বনফুল উপন্যাস সমগ্র

(তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীবলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

।। এক।।

মূল লেখাটি শুরু করার আগে একটি কথা কবুল করতে হবে। উপন্যাস সমগ্র প্রথম খণ্ড ভূমিকা লেখার সময় বলা হয়েছিল বনফুল ছোট বড় মিলিয়ে সবসুদ্ধ উপন্যাস লিখেছিলেন ছাপ্পান্নটি। কিন্তু এ হিসেব ভুল ছিল। আসলে তাঁর লেখা উপন্যাসের সংখ্যা চৌষট্টি [দ্রষ্টব্য : 'বনফুল শতবর্ষের আলোয়' গ্রন্থে পরিবেশিত তিস্তা মুখোপাধ্যায় সংকলিত বনফুল রচনার তালিকা]। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ উপন্যাস 'হরিশচন্দ্র'-এর প্রকাশকাল ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ। বনফুল প্রয়াত হয়েছিলেন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দেই। তার অর্থ হল সাহিত্যিক জীবনে বনফুল ছিলেন অক্লান্ত শিল্পী! তাছাড়া তিনি যে এতগুলো উপন্যাসই শুধু লিখেছিলেন তা নয়, প্রায় ছয়শো ছোটগল্প, ছোট বড় প্রচুর নাটক, অজস্র কবিতা, বেশ কিছু প্রবন্ধেরও রচয়িতা তিনি। তাঁর অঙ্কিত ছবির সংখ্যাও কম নয়। এমন একজন বহুপ্রজ্ঞ সক্ষম শিল্পীকে ছোট একটি নিবন্ধের পরিসরে প্রকাশ করা বেশ কঠিন!

বর্তমান খণ্ডে প্রথম খণ্ডের মতোই দশটি উপন্যাস সংকলিত হয়েছে। জীবনের নানা পর্বে এগুলো লেখা। আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে তার কালানুক্রম সন্নিবেশিত হল।

১. কিছুক্ষণ ১৯৩৭ খ্রি
২. সে ও আমি ১৯৪৩ খ্রি
৩ অগ্নি ১৯৪৫ খ্রি
৪. নঞ্ তৎপুরুষ ১৯৪৬ খ্রি
৫. হাটেবাজারে ১৯৬১ খ্রি
৬. কন্যাসু ১৯৬২ খ্রি
৭. পিতাম্বরের পুনর্জন্ম ১৯৬৩ খ্রি
৮. গন্ধরাজ ১৯৬৬ খ্রি
৯. সন্ধিপূজা ১৯৭২ খ্রি
১০. কৃষ্ণপক্ষ ১৯৭৩ খ্রি

উল্লিখিত উপন্যাসসমূহের মধ্যে 'পিতাম্বরের পুনর্জন্ম', 'নঞ্ তৎপুরুষ' ও 'গন্ধরাজ' হল বিদেশি রচনার আত্তীকৃত রূপ। জীবনের নানা পর্বে বনফুল বেশ কিছু উপন্যাস ও নাটক বিদেশি লেখকদের থেকে আত্তীকরণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধি প্রশংসাযোগ্য হয়েছিল এবং পাঠকসমাজে অনুকূল সমর্থন পেয়েছিল। এ বিষয়ে একটি পৃথক আলোচনা দাবি করে।

।। দুই।।

১৯৩৭ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত সময়সীমা নিতান্ত কম নয়। বিস্তৃত এ কালের মধ্যে বঙ্গদেশ, ভারত ও বিশ্বের মধ্যে নানা ঘটনা তরঙ্গিত হয়েছে

এবং তার অভিঘাত যে একজন সচেতন সাহিত্যিকের মানসগঠন ও অভিব্যক্তিতে বিবিধ বৈচিত্র্য প্রকাশ করবে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই এ পর্বের কিছু বিশেষ ঘটনার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যার অভিঘাত অন্য সব লেখকের মতো বনফুলেরও মননে হলকর্ষণ করে গিয়েছিল। তার প্রমাণ রয়ে গেছে তাঁর বহুধা বিচিত্র রচনাসমূহে। এমনকি একটু ঝুঁকির সম্ভাবনা নিয়েও বলা যায় বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে যত ধরনের কম্পন বিগত শতকের আট দশক ধরে অনুভূত হয়েছে তার একটি বড় অংশ ধরা পড়েছে তাঁর আবেগ ও মননের জগতে, তাঁর অনুভূতির সিস্‌মোগ্রাফে। তাই বনফুলকে নিবিষ্টভাবে পাঠ করলে বাঙালি এবং সংলগ্ন বিহার অঞ্চলের সমাজজীবনকে অনেকটাই অনুধাবন করা যেতে পারে। তাই বনফুলের উপন্যাস নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিত তাঁর সমকালের সংঘাত থেকে উৎপন্ন প্রবাহকে খানিক অনুধাবনের চেষ্টা করা দরকার।

বিশ শতকের প্রায় আট দশক বিস্তৃত তাঁর জীবৎকালে অবিভক্ত ও খণ্ডিত বঙ্গের উপর দিয়ে অজস্র ঝড় প্রবাহিত হয়ে গেছে। আগ্রহী ও মনস্ক পাঠক অবশ্যই লক্ষ করবেন কত ধরনের ভাঙাগড়া এ সময়ে বাঙালি জীবনকে উদ্বেজিত করে রেখেছিল। ত্রিশের দশকের নির্বাচন ও মুসলিম লিগের ক্রমশক্তি-বৃদ্ধি, কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষচন্দ্রের সাফল্য অথচ অবমাননার মধ্য দিয়ে দলত্যাগ, চল্লিশের দশকে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ, রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ, বেয়াল্লিশের আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশ ভাগ ও ভগ্ন স্বাধীনতা বাঙালির জীবনকে মথিত ও বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। সারা উনিশ শতক জুড়ে বাঙালির জীবনে অর্জিত রেনেসাঁসের যে মূল্যবোধ ও সুস্থিতি স্বীকরণ করে নিয়েছিল তা যেন প্রায় এক দশকের সংঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ যে সাধনার ধারাকে আত্তীকরণ করেছিলেন, তা যেন ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে অতি সহজে বিলুপ্ত হতে বাধ্য হল। স্বাধীনতা ও তার সহচর হিসেবে আগন্তুক দেশভাগ বাংলার ক্ষতচিহ্নকে আরো লাঞ্ছিত করে তুলল। তারপর বাঙালির জীবনের ক্রম অবনমন আর রোধ করা গেল না। ব্যবসা-বাণিজ্যে, মেধা ও মননে, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে বাঙালির অবিসংবাদিত আধিপত্য ছিল তার অনিবার্য ক্ষীয়মাণ রূপ প্রকট হয়ে উঠল। ব্যবসার মূলধন বাংলা থেকে স্থানান্তরিত হতে লাগল। ১৭৭৩ থেকে ১৯২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রাজধানী ছিল কলকাতা এবং তার ফলে সংস্কৃতিতেও বাঙালি ছিল শক্তিমান। কিন্তু ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কার্জন প্রবর্তিত বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রবল আন্দোলনের ফলে প্রত্যাহৃত হল বটে কিন্তু রাজধানী নতুন দিল্লীতে স্থানান্তরিত হল। তার ফলে ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী হল নতুন দিল্লী। অর্থনৈতিক রাজধানী হল বোম্বাই তথা এখনকার মুম্বাই এবং বাংলা সাংস্কৃতিক রাজধানীর ক্ষীয়মাণ গরিমা আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাইল। কিন্তু চল্লিশের দশকে অভিব্যক্ত অগ্ন্যুৎপাত তাকে শান্তিতে থাকতে দিল না। চল্লিশের দশকের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব যে এ সংকটের একটি প্রতীকী প্রকাশ। তাই যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতা করে একটি মহৎ জাতীয়তাবোধের চেতনা জেগে উঠেছিল, তার নির্বহন ঘটল আরো অনিবার্য বৃহত্তর বিপদসম্পন্ন বঙ্গবিভাজনে। তারপর পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে

এতাবৎকাল পর্যন্ত এ ভাঙনকে জোড়া দেবার চেষ্টা চলে আসছে নানা পদ্ধতিতে। কিন্তু তাতে তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষীয়মাণতাকে রোধ করা যায়নি।

বনফুলের সাহিত্যজীবনেব বিস্তার অন্য অনেক বরিষ্ঠ সাহিত্যিকের মতো, বাঙালি জীবনের দুই পর্ব জুড়ে। বস্তুত যেসকল সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দশকে অথবা বিশ শতকের প্রথম দশকে তাঁদের সকলকেই এ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। বাংলা সাহিত্যে তাঁদেব আবির্ভাব বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে। বনফুলও কথাকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ত্রিশের দশকে। তখন 'মাথার উপর জ্বলিছেন রবি, জ্বলিছে সোনার শত ছেলে।' তবু তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে নেবার পালা। এ ভাঙন ও তার থেকে বাঁচবার প্রয়াস বিচিত্র চেহারা নিয়ে ধরা দিল বাঙালি এ কথাকারদের লেখায়। বিভূতিভূষণ বাঙালিসমাজের বিবিধ জীবিকা অভিমুখী বিচিত্র জীবনের আস্তিক্যকে ধরতে চাইলেন। তারাশংকরে দেখা গেল সামন্ততন্ত্রের রাজকীয় পতন ও কৃষকজীবনেব উত্থান। মানিকের লক্ষ নিবিষ্ট হল একদিকে সমাজ সমস্যার পশ্চাৎপটে অর্থনীতির রহস্য ও মনস্তত্ত্বের জটিল অভিব্যক্তির উৎস আবিষ্কারের দিকে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জীবনকে গভীর মনন ও বোধের দিকে চালিত করেছিলেন, তার ঐশ্বর্য থেকে খানিক বিচলিত হয়েও বাঙালি এ লেখককুল আত্ম-আবিষ্কারে নিমগ্ন হলেন ভিন্নতর পথে। বনফুলও ছিলেন এ পৃথকতর পথের উৎসাহী পথিক। তিনি প্রসারিত জীবনকে ধরতে চাইলেন প্রবাহের চলমানতার মধ্য দিয়ে। তার সঙ্গে তিনি মিলিয়ে নিলেন সমগ্র মানবজীবনের প্রায় লুপ্ত ইতিহাস থেকে শুরু করে সমকালের চঞ্চল গতিধারাকে। এ প্রবণতার জন্যই সম্ভবত বনফুলের বিষয়বিন্যাস ও প্রকরণের মধ্যে রয়ে গেছে বিচিত্র বিস্তার। বর্তমান প্রতিবেদকের ধারণা অন্তত এটাই।

নিজের লেখা নিয়ে রুশ উপন্যাসকার ফয়দর দস্তয়ভস্কি মন্তব্য করেছিলেন, 'I have been driven to the condition that an artist is bound to make himself acquainted, down to the smallest detail, not with the technique of writing, but with everything current no less than historical events relating to that reality which he designs to show forth. ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে মাদাস আল্‌তশেভস্কিকে লেখা দস্তয়ভস্কির এ চিঠি যেন বনফুলের রচনা প্রসঙ্গে অধিকতর সত্য হয়ে উঠেছে। এ সত্যের প্রেক্ষিতে আমরা বনফুলেব সৃষ্টিরহস্য আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা চালাব।

।। তিন।।

'কিছুক্ষণ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। একই বছরে বেরিয়েছিল আরেকটি উপন্যাস 'দ্বৈরথ'। বলা যায়, উপন্যাসে বনফুল এই প্রথম স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতাকে। এ যুগল উপন্যাসের মধ্যে নানা

কারণেই ‘কিছুক্ষণ’ স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। মূলত দুটি কারণে এ উপন্যাসকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে কয়েকটি ঘণ্টার কাহিনী। একটি মেল ট্রেন কোনো মফঃস্বল স্টেশনে আকস্মিকভাবে থেমে যেতে বাধ্য হয়। অপ্রত্যাশিত এ যাত্রাবিরতি যাত্রীদের মধ্যে যে নানা অন্তর্বুনন নির্মাণ করেছিল, ‘কিছুক্ষণ’ তারই একটি শিল্পিত প্রতিফলন। উপন্যাসটির আয়তন খুব একটা বড় নয়। কোনো কোনো সংকলনে এটি বড় গল্প হিসেবেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরা এখানে অবশ্য আকারগত শৈলী নিয়ে কূটতর্কে অবতীর্ণ হব না। আমাদের বিশ্লেষণের বিষয় হবে এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বনফুল জীবনের কোন্ সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

ইংরেজ কবি শেলী একবার লিখেছিলেন Life like a dome of many-coloured glass stains its white radiance to eternity. এ সত্য যেন কিছুক্ষণ-এ সার্থকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। জীবনের বহুবর্ণসমন্বিত দর্পণ যেন শাশ্বতকে স্পর্শ করতে চেয়েছে এ উপন্যাসে। একটি স্টেশন ও তার চারপাশের ক্ষুদ্র লোকালয় জুড়ে আবর্তিত হয়েছে এর ঘটনাপুঞ্জ। এ ছোট পরিসরের মধ্যে ছোট ছোট মুহূর্তসমূহ অনুরাগ বিরাগের নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। একটি মফঃস্বলের স্টেশনে বনফুল এনেছেন পূর্বভারতের বিবিধ ভাষাভাষী একাধিক অঞ্চলের অধিবাসীদের। তাদের বেশভূষা আচার-আচরণ ও প্রকাশের বিভিন্নতা নিয়ে যেন একটি সমগ্র জাতিসত্তা প্রকাশ পেয়েছে। ‘হিন্দু মুসলমান, মাড়োয়ারি, বাঙালি, বিহারি সকলেই জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে’—উপন্যাসের এক অংশে বনফুল এ বর্ণনা দিয়েছেন। এ মানবমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে দেখা দিয়েছে নানা অভিব্যক্তি। সামান্য স্বার্থপরতা লোভ হিংসা থেকে পরোপকার, স্নেহ প্রীতি প্রেম একই সঙ্গে, কখনো বা একই মানুষের মধ্যে সন্নিবেশিত করতে লেখক সামান্যতম দ্বিধা করেননি। আসলে মানুষ তো এ ধরনেরই অজস্র বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের সমাহার। রেল কর্মচারী মাখনবাবু ও তার স্ত্রী, বংশগৌরবে আত্মতৃপ্ত মধ্যবিত্ত মানুষটি, ছাগল-চরানো বুড়ি ও আরো প্রচুর মানুষ এবং সর্বোপরি কাহিনীর কথক ও মিস মার্থা দাস নামের ‘ক্রিশ্চান’ মুচির মেয়েটি অত্যন্ত অবলীলায় পাঠকের অন্তস্থলে পৌঁছে গেছে। এ উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা নেই, চরিত্র পরিস্ফুটনের দায় অথবা অবকাশ নেই, তবু সব অসংলগ্নতার মধ্যেও যেন একটি জৈব সমগ্রতা রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের অব্যর্থ রসদৃষ্টি এ রচনার তাৎপর্য সম্যক অনুধাবন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ অনুজ লেখকদের প্রতি অবিমিশ্র স্নেহ ও প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রকাশ করে গেছেন। বনফুলও বঞ্চিত হননি। ‘কিছুক্ষণ’ পড়ে তিনি বনফুলকে ২৪শে জানুয়ারি ১৯৩৮ তারিখে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে—‘সাবাস! তোমার কিছুক্ষণ খুবই ভাল লাগল। উল্টে পড়া রেলগাড়ি যে অসংলগ্ন জনতা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে তার মধ্য থেকে তুমি যথেষ্ট রস আদায় করে নিয়েছ। এর মধ্যে ঝাঁজ আছে কম নয়। সেটা যে কেবল স্বাদের জন্য ভালো তা নয়, পথ্যও বটে।’ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বনফুল এ বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন ‘অগ্রগামী কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীচরণেষু’-কে। উপন্যাসটির উপসংহার আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময়। ক্ষণকালের পরিসরে গড়ে ওঠা

সম্পর্ক অক্লেশে অগ্রাহ্য করে মার্থা চলে তার প্রেমিকের কাছে, ড্রাইভারের মা-মরা মেয়েটি নায়কের মন বিষণ্ণ করে দিয়েছে। সে অন্যমনস্ক ভাবে কখন যেন চলে গেছে শীর্ণ নদীতীরবর্তী শ্মশানে, সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্নতা, তারপর জেগে উঠে সে দেখতে পেল শবদাহ। জীবনের দুটি প্রান্ত যেন মিলে গিয়ে এক গভীর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করল। স্টেশনে ফিরে সে দেখল প্রায় সব যাত্রী নিয়ে আটকে-পড়া ট্রেনটি চলে গেছে, তার নিজের ট্রেনও এল বলে। মাখনবাবু তার জন্য খাবার আনতে গেল এবং তারপর 'আমি একা নির্জন প্ল্যাটফর্মে সিগন্যালটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ওই ট্রেন আসিতেছে। একটু পরেই আমিও আর এখানে থাকিব না।' জীবন এভাবেই এগিয়ে চলে চিরন্তনতার দিকে। বিপর্যস্ত সময়ের বিপন্নতার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য অন্বেষণের গভীর অথচ সরল জীবনচিত্র এ উপন্যাস।

।। চার।।

'সে ও আমি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ। উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে বনফুল নিজের লেখকজীবনে নানা নিরীক্ষা করেছিলেন, 'সে ও আমি' তারই একটি নমুনা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। অন্য অনেক উপন্যাসের মতো এ লেখাতেও বনফুল কাহিনীর বর্তুলতাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। উপন্যাস রচনার যে আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত চেহারাটির সঙ্গে পাঠক পরিচিত আছেন, বনফুল সচেতনভাবে তাকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন। বহু উপন্যাসেই তিনি এ রচনাকৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুত, তাঁর প্রথম উপন্যাসযুগল 'তৃণখণ্ড' ও 'বৈতরণী তীরে' থেকেই তাঁর বৈশিষ্ট্য পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। প্রথম দুটি উপন্যাসে তিনি আরো একটি রচনাকৌশল অনুসরণ করেছিলেন। নিজের অন্তঃস্থ সত্তাকে বিভক্ত করে দুটি অংশকে প্রায়শ মুখোমুখি স্থাপন করতে চেয়েছেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত 'সুমতি' ও 'কুমতি' যেমন ছিল একই সত্তার দুটি রূপ, বনফুল তাকেই উপস্থাপিত করলেন যুগোপযোগী আধুনিকতা ও অন্তঃস্থ জৈবিকতা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ একবার জানিয়েছিলেন তিনি নিজেকে দেখেছেন নানাখানা করে, বনফুল তারই ফলিত প্রকাশ দেখাতে চাইলেন সূচনাপর্বের উপন্যাসসমূহে। 'বৈতরণী তীরে' ও 'তৃণখণ্ড' উপন্যাসে পাঠকরা পেয়েছেন তার এক নিজস্ব অভিব্যক্তি। একই চরিত্রের, আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে স্বয়ং লেখকের, দ্বিখণ্ডিত সত্তা অপূর্ব দ্বান্দ্বিকতায় পবস্পরে প্রতিস্পর্ধী হয়েছে। রচনারীতির সার্থকতা সত্ত্বেও অবশ্য গোড়ার উপন্যাস দুটিতে এ দ্বিখণ্ডিত সত্তা সম্পূর্ণ জৈব হয়ে উঠতে পারেনি। কিছুটা বহিরঙ্গই থেকে গিয়েছে। 'সে ও আমি'-তে লেখক যেন তার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'। দ্বিখণ্ডিত সত্তা (Split personality) নিয়ে বিশ্বকে অবলোকন বিশ শতকের কথানকের একটি প্রগাঢ় প্রবণতা। বনফুল এ প্রবণতাকে প্রকাশ করলেন 'সে ও আমি' উপন্যাসে গভীরতর বিন্যাস সহকারে। 'আমি' ও 'সে' এ উপন্যাসে লেখকের অহং-এরই দ্বৈত প্রকাশ। উত্তমপুরুষ বার বার

বাইরের পৃথিবীতে ঝাঁপ দিয়েছে নানাভাবে, কিন্তু জীবনের তরঙ্গিত প্রবাহে ফিরে এসেছে যেন তৃতীয় পুরুষ হয়ে। এই আশ্চর্য টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মননের দীপ্ত গৌরব। তার ফলে বাইরের বাস্তব ও অন্তরের বাস্তব নির্মাণ করেছে এক গভীর বুনন। যদি এ প্রসঙ্গে বলা যায় বনফুলের এ রচনাকৌশল বা আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য ছিল সমকালেরই এক শিল্পিত প্রতিফলন, তাহলে সম্ভবত তা অযৌক্তিক হবে না। সচেতন পাঠক নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন বাঙালিজীবনে যে ভাঙনের শুরু বিশ শতকের বিশের দশকে, তারই চরম ক্রান্তিকাল ত্রিশ ও চল্লিশের দশক। এমন তরঙ্গিত সময় কোনো জাতির জীবনে দেখা যায় কদাচিৎ। এ ভাঙনকে মনস্ক লেখককুল প্রতিফলিত করেন নানাভাবে। তার ক্ষয় ও উত্তরণ যেমন প্রকাশ পায় লেখকের চরিত্র নির্মাণের সঙ্গে কাহিনীর অন্তর্বয়নের সমগ্রতায়, দর্শনের অনন্যতায়, তেমনি রচনাশৈলীর মধ্যেও রেখে যায় এক অভ্যন্তরীণ চাপ। বনফুল যেন এ অভ্যন্তরীণ চাপকেই অভিব্যক্ত করেছেন এ দ্বিখণ্ডিত সত্তার রূপনির্মাণে। এভাবেই তিনি আত্মস্থ করতে চেয়েছেন যুগের যন্ত্রণাকে। এ উপন্যাসের উপসংহারে তাই এক সরল ও গভীর উপলব্ধি প্রকাশ তিনি করেছেন অবলীলায়। ঘটনার নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সে ও আমি শেষবারের মতো উভয়ের মুখোমুখি হয়। তখন ভিতর বাইরের অজস্র সংশয়, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব অতিক্রান্ত হয়েছে। জীবনের উদ্দেশ্য ও অভীপ্সা নিয়ে বাক্যবিনিময়ের প্রাচুর্য বাদ যায়নি। এবং শেষ পর্যন্ত—

আমি। আমাদের কি করতে হবে তাহলে?

সে। সংসার করতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে। আমার একটা পেট কোনো রকমে চালিয়ে নেব—এ মনোবৃত্তি পশুর, মানুষের নয়। সমাজের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে সমাজের সুখ-দুঃখের অংশ নিয়ে সৎপথে জীবন-যাপন করার নামই মনুষ্যত্ব, তাই দেশ-সেবা।

আমি। কতকগুলো দরিদ্র অক্ষম অপোগণ্ড সৃষ্টি করলেই দেশ উদ্ধার হবে?

সে। আপনি হয়তো দেশ উদ্ধার করতে পারবেন না, আপনার বংশধর করবে, সে না পারলে তার সন্তানেরা করবে। কিন্তু আপনার পরে আর যদি কেউ না থাকে, আপনার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে কে? আর সবাই যে দরিদ্র অক্ষম অপোগণ্ড হবে, তাই বা কে বলল আপনাকে? পৃথিবীর অধিকাংশ বড়লোকই তো দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিলেন। ঠাকুরদাস যদি দারিদ্র্যের অজুহাতে বিয়ে না করতেন, বিদ্যাসাগরের জন্ম হত?

এ সংলাপের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রতি বনফুলের নিবিড় শ্রদ্ধা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সমাজের প্রতি, সভ্যতার প্রতি, উত্তর পুরুষের প্রতি সুগভীর মমতা ও দায়িত্ববোধও অভিব্যক্ত হয়েছে। তাই মালতীর বদলে মিনতির আবির্ভাব 'আমি'-র জীবনে আর কোনো সংশয় সৃষ্টি করেনি। এ যেন তলস্তলীয় উপলব্ধির দেশি সম্প্রসারণ। জীবনের অস্ত্যর্থক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে যাবতীয় দ্বিধা অপসৃত হতে পারে। এবং এভাবেই সম্ভব হয় বিভক্ত সত্তার পূর্ণ সাঙ্গীকরণ। 'সে ও আমি' এ সাঙ্গীকরণেরই একটি তীর্যক বিন্যাস।

।। পাঁচ।।

এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত 'অগ্নি' (১৯৪৫) ও 'সান্ধিপূজা' (১৯৭২) বনফুলের দুটি পৃথক পর্যায়ে লেখা হলেও এখানে এক শ্রেণীতে এনে আলোচনা করা হচ্ছে। তার কারণ হল এ দুটি উপন্যাসেই বনফুল প্রত্যক্ষ রাজনীতিকে অবলম্বন করেছেন। যে কোনো কথাকারই সমকালকে এড়িয়ে চলতে পারেন না এবং তাব ফলে কোনো না কোনো ভাবে রাজনীতি তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হবেই, তবে তা প্রত্যক্ষভাবে নাও হতে পারে। বনফুলেরও বিভিন্ন উপন্যাসে রাজনীতি এসেছে নানাভাবে, কিন্তু একথা বলা যায় তিনি রাজনীতিকে বিষয় করেছেন কদাচিৎ। সে হিসেবে 'অগ্নি' ও 'সন্ধিপূজা' বনফুলের দুটি ব্যতিক্রমী রচনা। জীবনের দুটি পর্বে লেখা হলেও তাই এখানে এক বন্ধনীভুক্ত করা হল। চল্লিশের দশক ভারত, বিশেষ করে বাঙালীর জীবনে এক ক্রান্তিকারী কাল। এ দশকেই ঘটেছে লাহোরে লিগের সভায় পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ (১৯৪০), সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান (জানুয়ারি ১৯৪১) ও রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ (আগস্ট ১৯৪১), বিয়াল্লিশের 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' আন্দোলন (আগস্ট ১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), নৌবিদ্রোহ (১৯৪৬), ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশভাগ ও স্বাধীনতা (আগস্ট ১৯৪৭)। বাঙালির জীবনে আরেকটি ঘটনাবহুল দশক হল সত্তরের দশক। এ পর্যায়ে ঘটেছিল তৃতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন ও তার ভাঙন, নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্তুঙ্গ পর্যায়, পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ ও তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব (১৯৭১), ১৯৭২-এব 'গণতান্ত্রিক' নির্বাচন ও সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে ভীতিপ্রদ শাসনের শুরু, ১৯৭৫-এ সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি ও গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, ১৯৭৭-এ নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিশাল জয় ও স্বৈরতন্ত্রের অবসান। এ দুটি দশকের অন্তঃস্থ অস্থিরতাকে বনফুল প্রকাশ করতে চাইলেন আলোচ্য দুটি উপন্যাসে—প্রথমটিতে সমকালের প্রেক্ষিতে, দ্বিতীয়টিকে অতীতের পটভূমিতে।

'অগ্নি' উপন্যাসের পটভূমি বেয়াল্লিশের আন্দোলন। রাজনীতির এক বিশেষ প্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী ইংরেজকে ভারত ছেড়ে চলে যাবার ডাক দিয়েছিলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যলগ্ন। হিটলারের নাৎসিবাহিনী সারা ইউরোপ দখল করে প্রবলবেগে এগিয়ে চলেছে সোভিয়েত রাশিয়ায় অভ্যন্তরে। তার সহযোগী শক্তি জাপানও পার্লহারবার চূর্ণ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রায় পুরোটাই অধিকার করে নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজশক্তি তখন ইউরোপ ও এশিয়ায় পর্যুদস্ত হয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে গত তিন দশক ধরে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের যে টানাপোড়েন চলছিল তা যেন এক শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছল। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হল, অন্যান্য আলোচনাও ফলপ্রসূ হল না। জাতীয় কংগ্রেসের কোনো প্রস্তাবেই ব্রিটিশ কর্ণপাত করল না। তখন গান্ধীজি আওয়াজ তুললেন 'ভারত ছাড়ো'। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা দেখা দিয়েছিল তারই উদগ্র প্রকাশ ঘটল এ আহ্বানে। অহিংস ও কখনো কখনো হিংসাপূর্ণ অভিব্যক্তিতে আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছল। প্রথম

সারির নেতাদের ইংরেজ সরকার বন্দী করলেও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ইতিহাসের যেন এক নতুন পর্যায় শুরু হল। কিন্তু এ আন্দোলনে ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক দল মুসলিম লিগ যুক্ত হল না। তাদের লক্ষ তখন পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন। তাই রাজনৈতিক স্বার্থের কারণেই তাদের পক্ষে ইংরেজদের বিরোধিতা করা সম্ভব হল না। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে সবচাইতে মুস্কিলে পড়ল ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি। এ ঘটনার প্রায় দু দশক আগে এ পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং প্রথম থেকেই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ছিল তার অহিনকুল সম্পর্ক। দু দশক ধরে ইংরেজ শাসকরা কম্যুনিস্টদের আটক ও তাদের উপর অত্যাচার করেছে, নানারকম সত্যমিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে এবং যখন ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে তখনো এ সম্পর্কের মধ্যে কোনো বদল হয়নি। কম্যুনিস্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জুন নাৎসি বাহিনী যখন সোভিয়েত রাশিয়া অকস্মাৎ আক্রমণ করল তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করল এবং যেহেতু সোভিয়েত রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দিল তাই ব্রিটিশও তাদের স্বাভাবিক মিত্র হল। ব্রিটিশ প্রীত হল ও কম্যুনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল। ফলে ভারতে রচিত হল এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস ছিল ব্রিটিশের সাহায্যকারী। তখন কোনো কম্যুনিস্ট পার্টি এদেশে ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী জাতীয় কংগ্রেসকে প্রবল বিরোধীপক্ষ ও কম্যুনিস্টদের মিত্রপক্ষ বলে প্রতিষ্ঠা দিল। ফলে ভারতীয় জনমানসে, বিশেষ করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের এক তরফের কাছে কম্যুনিস্টরা দেশদ্রোহী বলে পরিগণিত হল। কংগ্রেসীরা জাতীয় বীর ও কম্যুনিস্টরা বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত হল।

ইতিহাসের এ দ্বান্দ্বিক সময়কেই বনফুল প্রকাশ করার প্রয়াসী হয়েছেন 'অগ্নি' উপন্যাসে। এ উপন্যাসে চরিত্রসমূহের অন্তর্গত আলোড়ন সময়ের অভিঘাতে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়েছে। বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে বনফুল যে অর্কেস্ট্রাটি সৃষ্টি করেছিলেন তা উপন্যাস হিসেবেই নয়, সমকালীন ইতিহাসের এক সংক্ষুব্ধ দলিল বলেও স্বীকৃত হতে পারে। অংশুমান ও অন্তরার মধ্য দিয়ে বনফুল সময়ের যন্ত্রণাকে ধরতে চেয়েছেন। আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তিনি সার্থকভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন জীবনের এক সদর্থক দর্শন। তাই নানা উচ্চাবচতার প্রবহমানতা স্পর্শ করে কাহিনী যখন উপসংহারে পৌঁছয়, বনফুল তখন তা প্রকাশ করেন এভাবে—

'সেদিন পূর্ণিমা। শেষ রাত্রি। সামনেই ফাঁসির মঞ্চ। অন্তরা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। অংশুমান মৃত্যুর কথা ভাবছিল না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল সে। অনাবিল জ্যোৎস্নায় মহাকাশ পরিপ্লাবিত। পৃথিবীর ধূলিতে লেগেছে আকাশের স্পর্শ, জেগেছে অনাগত লোকের স্বপ্ন। রূপসাগরের কানায় কানায় অপরূপ সৌন্দর্যসুধা যেন টলমল করছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উড়ে যেতে চাইছে যেন পৃথিবীর দৃষ্টির ওপারে চক্রবাল রেখা ছাড়িয়ে। ওটা মেঘ নয়—নৌকোর পাল......ভারতের স্বর্গীয় অমরবৃন্দ বোধ হয় যাত্রা করেছেন আজ মর্ত্যের দিকে....ক্ষুদিরাম

কানাইলালের দল.....ওটা তাদেরই পালতোলা নৌকো—পালে লেগেছে পারিজাত গন্ধী হাওয়া—দুলছে তাতে নন্দনবনের মন্দারমঞ্জরী.. ....'

সমাপ্তিতে কোনো পূর্ণচ্ছেদ নেই। বনফুল অত্যন্ত সচেতনভাবেই পূর্ণচ্ছেদকে পরিহার করেছেন। অংশুমান-অন্তরার আবেগ চির প্রবহমান। তারা অনাগত ভবিষ্যতকে যেন সামনেই দেখতে পাচ্ছে। 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো' তাদের অবয়বকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। এ বর্ণনার মাধ্যমে বনফুল নিজের অভীপ্সা ও আদর্শকে প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও সার্থক শৈলীতে।

'সন্ধিপূজা' উপন্যাসটিতেও রাজনীতি বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। অবশ্য এ উপন্যাসের ঘটনাবলী সমসাময়িক ছিল না, আঠারো শতকের বঙ্গদেশের রাজনীতি তার বিষয়। অথচ বনফুল আত্মজীবনীতে অন্তরঙ্গ স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছেন, 'যদিও আমি প্রকাশ্যভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত ছিলাম না, কিন্তু রাজনীতির প্রভাব আমার মনে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। মনে মনে আমি কংগ্রেসী ছিলাম, মহাত্মা গান্ধীর উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল।' কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে 'অন্যায়ভাবে' কংগ্রেস থেকে বিতারণ, বাঙালি শহিদদের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব ইত্যাদি বিষয় তাঁকে বিচলিত করেছিল। এ বীতরাগ সত্ত্বেও তাই তিনি লিখেছিলেন 'অগ্নি'। অবশ্য তার ঘোষণা ছিল, 'না, পলিটিকসে আমি ঢুকি নাই। কিন্তু তবু পলিটিক্যাল খবর আমাকে বিচলিত করিত' [পশ্চাৎপট]। এ বিচলন যেমন প্রকাশ পেয়েছিল 'অগ্নি'সহ আরো কিছু উপন্যাস রচনার মধ্যে, তেমনি 'সন্ধিপূজার' মধ্যেও। সম্ভবত সত্তর দশকে বাঙালি জীবনে আবার যে উত্তুঙ্গ আলোড়ন উঠেছিল তা সচেতন লেখক হিসেবে বনফুলকেও স্পর্শ করে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ডামাডোল ও পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানও প্রচণ্ড অস্থিরতায় প্রকাশিত হয়েছিল সত্তর দশকের গোড়াতেই। উভয় বাংলার এ অনিশ্চিত ও অস্থির পরিস্থিতি বনফুলের স্মরণে এনে দিয়েছিল দুই শতাব্দী আগেকার বঙ্গীয় ইতিহাসের একটি ক্ষতলাঞ্ছিত কয়েকটি অধ্যায়কে। বাংলায় শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সরাবার জন্য যে ব্যাপক ষড়যন্ত্র হয়েছিল যার পরিণামে ঘটেছিল পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলার স্বাধীনতালোপ, তার অনুরূপ প্রতিধ্বনি যেন তিনি অনুভব করলেন সত্তরের ঘটনাবলীর মধ্যে। প্রায় দুশতক ব্যবধানে বাংলার সমাজজীবনে সংঘটনার প্রতিফলনের মধ্যে তিনি একটি সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তবে বনফুল ছিলেন দুর্মর আশাবাদী। তাই সর্ববিধ নেতির মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন মঙ্গলকে। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'—রবীন্দ্রনাথের এ বাণীকে তিনি মেনে চলতেন সর্বান্তঃকরণে। তাই এ উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে পলাশীর যুদ্ধের সমসাময়িক দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোর কথা থাকলেও তিনি সন্ধানী অস্ত্যর্থক আশাবাদী আলো ফেলেছিলেন বাঙালির সমাজজীবনে। 'সন্ধিপূজা' শব্দটি বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার সঙ্গে জড়িত। অষ্টমীতে দুর্গাপূজার অনুষঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় সন্ধিপূজা। বনফুল এ পূজাকে রূপক হিসেবে গ্রহণ করে লিখলেন এ উপন্যাস। তিনি যেন বলতে চাইলেন বাঙালির জীবনে যত বড় বিপর্যয়ই দেখা দিক না কেন তার অবসান হবেই এবং একটি

নির্মল শুভ্র প্রভাত সুমঙ্গলের বাতাবরণ নির্মাণ করবে। তাই এ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময়ে যে সন্ধিপূজা শুরু হতে যাচ্ছিল সেখানে যেন এ কাহিনীর মুখপাত্র হয়ে সহসা নীলু রায় বললেন, 'এই সন্ধিপূজার সময় মায়ের কাছে বর প্রার্থনা করুন আমরা যেন বিজয়ী হই। আজ আমরা যুগসন্ধিক্ষণেও উপস্থিত হয়েছি। মুসলমানের রাজত্ব শেষ হয়েছে, ইংরেজের রাজত্ব শুরু হল। এই সন্ধিপূজাও আমাদের করতে হবে। এ পূজার মন্ত্রপাঠ করবেন আমাদের বিবেক। এ পূজায় আমরা শপথ নেব যে আমরা চিরকাল সত্যের দিকে, ন্যায়ের দিকে, ধর্মের দিকে থাকব। অসত্য অন্যায় অধর্ম আমরা কিছুতে সহ্য করব না। মা আমাদের আশীর্বাদ করুন।'

এভাবেই 'শুরু হইয়া গেল সন্ধিপূজা।' কোনো জাতির জীবনে ব্যাপক অস্থিরতার মধ্যে একজন বিবেকী লেখক এর চাইতে পুণ্যময় আর কিই বা উচ্চারণ করতে পারেন।

।। ছয়।।

'হাটেবাজারে' বনফুলের সাহিত্যজীবনেব প্রায় মধ্যপর্বের রচনা। রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। এটি তাঁর ছত্রিশতম উপন্যাস। 'হাটেবাজারে' বনফুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, প্রচণ্ড জনপ্রিয়ও বটে। এ উপন্যাসে পাঠক আবার পেলেন লেখকের আত্মপ্রতিফলন। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য যেন বনফুলেরই পূর্বসৃষ্ট অগ্নীশ্বর মুখার্জিরই সম্প্রসারণ। পারিপার্শ্বিক জীবন ও মানুষদের প্রতি অসীম সহানুভূতিসম্পন্ন সদাশিব তেজে ও সমমর্মিতায়, ত্যাগে ও সেবায়, অনুরাগে ও প্রতিবাদে একটি অপূর্ব স্বাতন্ত্র্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। এ উপন্যাসে সদাশিব স্বয়ং এবং দেহাতি মেয়ে ছিপলী, ড্রাইভার আলীর মতো নিকট জনেরা শুধু আছে তাই নয়, আছে ছবিলাল ও তার লোকজন, যারা সমাজে নানা দুষ্কৃতি করে বেড়ায়। আর আছে অজস্র বিচিত্র সব চরিত্র যারা সদাশিবের প্রাত্যাহিক জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত থাকে নানাভাবে। বনফুলের নিজের কথায়, 'ভাগলপুরে লেখা আর ডাক্তারি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কথাও কিছু নাই। আমার ল্যাবরেটারির কাজ একঘেয়ে কাজ। তাহাতে বৈচিত্র্য কিছু ছিল না। বৈচিত্র্য ছিল আমার রোগীগুলির মধ্যে। মেথর, ডোম, চামার, গয়লা, মেছো, কসাই, রিকশাওলা, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান—ইহারাই আমার রোগী ছিল। মুসলমান কসাইরা, তরকারিউলীরা, চাল, ডাল, বিক্রেতারা খুব ভক্ত ছিল আমার' [পশ্চাৎপট]। আবার আত্মজীবনীরই অন্যত্র এক জায়গায় লিখেছেন, 'ভাগলপুরে বিহারীদের এবং অন্য অবাঙালিদের নিকট আমি যে আন্তরিক ভালবাসা পাইয়াছিলাম, বাঙালিদের নিকট হইতে তাহা পাই নাই। বাঙালিরা আমার খ্যাতির জন্য আমাকে কিছু খাতির করিত, কিন্তু আমাকে বেশি ভালবাসিত বিহারীরা। ভাগলপুরের ফটোগ্রাফার হরি কুণ্ডু এবং আনন্দ প্রেসের মালিক রাম অওতার আজও আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে। আরও আছে অনেক কুলি, মুটে মজুর, রিকশাওয়ালা, মেছো, মেছুনি, দোকানদাররা। ইহারা

আমার সাহিত্যের আস্বাদ পায় নাই, তবু কেন যে ভালবাসিত আমাকে, তাহা জানি না। ইহাদের অনেকের কথা পরে আমি আমার হাটেবাজারে গ্রন্থে লিখিয়াছি।'

শুধু 'হাটেবাজারে' উপন্যাসে নয়, আরো বেশ কিছু উপন্যাসে ও অজস্র ছোটগল্পে বিহারের এ অঞ্চলের প্রচুর মানুষ বনফুল সুগভীর অনুরাগে উজ্জ্বল চেহারায় উপস্থাপিত করেছেন। জাতি ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে তারা বনফুলের মমতাময় সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। বস্তুত এ উপন্যাস সম্পর্কে একটু ঝুঁকি নিয়েও হয়তো বলা চলে ডাক্তার সদাশিবকে কেন্দ্র করে একটি মূল কাহিনীর বিন্যাস লেখক ঘটালেও আসলে অজস্র চরিত্রের ছোট ছোট জীবনচিত্র ছোটগল্পেরই উপকরণ বলে স্বীকৃত হতে পারে। মূল কাহিনীকে বিস্তারের বদলে লেখক যেন পারিপার্শ্বের মানুষগুলো সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন বেশি। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অ্যান্থনি ট্রোলেপে যেন এ মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করেছেন উপন্যাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে, 'But the novelist has other aims than the elucidation of his plot. He desires to make his readers so intimately aquainted with his characters that the creations of his brain should be to them spe·king, living, human characters. This he can never do unless he knows those fictitious personages himself, and he can never know them well unless he can live with them in the full reality of established intimacy. They must be with him as he lies down to sleep and as he wakes from his dream He must learn to hate them and to love them

বনফুল যেন এ উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে, বিশেষ করে 'হাটেবাজারে' উপন্যাসটিতে। তিনি পারিপার্শ্বের তথাকথিত অকিঞ্চিৎকর মানুষগুলোকে শুধু দেখেননি, অনুভবও করেছেন, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে অনুরাগে বিরাগে অন্তরঙ্গ ভাবে দিনযাপন করেছেন এবং তুলির অভ্রান্ত টানে তাদের পূর্ণরূপে জীবন্ত করে তুলেছেন। এভাবেই ভাগলপুর মোটর ওয়ার্কসের মালিক অমল মুখোপাধ্যায় হাটেবাজারের মধ্যে এসে গেছে 'কমল' নামে। '....মোটর মিস্ত্রিদের মধ্যে অনেক চরিত্র আমার মনে দাগ কাটিয়া গিয়াছে। তাহাদের চরিত্র আমার গল্পে, উপন্যাসে আসিয়া পড়িয়াছে [পশ্চাৎপট]।

এসব চরিত্রের মধ্যে উজ্জ্বলতম হল ড্রাইভার আলী। 'হাটেবাজারে'-র সদাশিব ডাক্তারের ড্রাইভারের নাম ছিল আলী। বনফুলের ড্রাইভারের নামও ছিল আলী। আলী সম্পর্কে আত্মজীবনীতে বনফুল জানিয়েছেন, 'অনেক রকম ড্রাইভার আমাকে রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু আলীই আমার মনে দাগ রাখিয়া গিয়াছে। এ চরিত্রটি আমি আমার 'হাটেবাজারে' গল্পে অঙ্কিত করিয়াছি। .....সে কখনই প্রভুর কথার উপর কথা বলিত না। তাহার মধ্যে একটা মুসলমানী আদবকায়দাও আমাকে মুগ্ধ করিত।' অন্যত্র লিখেছেন, 'আমার হাটেবাজারে বইটির ড্রাইভার আলী সত্য চরিত্র, কাল্পনিক নহে।' আলীর মতোই অজস্র চরিত্র তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্মের সঙ্গে 'হাটেবাজারে'-র মঞ্চেও চিরন্তনতা পেয়ে গেছে। তারা হয়ত সকলে আলীর মতো প্রকৃত নামে বনফুলের রচনায় আসেনি, কিন্তু কাল্পনিক

নামেই তারা সুগভীর বাস্তবতা নিয়ে হাজির থেকেছে। বনফুল তাদের সঙ্গে 'ঘুমিয়েছেন ও স্বপ্ন থেকে জেগে' উঠেছেন।

চারপাশের চেনাজানা মানুষদের বনফুল এভাবেই সাহিত্যের সামগ্রী করে তুলেছেন। এ বাস্তবতার মধ্যে ডাক্তার সদাশিব জীবনযাপন করেছেন, মৃত্যুও এসেছে তাদেরই সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার অভিঘাতে। ছিপলীকে ডাকাতদের হাতে লাঞ্ছনা থেকে বাঁচাতে গিয়ে মাথায় লাঠির আঘাতে অন্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেছেন তিনি। এবং তারপর বনফুলের ভাষায়।

'ক্রমশ প্রলাপও বন্ধ হয়ে গেল। ঠোঁট দুটো নড়ত খালি, কি বলতেন কিছু বোঝা যেত না।

দিন দুই পরে তাঁর মৃত্যু হল।

মালতী বা সোহাগকে খবর দিতে পারা যায়নি। ছিপলীই তার মুখাগ্নি করল।'

এমন সংক্ষিপ্ত অথচ বিদ্যুৎগর্ভ বর্ণনা উপন্যাসের সমাপ্তিকে অসামান্য সৌন্দর্যময় করে তুলেছে। এ বর্ণনা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিকেও গভীরতা দিয়েছে। ডাক্তার সদাশিবের শেষকৃত্যের জন্য নিজের আত্মীয় পরিজনের প্রয়োজন ছিল না। যাদের সঙ্গে তিনি বেঁচে থেকেছেন ও যাদের জন্য মরেছেন তারাই ত তাঁর যথার্থ আত্মার সম্পর্কিত আত্মীয়। বনফুল সদাশিবকে সেই মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এ উপন্যাসটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন বনফুল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যে যাতায়াতকারী একটি ট্রেন 'হাটেবাজারে' নামে চিহ্নিত হয়েছে।

।। সাত ।।

'হাটেবাজারে'-র পরের বছরেই প্রকাশিত হয় 'কন্যাসু'। কন্যাসন্তান সমাজের কাছে কতখানি কাঙ্ক্ষিত এ নিয়ে রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরে আলোচনা করছেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমাজ আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার কন্যাসম্পর্কিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটাতে ব্যর্থই হয়েছে। বিশ শতকের উপান্তে এলেও দেখা গেছে সতীদাহের মতো লজ্জাজনক ঘটনা, কন্যাভ্রূণ হত্যা করার জঘন্য মানসিকতা। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে কন্যাসন্তানকে বিক্রি করে দেবার মতো ঘটনাও আমাদের দেশে কম ঘটে না। এসবের বিদ্যামানতার মধ্যে কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য যে প্রক্রিয়া ও প্রথার মধ্য দিয়ে অভিভাবকদের অতিবাহিত করতে হয় তার যন্ত্রণাও নিতান্ত কম নয়। কন্যাকে পণ্যের মতো পাত্রপক্ষের সামনে হাজির করা, পণের জন্য দরকষাকষি পারস্পরিক আত্মীয়তাস্থাপনের মনকেও গোড়াতেই গুলিয়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' থেকে আধুনিক কালের বহু লেখকের সাহিত্যে এ কুপ্রথাকে আক্রমণ করা হয়েছে, কিন্তু তাতে সমাজ তেমন বদলায়নি। এমনকি পিতার শিক্ষিত সুন্দরী তন্বী কন্যাকেও নানা গ্লানির মধ্য দিয়ে প্রায়শই চলতে হয়। অত্যন্ত সচেতন সাহিত্যিক বনফুলও এ সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাননি। তিনি নিজের কন্যার বিবাহ দিতে গিয়ে যেসব

অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তারই ঘটনাবলী থেকে প্রয়োজনীয় অংশ ছেঁকে নিয়ে পরিবেশন করেছেন এ উপন্যাসে।

সামাজিক এ দৃষ্টিভঙ্গির উৎস সন্ধান ও সমস্যা থেকে পরিত্রাণের পথও বনফুল এ উপন্যাসে করতে চেয়েছেন। আমাদের সামাজিক এ মনোভঙ্গির জন্য তিনি দায়ী করেছেন দীর্ঘকালের পরাধীনতাকে, 'বাইরের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েও আমরা কিছুই পাইনি। আমরা সত্যকথা বলতে ভয় পাই, আনন্দ লাভ করবার দাবি জানাতেও ভয় পাই। ঘরে বাইরে সশঙ্কিত পশুর মতো রয়েছি। সামান্য একটু আনন্দের জন্যে, মানুষের মতো বাঁচবার জন্যে অমানুষের মতো কি হীনতাই না সহ্য করতে হচ্ছে আমাদের।' কাহিনীর অন্যতম চরিত্র ঊষার জবানীতে উদ্ধৃত উক্তিটি তো স্বয়ং বনফুলেরই। সমাজের একটি শ্রেণীর হাতে অজস্র অর্থ উচ্ছৃঙ্খলাতে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বলেই মনে করেন তিনি। তাই বিবাহযোগ্য কন্যাদের দিকে প্রতিমুহূর্তে নিক্ষেপ করা হয় অবহেলা ও অপমান। 'কন্যাসু' উপন্যাসটি অবশ্য সুখপ্রদ উপসংহারে উপনীত হয়েছে, কিন্তু এ রচনাতে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর প্রাসঙ্গিকতা পাঠকদের বরাবর ভাবিয়ে তুলবে, অন্তত যতদিন না এ পরিস্থিতি ও মানসিকতার পরিবর্তন হয়।

।। আট।।

'পিতাম্বরের পুনর্জন্ম' ও 'গন্ধরাজ' উপন্যাসযুগল বিদেশি কাহিনীর আত্তীকরণ। 'পিতাম্বরের পুনর্জন্ম' বনফুল বাংলায় এনেছেন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক চার্লস ডিকেন্স (১৮১২—১৮৭০)-এর ক্রিসমাস ক্যারল থেকে এবং 'গন্ধরাজ' এসেছে রবার্ট লুই স্টিভেনসন (১৮৫০-১৮৯৪)-এর 'প্রিন্স অটো' থেকে। চার্লস ডিকেন্স পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীকৃত। স্টিভেনসনও বিশ্বসাহিত্যে অত্যন্ত পরিচিত নাম। 'ক্রিসমাস ক্যারল'-এ বড়দিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে ইংরেজ সমাজজীবনে যে হাসিকান্না উৎসারিত হয় লেখক তারই একটি অনুরাগরঞ্জিত ছবি এঁকেছেন। বনফুল বড়দিনকে রূপান্তরিত করেছেন দুর্গোৎসবে। বড়দিন যেমন ক্রিশ্চানদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। তেমনি দুর্গোৎসবও আমাদের নিজস্ব সম্পদ। এ উৎসবকে কেন্দ্রে রেখে সমাজের ভালমন্দ, ঘৃণা ভালবাসাকে বনফুল একটি বিশ্বাসযোগ্য চেহারা দিয়েছেন। 'গন্ধরাজ' উপন্যাসেও অনুরূপ সিদ্ধি অনুভব করা যায়।

'নঞ তৎপুরুষ' উপন্যাসটিও বিদেশ থেকে আহৃত। রুশ লেখক ফিয়োদোর দস্তয়ভস্কির (১৮২১-১৮৮১) 'দ্য ইটারনাল হাজব্যান্ড' উপন্যাস থেকে বনফুল এটিকে বাংলায় এনেছেন। জীবনের নানা পর্বে বনফুল এধরনের আত্তীকরণে বেশ সাফল্য দেখিয়েছেন। এ বিচিত্রমুখী প্রয়াসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তার অবিরত অন্বেষণ ও প্রগাঢ় জীবনচর্যা। মানুষের গভীর ও হাস্যমুখর, ভাল ও মন্দ, অনুরাগ ও অপ্রীতি এক অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনন ও অনুসন্ধিৎসু হৃদয়টিকেও পাঠক এসব রচনার মধ্যে অনুভব করতে পারেন।

।। নয়।।

বর্তমান সংকলনের শেষ উপন্যাস 'কৃষ্ণপক্ষ'। আঙ্গিকের বৈচিত্র্যের প্রতি বনফুলের বরাবরই একটি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। তিনি যেমন একদিনে ছোট বড় নানা আকারের উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি প্রকাশভঙ্গিরও বিবিধ কৌশল তাঁর রচনায় লক্ষ করা যায়। আমরা তাঁর কাছ থেকে 'জঙ্গম', 'উদয় অস্ত', 'ডানা', 'স্থাবব' প্রভৃতি বৃহদায়তনিক উপন্যাস, আবার 'ভুবন সোম', 'কিছুক্ষণ', 'সে ও আমি' অথবা 'তৃণখণ্ড'-এর মতো ঔপন্যাসিক। সাধু ও চলিত, গদ্য ও কাব্য তাঁর কাছে অপক্ষপাত মর্যাদা পেয়েছে। তাছাড়া তিনি বারবার অবগাহন করতে চেয়েছেন চেতনার অন্তঃপ্রবাহে। 'কৃষ্ণপক্ষ' এমনই একটি উপন্যাস।

এ উপন্যাসে চেতন-অবচেতন, মানুষ ও প্রকৃতি যেন হাত ধরাধরি করে চলেছে। জীবনের পর্দার উপর প্রতিফলিত হয়ে চলেছে কোনো কবির স্বপ্নচ্ছবি। তার ফলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের তুলনায় অনেক বেশি জাগ্রত রয়েছে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। পরিণামে আলোছায়ার এক বিচিত্র জগত পাঠকেব সামনে ক্রমাগত উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে। তারই একটি অভিব্যক্তি দেখা যায় উপন্যাসের প্রায় অন্তিম অংশে।

'বেড-সুইচটা হাতড়ে টিপে দিলাম। মনে হল একটা পুড্‌ল (Poodle) কুকুর যেন ছুটে পালিয়ে গেল। একটা মেমসাহেবকেও যেন দেখতে পেলাম আবছা। তারপর নজর পড়ল বেড সুইচের তারের উপর। হলদে রঙ, হলদে পাখির মতো হলদে। নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম সেটার দিকে। তাহলে কি জগদম্বা আবার নৌকো পাঠিয়েছে? এটা কি হলদে পাখির ছদ্মবেশ? সবই তো ছদ্মবেশ, আসল রূপ তো কারো দেখলাম না আজ পর্যন্ত। নিশ্চয়ই এটা হলদে পাখি---জগদম্বা পাঠিয়েছে। টিউ-টিউ-টিউ---ওই যে হলদে পাখি ডাকছে। যাচ্ছি যাচ্ছি। যাবার আগে যা ঘটেছে সব লিখে যাব। কেউ বিশ্বাস করবে না---তবু লিখে যাব।'

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রান্ত স্পর্শ করে চেতনাপ্রবাহের এ অগ্রসরমানতা বনফুলের আরো কিছু উপন্যাসের মতো 'কৃষ্ণপক্ষ'-এরও উপজীব্য। যাই ঘটুক না কেন নির্বহনে তিনি অবিমিশ্র তমিস্রাকে প্রাধান্য দেন না কখনোই। 'কেউ বিশ্বাস করবে না তবু লিখে যাব'— এ ঘোষণা তাই এ উপন্যাসেও বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে পাঠকদের কাছে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য পেশ করা হচ্ছে। আলোচিত দশটি উপন্যাসের মধ্যে 'কিছুক্ষণ' ও 'হাটেবাজারে' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। 'কিছুক্ষণ' পরিচালনা করেছিলেন লেখকের অনুজ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। মুক্তি পেয়েছিল ২৪.৭.১৯৫৯-তে। কুশীলব ছিলেন অরুন্ধতি, অসীমকুমার, শোভা সেন প্রভৃতি শিল্পী। 'হাটেবাজারে'র পরিচালক ছিলেন তপন সিংহ। মুক্তি পেয়েছিল ১৬.১১.১৯৬৭-তে। শিল্পী ছিলেন অশোককুমার, বৈজয়ন্তীমালা, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী প্রভৃতি। এ ছবি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার সহ নানা শিরোপা পেয়েছিল।

গন্ধরাজ

।। এক।।

ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে পৌরাণিক রাজ্য গর্জনগ্রামের নাম লুপ্ত হয়ে গেছে। গর্জনগ্রাম ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। আয়তনে ছোট হলেও প্রতাপে সে নাকি ছোট ছিল না। গর্জনগ্রামের গর্জনে পার্শ্ববর্তী রাজ্যরা ভয়ে কাঁপত। হিমালয়ের পাদদেশে তখন যে সব রাজারা রাজত্ব কবতেন তাঁরা গর্জনগ্রামের সঙ্গে শত্রুতা করা নিরাপদ বিবেচনা করতেন না। সে যুগের ইতিহাসে গর্জনগ্রাম তার মহিমময় স্বাক্ষর রেখে গেছে। কিন্তু সে যুগও আর নেই, সে স্বাক্ষরও নিশ্চিহ্ন। ইতিহাসের কোন্ পর্বে এসব ঘটেছিল তা-ও জানা নেই। বহুকাল আগে ও রাজ্যের উত্থান এবং পতন হয়ে শেষ হয়ে গেছে সব। কিম্বদন্তী এইটুকু মাত্র শুধু বলে যে গর্জনগ্রামের রাজারা নাকি লিচ্ছবি বংশের লোক ছিলেন, যে লিচ্ছবি বংশ ইতিহাসে আলো-ছায়া-ময় অনেক কাহিনী রচনা করেছে।

মনোরম রাজ্য ছিল অরণ্যপরিবৃত পার্বত্য গর্জনগ্রাম। অনেক নদী অনেক নির্ঝরের উৎস, অনেক বৃক্ষলতাগুল্মশোভিত, নানাবিধ পার্বত্য পুষ্পে সজ্জিত, অনেক আশ্চর্য উপত্যকা-পর্বতশিখরে-সমৃদ্ধ এই জনপদ তদানীন্তন সভ্যতারও প্রতীক ছিল। অসভ্য ছিল না গর্জনগ্রামের অধিবাসীরা। সেকালেও নদী-নির্ঝরের সহায়তায় মিল চালাতো তারা। করাত দিয়ে পাহাড়ী গাছ চিরে তক্তা বানিয়ে ব্যবসা করত। নগরের নাম ছিল পার্বতী, আর তাকে কেন্দ্র করে বাদামী রঙের কাঠের-তৈরী বাড়ি থাকে থাকে গড়ে উঠেছিল পর্বতের স্তরে স্তরে ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রামগুলিতে। ঠিক্ যেন ছবির মতো দেখাতো। গভীর উপত্যকার নিম্নভূমি থেকে এই সব কাঠের-তৈরী বাড়ির ছাদের সহায়তায় এবং বেগবতী বড় বড় পাহাড়ী নদীর উপর আচ্ছাদিত সেতুর উপর দিয়ে গ্রামবাসীরা নীচের গ্রাম থেকে উপরের গ্রামে যাতায়াত করত। মিলের গুরু-গুরু শব্দ, নদীর কলকলধ্বনি, দেওদার গাছের তীব্র মধুর গন্ধ, আরণ্যবৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় স্বচ্ছন্দপ্রবাহিত বাতাসের স্বনন, শিকারীদের আগ্নেয়াস্ত্রের ক্বচিৎ বিস্ফোরণ, কাঠুরেদের কাঠ-কাটার আওয়াজ, দুরারোহ দুর্গম পথ, পথের পাশে পরিচ্ছন্ন সরাইখানায় টাটকা মাছভাজার গন্ধ, নানারকম পাখির গান আর গ্রামবাসীদের আনন্দগুঞ্জন— এই সবই ছিল গর্জনগ্রামের বৈশিষ্ট্য। যাঁরা গর্জনগ্রামে বেড়াতে যেতেন এই সবেরই স্মৃতি আঁকা থাকত তাঁদের মানসপটে।

গর্জনগ্রামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ঢেউ-খেলানো পর্বতমালার রেখা ধরে নেমে এসেছিল **এক বিরাট সমতল প্রান্তরে। এই প্রান্তরের সীমায় অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। অধুনা-লুপ্ত ভৈরঙ্গী ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। গর্জনগ্রামের দক্ষিণ সীমায় ছিল রোহিণীপ্রস্থ। ক্ষমতাশালী বলে খ্যাতি ছিল এ রাজ্যটির। আরও নানা অদ্ভুত ব্যাপারে খ্যাতি ছিল এর। এ রাজ্যের লোকেরা নাকি অতি সরল, অতি কোমল-হৃদয়, অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। এ রাজ্যের ফুল নাকি বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়কর নাকি এ রাজ্যের পাহাড়ী ভালুক। বহু শতাব্দী ধরে**

গর্জনগ্রাম আর রোহিণীপ্রস্থের রাজবংশ বিবাহ-বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ ছিলেন। গর্জনগ্রামের শেষ রাজপুত্র, যাঁর কাহিনী আমরা এই আখ্যায়িকায় বলব, তিনি ছিলেন রোহিণীপ্রস্থের রাজা কোকনন্দকুমারের একমাত্র কন্যা স্বর্ণাঙ্গিনীর পুত্র। কোমল-হৃদয় ভাব-প্রবণ রোহিণী-রাজবংশের সঙ্গে গর্জনগ্রামের রাজবংশের এই বৈবাহিক যোগাযোগ গর্জনগ্রামের প্রজারা খুব সুচক্ষে দেখত না। তারা মন করত গর্জনগ্রামের প্রাচীন রাজাদের রুক্ষ পরুষ চরিত্র ওই রোহিণীবংশের সংস্পর্শে এসে যেন একটু মোলায়েম মেয়েলী গোছের হয়ে গেছে। গর্জনগ্রামের কয়লাওলারা, পাহাড়ী বলিষ্ঠ করাত চালিয়ে ছুতোররা, দেওদার-অরণ্য-নিবাসী বৃহৎ কুঠার-চালক কাঠুরেরা তাদের প্রবল পৌরুষকেই শ্রদ্ধা করত। তাদের রুক্ষ হাত, বলিষ্ঠ বাহু, তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞতা, তাদের বীরত্বময় প্রাচীন ঐতিহ্য-উপকথা—এই সবই গর্বের বস্তু ছিল তাদের। রাজবংশের কোমল নমনীয়তা মোটেই পছন্দ করত না তারা।

ঠিক কোন্ বছরে কোন তারিখে এ গল্পের আরম্ভ তা পাঠক পাঠিকারাই আন্দাজ করে নিন। কিন্তু কোন্ সময়ে, অর্থাৎ কোন ঋতুতে এ নাটকের যবনিকা উঠেছিল সেটা না বললে অশোভন হবে। ঋতুরাজ বসন্ত তখন মহাসমারোহে এসে গেছেন। গর্জনগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বেজে উঠেছে শিকারীদের তুরী-ভেরী। সকলে জেনে গেছে রাজপুত্র মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। শরৎকাল না আসা পর্যন্ত এ মৃগয়া চলবে।

এই স্থানে গর্জনগ্রামের সীমান্তরেখাটা অমসৃণ। সোজা খাড়া নেমে গেছে অনেক নীচে, মাঝে মাঝে এবড়ো-খাবড়ো পাথরের চাঙড় দুর্গম করে রেখেছে জায়গাটাকে। এই উদ্ধত নিষেধের মতো বন্ধুর জটিল পর্বতের ঠিক নীচেই শ্যামল সমতল শস্যক্ষেত্র। সে সময় এখানে দুটি মাত্র পথ ছিল। যেটি রাজপথ সেটি ভৈরঙ্গী রাজ্যের রুদ্রার দিকে তির্যকভাবে নেমে এসেছিল অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ঢালু পর্বতগাত্র বেয়ে। আর দ্বিতীয় পথটি পাহাড়ের ললাটে একটি সরু ফিতার মতো দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল দুর্গম গিরিসঙ্কটের নিবিড় গহনে। ছোট ছোট পাহাড়ী ঝরনার জলকণায় আপ্লুত হয়ে তা এগিয়ে গিয়েছিল গহনতর অরণ্যে। আরও কিছুদূর গিয়ে তা এসে সেই দুর্গের পাশে হাজির হয়েছিল যা ও অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য। দুর্গের নাম শূলপাণি। বিরাট পর্বতের শিখরে নির্মিত আকাশচুম্বী শূলপাণি থেকে গর্জনগ্রামের পার্বত্য সীমান্ত এবং ভৈরঙ্গীর জন-সমাকীর্ণ সমতলভূমি স্পষ্ট দেখা যেত। নানাভাবে ব্যবহৃত হত এই দুর্গ। কখনও কারাগার, কখনও মৃগয়া-বিহার, কখনও বা আরও কিছু। অদ্ভুত মনে হত দুর্গটাকে। একক বলিষ্ঠ প্রহরী যেন আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যুগযুগান্ত ধরে। রুদ্রার অধিবাসীরা পাহাড়ের গায়ে লেবু চাষ করত। তাদের কেউ কেউ কপালের উপর হাত রেখে লেবুগাছের ফাঁকে দাঁড়িয়ে দেখত— শূলপাণির গায়ে কটা জানলা রয়েছে। মনে হত যেন আকাশের গায়েই রয়েছে জানলাগুলো।

এই দুই পথের মাঝে ঘন অরণ্য। এই অরণ্যেই তুরী-ভেরীর নিনাদ উঠছিল থেকে থেকে। অবশেষে সূর্য যখন অস্তাচলচূড়াবলম্বী তখন তুমুল একটা হর্ষ-ধ্বনি উঠল। বোঝা গেল ঈপ্সিত শিকার মারা পড়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় শিকারী একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন দল থেকে। একটা গিরিশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁরা চেয়ে দেখছিলেন নীচের দিকে। একটা ঢালু পাহাড়ের অংশ আর শস্য-শ্যামল সমতলভূমি দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁরা। সূর্যের কিরণ চোখে পড়ছিল বলে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছিলেন তাঁরা। সূর্যাস্ত হচ্ছিল, কিন্তু তেমনি মহিমময় সূর্যাস্ত

নয়। হাজার হাজার পাহাড়ী গাছের জটিল নকশা চিত্রিত হয়েছিল আকাশ-পটে, অনেক বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠছিল, শস্যক্ষেত্র থেকেও কুয়াশার মতো কি উঠছিল যেন, জলচালিত কলের দুটো পাখনা দেখা যাচ্ছিল দূরে, মনে হচ্ছিল গাধার কান যেন। আর কাছেই প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘ ক্ষতের মতো দেখা যাচ্ছিল রুদ্রার দিকে বিসর্পিত রাজপথটা, মনে হচ্ছিল সেটা যেন সূর্যের দিকেই এগিয়ে গেছে, যোগাযোগের রক্ত-ধমনী যেন।

প্রকৃতির একটি সুরে মানুষ এখনও কথা বসাতে পারেনি, গানও বাঁধতে পারেনি। 'পথের ডাক', প্রকৃতির সেই চিরন্তন সুর। এই সুর যুগ যুগ ধরে আকুল করেছে 'জিপসী'দের, বেদেদের এই সুরে মেতে আমাদের ভ্রাম্যমাণ পূর্বপুরুষরা ঘুরে বেড়িয়েছেন বনে জঙ্গলে পর্বতে মরুতে। এই সুর তখনও বাজছিল, সেই মুহূর্ত, সেই ঋতু, সেই দৃশ্য সবাই যেন সেই সুরের ঐক্যতানে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। আকাশে উড়ে চলেছিল অসংখ্য বিদেশগামী পাখির দল, লক্ষ লক্ষ ছোট বিন্দু যেন উড়ে চলেছে। আর নীচে ওই রাজপথ, মানুষের তৈরী পথ, তারও ওই এক আহ্বান—চলো, চলো, চলো।

কিন্তু যে অশ্বারোহী দুজন পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কানে এ সুর বাজছিল না। মনে হচ্ছিল তারা দুজনেই যেন চিন্তিত এবং বিরক্ত। তন্ন তন্ন করে বনের আশে-পাশে, ঝোপের ফাঁকে-ফাঁকে দৃষ্টি দিয়ে তারা খুঁজছিল যেন কাকে। খুঁজতে খুঁজতে অধীর হয়ে পড়ছিল, হতাশ হয়ে পড়ছিল। আবার খুঁজছিল। যাকে খুঁজছে তার পাত্তা নেই।

"আমি তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না কুনো"—প্রথম শিকারীটি বললে—"কোথাও না, তার ঘোড়ার ল্যাজের ডগাটুকু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আবার সে সরে পড়েছে, বনের আড়াল থেকে অন্তর্ধান করেছে আবার। ইচ্ছে করছে কুকুর নিয়ে তার পিছু পিছু ধাওয়া করি—"

"হয়তো বাড়ি ফিরে গেছে"—কুনো বললে, একটু দ্বিধাভরে।

"বাড়ি!"—ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেল প্রথম শিকারীর নাক মুখ—"বারো দিনের আগে সে বাড়ি ফিরবে না। বিয়ের তিন বছর আগে যে খেলা শুরু হয়েছিল তাই আরম্ভ হয়ে গেছে আবার। কি লজ্জা, কি কেলেঙ্কারি! রাজবংশের কুল-প্রদীপ! আমি বলব রাজবংশের অকাল কুষ্মাণ্ড একটি। রাজ্যের আত্মসম্মান, প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে সীমান্ত পার হয়ে রোজ ভৈরঙ্গীতে চলে যাচ্ছে! ছি, ছি, ছি। ওটা কি? না কিছু নয়। ও রকম রাজপুত্রের চেয়ে একটা ভালো ঘোড়া বা ভালো কুকুর ঢের বেশী নির্ভরযোগ্য। এই তো তোমার গন্ধরাজের গন্ধ!"

"আমার গন্ধরাজ কেন হতে যাবে"—অস্ফুট বিরক্ত কণ্ঠে বলল কুনো।

"তোমার যদি না হয় তাহলে কার তা-ও তো জানি না!"

"তুমি ওর জন্যে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তেও দ্বিধা কর না সেটা কে না জানে!"

"আমি! আমি ওকে ফাঁসিতে লটকে দিতে পারলে সুখী হব। আমি গর্জনগাঁওয়ের খাঁটি দেশপ্রেমিক লোক, সেনাবিভাগে আমি নাম লিখিয়েছি, দেশের জন্যে যুদ্ধ করে পদকও পেয়েছি—আমি সাহায্য করব তোমার ওই রাজপুত্রকে! আমি স্বাধীনতা চাই, আমি কপিঞ্জলের দিকে—"

"যাই বল, সবই বুঝি"—কুনো হেসে বলল—"তুমি এখন যা বললে তা যদি আর কেউ বলত তাহলে তুমি তার রক্তদর্শন করে ছাড়তে—এ আমিও জানি, তুমিও জান। লোকটা

দেখছি সত্যিই তোমাকে গুণ করেছে। গন্ধরাজের গন্ধে তুমি মোহিত"—প্রথম শিকারী প্রত্যুত্তর করেই বলে উঠল— "ওই যে, ওই যাচ্ছেন মহাপুরুষ—"

সত্যিই দেখা গেল, প্রায় এক মাইল নীচে একজন অশ্বারোহী একটি শাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে উপত্যকা বেয়ে দ্রুতবেগে অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"একটু পরেই ও ভৈরঙ্গীতে পৌঁছে যাবে"—কুনো বললে—"নাঃ, ওকে আর শোধরানো গেল না। চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে।"

"কিন্তু ও যদি অমন চমৎকার ঘোড়াটাকে জখম করে ফেলে আমি ওকে ক্ষমা করব না কিছুতে—কি রকম ছোটাচ্ছে দেখেছ!"

প্রথম শিকারী ঘোড়ার লাগাম বাগিয়ে ধরল।

তারপর তারা পাহাড় থেকে নামতে লাগল তাদের সঙ্গীদের কাছে যাবার জন্যে। সূর্য অস্ত গেল। অরণ্যে ঘনীভূত হতে লাগল সন্ধ্যাব অন্ধকার। একটা নীরব গাম্ভীর্য ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে।

।। দুই।।

কুমার গন্ধরাজ রাত্রির অন্ধকারে ধীরে ধীরে নামছিলেন ঢালু পাহাড়ী পথ বেয়ে। পাতা আর শ্যাওলায় ঢাকা সবুজ সরু পথ। দেওদার গাছে সমাচ্ছন্ন চারিদিক। মাথার উপরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশ। কিন্তু নক্ষত্রের আলো এ সূচীভেদ্য অন্ধকারকে আলোকিত করতে পারছিল না। বস্তুত পথই দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি। তাঁর ঘোড়াই তাঁকে নিজের খুশীমতো বয়ে নিয়ে চলেছিল। মোটেই খারাপ লাগছিল না তাঁর। প্রকৃতির কঠোর রূপ, পথের অনিশ্চয়তা, মাথার উপর তারা-ভরা আকাশ, বন্যবাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শ চমৎকার লাগছিল। সুরাপান করলে প্রথমটা যেমন একটা ঈষৎ উত্তেজনাময়-আনন্দ হয় সেইরকম একটা আনন্দ অনুভব করছিলেন তিনি যেন। অন্ধকারে কলধ্বনিমুখরা একটি নদীর আলাপও বেশ উপভোগ করতে করতে চলেছিলেন গন্ধরাজ। আশেপাশেই সে কলকলধ্বনি করে বয়ে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁর পরিশ্রম সার্থক হল। বন থেকে বেরুতে পারলেন তিনি। রাজপথের শক্ত মাটির উপর এসে পড়লেন। পুবদিকে ঘেঁষে চলে গেছে রাজপথ নীচের দিকে নেমে, অন্ধকার ঝোপের পাশে পাশে আবছা-ভাবে দেখা যাচ্ছে তার বিসর্পিত রূপটা। গন্ধরাজ থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে। পথ চলেছে, যোজনের পর যোজন চলেছে, আরও কত পথ এসে মিলেছে ওর সঙ্গে, সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। কখনও সমুদ্রসৈকতের পাশ দিয়ে, কখনও শহরের আলো গায়ে মেখে চলেছে চলেইছে ওই পথ দেশ থেকে দেশান্তরে। ওর উপর দিয়ে শত শত পথিক চলেছে একই উদ্দেশ্যে এবং এখন সবাই বোধহয় সমবেত হচ্ছে কোনও সরাইখানায় বা বিশ্রাম-গৃহে। নানা ছবি তাঁর মানসপটে ভিড় করে এল আর অদৃশ্য হয়ে গেল। ধমনীতে চঞ্চল হয়ে উঠল রক্তস্রোত, দুর্দম হয়ে উঠল একটা প্রবল প্রলোভন, ইচ্ছে হল ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ি

অজানার উদ্দেশ্যে। পরমুহূর্তেই আবার সে ইচ্ছে অন্তর্ধান করল। ক্ষুধা এবং ক্লান্তি এবং অভ্যস্ত জীবনের সেই দৈনন্দিন দাবি যা আমাদের সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাই আবার প্রাধান্য লাভ করল তাঁর মনে। দেহের এবং মনের এই দাবি মেটাবার আশায় চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। বাঁ দিকে, নদী এবং রাস্তার মাঝামাঝি একটা জায়গায়, দুটি আলোকিত বাতায়ন দেখতে পেলেন।

বাঁ দিকে ঘুরে সরু একটা পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে নেমে একটু পরেই হাজির হলেন এসে প্রকাণ্ড একটা গোলাবাড়ির সামনে। ঘোড়ার চাবুকের বাঁট দিয়ে দ্বারে আঘাত করতেই ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল অনেকগুলো কুকুর। তার পরেই শুভ্র-মস্তক দীর্ঘকায় একটি বৃদ্ধ কম্পিত-শিখা প্রদীপ হস্তে দেখা দিলেন দ্বারপ্রান্তে। বৃদ্ধকে দেখলেই মনে হয় এককালে তিনি শক্তিশালী তো ছিলেনই, সুপুরুষও ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর দিন ফুরিয়েছে। একটি দাঁত নেই, কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং অস্বাভাবিক।

"ক্ষমা করবেন"—রাজকুমার বললেন—"আমি একজন পথিক, পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

"আসুন' —গম্ভীর সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে আহ্বান করলেন বৃদ্ধ—"আপনি রঙ্গিলা খামারে এসে পড়েছেন। পাশেই রঙ্গিলা নদী। নদীর নামেই এই খামার। আমার নাম কীর্তিভূষণ—আপনার সেবা করবার সুযোগ পেলে আমি কৃতার্থ হব। এ জায়গাটা গর্জনগাঁওয়ের উত্তরা আর ভৈরঙ্গীর রুদ্রার ঠিক মাঝামাঝি— এদিকে দশ ক্রোশ ওদিকে দশ ক্রোশ। রাস্তা চমৎকার, কিন্তু সরাইখানা বা মদের দোকান একটিও নেই। আজ রাত্রের মতো আমারই কুঁড়ে ঘরে আতিথ্য নিতে হবে আপনাকে, সম্বর্ধনা করবার মতো আয়োজন তেমন কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তা আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন"—এই বলে বৃদ্ধ হাতজোড় করে প্রণামের ভঙ্গীতে মাথা নত করলেন—" অতিথি সৎকার করা পরমভাগ্য। আপনি আসুন—"

"বেশ। অসংখ্য ধন্যবাদ—"

গন্ধরাজও মাথা নত করে নমস্কার করলেন।

বাড়ির দিকে ফিরে বৃদ্ধ হাঁক দিলেন—"নন্দী, এই ভদ্রলোকের ঘোড়াটাকে নিয়ে গিয়ে আস্তাবলে বেঁধে দাও—"

তারপর রাজকুমারের দিকে ফিরে বললেন, "আসুন, ভিতরে আসুন।"

গন্ধরাজ যে ঘরটিতে ঢুকলেন সেটি বেশ বড় ঘর। একতলার প্রায় সবটাই জুড়ে আছে যেন ঘরখানা। মনে হল ঘরখানা আগে বোধহয় ভাগ করা ছিল। কারণ ঘরের ওদিকটায় কয়েকটা সিঁড়ি রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে একটা উঁচু বারান্দার মতো জায়গায় উঠতে হয়। তার একধারে আগুন জ্বলছে একটা প্রকাণ্ড উনুনে। তার কাছেই শাদা প্রকাণ্ড টেবিল একটা। বোধহয় খাবার টেবিল। ঘরের এ অংশটা বেশ উঁচু। কালো কাঠের উপর পিতলের কাজ করা আসবাবপত্র। শেলফে বাসনও সাজানো রয়েছে, সেকেলে ধাঁচের বাসন সব। তাছাড়া রয়েছে বন্দুক, দেওয়ালে বড় বড় হরিণের শিং, ঠাকুর দেবতার বিবর্ণ ছবি দু'একখানা। ঘটিকা-যন্ত্রও রয়েছে তাকের উপর। ঘরের কোণে পাথরের একটা বড় কলসী, তার গায়ে নল-লাগানো। গন্ধরাজের মনে হল ওতে গৃহপ্রস্তুত সুরা আছে সম্ভবত। মনে আনন্দ সঞ্চারিত হল একথা ভেবে। চমৎকার পরিবেশ, অদ্ভুত সুন্দর।

বলিষ্ঠ একটি যুবক বেরিয়ে এসে রাজকুমারের ঘোড়াটি ধরল। কীর্তি গন্ধরাজের সঙ্গে তাঁর মেয়ে উত্তমারও পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর গন্ধরাজ ঘোড়ার পিছু পিছু আস্তাবলে গিয়ে হাজির হলেন ঘোড়াটার ঠিক মতো ব্যবস্থা হচ্ছে কি না দেখবার জন্যে। আচরণটা রাজকুমারের পক্ষে অশোভন হল হয়তো, কিন্তু ঘোড়াকে তিনি এত ভালোবাসতেন যে তার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা হয়েছে কি না স্বচক্ষে না দেখলে স্বস্তি পেতেন না। আস্তাবল থেকে ফিরে এসে দেখলেন টেবিলের উপর গরম ডিম-ভাজা আর কয়েক টুকরো শূকরের মাংস তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তারপর এল মাংসের কোর্মা, তারপর পুরু সর-ভাজা। গন্ধরাজের ক্ষুধা নিবৃত্ত হল। সুরা-পাত্র নিয়ে সবাই আগুনের চারিপাশে সমবেত হলেন। পাছে কোনও অভদ্রতা হয় তাই কীর্তি এতক্ষণ কোনও প্রশ্ন করেননি। এইবার করলেন।

''ঘোড়ার পিঠে অনেকটা রাস্তা এসেছেন বোধহয়।''

''ঠিকই ধরেছেন। অনেকটা রাস্তাই এসেছি। ক্ষিধের বহর দেখেই বুঝতে পারছেন সেটা। আপনার কন্যার দেওয়া খাবার একটুও নষ্ট করিনি।''

''রুদ্রার দিক থেকেই আসছেন বোধহয়।''

''হ্যাঁ। রাস্তা হারিয়ে না ফেললে আমি পার্বতীতে গিয়ে রাত কাটাতাম। কিন্তু তা তো হল না।''

নির্বিকারভাবে মিথ্যা-ভাষণটি করলেন গন্ধরাজ।

''কোনও কাজের জন্যই নিশ্চয় পার্বতীতে যাচ্ছেন?''

''না, ঠিক কাজ নয়। কৌতূহল বলতে পারেন। গর্জনগাঁওয়ের প্রসিদ্ধ শহর পার্বতীকে দেখিনি,—গর্জনগাঁওয়ের নাম শুনেছি অনেক, দেখা হয়নি এখনও।''

''চমৎকার রাজ্য, দেখে সুখ পাবেন। সব ভালো, ওখানকার লোক, ওখানকার দেওদার-বন—সব ভালো। আমরা থাকি সীমান্তের এপারে তবু আমরা নিজেদের গর্জনগ্রামের প্রজা বলেই মনে করি। রঙ্গিলা নদীর জলে গর্জনগ্রামেরই স্বাদ গন্ধ। ওর প্রতি বিন্দুতে গর্জনগ্রামেরই মহিমা। চমৎকার জায়গা গর্জনগাঁও। গর্জনগাঁওয়ের লোকেরা যে কুড়ুল চালিয়ে কাঠ কাটে ভৈরঙ্গীর লোকেরা সে কুড়ুল তুলতেই পারবে না। আর সেখানকার দেওদার, উঃ কত যে দেওদার আছে ওই রাজ্যে, অগুনতি, অসংখ্য। পৃথিবীতে যত লোক আছে তার চেয়েও বেশী দেওদার আছে বোধহয় ওখানে। কুড়ি বছর আগে আমি জল-জঙ্গল পেরিয়ে গিয়েছিলাম একবার সেখানে, বুড়ো বয়সেই এখন ঘর আঁকড়ে পড়ে আছি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কাল গিয়েছিলাম। রাস্তা বরাবর চলে গেছে পার্বতীতে, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও ঢেউ-খেলানো। আর চারদিকে কেবল গাছ আর গাছ, খালি দেওদার, ছোট বড় মাঝারি নানারকম। আর চারদিকেই নদীর স্রোতকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে ওরা। কত কল, কত মিল। ওখানে আমাদের ছোট্ট একটুকরো বন ছিল বড় রাস্তার পাশে। বিক্রি করে দিতে হয়েছিল সেটা। কিন্তু ওইটুকু বনের বদলে একগাদা টাকা পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, একটি গাদা! মাঝে মাঝে তাই ভাবি সমস্ত গর্জনগাঁওয়ের গাছগুলোর দাম না জানি কত?''

''ওখানকার রাজকুমার গন্ধরাজের সঙ্গে পরিচয় নেই নিশ্চয়—''

''না''— নন্দী এবার জবাব দিলে—''পরিচয় করবার ইচ্ছেও নেই।''

''কেন! ওঁকে লোকে তেমন পছন্দ করে না বুঝি—''

"পছন্দ করে না বললে ঠিক বলা হবে না"—কীর্তি বললেন—"ওঁকে সবাই ঘৃণা করে।"

"বটে!"—অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিয়ে থেমে গেলেন গন্ধরাজ।

"হ্যাঁ, ঘৃণা করে"—কীর্তি একটা লম্বা পাহাড়ী চুরুট ধরিয়ে বললেন—"আর আমার মতে ঘৃণা করবার ন্যায্য কারণও আছে। ভালো কাজ করবার কত সুযোগ পেয়েছিল লোকটা। কিন্তু কি করেছে? কিচ্ছু না। শিকার করে আর বাবুর মতো সেজেগুজে বেড়ায়। সাজগোজ মেয়েদের শোভা পায়, পুরুষের পায় কি? আর শুনেছি মাঝে মাঝে অভিনয় করে। আর কিছু করে বলে তো শুনিনি।"

"ও। কিন্তু শিকার করা, সেজে-গুজে বেড়ানো বা অভিনয় করা তো নির্দোষ আমোদ। আপনাদের কি ইচ্ছে উনি যুদ্ধ করুন ক্রমাগত?"

"না, মশাই"—বৃদ্ধ বলে উঠলেন.—"আমার কথাই ধরুন। এই রঙ্গিলা খামার নিয়ে আমি পঞ্চাশ বছর আছি, পঞ্চাশ বছর ধরে এর পিছনে আমি খেটেছি। রাত-দিন খেটেছি প্রত্যহ। লাঙল দিয়েছি, বীজ ছড়িয়েছি, ফসল কেটেছি, খুব ভোরে উঠেছি, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকেছি। ফল এই হয়েছে—এই খামার এতকাল আমার পরিবারকে লালনপালন করেছে এবং আমার স্ত্রীর কথা বাদ দিলে এর চেয়ে বড় বন্ধু আমার জীবনে আর পাইনি। আমি যখন চলে যাব তখন যে খামার রেখে যাব তা আমি যা পেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক উন্নত। আমি বলতে চাই, মানুষ যদি আন্তরিকভাবে মেহনত করে—প্রকৃতির নিয়মও তাই—তাহলে কখনও তার অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না, সুখশান্তিও পায়, তার স্পর্শে ধুলোমুঠি সোনামুঠি হয়ে যায়। আমরা সামান্য চাষী, তবু আমাদের মনে হয় গন্ধরাজ যদি তাঁর রাজত্বের দিকে একটু মন দিতেন, যে সিংহাসন তিনি পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছেন সেই সিংহাসনের দায়িত্ব যদি তিনি রাজার মতন বহন করতেন, আমি যেমন জমির পিছনে খেটেছি তিনিও যদি তাঁর রাজ্যের জন্য খাটতেন, কত ভালো হত তাহলে। সবাই ধন্য ধন্য করত, রাজ্যেরও উন্নতি হত অনেক—"

"আপনি যা বললেন তা আমি মেনে নিচ্ছি"—গন্ধরাজ উত্তর দিলেন—"কিন্তু তবু আমি বলব আপনার জীবনে আর রাজার জীবনে তফাত আছে। আকাশ-পাতাল তফাত। আপনার জীবন স্বাভাবিক এবং সরল। কিন্তু রাজার জীবন কৃত্রিম এবং জটিল। আপনার জীবনে আপনি অতি সহজেই যা উচিত তা করতে পারেন। কিন্তু রাজার পক্ষে অনুচিত কাজ না করাই খুব শক্ত ব্যাপার। কোন বার আপনার ফসল যদি না হয় আপনি আকাশের দিকে চেয়ে বলবেন—ভগবান এই যদি তোমার ইচ্ছা, তবে তাই হোক। ওইখানেই ব্যাপার মিটে গেল। কিন্তু রাজার কোন চেষ্টা যদি বিফল হয়, সবাই রাজাকেই দোষ দেবে, ভগবানকে নয়। তাই আমার মনে হয় ভারতবর্ষের রাজারা যদি নির্দোষ আমোদ নিয়ে থাকেন, প্রজারা বেশী সুখে থাকবে। রাজকার্য নিয়ে বেশী মাথা ঘামালেই বিপদ—"

"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন"—নন্দী বলে উঠল সানন্দে—"ঠারেঠোরে যা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনি আমার দলের লোক। সত্যিকাব স্বদেশ-প্রেমিক আপনি, রাজা-রাজড়াদের শত্রু।"

তাঁর কথার যে এই নির্গলিতার্থ হবে তা ভাবেননি গন্ধরাজ। একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন। প্রসঙ্গান্তরে আসাই সমীচীন মনে হল।

"গন্ধরাজ সম্বন্ধে যা বললেন তা শুনে বেশ আশ্চর্য লাগছে। কিন্তু আমি তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছি তা এতটা খারাপ নয়। আমাকে একজন বলেছিলেন গন্ধরাজ লোক ভালো। কিন্তু তিনি নিজেই নিজের শত্রু। আর কারও সঙ্গে তাঁর শত্রুতা নেই।"

"ঠিক শুনেছেন আপনি"—কীর্তিব মেয়ে উত্তমা বলল—"গন্ধরাজ নাকি চমৎকার লোক। সত্যি রাজপুত্র। তাঁর জন্যে প্রাণ বিসর্জন করতে প্রস্তুত আছেন এ রকম দু'একজন লোককে জানি—"

"ও, কুনো!"—নন্দী বলে উঠল—"ও তো একটা গাড়োল—"

"হ্যাঁ, কুনো!"—কম্পিত কণ্ঠে শুরু করলেন বৃদ্ধ—"মনে হচ্ছে এ ভদ্রলোক এ অঞ্চলে আগন্তুক, গন্ধরাজের খবর জানতে চাইছেন, মনে হয় কুনোর গল্পটা ওঁর ভালোই লাগবে। দেখুন—এই কুনোকে আমরা চিনি। কুনো হল গন্ধরাজের চাকর, শিকারের সময়ে সঙ্গে থাকে। হোঁৎকা গোছের, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, মদও খায় খুব অর্থাৎ ভৈরঙ্গীদের ভাষায় গর্জনগাঁওয়ের নির্ভেজাল মাল একটি। আমাদের এখানে আসে প্রায়, শিকারী কুকুরগুলো যখন বনের ভিতর ছিটকে পড়ে এদিকে ওদিকে, তাদের খোঁজে আসে এখানে। আমরা অবশ্য যত্ন করি খুব। আমার বাড়িতে গর্জনগাঁও আর ভৈরঙ্গীর ভেদাভেদ নেই, বিশেষ করে, গর্জনগাঁওয়ের সঙ্গে ভৈরঙ্গীর যখন কোনও ঝগড়া নেই তখন আসা-যাওয়ারও কোন বাধা নেই। দু'দিকের পথ খোলা, আমার দুয়ারও খোলা—"

"হ্যাঁ"—গন্ধরাজ বললেন—"গর্জনগাঁও আর ভৈরঙ্গীর মধ্যে অনেকদিন ধরে শান্তি বিরাজ করছে—অনেক শতাব্দী ধরে—"

"শতাব্দীর কথা বলছেন?"—কীর্তি বললেন প্রত্যুত্তরে—"চিরকাল নয় কেন, সেইটেই তো দুঃখ! যাক, কুনোর কথা শুনুন। কুনো একদিন কি একটা দোষ করেছিল। গন্ধরাজ রগ-চটা লোক, চাবকাতে লাগল কুনোকে। কুনো খানিকক্ষণ সহ্য করলে, কিন্তু আর পারলে না, গন্ধরাজের হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে বললে, আসুন রাজকুমার আমরা লড়ে যাই, চাবুক দিয়ে মারা বীরত্বও নয়, মনুষ্যত্বও নয়। এ অঞ্চলে মল্লযুদ্ধ করেই সাধারণত বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। গন্ধরাজ লড়ে গেলেন কুনোর সঙ্গে। কিন্তু কুনো হল একটা বিরাটকায় পাঠ্‌ঠা পালোয়ান, তার সঙ্গে ফড়িংবাবাজী গন্ধরাজ পারবে কেন। চাকা ঘুরে গেল। যে লোকটাকে এতক্ষণ তিনি চাবকাচ্ছিলেন সেই লোকটাই তাঁকে শূন্যে তুলে দিলে একটি আছাড়। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন বাছাধন!"

নন্দী বললে—"কব্জির কাছটা ভেঙে গিয়েছিল, কেউ বলে নাকটাও। ঠিক হয়েছিল। হাতাহাতি যুদ্ধ হলেই প্রমাণ হয়ে যায় কার জোর বেশী।"

"তার পর?"—গন্ধরাজ প্রশ্ন করলেন।

"কুনো তারপর কাঁধে করে তাঁকে বাড়ি নিয়ে গেল এবং তারপর থেকেই হরিহরআত্মা বন্ধু হয়ে গেল দুজনে। গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য কি না তা জানি না"—বৃদ্ধ মুচকি হেসে বললেন—" কিন্তু মজার গল্প এটা, অদ্ভুত গল্প। মানুষকে চাবুক মারবার আগে একটু ভাবা উচিত। আমার ভাইপো নন্দী যা বললে মল্লযুদ্ধেই বোঝা যায় কার মুরোদ কতখানি—"

"এ বিষয়ে আমার অভিমত যদি শোনেন"—গন্ধরাজ হেসে বললেন—"হয়তো আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আমার মনে হয় গন্ধরাজই জয়ী হয়েছিলেন।"

"তা এক হিসাবে ঠিক"—গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন বৃদ্ধ—"ভগবানের চোখে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি একটু অন্যরকম। তারা এ নিয়ে ঠাট্টা করে হাসাহাসি করে।"

"তারা গানই বেঁধে ফেলেছে একটা"—বলে উঠল নন্দী—"কুনো পিণ্ডি চটকেছে, গন্ধরাজকে পটকেছে—"

গানটা শোনবার ইচ্ছা ছিল না গন্ধরাজের। বাধা দিয়ে বললেন—"তবে আমার মনে হয় গন্ধরাজের বয়স তো বেশী নয়, শেষপর্যন্ত শুধরে যাবে।"

"খুব কমও নয়, মশাই"—নন্দী বলল—"মেঘে মেঘে বেশ বেলা হয়েছে। শুনেছি চল্লিশের কম নয়।"

"ছত্রিশ"—সংশোধন করে দিলেন কীর্তি।

"ও বাবা"—উত্তমার স্বপ্ন-ভঙ্গ হল যেন—"তাহলে তো বেশ বয়স হয়েছে। লোকে বলে যৌবনে তিনি নাকি খুব সুশ্রী ছিলেন।"

"সুশ্রী না ছাই। মাথায় টাক ছিল"—নন্দী টিপ্পনী কাটল।

গন্ধরাজ তাঁর চুলের ভিতর আঙুল চালালেন একবার। খুব খারাপ লাগছিল তাঁর। পার্বতীর রাজপ্রাসাদে একঘেয়ে বিরক্তিকর সন্ধ্যাগুলিও যে এর তুলনায় অনেক ভালো।

"ছত্রিশ বছর এমন কিছু বয়স নয়"—গন্ধরাজ প্রতিবাদের সুরে বললেন, "ছত্রিশ বছরে লোক বুড়ো হয়ে যায় না। আমার বয়স ছত্রিশ বছর।"

"আমার মনে হচ্ছিল, আর একটু বেশী"—বৃদ্ধ কীর্তিভূষণ মন্তব্য করলেন—"ছত্রিশ বছরই যদি আপনার বয়স হয় তাহলে আপনি মৃগেন্দ্রকুমারের সমবয়সী। আর চেহারা দেখে মনে হয় কাজও করেছেন খুব, অলসের মতো বসে থাকেননি। আমাদের মতো বুড়োর তুলনায় বয়সটা অবশ্য কমই মনে হয়, কিন্তু ছত্রিশ বছরই বা কম কি, ছত্রিশ বছরে কত কি না করা যায়। যারা কুড়ে আর আড্ডাবাজ তারাই ছত্রিশ বছরে শেষ হয়ে যায়। যে লোক ভগবানে বিশ্বাস করে, ভগবানের নিয়মে চলে, ছত্রিশ বছরে তার বাড়ি ঘর নাম যশ সব হয়, স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে সুখে দিন কাটায় সে, আর তার আদর্শ তার কীর্তি অমর করে রাখে তাকে—"

"গন্ধেশ্বরের স্ত্রী আছে একটি"—হো হো করে অসভ্যের মতো হেসে উঠল নন্দী।

"এতে আপনি একটা বিশেষ আমোদ অনুভব করছেন মনে হচ্ছে."

"হ্যাঁ, কেন করছি বুঝতে পারছেন না"—অসভ্যটা উত্তর দিলে— "সারা ভারতবর্ষ তো একথা জানে। আপনি শোনেননি?" একটা মূক অশ্লীল অভিনয় করে ব্যাপারটা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করল সে।

বৃদ্ধ বললেন, "মনে হচ্ছে আপনি কাছেপিঠে কোথাও থাকেন না। থাকলে শুনতে পেতেন। ব্যাপার কি জানেন, গর্জনগাঁওয়ের রাজপরিবারের লোকেরা আর রাজসভার সভ্যরা সবাই মহা অসভ্য আর মহাপাজি। একটি ভালো লোক নেই। সবাই রাজভোগে মহাসুখে আছে, কাউকে খেটে খেতে হয় না, আর এর যা অনিবার্য পরিণাম তাই ঘটেছে। সব দুশ্চরিত্র। গর্জনগাঁওয়ের রাণীর প্রণয়ী আছে একটি—পূর্ব হিমাচলের কোন এক প্রদেশের মহাসামন্ত না কি লোকটা। গন্ধরাজ তো নপুংসক, ওই লোকটার ধামা-ধরা হয়ে আছে সে। শুধু তাই নয়—রাণীর প্রণয়ী ওই বিদেশী মহাসামন্তটি এখন গর্জনগাঁওয়ের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। গন্ধরাজকে মাসে মাসে কিছু মাসোহারা দিয়ে সেই রাজকার্য চালায়! সুতরাং রাজ্য রসাতলে

যাচ্ছে। এর ভয়ংকর ফল ফলবে। আমি যদিও বুড়ো হয়েছি, তবু মনে হয় সে ফল আমি দেখেই মরব।"

নন্দী এসব শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়ল একটু।

"কপিঞ্জলের সম্বন্ধে একটু ভুল করলে তুমি"—উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে—"বাকি সব যা বলেছ তা ঠিক। গন্ধরাজ যদি ওই শয়তানী রাণীটাকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলে—এখনও আমি ওকে ক্ষমা করতে রাজি আছি।"

"না, নন্দী। অন্যায় আচরণ করে মন্দকে শোধরানো যায় না। দেখুন মশাই"—বেচারা রাজপুত্রের দিকে ফিরে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন—"সমস্ত দোষ ওই গন্ধরাজের। সে শপথ করে তার স্ত্রীর আর রাজ্যের ভার নিয়েছিল—"

"শপথ!"—বাধা দিল নন্দী—"রাজাদের শপথে তুমি বিশ্বাস কর নাকি!"

এ কথায় কর্ণপাত না করে বৃদ্ধ গন্ধরাজকে উদ্দেশ্য করেই বলতে লাগলেন—"সে শপথ ভুলে গিয়ে সে রাণী আর রাজ্যকে সঁপে দিয়ে বসল কিনা একটা বিদেশী বোম্বেটের হাতে। বোম্বেটেটা রাণীকে ভুলিয়ে এমন স্তরে নিয়ে গেছে যে প্রত্যেক মদের ভাঁটিতে ভাঁটিতে তার নাম নিয়ে ঠাট্টা মস্করা চলছে। আর রাণীর বয়স কত জানেন? মাত্র কুড়ি। তার চেয়েও কম বোধহয়। লোকটা ক্রমাগত খাজনা বাড়িয়ে চলেছে। অস্ত্রের ঝনৎকারে সবাই সন্ত্রস্ত। যুদ্ধ বাধল বলে।"

"যুদ্ধ"—বলে উঠলেন গন্ধরাজ।

"তাই তো বলছে সবাই। যারা তাদের কাজকর্ম লক্ষ্য করে তাদের তো ওই মত। যুদ্ধই বাধবে শেষটা। সমস্ত ব্যাপারটাই দুঃখের। বড়ই দুঃখের। ওই হতভাগিনী ভ্রষ্টা রাণী সকলের অভিশাপ কুড়িয়ে নরকে যাবে সেটা দুঃখের, এমন সুন্দর রাজত্বটা সুশাসনের অভাবে ছারখার হয়ে যাবে সেটাও দুঃখের। কিন্তু যে যাই বলুক আমাব ধারণা গন্ধরাজ এঁটে উঠতে পারবে না এদের সঙ্গে। তার কৃতকর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হবেই। ভগবান ক্ষমা করুন তাকে—"

"লোকটা শপথ ভঙ্গ করেছে, সুতরাং প্রতারক। প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করেছে কিন্তু প্রজাদের প্রতিদানে কিছু দেয়নি, সুতরাং চোর। স্ত্রীকে পরপুরুষের কোলে তুলে দিয়েছে, সুতরাং আত্মসম্মানহীন বেহায়া। আর বাকী রইল কি। বুদ্ধি? জন্ম থেকেই তো ও নিরেট!"

"সুতরাং বুঝতেই পারছেন"—কীর্তিভূষণ বললেন—"কেন আমরা গন্ধরাজের উপর চটা। মানুষ তার অন্তরের ব্যক্তিগত জীবনে সৎ আর ধার্মিক হতে পারে, আবার বাইরের সামাজিক জীবনেও হতে পারে। কিন্তু কোন লোক যদি কোন দিকেই ভদ্র না হয় তাহলে ভগবান ছাড়া তাকে আর কে বাঁচাতে পারে বলুন। ওই যে কপিঞ্জল লোকটা—যার সম্বন্ধে আমাদের নন্দী এত উচ্ছ্বসিত—"

"হ্যাঁ, কপিঞ্জলই আমার আদর্শ। ওর মতো নেতা যদি ভৈরঙ্গীতেও থাকতো তাহলে আমরা বেঁচে যেতাম।"

"লোকটা কিন্তু খারাপ"—মাথা নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধ বললেন—"খুব খারাপ। ধর্মের বিধান যারা লঙ্ঘন করে তারা কখনও কোনও ভালো কাজ করতে পারে না। তবে এইটুকু বলতে পারি লোকটা উদ্যোগী আর পরিশ্রমী— সেটাও একটা বড় গুণ।"

তর্জনী আস্ফালন করে বলে উঠল নন্দী—"ওই কপিঞ্জলই গর্জনগাঁওয়ের একমাত্র আশা-

ভরসা। তোমার সেকেলে বাসী শুকনো আদর্শের সঙ্গে না মিললেও এটা বলতেই হবে ওই হচ্ছে আধুনিক নেতা। আধুনিক যুগের আলো আর প্রগতির ওই হচ্ছে প্রতীক। ও মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলে মানছি—কিন্তু ভুল কে না করে—কিন্তু জনসাধারণের মঙ্গল হোক এইটেই ওর একমাত্র লক্ষ্য। আপনি তো মশাই সংস্কারমুক্ত উদার লোক আর যতদূর বুঝতে পারছি ওই রাজরাজড়াদের শত্রু, আপনি একটা কথা শুনে রাখুন—কিছুদিন পরে দেখবেন ওই নপুংসক গন্ধরাজকে আর তার স্বৈরিণী রাণীকে প্রজারা ঘাড় ধরে রাজ্য থেকে বার করে দিয়ে কপিঞ্জলকে গণ-নায়করূপে বরণ করেছে। এ হবেই, দেখে নেবেন। ওদের বক্তৃতায় আমি একথা শুনেছি। রুদ্রাতে আমি একবার একটা সভায় গিয়েছিলাম। বিরাট সভা। পার্বতীর প্রায় পনেরো হাজার লোকের প্রতিনিধিরা সেখানে বক্তৃতা দিয়েছিল। পনেরো হাজার বাজে লোক নয়, সেনাদলের পদক-প্রাপ্ত পনেরো হাজার জোয়ান। তারা ঠিক এই কথাই বললে। কপিঞ্জলের প্রভাবটা কি রকম বুঝতেই পারছেন তাহলে—"

এসব কথায় বৃদ্ধ কীর্তিভূষণ কিন্তু তেমন প্রভাবিত হলেন না।

"আরে শেষ পর্যন্ত দেখ কি হয়। ওসব লম্বা-চওড়া কথা অনেক শুনেছি, বীরত্বের আর আধুনিকতার ফাঁকা আওয়াজ গুণ্ডামি আর লুটপাটে পরিণত হতে বেশী দেরি লাগে না। তবে একটা কথা ঠিক, এই কপিঞ্জল একটি পা রেখেছেন রাজার অন্দরমহলে আর একটি পা শ্রমিক প্রজাদের উঠোনে। নিজেকে উনি গণ-নায়ক বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। বিদেশী মহাসামন্ত এদেশের গণনেতা সেজেছেন।"

"সেজেছেন!"—প্রতিবাদ করল নন্দী—"সত্যিই উনি গণনেতা। যেদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সেইদিনই উনি ওঁর মহাসামন্ত উপাধি পরিত্যাগ করবেন। ওঁর বক্তৃতায় এ কথা শুনেছি।"

"মহাসামন্ত ভোল বদলে গণ নেতা হবেন! নীলবর্ণ মেখে শৃগাল হবেন পশুরাজ! আমি তো থাকব না, তোমরাই দেখতে পাবে এর কি ফল হয়।"

"বাবা"—উত্তমা বৃদ্ধের কানে কানে বলল—"ভদ্রলোক বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওঁর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখ—"

আতিথ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ।

"ক্ষমা করবেন। অনেকক্ষণ বকবক করেছি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। একটু মাধ্বী খাবেন? খাঁটি মধু থেকে মাধ্বী তৈরি করি আমরা—"

"না, ধন্যবাদ। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে পড়েছি খুব—" গন্ধরাজ বললেন—"শরীর আর বইছে না। এখন শুয়ে পড়তে চাই—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। উত্তমা আলোটা দাও। মুখটা শুকিয়ে গেছে আপনার। আর একটু শরবত খাবেন? না? থাক তাহলে। আসুন আমার সঙ্গে। ওই ঘরে আপনার শোওয়ার জায়গা হয়েছে। অনেক অতিথির পায়ের ধুলো পড়েছে ওঘরে। আসুন—"

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন দু'জনে।

"ভালো খাবার, একটু ভালো মদ, ভদ্র বিবেক, আর শোওয়ার আগে একটু হালকা গল্প-গুজব—এর চেয়ে ভালো ঘুমের ওষুধ আর কিছু নেই। আসুন—"

একটি ঘরের কপাট খুলে গন্ধরাজকে নিয়ে তিনি ছোট একটি শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলেন।

"এই আপনার বন্দর! ছোট, তবে খুব অসুবিধা হবে না। ঘরটায় ভালো হাওয়া খেলে। বিছানাপত্রও খুব খারাপ নয়, উত্তমার এসব ব্যাপারে খুব শখ—বিছানায় আতর ছেটায়! এঘরে জানলা দিয়ে রঙ্গিলাকে দেখতে পাবেন আর তার গান শুনবেন। একই গান বরাবর শুনিয়ে আসছে ও, কিন্তু কখনও একঘেয়ে হয় না। মানুষের গান বেশীক্ষণ শোনা যায় না, কিন্তু নদীর গান শোনা যায়। মনটাকে একেবারে আকাশের তলায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। আমরা বাড়িটাড়ি বানাই বটে, কিন্তু আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়ালেই বোঝা যায় বাজে সময় আর অর্থ নষ্ট হয়েছে। রঙ্গিলার ওই কুলুকুলু শব্দ মনে ভারি একটা আনন্দও এনে দেয়। প্রার্থনা করবার পর যে আনন্দ হয়, অনেকটা সেই রকম আনন্দ। এবার শুয়ে পড়ুন। সকালে আবার দেখা হবে!"

বৃদ্ধ মাথা নত করে অভিবাদন করলেন, তারপর নেমে গেলেন ধীরে ধীরে।

।। তিন।।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল গন্ধরাজের পাখিদের প্রথম কাকলীতে বনভূমি সবে জেগে উঠেছে, মন্দ সমীরণে চতুর্দিক স্নিগ্ধ। নবোদিত সূর্যকিরণের তির্যক আলোতে দেওদার গাছগুলোর সুদীর্ঘ ছায়া পড়েছে পাহাড়ের গায়ে। রাত্রিটা বড় কষ্টে কেটেছিল, পবিত্র প্রভাতের এ সংবর্ধনা ভারি ভালো লাগল। মনে হল সবার আগে যখন উঠেই পড়েছি তখন এই মনোরম পরিবেশে শরীর আর মনকে একটু চাঙ্গা করে নেওয়া যাক। ভিজে ঘাসের উপর পা দিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর ছায়াও অনুসরণ করতে লাগল তাঁকে।

জাফরি-ঘেরা একটা পথ নদীর দিকে চলে গেছে দেখতে পেলেন। সেই পথেই চলতে লাগলেন গন্ধরাজ। রঙ্গিলা দুর্দান্ত পাহাড়ী নদী। খামারের কাছেই একটি ছোট পাহাড়ের উপর থেকে লাফ দিয়ে নদীটি নেমেছে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে কলকল খলখল করে বয়ে চলেছে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে। তারপর কিছুদূর গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়ে সৃষ্টি করেছে একটা ছোট্ট জলাশয়। তার জল যেন ফুটছে! সেই জলাশয়ের ভিতর একটা বড় পাথরের চাঙড় দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন একটা অন্তরীপ। গন্ধরাজ কোনক্রমে সেই পাথরটার উপর উঠে পড়লেন। ভাবলেন এইখানে বসেই ব্যাপারটা একটু প্রণিধান করা যাক।

একটু দূরেই দেওদার গাছের ডালপালা আর কচি কচি পাতাগুলো একটি পরদার মতো ঝুলছিল প্রপাতের উপর। সূর্য একটু উপরে উঠতেই সেই পরদার উপর আলো পড়ল, সোনালী আর সবুজের মহিমা প্রতিফলিত হল সেই ফুটন্ত জলের উপর। মনে হতে লাগল পাথরের উপর আশ্চর্য কারুকার্য যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে হঠাৎ। সেই দুরন্ত জলধারার সঙ্গে আলো যেন খেলা করতে লাগল, জলাশয়ের ফেনিল আবর্ত মণ্ডিত হয়ে গেল উজ্জ্বল হীরক-দ্যুতিতে। গন্ধরাজ যেখানে বসেছিলেন সেখানে রোদ এসে পড়েছিল। প্রভাতের সেই মধুর আতপ্ত পরিবেশে কেমন যেন নেশার মতো লাগছিল। মনে হচ্ছিল আলো যেন সাঁতার

কাটছে, আলো যেন জলের উপর আলপনা দিচ্ছে। যে পাথরের উপর তিনি বসেছিলেন সে পাথরটাও যেন আলোর স্পর্শে রূপবান হয়ে উঠল। প্রজাপতির মতো নাচতে লাগল প্রতিফলিত আলোর অপরূপ ছবি সব। সামনের দেওদার গাছের পরদাটা দুলতে লাগল পাহাড়ী হাওয়ায়।

সমস্ত রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কেটেছে, যা শুনলেন তাতে সমস্ত মন গ্লানিতে আর ঈর্ষায় পূর্ণ—কিন্তু এই আলো-ছায়াময় কলধ্বনি-মুখর পরিবেশে এসে তাঁর প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। পা দুটো গুটিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি পাথরটার উপর। মুগ্ধ স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে সবিস্ময়ে। অজানা দেশের অনিশ্চিত রহস্যালোকে ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর মন। নদীর মতোই তরল ধারায় প্রবাহিত হতে লাগল তাঁর অস্পষ্ট চিন্তাধারা বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে,—যেন অদৃশ্য ভাগ্যের স্রোতেই ভাসিয়ে দিলেন তিনি নিজেকে ক্রীড়াচ্ছলে। ভাসতে ভাসতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমের দেশে চলে গেলেন যেন। নদীর আবর্ত আর গন্ধরাজ দুই যেন এক। দুজনকেই কোন শক্তি যেন পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, আবার দুজনকেই যেন কোন শক্তি পৃথিবীর এক কোণে বন্দী করে রেখেছে। বিশ্বতত্ত্বের বিরাট পটভূমিকায় কি মূল্য আছে তাদের? কিছুই নেই!

সম্ভবত গন্ধরাজ একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলেন—কার ডাকে চমকে জেগে উঠলেন।

"শুনুন"—গন্ধরাজ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন কীর্তিভূষণের কন্যা উত্তমা ডাকছে। একটা সলজ্জ ভয় যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তার ব্যবহারে। মনে হচ্ছে তাঁকে এ ভাবে ডেকে সে যেন শালীনতার সীমা অতিক্রম করছে এবং অতিক্রম করছে বলে ভয়ে আর লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়েছে বেচারী। সাধারণ গ্রাম্য বালিকা উত্তমা। সুস্থ, সবল, সরল, সুখী এবং সৎ। সুখ এবং স্বাস্থ্য থাকলে দেহে যে রূপ বিকশিত হয় সে রূপ তার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন তার সলজ্জ সভয় ভাব তাকে যেন আরও কমনীয় করে তুলেছে।

"নমস্কার"—পাথর থেকে উঠে তার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন গন্ধরাজ—"আমি খুব ভোরে উঠেছি। এতক্ষণ যেন একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ছিলাম।"

"মহারাজ"—সভয়ে সানুনয়ে বলল সে—"আমার বাবাকে ক্ষমা করুন। আপনি কে তা জানলে তিনি যা বলেছেন তা কখখনো বলতেন না। তা বলবার আগে নিজের জিভ কেটে ফেলতেন তিনি। আর ওই নন্দী—কি অসভ্যের মতো যা তা বলছিল কাল। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল কাল রাত্রেই। সকালে উঠেই তাই আমি আস্তাবলে চলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম যা ভেবেছি তাই, ঘোড়ার রেকাবে আপনার বজ্রাঙ্কুশ আঁকা রয়েছে। আমি জানি আপনি ওদের ক্ষমা করবেন—ওরা নিতান্তই সরল আর নিরীহ। যা শোনে, তাই বলে বেড়ায়—"

গন্ধরাজ খুশী হলেন একথা শুনে।

বললেন, "কিন্তু একটা কথা তুমি বুঝতে পারছ না। দোষ তো আমারই। নাম ধাম পরিচয় গোপন করে ওদের উসকে দিয়ে ওদের মুখ থেকে নিজের সমালোচনা শোনার কোনও মানে হয়? দোষ আমারই। কিন্তু আমার অনুরোধ, ব্যাপারটা, মানে আমার এই আত্মগোপনের ব্যাপারটা, যেন ফাঁস করে দিও না তোমরা। আমাকে ভয় নেই, আমি তোমাদের কিছু করব

না। ভৈরঙ্গীতে তোমরা তো এমনিতেই নিরাপদ, আর আমার নিজের রাজত্বে আমার কোনও ক্ষমতা নেই।"

"ওকথা বলবেন না। আমি জানি শিকারীরা আপনার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"

"ও, তাহলে আমাকে সুখী রাজপুত্র বলতে পার!"—হেসে বললেন গন্ধরাজ—"কিন্তু আমি জানি সৌজন্যবশতই তুমি আসল সত্যটা চাপা দেবার চেষ্টা করছ। সত্যটা হচ্ছে আমি নামেই রাজা, বাইরের একটা লোক-দেখানো মিথ্যা শোভা। কালই তো সব শুনলে পরিষ্কারভাবে। পাথরের উপর ছায়াটা নড়ছে দেখছ? আমি ওই ছায়া আর কপিঞ্জল পাথরটা। এ ছাড়া গন্ধরাজের আর কোন মুল্য দেয় না কেউ। তোমার বন্ধুদের আমার উপর যত রাগ কপিঞ্জলের উপর যদি তত রাগ থাকত! নন্দী তো ওর সম্বন্ধে একেবারে গদগদ দেখলুম। তোমার বাবা ততটা নন, তিনি বেশ জ্ঞানী লোক বলেই মনে হল আমার, সৎলোক তো বটেই—"

উত্তমা বলল— "সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ করবেন না মহারাজ। নন্দীও ভালো ছেলে। কাল ওরা যা বলছিল তা সব বাজে কথা। গাঁয়ের লোকেরা যখন গল্পগুজব করে তখন সত্য-মিথ্যার দিকে খেয়াল থাকে না তাদের। গল্প করবার জন্যেই গল্প করে। আপনি যদি আর একটা খামারে যান আর তাদের আড্ডায় বসেন শুনতে পাবেন তারা আমার বাবার বিরুদ্ধেই কত কথা বলছে। গাঁয়ের লোকেদের ওই স্বভাব! পরনিন্দা পরচর্চা করতে পেলে আর কিছু চায় না।"

"থাম, থাম"—গন্ধরাজ বাধা দিলেন—" আমার কথাটা শোন। গন্ধরাজের বিরুদ্ধে কাল ওঁরা যা বলছিলেন—"

"সব মিথ্যে—"

"মোটেই না। সব সত্যি। ওঁরা কাল যা বলছিলেন তা সব বর্ণে বর্ণে সত্যি। ওঁরা আমাকে যত খারাপ ভাবছেন আমি তার চেয়েও খারাপ!"

"বলেন কি"—সবিস্ময়ে বলে উঠল উত্তমা—"আপনি সত্যি ওই রকম? আপনি পুরুষ নন? আমাকে যদি কেউ ওরকম ভাবে গালাগালি দিত আমি কিছুতেই সহ্য করতাম না, কিছুতেই না। আমি মজাটি টের পাইয়ে দিতাম তাদের। আর আপনাকেও তাই করতে হবে যদি আপনি মাথা উঁচু করে বাঁচতে চান। ওসব কথা শুনে কাল আপনার লজ্জা হচ্ছিল না? রাগ হচ্ছিল না? আপনার পৌরুষ বলে কিছু নেই নাকি! বিশ্বাস করি না আমি।"

"তা আছে। পৌরুষ আছে বৈ কি।"

"বেশ, তাহলে আসুন আমার সঙ্গে। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে সেটা। আশা করি আমার উপর রাগ করছেন না?"

"তোমাকে বোঝাই কি করে!"—গন্ধরাজ বিব্রত হলেন একটু—"তুমি খুব ভালো রাঁধতে পার। কাল মাংসের যে কোর্মাটি রেঁধেছিলে তা চমৎকার, খুব তৃপ্তি করে খেয়েছি। এই সুযোগে ধন্যবাদটাও দিয়ে দিচ্ছি। তুমি ভালো রাঁধুনী, কিন্তু তুমি কি দেখনি, আনাড়ী রাঁধুনীর হাতে ভালো মসলা, ভালো মাংস দিলেও তা সুখাদ্য হয় না, অখাদ্য হয়? তার হাতে পায়েস পুড়ে যায়, সন্দেশের পাক ঠিক হয় না। তরকারিতে নুনের বদলে সে চিনি দিয়ে ফেলে, গরম মসলার বদলে হলুদ। আমার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। আমার নাগালের

মধ্যে মালমসলা বা উপকরণের অভাব নেই, কিন্তু রান্না অখাদ্য হয়েছে। আমি বার বার সুক্‌তুনিতে ঝাল আর অম্বলেতে ঘি দিয়ে ফেলেছি—"

"আমি অতশত বুঝতে চাই না। আমি জানি আপনি ভালো— "সত্যি ভালো"—বলেই একটু লজ্জা পেয়ে গেল উত্তমা।

"আমি একটা কথা যদি বলি, তুমি রাগ করবে না তো"— গন্ধরাজ মৃদু হেসে বললেন, "ভালো আমি নই, ভালো তুমি। তুমি চমৎকার—"

"আপনার সম্বন্ধে সবাই ওই কথাই বলে। মেয়েদের খোশামোদ করতে আপনি খুব পটু।"

"ভুলে যেও না, আমি প্রৌঢ় প্রবীণ লোক। কি বলছ!"

গন্ধরাজের চোখে মুখে চাপা-হাসি চিকমিক করতে লাগল।

"সত্যি কথা বলব? রাগ করবেন না তো? আপনি প্রবীণ তো ননই, আপনি একটি দুষ্টু ছেলে। রাজা হোন বা যাই হোন, আমার রান্নাঘরে যদি আপনি আমাকে বিরক্ত করতে আসতেন আমি আপনাকে খুনতির ছেঁকা দিয়ে দিতাম। ওমা, কি সব বলছি আমি! রাগ করলেন মহারাজ? কিন্তু আমি যে মনের কথা চেপে রাখতে পারি না—"

"আমিও পারি না"—গন্ধরাজ বললেন—"এই জন্যেই তো সবাই গাল দেয় আমাকে—"

মনে হতে লাগল ওরা যেন প্রণয়ী-প্রণয়িনী। একটু অবশ্য তফাত ছিল, ওরা ফিসফিস করে কথা বলছিল না। জলপ্রপাতের ঝরঝর শব্দের জন্য বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই কথা বলতে হচ্ছিল। কিন্তু পাহাড়ের উপর থেকে কেউ যদি দেখতে পেত তাহলে ওদের এই ঘনিষ্ঠতা দেখে সন্দেহ হত তার। হয়তো একটু রাগও হত। উপরের একটা ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ কে যেন চীৎকার করে উত্তমার নাম ধরে ডাকতে লাগল। উত্তমার কান দুটো লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। "নন্দী ডাকছে। আমি যাই—"

"যাও। আমার সম্বন্ধে ভয় আশা করি ভেঙে গেছে। আমি যে ভয়ংকর কিছু একটা নই তা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়।"

তারপর দু'হাত তুলে তিনি বিদায়-অভিনন্দন জানালেন তাকে অনেকটা থিয়েটারি ভঙ্গীতে। উত্তমা হরিণীর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠে গেল এবং উপরের ঝোপটায় অদৃশ্য হয়ে গেল একটু পরেই। অদৃশ্য হবার ঠিক আগেই হাসিমুখে ফিরে চাইল একবার, তারপর মাথার ছোট্ট একটা ঝাঁকানি দিয়ে ঢুকে পড়ল ঝোপে। হাসিমুখে চাইল তার কারণ আবার সে ভুলে গিয়েছিল যে তাদের অতিথি সামান্য লোক নন—গর্জনগ্রামের অধীশ্বর গন্ধরাজ।

গন্ধরাজ আবার তাঁর অন্তরীপে ফিরে গেলেন। তাঁর মেজাজের রংটা বদলে গিয়েছিল একটু। বেলা বাড়াতে জলাশয়ের উপর রোদ পড়েছিল, তার বাদামী রঙের উৎসারিত জলরাশির উপর প্রতিফলিত হয়েছিল নীল আকাশ আর দেওদার গাছের বাসন্তী মহিমা-মণ্ডিত পত্র-পল্লবের অপূর্ব কারুকার্য। মনে হচ্ছিল যেন আরব্য উপন্যাসের কোন পসারিণী গহনার পসরা মেলে ধরেছে সামনে। আবর্তের তরঙ্গে তরঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল বিচিত্র বর্ণহিল্লোল। উপত্যকার এই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে মনটা করকর করছিল গন্ধরাজের। জায়গাটা তাঁর রাজ্যের এত কাছে, অথচ রাজ্যের ভিতরে নয়, ঠিক বাইরে। তাঁর নিজের রাজ্যে এরকম হাজার হাজার সুন্দর জায়গা আছে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে তাঁর কোন মোহ নেই। কিন্তু যেহেতু

এ জায়গাটা তাঁর রাজ্যের সীমার বাইরে, যেহেতু এটা অপরের সম্পত্তি, তাই তাঁর মনে কেমন যেন একটু ঈর্ষা জাগল, কেমন যেন একটা শিল্পীসুলভ ঈর্ষা। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে এই মৃদু ঈর্ষার পীড়া ভোগ করছিলেন তিনি। কীর্তিভূষণ আসাতে একটু আরাম বোধ করলেন।

"আশা করি গরীবের কুঁড়ে ঘরে ঘুমুতে আপনার কষ্ট হয়নি কাল রাত্রে"—প্রথমেই বললেন কীর্তিভূষণ।

একথার জবাব না দিয়ে গন্ধরাজ বললেন—"আপনার এই সুন্দর স্থানটির শোভা উপভোগ করছি ভোর থেকে। আপনি এই জায়গায় থাকেন, আপনি সৌভাগ্যবান।"

"হ্যাঁ, সুন্দর বটে, কিন্তু জংলী জায়গা। তবে এখানকার জমিটমিগুলো ভালো। পশ্চিমদিকের জমিগুলো খুব উর্বরা। ওদিকে যদি যান আমার গমের ক্ষেতটা দেখবেন। গর্জনগাঁও বা ভৈরঙ্গী কোথাও আপনি রঙ্গিলা খামারের জোড়া পাবেন না। কোথাও বারো আনা ফসল ফলে, কোথাও বা চোদ্দ আনা। ষোল আনা ফলে এমন জায়গাও আছে দুএকটা। কিন্তু আমার কত ফলে জানেন? বিশ আনা! অন্য জায়গার জমি যে খারাপ তা নয়, কিন্তু সবাই জমির পিছনে খাটে না। খাটা চাই—'

"নদীতে মাছ আছে নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ, ওই যেখানটায় জল জমেছে ওটা তো মাছে ভরতি। জায়গাটা সময় কাটাবার পক্ষে চমৎকার। রঙ্গিলার কলকল শব্দ, চারদিকে সবুজ গাছপালা আর পাহাড়। আর দেখেছেন, পাথরের নুড়িগুলো যেন নানারঙের দামী পাথর! সময় কাটাবার পক্ষে খুব ভালো জায়গা। কিন্তু একটা কথা বলছি, মাপ করবেন। আপনার যা বয়স এখন বাতের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত আপনার। তিরিশ আর চল্লিশ বছরের মধ্যেই বাতের শুরু হয়। সাবধান না হলেই পেড়ে ফেলবে শেষে। এ জায়গাটা চমৎকার সন্দেহ নেই, কিন্তু বড্ড স্যাঁতসেঁতে। খালি পেটে এত সকালে এখানে বসে থাকা ঠিক নয়। যদি আপত্তি না থাকে, চলুন এবার আমার সঙ্গে—"

"না, না, আপত্তি কি। চলুন। সত্যি জায়গাটি সুন্দর। আপনার সারাজীবন কি এখানে কেটেছে?"

চলতে চলতে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"আমি এখানে জন্মেছি। আর এখানে মরতেও চাই। কিন্তু সব ইচ্ছা তো পূর্ণ হয় না। অদৃষ্টই চালক, সে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানেই যেতে হবে। সবাই বলে অদৃষ্ট না কি অন্ধ, কিন্তু আশা করি একেবারে অন্ধ নয়, আশা করি খানায় খন্দে ফেলে দেবে না আমাকে। আমার ঠাকুরদা, আমার বাবা আর আমি—আমরা এখানকার জমি চষেছি। আমার লাঙলের দাগ, তাদের লাঙলের দাগকে অনুসরণ করেছে। আমাদের বাগানের বেঞ্চিটায় তিনজনের নামই খোদাই করা আছে—কর্মভূষণ, ধর্মভূষণ আর কীর্তিভূষণ। কর্মভূষণ আর ধর্মভূষণ ওই বাগানেই দেহ রেখেছেন। বাবার একটা ছবি আমার খুব মনে আছে এখনও। রাত্রে একটা কালো টুপি পরে একটা লম্বা চুরুট ধরিয়ে তিনি চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। সেই শেষবারের মতো দেখছিলেন। হঠাৎ আমাকে বললেন—"কীর্তি চুরুটের ধোঁয়াটা দেখছিস? মানুষের জীবনও ওই ধোঁয়ার মতো!" ওই তাঁর জীবনের শেষ চুরুট খাওয়া। আমার মনে হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সেটা। সমস্ত ফেলে চলে যাওয়ায়—অদ্ভুত ব্যাপার একটা। যে গাছ

তিনি নিজের হাতে পুঁতেছিলেন, যে ছেলেকে তিনি মানুষ করেছিলেন, যে চুরুট তিনি নিজের হাতে তৈরি করে খেতেন, যেখানে তাঁর প্রথম যৌবন প্রথম প্রেম ফুলের মতো ফুটেছিল—এই সব ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাওয়া—আশ্চর্য, নয়? কিন্তু এই তো ভবিতব্য। এর পর কি আছে কে জানে। অনন্ত স্বর্গ? কে জানে সত্যি তা কোথাও আছে কি না। বিশ্বাস করতে অবশ্য ভালো লাগে, খুবই ভালো লাগে। কিন্তু অপরিচিত জায়গায়, অচেনা খাটে শুয়ে মরতে ভালো লাগে না আমার। যে পরিবেশে জীবন আরম্ভ করেছিলাম সেই পরিবেশেই তা শেষও করতে চাই—"

"করবেনই তো। করবার বাধাটা কোথায়?"

"বাধা আছে। দশ হাজার টাকা দাম উঠেছে। দু হাজার টাকা হলে মেরে কেটে আমিই কিনে ফেলতে পারতুম, না বড়াই করছি না, দু'হাজার টাকা আমি যোগাড় করতে পারতুম নিশ্চয়। কিন্তু দশ হাজার টাকা পারব না। নতুন জমিদার যিনি হবেন তিনি যদি আমাকে উচ্ছেদ করতে চান তাহলে পোঁটলাপুঁটলি গুটোতেই হবে আমাকে। গত্যন্তর নেই।"

এই সংবাদে গন্ধরাজ উল্লসিত হলেন মনে মনে। জায়গাটা তাঁর ভালো লেগেছিল, এ সংবাদ শুনে আরও ভালো লেগে গেল। যা তিনি কাল শুনলেন তা যদি সত্যি হয় তা হলে গর্জনগ্রামে তো তিনি টিকতে পারবেন না। রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে তো আর আমলই দেবে না কেউ। গণতন্ত্র স্থাপন করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে সবাই। সুতরাং তাঁকে অন্য একটা আশ্রয় খুঁজতে হবে। তাই যদি হয় তাহলে এ জায়গাটার চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথায় পাবেন তিনি? কীর্তিভূষণকে তাঁর ভালোও লেগেছিল। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মহত্ত্ব আস্ফালন করবার লোভ থাকে একটা। যে লোকটি কাল রাত্রে তাঁর অত নিন্দা করছিল তাকে তিনি যদি এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন তাহলে একটা মহৎ প্রতিশোধও নেওয়া হবে। কথাটা মনে হয়েছে বলে নিজের উপরই তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল যেন।

"দেখুন, আমি একজন ভালো খরিদ্দার যোগাড় করে দিতে পারি, সে আপনাকে উচ্ছেদ করবে না। আপনি যেমন আছেন তেমনই থাকবেন।"

"পারেন না কি! সত্যি! তাহলে তো বেঁচে যাই আর কেনা গোলাম হয়ে থাকি আপনার। সারা জীবন ঈশ্বরের উপরই বিশ্বাস করে এসেছি—শেষ জীবনে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল সবই বৃথা হল।"

"আপনি দলিলপত্র ঠিক করতে বলুন। সে দলিলে এটাও লিখিয়ে নিতে পারেন যে আপনার জীবদ্দশায় ক্রেতা আপনাকে উচ্ছেদ করতে পারবেন না।"

"কিন্তু তার পর? আপনার বন্ধু কি নন্দীর সম্বন্ধে কিছু করতে রাজি হবেন?"

"নন্দী তো এখন ছেলেমানুষ। সে আগে তার যোগ্যতা প্রমাণ করুক—"

"নন্দী আমার সঙ্গে বরাবর কাজ করেছে। সমস্ত কাজকর্ম ওর নখদর্পণে। আমি বুড়ো হয়েছি তো, আসছে বৈশাখে আটাত্তর বছরে পড়ব। আমার মৃত্যুর পর নূতন মালিকের পক্ষে আবার নূতন লোক খোঁজা কি সহজ হবে? আমার মৃত্যুর পর নন্দীই যদি এখানে থাকে তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব। যিনি নূতন মালিক হবেন তিনি যদি পুরুষানুক্রমে আমাদের এ খামারে কাজ করবার অনুমতি দেন তাহলে ক্ষতি কি।"

"নন্দীর মতি-গতি কিন্তু ভালো নয়। কেমন যেন একটু উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধত গোছের—"

"যিনি কিনবেন তিনি হয়তো—"

ঈষৎ ক্রোধের রক্তিমা ফুটে উঠল গন্ধরাজের গালে।

"আমিই কিনব—"

খুব ঝুঁকে অভিবাদন করে বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে বললেন—"সে কথা আমার ভাবা উচিত ছিল। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। এই বুড়োর মনের ভার নামিয়ে দিলেন আপনি। কাল যে আমি একজন দেবদূতকে অতিথিরূপে পেয়েছিলাম তা ভাবিনি। পৃথিবীতে যারা বড় লোক—মানে যারা পদস্থ লোক—তারা যদি আপনার মতো উদার হত তাহলে গরীবদের ঘরে ঘরে আনন্দের বান বয়ে যেত—"

"বড় লোকদের সম্বন্ধে রূঢ় হতে আমি চাই না। দুর্বলতা কার নেই?"

"তা তো ঠিকই, তা তো ঠিকই। আমার নূতন জমিদারকে কি নামে ডাকব?"

গন্ধরাজের মন পড়ল তাঁর রাজসভায় এক সপ্তাহ আগে একটি বাঙালী পর্যটক এসেছিলেন, আর যৌবনে 'অংশুমালী' নামে একটি দুষ্টপ্রকৃতির বাঙালীর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল তাঁর।

বললেন—"আমার নাম অংশুমালী। আমি একজন বাঙালী পর্যটক। আজ মঙ্গলবার, আগামী বৃহস্পতিবারে দুপরের আগেই টাকাকড়ি নিয়ে আমি প্রস্তুত থাকব। পার্বতীতে শুকতারা নামে যে সরাইটা আছে, সেইখানেই আসুন আপনি, যদি আপনার অসুবিধা না হয়—"

"না, না, কিছুমাত্র অসুবিধা নেই। আপনি যেখানে হুকুম করবেন সেইখানে যাব। বে-আইনী কাজ ছাড়া আর সব কাজ করতে আমি প্রস্তুত। আপনি বাঙালী? মস্ত জাত বাঙালী। বাঙালী পাল রাজারা পৃথিবীখ্যাত। বাঙালী পর্যটকরাও পৃথিবীর সর্বত্র গেছেন। আপনি বাঙালী! আচ্ছা, জমি সম্বন্ধে আপনার কোনও অভিজ্ঞতা আছে তো—"

"আগে ছিল কিছু-কিছু"—গন্ধরাজ হেসে উত্তর দিলেন—"কিন্তু ওই যে আপনি বললেন অদৃষ্টই চালক। এখন এখানে এসে পড়েছি, দেখি এখানে যদি কিছু সুবিধা করতে পারি। সবই ভগবানের হাত—"

"নিশ্চয়। সে কথা আর বলতে—"

চিন্তিতমুখে দুজনেই পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন। গোলাবাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তাঁরা, জাফরি দেওয়া রাস্তাটা ধরে উপরে উঠছিলেন। একটু উপরে কাদের কথাবার্তার শব্দ অস্পষ্টভাবে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। তাঁরা যতই উপরে উঠতে লাগলেন ততই স্পষ্ট হতে লাগল সেটা। একটু পরে তাঁরা উপরে উঠে পড়লেন। দেখা গেল দূরে উত্তমা আর নন্দী রয়েছে। নন্দীর চোখ লাল, মুখ কালো, সে চীৎকার করে কর্কশকণ্ঠে কি যেন বলছে নিজের প্রসারিত করতলের উপর ঘুঁষি মেরে মেরে আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে উত্তমা, তারও মুখ লাল, সে-ও অনর্গল কি সব বলে চলেছে। তার বেশবাস বিস্রস্ত, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

"কি কাণ্ড!"—কীর্তিভূষণ সেখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত মনে করে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

কিন্তু গন্ধরাজ সোজা চলে গেলেন প্রণয়ীযুগলের দিকে। ঝগড়ার কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং ঝগড়ার মূল যে তিনিই এটাও অনুমান করে নিতে বিলম্ব হয়নি তাঁর। গন্ধরাজকে দেখেই নন্দী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, একটা মৌন প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ যেন মূর্ত হয়ে উঠল তার সর্বাঙ্গে।

"ও আপনি এসে গেছেন!"—চীৎকার করে বলে উঠল সে—"আপনি ভদ্রলোক, আশা করি আপনি আমার কথার ভদ্র জবাব দেবেন একটা। ওখানে কি করছিলেন আপনারা? ঝোপের ধারে লুকিয়ে লুকিয়ে কি করা হচ্ছিল! ছি, ছি, ছি"—হঠাৎ উত্তমার দিকে ফিরে সে বলল—"কি কুক্ষণেই যে তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। তুমি এই তা যদি জানতাম—"

"শুনুন"—গন্ধরাজ বাধা দিলেন—"আমার সঙ্গে কথাটা আগে শেষ করে নিন। আপনি আমার কাছে এই মেয়েটির আচরণ সম্বন্ধে জানতে চাইছেন। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি কোন অধিকারে চাইছেন? আপনি কি ওর বাবা, না দাদা, না স্বামী?"

"ওর সঙ্গে আমার যে কি সম্পর্ক তা সবাই জানে, আপনিও হয়তো আন্দাজ করেছেন। ও আমার সঙ্গিনী, ওকে আমি ভালোবাসি আর আমার ধারণা আমাকেও সম্ভবত ভালোবাসে ও। জানি না, ব্যাপারটা এখন গোলমেলে ঠেকছে। আমি সেটা ওর সামনেই স্পষ্ট করে নিতে চাই। আমারও আত্মসম্মান বলে একটা জিনিস আছে—"

গন্ধরাজ বললেন, "তাহলে প্রেম কি সেটা আপনাকে বোঝানো দরকার। মমতাই হচ্ছে প্রেমের মাপ কাঠি। আপনার আত্মসম্মান আছে বলছেন, কিন্তু ওরও আত্মসম্মান আছে হয়তো। আমি নিজের স্বপক্ষে কিছু বলব না। তবে একটা কথা জেনে রাখুন আপনার সব আচরণও যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা যায় আপনি বেকায়দায় পড়ে যাবেন।"

"দেখুন, এসব তুলনার কোনও মানে হয় না"—নন্দী একটু উদ্ধত ভাবেই বলল—"আমি পুরুষ আর ও মেয়েমানুষ। আমাদের দুজনের ওজন এক নয়। পুরুষ চিরকালই শ্রেষ্ঠ আছে এবং থাকবে। এর অন্যথা কোনও কালে হবে না। হবে কি? দিন, এবার আমার কথার জবাব।"

"মানব-সভ্যতার সম্বন্ধে আর একটু জ্ঞান থাকলে আপনার মত বদলে যেত। ওজনের কথা বলছিলেন? একটা কথা আপনি ভাবেননি যে ভুয়ো বাটখারা দিয়ে আপনি আপনার ওজন বাড়িয়েছেন। নানারকম বাটখারা ব্যবহার করেন আপনারা। মেয়েদের জন্যে একরকম বাটখারা, পুরুষদের জন্যে আর একরকম। রাজা-রাজড়াদের জন্যে একরকম বাটখারা, গরীব-গুরবোদের জন্যে আর একরকম। গন্ধরাজ তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁর সমালোচনায় আপনি পঞ্চমুখ। কিন্তু প্রণয়ী যদি প্রণয়িনীকে অপমান করে সে সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন? আপনি ভালোবাসা কথাটা বললেন। এ মেয়েটি আপনার মতো লোকের ভালোবাসার কবল থেকে যদি মুক্তি পেতে চায় তাহলে খুব অন্যায় হবে কি সেটা? আমি একজন বিদেশী, আপনি ওর সঙ্গে বর্বরের মতো যে ব্যবহার করেছেন, আমি যদি তার শতাংশের একাংশও করতাম তাহলে আপনি আমার মাথা ফাটিয়ে দিতেন। আর ঠিক কাজই হত সেটা, প্রণয়ী হিসাবে ওর মর্যাদা রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। কিন্তু আমি বলছি আপনার কাছ থেকেই আগে বাঁচান ওকে। কারণ আপনার আচরণ ভদ্র নয়। ও মেয়েমানুষ বলেই ওকে অপমান করবার অধিকার আপনার নেই—"

"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন"—বৃদ্ধ কীর্তিভূষণ মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিলেন—"শাস্ত্রও ওই কথা বলে।"

নন্দী একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। গন্ধরাজের গম্ভীর অবিচলিত ব্যবহার তো ঘাবড়ে দিয়েইছিল তাকে, সে আরও ঘাবড়েছিল নিজের ব্যবহারের জন্য। সে যে অন্যায় করেছে এটা

বুঝতে পেরেছিল সে। বিশেষ করে মানব-সভ্যতার দোহাই দিয়ে গন্ধরাজ যা বললেন তা মর্ম স্পর্শ করেছিল তার, সে সহসা যেন উপলব্ধি করল যদিও সে নিজেকে এতদিন সভ্য বলে মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এসেছে কিন্তু মানব-সভ্যতার ধারে কাছেও যেতে পারেনি সে।

"আমি যদি অন্যায় করে থাকি স্বীকার করব সেটা"—নন্দী বলল—"তবে আমি বেদস্তুর কিছু করিনি। তবে এ কথাও আমি বলব ওই সব সেকেলে ছ্যাঁচড়ামিও আমি পছন্দ করি না। আমি যদি রূঢ় আচরণ করে থাকি, ক্ষমা চাইছি সেজন্য—"

"হয়েছে, হয়েছে, খুব হয়েছে—" বলে উঠল উত্তমা।

"কিন্তু আমি যা জানতে চাইছি তা তো তুমি বললে না। তোমরা ওখানে কি কথা বলছিলে সেইটেই আমি জিগ্যেস করছি। ও বলছে আপনার কাছে না কি ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে কথা কাউকে বলবে না। কিন্তু আমি জানতে চাই সেটা। ভদ্রতার মান অবশ্যই আমি রাখব, কিন্তু ছলচাতুরী আমি সহ্য করব না। দুজনকে যদি একসঙ্গে থাকতে হয় তাহলে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় চলবে না।"

গন্ধরাজ বললেন, "বেশ, আপনার বাবাকে জিগ্যেস করলেই বুঝতে পারবেন সব। আমি বাজে সময় নষ্ট করছিলাম না। আজ সকালবেলা উঠেই আমি ঠিক করেছি যে এই রঙ্গিলা খামার আর তার আশপাশের জমি জায়গা আমি কিনে নেব। এরকম অশোর্ভন কৌতূহলকে আমি প্রশ্রয় দিই না, আপনার খাতিরে এইটুকু বললুম শুধু—"

"ও, আপনি বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন? তাহলে অবশ্য আলাদা কথা সেটা। কিন্তু এতে গোপন করবারই বা কি আছে তা-ও বুঝতে পারছি না। তবে আপনি যদি আমাদের খামারের মালিক হন তাহলে অবশ্য আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে চাই না।"

"নিশ্চয়ই না" দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন কীর্তিভূষণ।

উত্তমা এবার রুখে উঠল। বিজয়িনীর মতো বললে—"এইবার শুনলে তো? কি বলেছিলাম আমি তোমাকে? বলেছিলাম যে তোমাদের জন্যেই আমি অনুরোধ করেছিলাম ওঁকে। এবার শুনলে তো? কি জঘন্য সন্দেহবাতিক তোমার। ছি, ছি, ছি। তোমার উচিত ওঁর কাছে আর আমার কাছে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়া।"

।। চার।।

দুপুরের একটু আগে গন্ধরাজ কৌশলে সরে পড়লেন রঙ্গিলা খামার থেকে। কীর্তিভূষণের সাড়ম্বর উচ্ছ্বাস এবং উত্তমার গোপন কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন এড়িয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি, কিন্তু নন্দীকে অত সহজে এড়াতে পারলেন না। এই চতুর ছোকরাটির মনে সম্ভবত কোনও সন্দেহ জেগেছিল। সে বললে, "চলুন আমি আপনাকে কিছুদূর এগিয়ে দিই।" গন্ধরাজ 'না' বলতে পারলেন না। তাঁর মনে হল 'না' বললে উত্তমার সম্পর্কে যে ঈর্ষা আর সন্দেহ তার মনে জেগেছে সেটা বেড়ে যাবে হয়তো। কিন্তু ওর সঙ্গটা পছন্দ করছিলেন না তিনি মোটে। নন্দী কিছুক্ষণ নীরবে তাঁর ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলল। অনেক দূর গিয়ে একটু ইতস্তত করে আত্মপ্রকাশ করল সে অবশেষে।

"আপনি কি একজন বিদ্রোহী?"

"না। বিদ্রোহী কেন হতে যাব। একথা মনে হচ্ছে কেন আপনার।"

"গোড়া থেকেই আপনার কথাবার্তা থেকে তাই মনে হচ্ছিল। ওই বুড়োর ভয়েই আপনি মুখ খোলেননি। আভাসে ইঙ্গিতে কথা বলছিলেন। ঠিকই করেছেন ঃ বুড়োরা প্রায়ই ভীতু হয়, সেকেলে ধরনধারণ নিয়মকানুনই আঁকড়ে থাকতে চায় তারা। কিন্তু আজকাল কে যে ঠিক কোন দলের তা-ও তো বোঝা কঠিন, বিদ্রোহের পথে কে যে কতটা অগ্রসর তা প্রথম প্রথম বোঝবার উপায় থাকে না। আমিও প্রথমটা ধরতে পারিনি আপনাকে, কিন্তু আপনি যখন মেয়েদের কথা আর স্বাধীন প্রেমের কথা বললেন তখনই আপনাকে চিনে ফেললাম।"

"কই না"—গন্ধরাজ বললেন—"ওসব কথা তো আমি বলিনি।"

"বলেননি! বুঝতে পেরেছি। ধরা-ছোঁওয়া দিতে চান না। কেবল বীজ ছড়িয়ে দিয়ে চলে যেতে চান। আমাদের দলপতি ওকে 'বীজ টোপ' বলেন। ঠিকই করেছেন। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত, আমি নানা দলের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মতামত ধরনধারণও জানি।" তারপর নিম্নকণ্ঠে সে বললে—"আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমিও গুপ্ত সমিতির একজন সভ্য। এই দেখুন আমার পদক।" সে সবুজ-ফিতে-দিয়ে-বাঁধা একটা দস্তার পদক বার করল। তার গলায় ঝোলানো ছিল সেটা। গন্ধরাজ দেখলেন তার একদিকে আঁকা রয়েছে একটি কোষমুক্ত কৃপাণ আর একদিকে লেখা রয়েছে—"গণ-স্বাধীনতা"।

"এখন আশা করি আর আপনার সন্দেহ নেই। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। সরাইখানায় যারা মদের ঝোঁকে রাজা-উজীর মারে, আমি তাদের দলের নই! আমি একজন খাঁটি বিদ্রোহী।"

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে সে চাইল গন্ধরাজের দিকে।

"ও তাই বুঝি"—গন্ধরাজ একটু বিস্ময়ের ভান করে বললেন—"বাঃ, বাঃ, খুব আনন্দের কথা। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। দেশের ভালো করতে হলে আগে নিজে ভালো হতে হবে। ওইটেই প্রথম এবং প্রধান কাজ। আপনি ঠিকই ধরেছেন, রাজনীতি নিয়েই আমি মাথা ঘামাই, কিন্তু আমি নেতা হতে পারিনি, কারণ আমার মেজাজ, আমার বুদ্ধি নেতা হওয়ার মতো নয়। হয়তো উপনেতা হতে পারতুম, কিন্তু তা-ও হয়েছি কিনা জানি না। কিন্তু তবু আমাদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু শাসন করতেই হয়, নিজের মন-মেজাজকে নিজের চরিত্রকে শাসন করাও কম কাজ নয়। বিশেষ করে যে লোক বিয়ে করবে ঠিক করেছে তার তো এ বিষয়ে কড়া নজর রাখা দরকার। রাজার পদই বলুন আর স্বামীর পদই বলুন—দুটোই কৃত্রিম ব্যাপার। কড়া শাসন না করলে কোন পদই বজায় রাখা যায় না। একটু ঢিলে দিলেই মুশকিল। বুঝতে পারছেন আমার কথা।"

"হ্যাঁ পারছি বই কি।"

নন্দী কিন্তু এ ধরনের উত্তর আশা করেনি। মনে মনে একটু হতাশ হয়ে পড়ল বেচারা। তারপর আবার একটু সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি যে রঙ্গিলা খামার কিনছেন, এখানে দুর্গটুর্গ করবার ইচ্ছে আছে না কি!"

"এখনও ঠিক করিনি কিছু"— হেসে ফেললেন গন্ধরাজ—"খুব বেশী উত্তেজিত হবেন না এ নিয়ে। আর এ নিয়ে কাউকে কিছু বলবেন না। এ সব চাউর হওয়া ঠিক নয়।"

"আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন"—গন্ধরাজ তাকে যে স্বর্ণমুদ্রাটি দিলেন সেটি ট্যাঁকে গুঁজে সোৎসাহে বলে উঠল সে—"তাছাড়া আপনি কিছুই তো বলেননি এখনও। আমি কেবল আন্দাজ করেছি, আর মনে হয় আমার আন্দাজ ভুল হয়নি। একটা কথা মনে রাখবেন এ অঞ্চলের জঙ্গলে পাহাড়ে ছোট বড় যত পথ আছে সব আমার নখদর্পণে। সে বিষয়ে আমি আপনাকে খুব সাহায্য করতে পারব।"

মনে মনে একটু হেসে অশ্বের গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন তিনি। নন্দীর কথাবার্তা খুব ভালো লেগেছিল তাঁর। রঙ্গিলা খামারের অন্য লোকজনদেরও মন্দ লাগেনি। ওরা এর চেয়ে খারাপ ব্যবহারও তো করতে পারত! এ অবস্থায় খারাপ ব্যবহারই তো প্রত্যাশিত ছিল। মনের আনন্দে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন, আর তাঁর মনের সুরের সঙ্গে বাসন্তী প্রকৃতি আর আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী রাস্তাও যেন সুর মেলাতে লাগল।

এঁকে বেঁকে চড়াই উতরাই পার হয়ে পার্বত্য অরণ্যভূমির ভিতর দিয়ে চওড়া রাজপথ এগিয়ে গিয়েছিল গর্জনগাঁওয়ের দিকে। পথের দুধারে দেওদারশ্রেণী নীরবে দাঁড়িয়েছিল, সবুজ শ্যাওলার সমারোহ নন্দিত করছিল দৃষ্টিকে, মাঝে মাঝে রুক্ষ পাহাড়ের বুক ভেদ করে নামছিল ঝরনাধারা। দেওদার গাছ নানা বয়সের, নানা আকারের। কেউ মহীরুহ, কেউ যেন লাবণ্যময় কিশোর, কেউ আবার আরও সরু—কিন্তু সবাই নীরবে একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল, মনে হচ্ছিল এক বিরাট সেনা-বাহিনী রাজাকে যেন নীরবে অভিবাদন জানাচ্ছে।

রাজপথ দু'পাশের শহর এবং গ্রামকে একটু দূরে রেখেই এগিয়ে চলেছিল। একটু দূরে এখানে-ওখানে, কখনও বা অনেক নীচের কোনও উপত্যকায় গন্ধরাজ দেখতে পাচ্ছিলেন ছাতের সারি, কখনও বা অনেক উপরে—হয়তো কোনও পাহাড়ের কাঁধের উপর কাঠুরেদের কাঠের তৈরী ঘরও চোখে পড়ছিল। রাজপথ আন্তর্জাতিক ব্যাপার, তার লক্ষ্য দূরের শহরের দিকে, গর্জনগাঁওয়ের ছোট ছোট গ্রাম বা নগরের জীবনধারাকে অগ্রাহ্য করে সে যেন চলেছিল দূরের দিকেই কেবল। তাই পথ খুব নির্জন। গর্জনগ্রামের সীমান্তে পৌঁছে গন্ধরাজ দেখতে পেলেন তাঁরই একটা সৈন্যদল ধুলো উড়িয়ে আসছে। গন্ধরাজকে দেখে তারা জয়ধ্বনি করল—গন্ধরাজের মনে হল একটু ক্ষীণভাবেই করল যেন। গন্ধরাজ পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন। এর পর অনেকক্ষণ একাই রইলেন তিনি। পথের দু'ধারে প্রকাণ্ড বন ছাড়া আর কেউ সঙ্গী রইল না তাঁর।

তাঁর মনের প্রসন্নভাব কিন্তু বেশীক্ষণ রইল না। পোকার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে চিন্তারাশি তাঁর মন জুড়ে বসল আর গতরাত্রে যা শুনেছিলেন তা যেন চড়-কিল-লাথির মতো আঘাত করতে লাগল তাঁকে এখন। সান্ত্বনার আশায় এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন তিনি । দেখতে পেলেন একটু দূরে একটি উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে সরু রাস্তা বেয়ে খুব সন্তর্পণে একজন অশ্বারোহী নামছেন। মরুভূমিতে ঝরনা দেখলে যে আনন্দ হয় সেইরকম আনন্দ হল গন্ধরাজের। মনে মনে একজন মানুষের কামনা করছিলেন তিনি। গন্ধরাজ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। লোকটি যখন কাছাকাছি এল তখন গন্ধরাজ বুঝতে পারলেন লোকটি তাঁর রাজ্যেরই অধিবাসী একজন। লোকটির টকটকে লাল মুখ, পুরু ঠোঁট। ঘোড়ার জিনের দু'ধারে জিনিসপত্রে ঠাসা দুটি থলি ঝুলছে আর কোমরে বাঁধা আছে একটি বড় বোতল। গন্ধরাজ

যখন তাকে ডাকলেন তখন সে উৎফুল্লকণ্ঠে সাড়া দিলে বটে, কিন্তু গন্ধরাজের মনে হল কণ্ঠস্বর একটু জড়িত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে একটু টাল খেয়ে সামলে নিলে। গন্ধরাজ বুঝলেন মদ খেয়েছে।

"আপনি পার্বতীর দিকে যাচ্ছেন নাকি"—প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"হ্যাঁ যাচ্ছি। কিন্তু জঙঘা পর্যন্ত। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলাম। চলুন।"

পাশাপাশি চলতে লাগলেন দুজনে। সাধারণ লোকের যা স্বভাব লোকটি প্রথমেই গন্ধরাজের ঘোড়াটাকে তার ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। "আরে, চমৎকার ঘোড়াটি তো আপনার— বাঃ বাঃ"—তারপর সে দৃষ্টি ফেরাল গন্ধরাজের মুখের দিকে, ফিরিয়েই চমকে উঠল সে।

"মহারাজ!"

বলেই সে অভিবাদন করল এবং তা করতে গিয়ে আবার একবার টাল সামলাল।

"আপনাকে চিনতে পারিনি মহারাজ, ক্ষমা চাইছি।"

গন্ধরাজ একটু বিরক্ত হলেন। তাঁর মনের সাম্য যেন বিচলিত হল একটু।

"আপনি যখন আমাকে চিনতে পেরেছেন তখন আমরা আর পাশাপাশি যেতে পারি না। আমি এগিয়ে যাচ্ছি, আপনি পিছু পিছু আসুন।"

তিনি এগোতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ওই অর্ধ-মত্ত লোকটা এক কাণ্ড করে বসল। একটু ঝুঁকে গন্ধরাজের ঘোড়ার লাগামটা ধরে ফেলল সে।

"শুনুন, আপনি মহারাজা হোন আর যা-ই হোন, এমন অভদ্রতা করে আপনাকে চলে যেতে দেব না। আপনি ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে যেতে চাইছিলেন, বোধহয় আমার মনের কথা বার করে নেবার মতলব ছিল, কিন্তু যে-ই ধরা পড়ে গেলেন অমনি এগিয়ে সরে পড়তে চাইছেন। আপনি মহারাজা না গুপ্তচর?"

মদের ঝোঁকে আর আহত আত্মসম্মানের ক্ষোভে আরও লাল হয়ে উঠল লোকটার চোখ-মুখ। মনে হল কথাগুলো সে যেন থুতুর মতো ছুঁড়ে দিল গন্ধরাজের মুখে।

একটু থতমত খেয়ে গেলেন গন্ধরাজ। বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। বুঝলেন তিনি ভুল করেছেন, তিনি যে 'মহারাজ' এ নিয়ে আস্ফালন করাটা অশোভন হয়েছে। তাছাড়া তাঁর ভয়ও হল একটু। লোকটা বেশ বলিষ্ঠ আর ষণ্ডা, তাছাড়া মাতাল হয়েছে।

"আমার লাগাম ছেড়ে দিন"—শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি। একটা আদেশের সুর ধ্বনিত হল তাতে । একটু অবাকও হলেন, লোকটি যখন সত্যিই লাগাম ছেড়ে দিলে।

"আপনার সঙ্গে পাশাপাশি যেতে আমার আপত্তি ছিল না, আপনি যদি বুদ্ধিমান ধীর স্থির লোক হতেন, তাহলে আপনার মুখ থেকে আমার সমালোচনা শুনলেও আমি খুশী হতাম, কিন্তু এখন আমাকে মহারাজা জেনে যে সব অসার চাটুবাক্য আপনি বলবেন তা শোনবার তেমন আগ্রহ নেই আমার।"

"আপনি কি মনে করেন আমি মিথ্যে কথা বলব?"

আরও লাল হয়ে উঠল তার মুখ।

"আমি জানি আপনি বলবেন"—এইবার আত্মস্থ হয়েছিলেন গন্ধরাজ—"এ-ও জানি আপনি গলায় যে পদকটি ঝুলিয়ে রেখেছেন তা-ও আমাকে দেখাবেন না।"

গন্ধরাজ লোকটির গলায় সবুজ ফিতেটা দেখতে পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পরিবর্তন হল। বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখটা। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে গলার ফিতেটা ঢাকবার চেষ্টা করল সে। নেশা ছুটে গেল।

"আমার কোনও পদক নেই।"

"বিশ্বাস করলাম না আপনার কথা, মাপ করবেন। আপনার পদকে কি আঁকা আছে তা-ও বলে দিতে পারি—একদিকে একটা খোলা তলোয়ার আর এক দিকে 'গণ-স্বাধীনতা'। তাই না?"

লোকটি নির্বাক হয়ে রইল।

গন্ধরাজ হেসে বললেন—"আপনি অদ্ভুত লোক দেখছি। যাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছেন তার কাছ থেকে ভদ্রতা প্রত্যাশা করছিলেন।"

"হত্যা!"—প্রতিবাদ করে উঠল লোকটা—"না, কখনও নয়। ওসব নোংরা কাজের মধ্যে আমি নেই।"

"ষড়যন্ত্র মানেই নোংরা কাজ, আইনত ওতে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। ধরা পড়লে মৃতুদণ্ড্য হবেই এতে কোনও সন্দেহ নেই। ঘাবড়াবেন না অত, কারণ আমি গোয়েন্দাবিভাগের লোক নই। কিন্তু এ ধরনের রাজনীতি করতে গেলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে দেখা উচিত। জানা উচিত এর পরিণাম কি হতে পারে—"

"মহারাজ—" কম্পিতকণ্ঠে শুরু করছিল লোকটা। কিন্তু গন্ধরাজ তাকে থামিয়ে দিলেন।

"মহারাজ? মহারাজ কথাটা তো আপনার মুখে মানাচ্ছে না। আপনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আপনার মুখে মহারাজ-টহারাজ বেমানান নয় কি? চলুন যাওয়া যাক। আপনার যখন এত ইচ্ছে চলুন পাশাপাশিই যাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে। শুনেছি আপনারা দলে বেশ ভারী, প্রায় পনের হাজার লোক আপনাদের দলে আছে কথাটা সত্যি?"

লোকটার গলায় একটা ঘড়-ঘড় শব্দ হল শুধু।

"আপনারা দলে যখন এত ভারী তখন সোজা আমার কাছে এসে আপনাদের দাবী জানালেই পারতেন। আরও স্পষ্ট করে বলছি, আমাকে আদেশ করলেই পারতেন। আপনাদের কি ধারণা আমি সিংহাসন আঁকড়ে থাকতে চাই? মোটেই না। আপনাদের দল যদি সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয় আমাকে দেখিয়ে দিন সেটা, আমি এখনই সিংহাসন ত্যাগ করছি। আপনাদের দলের লোকেরা আমার নানা দোষ দেখতে পেয়েছে, কিন্তু তাদের বলুন যে তারা এজন্য আমাকে যতটা দোষী করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী দোষী করেছি আমি নিজেকে। তারা আমাকে রাজা হিসেবে যত অনুপযুক্ত মনে করে তার চেয়ে অনেক বেশী অনুপযুক্ত মনে করি আমি নিজে। আমি জানি ভারতবর্ষের মধ্যে আমি অতি ওঁছা রাজা। এর চেয়ে খারাপ ধারণা নিশ্চয়ই নেই তাদের। সিংহাসনের ঝামেলা পোয়াবার আমার ইচ্ছে নেই। আমি নির্বিবাদী লোক। আপনারা যদি গণতন্ত্র স্থাপন করতে চান করুন, আমার কিচ্ছু আপত্তি নেই।"

"না, না, আপনি এসব কি বলছেন। আমার দ্বারা—" আবার আরম্ভ করল লোকটা।

"কি কাণ্ড! আপনি আবার আমার দিকে হয়ে গেলেন নাকি"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন গন্ধরাজ—"তাহলে শুনুন। ওসব ষড়যন্ত্র টড়যন্ত্র ছেড়ে দিন। দেখছি, আমার যেমন রাজা হওয়ার যোগ্যতা নেই আপনারও তেমনি চক্রান্ত করবার যোগ্যতা নেই!"

"একটা কথা শুনুন, সত্যি কথা এটা"—মরিয়া হয়ে বলে ফেলল লোকটা—"আপনার উপর আমাদের ততটা রাগ নেই, আমাদের রাগ আপনার রাণীর উপর।"

"না, কোনও কথা শুনতে চাই না"—গন্ধরাজ থামিয়ে দিলেন তাকে। তারপর একটু রাগতকণ্ঠে বললেন—"আমি আবার আপনাকে বলছি রাজনীতি আপনি ছেড়ে দিন। ওপথে চলবার যোগ্যতা আপনার নেই। আর এর পর যখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে তখন আপনাকে মাতাল অবস্থায় যেন না দেখি। সকালে উঠেই যে মদ খায় আমার মতো হতভাগা রাজাকেও বিচার করবার যোগ্যতা নেই তার।"

"আমি বেশী খাইনি, দু এক ঢোঁক মাত্র খেয়েছি"—লোকটার চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ—"আর যদিও বা খেতাম তাতেই বা কি! কেউ কি আমার কথা ভাবে? আমার কারখানাটা বন্ধ হয়ে আছে। এর জন্যে দোষী কে জানেন? আপনার রাণী। আর শুধু কি আমারই কারখানা বন্ধ? ঘুরে ঘুরে জিগ্যেস করুন গিয়ে। দেখবেন সব ব্যবসা বন্ধ। যারা ব্যবসা চালায় তারা সব উধাও। বাজারে টাকা নেই। দেশটার যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। কেন এমন হল! কার দোষে এই অরাজকতা? আপনাদের। আপনাদের দোষের জন্যই আমরা মারা যাচ্ছি, আমরা গরীবরা। আমাদের দুঃখ আপনারা কি বোঝেন? মদ খাই বা না খাই একটা জিনিস কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি, দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে আর কেন যাচ্ছে কার জন্যে যাচ্ছে তা-ও জানি। মাপ করবেন, মনের কথা সরল ভাবে বলে ফেললুম—এর জন্য আমাকে যদি গারদে পুরতে চান, পুরুন। আপত্তি করব না। যা সত্য তাই বলেছি, আর সত্যকেই আঁকড়ে থাকব। আমি আর মহারাজকে বিব্রত করতে চাই না, যদি অনুমতি দেন এবার আমি যাই।"

ঘোড়ার লাগামটা টেনে ধরে সে অভিবাদন করল গন্ধরাজকে, যদিও সেটা দেখতে শোভন হল না তেমন।

"আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি আপনার নাম ধাম জানতে চাইনি। আশা করি নির্বিঘ্নে আপনি আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবেন। নমস্কার।"

লোকটা দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল।

গন্ধরাজ কিন্তু মুষড়ে পড়লেন মনে মনে। হারিয়ে দিয়ে গেল তাঁকে লোকটা, অপ্রস্তুত করে দিয়ে গেল। প্রথমে তাঁর ভদ্রতার খুঁত ধরল, শেষে তাঁকে তর্কেও হারিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। লোকটার প্রতি ঘৃণা হল খুব, রাগও হল। কিন্তু সত্যকে তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। হ্যাঁ, হেরে গেছেন তিনি! সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল, একটু আগে যে সব তিক্ত চিন্তা মনে জাগছিল, আবার তারা যেন ভিড় করে আসতে লাগল। অপরাহ্ণে একটা চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছে ঠিক করলেন রোহিণীর দিকে যাবেন। সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। পথ চলতে আর ভালো লাগছিল না তাঁর।

রোহিণীর এক পান্থশালায় ঢুকেই তিনি দেখতে পেলেন একটি যুবক আহারে ব্যাপৃত রয়েছেন যদিও, কিন্তু তাঁর সামনে একটি বই খোলা রয়েছে। খেতে খেতে পড়ছেন তিনি। যুবকটির চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি দেখে ভালো লাগল তাঁর। যুবকটির পাশেই তাঁকে খেতে দেওয়া হল। তিনি আলাপ করবার জন্যেই প্রশ্ন করলেন, "কি বই পড়ছেন অত মন দিয়ে?"

"এটা? পার্বতীর রাজপাঠাগারের অধ্যক্ষ এবং গর্জনগাঁওয়ের মহারাজা গন্ধরাজের খুল্লতাত পুত্র ইন্দীবর ভারতীর লেখা বই এটা। এটাই তাঁর শেষ বই। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি বিরাট পণ্ডিত, কিন্তু নীরস নন। রসের নানা পরিচয় আছে তাঁর রচনায়।"

"ইন্দীবর ভারতীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে"—ভদ্রভাবে বললেন গন্ধরাজ—"কিন্তু তাঁর কোন বই আমি পড়িনি।"

"ও। তাহলে তো আপনি মহাসৌভাগ্যবান। তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন এটা একটা সৌভাগ্য। পরোক্ষে আর একটা সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে যখন তাঁর বইগুলো পড়বেন—"

"ইন্দীবর ভারতীকে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যে সবাই খুব খাতির করেন নয়?"

"বুদ্ধির আর বিদ্যার শক্তি যে কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইন্দীবর ভারতী। তাঁর খুড়তুতো ভাই গন্ধরাজ যদিও মহারাজা কিন্তু আমরা যুবকরা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। কিন্তু ইন্দীবর ভারতীকে কে না চেনে? বিদ্বানকে বুদ্ধিমানকে সবাই শ্রদ্ধা করে।"

গন্ধরাজ সসম্ভ্রমে বললেন—"মনে হচ্ছে কোন ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হল আমার। ছাত্র, না কোন গ্রন্থকার?"

যুবক একটু লজ্জিত হলেন।

"আমি ছাত্র, গ্রন্থকার দুইই। আমার নাম কুণাল। রাজনীতি সম্বন্ধে কয়েকখানা বই লিখেছি।"

"বটে! বাঃ আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব আনন্দ হল। আপনার কাছে একটা কথা জেনেও নি তাহলে। শুনেছি গর্জনগাঁওয়ে না কি বিদ্রোহের আগুন ধোঁয়াচ্ছে? আপনি তো এসব বিষয়ে পণ্ডিত, বলুন তো এতে কি ভালো হবে শেষ পর্যন্ত?"

যুবকটি ঈষৎ অধীরভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে বসলেন।

"দেখছি, আমার ছোটখাটো বইগুলো আপনি পড়েননি। আমি শক্তিশালী শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী। যাঁরা নানারকম উদ্ভট আজগুবী কল্পনা করে আত্মপ্রবঞ্চনা করেন এবং মূর্খ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেন, আমি তাঁদের দলে নই। ওসব উদ্ভট কল্পনার দিন চলে গেছে কিংবা যাচ্ছে—"

"কিন্তু আমি চারিদিকে যখন চেয়ে দেখি—"

"তখন আপনি দেখেন কেবল মূর্খ জনসাধারণকে"—বাধা দিয়ে বললেন যুবকটি—"কিন্তু যে মন্দিরে সব রকম মতবাদ জ্ঞানের আলো দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় সেখান থেকে ওসব উদ্ভট মিথ্যা কল্পনা বহু আগেই নাকোচ হয়ে গেছে। আমরা প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মের দিকেই ফিরে যাচ্ছি এবং চিকিৎসকরা যেমন বলেন, আশা করছি প্রাকৃতিক নিয়মেই সমাজের ব্যাধি আস্তে আস্তে সেরে যাবে। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার এই গর্জনগাঁওয়ের যা অবস্থা আর আপনাদের ওই গন্ধরাজের যা মতিগতি তা আমরা মোটেই সমর্থন করি না। ওরা যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারছে না, অনেক পেছিয়ে পড়েছে। কিন্তু বর্বরের মতো বিদ্রোহ করে সব উলটেপালটে দিলেই এর প্রতিকার হবে তা-ও আমি মনে করি না। আমার মতে স্বাভাবিক ভাবে, মানে, প্রকৃতির রাজ্যে যেমন সর্বদা হচ্ছে—একটি ভালো রাজা এসে যদি সিংহাসনে বসেন তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভালো মানে, শক্তিমান, সুদক্ষ। আপনি

হয়তো বলবেন ভালো রাজা মানে কি''—হেসে বলতে লাগলেন যুবকটি—''আমরা যারা গ্রন্থ-কীটের মতো ঘরের কোণে বসে বই পড়েছি, আমরা এ কাজের উপযুক্ত নই। আমরা নানারকম পরস্পরবিরোধী মতামত পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে বসে আছি। আমার মনে হয় না কোন বিরাট পণ্ডিত যদি সিংহাসনে বসেন তিনি রাজ্য চালাতে পারবেন। যদিও এটা আমি স্বীকার করি রাজাকে পরামর্শ দেবার জন্যে সিংহাসনের কাছাকাছি কোনও বিদ্বান লোক থাকলে ভালো হয়। আমি কি রকম রাজা চাই জানেন? লোকটি খুব নয়, কিন্তু মোটামুটি বুদ্ধিমান হবে, খুব গভীর বা গম্ভীর হবার দরকার নেই, কিন্তু সজীব প্রাণবন্ত হওয়া চাই। আচরণ ভদ্র হবে, তোমণ করবার এবং শাসন করবার দুরকম ক্ষমতাই তার থাকবে। অর্থাৎ বেশ সমঝদার, চৌকশ, দিলদরিয়া হওয়া চাই লোকটি। আপনাকে আমি গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছি। আমি যদি গর্জনগাঁওয়ের প্রজা হতাম তাহলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম তিনি যেন আপনার মতো একজন লোককে এখানকার সিংহাসনে বসান।''

''বলেন কি মশাই!''—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন গন্ধরাজ।

হো হো করে হেসে উঠলেন যুবকটি।

''আমি জানি আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। এও জানি এখানকার জনসাধারণ আপনার মতো লোককে পছন্দ করবে না।''

''নিশ্চয়ই করবে না।''

''আজ না করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে করবে, করতে হবে। জনসাধারণের মতিগতিও ভালো হচ্ছে ক্রমশ।''

''মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।''

''বিনয় অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য''—যুবক মৃদু হেসে বললেন— ''কিন্তু আমি বলছি আপনার মতো রাজার পাশে যদি ইন্দীবর ভারতীর মতো মন্ত্রী থাকেন তাহলে আমি অন্তত খুশী থাকব। আমার মতে ওই হবে আদর্শ যোগাযোগ।''

এইভাবে অনেকক্ষণ গল্প হল, অনেকটা সময় আনন্দে কেটে গেল। যুবকটি কিন্তু বেশীক্ষণ পান্থশালায় থাকতে পারলেন না, বললেন রোহিণী গ্রামে একজনের বাড়িতে শোবেন তিনি। রাত্রে আর কোথাও যাবেন না। একটানা ঘোড়ার পিঠে থাকতে তাঁর ভালো লাগে না। রাস্তায় বিশ্রাম করে করেই চলা তাঁর অভ্যাস। যুবকটি চলে যাওয়ার পর একলা পড়ে গেলেন গন্ধরাজ। এদিকে ওদিকে চেয়ে সঙ্গী খুঁজতে লাগলেন। একটু দূরে দেখতে পেলেন তাঁরই রাজ্যের একদল কাঠের ব্যবসায়ী একজায়গায় বসে গুলতানি করছে কয়েক বোতল মদকে কেন্দ্র করে। তাদেরই সঙ্গে গিয়ে ভাব করলেন গন্ধরাজ এবং অবশেষে তাদের দলেই ভিড়ে গেলেন।

তাঁরা যখন ঘোড়ার পিঠে চড়লেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বারুণীর প্রভাবে ব্যবসায়ীরা ঈষৎ বেসামাল হয়েছিলেন। হাসাহাসি ঠাট্টামস্করা বেশ জোরে জোরেই চলছিল। নিজেদের ঘোড়া নিয়ে হুড়োহুড়ি করেও যেন একটু বিশেষ আমোদ পাচ্ছিলেন তাঁরা। সমবেতকণ্ঠে গানও গাইছিলেন মাঝে মাঝে গন্ধরাজের কথা সব সময়ে মনে থাকছিল না তাঁদের। তাই গন্ধরাজ মাঝে মাঝে। একা হয়ে পড়ছিলেন, আবার মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গও পাচ্ছিলেন। ওদের হাসি ঠাট্টা বাজে বকবক গল্প শুনছিলেন মাঝে মাঝে, আবার মাঝে মাঝে

অন্যমনস্ক হয়ে দুপাশের আরণ্য পরিবেশে মগ্ন করে দিচ্ছিলেন নিজেকে। নক্ষত্রের আলোকে ঈষৎ-স্বচ্ছ অন্ধকার, বনের রহস্যময় মর্মর, খপ্ খপ্ খপ্ খপ্ অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত বেখাপ্পা সঙ্গীত, সমস্ত মিলে এক বিচিত্র রসে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল তাঁর মনকে। পার্বতীর প্রান্তে যে সুদীর্ঘ পর্বতটি আছে তার চূড়ায় যখন তাঁরা উঠলেন তখনও তাঁর মনের সুর কাটেনি।

অনেক নীচে অরণ্য-কুন্তলা পার্বতীকে দেখা যাচ্ছিল। বনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল তার আলো, দেখা যাচ্ছিল তার আলোকিত পথঘাট। মনে হচ্ছিল একটা ছবি যেন। ডান দিকে আলোক-মণ্ডিত রাজপ্রাসাদ দাঁড়িয়েছিল একক মহিমায়।

গর্জনগাঁওয়ের অধিবাসী হলেও একজন ব্যবসায়ীও গন্ধরাজকে চিনতেন না। রাজপ্রাসাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তিনি বললেন, "এতক্ষণ আমরা রোহিণী পান্থশালায় ছিলাম, এইবার ওই দেখুন স্বৈরিণী পান্থশালা।"

আর একজন হো হো করে হেসে উঠে বললেন—"আরে ওর ওই নামকরণ করেছ না কি তুমি!"

"হ্যাঁ ভদ্রভাষায় ওই নাম দিয়েছি। আসলে তো ওটা একটা বেশ্যার আড্ডা" বলেই তিনি গান ধরে দিলেন একটা। মনে হল গানটা সকলেই জানে, কারণ সকলেই গেয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। গর্জনগাঁওয়ের রাণী, মহামান্যা সুরূপিণী, হায় হায় হায়, সুধাভাণ্ড উজাড়িয়া কপিঞ্জল পিপাসা মিটায়। হায় হায় হায়, রাণী বড় রসবতী, আহা রাণী বড় রসবতী—হায় হায় হায়।" এই হল গানের গোড়ার দিকটা। লজ্জায় গন্ধরাজের মাথা কাটা গেল যেন। কানের ডগা দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে, স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ঘোড়ার উপর। প্রমত্ত বণিকের দল গান গাইতে গাইতে নীচে নামতে লাগল। গন্ধরাজ তাদের সঙ্গে গেলেন না।

গানের সুরটা প্রপাতের মতো নামতে লাগল। গানের কথাগুলো যখন অস্পষ্ট হয়ে এল তখনও সুরটার দোলা যেন বার বার দুলে দুলে অপমান করে যেতে লাগল গন্ধরাজকে। তিনি আর সেখানে থাকতে পারলেন না। কাছেই পাহাড়ের গা বেয়ে একটা সরু পথ নেমে গিয়েছিল রাজপ্রাসাদের দিকে এঁকে বেঁকে ঘন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। সেটা বেয়ে গন্ধরাজ রাজপ্রাসাদের সামনের উদ্যানে এসে হাজির হলেন। বিকেল বেলা এখানটা বেশ জমজমাট থাকে। রাজসভার লোকেরা, স্বদেশী বিদেশী নাগরিকেরা এখানে সমবেত হয়ে মহারাজাকে অভিবাদন জানান। কিন্তু এখন এত রাত্রে এখানে কেউ নেই, আছে কেবল গাছের শাখায় শাখায় ঘুমন্ত পাখিরা। খরগোশদের খশ খশ শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। পাথরের মূর্তিগুলো এখানে ওখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই একই ভঙ্গীতে। উদ্যানের দুই একটা মন্দিরে প্রতিহত হয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ অদ্ভুত শোনাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই তিনি নিজের বাগানের সীমায় এসে পৌঁছলেন। এখানে একটা পুলের কাছে ছোট ছোট কয়েকটা আস্তাবল আছে বাগানের দিকে মুখ করে। শুনতে পেলেন প্রহরী ঘণ্টা বাজাচ্ছে দূরে দুর্গশিখরে, সে ঘণ্টার শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দূর থেকে দূরান্তরে। আস্তাবলে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ। গন্ধরাজ ঘোড়া থেকে নামলেন। অনেকদিন আগেকার একটা স্মৃতি জেগে উঠল মনে। চোর সহিসগুলো ঘোড়ার দানা কি

ভাবে সরিয়ে সস্তায় পাচার করে এটা অনেকদিন আগে দেখেছিলেন তিনি লুকিয়ে। হঠাৎ সেটা মনে পড়ে গেল। পুল পার হয়ে তিনি একটা জানলায় একটা বিশেষ ধরনে ছ'সাত বার আঘাত করলেন ঠুক ঠুক করে। জানলা ফাঁক হয়ে গেল, মানুষের মুণ্ড বেরিয়ে এল একটি।

"আজ মাল নেই।"

"একটা আলো আন।"

"এ কি কাণ্ড"—বলে উঠল সহিসটা—"কে তুমি?"

"আমি, আমি গন্ধরাজ। আলো আন একটা। ঘোড়াটাকে ভিতরে নিয়ে যাও আর বাগানে ঢোকবার কপাটটা খুলে দাও।"

লোকটা নির্বাক হয়ে রইল ক্ষণকাল।

"মহারাজ!"—সবিস্ময়ে বলে উঠল তারপর—"আপনি ওভাবে জানলায় শব্দ করলেন কেন বুঝতে পারছি না।"

"পার্বতীতে একটা কুসংস্কার আছে যে ওই রকম শব্দ করলে ঘোড়ার দানা সস্তা হয়ে যায়।"

ঢোঁক গিলে মুণ্ডটা টেনে নিলে সহিস্। যখন আলো নিয়ে ফিরে এল তখন সে বিবর্ণ, হাত কাঁপছে। কোনরকমে সে ঘোড়ার লাগামটা ধরে ভিতরে নিয়ে এল তাকে।

"মহারাজ"—হঠাৎ সে বলে ফেলল—"ঈশ্বরের দোহাই—" এ পর্যন্ত বলে আর কথা সরল না তার মুখে।

"ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে কি বলছ! ভয়ের কি আছে। ঘোড়ার দানা যদি ঈশ্বরের কৃপায় সস্তা হয়ে যায় ভালই তো হবে।"

বাগানের ভিতর ঢুকে পড়লেন গন্ধরাজ। সহিস প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইল।

ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমেছে বাগানের দিকে। বাগানের মাঝখানে যে মীন-দীঘিটা আছে সেই দীঘির পাড়ে এসে থেমেছে সিঁড়িগুলো। দীঘির ওপার থেকে আবার শুরু হয়েছে সিঁড়ি, সে সিঁড়ি পৌঁছেছে প্রাসাদ পর্যন্ত পিছন দিক দিয়ে। প্রাসাদের উঁচু-নীচু ছাদ, ত্রিকোণ প্রাচীর অন্ধকারে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল। প্রাসাদের বড় বড় স্তম্ভ, নাটমঞ্চ, পাঠাগার, প্রমোদগৃহ, গন্ধরাজের শয়নকক্ষ, বিরামকক্ষ প্রভৃতি রাজকীয় কক্ষের সারি পিছন থেকে কিছুই দেখা যায় না। সেগুলোর মুখ সব নগরের দিকে। পিছন দিকটা সেকেলে গোছের, এখানে জাঁকজমক বিশেষ কিছু নেই। বেশ অন্ধকারও। কয়েকটা পিছনের জানলা থেকে আলো এসে পড়েছে কেবল সিঁড়ির উপর। বিরাট চতুষ্কোণ তোরণদুর্গটি ক্রমশ সরু হয়ে উপরের দিকে উঠেছে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো। তার উপর পতাকাটি যেন ঝুলে আছে, উড়ছে না।

রাত্রির নক্ষত্রালোকিত অন্ধকারে পিছনের এই বাগানটি আমোদিত হয়ে উঠেছিল জুঁই চামেলী আর হাস্নুহানার গন্ধে। অন্ধকারের রহস্যময় আবরণের তলায় যেন গোপন চঞ্চলতার সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতপদে নামছিলেন গন্ধরাজ, তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের চিন্তাগুলোই যেন তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু হায়, এ চিন্তা থেকে তাঁকে রক্ষা করবে এমন আশ্রয় কি কোথাও আছে পৃথিবীতে? কিছুদূর নেমে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। প্রমোদগৃহ থেকে গানের সুর ভেসে আসছে, রাজসভার সভাসদরা নাচগানে মত্ত হয়ে আছেন ওখানে। ছাড়া ছাড়া ভাবে গানের টুকরো ভেসে আসছে। হঠাৎ এ

গানকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আর একটা গান, সেই মত্ত ব্যবসায়ীর দল একটু আগে যে গান গাইতে গাইতে পাহাড় থেকে নামছিল—রাণী বড় রসবতী, আহা, রাণী বড় রসবতী, হায় হায়, হায়—গানের এই ধুয়োটা আবার যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি। সমস্ত মন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। এতদিন পবে তিনি বাড়ি ফিরছেন। রাণী নাচ-গানে মাতোয়ারা, তিনি একটা সামান্য সহিসকে ধাপ্পা দিয়ে চোরের মতো বাড়ি ঢুকলেন। চারিদিকে ঢিঢি পড়ে গেছে, প্রজারা হাসাহাসি করছে সবাই। তিনি সত্যিই কি মহারাজা? সত্যিই কি স্বামী? গন্ধরাজ কি হয়েছ তুমি! দ্রুতপদে নামতে লাগলেন তিনি আবার।

কিছুদূর নেমেই অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ পেলেন একজন প্রহরীর। কিছুদূর গিয়ে আর একজন প্রহরী গতিরোধ করল তাঁর। মীন-দীঘির উপর সাঁকোটা যখন পার হচ্ছিলেন তখন একজন পদস্থ সামরিক কর্মচারী আবার দাঁড় করালেন তাঁকে। মনে হল তিনি যেন এ দিকটায় বিশেষ পাহারায় নিযুক্ত হয়ে আছেন। পাহাবার এমন বাড়াবাড়ি দেখে একটু অবাক হলেন গন্ধরাজ। কিন্তু কোনও প্রশ্ন জাগল না মনে। তাঁর মনে কোন কৌতূহল আর ছিল না যদিও বার বার বাধা পাওয়াতে বিরক্ত হচ্ছিলেন খুব। প্রাসাদের পশ্চাৎভাগে যে রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল, সে তাঁকে সিংহদরজা খুলে দিল এবং তাঁর বিস্রস্ত বেশবাস দেখে চমকে উঠল একটু। সেখান থেকে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তিনি প্রাসাদের দিকে এবং গুপ্ত সিঁড়ি দিয়ে গোপনে হাজির হলেন এসে নিজের শয়নকক্ষে। কেউ দেখতে পেল না। গিয়েই তিনি গায়ের পোশাক পরিচ্ছদ টেনে খুলে ফেলে অন্ধকারে শুয়ে পড়লেন নিজের বিছানায়। প্রমোদগৃহে নাচ-গান বাজনা তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে, কিন্তু সব ছাপিয়ে গন্ধরাজের কানে বাজতে লাগল সেই অর্ধমত্ত ব্যবসায়ীদের গানের সুর—অশ্বক্ষুরের বেসুরো বাজনার সঙ্গে সেই গান—রাণী বড় রসবতী—হায় হায় হায়।

।। পাঁচ ।।

খুব ভোরে ইন্দীবর ভারতী রাজপাঠাগারের পাঠকক্ষে এসে নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। পাশেই ছিল এক পাত্র মাধ্বী সুরা, আর আশেপাশে দেখা যাচ্ছিল সারি সারি আবক্ষ কয়েকটি মর্মরমূর্তি আর বহুবর্ণবিচিত্র পুস্তকের সংগ্রহগুলি। তিনি আগের দিন যা লিখেছিলেন তাই সংশোধন করছিলেন বসে বসে। ইন্দীবর ভারতীর বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডলেও ক্লান্তির ছাপ এসেছে একটা, চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিও তত উজ্জ্বল নেই আর। খুব সকাল সকাল শুয়ে খুব ভোরে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করাই তাঁর বহুকালের অভ্যাস আর নেশা মাত্র দুটি। বিদ্যাচর্চা আর মাধ্বী সুরা। তাঁর সঙ্গে গন্ধরাজের একটা প্রাচীন বন্ধুত্ব আছে, আত্মীয়তাও আছে। কিন্তু সেটাকে সুপ্ত বা অদৃশ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁদের দেখা হয় ক্বচিৎ। কিন্তু যখনই হয় তখনই যেন পুরাতন সুরটি আবার বেজে ওঠে। বাণীমন্দিরের নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী পুরোহিত ইন্দীবর তাঁর খুল্লতাত-পুত্র গন্ধরাজের উপর ঈষৎ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন (অবশ্য মাত্র একবেলার জন্য) যখন গন্ধরাজ সুরূপিণী দেবীকে বিয়ে করে আনেন। তিনি রাজা হয়েছেন বলে তাঁর কোন ঈর্ষা হয়নি। সিংহাসনের উপর লোভ ছিল না তাঁর।

গর্জনগাঁওয়ের লোকদের বই পড়ার আগ্রহ বিশেষ নেই। পাঠাগারে কেউ আসত না। সুতরাং এই বৃহৎ, আলোকিত, মর্মরমূর্তি-শোভিত, সুন্দর পুস্তক সংগ্রহশালাটি ইন্দীবর ভারতী একাই ভোগ করতেন। মাঝে মাঝে কেউ কখনও ক্বচিৎ গবেষণার জন্য ইন্দীবরের শিষ্য হতেন এসে।

সেদিন সকালে কিন্তু তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠে বাধা ঘটল। অপ্রত্যাশিত ভাবে দ্বার খুলে গেল। গন্ধরাজ প্রবেশ করলেন। ইন্দীবর চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। পাঠাগারের বড় বড় বাতায়নের পাশ দিয়ে আসছিলেন গন্ধরাজ, প্রভাতরৌদ্র যেন আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা করছিল তাঁকে। তাঁর চালচলন প্রসাধন-পরিচ্ছদেও যে আভিজাত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তা দেখে মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল ইন্দীবরের, কিন্তু তিনি যেন চটে গেলেন মনে মনে।

'ইন্দীবর কেমন আছ''—একটা আসনে বসে পড়লেন গন্ধরাজ—''অনেকদিন দেখা হয়নি—''

''আরে তুমি! খুব সকালে উঠেছ দেখছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল না কি. না অভ্যাস বদলাচ্ছ।''

''হ্যাঁ, এবার বদলাবার সময় এসেছে বৈ কি।''

''ও! কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না''— হেসে বললেন ইন্দীবর—''আমি নাস্তিক-প্রকৃতির লোক, নীতি-শাস্ত্রে আস্থা নেই। যখন যৌবন ছিল তখন আদর্শ-টাদর্শ নিয়ে অনেক মাতামাতি করেছি। এখন বুঝেছি ওসব আলেয়া, আশার ইন্দ্রধনুতে রঙের খেলা মাত্র।''

''তুমিই জান''—গন্ধরাজ বললেন—''আমি জনপ্রিয় রাজা নই'' বলেই তিনি এমনভাবে চাইলেন ইন্দীবরের দিকে যেন তিনি ইন্দীবরের কাছ থেকে এর সমর্থন বা প্রতিবাদ প্রত্যাশা করছেন।

''জনপ্রিয়? কিন্তু জনপ্রিয়তার রকমফের আছে।''

ইন্দীবর তাঁর আসনটিতে ভালো করে হেলান দিয়ে বসলেন, তারপর দু'হাতের আঙুলের ডগাগুলিকে হালকাভাবে পরস্পরের সঙ্গে ঠেকিয়ে সহাস্য দৃষ্টি চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন—''জনপ্রিয়তা অনেক রকমের আছে। বই-পড়া পাণ্ডিত্যের জনপ্রিয়তা আছে একরকম, বই পড়ে যে কোনও লোক পণ্ডিত হতে পারে। ওতে ব্যক্তিত্বের বিশেষ কোন প্রকাশ নেই, আর অনেক সময় তা দুঃস্বপ্নের মতো অলীক। আর একরকম জনপ্রিয়তা আছে রাজনৈতিক নেতাদের, সেটা কিন্তু গোলমেলে গোছের। আর একরকম জনপ্রিয়তা, যা নিতান্ত ব্যক্তিগত, তা হচ্ছে তোমার। মেয়েমানুষ তোমাকে দেখলেই প্রেমে পড়ে, চাকরবাকররা তোমাকে তুষ্ট করবার জন্যে পাগল। ভালো কুকুরকে দেখলেই তাকে আদর করে তার পিঠ চাপড়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা যেমন স্বাভাবিক তোমাকে দেখলেই ভালো-লাগাটা তেমনি স্বাভাবিক। তুমি গর্জনগাঁওয়ের কোনও কাঠুরে বা কাঠের ব্যবসায়ী হলে নিঃসন্দেহে তুমি সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় নাগরিক হতে। কিন্তু রাজা হিসাবে তুমি অচল, একদম বেমানান। আর সেটা স্বীকার করাই হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ, যা তুমি করেওছো—''

''হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ?''—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

''হ্যাঁ, হয়তো। আমি জোর করে কিছু বলতে চাই না।''

''হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু ধর্মসঙ্গত কি?''

"বীরধর্মসঙ্গত নয় অন্তত।"

গন্ধরাজ তাঁর আসনটি আরও কাছে টেনে এনে টেবিলের উপর দুই কনুই দিয়ে ইন্দীবরের মুখোমুখি হয়ে বসলেন।

"তার মানে? পুরুষোচিত নয়?"

একটু ইতস্তত করে ইন্দীবর বললেন, "তাও বলতে পার।"

তারপর হেসে বললেন—"তুমি নিজের পৌরুষ আস্ফালন করতে এত ব্যগ্র তা আমার জানা ছিল না তো। আর এই জন্যেই বিশেষ করে ভালো লাগত তোমাকে । তার চেয়েও বেশী—এই জন্যেই মনে মনে তারিফ করতাম তোমাকে। ধর্মসঙ্গত আচরণ করবার জন্যে সবাই লালায়িত। সব রকম ধর্মের পোশাক একসঙ্গে পরতে চায় সবাই, তা সে যতই না বেমানান হোক। আমরা দুঃসাহসী নির্ভীক বীরও হতে চাই আবার পরিণামদর্শী সংসারীও হতে চাই। আমরা অহঙ্কার আস্ফালন করে হুহুঙ্কারও ছাড়ি আবার বিনয়ে গদগদ হয়ে ধুলোয় লুটিয়েও পড়ি। ধর্মের পাল্লায় পড়ে একই লোক বিপরীত আচরণ করে। কিন্তু তুমি কখনও তা করনি। তুমি নির্জলা তুমিই আছ, কোনও কিছুর সঙ্গে কখনও আপোস করনি। আমি বরাবরই বলেছি গন্ধরাজের মধ্যে কোন ভণ্ডামি নেই। গন্ধরাজ চিরকালই গন্ধরাজ।"

"ভণ্ডামি নেই, কিন্তু কোন উদ্যমও নেই"—বলে উঠলেন গন্ধরাজ—"একটা মরা জানোয়ারের চেয়েও বেশী নির্জীব আমি। কিন্তু যে জিনিসটা তোমার কাছে জানতে এসেছি ইন্দীবর সেইটের উত্তর দাও— চেষ্টা করলে এবং কৃচ্ছ্রসাধন করলে আমি একটা চলনসই গোছের রাজাও হতে পারব না?"

"না, কদাপি নয়"—গম্ভীরভাবে বললেন ইন্দীবর—"ও চিন্তাই কোরো না। তাছাড়া, আমি জানি তুমি চেষ্টাই করবে না।"

"না, ইন্দীবর, আমাকে তুমি নিরস্ত করতে পারবে না, একটা হেস্ত-নেস্ত না করে আমি ছাড়ব না। রাজা হবার যোগ্যতা যদি আমার না থাকে তাহলে প্রজাদের টাকা নেবার কি অধিকার আছে আমার, এই প্রাসাদে বাস করবার কি অধিকার আছে, এত সৈন্যসামন্তের উপর, এত দেহরক্ষীর উপর প্রভুত্ব করবারই বা কি অধিকার আছে! আমি তো চোর তাহলে, অপরাধীকে আইনত শাস্তি আমি তাহলে দেব কি করে?"

"হ্যাঁ মুশকিল আছে বটে, সেটা মানছি।"

"আমি কি চেষ্টা করতে পারি না?"—গন্ধরাজ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন—"ধর্মত আমি কি চেষ্টা করতে বাধ্য নই? আমি যদি চেষ্টা করি আর তুমি যদি আমাকে পরামর্শ আর সাহায্য দাও—"

"আমি!" বলে উঠলেন ইন্দীবর—"রক্ষে কর!"

গন্ধরাজ যদিও উত্তেজিত হয়েছিলেন তবু হেসে ফেললেন তিনি।

"কাল রাত্রে কিন্তু সত্যিই একজন আমাকে বলেছে যে আমার মতো একজন লোক যদি ইন্দীবর ভারতীর মতো মাঝিকে হালে বসিয়ে পাল তুলে দেয় তাহলে রাজ্যের তরণী ঠিক তীরে ভিড়ে যাবে—"

"যে তোমাকে বলেছে সে হয় উন্মাদ, না হয় মতলববাজ পিশাচ—"

"সে তোমারই সগোত্র, একজন লেখক। নাম কুণাল—"

"কুণাল? হ্যাঁ তাকে চিনি, সে তো মহামূর্খ একটা—বই পড়েছি তার—"

"কিন্তু সে তোমার একজন ভক্ত।"

"তাই না কি?"—ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন ইন্দীবর— "তাহলে তো দেখছি ছোকরা খুব নিরেট নয়। তার বইটা আর একবার পড়ে দেখব। তার মতের সঙ্গে আমার মতের কিছুমাত্র মিল নেই, এ সত্ত্বেও যদি সে আমার ভক্ত হয় তাহলে ওর ভিতর বস্তু আছে কিছু। ওকে কি আমার মতে আনতে পেরেছি? কিন্তু না, ওসব কাণ্ড তো রূপকথার পরীর দেশে হয়।"

"তুমি কি রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী?"

"আমি? মোটেই না। আমি বিদ্রোহী। লাল রঙের বিদ্রোহী—"

"তাহলে আমার পরের কথাটা শোন এইবার। সত্যিই যদি আমাকে সিংহাসনে বসবার অনুপযুক্ত মনে কর, এই যদি সত্যই আমার বন্ধুদের মত হয়, আমার প্রজারা যদি সত্যিই আমাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে দিতে চায়, বিদ্রোহ যদি সত্যিই আসন্ন হয়ে থাকে তাহলে এই অনিবার্য পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আর হাস্যকর পরিস্থিতির অবসান ঘটানো কি উচিত নয়? সংক্ষেপে সিংহাসন ত্যাগ করাই কি এখন একমাত্র কর্তব্য নয় আমার? বিশ্বাস কর, ইন্দীবর, সকলের বিদ্রূপ গালাগালি আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু আমার মতো বাজে মহারাজাদের সিংহাসন ত্যাগ করার কি মূল্য আছে। সিংহাসন ত্যাগ করবার আগে প্রমাণ করতে হবে যে ওই সিংহাসনে সত্যিই আমার কিছু অধিকার ছিল, সংক্ষেপে আগে সাড়ম্বরে মহারাজার অভিনয় করে তারপর সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে।"

"ঠিক। কিংবা যেমন আছ তেমনি থাকতে হবে! আচ্ছা, তোমার আজ কি হয়েছে বল তো! তুমি কি করছ তা জানো? তুমি অজান্তে আনাড়ীর মতো জ্ঞানরাজ্যের সেই পবিত্র তীর্থে এসে পড়েছ যেখানে পাগলেরা থাকে। হ্যাঁ, পাগলেরা। আমাদের জ্ঞানের মন্দিরে গোপনতম নির্জন কক্ষে আমরা তালা দিয়ে যা বন্ধ করে রাখি, তা কি জান? মাকড়শার ঝুল! খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে সমস্ত মানুষ—সমস্ত বাজে, অত্যন্ত বাজে। অত্যন্ত অনাবশ্যক, একেবারে অপ্রয়োজনীয়। প্রকৃতি আমাদের দয়া করে সহ্য করেন, আমরা প্রকৃতির কোনও কাজে লাগি না। আমরা সেই ফুল যাতে ফল ফলে না। দরিদ্র ঘর্মাক্তকলেবর শ্রমিক থেকে শুরু করে তিলকমালাধারী মহাপুরুষরা পর্যন্ত সবাই একদলের, সবাই সমান অনাবশ্যক। কেউ কোন কাজে লাগি না। আমরা সবাই বালি দিয়ে দড়ি পাকাবার চেষ্টা করছি কিংবা তাস দিয়ে কেল্লা বানাচ্ছি। ও আলোচনা থাক। করলে পাগলদের কথা এসে পড়বে আবার।"

ইন্দীবর আসন থেকে উঠে পড়লেন। আবার বসে পড়লেন হঠাৎ। তারপর একটু হেসে বললেন, "ভায়া, দৈত্য-দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের কর্ম নয়, ফুলের মতো ফুটে থাকাই আমাদের কাজ। তুমি ওটা পারো বলেই তোমাকে ভালোবাসি। ওইই কর। ওই শোভন ওই সুন্দর। নিজের মৌজে মশগুল হয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াও। ধর্মটর্ম বিবেক-টিবেক চুলোয় যাক। কপিঞ্জল যেমন রাজ্য শাসন করছে করুক। লোকে বলে ও নাকি ভালই শাসন করছে। আর এসব করে ও নাকি খুশীও আছে, ওর দেমাকের কিছু খোরাকও পেয়েছে!"

"ইন্দীবর কি বলছ তুমি এসব? আমরা বাজে, আমরা অনাবশ্যক? না, আমি অন্তত

অনাবশ্যক নই, বাজেও নই। আমি হয় কোন কাজে লাগব, না হয় অকাজ করব। হয় গড়ব না হয় ভাঙব। স্থির হয়ে থাকা আমার ধাতে নেই। আমি মানছি রাজা-রাজত্ব এ সবই হাস্যকর ব্যাপার, সবই প্রহসন, কিন্তু এও ঠিক যে সাধারণ গৃহস্থরা যারা খেটে-খুটে খায় তারাই সমাজের ধারক আর বাহক। তিন বচ্ছর আমি রাজ্যের দিকে ফিরে তাকাইনি—সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত সম্মান, সমস্ত আমোদ-প্রমোদ, ঐশ্বর্যের সমস্ত সমারোহ কপিঞ্জল আর সুরূপিণীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ফল কি হয়েছে জান? প্রজাদের খাজনা বেড়েছে, সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে, কামান কেনা হয়েছে—অর্থাৎ রাজ্য বারুদের স্তূপে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি স্ফুলিঙ্গ পড়বার অপেক্ষা কেবল। প্রজাদের শান্তি নেই। ক্ষেপে রয়েছে সবাই। যুদ্ধের কথাও শোনা যাচ্ছে—এই ছোট্ট চায়ের পেয়ালাতেও তুফান উঠবে বলছে সবাই। পেজোমি আর বোকামির এমন জটিল সমন্বয় আগে দেখেছ কখনও? এ লজ্জা এ অপমান সহ্য করা যায় না। এর অনিবার্য পরিণাম বিদ্রোহ যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে তখন ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে হবে কাকে? আমাকে। এই সাক্ষীগোপাল মহারাজা গন্ধরাজকে। লোকে আমাকেই জবাই করবে, আমাকেই দায়ী করবে—"

ইন্দীবর বললেন, "আমার ধারণা ছিল লোকমতকে তুমি গ্রাহ্য কর না।"

"আগে করতাম না, এখন করছি"—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ—"এখন বয়স বেড়েছে। তাছাড়া, ওই সুরূপিণী, তার খবর রাখ? তাকে সকলে ঘৃণা করে। বিয়ে করে যে দেশে তাকে আমি এনেছিলাম সে দেশে তার কিছুমাত্র সম্মান নেই। বুঝতে পারছি, আমারই দোষে নষ্ট হয়েছে সে। এই রাজ্যটা তাকে আমি খেলনার মতো উপহার দিয়েছিলাম, কিন্তু খেলনাটা সে ভেঙে ফেলেছে। ফেলবেই! যেমন দ্যাবা, তেমনি দেবী। আচ্ছা ইন্দীবর, তার জীবন কি নিরাপদ এ রাজ্যে?"

"হ্যাঁ, এখন নিরাপদ"—উত্তর দিলেন ইন্দীবর—"তবে জিজ্ঞাসা করছ যখন তখন খুলেই বলছি। আজ নিরাপদ, কিন্তু কাল কি হবে বলতে পারি না। তোমার রাণীর পরামর্শদাতা যিনি তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, তিনি মোটেই ভালো লোক নন।"

"কে তিনি? তিনিই তো কপিঞ্জল। আর তুমি বলছ ওরই হাতে শাসনভার থাকুক। অদ্ভুত পরামর্শ তোমার! আমি এ ক'বছর যে পথে চলে এসেছি সে পথ আমাকে শেষে যে এখানে এনে ফেলবে তা ভাবতে পারিনি। তুমি বলছ সুরূপিণীর পরামর্শদাতা লোক ভালো নন। শুধুই কি তিনি পরামর্শদাতা? না, এ নিয়ে ঢাকঢাক গুড়গুড় করে লাভ নেই। লোকে তার সম্বন্ধে কি রটাচ্ছে জান?"

ইন্দীবর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছিলেন, তিনি শুধু মাথা নাড়লেন।

"আমি রাজা হিসেবে যে কত বাজে সে সমালোচনায় তুমি পঞ্চমুখ। কিন্তু আমি স্বামী হিসেবে কেমন সে কথা তো তুমি একবারও বলনি।"

"না"—ইন্দীবর বললেন—"ও তো অন্য প্রসঙ্গ। আমি চিরকুমার প্রৌঢ় মানুষ। ও বিষয়ে কথা কইবার বা পরামর্শ দেবার অধিকার আমার নেই।"

"আমি পরামর্শ চাইও না"—উঠে দাঁড়ালেন গন্ধরাজ—"কিন্তু এসব আর চলবে না। এ বন্ধ করতেই হবে।"

পিছনে দু'হাত দিয়ে পদচারণা শুরু করলেন তিনি।

"গন্ধরাজ, ভগবান তোমার সহায় হোন, আমি পারব না" কিছুক্ষণ নীরব থেকে ইন্দীবর বললেন অবশেষে।

হঠাৎ থেমে গন্ধরাজ ফিরে দাঁড়ালেন।

"এর মানে কি? কি বলব একে। আত্ম-অবিশ্বাস? উপহাসের ভয়? ছদ্ম আত্মম্ভরিতা? নাম যাই হোক কিন্তু কি শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি। দেখ ইন্দীবর, ভুয়ো ব্যাপার নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি। এই খেলনা-সিংহাসন যখন আমি পেলাম তখন আমি আনন্দিত হইনি লজ্জিত হয়েছিলাম। এই রাজাগিরিতে, এই অসম্ভব হাস্যকর ব্যাপারে, আমার যে কিছুমাত্র আস্থা আছে তা লোকে বিশ্বাস করুক এ আমি মোটেই চাইনি। যা হাসিমুখে সহজভাবে করা যায় না তা আমি কখনও করি না। সত্যিই আমার একটা রস-বোধ আছে, আমার স্রষ্টা ভগবান সেটা জানেন কি না জানি না, কিন্তু আমি জানি। আমি বেরসিকের মতো কিছু করি না। বিয়ের ব্যাপারেও ঠিক তাই। যখন বিয়ে হল তখন বুঝলাম এ মেয়ে আমাকে কোনদিন ভালবাসবে না, সুতরাং তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না, আমি যে ওর জীবনে কাঁটা হয়ে থাকতে চাই না এটা ভড়ং করে বজায় রাখতে হবে। তাই করেছি। কিন্তু কি করেছি! লোকে আমাকে অক্ষম নপুংসক বলছে। ছি, ছি—"

"দেখ"—ইন্দীবর একটু হেসে বললেন—"আমাদের একই বংশে জন্ম, আমাদের দুজনের শরীরেই এক রক্ত বইছে। তাই বুঝতে পারছি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তুমি যে ছবিটি আঁকলে সেটি একটি সন্দেহবাদী দার্শনিকের অপূর্ব আলেখ্য—"

"দার্শনিকের? ভীরুর"—চীৎকার করে উঠলেন গন্ধরাজ—"হ্যাঁ ভীরুর। মেরুদণ্ডহীন, নতজানু ভীরুর, যার মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই।"

গন্ধরাজের মুখ থেকে গুলির মতো এই কথাগুলো যখন ছুটছিল ঠিক সেই সময় একটি বেঁটে মোটা বৃদ্ধ ভদ্রলোক ইন্দীবরের পিছন দিকের একটি কপাট খুলে নিঃশব্দে প্রবেশ করলেন। গুলিগুলো যেন তাঁরই মুখে লাগল। একটু হকচকিয়ে গেলেন তিনি। শুকচঞ্চুর মতো নাক, চাপা ওষ্ঠাধর, ঠিকরে-পড়া চোখ ভদ্রলোকের। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তিনি যেন ভব্যতার প্রতিমূর্তি। সাধারণত তিনি যখন তাঁর বিরাট ভুঁড়ির পিছনে সদর্পে ঘুরে বেড়ান তখন তাঁকে জ্ঞান-গম্ভীর অবিচল চরিত্রের লোক বলেই মনে হয়, কিন্তু একটু বেগতিক দেখলেই তাঁর চেহারা বদলে যায়, হাত কাঁপতে থাকে, পা নড়বড় করে। তখন বোঝা যায় মূলেই গোলমাল আছে কোথাও। পার্বতীর বিখ্যাত গ্রন্থশালায়—যেখানে সাধারণত নিশ্ছিদ্র নীরবতাই বিরাজ করে—সেখানে তিনি যে এমন সগর্জনে অভ্যর্থিত হবেন তা তাঁর কল্পনার অতীত ছিল। দুহাত তুলে মেয়েমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, মনে হল সত্যিই বুঝি তাঁর মুখে গুলি লেগেছে।

"ও—" সভয়ে চীৎকার করে উঠলেন তিনি—"ও, আপনি, মহারাজ। বুঝতে পারিনি ঠিক। ক্ষমা করুন আমাকে। কিন্তু এত সকালে আপনি এখানে? ব্যাপারটা একেবারে ধারণার অতীত ছিল আমার—সত্যিই অপ্রত্যাশিত—মানে—"

"মহাধ্যক্ষ মশাই না কি। নমস্কার। হ্যাঁ, আজ একটু সকাল সকালই এসেছি এখানে।"

"আমি এখনি চলে যাচ্ছি। ভারতীমহাশয়কে কাল কিছু কাগজ দিয়ে গিয়েছিলাম সেটা নিয়ে যাব। ওগুলো দেখা হয়ে গেছে নিশ্চয় আপনার। দিন তাহলে নিয়ে চলে যাই। আপনাদের আলাপে বাধা দেব না।"

ইন্দীবর ভারতী একটি বাক্সের তালা খুলে একগোছা পাণ্ডুলিপির কাগজ তাঁকে দিলেন। কাগজগুলি হস্তগত করেই মহাধ্যক্ষ সসম্ভ্রমে নমস্কার করে চলে যাচ্ছিলেন।

"চলে যাচ্ছেন কেন"—বাধা দিলেন গন্ধরাজ—"এতদিন পরে যখন দেখাই হয়ে গেল তখন বসুন, একটু গল্প করা যাক।"

গর্জনগাঁওয়ের মহাধ্যক্ষ কুজ্ঝটিকুমার অভিবাদন করে বললেন—"মহারাজের এ অনুগ্রহে সম্মানিত হলাম।"

"আমি চলে যাওয়ার পর কোন গোলমাল হয়নি তো?"

গন্ধরাজ আসনে উপবেশন করলেন।

"আগে যেমন ছিল তেমনিই আছে"—উত্তর দিলেন কুজ্ঝটিকুমার—"সামান্য ইতরবিশেষ হয়েছে হয়তো কোথাও কোথাও। ওই সামান্য হয়তো না দেখলে বড় কিছু হয়ে পড়ত। কিন্তু তা হয়নি। মহারাজের আদেশ সর্বতোভাবে পালিত হচ্ছে।"

"আমার আদেশ?" গন্ধরাজ বিস্মিত হলেন—"আমি আবার কবে আপনাকে আদেশ দিয়ে বিব্রত করলাম! আমার বদলে হয়তো অন্য কেউ আদেশ দিয়ে থাকবেন। কিন্তু ও কথা যাক—ওই যে সামান্য ইতরবিশেষ কি কি হয়েছে বলছিলেন কি সেগুলো—"

"মহারাজ, আপনি রাজ্যের ধারাবাহিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে বুদ্ধিমানের মতো সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তাই—"

"আমার বিশ্রামের কথা বাদ দিন। কি কি হয়েছিল তাই বলুন।"

"ওই যে বললাম রাজ্যের ধারাবাহিক কাজকর্মই"—আমতা আমতা করে আবার বললেন তিনি।

"আশ্চর্য কাণ্ড দেখছি। সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর দিতে পাচ্ছেন না আপনি? আপনি এ রাজ্যের মহাধ্যক্ষ, আপনার কাছে এ রকম অস্পষ্টতা আশা করিনি। সন্দেহ হচ্ছে এর পিছনে কোনও মতলব লুকোনো আছে। আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি আমার অবর্তমানে রাজ্যের শান্তি অটুট ছিল কি না। অনুগ্রহ করে এ কথাটার জবাব দিন—"

"হ্যাঁ, ছিল, ছিল বই কি, শান্তি অটুট ছিল—"

যে ভাবে থেমে থেমে হোঁচট খেয়ে হোঁচট খেয়ে কথাগুলো বললেন কুজ্ঝটিকুমার তাতে মনে হল সত্য গোপন করছেন তিনি।

"এই কি তাহলে আমাকে মনে করতে হবে"—গম্ভীরভাবে বললেন গন্ধরাজ—"আপনি মহাধ্যক্ষ, আমার কাছে জানাচ্ছেন যে আমি চলে যাওয়ার পর রাজ্যে এমন কিছু ঘটেনি যা উল্লেখযোগ্য, যা আমার জানা উচিত?"

"না, না, ভারতী মশায় সাক্ষী আছেন, এরকম কোন কথা আমি বলিনি মহারাজ।"

"চুপ করুন"—থামিয়ে দিলেন তাঁকে গন্ধরাজ।

তারপর একটু থেমে বললেন—"দেখুন মহাধ্যক্ষ মশায়, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন। আমার অধীনে কাজ করবার আগে আমার বাবার অধীনেও আপনি কাজ করেছেন। আপনার মুখে এ ধরনের এলোমেলো কথা শোভা পাচ্ছে না, মনে হচ্ছে আপনি যেন কোনও অছিলায় সত্য গোপন করতে চাইছেন। আমি এ রাজ্যের মহারাজা, আমি প্রত্যাশা করি আমার মহাধ্যক্ষ তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত হবেন। আপনি স্থির হয়ে একটু ভাবুন এবং যে, সব কথা গোপন করবার

চেষ্টা করেছেন তা খুলে বলুন। হয়তো আর কারও প্ররোচনায় আপনি এ হীন কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন—কিন্তু আমি অনুরোধ করছি, আপনি আত্মস্থ হোন।"

ইন্দীবর শাস্ত্রী তাঁর পাণ্ডুলিপির উপর ঝুঁকে পড়ে সম্ভবত কিছু সংশোধন করছিলেন কিন্তু তাঁর স্কন্ধযুগলের আন্দোলন থেকে মনে হল তিনি গোপনে হাসছেন। আঙুলে রুমাল জড়াতে জড়াতে অপেক্ষা করতে লাগলেন গন্ধরাজ।

"মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কাছে এখন কোনও কাগজপত্র নেই, আপনার অবর্তমানে যে গুরুতর ঘটনাটি ঘটেছে সে সম্বন্ধে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে কিছু বলা যাবে না—কারণ সেটা রীতিবিরুদ্ধ। কারণ যা ঘটেছে তা কেন ঘটেছে সেটা আপনাকে বোঝাতে হলে সরকারী কাগজপত্র চাই। তা না হলে আমার ভয় হচ্ছে, আপনি সুবিচার করতে পারবেন না।"

"আমি কোনও সমালোচনাই করব না"—গন্ধরাজ বললেন—"আপনার আর আমার মধ্যে ভয়ের ছায়া থাকুক, এটাও আমি চাই না। কারণ আমি ভুলিনি আমার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক। বহুদিন থেকে আপনি এ রাজ্যের বিশ্বাসী কর্মচারী। কাগজপত্রের দরকার নেই, আপনি যদি মনে করেন ও বিষয়ে আমার হস্তক্ষেপ করা অনুচিত—তাও আমি করব। কিন্তু আপনার হাতেই তো এখন একগোছা কাগজ রয়েছে। কি এগুলো? দেখি। আশা করি ওগুলোর সম্বন্ধে আলোকপাত করতে আপনার আপত্তি নেই।"

"এগুলো?"—বলে উঠলেন কুজ্‌ঝটিকুমার—"এগুলো বাজে কাগজ। গোয়েন্দা আর আরক্ষী বিভাগের লোকেরা পাঠিয়েছিল। ওই যে বাঙালী পর্যটকটি এসেছেন তাঁরই কিছু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমরা ভারতী মশাইয়ের কাছে দেখবার জন্য দিয়ে গিয়েছিলাম।"

"বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে?"—গন্ধরাজ বলে উঠলেন—"কি রকম? খুলে বলুন সব।"

ইন্দীবর ভারতী বললেন—"রাঢ়ের ভগীরথ শর্মাকে কাল সন্ধ্যায় এখানে বন্দী করা হয়েছে।"

"সে কী! এ কথা কি সত্যি?"

মহাধ্যক্ষ কুজ্‌ঝটিকুমারের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"হ্যাঁ, সেইটেই সঙ্গত বলে বিবেচিত হয়েছে"—একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন যেন মহাধ্যক্ষ— "বেআইনী কিছু হয়নি। মহারাজেরই ছাপ মোহর আর মহারাণীর দস্তখত অনুসারে আইনত সব কিছু করেছেন ওঁরা। আমি ভৃত্য মাত্র, আমার বাধা দেবার কি অধিকার আছে মহারাজ!"

"ভগীরথ শর্মা আমার রাজ্যের সম্মানিত অতিথি। তাঁকে বন্দী করেছেন আপনারা? কি দোষে? কোন অছিলায়?"

মহাধ্যক্ষ আমতা আমতা করতে লাগলেন।

ইন্দীবর ভারতী বললেন—"মহারাজ হয়তো ওই পাণ্ডুলিপি থেকেই বুঝতে পারবেন সেটা।"

কলম দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তিনি পাণ্ডুলিপিটা।

গন্ধরাজ ইন্দীবরের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে মহাধ্যক্ষকে বললেন, "দিন তাহলে ওটা, দেখি—"

মহাধ্যক্ষ কিন্তু ইতস্তত করতে লাগলেন।

"মহাসামন্ত কপিঞ্জল এ ব্যাপারটা নিজের হাতেই রাখতে চান। এক্ষেত্রে আমি বাহক মাত্র। এ পাণ্ডুলিপি হস্তান্তরিত করবার হুকুম নেই। ইন্দীবর ভারতী আশা করি আমাকে সমর্থন করবেন।"

"দেখুন মহাধ্যক্ষ মশাই, এসে থেকে ক্রমাগতই আপনি আবোল-তাবোল বকছেন। কিন্তু এখন যা বললেন তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। দিন, দিন ওগুলো। আমি আদেশ করছি আপনাকে। দিন—"

কুজ্ঝটিকুমার আর পারলেন না।

"তাই হোক। আমার আবধ্যতার জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করছি, কিন্তু কি করব, আমি নাচার। যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এবার মন্ত্রণালয়ে যাই। সেখানে রাজকার্যের—"

"ওই চেয়ারটা দেখছেন? ওইটের উপরই বসুন এখন। ওইখানে বসেই রাজাকার্য করুন আপাতত। না, না, আর কোন কথা বলবেন না"—কুজ্ঝটিকুমার কথা বলবার জন্যে মুখ খুলেছিলেন —" নতুন মনিবের যে আপনি বিশ্বস্ত চাকর তার অনেক প্রমাণ তো দিলেন। কিন্তু আমার সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।"

মহাধ্যক্ষ মশাই বিনাবাক্যব্যয়ে বসে পড়লেন চেয়ারটাতে।

"দেখা যাক এবার এতে কি আছে"—পাণ্ডুলিপির কাগজগুলো ওলটাতে লাগলেন গন্ধরাজ—"ও বাবা, এ যে দেখছি প্রকাণ্ড বই একটা।"

"হ্যাঁ"—ইন্দীবর বললেন—"ওটি একটি ভ্রমণকাহিনী। উনি নানা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে যা দেখেছেন তাই লিখেছেন এতে।"

"তুমি পড়েছ বইখানা?"

"না। আমি সূচীপত্রটা দেখেছি কেবল। বইটা কিন্তু খোলা অবস্থায় পেয়েছিলাম। আর ও সম্বন্ধে কোনও গোপনতা বা সতর্কতার কথাও তো আমাকে বলা হয়নি।"

গন্ধরাজ কুজ্ঝটিকার দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

"হুঁ—গন্ধরাজ পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন—"পৃথিবীর ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে গর্জনগাঁওয়ের মতো অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য একটা রাজ্যে একজন গ্রন্থকারের লেখা পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে—এর চেয়ে অকীর্তিকর মূর্খতা আর কি হতে পারে!"

তারপর কুজ্ঝটিকুমারের দিকে চেয়ে বললেন—"এরকম একটা ঘৃণ্য কাজে আপনি হাত দিয়েছেন? আমার প্রতি আপনি সুবিচার করেছেন, না, অবিচার করেছেন সে কথা এখন থাক, কিন্তু আপনি, গর্জনগাঁওয়ের মহাধ্যক্ষ, গুপ্তচর হয়েছেন শেষে? তাছাড়া একে আর কি বলব! একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোককে বন্দী করে, তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র, তাঁর সারাজীবনের সাধনা এই গ্রন্থ কেড়ে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে যা করেছেন আপনি, তা কি কোনও ভদ্রলোকে করে কখনও? এই ভগীরথ শর্মা আমার সম্মানিত অতিথি। বঙ্গরাজ প্রসন্নপল্লবের পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি এসেছিলেন আমার রাজ্য পরিদর্শন করতে। তিনি শুধু বড় পণ্ডিতই নন, বড় যোদ্ধাও একজন। প্রসন্নপল্লব লিখেছিলেন উনি অভিজাত বংশের সন্তান, শস্ত্র এবং শাস্ত্র উভয়

ক্ষেত্রেই পারঙ্গম। কিন্তু ওঁর দেশভ্রমণ করবার বাতিক আছে, তাই সারা ভারতের নানা রাজ্যে ঘুরে বেড়ান। আমি ওঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেছিলাম। আমার অবর্তমানে তাঁকে কোন্ সাহসে অপমান করেছেন আপনারা? কেন ওঁর গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেছেন? গ্রন্থ নিয়ে কি করব আমরা? ইন্দীবর ভারতী হয়তো বলতে পারবেন গ্রন্থটি ভালো কি মন্দ, কিন্তু যদি মন্দই হয় তাহলে তা নষ্ট করবার অধিকার আমাদের আছে কি? তা যদি থাকতো তাহলে তো পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে ভাঁড়ের ভূমিকায় আমরা প্রথম হতাম!"

এ সব কথা বলতে বলতে গন্ধরাজ পাণ্ডুলিপিটি উলটে-পালটে দেখছিলেন। দেখলেন মলাটের উপর লেখা রয়েছে—"ভারতের নানা রাজ্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ। ভগীরথ শর্মা বিরচিত।" এরপরই সূচীপত্র। কোন্ কোন্ রাজ্যে তিনি গেছেন তারই একটা তালিকা। গন্ধরাজ দেখলেন ঊনবিংশ পরিচ্ছেদটি তিনি গর্জনগাঁওয়ের সম্পর্কে লিখেছেন।

"গর্জনগাঁও সম্বন্ধেও লিখেছেন দেখছি। মজার হবে নিশ্চয়ই খুব।"

পড়বার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন তিনি।

" ভদ্রলোকের লেখার বৈশিষ্ট্য আছে একটা। তিনি প্রত্যেক রাজ্যে থেকে সে রাজ্য সম্বন্ধে লেখা আরম্ভ করেছেন এবং সে লেখা শেষ করে তবে সে রাজ্য ত্যাগ করেছেন। মানে, সবই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বইটা যখন প্রকাশিত হবে তখন আমি যোগাড় করব একটা।"

"এটা কি পড়া উচিত হবে।"

ইন্দীবর ভ্রূকুঞ্চিত করে জানলার দিকে চেয়ে রইলেন। গন্ধরাজ অনুভব করলেন ইন্দীবরের ইচ্ছে নয় যে তিনি পড়েন।

"একবার একটু দেখেনি উলটে পালটে, তাতে আর ক্ষতিটা কি"—একটু হেসে আড়চোখে ইন্দীবরের দিকে চেয়ে পাণ্ডুলিপিটি প্রসারিত করে বসলেন তিনি।

।। ছয়।।

ভগীরথ শর্মা ঊনবিংশ পরিচ্ছেদটি এই ভাবে আরম্ভ করেছিলেন।

"আপনারা সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করিতে পারেন যে হিমালয়ের পাদদেশে তো গর্জনগাঁওয়ের মতো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, সকলেই একরকম নামেমাত্র রাজ্য সকলেই স্থূল-রুচি, সকলেই নীতি-বিবর্জিত,—তবে গর্জনগাঁওকেই আমি নির্বাচন করিলাম কেন। ঘটনাচক্র ইহার জন্য দায়ী, আমি স্বেচ্ছায় ইহা করি নাই। কিন্তু ইহাও বলিব, এজন্য আমার দুঃখও হয় নাই। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র সমাজে শিক্ষণীয় কিছু পাইলাম না, নিজেদের বিকৃতির জারকরসে ইহারা ক্রমশই গলিত বিগলিত হইতেছে। এখানে শিখিবার কিছু নাই। কিন্তু এখানে আমি অনেক মজার জিনিস দেখিলাম। এখানে আমোদের অনেক উপকরণ মিলিয়াছে।

এখানকার যিনি মহারাজা—মহামহিম মহিমার্ণব শৈলসূত শ্রীমন গন্ধরাজ বর্মন, তিনি, আমার মনে হয় তেমন শিক্ষিত লোক নহেন। তাঁহার সাহসের অভাব আছে, কর্ম-প্রেরণাও নাই। তাঁহার প্রজাদের চক্ষে তিনি ঘৃণিত এবং হেয়। অনেক কষ্টে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করি। কারণ তিনি প্রায়ই রাজসভায় থাকেন না, বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ান।

রাজসভায় কেহ তাঁহাকে গ্রাহ্য করে না। রাজসভায় যখন থাকেন তখন তাঁহাকে মহারাণীর প্রণয়-লীলায় আববণ স্বরূপ থাকিতে হয়। এতদ্ব্যতীত রাজসভায় তাঁহার অন্য ভূমিকা নাই। তৃতীয়বারের চেষ্টায় আমি যখন সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করি তখন মহারাজাকে ওই ভূমিকাতেই দেখিয়াছিলাম। তাঁহার একপাশে মহারাণী, আর একপাশে মহারাণীর প্রণয়ী কপিঞ্জল। মহারাজ কুদর্শন ব্যক্তি নহেন। মাথায় কালো কুঞ্চিত কেশদাম, চোখের তারা নীলাভ। কালো চুল আর নীলাভ চোখের সমন্বয় চারিত্রিক বা মানসিক দৌর্বল্য সূচিত করে। হয়তো এ দৌর্বল্য উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার শারীরিক সৌষ্ঠবে ছন্দ নাই, কিন্তু রূপ আছে। নাকটি ঈষৎ ছোট, মুখটি নারী-সুলভ। তাঁহার কথাবার্তা বলিবার ভঙ্গী মনোরম, তিনি সার্থকভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতেও সক্ষম। কিন্তু তাঁহার এই মনোহর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিলে হতাশ হইতে হয়। সেখানে কোনও উৎকৃষ্ট গুণ নাই। আছে শিথিল নীতির আভাস, আছে চপলতা, আছে পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যহীন অসংলগ্ন চিন্তাধারা। বর্তমান যুগের অবক্ষয়-বৃক্ষের তিনি একটি পাকা ফল। মাকাল ফল। সব-জান্তা পল্লবগ্রাহী গোছের লোক তিনি। নানা বিষয়ে অনেকক্ষণ বক্‌বক্ করিলেন, দেখিলাম একটি বিষয়েও তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই। তিনি বলিলেন, "আমি এক জিনিস নিয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না"—হাসিমুখেই কথাটা বলিলেন, যেন তাঁহার এই অক্ষমতা, এই চারিত্রিক দীনতা একটা বাহাদুরি, একটা গর্বের বস্তু। তাঁহার এই ঢিলা-ঢালা কান্ত কোমল দুর্বল চরিত্রের প্রভাব সর্বক্ষেত্রে পরিস্ফুট। তিনি অসিযুদ্ধ করেন, কিন্তু তিনি প্রথম শ্রেণীর অসি-যোদ্ধা নহেন। অশ্বারোহী, নর্তক, শিকারী—তিনি সবই, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর। তিনি গানও করেন—আমি তাঁহার গান শুনিয়াছি—মনে হয় ছোট ছেলে গান গাহিতেছে। তিনি ভুল সংস্কৃতে বাজে কবিতাও লেখেন। অভিনয়ের শখও আছে, কিন্তু কৃতিত্ব নাই, নৈপুণ্য নাই, প্রতিভা নাই। সংক্ষেপে, তিনি বহুরকম ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন, কিন্তু কোনটাই ভালো করিয়া করিতে পারেন না। একটিমাত্র পুরুষোচিত গুণ আছে তাঁহার, সেটি শিকার। এককথায়, তিনি নানা দুর্বলতার সঙ্গমক্ষেত্র। মনে হয় আসলে তিনি বোধহয় থিয়েটারের সখী, তামাশা করিয়া কেহ বুঝি তাঁহাকে পুরুষবেশে সাজাইয়া ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া দিয়াছে! আমি দূর হইতে এই নকল-মহারাজাকে, এই মহারাজার অপচ্ছায়াকে, অশ্বপৃষ্ঠে কয়েকবার দেখিয়াছি। কখনও একাই চলিয়াছেন, কখনও বা দুই চারিজন শিকারী হয়তো সঙ্গে আছে। কেহ তাঁহাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। ব্যর্থ বিষণ্ণ এই চিত্রটি দেখিয়া আমি নিজেই বড় দুঃখ বোধ করিয়াছি। মহৎ রাজবংশের অন্তিমকালে হয়তো এইরূপ দুর্বল প্রতিভূদেরই আবির্ভাব ঘটে।

মহারাণী শতশ্রী সুরূপিণী, কপিলবাস্তুর মহারাজাধিরাজ উৎফুল্লগৌরবের কন্যা। স্বামীর মতোই তাঁহাকেও হয়তো নগণ্যা বলিতাম, কিন্তু তিনি একজন উচ্চাভিলাষী পুরুষের হস্তে শাণিত অস্ত্রের মতো হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অস্তিত্ব নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতো নহে। বয়সে তিনি গন্ধরাজ অপেক্ষা অনেক ছোট। শুনিয়াছি মাত্র বাইশ বৎসর বয়স তাঁহার। উপর-চালাক, দেমাকের মরাই, কিন্তু আসলে নির্বোধ এই যুবতীটি যে খুব একটা রূপসী তাহাও নহেন। চক্ষু দুইটি বেশ বড় বড়, কিন্তু মুখের সহিত বেমানান, তারা দুইটি কালো নহে বাদামী। চক্ষু দুইটি ক্ষণকালও স্থির থাকে না, সর্বদাই ঘুরিতেছে। মহারাণীকে ঘূর্ণিতলোচনা আখ্যা দিলে

অত্যুক্তি হয় না, চোখের দৃষ্টি হইতে মনে হয় মেয়েটি চপল এবং দুর্দান্ত। কপালটি বেশ উঁচু এবং অপ্রশস্ত। দেহের গঠনসৌষ্ঠবও চমৎকার নহে। খুব রোগা এবং একটু কোল-কুঁজা ধরনের। সর্বদাই যেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া আছেন। তাঁহার ধরন-ধারণ, কথাবার্তা, তাঁহার রুচি, এমন কি তাঁহার উচ্চাকাঙক্ষা পর্যন্ত কোনটাই যেন স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন অভিনয় করিতেছেন। আর অভিনয়টাও অপটু বলিয়া সমস্তটাই কুৎসিত এবং দৃষ্টিকটু। কোন বগী বা বিন্দী দ্রৌপদীর ভূমিকায় অবতরণ করিলে যে হাস্যকর ব্যাপার ঘটে, এ যেন তাহাই ঘটিয়াছে। সত্যের সম্বন্ধে বা শালীনতা বিষয়ে ইঁহার কোনও নিষ্ঠা আছে বলিয়া মনে হয় না। সমাজে এই জাতীয় মেয়েরাই গোপনে প্রণয়ীপরিবৃত হইয়া সংসারের সুখশান্তি নষ্ট করে এবং হয়তো স্বামীপরিত্যক্তা হইয়া অবশেষে স্বৈরিণী-জীবনের নরককুণ্ডে নিপাতিত হয়। মহারাণীর মধ্যে অসাধারণ কোনও গুণই নাই এবং ছিদ্রান্বেষী নারী-বিদ্বেষী ছাড়া আর কেহ যে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন তাহাও মনে হয় না। কিন্তু সিংহাসনে বসিয়া এই রমণী কপিঞ্জলের মতো লোকের দ্বারা চালিত হইলে জনসাধারণের গুরুতর ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

কপিঞ্জলই বর্তমানে এই হতভাগ্য রাজ্যের আসল রাজা। কপিঞ্জল ব্যক্তিটি জটিল চরিত্রের লোক। গর্জনগাঁওয়ে তিনি বিদেশী, সে হিসাবে এখানে তাঁহার পদ-মর্যাদা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তথাপি সে পদ-মর্যাদা তিনি যে ভাবে রক্ষা করিতেছেন তাহাকে ধৃষ্টতা ও দক্ষতার একটা আশ্চর্য কীর্তি ছাড়া আর কি বলা যায়! প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চতুর লোক তিনি। তাঁহার কথাবার্তা, তাঁহার মুখভাব, তাঁহার নীতি—সবই কপটতাপূর্ণ। মুড়া এবং ল্যাজা একসঙ্গে। অতিবড় বুদ্ধিমান লোকও ঠাহর করিতে পারিবেন না তাঁহার আসল অভিপ্রায়টা কি। তবু আমি সাহস করিয়া একটা আন্দাজ করিতেছি। মনে হয় তিনি দুই নৌকাতেই পা দিয়া অপেক্ষা করিতেছেন ভাগ্যের অনুকূল পবন কোন নৌকার পালে লাগে। যেটাতে লাগিবে সেইটাই তিনি বাহিবেন। বুদ্ধিমান লোকেদের উপর ভাগ্যবিধাতার কৃপা প্রায়ই অকৃপণ ধারায় বর্ষিত হয়।

অপদার্থ গন্ধরাজের প্রধানমন্ত্রীরূপে এবং প্রণয়-বিহ্বলা সুরূপিণীকে অস্ত্র এবং মুখপাত্রী হিসাবে ব্যবহার করিয়া কপিঞ্জল এখন স্বেচ্ছাচার-ক্ষমতা-দৃপ্ত এবং রাষ্ট্রীয় উন্নতি বিধানে বদ্ধপরিকর। রাজ্যের সমস্ত সমর্থ পুরুষকে তিনি সেনাদলে ভরতি করিয়াছেন। অনেক কামান কেনা হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে অনেক রণ-নিপুণ সেনানায়কও তাঁহার প্ররোচনায় গর্জনগাঁওয়ের সেনা-বিভাগে যোগদান করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন। আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে প্রচ্ছন্নভাষায় তর্জনগর্জন করিয়া এখন তিনি যাহা করিতেছেন তাহা গুণ্ডাকেই মানায়। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন গর্জনগাঁও এবার দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে। গর্জনগাঁওয়ের মতো ক্ষুদ্র রাজ্য তাহার পরিধি বিস্তার করিবে ইহা বাতুলতা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু গর্জনগাঁওয়ের একটা সুবিধা আছে। যদিও সে আয়তনে ছোট কিন্তু পর্বত-অরণ্য পরিবৃত হইয়া এমন স্থানে সে অবস্থিত যে সামরিক দৃষ্টিতে তাহাকে নিরাপদই বলা চলে। তাহার পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট রাজ্যগুলিও অরক্ষিত এবং অসহায়। যদি কোন সময়ে হিমাচল প্রদেশের শক্তিমান রাজ্যগুলি পরস্পরের হিংসায় অন্ধ হইয়া পড়ে, আর গর্জনগাঁও যদি সেই সুযোগে একটু তৎপরতা দেখায় তাহা হইলে অনায়াসেই তাহার রাজ্যের সীমানা এবং জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যাইতে

পারে। গর্জনগাঁওয়ের রাজধানী পার্বতীর রাজসভায় এখন ইহা লইয়াই জল্পনাকল্পনা চলিতেছে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি ইহাকে নিতান্ত অবাস্তব বলিয়াও মনে করি না। অনেক ছোট রাজ্য যে এই ধরনের সুযোগ সুবিধার সহায়তা লইয়া বৃহৎ শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছে ইহার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নহে। যদিও এখন হাওয়া বদলাইয়াছে এবং যদিও এখন দিগ্বিজয়ের কাহিনী পৌরাণিক আখ্যায়িকায় পর্যবসিত হইয়া আমাদের অবসর-বিনোদন করিতেছে, তবু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা এখনও ঘটে, ভাগ্যের অঙ্গুলি-হেলনে এখনও অনেক রাজ্যের এবং জাতির উত্থান-পতন নির্ণীত হয়। গর্জনগাঁওয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল করবৃদ্ধি এবং স্বাধীন মতামতের কণ্ঠরোধ। তিন বৎসর পূর্বে যে দেশে সুখ-শান্তির প্রাচুর্য ছিল সে দেশ এখন নিষ্ক্রিয়, প্রাণহীন। দেশের সমস্ত স্বর্ণ অন্তর্ধান করিয়াছে, দেশের সমস্ত নির্ঝরিণীচালিত যন্ত্রগুলি অচল। সমস্ত সমর্থ লোককে সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

কপিঞ্জল এখানকার আপোষ-নিষ্পত্তির বিচারক। সে ভূমিকাতেও তিনি আর এক কাণ্ড করিতেছিলেন। রাজ্যের বড় বড় পান্থশালায় বিচারের ওজুহাতে অবতারের মর্যাদায় সম্বর্ধিত হইয়া তিনি সংঘবদ্ধ সভাগুলিতে যাহা করিতেছিলেন তাহা বিচার নহে, ষড়যন্ত্র, তাহা রাজার বিরুদ্ধে বিষোদগার। অবশ্য সভা না বলিয়া এগুলিকে আড্ডা বলাই সঙ্গত। এখানে আসিবার বহু পূর্বে হইতেই আমি রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সমর্থক। কোথাও কোন মন্তব্য বা আচরণ দ্বারা ইহার প্রতিকূলতা আমি করি নাই। তাই এ ধরনের অনেক আড্ডায় আমার স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ছিল। সুতরাং যাহা লিখিতেছি তাহা গুজব-মাত্র নহে, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। একটি সভায় গণতন্ত্রের সংবিধান কিরূপ হইবে তাহা লইয়া বিশদ আলোচনা চলিতেছিল। লক্ষ্য করিলাম সে আলোচনায় সকলেই কপিঞ্জলকেই সর্ববিষয়ে কর্ণধাররূপে মানিয়া লইতেছে। মনে হইল কপিঞ্জল ইহাদের সকলকেই সম্মোহিত করিয়াছে। তিনি প্রচার করিতেছেন যে মহারাণী সুরূপিণীর মোহিনীশক্তির বিরুদ্ধে তিনি আর কত যুদ্ধ করিবেন, তাঁহার শক্তির একটা সীমা আছে তো। নানারূপ ভুয়া যুক্তি দর্শাইয়া ইহাও তিনি বার বার বলিতেছেন ঠিক এই মুহূর্তে বিপ্লবের দামামা বাজানো সমীচীন হইবে না। কিন্তু তিনি যে রাজনীতিতে বিচক্ষণ এবং প্রজাদের হিতৈষী ইহা জাহির করিবার জন্য তিনি ইহাও বলিতেছেন যে দামামা না বাজাইলেও বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি দরকার। প্রত্যেক সমর্থ লোককে তিনি সৈন্যদলে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছেন, ইহাতে অনেকের মনে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ক্ষতের উপর এই বলিয়া তিনি মলম লাগাইতেছেন যে সৈন্যদলে ভরতি হইলে সকলেরই একটা সামরিক শিক্ষা ও নিপুণতা হইবে—যাহা না থাকিলে কোনও বিদ্রোহই কখনও সফল হয় না। বিদ্রোহ করিয়া এই রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে প্রত্যেককেই শিক্ষিত সৈনিক হইতে হইবে। সেদিন আর একটা গুজব শুনিয়া অবাক হইলাম। গর্জনগাঁও নাকি নিরীহ প্রতিবেশী রাজ্য ভৈরঙ্গীকে আক্রমণ করিবে। মনে হইল—প্রজারা এইবার বোধহয় কপিঞ্জলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিবে। অনিচ্ছুক নির্বিরোধী প্রতিবেশী ভৈরঙ্গীর উপর জোর করিয়া যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়া বর্বরতার নামান্তর মাত্র। গর্জনগাঁওয়ের প্রজারা নিশ্চয় ইহা সহ্য করিবে না। কিন্তু বাজারে গিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে আরও অবাক হইতে হইল। গর্জনগাঁওয়ের উদারপন্থী রাজনৈতিক দলও দেখিলাম কপিঞ্জলের জাদুমন্ত্রে

বশীভূত হইয়া বলিতেছে—"যাক না, ছোঁড়াগুলো আসল যুদ্ধ কাকে বলে তা দেখে আসুক। হাতে-কলমে কাজ শেখাই তো ভালো।" সকলেরই মুখে এই কথা, সকলেই বর্বর কপিঞ্জলের ভুয়া যুক্তি মানিয়া লইয়াছে, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ। সকলেরই মুখে শুনিলাম—"ওরা ভৈরঙ্গী আক্রমণ করে হাতে-কলমে যুদ্ধটা শিখে আসুক। ভৈরঙ্গীকে আমাদের সীমানা-ভুক্ত করাই তো ভালো। তাতে আমাদের শক্তি বাড়বে। চাই কি এর পর আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারব। আমাদের স্বাধীন গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে। ভারতবর্ষের সব রাজারাও যদি একজোট হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলেও আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না কেউ।" সব শৃগালের মুখেই ওই একই 'হুক্কা হুয়া'। আমি কিসের বেশী প্রশংসা করিব ভাবিয়া পাইতেছি না—গর্জনগাঁওয়ের প্রজাপুঞ্জের সরলতার, না, ভাগ্যান্বেষী এই লোকটার ধৃষ্টতার। ধূর্তটা সত্যই নানা ছলনার জাল বিস্তার করিয়া গর্জনগাঁওয়ের সকলকে নিজের কুক্ষিগত করিয়াছে। অবশ্য এই সর্পিল বিপদসঙ্কুল পথে তিনি কতদিন নিরাপদে চলিতে পারিবেন তাহা জানি না। মনে হয় বেশীদিন পারিবেন না। কিন্তু ইহাও সত্য গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া তিনি এই জটিল গোলকধাঁধায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন এবং যতদূর জানি, রাজসভায় এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব কখনও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

আমার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কিঞ্চিৎ সুযোগ ঘটিয়াছে। অদ্ভুত চেহারা ভদ্রলোকের। কদাকার গড়ন। প্রকাণ্ড নড়বড়ে শরীর, মনে হয় শরীরের কোথাও যেন মজবুত বাঁধুনি নাই, লম্বাচওড়া খাপছাড়া তাঁবুর মতো একটা চেহারা। অথচ যে কোনও সময়ে ইচ্ছা করিলে তিনি এই শরীরটাকে টানিয়া টুনিয়া গুটাইয়া নৃত্যের আসরের উপযোগী করিয়াও তুলিতে পারেন। তাঁহার বর্ণ এবং মেজাজ দুইই কবিরাজী ভাষায়—পিত্তপ্রধান। চোখের দৃষ্টি সর্বদাই অপ্রসন্ন। ক্ষৌরীকৃত গণ্ড এবং চিবুক ঘননীল। চোয়ালটা যেন সামনের দিকে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। দেখিলেই বোঝা যায় তিনি সকলকে ঘৃণা করেন, এমন কি তাঁহার দলের লোকদেরও। অথচ নিজে তিনি সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই, সাধারণ লোকের মতই তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং প্রশংসালোলুপ। লক্ষ্য করিয়াছি কথাবার্তা বলিবার সময় নানারকম খবর সংগ্রহ কবিবার জন্যই তিনি বেশী উৎসুক, নিজে তেমন কিছু বলিতে চান না, কেবল শুনিতে চান, বিশেষত খাঁটি কথা এবং সার সত্য শুনিবার আগ্রহটা খুবই প্রবল। মামুলী রাজনৈতিক নেতারা সাধারণত অদূরদর্শী হন, সে মানদণ্ডে মাপিলে কপিঞ্জলকে দূরদর্শী বলা চলে। গুণ তাঁহার আছে কিন্তু মহিমা নাই, লাবণ্য নাই, দ্যুতি নাই। সমস্তই যেন তাঁহার ওই জবড়জং চেহারার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। তাঁহার সহিত আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে, আলাপ করিবার সময় তাঁহার সসম্ভ্রম ব্যবহারও লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার ওৎ-পাতা-ভাবটা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। প্রত্যেকবারই মনে হইয়াছে তিনি আমার আলাপ হইতে কৌশলে কি যেন বাহির করিয়া লইতে চান। মোট কথা লোকটাকে ভদ্রলোক বলিয়া মনেই হয় না। কথাবার্তায় রসের অপেক্ষা কষই বেশী। শোভনতাও নাই। সুরূপিণী যে তাঁহার প্রেমাস্পদা এটা তিনি খুব সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত করিতে চান। কোন ভদ্রলোক এরূপ করিত না, গন্ধরাজ যে তাঁহাকে এতদিন ধরিয়া সহ্য করিতেছেন ইহার প্রতিদানে কোনও ভদ্রলোক তাঁহাকে এমনভাবে অপমান বা অবজ্ঞাও করিত না। কপিঞ্জল এত অভদ্র যে গন্ধরাজের নানারকম হাস্যকর নামকরণ করিয়া সেটা বাজারে চালু করিয়াছেন। ক্যাবলাকান্ত,

গন্ধ-গোকুল প্রভৃতি নাম লইয়া গর্জনগাঁওয়ের লোকেরা নিত্যই হাসা-হাসি করে। কপিঞ্জলের চরিত্রে এই ধরনের একটা গ্রাম্য চাষাড়ে ভাব বর্তমান, অথচ তাঁহার মনে মনে অহঙ্কারও খুব যে তিনি উচ্চকুলোদ্ভব একটা হোমরাচোমরা বুদ্ধিমান ব্যক্তি। গর্জনগাঁওয়ের রাজসভায় এই অসভ্য, কদর্য, স্বার্থপর জানোয়ারটা বিরাট দুঃস্বপ্নের মতো জাঁকাইয়া বসিয়া আছে।

ইহাও হয়তো সম্ভব যে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লোকটা মাঝে মাঝে কোমলও হইতে পারে। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি কোন প্রমাণ পাই নাই কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে এই কাষ্ঠপ্রতিম রাজনীতিবিদটি প্রয়োজন হইলে অনুগ্রহভিক্ষা করিবার জন্য যে কোনও লোকের কাছে যে কোনও ভাবে নিজেকে অবনত করিতে ইতস্তত করেন না। সম্ভবত এই জন্যই এখানে একটা গুজব প্রচলিত আছে যে গোপনে গোপনে কপিঞ্জল একটি খলিফা এবং খেলোয়াড় প্রেমিক। বিহার প্রদেশে চলিত কথায় যাহাকে 'লুচ্চা' বলে, তাহাই। সুরূপিণীর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কটা খুবই আশ্চর্যজনক। কপিঞ্জল গন্ধরাজের অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, চেহারাতেও ঢের বেশী কুৎসিত, নারীদের চিত্ত জয় করিতে হইলে যে সব গুণ দরকার তাহাও তাঁহার মধ্যে নাই অথচ ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই লোকটিই রাণীর সমস্ত চিত্ত এবং কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লোকচক্ষে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে। অসতী বলিয়া দুর্নাম হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাকে হেয় বলিতেছি তাহা নহে, অনেক রমণীর কাছে অসতীত্বটাই অলঙ্কার স্বরূপ। কিন্তু এই রাজসভায় আর একটি শিথিল-সুনাম মহিলাও আছেন। রাণী রঞ্জাবতী তাঁহার নাম, জানি না তিনি কোন্ অজ্ঞাতকুলশীল রাজার বিধবা অথবা সধবা পত্নী, তাঁহার যৌবনও বিগতপ্রায়, দেহে রূপের রশ্মিও ম্লান হইয়া আসিয়াছে কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি এই রাজসভায় প্রকাশ্যভাবে এবং অবিসংবাদিতরূপে কপিঞ্জলের রক্ষিতা উপপত্নীরূপে স্বীকৃতা। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম আসল পাপীয়সীকে আড়াল করিবার জন্যই বোধহয় এই মহিলাকে ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু রাণী রঞ্জাবতীর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়াই আমার এ ভ্রম দূর হইয়াছে। কাহারও কলঙ্ক ঢাকিবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি নাই কলঙ্কিনীর, কলঙ্ক ফলাও করিবার দিকেই তাঁহার ঝোঁক বেশী। তিনি যে ভাড়া-করা পরদামাত্র নহেন তাহাও বুঝিলাম যখন জানিলাম যে টাকা-কড়ি মান-সম্মান প্রতাপ-প্রতিপত্তি অর্থাৎ যে সব বখশিস এ ধরনের মেয়েদের প্রলুব্ধ বা ভূষিত করে—সে সব জিনিসের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র লোভ নাই। তিনি অনাচ্ছাদিত, নির্ভেজাল শয়তানী। গর্জনগাঁওয়ের রাজসভায় এই অনাবৃতা নগ্না প্রকৃতির সহিত আলাপ করিয়া আমার কিন্তু ভালোই লাগিয়াছিল।

সুরূপিণীর উপর কপিঞ্জলের প্রভাব সুতরাং সীমহীন। এই লোকটির স্তুতিতে বিগলিত হইয়া সুরূপিণী তাঁহার পবিত্র বিবাহ-বন্ধনকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, জনসাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন কিন্তু যাহা সর্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্যজনক যে নারীসুলভ ঈর্ষা নারীত্বের প্রধান লক্ষণ তাহাও যেন তাঁহার মধ্যে নির্বাপিত। যদিও তিনি একটা আহামরি সুন্দরী নন, তবুও তিনি যুবতী তো, তিনি পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল উভয় দিক দিয়া একজন অভিজাতবংশীয়া রাজকুমারীও, তিনি ওই আধা-বুড়ী, মায়ের বয়সী, নীচকুলোদ্ভবা রঞ্জাবতীর সদম্ভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—ইহা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। বাস্তবিকই ইহা একটি রহস্য। গুপ্ত প্রণয়ের অগ্নি ইন্ধন পাইলে শেষে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, বেশী দিন তাহা গুপ্ত

থাকে না। এই হতভাগিনী সুরূপিণীর মতিগতি এবং চরিত্র দেখিয়া মনে হয় উচ্ছন্নের শেষ সীমা পর্যন্ত যাইতে ইনি কুণ্ঠিত হইবেন না। সে সম্ভাবনাটা অন্তত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।'

।। সাত।।

পড়তে পড়তে গন্ধরাজের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। চোখের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ। শেষে তিনি আর পড়তে পারলেন না—ঠেলে সরিয়ে দিলেন খাতাখানা। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"এ লোকটা দেখছি শয়তান"—বলে উঠলেন তিনি—"এ লেখার যেমন ভাব তেমনি ভাষা। নানারকম কেচ্ছা সংগ্রহ করে বই লিখেছে! আশ্চর্য! কোথায় একে রেখেছেন মহাধ্যক্ষ মশাই?"

"আমাদের পতাকা-বুরুজে রাখা হয়েছে ওঁকে"—উত্তর দিলেন কুজ্ঝটিকুমার—"ধীমান-মহলে আছেন উনি।"

"আমাকে নিয়ে চলুন সেখানে"—গন্ধরাজ বললেন,—তারপর আর একটা কথা মনে হওয়াতে প্রশ্ন করলেন—"এইজন্যেই কি বাগানে প্রহরীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে?"

"তা তো আমার জানা নেই। প্রহরীরা কোথায় থাকবে তা ঠিক করা তো আমার কর্তব্য নয় মহারাজ।"

গন্ধরাজ সক্রোধে তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দীবর তাঁর বাহুতে মৃদু স্পর্শ করায়, কিছু আর বললেন না।

"বুঝলাম। এখন নিয়ে চলুন আমাকে পতাকা-বুরুজে।"

মহাধ্যক্ষ প্রস্তুত হলেন সঙ্গে সঙ্গে। একটু পরেই বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। গ্রন্থাগার থেকে পতাকা-বুরুজ নিতান্ত কাছে নয়, পথও জটিল। রাজপ্রাসাদের যে অংশ সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে গ্রন্থাগারটি তাতেই অবস্থিত; কিন্তু পতাকা-বুরুজ—যার উপরে গর্জনগাঁওয়ের পতাকা ওড়ে—পুরাতন প্রাসাদের সমুচ্চ প্রাকার সংলগ্ন, বাগানের ঠিক ওপরে। নানাপ্রকার সিঁড়ি আর বারান্দা অতিক্রম করে তাঁরা অবশেষে একটা বাঁধানো প্রাঙ্গণের মতো জায়গায় এসে পড়লেন। তার একধারে একটা উঁচু পাথরের জাফরি-দেওয়া দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বাগানের শোভা দেখা যাচ্ছিল, বিশেষ করে সবুজ শোভা। ত্রিকোণ প্রাচীর সমন্বিত বড় বড় অট্টালিকার শ্রেণী ধাপে ধাপে উঠে গেছে চারিদিকে, আর পতাকা-বুরুজ সর্বোচ্চ শিখরে নীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গর্বভরে। বুরুজের উপর বাসা তৈরি করছিল দাঁড়কাকেরা আর তাদের বাসার উপরে উড়ছিল গর্জনগাঁওয়ের পতাকা। বুরুজের সিঁড়ির নীচে একজন প্রহরী ছিল। সে সামরিক রীতিতে অভিবাদন জানাল। আর একটু উঠে দ্বিতীয় প্রহরীর দেখা পাওয়া গেল। আর একটু উঠে তৃতীয় প্রহরীর।

"এই মাটির ঢেলাটাকে দেখছি রত্নের মর্যাদা দিয়ে রক্ষা করা হচ্ছে"—একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন গন্ধরাজ।

ধীমান-মহলের একটু ইতিহাস আছে। বিখ্যাত স্থপতি ধীমানের কোনও বংশধর এটি নাকি নির্মাণ করেছিলেন গন্ধরাজের প্রপিতামহের আমলে এবং এটির নামকরণও তিনি করেছিলেন

তাঁর বিখ্যাত পূর্বপুরুষের নামানুসারে। ধীমান-মহলের ঘরগুলি বেশ বড় বড়। প্রচুর আলো-বাতাস। প্রত্যেক ঘর থেকেই বাগানের শোভা দেখা যায়। কিন্তু দেওয়ালগুলি খুব চওড়া (সেকালে এইরকমই রীতি ছিল) আর জানলাগুলিতে মোটা মোটা গরাদ লাগানো। কুজ্‌ঝটিকুমার প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছিলেন গন্ধরাজের পিছু পিছু, গন্ধরাজের গতিবেগের সঙ্গে তাল রাখতে পারছিলেন না তিনি। গন্ধরাজ দ্রুতপদে পাঠাগারের এবং বিরামকক্ষের ভিতর দিয়ে গিয়ে একেবারে অশনিপাতের মতো ঢুকলেন গিয়ে শয়নকক্ষে। ভগীরথ শর্মা স্নান সেরে গা মুছছিলেন। ভগীরথ শর্মার বয়স যদিও পঞ্চাশ, কিন্তু তিনি বেশ শক্তসমর্থ। চোখে মুখে সাহসের এবং আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তিও সুপরিস্ফুট। এই আকস্মিক আবির্ভাবে বিশেষ বিচলিত হলেন না তিনি, বরং একটু যেন ব্যঙ্গভরেই অভিবাদন করে বললেন—"ও আপনি! এই আকস্মিক সম্মানবর্ষণের হেতু কি মহারাজ?"

"আপনি আমার অতিথি, আমি দু'হাত বাড়িয়ে আপনাকে সম্বর্ধনা করেছি, আপনি আমার অন্ন খেয়েছেন, আমার বাড়িতে সম্মানিত অতিথির মর্যাদায় স্থান পেয়েছেন। আমার আতিথ্যে কোনও ত্রুটি ছিল কি? সম্মানিত অতিথির কোনও অনুরোধ পালনে বিলম্ব ঘটেছিল কি? আপনি তার চমৎকার প্রতিদানও দিয়েছেন। এই যে—"

তিনি পাণ্ডুলিপিটি তুলে দেখালেন।

"মহারাজ কি ওটি পড়েছেন? খুবই আনন্দিত এবং সম্মানিত হলাম। কিন্তু ওটা খসড়া মাত্র, অনেক ত্রুটি আছে ওতে। আরও অনেক কিছু লিখতেও হবে। একথাটা অন্তত লিখতেই হবে যে মহারাজকে আমি অলস বলে সমালোচনা করেছি তিনি আরক্ষী হিসাবে খুবই সতর্ক এবং কর্তব্যবোধে অপ্রিয় ঘৃণ্য কাজ করতেও পরাঙ্মুখ হন না। একথাটা আমাকে লিখতেই হবে। আমাকে বন্দী করার যে প্রহসনটা হয়ে গেল আর আপনি যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দর্শন দিয়ে আমাকে সম্মানিত করলেন—এসবও লিখব আমি। যে বঙ্গরাজ প্রসন্নপল্লবের পরিচয়পত্র নিয়ে আপনার রাজ্যে আমি প্রবেশ করেছিলাম তাঁকে আমি খবর পাঠিয়েছি আপনি আমার সঙ্গে কেমন সদ্ব্যবহার করেছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি আমাকে হত্যা না করেন, তাহলে আমি আপনার কারাগার থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই মুক্তি পাব, তা সেটা আপনাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক। কারণ আমার ধারণা ভবিষ্যৎ গর্জনগাঁও সাম্রাজ্যের শক্তি এখনও তেমন প্রবল হয়নি যে সে সমরাঙ্গনে বঙ্গরাজের সম্মুখীন হতে পারে। আমি মনে করি আমাদের শোধবোধ হয়ে গেছে। আপনাকে কোনরকম জবাবদিহি দিতেও আমি বাধ্য নই। আপনিই ভুল করছেন। আমি ওই খাতায় যা লিখেছি তার মধ্যে সত্যিই যদি প্রবেশ করতে পেরে থাকেন তাহলে আপনারই উচিত আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। আমি আপনার চোখ খুলে দিয়েছি। আমি এইমাত্র স্নান সমাপন করেছি, এখনও কাপড়চোপড় পরা হয়নি, সেজন্য অনুরোধ করছি আপনি এখন বাইরে যান—"

ঘরে একটা টেবিল ছিল আর তার উপর শাদা কাগজও ছিল কিছু। গন্ধরাজ একটা আসন টেনে উপবেশন করে একটা কাগজে ভগীরথ শর্মার ছাড়-পত্র লিখে ফেললেন খস্‌খস্ করে। তারপর মহাধ্যক্ষের দিকে চেয়ে বললেন—" এটাতে মোহর দিয়ে দিন।"

কুজ্‌ঝটিকুমারের হাতে একটি লাল রঙের থলি ছিল। তিনি তার থেকে টিকিটের মতো কি একটা বার করে সেঁটে দিলেন কাগজে। তাঁর বিচলিত মূর্তি এবং বেকুবের মতো হাবভাব

সত্যই যেন প্রহসন করে তুলল ব্যাপারটাকে। ভগীরথ শর্মা তির্যক দৃষ্টিতে নীরবে উপভোগ করতে লাগলেন দৃশ্যটা। কুজ্‌ঝটিকুমারের আনুগত্যের এই অনাবশ্যক আতিশয্যে গন্ধরাজের কানের ডগা লাল হয়ে উঠল, কিন্তু তখন রাগটা হজম করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। মহাধ্যক্ষ মশায় অবশেষে কার্যটি সমাধা করলেন এবং আদেশের অপেক্ষা না রেখে সইও করে দিলেন।

গন্ধরাজ বললেন—"আপনি এবার আমার একটি ভালো গাড়ি ঠিক করবার ব্যবস্থা করুন। আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গাড়িতে ভগীরথ শর্মার জিনিসপত্রগুলো তুলিয়ে দিন। গাড়িটা যেন ময়ূরমহলের সামনে অপেক্ষা করে। ভগীরথ শর্মা আজই বঙ্গদেশে ফিরে যাবেন।"

মহাধ্যক্ষ সাড়ম্বরে অভিবাদন করে বিদায় নিলেন।

"এই আপনার ছাড়-পত্র"—ভগীরথ শর্মার দিকে চেয়ে গন্ধরাজ বললেন—"আপনার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করা হয়েছিল বলে আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

"বেশ, বঙ্গরাজের সঙ্গে আপনাদের আর যুদ্ধ হবে না।"

"না মশাই, অত সহজে আপনাকে রেহাই দেব না। শিষ্টাচারের দাবি আপনাকে মানতে হবে। এখন আপনি আর বন্দী নন। আপনি আমি দুজনেই এখন সমান। আমি আপনাকে বন্দী করবার আদেশ দিইনি। কাল অনেক রাত্রে আমি শিকার থেকে ফিরেছি। আপনাকে বন্দী করবার জন্যে দোষ দিতে পারবেন না, বরং যদি ইচ্ছে করেন মুক্তি দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ দিতে পারেন।"

"কিন্তু আপনি আমার কাগজপত্রগুলো তো পড়েছেন—"

"সেটা আমার অন্যায় হয়েছে। তার জন্যে আমিও ক্ষমাও চাইছি। আপনি তো জানেনই আমি দুর্বলচিত্ত, দুর্বলকে ক্ষমা করাই মহতের ধর্ম। আপনার কাগজপত্রও ইচ্ছে করে পড়িনি—অপ্রত্যাশিতভাবে আমার হাতে এসে গেছে। আপনি যা লিখেছেন তা যদি নির্দোষ গ্লানিহীন হত—তাহলে আমি যা করেছি তাকে বড় জোর আপনি অবিমৃষ্যকারিতা বলতে পারতেন। কিন্তু আপনি যা লিখেছেন তা আমার আত্মসম্মানকে আঘাত করেছে।"

ভগীরথ শর্মার চোখের দৃষ্টিতে একটা হাসির ঝলক ফুটে উঠল। তিনি কিছু না বলে অভিবাদন করলেন শুধু।

গন্ধরাজ বলতে লাগলেন—"আপনি এখন স্বাধীন, আপনাকে এখন আমি একটা অনুরোধ করতে চাই। আমার অনুরোধ আপনি আমার সঙ্গে একা ওই বাগানে চলুন।"

"মহারাজ যে মুহূর্তে আমার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছেন"—ভগীরথ শর্মা সসম্ভ্রমে বললেন—"সেই মুহূর্ত থেকে আমি মহারাজের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত। আমি এইমাত্র স্নান সেরে উঠেছি, এখনও পোশাক পরিনি। তবু যদি আপনি আদেশ করেন, এই ভাবেই আমি আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছি।"

"অনেক ধন্যবাদ। আসুন তাহলে।"

অবিলম্বে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। গন্ধরাজ আগে আগে যেতে লাগলেন, ভগীরথ পিছু পিছু। বুরুজের সিঁড়ি ভাঙবার সময় তাঁদের পদশব্দে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বুরুজের গম্বুজ। সিঁড়ি থেকে নেমে সেই জাফরি-কাটা দেওয়াল পেরিয়ে তাঁরা এসে পড়লেন বাগানের

উন্মুক্ত বাতাসে। রৌদ্রকিরণে ঝলমল করছিল চতুর্দিক, শোভা বিকীর্ণ করছিল ফুলের দল। তারপর মীন-দীঘির পাশ দিয়ে দিয়ে যেতে লাগলেন তাঁরা। ছোট ছোট চিতল মাছ এবং আরও নানারকম মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল জল থেকে। সে-ও এক অপূর্ব দৃশ্য। তারপর তাঁরা আবার সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। সিঁড়ির চারদিকে মরসুমী ফুলের ঝাঁক, আশেপাশে পাখিরা গান ধরেছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে গন্ধরাজ থামলেন। সেখানে একটি ছোট দ্বার ছিল। সেই দ্বার দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটি সবুজ সমতল মাঠের আভাস। শ্বেতপাথরের তৈরী আসনও দেখা যাচ্ছিল কয়েকটি। এই সমতল মাঠে দাঁড়ালে নীচে সারি সারি অনেক গাছের শীর্ষভাগ দেখা যায়, আর তারও ওপারে দেখা যায় প্রাসাদশীর্ষে গর্জনগাঁওয়ের পীতবর্ণ পতাকা নীল আকাশে উড়ছে। সেই মাঠে ঢুকলেন তাঁরা।

"বসুন।"

একটি শ্বেতপাথরের আসন দেখিয়ে গন্ধরাজ বললেন। কোনও কথা না বলে বসে পড়লেন ভগীরথ শর্মা। গন্ধরাজ বসলেন না, তিনি তাঁর সামনে পায়চারি করতে লাগলেন, রাগে তাঁর ভিতরটা জ্বলছিল। পাখিদের অজস্র কাকলীও তাঁর কানে ঢুকছিল না।

"দেখুন"—অবশেষে ভগীরথের দিকে ফিরে গন্ধরাজ বললেন—"বঙ্গরাজের পরিচয়পত্রের কথা বাদ দিলে আপনি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুক। আপনার মতিগতি আপনার চরিত্র আমি কিছুই জানি না। আমি জ্ঞানত কখনও আপনার কোন বিরুদ্ধাচরণ করিনি। আমাদের দুজনের মধ্যে যে সামাজিক ব্যবধান আছে সে কথাও আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না। আপনি আমাকে একজন সাধারণ ভদ্রলোক হিসাবেই গণ্য করুন এখন। আমি আপনার পাণ্ডুলিপিটি আপনার বিনা অনুমতিতে পড়ে অন্যায় করেছি। কৌতূহলবশেই আমি ও কাজ করেছিলাম। স্বীকার করছি এ কৌতূহল অশোভন, কিন্তু ওই পাণ্ডুলিপিতে আপনি যা লিখেছেন তা শুধু মিথ্যাই নয়, তা ভীরুতার পরিচায়ক। আপনার পাণ্ডুলিপি খুলে আমি দেখলাম—আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন তা সব মিথ্যা"—উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন গন্ধরাজ—"হ্যাঁ মিথ্যা। ভগবান জানেন ওতে সত্যের লেশমাত্র নেই। আপনি ওর বাবার বয়সী, আপনি একজন ভদ্রলোক, শুনেছি আপনি বিদ্বান—আপনি ওই সব মিথ্যা কথার জঞ্জাল একত্র করে তা প্রচার করতে উদ্যত হয়েছেন? শুনেছি আপনি যোদ্ধাও, যোদ্ধারা নারীদের সম্মান করে। এই কি তার প্রমাণ? কিন্তু ভুলে যাবেন না, ওর স্বামী এখনও জীবিত আছে। আপনি আপনার পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন যে আমি অসিযুদ্ধে তেমন পারদর্শী নই। আপনাকে অনুরোধ করছি আমাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিন। পাশেই ওই একটা নির্জন স্থান আছে, কিছু দূরেই ময়ূরমহল, সেখানে আপনার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে। অসিযুদ্ধে আপনি যদি আমাকে মেরেও ফেলেন, কেউ তা জানতে পারবে না। আপনি তো নিজেই লিখেছেন আমার প্রজারা আমার বিশেষ খোঁজখবর রাখে না। মাঝে মাঝে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়াও আমার স্বভাব। আমার অনুপস্থিতি কেউ লক্ষ্য করবে না। যখন লক্ষ্য করবে তখন আপনি আমাদের রাজ্যের সীমানা নিরাপদে পেরিয়ে গেছেন। আসুন।"

ভগীরথ শর্মা বললেন, "মহারাজ, আপনি যা বলছেন তা অসম্ভব।"

"আমি যদি আপনাকে আঘাত করি?"

"সেটা ভীরুর মতো আঘাত হবে। কারণ আমি প্রত্যাঘাত করতে পারব না। কোন স্বাধীন রাজ্যের মহারাজার বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"অথচ আপনি সেই মহারাজকে অনায়াসে অপমান করেছেন তো।"

"ক্ষমা করুন"—সবিনয়ে উত্তর দিলেন ভগীরথ শর্মা—"আমার প্রতি অবিচার করবেন না। আপনি মহারাজা, আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারি না, কিন্তু আপনি মহারাজা বলেই আপনার আচরণের এবং আপনার মহারাণীর সমালোচনা করবার ন্যায্য অধিকার আমার আছে। আপনার সপক্ষে আপনার আইন আছে, সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী আছে, গুপ্তচরদের তীক্ষ্ণ চক্ষু আছে, কিন্তু আমাদের একটি মাত্র অস্ত্রই ভরসা—সেটি হচ্ছে সত্য।"

"সত্য!"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন গন্ধরাজ।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কাটল।

"মহারাজ"—ভগীরথ শর্মাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন—"আপনি আমড়া গাছে আম প্রত্যাশা করবেন না। আমি বৃদ্ধ এবং স্বভাবতই নিন্দুক। আমাকে কেউ গ্রাহ্য করে না, আমিও কাউকে করি না। কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর বুঝেছি যে আপনার চেয়ে ভালো লোক আমি এ যাবৎ দেখিনি। আপনার সম্বন্ধে আমার মত বদলে গেছে এবং যা সাধারণত কেউ করে না তাই করছি, অর্থাৎ অসঙ্কোচে সেটা স্বীকার করছি আপনার কাছে। আপনার সামনেই ওই পাণ্ডুলিপি আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব। যা লিখেছিলাম সেজন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, মহারাণীর কাছেও চাইছি। আমি আপনার কাছে শপথ করছি, এ বৃদ্ধের কথায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, আমি আপনার কাছে শপথ করছি আমার বই যখন বেরুবে তখন তাতে গর্জনগাঁওয়ের নাম পর্যন্ত থাকবে না। যদিও আমার বইয়ের ও অধ্যায়টা একটা জবর অধ্যায় ছিল, তবু ওটাকে বাদ দিয়ে দেব। মহারাজ পাণ্ডুলিপির অন্যান্য অধ্যায়গুলো যদি পড়তেন! আমি শকুনি—গলিত মাংস খেয়ে বেড়াই। অভাবও হয় না, সমস্ত পৃথিবীটাই তো ভাগাড়, সেটা কি আমার দোষ মহারাজ?"

"আপনার চোখের দৃষ্টি একটু বেশী বাঁকা নয় তো!"

"হ্যাঁ, হতে পারে। আমি কবি নই, আমি ছোঁক ছোঁক করে পচা গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াই। আশা আছে ভবিষ্যতে হয়তো এ পৃথিবী স্বর্গরাজ্য হবে, কিন্তু এখন যে পৃথিবীকে দেখছি তার উপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তাই আমি পচা ডিমের গান গেয়ে বেড়াই। কিন্তু মহারাজ ফুল দেখলে আমি চিনতে পারি। আপনার সঙ্গে এই পরিচয়ের স্মৃতি আমার জীবনে মূল্যবান স্মৃতি হয়ে থাকবে। আজ সত্যিই এমন একজন রাজার দর্শন পেলাম যাঁর মধ্যে মনুষ্যোচিত গুণ কিছু আছে। আমিও এককালে রাজসভায় ছিলাম, আমি একজন বিদ্রোহী সংস্কারকও, আমি আজ অন্তর থেকে আপনাকে সাধুবাদ করছি। আপনি যদি আমাকে হস্তচুম্বন করতে দেন, আমি অনুগৃহীত হব।"

"আরে হস্তচুম্বন কেন! আসুন আপনাকে আলিঙ্গন করি—"

দু'হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরলেন তিনি ভগীরথকে। তারপর বললেন, "ময়ূরমহলের কাছেই আমার গাড়ি আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ওই গাড়িতে চড়েই আপনি চলে যান এবার। আশা করি আমার এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করবেন না। আপনি বঙ্গরাজ্যে নির্বিঘ্নে পৌঁছে যান ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।"

"উৎসাহের চোটে আপনি একটা কথা ভুলে গেছেন মহারাজ। আমি এই সবে স্নান করে উঠেছি। এখনও কিছু খাইনি।"

"ওহো, ঠিক তো! বেশ তাহলে আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে থাকুন। কিন্তু একটা ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক করে দিই। এখানে আপনার বন্ধুর চেয়ে আপনার শত্রুরা বেশী প্রবল। মহারাজ অবশ্যই আপনার সপক্ষে আছেন, তাঁর সদিচ্ছার কোনও অভাব নেই—কিন্তু আপনি তো আমার চেয়েও ভালো জানেন এখানকার হালচাল। এখন মহারাজই গর্জনগাঁওয়ের একমাত্র হর্তাকর্তা-বিধাতা নন।"

"কিন্তু তবু আপনি মহারাজ এখনও। কপিঞ্জল চট করে কিছু করেন না, যা করেন রয়ে সয়ে ভেবেচিন্তে করেন। তাঁর কাজকর্ম সব অন্ধকারে গোপনে গোপনে। আলোয় আসতে ভয় পান তিনি। আর আপনার এখন যে পরিচয় পেলুম তাতে আমার ভয়ও ভেঙে গেছে। হয়তো আপনিই জয়ী হবেন শেষ পর্যন্ত—"

"বলেন কি! আপনার কথায় মনে বল পেলাম।"

"আমি আর ও ধরনেব লেখা লিখব না। লোককে চেনবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন। একটা লাফ দেওয়া আর সমস্ত দিন একটানা ছুটে বেড়ানোতে তফাত আছে। আপনার চেহারা দেখে কিন্তু খুব ভরসাও হয় না আমার। আপনার ওই ছোট নাক, ওই চুল আর চোখের ওই নানা রঙের দৃষ্টি থেকে মনে হয় না যে আপনি একটানা কিছু করতে পারবেন। আপনি কবি, গদি আঁকড়ে থাকবার মতো ইতর মনোভাব আপনার নেই—"

"আমি তাহলে থিয়েটারের সখী মাত্র নই?"

"না মহারাজ। আমি যা লিখেছিলাম তার জন্যে আমি লজ্জিত। ওকথা আর আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। আমি দুর্মুখও নই, চাণক্যও নই, আমি অক্ষম চিত্রকর মাত্র। যা আঁকি প্রায়ই তা ঠিক হয় না। ও পাণ্ডুলিপি আপনি পুড়িয়ে ফেললে আমি বাধিত হব।"

।। আট।।

খুব খুশী হয়ে এরপর গন্ধরাজ মহারাণী সুরূপিণীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পা বাড়ালেন। অনুভব করলেন এ কাজটা আরও শক্ত। নিয়ম অনুসারে সোজা গিয়ে তাঁর কক্ষে ঢোকা যাবে না, পাশের ঘরে গিয়ে তাঁর সহচরী মারফত 'এত্তেলা' দিতে হবে আগে। রাজকীয় নিয়ম আর কেউ পালন না করুক রাজাকে করতেই হবে। তিনি যাওয়ামাত্র পরদা উঠে গেল এবং প্রতিহারী তাঁর নাম ঘোষণা করল। ভঙ্গীভরে সাড়ম্বরে প্রবেশ করলেন গন্ধরাজ। দেখলেন ঘরে অনেকে অপেক্ষা করছে। বেশীর ভাগই মহিলা। গর্জনগাঁওয়ের মহিলা-মহলে গন্ধরাজের খুব খাতির। একজন মহিলা রাণীকে খবর দেওয়ার জন্য পাশের ঘরে চলে গেল। গন্ধরাজ নমস্কার বিনিময় করতে করতে এগিয়ে গেলেন অন্য মহিলাদের দিকে। হাসিমুখে প্রত্যেককেই তুষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগলেন আন্তরিকতার দ্যুতি বিকীর্ণ করতে করতে। এই যদি তাঁর একমাত্র কর্তব্য হত তাহলে তিনি আদর্শ নৃপতি বলে নিশ্চয়ই গণ্য হতেন। মহিলার পর মহিলা তাঁর সুমিষ্ট আলাপে বিগলিত হতে লাগলেন।

একজনকে বললেন, "কি কাণ্ড বলুন তো। আপনার বয়স বাড়ছে, না কমছে? রোজই যেন আপনাকে আগের চেয়ে বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"আপনার রঙ্ কিন্তু তামাটে হয়ে যাচ্ছে, মহারাজ। না, এ বিষয়ে আমার একটু অহঙ্কার আছে, আমাদের দুজনেরই গায়ের রঙ্ আগে একরকম ছিল। আমি সে রঙটা বজায় রাখবার চেষ্টা করেছি, মহারাজ কিন্তু রোদে রোদে ঘুরে কালো হয়ে যাচ্ছেন—"

"শুধু কালো নয়, কাফ্রীর মতো কালো। সুন্দরীদের ক্রীতদাস হতে হলে ওই রঙই তো মানানসই। গভীরা দেবী, আমাদের অভিনয় আবার কবে হবে? এইমাত্র একজনের কাছে শুনলাম যে আমি নাকি অত্যন্ত বাজে অভিনেতা।"

"ওমা,"—গভীরা দেবী বলে উঠলেন—"কোন্ গাড়োল একথা বলতে সাহস করেছে—"

"গাড়োল নয়, চমৎকার লোক, বিচক্ষণ ব্যক্তি।"

"হতেই পারে না। মহারাজ গন্ধর্বদের মতো অভিনয় করেন।"

"মানছি, তোমার কথা ঠিক। মিথ্যাকথা এমন মনোরমভাবে আর কে বলতে পারে? কিন্তু যে ভদ্রলোকটির কথা বলছি তিনি বোধহয় আমাকে মানুষের মতো অভিনয় করতে দেখলে বেশী খুশী হতেন। গন্ধর্ব টন্ধর্ব তাঁর পছন্দ নয়।"

এ কথায় হাসির একটা গুঞ্জন উঠল। গন্ধরাজ ময়ূরের মতো তাঁর পেখম বিস্তার করলেন। নারী-সঙ্গ-মধুর এই সহৃদয় পরিবেশ গন্ধরাজের বড় প্রিয়।

"অঞ্জনা দেবী, আপনার খোঁপাটি তো চমৎকার সাজিয়েছেন দেখছি।"

"হ্যাঁ, সবাই তাই বলছে"—একজন মন্তব্য করলেন।

"আপনার যে ভালো লেগেছে তাতেই আমি খুশী—"

অঞ্জনা দেবী ভঙ্গীভরে অভিবাদন করলেন গন্ধরাজকে। সঙ্গে সঙ্গে কটাক্ষের একটা বিজলীচমকও খেলে গেল তাঁর চোখ দুটিতে।

"সত্যিই চমৎকার। কাশ্মীর আমদানী? না, মিথিলার? এই কি আধুনিক ধরন?"

"একেবারে আনকোরা আধুনিক। মহারাজা আসবেন বলেই আজ এভাবে সেজেছি। সকালে উঠেই কেমন যেন আনন্দের জোয়ার লাগল মনে। আপনার আগমনের পূর্বাভাস। এমন করে আমাদের ছেড়ে চলে যান কেন মহারাজ—এ ভারী অন্যায় কিন্তু—"

"ফিরে আসার আনন্দলাভ করবার জন্যে। আমার স্বভাব অনেকটা কুকুরের মতো। খাওয়ার হাড়টাকে পুঁতে রেখে যাই, তারপর ফিরে এসে আবার সেটাকে খুঁড়ে আবিষ্কার করে আনন্দ পাই।"

"হাড়! এ কি উপমার ছিরি। বনে বনে ঘুরে বন্যস্বভাব হয়ে গেছে মহারাজের—আশা করি আমার স্পষ্ট কথায় রাগ করবেন না।"

"অনুরাগের অণুটুকু যে পর্বত-প্রমাণ। তা সরিয়ে ফেলবার সামর্থ্য কোথায়! তবে জেনে রাখুন, কুকুররা ওই করে। ওই তাদের প্রিয় কাজ। আরে, শ্রীমতী রঞ্জাবতীও রয়েছেন দেখছি—"

গন্ধরাজ ভিড় সরিয়ে অলিন্দের কাছে বাতায়নবর্তিনী মহিলাটির দিকে অগ্রসর হলেন।

রঞ্জাবতী এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি। একটু যেন বিমর্ষই বোধ হচ্ছিল তাঁকে। গন্ধরাজকে আসতে দেখে তাঁর চোখে আলো ফুটল। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটি, অনেকটা যেন

পরী-পরী ভাব, মনে হয় এখনি বুঝি উড়ে চলে যাবে। তাঁর সুন্দর মুখখানি উদ্দীপ্ত হয়ে আরও সুন্দর হয়ে উঠল, মৃদু হাসি চিকমিক করে উঠল চোখে মুখে ঠোঁটে গালে। গায়িকা হিসাবেও তাঁর সুনাম খুব। কথা বলবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর নানা গ্রামে ওঠা-নামা করে, উদারা থেকে তারা পর্যন্ত যে কোনও পর্দায়। যখন চুপি চুপি কথা বলেন তখনও সঙ্গীতের মৃদু গমক শোনা যায়, যখন জোরে কথা বলেন বা হাসেন তখন তো সে সঙ্গীত ঝরনার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বহুমূল্য রত্ন একটি, নানা রঙের লীলা তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে। ছলনাময়ীও, নিজের রূপকে লুকিয়ে রাখতে জানেন, তারপর সহসা ক্ষণিক সোহাগের অভিনয়ে সেটাকে শাণিত তরবারির মতো আস্ফালন করে অভিভূতও করে দিতে পারেন দর্শককে। দেখতে সাধারণ একটি ছিপছিপে রূপসী মেয়ে, কিন্তু পরমুহূর্তেই ফুলের মতো রূপে রসে গন্ধ বিকশিত হয়ে মনোহারিণী হয়ে উঠতে পারেন রঞ্জাবতী। অবাঞ্ছিত প্রণয়ভিক্ষুদের জন্য একটি ছোরাও লুকিয়ে রাখেন তিনি সর্বদা। গন্ধরাজের দিকে একটি হাস্য-দীপ্ত শর নিক্ষেপ করে তিনি বললেন, "যাক্ অবশেষে আমার কাছে এলেন আপনি মহারাজ! জানি প্রজাপতিকে পোষা যায় না তবু—যাক্— আপনার হস্ত-চুম্বনের অনুমতি পাবো তো?"

"আমিই তোমার হস্ত-চুম্বন করব রঞ্জাবতী।"

গন্ধরাজ অভিবাদন করে এগিয়ে গেলেন এবং রঞ্জাবতীর হস্ত চুম্বন করলেন।

"আমার একটি আবদারও আপনি রাখেন না।"

"রাজসভার খবর কি বল? তোমার কাছেই তো সব খবর পাই বরাবর।"

"পচা-ডোবার আবার খবর কি! সব নিঝ্ঝুম, সব ঘুমে ঢুলু-ঢুলু। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে সবাই ঘুমুচ্ছে। জাগরণের কোথাও কোনও সাড়া তো পাই না, কোথাও কোনও উত্তেজনা নেই। সেই কতকাল আগে আমার শিক্ষয়িত্রী আমার কান মুলে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে উত্তেজনা-জনক আর তো কিছু ঘটেনি। কিন্তু না, নিজের প্রতি আর আপনার ওই জাদুমন্ত্রমুগ্ধ ভাগ্যহত রাজপ্রাসাদের প্রতি কিছু অবিচার করলাম বোধহয়। বলছি সব—কিন্তু এই শেষ, মনে রাখবেন সেটা—"

মুখের কাছে রঙীন পাখাটি তুলে ধরে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে নিপুণ বর্ণনা-কুশলতায় সব বলে গেলেন তিনি। অন্য মহিলারা এ দেখে দূরে সরে গেলেন একটু। কারণ সবাই জানেন যে রঞ্জাবতীর সঙ্গে গন্ধরাজের সম্পর্ক বেশ একটু ঘনিষ্ঠ। কাছেপিঠে থাকাটা শোভন নয়। তবু রঞ্জাবতী গলার স্বর বেশ একটু খাটো করে চুপি চুপি বলতে লাগলেন সব, জানলার ধারে গন্ধরাজের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

গন্ধরাজ হেসে বললেন—" একটা কথা বোধহয় তুমি জান না। তোমার মতো মনোরমা নারী পৃথিবীতে আর নেই।"

"সত্যি? এত বড় আবিষ্কার করে ফেলেছেন আপনি?"

"হ্যাঁ। বয়স যতই বাড়ছে ততই সত্যকে স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি।"

"বয়স? বয়স তো বিশ্বাসঘাতক! আপনি বয়সে বিশ্বাস করেন? দিন মাস সন তারিখ ও সব তো মিথ্যা মায়া।"

"হয়তো তাই। তোমার সঙ্গে আমার ছ'বছর ধরে বন্ধুত্ব। কিন্তু বয়সের ছাপ তো তোমার উপর পড়েনি। তোমার তারুণ্য আরও অম্লান। তুমি যেন নিত্য নূতন হচ্ছ।"

"এটা কিন্তু চাটুবাক্য হল মহারাজ"—তারপর হঠাৎ সুর বদলে—"না, চাটুবাক্য কেন, আমি নিজেও তো তাই মনে করি। এক সপ্তাহ আগে আমি আমার পরীক্ষকের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার পরীক্ষক কে জানেন তো? আয়না। পরীক্ষক বললে—'না, এখনও দেরি আছে।' প্রতিমাসে একবার করে আমি পরীক্ষকের সামনে দাঁড়াই। দুরু দুরু বক্ষে বিস্ফারিত চক্ষে। যেদিন আয়না বলবে—'আর নয়। এইবার সময় হয়েছে'—জানি না সেদিন আমি কি করব।"

"আন্দাজ করতে পারছি না"—ইতস্তত করে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ।

"আমিও পারছি না। কত কি করতে পারি। আত্মহত্যা, জুয়া খেলা, সন্ন্যাসিনী হয়ে যাওয়া, আত্মজীবনী লেখা, কিংবা রাজনীতির সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া—"

"ওটা বড় বাজে জিনিস। ওতে কি তোমার মন ভরবে?"

"না, খুব বাজে নয়। ওটা আমার ভালোই লাগে। রাজনীতি পরচর্চারই বড় দাদা। পরচর্চার মতো মনরোচক আর কি আছে বলুন। ধরুন যদি আপনাকে বলি মহারাণী সুরূপিণী প্রত্যহ কপিঞ্জলের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে যান কামান পরিদর্শন করতে—তাহলে এটাকে কি বলবেন রাজনীতি, না পরচর্চা? নির্ভর করবে কেমন করে কি ভাষায় বললাম তার উপর। ঘটনাগুলোকে কমিয়ে বাড়িয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে বাঁকিয়ে চুরিয়ে ছেঁটে কেটে রূপান্তরিত করবার যে শিল্প-কৌশল, তার জাদুকরী হবার ক্ষমতা আমার আছে। আপনার অনুপস্থিতিতে রোজই তারা একসঙ্গে সর্বত্র বেড়িয়েছে—"

গন্ধরাজের মুখে ছায়া নামল, কিন্তু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন রঞ্জাবতী।

"এ খবরটা জল্পনা-জগতের ছোট্ট কাদাখোঁচা একটা, কিন্তু যদি বলি তারা যেখানেই গেছে সেখানেই প্রজারা জয়ধ্বনি করেছে—অমনি কাদাখোঁচা ময়ূর হয়ে যাবে। তখন দামী রাজনৈতিক খবর হবে এটা—"

"প্রসঙ্গ বদলাও। ভালো লাগছে না ওসব কথা।"

"আমিও তাই ভাবছিলুম। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছেড়ে রাজনীতিই আলোচনা করা যাক। জানেন? এই যুদ্ধটা এত জনপ্রিয় হয়েছে যে মহারাণী যেখানেই যান সেখানেই জয়ধ্বনিতে আকাশ গমগম করে।"

"হয়তো করে। সবই সম্ভব। হয়তো যুদ্ধই হবে, কিন্তু বিশ্বাস কর কার সঙ্গে হবে কেন হবে তা আমি অন্তত জানি না।"

"অথচ আপনি এটা সহ্য করছেন। আমি নীতি-টিতির ধার ধারি না মহারাজ, আমি অকপটে স্বীকার করছি ভীরু ভেড়ার চেয়ে হিংস্র বাঘকে আমি বেশী ভালোবাসি। দোহাই আপনার, ওই ভেড়া-ভাব পরিত্যাগ করুন। আমাদের অনুভব করতে দিন যে সত্যিই রাজার মতন রাজা আছেন আমাদের। মেয়েলীপনা মোটেই ভালো লাগছে না।"

"রঞ্জাবতী, আমার ধারণা ছিল তুমি ওদের দলের।"

"মহারাজ, আপনার যদি দল থাকত তাহলে আপনার দলেই থাকতাম আমি। আপনার কি কোন উৎসাহ নেই? ইতিহাসে চাণক্যের কথা পড়েছি, তিনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাট করেছিলেন। আমি যদিও মেয়েমানুষ, কিন্তু আমিও সে ক্ষমতা রাখি মহারাজ। গর্জনগাঁওয়ের রাজকুমারকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি অন্তত।"

"কোনদিন হয়তো তোমার সাহায্য চাইব আমাকে চাষী গৃহস্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে।"

"হেঁয়ালি না কি?"

"তাই ধরে নাও। আর খুব ভালো হেঁয়ালি।"

"তাহলে আমিও একটা হেঁয়ালি বলি। কপিঞ্জল কোথায় এখন?"

"আমাদের প্রধানমন্ত্রী? তিনি নিশ্চয় তাঁর কর্ম-কক্ষে আছেন।"

"ঠিক। কর্ম-কক্ষেই আছেন তিনি"—রঞ্জাবতী পাখা দিয়ে মহারাণী সুরূপিণীর ঘরটা দেখিয়ে দিলেন—"আপনি আর আমি পাশের ঘরে আছি। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার উপর আমার দয়ামায়া কিচ্ছু নেই। কেবল আপনাকে আঘাত করছি। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, তাহলেই আপনার ভুল ভেঙে যাবে। আমাকে কোনও একটা কাজ দিন, কিংবা কোনও প্রশ্ন করুন। আপনার জন্য হেন কাজ নেই যা করতে আমি প্রাণপণ না করতে পারি, হেন গোপন খবর নেই যা আপনার কাছে না প্রকাশ করতে পারি।"

"না, রঞ্জাবতী, সেসব কিছু করব না। তোমার বন্ধুত্বকে আমি এত মূল্যবান বলে মনে করি যে কোনও নোংরামির মধ্যে তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে চাই না।"

গন্ধরাজ আর একবার রঞ্জাবতীর হস্ত-চুম্বন করলেন।

"জান? যখন যুদ্ধ হয়, দু'দলের সৈন্যরা যখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আড়ালে আবডালে শত্রু-পক্ষের সৈন্যের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয় কারো কারো। কিন্তু তা বলে তারা কেউ নিজের দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। না, আমি কিছু জানতে চাই না।"

"মহারাজ"—বাঁকা হাসি হেসে বললেন রঞ্জাবতী—"আপনার মতো সবাই যদি উদার হত তাহলে নারী-জন্ম সার্থক হত আমাদের।"

কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গীতে মনে হল তিনি একটু যেন আহত হয়েছেন গন্ধরাজের কথায়। তিনি অন্য রকম কিছু ঘটবে আশা করেছিলেন। তিনি প্রত্যাঘাত করবার ছুতো খুঁজতে লাগলেন মনে মনে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেটা পেয়ে প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন।

"মহারাজ এবার আমাকে ছুটি দিন, আর বেশীক্ষণ আমার কাছে থাকবেন না। কথাটা হয়তো অশোভন স্পর্ধার মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু কি করি বলুন, আমার ভালুকটা যে বড় হিংসুকে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যাচ্ছি। কৈকেয়ীর নির্দেশে রামরা সর্বদাই বনবাসে যেতে প্রস্তুত! চললুম। কিন্তু জেনে রাখ আমি চিরকালই তোমার বশম্বদ বন্ধু থাকব। শিস্ দিয়ে ডাকলেই চলে আসব কুকুরের মতো—"

গন্ধরাজ সরে গেলেন। গভীরা দেবী আর অঞ্জনা দেবীর সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন আবার। রঞ্জাবতী অস্ত্র-কুশলা। তিনি জানেন তাঁর কোন অস্ত্রটি কোথায় কিভাবে লাগসই হবে। গন্ধরাজের হৃদয়ে তিনি একটি মোক্ষম তীর হেনেছিলেন। কপিঞ্জল ঈর্ষা-পীড়িত হতে পারে—এটা তো একটা পরম প্রীতিকর প্রতিশোধ। গন্ধরাজও রঞ্জাবতীকে যেন নূতন আলোকে দেখলেন। ওকে কেন্দ্র করে কারও ঈর্ষা জাগতে পারে না কি!

।। নয়।।

রঞ্জাবতী ঠিক কথাই বলেছিলেন। গর্জনগাঁওয়ের মহামহিম প্রধানমন্ত্রী সত্যই মহারাণী সুরূপিণীর প্রসাধন-কক্ষে বসে ছিলেন তখন। প্রসাধন শেষ হয়েছিল, সুরূপিণী সুসজ্জিতা হয়ে বসে ছিলেন একটি দীর্ঘ দর্পণের সমুখে। ভগীরথ শর্মার বর্ণনা নিদারুণভাবে সত্য। কিন্তু বর্ণনা হিসাবে সত্য হলেও ওটা যে বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা তাও বুঝতে দেরি হয় না। ভগীরথ শর্মার নারী-বিদ্বেষী মনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ওই বর্ণনাটি। সুরূপিণীর কপালটা উঁচু ঠিকই, কিন্তু মোটেই তা বেমানান নয়। তিনি ঈষৎ কোলকুঁজো তা-ও অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁর প্রতিটি অঙ্গ নিটোল, যেন নিপুণ শিল্পীর গড়া। তাঁর হাত, পা, কান, কমনীয় গ্রীবার উপর তাঁর সুন্দর ছোট্ট মাথাটি, তাঁর মুখের এবং চিবুকের ডোল সবই চমৎকার, কোথাও ছন্দপতন ঘটেনি। তিনি হয়তো তিলোত্তমার মতো সুন্দরী নন, কিন্তু তিনি প্রাণবন্ত, চঞ্চল, বর্ণময়ী, হাজার রকম মাধুর্যের উৎস। তাঁর চোখ দুটি একটু বেশী চঞ্চল বটে, একটু যেন বেশী ঘূর্ণ্যমান, কিন্তু প্রতিটি ঘূর্ণন অর্থপূর্ণ। তাঁর সর্বাঙ্গের মধ্যে চোখ দুটিই সব চেয়ে সুন্দর, সে চোখের দৃষ্টিতে তাঁর মনোভাবের প্রকাশ নেই কিন্তু। সে দৃষ্টি যা বলছে তা যেন তাঁর মনের কথা নয়। তাঁর অপরিণত কঠিন হৃদয়ে যে কামনা নিহিত তা নারীসুলভ নয় তা পারুষ্যধর্মী, তা ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি কখনও উদ্ধত কখনও মিনতিভরা, কখনও প্রদীপ্ত কখনও বিগলিত। দৃষ্টিতে যেন লোলুপ কুহকিনীর ছলনা। হ্যাঁ, ছলনাময়ী তিনি সত্যিই। তিনি যে পুরুষ নন, পৌরুষের মহিমায় তিনি যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারছেন না এই ক্ষোভে তিনি তাঁর নারীত্বকে কেন্দ্র করেই যথেচ্ছাচার করবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, নিজের প্রভুত্ব কায়েম করতে চাইছেন গুপ্ত অভিসন্ধির পথে, খেয়াল-খুশির মেঘে ভেসে ভেসে চাইছেন নিজের প্রভাব প্রতিপত্তির বর্ষণে চতুর্দিক ভাসিয়ে দিতে। তিনি কাউকে ভালবাসেন না, কিন্তু তিনি চান সকলে তাঁর পদানত হয়ে থাকুক। যে কোনও সাধারণ মেয়েরই এই আকাঙ্ক্ষা বোধহয়। ইতিহাসে এ রকম নজির আছে। প্রেমান্ধ প্রণয়ীকে সিংহের মুখে ফেলে দিয়ে মজা দেখেছেন প্রণয়িনী। কিন্তু প্রকৃতি ছলনাময়ী। তিনি শুধু পুরুষের জন্যেই ফাঁদ পাতেন না, নারীর জন্যেও পাতেন।

মার্জার যে ভঙ্গীতে ওত পেতে বসে সেই ভঙ্গীতে কপিঞ্জল তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুটিয়ে বসেছিলেন একটি নীচু কেদারায় একটু ঝুঁকে। তাঁর কাঁধ দুটো উঁচু হয়ে উঠেছিল, নীলাভ প্রচণ্ড গণ্ডে আর চোয়ালে, পীতাভ চোখের দৃষ্টিতে যে ভাব ফুটে উঠেছিল তাতে মনে হচ্ছিল যদিও তাঁর ভঙ্গীটা ওত পাতার মতো, কিন্তু ইচ্ছেটা বোধহয় তোষামোদ করবার। তাঁর শক্তিব্যঞ্জক মুখভাবে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তাতে ফুটে উঠেছিল দস্যুসুলভ স্পর্ধা, নির্জলা স্পর্ধা, কোনও আবরণ তাতে ছিল না। গোপন করবার বিন্দুমাত্র প্রয়াসও ছিল না। সুরূপিণীর দিকে চেয়ে যে হাসিটি তিনি হাসলেন তা মোহন, কিন্তু মার্জিত নয়।

বললেন, "এবার আমার বোধহয় ওঠা উচিত। মহারাজকে পাশের ঘরে অপেক্ষা করিয়ে রাখাটা আর উচিত হচ্ছে না। অবিলম্বে একটা মীমাংসায় আসা দরকার।"

"মীমাংসাটা পরে করলে হয় না? এখনই করতে হবে?"

"হ্যাঁ, এখনই, আর দেরি করা চলে না। মহারাণী নিজেই সেটা বুঝতে পারছেন। গোড়ায়

গোড়ায় সাপকে নকল করা চলতে পারে কিন্তু শেষমুহূর্তে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মহারাজ যদি এখন না আসতেন তাহলে ভালো হত, কিন্তু আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি এখন ফেরা অসম্ভব।"

"ভাবছি, হঠাৎ মহারাজ এলেন কেন। বিশেষ করে আজকেই আসার হেতুটা কি!"

"যারা সব ভণ্ডুল করে দেয় তাদের তো ওই স্বভাব। ঠিক সময়টিতে হাজির হয়ে সব পণ্ড করে দেবে। কিন্তু ভাববার কিছু নেই। ভেবে দেখুন কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আমরা কতটা এগিয়েছি। এখন একটা আহাম্মক এসে—কিন্তু না—"

কপিঞ্জল মৃদু হেসে তাঁর আঙ্গুলগুলোতে ফুঁ দিলেন ভঙ্গীভরে।

"কিন্তু ওই আহাম্মকই"—উত্তর দিলেন মহারাণী—"এখনও গর্জনগাঁওয়ের মহারাজ—"

"সেটা আপনার মরজির জন্যে। আর যতক্ষণ আপনি প্রশ্রয় দেবেন ততক্ষণ উনি মহারাজ থাকবেনও। প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে, শক্তিময়ীর কাছেই শক্তি থাকে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। উনি যদি আপনার সঙ্গে টক্কর দিতে আসেন তাহলে সেই মাটির হাঁড়ি আর পিতলের হাঁড়ির গল্পের পুনরাবৃত্তি হবে—"

"আপনি আমাকে হাঁড়ি বলছেন! এটা কিন্তু অশোভন" হেসে ফেললেন সুরূপিণী।

"আপনার কীর্তি পুরোপুরি কায়েম করবার জন্যে এখন অনেক উপমা ব্যবহার করতে হবে আমাকে। পার হতে হবে অনেক সিঁড়ি—তারপর অবশ্য—"

আনন্দে সুরূপিণীর মুখটা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"গন্ধরাজ কিন্তু এখনও সিংহাসনে আসীন আছেন, চাটুকার মশাই, আপনি কি বিদ্রোহ করতে বলেন? আপনি? তাঁর প্রধানমন্ত্রী—?"

"বলবার তো আর কিছু নেই মহারাণী। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। গন্ধরাজ এখন শুধু কাগজেকলমে মহারাজা, আসল শাসনকর্ত্রী তো আপনি, মহামান্যা মহারাণী সুরূপিণী দেবীই তো রাজ্য চালাচ্ছেন—"

তাঁর দিকে অনুরাগ-ভরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইলেন কপিঞ্জল। সুরূপিণীর অন্তরে দোলা লাগল। ফুলে উঠল বুকটা। বিরাটকায় তাঁর এই ক্রীতদাসের দিকে চেয়ে ক্ষমতার মদিরা পান করলেন তিনি। ক্রীতদাসটি কিন্তু বলেই চললেন—শয়তানি ধূর্ততা যদিও তাঁকে মানাচ্ছিল না ঠিক—কিন্তু তবু তিনি বললেন—"একটি দোষ আছে কিন্তু মহারাণীর। তাঁর সমুজ্জ্বল সুমহৎ ভবিষ্যতে সেটি যে বিপজ্জনক ছায়াপাত করেছে তা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। বলব সেটা কি? আপনি কি আমার বেয়াদবি ক্ষমা করবেন? দোষটি আপনার মধ্যেই আছে মহারাণী—আপনার হৃদয় অতি কোমল।"

"ঠিকই বলেছেন, আমি একটু ভীরু। ধরুন আমাদের বিচারে যদি ভুল হয়ে থাকে, যদি আমরা হেরে যাই?"

"হেরে যাব, মহারাণী?" তিক্ত ব্যঙ্গ সহকারে উত্তর দিলেন কপিঞ্জল। "খরগোশের কাছে কুকুর কখনও হেরে যায়? সীমান্তে আমাদের পাঁচ হাজার সশস্ত্র সৈনিক মজুত আছে, পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচ হাজার সৈন্য রুদ্রার সিংহদ্বারে আঘাত হানবে; ভৈরঙ্গীতে দেড় হাজারের বেশী সেনা নেই। এ তো অঙ্কের ব্যাপার। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আমাদের বাধা দেবে কে—"

"কিন্তু এতে বাহাদুরি কি আছে। একে আপনি গৌরব বলছেন? এ তো একটা শিশুকে ধরে প্রহার করার মতো। এতে সাহসের পরিচয় কোথায়?"

"মহারাণী, সাহসটা রাজনৈতিক। আমাদের এই পদক্ষেপ লঘু নয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা সমস্ত উত্তর ভারতের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করব, এই প্রথম আকর্ষণ করব। এর আগে আমরা নগণ্য ছিলাম। এর পর তিন মাসের মধ্যে যে সব সন্ধি-চুক্তি হবে তার উপর নির্ভর করবে আমাদের উত্থান কিংবা পতন। ওই সব সন্ধিচুক্তির সময় আপনার পরামর্শের উপরই ভরসা করতে হবে আমাদের"—গম্ভীরভাবে বলে চললেন তিনি—"আপনাকে যদি আমি কাজ করতে না দেখতাম, সে সময় আপনার উর্বর মস্তিষ্কের পরিচয় যদি না পেতাম, তাহলে সত্যি বলছি, এই আসন্ন বিপদে ভয়ে আমার বুক কাঁপত। বুদ্ধির ক্ষেত্রে, কৌশলের ক্ষেত্রে, প্রেরণার ক্ষেত্রে, আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করতেই হবে। মনে করুন বিদুলার কথা, মনে করুন কৈকেয়ীর কথা, মনে করুন দ্রৌপদীর কথা। ভারতের বাইরে যে সব দেশ আছে—ফরাসীদের দেশ, রুশ দেশ, ইংরেজদের দেশ, স্পেন দেশ—যাদের আমরা ম্লেচ্ছ, ফিরিঙ্গী বা গুরুও বলি—তাদের দেশেও শুনেছি মহিমময়ী নারীদের প্রতিভাই হয় প্রকাশ্যে না হয় অন্তরালে রাজত্বের শাসনরজ্জুকে সবল হস্তে ধরে আছে। তাঁদের যে সম্মান পাওয়া উচিত ছিল সে সম্মান হয়তো তাঁরা পাননি, তাঁদের আহাম্মক স্বামীরা বা সেনাপতিরা বা মন্ত্রীরা হয়তো তা পেয়েছেন, অনেকে হয়তো হৃদয়ের দুর্বলতার জন্যও তাঁদের ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন—কিন্তু সত্য কখনও অম্লান হয়নি, কখনও হবে না।"

এই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় সুরূপিণী কিন্তু বিশেষ বিচলিত হলেন না। মনে হল তিনি যা ঠিক করেছিলেন তা যেন আর ভালো লাগছিল না তাঁর। তিনি তাঁর অর্ধনিমীলিত চক্ষুর ফাঁক দিয়ে কপিঞ্জলের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ অবজ্ঞাভরেই বললেন, "সত্যি, কি ছেলেমানুষ এই পুরুষরা। লম্বাচওড়া কথা বলতে পেলে আর কিছু চায় না। রাজনৈতিক সাহস! আপনাকে যদি পোড়া কড়াই মাজতে হত তাহলে সেটাকে আপনি নিশ্চয় গার্হস্থ্য সাহস বলতেন?"

"বলতাম, যদি সে কড়াইটাকে ভাল করে মাজতে পারতাম।" কপিঞ্জলও দমবার পাত্র নন—"যে কোনও গুণকে ভালো নামেই আমি ভূষিত করতে চাই, করাটাই উচিত, বিশেষণই গুণের উৎকর্ষ বাড়ায়, গুণ সব সময়ে মনোহর না-ও হতে পারে।"

"বেশ আমাদের সাহসটাকে পরীক্ষা করে দেখা যাক। কৌশাম্বী থেকে ঠাকুমা আমাদের পিঠ চাপড়েছেন, কপিলবাস্তুর জ্যাঠামশাই আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, আমাদের পরিবারের যে যেখানে আছেন সবাই বাহবা বাহবা বলেছেন। এই কি আমাদের সাহসের সম্বল? আপনার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আমি মন্ত্রীমশাই?"

"মহারাণীর মনটা আজ ভালো নেই দেখছি।"

কপিঞ্জল পুনরায় আরম্ভ করলেন।

"বিপদটা যে কোথায় তা তিনি ভুলে গেছেন। আমরা চারিদিক থেকে উৎসাহ পেয়েছি তা ঠিক, কিন্তু মহারাণী ভালো করেই জানেন ও সব উৎসাহের ভিত্তি চোরা-বালির উপর; মহারাণী এ-ও জানেন যে প্রকাশ্য জনসভায় এইসব গোপন ইশারার কথা বলা যায় না, অনেক সময় তা চেপে যেতেও হয়। কিন্তু বিপদ যে সমূহ তাতেও সন্দেহ নেই।"

যে জিনিসটাকে তিনি চাপা দিতে চেয়েছিলেন সেইটেকে আবার খুঁচিয়ে তুলতে বাধ্য হচ্ছেন বলে মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন তিনি, কিন্তু থামতে পারলেন না।

"বিপদটা ঠিক যুদ্ধসংক্রান্ত নয়, কিন্তু তবু সেটা উপেক্ষণীয়ও নয়, অবশ্য সহজেই এ বিপদ কাটিয়ে ওঠা যাবে এ বিশ্বাস আমার আছে। যদি আমাদের সৈন্যদলের উপর নির্ভর করতে হত তাহলে একটু মুশকিলই হত। কারণ আপনি ঠিকই ধরেছেন অভিজিৎ এখনও সেনাপতি হিসাবে তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু সন্ধি-চুক্তি-কূটনৈতিক কৌশলের ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভর করতে হবে নিজেদেরই উপর। সেইখানেই বিপদ, কিন্তু আপনার সাহায্য পেলে সে বিপদকে আমি গ্রাহ্যই করি না—"

"তা হতে পারে"—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন মহারাণী—"কিন্তু আমি বিপদ দেখছি অন্য জায়গায়। আমাদের প্রজারা—ওই লক্ষ্মীছাড়ারা—ওরা যদি হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসে—তাহলে? উত্তর ভারতের লোকেরা কি ভাববে যখন তারা দেখবে যে আমরা যখন অপরের রাজত্ব আক্রমণ করতে যাচ্ছি, তখন আমাদের নিজেদেরই সিংহাসন টলমল?"

"না, মহারাণী"—হেসে উত্তর দিলেন কপিঞ্জল—"আপনিও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না এতে আশ্চর্য হচ্ছি। প্রজারা অসন্তুষ্ট কেন? অর্থাভাবে আর খাজনার চাপে। একবার যদি আমরা ভৈরঙ্গী দখল করতে পারি, খাজনা মাপ করে দেব, ছেলেরা বীরত্বের মুকুট আর লুটের মাল নিয়ে ফিরে আসবে ঘরে ঘরে শৌর্যবীর্যের মহিমায় বুক ফুলিয়ে, তখন আর কোন গ্লানি থাকবে না কারো মনে। তারা বলাবলি করবে, মহারাণী ঠিকই করেছিলেন, কি মাথা, কি দূরদৃষ্টি তাঁর, আর তো আমাদের অভাব নেই। অবশ্য, মহরাণীর কাছে এসব বলার মানে হয় না। কিন্তু মহারাণীই তো আমাকে এ পথ দেখিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশে দুর্গম পথের যাত্রী হয়েছি আমি।"

"মন্ত্রী মশায়"—সুরূপিণী যেন একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বললেন—"প্রায়ই আপনি আপনার নিজের কেরামতিটা মহারাণীর উপর আরোপ করেন দেখছি।"

এই অতর্কিত খোঁচায় কপিঞ্জলের ব্যক্তিত্ব টলমল করে উঠল। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। পরমুহূর্তেই তিনি সামলে নিলেন নিজেকে।

"করি না কি! হয়তো করি। মহারাণীর মধ্যেও এ প্রবণতা লক্ষ্য করেছি।"

তিনি এমন সহজভাবে বললেন কথাগুলো এবং তা এমন সঙ্গত মনে হল যে সুরূপিণী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর অহমিকার ভিত্তিটাই যেন কেঁপে উঠেছিল, আত্মস্থ হয়ে আরাম পেলেন।

"কিন্তু কোন কাজই তো এগোল না। ওদিকে গন্ধরাজ পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে। কি ভাবে সম্মুখসমরে অগ্রসর হব তাই তো মাথায় আসছে না, সেনাপতি মশাই একটু উপদেশ দেবেন? কি ভাবে তার সঙ্গে কথাবার্তা কইব, আর সে যদি রাজপরিষদে যেতে চায় তাহলেই বা আমরা কি করব—"

"এখন, মানে এখনকার মতো, আমি মহারাণীকে মহারাজের কাছে রেখে যাচ্ছি। মহারাণীর উপর আমার আস্থা আছে। তাঁর কাজকর্ম আমি দেখেছি। মহারাজকে নাট্যশালায় পাঠিয়ে দিন না, অবশ্য বুঝিয়ে সুজিয়ে"—তারপর বললেন—"মহারাণী যদি এখন মাথাধরার অভিনয় করেন, কেমন হয়?"

"মাথাধরার অভিনয়? কক্ষনো না। যে সৈন্য যুদ্ধ করতে জানে সে কখনও পালায় না, যে নারী পুরুষকে আয়ত্তে আনতে জানে সে-ও কখনও রণে ভঙ্গ দেয় না। বীর তার অস্ত্রকে কলঙ্কিত করে না।"

"তাহলে মহারাণীর কাছে একটি বিনীত প্রার্থনা করে বিদায় নি। মহারাণীর একটি মাত্র গুণের অভাব আছে—করুণা। করুণাময়ীর অভিনয় করুন তাহলে—বেচারার শিকার টিকার নিয়ে একটু আলোচনা করুন। রাজনীতির ধার দিয়েও যাবেন না। অভিনয় করুন রাজ্যের শুষ্ক কর্তব্যপালন করবার পর তাঁর সঙ্গ পেয়ে যেন আপনি বর্তে গেলেন। মহারাণীর কি এ রণ-নীতি পছন্দ হল?"

"ওর জন্যে আমি ভাবছি না"— সুরূপিণী উত্তর দিলেন—"কিন্তু রাজপরিষদ—তার কি হবে?"

"রাজপরিষদ?"—কপিঞ্জল হেসে উঠলেন এবং গন্ধরাজের স্বর এবং ভঙ্গী হুবহু নকল করে ঘরের মধ্যে এক চক্কোর পায়চারি করে শুরু করলেন—"আজ পরিষদে কি কি কাজ আছে? আরে মহাধ্যক্ষ মশাই যে—গোঁফে কলপ লাগিয়েছেন দেখছি! হেঁ হেঁ আমাকে ঠকাতে পারবেন না। কলপের ব্যাপারে আমি একজন ওস্তাদ। তাছাড়া আমার চোখ রাজার চোখ, ঠকানো শক্ত। এ কাগজগুলো কিসের? ও, তাই তো। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি আপনারা কলপের ব্যাপারটা ধরতে পারেননি কেউ। ওরে বাবা এতগুলো কাগজ! আপনিই সই করুন, আপনাকে তো অধিকার দেওয়াই আছে। কিন্তু দেখুন, আপনার কলপের রহস্যটা আমি ধরে ফেলেছি। ফেলিনি?" এই পর্যন্ত বলে কপিঞ্জল থামলেন। তারপর নিজের কণ্ঠস্বরে বললেন, "এটা বলতে হবে আমাদের মহারাজা তাঁর পরিষদের সভ্যদের খুব আমোদে রাখেন আর রক্ষাও করেন। এটা কম সৌভাগ্য নয়।"

এই পর্যন্ত বলে কপিঞ্জল যখন মহারাণীর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তখন দেখলেন তিনি যেন জমে গেছেন।

"মন্ত্রীমশায়, আপনি দেখছি রসিক লোক। কিন্তু আপনি বিস্মৃত হয়েছেন কোথায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। এতক্ষণ আমাকে যে সব পরামর্শ দিলেন এবং যে সব অভিনয় করলেন তা একটাও হয়তো কাজে লাগবে না। কারণ আপনার প্রভু, গর্জনগাঁওয়ের মহারাজা গন্ধরাজ অত সহজে ভোলবার লোক নন। তিনিও অনেক সময় শক্তি এবং বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন।"

মনে মনে জ্বলে উঠলেন কপিঞ্জল। ভাঁড়দের অহমিকাও গগনচুম্বী হয় আর তাতে আঘাত লাগলে অত্যন্ত মর্মান্তিক হয় সেটা তাদের কাছে, বিশেষত কপিঞ্জল যে উদ্দেশ্যে এ ভাঁড়ামির অবতারণা করেছিলেন সেটা তুচ্ছ নয়, অতিশয় গভীর। তাই সুরূপিণীর এই আঘাতটা বড়ই বাজল মনে। কিন্তু কপিঞ্জল লৌহ-মানব। বাইরে কোন কিছু প্রকাশ করলেন না, সাধারণ ভাঁড় হলে সরে পড়তেন, কিন্তু তিনি তা-ও করলেন না, নিজের হাল ধরে অটল হয়ে রইলেন।

মৃদু হেসে বললেন, "তাই নাকি। তাহলে শক্তি এবং বুদ্ধির সাহায্যেই লড়তে হবে তাঁর সঙ্গে। উন্মত্ত ষাঁড়কে থামাতে হলে তার শিং দুটোই চেপে ধরতে হবে।"

"দেখা যাক"—ওড়নাটা ঠিক করে নিয়ে ওঠবার উপক্রম করলেন সুরূপিণী। চটলে অপরূপ দেখায় সুরূপিণীকে। রাগ ঘৃণা, বদমেজাজ গয়নার মতো মানায় তাঁকে। সুরূপিণীকে সত্যিই সুরূপিণী বলে মনে হতে লাগল।

'ভগবান করুন, ওদের যেন ঝগড়া হয়ে যায়'— মনে মনে ভাবলেন কপিঞ্জল—'ঝগড়া না হলে দজ্জালিনিটাকে দলে টানা যাবে না। এখানে আর আমার থাকা উচিত হচ্ছে না। মহারাজকে এবার আসতে দেওয়া উচিত। নারদ—নারদ—'

কপিঞ্জল নতজানু হয়ে সুরূপিণীর হস্ত চুম্বন করলেন। বাত ছিল হাঁটুতে ব্যথা লাগল একটু। কিন্তু তিনি সসম্ভ্রমে বললেন, "মহারাণী, আপনার ভৃত্যকে এবার বিদায় দিন। রাজপরিষদের বৈঠকের জন্য অনেক কিছু করতে হবে আমাকে এখন।"

"যান—"

সুরূপিণী উঠে দাঁড়ালেন। কপিঞ্জল পিছনের গোপন একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি। সুরূপিণী ঘণ্টা বাজালেন এবং সহচরীকে আদেশ দিলেন মহারাজকে খবর দিতে।

।। দশ।।

কতো মহৎ সদিচ্ছা নিয়েই না গন্ধরাজ তাঁর স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করলেন। পিতার মমত্ববোধ, কোমল্ অনুভূতির পসরা, নীতি-বচনের মালা কিছুরই অভাব ছিল না—অনেক আশা নিয়েই প্রবেশ করলেন তিনি। সুরূপিণীও যে খুব বিরূপিণী ছিলেন তা নয়। গন্ধরাজ তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে সব ভণ্ডুল করে দেবে এ ভয়ও আর ছিল না, কারণ তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সিঁড়িগুলোর পরিচয় পেয়ে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তিনি। কপিঞ্জলের উপর তিনি যে কেবল অপ্রসন্নই হয়েছিলেন তাই নয় তাঁর সম্বন্ধে একটা বিভীষিকাও সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মনে। লোকটিকে তিনি যেন মোটেই সহ্য করতে পারছিলেন না আর। তাঁর নির্লজ্জ দাসসুলভ আচরণ থেকে এবং যে অশোভন মনোযোগ তিনি তাঁর প্রতি বর্ষণ করছেন তার অসৌজন্য থেকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে লোকটা আসলে বর্বরই। কিন্তু তবু প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন তাকে কারণ যে ভালুক পোষে সে ভালুকের গায়ের গন্ধের জন্য তাকে ছেড়ে দেয় না। তাছাড়া তিনি গোপনে ঈর্ষাজনক এমন দু'একটা খবর পেয়েছিলেন যার থেকে বুঝেছিলেন লোকটা দুমুখো সাপও। এটা মিথ্যা নয় অবশ্য যে তিনি তাঁর সঙ্গে প্রণয়ের অভিনয় করেন, অবশ্য সেটা অভিনয়ই, আর কপিঞ্জল যেটা করেন সেটা সুরূপিণীর অহঙ্কারকে তোয়াজ। এখনি তিনি যে তাঁর সামনে তাঁর স্বামীকে নকল করে ভাঁড়ের অভিনয় করলেন এবং যে ঘৃণ্য অবস্থায় পড়ে তাঁকে সেটা মুখ বুজে দেখে যেতে হল—এর জ্বালাটা তাঁর মনে জ্বলছিল তখনও, তাছাড়া বোঝার মতো কি যেন একটা চেপেছিল তাঁর বিবেকের উপর। গন্ধরাজ যখন ঘরে ঢুকলেন তখন সুরূপিণীর মনের ভাবটা দোষী-দোষী, গন্ধরাজ তাঁকে এইসব নোংরামি থেকে বাঁচাবেন এই আশায় সুরূপিণী সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু অদৃষ্ট মাঝে মাঝে পরিহাস করেন। এমন সাক্ষাৎকারও ফলপ্রসূ হল না। ঘরে ঢুকেই গন্ধরাজের খটকা লাগল একটা। তিনি দেখলেন কপিঞ্জল চলে গেছে, কিন্তু আয়নার খুব কাছ ঘেঁষে তখনও সেই চেয়ারটা আছে যেটায় বসেছিলেন তিনি। খচ্ করে লাগল মনে। লোকটা সুরূপিণীর প্রসাধনকক্ষে এতক্ষণ তো ছিলই, যাবার সময়েও চোরের মতন গোপনে চলে গেছে! যে সহচরী তাঁকে নিয়ে এসেছিল, একটু রূঢ়কণ্ঠে তাকে বাইরে যেতে বললেন।

"এস, এস, বস"—সুরূপিণী এগিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি। গন্ধরাজের রূঢ় কণ্ঠস্বরে সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। চেয়ারটার দিকে যে দৃষ্টিতে তিনি চেয়েছিলেন তা-ও একটু বিচলিত করল সুরূপিণীকে।

"সুরূপিণী, আমি তোমার এ ঘরে এত কম এসেছি যে এখানে আগন্তুকের বেশী কোন দাবি নেই আমার।"

"তুমি তো নিজেই নিজের পছন্দ মতো সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে থাকতে ভালবাস।"

"সেই কথাই বলতে এসেছি"—গন্ধরাজ উত্তর দিলেন—"চার বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। এই চার বছরে আমি নিজেও সুখী হইনি, তোমাকেও সুখী করতে পারিনি। আমি ভালো করেই জানি আমি তোমার স্বামী হবার যোগ্য নই। আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, আমার কোনও উচ্চাকাঙক্ষা নেই, আমি খামখেয়ালী বিদূষক। তুমি যেন আমাকে ঘৃণা কর তা আমার অবিদিত নেই, এর জন্যে তোমাকে দোষও দিই না আমি সুরূপিণী। কিন্তু সুবিচার করতে হলে তোমার ভেবে দেখা উচিত তোমার প্রতি আমি কি আচরণ করেছি। যখন আমি দেখলুম এই ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চে মহারাণীর ভূমিকায় অভিনয় করতে তোমার খুব ভালো লাগছে, সঙ্গে সঙ্গে কি আমি আমার খেলনার বাক্সটা, মানে গর্জনগাঁওয়ের এই রাজত্বটা তোমাকে দিয়ে দিইনি? যেই আমি অনুভব করলাম স্বামী হিসেবে তুমি আমাকে পছন্দ করছ না অমনি কি আমি সরে দাঁড়াইনি? তোমাকে এতটা স্বাধীনতা আর কোনও স্বামী দিতে পারত কি? তুমি হয়তো বলবে আমি হৃদয়হীন, আমার কোনও অনুরাগ নেই, আমি খেয়ালখুশীর হাওয়ার মুখে উড়ে বেড়িয়েছি, আমার চাল-চলন অদ্ভুত তাই আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারনি। মানছি সেটা। আমি দায়িত্ব এড়িয়ে গেছি, কিন্তু এটা এবার বুঝতে পারছি, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সহজ বটে, কিন্তু সঙ্গত নয়। হয়তো আমি তোমার স্বামী হিসাবে একটু বুড়ো, হয়তো তোমার পছন্দের মাপকাঠির মাপে আমার অযোগ্যতা ধরা পড়েছে, কিন্তু তবু সুরূপিণী এটা বোধহয় আমার ভোলা অন্যায় হয়েছে যে দেশে তোমাকে এনেছি সে দেশের আমি রাজা, তুমি যখন এসেছিলে তখন তুমি বালিকামাত্র, নিতান্ত শিশু। সেদিক থেকেও আমার কর্তব্য ছিল, কিন্তু সেসব কর্তব্য আমি পালন করিনি।"

বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নির্ঘাত মনকে বিরূপ করে তোলে।

"কর্তব্য।"—হেসে উঠলেন সুরূপিণী—"তোমার মুখে কর্তব্যের কথা। শুনে সত্যিই হাসি পাচ্ছে গন্ধরাজ। হঠাৎ আজ এ খেয়াল? চাকরানীদের সঙ্গে প্রেম কর না গিয়ে মহারাজা হবার শখ যদি হয়ে থাকে, পুতুল-মহারাজা হও না। উপভোগ কর জীবনটা, যা বরাবর করে এসেছ। কর্তব্য আর রাজত্বের ভার আমাদের উপর থাক।"

আমাদের কথাটা গন্ধরাজের কানে বাজল।

"উপভোগ? উপভোগের চরম করেছি আমি। কিন্তু তবু এর একটা দিকও আছে আর সেটাও বিবেচ্য। তোমার ধারণা আমি শিকার নিয়েই উন্মত্ত। কিন্তু এমন এক দিন ছিল যখন যাকে লোকে সম্ভবত ভদ্রতা করেই আমার শাসন-ব্যবস্থা বলত তাতে আমি গভীরভাবে নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলাম। একটা দাবি আমি করব, আমার সুরুচি আছে, জীবন্ত সুখ আর একঘেয়ে প্রণালীবদ্ধ জীবন যাপনের তফাত আমি বুঝতে পারি। শিকার, রাজসিংহাসন আর তোমার সঙ্গসুখের মধ্যে কোনটা আমার প্রিয় তা আমি অনায়াসে ঠিক করে নিতাম, যদি তা

ঠিক করবার সুযোগ আমার থাকত। তোমাকে যখন পেয়েছিলাম তখন তুমি বালিকা ছিলে, অর্ধ-স্ফুট কুঁড়ি একটি—"

"কি সর্বনাশ! প্রণয়ের অভিনয় শুরু হল না কি?"

"দেখ, আমার একটি মাত্র গুণ, আমি হাস্যজনক কিছু করি না। আমি যা করছি তা রীতিমত দাম্পত্য-ব্যাপার। প্রণয় অভিনয় নয়। কিন্তু এর গোড়ার দিকটা যখন মনে পড়ে তখন দুঃখ হয়, এর চেয়ে মৃদু ভাষায় তার বর্ণনা করতে পারি না। সুবিচার কর সুরূপিণী ঃ এই সব পুরোনো কাহিনীর স্মৃতি টেনে আনছি বলে তুমি হয়তো আমাকে অসভ্য ভাবছ। কিন্তু একটু সুবিচার কর, সৌজন্যর খাতিরেও স্বীকার কর যে অতীতের সেই দিনগুলোর জন্য তুমিও দুঃখিত।"

"আমি কোনও কিছুর জন্য দুঃখিত নই"—সুরূপিণী বলে উঠলেন—"আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমার ধারণা ছিল তুমি সুখী।"

"সুখের নানা চেহারা। কেউ বিদ্রোহ করে সুখী হয়, কেউ বা ঘুমিয়ে। মদ, নিত্যনূতন পরিবর্তন, দেশভ্রমণ এ সবেও সুখ আছে। ধর্মেও আছে নাকি শুনেছি। ওপথে আমি অবশ্য চেষ্টা করে দেখিনি কখনও। লোকে এ-ও বলে, সাবেক ধরনের, অনাড়ম্বর দাম্পত্যজীবনেও নাকি আর এক রকম সুখের সন্ধান পাওয়া যায়। সুখী, হ্যাঁ বলতে পার তুমি—আমি সুখী, কিন্তু একটা কথা বলছি যখন তোমাকে প্রথমে বিয়ে করে এনেছিলাম তখন আমি আরও সুখী ছিলাম—"

একটু যেন জোর করে হেসে সুরূপিণী বললেন, "তাহলে সে সুখ তোমার বেশী দিন ভালো লাগেনি বলতে হবে। দেখতে দেখতে তোমার মনের সুর বদলে গেল।"

"না, কিছুই বদলায়নি। সুরূপিণী, তোমার মনে আছে কি পথে আসতে আসতে ঝোপের মধ্যে গোলাপ দেখে যখন তোমার ভালো লেগেছিল তখন আমি ঘোড়া থেকে নেমে তুলে এনে দিয়েছিলাম সেগুলো? তখন সন্ধ্যা হচ্ছিল, আকাশে তখন স্বর্ণমহোৎসব, পাখিরা ডাকতে ডাকতে ফিরছিল নিজেদের বাসায়। নটি, হ্যাঁ নটি লাল গোলাপ তুলে দিয়েছিলাম তোমাকে এবং প্রত্যেকটির জন্য তুমি আমাকে চুমু দিয়েছিলে একটি। আমার মনে হয়েছিল যে প্রত্যেকটি গোলাপ এবং প্রত্যেকটি চুম্বনের জন্য আমাদের ভালোবাসা অন্ততঃ এক বছর অম্লান থাকবে। কিন্তু দেড় বছর কাটতে না কাটতে সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু সুরূপিণী তোমার কি ধারণা যে আমার হৃদয়ও বদলে গেছে—"

"আমি জানি না"—মনে হল সুরূপিণীর কণ্ঠস্বরে একটা যন্ত্র যেন কথা কইল।

"না, বদলায় নি"—গন্ধরাজ বলতে লাগলেন—"কিন্তু আমি জানি প্রেমের ব্যাপারে, এমন কি বিবাহিত স্বামীর পক্ষেও, এটা স্বীকার করা হাস্যকর যে সে সুখ-স্বপ্ন ভেঙে গেছে, চাইবারও আর কিছু নেই। ক্ষমা কর, চোরাবালির উপর সে স্বপ্নের প্রাসাদ গড়েছিলাম ঃ না, তোমার দোষ দিচ্ছি না, দোষটা হয়তো আমারই, সে চোরাবালি হয়তো আমারই অক্ষমতা। কিন্তু অনেক আশা নিয়ে গড়েছিলাম, এখনও তার ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে।"

"এত কবিত্ব কেন হঠাৎ"—হাসতে হাসতে সুরূপিণী বললেন। তাঁর হাসির মধ্যেও যেন প্রচ্ছন্ন কান্নার সুর বেজে উঠল। একটা নামহীন বেদনা, অজানা আকুতি ধীরে ধীরে মূর্ত হতে লাগল যেন মনের মধ্যে।

"তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি?"

"বলছি, কিন্তু বলতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বলতেই হবে—দেখ সুরূপিণী, যাই ঘটে থাকুক, তবু আমি তোমার স্বামী, হয়তো বোকা, হয়তো অযোগ্য, কিন্তু তবু আমি তোমাকে এখনও ভালোবাসি। কিন্তু মনে রেখো"—হঠাৎ দৃঢ় পরুষকণ্ঠে বলে উঠলেন গন্ধরাজ—"আমি অনুনয় করতে আসিনি। প্রেম দিয়ে আমাকে যদি গ্রহণ করতে না পার, করুণা দিয়ে পারবে না। করুণা আমি চাই না, তা আমি প্রত্যাখ্যান করব। ঈর্ষা? ঈর্ষার কোন সঙ্গত কারণ তো দেখতে পাইনি। যে কুকুরটা বিচালির গাদার উপর বসে গরুকে বঞ্চিত করছে তার আচরণ কুকুরদেরই বিচার্য, কুকুররাই তাকে উপহাস করুক, আমি কিছু বলব না। কিন্তু জগতের চক্ষে আমি এখনও তোমার স্বামী, স্বামীর প্রতি যে ব্যবহার করা উচিত তা কি তুমি করেছ? আমি নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে রেখে তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি, তোমার কোনও ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিনি। প্রতিদানে কি দিয়েছ তুমি আমাকে? তুমি তো মাত্রা ঠিক রাখতে পারনি, হিসেব করে চলনি, অবিবেচকের মতো যা তা করে বসে আছ। কিন্তু আমরা যেখানে আছি, সেখানে সকলের দৃষ্টি আমাদের উপর, পান থেকে চুন খসবার জো নেই, শোভনতা শালীনতা এসব বজায় রাখতেই হবে। কেলেঙ্কারি হয়তো সহজে এড়ানো যায় না, কিন্তু ওর দংশন সহ্য করা শক্ত।"

"কেলেঙ্কারি!"—প্রায় যেন চীৎকার করে উঠলেন সুরূপিণী—"তাহলে কেলেঙ্কারির কথা বলতেই তুমি এসেছ, তাই এত ভণিতা—"

"যা অন্তর থেকে অনুভব করছি, তাই বলবার চেষ্টা করেছি। আমি বলেছি আমি তোমাকে ভালোবাসি—যদিও সে ভালোবাসা তোমার কাছে মূল্যহীন—কোনও স্বামীর পক্ষে এই তিক্ত সত্যটা মেনে নেওয়া শক্ত। কিন্তু তবু আমি কোনও কিছু গোপন না রেখে সব তোমাকে বলেছি যাতে তোমার মনে কোনও আঘাত না লাগে। যখন বলতে আরম্ভ করেছি তখন শেষ পর্যন্ত সব বলব।"

"হাঁ, বলতেই হবে। কিসের কেলেঙ্কারি?"

গন্ধরাজের মুখটা লাল হয়ে উঠল।

"যা বলতে বাধ্য হচ্ছি তা না বলাই ভালো ছিল। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, কপিঞ্জলের সঙ্গে মেলামেশাটা একটু কম কর।"

"কপিঞ্জলের সঙ্গে? কেন!"

"ওইটেই কেলেঙ্কারির কারণ, সুরূপিণী। চারদিকে ঢি ঢি পড়ে গেছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি আমি। আমার বিশ্বাস তোমার বাবা মা যদি শোনেন তাঁরাও পাবেন।"

"তোমার মুখেই প্রথম একথা শুনলাম। এজন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

"হয়তো না-শোনার একটা হেতু আছে। তোমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমিই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি—"

"আমার বন্ধুবান্ধবদের কথা থাক। তারা ভিন্ন জাতের লোক। তুমি এসে সাড়ম্বরে তোমার ভাবাবেগের তুফান বইয়ে দিলে! কতদিন পরে এলে বল তো? শেষবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল? তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার রাজ্য আমি শাসন করেছি, কারও সাহায্য না নিয়ে। যা পুরুষের কাজ তা করে করে আমি যখন ক্লান্ত এবং তোমার খেয়াল-খুশির খেলা

খেলে তুমিও যখন শ্রান্ত—তখন তুমি এসে দাম্পত্য-প্রণয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে তিরস্কার আর বক্তৃতার আড়ম্বর করছ। একটা কথা তোমার মনে রাখা উচিত রাজ্যশাসনের কাজ চালিয়ে বধূর ভূমিকায় নিখুঁত থাকা যায় না। আমরা, রাজারাজড়ারা, কেলেঙ্কারির আবহাওয়াতেই তো অভ্যস্ত। তুমি একজন মহারাজা, তোমার এ কথাটা জানা উচিত ছিল, লোকনিন্দাই তো আমাদের অঙ্গের ভূষণ। তোমার এ ব্যবহারের প্রশংসা করতে পারলাম না। ওই কুৎসা কি তুমি বিশ্বাস কর?"

"করলে আমি কি এখানে আসতাম—"

"বিশ্বাস কর কি না আমি জানতে চাই"—হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেলেন সুরূপিণী—"যদি বিশ্বাস করে থাক—ধর যদি বিশ্বাস করে থাক—"

"তাহলেও আমি সে বিশ্বাসকে অবিশ্বাসে রূপান্তরিত করা আমার কতর্ব্য বলে মনে করতাম।"

"বুঝতে পেরেছি। নীচতা ছাড়া তোমার মধ্যে আর কিছু নেই।"

"সুরূপিণী"—অবশেষে গন্ধরাজ যেন জেগে উঠলেন—"থাক্, ঢের হয়েছে। তুমি জেদ করে আমাকে ভুল বুঝছ, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছ ইচ্ছে করে। তোমার বাবা মায়ের নামে, আমার নামে আমি তোমাকে বলছি—সাবধান হও।"

"এটা কি অনুরোধ মহারাজ?"

"ইচ্ছে করলে আমি আদেশ করতেও পারতুম।"

"আইন অনুসারে বন্দীও করতে পার আমাকে। তা না করা পর্যন্ত তোমার কথা মানতে পারব না।"

"এতদিন যা করে এসেছ তাই করবে?"

"ঠিক তাই করব। এই প্রহসন শেষ হয়ে গেলেই আমি প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জলকে ডেকে পাঠাব। বুঝতে পেরেছ?"

"এই বলে উঠে পড়লেন সুরূপিণী, বললেন—"এ ছাড়া আর আমার কোনও বক্তব্য নেই।"

"একটি অনুরোধ তাহলে করব আবার"—গন্ধরাজ শান্ত কণ্ঠেই বললেন, যদিও তাঁর ভিতরটা রাগে পুড়ে যাচ্ছিল—"তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও। চল একসঙ্গে আর একবার আমাদের এই পুরোনো বাড়িটা ঘুরে আসি। বেশীক্ষণ সময় লাগবে না। এই আমার শেষ অনুরোধ।"

"শেষ? ভালোই তো, শুনে খুশী হলাম। চল—"

হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি, গন্ধরাজও ধরলেন সেটা, উভয় পক্ষেই যেন সাড়ম্বর অভিনয় হল একটা। কপিঞ্জল যে গোপন দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সেই দরজাটা দিয়ে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা। বাগানের ধারে দু একটা জনবিরল লম্বা দালান পার হয়ে গন্ধরাজের ঘরগুলোর কাছে এসে হাজির হলেন অবশেষে। প্রথম ঘরটিই অস্ত্রাগার, নানা দেশের নানা রকম অস্ত্র টাঙানো আছে সেখানে। ঘরের সামনেই বেশ বড় একটা নির্জন ছাদ।

"তুমি কি হত্যা করবে বলে আমাকে এনেছ?"—প্রশ্ন করলেন সুরূপিণী।

"না, শুধু দেখাবার জন্য। চল, পার হয়ে যাই এটা।"

এর পরেই গ্রন্থশালা। সেখানে একজন বৃদ্ধ কঞ্চুকী বসে ঢুলছিলেন। রাজদম্পতীকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলেন তিনি, জিজ্ঞাসা করলেন কোন আদেশ আছে কি না।

"এখানেই থাকুন আপনি, যদি কিছু দরকার হয়—"

এরপরই ছবির ঘরে ঢুকলেন তাঁরা। সামনেই সুরূপিণীর ছবিটা ঘরটাকে আলো করে টাঙানো ছিল। বধূবেশিনী সুরূপিণী, মাথায় লাল লাল গোলাপ ফুলগুলো যেন জীবন্ত। গন্ধরাজ কোন কথা না বলে সেদিকে আঙুল তুলে দেখালেন। সুরূপিণীও চোখ তুলে দেখলেন নীরবে। এরপরই তাঁরা দামী মাদুর-পাতা একটা বড় দালানে প্রবেশ করলেন। সে দালানে চারটি ঘরের চারটি দরজা। একটি দরজা গন্ধরাজের শয়নকক্ষের, আর একটি সুরূপিণীর ঘরের। এখানে এসে গন্ধরাজ সুরূপিণীর হাত ছেড়ে দিলেন। এতক্ষণ ছাড়েননি। হাত ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে খিল লাগিয়ে দিলেন ঘরে।

"এ ঘরে অনেকদিন ভিতর থেকে খিল পড়েনি, বাইরে থেকেই পড়েছে" বললেন গন্ধরাজ।

"একটা খিলই যথেষ্ট"—তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন সুরূপিণী—"ব্যাস্, এই তো? না, আর কিছু করবে।"

"না, আর কিছু করবার নেই। তোমাকে কি আবার ফিরে রেখে আসব?"

"তোমার সঙ্গে নয়, কপিঞ্জলের সঙ্গে আমি ফিরে যেতে চাই।"

গন্ধরাজ কঞ্চুকীকে ডাকলেন।

"প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জল যদি প্রাসাদে থাকেন, বল মহারাণী তাঁকে ডাকছেন।"

কঞ্চুকী চলে গেলেন।

"তোমাকে খুশী করতে আর কিছু করতে পারি কি সুরূপিণী?"

"না, আর কিছুর দরকার নেই। আমার খুশির ভরা উপচে উঠেছে।"

"এইবার"—গন্ধরাজ বলতে লাগলেন—"সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিলাম তোমাকে। আমাকে বিয়ে করে বড়ই দুঃখ পেয়েছ তুমি।"

"দুঃখ!"—এই একটি কথা কেবল উচ্চারণ করলেন সুরূপিণী।

"অনেকে এই দুঃখের ভার লঘু করতে চেষ্টা করেছে, আমি আরও হালকা করে দিলুম। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমার পিতৃপুরুষের নামটা এখনও তোমার নামের সঙ্গে জুড়ে রইল। ও নামের যেন কোনও অমর্যাদা না হয় এইটি শুধু দেখো!"

"কপিঞ্জল আসতে বড়ই দেরি করছেন তো"—সুরূপিণী এর জবাবে এই শুধু বললেন।

"সুরূপিণী, সুরূপিণী"—আর কিছু বলতে পারলেন না গন্ধরাজ।

সুরূপিণী একটা জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরেই কঞ্চুকী খবর দিলেন কপিঞ্জল এসেছেন। কপিঞ্জল যখন ভিতরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর চোখ কপালে উঠেছে, মুখ বিবর্ণ। আকস্মিক অপ্রত্যাশিত এই আহ্বানে তিনি যেন ঈষৎ দিশাহারা হয়ে পড়েছেন মনে হল। সুরূপিণী ঘুরে দাঁড়ালেন জানলা থেকে। তাঁর চোখে মুখে হাসি চিকমিক করছে। গাল আর কানের পাশ দুটো লাল হয়ে ছিল তখনও, এ ছাড়া তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের আর কোন চিহ্ন বোঝা যাচ্ছিল না। গন্ধরাজকেও ঈষৎ বিবর্ণ দেখাচ্ছিল কেবল, কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।

"মন্ত্রীমশায়"—গম্ভীর ভাবে বললেন তিনি—"একটু কষ্ট দিলাম আপনাকে। আপনি মহারাণীকে তাঁর কক্ষে পৌঁছে দিয়ে আসুন।"

হাত বাড়িয়ে দিলেন কপিঞ্জল, যদিও তখনও তিনি অকূল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন মনে মনে। সুরূপিণী হাসিমুখে তাঁর হাত ধরলেন এবং পাশাপাশি যেন পাল তুলে বেরিয়ে গেলেন ছবিঘরের ভিতর দিয়ে।

তাঁরা চলে যাওয়ামাত্রই গন্ধরাজ বুঝতে পারলেন ব্যর্থ হয়ে গেল সব, হেরে গেলেন তিনি। তিনি যা করবেন ভেবে এসেছিলেন ঠিক তার উল্টোটা হয়ে গেল। বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। এই চরম নিদারুণ পরিণতিটার মধ্যে হাসির উপাদান আছে, হঠাৎ এটা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসেও উঠলেন, যদিও রাগে তাঁর বুক পুড়ে যাচ্ছিল। তারপরই দুঃখ হল খুব, তীক্ষ্ণ মর্মন্তুদ দুঃখ। কিন্তু দুঃখও বেশীক্ষণ রইল না। সব কথা মনে পড়ল যখন তখন রাগ হল আবার, ভয়ঙ্কর রাগ। মন-স্থির করতে পারছিলেন না তিনি। নিজের মতিভ্রম আর নপুংসকতার গ্লানি হঠাৎ যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুনের মতো। অস্থির হয়ে উঠলেন। নিজের প্রতিই করুণা হতে লাগল।

বাঘের মতো পরিক্রমণ করতে লাগলেন তিনি ঘরের মধ্যে। মনে হতে লাগল মুহূর্তের মধ্যে হয়তো ভয়ানক একটা কিছু করে বসবেন। পিস্তল যেমন হঠাৎ খুন করে পরমুহূর্তেই পদাহত হয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, মনে হল তিনিও বুঝি করে ফেলবেন তেমনি কিছু একটা। লম্বা দালানটায় পায়চারিই করে যেতে লাগলেন তিনি, নানা অনুভূতির দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে রুমালটা দুহাতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে। সমস্ত চেতনাকে একাগ্র উদগ্র করে তিনি মনে মনে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন। পিস্তলে গুলি ভরাই ছিল। ঈর্ষার তাড়না যখন মনের কোমল বৃত্তিগুলোর উপর কশাঘাত করছিল, যখন সুরূপিণীর নানাভঙ্গীর বহ্নি-মূর্তি মানসচক্ষে ভেসে উঠছিল, তখন ভয়াবহ হয়ে উঠছিল তাঁর আর্ত মুখ-ভাব। ঈর্ষাকে তিনি আমলে আনতে চাইছিলেন না, কিন্তু দংশন করতে ছাড়ছিল না তা। এই মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি ভাবতে পারছিলেন না যে সুরূপিণী সত্যিই দোষী। সুরূপিণী কলঙ্কিনী নয় এই বিশ্বাসকেই তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছিলেন; কিন্তু সন্দেহ তবু উঁকি মারছিল, সম্ভাবনাকে তিনি অস্বীকার করতে পারছিলেন না, আর সেই জন্যেই ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, নানা দুঃখের বোঝার উপর এই সন্দেহের শাকের আঁটিটা দুর্বহ মনে হচ্ছিল তাঁর।

এমন সময় দুয়ারে টোকা পড়ল। কুঞ্চুকী এসে একটি ছোট চিঠি দিলে তাঁকে। চিঠিটা নিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে পিষে ফেললেন সেটাকে, পড়লেন না। যেমন পরিক্রমণ করছিলেন তেমনি করতে লাগলেন। উদ্দাম ঝড় তেমনি বইতে লাগল মনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হল চিঠিতে কি আছে সেটা পড়ে দেখা উচিত। পেন্সিলে লেখা একলাইন চিঠি ইন্দীবর ভারতী পাঠিয়েছেন—

রাজপরিষদের অধিবেশন গোপনে এবং অবিলম্বে আহূত হয়েছে।

ই. ভা.

নিয়মিত সময়ের পূর্বে এবং গোপনে পরিষদের অধিবেশন ডাকবার মানে? একটি মানেই প্রতিভাত হল গন্ধরাজের মনে। পাছে অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে তিনি কিছু বাধা দেন সেই

ভয়ে এ কাজ করা হয়েছে। ভয়ে ঃ কথাটা বড় আরামদায়ক মনে হল। ইন্দীবর—তাঁর বন্ধু ইন্দীবর ভারতী—যে তাঁকে বরাবর খামখেয়ালী গ্রাম্য লোক বলে ভেবে এসেছে—সে-ও তাঁকে সময়ে খবরটা দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে ঃ মানে, ইন্দীবরও তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা করছে। বেশ, তাকে হতাশ করবেন না গন্ধরাজ। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র এবার রাহুমুক্ত হয়ে পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করবে আকাশে। তিনি তাঁর পরিচারককে ডাকলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক করে নিলেন সাড়ম্বরে। গোঁফের ডগা পাকিয়ে আতর লাগালেন তাতে, ঠিক করে নিলেন অবিন্যস্ত কেশদাম, অলঙ্কৃত করলেন নিজেকে। তারপর মনোহর বেশে এগিয়ে গেলেন একাই পরিষদকক্ষের দিকে।

।। এগারো।।

ইন্দীবর ভারতী ঠিকই খবর দিয়েছিলেন। ভগীরথ শর্মাকে মুক্তিদান, মহাধ্যক্ষ কুজ্ঝটিকুমারের দুরু-দুরু-হৃদয়ের সভয় নিবেদন এবং পরিশেষে সুরূপিণীর সঙ্গে গন্ধরাজের সাক্ষাৎকার—এই সমস্ত বিবেচনা করে ষড়যন্ত্রকারীরা শেষে সাহস করে ভীরুর মতো গোপনে এবং অসময়ে রাজপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করাই ঠিক করেছিলেন। একটু তাড়াহুড়ো করতে হয়েছিল অবশ্য, রাজপোশাক পরিহিত পরিচারকদের চিঠি নিয়ে ছুটোছুটি করতে হয়েছিল নানা দিকে । অবশেষে সাধারণ সময়ের এক ঘণ্টা পূর্বে পরিষদকক্ষে সদস্যরা এসে সমবেত হলেন।

সদস্যসংখ্যা খুব বেশী নয়। কপিঞ্জল সদস্যসংখ্যা অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁরা রাজ্যের 'হাতিয়ার' তাঁরাই অধিষ্ঠিত ছিলেন সদস্যপদে। পাশের একটি টেবিলে তিনজন সম্পাদক বসে ছিলেন। সুরূপিণী ছিলেন সভানায়িকা। তাঁর ডাক দিকে ছিলেন কপিঞ্জল, বাঁ দিকে কুজ্ঝটিকুমার। আর একদিকে ছিলেন কোষাধ্যক্ষ শঙ্করদেব, গভীরা দেবীর স্বামী। তাঁর পাশে ছিলেন অঞ্জনা দেবীর স্বামী রঘু বর্মন। আর তাঁদের মধ্যে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে বসেছিলেন ইন্দীবর ভারতী। গন্ধরাজই তাঁকে সদস্যপদে মনোনীত করেছিলেন অনেক আগে। অন্য কোনও কারণে নয়, সদস্যের বেতন পেলে তাঁর জীবনটা আর একটু স্বচ্ছন্দ হবে এই জন্য। তিনি কখনও কোনও অধিবেশনে আসতেন না, তাই সদস্যপদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করবার কথা কপিঞ্জলের মনেই হয়নি। অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁকে এই অধিবেশনে উপস্থিত দেখে সবাই যেন বিব্রত বোধ করছিলেন একটু। কপিঞ্জল ভ্রূকুটিকুটিল মুখে চেয়েছিলেন তাঁর দিকে। তাঁর পাশে রঘু বর্মন বসে ছিলেন, কপিঞ্জলের চোখের দৃষ্টি দেখে তিনি ইন্দীবরের কাছ থেকে সরে বসলেন একটু। তাঁর মনে হল যার উপর কপিঞ্জল প্রসন্ন নন তাঁর কাছে বসাটা নিরাপদ নয় ঠিক।

"মহারাণী"—কপিঞ্জল বললেন—"দেরি হয়ে যাচ্ছে, এবার আমরা কাজ আরম্ভ করব কি?"

"হ্যাঁ অবিলম্বে।"

"মহারাণী, একটু বাধা দিচ্ছি, ক্ষমা করবেন"—ইন্দীবর বললেন—"আপনারা হয়তো জানেন না মহারাজা রাজধানীতে ফিরে এসেছেন।"

"জানি, কিন্তু তিনি অধিবেশনে আসবেন না"—তাঁর কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল একটু—"মহাধ্যক্ষ মশাই আমাদের প্রস্তাবগুলো এবার পড়া হোক একে একে। ভৈরঙ্গীর সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আছে না?"

একজন সম্পাদক একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন।

"হ্যাঁ, এই যে সেই প্রস্তাব। পড়ব কি?"

"পড়বার দরকার নেই। ওতে কি আছে আমরা জানি। মহারাণীর সমর্থন আছে তো?"

"নিশ্চয়ই"

"তাহলে ওটা 'পঠিত' বলে ধরে নেওয়া হোক। মহারাণী কি স্বাক্ষর করবেন?"

মহারাণী স্বাক্ষর করলেন। কপিঞ্জল, রঘু বর্মন, শঙ্করদেব তার পর স্বাক্ষর করলেন একে একে। তারপর কাগজটা ইন্দীবরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তাঁরা। ইন্দীবর সই না করে ধীরে সুস্থে পড়তে শুরু করে দিলেন প্রস্তাবটা।

"আমাদের সময় বড় কম, ভারতী মশায়,"—অসভ্যের মতো বলে উঠলেন কপিঞ্জল—"যে প্রস্তাবে স্বয়ং মহারাণীর সমর্থন আছে তাতে স্বাক্ষর করতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, তাহলে কাগজটা পাশের লোককে দিন। কিংবা যদি ইচ্ছা করেন আপনি সভাকক্ষ থেকে চলে যেতেও পারেন।"

"মাপ করবেন, আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না, মন্ত্রী মশায়। আমি আবার বলছি আমাদের মহারাজা এখনও পরিষদে আসেননি"—এই বলে আবার তিনি শান্তভাবে পড়তে শুরু করলেন। বাকী সকলে রাগে গরগর করতে করতে পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগলেন ব্যর্থ আক্রোশে। পড়া শেষ করে অবশেষে তিনি বললেন, "মহারাণী এবং সদস্যগণ, এ প্রস্তাবটি তো যুদ্ধঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয় দেখছি।"

"আর কিছু নয়!"—সুরূপিণীর চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে উঠল।

"গর্জনগাঁওয়ের মহারাজা এখন এখানে আছেন। আমি চাই—হ্যাঁ, জোর দিয়েই বলছি—আমি চাই যে তাঁকে খবর দিয়ে এখানে ডেকে আনা হোক। কেন বলছি তা নিয়ে বাগবিস্তার করা আমি নিরর্থক মনে করি। আশা করি এই বদ মতলবের জন্য—যা বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর—আপনারা সবাই মনে মনে লজ্জিত।"

সমুদ্রের মতো উত্তাল হয়ে উঠল পরিষদ। নানা রকম চীৎকার উঠল। কপিঞ্জল সগর্জনে বলে উঠলেন—"আপনি মহারাণীকে অপমান করছেন।"

এর কোন জবাব না দিয়ে ইন্দীবর শান্ত কণ্ঠে কেবল বললেন—"আমার প্রতিবাদ থেকে এক চুলও আমি নড়ব না।"

কলরব যখন তুমুল হয়ে উঠেছে তখন সভাকক্ষের কপাটটা খুলে গেল। প্রতিহারী ঘোষণা করল—"মহারাজ এসেছেন।" মৃদু হাসতে হাসতে খুব সহজ স্বচ্ছন্দ চালে প্রবেশ করলেন গন্ধরাজ। ফুটন্ত ডালের হাঁড়িতে যেন তেল পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যেকেই বসে পড়লেন নিজের নিজের জায়গায়। কুজ্ঝটিকুমার ভান করলেন যেন তিনি কাগজপত্র নিয়েই মগ্ন ছিলেন, গম্ভীরভাবে কাগজপত্রই ওলটাতে লাগলেন। এই কপটতায় কিন্তু একটা জিনিস বিস্মৃত হলেন সকলে। মহারাজকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন না কেউ।

"সভাসদগণ"—থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন গন্ধরাজই।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন সদস্যরা। আচরণের এই গাফিলতিতে সবাই আরও যেন ঘাবড়ে গেলেন, বিশেষ করে যাঁরা দুর্বলচিত্ত, তাঁরা।

গন্ধরাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন টেবিলের দিকে। তারপর আবার থামলেন একটু। কুজ্‌ঝটিকুমারের দিকে চেয়ে বললেন—"অধিবেশনের সময় যে আপনারা বদলেছেন তা আমাকে জানানো হয়নি কেন?"

"মহারাজ..." মহাধ্যক্ষ বললেন, "মহামান্যা মহারাণী..."

আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি, থেমে গেলেন আমতা আমতা করে।

সুরূপিণী বললেন—"আমার ধারণা ছিল তুমি পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবে না।"

এক মুহূর্তের জন্য চারিচক্ষুর মিলন হল, সুরূপিণীর চক্ষু নত হল পরমুহূর্তেই। এই মিথ্যাচারের আহূতিতে তাঁর অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রোধবহ্নি আরও যেন জ্বলে উঠল।

"এবার আপনারা বসুন সবাই"—গন্ধরাজ নিজের আসনে উপবেশন করলেন।

"আমি অনেকদিন এখানে ছিলাম না। অনেক কাজ নিশ্চয় জমে গেছে। কিন্তু কাজে হাত দেবার আগে কোষাধ্যক্ষ শঙ্করদেবকে অনুরোধ করছি তিনি অবিলম্বে আমাকে রাজকোষ থেকে দশ হাজার টাকা এনে দিন আগে। আমার নামে খরচ লিখে রাখুন এটা—"

শঙ্করদেব সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

"দশ হাজার টাকা!"—সুরূপিণী প্রশ্ন করলেন—"কিসের জন্য?"

হেসে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ—"আমার নিজেরই দরকার আছে।"

কপিঞ্জল টেবিলের নীচে পা চালিয়ে খোঁচা দিলেন শঙ্করদেবকে। শঙ্করদেব তো তাঁর হাতের পুতুলমাত্র। তিনি শুরু করলেন—"মহারাজ যদি জানান যে কি বাবদ টাকাটা খরচ হবে—"

"মহারাজের জবাবদিহি তলব করবার অধিকার কে দিলে আপনাকে!" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

শঙ্করদেব অসহায় ভাবে চাইলেন প্রভু কপিঞ্জলের দিকে। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন তাঁর সাহায্যে। মধুর কণ্ঠে প্রতিটি কথা ওজন করে করে বললেন—"শঙ্করদেবের আচরণে মহারাজের আশ্চর্য হওয়ার সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমি জানি আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ করবার কল্পনাও উনি করতে পারেন না। কিন্তু ওঁর উচিত ছিল গোড়াতেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা আপনাকে। বর্তমানে আমাদের রাজকোষ অর্থশূন্য, যা অর্থ ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে, মানে সেটা অন্য একটা দরকারী ব্যাপারে আটকে পড়েছে। সেটা কি তা আপনাকে বলছি। আশা করি এক মাসের মধ্যে নিঃসন্দেহে আমরা মহারাজের আদেশ পালন করতে পারব। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ওই সামান্য দশ হাজার টাকাও দিতে আমাদের রাজকোষ অক্ষম। মহারাজকে হতাশ করতে হল বলে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। আপনার আদেশ পালন করতে আমাদের আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু বর্তমানে আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।"

"কোষাধ্যক্ষ মশাই, রাজকোষে এখন কত অর্থ আছে?"—ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"মহারাজ"—প্রতিবাদের ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন শঙ্করদেব—"রাজকোষের প্রতিটি কপর্দক এখন নিতান্ত প্রয়োজন আমাদের—"

"আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন, শঙ্করদেব"—বিদ্যুতের দীপ্তি চমকে উঠল গন্ধরাজের দৃষ্টিতে। পাশের টেবিলের দিকে চেয়ে বললেন, "সম্পাদক মশাই, রাজকোষের হিসাবের খাতাটা আমাকে দিন তো।"

শঙ্করদেব বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন ঃ কুজ্‌ঝটিকুমার ভাবছিলেন এইবার তাঁর পালা। মনে মনে ভগবানকে ডাকছিলেন তিনি। কপিঞ্জল মার্জারের মতো ওত পেতে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন সব। ইন্দীবর একটু অবাক হয়ে চেয়েছিলেন গন্ধরাজের দিকে। গন্ধরাজের পৌরুষের প্রমাণ পেয়ে মনে মনে খুব খুশী হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু বুঝতে পারছিলেন না এই সঙীন গুরুতর পরিস্থিতিতে টাকা-কড়ি নিয়ে কথাবার্তার অর্থ কি? নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এভাবে শক্তির অপব্যয় করা কি ঠিক হচ্ছে?

গন্ধরাজ হিসাবের খাতাটা দেখছিলেন।

বললেন, "দেখছি রাজকোষে এখন এক লক্ষ টাকা রয়েছে—"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই"—কপিঞ্জল বললেন—"কিন্তু বাজারে এখন আমাদের যা দেনা আছে, যদিও সৌভাগ্যক্রমে সবটা নগদ দেনা নয়, তা এই এক লাখ টাকায় শোধ হবে না। সেইজন্যে রাজকোষ থেকে এখন একটি কপর্দকও অন্য বাবদে খরচ করা চলবে না। করলে ঘোরতর অপরাধ হবে সেটা। যদিও খাতায় এক লাখ টাকা দেখছেন, আসলে কিন্তু রাজকোষ শূন্য। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম কেনবার জন্যে আমাদের একটা প্রস্তাবও উত্থাপিত হবে আজ—"

"যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম?" বিস্ময়ের চমৎকার অভিনয় করে বলে উঠলেন গন্ধরাজ—"যতদূর মনে পড়ছে গত মাঘ মাসে আমরা কিছু যুদ্ধের সরঞ্জাম কিনেছিলাম।"

"আরও কেনবার প্রয়োজন ঘটেছে। আমরা সম্পূর্ণ একটা গোলন্দাজবাহিনী সজ্জিত করেছি; পাঁচশ বন্দুক কেনা হয়েছে, কিছু কামানও, তাছাড়া মালবাহী অশ্বতরও সাতশো কিনতে হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তাবে লেখা আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ অনুগ্রহ করে প্রস্তাবটা দিন তো—"

ধূর্জটিপ্রসাদ আর একজন সম্পাদক। তিনি তাড়াতাড়ি প্রস্তাব-পত্রটা বাড়িয়ে ধরলেন।

"ব্যাপার শুনে মনে হচ্ছে আমরা যেন যুদ্ধযাত্রা করছি।"

"হ্যাঁ, করছিই তো"—সুরূপিণী বললেন।

"যুদ্ধ!"—উত্তেজিত বিস্মিত কণ্ঠে বললেন গন্ধরাজ—"কার সঙ্গে যুদ্ধ? গর্জনগাঁওয়ের শান্তি তো বহু শতাব্দী ধরে অটুট আছে। কে আমাদের আক্রমণ করেছে, কে আমাদের অপমান করতে সাহস করলে?"

ইন্দীবর বললেন, "মহারাজ, এই দেখুন যুদ্ধঘোষণার চরমপত্র। এই চরমপত্রে যখন সকলের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছিল, তখনই সৌভাগ্যক্রমে আপনি এসে পড়লেন।"

গন্ধরাজ কাগজটা তাঁর সামনে টেবিলে রাখলেন। এবং আঙুল দিয়ে টেবিলে বাজনা বাজাতে বাজাতে পড়তে লাগলেন সেটা।

"আমাকে কিছু না জানিয়েই কি আপনারা এই চরমপত্রটা পাঠাবেন ঠিক করেছিলেন?"

রঘু বর্মন ব্যাপারটাকে ঈষৎ লঘু করবার প্রয়াস পেলেন।

"শ্রীযুক্ত ইন্দীবর ভারতী এর প্রতিবাদ করেছেন। সই করেননি তিনি।"

"এ বিষয়ে যা কিছু চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে সব আমাকে দিন।"

সম্পাদক মশাই সব তাঁকে দিয়ে দিলেন। তিনি তখনই নিবিষ্টচিত্তে আগাগোড়া পড়তে শুরু করে দিলেন। ধৈর্যসহকারে অনেকক্ষণ পড়লেন। সদস্যরা বোকার মতো বসে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন কেবল। যে সম্পাদক তিনটি পাশের টেবিলে ছিলেন, মনে হল তাঁদের একটু স্ফূর্তি হয়েছে। রাজপরিষদে এ ধরনের গণ্ডগোল বিরল, কিন্তু যখন হয় তখন বেশ লাগে তাঁদের।

পড়া শেষ হলে গন্ধরাজ বললেন, "পড়ে বড়ই দুঃখ পেলাম। ভৈরঙ্গীর 'উর্বরা' জনপদের উপর আপনারা যে দাবি জানিয়েছেন তা ভিত্তিহীন এবং অন্যায়। ন্যায়ের বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই ওতে। এমন কি বৈঠকখানায় বসে ও নিয়ে ঘোঁট করবার মতোও মালমসলা নেই ওতে। আর এই নিয়ে আপনারা যুদ্ধঘোষণা করতে চাইছেন? আশ্চর্য কাণ্ড!"

"ঠিকই বলেছেন মহারাজ"—কপিঞ্জল উত্তর দিলেন সঙ্গে সঙ্গে—অন্যায়কে ন্যায় বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা যে হাস্যকর তা বোঝবার মতো বুদ্ধি তাঁর আছে। বললেন, "ঠিকই বলেছেন মহারাজ। 'উর্বরা'র উপর আমাদের দাবিটা ছুতো মাত্র ভান শুধু—"

"ও, তাই না কি! মহাধ্যক্ষ মশাই, আপনি কলমটা নিন, যা বলছি তা লিখুন। রাজপরিষদ"—তিনি বলতে শুরু করলেন, তারপর হঠাৎ থেমে সদস্যদের দিকে চেয়ে বললেন—"আমি যে মাঝে পড়ে সব থামিয়ে দিলাম সে কথাটা অবশ্য আমি গোপনই রাখব"—তারপর সুরূপিণীকে সম্বোধন করে বললেন—"আমার অগোচরে তোমরা যে এতবড় একটা কাণ্ড লুকিয়ে করতে যাচ্ছিলে, সে সম্বন্ধেও আমি নীরব থাকব! আমি যে ঠিক সময়ে এসে পড়তে পেরেছি, এতেই আমি খুশী। হ্যাঁ লিখুন—রাজপরিষদ সমস্ত ব্যাপারটি পুনরায় পর্যালোচনা করিয়া এবং ভৈরঙ্গী হইতে প্রাপ্ত শেষ চিঠিটা পাঠ করিয়া সানন্দে ঘোষণা করিতেছে যে তাঁহাদের সহিত ভৈরঙ্গীর মহামান্য রাজপরিষদে অভিব্যক্ত মতের বিন্দুমাত্র অনৈক্য নাই। তাঁহাদের অভিমত এবং সৌজন্যকে আমরা শ্রদ্ধা সহকারে সানন্দে স্বীকার করিয়া লইলাম। লেখা হয়েছে? এইটেই একটু ভাল করে গুছিয়ে লিখে ভৈরঙ্গীতে পাঠিয়ে দিন।"

"মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যে সব চিঠিপত্র আপনি পড়লেন সে সবের নেপথ্যে যা আছে তা মহারাজ পুরোপুরি জানেন না। আপনি যদি এখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে গুরুতর অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার ওই চিঠি যদি পাঠানো হয় তাহলে ভৈরঙ্গীর সঙ্গে গর্জনগাঁওয়ের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা বানচাল হয়ে যাবে।"

"গর্জনগাঁওয়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক! মন্ত্রীমশায়, আপনি মাত্রাবোধ হারিয়ে ফেলেছেন মনে হচ্ছে। শরবতের পেয়ালায় কেউ কি ছিপ ফেলে বা জাল ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করে?"

"মহারাজ যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা আমাকে বলতে অনুমতি দিন। শরবতের পেয়ালায় বিষ থাকতে পারে এ কথাটা মনে রাখা উচিত। আমরা রাজ্য বাড়াবার জন্যেই যে এ যুদ্ধ করতে যাচ্ছি তা নয়, আমাদের গৌরব বাড়াবার জন্যেও নয়। মহারাজ

ঠিকই বলেছেন, ক্ষুদ্র গর্জনগাঁওয়ের পক্ষে ও সব দুরাকাঙ্ক্ষা শোভা পায় না। কিন্তু গর্জনগাঁওয়ের মধ্যে নানা রকম দল হয়েছে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং আরও নানারকম তন্ত্র মাথা চাড়া দিয়েছে, বড় দল ছোট দল নানা রকম দল গজিয়ে উঠেছে আপনার সিংহাসনের চারিপাশে।"

"সে কথা আমি শুনেছি, মন্ত্রীমশাই"—গন্ধরাজ বললেন—"কিন্তু আপনি যখন বলছেন তখন তার গুরুত্ব আছে এ কথা আমি অস্বীকার করব না।"

"আপনার একথা শুনে সম্মানিত হলাম মহারাজ"—কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে কপিঞ্জল বলে চললেন—"এই সব কথা ভেবেই আমরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি ঠিক করেছি। গর্জনগাঁওয়ের লোকেদের মনটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া নিতান্ত দরকার, বেকারদের কাজ পাওয়া অত্যন্ত দরকার। আপনার শাসনকে জনপ্রিয় করতে হলে এসব প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন খাজনা কমিয়ে দেওয়া, একবারে যতটা বেশী সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। এই যুদ্ধ—অবশ্য খুব বাড়িয়ে না বললে এটাকে যুদ্ধ বলা যায় না—এই যুদ্ধ কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান করতে পারবে, রাজপরিষদের তাই মনে হয়েছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতিই লোকের মনে একটা সাড়া জাগিয়েছে। এ যুদ্ধে আমাদের যদি জয় হয় তাহলে আমাদের আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। আশার অতিরিক্তও হয়তো হবে।"

"আপনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, মন্ত্রীমশাই"—গন্ধরাজ বললেন—"আপনার কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। এ যাবৎ আপনার সম্যক সমাদর আমি করিনি।"

একথা শুনে সুরূপিণীর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন বাজি মাৎ হয়ে গেছে। কপিঞ্জল কিন্তু অপেক্ষা করতে লাগলেন মনে মনে সশস্ত্র হয়ে। দুর্বল যখন বিদ্রোহ করে তখন সহজে তাকে নোয়ানো যায় না—এ জ্ঞান তাঁর ছিল।

গন্ধরাজ বললেন, "রাজ্যরক্ষার জন্য যে সৈন্যবাহিনীর তোড়জোড় আপনারা করেছিলেন আর যাতে আমাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আপনারা মত করিয়েও নিয়েছিলেন—তার গোপনে গোপনে এই উদ্দেশ্য ছিল না কি!"

"আমার বিশ্বাস তাতে সুফলই ফলেছে"—উত্তর দিলেন কপিঞ্জল—"কুচকাওয়াজ করা, ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দেওয়া—এইসব জিনিস জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখে বই কি। কিন্তু একটা কথা আমি স্বীকার করব যখন রাজ্যরক্ষা সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থা হল, তখন কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে রাজ্যের বিদ্রোহী দল এতদূর এগিয়ে গেছে। আর এ-ও আমাদের ধারণা ছিল না যে এই রাজ্যরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গণতান্ত্রিক দলের বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।"

"আছে না কি?"—গন্ধরাজ প্রশ্ন করলেন—"আশ্চর্য! এ কথা কেন মনে হচ্ছে আপনার।"

"মনে হচ্ছে, কারণ নেতারা ঠিক করেছিলেন যে রাজ্যরক্ষা বাহিনীর সৈন্যরা জনসাধারণের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবেন। সুতরাং যদি সিংহাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহ করে তাহলে এই সৈন্যবাহিনীর উপর আস্থা রাখা যাবে না। ওরা হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করবে।"

"ও"—গন্ধরাজ বললেন—"এইবার বুঝতে পারছি।"

"মহারাজ তাহলে বুঝতে পেরেছেন?"—বিনয়ে বিগলিত হয়ে কপিঞ্জল বললেন—"কি বুঝেছেন তা কি খুলে বলবেন মহারাজ।"

"বিদ্রোহের ইতিহাস"—গন্ধরাজ নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তারপর বললেন—"যাক্ আপনি এসব থেকে কি সিদ্ধান্তে এসেছেন?"

"আমার সিদ্ধান্ত মহারাজ মোটেই জটিল নয়"—কপিঞ্জল খোঁচাটা হজম করে অকম্পিত কণ্ঠে বললেন—"যুদ্ধ জনপ্রিয়, লোকে যুদ্ধ চায়। কাল যদি যুদ্ধের গুজবটার প্রতিবাদ হয় অনেকেই হতাশ হবে, আর এখন চারিদিকে যে রকম উত্তেজনা সামান্য ফুলকি পড়লেই দাবানল জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে চতুর্দিকে। বিপদ ওইখানেই। বিদ্রোহ তো আসন্ন, আমরা একটা আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে আছি, যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে।"

"তাই যদি হয় তাহলে এখন আমাদের একত্রিত হয়ে সম্মানজনকভাবে বাঁচবার উপায় চিন্তা করতে হবে।"

ইন্দীবর ভারতী যখন যুদ্ধ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন তখন থেকে সুরূপিণী মাত্র গুটি কয়েক কথা বলেছিলেন। আরক্তবদনে আনমিত নয়নে, মেঝের উপর মাঝে মাঝে অধীর ভাবে পা ঠুকে আত্মসংবরণ করে বীরের মতো নীরবে বসেছিলেন তিনি। কিন্তু গন্ধরাজের এই কথায় তিনি আত্মসংযম হারিয়ে ফেললেন।

"উপায়!—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি—"তোমার বোঝবার অনেক আগেই তা আবিষ্কৃত হয়েছে। কাগজ তো তোমার সামনেই পড়ে রয়েছে। অবিলম্বে সই করে দাও, অযথা দেরি কোরো না।"

"মহারাণী" স্নিগ্ধ কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে গন্ধরাজ বললেন—"আমি শুধু 'উপায়' বলিনি। সম্মানজনক উপায় বলেছি। আমার মতে এবং প্রধান মন্ত্রীর বিবরণ অনুসারে এক্ষেত্রে যুদ্ধ মোটেই বাঞ্ছনীয় সদুপায় নয়। আমরা যদি গর্জনগাঁওয়ের প্রজাদের সুশাসন করতে অসমর্থ হয়ে থাকি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ভৈরঙ্গীর লোকের রক্তপাত করে করতে হবে? না সুরূপিণী, আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে তা হতে আমি দেব না। কিন্তু যে সব কথা আজ আমি প্রথম শুনলাম—কেন আজই প্রথম শুনলাম তার জবাবদিহি আমি চাইছি না কারো কাছে—কিন্তু যা শুনলাম তা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এ সমস্যার সমাধান আমাকে করতেই হবে যেমন করে হোক।"

"কিন্তু যদি না পার?"

"না পারলে তার ফল আমি নিজেই ভোগ করব। বিদ্রোহের অঙ্কুর দেখা দিলেই আমি সমস্ত প্রজাদের আমন্ত্রণ করে বলব, তোমরা যদি বল আমি এখনই সিংহাসন ত্যাগ করছি।"

রোষভরে হেসে উঠলেন সুরূপিণী—"এই লোকের জন্যে আমরা খেটে মরছি! রাজ্যে কি পরিবর্তন এসেছে তা আমরা বললাম, উনি বললেন আমি উপায় উদ্ভাবন করব। উপায়টা কি? সিংহাসনত্যাগ! যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমার রাজ্য চালাচ্ছে শেষ মুহূর্তে এসে তাদের সব কাজ পণ্ড করে দিতে তোমার লজ্জা করে না? তুমি এতদিন কি করেছ তা কি তোমার মনে নেই? আমি একা এখানে থেকে তোমার মানমর্যাদা রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি, ভালো ভালো বিজ্ঞ লোকেদের পরামর্শ নিয়েছি, তুমি তো কেবল শিকার করে ফূর্তিতে দিন কাটিয়েছ। অনেক ভেবেচিন্তে, অনেক দূরদর্শিতা সহকারে আমি এতদিন ধরে যে উপায় ঠিক করে রেখেছি, তুমি হঠাৎ একদিন সকালে এসে তা সব পণ্ড করে দিয়ে বাহাদুরি দেখাচ্ছ"—হঠাৎ সুরূপিণীর বাক্‌রোধ হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্য। সামলে নিয়ে আবার তিনি শুরু করলেন—"সব তছনচ করে দিয়ে আবার তো তুমি তোমার খেয়াল-খুশির স্রোতে গা ভাসিয়ে

দেবে। আবার আমরা যখন খেটেখুটে ভেবেচিন্তে সব ঠিকঠাক করব, তখন ফের তুমি হঠাৎ এসে সব উলটে-পালটে দেবে। যা করবার তোমার বুদ্ধি নেই, যা জানবার জন্যে তুমি কোনও চেষ্টা কখনও করনি তা ভেঙেচুরে দিতে এতটুকু সঙ্কোচ হয় না তোমার! এ আর সহ্য করা যায় না। আশ্চর্য, তোমার কি এতটুকু হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই? যে সিংহাসনে বসবার তোমার একটুও যোগ্যতা নেই সেই সিংহাসনের সুযোগে তুমি যা-খুশি করবে? সিংহাসনে বসে অমন সদম্ভে আদেশ জারি করতে তোমার লজ্জা করে না? তোমার জানা উচিত তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবশত কেউ তোমার আদেশ পালন করে না। কি তুমি? এই রাজপরিষদে সত্যিই কি তোমার কোনও মর্যাদার আসন আছে। এখানে এসেছ কেন! তোমার ইয়ারবকসিদের কাছে ফিরে যাও না তুমি। তুমি যে কত বড় মহারাজা তা আর কারও জানতে বাকি নেই, রাস্তার লোকেরা পর্যন্ত তা নিয়ে হাসাহাসি করছে—"

এই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ভীত চকিত হয়ে গেলেন সকলে।

কপিঞ্জল সন্তর্পণে মৃদু কণ্ঠে বললেন—"মহারাণী আত্মসংবরণ করুন।"

"যা বলবার আমাকেই বলুন আপনি। মহারাণীর কানের কাছে ওসব ফুসফুস গুজগুজ আমি সহ্য করব না"—ধমকে উঠলেন গন্ধরাজ।

সুরূপিণী কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

"মহারাজ"—কপিঞ্জল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"মহারাণীর—"

"আপনি যদি আর এ বিষয়ে একটি কথা উচ্চারণ করেন আপনাকে আমি বন্দী করব কপিঞ্জলদেব—"

"মহারাজই সর্বেসর্বা —"

অভিবাদন করে সয়ে দাঁড়ালেন কপিঞ্জল।

"এ কথাটা সর্বদাই মনে রাখবেন। মহাধ্যক্ষ মশাই, আপনি সব কাগজপত্র নিয়ে আমার ঘরে আসুন। আর আপনারা এখন যেতে পারেন, রাজপরিষদ আমি ভেঙে দিলাম।"

নমস্কার করে গন্ধরাজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পিছু পিছু গেলেন কুজ্‌ঝটিকুমার আর সম্পাদক তিনজন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মহারাণীর সহচরীবৃন্দ এসে ঘরে ঢুকলেন মহারাণীকে সামলাবার জন্য।

।। বারো।।

আধঘণ্টা পরে কপিঞ্জল পুনরায় দেখা করলেন সুরূপিণীর সঙ্গে।

"মহারাজ এখন কোথা"—প্রশ্ন করলেন সুরূপিণী।

"তিনি মহাধ্যক্ষের সঙ্গে রয়েছেন। আর তাজ্জব ব্যাপার, সত্যিই কাজ করছেন তিনি—"

"আমাকে যন্ত্রণা দেওয়াই ওঁর একমাত্র কাজ। উঃ কি পতন! কি লজ্জা! এমন তুচ্ছ কারণে আমাদের অত বড় পরিকল্পনাটা নষ্ট হয়ে গেল! এখন তো আর উপায় নেই।"

"উপায় আছে মহারাণী। হতাশ হবেন না। বরং এই ঘটনার পর আর একটা পথ আমরা দেখতে পেয়েছি। আপনি আত্মস্থ হয়েছেন, মহারাজের স্বরূপ স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছেন এবার। আপনার অতি-কোমল হৃদয়ের যে দুর্বলতা পরদার মতো এতদিন সত্যকে আবৃত

করে ছিল সেটা সরে গেছে। রাজ্যের সব ব্যাপারেই এতদিন আপনি যে তীক্ষ্ণ বাস্তব-বুদ্ধির পরিচয় বরাবর দিয়ে এসেছেন এ ব্যাপারেও এবার আশা করি তার পরিচয় পাব আমরা। যতক্ষণ গর্জনগ্রামের মহারাজা হিসেবে তাঁর কর্তৃত্ব আস্ফালন করবার অধিকার ছিল ততক্ষণ সাম্রাজ্যের স্বপ্নটা স্বপ্নই ছিল আমার কাছে। অনেক ভেবেচিন্তেই আমি এ পরিকল্পনা করেছিলাম, এ রকম সংঘাত যে আসবে তা-ও আমি ভেবেছিলাম এবং তার জন্যে প্রস্তুতও আছি। আমি নির্ভর করে আছি দুটি সত্যের উপর ঃ আমি জানি আপনিই মহারাণী, আদেশ করবার জন্মগত অধিকার একমাত্র আপনারই, আর আমি আপনার সেবক, আদেশ পালন করবার জন্মগত অধিকার আমার। অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটেছে একটা—সক্ষম হাতের সঙ্গে শাণিত হাতিয়ারেব আশ্চর্য সমন্বয় এটা! গোড়া থেকেই আমি জানতাম এবং এখনও আমি জানি যে উত্তরাধিকারের ছাপ-মারা কোনও বাজে রাজার সাধ্য নেই যে এই অদ্ভুত যোগাযোগকে বিচূর্ণ করে।''

''আপনি বলছেন, আদেশ করবার জন্মগত অধিকার আমার আছে! আমার চোখের জল কি দেখতে পাননি?''

''বীরাঙ্গনারাও মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলে। আপনার চোখের জলে স্ফুলিঙ্গ দেখে শিউরে উঠেছি আমি। বুকটা কেঁপে উঠেছিল, আমার মতো লোকেরও আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল ক্ষণকালের জন্য। কিন্তু তার আগে যা ঘটেছিল, আপনি কি মনে করেন তা দেখেও কি আমি অভিভূত হইনি? আপনার ওই ওজস্বিনী ভর্ৎসনা, ওই আত্মসম্বৃত ভাষণ!—সত্যিই রাজকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন আপনি।''

কয়েক মুহূর্ত চুপ করলেন তিনি।

তারপর শুরু করলেন আবার—''হ্যাঁ দেখবার মতো দৃশ্য হয়েছিল একটা। আপনাকে দেখে আমি যেন আনন্দের মদিরা পান করছিলাম। নকল করতে চেষ্টা করছিলাম আপনার ওই শান্ত সৌম্য ভাব ঃ অদ্ভুত প্রেরণা জাগছিল প্রাণে, যে কোনও লোকেরই জাগত ঃ যে কোনও বুদ্ধিমান লোকই আপনার যুক্তি সমর্থন করত। কিন্তু মহারাণী, যা অনিবার্য তাই ঘটেছে, এর জন্যে দুঃখও নেই। আসুন খোলাখুলি সব আলোচনা করি এবার, আমাকে অন্তত অকপটভাবে সব বলবার অনুমতি দিন। জীবনে দুটি জিনিসকে আমি ভালোবেসেছি—গর্জনগাঁওকে আর তার অধিশ্বরীকে''—এই বলে তিনি সুরূপিণীর হস্ত চুম্বন করলেন—''হয় আমাকে মন্ত্রীত্ব বর্জন করতে হবে—যে দেশকে আমি স্বদেশ বলে বরণ করেছি, যে মহারাণীকে সেবা করব বলে স্বপ্ন দেখেছি তা ত্যাগ করে চলে যেতে হবে—কিংবা—''

আবার থামলেন তিনি।

''হায় কপিঞ্জলদেব, এরপর আর তো 'কিংবা' নেই।''

''না, মহারাণী, সে কথা মানব না। আমাকে সময় দিন। আপনাকে প্রথম যখন আমি দেখেছিলাম তখন আপনার বয়স খুব কম ছিল। আপনার মধ্যে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে তা সকলের চোখে পড়ত না। কিন্তু মাত্র দুবার আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সম্মান এবং সুযোগ পেয়ে আমি বুঝে নিলাম যে আমার সম্রাজ্ঞীকে আমি আবিষ্কার করেছি। আমারও কিছু প্রতিভা আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আছে। কিন্তু আমার প্রতিভাটা সেবকের প্রতিভা—আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে আমি এমন একজনকে খুঁজছিলাম যিনি শাসন করতে

পারেন, যিনি শক্তির উৎস। আমাদের দুজনের আশ্চর্য এই মিলনের এইটেই হল মুল কথা। আমরা একজন আর একজনের পক্ষে অপরিহার্য। প্রভু ভৃত্যকে চিনেছে যন্ত্রী চিনেছে যন্ত্রকে, আমাদের এ যোগাযোগ অদ্ভুত, আমরা দুজনে মিলে হয়েছি সম্পূর্ণ। লোকে বলে বিধির নির্বন্ধে বিবাহ হয়। কিন্তু এই যে বিশুদ্ধ বুদ্ধির মিলন—এই যে মানসিক অন্তরঙ্গতা যার জোরে আমরা সাম্রাজ্যের বনিয়াদ স্থাপন করব তাও কি তুচ্ছ করবার মতো? বিবাহ-বন্ধনের চেয়ে তা কি কম শিথিল? তাছাড়া আরও কথা আছে। আমাদের যখন পরিচয় হল তখনই আমরা চিনতে পেরেছিলাম পরস্পরকে, বুঝতে পেরেছিলাম আমরা দুজনেই বৃহত্তর আকাশে ওড়বার জন্যে প্রস্তুত, আমাদের আলাপে আলোচনায় আমাদের সে আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছিল নানা বর্ণে নানা রূপে। দুটি বালক বালিকার মতো আমরা যেন এক সঙ্গে বেড়ে উঠেছিলাম—হ্যাঁ মহারাণী, মনের দিক থেকে বিচার করলে একথা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। আপনার সঙ্গে যতদিন দেখা হয়নি ততদিন আমার জীবন অর্থহীন ছিল, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম খালি। আপনারও কি তাই ছিল না মহারাণী? কিন্তু আমাদের দেখা হওয়ার পর আপনার দৃষ্টির পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। মানসচক্ষে এখন আপনি আশা-রঞ্জিত সেই সম্বর্ধনাও দেখতে পেয়েছেন যার দিকে ধীরে ধীরে এগুচ্ছি আমরা, যার জন্যে আমরা নিজেদের গড়েছি, নিজেদের প্রস্তুত করেছি।"

"ঠিক বলেছেন আপনি"—সুরূপিণী বললেন—"আমিও তা অনুভব করছি। কিন্তু আপনার প্রতিভাই এসব সম্ভব করেছে, মহত্ত্বে আপনার অন্তর্দৃষ্টি আচ্ছন্ন বলে সেটা বুঝতে পারছেন না। আমি কিই বা করেছি। আমি রাণী, সেই হিসেবে, সিংহাসনের সমর্থনটুকুই আমি আপনাকে দিতে পেরেছি, অকুণ্ঠভাবে দিয়েছি অবশ্য। আমি সানন্দে এবং সোৎসাহে আপনার সমস্ত চিন্তার অংশীদার হয়েছি। আপনি আমার উপর নির্ভর করতে পেরেছেন, নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন যে আমার দিক থেকে অন্যায় কিছু হবে না, কোন বাধাও আসবে না। বলুন, আবার বলুন আমি আপনাকে সত্যিই সাহায্য করতে পেরেছি। পেরেছি কি?"

"না, মহারাণী, শুধু সাহায্য নয়, আপনি আমাকে নির্মাণ করেছেন। আপনিই আমার প্রেরণা। আমরা যখন রাজ্যবিষয়ে পরিকল্পনা রচনা করেছিলাম, তখন আমি প্রতিপদে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আপনার মননশীলতা দেখে, আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে, আপনার সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম করবার ক্ষমতা দেখে—যা অনেক পুরুষের চরিত্রেও দুর্লভ। আমি আপনাকে তোষামোদ করছি না মহারাণী, আপনি জানেন আমি যা বলছি তা সত্য। আপনি একদিনও কি বিশ্রাম করেছেন? কোনও তুচ্ছ আমোদপ্রমোদে কি কালহরণ করেছেন? আপনি তরুণী, আপনি রূপসী, কিন্তু আপনার জীবন কেটেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে—হয় উচ্চতর বুদ্ধির চর্চায়, না হয় বিরক্তিকর বুদ্ধির দ্বন্দ্বে। এর পুরস্কার আপনি পাবেন। ভৈরঙ্গীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সাম্রাজ্যের সিংহাসন স্থাপিত হবে।"

"তার মানে? কি বলছেন আপনি"—প্রশ্ন করলেন সুরূপিণী—"সব কি শেষ হয়ে যায়নি?"

"না মহারাণী। আমরা দুজনে একই কথা ভাবছি।"

"কপিঞ্জলদেব, সত্যি আমি আর কিছু ভাবছি না। ভাবতে পারছি না। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছি আমি।"

"আপনি অভিমানে অভিভূত হয়েছেন মহারাণী। প্রকৃতি যাঁদের ভাবপ্রবণ কোমল হৃদয়

দেন তাঁরা অপমানে বা অবজ্ঞায় সহজে কাতর হয়ে পড়েন। আপনি তাই হয়েছেন। আপনি বুদ্ধির আলোকে ব্যাপারটা দেখুন এবং বলুন কি দেখছেন।"

"আমি তো সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"আপনার মনে একটি কথা নিশ্চয়ই জ্বলজ্বল করে জ্বলছে—'সিংহাসনত্যাগ'।"

"ও! ভীতু কাপুরুষটা আমার কাঁধে সমস্ত ভার চাপিয়ে মজা করে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল আর যখন চরমক্ষণ এল তখন আমাকে পিছন থেকে ছোরা মেরে বসল। অপদার্থ! ওর মধ্যে কিছু নেই, ভদ্রতা, ভালোবাসা, সাহস কিচ্ছু নেই। অনায়াসে তার স্ত্রীকে, তার মর্যাদাকে, তার সিংহাসনকে, তার পিতৃপুরুষের সম্মানকে ভুলে গেল।"

"হ্যাঁ, 'সিংহাসনত্যাগ'—ওই কথাটার মধ্যেই আমি যেন আশার আলোক দেখতে পাচ্ছি একটু।"

"আপনি কি ভাবছেন তা বুঝতে পারছি। কিন্তু যা ভাবছেন তা বাতুলতা, নিছক বাতুলতা। আমি মোটেই জনপ্রিয় নই, সবাই আমাকে গালাগালি দেয়। আপনি তা জানেন। প্রজারা ওঁর দুর্বলতাকে হয়তো ক্ষমা করতে পারে, হয়তো ভালওবাসতে পারে, কিন্তু আমাকে কখনও নয়। আমাকে ঘৃণা করে সবাই।"

"জনসাধারণের কৃতজ্ঞতার ওই তো রূপ মহারাণী। কিন্তু আমরা বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছি। আমি যা ভাবছি তা পরিষ্কার করে এইবার বলি। যে লোক বিপদের সময় সিংহাসন ত্যাগের কথা ভাবে, আমার মতে, সে তো বিষধর জন্তু। আমার এ রূঢ়তা মাপ করবেন মহারাণী। এখন কথার লালিত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়। ভীরু যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তাহলে সে আগুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমরা আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছি। গন্ধরাজ যদি নিজের মতলবে চলেন তাহলে এক সপ্তাহ যেতে না যেতে গর্জনগাঁও নিরীহ লোকের রক্তে ভেসে যাবে। আপনি জানেন আমি যা বলছি তা মিথ্যা নয়, এই নিদারুণ সম্ভাবনার কথা আমরা দুজনেই ভেবেছি। ওঁর কাছে এটা কিছুই নয়, উনি সিংহাসন ত্যাগ করে চলে যাবেন। হায় ভগবান, এই দুর্ভাগা দেশের ভার কি লোকের হাতেই দিয়েছ তুমি! এদেশের পুরুষের জীবন, নারীদের সম্ভ্রম ..."

মনে হল বলতে বলতে তাঁর বাকরোধ হয়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি সামলে নিলেন নিজেকে।

"কিন্তু মহারাণী আপনি তো অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন নন, আমিও আপনার সঙ্গে আছি। এই আসন্ন বিপদের মুখে আমি বলছি, এবং আপনিও নিশ্চয় তার সমর্থন করবেন—এই আসন্ন বিপদের মুখে আমরা নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি, এখন থামা অসম্ভব। সম্মান এবং কর্তব্যের আহ্বানে, আমাদের নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার জন্যও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।"

সুরূপিণী ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন, "আমিও সেটা অনুভব করছি। কিন্তু তা হবে কি করে? ক্ষমতা তো ওর হাতে।"

"ক্ষমতা মহারাণী? ক্ষমতা সৈন্যদের হাতে" উত্তর দিলেন কপিঞ্জল এবং সুরূপিণী কোন কথা বলবার আগেই তাড়াতাড়ি বললেন—"আমাদের বাঁচতে হবে। আমাকে বাঁচাতে হবে আমার মহারাণীকে আর মহারাণীকে বাঁচাতে হবে তাঁর মন্ত্রীকে আর আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় বাঁচাতে হবে ওই বাতুল মহারাজাকে। বিদ্রোহ শুরু হলে উনিই হবেন প্রথম বলি।

আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি জনতা তাঁর দেহটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে। গর্জনগাঁও, দুর্ভাগা গর্জনগাঁও—তার কি দশা হবে তারপর? না, মহারাণী, আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে, আপনিই শক্তির প্রতীক, আপনার ক্ষমতা অসীম, সে ক্ষমতা আপনি ব্যবহার করুন। তা না হলে বিবেকের কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

"দেখিয়ে দিন কেমন করে কি করব! ধরুন ওঁকে যদি কোনও রকমে আটকাই বিদ্রোহীরা তো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আক্রমণ করবে।"

কপিঞ্জল ভান করলেন যেন এ কথাটা উনি ভাবেননি।

"হ্যাঁ, তা সত্যি। আপনি যত পরিষ্কারভাবে দেখতে পান, আমি ততটা পাই না। কিন্তু তবু উপায় নিশ্চয় একটা আছে, সেটা বার করতেই হবে।"

উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করে রইলেন তিনি।

"না, গোড়াতেই তো বলেছি, আর কোন উপায় নেই। আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ হয়ে গেছে—শেষ করে দিয়েছে ওই হতভাগা খামখেয়ালী, চপল চঞ্চল যথেচ্ছাচারী লোকটা। কালই হয়তো সে আবার ফিরে যাবে তার চাষাড়ে হৈ-হল্লার মধ্যে—"

কপিঞ্জল দেখলেন ঝড়ের সময় যে কোনও বন্দরে আশ্রয় নেওয়াই সমীচীন। যেটা পাওয়া গেল সেটাও বা মন্দ কি!

"কি বোকা আমি, কথাটা এতক্ষণ আমার মনেই পড়েনি। মহারাণী, আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনি সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।"

"কি রকম? খুলে বলুন।"

নিজেকে একটু সামলে নিলেন কপিঞ্জল। তারপর একটু হেসে বললেন, "মহারাজাকে আর একবার শিকার করতে পাঠাতে হবে।"

"যায় তবে তো। গিয়ে যদি আর না ফেরে, সেখানেই যদি থেকে যায় তাহলে আরও ভালো হয়।"

"হ্যাঁ, থেকে গেলে খুব ভালো হয়।"

কপিঞ্জল এমনভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বললেন যে সুরূপিণীর কানে বেসুরো ঠেকল তা। তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেল হঠাৎ। কপিঞ্জল লক্ষ্য করলেন সেটা এবং তাড়াতাড়ি বললেন, "না, আশঙ্কার কিছু নেই। এবার উনি গাড়ি করে আমাদের বিদেশী রক্ষী পরিবৃত হয়ে শিকারে যাবেন। থাকবেন গিয়ে শূলপাণিতে। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর, পাহাড়টাও বেশ উঁচু, শূলপাণির জানলাগুলো ছোট ছোট, লোহার গরাদ-দেওয়া। বোধহয় এই উদ্দেশ্যেই কেউ কোন সময়ে তৈরি করেছিল ওটা। আমরা অঙ্গপ্রদেশের সেনাপতিকে ওঁর সঙ্গে পাঠাব। লোকটা গোঁয়ার গোছের। কোনও ভাঁওতায় ভুলবে না। মহারাজ যে এখানে নেই তা কে ধরতে পারবে? সবাই ভাববে তিনি শিকারে গেছেন। বুধবারে একদিনের জন্য ফিরে এসেছিলেন, বৃহস্পতিবারে আবার চলে গেছেন। এ রকম তো প্রায়ই যান, বুঝতে পারবে না কেউ। ইতিমধ্যে আমরা যুদ্ধটা আরম্ভ করে দি। নির্জনবাস অবশ্য মহারাজের বেশী দিন ভালো লাগবে না। তারপর আমাদের জয় যখন আসন্ন হয়ে আসবে, কিংবা তখনও উনি যদি বেঁকে থাকেন, তাহলে তারও কিছু দিন পরে বিশেষ একটা শর্ত করে ওঁকে আমরা মুক্তি দেব। ফিরে এসে উনি আবার অভিনয়-টভিনয় নিয়ে মেতে যাবেন—এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—"

সুরূপিণী গুম হয়ে বসে রইলেন। মনে হল ভাবছেন। তারপর হঠাৎ বললেন, " তা না হয় হল। কিন্তু ভৈরঙ্গীর রাজদরবারে যে বন্ধুত্বসূচক প্রস্তাবটা পাঠানো হচ্ছে তার কি হবে?"

"সে প্রস্তাব রাজ্যপরিষদ থেকে শুক্রবারের আগে বেরুবে না। মহারাজ অবশ্য ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে পারেন, কিন্তু রাজকর্মচারীরা এমন কি দূতেরাও সবাই আমারই তাঁবে। ওরা আমার বাছাই করা লোক মহারাণী। আটঘাট বেঁধে কাজ করাই আমার নিয়ম।"

"হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে"—লোকটার উপর ক্ষণিকের জন্য একটা বিতৃষ্ণা জাগল, মাঝে মাঝে যেমন জাগে,—চুপ করে রইলেন একটু, তারপর বললেন, "কপিঞ্জলদেব, আমি অতটা করতে, মানে অতটা চরমে যেতে চাই না। এ আমার ভালো লাগছে না।"

"আমারও লাগছে না। মহারাণীর অনিচ্ছার হেতু কি তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায় কি বলুন? ও পথ ছাড়লে আমরা যে অসহায় একেবারে।"

"তা বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা বড়ই আকস্মিক হবে না? তাছাড়া এটা যে মহা অপরাধ, রাষ্ট্রীয় আইনভঙ্গ—"

"ভালো করে তলিয়ে দেখুন একটু। অপরাধটা আসলে কার?"

"ওরই অপরাধ"—উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন সুরূপিণী—"ভগবানের কাছে ও-ই অপরাধী। এ সবের জন্যে ওকেই আমি দায়ী করছি। কিন্তু তবু—"

"ওঁর তো কোনও অনিষ্ট করতে চাইছি না আমরা।"

"তা জানি।"

সুরূপিণীর কণ্ঠস্বরে কিন্তু আন্তরিকতার সুর বাজল না।

তারপর ইতিহাসের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সাহসী বীরেরা চিরকাল যেমন সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আনুকূল্য ও সাহায্য পেয়েছেন এ ক্ষেত্রেও তেমনি হল। ঠিক সময়ে তিনি রথ থেকে নেমে এলেন। মহারাণীর একজন সহচরী খবর পাঠালেন যে জরুরী দরকারে তিনি একবার ভিতরে আসতে চান। একটি লোক প্রধানমন্ত্রীর জন্য না কি একটি চিঠি এনেছে। দেখা গেল পেন্সিলে লেখা এই লাইন চিঠি, চতুর কুজ্‌ঝটিকুমার গন্ধরাজের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কোনক্রমে লিখে পাঠিয়েছেন চিঠিটি। কুজ্‌ঝটিকুমার মহাভীতু লোক, ভয়ই তাঁকে উঠ-বোস করায়। তিনি যে এতটা সাহস করতে পেরেছেন এটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। চিঠিতে কেবল একটি মাত্র খবর সংক্ষেপে লেখা ছিল—"এর পর থেকে মহারাজ নিজেই সব কাগজে সই করবেন। মহারাণীর সই আর চলবে না।"

গত তিন বছর ধরে সুরূপিণীই মহারাজের হয়ে সমস্ত কাগজপত্রে সই করেছেন। আজ থেকে তাঁর সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হল? এর পর কোনও সরকারী কাগজে আর তাঁর স্বাক্ষর থাকবে না? এটা সামান্য অপমান নয়,—তাঁর মনে হল এটা জনসাধারণের চক্ষে তাঁকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা। তিনি একবারও ভাবলেন না কেন এটা করা হল, গুলি খেয়ে আহত বাঘ যেমন সগর্জনে লাফিয়ে ওঠে তিনিও তেমনি উঠলেন।

"যথেষ্ট হয়েছে। আমি আদেশপত্রে সই করে দেব। কখন ওকে নিয়ে যাওয়া হবে?"

"আমার নিজের লোকজন সংগ্রহ করতে প্রায় বারো ঘণ্টা লাগবে। আর এসব জিনিস রাত্রে করাই ভালো। যদি অনুমতি দেন—কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরে ব্যবস্থা করি—"

"ঠিক আছে। আমার ঘরের দ্বার তো আপনার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত। আদেশপত্র প্রস্তুত হলেই নিয়ে আসবেন, আমি সই করে দেব।"

"মহারাণী যদি অভয় দেন তাহলে একটা কথা নিবেদন করি। এ ব্যাপারে একমাত্র আপনারই প্রাণদণ্ডের কোনও আশঙ্কা নেই। যদি ধরা পড়ি আমাদের সবারই সে আশঙ্কা আছে। এই জন্যে আমি প্রস্তাব করছি যে কেবলমাত্র সই না করে সমস্ত আদেশপত্রটা আপনি নিজের হাতে লিখে ফেলুন।"

"ঠিক বলেছেন আপনি। বেশ তাই হবে—"

কপিঞ্জল তাঁর হাতে সরকারী ছাপ-মারা একটি শাদা কাগজ দিলেন। সুরূপিণী অবিলম্বে গোটা গোটা পরিষ্কার অক্ষরে লিখে ফেললেন আদেশটা। লিখে আবার পড়লেন। সহসা একটা কুটিল হাসি ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে।

"ওঁর কাকাতুয়াটির কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ইন্দীবর ভারতীও ওঁর সহযাত্রী হোন। দুজনে গল্পসল্প করে ভালই থাকবেন।"

ইন্দীবর ভারতীকেও নির্বাসনের দণ্ড দিলেন তিনি এবং এ আদেশটার তলায় দাগ দিয়ে আবার সই করলেন।

"আপনার সেবকের চেয়ে আপনার স্মৃতিশক্তি আরও প্রখর দেখছি মহারাণী" এই বলে কপিঞ্জল মনোযোগ সহকারে সাংঘাতিক আদেশপত্রটি পড়লেন।

"ঠিক হয়েছে।"

"আপনি কি বৈঠকখানায় বসবেন এখন?"

"না বেশী জানাজানি হোক এটা আমি চাই না এখন। আমার উপর লোকে যদি আস্থা হারিয়ে ফেলে তাহলে ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো হবে না সেটা।"

"তা ঠিক।"

মহারাণী তাঁর দিকে এমনভাবে হাত বাড়িয়ে বিদায় দিলেন যেন তিনি একজন সমপর্যায়ের পুরাতন বন্ধু।

।। তেরো।।

বস্তুত, তীর নিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যপরিষদে সাধারণত যা হয় তাই যদি হত তাহলে গন্ধরাজের তেজ বা রাগ এতক্ষণ স্থায়ী হত না। তিনি নিজেরই দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হতেন সর্বাগ্রে, নিজের সম্বন্ধে যা সত্য তাই নিক্তি ধরে বিচার করতেন, ভুলে যেতেন সুরূপিণীর সদম্ভ উক্তি ও আচরণ এবং আধঘণ্টার মধ্যেই অনুতপ্ত পাপী যেমন ঠাকুর ঘরে ঢুকে দেবতার কাছে আত্মনিবেদন করেন, অথবা পাঁড় পাতাল যেমন শেষকালে বোতলের আশ্রয় নেন—তিনিও তাই করে ফেলতেন। কিন্তু দুটি কারণে তাঁর জেদ চড়ে গেল। প্রথম, তিনি অনুভব করলেন অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে, অনেকদিন ধরে অনেক দরকারী কাজ তিনি করেননি। গন্ধরাজের মতো অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী লোক যখন কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হন তখন একমাত্র কাজ করেই তিনি নিজের বিবেককে শান্ত রাখতে পারেন। সমস্ত বিকেলটা তিনি মহাধ্যক্ষ কুজ্ঝটিকুমারের সঙ্গে কাজ করলেন। অনেক দলিল পড়লেন, অনেক শ্রুতিলিখন লেখালেন, অনেক কাগজে সই করলেন এবং অনেক আদেশ জারি করলেন।

একটা অদ্ভুত আত্মপ্রসাদের দীপ্তি ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। দ্বিতীয় কারণ, তাঁর আত্মসম্মান আহত হয়েছিল। যে টাকাটা তিনি চেয়েছিলেন তা পাননি। কাল সকালে কীর্তিভূষণ হতাশ হবে, যে টাকাটা তাকে দেবার কথা ছিল তা দিতে পারবেন না। ওই পরিবারটি তাঁকে খুব সুনজরে দেখেনি, তাদের কাছে ত্রাণকর্তা বীরের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি যে খাতিরটুকু পাবেন আশা করেছিলেন, তা আর পাওয়া যাবে না। তারা এখন তাঁকে মিথ্যাবাদী ছোটলোক ভাববে। গন্ধরাজের মতো লোকের কাছে এটা মৃত্যুর চেয়েও নিদারুণ। এর সঙ্গে কিছুতেই তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না। কাজ করতে করতে—রাজ্যের খুঁটিনাটি বিরক্তিকর কাজকর্ম তিনি বেশ ভালো ভাবেই করে যাচ্ছিলেন—কিন্তু কাজ করতে করতে তিনি ভাবছিলেন কি করে এই অবাঞ্ছিত পাশাটা উল্টে দেওয়া যায়। যে মতলবটা তাঁর মাথায় এসেছিল সেটা মানুষ গন্ধরাজের পক্ষে খুবই আনন্দজনক হলেও মহারাজ গন্ধরাজের পক্ষে অসম্মানজনক। কিন্তু তরল স্বভাবের লোক তিনি, তাঁর মনে হচ্ছিল এই যে বাজে ব্যাপারে খেটে মরছি ওই মতলবটা হাসিল করতে পারলে তার মজুরি উসুল হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে মনে মনে হাসছিলেন তিনি। চাপা হাসির মৃদু উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে প্রকাশও হয়ে পড়ছিল। কুজ্ঝটিকুমার তা দেখে বিস্মিত হচ্ছিলেন মনে মনে, তাঁর মনে হচ্ছিল সকালে রাজ্যপরিষদে যা ঘটেছে তারই স্মৃতি বোধহয় পুলকিত করছে মহারাজকে।

এই ভেবে, তাঁর একটু মিহি খোশমোদ করবার প্রবৃত্তি জাগল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন যে গন্ধরাজের বাবার কথা তাঁর মনে পড়ছে।

"কি বলছেন?"

গন্ধবাজ প্রশ্ন করলেন। তিনি তখন একেবারে অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।

"রাজ্যপরিষদে মহারাজের প্রতাপের কথা ভাবছিলাম।"

"তাই না কি! ও হ্যাঁ"—অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ।

কিন্তু এ শুনে তাঁর অহমিকা ঈষৎ স্ফীত হল. সকালে রাজ্য পরিষদের ঘটনাগুলো মানস-চক্ষে ভেসে উঠল। মনে মনে হেসে ভাবলেন—"সবাইকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি—"

যখন সব দরকারী কাজ শেষ হয়ে গেল তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। গন্ধরাজ কুজ্ঝটিকুমারকে তবু আটকে রাখলেন। বললেন, "আপনি এখানেই আমার সঙ্গে খান।" প্রাচীন স্থূল মোসাহেবির সঙ্গে আধুনিক সূক্ষ্ম খোশামোদের সমন্বয় করে কুজ্ঝটিকুমার খাওয়ার টেবিলে প্রচুর আনন্দ দান করলেন গন্ধরাজকে। হীন আনুগত্যের উপরই কুজ্ঝটিকুমারের জীবনের উন্নতি প্রতিষ্ঠিত। তিনি যা কিছু সম্মান বা চাকুরি পেয়েছেন তা হামাগুড়ি দিয়ে পেতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর প্রবৃত্তিকে বেশ্যার সঙ্গে উপমিত করলে অত্যুক্তি হবে না। খোশামোদ করবার একটা সহজাত নিপুণতাও ছিল তাঁর। আর গন্ধরাজের খুব ভালো লাগছিল সেটা। প্রথমে নারীজাতির বুদ্ধি সম্বন্ধে তিনি দু'একটা ব্যঙ্গোক্তি করে টোপ ফেললেন। তারপর আর একটু ঘনিষ্ঠ আলোচনা করলেন এ বিষয়ে এবং আহারের তৃতীয় পর্বের পূর্বেই দেখা গেল তিনি সুরূপিণীর চরিত্র কৌশলে বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন এবং গন্ধরাজ ঘাড় নেড়ে নেড়ে স্মিত মুখে শুনছেন তা। কারও নাম অবশ্য উচ্চারিত হচ্ছিল না তবু সুরূপিণীর সঙ্গে তিনি যে আদর্শ চরিত্র পুরুষটির তুলনামূলক সমালোচনা করছিলেন সে ব্যক্তিটি যে কে তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। এই বেতো বুড়োটিকে ভগবান অদ্ভুত শয়তানী

বুদ্ধি দিয়েছিলেন। কেবল বাক্যবলেই মানুষের হৃদয়দুর্গ অধিকার করতে পারতেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতার কানের কাছে তাঁর প্রশস্তি-পাঠ করে যাবার ক্ষমতা ছিল ভদ্রলোকের। অথচ এমন কায়দা করে সেটা করতেন যে শ্রোতার আত্মসম্মান বিচলিত হত না একটুও। গন্ধরাজের মন তো গোলাপী হয়ে উঠল, স্তাবকের স্তুতির সঙ্গে যদি নিজের বিবেকের সায় থাকে তাহলে আত্মপ্রসাদের আনন্দ উপচে পড়ে একেবারে। নিজের ব্যক্তিত্বকে এমন বিচিত্রবর্ণমণ্ডিত দেখে খুবই পুলকিত হয়ে উঠলেন গন্ধরাজ। তাঁর মনে হল কুজ্‌ঝটিকুমারের মতো লোকও সুরূপিণীর চরিত্রে যদি এত গলদ দেখতে পেয়ে থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের লোক জেনেও যদি সেটা তাঁর কানে তুলে দিতে ইতস্তত না করে— তাহলে অবহেলিত স্বামী এবং অপদস্থ মহারাজা হিসেবে তিনি যে আচরণ করেছেন তা মোটেই কঠোর নয়।

প্রসন্ন মনে বিদায় দিলেন তিনি কুজ্‌ঝটিকুমারকে। তাঁর স্তুতি-বাক্যগুলো গানের মতো বাজতে লাগল কানে। এরপর তিনি অগ্রসর হলেন বৈঠকখানার দিকে। সেখানে সুরূপিণী তো আছেই, আরও অনেকে আছে। এ সময় বৈঠকখানা জমজমাট হয়ে ওঠে। সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই কিন্তু অনুতাপ হতে লাগল তাঁর। বৈঠকখানার প্রকাণ্ড দালানে ঢুকেই দেখতে পেলেন তিনি সুরূপিণীকে। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল তাঁর মন। কুজ্‌ঝটিকুমার তাঁর মনে তোষামোদ দিয়ে যে অলীক স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল তা স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে গেল। বাস্তব জীবনের কাব্যের রং রাঙিয়ে দিল মনকে। বেশ কিছু দূরে একটা উজ্জ্বল আলোর নীচে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুরূপিণী। তাঁর কোমরের অপরূপ বঙ্কিম ভঙ্গী অভিভূত করে ফেলল গন্ধরাজকে। ওই বালিকাবধূকে একদিন তিনি এনে বাহুপাশে জড়িয়ে কত আদর করেছেন, শপথ করেছেন ওকে রক্ষা করবেন। ওই তো সে, জীবনের কোনও সৌভাগ্যের সঙ্গে কি ওর তুলনা হয়?

মুহ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। সুরূপিণীই তাঁকে আত্মস্থ করলেন এসে। তিনি যেন সাঁতার দিতে দিতে এলেন এবং হেসে আধ-আধ অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—"গন্ধ, আসতে তোমার বড্ড দেরি হয়ে গেল যে—"। হাসিটা বড়ই কৃত্রিম ঠেকল গন্ধরাজের চোখে। মনে হল এটা যেন মিলনান্তক কোন নাটকের দৃশ্য। অসুখী দাম্পত্যজীবনে এ রকম অভিনয় স্বাভাবিক। সুরূপিণীর নির্লজ্জ ন্যাকামিটা অসহ্য মনে হল তাঁর।

বৈঠকখানায় কোনও কড়াকড়ি রীতি-নীতি নেই। যে যা খুশি করছে, ঢুকছে, বেরুচ্ছে। আড়ষ্টতা নেই কোনও। জানলার কাছে কাছে যে সব বসবার জায়গা আছে, পাখির মতো অনেকে বসে আছে সেখানে জোড়ায় জোড়ায়। ওদিকের কোণটাতে বেশ একটি বড় দল মহানন্দে মশগুল হয়ে গেছে পরনিন্দা পরচর্চায়। আর একটু দূরে একটা টেবিলে জুয়া চলছে তাস নিয়ে। খুব একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে নয়, তবে এই দিকেই ধীরে ধীরে এগুলেন গন্ধরাজ নমস্কার বিনিময় করতে করতে। রঞ্জাবতী যেখানে খেলছিলেন তারই সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। রঞ্জাবতীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কাছেই জানলার ধারে দেওয়ালে যে ফাঁকটি ছিল সেখানে গিয়ে বসলেন তিনি। রঞ্জাবতীও হাজির হলেন সেখানে অবিলম্বে।

"ডেকে এনে বাঁচালেন আমাকে। ভূতের মতো হারছি। জুয়াই আমার সর্বনাশ করবে।"

"ছেড়ে দাও না ওসব!"

"ছেড়ে দেব!"—বলেই হেসে উঠলেন রঞ্জাবতী—"কি নিয়ে থাকব তাহলে। ওই তো

আমার নিয়তি। যক্ষ্মায় যদি মারা যেতাম তাহলে বেঁচে যেতাম। ওই একমাত্র আশা ছিল। কিন্তু তা যখন হল না তখন কোন চিলে-কোঠার ঘরে মরতে হবে।"

"মনে হচ্ছে মেজাজটা ভালো নেই।"

"ক্রমাগত হারছি আজ। লোভ যে কি বস্তু তা আপনি জানেন না।"

"দেখছি, খুব খারাপ সময়ে এসে পড়েছি তাহলে—"

"কেন কিছু করতে হবে?"—এক ঝলক হাসি ফুটে উঠল মুখে।

"রঞ্জাবতী আমি একটা দল গড়ব ভাবছি, সে দলে তোমাকে টানতে চাই।"

"রাজী" হেসে উত্তর দিলেন রঞ্জাবতী—"আমাকে পুরুষ বলে মনে করতে পারেন।"

"হয়তো এটা আমার ভুল। কিন্তু কেন জানি না আমি সত্যিই বিশ্বাস করি তুমি আমার অশুভাকাঙ্ক্ষিণী নও।"

"আমি আপনার এত শুভাকাঙ্ক্ষিণী যে তা বলবার সাহস আমার নেই।"

"তাহলে বলব কথাটা?"

"বলুন মহারাজ। আপনি যা করতে বলবেন তা নিশ্চয়ই করব।"

"সেদিন যে গৃহস্থটির গল্প করেছিলাম, আমি চাই তাকে তুমি প্রতিষ্ঠিত কর। বাঁচাও।"

"কোন গৃহস্থ? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। যাক্ বুঝতে চাই না। আমি আপনাকে খুশী করতে চাই। ধরে নিন তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেব। বাঁচাব।"

"এইবার তাহলে অন্য দিক থেকে ব্যাপারটা বলি। তুমি কখনও চুরি করেছ?"

"অনেকবার। শাস্ত্রের সমস্ত উপদেশ আমি লঙ্ঘন করেছি, ফের নূতন শাস্ত্র যদি তৈরী হয় সে সবেব উপদেশও লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত ঘুম হবে না আমার। কি করতে হবে?"

"তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে চুরি করতে হবে। তোমাকে এ কাজ করতে বলছি কারণ আমার মনে হল তুমি দুঃসাহসিনী, এতে আমোদ পাবে হয়তো। আমিও তোমার সহকারী হব।"

"ও কাজ করিনি কিন্তু। তালাটালা ভাঙ্গিনি কখনও। ছেলেবেলায় একটা সেলাইয়ের বাক্স ভেঙে ফেলেছিলাম, অবশ্য মন ভেঙেছি অনেকের এমনি কি নিজেরও। ঘরের তালা ভাঙ্গিনি। কিন্তু তাতে কি! ভাঙব তালা, দুষ্কর্ম করা কি আর এমন শক্ত! কোথাকার তালা ভাঙতে হবে।"

"আমার কোষাগারের।"—বলে গন্ধরাজ মৃদু হাসলেন। তারপর সংক্ষেপে, হাসতে হাসতে এবং মাঝে মাঝে করুণরসের ছিটেফোঁটা দিয়ে কীর্তিভূষণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং জমি কেনার প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করে গেলেন। তারপর বললেন—"আজ সকালে রাজসভায় কোষাধ্যক্ষের কাছে টাকাটা চাইলাম, কিন্তু ওঁরা দিলেন না আমাকে টাকাটা। তাই ঠিক করেছি নিজেই নিজের কোষাগার থেকে চুরি করব।" গন্ধরাজ কোষাগারের জানলা দরজা কোথায় আছে এবং কিভাবে সেখানে ঢোকা সম্ভব, কি বিপদ হতে পারে এইসব বললেন তারপর।

"রাজসভায় আপনাকে টাকাটা দিলে না। আর আপনি সেটা মেনে নিলেন। অবাক্ কাণ্ড!"

গন্ধরাজের কানের ডগাটা লাল হয়ে উঠল একটু।

"ওঁরা কারণ দেখালেন নানারকম, আমার মনে হল ওইসব ওজনদার কারণ উলটে দেবার

ক্ষমতা আমার নেই। তাই ঠিক করেছি আমার রাজের কোষাগার থেকে আমিই চুরি করব। এতে মর্যাদা নেই কিন্তু মজা আছে।''

''মজা? ও—''

রঙ্গাবতী চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। ভাবলেন কি যেন।

''কত টাকা আপনার দরকার?''

''দশ হাজার হলেই চলবে। আমার নিজের কাছেও কিছু আছে।''

''দশ হাজার? বেশ''—হালকা মিষ্টি হাসি আবার ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে—''বেশ, আমি আপনার সঙ্গে যাব। কোথায় তাহলে আবার আমাদের দেখা হচ্ছে? কোন জায়গা থেকে যাত্রা করব?''

''আমার বাগানে যেখানে একটা উড়ন্ত পরীর মর্মরমূর্তি আছে সে জায়গাটা চেন? তিনটি রাস্তা এসে মিলেছে সেখানে। একটি বসবার জায়গাও আছে সেখানে। স্থানটি নির্জন এবং পরী আছে বলে মনোরম।''

''কি ছেলেমানুষ অপানি''—লীলাভরে পাখা দিয়ে সামান্য ঠোকা দিয়ে বললেন—''কিন্তু আপনি যে জায়গাটার কথা বললেন তা আপনার পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু আমি কি সেখানে সহজে পৌঁছতে পারব? আমার অনেক দেরি হবে। প্রচুর সময় না দিলে যাওয়া যাবে না ওখানে। দুটোর আগে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু দুটোর ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সহকর্মিণী নির্ঘাৎ হাজির হবে আপনার কাছে—। আশা করি আপনি এতে আপত্তি করবেন না। হ্যাঁ, ভালো কথা, আর কেউ কি থাকবে সেখানে? না, লোক-লজ্জার জন্যে বলছি না আমি, অত লজ্জাশীলা নই।''

''আমার একজন সহিস থাকবে। আমার ঘোড়ার দানা চুরি করত তাকে ধরে ফেলেছিলাম একবার। সেই থেকে—''

''তার নাম কি?''

''নাম তো জানি না। দানা-চোরের সঙ্গে পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ হয়নি। সম-ব্যবসায়ী হিসাবে মাত্র—''

''আমার সঙ্গে যেমন হয়েছে! উঃ কি লোক আপনি! যাক, একটি কাজ কিন্তু করবেন। পরীর কাছে যে বেঞ্চটি আছে সেখানে যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই, সেখানে বসে আপনি আমার অপেক্ষা করবেন। যেমন ভাবে অপেক্ষা করে—''

বলেই মুচকি হাসলেন রঙ্গাবতী।

''আর আপনার ওই চোর-বন্ধুটি যেন কাছাকাছি না থাকে। দূরে যে ফোয়ারাটা আছে সেখানেই তাকে থাকতে বলবেন। এ ব্যবস্থায় রাজী তো?''

''রঙ্গাবতী, আজ তুমিই হুকুম দেবে আমি তা পালন করব। এ অভিযানে তুমিই নেত্রী, আমি আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র।''

''অভিযান সফল হবে আশা করি। আজ শুক্রবার নয়—''

রঙ্গাবতীর হাবভাব একটু যেন রহস্যময় মনে হল গন্ধরাজের। সন্দেহও হল একটু।

''আমি আমার বিপক্ষ দল থেকে সহকারী যোগাড় করলাম। এটা একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে না?''

"অদ্ভুত আবার কি! আপনার প্রধান গুণ কি জানেন? আপনি আপনার বন্ধুদের চেনেন।"

হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলেন রঞ্জাবতী। গন্ধরাজের হাতটা তুলে আবেগভরে চুম্বন এঁকেদিলেন তাতে!

"এবার যান। আর দেরি করবেন না।"

ঈষৎ বিহ্বল হয়ে সরে গেলেন গন্ধরাজ। তাঁর মনে হতে লাগল একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল বোধহয়। রঞ্জাবতী হঠাৎ যেন রত্নের মতো চকমক করে উঠল। তাঁর পূর্ব-প্রণয়ের বর্ম ভেদ করেও যেন ধাক্কা লাগল একটা। ভয় হল একটু। কিন্তু বেশীক্ষণ সে ভয় রইল না।

সকাল সকালই গন্ধরাজ এবং রঞ্জাবতী বেরিয়ে এলেন বৈঠকখানা থেকে। একটা ছুতো করে গন্ধরাজ তাঁর দেহরক্ষীকেও বিদায় করে দিলেন। তারপর গোপন পথ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি বাগানের দিকে সেই সহিসের খোঁজে।

গিয়ে দেখলেন আস্তাবল অন্ধকার। আগে যে কায়দায় জানলায় টোকা মেরেছিলেন এবারও মারলেন। সহিসটি মুখ বাড়াল এবং তাঁকে দেখে আবার বিবর্ণ হয়ে গেল ভয়ে।

"কি খবর! দানার একটা বোরা চাই—খালি বোরা। বোরাটা নিয়ে আমার সঙ্গে এস। সমস্ত রাত আমার সঙ্গে থাকতে হবে আজ—"

"মহারাজ, আস্তাবলে আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি চলে গেলে ঘোড়াগুলোর—"

"যা হবার হোক। ঘোড়াদের উপর তোমার যে কত দরদ তা জানা আছে।"

হঠাৎ গন্ধরাজ লক্ষ্য করলেন লোকটা ভয়ে কাঁপছে। তখন তিনি তাঁর কাঁধে হাতটা রেখে বললেন, "ভয় কি। তোমার কোন ক্ষতি করবার জন্যে আমি আসিনি। অনর্থক ভয় পাচ্ছ কেন।"

সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত হল বেচারা। খালি বোরা নিয়ে এল। গন্ধরাজ তাকে সঙ্গে নিয়ে ছোট বড় নানারকম পথ পার হলেন গল্প করতে করতে। অবশেষে যেখানে প্রকাণ্ড একটা পিতলের মাছের মুখ থেকে বিরাট একটা চৌবাচ্চায় অনর্গল জল পড়ছিল সেখানে এসে থামলেন। বললেন, "তুমি এইখানে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো। কোথাও যেও না।" তারপর তিনি গেলেন সেই মর্মর-নির্মিত উড়ন্ত পরীর দিকে। উলঙ্গ পরী ডানা মেলে মুখ তুলে একটা পায়ের উপর ভর দিয়ে আকাশের দিকে দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে এখনি উড়ে যাবে, কিন্তু উড়ছে না, স্থির হয়েই একই ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহুকাল ধরে। আকাশে অসংখ্য তারা। বেশ গরম, একটুও হাওয়া নেই। দিগন্তে কৃষ্ণপক্ষের একফালি শীর্ণ চাঁদ উঠেছে। তাব ম্লান জ্যোৎস্নায় নক্ষত্ররা ঢাকা পড়েনি। নক্ষত্রের আলোকেই অপরূপ হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। গাছের বীথির ভিতর দিয়ে দূরে তিনি প্রাসাদের আলোকিত অলিন্দের একটা অংশ দেখতে পেলেন। দেখলেন প্রহরী সেখানে পাহারা দিচ্ছে। তারও ওপারে দেখা যাচ্ছে শহরের আলো আর রাস্তা। কিন্তু আশেপাশের সবুজ গাছগুলো কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন, মৃদু নক্ষত্রালোকে অদ্ভুত অস্পষ্ট একটা রূপকথালোক মূর্ত হয়েছে যেন। ওই উড়ন্ত পরীটাকেও আর প্রাণহীন মর্মর মনে হচ্ছে না।

রাত্রির নির্জন রহস্যময় পরিবেশে গন্ধরাজের বিবেকও সহসা যেন নক্ষত্রের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। তাঁর চরিত্রের গলদগুলো সারি সারি এসে দাঁড়াল যেন সেই নক্ষত্রালোকে। তিনি এখানে এসেছেন

কেন? রাজকোষের অর্থ নানা অপব্যয়ে নষ্ট হয়েছে সত্য, কিন্তু তার কারণ কি তাঁরই শৈথিল্য নয়? আলস্যবশে তিনি যে রাজত্বকে সুশাসন করতে পারেননি সেই রাজত্বের পঙ্গু রাজকোষকে তিনি অসাধু উপায়ে আরও পঙ্গু করতে উদ্যত হয়েছেন। এই চুরি-করা টাকাটাও তিনি নিজের ব্যক্তিগত খামখেয়ালে ফুঁকে দেবেন। হতে পারে কাজটা মহৎ কাজ, কিন্তু তাতে কি? এটা তাঁর খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। যে লোকটাকে তিনি দানা-চুরির অভিযোগে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন তাকেই তিনি রাজকোষ থেকে টাকা চুরিতে প্রবুদ্ধ করতে যাচ্ছেন! তারপর, ওই রঞ্জাবতী—সচ্চরিত্র পুরুষের পক্ষে অসতী স্ত্রীলোকের উপর যে রকম ঘৃণা হওয়া স্বাভাবিক— সেই রকম একটা ঘৃণায় ঘিন ঘিন করতে লাগল তাঁর সারা মন। অথচ ওই স্ত্রীলোকটাকেই তিনি কাজে লাগাতে চাইছেন। যেহেতু ও হীন, যেহেতু তিনি জানতেন ওকে যে কোনও পাঁকে সহজে নামানো যাবে, তাই ওকেই এই কাজে লাগিয়ে ওকে আরও হীন করবার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি, হয়তো এজন্যে ওর সমস্ত ভবিষ্যৎই বিপন্ন হতে পারে, এ জেনেও পেয়েছেন।

গন্ধরাজ শিস দিতে দিতে পায়চারি করছিলেন দ্রুতবেগে। হঠাৎ তাঁর মনে হল পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে অন্ধকারে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কে যেন এগিয়ে আসছে। লাফিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি এবং রঞ্জাবতী আসছে ভেবে আশ্বস্ত হলেন। একা একা বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করা কি সহজ? সেই মুহূর্তে তাঁর চেয়ে বেশী পাপী আর একজনের দেখা পেয়ে সত্যিই ভারি আরাম পেলেন যেন।

কিন্তু মনে হল একটি যুবক এগিয়ে আসছে, স্ত্রীলোক তো নয়। খর্বকায়, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, চলবার ধরনটাও অদ্ভুত, ঘাড়ে একটা বোঝা। কে এ! গন্ধরাজ আত্মগোপন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যুবকটি হাত তুলে মানা করল। তারপর প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এসে বোঝাটা তাঁর পায়ের কাছে ফেলে হাঁপাতে লাগল । তারপর ধপাস করে বসে পড়ল বেঞ্চিটার উপর, তার মুখের দিকে চেয়ে গন্ধরাজ রঞ্জাবতীকে চিনতে পারলেন।

"তুমি, রঞ্জাবতী!"

"না, আমি রঞ্জাবতীর ভাই রঞ্জনকুমার। আমিও লোক খারাপ নই। হাঁপিয়ে পড়েছি। একটু দম নিতে দিন—"

"আচ্ছা, রঞ্জাবতী—"

"না, আমাকে রঞ্জনকুমার বলুন। আমার ছদ্মবেশকে উপহাস করবেন না, মেনে নিন।"

"বেশ। রঞ্জনকুমারকে তাহলে অনুরোধ করছি, আর দেরি করা ঠিক নয়, এবার রাজকোষের দিকে অগ্রসর হওয়া যাক।"

"আপনি এইখানে আমার পাশে বসুন তো"—আঙুল দিয়ে বেঞ্চিটার অপর প্রান্ত দেখিয়ে দিলেন—"এক্ষুনি যাব। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। বিশ্বাস না হয়, হাত দিয়ে দেখুন। আপনার সেই চোরটি কোথা—"

"সে ওই ফোয়ারার কাছে আছে। আলাপ করবে তার সঙ্গে? চমৎকার লোক।"

"না এখন নয়। তাড়াহুড়ো করবেন না, কথা আছে। আপনার চোরকে আমি অসম্মান করছি না। যাদেরই পাপ করবার সাহস আছে তাদেরই আমি সম্মান করি। মহারাজের সঙ্গে

প্রেমে পড়ে গিয়েই যদিও প্রথম আমি পুণ্যলোকে উত্তীর্ণ হলাম, কিন্তু তার জন্যেও পাপের সাহায্য নিতে হল।"

বিব্রত বোধ করতে লাগলেন গন্ধরাজ।

"কতক্ষণ এভাবে থাকবে এখানে?"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি। একটু দম নিতে দেবেন না?"

আরও জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলেন তিনি।

"কেন এত ক্লান্ত হয়ে পড়লে? ওই বস্তাটা বয়ে? আচ্ছা পাগল তো তুমি! এটা বয়ে আনতে গেলে কেন। আমি যে একটা খালি বস্তা যোগাড় করে রাখতে পারি আমার উপর এটুকু বিশ্বাসও কি নেই তোমার? আর মনে হচ্ছে, এটা তো খালিও নয়। কি পুরে এনেছ ওতে? দেখি—"

তিনি হাত বাড়িয়ে ঝুঁকতেই রঞ্জাবতী তাঁর হাতটা ধরে ফেললেন।

"গন্ধরাজ, না, না ওরকম করবেন না। আমি বলছি, অকপটেই সব খুলে বলছি। কাজ আমি হাসিল করে ফেলেছি। একাই লুট করেছি আপনার রাজকোষ। ওই বস্তায় দশ হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি মুদ্রা আছে। আশা করি এতেই আপনার কাজ হয়ে যাবে।"

এ কথা শুনে বজ্রাহতবৎ হয়ে গেলেন গন্ধরাজ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। মুখ দিয়ে একটি কথা সরল না। তাঁর হাত তখনও বাড়ানো ছিল, রঞ্জাবতী তখনও ধরে ছিলেন হাতের কব্জিটা।

"তুমি? কি করে করলে—!"

তারপরই সোজা হয়ে বসলেন তিনি।

"তুমি নিশ্চয়ই তাহলে আমাকে এত অপদার্থ ভেবেছ যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সাহস হয়নি তোমার! আমি অপদার্থ তাতে সন্দেহ নেই—"

"না, এই যদি ভাবেন, তাহলে যা বললাম তা মিথ্যে। টাকাটা আমারই টাকা—সত্যি বলছি—আমারই টাকা, এখন আপনার। আপনি যা করতে চাইছিলেন তা আপনার গৌরবের সঙ্গে বেমানান। আপনার কথা শুনেই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম যে আপনার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আমি আপনার সম্মান রক্ষা করব। আমি মিনতি করছি, আপনি আমাকে সে অধিকার দিন!"

রঞ্জাবতীর কণ্ঠস্বরে আবদারের মোলায়েম সুর বেজে উঠল। "আমি হাত জোড় করে মিনতি করছি গন্ধরাজ। হতভাগিনীর তুচ্ছ কটা টাকা আপনার কাজে লাগুক। এ হতভাগিনী আপনাকে—না, ও কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা করছে!"

"আমাকে মাপ কর রঞ্জাবতী। ও আমি পারব না। আমি চললুম—"

উঠে পড়লেন গন্ধরাজ। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জাবতী মাটিতে নেমে দুহাতে তাঁর হাঁটু জাপটে ধরলেন।

"না, আপনি যাবেন না। আমাকে আপনি এত ঘৃণা করেন? এ টাকা তো আমার কাছে অসার তুচ্ছ জিনিস। জুয়ার আড্ডায় দু'দিনেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি দয়া করে নেন, ও টাকা বেঁচে গেল, আপনার কাছে জমা রইল, আপনি ভালো কাজে ব্যবহার করবেন ওটা, হয়তো ওরই জোরে নিদারুণ ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচতে পারব একদিন।"

গন্ধরাজ মৃদুভাবে চেষ্টা করলেন নিজেকে মুক্ত করতে।

"গন্ধরাজ"—রঞ্জাবতী আবার বললেন—"আপনি যদি আমাকে এই নিদারুণ লজ্জার মধ্যে ফেলে চলে যান, আমি আর বাঁচব না। এইখানেই মরব আমি—"

গন্ধরাজ কাতরভাবে বললেন, "না, না—তুমি—"

"হ্যাঁ মরব। আমার যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে তা কি আপনি অনুভব করতে পারছেন? সামান্য একটা চক্ষুলজ্জা আপনাকে পীড়া দিচ্ছে, কিন্তু আমার বিচূর্ণিত আত্মসম্মান, আমার পদদলিত মর্যাদার কষ্টটা যে কি নিদারুণ তা একবার ভেবে দেখুন। আমি আমার যথাসর্বস্ব—যদিও তা নিতান্ত তুচ্ছ—আপনাকে এনে দিলাম আর আপনি তা প্রত্যাখ্যান করে চলে যাচ্ছেন! চুরি করতে আপনার দ্বিধা ছিল না, কিন্তু আমাকে আপনি এত ঘৃণ্য মনে করেন যে, আমার বুকটা মাড়িয়ে চুরমার করে দিয়ে যেতে আপনি ইতস্তত করছেন না। গন্ধরাজ, মহারাজ, এতটা নির্দয় হবেন না, দয়া করুন আমার উপর—দয়া করুন—কৃপা ভিক্ষা করছি—"

রঞ্জাবতী তখনও গন্ধরাজের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে ছিলেন। তারপর হঠাৎ হাতটা ধরে পাগলের মতো তাতে চুম্বন করতে লাগলেন। গন্ধরাজের মাথাটা ঘুরে গেল।

"ও, এতক্ষণে বুঝেছি। বুঝেছি, বুঝেছি, বুঝেছি। আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি, আর তো আমার রূপ নেই, কিছু নেই—"

হঠাৎ তিনি হু হু করে কাঁদতে লাগলেন। এইবার গন্ধরাজের পরাজয় ঘটল। আর পারলেন না—তাড়াতাড়ি রঞ্জাবতীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত টাকাটা নিতেও রাজী হতে হল তাঁকে। দুর্বল মানুষ স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়লে যা হয় তাই হল। রঞ্জাবতীর কান্না থেমে গেল। কম্পিতকণ্ঠে তিনি ধন্যবাদ দিলেন গন্ধরাজকে, তারপর বেঞ্চিতে উঠে বসলেন গন্ধরাজের পাশে।

"এখন বুঝতে পারছেন কেন আমি আপনার চোর বন্ধুটিকে দূরে রাখতে বলেছিলাম আর কেনই বা আমি একা এসেছি। টাকাটা নিয়ে আসতে কি যে বুক কাঁপছিল আমার—"

"আর বোলো না রঞ্জাবতী"—গন্ধরাজের কণ্ঠস্বরও সজল মনে হল—"আমাকে আর লজ্জা দিও না। তুমি এত ভালো, এত মহৎ তা আমি জানতাম না। তুমি যে আমার জন্যে এতটা করবে—"

"করব না? বলেন কি। শুনে অবাক লাগছে। আপনি কি নির্বুদ্ধিতাটা করছিলেন বলুন তো! এখন আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার সেই কৃষক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে। আপনার বান্ধবীর টাকাটারও সদগতি হল একটা। বাজে চক্ষুলজ্জার জন্যে আপনি যেটা প্রকৃত কর্তব্য, আমি বলব যেটা প্রকৃত দয়া— সেইটেই ভুলে যাচ্ছিলেন আপনি। যাক্, আমি এবার খুশী হয়েছি, খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু আপনি অমন মুখ গোমড়া করে রইলেন কেন। হাসি ফুটছে না কেন আপনার চোখে মুখে। আমি জানি সৎকার্য করলে মনটা দমে যায়। কিন্তু ভুলে যান এসব। আমার দিকে তাকান, হাসুন একটু— এখনও রাগ পড়ল না?"

গন্ধরাজ তাঁর মুখের দিকে চাইতে পারলেন না। যখন কেউ কোন নারীকে আলিঙ্গন করে তখন ইন্দ্রজালের জাদু সম্মোহিত করে দেয় তার মনকে; কিন্তু এ সময়ে গহন রাত্রির পটভূমিকায় নক্ষত্রের চিকিমিকি আলোকে নারীর যে মাধুরী ফুটে ওঠে তা অনির্বচনীয়। তার চুলে তারার আলোর ছোঁয়া হয়ে ওঠে নিপুণ তুলির স্পর্শ, তার চোখ দুটিকে মনে হয় নক্ষত্র-

মিথুন। তার মুখের রেখায় রেখায় মন যে ছবি আঁকে তা অনুরাগ-রঞ্জিত অনবদ্য চিত্র। গন্ধরাজ পরাজিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার জন্য আর ক্ষোভ ছিল না মনে। রঞ্জাবতীর উপর আর রাগ করতে পারছিলেন না। বরং অনুরাগই জাগছিল মনে।

বললেন, "না, আমি অকৃতজ্ঞ নই—"

"আপনি বলেছিলেন মজার খোরাক দেবেন আমাকে। কিন্তু আমিই দিলাম সেটা। কেমন একটা ঝঞ্ঝা-ঝটিকাময়ী নাটিকা হয়ে গেল বলুন তো—"

গন্ধরাজ হেসে উঠলেন। কিন্তু সে হাসির আওয়াজটা যেন স্বাভাবিক মনে হল না। মনে হল মেকী।

"এবার আমাকে কি দেবেন বলুন, আমার এমন বাহাদুরির বখশিস কিছু পাব না?"

"যা চাও তাই দেব।"

"যা চাই তাই দেবেন? সত্যি? মনে করুন যদি আপানর রাজমুকুটটাই চেয়ে বসি? দেবেন?"

বিজয়িনীর গর্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি।

"চাও যদি, নিশ্চয়ই দেব।"

"চাইব তাহলে মুকুটটা? না, মুকুট নিয়ে কি করব আমি! ছোট্ট রাজ্য আপনার গর্জনগাঁও। অমার দুরাকাঙ্ক্ষা আরও অনেক বেশী। আমি চাই—কি চাইব—দেখছি চাইবার মতো কিছুই তো নেই। তার বদলে আমিই বরং কিছু দিই আপনাকে । নিন, চুমু খান আমার। একবার কিন্তু। সরে আসুন।"

সরে এলেন গন্ধরাজ। রঞ্জাবতী মুখটা উঁচু করলেন। দুজনেরই চোখেমুখে চিকমিক করতে লাগল হাসি। যেন একটা ছেলেমানুষি খেলা হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের ওষ্ঠ সত্যিই যখন সংলগ্ন হল তখন গন্ধরাজের সমস্ত সত্তায় একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল যেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দূরে সরে বসলেন। রঞ্জাবতীও। নির্বাক হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলেন দুজনেই। গন্ধরাজের ভয় হল এই নীরবতার মধ্যে হয়তো আরও কোন আসন্ন বিপদ ওত পেতে আছে, তবু তিনি নীরবতা ভঙ্গ করতে পারলেন না। কোন কথাই যোগাল না তাঁর মুখে। রঞ্জাবতীই প্রথমে কথা কইলেন।

"আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা কথা—"

বেশ পরিষ্কার অকম্পিত কণ্ঠে শুরু করলেন রঞ্জাবতী।

"আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আমি তাকে ভালবাসি—"

খাপছাড়া রকম উঁচু গলায় গন্ধরাজ বলে উঠলেন ।

"আমি কি বলি তা আগে শুনুন। শেষ করতে দিন কথাটা"—হেসে উত্তর দিলেন রঞ্জাবতী—"বিনা কারণে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিনি। এখনই আমাদের দুজনেরই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওর জন্যে অপ্রস্তুত হবেন না, এতে লজ্জারই বা কি আছে ।"

রঞ্জাবতীর কথায় ধমকের একটু আমেজ পাওয়া গেল—"লজ্জাটজ্জা নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করি না আমি। একটু ভাবলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমি নানাভাবে আপনাকে বাঁচাবারই চেষ্টা করছি, আপনার সুনামকে রক্ষা করবার জন্য আমি তার চারপাশে দুর্গই রচনা করছি। এটা যেন আপনি ভুলেও মনে করবেন না যে আমি আপনার প্রেমের ভিখারিণী,

মোটেই তা নই—এ কথাটা মনে রাখলে সুখী হব। হাসতে হাসতে যা করলুম, হাসির সঙ্গেই তা শেষ হোক। বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা হবার ইচ্ছে নেই। হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে যা বলছিলাম— তিনি কপিঞ্জলের উপপত্নী নন, কখনও ছিলেন না। কপিঞ্জল তাঁর অন্দরের উঠোনে প্রবেশাধিকার পায়নি। পেলে এ নিয়ে নিশ্চয় সে ঢাক বাজিয়ে বেড়াত। আচ্ছা, চললুম। নমস্কার—"

নিমেষের মধ্যে গলির অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন রঞ্জাবতী। গন্ধরাজ টাকার থলি নিয়ে সেই উড়ন্ত পরীর সামনে একা বসে রইলেন।

।। চোদ্দ।।

রঞ্জাবতী যুগপৎ আঘাত এবং আদর হেনে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে যে সুসংবাদটি দিয়ে গেলেন এবং যে ভাবে এই অভিনব সাক্ষাৎকারটির সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি হল তাতে গন্ধরাজের নিঃসন্দেহে খুশী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যখন তিনি টাকার বস্তাটা কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁর সহিসটির কাছে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন তখন যেন নানা বেদনার কাঁটা খচখচ করে বিঁধতে লাগল তাঁর মনে। অন্যায় করা এবং তারপর সংশোধিত হয়ে ন্যায়ের পথে ফিরে আসা—দুটোই পুরুষের অহঙ্কারকে আঘাত করে। সহসা তাঁর নিজের দুর্বলতা আবিষ্কার করে এবং সে রকম অবস্থায় পড়লে তাঁর পক্ষেও যে দাম্পত্য-অঙ্গীকার লঙ্ঘন করা সম্ভব এই ভেবে তাঁর আত্মবিশ্বাস কেমন যেন টলমল করে উঠল। আর ঠিক এই সময়ে তিনি শুনলেন যে সুরূপিণী অটল আছে, আর এমন লোকের মুখ থেকে শুনলেন যে তার বন্ধু নয়, শত্রু। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ শুনে তাঁর মনের খচখচানিটা আরও বেড়ে গেল যেন।

খানিকটা পথ হাঁটবার পর একটু স্বস্থ হলেন তিনি, পরিষ্কার ভাবে নিজের মনটা দেখতে পেলেন। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে তিনি রেগে রয়েছেন। ক্রোধভরেই থেমে গেলেন তিনি এবং ঠিক তাঁর পাশেই যে ছোট ঝোপটা ছিল তাতে সজোরে আঘাত করলেন হাত দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক চড়ুই পাখি উড়ল, উড়েই আবার বিলীন হয়ে গেল অন্ধকারে। বোকার মতো চেয়ে রইলেন তিনি সেদিকে। তারা যখন অন্তর্ধান করল তখন চাইলেন নক্ষত্রের দিকে । অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন।

"আমার রাগ হচ্ছে"—ভাবতে লাগলেন তিনি—"কিন্তু কেন? রাগের সঙ্গত কারণ কিছু ঘটেছে কি? কিছু না।"

হঠাৎ রঞ্জাবতীর উপর রাগ হল, কিন্তু পরমুহূর্তেই অনুতাপ করলেন সেজন্য। কাঁধের উপর টাকার ভারটা বেশ ভারী বলে মনে হতে লাগল।

ফোয়ারার কাছে পৌঁছে বাহাদুরি দেখাবার জন্যে তিনি যা করলেন সেটাও খুব সুবুদ্ধির কাজ নয়।

চোর সহিসের কাছে টাকার থলিটা ধপাস করে নামিয়ে বললেন, "এটা তোমার কাছে রাখ। পরে আমি এসে নিয়ে যাব। অনেক টাকা আছে এতে। এর থেকেই বুঝতে পারছ তোমার উপর আমি রাগ করিনি।"

এই বলে গটগট করে চলে গেলেন তিনি, যেন খুব একটা মহৎ কাজ করেছেন। সঙিন উঁচিয়ে নিজের আত্মসম্মানের দুর্গে প্রবেশ করবার হাস্যকর চেষ্টা এটা, আর এসব ক্ষেত্রে যা সাধারণত হয় এক্ষেত্রেও তাই হল—এ চেষ্টাও সফল হল না। বিছানায় শুয়ে সারারাত এপাশ ওপাশ করলেন। একটুও ঘুম হল না। তারপর ভোরের দিকে, ঊষার আলো যখন পূর্বাকাশে ফুটি ফুটি করছে, তখন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ঘুম ভাঙল বেলা দশটায়। মনে হল এখনই যে কীর্তিভূষণের সঙ্গে দেখা করবার কথা। দেখা করতেই হবে, দেরি হয়ে গেল, তা হোক। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন তিনি ঘর থেকে এবং ধাবিত হলেন সেই সহিসের উদ্দেশে। গিয়ে দেখলেন—আশ্চর্যের বিষয় এটা—সহিস ঠিক আছে, টাকার থলিও ঠিক আছে, তাড়াহুড়ো করে হাজির হলেন 'শুকতারা' সরাইখানায়, একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল অবশ্য, গিয়ে দেখলেন কীর্তিভূষণ সভ্যভব্য পোশাক পরে গম্ভীরভাবে বসে আছে তাঁর অপেক্ষায়। একজন আইনজীবীও কাগজপত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন পাশের একটা টেবিলে। দলিলে সেই সহিস এবং সরাইখানার মালিক সাক্ষী হলেন। সরাইখানার মালিক গন্ধরাজকে চিনতে পেরেছিলেন এবং মহারাজের মতই খাতির করেছিলেন তাঁকে। এ দেখে অবাক হয়ে গেল কীর্তিভূষণ, এত খাতির করছে কেন। তারপর ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে যখন গন্ধরাজ দলিলে সই করলেন। তখন আত্মহারা হয়ে পড়ল বেচারা।

"মহারাজা"—আবেগভরে বলে উঠল সে—"মহারাজা" এই কথাটাই বার বার উচ্চারণ করতে লাগল সে। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। যখন বিশ্বাস হল তখন সে সাক্ষী দুটির দিকে ফিরে বলল,"আপনারা স্বর্গরাজ্যে বাস করছেন। আমি অনেক সদাশয় ভদ্রলোক দেখেছি কিন্তু এঁর মতো লোক আর দেখিনি— সত্যি বলছি দেখিনি। ইনি সত্যিই মহারাজা। আমি বুড়ো মানুষ, অনেক অভিজ্ঞতা আছে আমার, কিন্তু এমন ভদ্রলোক কখনও দেখিনি। সত্যি দেখিনি—সত্যি ভদ্রলোক।"

সরাইখানার মালিক মৃদু হেসে বললেন, "আমরা তা ভালো করেই জানি। ওঁকে যদি আমরা আরও কাছে পেতাম তাহলে বর্তে যেতাম।"

সহিসটিও বলতে শুরু করেছিল—"এরকম দয়ালু মহারাজা—" বলেই চুপ করে গেল সে, হঠাৎ তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা। সবাই ফিরে চাইল তার দিকে। গন্ধরাজ অবাক হয়ে গেলেন।

এরপর উকীল ভদ্রলোকটিও কিছু বললেন।

"মহারাজা, ভবিষ্যতে কি হবে তা জানি না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি আজকের দিনটি আপনার রাজত্বের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দিন। এই নিরীহ সরল লোকগুলির মুখে আপনার যে জয়ধ্বনি আজ ধ্বনিত হল তা আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনীর জয়ধ্বনির চেয়েও বেশী মুখর, বেশী আন্তরিক।"

এই বলে তিনি অভিবাদন করলেন, একটু পিছিয়ে গেলেন এবং একটিপ নস্যি নিলেন। মনে হল সুযোগ মতো তাক মাফিক ভালো ভালো কথাগুলো বলতে পেরেছেন বলে ভারি একটা আত্মপ্রসাদ হয়েছে তাঁর।

কীর্তিভূষণ বলল, "আপনি জীবনে অনেক আইনের কাজ করেছেন, এ কথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ, আজ যা করলেন তেমনটি আর কখনও করেননি। আমি বুড়ো মানুষ আপনাকে আশীর্বাদ করছি। আপনি বড়লোক, অনেক বড় বড় সমাজে ঘোরেন, আপনার

সুখের অভাব নেই তবু আমার মতো গরীবলোকের আশীর্বাদে আশা করি আপনার আরও ভালো হবে।"

ব্যাপারটা প্রায় একটা অভিনন্দন-সভার মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, কিন্তু গন্ধরাজ আর সেখানে দাঁড়ালেন না। বেরিয়ে এসে একটা অদ্ভুত কথা মনে হল তাঁর। যেখানে গেলে নিশ্চয়ই প্রশংসা পাওয়া যাবে এ রকম একটা জায়গায় যাওয়ার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠল সহসা। মনে পড়ল রাজসভার কথা। সেখানে তিনি যা করেছিলেন তা প্রশংসাযোগ্য নিশ্চয়ই। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল ইন্দীবর ভারতীর কথা। ঠিক করলেন তাঁর কাছেই যাবেন।

ইন্দীবর ভারতী যথারীতি পাঠাগারেই ছিলেন। গন্ধরাজকে দেখে মনে হল যেন একটু অসন্তুষ্ট ভাবেই তিনি কলমটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন—"এই যে। কি খবর—"

"খবর? আমরা সেদিন বিদ্রোহটা করে ফেলতে পেরেছি, কি বল?"

"হ্যাঁ। আমারও ভয় হচ্ছে তাই।"

"ভয়? ভয় কিসের? আমি এবার আমার শক্তি আর ওদের দুর্বলতা কোথায় তা বুঝতে পেরেছি। এবার থেকে আমিই শাসন করব আমার রাজ্য—"

ইন্দীবর কোনও উত্তর দিলেন না, হেঁটমুণ্ডে নিজের থুতনিতে হাত বোলাতে লাগলেন নীরবে।

"তোমার মত নেই? আচ্ছা খামখেয়ালী লোক তুমি তো!"

"আজ্ঞে না মহারাজ। আমি যতটুকু দেখেছি তাতে আমার ভয়ই হচ্ছে। এ ভাবে চললে কিছুই হবে না।"

"কি ভাবে চললে!"

গন্ধরাজের গালে কে একটা চড় মারল যেন।

"যে ভাবে চলছ। রাজ্যশাসন করতে হলে যে শক্তি, যে চরিত্র, যে সংযম, যে ধৈর্য থাকা দরকার তা তোমার কিচ্ছু নেই। তোমার স্ত্রীর চরিত্রে এ সব আছে, অনেক বেশী আছে। যদিও সে একটা বদলোকের পাল্লায় পড়েছে, কিন্তু তার শাসন করবার ক্ষমতা তোমার চেয়ে ঢের বেশী। সে জানে কত ধানে কত চাল হবে এবং কি করে সেটা নিজের গোলায় তোলা যাবে। আর তুমি, ভাই গন্ধরাজ রাগ কোরো না, তুমি তুমিই। আমার উপদেশ তুমি তোমার খেলার মাঠে ফিরে যাও। নিজেকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, তুমিও পারনি। তুমি বার বার আত্মপ্রকাশ করছ। আমার কোনও কিছুতেই বিশেষ আস্থা নেই, আমি পক্ষপাতহীন নাস্তিক। তবে দুটি ব্যাপারে আমার অনাস্থা সবচেয়ে বেশী, একটি হচ্ছে রাজনীতি, আর একটি চরিত্র-নীতি। তুমি যে সব দুষ্কর্ম কর, সেগুলো আমার ভালোই লাগে, কারণ তা প্রায় সবই নেতি-বাচক, বিশেষ কারো অনিষ্ট করে না, আর আমার জীবনদর্শনের সঙ্গে মেলেও খানিকটা। তাই মাঝে মাঝে তোমার ওই দুষ্কর্মগুলোকে সৎকর্ম বলতেও দ্বিধা করিনি আমি। কিন্তু গন্ধরাজ, এখন দেখছি আমার ভুল হয়েছে। আমার নাস্তিক্যবাদ আমি বর্জন করেছি এবং দেখতে পাচ্ছি যে তোমার দোষ অমার্জনীয়। তুমি মহারাজা হওয়ার উপযুক্ত নও, স্বামী হওয়ার যোগ্যতাও নেই তোমার। একটা প্রচণ্ড গুণ্ডা যদি সব তছনছ করে দেয় তার দক্ষতাকে সহ্য করা যায় কিন্তু ভালো করবার ছুতোয় যদি কেউ আনাড়ীর মতো সব পণ্ড করতে থাকে তাহলে তা অসহ্য।"

গন্ধরাজ নীরবে গুম হয়ে শুনে যেতে লাগলেন।

ইন্দীবর শুরু করলেন আবার—"প্রথমে ছোটখাটো ব্যাপারের কথাই বলছি—স্ত্রীর প্রতি তোমার আচরণ। তুমি নাকি তোমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে জবাবদিহি দাবি করেছিলে, এটা ভালো কি মন্দ তার আমি সমালোচনা করছি না। কিন্তু এর ফল হয়েছে তিনি চটেছেন। রাজসভায় প্রকাশ্যে তিনি তোমাকে অপমান করলেন। তুমিও উল্টে অপমান করলে তাঁকে—পুরুষ আর নারী—স্বামী আর স্ত্রী—প্রকাশ্য সভায় ইতরের মতো ঝগড়া করতে লাগলে। আমার মনে হচ্ছিল, এটা রাজসভা না মেছোবাজার। যাক্ সে সব তো চুকে বুকে গেল—তারপর শুনছি না কি—কথাটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে—শুনছি না কি দলিলপত্রে মহারাণীর স্বাক্ষর করবার অধিকারটা তুমি কেড়ে নিয়েছ। এ অপমান তিনি কি কখনও ক্ষমা করবেন? তেজস্বিনী যুবতী নারী—যিনি জানেন যে তোমার বুদ্ধির চেয়ে তাঁর বুদ্ধি অনেক বেশী—তিনি কি এ আঘাত সহ্য করবেন নীরবে? কখনও না। প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকো। পরিশেষে আর একটা কথা, তোমার দাম্পত্য জীবনের যখন এই রকম টলমল অবস্থা তখন তুমি তোমার বৈঠকখানায় ওই রঞ্জাবতীর সঙ্গে ঘেঁষা-ঘেঁষি করে জানলার খোপে বসে স্বচ্ছন্দে আড্ডা দিয়েছ। আড্ডা দেওয়া অন্যায় তা বলছি না, কিন্তু এ কাজটি প্রকাশ্যে করে তোমার স্ত্রীর মর্যাদাহানি করেছ তুমি। তাছাড়া মেয়েটি অপাঙ্গময়ী হতে পারে, কিন্তু অপাংক্তেয়। ওর সঙ্গে কি মহারাজের—"

'ইন্দীবর, রঞ্জাবতীর কোন নিন্দা আমি সহ্য করব না।"

"কোরো না, কিন্তু তার কোনও প্রশংসা আমি করতে পারব না। দেখ, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে নিখুঁত চারুশীলা দেখতে চাও তাহলে তোমার সভা থেকে ওই সব আঁশটে-গন্ধ দূর কর—"

'ইন্দীবর তুমিও কি তোতাপাখির মতো ছেঁদো কথা আওড়াবে? মহিলা বলেই ওর যত অপরাধ? কপিঞ্জল কি তাহলে! রঞ্জাবতী যদি পুরুষ হত—"

"আমার কাছে সব সমান। দেখ—"

ইন্দীবরের কণ্ঠস্বর একটু চড়া হল—"দেখ, যখন বুড়োখোকা এসে ভাঁড়ামি করে হেঁয়ালিতে কথা কয় আর নিজের দোষগুলো নিয়ে বাহাদুরি করতে চায়, তখন আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। তখন আমি বলতে বাধ্য হই, তুমি ভদ্রলোক নও, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই। মহিলা! মহিলা কথাটার মানে জান তুমি? রঞ্জাবতীকে তুমি মহিলা বলছ!"

"রঞ্জাবতীর চেয়ে বড় বন্ধু আমার নেই। আমি ইচ্ছা করি তার সম্বন্ধে সসম্ভ্রমে কথা বলা হোক।"

"সে যদি তোমার বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে সেটা তোমার দুর্ভাগ্য। ও জল ওখানেই থেমে থাকবে না, অনেক দূর গড়াবে!"

"বাঃ বাঃ, তোমার উদারতা দেখে মুগ্ধ হলাম। ফলে একটু দাগ থাকলেই সেটা পচা? চমৎকার যুক্তি তোমার। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি রঞ্জাবতীর উপর তুমি ঘোর অবিচার করছ!"

"আমাকে বলতে তোমার বাধা থাকা উচিত নয়। তুমি কি ওকে বাজিয়ে দেখেছ? ঘোড়ায় চড়েছ, না ঘোড়াটা দেখেই—"

গন্ধরাজের মুখটা লাল হয়ে উঠল।

"মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল যে। তোমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে লজ্জায় তোমার অধোবদন হওয়া উচিত। ও রকম মেয়েকে পেয়ে হাতছাড়া করে ফেলছ তুমি। ও রকম টকটকে রাঙা জবার মতো মেয়ে—ওর চোখে যে দীপ্তি জাজ্বল্যমান তা ওর আত্মার প্রকাশ।"

"সুরূপিণীর সম্বন্ধে সুর বদলে ফেলেছ দেখছি—"

ভুরু কুঁচকে বললেন গন্ধরাজ।

"বদলে ফেলেছি?"—উদ্দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন ইন্দীবর—"অন্যরকম কবে ছিল? আমি উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করছি রাজসভায় তার যা চেহারা দেখেছি তা অপূর্ব। নীরবে বসে সে যখন পায়ের জুতো ঠুকছিল তখন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি, ঝড়কে দেখে যেমন হই, তেমনি। দাম্পত্যের দুরূহ পথে যদি কখনও পদার্পণ করতে প্রলুব্ধ হই—ওই রকম মেয়ের জন্যই হব। সত্যিই প্রলুব্ধ করে, দ্রৌপদী যেমন প্রলুব্ধ করেছিল অর্জুনকে। লক্ষ্য ভেদ করা শক্ত, খুবই শক্ত, কিন্তু ও রকম মেয়েরা বীরভোগ্যাই হয়। ও রকম পুরস্কারের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করতে পারি। কিন্তু ওই রঞ্জাবতীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা—কখনও না। কাম? ওটা আমি বর্জন করেছি। ও চুলকোনি ছাড়া কিছু নয়। কৌতূহল? শরীরতত্ত্বের বই খুললেই তা মিটে যায়—তার জন্যে—"

"কাকে তুমি কি বলছ! তুমি অন্ততঃ জান আমি সুরূপিণীকে ভালবাসি—আর কেউ না জানুক।"

"ও ভালবাসা! প্রেম! মস্ত কথা ওটা, সব অভিধানেই আছে। তুমি যদি তাকে ভালবাসতে তাহলে তার প্রতিদানও নিশ্চয় পেতে। ও তো বেশী কিছু চায় না—একটু আদর, একটু উচ্ছ্বাস, একটু উত্তাপ, একটু হাব-ভাব—"

"কিন্তু দুজনের ভালবাসা একজন কি বাসতে পারে? খুব শক্ত সেটা।"

"শক্ত বলছ? ওইটেই তো কষ্টিপাথর। কবিরা কি বলে গেছেন মনে নেই? আমরা তো মরুভূমি—কেবল ধুলো-বালি আর উত্তাপ, জীবনের শ্যাম-শোভা সেখানে নেই। প্রেমই তাকে স্নিগ্ধ করে। বিরাট পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে প্রেম যে শীতল ছায়া বিস্তার করে সে ছায়ায় শুধু প্রণয়ী নয়, প্রণয়িনী এবং তার ছেলে মেয়েরাও আশ্রয় পায়, বন্ধু-বান্ধবরাও সে ছায়ার প্রান্তে এসে শান্তি খোঁজে। যে প্রেম গৃহস্থালীর নীড় রচনা করতে পারে না সে প্রেম প্রেমই নয়। খুঁত ধরে ঝগড়া করাকে তুমি প্রেম বল? প্রণয়িনীর পথে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে তার মুখের উপর প্রকাশ্যে অপমান ছুঁড়ে দেওয়াটা কি প্রেমের লক্ষণ? প্রেম!"

"ইন্দীবর, তুমি আমার উপর অবিচার করছ। আমি তখন দেশের জন্য লড়ছিলাম।"

"আর ওইখানেই সাংঘাতিক ভুল করেছ। তুমি বুঝতেও পারনি যে ভুল করছ। রাজপরিষদ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যতদূর এগিয়েছিল সেখান থেকে এখন পিছিয়ে আসা মানে যে সর্বনাশ এটা তোমার মাথায় ঢোকেনি।"

"কিন্তু তুমি তো আমাকে সমর্থন করেছ।"

"করেছি। কারণ আমিও তোমার মতো হাঁদা। কিন্তু এখন আমার চোখ খুলেছে। এখন বুঝতে পারছি তুমি যদি এই চালে চল, ওই কপিঞ্জল লোকটাকে যদি প্রকাশ্যে অপমান কর, এবং তোমার গৃহবিচ্ছেদের কেলেঙ্কারি যদি ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রচার করে বেড়াও তাহলে গর্জনগাঁওয়ের সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিদ্রোহ হবে, বিদ্রোহ—"

"তুমি নিজেকে লাল বিদ্রোহী বল। বিদ্রোহকে এত ভয় তোমার? এসব কথা তোমার মুখে মানাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, আমি লালই, কিন্তু প্রজাতন্ত্রী লাল। রাষ্ট্রবিপ্লবী নই। উন্মত্ত গর্জনগাঁওয়ের জনতা অতি জঘন্য অতি ভয়ঙ্কর। মাত্র একটি লোকই ওদের ঠাণ্ডা করতে পারে, দেশকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে—সে হচ্ছে ওই দুমুখো সাপ কপিঞ্জল। তুমি যেমন করে পার ওর সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেল। তাহলেই দেশে শান্তি ফিরে আসবে। তুমি তা পারবে না, তোমার সে ক্ষমতাই নেই। তোমার সুরূপিণী যা বলেছিল তাই তুমি। তুমি মহারাজাপদের সুযোগ নিয়ে নিজের খেয়ালখুশির মালমসলা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। কাল টাকার জন্যে তুমি নাছোড়বান্দা ভিকিরির মতো ভিক্ষে করছিলে। কেন? রাজকোষের টাকা কেন নেবে? এ কি অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতার হেঁয়ালি! কি দরকার ছিল টাকার!"

"কোন মন্দ কাজের জন্যে নয়। একটা খামার কেনবার জন্যে।"

"খামার! খামার কেনবার জন্যে!"

"কেন, ক্ষতি কি। আমি কিনেও ফেলেছি।"

ইন্দীবর যেন লাফিয়ে উঠলেন।

"কি করে কিনলে?"

"কি করে?"

"হ্যাঁ, কি করে। টাকা পেলে কোথায়—"

গন্ধরাজের মুখটা কালো হয়ে গেল।

"পেয়েছি কোথাও থেকে। তা তুমি না-ই বা শুনলে।"

"কথাটা বলতে লজ্জা হচ্ছে তোমার। তোমার রাজ্যের যখন টাকার এত দরকার তখন তুমি খামার কিনছ, সম্ভবত তোমার ইচ্ছে সিংহাসন ত্যাগ করে সেইখানে গিয়ে বসবাস করবে! আমি বলছি তুমি টাকাটা চুরি করেছ। টাকা পাওয়ার তিন রকম উপায় নেই, মাত্র দুরকম আছে—হয় উপার্জন করা, না হয় চুরি করা। উপার্জন করবার ক্ষমতা তোমার নেই, সুতরাং তুমি চুরি করেছ, আর তা নিয়ে আমার কাছে বাহাদুরি করছ। দেখ, একটা সোজা কথা স্পষ্ট করে বলছি তোমাকে। যতক্ষণ আমি এই খামার খরিদের সম্পূর্ণ বিবরণ না জানছি, ততক্ষণ আমি আর তোমার ব্যাপারে নেই। হাত গুটিয়ে নিলাম। মহারাজা হিসাবে তুমি অযোগ্যতম হতে পার, কিন্তু ভদ্রলোক হিসাবে তোমাকে নিষ্কলঙ্ক হতে হবে।

বিবর্ণ মুখে উঠে দাঁড়ালেন গন্ধরাজ।

'ইন্দীবর তুমি আমাকে আমার ধৈর্যের সীমার ওপারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছ। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—"

"তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, বন্ধু"—গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন ইন্দীবর—"তাহলে তো এ নাটকের অদ্ভুত উপসংহার হল।"

"ব্যক্তিগত কারণে কবে আমি আমার ক্ষমতা ব্যবহার করেছি? তুমি আমাকে যা বললে যে কোনও লোকের পক্ষেই তা অমার্জনীয় অপমান, কিন্তু আমাকে লক্ষ্য করে তুমি নিরঙ্কুশ ভাবে তীরের পর তীর চালিয়ে গেলে, কারণ তুমি জান আমি তোমায় কিছু বলতে পারব না এবং হয়তো এ আশাও করেছ যে তোমার স্পষ্টবাদিতার জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতাও

প্রকাশ করব। বেশ, আমি তা করছি এবং এ-ও বলছি তোমাকে শুধু ক্ষমাই করলাম না, তোমার প্রশংসাও করছি, আমার মতো একজন পিশাচ-মহারাজার সঙ্গে এতদিন ছিলে বলে। কিন্তু তুমি যে নিষ্ঠুর হাতে আমাদের পুরোনো প্রেমটাকে এমনভাবে উপড়ে ফেলতে পার তা ভাবিনি। বুকটা খালি হয়ে গেল। শেষ বন্ধনটাও ছিঁড়ে গেল। ভগবান সাক্ষী আমি যা করতে চেয়েছি তা মন্দ নয়, ভালো। পাপ নয়, পুণ্য। কিন্তু তার এই পুরস্কার। কোন বন্ধু রইল না, একা হয়ে গেলাম। তুমি বললে আমি ভদ্রলোক নই, কিন্তু এতক্ষণ তোমার মুখেই গালাগালির খই ফুটেছে, আমি একটি অভদ্র কথাও উচ্চারণ করিনি। যদিও আমি বুঝতে পারছি কার জন্যে তোমার এত দরদ, তবু আমি মুখ বুজেই আছি, মুখ বুজেই থাকব।"

"পাগল হয়ে গেলে না কি তুমি!"

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন ইন্দীবর।

"যেহেতু আমি জানতে চাই যে কি করে তুমি টাকাটা পেলে এবং যেহেতু তুমি তা বলতে রাজী নও—তাই—"

"পণ্ডিতপ্রবর মহামান্য ইন্দীবর ভারতী, আমার ব্যাপারে তোমাকে আর নাক গলাতে হবে না, তোমার হিতৈষণা তোমার কাছেই থাক। আমি যা জানতে চেয়েছিলাম তা জেনেছি, তুমি আমার অহঙ্কারকে দুপায়ে পিষে চূর্ণবিচূর্ণও করেছ। আমি রাজ্যশাসন করতে পারি না, আমি ভালওবাসতে পারি না—এসব হয়তো সত্যি, তুমি অন্তত জোরের সঙ্গে তা বললে, নিশ্চয়ই তোমার বিবেকেরও সায় আছে ওতে, কিন্তু ভগবান আমাকে একটা ক্ষমতা দিয়েছেন, আমি সব জেনে সব শুনেও ক্ষমা করতে পারি। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, আমার মনের এই শোচনীয় অবস্থাতেও আমি বুঝতে পারছি কি কি আমার দোষ এবং তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হয়েছ কেন। ভবিষ্যতে যদি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করি তাহলে ভেবো না যে আমি রাগ করে তা করেছি। রাগ নয়, কিন্তু তুমি আমাকে যে ভাবে যে ভাষায় আক্রমণ করেছ, তা বার বার সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার মহারাজাকে কাঁদিয়ে এবং ব্যথা দিয়ে তুমি তৃপ্তি পেয়েছ এবং যে লোকটার সুখকে নিয়ে তুমি কতবার ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে তাকে ধুলোয় নামিয়ে নির্জন পথের পথিক করে দিয়ে সুখ পেয়েছ—ব্যাস্। না আর কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। মহারাজা হিসাবে শেষ কথাটা বলবার দাবি আমার আছে—সেই কথাটা বলে আমি চলে যাচ্ছি—আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।"

এই কথা বলে গন্ধরাজ চলে গেলেন। একা বসে রইলেন ইন্দীবর ভারতী। দুঃখ, অনুতাপ (এবং ঈষৎ আনন্দ)— পরস্পরবিরোধী এই সব মনোভাব দ্বন্দ্ব শুরু করে দিলে তাঁর অন্তরে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, পায়চারি করতে লাগলেন টেবিলের সামনে। মাথার উপরে দু'হাত তুলে তিনি বার বার প্রশ্ন করতে লাগলেন, এই বন্ধুবিচ্ছেদের জন্যে দুজনের মধ্যে কে বেশী দায়ী। তারপর আলমারি খুলে বার করলেন মাধ্বী সুরা আর পদ্মরাগখচিত একটি পানপাত্র। প্রথম পাত্র নিঃশেষ করে ধাতস্থ হলেন একটু। দ্বিতীয় পাত্রের পর মনে হল তিনি যেন সূর্যকরোজ্জ্বল একটা পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে এই সব ঝামেলাগুলোকে নিরীক্ষণ করছেন। এইভাবে কেটে গেল খানিকক্ষণ মনোরমা মায়া-সান্ত্বনা আর মিথ্যা-সুখের মোহে অভিভূত হয়ে। ক্রমশঃ সমস্ত জীবনটাকেই তিনি যেন একটা সোনালী স্বপ্নের মতো দেখতে লাগলেন।

তারপর একটু লজ্জিত হয়ে একটু মৃদু হেসে, একটু নিঃশ্বাস ফেলে তিনি নিজের কাছে স্বীকার করলেন তাঁর ভাইটিকে তিনি যা বলেছেন তা একটু বেশী স্পষ্ট, বেশী রূঢ়। 'সে-ও সত্যি কথাই বলেছে'—অনুতপ্ত ইন্দীবর মনে মনে বললেন—'যদিও আমি সন্ন্যাসী লোক, তবু আমি সুরূপিণীকে ভালোবাসি—সন্ন্যাসীর ধাঁচেই বাসি, কিন্তু বাসি যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

কথাটা নিজের কাছে স্বীকার করেই লাল হয়ে উঠল ইন্দীবরের কানের ডগা, মনে হল তিনিও যেন চুরি করছেন। আবার বসে পড়লেন চেয়ারে এবং সুরূপিণীর উদ্দেশ্যেই পান করলেন আর এক পাত্র সুরা।

।। পনেরো।।

সেদিন রঞ্জবতী দেবী যখন বাইরে বেরুলেন তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। বেলা প্রায় তিনটে। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেবে সামনের বাগানটা হনহন করে পার হতে লাগলেন তিনি। তাঁর মাথায় কাঁধে সূক্ষ্ম মসলিনের মতো খুব স্বচ্ছ, খুব সুন্দর মেঘবরণ একটি ওড়না উড়ছে, দামী নীলাম্বরী শাড়ির প্রান্তটা লুটিয়ে পড়েছে ধুলোয়।

সুদীর্ঘ বাগানটির অপর প্রান্তে রঞ্জাবতীর বাড়ির কাছেই দেখা যাচ্ছে আর একটি বৃহৎ প্রাসাদ। এই প্রাসাদে প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জল রাজকীয় কর্তব্য নির্বাহ এবং অবসর বিনোদন করেন। রঞ্জাবতীর বাড়ি এবং এই প্রাসাদের দূরত্বটা পার্বতীসমাজের আইন অনুসারে খুব অশোভন নয়।

রঞ্জাবতী দ্রুতবেগে পার হয়ে প্রাসাদের পিছন দিকে একটি ছোট কপাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কপাটে তালা বন্ধ ছিল। রঞ্জাবতী চাবি বার করে খুললেন সেটি। খুলেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেন এবং বিনা ভূমিকায় সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লেন কপিঞ্জলের পাঠাগারে। বেশ উঁচু প্রকাণ্ড ঘরটি। চারদিকের দেওয়ালে থাকে থাকে বই, টেবিলের উপর, মেজেতে কাগজপত্র ছড়ানো, মাঝে মাঝে দু-একটা ছবি, পরদা-টরদার বিশেষ বালাই নেই। ঘরের এক ধারে সুদৃশ্য পাথর দিয়ে বাঁধানো একটি অগ্নিকুণ্ডে গনগনে আঁচ উঠেছে। ঘরের ছাতের উপর থেকে প্রকাণ্ড একটি গম্বুজের ভিতর দিয়ে আলো ঢুকছে ঘরে। এরই মধ্যে বসেছিলেন মহামহিম প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জলদেব, একটা হাত-কাটা কামিজ পরে। তাঁর সেদিনের কাজকর্ম প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, বিশ্রাম করবার জন্যে একটু ঢিলে-ঢালা ভাবে বসেছিলেন তিনি। মনে হচ্ছিল তাঁর চেহারায়, এমন কি তাঁর প্রকৃতিতেও যেন একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে কিছু। যে কপিঞ্জল প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজকর্মে লিপ্ত থাকেন তাঁর সঙ্গে ঘরোয়া কপিঞ্জলের আকাশপাতাল তফাত। তাঁর চোখে মুখে বিশাল বপুতে যে আনন্দোচ্ছল ভাবটা ফুটে উঠেছিল তা বেশ মানিয়েছিল তাঁকে; স্থূলতার সঙ্গে স্ফূর্তির অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিল যেন। তাঁর মন্ত্রীসুলভ মুখোশ, ধূর্ত কুটিল ভাব-ভঙ্গী কিচ্ছু ছিল না তখন। তিনি আগুনের সামনে খোশমেজাজে বসে আরাম করছিলেন। একটা বিরাট জানোয়ার যেন রোদ পোয়াচ্ছে।

"আরে, এই যে! এলে অবশেষে—"

রঞ্জাবতীকে দেখে বলে উঠলেন তিনি। রঞ্জাবতী কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসলেন পায়ের উপর পা তুলে। তাঁর সুগঠিত পায়ের কালো মোজার খানিকটা এবং সুদৃশ্য নকশা করা সায়ারও নীচের দিকটা প্রকট হয়ে পড়ল। তাঁর মার্জিত মুখচ্ছবি, আঁটসাঁট দেহের সংযত মাধুরী সহসা যেন বিজয়িনীর মতো প্রতিষ্ঠিত করল নিজেকে—ওই প্রকাণ্ড কালো শয়তান দৈত্যটার পাশে।

"বার বার তুমি আমাকে ডেকে পাঠাও"—রঞ্জাবতী বললেন—"লোকে কি বলবে বল তো! আমার বুঝি লজ্জা করে না?"

হেসে উঠলেন কপিঞ্জল।

"এ কথায় মনে পড়ল, কোথায় ছিলে তুমি বল তো। কাল সমস্ত রাত তো তুমি বাড়িতে ছিলে না।"

"না। শিবমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম।"

হো হো করে হেসে উঠলেন কপিঞ্জল এবার। অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন, তাঁর দেহের মেদবহুল অংশগুলো হাসির ধাক্কায় থলথল করতে লাগল।

"ভাগ্যে আমার ঈর্ষা-বাতিক নেই। থাকলে অন্য রকম সন্দেহ করতুম। তুমি তো আমাকে চেনো, আমার ফুর্তির জন্যে কারও স্বাধীনতা আমি ক্ষুণ্ণ করি না, স্বাধীনতা আর ফুর্তি দুই হাত ধরাধরি করে চলুক আপত্তি নেই। আমি যা বিশ্বাস করি তা আঁকড়ে থাকি, সেটা খুব বড় কিছু নয় হয়তো, কিন্তু সেটা আমি আঁকড়ে থাকি। এবার কাজের কথায় আসা যাক—আমার চিঠি পড়েছ তো?"

"না পড়তে পারিনি। খোলাই হয়নি। যা মাথা ধরেছিল—"

"ও, তাই নাকি। তবে শোন মস্ত খবর আছে। কাল সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম। আজ সমস্ত সকালও তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। মস্ত খবর আছে। কাল বিকেলে আমি কাজ ফতে করেছি, নৌকা বন্দরে এসে গেছে, একটা মোক্ষম টানেই তীরে ভিড়ে যাবে এবার। তারপর আর মহারাণী আদরিণীর হুকুম তামিল করতে হবে না আমাকে । হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক। আদরিণী নিজের হাতে আদেশপত্র লিখে দিয়েছে। বুকে করে রেখেছি সেটা। আজ ঠিক রাত বারোটার সময় মহারাজ গোবর-গণেশকে তাঁর শোবার ঘরে বিছানায় বন্দী করে খোকার মতো পাঁজাকোলা করে চটপট রথে তুলে ফেলা হবে। পরদিন সকালে শূলপাণি দুর্গের নির্জন কারাগারে বসে মনোরম পার্বত্য দৃশ্য দেখবার সুযোগ পাবেন তিনি। তারপর যবনিকাপাত হবে গোবর-গণেশের রাজত্বের উপর। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, আদরিণী এসে যাবে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। এতদিন আমি তার অপরিহার্য ভৃত্য ছিলাম, এখন আমিই সর্বেসর্বা হব। বহুকাল থেকে" এবার বেশ জোর দিয়ে বললেন—"হ্যাঁ, বহুকাল থেকে এই দুরাশাটাকে প্রকাণ্ড পাহাড়ের মতো কাঁধে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি ! সে পাহাড় আজ নাবল। পাহাড়ের শিখরে শিখরে এখন উষার আলো ঝলমল করছে—"

রঞ্জাবতীর মুখ শুকিয়ে গেল, দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি।

"সত্যি বলছ?"

"সত্যি। বর্ণে বর্ণে সত্যি। পাখি ফাঁদে ধরা পড়েছে।"

"আমি বিশ্বাস করি না। মহারাণী নিজের হাতে আদেশপত্র দিয়েছেন? অসম্ভব! এ আমি কখনও বিশ্বাস করব না কপিঞ্জল—"

"আমি দিব্যি করে বলছি।"

"দিব্যিতে তোমার বিশ্বাস আছে? আমার তো নেই। তুমি কিসের নামে দিব্যি করবে? মদ, মেয়েমানুষ, না গান? ও-সবের কোন দাম নেই আমার কাছে"—এই বলে, রঞ্জাবতী কপিঞ্জলের আরও কাছে সরে গেলেন। তাঁর বাহুতে হাত রেখে বললেন—"আদেশপত্রের কথা আমি বিশ্বাস করলাম না, কখনও করব না। মরে গেলেও করব না। তোমার অন্য কোনও গোপন মতলব আছে—কি সেটা তা বুঝতে পারছি না—কিন্তু তুমি যা বলছ তার একটি বর্ণ সত্য নয়।"

"আদেশটা তোমাকে দেখাব?"

"যা নেই তা দেখাবে কি করে! আমাকে ধাপ্পা দিও না।"

"আশ্চর্য কাণ্ড! আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, দেখ তবে। দেখাচ্ছি তোমাকে আদেশপত্রটা—"

একটা চেয়ারের উপর কপিঞ্জলের গায়ের জামাটা পড়ে ছিল। সেই জামার পকেট থেকে তিনি কাগজটা বার করলেন।

"পড়।"

লোলুপহস্তে কাগজটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন রঞ্জাবতী। পড়তে পড়তে তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে যেন আগুনের হলকা ছুটে বেরুল।

"বুঝেছ, একটা রাজবংশের উচ্ছেদ হল আর তা উচ্ছেদ করলাম আমি। তুমি আর আমি এবার এ রাজত্ব ভোগ করব।"

বলতে বলতে কপিঞ্জলের বুকটা যেন বেশী চিতিয়ে গেল, মাথাটা আর একটু উঁচু হল, সমস্ত চেহারাটাই যেন স্ফীত হয়ে উঠল। তারপর একটু হেসে হাত বাড়িয়ে বললেন—"দাও ছোরাটা দাও, রেখে দি।"

রঞ্জাবতী হঠাৎ চট করে কাগজটা পিছন দিকে লুকিয়ে ঘনঘটাচ্ছন্ন মুখে ঘুরে দাঁড়ালেন কপিঞ্জলের চোখের দিকে চেয়ে।

"না, না। তোমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করতে চাই আগে। তুমি কি মনে কর আমি অন্ধ? কেবল একটি লোককেই এ রকম আদেশপত্র, ও দিতে পারে--যে ওর প্রেমিক। না, অস্বীকার কোরো না। তুমি ওর প্রেমিক, তুমি এই ষড়যন্ত্রে ওর সহকারী, তুমি ওর প্রভু, বুঝেছি, সব বুঝেছি আমি, তোমার ক্ষমতা যে কত তা আমার অজানা নেই। কিন্তু আমার স্থান কোথায়? আমাকে, যাকে তুমি প্রতারণা করেছ, আমাকে কোন জাহান্নমে পাঠাবে এখন!"

'ঈর্ষা! তোমার কাছে এটা প্রত্যাশা করিনি রনজু। বিশ্বাস কর, আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, আমি ওর প্রণয়ী নই। হয়তো হতে পারতাম, কিন্তু প্রেমের কথা বলতে সাহসই হয়নি আমার। মেয়েটা এমন আবছাগোছের ধোঁয়া-ধোঁয়া, এমন ছলাকলাময়ী খুকী, এমন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে— যে ওকে প্রেমের কথা বলতে সাহস হয় না। কেবল বাইরের চাপ দিয়ে ওকে
প্রেমের কথা বলতে সাহস হয় না। কেবল বাইরের চাপ দিয়ে ওকে আমি হাতে রেখেছি,

প্রেমিক কপিঞ্জল নেপথ্যে ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য। কিন্তু সে প্রয়োজন হয়নি। রনজু, তুমি নিজেকে সামলাও, এ সময় এসব অগ্নিকাণ্ড চলবে না। মেয়েটাকে এই বিশ্বাসে আমি ভুলিয়ে রেখেছি যে আমি তাকে পুজো করি, সে দেবী, আমি ভক্ত সেবক। এ সময় সে যদি ঘুণাক্ষরে তোমার আমার সম্পর্কের কথা টের পায়, সে যে রকম নির্বোধ, যে রকম ন্যাকা, যে রকম হিংসুকে তাহলে সে তো সমস্ত পণ্ড করে দেবে।"

"বক্তৃতাটি চমৎকার। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি—কার সঙ্গে তুমি দিনের পর দিন কাটাও? আমি কাকে বিশ্বাস করব, তোমার কথাকে, না, তোমার কাজকে?"

"কি মুশকিল রনজু, তুমি কি অন্ধ? তুমি আমাকে ভালো করেই জান। আমার পক্ষে ওরকম একটা ঠুনকো পুতুলকে ভালোবাসা কি সম্ভব? আমরা এতদিন একসঙ্গে আছি তবু তুমি যে আমাকে একটা অপদার্থ কবি বলে ভাবছ এটা সত্যিই কষ্টকর। আমি বরাবর ঘেন্না করে এসেছি ওই শাড়ি জামা গয়না জড়ানো ন্যাকড়ার পুতুলদের। আমি চাই রক্তমাংসের মেয়ে—তোমার মতো। তুমিই আমার উপযুক্ত সঙ্গিনী। আমার জন্যেই ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তুমিই আমার আনন্দ, প্রেরণা, সব। তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কি হবে? তোমাকে সত্যিই যদি ভালো না বাসি তাহলে তোমাকে আমার প্রয়োজনই বা কি। কিছু নেই। দিনের আলোর মতো কথাটা স্বচ্ছ।"

"সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাস কপিঞ্জল?"—রঞ্জাবতী যেন গলে গেলেন—"সত্যি?"

"নিশ্চয় সত্যি। আমি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি নিজেকে। তারপর তোমাকে। তোমাকে যদি হারাই তাহলে আমি নিঃস্ব হয়ে যাব।"

"তাহলে"—কাগজটি পরিপাটিরূপে ভাঁজ করে রঞ্জাবতী গম্ভীর ভাবে সেটি নিজের জামার ভিতর রাখলেন—"তাহলে আমি তোমাকে বিশ্বাস করব এবং তোমার ষড়যন্ত্রে যোগ দেব। আমার উপর নির্ভর করতে পার। রাত দুপুরে, বললে না? অঙ্গপ্রদেশের সেনাপতি ধূর্জটি সিং সঙ্গে থাকবেন, বুঝেছি। ঠিক লোককেই নির্বাচন করেছ। লোকটা কোন কিছুতেই পিছ-পা হবে না।"

কপিঞ্জল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"কাগজটা তুমি নিলে কেন। ওটা আমাকে দাও।"

"না। এটা আমার কাছে থাকবে। আঘাতটা আমিই হানব, তার জন্যে প্রস্তুতি দরকার। আমি ছাড়া এ কাজ একা তুমি করতে পারবে না। আর ব্যাপারটা ভালোভাবে করতে হলে কাগজটা আমার কাছে থাকা দরকার। ধূর্জটি সিংয়ের কোথায় দেখা পাব? তাঁর ঘরে কি?"

যদিও খুব শান্তভাবে রঞ্জাবতী কথাগুলো বলবার চেষ্টা করছিলেন তবু চাপা উত্তেজনায় তাঁর গলার স্বর কেঁপে উঠছিল মাঝে মাঝে।

"রনজু"—কঠিন দৃঢ়কণ্ঠে আদেশের সুরে কপিঞ্জল কথা কইলেন এবার। এতক্ষণ যে দিলদরিয়া ঘরোয়া ভাব ছিল সেটা লুপ্ত হয়ে গেল নিমেষে। কর্কশমূর্তি প্রধান মন্ত্রী আত্মপ্রকাশ করলেন।

"রনজু, কাগজটা আমি ফেরত চাইছি—এক, দুই, তিন—"

তাঁর মুখের দিকে স্পর্ধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রঞ্জাবতী বললেন, "দেখ কপিঞ্জল, কোনও হুমকি আমি সহ্য করব না।"

দুজনের চেহারাই ভয়ানক হয়ে উঠল; একটা ভয়ঙ্কর নীরবতা থমথম করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে রঞ্জাবতীই নীরবতা ভঙ্গ করলেন একটা তীক্ষ্ণ অকপট হাসি হেসে।

"খোকার মতো অবুঝ হয়ো না কপিঞ্জল। তোমার ব্যবহারে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তুমি যা যা বললে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাকে অবিশ্বাস করবার কি কারণ থাকতে পারে, আমিই বা শুধু শুধু বিশ্বাসঘাতিনী হতে যাব কোন স্বার্থে! গন্ধরাজকে প্রাসাদ থেকে চুপচাপ কোন হইচই না করে সরিয়ে ফেলাটাই শক্ত কাজ। তার দেহরক্ষীরা বিশ্বাসী, তার প্রধান-পরিচারক তার অন্ধ ভক্ত। একটি চীৎকারে সব নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

"তাদের কাবু করতে হবে। হাত পা মুখ বেঁধে তাদেরও চালান করে দিতে হবে মহারাজের সঙ্গে। গন্ধরাজের সঙ্গে সঙ্গে তারাও উপে যাবে।"

"সঙ্গে সঙ্গে উপে যাবে তোমার সমস্ত মতলব আর ফন্দী ফিকির। মহারাজ যখন শিকারে যান তখন এখানকার একটি চাকরকেও সঙ্গে নেন না। একটা শিশুও ধরে ফেলবে কি হয়েছে। না, তুমি যা ভেবে রেখেছ তা একদম বাজে। বুদ্ধিটা কি আদরিণী দিয়েছে? এখন আমি যা বলছি শোন। তুমি বোধহয় জান গন্ধরাজ আমার প্রেমে পাগল?"

"জানি! বেচারা গোবর-গণেশের পথে আমিই তো কণ্টক।"

"ধর, আমি যদি তাকে রাজপ্রাসাদ থেকে চুপি চুপি বার করে এনে বাগানের কোনও নির্জন জায়গায় ভুলিয়ে নিয়ে যাই—ধর ঐ উড়ন্ত পরীটা যেখানে আছে, সেইখানে। কাছাকাছি কোনও একটা ঝোপে ধূর্জটি সিং লুকিয়ে থাকুক। মহারাজের গাড়িও থাকতে পারে মন্দিরটার পিছনে। চুপচাপ নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে সব। কাক পক্ষীটি পর্যন্ত টের পাবে না। গন্ধরাজ লোপাট হয়ে যাবেন। কি মনে হচ্ছে? আমি তোমার যোগ্য সহচরী নই? আমার এ বুদ্ধিটা কি তুচ্ছ করবার মতো? তোমার রনজুকে হাতছাড়া কোরো না কপিঞ্জল, তার ক্ষমতা আছে।"

কপিঞ্জল টেবিলের উপর ঘুষি মারলেন একটা।

তারপর বললেন—"ডাইনি! তোমার জোড়া সারা ভারতবর্ষে নেই। তুমি যা বললে তা চমৎকার। ব্যাপারটা চাকার মতো গড়গড় করে গড়িয়ে যাবে।"

"তাহলে আমাকে চুমু খেয়ে ছেড়ে দাও অবিলম্বে। গোবর-গণেশকে মাৎ করে আসি। দেরি করলে কোথাও বেরিয়ে যাবে হয়তো।"

"থাম, থাম, অত হড়বড় কোরো না। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারলে বেঁচে যেতাম। কিন্তু তুমি—কি বলব—এমন খামখেয়ালী, এমন চপলা—যে তোমাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। না, হয় না। তুমি যা বলছ—না, অসম্ভব সেটা।"

"তুমি আমাকে সন্দেহ করছ কপিঞ্জল!"

"কথাটা ঠিক সন্দেহ নয়। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। একবার ওই কাগজটা নিয়ে তুমি যদি এখান থেকে কেটে পড়—তাহলে কি যে করবে কে জানে। আমি তো জানিই না, তুমিও জান না। তুমি যে একটি পাগলী, অনেক রকম বাঁদুরে বুদ্ধি খেলে তোমার মাথায়—"

"আমি তোমার কাছে শপথ করছি। ভগবানের নামে শপথ করছি—"

"তোমার শপথ শোনবার কৌতূহল নেই আমার"—হেসে জবাব দিলেন কপিঞ্জল।

"তুমি কি মনে কর আমার ভগবান নেই, ধর্ম নেই, আত্মসম্মান নেই? বেশ, তাহলে

তোমার সঙ্গে তর্ক আর করব না। কিন্তু তোমাকে শেষবার বলছি এই আদেশপত্র আমাকে নিয়ে যেতে দাও, গন্ধরাজকে বন্দী করে দেব। কিন্তু এটা যদি আমার কাছ থেকে কেড়ে নাও, তাহলে সুনিশ্চিত জেনো সব ভণ্ডুল করে দেব আমি। প্রকাশ করে দেব সব। আমাকে বিশ্বাস বা ভয় যাই কর— এখনি ঠিক করে ফেল কি করবে।"

কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি কপিঞ্জলের দিকে।

কপিঞ্জল মুশকিলে পড়ে গেলেন একটু, সহসা ঠিক করতে পারলেন না কি করবেন। দুটো বিপদের মধ্যে কোনটা বেশী বিপদ তা স্থির করতে পারলেন না চট্ করে। একবার হাত বাড়িয়ে পরমুহূর্তেই আবার টেনে নিলেন হাতটা।

"বেশ "—ইতস্তত করে বললেন শেষে—"বিশ্বাস করতেই যখন বলছ, তখন—"

"ব্যাস্, ওখানেই থেমে যাও। আর মত বদলো না! তুমি সব না জেনেই যখন আমাকে বিশ্বাস করতে চাইছ তখন তোমাকে সব খুলে বলছি এবার। আমি এখনি গিয়ে ধূর্জটি সিংয়ের সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু দেখা করলেই সে আমার কথা শুনবে কেন? এই কাগজটা দেখাতে হবে। তারপব কখন আমি গন্ধরাজকে লুকিয়ে বাগানে বার করে আনতে পারব তারই বা ঠিক কি? রাত দুপুর হয়ে যেতে পারে, সন্ধ্যার পরও হতে পারে, কিচ্ছু ঠিক নেই। গাড়ি যদি চালাতে হয় তাহলে ঘোড়ার রাশটা আমার হাতে থাকা দরকর। এবার তোমার সঙ্গিনী বীরাঙ্গনাকে বিদায় দাও। পরাইয়া দাও তারে কবচ কুণ্ডল—"

এই বলে দু'হাত প্রসারিত করে প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি কপিঞ্জলের দিকে।

"বেশ"—জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন তাকে কপিঞ্জল—"প্রত্যেক লোকই ভুল করে। আমিও করলুম বোধহয়, হয়তো আমার ভুলটা খুব বেশী গর্হিত নয়। আচ্ছা, যাও এবার। মনে হচ্ছে দুষ্টু খুকীর হাতে একটা পটকা দিয়ে দিলুম।"

।। ষোল।।

বেরিয়েই রঞ্জাবতীর প্রথম মনে হল নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেহারাটা একটু ঠিকঠাক করে নেওয়া দরকার। এই অভিযানের পরিণাম যাই হোক না কেন, তিনি এটা ঠিক করে ফেলেছিলেন মহারাণী সুরূপিণীর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। যাকে কেউ পছন্দ করে না সেই নারীটির সামনে খেলো-ভাবে দাঁড়াবার বাসনা রঞ্জাবতীর ছিল না। গেলে বিজয়িনীর মতোই যেতে হবে। কয়েক মিনিট মাত্র লাগল। প্রসাধন-শিল্পে রঞ্জাবতী পারদর্শিনী। যে সব মেয়েরা একগাদা প্রসাধন দ্রব্যের প্রাচুর্যের মধ্যে অসহায় ভাবে এটা ওটা নাড়াচাড়া করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে শেষে সং সেজে বেরিয়ে আসেন, রঞ্জাবতী সে দলের নন। একবার তিনি ঘাড় বেঁকিয়ে আয়নার দিকে চাইলেন, একটা অলক একটু সরিয়ে দিলেন, একটু টেনে টুনে মাথার চুলকে ইচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলায় মনোহর করে তুললেন, ওড়নার ভাঁজটাকে ঈষৎ এলোমেলো করে আরও সুন্দর করে ফেললেন, তারপর গালে ঠোঁটে সামান্য একটু রঙের ছোঁয়া, বুকে একটি হলদে গোলাপ—ব্যাস, চমৎকার হয়ে গেল ছবিটি।

"এই যথেষ্ট"—পরিচারিকাকে বললেন—"আমার গাড়িটাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে বল। রাজপ্রাসাদের সামনে সেটা যেন আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে আমার জন্যে অপেক্ষা করে।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পার্বতী নগরীর দোকানে দোকানে, বীথি-ঢাকা রাস্তায় রাস্তায় জ্বলে উঠছিল আলোকমালা। রঞ্জাবতী তাঁর অভিযানে যাত্রা করলেন পায়ে হেঁটেই। মন তাঁর আনন্দে মাতোয়ারা। কৌতূহল আর আহ্লাদের তৃপ্তিতে তাঁর রূপও যেন ডানা মেলে উড়ছে, আর সেটা তিনি অনুভবও করছেন নিজে। ভারী ভালো লাগছে। একটি বড় জহুরীর দোকানের সামনে তিনি দাঁড়ালেন একটু, তার পরে গেলেন একটা পোশাকের দোকানের সজ্জিত বাতায়নে, দু একটা পোশাকের প্রশংসাও করলেন। তারপর আরও এগিয়ে গেলেন। হাঁটতে লাগলেন জম্বীর-বীথি ধরে। জম্বীর লেবুর গন্ধে বাতাস মন্থর হয়ে এসেছে, গাছের পত্রবহুল শাখাপ্রশাখারা মাথার উপর প্রসারিত হয়ে রয়েছে খিলানের মতো। ঈষৎ আলোকিত গলিগুলোর মধ্যে পথিকদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একটা বেঞ্চি ছিল পথের ধারে। তারই উপর বসে পড়লেন রঞ্জাবতী। নিজের খুশীর আমেজেই বিভোর হয়ে রইলেন। বেশ শীত পড়েছিল, কিন্তু রঞ্জাবতী তা অনুভব করছিলেন না, তাঁর মনের ভিতরে উদ্দীপনার আগুন জ্বলছিল। জহুরীর দোকানে চুনী পান্নাগুলোর মতো তাঁর মনের চিন্তাগুলোও যেন চকমক করছিল সেই অন্ধকার নির্জনে, পথিকদের পদধ্বনি মনে হচ্ছিল সঙ্গীত।

কি করবেন তিনি? তাঁর কাছে যে কাগজটা আছে তার উপরই তো নির্ভর করছে সব। গন্ধরাজ, কপিঞ্জল, আদরিণী, আর এই গর্জনগাঁও রাজ্যটাও তাঁর নিক্তিতে ধুলোর মতোই হালকা মনে হতে লাগল। অনায়াসেই আঙুল দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে পারেন সব। নিজের এই সু-উচ্চ মহিমার দিকে চেয়ে নিজেই তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ হেসে উঠলেন—কি না করতে পারেন তিনি এখন। তুঙ্গ পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে যেমন মাথাটা ঘুরে যায় ক্ষমতার মদিরা পান করে তাঁর মাথাটাও তেমনি ঘুরে উঠল। সর্বশক্তিমত্তার পাগলামি, যে পাগলামি রোমের সীজারদের পেয়ে বসেছিল, সেই পাগলামি তাঁর বিচার-বুদ্ধিকেও বিচলিত করে ফেলল। "দুনিয়াটা কি অদ্ভুত আশ্চর্য পাগলাগারদ"—হঠাৎ মনে হল তাঁর। আবার হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

মুখে আঙুল ঢুকিয়ে একটি ছোট ছেলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বোকার মতো চেয়ে ছিল রঞ্জাবতীর দিকে। অমন হাসছেন কেন উনি। ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে রঞ্জাবতী তাকে ডাকলেন। কিন্তু এল না সে। চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু রঞ্জাবতী ছাড়বার পাত্রী নন। একটা ছোট ছেলে, ডাকলে আসবে না? তিনি উঠে পড়লেন। ভুলিয়ে ভালিয়ে অনেক মিষ্টি কথা বলে নিয়ে এলেন তাকে টেনে। একটু পরেই সে তাঁর কোলের উপর বসে তাঁর হারের চকচকে লকেটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

"আচ্ছা খোকা, তোমার যদি একটা মাটির ভালুক আর চীনেমাটির বাঁদর থাকে কোনটাকে তুমি আগে ভাঙবে?"

"আমার তো একটাও নেই।"

"তোমাকে টাকা দিচ্ছি। কিনে নাও দুটোই। এখনি দেব টাকাটা, কিন্তু তার আগে বল কোন্‌টা আগে ভাঙতে চাও—মাটির ভালুকটা না, চীনেমাটির বাঁদরটা—বল—"

চকচকে একটা টাকা বার করলেন রঞ্জাবতী। কিন্তু ওই উলঙ্গ ছেলেটা কোন উত্তর না দিয়ে টাকাটার দিকেই চেয়ে রইল নির্নিমেষে। রঞ্জাবতী তার মুখ থেকে যে উত্তরটা শুনতে চেয়েছিলেন তা আর পেলেন না। হতাশ হলেন একটু। তারপর তাকে ছোট্ট একটি চুমু খেয়ে

তার হাতে টাকাটা দিয়ে নামিয়ে দিলেন তাকে কোল থেকে। ছেলেটা ছুটে চলে গেল। রঞ্জাবতীও উঠে পড়লেন। লীলায়িত গতিতে অগ্রসর হলেন প্রাসাদের দিকে।

"কোনটা আমি ভাঙব?" ভাবতে লাগলেন তিনি; নিজের ঈষৎ আলুলায়িত কুন্তলে মুচকি হেসে একবার হাত বোলালেন। "কোনটা?"—আকাশের দিকে সহাস্য উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করলেন—"দুজনকেই কি আমি ভালোবাসি? না, কাউকেই না? একটু?—গভীরভাবে? না, মোটেই না? দুজনকেই? না একজনকেও না? দুজনকেই বোধহয়। কিন্তু ঐ আদরিণীকে আমি থুড়ব।"

তিনি যখন লোহার সিংহদরজা দিয়ে বাগানের সিঁড়ি দিয়ে উঠে বেদি-মণ্ডপে এসে হাজির হলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। প্রাসাদের সম্মুখভাবে জানলায় জানলায় আলো জ্বলে উঠেছে, বাইরে অলিন্দেই পিল্লাগুলিতেও বড় বড় আলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। চারিদিকে আলো। এর মধ্যেও রঞ্জাবতী পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। সূর্যের শেষ রশ্মির স্বর্ণাভ ছটা তখনও সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি, সে আলোর পটভূমিকায় শোভা পাচ্ছে অসংখ্য জোনাকির নীল-সবুজ দীপালী। রঞ্জাবতী সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্পন্দ হয়ে।

ভাবতে লাগলেন—"আশ্চর্য! আমি আজ নিয়তির মতো, দৈবের মতো, অমোঘ ভাগ্যের মতো এসেছি এখানে অপ্রত্যাশিত ক্ষমতার অধিকার নিয়ে, অথচ এখনও আমি জানি না কোন পক্ষ অবলম্বন করব। আর কেউ কি এ অবস্থায় আমার মতো পক্ষপাতহীন থাকতে পারত? কিন্তু ভগবান আমাকে সমদর্শী করেছেন, যা ন্যায়সঙ্গত তাই আমি করব।"

গন্ধরাজের ঘরের জানলার আলো উজ্জ্বলতম। সেদিকে চেয়ে রঞ্জাবতীর মনটা ধীরে ধীরে কোমল হয়ে এল, একটু যেন বেদনাও জাগল।

"সবাই যাকে ত্যাগ করেছে তার মনের অবস্থাটা কি রকম হয়? আহা, বেচারী। ওর আদরিণী যে কত বড জাতসাপ তা ওকে জানান দরকার। সেই জন্যেই এই আদেশপত্রটা ওকে দেখাতে হবে। মুখে বললে বিশ্বাসই করবে না—"

আর কালবিলম্ব না করে তিনি প্রাসাদে ঢুকে পড়লেন। প্রতিহারীকে বললেন তিনি মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চান। প্রতিহারী বলল—"মহারাজা তাঁর নিজের ঘরে আছেন। তিনি বলেছেন, তিনি একা থাকতে চান, কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।" তবু রঞ্জাবতী তাঁর নামটা লিখে পাঠিয়ে দিলেন। সে ফিরে এসে বলল—"মহারাজ আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, তাঁর এখন কারো সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা নেই।"

"তাহলে এই চিঠিটা নিয়ে যাও—"

একটা কাগজে খসখস করে লিখলেন, "জীবন-মরণ-সমস্যা। মহারাজ সাহায্য করুন আমাকে। আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না।"

এবার প্রতিহারী তাড়াতাড়ি ফিরে এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। মহারাজা গন্ধরাজ কৃপা করে রঞ্জাবতী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হলেন।

গন্ধরাজ অস্ত্রাগারে বসে ছিলেন। বিরাট অস্ত্রাগার। বিচিত্র আলোকে নানারকম অস্ত্র চারিদিকে চকমক করছিল। কেঁদে কেঁদে গন্ধরাজের চোখ মুখ ফুলে গিয়েছিল। বড়ই খারাপ দেখাচ্ছিল তাঁকে। বড়ই বিষণ্ণ এবং বিরক্ত। রঞ্জাবতী যখন প্রবেশ করলেন তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন না পর্যন্ত। নমস্কার করে প্রতিহারীকে চলে যেতে বললেন শুধু। যে মমতা রঞ্জাবতী

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, যে মমতা বরাবর তাঁর হৃদয় এবং বিবেককে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেই মমতা সহসা তাঁকে অভিভূত করে ফেলল। অসহায় দুর্বল গন্ধরাজকে যেন সম্পূর্ণ দেখতে পেলেন তিনি। মনে হল ও যেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে! রঞ্জাবতী নিমেষেই ঠিক করে ফেললেন এখন কি ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে তাঁকে। তিনি তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে অপূর্ব ভঙ্গীতে বললেন—"উঠুন।"

"রঞ্জাবতী, তুমি তোমার চিঠিতে জীবন-মরণের কথা লিখেছ। কার জীবন বিপন্ন? পৃথিবীতে এমন কে দীন হীন রিক্ত আছে যাকে গর্জনগাঁওয়ের গন্ধরাজও সাহায্য করতে পারে?"

"প্রথমে ষড়যন্ত্রকারীদের নাম শুনুন; মহারাণী সুরূপিণী, এবং প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জল দেও। বাকিটা আন্দাজ করতে পারছেন না?"

গন্ধরাজ চুপ করে রইলেন।

রঞ্জাবতী বললেন—"আপনারই জীবন বিপন্ন। আপনার ধর্মপত্নী এবং আমার মহাপ্রভু দুজনে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে। কিন্তু তারা আমাকে আপনাকে চেনে না তাই তাদের এই ধৃষ্টতা। রাজনীতি আর প্রণয়ে দল গড়তে হয়, আমরাও গড়ব মহারাজ। ওদের হাতে টেক্কা আছে কিন্তু আমরা রং দিয়ে তুরুপ করব। আসুন, দেখাব আপনাকে তাস?"

"খুলে বল। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।"

"দেখুন তাহলে—"

আদেশপত্রটা বার করে দিলেন রঞ্জাবতী।

গন্ধরাজ সেটা পড়ে চমকে উঠলেন, তারপর নীরবে নিজের মুখের সামনে হাতটা রাখলেন। একটি কথা বেরুল না তাঁর মুখ দিয়ে। রঞ্জাবতী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"সে কি! আপনি নতমস্তকে এ আদেশ মেনে নেবেন? আপনার প্রতি ও মেয়ের দয়ামায়া প্রেম কিচ্ছু নেই। দুধের ভাঁড়ে কি মদ থাকে? মুছে ফেলুন ওই শেলেটের লেখা, মানুষের মতো উঠে দাঁড়ান। হতে পারে ওদের হাতে ক্ষমতা আছে, হতে পারে ওরা সিংহ-সিংহিনী, কিন্তু তবু বলছি ইঁদুর হয়েও আমার ওদের ওই ষড়যন্ত্রে জাল টুকরো টুকরো করে দিতে পারি। কাল রাত্রে, যখন কিছুই বিপন্ন হয়নি, যখন সবটাই নিছক কৌতুক আর মজা ছিল তখন তো আপনি বেশ তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এখন মুষড়ে পড়ছেন? এ কৌতুকটা যে আরও জমজমাট, আরও জীবন্ত। উঠে দাঁড়ান।"

গন্ধরাজ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। লাল হয়ে উঠল মুখটা।

"রঞ্জাবতী, সব বুঝতে পারছি, আমি অকৃতজ্ঞ নই। এটা যে তোমার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন তা আমি জানি। কিন্তু রঞ্জাবতী, তুমি যা আমার কাছে আশা করছ, তা আমি পারব না। তুমি আশা করছ আমি প্রতিবাদ করব, আমি বাধা দেব। কিন্তু কেন দেব? দিয়ে কি লাভ হবে। যে ভুলে স্বর্গের শেষ সীমাটাকে এখনও আমি বোকার মতো আঁকড়ে ছিলাম এই আদেশপত্র পড়বার পর সেটাও চুরমার হয়ে গেল। এখন গর্জনগাঁওয়ের মহারাজার নামের সঙ্গে এক নিশ্বাসে লাভ-ক্ষতির আলোচনা কি হাস্যকর নয়? আমার কোন দল নেই, শাসন-প্রণালী নেই, অহঙ্কার নেই। বড় গলা করে বলবার মতো কিছুই যে নেই আমার। তবে কেন

তুমি প্রত্যাশা করছ আমি এর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে এগিয়ে যাব? কোন নীতি অনুসারে যাব কি লাভ হবে তাতে? কিংবা তুমি কি চাও বন্দী নেউলের মতো ব্যর্থ আক্রোশে আমি খামচাখামচি কামড়াকামড়ি করব? না, রঞ্জাবতী। যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের গিয়ে বল, আমি নির্বাসনে যেতে প্রস্তুত এ নিয়ে আমি কোন লজ্জাকর কোলাহল করতে চাই না। আমি যাব।"

"আপনি যাবেন? স্বেচ্ছায় যাবেন?"

"স্বেচ্ছায় নয় অবশ্য। কিন্তু যাব, যত শীঘ্র সম্ভব যাব। অনেক দিন থেকেই আমি বাইরে যেতে চাইছিলুম সে সুযোগ তো এসে গেল। আমি প্রত্যাখ্যান করব কেন? ভগবান আমাকে কিঞ্চিৎ রস-বোধ দিয়েছেন, আমি এই প্রহসনকে বিয়োগান্ত নাটকের রূপ দেবার চেষ্টা করব না।"

আদেশপত্রটা টেবিলের উপর ছিল, তিনি আঙুলের টোকা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন সেটাকে।

তারপর সাড়ম্বরে বললেন—"ওদের জানিয়ে দিতে পার আমি যেতে প্রস্তুত আছি—"

"মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে আপনি রেগেছেন মনে হচ্ছে।"

"আমি? রেগেছি? বাজে কথা। রাগবার কোনও কারণ নেই আমার। প্রতিপদে সবাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আমি দুর্বল, আমি অস্থির, আমি খেয়ালী—আমি সমাজে বাস করবার অযোগ্য। আমি নানারকম দুর্বলতার আকর, আমি নপুংসক মহারাজা, আমি ভদ্রলোক কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। তুমি আমার উপর প্রসন্ন, কিন্তু তুমিও দুবার আমাকে আমার লঘুতার জন্য বকুনি দিয়েছ। এতে কি আমি রাগ করব? এদের নির্মমতায় আমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এরা কেন যে এমনভাবে কোপ মারতে উদ্যত হয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি, ততটুকু সাধারণ বুদ্ধি আমার আছে। আমি অপদার্থ, আমি অকেজো, তাই ওরা আমাকে সরিয়ে দিতে চায়। ওদের দোষ দিতে পারি না।"

"এসব কার কাছ থেকে শুনেছেন?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন রঞ্জাবতী—"আপনি অপদার্থ? আপনি অকেজো? দেখুন মহারাজ, আপনার রূপ আর যৌবন যদি না থাকত তাহলে আপনার মুখদর্শন করতাম না আমি। পুরুষের মুখে ওসব বিনয় বচন অসহ্য। নগণ্য সাধারণ লোকেরাও এতটা করে না। এই অকৃতজ্ঞতা—"

"ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর রঞ্জাবতী"—গন্ধরাজের মুখে যেন ছায়া নামল—"কৃতজ্ঞতার কোন প্রশ্নই ওঠে না এতে—আত্মসম্মানেরও নয়। তুমি কেন কিভাবে এখানে এসেছ তা বুঝতে পারছি না ঠিক, কিন্তু আমার প্রতি তোমার করুণাই যে প্রধান কারণ তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সঙ্গে আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত পারিবারিক ঘটনাও জড়িয়ে গেছে যার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর একমাত্র আমিই জানি। তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে আমার স্ত্রী, তোমার মহারাণী, কি দুঃখ ভোগ করেছে। তাই তুমি এমন কি আমিও, ওর আচরণের বিচার করতে পারি না—করতে গেলে সেটা অন্যায় হবে। আমি আমার অক্ষমতা আমার অপরাধ স্বীকার করছি। যদি না করতাম তাহলে আমার ভালোবাসার কি মূল্য থাকত? যাকে ভালোবাসি তার কাছে যদি সামান্য নতি স্বীকার করতে না পারি তাহলে তো সে ভালোবাসা মৌখিক ভান মাত্র। সাধারণ বইতেও তো লেখা আছে যে প্রণয়িনীকে তুষ্ট করবার জন্য

প্রয়োজন হলে মৃত্যুবরণ করাও উচিত। আমি কারাবরণ করছি এটা কি খুব বেশী এমন একটা কিছু?”

“প্রণয়? প্রণয়ের সঙ্গে কারাবরণের কি সম্পর্ক থাকতে পারে!” রঞ্জাবতী দেওয়াল এবং ছাতকেই যেন প্রশ্নটা করলেন—“ভগবান সাক্ষী, প্রণয়ের সম্বন্ধে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আমার জীবনই তার জীবন্ত প্রমাণ। কিন্তু যে প্রেম প্রতিদান দেয় না আমি জানি তা প্রেমই নয়—তা অসার, ফাঁকি, মায়া, মরীচিকা।”

“রঞ্জাবতী, প্রেমকে আমি ওরকম দান-প্রতিদানের মাপকাঠিতে মাপতে শিখিনি, যদিও আমি স্বীকার করছি একজন মহিলার কাছে ওই মাপকাঠিতেই আমি অশেষ ঋণী হয়ে আছি। কিন্তু এসব আলোচনা বৃথা। প্রেম নিয়ে এখানে আমরা কবির লড়াই করছি না, গবেষণাও করছি না।”

“তবু একটা জিনিস আপনি ভুলে যাচ্ছেন। আজ উনি কপিঞ্জলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আপনার স্বাধীনতা হরণ করছেন, কাল আপনার সম্মানকেও কলঙ্কিত করতে পারেন।”

“আমার সম্মান?”—কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন গন্ধরাজ—“তুমি স্ত্রীলোক হয়ে একথা বলছ? আশ্চর্য লাগছে শুনে। আমি যদি তার ভালোবাসা অর্জন করতে না পেরে থাকি, স্বামী হিসেবে যদি আমি ব্যর্থ হয়ে থাকি, তাহলে আর বাকী কি রইল? এই শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যে কোন্ মুখে আমি কোন্ সম্মান দাবি করব তা তো জানি না। না, সব শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন অপরিচিত অচেনা লোকের দলে পড়ে গেছি। আমার স্ত্রী যদি আমাকে ভালো না বাসে তাহলে আমি কারাগারেই যাবে, এই যখন তার ইচ্ছে। সে যদি আর কাউকে ভালবেসে থাকে তাহলে কারাগারই তো আমার ঠিক স্থান! আমার পক্ষে ওর চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথা আছে পৃথিবীতে। তাছাড়া দোষ তো আমারই। আজকালকার অনেক মেয়েমানুষের মতো তুমিও পুরুষের ভাষায় কথা কইতে শিখেছ। আমার যদি পদস্খলন হত (ভগবান জানেন, হওয়া খুবই সম্ভব ছিল) তাহলে আমি ভয়ে কাঁপতাম কিন্তু এ-ও বলছি এর জন্যে তার কাছে মাপ চাইতাম, আশাও করতাম যদি সে ক্ষমা করে, যদিও সে আশা হয়তো দুরাশা হত—হয়তো—”

হঠাৎ থেমে গেলেন গন্ধরাজ। তারপর একটু বিরক্তিভরে বললেন, “দেখ রঞ্জাবতী, কোনও স্বামীর অসারতা, অতি নমনীয়তা বা বাজে রসিকতা যদি কোনও স্ত্রীর পক্ষে অসহ্য হয়, যদি তার ধৈর্য ভেঙে পড়ে তাহলে তাকে ভুল বিচার করবার অধিকার আমি কাউকে দেব না। সে স্বাধীন, পুরুষটার মধ্যেই গলদ ধরা পড়েছে—”

“সে আপনাকে ভালোবাসে না বলে গলদ আপনার! আপনার জানা উচিত ভালোবাসবার ক্ষমতাই তার নেই।”

“বরং বলা উচিত আমি তার মনে ভালোবাসা জাগাতে পারিনি। আমারই সে ক্ষমতা নেই—”

“মহারাজ, অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আমার মনে তো আপনি ভালোবাসা জাগিয়েছেন। আমি আপনাকে ভালবাসি।”

“রঞ্জাবতী, তুমি করুণাময়ী”—হেসে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ—“তুমি আমার উপর করুণা করেছ। কিন্তু এসব তর্ক বৃথা। কি করব আমি তা ঠিক করে ফেলেছি। স্পষ্ট কথা বলছি—

স্পষ্টবাদিতায় অবশ্য তুমিও কম যাও না—স্পষ্ট কথাটা হচ্ছে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি, এ সুযোগ আমি ছাড়ব না। দুঃসাহসে আমি পিছপা হইনি কখনও। এখানে আমি একটু বেকায়দায় পড়ে গেছি—সবাই বলছে রাজা হিসেবে আমি বেমানান। এখানে কেমন যেন রংছুট হয়ে আছি। তার চেয়ে সরে পড়াই কি ভালো নয়? আমার এই বেপরোয়া ভাব তুমি অনুমোদন করবে না?"

"মহারাজ, আপনি যদি মনস্থির করে থাকেন আমি আপনাকে ফেরাবার চেষ্টা করব না। কেন করব? বেহায়ার মতো একটা কথা বলছি আপনি গেলে আমারই তো সুবিধে। যান তাহলে, আমার বুকটা অবশ্য ভেঙে যাবে, আমার মনটা হয়তো আপনার পিছু পিছু ছুটবে, আপনার কষ্টের কথা ভেবে হয়তো রাত্রে আমার ঘুম হবে না, কিন্তু তবু আমি আপনাকে বারণ করব না। আপনার সাংসারিক বুদ্ধি কিচ্ছু নেই, তবু স্বীকার করছি আপনি রাজা, আপনি বীর।"

"রঞ্জাবতী, তুমি যে টাকাটা আমাকে দিয়েছিলে তা নেওয়া আমার ঠিক হয়নি। কিন্তু তোমার অনুরোধ কিছুতেই এড়াতে পারিনি কাল। যাক্, তোমাকে এর বদলে যে কিছু দিয়ে যেতে পারব এইটেই আমার সান্ত্বনা এখন।"

গন্ধরাজ একটা তাক থেকে কয়েকটা দলিল নিয়ে এলেন।

"এই নাও। তোমার টাকা দিয়ে যে খামারটা কিনেছি তার দলিল। তুমিই রাখ এটা। আমাকে যেখানে যেতে হবে সেখানে তো এসব আমার কাজে লাগবে না। অন্য কোনও উপায়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পারব এ সম্ভাবনাও আর নেই এখন। তুমি মহৎ বলেই কোন রসিদ না নিয়ে আমাকে টাকাটা দিয়েছিলে। আমি ভেবেছিলাম—কিন্তু এখন চাকা ঘুরে গেছে। গর্জনগাঁওয়ের মহারাজার সৌভাগ্যসূর্য অস্ত যাচ্ছে। এই দলিলটা রাখ, আমি তোমাকে যতদূর জানি তাতে আশা করি এটা নিতে তুমি দ্বিধা করবে না, কারণ তোমাকে দেবার আর আমার কিছুই নেই। সরল গৃহস্থ কীর্তিভূষণ নিরাপদে তার গৃহস্থালী চালাতে পারবে আর আমাকে টাকা দিয়ে আমার বান্ধবীও যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এ কথা ভেবে আমি আনন্দ পাব।"

"মহারাজ, আমি যে কি জঘন্য অবস্থায় পড়েছি তা কি আপনি বুঝতে পারছেন না? আপনার পতনের উপরই আমার উন্নতি নির্ভর করছে।"

"আমাকে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করে তুমি তোমার মহান চরিত্রেরই পরিচয় দিয়েছ রঞ্জাবতী। জেনে রাখ, এসব সত্ত্বেও আমাদের সম্বন্ধ যেমন ছিল তেমনি থাকবে। এইবার মহারাজা হিসেবে শেষ আদেশ তোমাকে করব—এটা নাও।"

এই বলে জোর করে তিনি দলিলের কাগজগুলো তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন।

"এগুলো ছুঁতেও ঘেন্না করছে আমার!"

এর পর নীরবতা ঘনিয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

গন্ধরাজ হঠাৎ বললেন—"তুমি কি জান কখন আমাকে ওরা বন্দী করবে?"

"মহারাজ, যখনই ইচ্ছে করবেন তখনই। কিংবা আপনি যদি ইচ্ছা করেন ওই আদেশপত্রটা ছিঁড়ে ফেলুন—তাহলে কখনই ওরা আপনাকে বন্দী করতে পারবে না।"

"না, তা করব না। দেখ আমার ইচ্ছা, যত শীঘ্র ব্যাপারটা চুকে যায় ততই ভালো। আমি শুধু সুরূপিণীকে একটা চিঠি লিখে রেখে যেতে চাই।"

"মহারাজ, আমি আপনাকে প্রতিবাদ করতে বলেছি, আমার ইচ্ছে আপনি রুখে দাঁড়ান। কিন্তু তাতে যখন আপনি সম্মত নন, আপনি যখন তস্করদের সামনে বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকাটাই ভালো মনে করছেন—তাহলে আপনাকে বন্দী করার ব্যাপারটার ভার আমাকেই নিতে হয়। আমি ওদের বলেছিলাম"—একটু ইতস্তত করে বললেন—"আমি ওদের বলেওছিলাম যে আপনাকে ধরিয়ে দেব, তাই এই আদেশপত্রটা ওরা আমাকে দিয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে সাহায্য করা। কিন্তু আপনি আমার সাহায্য যখন নিতে চাইছেন না, তখন আমাকে একটু সাহায্য করুন। আপনার যখন সুবিধা হবে তখন আপনি তাহলে ওই উড়ন্ত পরীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন—কাল যেখানে গিয়েছিলেন। এতে আপনার অসুবিধা হবে না, আমাদের কিন্তু সুবিধে হবে।"

"নিশ্চয়ই যাব। সাগরে ঝাঁপ দেবই যখন ঠিক করেছি, তখন কোন্ ঘাট থেকে দেব তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। তুমি এখন যাও তাহলে, আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ কর। আমি চিঠিটা লিখেই যাব ওখানে। উড়ন্ত পরীর সামনেই দেখা হবে আবার। আজ আশা করি কালকের মতো ছদ্মবেশ থাকবে না কোনও।"

গন্ধরাজ একটু হাসলেন।

রঞ্জাবতী চলে যাবার পর খানিকক্ষণ নিজের সমস্ত শক্তি সংহত করে আত্মসংবরণ করলেন গন্ধরাজ। তিনি ভাবতে লাগলেন যে নিদারুণ হীন অবস্থার মধ্যে তিনি পড়েছেন, কি করে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে তার থেকে এখন উত্তীর্ণ হতে পারা যায়। নির্বাসনের কথা শুনে তিনি একটুও বিচলিত হননি। কিন্তু ইন্দীবরের সঙ্গে আলাপ করে তিনি বড়ই আহত, বড়ই অপমানিত বোধ করছিলেন। এর পর নির্বাসনের খবরটা যেন মুক্তির বার্তা নিয়েই এল, তিনি যেন আরাম পেলেন একটু। তাঁর মনে হল এটা তো নির্দোষ পথ, এ পথে গেলেই তাঁর সব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হবে। তিনি সুরূপিণীকে চিঠি লিখতে বসলেন। হঠাৎ মনের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। তাঁর অতীত জীবনের ক্ষমা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতার কাহিনীগুলো বিকট ভাবে মনে পড়তে লাগল একে একে, আরও বিকট মনে হল যখন ভাবলেন এসবের প্রতিদানে কি উদাসীনতা কি অহঙ্কার, কি নিষ্ঠুরতার প্রকাশ রূপায়িত হয়েছে সুরূপিণী-চরিত্রে। যে কলম দিয়ে লিখছিলেন সেটা কাঁপতে লাগল। সহসা বিস্মিত হয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর আত্মসমর্পণের ভাব অন্তর্হিত হয়েছে, সে ভাব একদম তাঁর নাগালের বাইরেই চলে গেছে। আর ফিরবে না। তিনি মাত্র কয়েকটি উত্তপ্ত শব্দ লিখে, ক্ষিপ্তুতাকে প্রেমের মর্যাদা দিয়ে আর ক্রোধকে ক্ষমার কৌলীন্যে ভূষিত করে তাঁর বিদায়পত্র শেষ করলেন। তারপর ঘরটার চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলেন, যে ঘর এতদিন তাঁর নিজের ঘর ছিল, কিন্তু যা আর তা থাকবে না। তারপর বেরিয়ে পড়লেন। প্রেমে অভিভূত হয়ে? না, অহঙ্কারে?

যে গোপন পথ দিয়ে তিনি প্রায়ই যাতায়াত করতেন সেই পথেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি। প্রহরী তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল। বেরিয়েই তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। রাত্রির অন্ধকারকে উন্মনা করে হু হু করে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া, আকাশ-ভরা তারা হাসি-ভরা চোখে চেয়ে আছে। মনে হল এরা যেন অভ্যর্থনা করল তাঁকে। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। মাটির গন্ধ উঠছে, ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে, বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নিলেন। আবার আকাশের দিকে চাইলেন। মন শান্ত হল। তাঁর স্ফীত ক্ষুদ্র জীবনটা এই বিরাটের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল যেন। যিনি একটু আগে নিজেকে বহ্নিগর্ভ শহীদ মনে করছিলেন, তিনি বিশাল আকাশের দিকে চেয়ে

ভাবলেন আমি কত ক্ষুদ্র। তাঁর মনের ক্ষতে প্রলেপ পড়ল। বাইরের দুরন্ত হাওয়া মহাকাশের অনাবিল শান্তি নীরব সঙ্গীতের মতো যেন তাঁর অহঙ্কারকে বিলীন করে প্রসন্নতায় ভরে দিল চিত্তকে।

"বেশ, আমি তাকে ক্ষমা করলুম"—বলে উঠলেন তিনি--"আমার ক্ষমা যদি তার কাজে লাগে আমি ক্ষমা করলুম তাকে।"

তারপর দ্রুতপদে তিনি বাগানটা পেরিয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে পড়লেন যেখানে উড়ন্ত পরীটা ছিল। বেদির পাশে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিলেন একজন। তিনি বেরিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"আমায় ক্ষমা করবেন। আমি বিদেশী। নূতন বাহাল হয়েছি, আপনাকে ঠিক চিনি না। যদি আপনি মহারাজা গন্ধরাজ হন তাহলে আপনি নিশ্চয় জানেন আমি কেন এখানে আপনার অপেক্ষা করছি।"

"ধূর্জটিপ্রসাদ কি আপনার নাম?"

"শ্রীমান ধূর্জটিপ্রসাদ সিংহ। যে কাজ করতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে, সেটা একটু কঠিন কাজ। তা যে এমন নির্বিঘ্নে এমন সহজ ভাবে হয়ে যাবে তা ভাবিনি। কাছেই গাড়ি অপেক্ষা করছে। আমি কি মহারাজের অনুসরণ করব?"

"সেনাপতি, আমি এখন জীবনের সেই মধুর মুহূর্তে উপনীত হয়েছি যখন আমি আদেশ শুনব, আদেশ করব না।"

"বাঃ, এ তো কবির মতো উক্তি। মনে হল যেন বিদ্যাপতির কবিতা শুনলাম। চমৎকার! মহারাজ আপনার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই, এ রাজ্যের কারও সঙ্গে নেই। থাকলে আমি এ কাজের ভার নিতাম না হয়তো। কিন্তু চাকরি যখন গছেছি তখন কপিঞ্জলদেবের আদেশ আমাকে শিরোধার্য করতে হয়েছে, অবশ্য আমার দিক দিয়ে এতে কোন অশোভনতা নেই, সৈনিকের পক্ষে এরকম কাজ অস্বাভাবিকও নয়। আর মহারাজ যখন এটা সহজ ভাবে নিয়েছেন তখন মনে হচ্ছে আমাদের সময় ভালোই কাটবে। কারারক্ষীও তো বন্দী এক হিসেবে।"

"একটা কথা জানতে পারি কি? এ কাজে তো প্রশংসা নেই, এ কাজ বিপদও ডেকে আনতে পারে। তবে কেন আপনি এ কাজ নিতে রাজী হলেন।"

"আপনার কৌতূহল স্বাভাবিক। আমার বেতন দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে।"

"ও! যাক্, আমি সমালোচনা করব না। ওই যে গাড়িটা দেখতে পেয়েছি—"

একটু দূরেই চার ঘোড়ার গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল গলির মোড়ে। গাড়ির আলোগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এ সাধারণ গাড়ি নয়। আরও একটু দূরে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল কুড়ি জন সশস্ত্র প্রহরী।

।। সতেরো।।

রঞ্জাবতী গন্ধরাজের কাছ থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন ধূর্জটি সিংহের কাছে। কি করে মহারাজকে বন্দী করতে হবে তা তাঁকে বুঝিয়ে বলেই ক্ষান্ত হননি তিনি। উড়ন্ত

পরীর জায়গাটা ঠিক কোথায় তা দেখাবার জন্যে গিয়েছিলেন তিনি ধূর্জটি সিংকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাহু-লগ্ন হয়ে। ধূর্জটি সিংহের বুকের রক্তে দোলা দিয়ে তিনি যে সব কথাবার্তা বলছিলেন তা মনে হচ্ছিল যেন সেতারে গতের আলাপ। সত্যিই রঞ্জাবতী একটু উত্তেজিত হয়েছিলেন। আনন্দ এবং উদ্দীপনার ঝঞ্ঝায় যেন নিজেকে ঠিক রাখতে পারছিলেন না তিনি। হাসতে গিয়ে কথা আটকে যাচ্ছিল, চোখের দৃষ্টি থেকে ঠিকরে পড়ছিল অসামান্য দ্যুতি, যে রং তাঁর মুখ-শোভা থেকে অনেক দিন অন্তর্হিত হয়েছিল তাও যেন ফিরে এসেছিল তখন। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। যদিও কথাটা ভাবতে তাঁর ঘৃণা হচ্ছিল তবু তিনি আশঙ্কা করছিলেন আর একটু পরেই ধূর্জটি সিং হয়তো নতজানু হয়ে বসে পড়বেন তাঁর সামনে।

উড়ন্ত পরীর কাছেই একটা প্রকাণ্ড হাস্নুহানার ঝাড় ছিল। তারই আড়ালে লুকিয়ে রঞ্জাবতী নিরীক্ষণ করতে লাগলেন কি রকম ভদ্রতা সহকারে ধূর্জটি সিং গন্ধরাজকে বন্দী করছেন। তাঁরা দুজনে কথা কইতে কইতে এগিয়ে গেলেন, তারপর তাঁদের কথাবার্তা আর শোনা গেল না। একটু পরেই গাড়ির চাকার শব্দ আর অশ্বের ক্ষুরধ্বনি বিঘ্নিত করল নৈশ নীরবতাকে। সে শব্দও ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। গন্ধরাজ চলে গেলেন।

রঞ্জাবতী তখন আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন। না, রাত খুব বেশী হয়নি। এখনও দেখা হতে পারে। দ্রুতবেগে তিনি প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। ভয় হতে লাগল কপিঞ্জল এসে পড়েনি তো। বেগ আরও বেড়ে গেল এ কথা ভেবে। তিনি প্রাসাদে পৌঁছেই প্রতিহারিণীকে বললেন খুব জরুরী ব্যাপারে মহারাণীর সঙ্গে এখনি দেখা করা দরকার। কপিঞ্জলদেও তাকে পাঠিয়েছেন। এমনি গেলে মহারাণী হয়তো দেখা করতেন না, কিন্তু কপিঞ্জলের দূতীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

সুরূপিণী একটা টেবিলের সামনে বসে খাওয়ার ভান করছিলেন। তাঁর গালে চোখের জলের দাগ, চোখ ফোলা ফোলা। তিনি ঘুমোননি, খাননি। এমন কি তাঁর বেশবাসও বিস্রস্ত। মনে হচ্ছিল তিনি যেন শুকিয়ে গেছেন। তাঁর চেহারা, তাঁর মন সবই যেন বিকল, বিবেকের তাড়নায় তিনি যেন বিধ্বস্ত। রঞ্জাবতী তাঁর এই চেহারার সঙ্গে নিজের চেহারার তুলনা করে একটু যেন খুশী হলেন।

"প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছেন আপনি। বসুন। কি বলবার আছে বলুন।"

"কি বলবার আছে?"—রঞ্জাবতী পুনরাবৃত্তি করলেন কথাগুলো—"অনেক কিছু বলবার আছে। অনেক কিছু যা বলতে ইচ্ছে করছে না, অনেক কিছু যা গোপন রাখা উচিত কিন্তু যা আমাকে বলতে হবে। আমি রামায়ণের দুর্মুখের মতো, অনেক অপ্রিয় কাজ আমাকে করতে হয়। যা বলব, নিরপেক্ষভাবে বলবার চেষ্টা করব। আমি মহারাজের কাছে আপনার আদেশপত্র নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি বলে উঠলেন—রঞ্জাবতী এ অসম্ভব—এ হতে পারে না—আমি ভুল দেখছি, ভুল পড়ছি। তুমি নিজের মুখে বল। আমার স্ত্রীকে ওরা ভুলিয়ে ভালিয়ে হাত করেছে, তার বুদ্ধি নেই, কিন্তু এত নিষ্ঠুর সে নয়। আমি বললাম, মহারাজ, আপনার স্ত্রী তরুণী সেইজন্যেই তিনি নিষ্ঠুর। হাতের কাছে আর কিছু না পেলে যুবতীরা পাখা দিয়ে মাছিও মারে—"

"রঞ্জাবতী দেবী"—তীক্ষ্ণ অকম্পিত কণ্ঠে বললেন সুরূপিণী, তাঁর মুখে ক্রোধের রক্তিমা ফুটে উঠল—"কে আপনাকে পাঠিয়েছে এখানে? কেন এসেছেন? কি প্রয়োজন আপনার?"

"আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কেন এসেছি। আপনার মতো বৃহৎ আদর্শ আমার সামনে নেই। আমার হৃদয় আমার বুকে থাকে না, আমার আস্তিনে থাকে। জামাটাও মাঝে মাঝে বদলাতে হয়। আমার হৃদয় খুব ছোট, সেই জন্যই হয়। মহারাণী আমার এই অশোভন উক্তি মাপ করবেন আশা করি, কিন্তু যা মনে হল তা বলে ফেললাম।"

দাঁড়িয়ে উঠলেন সুরূপিণী।

"মহারাজকে বন্দী করা হয়েছে, এই খবর দিতেই এসেছেন?"

"হ্যাঁ, আপনি যখন খাচ্ছিলেন তখনই বন্দী করা হয়েছে তাঁকে।"

রঞ্জাবতী উঠলেন না, বসেই রইলেন।

"যা বলতে এসেছিলেন তা তো বললেন। আর আপনাকে আমি আটকাব না—"

"না, মহারাণী, সব কথা এখনও বলা হয়নি। যদি অনুমতি করেন, বলি। আপনার কাজের জন্য আজ সমস্ত সন্ধ্যাটা অনেক কিছু সহ্য করেছি। বড় কষ্ট পেয়েছি। এ জঘন্য কাজ করবার জন্যে বাধ্য করা হয়েছে আমাকে—"

রঞ্জাবতী তাঁর হাতের পাট-করা পাখাটা খুলে ফেললেন, তারপর ধীরে ধীরে হাওয়া করতে লাগলেন নিজেকে, তাঁর নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছিল ক্রমশ। তাঁর মনের ভাব বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তাঁর উজ্জ্বল চোখের ভাষায়, গ্রীবার উদ্দীপ্ত ভঙ্গিমায়, সুরূপিণীর দিকে বিজয়িনীর মতো যে উদ্ধত দৃষ্টিতে ঘৃণাভরে চেয়েছিলেন সেই চাহনির নীরব কশাঘাতে। একাধিক ক্ষেত্রে সুরূপিণীর সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল—অন্ততঃ রঞ্জাবতী তাই মনে করতেন—আজ সে সবের শোধ তুলতে হবে। আজ তিনি বিজয়িনী।

"রঞ্জাবতী দেবী, আপনি তো আমার ভৃত্য নন"—সুরূপিণী বললেন।

"না, তা নই"—তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন রঞ্জাবতী—"কিন্তু আমাদের দুজনকেই একটি লোকের তাঁবে থাকতে হয় এ কথা আশা করি আপনি জানেন, আর যদি না জানেন তাহলে আমি সেটা সানন্দে জানাচ্ছি আপনাকে। আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি এত কম—এত কম—" কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি, হাতের পাখাটা প্রজাপতির মতো আর একটু ঊর্ধ্বে আন্দোলিত হতে লাগল—"হয়তো ব্যাপারটা আপনি ঠিক বোঝেননি।" এবার পাখাটা মুড়ে কোলের উপর রাখলেন এবং উত্তেজিত ভাবে আর একটু সোজা হয়ে বসলেন।

"সত্যি বলছি, আপনার মতো অবস্থায় কোনও মেয়েকে পড়তে দেখলে, সত্যিই খুব কষ্ট হবে আমার। আপনি তো জীবনে যা কিছু কাম্য তাই নিয়েই জীবন আরম্ভ করেছিলেন মহারাণী, পুষ্পাকীর্ণ পথে আপনার রথ যাত্রা শুরু করেছিল—ভালো বংশ, যোগ্য বর, অনিন্দ্য রূপ—সবই ছিল—কিন্তু দেখুন এ সব সত্ত্বেও কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি। সত্যি, অনুকম্পা হচ্ছে। সবচেয়ে কি সে সর্বনাশ হয়েছে জানেন? ক্ষমতার মদিরা পান করে আপনার মাথাটা ঘুরে গেছে, আপনার মতিভ্রম হয়েছে।"

আবার পাখাটা খুলে সপ্রতিভভাবে হাওয়া করতে লাগলেন নিজেকে।

"দেখুন, রঞ্জাবতী দেবী, আপনি আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। পাগলের মতো কি যা তা বলছেন!"

"পাগল? না পাগল হইনি এখনও। মাথা আমার এত ঠাণ্ডা আছে যে আমি জানি আপনি এখন আমাকে দূর করে দিতে পারবেন না—এবং তা জানি বলেই যা বলবার তা বলে তবে

আমি যাব। আমি যখন প্রিয়দর্শী মহারাজাকে—হ্যাঁ আমি তাঁকে প্রিয়দর্শীই বলব—আমি যখন একটু আগে তাঁকে ছেড়ে এলাম তখন তিনি একটা তুচ্ছ কাঠের পুতুলের জন্যে অঝোর ঝরে কাঁদছিলেন। সত্যিই বড় কষ্ট হল, প্রিয়দর্শী গন্ধরাজকে আমি ভালোবাসি, আপনি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আমি তাঁকে তাঁর পুতুলটা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে তাঁর মুখে হাসি ফোটাতে চাই—আমি তাঁকে সুখী দেখতে চাই।"

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন রঞ্জাবতী। তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়ে উঠল। পাখাটা মহারাণীর দিকে খোঁচার মতো বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি কি জানেন? আপনি বোকা, আপনি একটি কচি খুকী! প্রাণহীন কাঠের পুতুল একটা! আপনার শরীরে কি দয়ামায়া আছে? ভালোবাসা আছে? রক্ত আছে? কিচ্ছু নেই। থাকলে বুঝতে পারতেন উনি কত বড় মানুষ আর আপনাকে কত ভালোবাসেন। এ ভালবাসা জীবনে দু'বার আসে না, এ তুচ্ছ সাধারণ জিনিস নয়, এ ভালোবাসার জন্যে অনেক বুদ্ধিমতী অনেক রূপসী কেঁদে কেঁদে বেড়ায় তবু পায় না। আর আপনি, এক ফোঁটা মেয়ে, অমন রত্নকে পায়ে দলেছেন, আপনি বোকা, দেমাকে অন্ধ। রাজ্যশাসন করবার আগে নিজের ঘর গোছাতে শিখুন ভদ্রভাবে, ঘরই মেয়েদের রাজত্ব, রাজধানী সব—"

রঞ্জাবতীর হাতের পাখাটা কাঁপছিল। তিনি থামলেন একটু, তারপর হেসে উঠলেন, অদ্ভুত সে হাসি।

"বলা উচিত নয়, তবু একটা কথা বলছি, ভেবেছিলাম বলব না কিন্তু বলছি। নারী হিসেবে রঞ্জাবতী আপনার চেয়ে অনেক ভালো, জানি না কথাটা কষ্ট করে আপনি বুঝবেন কি না। আমি যখন আপনার আদেশপত্রটা মহারাজকে দিলাম তখন তাঁর মুখ দেখে আমার বুকটা ভেঙে গেল, সমস্ত আত্মাটাই বিগলিত হয়ে গেল যেন এবং—হ্যাঁ, রেখে-ঢেকে বলছি না—আমি দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম তাঁকে আমার বুকে আশ্রয় দিতে।"

সত্যিই রঞ্জাবতী দুহাত প্রসারিত করে নাটকীয় ভঙ্গীতে এগিয়ে গেলেন একটু। সঙ্কোচে সরে গেলেন সুরূপিণী।

"ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে সে আশ্রয় দিতে চাই না। পৃথিবীতে একটি মাত্র লোক আছেন যিনি আপনাকে সে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। মহারাজ কি বলেছিলেন শুনবেন? বলেছিলেন ওর যদি এতেই আনন্দ হয় আমি কাঁটার মুকুটই পরব, আমি কাঁটাকেই আলিঙ্গন করব। আমি আপনাকে বলছি—খোলাখুলিভাবেই বলছি—আদেশপত্রটা তাঁর হাতে দিয়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম আপনি রুখে দাঁড়ান, প্রতিবাদ করুন, প্রতিরোধ করুন। আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, আমার সঙ্গেও করতে পারেন—এ কথা কপিঞ্জলের কানে তুলে দিয়ে। কিন্তু গন্ধরাজ বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। এ কথাটা ভালো করে বুঝে নিন যে তাঁর উদারতার জন্যেই আপনি এখন এখানে বসে আছেন, চাকা অনায়াসেই ঘুরে যেতে পারত, তাকে আমি সে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, আদেশপত্র অনায়াসেই বদলে দিতে পারতেন তিনি। কিন্তু তিনি তা করেননি; আপনাকে কারাগারে না পাঠিয়ে নিজেই তিনি চলে গেলেন সেখানে।"

সুরূপিণী স্তম্ভিত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। যখন কথা কইলেন বোঝা গেল কাতরও হয়ে পড়েছেন খুব। বললেন—"আপনার রূঢ়তায় আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। খুবই কষ্ট হচ্ছে

আমার। আপনি যা করেছেন তার জন্যে রাগ করছি না, কারণ অন্যায় হলেও এটা স্বীকার করতে হবে যা করেছেন তাতে আপনার সহৃদয়তাই প্রকাশ পেয়েছে। এটা আমার জানা দরকার ছিল। আমি সব কথা খুলে বলছি আপনাকে, যদিও হয়তো তা উচিত হচ্ছে না। অত্যন্ত দুঃখে আমি ওই আদেশপত্র লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। মহারাজকে আমিও পছন্দ করি খুব, তাঁর অমায়িকতায় আমি মুগ্ধ। কিন্তু এটা আমাদের মহা দুর্ভাগ্য, হয়তো আমিই এর জন্যে খানিকটা দায়ী, যে আমাদের ঠিক জোড় মেলেনি। কিন্তু তবুও ওঁর নানা গুণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি আমি। উনি যদি সাধারণ লোক হতেন তাহলে আপনার মতের সঙ্গে আমি সায় দিতাম। কিন্তু যেখানে রাজ্যের ভালোমন্দ নির্ভর করছে সেখানে পক্ষপাতহীন হতে হবে, ব্যক্তিগত কোন প্রশ্নের সেখানে স্থান নেই। অত্যন্ত অনিচ্ছাসহকারে রাজ্যের শুভাশুভের কথা চিন্তা করে কর্তব্যের খাতিরেই ওটা করতে হয়েছে আমাকে এবং এটাও আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে রাজ্যের বিপদের ভয় যখন থাকবে না তখনই মহারাজা মুক্তি পাবেন। আপনি এখন যে সব কথা যে ভাবে বললেন তাতে রাণী হিসাবে আমার রাগ করা উচিত, কিন্তু আমি রাগ করিনি”—মনে হল মুহূর্তের জন্য তিনি কাতর দৃষ্টিতে চাইলেন রঞ্জাবতীর দিকে—“আপনি আমাকে যতটা অমানুষ মনে করছেন, আমি ঠিক ততটা নই—”

“আপনি রাজ্যের শুভাশুভ আর একজনের ভালোবাসা কি এক বাটখারায় ওজন করবেন?”

“রঞ্জাবতী, রাজ্যের অনেক লোকের জীবন-মরণ যে জড়িত রয়েছে এর সঙ্গে। গন্ধরাজের জীবনও নিরাপদ নয়, এবং হয়তো আপনারও নয়”—সুরূপিণী গম্ভীর ভাবে বিজ্ঞের মতো বলে চললেন—“আমার বয়স যদিও কম তবু জীবনে এই বেদনাদায়ক কঠোর শিক্ষা আমি পেয়েছি যে আমার ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনা-সুখ-দুঃখের স্থান কখনই সর্বাগ্রে স্থান পাবে না, সর্বদাই সবার শেষে থাকবে তা—”

“এ কি ন্যাকামি! মুখ দিয়ে লাগ-সই কথাটা বেরিয়ে পড়ল আমার, মাপ করবেন। ভদ্রভাবে বললেও বলতে হয়—আপনার এই সরলতা দেখে অবাক হচ্ছি। আপনি যে কি ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন তা কি আপনি জানেন না? আপনার কি সন্দেহও হয়নি! সত্যি আপানর উপর অনুকম্পা হচ্ছে, হাজার হলেও আমরা দুজনেই এক জাতের, দুজনেই মেয়েমানুষ, ছি, ছি, লোকটা কি বোকা বানিয়েছে আপনাকে। আমি সব মেয়েমানুষকেই ঘৃণা করি তাদের ওই একটি দোষের জন্য। কিন্তু আপনাকে দেখে এখন সত্যি কষ্ট হচ্ছে আমার। আপনার উপর আর আমার রাগ নেই। মহারাণী—”

হঠাৎ তিনি ভঙ্গীভরে অভিবাদন করলেন—“মহারাণী, আমি এবার হয়তো আপনার সম্মানে আঘাত করব, যে লোকটাকে সবাই আমার প্রণয়ী বলে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেখাব, কিচ্ছু গোপন করব না, এর জন্যে আপনি হয়তো আমার সর্বনাশ করে দিতে পারেন,—তা করুন, আমি গ্রাহ্য করি না। কি সুন্দর নাটক বলুন তো। আপনি বিশ্বাসঘাতক, আমি বিশ্বাসঘাতক, সবাই বিশ্বাসঘাতক। এবার আমার পালা এসেছে। চিঠি, হ্যাঁ একটা চিঠি। এই চিঠিটা দেখুন মহারাণী, এটার সীল এখনো আমি ভাঙিনি, এটা আজ সকালে আমার বিছানার উপর পেয়েছি। আজ আমার মেজাজ ভাল ছিল না তাই ওটা খুলিনি, এর এরকম চিঠি আমি অজস্র পাই, এ রকম অনুগ্রহ প্রত্যহই বর্ষিত হয় আমার উপর। আপনার নিজের

জন্য, আমার প্রিয়দর্শী গন্ধরাজের জন্য, আর যে রাজত্বের চিন্তা আপনার ঘাড়ে চেপে বসেছে তার জন্য আমি অনুরোধ করছি চিঠিটা খুলে পড়ুন।"

"এ চিঠির সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক আছে কোনও?"

"ওতে কি আছে তা তো জানি না। আমি তো পড়িনি। কিন্তু চিঠিটা আমার, আপনি পড়ে দেখুন কি আছে ওতে।"

"আপনি আগে না পড়লে আমি পড়ব না। ওতে হয়তো এমন কথা থাকতে পারে যা গোপনীয়, যা আমার জানা উচিত নয়।"

রঞ্জাবতী চিঠিটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার, তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন টেবিলের উপর। মহারাণী তুলে নিয়ে এক নজরেই কপিঞ্জলের হস্তাক্ষর চিনতে পারলেন। পড়তে পড়তে ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে এল তাঁর। একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় তাঁর মাথা ঘুরে গেল, গা গুলিয়ে উঠল। চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রাণের রনজু, অবিলম্বে চলে এস। আদরিণী কাজটি করে ফেলেছেন, আদেশ দিয়েছেন তাঁর স্বামীকে কারাগারে চালান করে দেওয়া হোক। বাচাল দজ্জাল মেয়েটা এবার সম্পূর্ণ আমার কবলে। এবার আর বেচাল হতে পারবে না. জোয়ালে জুতে দিলে ঠিক চালে চলবে। আর যদি না চলে তখন আমি বুঝব। এখনি চলে এস। কপিঞ্জল—

"ঘাবড়াবার কিছু নেই মহারাণী, বেসামাল হবেন না—" সুরূপিণীর মুখের বিবর্ণ ভাব দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন রঞ্জাবতী। "কপিঞ্জলের সঙ্গে আপনি এঁটে উঠতে পারবেন না, আপনার অনুগ্রহ ছাড়াও আরও নানাদিকে ওর জাল ছড়ানো আছে। অঙ্গুলি সামান্য হেলনে ও আপনাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে পারে। এটা জানি বলেই ওর স্বরূপটা দেখিয়ে দিলাম আপনাকে। কপিঞ্জল শক্তসমর্থ পুরুষ, ও এতদিন আপনাদের পুতুল নাচ নাচিয়েছে। এখন অন্তত আপনি বুঝতে পারছেন কিসের জন্যে আপনি আপনার অমন স্বামীকে বিসর্জন দিয়েছেন। আপনি একটু মাধ্বী পান করবেন? আমি বড়ই নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গে—"

"নিষ্ঠুরের মতো নয়, হিতকারী বন্ধুর মতো"—একটা হাসি হেসে বললেন মহারাণী, —"না, ধন্যবাদ, আমার কিছু দরকার হবে না। প্রথম ধাক্কাটা আমাকে একটু বিচলিত করেছিল। আপনি আমাকে একটু সময় দেবেন? আমি ভাবতে চাই একটু—"

তিনি দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে চোখ বুজে এমন ভাবে বসে রইলেন খানিকক্ষণ যেন একটা দুরন্ত ঝড়ের দাপটের মধ্যেও পথ খোঁজবার চেষ্টা করছেন।

"ঠিক সময়েই খবরটা পৌঁছেচে। আপনি যা করলেন আমি তা করতে পারতাম না, আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কপিঞ্জল আমাকে প্রতারণা করেছে বুঝতে পেরেছি সেটা।"

"মহারাণী, কপিঞ্জল চুলোয় যাক, আপনি আগে গন্ধরাজের কথা ভাবুন।"

"আপনি আবার এমন ভাবে কথা কইছেন যেন আমি সাধারণ পর্যায়ের সামান্য মানুষ। আপনাকে অবশ্য আমি দোষ দিচ্ছি না এ জন্য। কিন্তু আমার নিজের চিন্তাই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। যাক, আপনি যখন আমার, মানে আপনি গন্ধরাজের প্রকৃত বন্ধু, তখন এই মুহূর্তেই তার মুক্তির আদেশটা আপনার হাতেই দিচ্ছি আমি। দোয়াত-কলমটা এগিয়ে দিন এ দিকে—"

তিনি টেবিলের উপর ঝুঁকে খস্ খস্ করে লিখে দিলেন আদেশটা যদিও লিখতে লিখতে তাঁর হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

"এই নিন। মনে রাখবেন এটা এখন ব্যবহার করবেন না, এ কথা বলবেনও না কাউকে যতক্ষণ না কপিঞ্জলের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে। তাড়াতাড়িতে হয়তো সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে, এই আকস্মিক ধাক্কায় আমার বুদ্ধিটা গুলিয়ে গেছে।"

"মহারাণী, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যতক্ষণ না আপনি আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন ততক্ষণ আমি এটা ব্যবহার করব না, তবে মনে হচ্ছে খবরটা গন্ধরাজের কানে যদি পৌঁছয় বেচারা একটু আরাম পাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। তিনি আপনাকে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন। আপনার অনুমতি পেলে সেটা আমি নিয়ে আসতে পারি। এই দরজা দিয়েই যাওয়া যায় বোধহয়?"

রঞ্জাবতী কপাটটা খোলাবার জন্য এগিয়ে গেলেন সেদিকে।

"এ কি, ওদিক থেকে খিল লাগানো রয়েছে যে!"

"হ্যাঁ—ওটা"—

সুরূপিণীর কানটা লাল হয়ে উঠল।

"ওঃ—"—রঞ্জাবতী আর কিছু বললেন না।

একটা নীরবতা ঘনিয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

"আমি নিজে গিয়েই চিঠিটা নিয়ে নেব। আপনি এখন যান। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন একা থাকতে চাই।"

রঞ্জাবতী অভিবাদন করে বেরিয়ে গেলেন।

।। আঠারো।।

সুরূপিণী সাহসী, অন্তত বুদ্ধির সাহস তাঁর কম নয়, তবু যখন তিনি একা হয়ে গেলেন তখন টেবিলটা আঁকড়ে ধরে তিনি নিজেকে সামলালেন। সহসা সমস্ত আকাশ যেন ভেঙে পড়ল মাথায়। তিনি কোনও দিনই কপিঞ্জলকে পছন্দ তো করেনই নি, এমন কি সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করেননি। তাঁর বন্ধুত্বটা যে মেকী হতে পারে এ সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে বার বার জাগত। কিন্তু সরকারী কাজকর্মে যে সাধুতার জন্য তিনি তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন তাও যে তাঁর একেবারেই নেই, তিনি যে একটা সামান্য শঠ স্বার্থান্বেষী মাত্র, নিজের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জঘন্য ষড়যন্ত্রে তিনি যে সুরূপিণীকে দাবার বোড়ের মতো ব্যবহার করতে ইতস্ত করেননি—এ সব কল্পনাতীত ছিল সুরূপিণীর। এই সত্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তাঁর একটু সময় লাগল, উচ্চ পর্বতশিখর থেকে দ্রুত অধঃপতন হলে মাথাটা যেমন ঘুরে যায় তাঁরও অনেকটা সেইরকম হল। তাঁর মস্তিষ্কে আলো আর অন্ধকার যেন পর পর আসতে লাগল, একবার বিশ্বাস করছেন, পরমুহূর্তেই অবিশ্বাস এসে বিশ্বাসকে সরিয়ে দিচ্ছে। তিনি কপিঞ্জলের চিঠিটা অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু চিঠি ছিল না। রঞ্জাবতী যেমন গন্ধরাজের কাছ থেকে আদেশপত্রটি ঠিক নিয়ে এসেছিলেন এখান থেকেও

তেমনি কপিঞ্জলের চিঠিটা নিয়ে যেতে ভোলেননি। রঞ্জাবতী পুরোনো খেলোয়াড়, সহসা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না। রেগে গেলে তাঁর বুদ্ধি ভোঁতা হয় না আরও শাণিত হয়।

কপিঞ্জলের চিঠি খুঁজতে গিয়ে তাঁর আর একটা চিঠির কথা মনে পড়ল! গন্ধরাজের চিঠি। তৎক্ষণাৎ উঠে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন তিনি, তাঁর মাথা তখনও ঘুরছিল, গন্ধরাজের শস্ত্রাগারে ঝড়ের মতো প্রবেশ করলেন গিয়ে। বৃদ্ধ কঞ্চুকী সেখানে অপেক্ষা করছিল। তাঁকে দেখে চটে গেলেন সুরূপিণী। মনে হল কি করছে লোকটা এখানে। তাঁর এই সর্বনাশ উঁকি মেরে দেখছে না কি!

"তুমি যাও এখান থেকে"—আদেশের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন। কঞ্চুকী বেচারা যখন কিছুদূর চলে গেছে তখন আবার ডাকলেন তাকে—"থাম, শোন। প্রধানমন্ত্রী কপিঞ্জলদেও এলেই তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিও।"

"আপনার হুকুম তাঁকে বলব।"

"এখানে একটা চিঠি ছিল"—বলেই থেমে গেলেন তিনি।

"মহারাণী ওই টেবিলের উপর চিঠিটি আছে। আমার উপর কোনও আদেশ ছিল না, থাকলে মহারাণীকে এজন্য কষ্ট করে আসতে হত না। এনে দেব ওটা?"

"না, না, না। ধন্যবাদ। আমি এখন একা থাকতে চাই।"

কঞ্চুকী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরূপিণী ছুটে গিয়ে যেন লাফিয়ে পড়লেন চিঠিটার উপর। তাঁর মন তখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঝোড়ো মেঘলা রাতে চাঁদের মতন তাঁর বিচারবোধ কখনও উজ্জ্বল হচ্ছে, কখনও আবার ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। চিঠিটা তিনি একটানা পড়তে পারলেন না। থেমে থেমে পড়লেন।

"সুরূপিণী"—গন্ধরাজ লিখেছিলেন—"আমি একটিও তিরস্কার বাক্য লিখব না। আমি তোমার আদেশপত্র দেখেছি, আমি চললাম। আমার আর কি বাকি রইল? আমার সব ভালোবাসা আমি অপব্যয় করে নষ্ট করে ফেলেছি, আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম এ কথা লেখারও প্রয়োজন নেই। আমরা এখন চিরদিনের মতো আলাদা হয়ে গেলাম। তুমিই নিজে হাতে আমার ঈপ্সিত বন্ধনটা কেটে দিলে, বন্ধনহীন হয়ে আমি কারাগারে চললাম। রাগ করে বা অনুরাগ ভরে তোমাকে আর কখনও কিছু বলতে আসব না। তোমার জীবন থেকে আমি বেরিয়ে এলাম, হয়তো তুমি এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে। যে স্বামী তোমাকে স্বামী-ত্যাগ করতে বাধা দেয়নি, যে রাজা তার নিজের সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত অধিকার তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল, যে বিবাহিত প্রণয়ী আড়ালে তোমার দোষ ঢেকে সর্বদাই গর্ব অনুভব করত—তার হাত থেকে এবার তুমি পরিত্রাণ পেলে। কিভাবে তুমি প্রতিদান দিয়েছ সে কথা তোমার বিবেকই তোমাকে স্পষ্ট করে বলবে, আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু একদিন আসবে যখন তোমার অলীক স্বপ্নগুলো মেঘের মতই মিলিয়ে যাবে, তখন দেখবে তুমি নিতান্তই একা। তখন তোমার সব মনে পড়বে।"

গন্ধরাজ

চিঠিটা পড়তে পড়তে তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন। যে দিনের কথা গন্ধরাজ লিখেছেন সে দিন তো এসে গেছে। তিনি তো সত্যিই এখন একা, একেবারে একা। তিনি বিশ্বাসহন্ত্রী, তিনি নিষ্ঠুর। অনুতাপের ঢেউ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর মনের উপর। তার পরই তাঁর

চেতনার রঙ্গমঞ্চে তীব্র চীৎকার করে আরও নানা অনুভূতি মূর্ত হল। তিনি প্রবঞ্চিত, তিনি প্রতারিত। তিনি অসহায়। তিনি স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যে নিজেকে ঠকিয়েছেন। বছরের পব বছর তিনি কাটিয়েছেন খোশামোদের মিথ্যা স্বর্গে। টপ টপ করে গিলেছেন তোষামোদের টোপগুলো, জুয়াচোর পরিবৃত হাস্যকর বিদূষকের মতো লোক হাসিয়েছেন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে! তিনি—সুরূপিণী! এর পরিণাম কি তা তিনি নিমেষে বুঝতে পারলেন, নিমেষে আকণ্ঠ পান করলেন এ গরল। আসন্ন পতনের ছবিটা ভেসে উঠল চোখের উপর, জনতার ধিক্কার তিনি যেন শুনতে পেলেন, দেখলেন এই ঘৃণ্য কলঙ্কের কাহিনী কি ভাবে লোকের মুখে মুখে সাড়ম্বরে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে। বাহাদুরি দেখাবার জন্য রাজকীয় প্রতাপের জোরে তিনি যে দৃষ্টিকটু কেলেঙ্কারিটাকে গ্রাহ্যই করেননি—এখন সেটার মুখোমুখি হবার মতো সাহস তাঁর কই। ওই লোকটার উপপত্নী বলে সবাই তাঁকে ভাববে এবার—হয়ত ওই জন্যই.....তাঁর মুদিত চোখের সামনে বহু অকথ্য জঘন্য চিত্র ভেসে উঠল সারি সারি। দেওয়ালে নানা অস্ত্র ঝুলছিল, হঠাৎ তিনি একটা ছোরা পেড়ে ফেললেন। হ্যাঁ, সরে পড়তে হবে। পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চ থেকে, যেখানে দর্শকরা কেউ মাথা নাড়ছে, কেউ মুচকি হাসছে, কেউ ফুসফুস-গুজগুজ করছে—এখান থেকে সরে পড়বার একটি মাত্র দরজাই খোলা আছে এখন। যেমন করে হোক, যত কষ্ট সহ্য করেই হোক জনতার ওই স্থূল অট্টহাস্য থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। চোখ বুজে নীরবে তিনি প্রার্থনা করলেন, তারপর ছোরার ডগাটা বিঁধিয়ে দিলেন বুকে। খুব লাগল। চীৎকার করে উঠলেন তিনি, দংশন করল যেন ছোরাটা। বুঝলেন তিনি পারবেন না, এভাবে সরে পড়বার ক্ষমতা তাঁর নেই, অধিকারও নেই বোধ হয়। চুনীর মতো একফোঁটা রক্তবিন্দু কেবল তাঁর বুকের উপর সাক্ষী হয়ে রইল এই দুঃসাহসের। তীক্ষ্ণ আঘাতটা কিন্তু তাঁকে আত্মস্থ করল, তিনি যেন নিজের শক্তি ফিরে পেলেন আবার। আত্মহত্যা করবার ইচ্ছেটা চলে গেল মন থেকে।

ঠিক এই সময়ে বাইরের বারান্দায় পদধ্বনি শোনা গেল; ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল সেটা। কপিঞ্জলের পদধ্বনি, এ পদধ্বনির আওয়াজ তাঁর চেনা, এ আওয়াজ শুনে কতবার তিনি খুশী হয়েছেন। কিন্তু এখন এ পদধ্বনি শুনে তাঁর সমস্ত সত্তা রুখে দাঁড়াল যুদ্ধের জন্যে। ছোরাটা তিনি লুকিয়ে ফেললেন কাপড়ের মধ্যে। তারপর সোজা হয়ে ঘাড় তুলে ক্রোধ-দীপ্ত মূর্তিতে অকম্পিত চরণে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি শত্রুর প্রতীক্ষায়।

প্রধানমন্ত্রীর আগমনবার্তা যথারীতি ঘোষিত হল। তিনি প্রবেশ করলেন এসে। টোলের ছাত্রদের কাছে পাণিনি ব্যাকরণ যেমন সমস্যা কপিঞ্জলের কাছে সুরূপিণীও বরাবর তাই। তিনি রূপসী কি না এ নিয়ে তিনি কখনও মাথা ঘামান নি, ঘামাবার ইচ্ছা বা অবসর তাঁর ছিল না। কিন্তু আজ তাঁর রোষরঞ্জিত মূর্তি দেখে হঠাৎ নূতন ভাব মনে জাগল তাঁর, তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন, ক্ষণিকের জন্যে কামনার একটা স্ফুলিঙ্গও যেন বিচলিত করল তাঁকে। তাঁর এ দুটো অনুভূতিরই সম্ভাবনা কি হতে পারে তা ভাবলেন একটু। ভাবলেন, হ্যাঁ ও দুটোও নূতন উপায় বটে তাঁর স্বার্থসিদ্ধির। মনে হল—প্রেমিকের ভূমিকায় যদি অভিনয় করতে হয় এখন, তাহলে সেটা প্রাণহীন হবে না। আবেগময় করে তুলতে পারব সেটাকে—"

তাঁর গুরুভার দেহকে নত করে অভিবাদন করলেন তিনি।

"আমি চাই"—অদ্ভুত সুরে বেজে উঠল সুরূপিণীর কণ্ঠস্বরে, তাঁর কণ্ঠের এ সুর নিজেও

তিনি কোনদিন শোনেন নি—"আমি চাই যে মহারাজাকে এখনই মুক্তি দেওয়া হোক। যুদ্ধ বন্ধ করে দিন অবিলম্বে।"

"মহারাণী, আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত এই ঘটবে। যখন আমরা এই অবাঞ্ছিত কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে এসেছিলাম তখনই আমার আশঙ্কা হয়েছিল আপনার কোমল হৃদয় এ আঘাত সহ্য করতে পারবে না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি আপনার অযোগ্য সহকারী নই। আমি জানি আপনার যে সব গুণ আছে আমার তা নেই। কিন্তু আপনার ওই গুণগুলোকেই আমি আমাদের মৈত্রীর অস্ত্রাগারে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলে গণ্য করি। মহারাণীর অন্তরে কিশোরী। এ যে অপূর্ব—করুণা, প্রেম, স্নেহ, হাসি—এসবের চেয়ে বড় অস্ত্র আর আছে কি? মৃদুস্ম হাসিও যে পুরস্কৃত করে সকলকে। আমি শুধু হুকুম করতে পারি, ধমকাতে জানি, আমার মুখে ভ্রূকুটি ছাড়া আর কিছু ফোটে না। কিন্তু আপনি! এই কমনীয় দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগাবার শক্তি আপনার আছে, আবার প্রয়োজন হলে, যুক্তির অনুরোধে এদের দমন করবার ক্ষমতাও আপনি রাখেন। এজন্যে আমি কতবার আপনার কাছেও উচ্ছ্বসিত হয়েছি। হ্যাঁ আপনার কাছেও"—একটু কোমল কণ্ঠে তিনি শেষ কথাগুলি বললেন, সম্ভবত বিগত দিনের উচ্ছ্বাসভরা কোন গোপন সাক্ষাৎকারের কথা তাঁর মনে পড়ল।

"কিন্তু মহারাণী, এখন—"

"এখন ওসব বক্তৃতা থামান"—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন সুরূপিণী—"আপনি সত্যি কি? বিশ্বাসী, না বিশ্বাসঘাতক? নিজের মনের দিকে চেয়ে উত্তর দিন। আমি আপনার মনের কথা শুনতে চাই।"

"এইবার হয়েছে"—ভাবলেন কপিঞ্জল। "আপনি, মহারাণী!"—আবেগভরে বলে উঠলেন তারপর, যেন চমকে গেছেন—আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ভয়ে, আসলে কিন্তু আনন্দে—"আপনি! আপনি আমাকে আদেশ করছেন মনের কথা বলতে!"

"আপনি কি মনে করেন আমি ভয় করি?"

সুরূপিণীর মুখে এমন আশ্চর্য একটা অরুণিমা ফুটে উঠল, চোখের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এমন একটা আলো, অধরপ্রান্তে খেলা করতে লাগল এমন একটা রহস্যময় হাসি যে কপিঞ্জলের মনে আর কোনও সন্দেহ কোনও দ্বিধা রইল না। তিনি ঝপ্ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

"মহারাণী"—আবেগ ভরে তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল—"সুরূপিণী, এ নামে ডাকবার অনুমতি দেবেন কি? আপনি কি আমার মনের গোপন কথা টের পেয়েছেন? সত্যি—আমি সানন্দে আমার জীবন আপনার পায়ে উৎসর্গ করছি। আমি আপনাকে ভালবাসি, সারা হৃদয় দিয়ে বাসি বন্ধুরূপে, প্রেয়সীরূপে, সমরসঙ্গীনীরূপে; মধুর হৃদয়ের জন্য কামনা করি আপনাকে, পূজা করি। আপনি আমার বধু—" হঠাৎ তাঁর কবিত্ব সপ্তমে চড়ে গেল—"আমার মানসবধু, আমার ইন্দ্রিয়লোকের ইন্দ্রাণী আপনি। করুণা করুন, গ্রহণ করুন আমার ভালোবাসা।"

সুরূপিণী বিস্মিত হয়ে শুনছিলেন। তারপর তাঁর রাগ হল, পরিশেষে ঘৃণা, নিদারুণ ঘৃণা। তাঁর কথাগুলো তাকে যেন মারতে লাগল, অপমানে আত্মহারা হয়ে গেলেন তিনি। হুমড়ি খেয়ে যে প্রকাণ্ড জানোয়ারটা তাঁর পায়ের কাছে পড়ে আছে তাঁকে দেখে হেসে উঠলেন তিনি, দুঃস্বপ্ন দেখে লোকে যেমন হাসে।

"কি লজ্জা, কি লজ্জা। এ কি অসম্ভব ঘৃণ্য আচরণ আপনার। এ দেখলে আপনার রঞ্জাবতী কি বলবেন?"

সেই মহামহিম প্রধানমন্ত্রী, সেই তুখোড় রাজনৈতিক নেতা—ওই অবস্থায় হাঁটু গেড়েই আরও কিছুক্ষণ রইলেন। তাঁর মনের যে অবস্থা হল তাকে সকরুণ বা শোচনীয় বললেও অত্যুক্তি হবে না কিছু। বিরাট বক্ষের লৌহপিঞ্জরে তাঁর অহঙ্কার যেন মাথা কুটে রক্তাক্ত হয়ে ছটফট করতে লাগল। তিনি যদি সমস্ত মুছে দিতে পারতেন, অংশত ও যদি পারতেন, ওই 'বধূ' শব্দটা যদি উচ্চারণ না করতেন—তাঁর কানের কাছে কে যেন আর্তনাদ করছিল—নিজের মূঢ় আচরণে ক্ষুব্ধ লজ্জিত হয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি অবশেষে। নির্বাক যন্ত্রণা যখন ভাষা পায় তখন রসনা যা প্রকাশ করে তাতে মানুষের প্রচ্ছন্ন নিকৃষ্ট রূপ উদঘাটিত হয় সহসা। কপিঞ্জলের মুখ দিয়ে যা বেরুল তার জন্যে এরপর ছয় সপ্তাহ ধরে তাঁকে অনুতাপ করতে হয়েছিল।

"ও, রঞ্জাবতী?"—তিনি বললেন—"এইবার বুঝতে পারছি কেন মহারাণীর এ অস্বস্তি—"

অসভ্য চাষার মতো অশ্লীল ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেন তিনি। আগুন ধরে গেল সুরূপিণীর মনে। যে বজ্রগর্ভ কালো মেঘটা তাঁর যুক্তিকে এতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেটা থেকে এবার বজ্রপাত হল। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, তারপর মেঘটা যখন সরে গেল, রক্তাক্ত ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেজের উপর। ক্ষতটাকে চেপে ধরে কপিঞ্জল ব্যায়ত আননে এগিয়ে এলেন টলতে টলতে। পরমুহূর্তে যে ভাষা উচ্চারণ করতে করতে তিনি বন্য মহিষের মতো সুরূপিণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সে ভাষা সুরূপিণী কখনও শোনেননি। খামচে ধরলেন তিনি সুরূপিণীর পোশাকের খানিকটা, সুরূপিণী আতঙ্কে পেছিয়ে গেলেন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে। হোঁচট খেলেন কপিঞ্জল, তারপর তাঁর মাথাটা ঝুলে পড়ল। সুরূপিণী তাঁর সাংঘাতিক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করবার আগেই কিন্তু তিনি পড়ে গেলেন তাঁর পায়ের কাছে।

তারপর তিনি একটা কনুইয়ের ভর দিয়ে উঠলেন, সুরূপিণী নিষ্পলকদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে।

"রনজু"—কপিঞ্জল চীৎকার করে বললেন—"রনজু, বাঁচাও—" এরপর আর কিছু বলতে পারলেন না, ধপাস করে পড়ে গেলেন আবার। মনে হল শেষ হয়ে গেল বুঝি সব।

সুরূপিণী ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলেন, অস্থিরভাবে মোচড়াতে লাগলেন নিজের হাত দুটো, চীৎকার করতে লাগলেন। তাঁর অন্তর্লোকে তখন যেন তুমুল ঝটিকা আর ভয়ঙ্কর কোলাহল, সচেতন মনে কেবল একটি মাত্র বাসনা এ দুঃস্বপ্ন শেষ হোক্, আমি জেগে উঠি।

দ্বারে কে যেন করাঘাত করতে লাগল। তিনি ছুটে চলে গেলেন দ্বারের কাছে, প্রাণপণে চেপে ধরলেন দরজাটা, যেন কেউ ঢুকে না পড়ে। হাঁপাতে লাগলেন, তারপর প্রাণপণ শক্তিতে প্রকাণ্ড খিলটা এঁটে দিলেন ভিতর থেকে। এটা করে নিশ্চিন্ত হলেন একটু, উত্তেজনা একটু কমল। তারপর তিনি ফিরে এলেন নিস্পন্দ কপিঞ্জলের কাছে। দরজার উপর

করাঘাত আরও জোরে জোরে পড়তে লাগল। হ্যাঁ, লোকটা মরেই গেছে। তিনিই হত্যা করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি রঞ্জাবতীর নাম শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন! এমন করে সুরূপিণীর নাম কেউ কি উচ্চারণ করবে? তিনিই হত্যা করেছেন ওকে। তিনি—যিনি একটু আগে ছোরার ডগার সামান্য খোঁচায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন—তিনিই এই বিরাট দৈত্যকে ছোরার এক আঘাতে ভূপাতিত করবার শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

বাইরের দরজায় করাঘাত আর কোলাহল ক্রমশ উদ্দাম হয়ে উঠতে লাগল। প্রাসাদের শান্ত নির্বিঘ্ন জীবনে এ রকম হয় না। কুৎসা নিন্দা অখ্যাতি কলঙ্ক এবার দ্বারে এসে হানা দিচ্ছে, সঙ্গে কত লোক আছে কে জানে। ভেবে শিউরে উঠলেন সুরূপিণী। অনেকে তাঁর নাম ধরে ডাকছে। মহাধ্যক্ষ কুজ্ঝটিকুমারের গলাটা তিনি চিনতে পারলেন।

"মহাধ্যক্ষ কুজ্ঝটিকুমার এসেছেন না কি?"—ভিতর থেকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"হ্যাঁ, মহারাণী আমি। আমরা আপনার ঘরে চীৎকার শুনলাম, তারপর কি একটা ভারী জিনিস যে পড়ে গেল। কি হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু হয়নি। আমি কেবল আপনার সঙ্গে কথা বলব। আর যাঁরা আছেন তাঁদের চলে যেতে বলুন।"

থেমে থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলি বললেন তিনি। তাঁর বুদ্ধি কিন্তু সজাগ ছিল। খিল খোলবার আগে দরজার দুধারে যে গোটানো পরদা ছিল সেগুলো তিনি ফেলে দিলেন, যাতে বাইরের কোন লোক হঠাৎ কিছু দেখতে না পায়। বশংবদ কুজ্ঝটিকুমার ভিতরে ঢুকতেই আবার খিল বন্ধ করে দিলেন তিনি। কুজ্ঝটিকুমার বিরাট পরদার ভাঁজে একটু জড়িয়ে পড়েছিলেন। সুরূপিণী তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে এলেন।

"এ কি!"—সভয়ে বলে উঠলেন তিনি—"মহামান্য কপিঞ্জলদেও!"

"আমি ওঁকে খুন করেছি। হ্যাঁ, হত্যা করেছি—"

"বলেন কি! এ রকম তো আগে কখনও হয়নি।"—তারপর বললেন—"প্রণয় কলহের এ রকম সম্পূর্ণীকরণ"—বলেই থেমে গেলেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে।

তারপর আবার বললেন, "কিন্তু এখন কি করা যায়। আমরা কি করব? এ যে ভয়ানক ব্যাপার, ধর্মের দিক দিয়ে নীতির দিক দিয়ে, যে দিক দিয়েই দেখুন — এ যে ভয়াবহ। মহারাণী, মাপ করবেন, যদিও আপনি প্রভু তবু আপনি আমার মেয়ের মতো, সেইভাবেই আমি কথা বলছি—এ যা কাণ্ড করেছেন আইনের চোখে তা—ওঃ তারপর এই মড়া আপনার ঘরে—"

সুরূপিণী ভ্রূকুঞ্চিত করে শুনছিলেন তাঁর কথা, ঘৃণা হল লোকটার উপর। এই অপদার্থ লোকটার কাছে সাহায্যের কোন আশা নেই। নিজেই রাশ ধরতে হবে, ঠিক করে ফেললেন।

"ভাল করে দেখুন না সত্যিই উনি মারা গেছেন কি না!"

নিজের আচরণের কোনও কৈফিয়ত দেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করলেন না। অতিশয় ভয়ে ভয়ে কুজ্ঝটিকুমার এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে যাওয়া মাত্রই আহত কপিঞ্জলের চোখের পাতা নড়ে উঠল।

"বেঁচে আছেন"—চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ কুজ্ঝটিকুমার—"মহারাণী, উনি বেঁচে আছেন।"

"ওঁকে সাহায্য করুন তাহলে"—সুরূপিণী না নড়েই আদেশ দিলেন—"ওঁর ক্ষতটা কাপড় দিয়ে বেঁধে দিন।"

"বাঁধব? কি করে বাঁধব বলুন—"

"আপনার রুমালটা বার করুন না, যা হোক কিছু একটা দিয়ে বাঁধুন ওটাকে"—এই বলে তিনি তাঁর মসলিনের শাড়ির ঝালর দেওয়া আঁচলটা ছিঁড়ে ফেললেন। সেটা তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—"নিন, এইটে দিয়ে বাঁধুন"—তারপর সেই প্রথম তাঁর কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। এতক্ষণ দূরে ছিলেন।

কিন্তু কুজ্‌ঝটিকুমার দুহাত উপরে তুলে যন্ত্রণায় যেন আর্তনাদ করে উঠলেন। কপিঞ্জল যখন সুরূপিণীকে খামচে ধরেছিলেন তখন তাঁর মূল্যবান কাঁচুলির খানিকটা ছিঁড়ে গিয়েছিল।

"মহারাণী, আপনার কাঁচুলির এ কি ভয়ানক অবস্থা। আপনার বেশবাস যে বিস্রস্ত—"

"আপনি কাপড়টা তুলে নিয়ে ওঁর ক্ষতটা বাঁধুন আগে। তা না হলে উনি এখনি মারা যেতে পারেন।"

কুজ্‌ঝটিকুমার থতমত খেয়ে কপিঞ্জলের দিকে ফিরে অসহায়ভাবে তাই করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, যা না করলেও চলত।

"এখনও আশা আছে মহারাণী। উনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, নিঃশ্বাস নিচ্ছেন।"

"আপনি এর বেশী যদি কিছু করতে না পারেন তাহলে যান, কয়েকজন লোক ডেকে আনুন। ওঁকে ওঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান।"

"মহারাণী এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য যদি শহরের লোকের চোখে পড়ে, তাহলে তো সর্বনাশ, রাজ্য এখনি রসাতলে যাবে।"

"প্রাসাদে একটা পালকি আছে"—সুরূপিণী বললেন—"সেইটেতে করে ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দিন। আপনার উপর এ দায়িত্ব দিচ্ছি। যদি পালন না করেন আপনার প্রাণদণ্ড হবে। যান, এখনি যান—"

"বুঝতে পেরেছি, মহারাণী, স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি এবার। কিন্তু নিয়ে যাব কি করে? কারা নিয়ে যাবে? মহারাজের চাকররা? তারা মহারাজকে ভালোবাসে। হ্যাঁ, তাদের ডাকলে হয়, তারা বিশ্বাসী।"

"না, তাদের ডাকতে হবে না। আপনি সাপ্রাকে, আমার নিজের বিশ্বাসী চাকরকে ডাকুন—সে খুব কাজের লোক—"

"সাপ্রাকে! সে তো বিদ্রোহীদের দলের লোক। সে খবর পেলে তো আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়বে খবরটা। সবাই এখুনি এসে আমাদের কচু-কাটা করবে!"

তাঁর আদেশ যে পালিত হচ্ছে না, তিনি যে ধীরে ধীরে নেবে যাচ্ছেন তা সুরূপিণী অনুভব করলেন।

"বেশ, যাকে খুশি ডেকে আনুন। পালকিটা এখানে নিয়ে আসুক।"

কুজ্‌ঝটিকুমার চলে যেতেই সুরূপিণী কপিঞ্জলের কাছে ছুটে গেলেন এবং চেষ্টা করতে লাগলেন রক্তপাত বন্ধ করতে পারেন কি না—কিন্তু তাঁর গা ঘিন ঘিন করত লাগল। ওই পশুটার অঙ্গ স্পর্শ করবামাত্র তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল। তাঁর মনে হল ক্ষতটা সাংঘাতিক, ক্রমাগত রক্ত পড়ছে। মনটাকে শক্ত করে তিনি কাপড়ের টুকরোটা দিয়ে রক্তটা মুছে নিতে লাগলেন, কুজ্‌ঝটিকুমার এটুকুও পারেনি। মূর্ছিত কপিঞ্জলকে দেখে কোনও নিরপেক্ষ দর্শক মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর সুগঠিত বিশাল দেহ দেখে মনে হচ্ছিল একটা বিরাট যন্ত্র যেন হঠাৎ বিকল হয়ে গেছে। ক্রোধ বা ভণ্ডামির লেশমাত্র আভাস তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল

না। মনে হচ্ছিল যেন ওটা কোন শিল্পীর সৃষ্টি, যেন পাথরে কোঁদা। সুন্দর শক্তিব্যঞ্জক অপূর্ব। কিন্তু সুরূপিণীর এ সব মনে হচ্ছিল না। কপিঞ্জলের প্রসারিত বিশাল বপু (মাঝে মাঝে থরথর করে কাঁপছিল সেটা), তাঁর উন্মুক্ত বিরাট বক্ষ, একটা ঘৃণ্য কদর্যতায় পূর্ণ করে তুলছিল তাঁর মনকে। ক্ষণে ক্ষণে গন্ধরাজের কথা মনে পড়ছিল তাঁর।

প্রাসাদের বাইরে কিন্তু গুজব ছড়াচ্ছিল। একাধিক লোকের ছুটোছুটির শব্দ আর গলার আওয়াজ থেকে বোঝা যাচ্ছিল তা। প্রকাণ্ড সিঁড়িটার উপর সহসা অনেক লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দালান দিয়ে কারা যেন আসছে দ্রুতপদে। কুজ্‌ঝটিকুমার গন্ধরাজের চারজন চাকরের সাহায্যে পালকিটা নিয়ে আসছিলেন। চাকররা ঘরে ঢুকে বিস্রস্তবাসা সুরূপিণী আর আহত কপিঞ্জলের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। কথা বলবার অধিকার তাদের ছিল না, কিন্তু এ দৃশ্য দেখে তাদের মনে যে কথা জাগল তা অপবিত্র, তা অশুচি। কপিঞ্জলকে পালকির ভিতর ঢুকিয়ে পালকির পরদা ফেলে দেওয়া হল। বেয়ারারা পালকি তুলে নীরবে বাইরে নিয়ে গেল, কুজ্‌ঝটিকুমার তাদের অনুসরণ করলেন বিবর্ণ মুখে।

সুরূপিণী জানলার কাছে ছুটে গেলেন। জানলার কাচ দিয়ে বাইরের উঁচু ছাদটা দেখা যায়। সেখানে আলোর সারি। তারপর দেখা যায় যে বীথি-ঢাকা রাস্তাটা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে চলে গেছে, তারও দুধারে আলোর সারি। আর দেখা যায় মাথার উপর অন্ধকার আকাশ আর নক্ষত্র। বড় বড় নক্ষত্রগুলো দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে। জানলার কাচে চোখ লাগিয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুরূপিণী। একটু পরেই দেখা গেল পালকিটা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে, বাগান পার হয়ে আলোকসজ্জিত রাস্তায় পড়ল। পালকিটা দুলছে, চিন্তিতমুখে বিব্রত কুজ্‌ঝটিকুমার চলেছেন পিছু পিছু। আস্তে আস্তে তারা দূরে মিলিয়ে গেল। বাইরে তিনি চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখলেন, আর মনের ভিতর দেখলেন তাঁর জীবনের, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার চূর্ণ-বিচূর্ণ বিধ্বস্ত রূপ, সম্পূর্ণ ধ্বংসের, সম্পূর্ণ পরাজয়ের প্রতিচ্ছবি। তাঁর জীবনে এখন এমন আর কেউ নেই যাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন, এমন কোন বন্ধু নেই যে হাত বাড়িয়ে দেবে, এমন একজনও নেই যার আনুগত্যের উপর তিনি আস্থা স্থাপন করতে পারেন। কপিঞ্জলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর দলের, তাঁর ক্ষণিক জনপ্রিয়তারও পতন হল। তিনি জানলার কাছে বসে শীতল কাচের উপর তাঁর কপলটা রেখে চুপ করে বসে রইলেন। বেশবাস ছিন্ন, সম্পূর্ণ লজ্জানিবারণও হচ্ছিল না তাতে, মনে দুর্ভাবনার তুফান, চোখে শঙ্কার ছায়া। এই কি মহারাণী, সুরূপিণী?

ব্যাপার কিন্তু ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিল; অন্ধকারের অন্তরালে ধ্বংস এবং বিদ্রোহের রক্তশিখা লেলিহান হয়ে উঠছিল নেপথ্যে। পালকি সিংহদরজা পার হয়ে শহরের রাস্তায় প্রবেশ করল। কোন্ মন্ত্রবলে কোন্ ঝড়ের মুখে আতঙ্কের খবরটা ছড়িয়ে পড়ল শহরে? কিন্তু পড়েছিল। প্রাসাদে যে চাঞ্চল্য, সাড়া জেগেছিল তার ঝাপটা শহরে গিয়েও পৌঁছেছিল। তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সকলের ঘরে ঘরে। গুজব সাপের মতো ফণা তুলে বেড়াচ্ছিল রাস্তায় রাস্তায়। সবাই যন্ত্রচালিতবৎ বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা হতে লাগল, জম্বীর বীথিতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, শহরের প্রান্তে আলোর তলায়, হাটে, বাজারে সর্বত্র লোক। সবার মুখে কুটিল কালো ছায়া।

এই অপেক্ষমান জনতার ভিতর পরদা-ঢাকা পালকিটা আবির্ভূত হল অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের মতো। পালকির পিছনে পিছনে ধাবমান স্বয়ং কুজ্‌ঝটিকুমার। নীরবে দেখতে লাগল সবাই,

তারপর পালকিটা যখন পার হয়ে গেল, তখন একটা চাপা তর্জন ফুটন্ত জলের মতো যেন টগবগিয়ে ফুটে উঠল। উথলে পড়ল। জটলার লোকেরা জটলা থেকে বেরিয়ে এল একে একে, সমস্ত জনতা একের পিছনে আর একজন সারিবদ্ধ হয়ে চলতে লাগল পরদা-ঢাকা পালকিটাকে অনুসরণ করে। তারপর তাদের মধ্যে যারা একটু সাহসী তারা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করতে লাগল কুজ্‌ঝটিকুমারকে। যে মিথ্যাভাষণের কৌশল আয়ত্ত করে তিনি সারাজীবন সুখে কাটিয়েছেন সে কৌশল কিন্তু এখন কাজে লাগল না। আমতা আমতা করতে লাগলেন তিনি। যে জৈবিক প্রেরণা এতকাল তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে— সেই ভয় তাঁকে অভিভূত করে ফেলল। তাঁকে চেপে ধরল সবাই ঃ তিনি অসংলগ্নভাবে যা তা বলতে লাগলেন, ঠিক এই সময়ে পালকির ভিতর থেকে একটা আর্তনাদ শোনা গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে, সমবেত জনতার ক্ষুব্ধ কোলাহলে কুজ্‌ঝটিকুমার স্পষ্ট সেই সংকেত শুনলেন যা ঘড়ি বাজবার ঠিক আগে ছোট্ট 'খচ্‌' শব্দটিতে শোনা যায়। কম্পমান কুজ্‌ঝটিকুমার বুঝলেন আর উপায় নেই, আর গোপন করা যাবে না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে এরপর তিনি যা করলেন তাতে তাঁর অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তিনি একজন বেয়ারাকে চুপি চুপি বললেন—"মহারাণীকে পালাতে বল। সর্বনাশ হয়ে গেছে। দৌড়ে চলে যাও।" পরমুহূর্তেই তিনি আত্মসমর্পণ করলেন জনতার হাতে, অসংলগ্নভাবে বলতে লাগলেন তিনি দায়ী নন, তাঁর কোন দোষ নেই।

পাঁচ মিনিট পরে বেয়ারাটা ছুটতে ছুটতে এসে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল মহারাণীর ঘরে।

"সর্বনাশ হয়ে গেছে। মহাধ্যক্ষ মশাই আপনাকে পালাতে বললেন।"

সেই মুহূর্তেই সুরূপিণী জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন আলোকিত বীথি-পথ দিয়ে জনতার কৃষ্ণস্রোত প্রাসাদের দিকে ছুটে আসছে।

"ও তাই নাকি। ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন। তুমি যাও।"

লোকটা তবু দাঁড়িয়ে রইল।

"দাঁড়িয়ে আছ কেন। তুমিও পালাও। বাঁচাও নিজেকে—"

যে গোপন পথ দিয়ে ঠিক দু'ঘণ্টা আগে গর্জনগাঁওয়ের শেষ মহারাজা গন্ধরাজ নির্বাসনে গিয়েছিলেন সেই গোপন পথ দিয়েই গর্জনগাঁওয়ের শেষ মহারাণী মহামান্যা সুরূপিণীও অন্তর্ধান করলেন।

।। উনিশ।।

গোলমালের শব্দ পেয়ে প্রহরীটা পালিয়েছিল পিছনের ফাটক থেকে। উন্মুক্ত তোরণদ্বারের সামনে অপেক্ষা করছিল রাত্রির অন্ধকার। সুরূপিণী বাগানের চাতালের উপর দিয়ে পালাতে পালাতে শুনতে পেলেন ক্ষিপ্ত জনতার কোলাহল আর পদধ্বনি প্রাসাদের দিকে এগুচ্ছে; শব্দ থেকে মনে হচ্ছে একদল অশ্বারোহী যেন ছুটে আসছে, এর উপর শোনা যাচ্ছে বাতি ভাঙার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ আর সবার উপরে শোনা যাচ্ছে তাঁর নিজের নামটা। ওরা যেন সেটা নিয়ে লোফালুফি করছে। রক্ষীদের ঘর থেকে তূরীধ্বনি হল, একটা বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল, তারপর শত শত লোকের বিকট চীৎকারের কাছে আত্মসমর্পণ করল পার্বতীর রাজপ্রাসাদ। বিরাট বন্যাস্রোতে ডুবে গেল যেন সব।

এই সব ভয়াবহ শব্দে ভীতচকিত হয়ে সুরূপিণী লম্বা বাগানটা ছুটতে ছুটতে পার হলেন, তারপর সিঁড়ি, এখানে নক্ষত্রের আলো ছাড়া অন্য আলো নেই। নিশাচরী পক্ষিণীব মতো উড়তে উড়তে সিঁড়িও তিনি অতিক্রম করলেন, এরপর ঢুকলেন এসে প্রমোদউদ্যানের অঙ্গনে। যেখানে এলেন সে জায়গাটা খুব বিস্তৃত নয়, নানারকম গাছের সারি আর ফুলের ঝোপ সেখানে। জঙ্গুলে জায়গা। তবু সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই তিনি নির্ভয় হলেন একটু। তারপরই দেওয়াল দেওয়ালের পর আবার জঙ্গল, বেশ বেশী জঙ্গল। দূরে দূরে প্রাসাদের আলো জ্বলছে পিছন দিকে। সুরূপিণী সে সব আলো আর মহারাণীর মানমর্যাদা সব পিছনে ফেলে দেওয়ালের উপর উঠে লাফিয়ে নেমে পড়লেন জঙ্গলে। সভ্যতা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অরণ্যে।

বনের মধ্যেও সরু পথ পেলেন। সেইটে ধরেই সোজা চলতে লাগলেন। আশপাশে গুল্ম ঝোপ আর আকাশে তারার আলো। তারার আলোই পথ দেখাতে লাগল তাঁকে। একটু দূরেই থামের মতো কালো কালো দেওদার গাছের সারি, কোথাও কোথাও কুঞ্জবনের মতো, শাখা-প্রশাখা আকাশকে আড়াল করেছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ, একটু হাওয়া নেই, মনে হচ্ছে অন্ধকারের কারাগার যেন, একটা কি যেন ভয়ঙ্কর আবির্ভাব স্তব্ধ হয়ে আছে চারিদিকে; হাতড়ে হাতড়ে এগুতে লাগলেন সুরূপিণী, গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা লাগতে লাগল। উৎকর্ণ হয়ে রইলেন যদি কোনও শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়া গেল না।

সহসা অনুভব করলেন একটা ঢালু জমি বেয়ে তিনি উপর দিকে উঠছেন। এতে একটু আশা জাগল, একটু পরেই দেখতে পেলেন পাহাড়টাকে, অরণ্যের সমুদ্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে আরও ছোট বড় পাহাড়। কালো কালো উপত্যকাগুলো দেখা যাচ্ছে, যেন মখমলে মোড়া। মাথার উপর আবার দেখা দিল আকাশ, কোটি কোটি নক্ষত্রখচিত আকাশ। পশ্চিম আকাশের দূর দিগন্তে আরও অনেক পাহাড়ের অস্পষ্ট ছবি। মহারাত্রির মহামহিমায় অভিভূত হলেন সুরূপিণী, তারার মতোই দীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর চোখ ঃ চোখের দৃষ্টি আকাশের শীতলতায় অবগাহন করল, মন আকাশের ভাস্বরতায় কৃতার্থ হল, মনে হল যেন অদ্ভুত একটা প্রশান্তির সাগরে ধীরে ধীরে তিনি বিলিয়ে দিচ্ছেন নিজেকে। একটু পরে সত্যিই মনে শান্ত হল। দিনের বেলা সূর্য মাথার উপরে আকাশে সোনার ফসল ছড়াতে ছড়াতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একই আহ্বান জানান। সে আহ্বান উদাত্ত, কিন্তু তা সকলের জন্য, ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়। চাঁদও জ্যোৎস্নার বীণায় যে সুর বাজান তাতেও ধ্বনিত হয় বহুলোকের আনন্দ, বহুলোকের বিরহ। তারারাই কেবল আলাদা আলাদা প্রতি মানুষের কানে কানে চুপি চুপি কথা বলেন বন্ধুর মতো। তাদের ওই উজ্জ্বল চিকিমিকি হাসিতে সর্বজনীনতা নেই, তা যেন প্রতি মানুষের প্রতি আলাদা সম্ভাষণ। তারা মিটিমিটি ওই হাসি হেসে আমাদের দুঃখের কথা শোনে, অসীম ধৈর্যভরে বুড়ী দিদিমার মতো। ওরা দেখতে ছোট ছোট কিন্তু কল্পনায় কি বিরাট ওদের রূপ। এ দুই ভূমিকাতেই ওরা আমাদের মনে ছবি আঁকে—আমাদের প্রকৃতির, আমাদের নিয়তির।

পাহাড়ের উপর বসে ছিলেন সুরূপিণী, বসে উপভোগ করছিলেন এই সৌন্দর্য, আকাশ-ভরা তারার সঙ্গিনী হয়ে। সন্ধ্যাবেলার ঘটনাগুলো উজ্জ্বল ছবির মতো ফুটে উঠছিল তাঁর

মানসপটে, মুখর হয়ে বাজছিল তাঁর কানের কাছে। রঞ্জাবতী আর তার পাখার দোলন, নতজানু কপিঞ্জল, চকচকে মার্বেলের মেঝেতে রক্তের ধারা, দ্বারে ঘনঘন করাঘাত, আলোকিত বীথি-ঢাকা পথে দোদুল্যমান পালকি, উর্ধ্বশ্বাসে দূতের আগমন, উন্মত্ত জনতার চীৎকার। এখন কিন্তু সবই কত দূরে, যেন সত্য নয়, স্বপ্ন। এখন তাঁর চারিদিকে বর্ষিত হচ্ছে রাত্রির প্রসন্নতা আর মহিমা, শান্ত হয়ে আসছে মন, ক্ষতগুলো আর জ্বালা করছে না। পার্বতীর দিকে চেয়ে দেখলেন ঃ পাহাড়ে ঢাকা পড়ে গেছে, দেখা যচ্ছে না ঃ কিন্তু পাহাড়ের উপরে আকাশটা লাল, পার্বতী পুড়ছে বোধহয়। সেই ভালো, সেই ভালো, তাঁর পতনটাও নাটকীয় মহিমায় হৃদয়-বিদারক হয়ে উঠুক। শহর জ্বলছে, প্রাসাদ জ্বলছে—চমৎকার! গর্জনগাঁওয়ের জন্য একটুও দুঃখ হল না তাঁর, কপিঞ্জলের জন্যও না! তাঁর জীবনের এ অধ্যায় চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেল—যাক। আহত অভিমান, বিচূর্ণিত অহঙ্কার একটু দুঃখ দিচ্ছিল অবশ্য, কিন্তু তা-ও আর থাকবে না। একটি কথাই এখন সুস্পষ্টভাবে তাঁর মনে জাগছিল—পালাতে হবে এবং সম্ভব হলে—যদিও সেটা স্পষ্টভাবে তখনও তিনি স্বীকার করছিলেন না নিজের কাছে —পালাতে হবে শূলপাণির দিকে। তাঁর একটা কর্তব্য বাকী আছে—গন্ধরাজকে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর যুক্তি অনাসক্তভাবে কথাটা ভাবছিল, কিন্তু তাঁর মনে তাঁর হৃদয়ে যা জাগছিল তা অনাসক্ত নয়, তা উন্মুখ আগ্রহে কম্পমান। তিনি কামনা করছিলেন সেই স্পর্শ যা করুণায় ভরা, যা বন্ধুর স্পর্শ।

এ কথা মনে হওয়াতে উঠে পড়লেন তিনি, ঢালু জমি বেয়ে ঢুকে পড়লেন জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড়ে। ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি, অরণ্যের নিবিড়তা তাঁকে আশ্রয় দিল আবার। আবছা মূর্তির মতো আবার তিনি যাত্রা শুরু করলেন অজানা পথে, যে পথে রাজকীয় জয়ধ্বনি নেই, পথপ্রদর্শক অশ্বারোহী সৈন্য নেই। এখানে ওখানে বনের ফাঁকে ফাঁকে সামান্য আলোর ইশারা, সেই দিকেই চললেন তিনি, কোথাও কোন বিরাট বনস্পতির রূপ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে যেন, কোথাও খসখস শব্দ, কোথাও খুব ঘন অন্ধকার, কোথাও একটু আলোর আভাস, আর সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে থমথম করছে নিশীথিনীর ঘনগাম্ভীর্য। সুরূপিণীর মনে হচ্ছিল গাম্ভীর্যসত্ত্বেও নিশীথিনী যেন তাঁর প্রতি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে। কখনও তিনি দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন, রাত্রির গভীরতা ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছিল, এই নিথর নীরবতায় তাঁর যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে মনে হচ্ছিল। আবার চলতে শুরু করলেন, ছুটতে লাগলেন, হোঁচট খেলেন, পড়ে গেলেন, তবু থামলেন না। উঠে আরও বেশী ছুটতে লাগলেন। মনে হল, সমস্ত বন, সমস্ত গাছপালাও যেন তাঁর সঙ্গে ছুটছে। পাগলিনীর মতো তাঁর এই ঝড়ের বেগে যাত্রা সমস্ত বনকে সচকিত করে তুলল, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে মুখরিত করে তুলল অন্ধকারকে, একটা আতঙ্ক যেন ঘনিয়ে এল চারিদিকে। আতঙ্ক, হ্যাঁ আতঙ্কই—আতঙ্ক যেন ছুটতে লাগল তাঁর পিছু পিছু; গাছেরা যেন শাখা বাড়িয়ে তাঁকে ধরতে আসছে; চারদিকে আবছা আবছা প্রেতমূর্তির মতো ওরা কারা! মনে হল তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে আবার, তিনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন খুব, কিন্তু বুদ্ধিহারা হননি। ভয়ের এইসব ঝড়ঝাপটে তাঁর মনের দুর্গে যুক্তির আলো একটু কাঁপছিল অবশ্যই, কিন্তু নিবে যায়নি। তিনি বুঝতে পারছিলেন, বুঝতে পারছিলেন এবার তাঁকে থামতে হবে, থামা উচিত, কিন্তু থামতে পারছিলেন না।

তিনি যখন প্রায় পাগল হয়ে যাওয়ার মতো হয়েছেন তখন হঠাৎ সরু একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। এই সময় একটা তুমুল শব্দও স্পষ্ট হয়ে উঠল, সামনে অস্পষ্ট নানা মূর্তি, আর কি একটা যেন শাদা মতন চোখে পড়ল, পরমুহূর্তেই তিনি পড়ে গেলেন, আবার অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সমস্ত চেতনা, সমস্ত অনুভূতি যেন তলিয়ে গেল!

যখন আত্মস্থ হলেন তখন দেখলেন তিনি জলে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পায়ের গোছ পর্যন্ত বরফের মতো ঠাণ্ডা জল, এটা পাহাড়ী ঝরনা ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে আর যে পাথরটা থেকে পড়ছে সেই পাথরটাকেই আঁকড়ে ধরে আছেন তিনি। উৎক্ষিপ্ত জলধারায় তাঁর চুল ভিজে গেছে। শাদা ঝরনাটা তখন দেখতে পেলেন, তার জলে আকাশের তারারা আন্দোলিত হচ্ছে, ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে, আর মাথার উপরে দুধারে নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলোকে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা দেওদার গাছের সারি। মনটা হঠাৎ আবার শান্ত হল, তখন সানন্দে লক্ষ্য করলেন কি প্রচণ্ড বেগে ঝরনাটা লাফিয়ে পড়েছে ওই জলাশয়ের বুকে। জল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এলেন, সর্বাঙ্গ থেকে জল ঝরছে। ক্লান্তির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিলেন তিনি, এখন এই অন্ধকারে আবার জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়া আত্মহত্যারই নামান্তর হবে তাঁর মনে হল। মনে হল এই সংকীর্ণ স্থানে এই ছোট্ট নদীটির পাশে আকাশ-ভরা নক্ষত্রের সঙ্গে রাতটা তিনি কাটিয়ে দিতে পারবেন, একটু পরেই চাঁদও দেখা দিল পূর্বদিগন্তে।

দেওদার গাছের সারি পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়েছিল দুধার দিয়ে। মাঝখানে বেশ খানিকটা চওড়া জায়গা, ছোট্ট পাহাড়ী নদীটির অতটা জায়গার প্রয়োজন ছিল না। গাছের নীচে নীচে ফাঁকা জায়গা, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, নক্ষত্রের মৃদু আলোয় সবাই যেন স্বপ্ন দেখছে। এই দিকেই সাহস ও ধৈর্যভরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন তিনি। উপরে পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখতে পেলেন পাহাড় বেয়ে অনেক ছোট ছোট ঝরনা এসে নদীটিতে পড়ছে, অজস্র ধারা এসে প্রথমে পড়েছে বড় বড় ঘাসের বনে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে মিশেছে নদীতে এসে মন্থর গতিতে। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে আবার নক্ষত্রদের দিকে চাইলেন তিনি, চিরউজ্জ্বল, চিরনবীন, চিরসঙ্গীরা ওই যে রয়েছে চেয়ে। সন্ধ্যার প্রথম দিকটায় একটু শীত শীত করছিল, কিন্তু এখন তত শীত নেই মনে হল। অরণ্যের শাখা-প্রশাখার ভিতর থেকে বইছিল মৃদুমন্দ বাতাস, মনে হচ্ছিল কে যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। প্রচুর শিশির পড়েছে ঘাসে ঘাসে আর ঘাসের ফুলে ফুলে। সুরূপিণী জীবনে এই প্রথম উন্মুক্ত আকাশের তলায় একা এসে দাঁড়ালেন। আর তাঁর ভয় করছিল না। আকাশের স্নিগ্ধ নীরবতা-ভরা শান্তি তাঁর মর্মে গিয়ে পৌঁছল। মনে হল বিরাট মহাকাশ এই পথহারা মহারাণীকে যেন স্নেহভরে নিরীক্ষণ করছেন, আর নদীটির কল্লোলে যে ভাষা ফুটছে তা-ও যেন উৎসাহের ভাষা। বলছে, ভয় কি।

অবশেষে তিনি অনুভব করলেন তাঁর চারদিকে যেন বিরাট একটা পরিবর্তন হচ্ছে, নীরবে যেন একটা বিপ্লব ঘটছে চারদিকে—যার কাছে পার্বতীর অগ্নিকাণ্ড অতি তুচ্ছ একটা পটকাবাজির মতো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। যে চেহারা নিয়ে দেওদার গাছের সারি তাঁকে প্রথমে দেখা দিয়েছিল, তাদের সে চেহারা ধীরে ধীরে বদলে গেল; ছোট ছোট তৃণগুল্মদল, ওই পাহাড়ী নদীর ঘোরানে সিঁড়ির মতো ঊর্ধ্বগতি মনে হল যেন লীলায়িত, গম্ভীর অথচ মধুর।

নির্বাক বিস্ময়ে সুরূপিণী দেখতে লাগলেন। তাঁর মনের তন্ত্রীতে যে সুর বেজে উঠল তা অনবদ্য, তা অপরূপ। মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। অনুভব করলেন সমস্ত প্রকৃতিও যেন তাঁর দিকে চেয়ে আছে, সে চাহনি অর্থভরা, যেন ঠোঁটের উপর একটি আঙ্গুল রেখে সে অপূর্ব ভঙ্গীতে সকৌতুকে প্রকাশ করছে অনির্বচনীয়কে। আকাশের দিকে আবার চেয়ে দেখলেন। তারারা কোথা গেল? যে দু'একটা আছে, তাদের আলোও যে ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশ। মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। আকাশের রংও অদ্ভুত অপরূপ হয়ে গেল। রাত্রির ঘন-নীল যেন কিসের স্পর্শে কোমল হয়ে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, উজ্জ্বল হয়ে উঠছে; যে রং ফুটে উঠেছে তার কোন নাম নেই, প্রভাতের বার্তাবহ হয়েই সে রং আকাশে ফোটে। "ও—" সানন্দে বলে উঠলেন সুরূপিণী—"ওই যে ঊষা!"

তাড়াতাড়ি তিনি নদী পার হয়ে গেলেন, গাছ-কোমর করে পরে নিলেন শাড়িটা, স্বল্পালোকিত সঙ্কীর্ণ পথ ধরে আবার ছুটতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে শুনতে পেলেন পাখিদের কাকলী, যা গানের চেয়েও সুন্দর; বড় বড় গাছের ডালে ডালে ছোট ছোট বাসায় বসে—সে বাসায় প্রণয়িনীর পাশে প্রণয়ী, ঘেঁষাঘেঁষি বসে সারারাত কাটিয়েছে—সেই বাসায় বসে ওই পাখির দল, ওই স্বচ্ছচক্ষু প্রাণোদ্বেল বিহঙ্গমেরা শুরু করেছে জাগরণী গান, ভৈরোঁতে নয়, ভৈরবীতে নয়, হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে, প্রাণের অকুণ্ঠিত উচ্ছ্বাসে। সুরূপিণী ছুটছিলেন তবু তাঁর হৃদয় সাড়া দিল তাদের গানের ডাকে। তারাও যেন সু-উচ্চ মন্দিরের বাতায়ন থেকে সবিস্ময়ে দেখতে লাগল এই পলাতকা ছিন্নবসনা মহারাণীকে। একটুও না থেমে ছুটছিলেন তিনি ঘাস আর শ্যাওলায় ঢাকা গিরিপথে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে।

একটু পরেই অতিকষ্টে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়লেন। দেখতে পেলেন অনেক নীচে পূর্বদিগন্তে দূরাগত আলোকবন্যার মতো প্রভাতের আবির্ভাব হচ্ছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গে স্বচ্ছ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে দশদিক। অন্ধকার যেন কাঁপতে কাঁপতে আলো হয়ে যাচ্ছে। তারারা নিবে গেছে, মানুষের তৈরী শহরের রাস্তায় প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রাস্তার আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি এদেরও কে যেন নিবিয়ে দিয়েছে। স্বচ্ছ আলো প্রথমে মনে হল রজত-সন্নিভ, তারপর উত্তপ্ত হয়ে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্বর্ণকান্তিতে, স্বর্ণ রূপান্তরিত হল অগ্নিতে, তারপর পাবক জীবন্ত শিখা মূর্ত হল আকাশে ঃ বড় বড় রক্তরেখায় রঞ্জিত হয়ে গেল পূর্বদিগন্ত। শীতল বাতাসের প্রথম নিশ্বাস নিয়ে নবজাতক যেন স্তব্ধ হয়ে রইল কয়েক মুহূর্তে, তারপর আন্দোলিত হয়ে উঠল জীবনাবেগ বন-বনান্যে প্রভাত সমীরণের চাঞ্চল্যে। হঠাৎ সূর্য দেখা দিলেন, অকস্মাৎ যেন আবির্ভূত হলেন দিনেন্দ্র, আলোকের তূর্যধ্বনি নীরবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল মেঘমালায়, বৃক্ষপল্লবে, পর্বতচূড়ায়, উপত্যকার লতা-গুল্ম-তৃণদলে! এই প্রোজ্জ্বল মহিমাময় দৃশ্যে সচকিত হয়ে উঠলেন সুরূপিণী, আশপাশের ঝোপঝাড় থেকে অন্ধকারগুলো যেন লাফিয়ে বেরিয়ে এল এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল এই বিজয়ী বীরকে। প্রদীপ্ত গৌরবে দিবসের আবির্ভাব হল চতুর্দিকে, পূর্বদিগন্তে ধীরে ধীরে আরোহণ করতে লাগলেন সূর্যদেব তাঁর হিরণ্ময় রথে রাজকীয় প্রতাপে।

সুরূপিণী একটা দেওদার গাছে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, একটু ঢুলুনি এল। তাঁর ঢুলুনি দেখে সদ্য জাগরিত প্রফুল্ল বনভূমি উচ্চকণ্ঠে যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসতে লাগল নানা সুরে। রাত্রির

অন্ধকারের ভয়, প্রভাতের অপূর্ব আবির্ভাবের শিহরন আর মনে সাড়া জাগাচ্ছিল না। তপ্ত দিবসের নিরাবরণ রৌদ্রে এখন সুরূপিণী চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। দূরে নীচের বনভূমির একপ্রান্তে দেখতে পেলেন ধোঁয়া উঠছে, একটা কালো থাম যেন উপরে উঠে বিলিয়ে দিচ্ছে নিজেকে আকাশের নীলে আর সূর্যের সোনায়। নিশ্চয়ই লোক আছে ওখানে, আগুনের ধারে বসে আছে ওরা। মানুষেরই হাত শুকনো ডালাপালা কুড়িয়ে আগুন জ্বেলেছে, ফুঁ দিয়ে দিয়ে সঞ্জীবিত করেছে সে আগুনকে। এখন সে আগুনের আলো আর উত্তাপ চোখে মুখে সর্বাঙ্গে পড়েছে ওদের। ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠল মনে, মনে হল একটু যেন শীত শীত করছে, মনে পড়ল তিনি গৃহহারা। রোদের তাপ বাড়তে লাগল, বনের সৌন্দর্য আর ভালো লাগল না, মানুষের সঙ্গ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল মন। গৃহের আশ্রয়, ছোট ছোট ঘরের গোপনতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অগ্নি-বেদির পবিত্রতা—এরাই যেন আকর্ষণ করতে লাগল তাঁকে। ধোঁয়ার থামটা হাওয়ায় বেঁকে নদীর মতো হয়ে গেল, তারপর একটা ছোট ধ্বজার মতো উড়তে লাগল তাঁর দিকে ফিরে। তাঁর মনে হল ও তো আমায় ডাকছে। উঠে পড়লেন সুরূপিণী, আবার প্রবেশ করলেন পাহাড়ের জঙ্গলে।

নীচে নেমেই মনে হল, দিন তো এখনও পাহাড়ের উপরেই আছে, এখানে তো নামেনি, এখানে এখনও প্রদোষের কুহেলী আর শিশিরের খেলা চলছে। কিন্তু এখানে ওখানে, ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশকে ছাড়িয়ে যে বড় বড় দেওদার গাছেরা আকাশে তাদের জটিল শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত করেছে সেখানে এসে পৌঁছে গেছে সূর্যালোক, ঝলমল করছে তরু-চূড়ারা প্রভাতকিরণে। দূরে দূরে পাহাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকেও দেখা যাচ্ছে দিবসের দীপ্তি। সুরূপিণী বন্যপথ ধরে দ্রুতবেগে চলতে লাগলেন। ধোঁয়ার ধ্বজাটা আর দেখতে পেলেন না, ঢাকা পড়ে গিয়েছিল সেটা। কিংবা হাওয়ায় উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাছাকাছি যে মানুষ আছে এর চিহ্ন আরও নানাভাবে পাওয়া গেল। কোথাও কাটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, কোথাও এক বোঝা ঘাস, কোথাও শুকনো কাঠের গাদা। এই সবই পথ দেখাতে লাগল তাঁকে, কিছুদূর গিয়ে তিনি একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন, কাছেই একটি ছোট্ট কুটির, এইখান থেকেই ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। কাছেই একটি পাহাড়ী নদী পাহাড়ের ধাপে ধাপে যেন নেচে নেচে চলেছে। কুটিরের ঠিক সামনে তামাটে রঙের রুক্ষ-মূর্তি এক কাঠুরে দাঁড়িয়ে ছিল। পিছনে দুহাত দিয়ে আকাশে মুখ তুলে কি দেখছিল যেন।

সুরূপিণী সোজা তার কাছে গেলেন। সুরূপিণী হয়তো বুঝতে পারছিলেন না, কি রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাঁকে। উজ্জ্বল-নয়না রূপসী, কিন্তু শীর্ণা ভিখারিণীর মতো; পোশাক-পরিচ্ছদ মূল্যবান কিন্তু ছেঁড়া, কানে তখনও হীরের দুল চকমক করে দুলছে, কিন্তু যখন হাঁটছেন তখন বুকের ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট একটি স্তন দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। রাত্রি প্রভাতের স্বপ্নময় সন্ধিক্ষণে, ঘন বনের রহস্য থেকে বেরিয়ে এল এ কে—মানবী না পরী—এই কথা মনে হল লোকটির, ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল সে।

"আমার বড় শীত করছে। বড় ক্লান্ত হয়েছি, তোমার উনুনের পাশে আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও"—এই বলে আর একটু এগিয়ে গেলেন সুরূপিণী।

বোঝা গেল কাঠুরেটি বিচলিত হয়েছে একটু। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না সে।

"আমি এর দাম দেব"—সুরূপিণীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু বলেই তিনি অনুতপ্ত হলেন যখন দেখলেন এ কথা শুনে লোকটির চোখে ভয়ের আভাস ফুটে উঠল। কিন্তু এতে তিনি দমলেন না, বরং যেমন তাঁর স্বভাব, বাধা পেয়ে তাঁর সাহস আরও যেন বেড়ে গেল। তিনি লোকটিকে দ্বার থেকে সরিয়ে দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে গেলেন। লোকটি সভয়ে সবিস্ময়ে অনুসরণ করল তাঁর।

ভিতরে গিয়ে সুরূপিণী দেখলেন ঘরটি অন্ধকার, মেজে এবড়ো-খেবড়ো। ঘরের এককোণে শান-বাঁধানো জায়গায় উনুনটি রয়েছে, শুকনো ডালপালা জ্বলছে গনগনে আঁচটি চমৎকার। দেখেই যেন আরাম পেলেন সুরূপিণী। উনুনের ধারে ঘেঁষে বসলেন গিয়ে। তখনও শীতে কাঁপছেন, তবু আগুনের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কাঠুরেটি তখনও নির্নিমেষে তাঁর দিকে চেয়ে ছিল; তাঁর ছিন্নভিন্ন দামী পোশাকের দিকে, তাঁর উন্মুক্ত বাহুর দিকে, তাঁর বিপর্যস্ত জরি আর জহরতের দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

"আমাকে কিছু খেতে দাও"—সুরূপিণী বললেন—"এইখানে, এই উনুনের পাশেই দাও।"

লোকটি একটা ভাঁড়ে খানিকটা দেশী মদ, শালপাতায় কয়েকখানা শুকনো রুটি, একটা খুরিতে খানিকটা বাসী দই, আর কয়েকটা পেঁয়াজ এগিয়ে দিল। রুটিগুলো চামড়ার মতো শক্ত, দইটা খুব টক। পেঁয়াজ যদিও ভুঁই-ফোড় ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য, তবু কাঁচা পেঁয়াজ মহারাণীর পক্ষে সুখাদ্য নয়। কিন্তু তবু তিনি খেলেন, ভালো লাগছিল না, তবু সাহস করে চেটেপুটে খেয়ে ফেললেন সব। মদের ভাঁড়টাকেও অবহেলা করলেন না। তিনি জীবনে এ রকম খাবার খাননি, এ রকম মদও খাননি। মেয়েরা সব অবস্থার সঙ্গেই সাহসের সঙ্গে যতটা খাপ খাইয়ে নিতে পারে, পুরুষরা ততটা পারে না। কাঠুরেটা একটি কথা বলেনি, আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল কেবল। তার মনে যে ভাব জাগছিল তা মোটেই উচ্চভাব নয়। লোভ, ভয় এবং আরও যেন কিছু সেখানে যে দ্বন্দ্ব শুরু করেছিল তার আভাস ফুটে উঠেছিল তার চোখের দৃষ্টিতে। সুরূপিণী অনুভব করলেন এখান থেকে এখনই চলে যেতে হবে।

তিনি উঠে পড়লেন এবং দুটো টাকা দিলেন তাকে।

"এতেই হবে তো?"

এইবার লোকটার মুখে কথা ফুটল।

"ওতে হবে না, আরও চাই।"

"আর তো আমার কাছে নেই"—বলেই গম্ভীরভাবে গটগট করে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল যখন তিনি দেখলেন লোকটা হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করছে। কুড়ুলটা ঘরের কোণে ছিল, সেদিকেও চাইছে সে। ছুটে বেরিয়ে গেলেন সুরূপিণী। পশ্চিম দিকে যে পায়ে-চলা পথটা চলে গিয়েছিল সেইটে ধরেই ছুটতে লাগলেন তিনি পিছু দিকে না চেয়ে। রাস্তার বাঁক থেকেই আবার বন শুরু হয়েছিল, তার ভিতর ঢুকে পড়লেন তিনি, আর বড় বড় গাছের নীচে দিয়ে ছুটতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ছুটলেন। যখন মনে হল আর ভয় নেই তখন থেমে হাঁপাতে লাগলেন।

মাথার উপর দেওদার গাছের শাখা-প্রশাখার আচ্ছাদন। সুরূপিণী দেখলেন প্রখর দিবালোক হাজার হাজার জায়গায় সে আচ্ছাদনকে ভেদ করে বনের ভিতর প্রবেশ করেছে, গাছের গুঁড়িগুলো সে আলোয় লালে লাল হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে। সে আলো প্রবেশ করেছে ঝোপঝাড়ের অন্ধি সন্ধিতে, বিচিত্র সাজে সাজিয়েছে তাদের। সে আলো মরকতের মতো জ্বলছে ঘাসে ঘাসে। দেওদার গাছের গঁদের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত। তপ্ত রৌদ্রে দেওদাররা কি ধূপ জ্বেলেছে? মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, গাছের ডালপালা নড়ছে, তার সঙ্গে নড়ছে আলো ছায়া, নড়ছে ঘাসের উপর বিছানো মরকত-দ্যুতি, যেন একপাল রঙীন দুরন্ত পাখি কিংবা একঝাঁক মত্ত মধুকর পাগলের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে, একটা অদ্ভুত মর্মরে কি যেন জাগছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

সুরূপিণী চলছিলেন, ক্রমাগত চলছিলেন, চড়াই উতরাই ভেঙে, রৌদ্রে ছায়ায় অবিরাম চলছিলেন তিনি। কখনও রুক্ষ পাহাড়ের উপর দিয়ে, কখনও বন্য গিরগিটি আর সাপের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে, মেঘের সঙ্গে, সূর্যের সঙ্গে, গহন বনের অন্ধকারের নিবিড়তায় চলেই ছিলেন তিনি দ্রুতপদে। কোথায় যাচ্ছেন? উপত্যকার গোলকধাঁধায় বন্য রাস্তা দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবেই চলছিলেন তিনি। কখনও পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন আরও দূরের পর্বতমালা, দেখছিলেন বিরাট বিরাট পাখিরা আকাশে চক্রাকারে ঘুরছে, কখনও দূরে পাহাড়ের গায়ে ছোট পল্লী, পল্লী কিন্তু এড়িয়ে চলছিলেন তিনি। নীচে দেখতে পাচ্ছিলেন খরস্রোতা ফেনায়িতা পাহাড়ী নদীদের লীলা-নর্তন। কাছে ছোট ছোট উৎস, নিঃশব্দে মাটির ভিতর থেকে বেরুচ্ছে, শ্যাওলা আর কচি কচি ঘাসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে যেন। কোথাও আবার একদল শিশু-নদী একত্রিত হয়ে বেরিয়েছে কোন গহ্বর থেকে আর পাথরের নুড়িতে ঠুনঠুন বাজনা বাজিয়ে ছোট ছোট জলাশয় সৃষ্টি করছে চড়ুই পাখিদের স্নানের জন্য, কোথাও বা আবার উঁচু পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার নীচের উপত্যকায় স্ফটিকস্বচ্ছ ধারায়। চলতে চলতেই এসব দেখছিলেন তিনি উজ্জ্বল দিবালোকে আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে। এমন অনন্য, এমন মর্মস্পর্শী, রঙে রসে গন্ধে ভরা এমন অপূর্ব অনুভূতি তাঁর ইতিপূর্বে আর হয়নি কখনও। নীল-আকাশঘেরা রূপকথালোকের ভিতর দিয়ে তিনি চলেছিলেন।

অবশেষে যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন এসে পৌঁছলেন এক অগভীর জলাশয়ের ধারে। অগভীর কিন্তু বেশ প্রশস্ত। তার মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপের মতো কালো কালো পাথর মাথা উঁচু করে আছে, জলের ধারে ধারে বড় বড় ঘাস, নলখাগড়ার মতো। তীরে অসংখ্য দেওদার গাছ, জলের তলাতেও অসংখ্য দেওদারের ফল। দেওদার গাছের শিকড়ও এসে প্রবেশ করেছে সেই জলাশয়ের ভিতর, মনে হচ্ছে ছোট ছোট অন্তরীপ যেন, গাছগুলো ঈষৎ ঝুঁকে দেখছে তাদের। সুরূপিণী হামাগুড়ি দিয়ে জলের ধারে এসে বসলেন, স্বচ্ছ জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এ কে! এই কি মহারাণী সুরূপিণী? চোখের কোলে কালি, কাপড় জামা ছিন্নভিন্ন, খোঁপা খুলে পড়ছে। একটু হাওয়া বইল, নড়ে উঠল প্রতিবিম্ব, তারপর এক ঝাঁক পোকা উড়তে লাগল সেটার উপর। সুরূপিণী হাসলেন একটু, প্রতিবিম্বও হাসল, সে হাসিতে অনুকম্পার ছটাও দেখতে পেলেন তিনি। অনেকক্ষণ তিনি রোদে বসে রইলেন। দেখলেন তাঁর হাত পা সব ছড়ে গেছে, কতবার যে আছাড় খেয়েছেন তিনি। কি

নোংরা হয়ে গেছে কাপড়চোপড়, হাত পা মুখ চোখ সবই নোংরা, আশ্চর্য হলেন এই বেশে তিনি এতক্ষণ আছেন কি করে।

তারপর তিনি উঠলেন। ঠিক করলেন ওই আরণ্য আয়নার সাহায্যেই একটু ঠিকঠাক করে নিতে হবে নিজেকে, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবেন, গা-হাত-পা-মুখে জল দিয়ে ময়লাগুলো ধুয়ে ফেলবেন। প্রথমেই তাঁর দামী গয়নাগুলো খুলে একটা পুঁটুলিতে বাঁধলেন, তারপর ছিন্নভিন্ন শাড়ি কাঁচুলি ওড়নাটাকে গুছিয়ে পরলেন আবার, কুন্তল আলুলায়িত করে চূড়ার মতো করে বেঁধে নিলেন সেটা। বাঁধতে বাঁধতে একটা কথা মনে পড়ল। গন্ধরাজ বলতেন তোমার চুলে সুবাস আছে। আছে না কি? শুঁকে দেখলেন, কই না! হাসলেন একটু। তাঁর সেই ছোট্ট হাসিরও প্রতিধ্বনি ফিরে এল। তারপর উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন একটি ছোট মেয়ে আর তার চেয়েও ছোট একটি ছেলে, জলাশয়ের ওপারে একটা দেওদার গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে তাঁকে দেখছে। যেন দুটি পুতুল। সুরূপিণী ছোট ছেলেদের তত পছন্দ করেন না, ওদের দেখে তাঁর ভয় হল একটু।

"কে তোমরা"—একটু রুক্ষকণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন।

ওরা দু'জনেই ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল। তখন তাঁর মনে হল ছি ছি, ওদের সঙ্গে এমনভাবে কথা কওয়া ঠিক হয়নি। ভয় পেয়ে গেছে বেচারারা। কি সুন্দর দেখতে, চোখের দৃষ্টিতে কি স্বচ্ছতা। বনের ছোট ছোট পাখিদেরই সগোত্র ওরা। পাখির চেয়ে একটু বড়, কিন্তু পাখির চেয়ে ঢের বেশী সরল। ইচ্ছে হল ওদের সঙ্গে ভাব করি।

"এস না, এখানে এস, ভয় কি।"

তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ছুটে পালাল তারা, অদৃশ্য হয়ে গেল বনের ভিতর। নিদারুণ ব্যথা পেলেন এতে। একটা শাণিত সত্য যেন বুকে এসে বিঁধল। তাঁর বাইশ বছর বয়স হল—শীঘ্রই তেইশ হবে—কিন্তু কেউ তাঁকে ভালবাসে না। কেউ না। গন্ধরাজ হয়তো বাসতো। কিন্তু সে কি তাঁকে ক্ষমা করবে? তাঁর দুচোখ জলে ভরে এল। তখনি মনে হল এখন যদি এখানে কাঁদতে বসি তাহলে সে কান্না তো শেষ হবে না। আমরণ বসে কাঁদতে হবে। পাগলও হয়ে যেতে পারি। না, এখানে বসে থাকলে চলবে না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। জ্বলন্ত কাগজকে লোকে যেমন পায়ে চেপে নিবিয়ে দেয় তাঁর এই চিন্তাগুলোকে তেমনি দুপায়ে মাড়িয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। চুলটা ঠিক করে নিলেন—এদিক-ওদিকে চেয়ে দেখলেন একবার—নিশ্চয়ই কাছে বস্তি আছে— ভয় হল, তাড়াতাড়ি আবার চলতে শুরু করলেন।

দুপুরের কাছাকাছি সময়ে তিনি রাজপথে এসে পৌঁছলেন। রৌদ্রালোকিত পথটা দুটো বড় বড় ঝোপের মাঝ দিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। মনে হচ্ছে পথ নয়, যেন আলোর নদী। প্রকাণ্ড চড়াই। কিন্তু তিনি আর পারছিলেন না। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছিল। যা হবার হোক এই ভেবে রাস্তার ধারে একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন তিনি, সভ্যতার প্রতীক এই রাজপথের সান্নিধ্যে এসে অজ্ঞাতসারে একটু নির্ভয়ও হলেন হয়তো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে এল, মনে হতে লাগল ক্লান্তিতে বোধহয় মূর্ছাই গেলেন, কিন্তু মূর্ছা নয়, ঘুমই। যখনই তিনি আত্মসমর্পণ করলেন তখনই নিদ্রা যেন তাঁকে কোলে তুলে নিল। সমস্ত দুঃখ,

সমস্ত কষ্ট অতিক্রম করে নিমেষে তিনি বাড়িতে ফিরে গেলেন মায়ের বুকে। রাজপথের ধারে বে-পরদা হয়ে শুয়ে রইলেন মহারাণী, তাঁর ছিন্নভিন্ন বিপর্যস্ত বিলাসব্যসন ধুলোয় লুটোতে লাগল। পাখিরা উড়তে লাগল আশেপাশে আর পাখিদের ভাষায় পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল— এ কে, এ কে।

সূর্য আরও উপরে উঠলেন। মহারাণীর পায়ের কাছ থেকে ছায়া সরে গেল, ক্রমশঃ আরও সরতে লাগল। একেবারে যখন সরে যাচ্ছে তখন দূরে একটা গাড়ির চাকার শব্দে চাঞ্চল্য জাগল পাখিদের মধ্যে। ওই অঞ্চলে রাস্তাটা খুব খাড়া, চাকার আর্তনাদ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল সেটা। একটু পরেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হলেন সেখানে। মাঝে মাঝে তিনি পেন্সিল দিয়ে একটি নোটবুকে কি যেন লিখে নিচ্ছিলেন, আর মাঝে মাঝে আপনমনে কথাও বলছিলেন নিজের সঙ্গে, মনে হচ্ছিল কোনও কবি বুঝি কবিতা লিখে মৃদুকণ্ঠে সেটা পড়ে দেখে নিচ্ছেন ছন্দটা ঠিক হয়েছে কি না। গাড়ির চাকার শব্দ তখনও অনেক দূরে। বোঝা গেল গাড়িকে ছাড়িয়ে তিনি অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছেন।

সুরূপিণী যেখানে শুয়েছিলেন তার খুব কাছাকাছি এসেও তাঁকে প্রথমে দেখতে পাননি তিনি। তারপর হঠাৎ পেলেন। দেখেই চমকে উঠলেন তিনি, খাতা-পেন্সিল পকেটে পুরে, আরও কাছে এলেন। কাছেই পাথর ছিল একটা। তার উপর বাগিয়ে বসে ভ্রূকুঞ্চিত করে দেখতে লাগলেন তিনি সুরূপিণীকে। অনেকক্ষণ দেখলেন। পা গুটিয়ে হাত গুটিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিলেন তিনি নিটোল বাহুর উপর মাথা রেখে। মনে হচ্ছিল প্রাণহীন নিস্পন্দ। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও তাঁর বুক উঠছিল পড়ছিল না। জীবনের কোনও লক্ষণই নেই, একটা মড়াকে কারা যেন রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। প্রগাঢ় ক্লান্তির ভাষা সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। ভদ্রলোক মুখ টিপে হাসলেন একটু। একটা মর্মরমূর্তি দেখলে তিনি যা করতেন তাই করলেন। অনিচ্ছাসহকারে হলেও মহারাণীর মুখের চোখের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, তাঁর রূপের, প্রসাধনের একটা তালিকা প্রস্তুত করতে লাগলেন মনে মনে । ওই তন্বী দেহের অনাবৃত ঘুমন্ত মহিমায় বিস্মিত হলেন তিনি। মনে হল এই নিরাবরণ নিরাভরণ নিদ্রা অপরূপ মানিয়েছে তাঁকে, নূতন রূপে অলংকৃত করেছে তাঁর সর্বাঙ্গ।

"কি আপদ"—ভাবলেন তিনি—"মেয়েটা যে এত সুন্দরী তা তো ভাবিনি। আর এক আপদ, একথা আমি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করতে পারব না কোথাও—"

তাঁর হাতে একটা ছড়ি ছিল। সেইটে দিয়ে সুরূপিণীর পায়ে ঈষৎ খোঁচা দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সুরূপিণী চীৎকার করে উঠে বসলেন ধড়মড়িয়ে এবং তাঁকে দেখে চেয়ে রইলেন বিস্ফারিত চক্ষে।

"মহারাণীর আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে"—মাথা নেড়ে প্রশ্ন করলেন তিনি। কিন্তু মহারাণীর মুখ দিয়ে অসংলগ্ন শব্দ বেরুতে লাগল শুধু।

"আপনি ভয় পাবেন না, স্থির হোন। আমার গাড়ি পিছনে আসছে, আশা করি মহারাণীর সহযাত্রী হবার পরম সৌভাগ্য আমার হবে।"

"পণ্ডিত ভগীরথ শর্মা!"—সুরূপিণী তাঁকে চিনতে পারলেন অবশেষে।

"মহারাণীর আদেশ পালন করতে সর্বদাই প্রস্তুত।"

সুরূপিণী দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"ও, আপনি পার্বতী থেকে আসছেন কি?"

"আজ সকালেই আমি পার্বতী ত্যাগ করেছি। আর ফিরব না সেখানে। আপনি ছাড়া সেখানে না ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা যদি আর কারো থাকে তাহলে সে ব্যক্তি আমি।"

"প্রধানমন্ত্রী কপিঞ্জল—"

বলেই থেমে গেলেন সুরূপিণী।

"আপনি সৎকার্যই করেছিলেন, আপনি দ্রৌপদীর চেয়ে বড় বীরাঙ্গনা, ভীমের সাহায্য না নিয়েই কীচক বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কীচক কিন্তু মরেনি। কয়েকঘণ্টা কেটে গেছে। শুনেছি তিনি ভালো আছেন। সকালে বেরুবার আগে আমি খবর নিয়েছিলাম, ওঁরা বললেন, ভালো আছেন, কিন্তু যন্ত্রণা আছে খুব। অ্যাঁ? হ্যাঁ খুব। পাশের ঘর থেকে তাঁর কাতরানি শোনা যাচ্ছে না কি—"

"আর মহারাজা? তাঁর কোনও খবর পেয়েছেন?"

ভগীরথ শর্মা প্রশ্নটা শুনে একটু আমোদ অনুভব করলেন এবং একটু থেমে বললেন— "লোকে বলছে এর সঠিক খবর একমাত্র আপনিই দিতে পারেন না কি।"

সুরূপিণী এ কথার জবাব না দিয়ে একবার চোখ তুলে চাইলেন তাঁর মুখের দিকে। তারপর অন্য প্রসঙ্গ পাড়ালেন—"আপনার গাড়ি আছে? আপনি কি দয়া করে আমাকে শূলপাণি দুর্গে পৌঁছে দিতে পারবেন? সেখানে আমার খুব জরুরী দরকার আছে একটা—"

"নিশ্চয় পারব। আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারি কি?"—ভগীরথ শর্মা গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলুবে তা আমি সানন্দে করব। আমার গাড়ি এখনি এসে পড়বে। আপনি সেটা যেখানে খুশি নিয়ে যান। কিন্তু"—আবার তাঁর কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর ফুটল—"আপনি তো রাজপ্রাসাদের কথা কিছু জানতে চাইলেন না?"

"ওর জন্যে আমার একটুও মাথা-ব্যথা নেই। মনে হচ্ছে কাল আমি ওটা পুড়তে দেখেছি—"

"অদ্ভুত তো! মনে হচ্ছে আপনার? এতগুলো প্রসাধনসামগ্রী পুড়ে গেল, অথচ আপনি নির্বিকার। প্রশংসা করছি আপনার মনের জোরের! রাজ্য সম্বন্ধেও আপনার মাথা-ব্যথা নেই না কি? আমি যখন এলাম তখন নূতন শাসন-তন্ত্রের বৈঠক বসেছে—নূতন শাসনতন্ত্রের দুজনের নাম নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত। একজন সাপ্রা, যে আপনার ভৃত্য হবার সৌভাগ্যলাভ করেছিল—ফাইফরমাশ খাটবার চাকর ছিল কি?—আর দ্বিতীয় লোকটি হচ্ছেন কুজ্ঝটিকুমার, তিনি এখন অবশ্য আর মহাধ্যক্ষ নন, নিম্নপদস্থ কর্মচারী। এই রকমই হয়, রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় নীচুরা উপরে উঠে যায়, আর উপরের লোকেরা নীচে নেমে আসে।"

"মহামান্য শর্মাজি, আপনি নিশ্চয়ই এসব কথা আমার ভালোর জন্যেই বলছেন, কিন্তু আমি বলছি ওসব জানবার আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।"

ভগীরথ শর্মা একথা শুনে বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। গাড়িটা দূরে দেখা যেতেই বেঁচে গেলেন যেন, কিছু একটা বলবার জন্যেই যেন বললেন, "চলুন আমরা হেঁটে গিয়েই চড়ি ওটাতে।"

তাই হল। তিনি সসম্ভ্রমে সুরূপিণীকে আগে গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে তারপর নিজে চড়লেন। গাড়ির ভিতর নানারকম টুকিটাকি জিনিসে ভরতি ছিল। তিনি কিছু ফল বার করলেন, কয়েক টুকরো মেটে-ভাজা, চমৎকার রুটি আর এক বোতল গৌড়ী সুরা। বোতলটা পাথরের। এসব বার করে তিনি সুরূপিণীকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, মনে হল বাবা যেন অবাধ্য মেয়েকে সাধছেন। এ সময় আতিথ্যের রীতিবিরুদ্ধ কোনও অভদ্র আচরণ তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেল না, কণ্ঠে ধ্বনিত হল না কোনও ব্যঙ্গের সুর। তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেন সুরূপিণী। কৃতজ্ঞও হলেন।

বললেন, "শর্মাজি, আমি জানি আপনি আমাকে ঘৃণা করেন, আজ এত সদয় কেন?"

এ কথার কোন প্রতিবাদ না করে তিনি বলনেল—"ও, কেন? আপনার স্বামীর বন্ধুত্বলাভের সৌভাগ্য হয়েছে যে আমার। তাঁকে খানিকটা ভালও লেগেছে।"

"পছন্দ হয়েছে! কিন্তু শুনেছি আমাদের দুজনের সম্বন্ধেই অনেক নিষ্ঠুর কটুবাক্য লিখেছেন আপনি।"

"হ্যাঁ, ওই অদ্ভুত পথ দিয়েই আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম! বিশেষ করে আপনার সম্বন্ধে আমার সমালোচনা বিশেষ রকম নিষ্ঠুর এবং কটু হয়েছিল—ওই দুটো শব্দই তো আপনি ব্যবহার করলেন। আপনার স্বামী আমার বন্দীত্ববন্ধন মোচন করে আমাকে স্বাধীন করে দিলেন, রাজ্য ত্যাগ করবার ছাড়পত্র লিখে দিলেন, আমার জন্যে একটা গাড়ি ঠিক করে দিলেন। তারপর ছেলেমানুষের মতো বললেন, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব। তাঁর দাম্পত্যজীবনের খবর আমি জানতাম, তাই তাঁর এই সাহস আর আপনার সম্মান রক্ষা করবার জন্যে তাঁর আগ্রহ দেখে ভারী মজা লাগল আমার। তিনি কি বলেছিলেন শুনবেন? বলেছিলেন—'আপনি আমাকে যদি মেরে ফেলেন কেউ আমার অভাব অনুভব করবে না, কেউ আমার জন্যে কাঁদবে না।' বোধহয় আপনিও পরে এই ধরনের কিছু একটা ভেবেছিলেন। 'অন্য কথায় এসে পড়ছি। আমি তাঁকে বললাম—'আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব আমার পক্ষে! তিনি উত্তর দিলেন—"আমি যদি আপনাকে আঘাত করি, তাহলেও অসম্ভব?' কি অদ্ভুত কাণ্ড দেখুন! আমার ইচ্ছে ছিল এ ঘটনাটাও আমার রোজনামচায় লিখে রাখব। কিন্তু আমি হেরে গেলাম, ভদ্রতা আর আন্তরিকতার কাছে পরাজয় ঘটল আমার, গন্ধরাজকে ভালোবেসে ফেললাম। আপনাদের সম্বন্ধে যা যা লিখেছিলাম অনেক কলঙ্কের কথা ছিল তাতে—তা ছিঁড়ে ফেলতে হল তাঁর সামনে। আমি আপনার সঙ্গে এখন যে ব্যবহার করছি তার জন্যে আপনি আপনার স্বামীর কাছে ঋণী মহারাণী।"

সুরূপিণী চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তিনি যাদের ঘৃণা করেন তাদের কাছ থেকে নিজের সম্বন্ধে সুবিচার তিনি প্রত্যাশা করেন না। গন্ধরাজের মতো সকলকে খুশী করার ক্ষমতা তাঁর নেই, প্রবৃত্তি নেই। নিজের মতে নিজের পথে মাথা উঁচু করে সোজা গিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছনই তাঁর স্বভাব। কিন্তু ভগীরথ শর্মার কথা শুনে, বিশেষ করে তিনি তাঁর স্বামীর বন্ধু এ খবর পেয়ে, তিনি নিজেকে অবনত করলেন একটু।

"আমার সম্বন্ধে কি ধারণা আপনার?"—হঠাৎ জিগ্যেস করলেন তিনি।

"সে তো আগেই বলেছি। আমার ধারণা আপনার আর এক পাত্র গৌড়ী পান করা উচিত।"

"কথাটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা তো আপনার স্বভাব নয়। আপনি তো সত্য কথা বলতে ভয় পান না। আপনি বললেন আপনি আমার স্বামীকে পছন্দ করেন। আমার সম্বন্ধেও সত্য কথাটা বলুন—"

"আপনার সাহসকে আমি প্রশংসা করছি। কিন্তু তার বেশী আর কি বলব। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, মুখ ফুটে বলেওছেন, আমাদের রুচির পার্থক্য আছে।"

"আপনি যে কেলেঙ্কারি আর কলঙ্কের কথা লিখেছিলেন সত্যিই কি তা খুব বেশী শুনেছিলেন আপনি?"

"বেশ বেশী—প্রচুর।"

"আপনি সে সবে বিশ্বাস করেছেন?"

"মহারাণী—এ কি প্রশ্ন!"

"আপনার উত্তরের জন্য ধন্যবাদ", —উষ্মাভরে বললেন সুরূপিণী—"কিন্তু আপনার মুখের উপরই আমি বলছি, আমার ধর্ম, আমার ভগবান, আমার আত্মা, আমার সম্মান সাক্ষী—শত কেলেঙ্কারি শত কুৎসা সত্ত্বেও সত্য কথা হচ্ছে আমি অকলঙ্কিতা, আমি সতী।"

"এরকম ব্যাখ্যায় বোধহয় আমি সায় দিতে পারব না।"

"আমি জানি, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছি। কিন্তু সে কথা বলছি না। আপনি যদি আমার স্বামীকে ভালোবাসেন, তাহলে আমি দাবি করছি আপনি আমার কথাটাও বুঝুন। আমি নির্ভয়ে আমার স্বামীর মুখের দিকে চাইতে পারি, আমার চোখের দৃষ্টি একবারও কাঁপবে না—"

"হতে পারে। কাঁপবে একথা তো আমি বলছি না।"

"তাহলে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না? আপনার ধারণা আমি তাহলে অসতী? ওই লোকটা আমার প্রণয়ী?"

"মহারাণী, আমি যখন ওই কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলেছিলাম তখনই আমি আপনার স্বামীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আপনার ব্যাপার নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাব না। আমি আবার বলছি আপনার ভালো-মন্দর বিচার করবার আমার একটুও ইচ্ছে নেই।"

"কিন্তু আমি যে নির্দোষ একথা আপনি মানবেন না? কিন্তু সে মানবে, সে আমাকে ভালো করে চেনে।"

ভগীরথ শর্মা হাসলেন।

"আপনি আমার দুঃখ দেখে হাসছেন?"

"দুঃখ দেখে নয়, আপনার সাহস দেখে। কোনও পুরুষ এ রকমভাবে নিজের সাফাই গাইবার সাহস পেত কি না সন্দেহ। আপনি যা করছেন তা হয়তো খুবই স্বাভাবিক, যা বললেন তাও হয়তো সত্যি। তাহলে শুনুন, আপনি যখন আমার মতামত শুনতে এত উৎসুক—আপনি যা আপনার দুঃখকষ্ট বলে বর্ণনা করছেন তা শুনে আমার বিন্দুমাত্র করুণা হচ্ছে না। আপনি অত্যন্ত স্বার্থপর, আপনি যে বীজ বপন করেছিলেন তারই ফসল ফলেছে। আপনি যদি কেবল নিজের কথা না ভেবে আপনার স্বামীর কথা একবারও ভাবতেন, তাহলে আপনি এমন একা পড়ে যেতেন না, এমনভাবে আপনাকে পালাতে হত না, ঘাতকের মতো

আপনার হাতে রক্তের ছাপ লাগত না, আর একজন বৃদ্ধ বিমর্ষ গৌড়বাসীর মুখে আপনার সম্বন্ধে এইসব সত্য কথাও শুনতে হত না, যা কুৎসার চেয়েও বেশী তিক্ত।"

"আপনাকে ধন্যবাদ"—সুরূপিণীর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল—"যা বললেন তা সত্যি, খুব সত্যি। এখন আপনার গাড়িটা থামাবেন?"

"না, যতক্ষণ না আপনি দেহে-মনে সুস্থ হচ্ছেন ততক্ষণ থামাব না।"

গাড়ি চলতে লাগল। একটা পাহাড় একটা প্রকাণ্ড বনভূমি পার হয়ে গেল।

"এইবার আমি সুস্থ হয়েছি। আবার আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে নামিয়ে দিন।"

"এটা তো অবুঝের মতো কথা। থাকুন না গাড়িতে—চারদিকে পাহাড়—"

"মহামান্য শর্মাজি, ওই পাহাড়ে যদি স্বয়ং মৃত্যুও আমার অপেক্ষায় বসে থাকে তবু আমি নামব। আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, ধন্যবাদ দিচ্ছি। অপরের চোখে আমি যে কি তা আমি এখন বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যাঁর ওই রকম ধারণা তাঁর সঙ্গে আমি এক গাড়িতে বসে যাব? না, না, কিছুতেই না, আপনি গাড়ি থামান—"

ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ি থামালেন ভগীরথ শর্মা। তারপর নিজে নেমে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন যাতে মহারাণী নির্বিঘ্নে নামতে পারেন। কিন্তু মহারাণী সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না, নিজেই লাফিয়ে নেমে পড়লেন।

রাস্তাটা এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের উপরে উঠছিল, এইবার সেটা উপত্যকা থেকে বেরিয়ে গর্জনগাঁওয়ের উত্তরে আর একটা উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে ঠিক যেন কার্নিসের মতো হয়ে চলে গিয়েছিল আরও উপরে। তাঁরা যেখানে নেমেছিলেন সেখানে প্রকাণ্ড একটা বাঁক। মাথার উপরে প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঙড় আর ঝঞ্ঝাহত কয়েকটা দেওদার গাছ ঝুলছিল, নীচে অনেক নীচে, দেখা যাচ্ছিল উপত্যকার নীল সমতলভূমি সবুজ দিগন্তের সঙ্গে কোলাকুলি করছে—আর সামনে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে বিরাট একটা সাপের মতো উঠে গিয়েছিল আরও উপরে। সেখানে একটা উচ্চ গিরিচূড়ার উপর একটা দুর্গ দাঁড়িয়েছিল দৃষ্টিরোধ করে।

ভগীরথ শর্মা অঙ্গুলিনির্দেশে জানালেন—"ওই হচ্ছে শূলপাণি, আপনার গন্তব্যস্থান। কামনা করি আপনার যাত্রা শুভ হোক। আপনাকে আর একটু সাহায্য করতে পারলে আমি সত্যিই খুশী হতাম, কিন্তু তাতো আর হল না।"

তিনি গাড়িতে চড়ে ইঙ্গিত করতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। সুরূপিণী রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন সামনের দিকে চেয়ে, মনে হতে লাগল কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, চোখ দুটো যেন অন্ধ হয়ে গেছে। ভগীরথ শর্মার কথা আর ভাবছিলেন না তিনি, যাদের তিনি ঘৃণা করেন মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দেন না তাদের, তারা ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে অবশেষে বিলীন হয়ে যায় তাঁর মন থেকে। এখন তিনি ভাবছিলেন অন্য কথা। গন্ধরাজের সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকারের কথা তিনি ভোলেননি, এজন্য গন্ধরাজকে ক্ষমাও করেননি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা নূতন আলোকে নূতন রূপে প্রতিভাত হয়েছে তাঁর মনে। তিনি অপমানিত হয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, তবু এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা ঘুণাক্ষরে বলেননি। তাঁর সম্মান রক্ষা করবার জন্যই তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন ভগীরথ শর্মার মতো বীরকে। হ্যাঁ তাঁর জন্যই।

অথচ—। দেখতে দেখতে সমস্ত ছবিটারই মানে বদলে গেল। তিনি যে তাঁকে ভালবাসেন, তাতে সন্দেহ রইল না। এ সামান্য দুর্বলতামাত্র নয়, এ পৌরুষের বীরত্ব। কিন্তু তিনি? তাঁর কি ভালোবাসার ক্ষমতাই নেই? আপাতদৃষ্টিতে তাই তো মনে হয়। সহসা তাঁর দুই চোখ জলে ভরে এল, গন্ধরাজকে দেখবার জন্যে, তাঁকে সব কথা খুলে বলবার জন্যে আকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর অপরাধের জন্য হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইবেন তিনি। আর সমস্ত আশা ভরসা যদি চিরতরে নির্বাপিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাঁর যে স্বাধীনতা তিনি অপহরণ করেছেন সেটা অন্তত ফিরিয়ে দেবেন তাঁকে।

আবার দ্রুতপদে যাত্রা শুরু করলেন। ঘোরানে সিঁড়ির মতো রাস্তা দিয়ে তিনি পর্বত-সমীরণ-স্নাত রৌদ্রোজ্জ্বল শূলপাণিকে লক্ষ্য করেই চলতে লাগলেন। মাঝে মাঝে অনেক উঁচুতে, কখনও তাকে দেখতে পেলেন, আবার কখনও পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সে যেন লুকিয়ে পড়ল। আবার দেখা দিল একটু পরে।

।। কুড়ি ।।

গন্ধরাজ যখন তাঁর চলন্ত কারাগারে উঠলেন তখন দেখলেন আর একজন কে যেন সামনের আসনে কোণের দিকে বসে আছে। মাথা নীচু করে বসে ছিল লোকটি, গাড়ির আলো বাইরের দিকে পড়ছিল, তাই গন্ধরাজ শুধু একটি লোককেই দেখলেন। সেনাপতি ধূর্জটিপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে গাড়ির কপাট বন্ধ করে দিতেই গাড়ির চারটি ঘোড়াই অবিলম্বে কদমচালে চলতে শুরু করল।

"দেখুন"—একটু পরে গলা খাঁকারি দিয়ে ধূর্জটি সিং বললেন—"মানে এমন চুপচাপ করে না গিয়ে একটু ঘরোয়াভাবে গেলে কেমন হয়। আপনাদের চোখে আমি অবশ্য ঘৃণ্য লোক, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি অসভ্য নই। আমি বই পড়তে ভালোবাসি, বিদ্যাপতি কালিদাস ভবভূতি আমার কণ্ঠস্থ, বিদগ্ধ লোকের সঙ্গে আড্ডা দেবার সুযোগ পেলে হাতে স্বর্গ পাই। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে আমাকে বিদেশে এসে প্রহরীর চাকরি নিতে হয়েছে। আজ কিন্তু মহা সুযোগ পেয়ে গেছি, অনুরোধ করছি, আমাকে হতাশ করবেন না। ছাত্রসভার বাছাই করা দুটি অমূল্য রত্নকে আজ পেয়েছি—অবশ্য রূপসী সদস্যাদের কথা বাদ দিয়ে—একজন সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য গ্রন্থকার পণ্ডিত এবং—"

"এ কি, ইন্দীবর না কি"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন গন্ধরাজ।

"মনে হচ্ছে আমাদের দুজনকে এক গাড়িতে একসঙ্গেই যেতে হবে। মহারাজ বোধহয় এটা প্রত্যাশা করেননি।"

"মানে? তুমি কি ভেবেছ আমি তোমাকে বন্দী করেছি?"

"এ সিদ্ধান্তে আসা খুব দুরূহ তো নয়।"

"সেনাপতি ধূর্জটি সিং"—গন্ধরাজ বললেন—"আপনার তো কিছুই অবিদিত নেই। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিন ইন্দীবরকে।"

"দিচ্ছি। আপনারা দুজনেই মহারাণী সুরূপিণীর আদেশে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে

শূলপাণি দুর্গে চলেছেন। আদেশপত্রে মহারাণীর স্বাক্ষরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কপিঞ্জলের স্বাক্ষর আছে। পরশু দিন আদেশপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। যা বলছি সেটা গোপনীয় কথা।"

"গন্ধরাজ"—ইন্দীবর বললেন—"অকারণে তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম বলে ক্ষমা চাইছি।"

"ইন্দীবর, যা চাইছ তা কিন্তু তোমাকে দিতে পারব কি না জানি না।"

"মহারাজ"—একটু ইতস্তত করে ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন—"আমি জানি আপনি উদার দিলদরিয়া লোক। আমি যা করতে যাচ্ছি আশা করি তাতে আপনি আপত্তি করবেন না। আমাদের দেশে ঠাকুরঘরে আলো জ্বেলে দেওয়া নিয়ম। এখানেও আমি একটা আলো জ্বেলে দিতে চাই। সঙ্গে এনেছি—"

সত্যিই তিনি একটা উজ্জ্বল বাতিদান লাগিয়ে দিলেন গাড়ির ভিতরে। ভিতরটা বেশ আলোকিত হয়ে উঠল। তারপর তিনি বললেন, "আমাদের দেশে আর একটা নিয়ম আছে। কোনও গাছে ফুল না ফুটলে আমরা পৈঠী সুরা দিয়ে তার অর্চনা করি। সে সুরাও এনেছি কিছু।" তিনি গাড়ির আসনের নীচে থেকে একটা ঝুড়ি টেনে বার করলেন, দেখা গেল অনেকগুলি বোতলের গলা বেরিয়ে আছে তার ভিতর থেকে।

"অধ্যাপক মশাই, আপনি রাগ করবেন না তো। আপনারা আমার অতিথি এখন, আমাকে আপনাদের সেবা করবার সুযোগ দিন, বিশেষত আমার এই চাকরিটার জন্যে একটু বিব্রতবোধ করছি, আপনারা যদি আমার অনুরোধ না রাখেন তাহলে আরও বিব্রত হব। শ্রীমান মহারাজা গন্ধকুমারের মঙ্গল হোক।"

এই বলে ধূর্জটিপ্রসাদ একপাত্র পৈঠী সুরা পান করে ফেললেন।

গন্ধরাজ হেসে বললেন—"আমাদের সেনাপতি মশায় রসিক লোক দেখছি। দিন তাহলে আমাকেও একপাত্র। আপনার মঙ্গল কামনা করে আমিও পান করে ফেলি সেটা—"

এরপর আর আড়ষ্টতা রইল না। তিনজনেই মহানন্দে মদ্যপান করতে লাগলেন। একটা ঝাঁকানি দিয়ে গাড়িটা মোড় পার হল, তারপর আরও দ্রুতবেগে চলতে লাগল রাজপথ ধরে।

গাড়ির ভিতরটা আলোকিত ছিল বলে দেখা গেল ইন্দীবর ভারতীর গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল অস্পষ্ট গাছের সারি আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে, আকাশে নক্ষত্রের সারিও চলছে সঙ্গে সঙ্গে, কখনও কখনও ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে, আবার দেখা দিচ্ছে। বিরাট আকাশ মাঝে মাঝে একফালি মণিমুক্তাখচিত কালো ওড়নার মতোও মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে হু হু করে হাওয়া ঢুকছে নিশীথ রাত্রির রহস্যময় স্বাদ বহন করে। চাকার শব্দ, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ মুখরিত করে তুলেছে পার্বত্য বন্যপথকে। তিনজনে ক্রমাগত মদ খেয়ে চলেছেন, পাত্রের পর পাত্র হাতে করে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করে গলায় ঢেলে দিচ্ছেন তীব্র পৈঠী আসব। দেখতে দেখতে একটা আনন্দময় পরিবেশ ঘনিয়ে উঠল তিনজনকে ঘিরে, মৃদু হাসির গুঞ্জন কেবল ব্যাহত করতে লাগল তাকে মাঝে মাঝে।

নীরবতা ভঙ্গ করে ইন্দীবর বললেন—"গন্ধরাজ, আমি তোমাকে আর ক্ষমা করতে অনুরোধ করব না। ভেবে দেখলাম আমি যদি গন্ধরাজ হতাম আর তুমি যদি ইন্দীবর হতে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারতাম না।"

"কথাটা বেশ কায়দা করে বললে তো!"—গন্ধরাজ উত্তর দিলেন—"আমি কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করে ফেলেছি, যদিও তোমার কথাগুলো আর আমার প্রতি তোমার সন্দেহ মনে খচখচ করছে এখনও। শুধু তোমার কথাগুলোই নয়। সেনাপতি ধূর্জটিপ্রসাদ, আপনার কাছে তো আদেশপত্রটা আছেই, সুতরাং আপনার কাছে আর গোপন করবার কিছু নেই। আমার পারিবারিক অশান্তি আর মনান্তরের কাহিনী তো এখন সকলের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তা নিয়ে অসংকোচে এখন আলোচনা করতে পারি। আচ্ছা, আমি কি আমার স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারি? অবশ্যই পারি এবং করেওছি। কিন্তু কি ভাবে? আমি নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজেকে অবনত করব না, আর এও ঠিক যে এখন যদি তার কথা ভাবি তাহলে এমনভাবে ভাবতে হবে যেন সে অপরিচিতা, কোনও দিন যেন তাকে চিনতাম না—"

"একটা কথা বলছি, মাপ করবেন"—ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন—"একটা কথা গোড়াতেই ঠিক করে নিন। আমরা কি সবাই হিন্দু নই? আমরা কি সকলেই নিয়তির অমোঘ তাড়নায় বিপর্যস্ত নই? সকলেই কি আমরা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির? সকলেই কি নিষ্পাপ কলঙ্কহীন?"

"আমি ওসব বিশ্বাস করি না"—হঠাৎ বলে উঠলেন ইন্দীবর ভারতী—"আপনার এই উৎকৃষ্ট সুরা পান করে আমি হৃদয়ঙ্গম করছি কর্মফলটল বাজে কথা, পাপপুণ্য সব ধাপ্পাবাজি। আপনার ও যুক্তি অচল।"

"অচল? আপনি কি কখনও মন্দ কাজ করেননি? একটু আগেই তো আপনি ক্ষমা চাইছিলেন, ভগবানের কাছেও নয়, আপনারই মতো আর একজন সাধারণ লোকের কাছে।"

"ঘায়েল হয়ে গেলুম স্বীকার করছি। দেখছি আপনি শুধু অস্ত্রবিশারদই নন, যুক্তিবিশারদও।"

"ভগবান সাক্ষী, এ কথা শুনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে"—ধূর্জটিপ্রসাদ সিংহের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—"আমি মিথিলায় সংস্কৃত টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। দেখুন, আমার মতে এইসব ক্ষমা চাওয়াটাওয়ার ব্যাপার তাঁদের সাজে যাঁদের জীবনের নীতি শিথিল এবং তা সত্ত্বেও যাঁরা সমাজের বাইরে পা বাড়াতে ভরসা পান না। তাঁরাই এইসব ক্ষমা চাওয়াচাওয়ি করেন মাঝে মাঝে। যাঁরা আসল জ্ঞানী তাঁদের নিজের জীবনের নীতি নির্দিষ্ট সমাজের নীতির বাইরে তাঁরা পা বাড়াতে ইতস্তত করেন না। আপনারা দুজনেই জ্ঞানী, আপনারা কেউ কারোর ক্ষমা চাইবেন কেন? কেউ কারুকে ক্ষমা করবেনই বা কেন!"

"এই আপাত-বিরুদ্ধ কথাটা কিন্তু খুব লাগসই মনে হচ্ছে না।"—হেসে উত্তর দিলেন ইন্দীবর।

"ক্ষমা করবেন সেনাপতি মশাই, আমি আপনার মনে আঘাত দিতে চাই না, কিন্তু আপনার কথাগুলো যেন ব্যঙ্গের মতো দংশন করল আমাকে। আপনি আমাকে জ্ঞানী বলছেন? যে অবস্থায় পড়েছি সে অবস্থায় আমাকে জ্ঞানী বলা কি সংগত? আমি কি আমার অজ্ঞানের প্রায়শ্চিত্ত করছি না? সুদীর্ঘ অজ্ঞতার ফলে এই অপমানের পঙ্কে ডুবছি না?"

"ক্ষমা করবেন মহারাজ"—বললেন ধূর্জটিপ্রসাদ—"আপনি কি কখনও মন্দির থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, আপনি কি কখনও সর্বস্বান্ত হয়েছেন? আমি হয়েছি। সামরিক কর্তব্যচ্যুতির

জন্য হয়েছি। খুলেই বলছি তাহলে—এত বেশী মদ খেতাম, এমন মাতলামি করতাম যে সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। এখন অবশ্য আর অতটা করি না"—এই বলে, তিনি তার এক পাত্র সুরা ঢাললেন—"দেখুন মহারাজা, যে লোক তার নিজের চরিত্রের সমস্ত দোষের কথা সম্পূর্ণরূপে জেনেছে, যেমন আমি জেনেছি, যে লোকটাকে অন্ধ লাটিমের মতো জীবনের অঙ্গনে নেচে নেচে বেড়াতে হয়েছে, তার কাছে ক্ষমার অর্থ একটু আলাদা। আমি যতক্ষণ না নিজেকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারছি ততক্ষণ ক্ষমার মহত্ত্ব নিয়ে আস্ফালন করা আমার অন্তত সাজে না। হয়তো আমি জীবনে কোনও দিন কাউকে ক্ষমা করবার মতো শক্তি সংগ্রহ করতে পারবই না। আমার পিতা সচ্চরিত্র নিষ্ঠাবান মন্দিররক্ষক ছিলেন, খুব কড়ালোক ছিলেন তিনি। তিনি কারো দোষত্রুটি ক্ষমা করতেন না । আমি সচ্চরিত্র নই নিষ্ঠাবানও নই এবং ওইখানেই তফাত। যে লোক দুর্বল মানুষকে ক্ষমা করতে পারে না আমার মতে সে শিশু, জীবনের কোনও সত্য অভিজ্ঞতাই তার নেই।"

ইন্দীবর বললেন, "শুনেছি, আপনি একজন বড় মল্লযোদ্ধা--"

"ওটা অন্য জিনিস। পেশা মাত্র, তবে একেবারে পাশবিক নয়।"

একটু পরেই সেনাপতি মশাই ঘুমিয়ে পড়লেন। অগাধ ঘুম! নাক ডাকতে লাগল। তাঁর দিকে চেয়ে হাসলেন ওঁরা।

"আজব চিড়িয়া"—ইন্দীবর বললেন।

"আর অদ্ভুত অভিভাবকও"—গন্ধরাজ উত্তর দিলেন—"তবে উনি যা বললেন তা নেহাত বাজে কথা নয়।"

"হ্যাঁ ঠিকভাবে বিচার করলে"—ইন্দীবর বললেন—"আমরা যখন বন্ধুকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করি, আসলে তখন আমরা নিজেদেরই ক্ষমা করতে পারি না। প্রত্যেক কলহের সঙ্গে আমাদের নিজেদেরই দুষ্কৃতি জড়িয়ে থাকে খানিকটা, তাতেই আরও জট পাকিয়ে যায়।"

"যারা ক্ষমা করে তাদের চরিত্রও কি দোষমুক্ত? আত্মসম্মানের কি কোনও সীমা নেই?" —গন্ধরাজ প্রশ্ন করলেন।

"দেখ, গন্ধরাজ, আত্মসম্মানের কথা তুললে যখন তখন জিগ্যেস করছি কোনও লোক কি সত্যি সত্যি নিজেকে সম্মান করে? এই পাহারাওলার চোখে আমরা মস্ত লোক। কিন্তু সত্যি আমরা কি! বাইরের নানারকম ভড়ং দিয়ে অন্তরের আবর্জনাকে ঢেকে রেখেছি। মুখোশ ছাড়া লোককে দেখাবার মতো আমাদের কিই বা আছে!"

"যা বললে, তা আমার সম্বন্ধে ঠিক খাটে। কিন্তু তুমি? তোমার অক্লান্ত পরিশ্রম, তোমার বিরাট প্রতিভা, তোমার অমর গ্রন্থাবলী, তোমার সাধনা, তোমার ব্রহ্মচর্য—তুমি জান না ইন্দীবর তোমাকে আমি কত হিংসা করি—"

ইন্দীবর মৃদু হাসলেন একথা শুনে।

"গন্ধরাজ, সত্যি কথাটা শুনবে তাহলে? এক কথায় বলছি, যদিও কথাটা ভালো শোনাবে না। আমি মাতাল, লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খাই। খুব বেশী খাই। সুরা প্রেতিনীর মতো আমার উপর ভর করেছে। আমার যে অমর গ্রন্থাবলীর প্রশংসায় তুমি এখনি গদগদ হলে সে গ্রন্থাবলী যত ভালো হতে পারত তত ভালো হয়নি, ওই প্রেতিনী তা করতে দেয়নি। পলে

পলে ও আমার মনুষ্যত্ব চুষে চুষে খেয়ে ফেলছে, আমার প্রতিভাকে নিষ্প্রভ করে দিচ্ছে, আমার মেজাজকে সঙ্কীর্ণ করে আনছে। সেদিন যে তোমাকে ওই ওজস্বিনী তিরস্কারটা করলুম, তার ওজস্ কোথা থেকে এল? মদ থেকে, রাত্রে খুব মদ খেয়েছিলাম। ওই যে মাতালটা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, তার কথার যদিও প্রতিবাদ করলাম সাড়ম্বরে, কিন্তু ও ঠিক কথাই বলেছে। আমরা সবাই পাপী, কিছুক্ষণের জন্য এই রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে ঠিক করছি এটা ভালো ওটা মন্দ, কিন্তু ভগবানের চক্ষে আমরা সবাই উলঙ্গ পাপী, ভাবলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। কথাটা কিন্তু সত্যি—"

"সত্যি? কি আমরা তাহলে? যা উৎকৃষ্ট—"

"মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলে কিছু নেই। আমি তোমার চেয়ে কিংবা ওই ধূর্জটিপ্রসাদের চেয়ে কোন অংশে ভালো নই, হয়তো মন্দও নই। আমি রঙ্গমঞ্চের একজন অভিনেতা, আমার সাজপোশাক, আমার কথাবার্তা আমার নয়, সব মেকী। এবার আশা করি আমাকে চিনেছ, যদি চিনে থাক তাহলেই আমি খুশী—"

"কিন্তু এসব শুনেও তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা তো কমছে না"—মৃদুকণ্ঠে বললেন গন্ধরাজ—"আমাদের দুষ্কৃতি আমাদের বদলায় না। ইন্দীবর, আবার সুরা ঢাল। এই চরম দুর্গতির মধ্যেও যে ধ্রুবতারাটা এখনও ডোবেনি, এস তারই স্মরণে, আমাদের সেই পুরাতন প্রেমকে স্মরণ করে আর এক পাত্র করে পান করি। তারপর যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কারণে তুমি আমাকে তিরস্কার করেছিলে তার অপমান বিস্মৃতির তমসায় ছুঁড়ে ফেলেদি। এস সুরূপিণীকে স্মরণ করেও পান কর আর এক পাত্র, যে সুরূপিণীর সঙ্গে আমি দুর্ব্যবহার করেছি, যে সুরূপিণী আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, যাকে আমি ছেড়ে চলে এসেছি, হয়তো খুব বিপদের মুখেই ফেলে এসেছি, এস, তাকে স্মরণ করেই আর এক পাত্র পান করি আবার। আমরা কত মন্দ তা বিচার করে লাভ কি, কি তাতে যায় আসে যদি তা সত্ত্বেও লোকে আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাদের ভালোবাসতে পারি—"

"ঠিক বলেছ"—ইন্দীবর বললেন—"খুব ভালো বলেছ। যারা দুঃখবাদী বিশ্বনিন্দুক এই তাদের মুখের মতন জবাব। এইটেই মনুষ্যজাতির ইতিহাসে চিরন্তন অত্যাশ্চর্য ঘটনা। তাহলে তুমি এখনও আমাকে ভালোবাস? তুমি এখনও তাহলে তোমার স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পার? ব্যাস, তাহলে তো হয়ে গেল। 'আমরা এখন অনায়াসে আমাদের বিবেকরূপী কুকুরটাকে ধমক দিয়ে বলতে পারি—থাম বেটা, ছায়া দেখে ঘেউ ঘেউ করে মরছিস কেন।"

দুজনেই নীরব হয়ে গেলেন। ইন্দীবর খালি পানপাত্রটায় অন্যমনস্কভাবে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে লাগলেন।

গাড়ি উপত্যকা অতিক্রম করে সেই রাস্তাটায় এসে হাজির হল যেটা গর্জনগাঁওয়ের সামনে দিয়ে চলে গেছে ভৈরঙ্গীর কান ঘেঁষে অনেক নীচে নক্ষত্রালোকে আলোকিত একটা জলপ্রপাত দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল বনলক্ষ্মীর অঞ্চলপ্রান্ত লুটিয়ে পড়েছে। উপরের পর্বতশ্রেণী নিকষকৃষ্ণ, নগ্ন এবং ভয়ঙ্কর। গাড়ির বাতি পাহাড়ের গায়ে আলোর ছাপ ফেলে ফেলে চলেছিল, দেখা যাচ্ছিল ছোট ছোট দেওদারগাছদের সেই চকিত আলোকে। পাথরের রাস্তাটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল গাড়ির চাকা আর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে। মাঝে মাঝে

গন্ধরাজ অশ্বারোহী প্রহরীদেরও দেখতে পাচ্ছিলেন, একটা নদীর ধার দিয়ে দলবদ্ধ হয়ে চলেছিল তারা। একটু পরেই শূলপাণির বলিষ্ঠ রূপ ফুটে উঠল, পর্বতের উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে আছে নক্ষত্রখচিত আকাশের পটভূমিকায় বিরাট দৈত্যের মতো।

"ইন্দীবর, আমরা এসে পড়েছি—"

ইন্দীবর স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে বসে ছিলেন, জেগে উঠলেন।

"আমি ভাবছিলাম। তুমি বললে সুরূপিণীকে বিপদের মুখে ফেলে এসেছ। এলে কেন? তোমার রুখে দাঁড়ান উচিত ছিল। শুনলাম তুমি স্বেচ্ছায় এসেছ, সুরূপিণীর কথাটা একবার ভাবলে না? তাকে বাঁচাবার জন্যে তোমার কি সেখানে থাকা উচিত ছিল না?"

গন্ধরাজের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

।। একুশ।।

সুরূপিণীর সঙ্গে দেখা সেরে রাজপ্রাসাদ থেকে শ্রীমতী রঞ্জাবতী যখন বেরিয়ে এলেন তখন ভয়ে তাঁর বুক কাঁপছে। তিনি লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে মনে হিসাবনিকাশ করতে লাগলেন, তিনি যা করে ফেললেন কপিঞ্জলের উপর তার কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে। পাখাটা খুলে নিজেকে হাওয়া করলেন একটু, কিন্তু পাখার হাওয়া তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে পারল না।

"মেয়েটার মাথা একদম খারাপ হয়ে গেছে"—ভাবলেন তিনি; তারপর মনে হল, "আমিও একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।" অবিলম্বে ঠিক করে ফেললেন গা ঢাকা দিতে হবে। রঞ্জাবতীর গা-ঢাকা দেওয়ার একটা জায়গাও ছিল। শহর থেকে দূরে বনের মধ্যে একটি ছোট বাগান-বাড়িগোছের। তিনি যদিও কবিত্ব করে এটার নামকরণ করেছিলেন—"অরণ্যনীড়"—সাধারণ লোকে কিন্তু এটাকে বলত "বনদরগা"।

এ কথা মনে হওয়ামাত্র তিনি গাড়ি হাঁকিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় দেখলেন বীথিপথ ধরে কপিঞ্জল প্রাসাদের দিকে যাচ্ছেন। ভান করলেন যেন তাঁকে দেখতে পাননি। বনদরগা পার্বতী থেকে সাত মাইল দূরে, একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে। সেইখানেই রাতটা কাটালেন তিনি। শহরের গোলমালের খবর তাঁর কানে এল না। জায়গাটা উপত্যকার মধ্যে, চারদিকে পাহাড়, তাই অগ্নিকাণ্ডের আলোও দেখতে পেলেন না তিনি। রাত্রে ঘুম হল না ভালো! কি হবে কি হবে এই চিন্তায় অস্থির হয়ে রইলেন, কাল সন্ধ্যাটা বেশ মনোরমভাবেই কেটেছে কিন্তু তার ফল শেষপর্যন্ত কি দাঁড়াবে কে জানে! তাঁরও শেষপর্যন্ত নির্বাসন লেখা আছে না কি কপালে! চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিজের অনেক সাফাই গাইবার পর তবে কি তিনি কপিঞ্জলের নাগাল পাবেন? কে জানে অদৃষ্টে কি আছে! তারপর তাঁর কৌতূহল হল গন্ধরাজ কাল তাঁকে যে দলিলগুলো দিয়েছিল তাতে কি আছে? দেখা যাক। দেখে কিন্তু তিনি হতাশ হলেন। এই ডামাডোলের বাজারে জমি আর খামার নিয়ে কি করবেন তিনি! এও তাঁর মনে হল গন্ধরাজ খুব বেশী টাকা দিয়েছে। একটা খামারের অত দাম? পরিশেষে গন্ধরাজের মুক্তির জন্যে সুরূপিণী যে আদেশটা দিয়েছিলেন সেটা খুলে পড়লেন। আঙুলগুলোয় ছ্যাঁকা লাগল যেন! মুড়ে রেখে দিলেন সেটা। ভাবলেন একটু। তারপর ঠিক করে ফেললেন কি করবেন।

পরদিন সকালে দেখা গেল একটি রূপসী রমণী অশ্বারোহণে এসে শূলপাণির সিংহদরজার সামনে ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পরনের কাপড় আঁটসাঁট করে পরা। চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পরিণাম কি হতে পারে তা না ভেবেই দুঃসাহসিনী রঞ্জাবতী বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনের ভাবটা—দেখা যাক না কি দাঁড়ায়! চিরকালই এই তাঁর মনের ভাব। খেয়ালের হাওয়াতেই চিরকাল তিনি তরী ভাসিয়েছেন। প্রহরীকে আদেশ করলেন—সেনাপতিকে খবর দাও। ধূর্জটিপ্রসাদ বেরিয়ে এসে স্বাগত-সম্ভাষণ জানালেন তাঁকে, নবীন যুবক কোনও তরুণীকে দেখে যেভাবে উচ্ছ্বসিত হতেন তেমনই উচ্ছ্বসিত হলেন, যদিও আশ্চর্যের বিষয়, দিবালোকে তাঁকে বেশ প্রবীণ বলেই মনে হচ্ছিল। রঞ্জাবতীর চোখমুখ রহস্যময় হয়ে উঠল।

"সেনাপতি মশাই, আপনাকে তাক লাগিয়ে দিতে এসেছি"—বলে একটি অর্থপূর্ণ কটাক্ষ হানলেন তিনি।

"আমার আসামী দুটিকে যেন ভুলিয়ে নিয়ে যাবেন না। বরং আপনি এসে যদি তাদের দলে যোগ দেন আমার আনন্দ সীমা ছাড়িয়ে যাবে।"

"তার মানে আমাকে নষ্ট করতে চান!"

"পারব কি? চেষ্টা নিশ্চয়ই করব।"

এই বলে তিনি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। রঞ্জাবতী তাঁর বাহুলগ্না হয়ে ঘেঁষে দাঁড়ালেন ঘনিষ্ঠ হয়ে।

"আমি মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অবিশ্বাস করছেন তো? হ্যাঁ, এখুনি দেখা করতে হবে। ওই হতভাগা কপিঞ্জল, আমাকে দূতের মতো দৌড় করাচ্ছে খালি। আচ্ছা, আমাকে দূতের মতো দেখাচ্ছে কি?"

এই বলে তিনি তাঁর চোখের উপর চোখ রাখলেন।

"আপনাকে পরীর মতো দেখাচ্ছে"—ধূর্জটিপ্রসাদ কবিত্ব করবার প্রয়াস পেলেন। রঞ্জাবতী হেসে উঠলেন এ কথায়।

"পরীর মতো? পরীরা কখনও ঘোড়ায় চড়ে আসে? আপনার কল্পনাটা একটু বেসামাল হয়ে পড়ল বোধহয় তাড়াতাড়িতে।"

"হতে পারে। আপনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন, সময় দিলেন কই! আসবার সময় আপনাকে স্মরণ করে আমরা পৈঠী পান করেছি, বার বার করেছি—সুন্দরী সুনয়নীকে ভুলিনি আমরা। সত্যি বলছি, আপনার চোখের মতো চোখ আমি একটিবার মাত্র দেখেছি কেবল আমাদের গ্রামে, তখন আমি টোলে পড়তাম। মেয়েটির নাম ছিল বৈদেহী। আপনার সঙ্গে তার অদ্ভুত মিল—"

"গাড়িতে আপনারা তাহলে বেশ ফুর্তি করতে করতে এসেছেন?"—রঞ্জাবতী মুখে হাতটা রেখে ছোট্ট হাই তুললেন।

"এসেছি। আড্ডা চমৎকার জমেছিল। কিন্তু মনে হয় কাল আমাদের মাত্রাটা একটু ছাড়িয়ে গিয়েছিল, মহারাজ মনে হয় একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিলেন। আজ সকালে সেইজন্যেই বোধহয় মেজাজটা ঠিক নেই। তবে সন্ধ্যে নাগাদ ঠিক হয়ে যাবে। এই যে এইটে দরজা—"

"দাঁড়ান—রঞ্জাবতী চুপি চুপি বললেন—"একটু দম নিয়েনি। না, না থামুন, এখন কপাটটা

খুলবেন না, আমার কিছু করার আছে।"

এই বলে তিনি যা করলেন তা অপ্রত্যাশিত। গান গেয়ে উঠলেন মিষ্টি গলায়। রোমাঞ্চিত হয়ে গেলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, তাঁর মনে হল যেন একটা বীণা বাজছে। গানের প্রথম কলি— আকাশ আবার ডাক দিয়েছে পাখিকে। গান শেষ করে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন একবার। তারপর বললেন—"এইবার খুলুন।" কপাট খুলে গেল। হরিণীর মতো চটুল দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলেন তিনি গন্ধরাজের কাছে, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অপরূপ জ্যোতি, মুখের ভাবে মূর্ত হল সদ্য-গাওয়া সংগীতের মধুর মূর্ছনা। নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রবেশ করলেন তিনি। কারারুদ্ধ বিমর্ষ গন্ধরাজের মনে হল মূর্তিমতী আলো এল যেন।

"এ কি! রঞ্জাবতী! তুমি এখানে!"

রঞ্জাবতী সেনাপতির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন। ভাবটা—আপনি একটু আড়ালে যান। সেনাপতি চলে যেতেই রঞ্জাবতী ছুটে গিয়ে কণ্ঠলগ্ন হলেন গন্ধরাজের।

"তোমাকে দেখতে এসেছি।"

কান্না ফুটে উঠল রঞ্জাবতীর কণ্ঠস্বরে। আরও জড়িয়ে ধরলেন তিনি গন্ধরাজকে।

কিন্তু গন্ধরাজ বিচলিত হলেন না। দৃঢ়পদেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জাবতীও সামলে নিলেন নিজেকে।

"আহা বেচারী, বেচারী। বস, এইখানে আমার পাশে এসে বস। সব বল আমাকে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কেমন লাগছে এখানে?"

রঞ্জাবতী কাল পর্যন্ত গন্ধরাজকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছেন। আজ হঠাৎ 'তুমি' বলতে তাঁর বাধছিল একটু। আড়চোখে গন্ধরাজের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। না, গন্ধরাজ এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। গন্ধরাজ তাঁর পাশে বসলেন। তাঁর বিমর্ষ ভাবটাও কেটে গেল।

"রঞ্জাবতী, তুমি যতক্ষণ আছ ততক্ষণ ভালোই লাগবে। কিন্তু তুমি তো এখনি চলে যাবে। ওখানকার খবর কি বল আগে। মনে হচ্ছে কাল তোমার পরামর্শ শোনাই উচিত ছিল আমার। শুনিনি বলে অনুতাপ হচ্ছে। আমার প্রতিরোধ করাই কর্তব্য ছিল। তুমি বার বার বলেছিলে। সত্যি তুমি বুদ্ধিমতী, সত্যি তুমি মহৎ, তোমার মতো হিতৈষী—"

"গন্ধরাজ আমার কথা বাদ দাও। আমার পক্ষে ওভাবে তোমাকে উৎসাহিত করা উচিত হয়েছিল কি? আমারও তো কর্তব্য আছে একটা। কিন্তু তোমাকে দেখলেই আমি সব কথা ভুলে যাই, সব কর্তব্য যেন উপে যায়।"

"আর আমার কর্তব্যবুদ্ধি পরে জাগে, তখন আর কিছু করবার থাকে না। এখন বুঝছি সত্যি, আমার প্রতিরোধ করা উচিত ছিল। এখন মনে হচ্ছে স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্যে আমি কি না দিতে পারি?"

"বল, কি দেবে তুমি?"—রঞ্জাবতী হেসে প্রশ্ন করলেন, তাঁর লাল পাখাটা আবার খুলে গেল মুখের সামনে, মনে হল তিনি যেন একটা দেওয়ালের ওপাশ থেকে উজ্জ্বল হাসি-ভরা দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন গন্ধরাজের দিকে।

"কি দেব? মানে? মনে হচ্ছে কোন খবর এনেছ তুমি—"

"খবর? হ্যাঁ তা খবর বলতে পার—"

গন্ধরাজ দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"ছলনা করো না রঞ্জাবতী। বল, কি খবর এনেছ। তুমি তো নিষ্ঠুর নও, আমি তোমাকে চিনি। কি দেব বলছিলে? কিছুই দেব না, এখন তো আমার কিছুই নেই, আমি এখন তোমার করুণা ভিক্ষা করতে পারি। আর কোনও ক্ষমতা নেই আমার।"

"ছি, ছি, ও কি কথা বলছ। না না এটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি তো আমার দুর্বলতা জান। ও কথা বলো না, তুমি মহারাজা, তোমার মহত্ত্ব বিসর্জন দিও না।"

"আমি আর মহারাজা নই রঞ্জাবতী, আমার মহত্ত্বও আর নেই। তুমি চিরকালই মহৎ, চিরকালই করুণাময়ী। তোমার সিংহাসন থেকে তোমাকে কেউ নামাতে পারেনি। তুমিই কৃপা কর আমাকে—"

তিনি রঞ্জাবতীর হাত দুটি ধরে সাগ্রহে চেয়ে রইলেন তাঁর চোখের দিকে। তারপর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, দু'একটা বিস্রস্ত অলক ঠিক করে দিলেন। রঞ্জাবতী খুব উপভোগ করতে লাগলেন এটা মনে মনে যদিও বাইরে ভান করতে লাগলেন যেন গন্ধরাজের এই মনোযোগে তিনি বিব্রত বোধ করছেন, শত্রু যেন দুর্গ আক্রমণ করেছে। অবশেষে হৃদয় বিগলিত হল তাঁর। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পটপট জামার বোতাম খুলে ফেলে বুকের ভিতর থেকে আদেশপত্রটা বার করে ছুঁড়ে দিলেন সেটা মেজের উপর।

"এই নাও। আমি জোর করে ওটা লিখিয়ে এনেছি। তোমার মুক্তির আদেশ। তুমি ওটা ব্যবহার করলে কিন্তু আমার ধ্বংস অনিবার্য। কপিঞ্জল আমাকে ক্ষমা করবে না। তাকে তো চেনো—"

মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, যেন উদগত অশ্রু গোপন করবার জন্যে।

গন্ধরাজ লাফিয়ে কাগজটা তুলে নিলেন। পড়লেন। তারপর বলে উঠলেন—"ও লিখে দিয়েছে? সত্যি? বিশ্বাস হচ্ছে না—"

আবেগভরে চুম্বন করতে লাগলেন কাগজটাকে।

রঞ্জাবতীর মনটা সত্যিই উদার, সত্যিই কোমল। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে তিনি থাকতে পারলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"অকৃতজ্ঞ! আমি জোর করে তাকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছি ওটা, এর জন্যে কপিঞ্জলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয়েছে আমাকে। আর তুমি তার জন্যে পাগল হয়ে উঠলে!"

"আমাকে দোষ দিও না রঞ্জাবতী। আমি তাকে ভালোবাসি।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আর আমি?"

"তুমি? তুমি আমার প্রিয়তমা, উদার-হৃদয়া, করুণাময়ী বান্ধবী।"

গন্ধরাজ এগিয়ে এলেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন—"তুমি যদি এমন রূপসী, এমন মনোরমা না হতে তাহলে তুমি আদর্শ বান্ধবী হতে পারতে। তোমার রসবোধ আছে, তোমার মোহিনীশক্তির ক্ষমতা যে কত তা তুমি জানো, যখন তোমার মরজি হয় তখন তুমি আমার দুর্বলতা নিয়ে খেলা করতেও ভালোবাস, আমিও কখনও কখনও সে খেলায় যোগ দিয়েছি। কিন্তু আজ সে নাটক হবে না। আজ আমাকে বিশ্বাসী শক্তসমর্থ পুরুষ বন্ধুর ভূমিকা নিতে

হবে, আজ যদি আমি ভুলে যাই যে তুমি রূপসী আর আমি দুর্বল তাহলে তুমি রাগ করতে পাবে না। আজ তোমাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত বন্ধুর মতো পেতে চাই রঞ্জাবতী, আমার এ অনুরোধ রাখ আজ—''

হাত বাড়িয়ে হেসে এগিয়ে গেলেন গন্ধরাজ। রঞ্জাবতীও সে হাতে নিজের হাত মেলালেন বেশ সপ্রতিভ হাসি হেসে।

বললেন, 'তুমি আমাকে জাদু করেছ গন্ধরাজ''—তারপর একটু হেসে—''আমি আমার অস্ত্র সংবরণ করছি এবং আমাকে এতে রাজী করতে পেরেছ বলে তোমাকে বাহবাও দিচ্ছি। কি চমৎকার করে গুছিয়ে তুমি কথাগুলো বললে! আমি যেমন রূপসী, তুমিও তেমনি নিপুণ—''

বলে অপরূপ ভঙ্গীভরে অভিবাদন করলেন তিনি।

গন্ধরাজও অভিবাদন করে বললেন—''আবার যদি তুমি অমন লোভনীয় হয়ে ওঠ তাহলে আমাদের চুক্তি টিকবে কি?''

''এই আমার শেষ তীর। এবার আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। খালি টোটা। গন্ধরাজ তুমি যদি এই কারাগার ছেড়ে চলে যাও—যেতে পার,—কিন্তু আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। কি করবে বল—''

ঠিক করে ফেলেছি, যাব। যদিও আমি গোবরগণেশ, তবু আমাকেই কর্তব্যের অনুরোধে যেতে হবে। একটা কর্তব্য করা হয়নি এখনও। কিন্তু ভয় নেই, তোমার সর্বনাশ হবে না। তুমিই আমাকে নিয়ে চল। ভালুকওলারা যেমন ভালুকের নাকে দড়ি পরিয়ে গলায় শিকল দিয়ে নিয়ে যায়—তেমনি করে তুমিও আমাকে নিয়ে চল কপিঞ্জলের কাছে। আমি সব হীনতা সহ্য করব আমার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য। আমাকে সে যা করতে বলবে তাই করব। তার সব দাবি মানব আমি, মহারাক্ষসের সব ক্ষুধা মেটাব। আর এর বাহাদুরি এবং গৌরব তুমি পাবে।''

''বেশ, রাজী! আর তুমি প্রিয়দর্শী গন্ধরাজ নও, তুমি এখন কর্তব্যপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের মহিমায় পরমপূজ্য মহাপুরুষ। চল এক্ষুনি তাহলে আমরা বেরিয়ে পড়ি। হ্যাঁ একটা কথা। ওই দলিলগুলো আমি তোমাকে ফেরত দিয়ে দিতে চাই। ওই খামার বাড়ি তুমিই পছন্দ করেছিলে, আমি তো দেখিও নি। তুমিই কীর্তিভূষণের উপকার করতে চেয়েছিলে, আমি তাকে চিনিও না। আর তাছাড়া''—একটু নিম্নকণ্ঠে হেসে বললেন—''আমি ভূমি-লক্ষ্মীর পুজোর মন্ত্র জানি না, আমি চিরকাল নগদ লক্ষ্মীরই উপাসিকা—''

দুজনেই জোরে হেসে উঠলেন।

''বেশ, আবার তাহলে আমি কৃষক হয়ে গেলাম''—দলিলগুলো হাত বাড়িয়ে নিলেন গন্ধরাজ—''কিন্তু ঋণে যে আমার মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে রইল।''

রঞ্জাবতী ঘণ্টা বাজাতেই ধূর্জটিপ্রসাদ এসে হাজির হলেন।

''সেনাপতি মশাই, আমি আপনার একজন কয়েদীকে নিয়ে উধাও হচ্ছি। আমাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়ে গেছে। এই দেখুন, মহারাণীর আদেশপত্র—''

যদিও প্রয়োজন ছিল না তবু ধূর্জটিপ্রসাদ একটি শৌখিন বিদেশী চশমা ব্যবহার করতেন। সেটি কায়দা করে নাকের উপর লাগিয়ে তিনি আদেশপত্রটি পড়লেন।

"মহারাণীর আদেশপত্র। ঠিক আছে। কিন্তু আগেকার আদেশপত্রে প্রধানমন্ত্রী কপিঞ্জল দেওয়েরও স্বাক্ষর ছিল—"

"তাঁরই জীবন্ত স্বাক্ষর হয়ে তো আমি এসেছি। তিনিই তো আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"ও বেশ, বেশ। আপনি সৌভাগ্যবতী, আমি হতভাগ্য এমন একজন লোকের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হলাম। এখন আপসোস করা ছাড়া আর উপায় কি? ইন্দীবর ভারতী অবশ্য রইলেন, তিনি বিরাট পণ্ডিত, নিজে ইচ্ছে করে যদি আমার নাগালের মধ্যে ধরা না দেন তাহলে আমি তাঁর পাত্তা পাব না।"

"হ্যাঁ, ইন্দীবরের সম্বন্ধে তো কোনো আদেশ নেই—"

"ভালোই তো। সেনাপতি মশাইকে একা থাকতে হবে না।"

"মহারাজ"—ধূর্জটিপ্রসাদ সাড়ম্বরে বললেন—"আশা করি আপনার এই স্বল্প কারাবাসের সময় আমি যথোচিত শ্রদ্ধাসহকারে আপনার মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছি। ইচ্ছে করেই আমি একটা আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। আমার মতে আনন্দময় পরিবেশ আর সুরা সব সময়েই সব দুঃখকষ্ট লাঘব করে দেয়।"

"সেনাপতি মশাই"—গন্ধরাজ হাত বাড়িয়ে দিলেন—"আপনার মধুর সঙ্গই যথেষ্ট ছিল, আর কিছুর প্রয়োজন ছিল না। আপনার চমৎকার স্বভাব, আর আপনার জীবনদর্শন মুগ্ধ করেছে আমাকে। শিক্ষাও দিয়েছে। আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে। আপনাকে একটা উপহার দিতে চাই, সামান্য স্মৃতি-চিহ্ন। এখানে বসে এই কারাগারের জানলার গরাদের দিকে চেয়ে চেয়ে আমি এইগুলো লিখেছি। আমি কবি নই, কারাগার কবিত্বের প্রেরণাও যোগায় না তবু বসে বসে কবিতাই লিখেছি। আপনি রাখুন এগুলো, আপনার কৌতূহলের খোরাক যোগাবে অন্তত—"

কাগজগুলো হাতে করে ধূর্জটিপ্রসাদের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি আবার শৌখিন চশমাটি নাকে লাগিয়ে পড়তে লাগলেন।

"বাঃ, চমৎকার ছন্দ তো! মালিনী কি? না, তা তো নয়। এ যে অনন্য একেবারে। আকাশ তোমার আলোর দূতের রামধনুরাঙা পোশাক হেরি হয়েছি মুগ্ধ আত্মহারা, কি বারতা তুমি পাঠায়েছ তাহা পশে কি কানে, তারপর এলো আলো-ঝলমল-লক্ষ তারা'—বাঃ, বা চমৎকার! শিরোধার্য করে নিলাম এই অমূল্য উপহার।"

"সেনাপতি মশাই কবিতাগুলো পরে পড়বেন"—বাধা দিলেন রঞ্জাবতী—"আগে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিন।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। ক্ষমা করবেন, কিন্তু এ কথা আমি বলতে বাধ্য আমি যে ধরনের লোক তাতে এই কবিতাগুলো, এদের অপূর্ব জন্মকথা, আমাকে সত্যিই বিচলিত করেছে। আপনাদের সঙ্গে কি কোনও লোক দেব?"

"না, দরকার নেই"—রঞ্জাবতীই উত্তর দিলেন—"আমরা হইচই করতে চাই না, ছদ্মবেশে যাব, যেমন এসেছিলাম। অমারা একসঙ্গে ঘোড়ায় যাব। গন্ধরাজ আমার চাকরের ঘোড়া নেবেন। আমরা তাড়াতাড়ি গোপনে সরে পড়তে চাই, এর বেশী আর কিছু দরকার নেই।"

তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন।

কিন্তু গন্ধরাজ ইন্দীবর ভারতীর কাছে বিদায় না নিয়ে যেতে পারলেন না। ধূর্জটিপ্রসাদ নাকে চশমা দিয়ে কবিতাগুলো পড়তে পড়তে তাঁর অনুসরণ করলেন, আর যাকে সামনে পেলেন তাকেই পড়ে শোনাতে লাগলেন সেগুলো। তাঁর উত্তেজনা ক্রমশ যেন বাড়তে লাগল। শেষে তিনি বললেন—"এগুলো পড়তে পড়তে আমার কালিদাসকে মনে পড়ছে। মেঘদূতের আকুলতা ফুটেছে কবিতাগুলোর ছত্রে ছত্রে।"

সব শেষ হল অবশেষে। গন্ধরাজ আর রঞ্জাবতী পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে। রঞ্জাবতীর চাকর দুটো ঘোড়া নিয়ে পিছু পিছু আসছিল। রৌদ্র আর সমীরণ, উড়ন্ত পাখির দল, সুদূরবিস্তৃত দিগন্ত তাঁদের ঘিরে যে পটভূমিকা সৃজন করছিল তা অবর্ণনীয়। চারিদিকের বনভূমি, পর্বতশিখরের গম্ভীর মহিমা, ঝরনা আর নদীর কলরোল তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল যেন। অনেক নীচে দেখা যাচ্ছিল বিরাট সবুজ যেন দিগ্বলয়ের বিরাট নীলে গিয়ে মিশছে।

তাঁরা কিছুক্ষণ নীরবেই হাঁটলেন। গন্ধরাজ তাঁর অপ্রত্যাশিত মুক্তির কথা ভেবে আর প্রকৃতির অনবদ্য রূপ দেখে আনন্দে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে ভাবছিলেন কপিঞ্জলের সঙ্গে দেখা হলে তাকে কি বলবেন। কিন্তু যখন উঁচু নীচু অমসৃণ রাস্তাটা শেষ হল, পাহাড়ের আড়ালে শূলপাণি যখন ঢাকা পড়ে গেল তখন রঞ্জাবতী দাঁড়ালেন।

"এখানে আমার চাকরটা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ুক। তুমি ওর ঘোড়াটা নাও। এস দুজনে মিলে উদ্দামগতিতে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যাই। মনোমত সঙ্গী পেলে ঘোড়া চড়তে এত ভালো লাগে!"

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে দেখা গেল নীচে ঢালু রাস্তাটার মোড়ে একটা গাড়ি ক্যাঁচ কোঁচ করতে করতে অতিকষ্টে চড়াই ভাঙছে। আর তার সামনে খাতা-হাতে একটি গম্ভীর প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে আসছেন।

"এ কি, ভগীরথ শর্মা দেখছি—"

গন্ধরাজ ডাকলেন তাঁকে। ভদ্রলোক খাতাটি পকেটে পুরে ফেলে খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন উপরের দিকে। তারপর ছড়ি নাড়লেন। গন্ধরাজ আর রঞ্জাবতী এগুতে লাগলেন তাঁর দিকে, তিনিও এঁদের কাছে আসবেন বলে চড়াই ভাঙতে লাগলেন লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে। তাঁরা যেখানে মিলিত হলেন সে জায়গাটা একটা কোণের মতো। সেখানে একটা ঝরনার ধারা মস্ত একটা পাথরকে ঘিরে ঘিরে নৃত্য করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাশের ঝোপে ভগীরথ শর্মা গন্ধরাজকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলেন। রঞ্জাবতীর দিকে চেয়ে তিনি মাথাটা একবার নোয়ালেন বটে, কিন্তু তাঁর নাকটা একটু কুঁচকে গেল, আর চোখের দৃষ্টিতে ফুটল একটু বিস্ময়।

রঞ্জাবতীকে সম্বোধন করেই প্রথমে কথা বললেন তিনি।

"আপনি কি খবরটা শোনেননি তাহলে?"

"কি খবর?"

"মস্ত খবর। গর্জনাগাঁওয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়ে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। রাজপ্রাসাদ ভস্মীভূত, মহারাণী পালিয়েছেন আর কপিঞ্জল আহত—"

"কপিঞ্জল আহত?"

"খুব। অত্যন্ত যন্ত্রণা পাচ্ছেন। তাঁর আর্তনাদ—"

রঞ্জাবতীর মুখ দিয়ে এমন একটা শপথবাক্য নির্গত হল যে অন্যসময়ে হলে এঁরা চমকে যেতেন তা শুনে। পরমুহূর্তেই তিনি ছুটে গেলেন তাঁর ঘোড়াটার কাছে, একলম্ফে তার পিঠে চড়ে আর কোন দিকে না চেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। চাকরটা সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েকমুহূর্ত, তারপর সেও অনুসরণ করল তাঁর। রঞ্জাবতীর এই ঝঞ্ঝাবৎ অর্ন্তধানের দাপটে ভগীরথ শর্মার গাড়ির ঘোড়াগুলো একটু ভড়কে গেল। রঞ্জাবতী কিন্তু থামলেন না—খটাখট্ খটাখট্ খটাখট্—তাঁর দ্রুতধাবমান অশ্বের ক্ষুরধ্বনি সচকিত করে তুলল গিরিপর্বত অরণ্যভূমিকে। তাঁর চাকর বৃথাই তার অশ্বকে বারংবার কশাঘাত করতে লাগল তাঁর নাগাল পাওয়ার জন্য। আর একটু নীচে আর একটি মেয়ে অতিকষ্টে চড়াই ভেঙে উপরে উঠছিল, সহসা রঞ্জাবতীর ঘোড়ার সামনে পড়ে চীৎকার করে সরে গেল সে। আর একটু হলে হয়তো মারা যেত। রঞ্জাবতী কিন্তু সেদিকে ফিরেও চাইলেন না। চড়াই উতরাই ভেঙে পাহাড় বনজঙ্গল অতিক্রম করে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছিলেন ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে।

"অদ্ভুত মেয়ে! কে বলবে ও একদিন লোকটাকে ভালোবাসত—"

গন্ধরাজ তাঁকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন আবেগভরে।

"আমার স্ত্রী! মহারাণী? তার খবর কি।"

"তিনি আসছেন। ওই বাঁকটার নীচেই আছেন। চড়াই ভাঙছেন। এই একটু আগে আমি তাঁকে ছেড়ে এসেছি।"

পরমুহূর্তেই বিস্মিত ভগীরথ একা দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে কারণ রঞ্জাবতীর মতো গন্ধরাজও ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন নীচের দিকে।

।। বাইশ।।

গন্ধরাজ দ্রুতবেগে ছুটছিলেন, তাঁর পা দুটো এগোচ্ছিল সবেগে,—কিন্তু তাঁর হৃদয়, যদিও তা প্রথমটা আরও দ্রুতবেগে এগিয়ে গিয়েছিল, ক্রমশ যেন পিছিয়ে পড়তে লাগল। সুরূপিণীর দুর্ভাগ্যে তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছিল, সুরূপিণীকে দেখবার জন্যেও তিনি আকুল হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু তবু অতীতের কথা স্মরণ করে, সুরূপিণীর কঠোর অবজ্ঞার কথা ভেবে তিনি যেন মনে জোর পাচ্ছিলেন না। তাঁর আত্মপ্রত্যয় কখনই সুদৃঢ় ছিল না. এখন তা যেন আরও শিথিল হতে লাগল। ভগীরথ শর্মার সব কথা যদি তিনি শেষ পর্যন্ত শুনতেন, অন্তত এটুকু যদি শুনতেন যে সুরূপিণী তাঁকে দেখবার জন্যেই শূলপাণির দিকে আসছেন পায়ে হেঁটে, তাহলে হয়তো তাঁর বুক ভরে উঠত। কিন্তু এখন তাঁর আবার মনে হল হয়তো তিনি তাঁর অবাঞ্ছিত মনোযোগ দিয়ে বিব্রত করে ফেলবেন তাকে, হয়তো এও তার মনে হবে যে তার দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে তাকে অনুকম্পা করতে এসেছেন তিনি, তার দুর্দশার সময় সেই সোহাগের পসরা নিয়ে এসেছেন যা সে তার মহিমার দিনে পদাঘাত করে সরিয়ে দিতে ইতস্তত করেনি। তাঁর আহত অহমিকার ক্ষতগুলো জ্বালা করে উঠল, রাগে তাঁর উদারতার

রংও যেন লাল হয়ে গেল। তিনি ক্ষমা করবেন নিশ্চয়ই, সাহায্যও করবেন, বাঁচাবার চেষ্টা করবেন, সান্ত্বনাও দেবেন সেই স্ত্রীকে যে তাঁকে ভালোবাসে না। সবই তিনি করবেন একটু দূর থেকে, স্ত্রীর ঔদাসীন্যকেও ক্ষমা করবেন তিনি, লোকে অবুঝ শিশুর সরলতাকে যেমন করে। তিনি যখন বাঁকটা ঘুরে সুরূপিণীকে দেখতে পেলেন তখন প্রথমেই তাঁর মনে হল তিনি প্রথমেই তাকে বুঝিয়ে বলবেন যে জোর করে নিজেকে তার উপর চাপিয়ে দিতে আসেননি। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। সুরূপিণী ছুটতে লাগল তাঁকে অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে দেখে। কিন্তু গন্ধরাজ দাঁড়িয়ে পড়তেই তিনিও দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে উঠে এলেন উপরে। গন্ধরাজের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"গন্ধ, আমি সব নষ্ট করে ফেলেছি। সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"সুরূপিণী"—গন্ধরাজের গলার কাছটা ব্যথা করতে লাগল, তিনি আর নড়তে পারলেন না, সুরূপিণীর বিস্রস্ত মলিন বেশবাশ দেখে, তার ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সুরূপিণী যদি চুপ করে থাকতেন তাহলে হয়তো পরমুহূর্তেই আলিঙ্গনাবদ্ধ হতেন তাঁরা। কিন্তু সুরূপিণী চুপ করে রইলেন না। দেখা হলে কি বলবেন তা তিনিও ভেবে এসেছিলেন। তিনি কথা কয়ে উঠলেন। মিলনের মুহূর্তটি হারিয়ে গেল।

"আর কিছু নেই"—সুরূপিণী বলতে লাগলেন—"সব নষ্ট করে ফেলেছি। গন্ধ দয়া করে তুমি আমার কথা শোন— আমি নিজের দোষ ঢাকব না, সব স্বীকার করব। শোন তুমি। আমাকে ওরা কি নিষ্ঠুর পথে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এখন আমি ভেবে দেখছি, ভাববার অনেক সময় পেয়েছি এখন। বুঝতে পারছি আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল ওরা, চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি সব। ভালোকে ত্যাগ করে আলোকে ফেলে আমি অন্ধকারে বাস করেছি এতদিন। কিন্তু স্বপ্ন যখন ভেঙে গেল, যখন বুঝতে পারলাম আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, যখন ভাবলাম আমি কপিঞ্জলকে"—একটু সামলে আবার বললেন—"যখন আমি ভাবলাম কপিঞ্জলকে মেরে ফেলেছি, তখন—তুমি যা লিখেছিলে তাই হল। আমার আর কেউ রইল না, আমি একা হয়ে পড়লাম।"

কপিঞ্জলের নাম শুনেই গন্ধরাজের মহানুভবতা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

"এসব যদি ঘটেই থাকে, তাহলে কার দোষ সেটা? আমার। তুমি আমাকে ভালোবাস আর না বাস আমার কি উচিত ছিল না তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা? কিন্তু আমি মন গুমরে বরাবর দূরে দূরে কাটিয়েছি, তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা না করে পালিয়ে যাওয়াটাই শ্রেয়ঃ মনে করেছি। ভালোবাসার যেটা আসল জিনিস—যুদ্ধ করে ঝগড়া করে নিজের দাবি সাব্যস্ত করা—সেটা আমি শিখিনি। আমি কেবল পালিয়ে বেড়িয়েছি। কিন্তু এইবার তো রাজত্বের প্রহসন শেষ হয়ে গেল, ভেঙে গেল রঙীন পুতুলটা, হয়তো আমার অক্ষমতার জন্যে, কিংবা তোমার ছেলেমানুষির জন্যে—যে জন্যেই হোক, শেষ হয়ে গেছে সব—এখন আমরা দুজনে পথে দাঁড়িয়েছি—স্ত্রী আর পুরুষ এই এখন আমাদের সত্য পরিচয়। আমি তোমাকে মিনতি করছি সুরূপিণী তুমি আমার দুর্বলতাকে ক্ষমা কর, নির্ভর কর আমার ভালবাসার উপর। আমাকে ভুল বুঝো না"—সুরূপিণী কথা কইতে যাচ্ছিলেন হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তিনি তাঁকে— "শোন আগে সবটা। আমার ভালোবাসার চেহারা বদলে গেছে। দাম্পত্যের কোনও

প্রসাধন আর তার অঙ্গে নেই। এ ভালোবাসা এখন আর কিছু প্রত্যাশা করে না, কোনও দাবি করে না, প্রতিদানে কিছু চায় না। এতদিন আমার মধ্যে যা তোমার এতো খারাপ লেগেছে তা আর থাকবে না, সে কথা ভুলে যাও তুমি—আজ তোমাকে যা দিচ্ছি তাতে কোনও খাদ নেই, তা ভাইয়ের ভালবাসা, স্বামীর নয়।"

"গন্ধ, আমি জানি তুমি মহৎ। এও জানি তোমার ভালোবাসার আমি উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি যা দিচ্ছ তা আমি নিতে পারব না। তার চেয়ে আমাকে ত্যাগ কর তুমি, আমার কপালে যা হবার তাই হোক। তুমি যাও, আমাকে ছেড়ে চলে যাও তুমি—"

"না। আগে আমাদের ওই ভীমরুলের চাকের কাছ থেকে পালাতে হবে। ওখানে আমিই তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে আমি ছেড়ে যেতে পারি না, তোমাকে চিরকাল রক্ষা করব এ অঙ্গীকারের কথা আমি ভুলব কি করে! আমরা গরীব হয়ে গেছি ঠিক, কিন্তু মাথা গোঁজবার একটা জায়গা এখনও আমাদের আছে। এখান থেকে কিছুদূরে গর্জগাঁওয়ের সীমার বাইরে আমার নিজের একটা বাড়ি আছে। চল সেইখানে নিয়ে যাই তোমাকে। মহারাজা গন্ধরাজের পতন হয়েছে, দেখা যাক শিকারী গন্ধরাজ এবার কি করতে পারে। এস। অতীতকে ভুলে যাও, আমার দোষের কথা আর মনে রেখো না। আমাদের নূতন ঘরে নূতন হাসি ফুটিয়ে তোল এবার। তুমি তো কতবার বলেছ মহারাজা আর স্বামী হিসেবে আমি তোমার মনোমত না হলেও মানুষ হিসেবে আমি খুব খারাপ লোক নই। মহারাজা আর স্বামীর রাজত্ব তো শেষ হয়ে গেল। এখন আমি মহারাজাও নই, স্বামীও নই, এবার হয়তো আমাকে তোমার ভালো লাগবে। চল যাই। গর্জনগাঁওয়ের এলাকায় থাকলে ওরা হয়তো আবার আমাদের বন্দী করে ফেলবে। তার চেয়ে চল নিজের ঘরে চলে যাই। তুমি হাঁটতে পারবে কি? পারবে? তাহলে চল—"

গন্ধরাজ পথ দেখিয়ে আগে আগে চললেন।

তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার একটু নীচেই একটি পাহাড়ী নদী বইছিল রাস্তার নীচে দিয়ে। রাস্তাটা সেতুর মতো তার উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এই কলস্বরা নদীর তীর থেকে একটি ছোট পায়ে-চলা পথ নেমে গিয়েছিল নীচের সবুজ উপত্যকায়। পথটা এবড়ো-খেবড়ো, পাথরে ঢাকা, আর বড্ড বেশী ঢালু, তার উপর কাঁটাগাছে ভরতি। খানিকটা পথ অবশ্য সমতল। চারিদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে জল ঝরছিল আর সে জল নদীটিতে এসে পড়ছিল বলে নদীটি ক্রমশ স্ফীতকায়া আর বেগবতী হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে একটা বড় জলাশয়ে পড়ছিল অবশেষে। সেখানে থেকে বেরিয়েও নানা বিচিত্র গতিতে নানা আশ্চর্য ছবি সৃষ্টি করতে করতে এগিয়ে চলেছিল সে । পাহাড়ের খানায় খন্দে, পাথরে, কাঁকরে, গহ্বরে গুহায় প্রবেশ করে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চলেছিল যেন। দুই তীরে নানা ভঙ্গীতে নানারকম গাছের শোভা, অসংখ্য ফুলের, অসংখ্য লতার, অসংখ্য পতঙ্গ পক্ষীর বিচিত্র দৃশ্য। এরই মধ্যে দিয়ে তীর্থযাত্রীর মতো তাঁরা নীচে নামছিলেন—আগে গন্ধরাজ, আর তাঁর পিছু পিছু সুরূপিণী। যেখানে রাস্তাটা বেশী ঢালু, সেখানে গন্ধরাজ দাঁড়াচ্ছিলেন সুরূপিণীকে হাত ধরে আস্তে আস্তে নামিয়ে দেবার জন্য। লক্ষ্য করছিলেন সুরূপিণীর চোখে নূতন আলো জ্বলছে, যে দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখছেন তা যেন আরতির প্রদীপ। তিনি লক্ষ্য করছিলেন কিন্তু

সাহস করে তার মর্মটা উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। মনে মনে বলছিলেন—"ও তো আমাকে ভালোবাসে না। এটা হয়তো দুঃখের পরে কৃতজ্ঞতা। আমি যদি ভদ্রলোক হই, সাধারণ মনুষ্যত্ব যদি আমার থাকে তাহলে এ অবস্থায় অন্য কোন চিন্তাই আমার করা উচিত নয়।"

আরও কিছুদুর নেমে দেখা গেল নদীটি আরও বড় হয়েছে, কিন্তু তার গতিকে রোধ করেছে একটি বাঁধ। নদীর স্রোতকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছে একটা কাঠের তৈরী খালে। সেই খালের ভিতর দিয়েই মহানন্দে বয়ে চলেছে নদী, সেই খালের দুপাশও সবুজ হয়ে উঠেছে তার স্নিগ্ধ স্পর্শে। এই খালের ধার দিয়ে দিয়ে পথটিও চলছিল ঝোপঝাড়ের পাশে পাশে। একটু পরেই বাদামী রঙের জল-চালিত কলটি দেখা গেল। তারপরই কলের বড় বড় চাকা আর চাকাকে কেন্দ্র করে মথিত জলরাশির অপূর্ব দৃশ্য। চারিদিকে হীরে ছিটকে পড়ছে যেন। এখানে উপত্যকাটি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এরপরেই কাঠ চেরার শব্দ পাওয়া গেল। মনে হল করাতরা বুঝি গান গাইছে।

পায়ের শব্দ শুনে কলের মালিক কপাট খুলে বেরিয়ে এলেন। তিনি এবং গন্ধরাজ দুজনেই চমকে উঠলেন। টকটকে লাল মুখ, পুরু ঠোঁট লোকটার।

"নমস্কার"—গন্ধরাজ বললেন—"আপনার কথাই ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল। আপনাকে আমিই খবরটা দিচ্ছি, আপনি পার্বতীতে চলে যান। আমি সিংহাসনচ্যুত হয়েছি—, মহা হইচই হয়েছে এ নিয়ে—আপনার বন্ধুরাই এখন রাজত্ব করছেন সেখানে।"

আশ্চর্য হয়ে গেল কলের মালিক।

"আর মহারাজ আপনি—"

"মহারাজ এখন পালাচ্ছেন ভৈরঙ্গীর দিকে—"

"গর্জনগাঁও ছেড়ে? আপনি কি আপনার পিতার পুত্র নন? না, এ হতে পারে না।"

"আপনি কি তাহলে বন্দী করতে চান আমদের?"

"আপনাকে বন্দী করব? আমি? আপনি আমাকে কি মনে করেন! গর্জনগাঁওয়ের একটি লোকও আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করবে না। আপনাকে ভালোবাসে না এমন লোক কেউ নেই।"

"অনেক আছে, অনেক আছে"—গন্ধরাজ হাসলেন—"আমি যখন মহারাজা ছিলাম তখন আপনি আমার মুখের উপর অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। এখন চাকা ঘুরে গেছে, এখন আমার দুঃখের দিনে হয়তো আপনার কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে আমাকে—"

কলের মালিকের মুখ আরও লাল হয়ে উঠল।

"আপনি যা খুশি বলতে পারেন! আপনারা দুজন আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলে আমি কৃতার্থ হবে। আসুন—"

"না, সময় নেই আমাদের। তবে আপনি আমাদের যদি এখানে একপাত্র করে যাহোকে কিছু খাওয়াতে পারেন তাহলে উপকৃত হব, খুশীও হব--"

আরও লাল হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে একটা কলসীতে কিছু সুরা আর তিনটি স্ফটিকের পাত্র নিয়ে এলেন। পাত্রে মদ ঢালতে ঢালতে বললেন—"মহারাজ

যেন মনে করবেন না, আমি রোজ মদ খাই। আপনার সঙ্গে সেবার যেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল সেদিন অবশ্য মাত্রা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাধারণত আমি বেশী খাই না, বিশ্বাস করুন এটা। আপনাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্যেই এখন খাচ্ছি একটু—"

পাহাড়ী ভব্যতার রীতি অনুযায়ী সসম্ভ্রমে মদের পাত্রে চুমুক দিলেন তাঁরা। গন্ধরাজ আর থাকতে চাইলেন না। উপত্যকার ঢালু রাস্তা বেয়ে আবার নামতে শুরু করলেন তাঁরা। সংকীণ উপত্যকা বিস্তৃত হল ক্রমশ, দীর্ঘ তরুশ্রেণী আবার দেখা দিল।

"ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছিলাম আমি"— গন্ধরাজ বললেন—"ওঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে যখন দেখা হয়েছিল তখন একটু অপমানই করেছিলাম ওঁকে। দোষটা আমারই ছিল হয়তো! কিন্তু মনে হচ্ছে নিজেকে নত করে শেষ পর্যন্ত কোনও লাভ হয় কি?"

সুরূপিণী উত্তর দিলেন—"কিন্তু সে শিক্ষাটা প্রয়োজন।"

"তা বটে তা বটে"—গন্ধরাজ একটু বিব্রত বোধ করলেন—"তা বটে। কিন্তু এখন আমাদের নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন। ওই কলের মালিকটি ভদ্রলোক, কিন্তু ওঁর উপর ঠিক বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না, উনি গণতন্ত্রের পাণ্ডা একজন। এই নদীর ধার দিয়ে দিয়ে যদি আমরা আরও এগিয়ে যাই—নদীটা অবশ্য অনেক এঁকেবেঁকে গেছে—কিন্তু এর ধার দিয়ে দিয়ে গেলেই আমরা স্বস্থানে পৌঁছে যাব। এই উপত্যকার উপরের দিকে একটা লম্বালম্বি খালের মতো আছে। সেটা পার হলেই, ব্যাস্—নিথর নির্জনতা। হরিণরা পর্যন্ত সেখানে যেতে ভয় পায়। তোমার ক্লান্ত লাগছে না তো, অতদূর যেতে পারবে এখন?"

"পথটা দেখাও, আমি ঠিক পারব।"

কথাটা শুনে অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন গন্ধরাজ।

"না। আমি বলছিলাম পথটা বড্ড উঁচুনীচু, ওই ছোট ছোট উপত্যকার ভিতর দিয়ে দিয়ে। মাঝে মাঝে গর্তও আছে, গর্তের ভিতর কাঁটার জঙ্গল—"

"চল না তুমি। তুমি শিকারী না?"

ঝোপঝাড় পেরিয়ে আবার হাঁটতে লাগলেন তাঁরা। একটু পরেই সবুজ নির্জন মাঠের মতো জায়গায় এসে পড়লেন। চমৎকার জায়গাটি। লম্বা লম্বা গাছ দিয়ে ঘেরা। গন্ধরাজ দাঁড়িয়ে পড়লেন, দেখতে লাগলেন চারিদিক চেয়ে চেয়ে, আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল মনটা। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন সুরূপিণীও দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তিনিও চেয়ে দেখছেন গন্ধরাজের দিকে। আরণ্য পটভূমিকায় কি যে চমৎকার দেখাচ্ছে, কি যে রহস্যময় ভাষা ফুটেছে চোখ দুটিতে। মানসিক এবং দৈহিক দুর্বলতায় সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে এল গন্ধরাজের, মনে হল এইখানেই হাত পা ছড়িয়ে বসলে কেমন হয়। নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি সুরূপিণীর দিকে।

"এস, এখানে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক"—একটা ছোট্ট ঢিপির পাশে সুরূপিণীর হাত ধরে জোর করে বসিয়ে দিলেন। নিজেও বসলেন।

সুরূপিণীর চোখের দৃষ্টি আনত হল, তিনি ঘাড় ফিরিয়ে ঘাস ছিঁড়তে লাগলেন, উৎকর্ণ হয়ে রইলেন প্রেমের ডাক এইবার আসবে কি? বনে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল বাতাস মাতালের মতো, কখনও কাছে আসছিল, কখনও দূরে সরে যাচ্ছিল। কাছের একটা ঝোপ থেকে ভেসে এল একটা সচকিত পাখির ত্রস্ত ডাক। কি যেন একটা হবে, তারই প্রস্তুতি যেন

চারিদিকে। গন্ধরাজের মনে হল তিনি এবার কি বলবেন তাই শোনবার জন্যে সমস্ত প্রকৃতি যেন অপেক্ষা করছে। কিন্তু তবু আত্মসম্মান যেন তাঁর মুখ চেপে রইল। যতই তিনি সুরূপিণীকে—ছিন্নলতার মতো বিস্রস্তা বিবর্ণা ওই মেয়েটিকে দেখতে লাগলেন—ততই যেন তাঁর পক্ষে কথা বলা ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর আত্মসম্মান, তাঁর অহঙ্কারের সঙ্গে মনের নেপথ্যে নীরবে লড়তে লাগল ওই অসহায় মেয়েটাই।

"সুরূপিণী—" অবশেষে কথা ফুটল গন্ধরাজের মুখে। একটু ইতস্তত করে ঢোঁক গিলে বললেন—"সুরূপিণী, আমি তোমাকে"—বলতে যাচ্ছিলেন, 'কখনও সন্দেহ করিনি'। কিন্তু সেটা কি সত্যি কথা? আর সত্যি হলেও সেটা কি এখন বলা উচিত? আবার নীরব হয়ে গেলেন।

"বল, কি বলছিলে। থেমে গেলে কেন।"

"বলছিলাম, আমি সব বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি তোমার কোনও দোষ নেই। বুঝতে পেরেছি আমার মতো দুর্বল লোকের প্রতি তোমার মতো সবলার আচরণ এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। কোন কোন ব্যাপারে তোমার হয়তো ভুল হয়েছিল, কিন্তু কেন হয়েছিল, তা-ও আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি। বুঝেওছি। আমার আর ক্ষমা করবার কিছু নেই, আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

"আমি জানি আমি কি করেছি"—সুরূপিণী উত্তর দিলেন—"আমি এত নির্বোধ নই যে কথায় আমি ভুলে যাব। আমি কি করেছি, কি ছিলাম তা আমি স্পষ্ট জানি। তোমার রাগের উপযুক্ত আমি নই, ক্ষমার তো নইই। এই পতন আর দুর্দশার অন্ধকারে আমি কেবল আমাকে দেখতে পাচ্ছি আর তোমাকে। তুমি চিরকাল যেমন ছিলে সেই তোমাকে, আর আমি যেমন ছিলাম সেই আমাকে। আমি আমাকেই দেখছি কেবল, আর কিছু ভাবতে পারছি না।"

"তাহলে এস আমাদের ভূমিকা বদলে ফেলি"—গন্ধরাজ বললেন—"অপরকে যখন আমরা ক্ষমা করতে পারি না তখন আসলে আমরা নিজেদেরই ক্ষমা করতে পারি না—কাল রাত্রে একজন বন্ধু বলেছিলেন আমাকে। তাঁর কথা শুনে আমি নিজেকেও ক্ষমা করেছি আমার শতদোষ থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না? তুমি নিজেকেও ক্ষমা কর, আমাকেও।"

সুরূপিণী কোন উত্তর দিলেন না, হাতটা বাড়িয়ে দিলেন কেবল।

গন্ধরাজের মুঠোর মধ্যে ভীরু আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। অদৃশ্য স্রোতে ভাষাহীন আকুতি মূর্ত হয়ে উঠল দুজনের মধ্যে।

"সুরূপিণী, অতীতকে ভুলে যাও একেবারে। আমি তোমাকে এখন সেবা করি, সাহায্য করি। মীরা বলেছিলেন তাঁর প্রিয়তমকে—ম্যঁয় নে চাকর রাখো জি। তুমিও আমাকে তোমার চাকর করে রাখ। তোমার কাছে থেকে তোমাকে সেবা করতে পেলেই আমি কৃতার্থ হয়ে যাব। আমাকে তাড়িয়ে দিও না। তোমার ভালোবাসা আমি নাই বা পেলাম, আমার একার ভালোবাসাই যথেষ্ট—"

"গন্ধ......."

সুরূপিণী আর কিছু বলতে পারলেন না। গন্ধরাজ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন—

আনন্দে, ভালোবাসায়, বেদনায় তা যেন বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। তাঁর সর্বাঙ্গ, বিশেষ করে চোখের দৃষ্টিতে যে মহিমা ফুটে উঠেছে তা প্রেমের মহিমা।

"সুরূপিণী"—হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন গন্ধরাজ। তার পর অন্য সুরে বললেন—"সুরূপিণী? সুরু—"

"চারিদিকে চেয়ে দেখ, প্রতিটি গাছে নতুন পাতা বেরিয়েছে, নতুন ফুল ফুটেছে। এইখানেই আমাদের দেখা হল, প্রথম দেখা হল, সব ভুলে গিয়ে নতুন জগতে জন্মালাম আমরা। পাপের আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বিস্মৃতির গহ্বরে ভগবানের পদপ্রান্তে—"

"তাই হোক সুরূপিণী। দুঃস্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাক বিগত জীবনটা। আবার নতুন করে শুরু করি, অচেনার মতো। আমি এতকাল স্বপ্ন দেখেছি—দীর্ঘ একটা স্বপ্ন, যেন আমি এক রূপসী নিষ্ঠুরা মেয়েকে পুজো করছি, সে সব বিষয়ে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বরফের মতো কঠিন আর ঠাণ্ডা সে। তারপরও আমি স্বপ্ন দেখেছি, তারপরও ভেবেছি—বরফ গলছে, সে বদলাচ্ছে, অরুণ কিরণ এসে পড়েছে তার উপর, সে তার উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন আমার দিকে ফিরিয়েছে। কিন্তু আমি তো অযোগ্য—ভালোবাসা ছাড়া আর তো আমার কিছু নেই—সাষ্টাঙ্গ-প্রণত প্রেমই আমার একমাত্র সম্বল—তাই আমি ভয়ে নড়িনি, পাছে স্বপ্নটা ভেঙে যায়—"

"আমার আরও কাছে ঘেঁষে এস—"

সুরূপিণীর কণ্ঠস্বরে কাঁপন লাগল, বীণার মূর্ছনার মতো শোনাল তা। বনভূমিতে বসন্তের সমারোহ শুরু হয়েছে।

পার্বতীতেও ঠিক সেই সময় নতুন গণতন্ত্রের প্রথম বৈঠক বসল।*

*আর এল স্টিভেন্‌সন প্রণীত 'প্রিন্স অটো' নামক উপন্যাসের ভাবানুবাদ।

অগ্নি

।। এক ।।

অংশুমান স্বপ্ন দেখছে। দিবাস্বপ্ন। জেলে বসে বসে। দেশের জন্য জেলে এসেছে। একখানা বই পড়তে পেয়েছে—ইলেক্‌ট্রিসিটির ইতিহাস। সেইটে কেন্দ্র করেই স্বপ্ন জাগছে নানা রঙের। দেশের অন্তরার, রূপকথার। মন উড়ে চলেছে জেলের প্রাচীর ভেদ করে দূরদূরান্তে, অতীতে ভবিষ্যতে আশা-আকাঙ্ক্ষার কল্পলোকে।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাব, ডাক শুনতে পেয়েছি, যাচ্ছি....।" সে চলেছে। অনাদি অনন্ত অতীত থেকে অনাদি অনন্ত ভবিষ্যের দিকে অন্তহীন প্রবাহে। তার চলার বেগ, তার আগ্রহ, তার গতি-ব্যাকুলতা যুগে যুগে উতলা করেছে মানুষকে। মানুষ বোঝেনি ঠিক। বিস্মিত হয়েছে, অনুসন্ধান করেছে। আজও করছে।

চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে ফিরে থাকে অহরহ। কেন? যীশুখ্রীস্টের জন্মের অনেক আগে বৈজ্ঞানিক জন্মেছে। সত্য আলেয়ার পিছনে ছুটে চলেছে অবিরাম।

চীন দেশের নাবিকেরা সমুদ্র-লঙ্ঘন করছে চুম্বকের সাহায্যে। গ্রীসের হোমার, থেলিস, পাইথাগোরাস, ইউরিপিডিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল—সকলেরই ধ্যানভঙ্গ হয়েছে মাঝে মাঝে চুম্বকের টানে। লুক্রেটিয়াস, সিসেরো অবাক্ হয়েছে চুম্বকের কাণ্ড দেখে।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই উদ্দেশে চলেছি...." এ কথার অর্থ কিন্তু বোঝেনি তখনও কেউ। বোঝেনি, কিন্তু তার গতি-বেগকে কাজে লাগাতেও ছাড়েনি।

একজন চীন-সম্রাট বিধ্বস্ত করছেন তাঁর প্রতিপক্ষকে চুম্বকের সাহায্যে দিক নির্ণয় করে। চলেছে ক্রুজেডাররা ধর্ম-যুদ্ধ করতে। যুদ্ধের অবসরে আহরণ করছে চুম্বক-তত্ত্ব শত্রুপক্ষ আরবদের কাছ থেকেই।... গ্রীসের ওরেক্‌ল্‌কে নিয়ন্ত্রিত করছে চুম্বক।..... কে রাজা হবে ঠিক করছে শূন্যে অবস্থিত চুম্বকের আংটি টেবিলের উপর বিছানো বর্ণমালার উপর ঘুরে ঘুরে।

রেশমের কাপড় দিয়ে তৃণমণিকে (Amber) ঘষলে তৃণমণি নানাবিধ হালকা জিনিসের টুকরো আর্কষণ করে। কেন? সুদূর অতীতে প্রাচীন গ্রীসে সবিস্ময়ে মানুষ ভাবছে, নিশ্চয় ওদের মধ্যেও আত্মা আছে। সুপ্ত আত্মা ঘর্ষণে জেগে ওঠে। তৃণমণি আর চুম্বকে দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে পুজো করছে কেউ কেউ। বিস্মিত মানবের জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা সত্য সন্ধান করে চলেছে তবু। ধার্মিক ধর্ম-তত্ত্ব ভুলে সবিস্ময়ে ভাবছেন। পাদ্রি নিমগ্ন হয়েছেন চুম্বকের গবেষণায়।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, ডাক শুনতে পেয়েছি আমি, যাচ্ছি...." তার গতির স্পন্দন আকুল করে তুলেছে মানুষকে। নানা বিজ্ঞানীর মনে নানা অর্থ বহন করছে। অর্থ অর্থান্তরে পরিণত হচ্ছে। যুগ যুগান্তরে।

রাণী এলিজাবেথের ডাক্তার তিনি। অর্থোপার্জনের দিকে তাঁর মন নেই। ডাক্তারির দিকেও

না। রুটির জন্যে ওসব করতে হয়, তাই করা। তাঁর সমস্ত মন পড়ে আছে চুম্বকের দিকে। চুম্বকেরই নানা তথ্য খুঁজছেন, ভাবছেন, লিখছেন। চুম্বক আর বিদ্যুৎ.....কি এরা? একই জিনিসের বিভিন্ন প্রকাশ নয়তো? হয়তো....হয়তো....। সারাজীবন কেটে গেল প্রমাণ সংগ্রহ করতে। হঠাৎ মারা গেলেন একদিন। প্লেগে।

সে চলেছে।

শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, মেঘ-মেদুর অম্বর, অন্ধকার রাত্রি, ছায়াছন্ন বনভূমি, সমস্ত তুচ্ছ করে রাধা যখন অভিসারে চলেছিলেন, নিকুঞ্জগৃহে অপেক্ষমান পীতবসন বনমালী ছাড়া কিছুই যখন তাঁর চেতনা-গোচর ছিল না, নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুম্—সেই বাঁশী ছাড়া আর কিছুই যখন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না, তখন নিখিল বিশ্বও কি রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেনি? আকাশে বাতাসে চন্দ্রে তারায় শিহরন কি লাগেনি? কবির মনে জাগেনি কি স্বপ্ন? সেদিনকার স্বপ্ন-প্রবাহই কি আকুল করেনি পরবর্তী যুগের চণ্ডীদাস জয়দেবকে?

তার গতির ছন্দও স্বপ্ন জাগিয়েছিল।

বেতার-বার্তার স্বপ্ন দেখেছিলেন কেউ কেউ সে যুগেও।

অক্ষ-সংলগ্ন বিরাট এক গন্ধক-গোলক বস্ত্রঘর্ষণে বিদুতায়িত হয়ে উঠেছে। সশব্দে খানিকটা আলো ছিটকে পড়ল। বিস্ময়ে চমকে উঠলেন আবিষ্কারক। যন্ত্র-যোগে প্রথম বিদ্যুৎস্ফুরণ।

"যাচ্ছি....যাচ্ছি....যাচ্ছি...."

অপরা-তড়িৎ কেবলই মিলতে চায় পরা-তড়িতের সঙ্গে।

রহস্য-লোকে আলোকপাত হতে লাগল ক্রমশ। টোয়াইন সুতো দিয়ে পরীক্ষা করে চমকে গেলেন একজন। সুতো বেয়েও বিদ্যুতের তরঙ্গ চলে। সাত শো পয়ষট্টি ফিট দূরেও বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখতে পেলেন তিনি। কৌতূহল জাগল, মানুষের শরীরের ভিতর দিয়েও এর গতিবিধি আছে নাকি? ছোট ছেলেদের উঁচুতে ঝুলিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন, তাদের শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করে কি না! ছোট ছেলেরা তাঁকে দেখলেই পালাত। মুরগী নিয়ে পড়লেন শেষটা। সারাজীবন ধরে হাতড়ে গেছেন। রহস্যের পর রহস্য, নিত্য নূতন রহস্য। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়েও বলছেন, টুকে নাও, টুকে নাও। অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু পেয়েছি, প্রকাশ করে যেতে পারলাম না। টুকে নাও—শিগ্গির—। বলতে বলতেই অন্তিম নিশ্বাস পড়ল।

এল আবার নূতন মানুষ। বাজল নূতন সুর তার কানে। চোখে ফুটল নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী। দু রকম বিদ্যুৎ আছে—এক রকম কাচ থেকে হয়, আর এক রকম রজন থেকে।

চুম্বক, বিদ্যুৎ—কি এরা? সুপ্ত আত্মা? দেবতার প্রকাশ? অশ্রুতিগোচর সুর কিন্তু বাজতেই লাগল—"যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাবই?"

শুনতে পেলে না কেউ। বিচলিত হল তবু নানাভাবে।

কৃষ্ণের বাঁশি বাজে, তবু যেতে পারে না রাধা। জটিলা কুটিলা আয়ান ঘোষ। রাজপ্রাসাদে বসে কাঁদে জাহানারা। নূরমহলের চামেলীকুঞ্জে বর্ষা নেমেছে। সমস্ত অন্তর গলে পড়ছে যেন। "দুলেরা, দুলেরা, কোথা তুমি? আমরা জলাশয়, তোমরা মরাল। কেন দূরে সরে আছ এখনও?" জাহানারা কাঁদে, কিন্তু যেতে পারে না। বাধা দুস্তর। জাহানারা পাতশাহ্ বেগম, দুলেরা সামান্য গায়ক মাত্র। সব বাধা অতিক্রম করা যায় না।

...সব জিনিস বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়—আবিষ্কার করলেন একজন।

দেখা যায়, কিন্তু দেখা যায় না। কাছে আসে, কিন্তু থাকে না। বাসনালোলুপ মানুষের চিত্ত উন্মুখ হয়ে ওঠে। বাসনার বহ্নিতে ইন্ধন যোগায় বুদ্ধি। চিরকাল যুগিয়েছে।

ঘোড়া গরু কুকুর হরিণ পাখি বনচর জলচর খেচর—সমস্ত কিছু উৎসুক করেছিল একদিন মানব-মনীষাকে। এদেরও দেখা যেত, কিন্তু রাখা যেত না। কাছে আসত, কিন্তু ধরা দিত না। মানুষ ফাঁদ পাততে শিখল। খাদ্যের লোভে, সঙ্গীর লোভে, অসংখ্য অদৃশ্য প্রবৃত্তির অমোঘ তাড়নায় দলে দলে ধরা পড়ল প্রলুব্ধ পশুর দল। আয়ত্তাতীত ছিল যারা, আয়ত্তাধীন হল। বন্য মানব সভ্য হল। বন্যপশুর দল ঢুকল এসে মানবনির্মিত পশুশালায়। গড়ে উঠল কৃষিসভ্যতা।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি..."

সেও যেতে চায়। সুযোগ পেলেই চলে যায়। সুযোগ পায় না কিন্তু সব সময়ে। কাচ বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়। কাচের কারাগারে বন্দী করলে পালাতে পারে না সে। মানুষ পশুশালা তৈরি করেছিল, হারেম তৈরি করেছিল, লিডেন জারও করলে। কাচের কারাগারে বন্দী হল সে। হঠাৎ অংশুমানের মনে হল, অন্তরাও তো বন্দী হয়ে আছে বিরাট একটা সামাজিক লিডেন জারে।

প্রথম লিডেন জারে আবিষ্কারক প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন। ধাক্কা দিয়ে পালিয়েছিল সে। প্রথম বন্দিনী মানবীও হয়তো প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় তার প্রথম অপহারককে। বন্য মানবীর মনে কি প্রেম ছিল না? সে কি কুক্কুরীর মত বলিষ্ঠতমের কাছেই আত্মসমর্পণ করত জৈবিক প্রেরণায়? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। বরং এই কথাই ভাবতে ইচ্ছে করে, আজও যেমন সে প্রেমে পড়ে, তখনও পড়ত। বিচার-বুদ্ধির মানদণ্ডকে অগ্রাহ্য করে অকারণে তার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হয়ে উঠত একটি বিশেষ মানুষের জন্য। সে সুন্দর বলে নয়, ধনী বলে নয়, বলিষ্ঠ বলে নয়—সে সে বলে। তার বিশেষ একটি রূপ বিশেষ করে তার চোখেই পড়েছিল বলে।

অন্তরা কি দেখেছিল তার মধ্যে? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অংশুমান। মনে হল, একটা সত্যের আভাস পেয়েছে সে। জেলে এই একটি মাত্র বই পেয়েছে সে পড়বার জন্যে। খবরের কাগজও আসে—ইংরেজ সম্পাদিত দৈনিক একখানা। এই বইটাই কিন্তু পেয়ে বসেছে তাকে। এর মধ্যেই অভিনব কল্পনার খোরাক পেয়েছে সে। প্রেমের আকর্ষণই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ পৃথিবীতে। অপরা-তড়িৎ পরা-তড়িতেব দিকে ছুটে চলেছে কিসের আকর্ষণ? প্রেমের? কে জানে!

খবরের কাগজ দিয়ে গেল। ইলেকৃট্রিসিটির ইতিহাস মুড়ে রেখে খবরের কাগজখানা খুললে সে। মিনিট খানেক পরে হঠাৎ তার গালে ঠাস করে চড় মারলে কে যেন একটা। খবরের কাগজটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে দিলে সে। না, খবরের কাগজ সে পড়বে না। মিথ্যেয় ভরতি।

"ও খবরের কাগজ পড়বে না? শোন তবে। তুমি চোর, তোমার বাবা চোর, তোমার চৌদ্দ পুরুষ চোর। এদের জুতো-পায়ের ধুলো মাথায় পড়াতে তবে তোমরা উদ্ধার হয়েছ। তুমি পাজি, তোমার বাবা পাজি, তোমার চৌদ্দ পুরুষ পাজি। এদের সংস্পর্শে এসে তবে তোমরা ভদ্র হয়েছ। তুমি মূর্খ, তোমার বাবা মূর্খ, তোমার চৌদ্দ পুরুষ মূর্খ। এদের কাছে লেখাপড়া শিখে তবে তোমরা মানুষ হয়েছ...

তারস্বরে চিৎকার করছে কানের কাছে। নির্বাক হয়ে শুনে যেতে হচ্ছে। হাত পা মুখ সব বাঁধা। চিৎকার করছে নিজের লোকেরাই—নিজের বাবা, নিজের ভাই, নিজের বন্ধু। কেউ চিৎকার করছে চরিত্র-ভ্রষ্ট হয়েছে বলে, কেউ চাবুকের চোটে, কেউ বকশিশের লোভে। চিৎকার করে চলেছে দিনরাত। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত কোথাও বাদ নেই। তুমুল চিৎকার...বিরাট চিৎকার... চাবুকের চোটে চিৎকার করছে..., বকশিশের লোভে...

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। উঃ, কি দারুণ দুঃস্বপ্ন! চোখ চেয়ে দেখলে একবার, চারিদিকে অন্ধকার। চোখ বুজে পাশ ফিরে শুল। ঘুম আসছে না। তার সমস্ত চিত্ত জুড়ে একটি কথাই জাগছে সারা দিন ধরে। বিজ্ঞানের এত আবিষ্কার শুধু কি মানব-পশুর পাশবিক শক্তিকে বাড়াবার জন্যেই? প্রেম নয়, হিংসাই কি তার পরিণতি? অন্তরার মুখখানা মনের মধ্যে ফুটে উঠল আবার। লজ্জিত হল একটু।

"আমার আবিষ্কারের আসল সত্যটা তো তুমি জান।" চমকে উঠল অংশুমান। একটি হাস্যদীপ্ত মুখ চেয়ে আছে তার দিকে। তীক্ষ্ণ নাসা, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, প্রশস্ত ললাট। মাথার সামনের দিকে টাক। ভয় পেয়ে গেল সে।

কে আপনি?

আমি গ্যাল্ভানি। তুমি কষ্ট পাচ্ছ, তাই তোমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছি। ভালোবেসেছ, তার জন্যে লজ্জা কি? ভালোবাসাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। আমি ভালোবেসেছিলাম বলেই অতবড় আবিষ্কারটা করে ফেলতে পারলাম। স্ত্রীর জন্যে নিজের হাতে যদি ব্যাঙের ঝোল রাঁধতে না যেতাম, তা হলে হয়তো কিছুই হত না...

আর একজন এসে দাঁড়ালেন।

ঠিক বলেছ। বিয়ে না করলে আমিও হয়তো বৈজ্ঞানিক হতাম না। মাদামোয়াজেল জুলিকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম বলেই উপার্জনের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক হতে হল। তা না হলে হয়তো ল্যাটিন কবিতা নিয়েই মেতে থাকতাম সারা জীবন...

একটু মুচকি হেসে গ্যালভ্যানি চলে গেলেন। অংশুমান বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল দ্বিতীয় লোকটির মুখের দিকে। একমাথা কোঁকড়ানো বড় বড় চুল। বড় বড় নীল চোখে প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি। বলিষ্ঠ নাক, পুরু ঠোঁট। প্রকাণ্ড কলারওলা বুক-খোলা জামা গায়ে। গলায় একটা মাফলার জড়ানো।

আপনি...?

আমি অ্যাল্পিয়র। আমাদের জীবন-চরিত নিয়ে তন্ময় হয়ে আলোচনা করছ তুমি, তাই একটা সাড়া পড়ে গেছে আমাদের মধ্যে। আমরা অনেকেই আসব তোমার কাছে। ভয় পেয়ো

না। তার পর একটু হেসে বললেন, ভয় পাবার ছেলে অবশ্য তুমি নও। যা কাণ্ড করেছ! কাণ্ডটা যে কত ভয়ানক তা আমার অজানা নেই. ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের মধ্যে আমি মানুষ। কিন্তু হ্যাঁ, যে কথাটা বলতে এসেছিলাম, তুমি যা ভেবেছিলে আজ, যেটাকে সত্যের আভাস বলে মনে হচ্ছিল তোমার, সেটা বেশ নতুন কথা, হয়তো সত্য কথাই।

'হয়তো' বলছেন কেন?

সত্যের নানা মূর্তি—কোন্‌টা ঠিক তা কি করে বলব? এই দেখ না, ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনকে প্রথমে সত্যের বড় একটা প্রকাশ বলে মনে হয়েছিল আমার, কিন্তু তারা যখন আমার বাবাকে কেটে ফেললে, তখন আমি মুষড়ে গেলাম। সত্যের চেহারা গেল বদলে। হোরেসের 'ওড টু লিসিনিয়াস' তখন একমাত্র সত্য বলে মনে হতে লাগল, তার জোরেই বেঁচে উঠলাম আবার। আসল কথা কি জান, যেটাকে সত্য বলে মনে হচ্ছে, সেইটেকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাক, যতক্ষণ না সেটা মিথ্যায় রূপান্তরিত হয়।

চোখ দুটো হাসিতে জ্বলজ্বল করতে লাগল। অকস্মাৎ অন্ধকার মিলিয়ে গেলেন তিনি। অংশুমান প্রথমে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু ভয় কেটে গেল তার। মনে পড়ল, ঠাকুমা একদিন দেখা দিয়েছিলেন তাকে স্কুলে টিফিনের সময়। পরলোক আছে। মানুষ মরে না, কেউ মরে না।

সোৎসাহে বিছানায় উঠে বসল সে। চতুর্দিকে অন্ধকার। অন্ধকারের দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে রইল। দেখতে পেল, অন্ধকারের বুক চিরে বিরাট একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রসারিত হয়ে রয়েছে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। সেই প্রদীপ্ত ক্ষুরধার আলোক-রেখা ধরে চলেছে অসংখ্য নরনারীর জ্যোতির্ময় মিছিল।

।। দুই।।

বাইরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ নির্মেঘ। অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলছে। সহস্রপাদ সহস্রাশীর্ষ সহস্রাক্ষ পুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জ্বলছে যেন অনন্তকালের অগ্নিদীপ্ত ইতিহাস। মাঠের মাঝখানে বটগাছটাকে ঘিরে খাদ্যোৎকুল শুরু করেছে অগ্ন্যুৎসব। গাঢ় তমিস্রা ভেদ করে পেচকের কর্কশ রব প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, তা সঙ্গীতে রূপান্তরিত হল পেচকীর কর্ণে। অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর রাত্রি গম্ভীর। সাবধানসঞ্চরণে চলেছে শ্বাপদ, তস্কর, যোগী, ভোগী, দৃশ্য অদৃশ্য অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য উদ্দেশ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে। আকাশের অগ্নি মর্ত্যের মৃত্তিকায় নেমে লীলায়িত হয়েছে নব নব রূপে নব নব প্রেরণায়। অন্ধকার পুরীর রহস্যালোকে রূপায়িত হচ্ছে চিরন্তন স্বপ্ন।

রোজ যেমন হয়।

।। তিন।।

প্রতিদিনের মত তার পরদিনেও যথারীতি জেরা শুরু হয়ে গেল। সি. আই. ডি. দারোগাটি বিনয়ের অবতার। একমুখ হেসে পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে একসঙ্গে গোটা চারেক

পান মুখে পুরে ফেললেন। তার পর ডিবেটি অংশুমানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন, আসুন।

আমি নেব না। ধন্যবাদ।

আজও নেবেন না?

অংশুমান চুপ করে রইল।

দারোগা সাহেব তর্জনীতে খানিকটা চুন লাগিয়ে নীচের দাঁত দিয়ে সেটা কুরে তুলে নিলেন। জরদা খেলেন একটু। তার পর উঠে জানলা দিয়ে পিক ফেললেন একবার।

আপনি গোড়া থেকেই একটা ভুল করছেন অংশুমানবাবু। আপনি ধরে নিয়েছেন যে, আমরা আপনার শত্রুপক্ষ। গভর্মেণ্ট আপনার শত্রু হতে পারে, আপনারা নিজেরাই শত্রুতা করছেন তার সঙ্গে; কিন্তু আমরা আপনার শত্রু নই, অন্তত আমি নই। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি, যাতে আপনাদের সুবিধে হয়।

হাস্যদীপ্ত চক্ষু মেলে চেয়ে রইলেন।

অংশুমান নীরব।

আপনার সঙ্গে আর কে কে ছিল—এই খবরটুকু পেলেই আপনাকে ছেড়ে দেব আমরা। আপনি যে নির্দোষ সে খবর আমরা পেয়েছি। কিন্তু দোষীকেও তো ধরতে হবে। আপনি সে বিষয়ে একটু সাহায্য করুন আমাদের শুধু। সেইজন্যেই আপনাকে আটকে রাখা। নাম কটা বলে দিন, ব্যাস্।

আমি তো বলেছি, আমি কিছু জানি না।

দেখুন, ও-সব কথা বলে ভোলাতে পারবেন না আমাদের। আপনি যে জানেন তা আমরা জানি।

অংশুমান চুপ করে রইল।

আপনি শিক্ষিত লোক, আপনার অন্তত আইনকে সাহায্য করা উচিত। সমাজকে রক্ষা করবার জন্যেই তো আইন, আপনার অন্তত সে আইনের মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য। একজন লোককে নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ন্যায়ত হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়া আপনারও কর্তব্য নয় কি? জাস্টিস বলে একটা জিনিস আছে তো!

হঠাৎ গ্রীক দার্শনিকের কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার। লিস্‌ন্ দেন, আই প্রোক্লেম দ্যাট মাইট ইজ রাইট অ্যাণ্ড জাস্টিস ইজ দি ইন্টারেস্ট অফ দি স্ট্রঙ্গার...। সঙ্গে সঙ্গে অর্ধদগ্ধ ডেপুটিটার মুখখানাও মনে পড়ল। হাত-পা-মুখ বেঁধে টাঙিয়ে পোড়ানো হয়েছিল তাকে পায়ের দিক থেকে। তার সেই ঠিকরে-বেরিয়ে-আসা লাল বড় চোখ দুটো এখনও যেন চেয়ে আছে তার দিকে। তারও তো মা বউ ছেলে মেয়ে আছে! তারা কি করছে এখন? তাদের দুঃখে মনটা দ্রবীভূত হচ্ছিল। কিন্তু বহু অসহায় আর্ত নারীকণ্ঠের চিৎকার আবার বেজে উঠল কানে সহসা।...দলে দলে পাঠান-সৈন্য ঘরে ঘরে ঢুকে নারী-ধর্ষণ করছে ওই ডেপুটিটার হুকুমে।

একমুখ হেসে দারোগাবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, বেশ, না হয় ধরেই নিলাম, আপনি কিছু জানেন না। আপনি কাকে সন্দেহ করেন তাও বলুন অন্তত।

অংশুমান প্রস্তরমূর্তিবৎ বসে রইল, কোন উত্তর দিলে না।

।। চার।।

জেলের বাইরে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের উপর বিশাল একটা শিরীষ গাছ। তার উঁচু ডালে বসে একটা দাঁড়কাক একটানা ডেকে চলেছে কা--কা--কা--কা--কা...। আর একটি ডালে পাশাপাশি বসে আছে একজোড়া ঘুঘু। স্তিমিত-নয়ন নির্বিকার একটি ঘুঘু হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে বসল, ঘাড় বেঁকিয়ে ঠোঁট দিয়ে পিঠ চুলকোতে লাগল। শিরীষগাছের পত্রপুঞ্জে ফুটেছে মরকত-মণির আভা। কাছেই ছোট্ট এক টুকরো ঢালু জমি অপরূপ হয়ে উঠেছে নবদুর্বাদলশ্যাম কান্তিতে। খঞ্জন-দম্পতি মনের আনন্দে চরে বেড়াচ্ছে তার উপরে। তাদের লঘুচপল গতি, পুচ্ছের আন্দোলন নিঃশব্দ ছন্দে স্পন্দিত করছে পারিপার্শ্বিককে। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের স্বর্ণকান্তি সমুদ্ভাসিত। দ্বিপ্রহরের উগ্র জ্যোতিতে চকচক করছে বেঅনেটের ডগাটা। জেলের গেটে খাকী পোশাক পরে নিঃশব্দে পদচারণ করছে পাঠান প্রহরী।

।। পাঁচ।।

অপমানে সমস্ত চিত্ত অবসন্ন, হতাশার লক্ষ কণ্টকে বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমাকীর্ণ। তবু সেই কণ্টকবনে ফুল ফুটে রয়েছে একটি। অম্লান কুসুম। অন্তরা।

অন্তরাকে ভালবেসেছিলাম কেন--ভাবছিল অংশুমান। ভালবাসার অর্থ কি? কুসুমের কানে কানে মধুকরের যে গুঞ্জন, কমলকোরকের সুপ্ত পাপড়িতে সূর্যালোকের যে জাগরণমন্ত্র, তাই কি ভালবাসা? লজ্জাবতীর মত স্পর্শকাতর, সূর্যমুখীর মত উন্মুখ, আলোকের মত স্বচ্ছ, অন্ধকারের মত নিবিড় কি এ? সহসা তার মনে হল, অন্তরাকে ভালবেসে কি অন্যায় করেছি, অবনত করেছি নিজেকে? যে ভালবাসাকে কোনদিন বিবাহের বন্ধনে বাঁধা যাবে না, যা অসামাজিক, অযৌক্তিক, অহেতুক...। অহেতুক? হঠাৎ মনে হল! অন্তরার সমস্ত মূর্তিটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মানসপটে। ওই তন্বী স্বর্ণলতা, ওকে ভালবাসার হেতু নেই কোনও? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অংশুমান।... নিশীথ রজনীর তারাভরা আকাশ...দিগন্ত-বিস্তৃত পল্লীপ্রান্তরে ইন্দ্রধনুশোভিত ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘপুঞ্জ...বিশাল সাগরের অগণিত ঊর্মিশিখরে অনাবিল জ্যোৎস্না লাস্য-লীলা... ছবির পর ছবি জাগতে লাগল মনে।

সহসা মনে হল, সহসা যেন দেখতে পেল সে, দান্তে ছুটে চলেছে বিয়াত্রিচের পিছনে পিছনে নরক পর্যন্ত। নরক...? হ্যাঁ, নরকই তো। ভালবাসা কি মানুষকে নরকগামী করে? ভাবতে লাগল সে। আমি যা ভোগ করছি এও তো নরক-যন্ত্রণা! অন্তরার জন্যেই তো কারাবরণ করেছি। অন্তরার চক্ষে নিজেকে বীর প্রতিপন্ন করবার জন্যেই তো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এই পাশবিক ঘূর্ণাবর্তে। তার কাছে আস্ফালন করেছিলাম নিজের পৌরুষ-মর্যাদা, সমস্ত ভবিষ্যৎ ভাসিয়ে দিয়ে। প্রদীপ্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে দেখেছিল। কোন মন্তব্য করেনি, কোন উৎসাহ দেয়নি, কিন্তু তার মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছিল তাই যথেষ্ট ছিল আমার পক্ষে। তাকে খুশি করবার জন্যে, তার হৃদয় হরণ করবার জন্যেই জীবনমরণ তুচ্ছ করে মেতে উঠেছিলাম আমি। তার স্মিত হাসি, মৌন জয়ধ্বনি পুরস্কৃত করেছিল আমাকে। ধন্য হয়েছিলাম... কিন্তু তার পরিণাম কি নরকযন্ত্রণা ভোগ করা? এই অন্ধকার ঘরটায় একা কাটাতে হবে দিনের পর দিন, কতদিন কে

জানে। পরক্ষণেই মনে হল, ওই বিয়াত্রিচের প্রেমই দান্তেকে স্বর্গেও নিয়ে গিয়েছিল শেষে।...রুমঝুম রুমঝুম রুমঝুম...মধুর নূপুররবে অন্ধকার ছন্দিত হয়ে উঠল সহসা।

কে?

আমি বেহুলা। দেবসভায় নৃত্য করছি মৃত স্বামীর গলিত দেহে প্রাণ-সঞ্চার করবার জন্যে।

সব থেমে গেল আবার। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অংশুমান। অনেকক্ষণ বসে রইল। যখন সচেতন হল, তখন তার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ। অন্তরা...অন্তরা... অন্তরা...। পরিপূর্ণ চিত্ত-সাগরের প্রত্যেক ঊর্মিটিই অন্তরা, কিন্তু সাগরের অন্তস্তলে স্রোত বইছে। প্রশ্নের, সন্দেহের। অর্থ কি এ ভালোবাসার? বহুর মধ্যে এককে, নির্বিশেষের মধ্যে বিশেষকে এমনভাবে আবিষ্কার করলাম কেন? অন্তরার মধ্যে যে এত মাধুর্য আছে, তা আমার চোখেই ধরা পড়ল কোন্ মন্ত্রে? অর্থ কি এ আবিষ্কারের...

আবিষ্কারের অর্থ বড় রহস্যময়।

ঘাড় ফিরিয়ে অংশুমান দেখলে, অন্ধকার আলোকিত হয়েছে খানিকটা। একটি মুখ ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। গোঁফদাড়ি নেই। অতিশয় শুচিস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি। চোখাচোখি হতেই সুমিষ্ট হাসি হেসে বললেন, আমি অরস্টেড। তার পর চুপ করে রইলেন।

নীরবতা ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে। অরস্টেডের দৃষ্টি থেকে একটা নীরব সান্ত্বনা ক্ষরিত হচ্ছিল যেন। মনে হচ্ছিল, একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নির্মম পেষণে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে, এর জন্যে তিনিই যেন দায়ী, এমনই একটা ভাব ফুটে উঠছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। অংশুমানেব দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললেন, আবিষ্কারের কাহিনী বড় রহস্যময়। তার দায়িত্ব বা কৃতিত্ব কারও প্রাপ্য নয়। শিশু যখন আবিষ্কার করে যে, মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ আছে, তখন তার কৃতিত্ব কতটুকু! আবিষ্কার করেই বা সে কি করে, কে বলে দেয় তাকে?

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, যে আবিষ্কারের জন্যে আমার এত নাম, তাতে আমার কৃতিত্ব যে কতটুকু তা তো জানই। আমার চোখে পড়েছিল। আমি লেকচার দিচ্ছিলাম, একটা কয়েলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছিল, কাছেই ছিল একটা ম্যাগ্নেটিক নিড্ল। হঠাৎ সেটা নড়ে উঠল, হঠাৎ আমার চোখে পড়ে গেল। প্রথমটা পড়েনি, কিন্তু যতবারই কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেল, ততবারই নড়ল সেটা। কেউ যেন আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। বিজ্ঞান-জগতে যেটা যুগান্তকারী আবিষ্কার, সেটা একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র। তার জন্যে আমি দায়ী হতে পারি না—না না কিছুতেই।

আর্তনাদ করে উঠলেন যেন, তার পর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর্তনাদটা মনে মনে উপভোগ করলে অংশুমান। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে ঘনিয়ে এল বিষাদের ছায়া। তার আবিষ্কারটা তো আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। সে যেচে গিয়ে আলাপ করেছিল। অন্তরার চোখে মুখে কি যেন একটা ছিল। কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করতে পারেনি সে। যদিও তার সামনে একটা কথাও বলতে পারত না, কিন্তু দুর্নিবার আকর্ষণে যেতে হত তাকে প্রত্যহ। তার চোখে নিজেকে বৃহৎ প্রতিপন্ন করবার দুর্নিবার প্রলোভনেই সে...

বাজে চিন্তা করে অকারণ শক্তি ক্ষয় করছ।

এলেন আর একজন। একমাথা ঝাঁকড়া কটা চুল। চমৎকার চোখ দুটি। নাক তীক্ষ্ণ।

অকারণে শক্তি ক্ষয় করছ। তোমার প্রণয়িনীর জন্যে তুমি দেশের কাজে নামনি, ওটা বাজে কথা, স্রেফ বাজে কথা। দেশই তোমার বরাবর লক্ষ্য, প্রণয়িনীটা উপলক্ষ্য মাত্র। প্রণয়িনীই যদি তোমার লক্ষ্য হত, তা হলে তুমি পাঁচিল টপকাতে, ডেপুটি পোড়াতে যেতে না।

একটা চাপা হাসি উঁকি দিচ্ছিল চোখ দুটি থেকে, কিন্তু নিমেষে সেটাকে অবলুপ্ত করে ফুটে উঠল অনুযোগমিশ্রিত ভর্ৎসনা।

কক্ষনোও যেতে না। মানুষের জীবনের আসল লক্ষ্য কি অর্থাৎ কোন্ রাস্তায় গেলে তার আত্মা সত্যিই পরিতৃপ্ত হয়, তা প্রথমটা সে বুঝতে পারে না। লেখক ডাক্তার হয়, কবি ব্যবসা করতে যায়, দেশপ্রেমিক নারীপ্রেমে কিংবা যশের নেশায় মশগুল হয়ে পড়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে স্বখাতে ফিরে আসতে হয় বাজে বন্যাগুলো সরে গেলে। এই দেখ না, আমি সোল্‌জার হব বলে মেতেছিলাম...

একটু হেসে তারপর বললেন, না মেতে উপায়ও ছিল। সোল্‌জার হওয়াটাই তখনকার দিনে ফ্যাশান ছিল যে। ফ্যাশান জিনিসটা হাম-জ্বরের মত, ওর কবল এড়ানো শক্ত। কিন্তু পলিটেক্‌নিকের পরীক্ষায় পাস না করলে সেকালে সোল্‌জার হওয়া যেত না। সেই পরীক্ষা দিতে হলে অঙ্ক শিখতে হত। অঙ্ক নিয়ে মাতলাম। সেই যে মাতলাম, ব্যাস্। ওরা দেখলে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো বৃথা। পাঠালে অব্‌জার্‌ভেটরিতে। বিওর সঙ্গে ভাব হল। গ্যাসের রিফ্র্যাক্‌টিং প্রপার্টি নিয়ে পড়লাম। তার পর মেরিডিওনাল মেজার্‌মেণ্ট। পিরেনিজ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে...তুমি তো সব জানই।

একটু চুপ করে আর একটু হেসে বললেন, না, জান না, নিদারুণ শীতে পিরেনিজ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে যখন ভৌগোলিক সঙ্কেত করেছিলাম, তখন আমার কষ্ট হয়নি, আনন্দ হয়েছিল— আমার জীবনচরিতকার সে কথাটা লেখেনি। তার পর পাহাড় থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে স্প্যানিয়ার্ডরা আমাকে স্পাই ভেবে যখন তাড়া করেছিল, তখনও আমার ভয় হয়নি, অদ্ভুত একটা আনন্দ হচ্ছিল, এমন কি বেল্‌ভার ক্যাস্‌লে পালিয়ে এসে সেই ভণ্ড পাদ্রিটার পাল্লায় পড়লাম যখন, যিনি আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলেন, তখনও আমার রাগ হয়নি, মজা লাগছিল। আমার মনের মধ্যে অফুরন্ত নির্ভীক যে আনন্দের ভাণ্ডার ছিল, সে খবর আমার জীবনচরিত থেকে পাওনি তুমি। ওইটে ছিল বলেই কাবু করতে পারেনি আমাকে। বিপদ তো কম হয়নি, সবই তো পড়েছ! পাদ্রির কাছ থেকে পালিয়ে পেয়ে গেলাম একখানা অ্যাল্‌জেরিয়ান জাহাজ, কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই পড়লাম আবার একদল স্প্যানিয়ার্ড জলদস্যুর হাতে। তারা আমাকে বন্দী করে নিয়ে এল স্পেনে। প্রথমে রাখলে একটা উইণ্ডমিলে, তার পর একটা জাহাজের খোলে, প্রায় তোমারই মত অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু দমিনি। ওদেরই একজনের সঙ্গে ভাব করে ফেললাম। হ্যাঁ ওইটি চাই, দরকার হলে শত্রুপক্ষের সঙ্গেও ভাব করা চাই। শত্রুপক্ষের মধ্যেও ভাব করবার মত লোক পাওয়া যায় বইকি। আমি যে লোকটার সঙ্গে ভাব করেছিলাম, সে অতি চমৎকার লোক। এত চমৎকার যে, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে আমায় ছাড়িয়ে নিলে, তার পর টিকিট করে তুলে দিলে একটা জাহাজে। কিন্তু কপাল ছিল মন্দ, ঝড় উঠল। আমাদের জাহাজকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে একেবারে আফ্রিকায়। সেখানে আবার স্প্যানিয়ার্ড। কিন্তু এবার ব্যাটারা নিজেদের মধ্যেই এমন মারামারি শুরু করে দিলে যে,

আমি পালাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে ছ মাস পরে দেশে ফিরি। এত কাণ্ড করেও কিন্তু সোলজার হলাম না, কিছুই হলাম না, শেষ পর্যন্ত আমাকে ইলেক্‌ট্রিসিটি আর ম্যাগনিটিজ্‌ম্‌ নিয়ে পড়তে হল। কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌ল নড়ে উঠছে কেন—অরস্টেডের এই আবিষ্কার পেয়ে বসল আমাকে। যতক্ষণ না বার করলাম যে, কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে কয়েলটাই ম্যাগ্‌নেট হয়ে যায়, ততক্ষণ আমার শান্তি ছিল না। কিন্তু বার করবার পর কি আনন্দ! তাই ভাবছি, আনন্দটাই আসল জিনিস, ওটা না থাকলে কিছু হয় না। আমার কিন্তু সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছিল অরোরা বোরিয়ালিস আর ম্যাগ্‌নেটিক স্টর্মের সম্পর্ক আবিষ্কার করে, মানে, হল কি...

অংশুমান সবিস্ময়ে শুনছিল।

আপনি কি আরোগা?

প্রশ্ন শুনে থমকে গেলেন আরোগা। পর মুহূর্তেই চটে গেলেন কথায় বাধা পড়াতে।—আমি কে তা নিয়ে কি দরকার, যা বলছি শোন না। আনন্দটিই আসল জিনিস, ওইটে না থাকলে তলিয়ে যাবে। তুমি ওই যে একটা থিয়োরি খাড়া করে মন গুমরে বসে আছ যে, অন্তরার জন্যেই এত কাণ্ড করেছ, ওটা একদম বাজে কথা। যা তোমার আনন্দকে ম্লান করছে, জানবে তা বাজে জিনিস—বিষবৎ পরিত্যাগ করবে সেটা। তা ছাড়া সত্যিই ওটা বাজে কথা। অন্তরা হয়তো তোমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে—আমি যেমন সোল্‌জার হতে চেয়েছিলাম; কিন্তু দেশই তোমার—

তুমি বড্ড বেশি বকবক করছ। ঘুমুতে দাও না বেচারীকে একটু।—আর একজন এসে দাঁড়ালেন আরোগার পাশে। প্রশস্ত ললাট, সামনের দিকে টাক থাকাতে আরও প্রশস্ত দেখাচ্ছে। মাথার পিছনে ছোট ছোট কাঁচা-পাকা চুল। কাটা কাটা নাক মুখ চোখ। বলিষ্ঠ চেহারা। কিন্তু সমস্ত মুখে বিনীত ভদ্রতা যেন মাখানো।

ঘুমুবে? এর মধ্যেই? এই তো সবে দশটা বেজেছে। অংশুমানের দিকে চেয়ে আরোগা প্রশ্ন করলেন, এঁকে চেনো? তার পর নিজেই উত্তর দিলেন, ইনি স্টার্জন। হ্যাঁ, সেই মুচির ছেলে। এঁরই বাপ কেবল মাছ ধরে আর পাখি শিকার করে বেড়াতেন, তাও চুরি করে। পোচিং! ইনিও আর্মিতে ঢুকে কুড়ি বছর কামান দেগেছিলেন। কিন্তু কিচ্ছু হয়নি। হল একদিন, বিরাট এক ঝড় উঠে। বজ্রের গর্জন শুনে আর বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে তাক লেগে গেল ভদ্রলোকের। কামান দাগার অবসরে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে হল। প্রথমে গ্রীক ল্যাটিন অঙ্ক, তার পর ইলেক্‌ট্রিসিটি ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌। শেষ পর্যন্ত ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট তৈরি করতে হল।

না না, আমি—

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন স্টার্জন। তার পর সামলে নিয়ে বললেন, এস, চল যাই। ও ঘুমুক এখন—

এই কুনো স্বভাবের জন্যেই তুমি মরেছ। তোমার কীর্তিটা লোকে জানতে পারলে না ভাল করে। ওদিকে আমেরিকায় হেনরির জয়জয়কার। আচ্ছা, হেনরি কোথা গেল বল তো? তারও যে আসবার কথা ছিল! আসবে বোধ হয় এখুনি, দাঁড়াও না একটু, বেশ জমানো যাক সবাই মিলে।

না, চল, যাই আমরা।

হেনরির সামনে দাঁড়াতে লজ্জা করছে বুঝি? আমি বলছি, ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটের কীর্তি

তোমারই প্রাপ্য, হেনরির নয়। হেনরিও সে কথা স্বীকার করবে। তার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার আছে তোমার, লজ্জা কি?

আরোগার চোখের দৃষ্টিতে চাপা কৌতুক ফুটে উঠল।

কি যে বলছ, লজ্জা কিসের! তা ছাড়া আমার প্রাপ্য তো আমি পেয়েছি।

কি পেয়েছ?

একটা রূপোর মেডেল। ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট তৈরি করে বিক্রিও করেছি অনেকগুলো। লেক্‌চারার হয়েছিলাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়েছিলাম, আবার কি চাই?

চোখ মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ। যাঁকে লাজুক বলে মনে হচ্ছিল, দেখা গেল, তিনি বেশ সপ্রতিভ।

অংশুমান আর থাকতে পারলে না।

আচ্ছা, একটা কথা কি আপনাদের কখনও মনে হয়নি, নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটি পজিটিভের দিকে যায় কেন?

যায় কেন? যায় বলেই যায়, যাওয়াই নিয়ম।—ভ্রূযুগল উত্তোলন করে আরোগা বললেন।

স্টার্জন ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন।

কেন এমন নিয়ম হল?

আরোগা 'শ্রাগ' করলেন। তার পর স্টার্জনের দিকে ফিরে বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছ, এর ঘুমোনো দরকার এখন।

অংশুমানকে বললেন, ঘুমোও তুমি। আর যে কথাটা বলতে এসেছিলাম, সেই কথাটা মনে রেখো,—দেশই তোমার আসল প্রেরণা, অন্তরা নয়। একটা বাজে চিন্তা করে মুষড়ে পড়বার দরকার নেই। চললাম। গুড্ নাইট্।

চলে গেলেন দুজনেই।

অংশুমানের ঘুম এল না। চোখ বুজে সে শুয়ে রইল চুপ করে। নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার চতুর্দিকে। তার পর ধীরে ধীরে গুঞ্জনধ্বনি উঠল। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি.......তোমারই দিকে চলেছি অক্লান্ত গতিতে...সত্য পথে...সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে...."

কে—কে তুমি?

চিৎকার করে উঠে বসল অংশুমান। কোন উত্তর এল না। হঠাৎ সে দেখতে পেলে, অসংখ্য উজ্জ্বল খদ্যোতপুঞ্জ উড়ে চলেছে অজানা অন্ধকারের দিকে অশ্রান্ত গতিতে তমিস্রাকে তুচ্ছ করে। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। চলেছে অন্তহীন প্রবাহে জ্যোতির বুদ্বুদমালা। কে ওরা...কি ওরা...? চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। চেষ্টা করতে লাগল ঘুমোবার। ঘুম কিন্তু এল না। বার বার মনে হতে লাগল, সত্যিই কি অন্তরা উপলক্ষ্য মাত্র, দেশই আসল লক্ষ্য....

দুইই এক।

অংশুমান চোখ খুলে দেখলে, আবার দুজন পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখেই চিনতে পারলে, দুজনেরই ছবি অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল সে আজ সকালে। হেনরি আর ফ্যারাডে।

ফ্যারাডে হেসে বললেন, আমরা দুজনেই প্রমাণ করেছি যে, দুইই এক। ইলেকট্রিসিটি আর ম্যাগ্‌নেটিজিম্ একই জিনিসের এ-পিঠ ও-পিঠ। বিদ্যুৎপ্রবাহ লোহার তারকে যেমন চুম্বকে

পরিণত করে, চুম্বকও লোহার তারকে তেমনি বিদ্যুতায়িত করতে পারে। শুধু তাই নয়, এখন আমরা বুঝেছি, একই শক্তির বহু রূপ। বিদ্যুৎ, চুম্বক, আলো—একই শক্তির বিভিন্ন লীলা। ক্লোরিন গ্যাস যখন লিকুইড হল, তখনও তাই দেখলাম। তোমার প্রেমও তাই। অন্তরা আর দেশ যাকেই ভালোবাস, জিনিসটা এক। এটাও এনার্জির আর একটা রূপ বোধ হয়। হঠাৎ থেমে গেলেন ফ্যারাডে, ভ্রূকুঞ্চিত করে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, তার পর বললেন, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গতি—দ্রুত গতি, নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন। চুম্বকের ক্ষেত্রে দ্রুতবেগে আবর্তিত হলে সামান্য ধাতুখণ্ডেও বিদ্যুৎতরঙ্গ বইবে। দ্রুতগামী বিদ্যুৎতরঙ্গের সমীপবর্তী হলে সামান্য লৌহখণ্ডও পরিণত হবে চুম্বকে। সামান্য কামারের ছেলে মাইকেল ফ্যারাডেও জীবনের ঘূর্ণাবর্তে দ্রুতবেগে আবর্তিত হতে হতে চুম্বক হয়ে উঠেছিল, তাই না তার টানে স্বয়ং সার্ হাম্‌ফ্রি ডেভি এসে হাজির হয়েছিলেন তার দ্বারে। হা-হা-হা-হা—

উচ্চকণ্ঠে হেসে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ফ্যারাডে।

জোসেফ হেনরি দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্পন্দ হয়ে। যেন অ্যাপোলো। ঋজু, বলিষ্ঠ, সৌম, শান্ত। চোখের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে মনীষা ও মাধুর্যের মিলন-মহিমা। স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ অংশুমানের দিকে।

তার পর বললেন, ফ্যারাডে যা বললেন, তা ঠিক। গতিই আসল। চুম্বকের আবহাওয়ায় অবিরাম বিঘূর্ণিত না হলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইত না, আর তা না বইলে গড়ে উঠত না বর্তমান জগৎ। সবই ঠিক। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত শুধু গতি নয়, গতিপথেরও বিশেষ মূল্য আছে একটা। একই বৈদ্যুতিক শক্তি সোজা তারে যতটা স্পার্ক দেয় তার চেয়ে ঢের বেশি দেয় তারটা কয়েল করে নিলে। তোমাদের পরাধীনতার মোচড় তেমন জোরালো হয়নি বোধ হয়, তাই জোরে স্পার্ক দিতে পারছ না....।

তাঁর গম্ভীর মুখ হাস্যস্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

জোরালো হয়নি? এর চেয়ে আর কি হবে?—বলে উঠল অংশুমান।

তাহলে বোধ হয় লীক করছে কোনখান থেকে। লীক করলে জোর কমে যায়। স্টার্জনের ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট যে বেশি ভারী জিনিস তুলতে পারেনি, তার কারণ তারগুলো ইন্‌স্যুলেটেড ছিল না। আমি পাড়ার মেয়েদের খোসামোদ করে প্রত্যেক তারের গায়ে সিল্কের ওয়াড় পরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ম্যাগ্‌নেট তাই জোরালো হয়েছিল। তোমরা শক্তিকে সংহত করতে পারছ না বোধ হয়। বাজে বক্তৃতার অকারণ লম্ফঝম্পে অনেক শক্তি নষ্ট হচ্ছে সম্ভবত.....

কিসের শক্তি আপনি বলছেন?

ধর, প্রেমেরই। ও, কিন্তু আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

স্ক্রীনিং এফেক্‌ট্ হতে পারে। প্রাইমারি কয়েল আর সেকেণ্ডারি কয়েলের মাঝখানে যে-কোন একটা ধাতুর চাদর রাখলে কারেণ্টের জোর কমে যায়। অন্তরা আর তোমার মাঝখানে সমাজটা স্ক্রীনের কাজ করছে হয়তো, কিংবা হয়তো, তোমার দ্বিধা। সিমিলার্‌লি, দেশ আর তোমার মাঝখানে বিদেশী শাসন, কিংবা তোমাদের তামসিকতা, কিংবা সামথিং, ঠিক জানি না....এইগুলো অনুসন্ধান করা দরকার। আচ্ছা, ধর—না থাক্, রাত হয়েছে, ঘুমোও তুমি।

আচ্ছা, অন্তরাকে ভালোবেসেছি বলে দেশের প্রতি আমার একনিষ্ঠতা কি কমে যেতে পারে?—প্রশ্নটা না করে পারলে না অংশুমান।

তা কখনও যায় নাকি? এই আমারই বেলা দেখ না, আমি তো জীবনে একনিষ্ঠ হতে পারিনি। ছেলেবেলায় একনিষ্ঠ কবি ছিলাম, কাব্য নিয়ে উন্মত্ত হয়ে থাকতাম। সেকালের এমন কোন নভেল নাটক ছিল না, যা পড়িনি। শুধু নিজে পড়তাম না, আর পাঁচজনকে ডেকে পড়ে শোনাতাম। থিয়েটার করা একটা বাতিক ছিল। যেখানেই সৃষ্টির মহিমা দেখেছি, মন মেতে উঠেছে। গ্রেগারির বইখানাও যেই হাতে পড়ল, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মন। কল্পলোকের নূতন একটা দ্বার খুলে গেল যেন। কাব্য ভালো লাগত বলে বৈজ্ঞানিক হতে আমার আটকায়নি। বস্তুত বড় বৈজ্ঞানিক আর বড় কবিতে কোন তফাতই দেখতে পাই না আমি। অন্তরার প্রতি তোমার প্রেম দেশপ্রেমকে ম্লান করবে কেন? বিজ্ঞানের উপমা দিয়েই যদি বলি, বেশি তার জড়ালে ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটের শক্তি যদি বাড়ে—দেশের বেশি লোককে ভালোবাসলে দেশপ্রেমই বা বাড়বে না কেন? দেশ মানে—দেশের মাটি নয়, দেশের মানুষ। দেশের মানুষকে ভালোবাসি বলেই দেশের মাটি ফুল ফল কীট পতঙ্গ পর্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে,—মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ তো ভালবাসা দিয়েই হয়। সেই যোগসূত্র দিয়েই তুমি তোমার আদর্শ, তোমার আবেগ সুপ্রসারিত করতে পারি নিত্য নূতন লোককে ভালবেসে। যত বেশি লোককে ভালবাসবে, তত বেশি জোর পাবে। আর একটা বৈজ্ঞানিক উপমা মনে পড়ছে। অ্যাম্পিয়রই প্রথমে ভেবেছিল যে, বিদ্যুৎতের তরঙ্গযোগে দূরে খবর পাঠানো সম্ভব। চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু হল না, তার তরঙ্গের জোর ছিল না বলে। বার্লো দেখিয়ে দিলে যে, দু'শো ফিটের বেশি যাবার শক্তি নেই তার। আমি কিন্তু আমার ইন্‌টেন্‌সিটি ব্যাটারি আর ইন্‌টেন্‌সিটি ম্যাগ্‌নেট দিয়ে এক মাইলের বেশি দূর পর্যন্ত কারেণ্ট নিয়ে গিয়েছিলাম। এক মাইল দূরে গিয়ে আমার কারেণ্ট ম্যাগ্‌নেটিক নিড্‌লটিকে ঘুরিয়ে ঠিক ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল।

কৃতিত্বের আনন্দে চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তা হলে প্রেমের একনিষ্ঠতা বলে আপনি কিছু মানেন না?

মানি বইকি। কাব্য পড়েছি, প্রেমের একনিষ্ঠতা মানি না? কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, শক্তি শুধু প্রেম নয়। একটি খাবারের প্রতি তুমি যদি একনিষ্ঠ থাকতে পার, তার জন্যে বাহবা অবশ্যই তোমার প্রাপ্য। কিন্তু একাধিক খাবার খেয়ে হজম করতে পারলে একনিষ্ঠতা থাকবে না বটে, কিন্তু শক্তি বাড়বে। তা ছাড়া প্রথম জীবনে মানসিক একনিষ্ঠতার অর্থ আছে নাকি কোন? যতটা পার, যেখান থেকে পার, আহরণ করে যাও। সমস্ত পরিপাক করে প্রাণবন্ত জীবনীশক্তির সংহত একনিষ্ঠতা পরে হবে। আমি প্রথম জীবনে কাব্য নিয়ে ছিলাম, তারপর বিজ্ঞান। বিজ্ঞান-জগতেও এক রাস্তায় চলিনি। ইলেকট্রিসিটি নিয়ে ছিলাম অনেকদিন। তার পর আবিষ্কার করলাম থার্মো-টেলিস্কোপ। সূর্যের গায়ে যে কালো কালো স্পট আছে, তাদের টেম্পারেচার কত—তাই নিয়ে কাটল কিছুদিন। তার পর কোহিশন অব লিকুইড্‌স, ফস্‌ফরেসন্‌স্‌, শব্দ-বিজ্ঞান—কত কি করেছি, এখনও করছি, কিন্তু লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়েছে বলে তো মনে হয় না। না না, ওসব ভুল ভাবছ, অন্তরা তোমার দেশপ্রেমের ক্ষতি করতে পারবে না। ঘুমোও, অনেক রাত হয়েছে, চললাম...

মিলিয়ে গেলেন।

অংশুমানের মনের সমস্ত গ্লানি অপসারিত হয়ে গেল। অন্তরার ভালোবাসাটা কাঁটার মত

বিঁধে ছিল মনে। দেখতে দেখতে ফুল হয়ে ফুটে উঠল সেটা। চোখ বুজে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল, অন্তরাই যেন দেশ-মাতৃকা।

"যাচ্ছি—যাচ্ছি—তোমারই কাছে...."

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল আবার।

।। ছয়।।

ছোট বড় স্তূপ স্তর, নানাবিধ মেঘপুঞ্জ নিঃশব্দ মন্থর গতিতে একত্রিত হয়েছে পূর্বদিগন্তে। রাত্রি দ্বিপ্রহর। চতুর্দিকে স্তব্ধ। চক্রবালরেখা-সংলগ্ন বৃক্ষশ্রেণী স্তম্ভিত হয়ে আছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, কালকালিন্দীর কৃষ্ণতরঙ্গমালা মূর্ত হয়ে গেছে যেন সহসা অদ্ভুত কোন মন্ত্রবলে। বেতসবনে অস্ফুট মর্মরধ্বনি উঠছে একটা। অন্ধকার অন্তরের অব্যক্ত বেদনা মূর্ত হতে চাইছে যেন সে অস্পষ্টতায়। কিসের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করছে সব? সারি সারি বাদুড় উড়ে চলেছে। বর্ষা-স্নাত বনানীর বন্য-মদির গন্ধে অন্ধকার ভারাক্রান্ত। ঝিল্লী ডাকছে না। সমস্ত নিঃশব্দ। সেই নিঃশব্দতার পটভূমিকায় অস্ফুট মর্মরধ্বনির সূক্ষ্মজাল সূক্ষ্মতর হচ্ছে ক্রমশ অন্ধকারের নিবিড়তায়। কি যেন একটা আসন্ন! সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সবাই। সহসা মেঘের কোলে কোলে লাগল জরির পাড়, বৃক্ষশ্রেণীর শিখরে শিখরে জাগল জ্যোতির আভাস, ঝিল্লীর কণ্ঠে ফুটল ভাষা, আকুল হয়ে উঠল বনমর্মর।

চাঁদ উঠল। চিরকাল যেমন ওঠে।

।। সাত।।

সি. আই. ডি. দারোগা আবার এলেন।

আর বোধ হয় আপনাকে বাঁচাতে পারলাম না মশাই।

অংশুমান রোজ যেমন থাকে, আজও তেমনই চুপ করে রইল।

আপনি চুপ করে আছেন, কিন্তু আর কেউ চুপ করে নেই। সবাই আপনার নাম বলছে।

আড়চোখে চাইলেন একবার অংশুমানের দিকে, তারপর পানের ডিবে বার করে চার-পাঁচ খিলি পান কুপকুপ করে খেয়ে ফেললেন।

আসুন!

আমি তো খাই না জানেন।

আরে, নিন না মশাই, এক খিলি খেয়েই দেখুন না। চমৎকার মিঠে পান, খাসা লাগবে। নিন, লোকে অনুরোধে ঢেঁকি গেলে, আপনি এক খিলি পান খেতে পারছেন না?

অংশুমান চুপ করে রইল।

আচ্ছা, পান না নিলেন, আসল কথাটা বলে ফেলুন দিকি। আমার কথাটা শুনুন, যা জানেন বলে ফেলুন সব। বলে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ ঢেকে রাখতে পারবেন না তো কিছু। আপনার বন্ধুরাই বলে দেবে সব। দিচ্ছেও। ধরাও পড়েছে অনেকে।

অংশুমান নীরব।

বলবেন না কিছু?

বলছি তো, আমি কিচ্ছু জানি না।

দারোগা সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবার একটু।

আপনি মনে করছেন, আপনি খুব দেশের কাজ করছেন। কিন্তু এর ফলে কি হবে জানেন? দেশই আপনার উচ্ছন্ন যাবে। গভর্মেন্টের সঙ্গে বেশি চালাকি চলে না। রেল-লাইন উপড়ে, টেলিগ্রাফের তার কেটে, পোস্ট-অফিস পুড়িয়ে, কতক্ষণ জব্দ করবেন আপনি গভর্মেণ্টকে, যখন তাদের হাতে হাজার হাজার এরোপ্লেন আর বোমা রয়েছে? মেরে ধুনে দেবে সব। অতও করতে হবে না, চাবুকের চোটেই সিধে হয়ে যাবে। প্রতি গ্রাম থেকে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় হচ্ছে, গোরা সোল্‌জার দেখেই পেচ্ছাপ করে ফেলছে অধিকাংশ লোক, আপামর ভদ্র হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পায়ের তলায়। তার পর কন্‌ট্রোলের যে রকম ব্যবস্থা হচ্ছে শুনলাম তাতে একটি লোক খেতে পাবে না, পরতে পাবে না, প্রয়োজনীয় কোন জিনিস পাবে না আর। এক মুঠো চালের জন্যে, এক টুকরো কাপড়ের জন্যে হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে হবে সবাইকে এই গভর্মেন্টেরই দ্বারে দ্বারে। আর এসব কেন হবে, জানেন? আপনাদের মত ত্যাঁদড় লোকেদের একগুঁয়েমির জন্যে। আপনাদের কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা গভর্মেণ্ট জানে, মাঝ থেকে কতকগুলো নিরীহ লোক মারা যাবে।

উঠে গিয়ে একবার পিক ফেললেন। তারপর অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বললেন, তার চেয়ে বলে ফেলুন যে, হীট অব দি মোমেণ্টে করে ফেলেছিলাম, মাথার ঠিক ছিল না, আমরা সামলে সুমলে নেব সব। ছাড়া পেয়ে যাবেন। সদ্‌বুদ্ধিটা নিন দয়া করে।

আর এক খিলি পান খেলেন।

অংশুমান নীরব।

যা জানেন, অকপটে বলে ফেলুন সব। কেন কচলাচ্ছেন মিছে?

আমি কিচ্ছু জানি না।

আচ্ছা লোক আপনি মশায়! ধন্য! ঢের ঢের লোক দেখেছি, কিন্তু আপনার মত এমনটি আর দেখিনি। মিছিমিছি কত লোককে কষ্ট দিচ্ছেন বলুন তো! আপনার বুড়ো বাবাকে পর্যন্ত ধরে নিয়ে গেছে, জানেন? মারধোর পর্যন্ত করছে নাকি।

অংশুমান চমকে উঠল।

বাবাকে ধরবার মানে?

মানে আপনিই!

আর একটু থেমে হেসে বললেন, আর আপনিই এর প্রতিকার করতে পারেন। সত্যি কথাটা বলতে দোষ কি?

অংশুমান নীরব। বাবার শীর্ণ মুখখানা চোখের উপর ভাসছিল তার। সত্যিই নিরীহ লোক। সারাজীবন কেরানীগিরি করে সসঙ্কোচে কাটিয়েছেন। চারটে মেয়ের বিয়ে দিতে আর অংশুমানকে পড়াতেই যথাসর্বস্ব গেছে। ধার হয়েছে কিছু। আশা ছিল, অংশুমান এম. এস-সি পাস করে সংসারের দুঃখ ঘোচাবে। এম. এস-সি সে পাস করেছে। কিন্তু সংসারের দুঃখ ঘুচল কি?

কি ঠিক করলেন?

বলেছি তো, আমি কিছু জানি না।

উঃ, সাংঘাতিক লোক আপনি! ডেন্‌জারাস। নিজেই কষ্ট পাবেন। আচ্ছা, এখন উঠি তবে। আবার আসব। সহজে হাল ছাড়বার লোক আমি নই। ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন, ভালো করে ভেবে দেখুন। সংসারটাকে এমন করে ডুবিয়ে দেবেন না, বুঝলেন, ভেবে দেখুন।

চলে গেলেন।

নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল অংশুমান।

।। আট।।

কখনও ফুলের উপর বসছে, কখনও পাতার উপর, কখনও বেড়ার শুকনো কঞ্চির ডগায়। বসেই উড়ছে আবার। চঞ্চল একদল প্রজাপতি। এক মুহূর্ত স্থির নয়, পাগলের মত উড়ে বেড়াচ্ছে খালি। নানা রঙের। সূর্যালোকের রঙগুলো হঠাৎ যেন স্বাতন্ত্র্য-লাভ করেছে এই নির্জন প্রান্তরে। স্পর্শ করে বেড়াচ্ছে সবকিছু মনের আনন্দে। শিয়ালকাঁটার কণ্টকপল্লবকে মহিমান্বিত করে সোনার বরণ যে ফুলগুলি ফুটেছে, তারা যেন উপভোগ করছে খামখেয়ালী প্রজাপতিদের এই হুড়োহুড়ি। অপরূপ হাসি ফুটেছে তাদের মুখে। কুহু-কুহু কুহু-কুহু কলকণ্ঠে বাহবা দিয়ে উঠল যেন কোকিলটা। বসছে উড়ছে, বসছে উড়ছে—বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই। বিচিত্রপক্ষ কতকগুলো খেয়াল মাতামাতি করে বেড়াচ্ছে দুপুরের রোদে।....

চিরকালই করে।

।। নয়।।

অন্ধকার।

অসংখ্য ক্ষুধিত পীড়িত অশিক্ষিত স্বার্থপর ধূর্ত মিথ্যাচারী বিশ্বাসঘাতক বিলাস-লোলুপ কামনা-ক্লিষ্ট আতুর জনতা....হিমালয় থেকে কুমারিকা, গুজরাট থেকে আসাম....কোথাও বাদ নেই। অথচ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই দেশ, রামায়ণ মহাভারত জাতক গীতা এই দেশেরই কাব্য, মহত্ত্বই এ দেশের মেরুদণ্ড, পরার্থপরতাই জীবন-মন্ত্র। সেই দেশের এ কি দুর্দশা! আকাশচারী বিহঙ্গম আফিঙের নেশায় অভিভূত, পিঞ্জর-বন্দনা করছে মধুরকণ্ঠে। নাদিরশাহ তৈমুরলঙ্গ বহু ভারতবাসীকে হত্যা করেছিল, বহু বিদেশী দস্যু বহুবার লুণ্ঠন করে গেছে ভারতকে, কিন্তু এমন নিঃস্ব আমরা কখনও হইনি। আজ আমাদের মনুষ্যত্ব নেই, আদর্শ লাঞ্ছিত, বিবেক মোহগ্রস্ত। যে পদাঘাতে আমাদের সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, সেই পদই লেহন করে চলেছি সগৌরবে। ওই দারোগাটাও আমাদের দেশের লোক।....

উত্তপ্ত মস্তিষ্কে উঠে বসল অংশুমান। মনে হল, যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। বাবার মুখটা মনে পড়ল আবার। মারধোর করছে? ওই নিরীহ বৃদ্ধকে মারতে হাত উঠছে কার? আমাদেরই দেশের লোকের, আবার কার? পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হয়েছিল, কিন্তু পাঞ্জাবীরাই সবচেয়ে বেশি রাজভক্ত। বাংলাদেশ শ্মশান হয়ে গেল, কিন্তু বাঙালীরই গোয়েন্দাগিরিতে আজও সবচেয়ে বেশি দক্ষ। ঘরে ঘরে বিশ্বাসঘাতক, কাউকে বিশ্বাস নেই। না, কাউকে না। কিন্তু সত্যি কি

কোনও উপায় নেই? আছে, নিশ্চয় আছে। কোথায় ত্রাণকর্তা, কোথায় তুমি?—আর্তনাদ করে উঠল অংশুমান।

ধীরে ধীরে কারা-প্রাচীরে মূর্ত হয়ে উঠল এক অশ্বারোহী মূর্তি ; কৃপাণধারী দিব্যকান্তি পুরুষ। অশ্বটি বড় জীর্ণশীর্ণ। কৃপাণটিও মরচেধরা। প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তিনি চেয়ে রইলেন অংশুমানের দিকে। প্রত্যাশাভরা প্রদীপ্ত দৃষ্টি। অংশুমানের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। মুখে ভাষা ফুটল অনেকক্ষণ পরে।

আপনি কে?

আমি? চিনতে পারছ না?

অংশুমান চেনবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। অথচ অচেনাও নয়, কোথায় যেন.....

তোমাদেরই সৃষ্টি আমি। যুগে যুগে তোমরাই সৃষ্টি করেছ আমাকে নানা রূপে। ....তোমাদের সৃজনীশক্তির মধ্যেই আমার অস্তিত্ব অমরত্ব লাভ করেছে কূর্ম মৎস্য বরাহ অবতারে। নৃসিংহরূপে আমিই হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করেছি, বলির গর্ব আমিই চূর্ণ করেছি একদিন, অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কুলকে আমারই পরশু নির্মূল করেছিল, দশমুণ্ড রাবণকে আমিই সংহার করেছি একদা, কুরুক্ষেত্র প্রকম্পিত হয়েছিল একদা আমারই পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষে, কংস-জরাসন্ধকে আমিই বধ করেছি, আবার অহিংসার বাণী আমিই প্রচার করেছি বুদ্ধরূপে। আমারই চিরন্তন আশ্বাসবাণী মূর্ত হয়েছে তোমাদের কবির রচনায়।—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

কিন্তু তোমাদের পুরুষকারই আমাকে সম্ভব করে। আমি আজও তোমাদের কাছে কল্পনামাত্র, তাই আমার অশ্ব জীর্ণশীর্ণ, কৃপাণ তীক্ষ্ণতাহীন।

অংশুমান সবিস্ময়ে চেয়ে রইল অশ্বটির দিকে। সত্যিই বড় রুগ্ন। তার মনের কথা টের পেয়ে সেই দিব্যকান্তি পুরুষ আবার বললেন, আমার অশ্ব রুগ্ন নয়, ক্ষুধিত। সামান্য ভূমির শস্যে এর পুষ্টি হয় না।

কোন্ ভূমির শস্য চাই তা হলে?

তাজা প্রাণের রক্ত যে ভূমিতে সার সিঞ্চন করেছে, সেই ভূমির শস্য চাই এই দেবদত্ত অশ্বকে সঞ্জীবিত রাখার জন্যে। বিদেশীর চর্বিত নানা ইজম গলাধঃকরণ করে যে পুরীষ তোমরা সৃষ্টি করছ, তাও একপ্রকার সার বটে, কিন্তু সে সারে উৎপন্ন ফসল আমার অশ্ব স্পর্শ করে না, তাই সে দুর্বল। আমার কৃপাণও তাই অতীক্ষ্ণ। ধৈর্যের কঠিন প্রস্তরে সবল হস্তে শাণ দিয়ে আমার হস্তে এ কৃপাণ তুলে দেবে যে, কোথায় সেই বীরপুরুষ? তাকেই অন্বেষণ করছি। তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি কারা থেকে কারান্তরে। আমি জানি কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই তার তপস্যা,....বন্দিনী জননীর কোলে আমিও জন্মলাভ করেছিলাম একদিন এই কারাগারেই।

বলুন কে আপনি?

আমি তোমাদেরই অসমাপ্ত কল্কি অবতারের কল্পনা। মিলিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে।

আবার অন্ধকার।.....

তোমাদেরই পুরুষকার আমাকে সম্ভব করে—ধীরে ধীরে এই কথাগুলো মূর্ত হয়ে

সকৌতুকে চেয়ে রইল যেন তার দিকে। কি রকম পুরুষকার চাই? জ্ঞান হয়ে থেকে একদিনও তো অলস হয়ে বসে থাকেনি সে। ভালো হব, বড় হব, দেশকে ভালো করব, বড় করব,—এই সাধনাই তো করছে অহরহ। তবু কিছু হবে না?

হবেই। নিশ্চয় হবে। সমস্ত জীবনকে ইন্ধন করেছ, আগুন জ্বলবে না, তা কি হতে পারে কখনও? জ্বলবেই।

সবিস্ময়ে অংশুমান চেয়ে রইল। নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছে না। স্বয়ং বিবেকানন্দ সামনে দাঁড়িয়ে।

এক টুকরো চকমকির মধ্যেও আগুন প্রচ্ছন্ন থাকে; আঘাত করলেই তা ছিটকে বেরিয়ে আসে। আঘাত কর, আঘাত কর, ক্রমাগত আঘাত করে যাও, ব্যর্থতায় হতাশ হয়ো না।

সহসা অন্তর্ধান করলেন।

অন্ধকার হয়ে গেল আবার।

অংশুমানের সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মনে হল বিবেকানন্দের এই বাণী নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পথে পথে প্রচার করা উচিত তারস্বরে "আঘাত কর, আঘাত কর, ক্রমাগত আঘাত করে যাও, ব্যর্থতায় হতাশ হয়ো না।"

সহসা উঠে ছুটে বেরিয়ে যেতে গেল সে, বন্ধ দরজায় প্রত্যাহত হয়ে নতুন করে আবার মনে পড়ল যে, সে বন্দী। বন্দী! তা হলে? মনের মধ্যে যত কথা জমে উঠেছে, তা কি কোনদিন বলা হবে না কাউকে? এই চারটে দেওয়ালের মাঝখানে তা চাপা থেকে যাবে চিরকাল? সমস্ত ছাপিয়ে এই দুঃখটাই তার মনে বড় হয়ে উঠল, চাপা থেকে যাবে সব? যা ভাবলাম যা দেখলাম, যা শুনলাম, তা বাইরে আর প্রকাশ করতে পারব না হয়তো জীবনে। বাইরের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে চিরকালের মত।

"একটা কথা শুনলে বোধ হয় আশ্বস্ত হবে—যোগসূত্র কখনও ছিন্ন হয় না, ছিন্ন করা যায় না। আমরাই প্রথমে এর আভাস পেয়ে প্রমাণ করেছিলাম। তারপর আরও অনেকে করেছেন পরে আরও ভালোভাবে।"

অংশুমান দেখলে, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন। সকলেরই ছবি দেখেছিল, সকলকেই চিনতে পারল সে। ওয়াট্‌সন সাল্‌ভা, সোমেরিং, স্টিন্‌হীল, মর্স, লিণ্ডসে, হাইটন....। সবাই স্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার দিকে।

"আগে সকলের ধারণা ছিল যে, তার না থাকলে বুঝি বিদ্যুৎ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে না। আমরা কিন্তু হাতে-কলমে প্রমাণ করেছিলাম যে, মাটি এবং জলও বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বহন করতে পারে। এরই জোরে টেলিগ্রাফ তৈরি করেছিলাম আমরা সেকালে। সফলও যে হয়েছিলাম, তা তো পড়েছ। তারের অভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহের গতি যেমন আটকায় না, প্রচার করবার মত সত্যি যদি কোনও জোরালো বাণী থাকে তোমার, জেলের দেওয়ালও তা আটকাতে পারবে না। অদ্ভুত উপায়ে অদৃশ্য পথে তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মনে গিয়ে পৌঁছবেই।"

একটু হেসে ওয়াট্‌সন চলে গেলেন। যাবার সময় হাইটনকে কনুই দিয়ে একটা ধাক্কা মেরে গেলেন। ভাবটা—তোমার বক্তব্যটা এইবার বলে ফেল। হাইটন এগিয়ে এসে একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, যখন অক্ষর সৃষ্টি হয়নি, তখনও মানুষ জ্ঞানের চর্চা করত। তাদের জ্ঞানের ধারা কি অবলুপ্ত হয়েছে? তোমাদের বেদ উপনিষদ বেঁচে রইল কি করে?

সাল্‌ভা বললেন, অন্তরা তোমার মনের কথা টের পেয়েছিল কি করে? মুখ ফুটে তাকে বলনি তো কোনদিন কিছু।

পেয়েছিল নাকি?—মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অংশুমানের।

সমস্বরে হেসে উঠলেন সবাই। তার পর চলে গেলেন সবাই একযোগে।

অন্ধকার....

বিনা-তারে বার্তা-বহনের আকাঙ্ক্ষা বৈজ্ঞানিকের মনে জেগেছিল তারের অযোগ্যতা দেখে। মানুষ দ্রুত সুনিশ্চিতভাবে বার্তা পাঠাতে চায়, অব্যাহত হবে তার গতি....তারের সে ক্ষমতা ছিল না।

মনে ছবির পর ছবি ফুটতে লাগল।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর। রাত্রিকাল। মর্স নদীর ভিতর এক মাইল লম্বা মোটা একটা ইন্‌স্যুলেটেড তার ফেলেছেন এই প্রমাণ করবার জন্যে যে, জলের ভিতরও তারযোগে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করা সম্ভব। রাত্রে তারটা জলে ফেলে এলেন, সকালে দেখাবেন সকলকে। পরদিন বিরাট জনতা সমবেত হয়েছে নদীর ধারে মর্সের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট দেখবার জন্যে। জলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গ আসবে! রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। বিদ্যুৎতরঙ্গ একবার একটু এল, তার পর আর এল না। হো-হো করে হেসে উঠল সবাই। যত সব আজগুবি কাণ্ড! এই পাগলটার পাল্লায় পড়ে সমস্ত সকালটাই মাটি। ঠাট্টায় বিদ্রূপে হাসিতে কলরবে পূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। মুখ কালো করে বসে রইলেন মর্স যন্ত্রটার দিকে চেয়ে। কি হল? এল না কেন? হৈ-হৈ করতে করতে জনতা ছত্রভঙ্গ হল। মর্স বেরুলেন কারণ অনুসন্ধান করতে। কারণ পাওয়া গেল কিছুদূর গিয়েই। একটা নৌকো নঙ্গর তোলবার সময় তারটাকে টেনে তুলেছিল, তারপর সেটার আদি-অন্ত না পেয়ে তা থেকে প্রায় দুশো ফিট কেটে নিয়ে সরে পড়েছিল। মর্স ভাবলেন, এত বড় লম্বা তার জলের তলায় রাখলে এ রকম নানা দুর্ঘটনা অহরহই ঘটবে। সুতরাং তার চলবে না। জলকেই করতে হবে বৈদ্যুতিক বাণীর বাহক। মর্সের জীবন-কাহিনী মনে পড়ল অংশুমানের। কিছুতেই নিরস্ত হননি। প্রথম জীবনে হতে চেয়েছিলেন চিত্রকর। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-সাদে-ল্যাম্বের বন্ধু বিখ্যাত মার্কিন চিত্রশিল্পী অ্যাল্‌স্টনের শিষ্য ছিলেন তিনি। 'ডেথ অব হার্‌কিউলিস' ছবিখানা এঁকে নামও হয়েছিল। কিন্তু পেট ভরল না তাতে। 'দি জাজ্‌মেণ্ট অব জুপিটার' ছবিখানার ক্রেতাই জোটেনি এক বছর। সক্রিয় মন অলস হয়ে বসে থাকেনি। বিজ্ঞান-চর্চায় মেতে উঠলেন। নূতন ধরনের পাম্প করে ফেললেন একটা, মিনিটে ৩৬০ গ্যালন জল তুলতে পারে। পেটেণ্ট করলেন সেটা। পেট ভরল। তার পর আকৃষ্ট হলেন ইলেকট্রিসিটির দিকে। অবাক হয়ে গেলেন এর বিচিত্র সম্ভাবনায়। একবার এক জাহাজে আসতে আসতে একজন আরোহীর মুখে শুনলেন যে, যত দূরই হোক না কেন, বিদ্যুৎতরঙ্গ এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিমেষেই নীত হয়; তখনই তাঁর মনে হল, তাহলে এই তরঙ্গযোগে নিমেষের মধ্যে খবরই বা পাঠানো যাবে না কেন? সাঙ্কেতিক শব্দ সৃষ্টি করলেই যাবে। জাহাজেই তাঁর মাথায় এল ডট্‌ আর ড্যাশের কথা।....মর্সের টেলিগ্রাফিক কোড আজ বিশ্ববিখ্যাত। যিনি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর হতে পারতেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাঁকে হতে হল বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। মানুষ যা হতে চায়, তা হতে পারে না। অংশুমান আশ্বস্ত হল যেন একটু। মনের মধ্যে একটা সংশয় কাঁটার মত খচখচ করছিল। বারংবার মনে হচ্ছিল, সামান্য

কেরানীর ছেলে আমি, আমার কি উচিত ছিল না লেখাপড়া শেষ করে সংসারের ভার নেওয়া? বাবার বুকের রক্ত-জল-করা পয়সায় লেখাপড়া শিখেছি, কি প্রতিদান দিলাম তাঁকে? পুলিসের হাতে মার খাচ্ছেন আমার জন্যে?....পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ?....হঠাৎ মর্সের মুখখানা ফুটে উঠল চোখের সামনে। মুখময় বলি রেখা, অধরে বিষণ্ণ হাসি।

হ্যাঁ, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় চাপ। গাছের ফল যখন স্বপ্ন দেখে যে আকাশে উড়ে যাব, তখন মাধ্যাকর্ষণের কথাটা সে ভুলে যায়। এ ছাড়া তোমার অন্য গতি ছিল না।

মিলিয়ে গেল মুখখানা।

অংশুমানের মনে প্রশ্ন জাগছিল একটা। মাধ্যাকর্ষণের টানে যে ফল মাটিতে নেমে আসে, তার ভবিষ্যৎ সার্থক ওই মাটিতেই অঙ্কুরিত বীজের নব নব উন্মেষে। আমার এই অসমসাহসিকতার কি ভবিষ্যৎ আছে কোনও? এই স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছ্রসাধন....। আবার ছবি ফুটে উঠল একটা। পিঠে কাপড়ের বোঝা, হাতে বই—চলছে বালক লিগুসে। গরিব চাষার ছেলে, তাঁতীর কাজ শিখছে। তাঁত বোনা শেখে, কাপড়ের বোঝা পিঠে করে দোকানে দিয়ে আসে। স্কুলের যাবার সঙ্গতি নেই। অধ্যয়নস্পৃহা কিন্তু প্রবল। পিঠে কাপড়ের বোঝা নিয়ে পথ চলতে চলতে বই পড়ছে...গ্রাম্য মেঠো পথ বেয়ে তন্ময় হয়ে চলেছে লিগুসে। কিছুতেই দমবে না। ছুটিতে কাজ করে ট্যুশনি করে কত কষ্টে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলে বাইশ বছর বয়সে। শেষ করলে আর্ট কোর্স, তার পর থিয়োলজি পড়লে, তার পর বিজ্ঞান। কখনও থামেনি, দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি....

লিগুসে সশরীরে এসে সামনে দাঁড়ালেন। চোখ-মুখ দেখে মনে হয় না যে, অতবড় বিদ্বান। সর্বদাই যেন ভীত সঙ্কুচিত হয়ে আছেন, যেন কিছু জানেন না। কথা বলতেও ইতস্তত করছেন, পাছে বেঁফাস কিছু বলে ফেলেন—এই ভয়। অংশুমানের দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখলেন, ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ল কয়েকবার, তার পর একটু ইতস্তত করে বললেন, তোমার মত আমিও একদিন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। দ্বিধা নয়, ত্রিধাই বলতে পার। ইলেকট্রিকসিটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলাম যে, এর তিনটে সম্ভাবনা আছে। প্রথম, এর শক্তি দিয়ে নানা রকম কাজ করানো সম্ভব—এ চাকা ঘোরাতে পারে, ভারী জিনিস তুলতে পারে। দ্বিতীয়, সংবাদ বহন করতে পারে। তৃতীয়, আলো দিতে পারে। আমি কোন্‌টা নিয়ে গবেষণা শুরু করব, তা ঠিক করতে পারিনি প্রথমে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে ঠিক করলাম—আলো। যে আলো হাওয়ায় নিববে না, ঝড়ে কাঁপবে না, তারই সন্ধান করতে হবে সকলের আগে। কেন আমার এ ইচ্ছে হয়েছিল জানি না। আলোক-প্রবণতা বোধ হয় মানব-মনের আদিমতম এবং আধুনিকতম বৈশিষ্ট্য....

চুপ করলেন কয়েক মুহূর্ত, চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটু।

ডাণ্ডি জেলের কয়েদীদের পড়াতাম। অনেক কাল পড়িয়েছি। সেখানেও দেখেছি, মানুষের মন আলোর সন্ধান করছে কেবল। আমার একটি ছাত্র বেশ কৃতী হয়েছিল। তারও ঝোঁক হল আলোর দিকে। জ্যোতিষ্ক-বিদ্যায়। অন্ধকার জেলে বছরের পর বছর কাটিয়েছে যে, সে তন্ময় হয়ে গেল আকাশের সূর্যতারার স্বপ্নে।—এই বলে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন লিগুসে।

আলো!

লক্ষ কোটি সূর্য-তারকা-বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরিত এক মহাকাশ ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠল অংশুমানের মানসদৃষ্টির সম্মুখে।

"আলোর অর্থ অন্ধকারও হতে পারে। অত্যুগ্র-আলোক-বিভ্রান্ত যে মন অন্ধকার-কামনায় আলো নিবিয়ে দিতে চাইছে, সেও এক হিসাবে আলোরই উপাসক। আলো মানে বিদ্রোহ.....। প্রকাণ্ড পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমি যখন ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে পৃথিবীর বিদ্যুতের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করছিলাম, তখন আসলে আমি দূরত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিলাম। মানুষ বিদ্রোহী জীব...সে ওলটাতে চায় এবং ওলটাতে পারে।"

লুমিস এসে এই কথাগুলি বলে দাঁড়িয়ে রইলেন উদ্ধত ভঙ্গীতে একটা প্রত্যুত্তরের আশায়। অংশুমান কিছু বলবার পূর্বেই আবার বললেন, তুমিও পারবে। চিয়ার আপ্।— বলেই মিলিয়ে গেলেন।

।। দশ।।

কমরেড মীনা দত্ত

সুচরিতাসু,

ভাই মীনু, এতদিন আমার চিঠি না পেয়ে আশ্চর্য হয়েছ হয়তো। অনেক আগেই আমার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, সময় করে উঠতে পারিনি। ঘণ্টা মিনিট যে সময়ের মাপকাঠি সে সময় আমার প্রচুর ছিল, আমি ডেপুটি-গৃহিণী, ছেলে-পিলে হয়নি, চাকর-বামুন আছে, স্বামী টুরে টুরে বেড়ান, সুতরাং সময় বলতে সাধারণত যা বোঝায়, তা আমার যথেষ্ট। সময় ছিল না মনের, যে মন তোমার চিঠির জবাব দেবে। আগস্ট-ডিস্টারবেন্সের তুমুল তুফানে সমস্ত মন এমন বিপর্যস্ত হয়েছিল যে, চুল বাঁধবার অবসর পর্যন্ত ছিল না। অথচ আমি প্রত্যক্ষভাবে ওতে যোগ দিইনি। ডেপুটি-গৃহিণীর ওসবে যোগ দেবার উপায় নেই। আমাদের প্রতিবেশী অংশুমানবাবুর সঙ্গে ভাসা-ভাসা আলাপ করেছি খালি সংযত ভাষায়, কিন্তু পরোক্ষলোকে আমার মন অলস হয়ে বসে থাকেনি। সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করছিল, ওই অংশুমানবাবুরই কার্যকলাপ। মুগ্ধ হয়ে গেছি তার বীরত্ব দেখে, মনে মনে প্রণাম করেছি তাকে শতবার। এখন সে জেলে। সুতরাং তোমার চিঠির জবাব দেবার অবসর হয়েছে। অবসর পেলেও এর আগে এমন করে জবাব দিতে পারতাম না, কারণ জবাবটা নিজের কাছে এখন যতটা স্পষ্ট হয়েছে, আগে ততটা ছিল না। সুতরাং আশা করছি, তোমাকে বোঝাতে পারব।

তোমাদের দলে যতদিন ছিলাম, ততদিন বুঝিনি, এখন কিন্তু ভালো করে বুঝতে পারছি যে, আমার অন্তত কমিউনিস্ট হওয়ার প্রেরণা ছিল দেশ-প্রেম নয়, আত্ম-প্রেম। ক্যাপিটালিস্টদের ধ্বংস করার যে মুখস্থ বুলি আওড়াতাম, তা পরশ্রীকাতরতার তাড়নায়, প্রোলিটারিয়েটদের প্রতি বেদনা-বোধের তীব্রতায় নয়। 'মাদার রাশিয়া'তে যেসব আত্মত্যাগী যুবক-যুবতী কিশোর-কিশোরীর কথা পড়েছি, আমাদের মধ্যে তাদের মত যারা আছে (আছে নিশ্চয়ই, যদিও আমার চোখে পড়েনি), তারা কই আমাদের দলে যোগ দেয়নি তো! আমার বিশ্বাস, আজকাল এই যে দলে দলে ছেলে-মেয়েরা বিশেষ করে মেয়েরা, কমিউনিস্ট হচ্ছে, ওটা ফ্যাশানের খাতিরে, কমিউনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ততটা নয়। এটা বর্তমান যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা অনিবার্য ফল বলতে পার। আমাদের ঘরে ঘরে ছেলেরা বেকার, মেয়েরা অবিবাহিতা। অথচ

তারা বুলি কপচাতে শিখেছে। প্রকৃত শিক্ষা আমরা পাই না। আমরা ডিগ্রী লাভ করেই কুলীন। আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির তোয়াক্কা রাখি না। উদর-সর্বস্ব স্বার্থপর বণিক-সভ্যতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা তাদের কাছে আত্মবিক্রয় করে যে পাঠ নিয়েছি, তার মূলমন্ত্র স্বার্থপরতা। আমাদের ঘরে ঘরে বেকার ছেলে আর অবিবাহিতা মেয়ের দল এই শিক্ষা পেয়ে অসন্তুষ্টির তুষানলে দগ্ধ হচ্ছিল এতদিন। কারণ এই শিক্ষার ফলে বেচারাদের লোভ উদ্দীপ্ত হয়েছে ষোল আনা, অথচ তা চরিতার্থ করবার কোন উপায় নেই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গুণে ছেলেরা উপার্জন করতে পারে না, সমাজ-ব্যবস্থার গুণে মেয়েদের বর জোটে না। দুস্তর বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে তবু যে-সব ছেলে উপার্জন করতে পেরেছে বা যে-সব মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তাদের সৌভাগ্যে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হওয়া ছাড়া অধিকাংশ বঞ্চিতদের অন্য কোন উপায় ছিল না এতদিন! বিদ্রোহী রাশিয়ার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে এখন তারা সেই পরশ্রীকাতরতার গায়ে লেনিন-স্টালিনের বড় বড় নাম জুড়ে দিয়েছে। জোর-গলায় বলে বেড়াচ্ছে, যাদের তোমরা এতদিন বড়লোক বলে এসেছ, আমরা ধরে ফেলেছি, আসলে তারা ছোটলোক, তারা পুঁজিবাদী, এই দেখ কার্ল মার্ক্স্......

যে পরশ্রীকাতরতাটা প্রকাশ করতে আগে লোকে লজ্জিত হত, একটা বড় নামের মুখোশ পরে তা-ই ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করাটা গৌরবজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। কিন্তু ভেবে দেখ, ধনীমাত্রেই পাজি, শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই জুয়াচোর—এই নীতি প্রচার করা অন্য যে-কোন দেশের পক্ষে শোভন হোক, ভারতবর্ষের পক্ষে নয়। যে হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষের গৌরব, পরমতসহিষ্ণুতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা যে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, সেই ভারতবর্ষের ধনীমাত্রেই পাজী—এই মত প্রচার করতে যাওয়া কি লজ্জাকর! একটু যদি ভালো করে ভেবে দেখ, হিন্দুধর্মই প্রকৃত স্বাধীনতার ধর্ম। প্রকৃত সাম্যবোধ আত্মানুসন্ধী হিন্দুধর্মেই আছে, অন্য কোন ধর্মে নেই; কারণ সাম্যবোধ জিনিসটা আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, পশু-জগতে ওর স্থান নেই। হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম, যে প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক প্রেরণাকে শ্রদ্ধা করেছে, বেয়নেট উঁচিয়ে বলেনি—তুমি এই ইজ্‌মে বিশ্বাস করবে কি না, যদি না কর, তা হলে তোমার বাঁচবার অধিকার নেই। এই সাম্যবোধই হিন্দু-ভারতবর্ষকে আধিভৌতিক জগতে দুর্বল করেছে হয়তো, সে নির্বিচারে ভিন্নধর্মাবলম্বীকে হত্যা করতে পারেনি বলেই এদেশে এত ধর্ম-বৈচিত্র্য, এত মতানৈক্য। ভারতবর্ষের তথাকথিত রাজনৈতিক একতা নেই, কারণ ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বহুর মধ্যে একককে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেছে, এবং তা করতে গিয়ে আধিভৌতিক জগতে জাতিহিসাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, কারণ আধিভৌতিক জগৎটা পশুর জগৎ। মানুষ যেখানে পশু সেখানেই সে আধিভৌতিক জগতে বিচরণ করে, দেহের ক্ষুধা, পাশবিক বাসনা মেটাবার জন্যে মারামারি কাটাকাটি করে, সাম্য-অসাম্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, প্রয়োজনের তাগিদে শক্তির শরণাপন্ন হয়, কেড়ে খায়, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করে। তুমি হয়তো বলবে, আধিভৌতিক জগৎটাও তো আছে, ওটাকে তো অস্বীকার করলে চলবে না, বহু লোক দারিদ্র্যের চাপে মরে যাবে আর জনকতক ঐশ্বর্য ভোগ করবে—এ রকম সমাজব্যবস্থাই কি ভালো? কে বলছে, ভাল? আধিভৌতিক জগৎটা যে আছে, তা তো প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি, অস্বীকার করব কি করে? আমার আপত্তি ভণ্ডামিতে। ক্ষুধার আহার, কামনার ইন্ধন সন্ধান করে বেড়াচ্ছি যখন, তখন আবার সাম্যের মুখোশ কেন? বিদ্যুৎতালোকিত সুসজ্জিত ঘরে ফ্যানের তলায় বসে

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কিষাণদের দুঃখ, শ্রমিকদের কষ্ট নিয়ে অমুক দাদার সঙ্গে উত্তেজিত আলোচনার ছবিটা যে আধুনিক পরিবেশে দুষ্মন্ত-শকুন্তলারই সাবেক ছবি, তা অস্বীকার করে যে ভণ্ডামিটাকে আমরা প্রশ্রয় দিয়েছি তাতেই আমার আপত্তি। মাছের লোভে ছিপ ঘাড়ে করে টোপ নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছি, ওর মধ্যে আবার সাম্যের আস্ফালন কেন? দীনের দুঃখে সত্যিই যারা বিচলিত হয়, তারা অত স্বার্থপর হয় না, হতে পারে না। নিঃস্বার্থপর ত্যাগী কমিউনিস্ট যে নেই তা আমি বলছি না, অনেক আছে হয়তো, কিন্তু আমাদের দলটির যে ছবি দেখেছি তা শ্রদ্ধেয় সাম্যবাদীর ছবি নয়। কমিউনিজ্‌ম জিনিসটা যে খারাপ, তাও আমার বক্তব্য নয়। সাময়িক প্রয়োজনে যুগে যুগে ওর উদ্ভব হয়েছে নানা রূপে! বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও রাজনৈতিক পরিবেশ অনুসারে ওর চেহারাও হয়েছে নানা রকম। বঙ্গদেশে গোপালদেবের আমলে কিংবা আরও পূর্বে যে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল, তার পরবর্তী যুগেও যে দীর্ঘকালব্যাপী কৈবর্ত-বিদ্রোহ হয়েছিল তা মূলত বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান বিদ্রোহেরই পূর্ব সংস্করণ। যা একটু তফাত তা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও রাজনৈতিক পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য। কমিউনিজ্‌ম যে অতি আধুনিক অভূতপূর্ব একটা কিছু, তা মনে করবার কোনও কারণ নেই! মানবের ইতিহাসে এ জিনিস বার বার ঘটেছে ও ঘটবে। সুতরাং কেউ তোমাদের পার্টি পরিত্যাগ করলে বা তোমাদের কথায় সায় না দিলেই তোমরা তাকে প্রগতি-বিরোধী, সেকেলে, রিঅ্যাক্‌শনারি প্রভৃতি বিশেষণে লাঞ্ছিত কর, সেটা যুক্তিসহ আচরণ নয়। তা ছাড়া আর একটা কথাও তোমরা ভুলে যাও, সেকেলে হতেই বা দোষ কি, যখন মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে একাল সেকালের চেয়ে এক পাও এগোয়নি।

আমাদের দেশের জনসাধারণের দুর্দশার সীমা নেই। সে দুর্দশা ঘোচাবার জন্যে যাঁরা জীবন পণ করেছেন, তাঁরা পূজনীয়; কিন্তু তোমাদের চেষ্টা, কি করে তাঁদের খেলো করবে, কোন্ আধুনিক মুখস্থ-করা ফরমুলায় ফেলে তাঁদের কর্মপদ্ধতির দোষ বার করবে। স্বাধীনতা-অপহারক বিদেশী রাজাই আমাদের দুর্দশার কারণ। সেই বিদেশী রাজা স্বদেশে বিদেশে আমাদের নামে রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে মিথ্যে কথা, তোমরাও তাতে সায় দিয়ে চলেছ ক্রমাগত। তোমরাও বলছ যে, হিন্দু-মুসলমান মিলন হচ্ছে না বলেই আমরা স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত নই; তোমরাও বলছ যে, অখণ্ড ভারতকে স্বাধীনতা দিলে অন্যায় করা হবে, পাকিস্তানই এর একমাত্র সমাধান। তোমরাও বুঝতে চাইছ না যে, হিন্দু-মুসলমান কেন, ইচ্ছা করলে রাজশক্তি পিতা-পুত্র স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটিয়ে দিতে পারে অনুগ্রহ-নিগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে। তোমরা 'ফুড ফ্রণ্ট' করে এদেশের পুঁজিবাদীদের নাস্তানাবুদ করেছ, কিন্তু আসল পুঁজিবাদীর রোমটি পর্যন্ত স্পর্শ করনি। ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহ করবার জন্যে তোমরা একদা উৎকণ্ঠিত ছিলে, সেই বিদ্রোহ যখন সত্যি সত্যি হল, তখন তোমরা শুধু সরেই দাঁড়ালে না, তার বিরুদ্ধচারণও করতে লাগলে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট অজুহাতে। কোনও স্বাধীনতাকামী লোকই ফ্যাসিজ্‌মের সমর্থন করে না, কিন্তু তোমাদের অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট আচরণগুলো বড় বেশি রকম পরস্পরবিরোধী। কেউ যদি মনে-প্রাণে জীবহত্যাবিরোধী বৈষ্ণব হতে চায়, তা হলে কেউ আপত্তি করবে না, অনেকে তাকে ভক্তিও করতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যদি কসাইখানা নির্মাণে সাহায্য করে, তাহলে ব্যাপারটা সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। তোমাদের গুরু স্টালিন স্বদেশপ্রীতির জন্য মানবপ্রীতি বিসর্জন দিতে ইতস্তত করেননি—এক কথায় থার্ড ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন; কিন্তু

তোমরা স্বদেশের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টাকে বাধা দিলে বিদেশী ফ্যাসিজ্‌মকে ধ্বংস করবার অজুহাতে। এ তোমাদের কেমন গুরুভক্তি, বুঝি না। সুতরাং সন্দেহ হয়, গুরুতর ভক্তি করবার মত কোনও দেবতার সন্ধান পেয়েছ হয়তো কাছে-পিঠে। ফ্যাসিজ্‌ম্ ধ্বংস করাই যদি তোমাদের নীতি, তা হলে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের সম্পর্কে ইংরেজও কি কম ফ্যাসিস্ট? তোমরা বলবে, আমরা তো তার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করছি। কিন্তু যার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করছ, সে-ই যখন তোমাদের পিঠ চাপড়াচ্ছে, তার নিজেরই বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা ছাপাবার জন্যে প্রচুর কাগজ দিচ্ছে, তখন ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকে। সামান্য বিরোধিতার জন্যে যারা গুলি চালিয়ে হাজার হাজার লোক মেরে ফেলতে ইতস্তত করে না, মেদিনীপুর চট্টগ্রাম উজাড় করে দেয়, দেশের নেতাদের বিনাবিচারে আটকে রাখে বছরের পর বছর, তারা তোমাদের সম্পর্কে এমন মহৎ হয়ে উঠল কি করে? হয়তো এ সমস্তরই উপযুক্ত জবাবদিহি তোমাদের কাছে আছে, হয়তো আমি যা বুঝেছি তা সমস্তই ভুল (আহা, তাই হোক), হয়তো আমি এত কথা লিখতামও না, কিন্তু আমি কেন তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আর রাখতে পারিনি, তা জানতে চেয়েছ বলেই অকপটে সমস্ত কথা খুলে বলতে হল, তা না হলে এসব অপ্রিয় আলোচনা তোলবার ইচ্ছে ছিল না। কারণ আমি জানি, আলোচনা দ্বারা তোমাদের স্বপক্ষে আনতে পারব না। তোমরা তর্কপটু চীৎকারদক্ষ বিদ্বান লোক, তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভবই হবে না হয়তো। এর উত্তরে তুমি যে কড়া জবাব দেবে, তার প্রত্যুত্তর দেবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তিও আমার আর থাকবে না সম্ভবত। তবু এত কথা লিখলাম, কেবল নিজের আচরণের সঙ্গতিরক্ষার জন্য।

একটা কথা আমি বুঝেছি, কারও উদ্দেশ্য যদি মহৎ এবং আচরণ যদি অকপট হয়, তাহলে কেবল মতবিরোধের জন্য কেউ তাকে ঘৃণা করে না। ভণ্ডই ঘৃণ্য। বিয়ে করবার পর আত্ম-আবিষ্কার করে আমি চমকে গেছি। সেজে-গুজে আমি যে তোমাদের পার্টিতে রোজ যেতাম, এতে আমার মা আপত্তি করলে তাঁদের মুখের উপর কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতে আমার আপত্তি ছিল না, দিয়েছিও কতবার, গুরুজনদের মুখের উপর কড়া জবাব দেওয়াটাই ছিল আমার বাহাদুরি। ঔদ্ধত্য যদিও কোন কারণেই মার্জনীয় নয়, তবু তা মানিয়ে যেত যদি আমার উদ্দেশ্য মহৎ এবং আচরণ অকপট হত। শ্রমিকদের উদ্ধারের ছুতোয় যা করতাম, চলিত ভাষায় তার নাম--আড্ডা দেওয়া এবং অত্যন্ত বাজে কাজে সময় নষ্ট করা। তার মধ্যে ত্যাগ ছিল না, ছিল মুখোশ-পরা স্বার্থপরতা। তার প্রমাণ, শেষ পর্যন্ত ওই আড্ডা থেকেই স্বামী নির্বাচন করে ঘর-সংসার গুছিয়ে বসেছি। শ্রমিকদের নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে হঠাৎ। আমার কমরেড স্বামীটিও ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় অনেক বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্র ক্যাপিটালিস্ট গভর্মেণ্টের অধীনে চাকরি নিতে তাঁর বাধেনি; এখন তাঁর হুকুমে পুলিস গুলি চালাচ্ছে ওই শ্রমিকদেরই উপর, কিষাণদের কাছ থেকে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করছেন তিনি। গুজব--শীঘ্রই রায়সাহেব হবেন নাকি কর্মপটুতার জন্য। তুমিও তাঁর ভক্ত ছিলে একজন, সেদিন তোমার এক তাড়া চিঠি আবিষ্কার করলাম তাঁর ড্রয়ার থেকে। এখনও তুমি তাঁকে ভক্তি করতে পারছ কি না জানি না (শুনেছি, ভক্তির বিশুদ্ধতা নির্ভর করে ভক্তের একনিষ্ঠার উপর, ভক্তিভাজনের গুণাগুণের উপর নয়), আমি কিন্তু আর পারছি না। আত্ম-আবিষ্কার করে নিজেরই উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি! ছি ছি, কি লজ্জা! এতদিন যেটাকে

তরবারি বলে আস্ফালন করেছিলাম, দেখছি, তাতে খাঁটি ইস্পাতের নাম-গন্ধ নেই, ঝুটো বীরত্বের রাঙতা দিয়ে মোড়া বাঁখারি সেটা। অশ্রদ্ধায় আত্মগ্লানিতে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

...আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। মানুষের মন শ্রদ্ধা করবার জন্য সতত উন্মুখ। দেহের ক্ষুধার মত এটিও একটা ক্ষুধা। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে শ্রদ্ধেয়কে খুঁজে বেড়ায়। সমাজ বা শাস্ত্র যাঁদের শ্রদ্ধা করতে বলেছেন, যেমন পিতা, মাতা বা স্বামী, তাঁরা সত্যিই যদি শ্রদ্ধাস্পদ হন, তাহলে জীবন চরিতার্থ হয়ে যায়; কিন্তু যদি না হন, তা হলে মন ভুল করে না। সমাজ বা শাস্ত্রের শাসন মেনে আমরা লেবেল-মারা পূজনীয়দের প্রতি মৌখিক একটা শিষ্টাচার করি বটে, কিন্তু মনে মনে আমরা সন্ধান করে বেড়াই সত্যিকার শ্রদ্ধেয়কে। নিরন্তর এই সন্ধান চলেছে। দেহের ক্ষুধার মত এও অনিবার্য। এর প্রেরণায় মন ঘুরে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে, পুস্তক থেকে পুস্তকান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরেও হয়তো।

অংশুমানবাবুকে দেখে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ হবার কারণ আমার নিজের মধ্যেই ছিল। যে নিজে ভণ্ড, সে সত্যিকার ধার্মিককে প্রথমে চিনতে পারে না, ভণ্ড বলে মনে করে। তার নিজের দৃষ্টিই বক্র, মন স্বচ্ছ নয়, সে সহজে প্রসন্ন মনে কারও মহত্ত্ব স্বীকার করতে পারে না, নিজের ক্ষুদ্র চরিত্রের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে গিয়ে সকলকেই সে ছোট করে ফেলে। অহঙ্কারবশে ভাবতেই পারে না যে, কেউ তার চেয়ে বেশি ভালো হতে পারে। সত্য কিন্তু চাপা থাকে না বেশিদিন। অন্ধকারবিলাসী পেচককেও শেষ পর্যন্ত সূর্যের মহত্ত্ব স্বীকার করতে হয়। পেচক বিস্মিত হয় কি না জানি না, আমি কিন্তু হয়েছিলাম, ওইখানেই বোধ হয় আমি পেচকের চেয়ে বড়। পরে ভেবে দেখলাম, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই! এরাই তো চিরন্তন অগ্রণী, সর্বকালে সর্বদেশে এরাই তো আদর্শের পতাকা বহন করেছে প্রাণ তুচ্ছ করে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে সমস্ত সত্তা দিয়ে, আষাঢ়ের নবোদিত জলধরের মত আত্মবিসর্জন দিয়ে ধন্য করেছে পিপাসিত পৃথিবীকে। এরা বিশেষ কোন দলেরও নয়, দেশেরও নয়। এরা কংগ্রেসে আছে, কমিউনিস্ট পার্টিতে আছে, হিন্দু মহাসভায় আছে। প্রাণের আবেগটাই এদের কাছে মুখ্য, দলটা নয়। প্রাণের আবেগে যে-কোনও একটা দলে নাম লিখিয়ে এরা প্রাণপণ করে আদর্শ পালন করবার জন্য। আদর্শই এদের লক্ষ্য, দলটা উপলক্ষ্য মাত্র। অনেক সময় কোনও দলে নাম লেখাবার প্রয়োজনও হয় না এদের। এ সবই জানতাম। তবু যখন আগস্ট-আন্দোলনের ঢেউ আলোড়িত করে তুলল চতুর্দিক, বিক্ষুব্ধ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আক্ষেপে সমস্ত দেশ বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল, দোষী-নির্দোষ বিচার না করে বেপরোয়া মিলিটারি গুলি যখন রক্তস্রোত বইয়ে দিলে দেশের বুকে, ইতর-ভদ্র সবাই যখন সন্ত্রস্ত—কখন কি হয়, আমাদেরই এই শহরে ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে পুলিস ঢুকে থামে-বাঁধা স্বামীর সামনে ধর্ষণ করে গেল যখন তার স্ত্রীকে, বৃদ্ধ বাপকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে দিলে, লোকের ঘর-বাড়ি নীলাম করে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করতে লাগল, তখন আমরা ঘরে খিল দিয়ে আরাম-কেদারায় বসে বসে 'রেন্‌বো' উপন্যাসে নাৎসি জার্মানির অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করতে করতে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম, আর কিছু করিনি। যদিও আমাদের দলের অনেকে বড়াই করে বেড়াচ্ছেন—'অন্ প্রিন্সিপ্‌ল্' করিনি; আমি কিন্তু অকপটে স্বীকার করছি—করবার সাহস হয়নি। এসব নিয়ে বৈঠকখানায় বসে আলাপ করবার সাহস পর্যন্ত হয়নি স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে। অন্তরঙ্গদের কাছে নিম্নকণ্ঠে আলাপ করবার আগেও বাইরে গিয়ে

দেখে এসেছি, আশেপাশে কেউ আছে কিনা! কলেজ-জীবনে যাঁর শ্রমিকদুঃখকাতরতার অন্ত ছিল না, প্রাক্তন কমরেড আমার সেই স্বামী যখন সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনী নিয়ে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্খলা-স্থাপনে ব্যস্ত এবং আমি যখন ব্যস্ত সেই স্বামীর পরিচর্যায়, তখন বিস্মিত হলাম অংশুমানবাবুর কাণ্ড দেখে। অতিশয় অপ্রত্যাশিত বলে মনে হল ঘটনাটা। আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে প্রকাশ্য দিবালোকে সভা করে ওই মুখ-চোরা ছেলেটি ঘোষণা করলে—এর প্রতিশোধ আমরা নেব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা, এই হীন অপমান কিছুতেই সহ্য করব না, প্রাণ দিয়েও প্রমাণ করব যে, প্রাণের চেয়েও মান আমাদের কাছে বড়।

...আমি জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। দেখলাম—ওর চোখে মুখে অপূর্ব দিব্য-জ্যোতি ফুটে উঠেছে। কেন জানি না, হঠাৎ রাণা প্রতাপসিংহের কথা মনে পড়ে গেল। অত্যন্ত ছোট মনে হতে লাগল নিজেকে।...

ও-ই একমাত্র লোক যার সঙ্গে মাঝে মাঝে রাজনীতি নিয়ে চর্চা হত, দেশের দুঃখ কষ্ট নিয়ে আলোচনা করতাম। আমাদের এ ধরনের আলোচনা যে কি রকম হয়, তা তোমাদের অজানা নেই নিশ্চয়। নিজেকে জাহির করবার আবেগে আত্মপ্রশংসার ফুলঝুরি কাটতে কাটতে এমন তন্ময় হয়ে যেতাম যে, ওর নীরবতাটা প্রথম প্রথম চোখেই পড়ত না। ও নীরবে বসে শুনত খালি। এমন একটা বিদ্বান ছেলে নীরবে আমার কথা শুনে যাচ্ছে বিনা প্রতিবাদে—যদিও এমন ঘটনা আমার জীবনে কখনো ঘটেনি, কারণ ইতিপূর্বে যাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাদের মধ্যে শ্রোতা ছিল না, বক্তা ছিল সবাই—তবু ওর নীরবতা বিস্মিত করেনি আমাকে। মনে হত, ওটা আমার প্রাপ্য। সূক্ষ্ম একটা গর্বও অনুভব করতাম। ওর সশ্রদ্ধ নীরবতার অর্থও আমি করেছিলাম—আহা, বেচারা বই মুখস্থ করে পরীক্ষাই পাস করেছে খালি, দেশের কোনও খবর রাখে না, দেশের সম্বন্ধে কোনও চিন্তাই করেনি বোধ হয়। দরিদ্র মজুর অসহায় কৃষকদের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার—এ কথা হৃদয়ঙ্গম করবার মত শিক্ষা হয়নি বেচারার, তাই আমার কথা শুনে তাক লেগে গেছে। ডেপুটি-গৃহিণী আমি, মনোহর শাড়ি ব্লাউজে সজ্জিত হয়ে সর্বাঙ্গে অলঙ্কারের ঝনৎকার তুলে গদি-আঁটা সোফায় বসে বিলিতি কফির পেয়েলায় চুমুক দিতে দিতে দেশের দরিদ্র মজুর ও কৃষকদের মর্মস্পর্শী আলোচনা করতাম। ও চুপ করে শুনত।

...তারপর এল আগস্ট-অন্দোলন। সেই আন্দোলনের পটভূমিকায় অংশুমানবাবুর স্বরূপ দেখে লজ্জায় মরে গেলাম। নিমেষে বুঝতে পারলাম, আমি চালিয়াৎ, ও কর্মী ; আমি ভীরু, ও বীর; যে পুলিসের সম্বন্ধে কথা কইতে আমার গলার স্বর স্বতই খাটো হয়ে পড়ে, ও এগিয়ে যেতে পারে সেই পুলিসের অত্যাচার প্রতিরোধ করবার জন্যে। ওতে আর আমাতে কত তফাত! মনে হল, এ কথা ওরও নিশ্চয় অবিদিত নেই। না জানি মনে মনে কত হেসেছে আমার লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনে। ওর সামনে দাঁড়াব কি করে—এই সমস্যায় যখন আমি আকুল, ও-ই তখন এসে তার সমাধান করে দিয়ে গেল।

...অন্ধকার রাত্রি। স্বামী টুরে বেরিয়ে গেছেন। কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। বন্দুক ঘাড়ে করে মিলিটারি পুলিস ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। নিঃশব্দচরণে অংশুমান এসে দাঁড়াল। ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল, সেই ক্ষণনিবদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে কি যে দেখলাম আমি, আমার সমস্ত চিত্ত বিকশিত হয়ে উঠল, মনে হল, ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি, চরিতার্থ হয়েছি।

তারপর স-সঙ্কোচে সে বললে, তোমার কাছে একটু দরকারে এসেছি...। আমার এক দূরসম্পর্কের দাদা ওর সহপাঠী ছিল, তাই ও আমাকে 'তুমি' বলত। সেই সূত্রে আলাপও হয়েছিল।

আমার কাছে কি দরকার?

সত্যিই অবাক লাগছিল, ভয়ও হচ্ছিল একটু-একটু।

যে কাজে নেমেছি, তাতে টাকার দরকার। কিছু দিতে পারবে তুমি? আমাদের অবস্থা তো জানই, কিছু টাকা পেলে সুবিধা হত। পারবে দিতে?

সংসার-খরচের কয়েক টাকা মাত্র হাতে ছিল। টাকা-কুড়ি-পঁচিশের বেশি নয়। সে কটা হাতছাড়া করবারও উপায় ছিল না, কারণ স্বামী টুরে, ব্যাঙ্ক বন্ধ। সংসার অচল হয়ে পড়বে। তবু কিন্তু এ সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে হল না। মনে হল, হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের এই একমাত্র উপায়। উঠে গিয়ে দেরাজটা খুললাম। যে জড়োয়া গয়নাগুলো আমার প্রিয়তম সম্পত্তি ছিল, তার বাক্সটা বার করে এনে দিলাম তার হাতে।

টাকা নেই। এইগুলো নিলে যদি হয়, নিয়ে যাও।

সে একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইলে আমার মুখের দিকে। তার পর বেরিয়ে চলে গেল! আর ফেরেনি।

এই ঘটনাটুকুর যে বৈজ্ঞানিক নির্যাস তুমি বার করবে তা আমি জানি। তবু তোমাকে সব কথা খুলে লিখলাম কেন, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি, তা হয়তো আমার পক্ষে অপমানজনক (মান-অপমানের প্রচলিত মানদণ্ড অনুসারে); তা হোক, তবু কোদালকে কোদাল বলতে আমি বাধ্য। নিজের এতবড় একটা কৃতিত্বের কথা তোমাকে না জানিয়ে পারছি না ভাই কিছুতেই। মনে হচ্ছে এই বোধ হয় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মনে হচ্ছে, এতদিনে নিজেকে ভারতবর্ষীয় নারী বলে পরিচয় দেবার সামান্য যোগ্যতা বোধ হয় অর্জন করলাম। তোমরা ইচ্ছে কর তো কমরেড অন্তরার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করতে পার।

.. কিন্তু ভুল বুঝো না আমাকে। মনে করো না যে, আমি কমিউনিজমের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন। যে সাম্যের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের দলে যোগ দিয়েছিলাম, তোমাদের দলে তার অভাব দেখে সে দলের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছি, কিন্তু সাম্যের আদর্শ আমার ঠিক আছে। ওইটেই তো মানুষের চিরন্তন আদর্শ। তা ছাড়া কোন ইজ্‌মের উপরই আমার রাগ নেই, কারণ এটা বুঝেছি যে, সব নদীই শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়ে মিশবে যদি তার গতি অব্যাহত থাকে। ইজ্‌মটা বাইরের জিনিস, আসল জিনিস মনুষ্যত্ব। আমরা অনেকেই বাইরের খোসাটার নকল করে মরছি, অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের সাধনা করবার ধৈর্য আমাদের নেই—এইটেই আমার দুঃখ। চিরকালই আমরা এই করে এসেছি। আর্য ঋষিদের যজ্ঞক্রিয়া পাঁঠা-খাওয়া-উৎসবে পরিণত হয়েছে, বুদ্ধসঙ্ঘ পরিপূর্ণ করেছে অনাচারী শ্রমণ-শ্রমণীর দল, চৈতন্যের ধর্ম নেড়া-নেড়ীর ব্যভিচার হয়ে দাঁড়াল, মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলনকে মূলধন করে কতকগুলো খদ্দরধারী গুণ্ডা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে বেড়াচ্ছে। কমিউনিজমের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কাস্তে-হাতুড়ির লেবেল মেরে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যা করে বেড়াচ্ছে, তা মনুষ্যত্ব-চর্চা নয়, আত্মবিনোদন। জীবনের বাঁধা-ধরা পথে চলবার সুযোগ কিংবা সামর্থ্য এদের অনেকের নেই,

অধিকাংশই জীবনযুদ্ধে অকৃতী। বিয়ে করেনি, নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাবার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। বাবা, দাদা বা ওই জাতীয় কারও ঘাড়ে চড়ে পরশ্রীকাতরতার বিষোদ্‌গিরণ করে বেড়াচ্ছে কেবল এবং নিজেদের অক্ষমতার দৈন্যটাকে ঢাকতে চেষ্টা করছে কমিউনিজ্‌মের ঢক্কানিনাদে। বোঝে না যে, অশক্ত অসংযত ভণ্ড বা স্বার্থপর লোক গায়ে একটা লেবেল আঁটলেই লেনিন স্ট্যালিন হয়ে ওঠে না। তার জন্য সাধনা চাই, চরিত্রবল চাই। যে-কোন একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া ফড়ফড় করে কমিউনিজ্‌মের বুলি আওড়ায় যখন, তখন লজ্জা হয় আমার। কবে আমরা বুঝতে শিখবো যে, শুধু বুলি আওড়ালেই সিদ্ধি হয় না। সিদ্ধির জন্য সাধনা চাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুকরণে অনেকেই এ দেশে দাড়ি রেখে উপনিষদের বুলি আওড়ালে, কিন্তু তার ফল কি হয়েছে?...

এত দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা পেয়েছি একটি কথা ভেবে যে, অধিকাংশই মেকি হতে পারে, কিন্তু খাঁটি লোকও আছে। এরা আছে বলেই আশা আছে। ইতিহাসে এদের কাহিনী পড়েছি, আমাদের দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবে দেখেছি এদের দ্যুতিমান আবির্ভাব। এরা সংখ্যায় কম। তাতে ক্ষতি নেই; একটি সূর্যই অন্ধকার ধ্বংস করে। আর আমার বেশি কিছু বক্তব্য নেই। আশা করি, যা বললাম তার মধ্যেই তোমার চিঠির উত্তর পেয়েছ। আমার ভালোবাসা জেনো। ইতি—

তোমারই

অন্তরা

।। এগারো।।

ইলেকট্রিসিটির বইখানা নিয়ে গেছে। মনের সঙ্গে যে নির্জনে বোঝাপড়া করব তারও উপায় নেই। দু ঘণ্টা অন্তর পুলিশের লোক আসছে। প্রতিবারই নূতন লোক। জেরা চলছে ক্রমাগত। সঙ্গত-অসঙ্গত নানা প্রশ্ন। গাল দিচ্ছে। তাকে, তার বাবাকে, বংশকে, দেশকে, দেশের নেতাদের। অকথ্য, অশ্রাব্য গালাগালি...ঘুমে চোখ বুজে আসছে, দেহ অবসন্ন, কিন্তু ওরা থামবে না। দু ঘণ্টা অন্তর নূতন লোক আসছে। জেরার পর জেরা, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, গালাগালির ঝড় বইছে। ঘুমুতে দেবে না। নির্বাক হয়ে শুনে যেতে হচ্ছে খালি। নির্বাকও থাকতে দিচ্ছে না...সঙ্গত অসঙ্গত নানা প্রশ্ন...যা হোক কিছু একটা উত্তর দিতেই হচ্ছে...একই উত্তর সহস্রবার দিয়েছে, আবার দিতে হচ্ছে। চুপ করে থাকলে গাল দিচ্ছে। জানি না, জানি না, জানি না—কতবর বলা যায় এক কথা! কিন্তু ওরা থামবে না। একই কথা শুনবে বার বার। বলছে—বলে যাচ্ছে ক্রমাগত। বসতে দেবে না, দাঁড় করিয়ে রেখেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শরীরের রক্ত ফুটছে টগবগ করে, জিব শুকিয়ে আসছে, জোর করে চাইতে গিয়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাইরে শান্তভাব বজায় রেখে তবু বলে যেতে হচ্ছে—জানি না, জানি না, জানি না।

শেষ সি. আই. ডি. ইনস্পেক্টার বিদায় নিয়ে যাবার আগে বলে গেলেন, তিনটে বাজল, এবার উঠি, আবার আসব কাল। ভাল করে ভেবে দেখুন ইতিমধ্যে।

অন্ধকার ঘরে একা রইল অংশুমান।

।। বারো।।

নিশ্ছিদ্র নিবিড় অন্ধকার।

পথ। যে পথ মানুষ সৃষ্টি করে গতিকে মুক্তি দেবার জন্যে সেই পথই আবার মানুষ বন্ধ করে মানুষেরই গতি রোধ আকাঙ্ক্ষায়। মানুষই মানুষের সর্বপ্রধান শত্রু...

ঠক্ ঠক্ ঠকাঠক্...সন্তর্পণে, কিন্তু অনবরত পড়ছে আঘাতের পর আঘাত। দশজন অন্ধকারে প্রাণ তুচ্ছ করে কুড়ুল চালিয়ে যাচ্ছে। গাছ ফেলে রাস্তা বন্ধ করতে হবে। মিলিটারি মোটর না আসতে পারে যেন। ঘর্মাক্ত কলেবরে কুড়ুল চালাচ্ছে সবাই। ধরা পড়লে মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও। হাত কাঁপছে না কারও। দৃঢ়-নিবদ্ধ ওষ্ঠ, চোখে আগুন জ্বলছে সকলের। সকলেই যুবক নয়। বৃদ্ধ আছে, বালকও আছে।

নিন বাবু মশায়, আমার নৌকোটাও।

সারি সারি নৌকো জমা হচ্ছে ঘাটে-আঘাটায়। প্রত্যেকটার তলা ফেঁড়ে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মালিকরা নিজেরাই দিচ্ছে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দিতে হচ্ছে সকলকেই। দেশব্যাপী এই অপমানের প্রতিবাদ করতেই হবে। নদী পেরিয়ে পুলিশ যেন না আসতে পারে। জনতার বিপুল দাবি, দিতেই হবে নৌকো সকলকে। দেখতে দেখতে সব কটা নৌকো ডুবে গেল। ওপারের দিকে চাইলে অংশুমান। অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। আকাশে মনে হল মেঘ করেছে একটু। মেঘের কোলে নক্ষত্র জ্বলছে। এক ঝলক হাওয়া ছুটে এল কোথা থেকে আচমকা। তালগাছের পাতাগুলো হুড়মুড় করে উঠল। শিহরন জাগল নদীর জলে। অংশুমান সওয়ার হল বাইকে, অনেক জায়গায় যেতে হবে এখনও।

মার গাঁইতি, হ্যাঁ দাও আর এক ঘা—

আরে, কোদাল চালাও না ওই দিকটাতে? ভয় কি, ভাবছ কি তুমি?

মায়া হচ্ছে।—হেসে বললে একজন, নিজের হাতে গেঁথেছিলাম একদিন...

হ্যাঁ, চার আনা মজুরির বদলে, সাহেবদের মোটর যাবে বলে।

পড়তে লাগল কোপের পর কোপ।

হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল পুলটা।

ছুটল সবাই অন্ধকার মাঠ ভেঙ্গে।

অদৃশ্য হয়ে গেল নিমিষে...

রাস্তায় বড় বড় গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। টেলিগ্রাফের তার একটাও নেই। খুঁটিগুলো পর্যন্ত উপড়ে ফেলেছে সবাই মিলে। টেলিফোনের তারও কাটা হয়ে গেছে...। অংশুমানের দেখা হয়ে গেল হঠাৎ দারোগারই সঙ্গে।

কে?

প্রদীপ্ত টর্চের আলোটা পড়ল মুখের উপর। পালাবার উপায় রইল না। বাইক থেকে নামতে হল।

আমি অংশু।

আপনি! এত রাতে এদিক কোথা গিয়েছিলেন?

মনে হল, কতকগুলো লোক টেলিগ্রাফের তার কাটছে, তাই বেরিয়েছিলাম যদি তাদের ধরতে পারি...

পাগল করে দেবে দেখছি ব্যাটারা। গেল কোন্ দিকে? আমিও তাদের সন্ধানে বেরিয়েছি।

ওই যে ওই দিকে, বাগানের অন্ধকারে সরে পড়ল সব।

যেদিকে লোকগুলো সত্যিই পালিয়েছিল, ঠিক তার উল্টো দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলে অংশুমান। বিভ্রান্ত দারোগা ছুটল সেই দিকে...

...পোল্যাণ্ড।

একটি ছোট বোর্ডিং স্কুল। পঁচিশটি মেয়ে সারি সারি বসে আছে। কুৎসিত-দর্শনা একটি শিক্ষয়িত্রী পড়া নিচ্ছেন। দশ বছরের একটি মেয়ে মেরী সক্লাডোওয়াস্কা পড়া বলে যাচ্ছে। পোলিশ ভাষায় পোল্যাণ্ডের একটি রাজার কাহিনী। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই। টু' শব্দটি নেই। বে-আইনী কাজ হচ্ছে। জার-শাসিত পোল্যাণ্ডে পোলিশ ভাষায় কিছু পড়াবার হুকুম নেই। তবু কিন্তু পড়ানো হচ্ছে লুকিয়ে। স্কুলের দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে হেডমিস্ট্রেস্ পর্যন্ত সকলেই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অন্যায় আইন মানবে না তারা।...হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক ঘণ্টাটা বেজে উঠল—জোরে নয় আস্তে। সঙ্কেত! চমকে উঠল সবাই। নিশ্চয় আসছে কেউ। নিমেষের মধ্যে চারটি মেয়ে ইতিহাসের বইগুলো কুড়িয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ত্বরিতপদে। সেগুলো লুকিয়ে রেখে ফিরে এল আবার। সেলাই নিয়ে বসল সব, যেন এতক্ষণ সেলাই নিয়ে ছিল সবাই। রাশিয়ান ইন্‌স্‌পেক্টর ঘরে ঢুকলেন!

শিক্ষয়িত্রীটি উঠে বললেন, এ দু ঘণ্টা আমরা মেয়েদের সেলাই শেখাই...

আপনি কি যেন পড়ছিলেন একটা?

ওদের গল্প পড়ে শোনাচ্ছিলাম! এই যে...

রাশিয়ান হরফে ছাপা কেতাদুরস্ত একখানা গল্পের বই আগে থাকতে টেবিলে রাখাই ছিল, দেখালেন সেটা। সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে সেটা উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে রাশিয়ান ইন্‌স্‌পেক্টর তার পর পরীক্ষা শুরু করলেন। রাশিয়ার জারেদের নাম, তাদের জাতিগোষ্ঠীর নাম, তাদের প্রত্যেকের উপাধি কি কি, খটমট নামের বিরাট বিরাট তালিকা আবৃত্তি করতে হল। নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করে গেল সেই দশ বছরের মেয়েটি। মেরী সক্লাডোওয়াস্কা...ভবিষ্যৎ মাদাম ক্যুরি।

শত্রুর কাছে মিছে কথা বলায় পাপ নেই।

...না, না...।

আপনি কি দেখেছিলেন?

আমি দেখেছিলাম যে, উনি বাইক করে এসে ভলাণ্টিয়ার যোগাড় করছিলেন তার কাটবার জন্যে। আমাকেও যেতে বলেছিলেন।

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অংশুমান। সাক্ষীর পর সাক্ষী আসছে যাচ্ছে। সে কিন্তু কিছু শুনছে না। তার মানসপটে জাগছে ছবির পর ছবি। আর কানে বাজছে—যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাব...। অদৃশ্য অপরা-তড়িৎ ক্রমাগত বলে চলেছে পরা-তড়িতের উদ্দেশে—যাব, যাব, তোমারই কাছে যাব...

হ্যাঁ যাবই, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যাব...

এগিয়ে চলেছে জনতা। সামনেই থানা। লাল-পাগড়িতে ভরে গেছে চারদিক। খাকি-পোশাক-পরা মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে বেওনেট উঁচিয়ে। জনতা এগিয়ে চলেছে তবু।

ফ্যায়ার...

শুরু হয়ে গেল গুলি। পতাকাধারী পড়ে গেল একজন। পতাকা পড়ল না কিন্তু...ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত বীরের দৃঢ়মুষ্টিতে সোজা খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ প্রাণ ছিল, পতাকার মান রেখেছিল সে। গুলি চলছে... লোক মরছে। অগ্রগতি বন্ধ হচ্ছে না কিন্তু...এগিয়ে চলেছে জনতা...

সর্বাঙ্গে গুলি লেগেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক, গিরগিটির মত হামাগুড়ি দিয়ে বুকের ভরে এগিয়ে চলেছে একজন। দুটো পা-ই জখম হয়েছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই। কিন্তু তবু সে যাবে, মরবার আগে থানায় সে পৌঁছবেই। পণ সে রক্ষা করবেই...

এসেছি, এসেছি এই দেখ, তোমরাও এস...

থানার বারান্দায় উঠে হাসিমুখে বলে উঠল সে। রগের উপর একটা গুলি বিঁধল এসে। মুখ থুবড়ে পড়ল। মুখে হাসি।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিস্পন্দ অংশুমান ছবির পর ছবি দেখছে শুধু, হঠাৎ জজ সাহেবের মুখটা চোখে পড়ল। দেশী জজ। যা শুনছে তাই লিখে যাচ্ছে, যে যা বলছে তাই টুকে যাচ্ছে। নির্বিকার। একটা গল্প মনে পড়ে গেল। গল্প নয়, ইতিহাস। ট্রট্স্কির লেখা রাশিয়ান বিদ্রোহের ইতিহাসে আছে—চতুর্দিকে বিদ্রোহ যখন আসন্ন, অত্যাচারে অবিচারে ষড়যন্ত্রে রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত যখন ব্যতিব্যস্ত, ঘরে বাইরে কোথাও স্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই, প্রলয়ের ঢেউ প্রাসাদের সিংহদ্বারে যখন ভেঙ্গে পড়ছে, তখন জার নিকোলাস নাকি নিরতিশয় উদাসীন ছিলেন। প্রমাণ তাঁর তখনকার রোজনামচা। অনেকক্ষণ বেড়ালাম, দুটো কাক মারলাম, দিনের আলোয় বসে চা খাওয়া গেল, পাতলা কামিজ গায়ে দিয়ে বেরিয়েছি আজ, নৌকো বাইলাম, একটু পড়েছি—রোজনামচায় এইসব লেখা খালি। আসন্ন বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি কথা নেই, স্বাভাবিক ছন্দে জীবন বয়ে চলেছে যেন। সামান্যতম উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানীরা পোর্ট আর্থার দখল করেছিলেন যখন, তখনও তিনি নাকি এমনই নির্বিকার ছিলেন। তাঁর পারিষদরা তাঁর অদ্ভুত আত্মসংযম দেখে অবাক হয়ে যেতেন, অনেকে বলতেন, এ ঔদাসীন্য আভিজাত্যের লক্ষণ। ট্রটস্কি বলেছেন, এর আসল কারণ আধ্যাত্মিক দৈন্য। উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত হতে হলে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, নিকোলাসের তা ছিল না। তিনি ছিলেন জন্ম-অসাড়। এ লোকটাও তাই নাকি।...অংশুমান আর একবার জজ-সাহেবের মুখের দিকে চাইলে। জীবনের কোন লক্ষণ নেই। যে জাল ছিন্ন করবার জন্যে দেশসুদ্ধ লোক বিদ্রোহ করেছে, সে জালে উনিও যে আবদ্ধ তার কোন বোধ ওঁর চোখে মুখে পরিস্ফুট নয়। মানুষ নয়, একটা মুখোশ-পরা যন্ত্র বসে আছে কোট প্যান্ট পরে, যে যা বলছে টুকে যাচ্ছে...

মেঘ করে আসছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের খানিকটা। পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন নীল মেঘে ছেয়ে ফেলেছে চারিদিক। তাদের বাড়ির পাশে যে কদমগাছটা আছে, তার পুষ্পকেশরে কি রোমাঞ্চ জেগেছে। চারিদিক কি স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে আসছে। কি নিবিড়। সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ...হঠাৎ মেঘদূত মনে পড়ে গেল। ত্বমারূঢ়ং পবন পদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তঃ

প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বস্যাত...আজও কি পথিকবনিতারা বিশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে অলকদাম উত্তোলন করে পবনপথারূঢ় আষাঢ়ের মেঘের দিকে চেয়ে থাকে...দেশের কি সে অবস্থা আছে এখন আর? অন্তরা কোথায় এখন কি করছে, কি ভাবছে, ডেপুটির গৃহিণী হয়ে সুখে আছে কি সে, তার মত মেয়ের পক্ষে থাকা সম্ভব কি, জড়োয়া গয়নার কথা তার স্বামী কি টের পেয়েছে?...

দপ্ করে ইলেক্ট্রিক আলো জ্বলে উঠল। "যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাচ্ছি, নানা বাধা-বিঘ্ন বহু জটিল পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে, কিন্তু তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছবই..."

অপরা-তড়িত পরা-তড়িতের কাছে যেতে যায়, তাই তো আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে, এরোপ্লেন ওড়ে, রেডিও বাজে। তার এ আগ্রহ না থাকলে থেমে যেত সব। অংশুমানের মনে হল, এমনই এক-একটা আগ্রহের টানেই তো গড়ে উঠেছে এক-একটা সভ্যতা। স্বর্গের টানে বৈদিক, ব্রহ্মের টানে ঔপনিষদিক, নির্বাণের টানে বৌদ্ধ, প্রেমের টানে বৈষ্ণব, অপরা-তড়িতের টানেও তেমনই গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা। অন্তরার টানে সেও হয়তো বড় কিছু একটা করবে। কিন্তু তখনই মনে হল, কতটুকু ক্ষমতা তার, কি করতে পারে সে!

"...যখন দাদোজীর সঙ্গে শিখরে দাঁড়িয়ে ভগবানের সমক্ষে আমি শপথ করেছিলাম যে, ভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের জন্য আমি প্রাণপণ করব, তখন আমার ক্ষমতা কতটুকু ছিল! তখন আমার বয়স আঠারো বছর মাত্র..."

সপ্তদশ শতাব্দীর স্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে এল শিবাজীর কণ্ঠস্বর।

তুমি নয়, আমি নয়, জয়ী হয় ধর্ম। ধর্মের ধ্বজাবাহক আমরা, তাই আমাদের একমাত্র ভরসা। ধর্মই আমাদের একমাত্র শক্তি...

রাজদম্পতির প্রকাণ্ড যে তৈলচিত্রটা টাঙানো ছিল সামনে, তা অবলুপ্ত করে ফুটে উঠল ছত্রপতি শিবাজির ছবি, অশ্বারোহণে ছুটে চলেছেন শত্রুজয় করতে।

আর্তের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

শত্রুর কবলে মরণাপন্ন আমরা নিজেরই ঘরে বন্দী হয়ে আছি, শত্রুর প্রহরী পাহারা দিচ্ছে দ্বারে। অন্ন নেই, পানীয় নেই, কোথায় তুমি ত্রাণকর্তা, ছুটে এস...

ছুটে চলেছে মারহাট্টা বীর হাম্বীর রাও।

প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হল একটা...চমকে উঠল আদালত।

যাবই আমি।—কে যেন বজ্রকণ্ঠে বললে, অংশুমানের মনে হল।

আবেগ যদি প্রবল হয়, দুস্তর বাধাও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় নিমেষে।

অংশুমানের সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সহসা। অন্তরা, অন্তরা, কোথায় তুমি...? পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। পরস্ত্রীর সম্বন্ধে এ কি চিন্তা! এ কি ভাবছে সর্বদা, ছি ছি! কেন এ দুর্বলতা, কেন, কেন, কেন? এই দুর্বল চরিত্র নিয়ে কোন্ সাহসে এই কঠিন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছি! এতটুকু মনের জোর নেই, যুঝব কি করে শেষ পর্যন্ত? এমন দুর্বল চরিত্র নিয়ে যুঝতে কি পেরেছে কেউ কখনও? সহসা শম্ভুজীর ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল—চরিত্রহীন মদ্যপ শম্ভুজী। ঔরঙ্গজেবের বন্দী শম্ভুজী। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে মৃত্যু। রাজী হল না শম্ভুজী। ইসলাম নয়, মৃত্যুকেই বরণ করবে সে। একে একে চোখ উপড়ে নেওয়া হল, তপ্ত লোহার সাঁড়াশি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হল জিব। চরিত্রহীন মদ্যপটা বিচলিত হল না

তবু। শিবাজীর অযোগ্য পুত্র ছিল যে সারাজীবন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে যোগ্যতা অর্জন করলে সে। অন্ধ শম্ভুজী যেন চেয়ে আছে তার দিকে, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল,... যেন বললে, তুমিও পারবে।

আপনি কি দেখেছিলেন?

ডেপুটি সাহেবকে মোটর থেকে জোর করে নামাচ্ছেন উনি।

আর কে ছিল?

অনেক লোক ছিল। আমিও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম, অংশুমানবাবু এগিয়ে গিয়ে ডেপুটি সাহেবের হাতটা চেপে ধরলেন।

সাক্ষীর পর সাক্ষী আসছে, যাচ্ছে।

সকলেরই মুখে এক কথা—স্বচক্ষে দেখেছি।

...আবার সেই নির্জন কারাগার।

সমস্ত মন অসাড় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, সমস্ত জমে গেছে যেন ভিতরে। খটাৎ করে শব্দটা হতেই চমকে উঠল সে। জগদ্দল পাথরের মত অনড় অচল ভাষাহীন যে বোধটা নিদারুণ চাপে নিপীড়িত করছিলাম যাকে, সজাগভাবে যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার উৎসাহ সে পায়নি এতক্ষণ, তালা-বন্ধ হওয়ার শব্দে ভেঙ্গে পড়ল সেটা যেন খানখান হয়ে, ছড়িয়ে পড়ল টুকরোগুলো প্রত্যক্ষ চেতনার সামনে। তার স্বরূপ অগোচর রইল না আর। সব দেশী লোক! জজ দেশী, দারোগা দেশী, পুলিশ দেশী, জেলার দেশী, দলে দলে তার নামে যারা মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে গেল সব দেশী! সে নির্দোষ নয় তা ঠিক, কিন্তু এরা যা বলে গেল তা সব বানানো—একটা কথাও সত্য নয়। কিসের লোভে মিথ্যে কথা বললে এরা?

তুমিও তো সত্য কথা বলনি। তুমিও মিথ্যা কথা বলে চলেছ ক্রমাগত....

অদৃশ্য বিবেকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল হঠাৎ। চমকে উঠল অংশুমান। নিক্তি ধরে এ লোকটা বসে আছে তো ঠিক, এত বিপর্যয়েও বিপর্যস্ত হয়নি একটুও। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যেই। পর-মুহূর্তেই বলে উঠল, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। আমি মিছে কথা বলেছি বৃহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, দুষ্টকে দমন করবার জন্যে, স্বদেশের স্বাধীনতা কামনায়। যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষের জীবনেই এ রকম প্রবঞ্চনার উদাহরণ পাওয়া যাবে। নির্জন অন্ধকারে কথাগুলো অদ্ভুত শোনাল। জোরে বলার কোন দরকার ছিল না তো! পোড়া ডেপুটির মুখখানা চোখের উপর ভেসে উঠল আবার। দাম্ভিক, বর্বর, পাষণ্ড। কামুকও। শুধু যে কর্তব্যকর্মের অনুরোধে বাধ্য হয়ে নারীধর্ষণের হুকুম দিয়েছিল তা নয়, সেটা উপভোগও করেছিল। বহুবার-ধর্ষিতা একটি মেয়ের চেহারা মনে পড়ল। কি অসহায় করুণ দৃষ্টি তার চোখে! মুখে কথা নেই, দাঁড়াতে পারছে না ভালো করে! থরথর করে কাঁপছে, উত্তর দিচ্ছে না কারও কথার...শুনতে পাচ্ছে না বোধ হয়, চেয়ে আছে শুধু। মনে হল, শুধু একজন নয়, সারা দেশ জুড়ে সহস্র সহস্র নারী যেন চেয়ে আছে তার দিকে। এই সব অসহায় মূক-বধিরদের মুখে ভাষা দেবে কে? অসংখ্য রক্তকণা তাণ্ডব নৃত্য শুরু করছে সারা

দেহে...অগ্নির ঝড় বইছে মাথার ভিতর। ন্যায়পরায়ণ বিবেক কোথায় উড়ে গেল সেই ঝঞ্ঝায়! আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল অংশুমান। সমস্ত চেতনা জুড়ে একটি কথাই স্পন্দিত হতে লাগল বারম্বার—এই সব অসহায় মূক-বধিরদের মুখে ভাষা দেবে কে?... আমি কি পারব?

না পারবার কি আছে!

হাস্যপ্রদীপ্ত একখানি মুখ ফুটে উঠল চোখের সামনে। অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে গেল। প্রদীপ্ত চোখদুটি থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ধপধপে সাদা দাড়ি, সাদা চুল, সাদা ভুরু। সমস্ত মুখে কিন্তু ফুটে রয়েছে যৌবনের জয়শ্রী। তারুণ্যের তিলক জ্বলজ্বল করছে প্রশস্ত ললাটের মধ্যস্থলে অদৃশ্য অগ্নিশিখার মত।

মূক-বধিরদের নিয়ে অনেক কাল কাটিয়েছি। তাদের মুখে ভাষা দেওয়া সহজ। তারা জীবন্ত, তারা কথা কইতে উৎসুক। তার চেয়েও শক্ত কাজ আমি করেছি, জড়-লোহাকে কথা কইয়েছি বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে। মড়ার কান চিরে যখন দেখলাম যে, সামান্য একটা পর্দার কম্পনই শ্রুতির কারণ, তখন মনে হল, লোহার পাতলা পর্দায় সে কম্পন সঞ্চার করা অসম্ভব হবে কেন বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে? লেগে গেলুম...

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন। পর-মুহূর্তেই কিন্তু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

ওই দেখ, স্বভাব না যায় মলে! এখনও মনে হচ্ছে, আমি করেছি। পড়েইছ তো, আসলে ব্যাপারটা ভূতুড়ে কাণ্ডের মত অদ্ভুত। ওয়াট্‌সনের ট্রান্‌স্‌মিটিং স্প্রিং একটা বিগড়ে গেল, সে সেটা নিয়ে টানাটানি শুরু করতেই আমি পাশের ঘরে শব্দ শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি, মেক-ব্রেক পয়েণ্ট দুটো জুড়ে গেছে।

ব্যাস্, টেলিফোন আবিষ্কারের খেই পেয়ে গেলাম! কি করে জুড়ল, ঠিক ওই সময় জুড়ল কেন, আমারই বা কানে গেল কেন—সেইটেই রহস্য এবং সেইটেই বোধ হয় আবিষ্কারের আসল কারণ। সে যাক, কিন্তু there's a lesson for you রহস্যটা নয়, ওয়াট্‌সনের ওই গোলমাল করে ফেলাটা—অপ্রত্যাশিতভাবে স্প্রিঙের মেক-ব্রেক পয়েণ্ট দুটো জুড়ে যাওয়াটা। প্ল্যান করে বড় কিছু প্রায়ই হয় না, গোলযোগের মধ্যেই অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে যায়। হিমালয় বা প্রশান্ত মহাসাগর কোন ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যান করে করতে পারত না। সুতরাং বিদ্রোহ করে দেশে বিশৃঙ্খলা এনেছে বলে তোমাদের খুব বেশি লজ্জিত হবার কারণ নেই। বহু বৈজ্ঞানিক বহু বহু বুদ্ধি খাটিয়ে যে সমুদ্রে পুল বাঁধতে পারে না, সেই সমুদ্র একদিনে শুকিয়ে যেতে পারে খামখেয়ালী ভূমিকম্পের ধাক্কায়, মানে....well, I did not like to talk, but I am talking like a parrot.....

হঠাৎ থেমে পিছনে দু'হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরময়। অস্থির যে যুবক একদা বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে ভোকাল ফিজিওলজির অধ্যাপক ছিল, সে-ই যেন আবার মূর্ত হয়ে উঠল বৃদ্ধ গ্রেহাম বেলের মধ্যে। হঠাৎ তিনি দু'হাত দিয়ে মাথার চুল মুঠি করে ধরে ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন। অংশুমানের মনে হল, কি যেন খুঁজছেন তিনি।

আপনি খুঁজছেন নাকি কিছু?

হ্যাঁ, শান্তি। আলো নয়, অন্ধকার। শব্দ নয়, নৈঃশব্দ্য। জীবনের শেষে ঘর থেকে টেলিফোন দূর করে দিয়েছিলাম আমি। It is a nuisance...... এখন দেখছি, চিন্তার ডাকেও সাড়া দিতে হয়। There is no escape....

তারপর হেসে বললেন, তোমাকে আমার মত হতে বলছি না তা বলে। হতে পারবেও না। সেলেনিয়মের উপর আলো পড়লে তার রেজিস্ট্যান্স্ যেমন বদলে যায়, তোমার মনের উপরও তেমনই পড়ছে প্রেরণার আলো। নানা রকম কারেণ্ট পাস করবে এখন। আমার ফোটোফোনের কথা পড়েছ তো, তার নয়—আলোর রেখা বার্তা বহন করেছিল, মনে আছে?

আছে।

তোমার মনের ওপরই তেমনই ভেঙ্গে পড়েছে অসংখ্য আলোর অসংখ্য রকম তরঙ্গ। অসহায় সোলার টুকরোর মত ভেসে বেড়াও এখন নানা তরঙ্গের শিখরে শিখরে। ডুবতে হবে, উঠতে হবে, ভাসতে হবে। ওর থেকেই কিছু একটা হয়ে উঠবে হয়তো, যদি হবার হয়। ভেবে চিন্তে প্ল্যান করে কিছু হবে না। বার্তা বহন করে যাও ক্রমাগত, ঠিক-বেঠিক যা হোক....আঃ, সিকেনিং!

সমস্ত মুখ বিরক্তিতে ভরে গিয়ে হাস্যোদ্দীপ্ত হয়ে উঠল আবার পর-মুহূর্তেই। যেন সামলে নিলেন।

এই এখন তোমার একমাত্র কাজ; মূক-বধিরদের নিয়ে মাথা ঘামাও যদি, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। Carry on...আমি চলি। আমাকে আর ডেকো না...please I want peace, nothing but peace, Good night.

চলে গেলেন।

অংশুমান বিস্মিত হয়ে বসে রইল।

প্ল্যান করে কিছু হবে না?...

....গ্যাল্‌ভানি, অর্‌স্টেড, বেকেরেল, রণ্ট্‌গ্যেন...সারি সারি আরও অনেকে এসে দাঁড়ালেন। সকলেরই চোখে সকৌতুক দৃষ্টি। এঁদের প্রত্যেকেরই আবিষ্কার যুগান্তকারী, কিন্তু প্রত্যেকটা আবিষ্কারই আকস্মিক। সকৌতুক দৃষ্টিতে নীরবে এই তথ্যটুকু নিবেদন করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সবাই আবার....

কারাগারের সূচীভেদ্য অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠল। প্ল্যান করে কিছু হবে না? আমাদের এই যে এত বছরের এত প্ল্যান, এর কি মূল্য নেই কোনও? সব বিদ্রোহের মূলেই তো প্ল্যান থাকে। রাশিয়ার ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান....বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর রাজনীতি এক নয়...গুলিয়ে ফেলছি আমি....বিজ্ঞান...

যে-কোনও বিষয়ের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান।

অংশুমান ফিরে দেখলে, নির্নিমেষ এক জোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। বিরাট শ্মশ্রুসমন্বিত গম্ভীর মুখ। অনড় নিস্পন্দ। ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল।

যে-কোনও বিষয়ের জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। কোনও নীতিই বিজ্ঞানের বহির্ভূত নয়, রাজনীতিও নয়। জ্ঞানমাত্রেই নিয়মের অধীন, পৃথিবীতে অনিয়ম বলে কিছু নেই। যা অনিয়ম বলে মনে হয়, আসলে তা জ্ঞানের অভাব, পর্যবেক্ষণ-শক্তির অপটুতা। নেপচুনকে দেখবার ঢের আগে অ্যাডাম্‌স্ তার অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, হ্যালি ভবিষ্যবাণী করেছিলেন ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাবের, অনেক ধাতু আবিষ্কৃত হবার পূর্বেই তাদের অস্তিত্ব নির্দেশ করতে পেরেছেন বৈজ্ঞানিক মলিকিউলার ওয়েট থেকে। কি করে সম্ভব হল এসব? অঙ্ক কষে। সমস্ত বিশ্বব্যাপার

নিয়ন্ত্রিত বলেই অঙ্ক কষে ইলেকট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক ওয়েভের কথা আমি বলতে পেরেছিলাম, হারৎজ্ হাতে-কলমে সেট প্রমাণ করলেন অনেক পরে। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খল কিছু নেই, থাকতে পারে না। মিস্টার বেলের ভূতুড়ে কাণ্ডটাও বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারেই ঘটেছিল। আমি আইনজ্ঞ উকিলের ছেলে, বে-আইনী কথা মানি না। মিস্টার বেলের কথায় দমে যাবার দরকার নেই, সহস্র উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, একটা বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করে প্ল্যান অনুযায়ী যাঁরা ঠিকমত চলতে পেরেছেন, তাঁরা অনেক বড় কাজ করতে পেরেছেন পৃথিবীতে। তার পর একটু ভেবে বললেন, এই ধর না যেমন আল্‌ভা এডিসন। ওই বেলের টেলিফোনেরই কত উন্নতি করেছেন তিনি, গ্রামোফোন বানিয়েছেন, ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্ তৈরি করেছেন, আরও কত কি করেছেন.....

কি বলছ আমার নামে?

আল্‌ভা এডিসন এসে দাঁড়ালেন। গোঁফ-দাড়ি নেই, ভারী মুখ, চোখের দৃষ্টিতে সপ্রশ্ন কৌতুক, বলিষ্ঠ নাকটা নীরবে যেন লোকটার ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করছে। এডিসনের আবির্ভাবে ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের চোখে মুখে প্রাণ সঞ্চার হল যেন। এতক্ষণ তাঁকে মূর্তিমান নিয়ম বলে মনে হচ্ছিল। একটু সসম্ভ্রমে তিনি বললেন, মিস্টার বেল এই ছেলেটিকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত করে গেছেন। বলে গেছেন যে, প্ল্যান-ট্ল্যান করে কিছু হবে না, ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে একটা কিছু আপনিই ঘটে উঠবে। আমি তাই একে বলেছিলাম যে, ঘূর্ণাবর্তও বিশৃঙ্খল ব্যাপার নয়, তাও বিশেষ বিশেষ বাঁধা-ধরা নিয়মের অধীন। সেই নিয়মগুলো আগে থাকতে জেনে নিয়ে যদি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করা যায়, তা হলে সুবিধাই হয়, ফলাফল আগে থাকতে আন্দাজ করা যায়। এবং সেটা সম্ভব। সেই সূত্রেই আপনার কথা উঠেছিল। আমার মনে হয়, আপনার প্রত্যেকটি কাজ আপনি বেশ প্ল্যান করে করেছেন। আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনার এমন জুসই যোগাযোগ দেখলে মনে হয় যে, অনেক ভেবেচিন্তে করেছেন সব। তাই এত করা সম্ভবও হয়েছে আপনার পক্ষে—নয়?

ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠল।

এডিসন হেসে বললেন, আমার কি মনে হয় জান, গার্ডের হাতের চড় খেয়ে সেই যে আমি কালা হয়ে গেলাম, তাই আমার উন্নতির কারণ। তার পর যতদিন বেঁচে ছিলাম, বাইরের কিছু শুনতে পেতাম না, একাগ্র হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম.....

দেখা গেল, ম্যাক্‌স্‌ওয়েল এডিসনের জীবনের এ ঘটনাটা জানতেন না। চড় মেরেছিল? আপনাকে? কোন্ গার্ড? কেন?...

রেলের গার্ড। ও, তুমি জান না বুঝি? গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রেলে আমি একটা খবরের কাগজ ছেপে বিক্রি করতাম। অবসর-সময়ে সেই ট্রেনেই সময় কাটাতাম কেমিস্ট্রির এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করে। একদিন একটা ফস্‌ফরাসের জার পড়ে গিয়ে ট্রেনে লেগে গেল আগুন। গার্ড ট্রেন থামিয়ে কানের উপর প্রচণ্ড একটি চপেটাঘাত করে দূর করে দিলে আমায়। কানের ড্রামটি ফেটে কালা হয়ে গেলাম জন্মের মত। এখন অবশ্য শুনতে পাই, কারণ সে দেহটা তো এখন আর নেই। একটু হাসলেন, তার পর বললেন, এটা অবশ্য ঠিক যে, সত্যের প্রতি একাগ্র না হলে সে ধরা দেয় না কিছুতে। বধির হয়েছিলাম বলেই একাগ্রতা বেড়েছিল, অন্যমনস্ক হবার সুযোগ ছিল না। আমার বধিরতার কারণ গার্ডের চপেটাঘাত, তার কারণ ফস্‌ফরাসের জার পড়ে যাওয়া,

তার কারণ বোধ হয় ট্রেনের ঝাঁকানি এবং আমার অসাবধানতা—কোন্‌টা যে আসল কারণ তা কি করে বলি, বল?—দুষ্টুমি-ভরা হাসিতে চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

আসল কারণ অবসর-সময়ে আপনার কেমিষ্ট্রি অধ্যয়নের আগ্রহ।—সসম্ভ্রমে বললেন ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল।

এডিসন চুপ করে রইলেন স্মিতমুখে। তার পর বললেন, হ্যাঁ, সত্যকে জানবার আগ্রহটাই আসল জিনিস। সেই আগ্রহই নানা জনকে নানা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করে...

এডিসনের মুখে "নিয়ন্ত্রিত" কথাটা শুনে ম্যাক্‌স্‌ওয়েল পুলকিত হয়ে উঠলেন। অংশুমানের দিকে চেয়ে বললেন, শুনলে? নিয়ন্ত্রিত না হয়ে উপায় নেই। নিয়মই সত্য, সত্যই নিয়ম। এ কথা মনে রাখলে মনে জোর পাবে। অনিয়ম সত্য নয়, বিশৃঙ্খলা শৃঙ্খলারই মিথ্যা রূপ। সত্য নিয়মের পরাধীনতাই সত্য স্বাধীনতা। সত্যকেই আঁকড়ে থাক এবং কি করে তা পারবে তার উপায় চিন্তা কর প্রতি মুহূর্তে। এরই নাম প্ল্যান....

হঠাৎ জেলের পাগলা ঘণ্টাটা বেজে উঠল। সাড়া পড়ে গেল চতুর্দিকে।

মারো—মারো—মারো....

ওপর-ওলার হুকুমে কংগ্রেসী কয়েদীদের মারা হচ্ছে ঘরে ঢুকে ঢুকে। আর্তনাদ উঠতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে। অংশুমানের ঘরের কপাটটা খুলে গেল। ব্যাটন হাতে ঢুকল পুলিস।

।। তেরো।।

নিজের বৈঠকখানায় লাহিড়ী মশাই চিন্তিত মুখে তামাক টানছিলেন। ছেলের চাকরির জন্য যে দরখাস্তটি করেছিলেন, তা নামঞ্জুর হয়েছে। অনেক তদ্বির করেছিলেন, তবু হল না। আপিসের বড়বাবু তাঁর বন্ধু, তাঁরই মাধ্যমে চেষ্টা করেছিলেন। একটু আগে বড়বাবু নিজে এসে বলে গেলেন—না হওয়ার আসল কারণ, সায়েব টের পেয়েছে অংশুমানের সঙ্গে ছেলের বন্ধুত্ব ছিল। ছিল, অস্বীকার করবার উপায় নেই। হতভাগা ছোঁড়াটা পাড়াসুদ্ধ সবাইকে মজিয়ে গেছে। আঃ! চাকরি তো হলই না, এখন পুলিসে না ধরলে বাঁচি। পেন্‌শনটি সম্বল, সেটা বন্ধ করে দিলেই—ব্যস্‌। হুঁকোর ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন, ধূমাচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিপাশ, রগের শিরগুলো ফুলে উঠল, চোখ দুটো মনে হল ঠিকরে বেরিয়ে আসবে এখুনি। বন্ধু পীতাম্বর প্রবেশ করলেন। গেঁটে-বাতওলা পাকা বুড়ো।

ওহে, খবর শুনেছ?

কিসের খবর?

রামতারণের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ প্রায় পাকা করে এনেছিলাম, কিন্তু হল না।

কেন?

রামতারণের মেয়েই বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বলছে, পুলিসের দারোগাকে বিয়ে করব না।

অ্যাঁ, বল কি?

হ্যাঁ হে। অতি ভয়ঙ্কর কাল এসে পড়ল, বোয়েছ?

খোঁড়াচ্ছ কেন?

হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। কদিন থেকে সমানে পুবে হাওয়া যা চালিয়েছে! ভাবলাম, বসে বসে কি আর করি, লাহিড়ীর সঙ্গে একদান পাশা খেলে আসা যাক। তামাক রাখ, পাশাটা পাড়।

লাহিড়ী পাশা পাড়লেন। গোমড়া মুখ করে দুজনে পাশা খেলতে লাগলেন। বাড়ির সামনে একটা গাছে অজস্র জবাফুল ফুটে ছিল, তারাই হাসতে লাগল কেবল।

।। চৌদ্দ ।।

একটা মাসিক-পত্র টেবিলের উপর পড়ে ছিল। মলাটের উপরই প্রকাণ্ড একটা সাবানের বিজ্ঞাপন। একটি নারী তার প্রস্ফুটিত যৌবনকে লীলায়িত করে আবক্র ভঙ্গীতে বসে আছে। নীচে রবীন্দ্রনাথের দু লাইন কবিতা। অন্তরা কাগজটা হাতে করে ছবিটার দিকে চেয়ে বসে ছিল চুপ করে। চেয়ে বসে ছিল, দেখছিল না। যখন দেখল, তখন সারা মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। নারীদেহের এই মাংসপিণ্ডগুলোকে যে-কোন অজুহাতে যখন-তখন সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে লজ্জাও করে না! পুরুষদের হয়তো করে না, তারা ওই হয়তো লুব্ধ-দৃষ্টিতে দেখতে চায়; কিন্তু মেয়েদেরও কি করে না? করে না বোধ হয়। কই, এ বিষয়ে কোনও নারীর প্রতিবাদ তো চোখে পড়েনি আজ পর্যন্ত! তারা বোধ হয় এর সমর্থনই করে। করাই স্বাভাবিক, ব্যবসাদার যেমন তার মাল বিজ্ঞাপিত করতে চায়...ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল অন্তরার। তাড়াতাড়ি মাসিক-পত্রিকার পাতাগুলো গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত উলটে গেল একবার। আবার শেষ থেকে গোড়া পর্যন্ত। তারপর বিতৃষ্ণাভরে সরিয়ে রেখে দিলে সেটা। সদ্য-আসা মাসিক পত্রের মোড়কটা পড়ে ছিল সামনে, সেটাকে অকারণে কুচিকুচি করলে অনেকক্ষণ ধরে। প্রত্যেকটি কুচি পাকিয়ে পাকিয়ে লুফল খানিকক্ষণ। আয়নার সামনে দাঁড়াল তার পর। চুলটা একটু ঠিক করে নিলে। হঠাৎ নজরে পড়ল, ডান কানের দুলটা এখনও বেঁকে আছে একটু...স্যাঁকরাটা ঠিকমত জুড়তে পারেনি...দুলটা কেন ছিঁড়েছিল অনিবার্যভাবে সে কথাটাও মনে পড়ল। কিন্তু সেটাকে সে আমল দিলে না কিছুতেই, জোর করে সরিয়ে দিলে মন থেকে। ও কথা নয়, সে অন্য কথা ভাবতে চায়, অন্য কিছু, যা হোক কিছু। একটা কথা মনে পড়াতে সে বেঁচে গেল।

রামধন!

আজ্ঞে?

ভৃত্য রামধন দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হল।

কই, বাজারের হিসেবটা দিলে না?

এই যে মা, নিন না। চার আনার আলু এনেছি, দু পয়সার সিম, আর আধ সের বেগুন তিন আনার....

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব নিতে লাগল অন্তরা প্রত্যেকটি জিনিসের দর করে, প্রত্যেকটি জিনিস ওজন করে। অবাক হয়ে গেল রামধন। কোনদিন তো এমন করেন না, আজ হল কি! তার আত্মসম্মান আহত হল একটু, কিন্তু কি বলবে! পুলকিতও হল, যখন হিসেবে কোন খুঁত ধরতে না পেরে বকশিশ পেলে চার আনা। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কাঠের টুকরোটাকে তুচ্ছ জেনেও প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চায়, রামধন-প্রসঙ্গটাও তেমনই কিছুতেই শেষ হতে দিতে চাইছিল না অন্তরা।

লাক্স সাবান বড় প্যাকেট পেলে না একেবারে? বাবুর নাম করেছিলে?

বাবুর নাম করলে ছোট প্যাকেটও পাওয়া যেত না মা। কোনও 'অপসর'কে কোন জিনিস দিতে চায় নাকি সহজে আজকাল! যেটুকু দেয় কারে পড়ে। আমাদের দেখলেই সরিয়ে ফেলে সব, বলে—বিক্রি হয়ে গেছে। হরিয়াকে দিয়ে কিনিয়েছি এটা...

হরিয়া স্থানীয় শশীবাবুর চাকর। শশীবাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সরকারী ডেপুটি নন। কথাটা বলেই রামধন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তখনই সামলে নিয়ে বললে, আমাদের বাবুকে তবু ভালোবাসে অনেকে, তাই আমরা কিছু কিছু পাই। এস. ডি. ও সাহেবের চাপরাসীকে দেখলে তো—। রামধন ভ্রূযুগল উত্তোলন করে প্রকাশ করলে বাকিটা। এই সামান্য কথার ধাক্কায় অন্তরা ছিটকে গিয়ে পড়েছিল, যেখানে তা লক্ষ অপমানের তীক্ষ্ণ কণ্টকে সমাকীর্ণ,—বহু কাঁটা একসঙ্গে বিঁধল সর্বাঙ্গে। অন্তরার মুখের পেশী কিন্তু বিচলিত হল না একটু। অমানুষিক শক্তিবলে কণ্ঠস্বরে অনাবশ্যক আবদারের সুর ঢেলে সে বললে, একটু গরম জল কর না তা হলে লক্ষ্মীটি। সিল্কের শাড়ি একখানা কাচতে হবে। রামধন চলে গেল গরম জল করতে। নূতন একটা সমস্যা সৃষ্ট হওয়াতে খুশি হল অন্তরা। কোন্ শাড়িটা কাচতে হবে, সেটা নির্বাচন করা যাক এবার...একটাও ময়লা হয়নি তেমন...তবু বেছে বার করতে হবে একটা। সময় কাটাবে।...

...ছোট একটি ঘর। জানলা নেই। ছোট ছোট ঘুলঘুলি। তাও লোহার জাল দেওয়া। কপাট বন্ধ। লোহার গরাদে দেওয়া মজবুত কপাট...সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে...অন্ধকার ঘরে একা চুপ্ করে বসে আছে সে....মুখময় গোঁফদাড়ি, পরনে কয়েদীর পোশাক। চোখ দুটো জ্বলছে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা....

মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?—কথাগুলো উচ্চারণ করেই অন্তরা আত্মস্থ হল। শাড়ির স্তূপ সামনে রেখে কি ছবি সে দেখছিল এতক্ষণ! হঠাৎ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখলে কেন? জেলে মারধোর করছে নাকি? কই, কোন খবর তো পাইনি! তবে? স্পষ্ট দেখতে পেলে! কেমন করে? ক্লেয়ারভয়েন্স? না, ওসব গাঁজাখুরিতে বিশ্বাস নেই তার। শাড়ির দিকে মন দিতে চেষ্টা করলে আবার। দুরন্ত বন্যা! তবু বাঁধ দিতেই হবে একটা যেমন করে হোক। ভেসে যেতে হবে তা না হলে অকূলে। ভয় করে...। সমাজের ভয় নয়, গুরুজনের ভয় নয়, কেমন একটা নামহীন ভয়! গড়ে-তোলা পারিপার্শ্বিককে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে অভ্যস্ত জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে কোথায় যাবে সে অনিশ্চিত কোন্ পথে? ভয় বাইরে নয়, নিজের মধ্যেই। নীড়বিলাসী অন্তরাত্মা ঝঞ্ঝার আভাস পেলেই পক্ষ সঙ্কুচিত করে চোখ বুজে বসে থাকতে চায় নীড়ের মধ্যে, তা যত তুচ্ছ হোক না সে নীড়। নিশ্চিন্ত আরামই তার কাম্য। এমন কি পরাধীনতার আরামও। পরাধীনতার আরামও চায় সে? বেণী-দোলানো এক কিশোরী গ্রীবাভঙ্গী করে বলে উঠল মনের মধ্যে, কক্ষনো নয়। অনাবিল স্বাধীনতার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে যে আরাম, তাই চাই আমি। সে স্বাধীনতা কোথায়, সে মনুষ্যত্বের অর্থ কি, খুঁজে বার কর সেটা। ঝুটো জিনিসও কখনও চাইনি, কখনও নেব না...বেণী-দোলানো কিশোরীটির দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অন্তরা। তার নিজেরই পূর্বরূপ...বয়ঃসন্ধির সেই অপরূপ ছবিটা এখনও মরেনি নাকি...এখনও বেঁচে আছে অবুঝটা। কোন্ স্বপ্নলোকে? সহসা মনে হল, ওই সত্য, স্বপ্নই সত্য। বাকি সব মিথ্যা। স্বাধীনতা কি...মনুষ্যত্ব কি?

অতীতের দিনগুলো এলোমেলোভাবে মনে পড়ল। মা-বাবা ভাই-বোন জামা-কাপড় ফ্রক-

ব্লাউজ টেপ-তেল চিরুনি-স্নো বই-খাতা স্কুলমাস্টার-মাস্টারনী বান্ধব-বান্ধবী চিঠি-প্রেম—এই সমস্তকে কেন্দ্র করে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তার সমস্ত সত্তা যে ছন্দে আবর্তিত হয়েছে, তা স্বাধীনতারই ছন্দ। নিজের মতে নিজের পছন্দ অনুসারে সব চেয়েছে যে। সব মানুষই তাই চায়। স্বাধীনতা মানেই মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব মানেই স্বাধীনতা। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি এটা। শৈশব থেকেই মানুষ পার হতে চায় গণ্ডি, লঙ্ঘন করতে চায় বাধা, অমান্য করতে চায় বারণ। এটা করো না, ওখানে যেও না...অনাদি কাল থেকে হিতৈষীর গুরুজনেরা বারণ করেছেন আর অনাদি কাল থেকে অবাধ্য শিশুরা তা অমান্য করেছে। দুষ্কর্ম করতেও তার প্রবৃত্তি। সে ঠেকে শেখে, ঠেকে শেখবার স্বাধীনতাই সে চায়। তারই বাধা সে চূর্ণ করেছে যুগে যুগে, বাধা হিতকর হলেও চূর্ণ করেছে, চূর্ণ করে মরেছে, তবু থামেনি। পুরাতনকে ওলটপালট করে সে আধুনিক হতে চেয়েছে বারম্বার। মানবজাতির এই ইতিহাস। প্রকৃতির নিয়মনিগড়ে বাঁধা থাকেনি সে। শীতাতপের নির্যাতন সহ্য করেনি, গৃহ নির্মাণ করেছে, অগ্নি আবিষ্কার করেছে, বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে নিত্য নব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে। দূরত্বের বাধা, সময়ের বাধাও সরিয়েছে সে। আকাশ-যান, বেতার -বার্তা, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ..মানবসভ্যতার প্রগতি বাধা-অপসারণের ইতিহাস। মানুষ এও আবিষ্কার করেছে যে, আসল বন্ধন বাইরে নয়, কঠিনতম বন্ধন নিজেরই মধ্যে,—ষড় রিপুর বন্ধন। তাও ছিন্ন করে মানুষ মুক্ত হতে চেয়েছে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করে। সে মুক্তি চায়, স্বাধীনতা চায়,—স্বাধীনতাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ।...মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা কেন দেখলাম...স্বাধীনতা-চিন্তার স্রোতকে ব্যাহত করে প্রশ্নটা মনে জাগল আবার...

মা গরম জল হয়ে গেছে।

খুব বেশি গরম করনি তো? চল, দেখি।

সাড়ম্বরে শাড়িটা সাবান দিয়ে ভিজিয়ে দিতে লাগল।

...ভয় করে...হ্যাঁ, ভয় করে সত্যিই! কিন্তু ভয়ের সঙ্গে কৌতূহলও কি নেই? অতল গহ্বরটার দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখলে....

...ঘূর্ণিপাকের তাণ্ডব চলেছে ওর তলায়...সমুদ্র-মন্থন...ওর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে কৌতূহল হয় বইকি...আত্মঘাতী কৌতূহল....

পিপারমেণ্ট আছে আপনার কাছে?

মুন্সেফবাবুর দশ বছরের মেয়ে রেখা এসেছে। ছিমছাম পোশাক-পরা মেয়েটি। মাথার চুল বব করা। এর মধ্যেই চোখের দৃষ্টিতে বয়সের ছাপ লেগেছে। সরলতা নেই। কথায় কথায় চোখ নিচু করে....

পিপারমেণ্ট? আছে বোধ হয়। দাঁড়াও, দেখি।

সময় কাটাবার আর একটা অজুহাত পেয়ে বেঁচে গেল। তন্নতন্ন করে আলমারিটা খুঁজলে নিপুণভাবে, তার পর এ-কৌটো সে-কৌটো, এ-তাক সে-তাক....অনেকক্ষণ পরে পাওয়া গেল শেষকালে।

বেশি নয়, একটুখানি আছে।

ওমা, তুমি এক জায়গায় দাঁড়িয়েই আছ সেই থেকে?

মেয়েটি কিছু না বলে চোখ দুটি নিচু করলে শুধু।

কি হবে পিপারমেণ্ট?

মা পান দিয়ে খাবে।

মৃদুস্বরে কথা কটি বলে পিপারমেণ্ট নিয়ে চলে গেল মেয়েটি।

অন্তরা আর একবার বসল টেবিলে। আর একবার মাসিক-পত্রখানা ওলটালে। গল্প পড়বার চেষ্টা করলে একটা। বিস্বাদ। কবিতা আরও বিস্বাদ।....উঠে দাঁড়াল। জানলার শার্সির একটা ফাটা কাচ জোড়া হয়েছিল পুরানো চিঠি দিয়ে। সেইটে পড়ল খানিকক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়ে।.....দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ার চিঠি....বিধবা...চেহারাটা মনে পড়ল..... গোলগাল ফরসা বেঁটে হাসিখুশি মানুষটি। নিজের দুর্ভাগ্যকে অতি সহজভাবে মেনে নিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখেছেন সেটাকে, তা দিয়ে জীবনের স্রোতকে অবরুদ্ধ করেননি...আনন্দের ধারা বইছে অবারিতভাবে, চোখে মুখে কথায় হাসি উপচে পড়ছে তার, অথচ কোনও আতিশয্য নেই, সহজ সুন্দর আনন্দ। "জীবন" বলতে পাশ্চাত্য ধরনে আমরা যে পশুজীবন বুঝি, তার কোন আস্ফালন নেই। সেটা প্রায় নিশ্চিহ্ন। এক বেলা আহার, পরনে থান, কখন ঘুমোন কখন জাগেন—কেউ জানতে পারে না, মৈথুনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকেই গেছে, ও-কথা ভাবেনও না বোধ হয়। আধুনিক অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা মোটেই নেই, একেবারে নিরক্ষর। আধুনিক মাপকাঠিতে এত ছোট যে মানুষটি, সে কিন্তু যেখানে থাকে সেখানটা পরিপূর্ণ করে রাখে, সুরভিত হয়ে ওঠে চারিদিক। আধুনিকমনা অন্তরা দূর-সম্পর্কের এই দুর্গাদিদির সঙ্গ পাবার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠল মনে মনে। দুর্গাদিদিকে কাছে পেলে সব কথা খুলে বলা যেত হয়তো, তিনি হয়তো বুঝতেন তার কথা। কোথায় আছেন এখন.....অনেক দিন আগে এসেছিলেন একবার...ফিরে গিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন, মানে লিখিয়েছিলেন পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে...উত্তর দেওয়া হয়নি। ...কাটা কাচের সবটা জোড়া যায়নি কাগজ দিয়ে....চিড়-খাওয়া খানিকটা অংশে সূর্যালোকে রঙ ধরেছে... গৈরিক রেখার পাশে অতিসরু রক্তের আভাস কাঁপছে থরথর করে....বাইরে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর....

ভারতবর্ষের নির্ভীক আত্মার সত্য-রূপটি ওরই মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। তর্কের বিষয় নয়, জানি। অনুভব করছি। হ্যাট-কোট-প্যান্ট-নেকটাই-পরা বিদেশী-বুলি-মুখস্থ-করা চাকরের দল ভারতে জন্মেছে বলেই কি ভারতীয় ওরা? তিলক-ফোঁটা কেটে টিকিনামাবলী উড়িয়ে সংস্কৃত মুখস্থ বুলি আওড়াচ্ছে যে আর এক-জাতীয় তোতাপাখির দল, তারাই কি ভারতীয়? জাতীয়তার অভিনয় করে বিজাতীয় বুলি আওড়াচ্ছে যারা, তারাই কি? কিছুই করছে না যারা—অন্ধ মূঢ় জনতার দল, যাদের দুঃখে আমরা অহরহ অভিভূত হয়ে বক্তৃতা-বিলাসের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছি ক্রমাগত, ওই যে শতকরা নিরেনব্বই জন, যারা জন্মাচ্ছে আর মরছে ক্ষুধায় হাহাকার করে লোভে লালায়িত হয়ে রোগে ভুগে-ভুগে, যে-কোন বক্তার বক্তৃতায় উত্তেজিত হচ্ছে, পুলিসের হুমকিতে পালাচ্ছে, কাবুলীর কাছে ধার করছে, তাড়িখানায় হল্লা করছে, তারা সংখ্যাতে বেশি বলেই কি ভারতীয় নামের যোগ্য? না। আর্য বৌদ্ধ মুসলমান ক্রিশ্চান সভ্যতার বহুবিধ বিপর্যয়েও বিভ্রান্ত হয়নি যে ভারতীয় আত্মা, তার স্বরূপ কেবল ওরই মধ্যে ফুটেছে, অন্তরার মনে হল। ওই চিড়-খাওয়া কাচের মধ্যে সূর্যালোকের মত, ভেঙেছে কিন্তু মরেনি, রূপান্তরিত হয়েছে ইন্দ্রধনুতে। পুলিসের ব্যাটনে মাথা ফাটতে পারে, কিন্তু সেই ফাটল বেয়ে যা বেরুবে তা রক্ত নয়—লাভা-স্রোত, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত নিরুদ্ধ উত্তাপ....চিড়-খাওয়া কাচের ফাটলে ওই

ক্ষীণ রক্তের আভাসে ভেসে ভেসে এসেছে, যেমন আসে জ্বলন্ত সূর্যের বার্তা কোটি মাইল দূর থেকে।

গাড়িটা এসে কাছারিতে যখন দাঁড়াল, তখন অন্তরা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। আদালতের বিবিধ বৈচিত্র্য হঠাৎ যেন একটি ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হল সহসা, তার মুখের দিকে চেয়ে রইল সবিস্ময়ে নির্নিমেষে। নীরব প্রশ্নও একটা মূর্ত হয়ে উঠল সে দৃষ্টিতে—তুমি এখানে হঠাৎ? আস না তো কোনদিন!

চাকরকে দিয়ে গাড়ি ডাকিয়ে সে যখন তাতে চড়ে বসেছিল, তখন সে যেন অন্য লোকে ছিল, এ অদ্ভুত আচরণের অস্বাভাবিকতা তখন চোখে পড়েনি তার। গাড়ি ডাকিয়ে অবিলম্বে আদালত অভিমুখে রওনা হয়ে পড়াটাই বরং সঙ্গত মনে হয়েছিল তখন। ওই অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও তো খবর পাওয়া সম্ভব নয়। এখন সহসা সে উপলব্ধি করলে, জবাবদিহি করতে হবে একটা। জবাবদিহি না করলে... কিন্তু কি বলবে?...মাথায় কিছু এল না; অসহায়ভাবে জনতার দিকে চেয়ে বসে রইল সে। যে ঘরটায় তার স্বামীর আদালত, তার সামনে খুব ভিড়....

"রামু মণ্ডল হাজির হো—"

চিৎকার করে উঠল আরদালী।

বিচার হচ্ছে। তার স্বামী বিচারক।

তার সমস্ত মুখ নীরব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। বহু দূরের বহু যুগ পরের অনাগত ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন......সেখানে তার বিচারক স্বামী নেই। অংশুমান? কই, সেও সেখানে নেই। জনতার মধ্যে নেই, নির্বাচিত সুধীদের মধ্যেও নেই। কোথায় সে?.....বিরাট বিশাল দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র একটা, কুচকুচে কালো জল, তার মধ্যে একটা লাল দ্বীপ..... প্রবাল নয়, জমাট রক্ত.....বহু যুগের প্রচুর রক্ত জমে কঠিন হয়ে গেছে, কিন্তু কালো হয়নি, টকটকে লাল আছে এখনও । সেই দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছে অংশুমান একা....মৃত রক্তকণিকাদের জাগাতে চেষ্টা করছে, ভাবছে, তারা না জাগলে তো সবই বৃথা.....

এ কি, বউদি, আপনি এখানে?

নবীন উকিল একটি। ভাব হয়েছে ছেলেটির সঙ্গে কিছুদিন থেকে তার স্বামীর। কমিউনিজ্‌মে আস্থাবান, ভালো ব্রিজখেলোয়াড়, মিহি খোশামোদও করতে পারে।

বাজারে যাচ্ছি।

এত ঘুরে?

বীণাদের বাড়িও যাব।

ঠিক সময়ে মিথ্যে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়াতে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। একটু আগেও মনে পড়েনি যে, বীণাদের বাড়িটা কাছারির সামনেই। বীণারা সেদিন এসেছিল, গেলেও বেমানান হবে না। কিন্তু সে যাবে না। অজুহাতটা খাড়া করতে পেরে স্বস্তি অনুভব করলে একটু।

বীণারা আজ কলকাতা গেছে সকালের ট্রেনে—

ও, তাই নাকি?

একটু ঝুঁকে গাড়োয়ানকে বললে, তবে বাজারে চল।

গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে, তখন দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হঠাৎ অনিবার্য প্রশ্নটা সে করে বসল, আচ্ছা, জেলে নাকি মারধোর করছে?

আপনি কোথা থেকে শুনলেন?

কে যেন বলছিল।

খবর তা হলে রটে গেছে! ওসব খবর কি চাপা থাকে কখনও?

সত্যি তাহলে?

উকিল মানুষ, কথায় কিছু বললেন না, কিন্তু মুচকি হাসিতে যা প্রকাশ করলেন তা কথার চেয়েও স্পষ্টতর। বন্দী হৃদপিণ্ডটা অনেকক্ষণ থেকেই পঞ্জরকারায় মাথা কুটছিল, হঠাৎ সেটা স্তব্ধ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য।

মফস্বল শহরের বন্ধুর পথে ধুলো উড়িয়ে চলেছে ছ্যাকড়া গাড়িটা। অসাড় অবসন্ন দেহে বসে আছে অন্তরা। মন কিন্তু উড়ে চলেছে ঝড়ো হাওয়ার মুখে হালকা মেঘের টুকরোর মত....অদৃষ্ট অতীত থেকে অদৃশ্য ভবিষ্যতের দিকে...

অনেকক্ষণ পরে সামনে এলোমেলো নানা জিনিসের স্তূপ দেখে বিস্মিত হল সে একটু। এগুলো....তখনই মনে পড়ল, নিজেই সে কিনেছে এগুলো বাজারে ঘুরে ঘুরে। ফিতে, চিরুনি, তেল, সাবান, টফি, চায়ের পেয়ালা। খদ্দরের টুকরোটাও চোখে পড়ল। এ বাড়ির কেউ পরবে না জেনেও এটা সে কিনেছে। ওই খদ্দরটুকুকেই বার বার তুলে সযত্নে পাট করতে লাগল সে। ওই খদ্দরের টুকরোর মধ্যেই তার স্পর্শ যেন সে খুঁজতে লাগল। ধরবার মত হাতের কাছে আর তো কিছু নেই....

অপরাহ্ন। পড়ন্ত রোদের একফালি এসে ঢুকেছে জানলার ভিতর দিয়ে। পড়েছে তার কোলের উপর। জানলার ধারে চুপ করে বসে আছে অন্তরা বাইরের দিকে চেয়ে। বড় একা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, চিরকালই একা। জীবনে ভিড় জুটেছে, সঙ্গী জোটেনি কখনও। বিশাল সমুদ্রে তৈলকণিকার মত তরঙ্গের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছে সে কেবল, মিশ খায়নি। সারা জীবন তবু ভান করতে হচ্ছে। নিজের কাছেও। আশেপাশে কেউ নেই। দূর থেকে লোকে দেখে, একটি তারার ঠিক পাশেই আর একটি তারা।....কিন্তু দুটি তারার মাঝে কোটি কোটি যোজনের ব্যবধান। ঠিক পাশে কেউ নেই—শুধু শূন্যতা....

।। পনেরো।।

নীহার সেন ডেপুটি হয়েছে বলেই যে মত বদলেছে, তা নয়। এখনও সে মনে প্রাণে কমিউনিস্টই আছে। ক্যাপিটালিস্টদের অধীনে চাকরি নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। পেটের দায়ে, সংসারের চাপে। পারিপার্শ্বিককে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলই তো জীবনযাপনের বিজ্ঞান এবং আর্ট। জীবনটা যখন যুদ্ধ, তখন কখনও আক্রমণ, কখনও সন্ধি, কখনও আপোস, কখনও বিরোধ—এ তো হবেই। উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হল। উদ্দেশ্য তার ঠিক আছে। তা ছাড়া এখন...ঠিক এই মুহূর্তে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের

সঙ্গে বিরোধিতার কোন হেতু নেই। ক্যাপিটালিস্ট ব্রিটিশ এখন অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট.....চার্চিলকে হাত মেলাতে হয়েছে স্ট্যালিনের সঙ্গে। হাত মিলিয়েছে যখন, তখন ঝগড়া নেই আর আপাতত। চাকরি নেওয়ারও কোন বাধা নেই। শুধু তাই নয়, ঠিক এই মুহূর্তে ব্রিটিশ শাসন-বিভাগে চাকরি নেওয়াটা প্রয়োজনও। আগস্ট-ডিস্টার্‌বেন্সের অর্থ তো পরিষ্কার। ফ্যাসিস্ট জাপানকে আমন্ত্রণ। সেটা যে মারাত্মক। এ মূঢ়তাকে প্রতিরোধ করতেই হবে সুতরাং যেমন করে হোক। আপাতদৃষ্টিতে যতই রূঢ় হোক তার আচরণ, যতই কঠোর হোক সমালোচনা (তথাকথিত অর্ধ শিক্ষিত সংকীর্ণদৃষ্টি স্বদেশভক্তদের ফেনায়িত উচ্ছ্বাসের ধার ধারে না সে), দেশের মঙ্গলের জন্যই এসব দৃষ্টিকটু ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে হবে এখন...রোগীর মঙ্গলের জন্য যেমন তার ফোড়াটায় ছুরি চালাতে হয়, তেমনিই জনতার উপর গুলি চালানোই দরকার এখন জনতার মঙ্গলের জন্যে। লোকে যাই বলুক, দেশের এ অবস্থায় স্যাবটেজ মারাত্মক, যেমন করেই হোক দমন করতেই হবে।

নীহারবাবু বাইরের ঘরে একা বসে ফাইল ক্লিয়ার করতে করতে চিন্তা করছিলেন। আজকাল যখনই একা থাকেন, এই তর্ক তাঁকে পেয়ে বসে। প্রতিপক্ষ কেউ নেই, তবু মনে মনে তর্ক করতে হয়। একা পেলেই চিন্তাটা চুপিচুপি চোরের মত এসে মনের মধ্যে ঢোকে, তর্ক জুড়ে দেয়,......কিছুতেই এড়াতে পারেন না।

দমন করতেই হবে যেমন করে হোক।—আর একবার মনে মনে আওড়ালেন নীহার সেন। আউড়েই ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। দ্বিজেন চক্রবর্তীকে দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে।.....লোকটা কতক্ষণ বকবক করবে কে জানে! পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর, তা ছাড়া একসঙ্গে পড়েও ছিলেন কলেজে। সুতরাং তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না সহজে।

কি হচ্ছে? ফাইল ক্লিয়ার? তোমরা খাসা আছ! আমাদের যে কি দুর্দশা....

কি রকম? একটু কৌতূহল প্রকাশ করতেই হল নীহার সেনকে।

পরশু দিনকার ঘটনাটাই ধর না। একটা নতুন থানায় বদলি হয়েছি, চার্জ নিতে না নিতেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জরুরী হুকুম—ওই এলাকায় মিলিটারি নিয়ে গিয়ে একটা গ্রাম খানাতল্লাসী করতে হবে। যারা রেল-লাইন উপড়েছিল, তারা নাকি সেখানে লুকিয়ে আছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য করবার উপায় নেই। স্টেশনে গেলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে কম্যাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সমস্ত ট্রেনখানাই মিলিটারি, মায় ড্রাইভার পর্যন্ত। কম্যাণ্ডিং অফিসারই তার মালিক, কোথায় কখন থামাতে হবে তা ড্রাইভারকে বলা আছে আগে থাকতে। তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে হল। বি. এ. পাস করেছি তো, ইংরেজিতে নেহাত কাঁচাও ছিলাম না, কিন্তু ভাই, তাদের একটি কথাও বুঝতে পারি না প্রথমে। ঘুচঘাচ করে কি যে বলে, বোঝাই যায় না কিছু। কথা বলে আর মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচোয়। মুচকি হেসে ঘাড় নাড়ি শুধু। কি আর করব? একটু পরে বুঝতে পারলাম, গাল দিচ্ছে—আমাদের দেশের লোককে গাল দিচ্ছে। অকথ্য ভাষায়। সন অব এ বিচ, সন অব এ গান, নিগার্‌স্‌, বাস্টার্ড্‌স্‌—এই সব হল মৃদুতম। এই চলল খানিকক্ষণ। অনবরত সিগারেট টানছে, মদ মারছে, বিস্কুট চিবুচ্ছে আর আমাদের গাল দিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারবার পরও মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে যাই। উপায় কি? কোথায় ট্রেন থামাবে তা আমাকে বলবে না। যদিও আমি পুলিস তাদের সপক্ষে

আছি, কিন্তু আমি কালা আদমী যে, আমাকে বিশ্বাস করবে কি করে? একটা ম্যাপ খুলে নিজেই ঠিক করছে সব। কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটা থেমে গেল মাঠের মাঝখানে। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, দু'দিকে মাঠ। সায়েব বললে, এইখানে নামতে হবে। বললাম, এখানে? এখানে নেবে কি হবে, এখানে রাস্তা কোথা? সায়েব বললে মাঠ ভেঙ্গেই যাবে তারা। সার্‌প্রাইজ অ্যাটাক করতে হবে। ম্যাপ দেখে বললে, মাইল খানেক গেলেই নাকি সেই গ্রামে পৌঁছানো যায়। আমি ঠিক তার আগের দিন চার্জ নিয়েছি, কিচ্ছু চিনি না, কারও সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত হয়নি। আমার ঈষৎ ইতস্তত ভাব দেখে সায়েব রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন, গেট ডাউন, গেট ডাউন প্লীজ অ্যাণ্ড লীড আস্। নামলাম, মানে নামতে হল। ভাগ্যে কাছে একটা টর্চ ছিল। তারই সাহায্যে কোন রকমে হেঁছড়ে-মেচড়ে তার টপকে মাঠে গিয়ে পড়লাম। আল ধরে ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি, নালা রয়েছে একটা। সোল্‌জারগুলো গাড়ি থেকে নেমে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ। আমি নালার একটা সরু অংশ দেখে লাফিয়ে পার হয়ে গেলাম, তার পর চেঁচিয়ে বললাম, কাম অন দেন। মাঠের মধ্যে নামল সবাই, বেয়নেট উঁচিয়ে আল ভেঙ্গেই ছুটতে লাগল ব্যাটারা। কিন্তু টর্চ ছিল না ব্যাটাদের, নালাটা দেখতে পায়নি, হুড়মুড় করে পড়ল এসে তার মধ্যে। কিন্তু কিছু কি গ্রাহ্য করে ব্যাটারা! জল কাদা ভেঙ্গে দেখতে দেখতে এপারে এসে উঠল সব। আমি ততক্ষণ ভেবে-চিন্তে উপায় বার করে ফেলেছিলাম একটা, বুঝলে....

এতক্ষণে থামলেন দ্বিজেন চক্র। একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে থামেন না তিনি সহজে। এখনও থামতেন না, কিন্তু সিগারেট ধরাবার প্রয়োজন হয়েছিল। ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চন করা ছাড়া আর কোন উপায়ে বিরক্তি প্রকাশ করা নীহার সেনেরও সাধ্যাতীত, মার্জিতরুচি ভদ্রলোক তিনি। তাঁর কুঞ্চিত-ভ্রূ দ্বিজেনবাবু লক্ষ্যও করলেন না বোধ হয়। সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার শুরু করলেন তিনি—

উপায় একটা বার করে ফেলেছিলাম, বুঝলে। কাছেই একটা বাগান ছিল, সম্ভবত আমবাগানই। সাহেবকে বললাম, তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে এই বাগানে একটু অপেক্ষা কর, আমি দু-একজন লোক যোগাড় করে নিয়ে আসি। আমি কালই এখানে বদলি হয়েছি, পথঘাট ভালো চিনি না, তা ছাড়া ভিতরের খবরটা প্রথমে একটু জানলে সুবিধেই হবে। তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি লোক যোগাড় করে আনি। সাহেব সার্‌প্রাইজ অ্যাটাক করতে ব্যস্ত, তার এ সন্দেহও হয়তো হল যে, আমি বোধহয় আসামীদের সর্তক করাতে যাচ্ছি। অনেক কষ্টে তাকে বোঝালাম যে, আমরা সার্‌প্রাইজ অ্যাটাকই করব, কিন্তু এলোপাতাড়ি অ্যাটাক করলে অনর্থক একটা প্যানিক হবে, কাজ হবে না। বিভীষণ একটা যোগাড় করতে যদি পারি সুবিধে হবে। অনেক কষ্টে রাজী হল লোকটা। আমি তাদের সেখানে রেখে বিভীষণ যোগাড় করতে বেরুলাম। সোজা খানিকক্ষণ হাঁটবার পর রাস্তায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা হল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, থানা কোন্ দিকে? থানার রাস্তাই জানা ছিল না আমার। সে একটা রাস্তা বাতলে দিয়েই সরে পড়ল, খাকী পোশাক দেখে সে আর বেশিক্ষণ কাছে থাকা নিরাপদ মনে করল না। প্রায় মাইল দেড়েক হেঁটে থানায় পৌঁছলাম। আমি ঠিক তার আগের দিন চার্জ নিয়েছি। যিনি আমার জায়গায় ছিলেন, তাঁর সেই দিনই সন্ধ্যের ট্রেনে চলে যাবার কথা। গিয়ে দেখি, সবাই স্টেশনে গেছে, তাঁকে সি-অফ করতে। থানা ভোঁ-ভোঁ। একটি লোক নেই। আমি ভেবেছিলাম, থানার কনস্টেব্‌লদের সাহায্যে যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করব। কিন্তু গিয়ে

দেখি, জনপ্রাণী নেই। অনেক হাঁকাহাঁকির পর চৌকিদার বেরুল একটা। তাকেই সঙ্গে নিয়ে সেই গ্রামটার নাম করে বললাম, চল্ ওই গ্রামেই 'রোঁদ' দেব আজ। তুই সঙ্গে থাক্ আমার। তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম। আবার মাইল দুই হন্টন। গ্রামে পৌঁছে দেখি, একেবারে নিষুতি। কেউ জেগে নেই, এক কুকুরগুলো ছাড়া। তারাই ঘেউঘেউ করে সম্বর্ধনা করলে এবং সর্বক্ষণ পিছনে লেগে রইল। চৌকিদারকে বললাম, ডেকে তোল্ একজন কাউকে। কাকে হুজুর? যাকে হোক। একটা কুঁড়েঘরের সামনে অনেক সোরগোল করে একটা জীর্ণশীর্ণ লোককে টেনে তুললে সে। স্বয়ং দারোগা সাহেব দ্বারদেশে সমুপস্থিত শুনে লোকটা তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, তার পর উঠেই সেলাম করে ফেললে একটা—

দ্বিজেন চক্রবর্তী হা-হা করে হেসে উঠতেই নীহার সেন বুঝতে পারলেন, দ্বিজেন মদ খেয়েছেন। ভ্রূ আর একটু কুঞ্চিত হল। দ্বিজেনের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। নীহার ভাবতে লাগলেন, আগে তো খেত না, ধরলে কবে?

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আবার শুরু করলেন, দ্বিজেনবাবু, সেলাম করে লোকটা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে। তার পর বার দুই ঢোঁক গিলে সসঙ্কোচে বললে, হুজুর ডেকেছেন আমাকে? আমি বললাম, হ্যাঁ, চল্ আমার সঙ্গে। চৌকিদারকে বললাম, তুমি থানায় যাও, আমি আসছি একটু পরে। চৌকিদার থানার দিকে চলে গেল, আমি চলতে লাগলাম সেই আমবাগানের উদ্দেশে। এবার পলাশীর আমবাগান নয়, জাফরগঞ্জের আমবাগান। হা—হা—হা—

নেশাটা জমে এসেছিল দ্বিজেন চক্রবর্তীর। আবার একটা সিগারেট ধরালেন তিনি।

হনহন করে চলতে লাগলাম। লোকটা কুকুরের মত পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। এত রাত্রে কোথায় কি উদ্দেশ্যে নিয়ে চলেছি তাকে, তা জিজ্ঞেস করবার সাহস পর্যন্ত হল না লোকটার। ভাগ্যে হয়নি....

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে আপন মনেই হাসলেন একটু মুখ নিচু করে।

বাগানের অন্ধকারে বীর ব্রিটিশ সৈন্যরা বেয়নট উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সারি সারি আমার প্রতীক্ষায়। সেখানে ঢুকে টর্চটা জ্বাললাম দপ করে, বেয়নেটগুলো চকচক করে উঠল। ক্যাপ্টেন সাহেব এগিয়ে এলেন। তাকে চুপি চুপি বললাম, লোক পেয়েছি একজন। তার পর সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি বাঁচতে চাও? ভয়ে কথা সরছিল না তার মুখে, হাত জোড় করে থর থর করে কাঁপছিল শুধু সে। ঠিক তার দুদিন আগে পার্শ্ববর্তী গ্রামে মিলিটারি রেড্ হয়ে গেছে। লোক মারা গেছে, ঘর পুড়েছে, নারীধর্ষণ হয়েছে। যারা পালাবার পালিয়েছে। নিতান্ত অপরাগ যারা, তারাই আছে এখনও। এ লোকটা পরে শুনলাম, কালাজ্বররোগী। একে ফেলে পালিয়েছে সবাই। এর ছেলে কোথায় চাকরি করে, তার আশায় ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছে ও। আমার "বাঁচতে চাও' প্রশ্নের উত্তরে অস্ফুটকণ্ঠে সে শুধু বললেন, হুজুর মা-বাপ। আমি বললাম, দেখ বাপু, ওসব বলে কিছু লাভ নেই। যারা রেল-লাইন উপড়েছে, তাদের ঘর দেখিয়ে দিতে হবে—যদি দাও বাঁচবে, তা না হলে মৃত্যু। গুলি করে এরা মেরে ফেলবে তোমাকে, কারও কথা শুনবে না। আমি কিছুই জানি না।—করুণকণ্ঠে বললে লোকটা। তাহলে মর। লোকটা চুপ করে রইল। অশিক্ষিত বোকা লোক কিনা, মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও চুপ করে

রইল। আমি শিক্ষিত এবং চালাক, বুদ্ধি বাতলে দিলাম। বললাম, ওরে ব্যাটা, যে-কোনও ঘর দেখিয়ে দে না, তা হলেই হবে, কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবি? ক্যাপ্টেন সাহেব অধীর হয়ে উঠছিলেন, আমাদের কথা একবর্ণ বুঝতে পারছিলেন না, গজরাচ্ছিলেন আর হাতঘড়ি দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি হিরোয়িক কাণ্ড করে বসলেন একটা। আচমকা লোকটার গালে ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন 'ব্লাডি.স্কোয়াইন' বলে। লোকটা পড়ে গেল। তার পর উঠেই দৌড়। অন্ধকারে কোথায় সে সরে পড়ল খুঁজে পেলাম না আর। টমিগুলোও অনেক খোঁজাখুঁজি করলে, কিন্তু পাওয়া গেল না তাকে। ক্যাপ্টেন সাহেব ক্ষেপে উঠল, মনে হল আমাকেই মেরে বসে বুঝি! বললাম, সাহেব, ঘাবড়াচ্ছ কেন? খবর যোগাড় করে-এনেছি, চল আমার সঙ্গে, এস। নিয়ে গেলাম। গিয়ে কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হল। কয়েকটি বুড়ী আর রুগী ছাড়া গ্রামে আর কেউ নেই, সব পালিয়েছে। সশস্ত্র ব্রিটিশবাহিনী নিরস্ত হল না তবু। রুগীগুলোকেই ঠ্যাঙাতে লাগল। মারের চোটে একটা ছোঁড়া রক্ত-বমি করতে শুরু করলে; শুনলাম, থাইসিস। একটা টমি একটা বুড়ীরই কেশাকর্ষণ করছে দেখলাম। অনেক কষ্টে থামাই তাদের, শেষকালে তারা প্রত্যেকের ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ফেলে ছড়িয়ে সোনাদানা যা পেলে পকেটে পুরে ব্রিটিশ-প্রতাপের মর্যাদা রক্ষা করলে কতকটা। আর—

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ দ্বিজেনবাবু।

নীহার সেনের কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হয়নি। মুখে ফুটেছিল মৃদু হাস্যরেখা। দ্বিজেনের সব কথা শুনছিলেন তিনি, কিন্তু বিচলিত হয়েছেন মনে হচ্ছিল না। স্থির জলাশয়ের জল যেন। ঊর্মির চাঞ্চল্যও নেই। সূর্যের আলো, মেঘের ছায়া, উড়ন্ত পাখির প্রতিবিম্ব, নক্ষত্রের দীপালী, জ্যোৎস্নার সমারোহ সবই জলে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু জলের জলত্ব নাশ করতে পারে না। ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ হবার পরও জল জলই থাকে। নীহারের প্রসারিত চেতনার উপর তেমনই দ্বিজেন চক্রবর্তীর বর্ণনাটা পরিস্ফুট হল, কিন্তু রেখাপাত করল না। অনুরূপ একটা ছবি পাশাপাশি ফুটে উঠল বরং। তিনি নিজে সে ঘটনার নায়ক। একটা গ্রামে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করতে গিয়েছিলেন। সে গ্রামে পোস্ট-অফিস থানা স্টেশন সব পুড়েছিল। ঘাটে একটা মালবোঝাই ফ্ল্যাট ছিল, সবাই লুট করেছিল সেটা। সুতরাং দশ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা অন্যায় হয়নি কিছু। দ্বিজেনের কথা শুনতে শুনতে সেই সম্পর্কে কয়েকটা মুখচ্ছবি পর পর ফুটে উঠল মনে। প্রায়ই ফুটে ওঠে। ভদ্রলোক সব। ডাক্তার জমিদার ব্যবসাদার সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বেয়নেট-ধারী মিলিটারী পরিবৃত হয়ে সারিবদ্ধ বসে আছে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। ভীত, অসহায়। লুটপাট তারা করেনি তা ঠিক, কিন্তু টাকা তাদের দিতে হবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে। না দিলে সম্পত্তি নিলাম করে নেওয়া হবে। গ্রাম্য ডাক্তারের দৃষ্টিটা মনে পড়ল, জ্বলছিল যেন। জমিদারের ম্যানেজারটা সেলাম করে খোশামোদ করবার চেষ্টা করছিল। চতুর ব্যবসাদার ঘুষ দেবার প্রস্তাব করছিল আকারে ইঙ্গিতে। বৃদ্ধ গৃহস্থ বেচারা কাঁদছিল। নীহার সেন কিন্তু টলেননি। পাই পয়সা পর্যন্ত আদায় করে এনেছিলেন। এসব ব্যাপারে টললে চলে না। শেষ লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, তাহলে সে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ছোটখাটো এমন অনেক কাজ করতে হয়, যা আপাতদৃষ্টিতে অমহৎ, কিন্তু শেষ লক্ষ্যের মাপকাঠিতে যাচাই করলে ইতিহাসের বিরাট পটভূমিকায় যা অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায় অবশেষে। লেনিন মানব-প্রেমিক ছিলেন, মনে মনে তিনি যে সমাজের কল্পনা করেছিলেন,

তা প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু সেই সমাজকে বাস্তবে মূর্ত করতে গিয়ে নরহত্যায় পশ্চাৎপদ হননি তিনি। হলে চলে না। লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসাধারণ মানুষের ওইখানেই তফাত।...দ্বিজেন চক্রবর্তীর কথা শুনতে শুনতে এই সব মনে হচ্ছিল নীহার সেনের। বিচলিত হননি তিনি, বিচলিত হননি মোটেই, বিচলিত হতে চান না।...সহসা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, মনে মনে চিৎকার করছেন তিনি। তাঁর নিজেরই সত্তাটা যেন দু ভাগ হয়ে গেছে, এক ভাগ আর এক ভাগের সঙ্গে তর্ক করছে চিৎকার করে। চমকে উঠে একটু অপস্তুত হয়ে পড়লেন। তার পর দ্বিজেনের মুখের দিকে চাইলেন একবার আড়চোখে। মনে হল, কিছু বলা উচিত।

কর্তব্য অনেক সময় কঠোর হয়ই, কি আর করা যাবে....

কর্তব্য? তাই নাকি! তোমার তো কর্তব্যপরায়ণ বলে নাম রটেছে খুব, তুমিও অনুভব করছ তা হলে! ভালো।

দ্বিজেনের মুখখানা হাস্যোদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

এইবার চুটিয়ে কর্তব্য করব ব্রাদার, বুঝলে। এতদিন ডালে ডালে ছিলাম, এবার পাতায় পাতায় বেড়াব। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—কোথায় পড়েছিলাম বল তো? মরুক গে। মোট কথা, চুটিয়ে কর্তব্য করব এবার। প্রোমোশন হয়েছে, শুধু তাই নয়, আই. বি. তে বদলি হয়েছি। সেই সুখবরটাই দিতে এসেছিলাম। উঠি এবার, ফাইল ক্লিয়ার কর তুমি। এক কাপ চা-ও তো অফার করলে না! মিসেস এখানেই তো? গান-টান শোনা যাচ্ছে না যে বড়?

মুচকি হেসে বেড়িয়ে গেলেন দ্বিজেন চক্রবর্তী।

দ্বিজেনের কথায় নীহারের নূতন করে আবার মনে পড়ল, সত্যি, অন্তরা আজকাল বড় বেশি রকম নীরব হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত গানে হাসিতে পূর্ণ করে রাখত সে বাড়িটা। আজকাল সাড়াশব্দই পাওয়া যায় না। বাড়ির কোন্ কোণে পড়ে থাকে, বোঝাই যায় না যেন। নিয়মমত কর্তব্য সমাপন করে যায় নিক্তির ওজনে নিখুঁতভাবে। মনে হয়, ভেতরের মানুষটা কোথায় চলে গেছে। পড়ে আছে শুধু দেহ-যন্ত্রটা। যে অন্তরা একদিন তাঁর প্রেমে পড়েছিল, সে অন্তরা কোথায়? সে যে অন্তর্হিত...এ কথা নীহারের অন্তর্যামী যে বুঝতে পারেনি, তা নয়। কিন্তু অন্তর্যামী ছাড়াও মানুষের মনে আর একজন থাকে, যে অন্তর্যামীর কথা বিশ্বাস করতে চায় না, প্রমাণ চায়। নীহারের মনের এই দ্বিতীয় সত্তাটি প্রমাণ সংগ্রহ করতেও ব্যগ্র নয়। অন্তর্যামী-আহরিত নিগূঢ় সত্যটি তিনি কেবল অবিশ্বাস করতে চান। অন্তরা তাঁকে আর ভালবাসে না—এ কথা কিছুতেই মানতে চান না তিনি। ইদানিং কিছুদিন থেকে যদিও তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, অন্তরার সবটা তিনি পাননি, অন্তরার চরিত্রের মধ্যে এমন একটা কি আছে যা তাঁর আয়ত্তাতীত, যা কিছুতেই তাঁর নিজের নাগালের মধ্যে, তাঁর বিশেষ অধিকারের মধ্যে ধরা দেয় না, ইচ্ছে করে যে লুকিয়ে রেখেছে তা নয়, অন্তরা সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে দিয়েছে (নীহার এই বিশ্বাসটাকেই আঁকড়ে আছেন প্রাণপণে), তিনিই—নীহারই তাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করতে পারেননি। সূর্যের কিরণ যেন। তাঁরই বাতায়ন-পথে এসে তাঁরই ঘর আলোকিত করেছে, তবু তাঁর নয়। বেলা শেষ হলেই চলে যাবে, রাখা যাবে না কিছুতে। আকাশ যেমন দিগন্তরেখায় পৃথিবীকে স্পর্শ করে আছে মনে হয়, অথচ কত দূরে...গাছের ফুলকে ছিঁড়ে এনে ফুলদানিতে,

এমন কি 'বাট্‌ন্‌হোলে' গুঁজে রাখলেও ফুলের অন্তরতম সত্তায় প্রবেশ করা যায় না যেমন কিছুতে, অন্তরা সম্বন্ধে এই ধরনের একটা বোধ তাঁর হৃদয়কে আকুল করে তোলে; যদিও ইদানিং কিন্তু অন্তরা তাঁকে আর ভালোবাসে না—এ কথা স্পষ্টভাবে কিছুতেই স্বীকার করতে চান না তিনি। অন্তর্যামীর মুচকি হাসির উত্তরে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি জবাব দেন—আমি ওকে সম্পূর্ণরূপে পাচ্ছি না, সেটা আমার নিজেরই অক্ষমতা, ও তো নিজেকে উজাড় করেই দিয়েছে।—এই সিদ্ধান্তে এসে শান্তি পেলেন নীহার সেন আবার। তাঁর অন্তরের সুনিভৃত অন্ধকার গুহায় বুভুক্ষু হিংস্র একটা পশুর দুই চক্ষে লেলিহান যে শিখাটা ধকধক করে জ্বলছিল তা যে আরও প্রখর হয়ে উঠল, নীহার সেন টের পেলেন না সেটা। পাবার কথাও নয়। গুহাটার সামনে মার্জিত চিন্তাধারার ঠাসবুনোনি পরদাখানা ঝুলছিল। সেটা তুলে ধরে আত্মবিশ্লেষণ করবার উৎসাহ ছিল না নবীন ডেপুটি নীহার সেনের। সময়ও ছিল না। সামনে স্তূপাকার ফাইল। ছুটির দিন, তবু ছুটি নেই। নীহার সেন ফাইলে মন দিলেন।

পাশের ঘরে অন্তরা শুয়ে ছিল। ঘুমুচ্ছিল না, চোখ বুঁজে পড়ে ছিল। তার আপাত-স্থৈর্যের অন্তরালে যে তুমুল আলোড়ন চলছিল, তার ঠিক স্বরূপটা নিজেও সে ঠিক করতে পারছিল না। ভয়, কৌতূহল, স্বাধীনতা-স্পৃহা, চক্ষুলজ্জা, বিদ্রোহ, সামাজিক কর্তব্য, নীহারের প্রতি মমতা এবং বিতৃষ্ণা—বহু বিচিত্র পরস্পরবিরোধী মনোভাব প্রবল হৃদয়াবেগের ঘূর্ণিপাকে তার মনে যে আবর্ত সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যে এমন কিছুই সে খুঁজে পাচ্ছিল না যা নির্ভরযোগ্য, যাকে অবলম্বন করে সে দাঁড়াতে পারে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে। তুমুল ঝঞ্ঝার মাঝখানে অন্ধকারে সে ছুটে চলেছিল একটা সত্য আশ্রয়ের আশায়, যেখানে তার মন নির্ভয় হবে। যে ভিত্তির উপর সে তার স্বপ্ন-সৌধ নির্মাণ করেছিল, তা নড়ে উঠেছে। স্বপ্ন-সৌধ ভেঙে পড়েছে। তাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে তবু? নিজেকে বারম্বার এই একই প্রশ্ন করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু থামতে পারছিল না। মনের ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে একটা উত্তরও আসছিল, ঠিক উত্তর নয়, পালটা প্রশ্ন আর একটা—ত্যাগ করবে কোন্ অজুহাতে, ত্যাগ করে যাবেই বা কোথায়? এ প্রশ্ন কিন্তু তার প্রথম প্রশ্নকে নিরস্ত করতে পারছিল না কিছুতে। সঙ্গে সঙ্গে এও সে ভাবছিল, যা সে আপাতদৃষ্টিতে দেখছে, তাই কি নির্ভরযোগ্য? কিছুদিন আগে যে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে সে নীহারের মধ্যেই জীবনের সঙ্গীকে আবিষ্কার করেছিল, সেই বিচার-বুদ্ধিটাই কি নির্ভরযোগ্য? স্বামীর কর্তব্যে নীহারের তো এতটুকু অবহেলা নেই, তাকে বিয়ে করে বরং নিজের আত্মীয়সমাজে সকলের বিরাগভাজন হয়েছেন তিনি। কমিউনিস্ট হয়ে ক্যাপিটালিস্ট গভর্মেন্টের অধীনে কেন তিনি চাকরি করছেন তার সপক্ষে নীহারের যুক্তির অভাব নেই, যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হলে শত্রুর সঙ্গেও আপোস করতে হয়। ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে কমিউনিজ্‌মের পৃথিবীব্যাপী যে যুদ্ধ অহরহ চলেছে, এটা তার অংশমাত্র। বৃহত্তর উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রেখেই অধুনা ক্যাপিটালিজ্‌মের মিত্রের ভূমিকায় অবতরণ করতে হয়েছে কমিউনিস্টদের। এসব কথা নীহার বহু বার বলেছেন, সে বহু বার শুনেছে। এর যৌক্তিকতাও সে অস্বীকার করতে পারেনি—বস্তুত এ নিয়ে তর্কই করেনি সে, নীহার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বার বার নিজের যুক্তিটা আস্ফালন করেছেন তার কাছে কারণে-অকারণে। যুক্তির দিক দিয়ে এসব কথা অকাট্য হলেও অন্তরের অন্তস্তলে অযৌক্তিক কি যেন একটা বাষ্পাকারে উঠে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে যুক্তির

স্পষ্টতাকে। মনে হচ্ছে যুক্তিই কি জীবনের সব, জীবনযুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত করাটাই মানব-জীবনের শেষ কথা, আর কিছু নেই? সামান্যতম পশুর আর বৃহত্তম মানুষের জীবন-দর্শনে কোন তফাত থাকবে না? এক-একবার এও মনে হচ্ছে, দাম্পত্যজীবনে রাজনীতিকে এত বড় স্থান দেওয়ার প্রয়োজন কি?... রাজনৈতিক মতবাদ থাকুক না বৈঠকখানার সুসজ্জিত সোফায় বসে তর্কাতর্কি চলুক না সেখানে, তার আলোড়ন অন্তঃপুরের শান্তিকে বিঘ্নিত করবে কেন? তখনই আবার ভাবছে, আমার এ দাম্পত্যজীবন যে ওই সূক্ষ্ম মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত! সমাজের অন্তঃপুর আর এর অন্তঃপুরে আকাশ-পাতাল তফাত যে! এর সবটাই অন্তঃপুর, বৈঠকখানা নেই। সমাজ এ জীবনে আমার ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেয়নি, আমি নিজে জেনে এ জীবনকে বরণ করেছি। যে আদর্শ স্বপ্ন-জীবনকে মূর্ত করতে চেয়েছিলাম এত সাধ করে, বাস্তবের এক আঘাতে সেই স্বপ্নটাই যদি চুরমার হয়ে গেল, তাহলে আর বাকি রইল কি? আদর্শ...স্বপ্ন...এই তো জীবনে চেয়েছি। কৌশল নয়, বিদ্যা নয়, বুদ্ধি নয়, রূপ নয়, অর্থ নয়, চেয়েছি মহত্ত্ব, বীরত্ব, আত্মত্যাগ। ডেপুটি-গৃহিণী হয়ে সকলের উপহাসের খোরাক যোগানোই যদি এর পরিণতি হয়, তাহলে লক্ষপতি ধনীর দুলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রীধারী যে নাদুস-নুদুস ব্যক্তিটির সঙ্গে তার বাবা প্রথমে সম্বন্ধে করেছিলেন, তার গলায় মালা দিলেই তো হত। জীবন-যুদ্ধের আইন অনুসারে বেশি সঙ্গত কাজই হত। কিন্তু তা না করে সে রূপকথালোকের রাজপুত্রকে বরণ করেছিল...মিনুকে রাগের মাথায় অন্য কথা লিখলেও নীহার তার চক্ষে রূপকথালোকের রাজপুত্রই ছিল সেদিন, যে রাজপুত্র অসাধ্যসাধন করবে, ঘুমন্তপুরীকে জাগিয়ে তুলবে সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে। জীবন-যুদ্ধের কৌশলে সেই রাজপুত্র সহসা রূপান্তরিত হয়ে গেল উপহাসাস্পদ কেরানীতে। হতে পারে না... কিছুতে হতে পারে না...

নীহার সেন তন্ময় হয়ে রায় লিখছিলেন। অসহায় কয়েকটা মুখ চোখের উপর ভাসছিল। অভাব—হ্যাঁ, অভাবই আসল কারণ, শুধু অর্থাভাব নয়, শিক্ষারও অভাব। লোকগুলোর চোখে পশুর দৃষ্টি, মানুষের নয়—ক্যাপিটালিস্ট সমাজের দুর্বল মানুষ-পশু। সুস্থ জীবন যাপন করবার সুযোগ পায়নি, চুরি করতে হয়েছে...তা ছাড়া...ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত হল নীহার সেনের। সত্যি লোকগুলো চুরি করেছে কি? ...একের পর এক এতগুলো লোক একবাক্যে যে কথা বলে গেল, উকিলের জেরায় টলল না, সে কথা বিশ্বাস করলে চুরি করেছে স্বীকার করতে হয়। এতগুলো লোকের কথা অবিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই। কিন্তু মকদ্দমা দাঁড় করাবার জন্যে পুলিস যে মিথ্যে সাক্ষী সৃষ্টি করে, এ তো জানা কথা। সেদিন একজন পুলিস-অফিসার বলছিলেন, নিছক সত্যের উপর নির্ভর করতে গেলে কোন দোষীকে সাজা দেওয়া যায় না। আইনের এমনই গড়ন যে, দোষীকে সাজা দিতে হলেও সত্যের খানিকটা অপলাপ করতেই হবে। এই আইনের সহায়তা করেছেন তিনি! সাক্ষীর উপর যেখানে সব নির্ভর করছে, এবং সে সাক্ষী পুলিস যখন নিজের খুশিমত তৈরী করতে পারে তখন....অসহায় লোকগুলোর নিষ্প্রাণ দুর্বল দৃষ্টি আবার মনে পড়ল তাঁর....ওই দুর্বল দৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসারও কিছু আভাস ছিল। ....সুযোগ পেলে ওরা প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না....হয়তো ওরা নির্দোষ। কিন্তু 'হয়তো'র উপর নির্ভর করতে গেলে কাজ চলে না। পৃথিবীতে সব আইনে ফাঁক আছে, সব নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। ট্রেনে কলিশন হয় জেনেও আমরা ট্রেনে চড়ি। বিবেকের তীক্ষ্ণ চঞ্চু ঠোকর মেরে মনে যে

ক্ষতটা করেছিল, এ কথা মনে হওয়াতে তাতে একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ল যেন। না, এতগুলো সাক্ষীকে অবিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই। ওদের পক্ষের উকিল তো কম জেরা করেনি! কলম চলতে লাগল নীহার সেনের। সব কটার সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে দিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, যে ডেপুটি যত বেশি সাজা দিতে পারে, চাকরিতে তার নাকি তত বেশি উন্নতি হয়! দু-চারটে উদাহরণও মনে পড়ল। পিওন চিঠি দিয়ে গেল। বাই জোভ, গুজব নয় তাহলে, সত্যিই সে রায় সাহেব হয়েছে। হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি মনটা শ্রদ্ধাগদগদ হয়ে উঠল....পর-মুহূর্তেই লজ্জা হল, তখনই বিদ্রোহের সুর জাগল আবার...অনুপস্থিত প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে মনে মনে আবৃত্তি করলেন—তুমি পাওনি, ঠাট্টা করছ তাই.....আঙুর আর শিয়ালের গল্পটা মনে পড়ছে। এতে লজ্জারই বা কি আছে, আমি তো চাইনি, আমার যোগ্যতার জন্য যেচে ওরা দিয়েছে। ক্লাসে যেমন ফার্স্ট প্রাইজ পেতাম। আর একটা সুখবরও ছিল চিঠিতে। সদরে বদলি হয়েছেন তিনি। অন্তরা খুশী হবে বোধ হয়। এই মফস্বলের বুনো আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছে বেচারা। তাই বোধ হয় অত মুষড়ে পড়েছে। আমি কাজকর্ম নিয়ে থাকি, ওর সঙ্গে গল্প করার পর্যন্ত সময় পাই না—ও বেচারার সময় কাটে কি করে। একটা রেডিও সেট কিনতে হবে এবার। এখনই উঠে গিয়ে অন্তরাকে সুসংবাদটা দিয়ে আসবেন কি না ভাবছিলেন, এমন সময় দরজাটা খুলে অন্তরা নিজেই এসে দাঁড়াল। চোখে অদ্ভুতরকম একটা উন্মুখ দৃষ্টি।

আমার একটা কথা রাখবে?

কি?

চাকরিটা ছেড়ে দাও তুমি। দেবে?

মজ্জমান লোক যে আগ্রহভরে ভাসমান কাঠের টুকরোটাকে অপলকা জেনেও আঁকড়ে ধরতে যায়, সেই আগ্রহ ফুটে উঠল অন্তরার চোখের দৃষ্টিতে। আবেগভরে ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

নীহার সেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

।। ষোল।।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অংশুমান চুপ করে শুনছিল।

হার্ৎজ্ বলছিলেন, ব্যাটনের আঘাতটা তোমার মাথায় লেগেছে, তুমি কষ্টও পেয়েছ খুব—এ কথা আমি মানছি। আমি শুধু তোমাকে সেই পুরাতন সত্যটা আবার নতুন করে উপলব্ধি করতে বলছি যে আমাদের অনুভূতির সীমানা বড় সংকীর্ণ। আমরা যতটা অনুভব করতে পারি, তার বাইরেও ঢের জিনিস আছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, যা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, তারও রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়। সাধারণ আলো রূপান্তরিত হয় ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ মহিমায় সামান্য একটা পরকলার ভিতর দিয়ে দেখলে। সুতরাং অনুভূতির বিশেষ একটা রূপকে আঁকড়ে ধরে কষ্ট পাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

কষ্ট পাচ্ছি যে। যা পাচ্ছি তা মানতেই হবে।

আনন্দও পেতে পার, যদি তোমার অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে বিশেষ একটা পরকলার ভিতর দিয়ে চালিত করতে পার।

কোথায় পাব সে রকম পরকলা?

তোমার মনের ভিতরেই আছে। খুঁজে দেখ। পরকলা শুধু কাচেরই হয় না, মানসিকতারও হতে পারে। একটা বিশেষ ধরনের মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়ে গেলে যন্ত্রণাও যে আনন্দদায়ক হতে পারে, তার প্রমাণ স্যাডিজ্‌মে। বিকৃত মনোভাব হিসেবে ওটা অনেকের কাছে ধিক্কৃত, বিজ্ঞানের কাছে কিন্তু কোন কিছুই ধিক্কৃত নয়। তা ছাড়া ইতিহাসে যাঁরা মার্টার বলে পুজো পান, তাঁরা কোনও অলৌকিক শক্তিবলে শারীরিক বেদনাকে মানসিক বিলাসের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন হয়তো। তোমাদের দেশেই সেকালে রাজপুত-রমণীরা জহরব্রত করতেন, এখনও চড়কপুজোয় অনেকে পিঠের চামড়ায় লোহার বড়শী বিঁধিয়ে বাঁশের ডগায় ঝোলেন শুনেছি। এঁরা নিশ্চয়ই কোন উপায়ে যন্ত্রণাকে মাধুর্যে রূপান্তরিত করতে পারেন, তা না পারলে—

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন হার্ৎজ্‌।

দেখ, স্নায়ুতন্ত্রীগুলো আঘাতের তরঙ্গগুলোকে বহন করে নিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে বেদনা-বোধের কেন্দ্রে আলোড়ন তোলে, তাই না আমরা বেদনা বোধ করি। সেগুলো আনন্দ-বোধের কেন্দ্রে গিয়ে আলোড়ন তুললেই আমরা আনন্দ বোধ করব। যোগাযোগ ঘটানো অসম্ভব কি?—ঘনসন্নিবিষ্ট চাপদাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। ক্ষণপরই আলো চকমক করে উঠল চোখের দৃষ্টিতে।

দেখ, ফ্যারাডের স্বপ্নকে ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল ভাষা দিয়েছিলেন। তিনি অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন যে আলো আর বিদ্যুৎতরঙ্গ একই জাতের জিনিস, একই ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিজমের বিভিন্ন রূপ—ইলেক্‌ট্রিকাল লাইন্‌স্‌ অব ফোর্স একটি মিডিয়মে মাত্র চলে, তার নাম ঈথর—যা সর্বব্যাপী, যা প্রত্যেক জিনিসের অণু-পরমাণুর অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট, অনেকটা তোমাদের উপনিষদের ব্রহ্মের মত এই ঈথর প্রত্যেক জিনিসকে প্রত্যেকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে রেখেছে—এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তরঙ্গ বহন করে এই ঈথরই। আমি হাতে-কলমে প্রমাণ করেছিলাম সেটা। এখন আমাদের অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে যদি ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক ওয়েভ বলে মনে কর—খুব সম্ভব তাই ওরা—তাহলে তাদের বহন করবার জন্যে স্নায়ুতন্ত্রীর প্রয়োজন নাও হতে পারে। সর্বব্যাপী ঈথর আছে। সুতরাং তার সাহায্যে বেদনার কম্পনগুলোকে আনন্দ-বোধের কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেই চেষ্টা কর তুমি। তোমাকে এই এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা করতে বলেছি এই জন্যে যে, আঘাত পেলেই তুমি যদি কাবু হয়ে পড়, তাহলে যে পথ তুমি বেছে নিয়েছ সে পথে অগ্রসর হতে পারবে না; কারণ যে পথেই তুমি চল না কেন, আনন্দই হল প্রধান পাথেয়। তোমার সশস্ত্র শত্রু অজস্র আঘাত করবে—ওই ওদের একমাত্র শক্তি—ওদের আঘাতকে তুমি যদি আনন্দে রূপান্তরিত করতে পার, তা হলেই তোমার জয়। পারবে না কেন?—Theoretically it is quite possible। আকাশের ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক তরঙ্গ রেডিও সেটে ঢুকে শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে, বেদনার অনুভূতিই বা আনন্দের অনুভূতিতে রূপান্তরিত হবে না কেন মস্তিষ্কের মত অমন একটা বিস্ময়কর যন্ত্রে প্রবেশ করে? চেষ্টা কর, হবে ঠিক।

হার্‌ৎজ্‌ চলে গেলেন।

অংশুমান অন্ধকারে চুপ করে বিমূঢ়ের মত বসে রইল। অকারণে আচমকা মার খাওয়ার পর থেকে তার সমস্ত মন কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে। একটা হিংস্র পশুকে বন্দী করেও লোকে তাকে এমন অকারণে মারে না। জেলে নাকি বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল! কয়েকজন কয়েদী নাকি জেলারকে তাড়া করে! ইলেক্‌ট্রিকের তার কেটে দিয়েছে! কর্তৃপক্ষের সন্দেহ, রাজনৈতিক বন্দীরাও সংশ্লিষ্ট আছে এতে। তাই এই শাসন।

একটা তপ্ত লৌহ-শলাকা কে যেন মাথার ভিতর ঢুকিয়ে ঘোরাচ্ছে ক্রমাগত। ঘুরিয়েই চলেছে—একদণ্ড বিরাম নেই—অসহায় পশুর মত সহ্য করতে হচ্ছে—উপায় নেই কোনও।

আনন্দে রূপান্তরিত করতে হবে। অসম্ভব যে নয় তা সে নিজেই জানে, কিন্তু নিজেকেও সে জানে যে! আঘাতের বদলে প্রতিঘাত করতে হয়—এই তার শিক্ষা। অপমানে জর্জরিত হয়ে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিঘাত করবে বলেই সে একদা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, প্রবল বিরুদ্ধ-শক্তির নিষ্ঠুর চাপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা জেনেও! এই প্রত্যাশিত চাপে আর্তনাদ করছে কেন তবে? নির্বিকারে থাকতে পারছে না কেন? নির্বিকারই থাকতে পারছে না যখন, আনন্দে রূপান্তরিত করবে কি করে তাকে? হার্‌ৎজের এ উপদেশ পালন করবে কি করে সে? পারলে যুদ্ধজয় সুনিশ্চিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে যখন সচেতন হল, তখন নিজের ক্ষুদ্রতায় সে সঙ্কুচিত। অযোগ্য, অনুপযুক্ত। সামান্য পশু ছাড়া আর কিছু নয়। আঘাতের বদলে প্রতিঘাত দেবার অতিপরিমিত সামান্য শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি তার নেই, তাই হাহাকার করে মরছে সারাক্ষণ। মত্ত মাতঙ্গের পদতলে নিষ্পিষ্ট কীটের মতই মরতে হবে, কীটের মতই মরতে হবে এবার। কীটের মতই মনোভাব, কীটের মতই দুর্বল, কীটের মতই মরতে হবে। আত্মিক শক্তি—মহাত্মা গান্ধী যে শক্তির উপর আস্থাবান, হার্‌ৎজ্‌ যে শক্তির কথা বলে গেলেন, সে শক্তির চর্চা তো সে করেনি কোনদিন। তার সন্ধানও জানে না। যে আত্মিক শক্তির বলে মানুষ পশুত্বের স্তর ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বলোকে উঠে গেছে...হঠাৎ দধীচির কথা মনে পড়ল— নিজের অস্থি দান করে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন....এটা কিসের রূপক?.... অনেকক্ষণ এই কথাই ভাবলে সে। রূপকের মর্মোদ্ধার হল না, সমস্ত অন্তর জুড়ে ঘনিয়ে উঠল একটা ক্ষোভ। যে ভারতবর্ষে তার জন্ম, সে ভারতবর্ষের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে। পাশবিক শক্তির তুচ্ছ আস্ফালনে মুগ্ধ হয়ে মনুষ্যত্বের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। পশু ছাড়া আর কিছু হয়নি সে। তাও অতিশয় হীন পশু...অতিশয় ছোট।

ছোট জিনিস তুচ্ছ নয়। আমি অদৃশ্য বিদ্যুৎতরঙ্গ ধরেছিলাম অতি ছোট একটি যন্ত্রের সাহায্যে। গ্যালিনার উপর সরু একটি তার....

আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল, তার পর সাহস হল যেন। ঘোর অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল অন্ধকারে, নির্ভরযোগ্য আত্মীয়ের দেখা পেয়ে শুধু যে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তা নয়, ম্লানায়মান আত্মবিশ্বাসের জ্যোতিটাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল সহসা অন্তরে। মনে হল, পারব।

জগদীশচন্দ্রও বললেন, ভারতবাসী তুমি, নিজেকে হীন ভাবছ কেন এতটা? তুমি হীন নও। অমৃতের পুত্র তুমি। আদিত্যবর্ণ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করবার পূর্বে উপনিষদের ঋষিকেও তমসার

সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভয় কি, অন্ধকার থাকবে না, আলো দেখা দেবে, সত্যকে আশ্রয় করে থাক শুধু।

সত্যকে?—সাগ্রহে বলে উঠল অংশুমান, কোন্‌টা সত্য বলে দিন আমাকে। কাকে আমি আশ্রয় করব, আমি আশ্রয় খুঁজছি!

সত্য কি, তা কেউ কাউকে বলে বোঝাতে পারে না। নিজে সেটা উপলব্ধি করতে হয়। যেটা মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে, সেইটে পরিহার করে চল শুধু। সত্য-সন্ধানের সেই একমাত্র উপায়। অনেকে মিথ্যা সত্যের মুখোশ পরে থাকে, তাদের চিনতে দেরি হয়, কিন্তু সন্ধানী বেশীদিন প্রতারিত হয় না। রূপে রূপে বহু রূপে যিনি বিচিত্র, জীবনে ও মরণে যিনি নিত্য, সেই স্বয়ম্প্রভ স্বতন্ত্র সত্যের নির্লিপ্ত রূপ দেখতে পাবেই, যদি তোমার নিষ্ঠা আর আকুলতা থাকে।

আমি যে-পথের পথিক, সে পথেও কি এই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রয়োজন? আমি চাই ক্ষমতা, শত্রুকে শাসন করবার শক্তি—

সত্যের কোন জাতিভেদ নেই। সত্যই শক্তি। আলোকে ভাসমান ধূলিকণা, পৃথিবীর অগণিত প্রাণী, আকাশের অসংখ্য প্রদীপ্ত সূর্য, শিকারের উপর ঝম্পনোন্মুখ শার্দূল, লজ্জাবতীর সঙ্কোচ, কুমুদিনীর নিশি-জাগরণ, বনচাঁড়ালের নৃত্য, উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত যা কিছু, তা শক্তির বিকাশ এবং তার মূলে আছে সত্য—একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, তাও এরই মধ্যে নিবদ্ধ। কোন পথই এর বাইরে নেই। যম নচিকতাকে বলেছিলেন—তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন....সকল দেবতা এঁর মধ্যেই প্রবিষ্ট—এঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। জড়, জীব, উদ্ভিদ, প্রাণী, বিদ্যুৎ, আলো—সমস্ত অনুশীলন করে সকলের মধ্যে যে বিরাট ঐক্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে বুঝেছি যে, আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তনশীল বলে মনে হলেও অন্তর্নিহিত সত্য এক এবং অভিন্ন। এবং এ উপলব্ধি যাঁর হয়েছে, তিনি অজেয়।—

বলতে বলতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল, যাচ্ছি যাচ্ছি, তোমারই কাছে, সত্যপথে অনিবার্য গতিতে—

তার পরদিন সকালেই অংশুমান খবর পাঠালে যে, সে দোষ স্বীকার করবে। তার স্বীকারোক্তি শুনতে এলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীহার সেন। ঠিক আগের দিন তিনি সদরে বদলি হয়ে এসেছিলেন।

।। সতেরো।।

শেষরাত্রি।

ঘন কুয়াশায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে পরিচিত ছিল, তা অবলুপ্ত হয়েছে। কুহেলিকা নয়, যেন প্রহেলিকা। জীবনের কোন লক্ষণ কোথাও নেই, বৈচিত্র্যহীন, সব একাকার। বিরাট একটা সাদা চাদর দিয়ে মৃতদেহকে মুড়ে রেখেছে যেন কে—চাদরটা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। অস্তমান শশীর পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় হাসি নেই, আছে সকরুণ আক্ষেপ। নীরব ভাষায় যেন বলছে, তোমরা যখন জাগবে তখন আমি থাকব না, আমার সময় ফুরিয়েছে, আমি চললাম। একটা সবেদন সান্ত্বনাও যেন ক্ষরিত হচ্ছে ম্লানায়মান সেই আলো থেকে। চন্দ্র অস্ত

গেল। ধার-করা আলোর জ্যোতিটুকুও নির্বাপিত হল। নিবিড় অন্ধকার। মনে হচ্ছে, সর্বগ্রাসী..... কালের প্রবাহও থেমে গেছে.....নিস্পন্দ অসাড় সব....বিরাট একটা অন্ধ জঠর গ্রাস করে জীর্ণ করছে যেন চরাচর নিখিল বিশ্ব। আশার লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই বলে মনে হচ্ছে যখন, তখন অদ্ভুত কাণ্ড হল একটা। তীক্ষ্ণ তীব্র সুরে বাঁশি বেজে উঠল অন্তরীক্ষে। সু-উচ্চ দেবদারুশাখাসীন শকুন্ত আলোকের অরুণাভাস দেখতে পেয়েছে পূর্বদিগন্তের চক্রবালরেখায়। এসেছে, সে এসেছে। নিষ্পন্দ স্পন্দিত হল, অসাড়ের সাড়া জাগল। নিষ্প্রাণ ঘুমন্ত পুরীতে লাগল যেন সোনার কাঠির স্পর্শ। সহস্রকিরণের সহস্র স্বর্ণশরজালে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কুয়াশার মোহআবরণ । স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর হতে লাগল চতুর্দিক। পাহাড়ের চূড়া জাগল, দেখা দিল বনস্পতির শীর্ষদেশ, মন্দিরের ললাটে পড়ল আলোকের তিলক, কলরব করে উঠল পক্ষীকুল বন থেকে বনান্তরে। ফুল ফুটল, হাওয়া বইল, অনুরূপ বর্ণবিচ্ছুরিত শোভাযাত্রায় প্রবেশ করল আলোকের বিজয়-রথ। প্রভাত হল।

।। আঠারো।।

মোটরের চারটে টায়ারই ফেটেছে।

পথের অনেকখানি জুড়ে ঘন ঘন লোহার পেরেক পোঁতা। আশেপাশে কোন গ্রাম নেই, চারিদিকে ধু-ধু করছে মাঠ। আমরা যে এই পথ দিয়ে যাব, তা কি করে জানলে ওরা, কে ওদের খবর দিলে?—ভ্রূকুঞ্চিত করে একটু বিস্মিত হবার চেষ্টা করলেন নীহার সেন। ড্রাইভার টায়ার মেরামত করছিল, একটু ঝুঁকে সেটাতে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলেন, পট করে হাফপ্যাণ্টের বোতাম ছিঁড়ে গেল একটা। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড় কপাল মুছলেন ভাল করে। হাতঘড়িটা দেখলেন একবার। আর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। সহসা চোখের উপর হাতটা একবার বুলোলেন, বুলিযেই ভুলটা বুঝতে পারলেন। ছবিটা চোখের সামনে নেই, মনের ভিতর আঁকা হয়ে গেছে। কতকগুলো পা, মোটর-লরি থেকে ঝুলছে—মড়ার পা। মিলিটারির গুলিতে মরেছে। মোটর-লরিতে বোঝাই করে এই কিছুক্ষণ আগে সেগুলোকে ফেলে আসা হল ওই নদীতে। প্রকাণ্ড মাঠটার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে নদীটা। সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন নীহার সেন। যদিও নদীটা দেখা যাচ্ছিল না, দেখা যাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তবু চেয়ে রইলেন। পাগুলো ঝুলছিল—দশ-বারোটা পা। হঠাৎ রাগ হল—অনির্দিষ্ট ধরনের রাগ। তার পর সেটাকে নির্দিষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। কতৃপক্ষ তাঁকেই কেন এ অপ্রীতিকর কাজটা দিলেন এত লোক থাকতে? তাঁকে বদলি করে আনার কি দরকার ছিল মফস্বল থেকে? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলছিলেন, তিনি বেশি কার্যদক্ষ—ক্রাইসিসের সময় 'এফিশেণ্ট' অফিসার দরকার। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, মিলিটারিদের গুলি চালাবার হুকুম দেওয়া ছাড়া দক্ষতা দেখাবার আর কোন উপায় নেই। সত্যিই নেই, সবাই কেমন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—জেলের কয়েদীরা পর্যন্ত। দু-দুজন জেলের অফিসারকে খুন করে পুড়িয়ে ফেলেছে, ফায়ার করবার অর্ডার না দিলে কি রক্ষা ছিল কারও? সমস্ত জেলখানাটা পুড়িয়ে ফেলত। জন চল্লিশ মরেছে—বেশ হয়েছে—ক্রিমিনাল গুণ্ডা যত। আর একটু রাগবার চেষ্টা

করলেন; কিন্তু পাগুলো আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে—দ্রুত ধাবমান লরির পেছন থেকে ঝুলছে। রাগটা একটু ফিকে হয়ে গেল। মনে হল, কই, এতদিন তো ওরা বিদ্রোহ করেনি, নিশ্চয় রাজনৈতিক বন্দীদের ষড়যন্ত্র আছে এর মধ্যে। অংশুমানের মুখটা মনে পড়ল। অদ্ভুত ছেলে! চোখের দৃষ্টিতে কোন উদ্বেগ নেই, ভয় নেই, উত্তেজনা নেই। পরিপূর্ণ শান্তিতে স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি। নির্বিকার চিত্তে স্বীকার করলে যে, ডেপুটির অমানুষিক অত্যাচারে বিচলিত হয়ে সে তাকে পুড়িয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করেছিল প্রতিশোধ নেবার জন্যে। এর জন্যে সে একটুও অনুতপ্ত নয়, এতদিন মিথ্যে কথা বলে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে বলেই সে অনুতপ্ত । তার মৃত্যুর জন্যে সে-ই সম্পূর্ণ দায়ী, আর কাউকে জড়াতে সে চায় না। অকম্পিত কণ্ঠে স্বীকার করলে যে, সে একাই দায়ী, অকম্পিত হস্তে সই করে দিলে স্বীকার-পত্রে। মুখের ভাব শান্ত, স্নিগ্ধ। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই এদের। আগেও অনেকবার দেখেছিলেন একে তিনি, কতবার তাঁর বাড়িতেই এসেছে। মুখচোরা ভালোমানুষ বলে মনে হত। ভাবতেই পারা যায়নি তখন যে এই লোক আগস্ট-ডিস্টার্‌বেন্সের পাণ্ডা হয়ে জলজ্যান্ত একটা লোককে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। এতদিন ধরে ক্রমাগত দোষ অস্বীকার করে এসেছে—হিমসিম খেয়ে গেছে এতগুলো ঝানু দারোগা। সবাই হার মানল যখন, তখন হঠাৎ নিজে যেচে দোষ স্বীকার করছে। অদ্ভুত! ভয় পেয়ে করছে যে, চোখের দৃষ্টি থেকে তা মনে হয় না। মিলিটারি ফায়ারিং হবার আগেই স্বীকার করেছে। না ভয় নয়—আসলে ওরা....আর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে চিন্তা করতে লাগলেন, এই ধরনের লোককে ঠিক কোন্‌ শ্রেণীতে ফেললে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। কারও প্রতি অবিচার করতে চান না নীহার সেন, প্রত্যেক জিনিসকে ঠিক প্রপার পার্‌স্‌পেক্‌টিভে ফেলে বিচার করাই তাঁর রীতি—একটু ভেবে তাই ঠিক করলেন, না, ঠিক ক্রিমিনাল ওরা নয়, বাহাদুরি করবার জন্যেও এসব করেনি, আসলে ওদের মনের সমতা নেই, আন্‌ব্যাল্যান্‌স্‌ড্‌ মাইণ্ড—এরাই বোধ হয় পাগল হয় শেষ পর্যন্ত। একটু দুঃখ হল—ছেলেটা পড়াশুনায় ভালো ছিল নাকি....

আর কত দেরি হে?

এখনও বহুত দেরি হুজুর। চার-চারটে টায়ার—। হাসিমুখে জবাব দিলে ড্রাইভার।

আকাশে বেশ মেঘ করেছে। ঘন-নীল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তাঁদের একটা ময়ূর ছিল। মেঘ দেখলে ময়ূরটা পেখম তুলে নাচত, আর নাচত তাঁর ছোট বোন মালতী। গানও গাইত একটা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে। ময়ূরটা উড়ে পালিয়ে গেল একদিন। মালতীও মারা গেছে। হঠাৎ মনে হল, বৃষ্টি হবে নাকি? আকাশের দিকে চাইলেন একবার। শঙ্কা ঘনিয়ে এল চোখের দৃষ্টিতে। অসহায়ভাবে চারদিকে চাইলেন—ধূ-ধূ করছে ফাঁকা মাঠ—কোথাও আশ্রয় নেই—মনে হল, আশ্রয় থাকলেও কেউ কি অভ্যর্থনা করত তাঁকে? মোটরে উঠে বসলেন।

আকাশে বহু বিচিত্র মেঘ থাকলে আকাশটা যেমন চোখে পড়ে না, তেমনই নানা চিন্তার ভিড়ে আসল চিন্তাটা আড়ালে পড়ে ছিল এতক্ষণে। হঠাৎ সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। অন্তরা চলে গেছে। কোথায়, কেন, কিছুই বলে যায়নি। ভ্রূকুঞ্চিত করে অপটুভাবে শিস দেবার চেষ্টা করলেন। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস উঠল একটা।

।। উনিশ।।

চাকরি ছাড়ার প্রস্তাবটাকে লঘু-হাস্যভরে উড়িয়ে দিলেন যখন নীহার সেন, তখন অন্তরার দাম্পত্য-নীড়ের শেষ খড়টুকুও যেন উড়ে গেল। যে ডালে সে নীড় ছিল, সেই ডালটাকে আঁকড়ে থাকবার আর কোন অজুহাত সে আবিষ্কার করতে পারলে না। সেটা ভদ্রভাবে ত্যাগ করে যাওয়াই স্বাভাবিক বলে মনে হল তার। আদর্শকেই সে বরণ করেছিল, নীহার সেনকে নয়। নীহারের চেয়ে দেশই তার কাছে বড়। কোন ইজ্‌মের খাতিরে সে দেশদ্রোহী হতে পারবে না। প্রথমে যৌবনে কমিউনিজ্‌মের যে স্বপ্ন তার কল্পলোকে মূর্ত হয়ে ছিল, তা আজও অম্লান আছে—সে কমিউনিজ্‌মের ভিত্তি দেশ—দেশেরই দরিদ্র জনসাধারণ। তাদের উপর গুলি চালাবার, তাদের অবলা নারীদের ধর্ষণ করবার যে যুক্তি নীহারকে মুগ্ধ করেছে, সে যুক্তি নিয়ে নিজের মতে নিজের পথে সে একাই চলুক। প্রত্যহের কুশাঙ্কুর সহ্য করে সে ও-পথে সঙ্গী হতে পারবে না।....

একটা ছোট স্যুটকেসে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সে গুছিয়ে নিলে। স্যুটকেসটা পরে ফেরত দিলেই হবে। কিছু টাকাও নিয়ে যাচ্ছে, সেটাও ফেরত দিতে হবে। চিঠিও লিখতে হবে একটা পরে। নীহার নিজের পথে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাক, আমি সরে দাঁড়ালাম তার স্বাধীনতায় বাধা দিতে চাই না বলে—এই সব লিখতে হবে।—আরও অনেক কথা লিখতে হবে।....

রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু নীহারের কথাই মনে হতে লাগল বার বার। বিদ্বান বুদ্ধিমান তর্কপটু রাজনৈতিক নীহারকে নয়। সেই অসহায় পুরুষটাকে, যার অন্তরা না থাকলে একদণ্ড চলে না; তাকে, যে দাড়ি কামিয়ে বুরুশটা ধুতে ভুলে যায়, হাতঘড়িটা হারায় ক্ষণে ক্ষণে, আপিসের কাগজ কোথায় রাখে ঠিক থাকে না। মনে পড়ছিল, মায়া হচ্ছিল; কিন্তু আর ফিরবে না সে। মা-বাবাকেও সে কম ভালোবাসত না, কিন্তু নীহারের জন্য তাদেরও ছেড়ে এসেছিল একদিন। আদর্শের জন্যেই নীহারকেও ত্যাগ করতে হল। কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু সে আর ফিরবে না। স্টেশনের দিকেই চলেছিল সে হাঁটাপথে। কোথায় যাবে ঠিক ছিল না। কলকাতায়ই যাওয়া যাক আপাতত। হঠাৎ মনে হল, তার আর্দশকে রূপ দেবে কে? অংশুমান? সে তো নাগালের বাইরে, জীবনে আর হয়তো দেখাই হবে না। হঠাৎ বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে সে—দ্রুতবেগে চলতে লাগল অসমতল কঙ্করাকীর্ণ পথে। সমস্ত দেহ-মন একাগ্র হয়ে উঠল যেন। কেন, কিসের উদ্দেশ্যে, তা সে বুঝতে পারলে না। চলতে লাগল শুধু, দ্রুতবেগে চলাটাই একমাত্র করণীয় বলে মনে হল। যেতে হবে—কোথায় সে আদর্শলোক জানা নেই—তবু যেতে হবে। চলতে লাগল। অনির্দিষ্ট নামহীন একটা আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে টেনে নিয়ে চলল তাকে।

মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে কিন্তু যে হাহাকারটা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে স্পষ্টভাবে অনুভব করতে লাগল, জীবনে সে কাউকে ভালবাসতে পারেনি, এক নিজেকে ছাড়া। সে ভালোবাসা চেয়েছে, ভালোবাসা পেয়েছে বলে ভান করেছে, মাঝে মাঝে উতলা হয়েছে, স্বপ্নের ঘোরে স্বপ্নকে জড়িয়ে ধরতে গেছে—কিন্তু আসলে পায়নি কিছু। সত্যি যদি ভালোবাসা পেত, তাহলে কেরানী স্বামী নিয়েও সুখী হত সে। ভালোবাসার স্পর্শে দাসত্বও মহনীয় হয়ে উঠত। হৃদয়সিংহাসন শূন্যই আছে, কোনও মহারাজার স্পর্শে ধন্য হয়নি তা এখনও। কোথায় সে

মহারাজা, কবে আসবে, কোন্ গুণে চেনা যাবে তাকে? একটি গুণই তো সে চেয়েছে সারা প্রাণ দিয়ে, সারাজীবন শ্রদ্ধেয় হবে সে—যার পায়ে সমস্ত দেহ মন উজার করে দেবে, তার মহত্ত্ব যেন মেকি না হয়—দু'দিন যেতে না যেতেই তার গিলটি ধরা না পড়ে। বিদ্বান নয়, বুদ্ধিমান নয়, রূপবান নয়, সে চেয়েছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে—যার মহত্ত্বের ঔজ্জ্বল্যে মরচে পড়বে না কখনও। তখনই মনে হল, তার নিজের কি এমন গুণ আছে, যে এমন খাঁটি সোনার দাবি সে করতে পারে অসঙ্কোচে? কি মূল্য দেবে সে—এর যোগ্য মূল্যই বা কি? মনের ভিতর থেকে উত্তর এল, আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে সে। কিন্তু কোথায়—কি ভাবে?....

আরে, রোকো রোকো.....

গর্জন করে দাঁড়িয়ে পড়ল মোটরটা।

মিসেস সেন? কোথায় চলেছেন? আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম যে আমি।

মোটর থেকে নামলেন ইন্‌স্পেক্টর দ্বিজেন চক্রবর্তী।

এক মুখ হেসে প্রশ্ন করলেন, কোথায় চলেছেন?

এই ট্রেনে কলকাতা যাব।

ও, তাহলে তো আরও সুবিধে হল। আমিও যাচ্ছি কলকাতা। ট্রেনের এখনও দেরি আছে আধ-ঘণ্টাটাক। স্টেশনে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখাটা সেরে যাব ভাবছিলাম। আপনিও কলকাতা যাচ্ছেন, ভালোই হল। আসুন তা হলে, উঠুন। স্টেশনেই যাওয়া যাক সোজা—

আমার সঙ্গে কি দরকার আপনার?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে অন্তরা। তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল একটু।

রাদার ইণ্টারেস্টিং—ধীরে সুস্থে বলব এখন। সঙ্গেই তো যাচ্ছেন! উঠুন। আপনার জিনিসপত্র কই?

এই ব্যাগটা ছাড়া আর কিছু নেই।

আসুন। মিস্টার সেন সদরে জয়েন করেছেন গিয়ে?

হ্যাঁ।

আপনি যাচ্ছেন কবে?

আমার কলকাতায় একটু দরকার আছে। সেটা সেরে তার পর যাব।

আই সি। আসুন।

ট্রেন ছুটে চলেছে অন্ধকার ভেদ করে। ঠিক আগের স্টেশনে কামরাটা খালি হয়ে গেছে। ইন্‌স্পেক্টর দ্বিজেন চক্রবর্তী ও অন্তরা ছাড়া কামরায় আর কেউ নেই। একটা কপাট খারাপ, ভালো করে বন্ধ হয় না। দ্বিজেনবাবু সেটাকে ভালো করে খুলে দিয়ে তার সামনেই বসেছেন নিজের ট্রাঙ্কের ওপর, ভালোভাবে হাওয়া পাবেন বলে। তাঁর মনে হল, এইবার কথাবার্তা শুরু করা যাক, পরের স্টেশনে আবার লোক উঠবে হয়তো।

একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে মিসেস সেন। আই হোপ, ইউ উইল স্পিক দি ট্রুথ—অংশুমান বাবুকে আপনি কি সাহায্য করেছিলেন কিছু?

অন্তরার চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল।

সাহায্য? কি রকম সাহায্য?

আর্থিক।

না।

ক্ষণকাল নীরব থেকে দ্বিজেন চক্রবর্তী বললেন, আমরা কিন্তু একটা বাড়ি সার্চ করে এব সেট জড়োয়া গয়না পেয়েছি, তার প্রত্যেকটাতে নাম খোদাই করা আছে—অন্তরা সেন।

অন্তরার মুখ শুকিয়ে গেল। তবু সে সপ্রতিভ হাসি হেসে বললে, আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য অন্তরা সেন থাকাও সম্ভব।

কোয়াইট, খুবই সম্ভব। আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু যে দোকান গয়নাগুলো বিক্রি করেছে, গয়নার গায়ে দোকানের নামও ছিল, সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে, এক আপনি ছাড়া অন্য কোন অন্তরা সেনকে গয়না বিক্রি করেনি তারা।

আমার সে গয়নার সুট চুরি হয়ে গেছে।

কবে?

ঠিক মনে নেই।

পুলিসে খবর দিয়েছিলেন?

না।

দেননি কেন?

পুলিসের ওপর আস্থা নেই বলে।

আপনার স্বামী কি এই চুরির কথা জানতেন?

তিনি রাগারাগি করবেন—এই ভয়ে তাঁকেও জানাইনি।

দ্বিজেন চক্রবর্তীর মুখ হাস্য-প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে উঁকি দিতে লাগল প্রচ্ছন্ন কৌতুক। পর-মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। আড়চোখে চেয়ে দেখলেন, অন্তরার দৃষ্টিতে আগুন জ্বলছে। এক ঝলক হেসে বললেন, কিন্তু আপনার বান্ধবী কমরেড মিনা দত্তকে এসব কথা লেখেননি তো—সে চিঠিখানাও দেখেছি আমি।

অন্তরার চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল।

দ্বিজেনবাবু বললেন, আই অ্যাম সরি, কিন্তু আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হল। কর্তব্যের খাতিরে, বিলিভ মি। মিস্টার সেন, আই হোপ, উইল অ্যাপ্রিসিয়েট মাই লাভ ফর ডিউটি।

একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল চোখ দুটোতে। অন্ধকার ভেদ করে ট্রেন ছুটতে লাগল।

।। কুড়ি ।।

অন্ধকারে একা ভাবছিল অংশুমান।

....ওরা ছাড়বে না, প্রতিশোধ নেবে। বার বার নিয়েছে, এবারও ছাড়বে না। ছাড়বে না, কারণ ওরাও ভীত। ভীত বন্য বরাহ যেমন দুরন্ত বেগে তেড়ে আসে, নখদন্ত বিস্তার করে বাঘ যেমন সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আততায়ীর বুকে, সাপ যেমন ফণা তোলে. এরাও তেমনই নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল করবে আমাদের। ভয় পেয়েছে বলেই অস্ত্র চালাবে, চোর যেমন ছোরা চালায়। না, ছাড়বে না। কখনও ছাড়েনি। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।—

...গাছের ডালে ডালে মড়া ঝুলছে। ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

...হাত-পা বাঁধা সারিবদ্ধ সিপাহী। একের পর এক গুলি করা হচ্ছে। মড়ার স্তূপ। দুটো কূপ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

....প্রকাণ্ড একটা কামান দাগা হল। আওয়াজটা হল চাপা গোছের, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ল চতুর্দিকে মাংসের টুকরো, কাটা আঙুল, রক্তাক্ত হাত-পা, ঝলসানো থ্যাত্লানো মাথা। কামানের ভিতর মানুষ পুরে কামান দাগা হয়েছে।

....একটা পোড়া দুর্গন্ধ উঠছে চতুর্দিকে। একটা জীবন্ত লোককে হাত-পা বেঁধে মন্দ আঁচে ধীরে ধীরে পুড়ানো হচ্ছে। তার আগে তাকে প্রহার করা হয়েছে প্রচুর। বেয়নেটের খোঁচায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত।

....একটা লম্বা ঘরে সারি সারি শোয়ানো আছে হাত-পা বাঁধা অপরাধীরা। সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তপ্ত লোহা দিয়ে আপাদমস্তক দেগে দেওয়া হচ্ছে সকলের একে একে। চড়চড় করে শব্দ হচ্ছে—তপ্ত লোহায় কাঁচা মাংস পুড়ছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে সকলে। আর্তনাদ যখন বিরক্তি উৎপাদন করতে লাগল, তখন গুলি চালিয়ে নীরব করে দেওয়া হল তাদের।

.....মুসলমানের মুখে জোর করে মাখানো হচ্ছে শূকরের চর্বি, শূকরের চামড়ায় পুরে সেলাই করা হচ্ছে তাদের, তার পর হত্যা করা হচ্ছে নির্মমভাবে! ফাঁসি দিয়ে, গুলি করে, কামানের ভিতর পুরে, পুড়িয়ে, ঠেঙিয়ে—যেমন খুশি। হিন্দুর বেলাতেও ঠিক অনুরূপ আচরণ। আগে ধর্ম নষ্ট, তার পর অপমান, তার পর হত্যা।

দিল্লী শ্মশান হয়ে গেছে। একটিও পুরুষ নেই। সব মরেছে। হাজার হাজার গৃহহীন স্ত্রীলোক আর শিশু ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। সৈন্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে লুঠ করেছে.....

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজ রাজপুরুষেরা যেভাবে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন, তার এই সব বর্ণনা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই* নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ভয়াবহ বর্ণনা। অনেকদিন আগে পড়েছিল। প্রতিটি বর্ণনা মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল চোখের সামনে। এ দেশের লোককে লাথি মেরে, চাবকে, জেলে পুরে, গুলি করে, ফাঁসি দিয়ে, আগুনে পুড়িয়েও তৃপ্তি হয়নি এদের! একজন লিখেছেন—আমার যদি আইনত ক্ষমতা থাকত, জীবন্ত অবস্থায় এদের চামড়া ছাড়িয়ে নিতাম। তার পর দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, কাবুল বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহও দমন করেছিল এরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে, হাজার হাজার লোক হত্যা করে। শক্তিমান জাতি, প্রতিশোধ নিতে এরা ছাড়ে না। জালিয়ানওয়ালাবাগ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর—ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলের সেলে সেলে...। সহসা চিৎকার করে বলে উঠল অংশুমান, তবু ভয় খাব না, তবু অন্যায় সহ্য করব না, আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আমরা নেবই। বলে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল—কোথাও কেউ নেই। চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। অন্ধকার—কেবল অন্ধকার। এত অন্ধকার কেন? একটু আলো, এতটুকু আলো পেলে যে বেঁচে যায় সে! কোথাও আলো নেই। চোখের সামনে অন্তরের নিবিড় গহনে কেবল অন্ধকার। ঘন গাঢ় পুঞ্জীভূত তমিস্রা। মৃত্যুর আঁধার এখনই নামল নাকি?

---

* *The Other Side of the Medal* by Edward Thompson.

শান্তি স্তব্ধ হয়ে চোখ বুজে বসে ছিল অংশুমান। চোখের সম্মুখে প্রসারিত তিমির-যবনিকা সামান্য একটু কাঁপল যেন, ক্ষীণ একটু আলোর আভাস দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।—আবার অন্ধকার—একটু পরেই আবার সেই আলোর আভাস, এবার যেন একটু বেশিক্ষণ স্থায়ী—আবার মিলিয়ে গেল তাও। একাগ্র আগ্রহে স্তব্ধ নিমীলিত নেত্রে বসে রইল অংশুমান। প্রদীপের শিখার মত ওই যে—স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল ক্রমশ—কম্পিত শিখা স্থির হল। সহসা সে শিখা থেকে আবির্ভূত হলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। বললেন, ভয় কি, আমি আছি। অন্ধকার মিথ্যা।

কে আপনি?

আমি অনির্বাণ অগ্নি। তোমার মধ্যে চিরকাল আছি এবং থাকব। ভয় আমাকে আবৃত করে, কিন্তু ধ্বংস করতে পারে না। ভয় অপসারিত কর, আমাকে দেখতে পাবে। ভয়ই অন্ধকার।

ধীরে ধীরে শিখার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন আবার।

অংশুমানের কানে কানে কে যেন বলতে লাগল, আমি দাবানল, আমিই বাড়বানল, আমিই আবার কৃশানু। মৃন্ময় প্রদীপের ভীরু কম্পিত শিখায়, বিদ্যুতের উজ্জ্বল প্রকাশে, ইন্দ্রের বজ্রে, মদনের কুসুমশরে, নক্ষত্রের কিরণে, খদ্যোতের দীপ্তিতে, তপস্বীর তপস্যায়, প্রেমিকের প্রেমে, কবির প্রেরণায়, বীরের বীরত্বে, বৃক্ষে লতায় জড়ে চেতনে অণুতে পরমাণুতে সর্বত্রই আমার প্রকাশ। ইলেক্‌ট্রনের যে রূপে তোমরা বিস্মিত, তা আমারই রূপ। নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রন চিরকালই পজিটিভের দিকে ধাবিত। আমারই এক অংশ আর এক অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ হতে চায়। স্বাহা আজও আমার অনুগামিনী, তাই পৃথিবী অজর অমর অক্ষয় শাশ্বত।

নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল—যাচ্ছি—যাচ্ছি—তোমারই কাছে অনিবার্য গতিতে—সত্য পথে—

।। একুশ।।

তিন মাস কেটে গেছে।

সব রকম চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। অংশুমানকে পাগল প্রতিপন্ন করা যায়নি। হাইকোর্টের বিচারেও তার প্রাণদণ্ড বাহাল আছে। প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটা দরখাস্ত করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন হিতৈষীরা। অংশুমান তাতে সই করেনি। অংশুমানের বাবা পুত্রের জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন রাজদরবারে। মঞ্জুর হয়নি। কাল ভোরে অংশুমানের ফাঁসি হবে। জেলারবাবু এসে প্রবেশ করলেন।

আপনার শেষ ইচ্ছা যদি কিছু থাকে বলুন, তা আমরা সম্ভব হলে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। মানে, যদি কারও সঙ্গে দেখা-টেখা করতে চান—

কার সঙ্গে দেখা করবে সে? মা বাবা? কি হবে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে? তাঁরা তো খালি কাঁদবেন! অজানা পথে অশ্রুর পাথেয় নিয়ে কি করবে সে? হঠাৎ মনে হল যদি—

একজনের দেখা পেলে সুখী হতাম, কিন্তু তা কি সম্ভব হবে এখন?

কার সঙ্গে বলুন, চেষ্টা করতে পারি।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীহার সেনের স্ত্রী অন্তরা দেবীর সঙ্গে।

তিনিও তো আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন।

মানে?

সবিস্ময়ে চেয়ে রইল অংশুমান।

কাল তাঁরও ফাঁসি হবে।

কেন, কি করেছিল সে?

একজন পুলিস অফিসারকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন? দেখি—

জেলারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

।। বাইশ ।।

সেদিন পূর্ণিমা। শেষ রাত্রি। সামনেই ফাঁসির মঞ্চ। অন্তরা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। অংশুমান মৃত্যুর কথা ভাবছিল না। মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে। অনাবিল জ্যোৎস্নায় মহাকাশ পরিপ্লাবিত। পৃথিবীর ধূলিতে লেগেছে আকাশের স্পর্শ, জেগেছে অনাগতলোকের স্বপ্ন। রূপসাগরের কানায় কানায় অপরূপ সৌন্দর্যসুধা যেন টলমল করছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উড়ে যেতে চাইছে যেন পৃথিবীর দৃষ্টির ওপারে চক্রবালরেখা ছাড়িয়ে। ওটা মেঘ নয়— নৌকার পাল...ভারতের স্বর্গীয় অমরবৃন্দ বোধ হয় যাত্রা করেছেন আজ মর্ত্যের দিকে...ক্ষুদিরাম-কানাইলালের দল...ওটা তাদেরই পাল-তোলা নৌকো—পালে লেগেছে পারিজাতগন্ধী হাওয়া—দুলছে তাতে নন্দনবনের মন্দারমঞ্জরী....
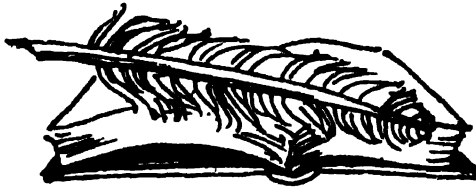
সে ও আমি

।। এক ।।

লিখতে শুরু করব, এমন সময় দেখি, সামনের চেয়ারে সে বসে আছে। এ রকম আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। মনে হল, চিনি, কিন্তু কোথায় কবে দেখেছি মনে পড়ল না। কিন্তু চেনা হলেও—এমন সময়ে হঠাৎ—

সে। কি দেখছেন অবাক হয়ে?

আমি। দেখছি আপনাকে। ভাবছি, এত রাত্রে এই তেতলার ঘরে আপনি কি করে এলেন?

সে। এসেছি যখন, তখন বুঝতেই পারছেন, আসাটা অসম্ভব নয়।

একটু চুপ করে রইলাম। অর্থাৎ আশা করে রইলাম যে, তার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কারণটা সে ব্যক্ত করবে। কিন্তু সে-ও চুপ করে রইল।

আমি। এসেছেন কেন, কোনও দরকার আছে?

সে। সেটা এখন নাই-বা শুনলেন।

আমি। আমাকে আগে চিনতেন কি?

সে। খুব। যদি বলি, আপনিই আমার একমাত্র পরিচিত লোক, তা হলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? দেখুন তো ভালো করে।

আমি। মনে হচ্ছে চিনি, অথচ— কোথায় দেখেছি বলুন তো?

সে। কোথাও দেখেন নি, অথচ—

একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

আমি। অথচ?

সে। অথচ সর্বদাই দেখছেন। আমার কথা থাক, আপনি কি করছেন এত রাত্রে একা বসে?

আমি। লিখছি।

সে। লিখছেন। আপনি যে লেখক তা তো জানা ছিল না আমার!

আমি। না, লেখক বলতে সাধারণ লোকে যা বোঝে, আমি ঠিক তা নই। তবু লিখছি।

সে। কি লিখছেন?

আমি। কাহিনী।

সে। প্রেমের? আজকালকার ছেলেরা—

আমি। দেখুন, আজকালকার ছেলেদের সমালোচনায় সবাই পঞ্চমুখ। দেশসুদ্ধ গোরু ওই একই জাবর কাটছে। আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে আপনার ধারণাও হয়তো ভালো নয়, কিন্তু সেটা বার বার বলে লাভ কি!

সে। কারও স্বাধীন মতামত শুনতে ভয় পান? ডেমোক্র্যাসির যুগ এটা জানেন?

আমি। বিলক্ষণ জানি। স্বাধীন মতামত অনেক শুনেছি। কিন্তু এই নির্জন রাত্রে আপনার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছে করছে না ও কথা। আপনি আপনার পরিচয়টা দিন আগে।

চোখ দুটি হাসতে লাগল তার।

সে। যদি বলি, কৌতূহল সম্বরণ করুন।

আমি। কেন?

সে। আগেই পরিচয় দেবার ইচ্ছে নেই, দ্বিতীয়ত পুরো পরিচয় দেবার ক্ষমতাও নেই বোধ হয়, আমি নিজেই নিজেকে জানি না ভালো করে।

আমি। যতটুকু জানেন, ততটুকু শুনি না।

সে। শোনবার দরকার কি। খানিকটা পরিচয় তো পাচ্ছেন। দেখছেন, এই তো যথেষ্ট পরিচয়। বেশী কৌতূহল ভালো নয়।

আমি। কিন্তু আমার কৌতূহল স্বাভাবিক। আমার ঘরে এমন রাতদুপুরে এসে—

সে। এটা আপনার ঘর নয়, এটা আপনার বাবার ঘর—

আমি। তার মানেই—

সে। না, তার মানেই তা নয়। বিশেষত আপনার বাবা যখন আপনাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন ঠিক করেছেন, তখন—

আমি। কি করে জানলেন আপনি?

আবার একটু হাসল সে।

সে। আপনার সব খবর রাখি আমি। মিনতিকে বিয়ে করছেন না কেন?

আমি। মিনতিকে চেনেন নাকি?

সে। একটু একটু।

আমি। আপনি আমার সম্বন্ধে এত কথা জানেন, অথচ আমি আপনাকে চিনতেই পারছি না ভালো করে। কোথায় দেখা হয়েছিল বলুন তো রমেশের বাড়িতে?

সে। না।

আমি। তবে? আচ্ছা, বিলেতে কি?

সে। কোথাও না। যাবার সময় বলে যাব, কে আমি। আগে থাকতেই অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। কি লিখছেন বলুন?

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম মেয়েটি সুন্দরী। ফরসা নয়, তবু সুন্দরী। মুখশ্রী ভাষাময়, দৃষ্টিতে মাদকতা আছে। মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়, একেই তো খুঁজছিলাম এতকাল। শুধু মুগ্ধ নয়, প্রলুব্ধও করে। এত রাত্রে হঠাৎ আমার কাছে কেন?

সে। কি লিখছেন বলুন।

আমি। লিখছি আমার ব্যর্থ জীবনের কাহিনী।

সে। আপনার জীবন ব্যর্থ! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না এ কথা।

আমি। আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরই জীবন ব্যর্থ। যাদের জীবন সার্থক, তারা ব্যতিক্রম। আমি ব্যতিক্রম নই, আমি সাধারণের দলে।

সে। হলেনই বা, জীবন ব্যর্থ হল কেন বুঝতে পারছি না। সামান্য পশুরও জীবন সার্থক, আর আপনার জীবন ব্যর্থ?

আমি। নিছক পশু হলে আমার জীবনও হয়তো সার্থক হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিছক পশুও নই, নিছক দেবতাও নই, উভয়ের সংমিশ্রণে হয়েছি মানুষ, তাই এই দুর্দশা।

সে। ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমি। দেবোচিত আদর্শ বজায় রেখে পশু-জীবন যাপন করবার সামর্থ্য নেই বলেই আমার জীবন ব্যর্থ।

সে। সামর্থ্য নেই। কেন? যুবক আপনি, শক্তসমর্থ দেহ আপনার, শিক্ষা পেয়েছেন—

আমি। এর পরেই ঠিক কি করবেন বুঝতে পারছি।

সে। কি?

আমি। সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা করে লম্বা একটা বক্তৃতা দেবেন। বেশ, দিন, ছাড়বেন না যখন। কেবল আশ্চর্য লাগছে, ঠিক এ সময়ে কি করে আপনি নাগাল পেলেন আমার!

সে। একালের ছেলেদের সম্বন্ধে আমার কি ধারণা শুনবেন?

আমি। বলুন।

সে। তারা খুব ভালো ছেলে। কবি সত্যেন দত্তের ভাষায় 'আদর্শে যে সত্য মানে', কিন্তু—

হাসি চিকমিক করে উঠল তার চোখ দুটিতে।

আমি। কিন্তু?

সে। কাজের বেলায় তারা অপদার্থ।

আমি। মেনে নিলাম। আর কিছু বলবার আছে আপনার?

সে। আপনি রাগ করছেন! উঠি তা হলে।

আমি। না, না, বসুন। রাগ করা উচিত, কিন্তু চেষ্টা করেও রাগ করতে পারছি না বলে নিজেরই ওপর রাগ হচ্ছে।

সে। আজকালকার ছেলেরা আর কিছু না পারুক, বেশ রাগিয়ে কথা বলতে শিখেছে।

আমি। কেন অন্যায় কিছু বললাম কি?

সে। রাগ করা উচিত, অথচ রাগ করতে পারছেন না—এই নপুংসক মনোবৃত্তিই তো আপনাদের দুর্দশার কারণ। সত্যি যদি রাগ হয়ে থাকে, প্রকাশ করুন না সেটা।

দুজনেই চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ। সহসা তার মুখে-চোখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল।

সে। আসল কথা কিন্তু আমি টের পেয়েছি—উঃ, কি ভণ্ড আপনি!

আমি। কি কথা?

সে। রাগ নয়, আপনার অনুরাগ হচ্ছে এবং সেটা প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছেন। এত ভয় কেন?

আমি। ভয় নয়, ভদ্রতা।

সে। ভদ্রতা মানেই ভীরুতা আর ভণ্ডামীর মুখোশ।

আমি। সমাজে থাকতে গেলে ও মুখোশ পরতেই হবে।

সে। রাত-দুপুরে তেতলার এই নির্জন ঘরে সমাজ কোথায়?

আমি। রাত্রি কিন্তু প্রভাত হবে, তেতলার এই ঘরেও সারা জীবন বসে থাকা যাবে না।

সে। ও, তাহলে ওই পুরিয়াটার কোনো অর্থ নেই?

আমি। কোন পুরিয়াটা?

সে। যেটা আপনার প্যাডের তলায় চাপা রয়েছে।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম।

কে এ!

আমি। আপনি কে?

সে। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি একজন রমণী। এর বেশি কোনো পরিচয় নেই আমার, থাকলেও তা অবান্তর।

আমি। আপনি আমার সব কথা জানলেন কি করে?

সে। আমি জাদু জানি। দেখবেন?

আলোটা নিবে গেল। অন্ধকারে বসে রইলাম দুজনে। তারপর ক্রমশ স্বচ্ছ হতে লাগল অন্ধকার। তারপর—

।। দুই।।

শহরের বাইরে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি, বাড়ির চারপাশে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা কচি কচি সবুজ ঘাসে ঢাকা। একটু দূর দিয়ে নদী বয়ে গেছে একটা। দক্ষিণ দিকের বারান্দা থেকে নদী, ওপারে বালুচর এবং তারও ওপারে দিগ্বলয়রেখা দেখা যায়। পূর্বদিকের দৃশ্যও মনোরম, সারি সারি কয়েকটা কৃষ্ণচূড়ার গাছে অজস্র ফুল ফুটে আছে, তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে নির্মল আকাশ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে টেনিস খেলবার জায়গা, তকতকে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো, দুধারে ঘন নীল রঙের পরদা ঝুলছে বল আটকাবার জন্যে। তার থেকে কিছু দূরে ঘাসের সবুজ "লন", রোলার চালিয়ে মালীটা ঘাস ছাঁটছে। গেটের সামনে দিয়ে চলে গেছে পিচ-ঢালা পরিষ্কার রাস্তা শহরের দিকে। যে রাস্তাটা গেট থেকে বাড়ির দিকে এসেছে সেটা পিচ দেওয়া নয়, সুরকির। চারিদিকে সবুজ রঙের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। গেটের ওপর ছোট একটি পিতলের ফলকে নাম লেখা রয়েছে—পি. এস. ডাট, আই. সি. এস.। পি. এস. ডাট—আমারই নাম, কিন্তু—

দৃশ্য বদলাল।

প্রকাণ্ড একটা হল। হলের একদিকে সোফা-সেট। আর একদিকে শ্বেতপাথরের বড় গোল টেবিল একটা, তার চারদিকে শৌখিন দামী কুশন-দেওয়া কয়েকটা বেতের চেয়ার, এক কোণে পিয়ানো একটা, হ্যাটর্যাক, দ্বারের দুপাশে সুদৃশ্য গোটা দুই গোল টেবিলের উপর পিতলের গোটা দুই বড় বড় সারস পাখি, চার দেয়ালে চারটে বড় বড় ছবি—একটা রাজা-রানীর, একটা দিল্লীর দরবারের, আর দুটো প্রাকৃতিক দৃশ্য। এত জিনিস সত্ত্বেও প্রচুর জায়গা। হলের ভিতর কেউ নেই। কুচকুচে কালো বড় বড় লোমওয়ালা কানঝোলা একটা কুকুর এসে ঢুকল খোলা দরজা দিয়ে, তার পিছু পিছু একজন খানসামা, খানসামার হাতে শিকল। খানসামাকে দেখে কুকুরটা ছুটে পালাল আর একটা দরজা দিয়ে। বিরক্ত হল না খানসামা, বরং তার মুখে ফুটে উঠল

স্নেহকোমল একটা মৃদু হাসি, যেমন ফুটে ওঠে নিজের ছেলেকে দুষ্টুমি করতে দেখলে। বেরিয়ে গেল সে কুকুরের পিছনে পিছনে।

হলের আর একটা খোলা দরজা দিয়ে চওড়া বারান্দার খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল, দক্ষিণ দিকের বারান্দাটা। তারই একধারে একটা সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, টেবিলের সামনে হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরা পি. এস. ডাট, আই. সি. এস. বসে ফাইল ক্লিয়ার করছেন। আমিই। অদূরে বসে আছে মারতী একটা শৌখিন মোড়ায়, নীল রেশমের সুতো দিয়ে ফুল তুলছে বাসন্তী রঙের একটা রেশমী কাপড়ে। একটা কার্ড নিয়ে চাপরাসী প্রবেশ করল। পি. এস. ডাট বাঁ হাতের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে কার্ডখানাকে ধরে দেখলেন একবার, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হল, তারপর বললেন, "আচ্ছা, সেলাম দাও।" প্রবেশ করলেন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্করবাবু। নমস্কার নয়। সেলামই করলেন—বেশ, একটু ঝুঁকেই। ঢিলাঢালা গলাবন্ধ তসরের কোটের জন্য দেখা যাচ্ছে না তাঁর বিসদৃশ ভুঁড়িটা, কাঁচাপাকা চুল-ভরা বুকটাও দেখা যাচ্ছে না। খোলা গায়ে তাঁকে দেখলে অপরিচিত ছোট শিশুর ককিয়ে কেঁদে ওঠা অসম্ভব নয়। গৌরীশঙ্করবাবু চারটি বড় বড় মিলের মালিক, ধনবান লোক। বেশ কিছু খরচ করে সম্প্রতি চেয়ারম্যান হয়েছেন কংগ্রেসের টিকিটে। কিন্তু কোনও ছুতোয় হাকিমদের কাছে আসতে পেলে কৃতার্থ হয়ে যান এবং হাকিমদের ঠিক অনুরোধ নয়, ইঙ্গিতমাত্র পেলেই এমন কাজ নেই যা করতে পারেন না, অবশ্য সে কাজ যদি অর্থসাধ্য হয়। বাইরে অবশ্য পরিষদমহলে বলে বেড়ান যে, হাকিমদের তোয়াক্কা করেন না তিনি। "ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের মুখের ওপর শুনিয়ে দিলাম কড়া কড়া কথা,—সেদিন কমিশনার সায়েব বললেন, এ কাজটি করে দিতে হবে; আমি বললাম, মাপ কর সায়েব, কংগ্রেসের লোক আমি"—এই সব।

গৌরীশঙ্করবাবু প্রবেশ করতেই মালতী নিঃশব্দে উঠে গেল।

"বসুন।"

গদগদ মুখে বসলেন গৌরীশঙ্করবাবু। কিছুক্ষণ কোনো বাক্যই নিঃসৃত হল না তাঁর মুখ থেকে। ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবই কথা কইলেন।

"আপনাদের মেথর-স্ট্রাইকের ঝামেলা মিটল?"

"হ্যাঁ, মিটে গেল বইকি, হুজুর যখন পড়েছেন ওতে, তখন আর না মেটে, বড় পাজি ব্যাটারা, ছোটলোক কিনা।"

"ওদের মাইনে কিছু কিছু বাড়িয়ে দিন এবার, সত্যিই বেচারারা ইলপেড—"

"নিশ্চয়। এবারকার বাজেটে প্রভিশন করতে হবে তার। কিন্তু কি করে যে করব, হুজুরের পরামর্শ নিতে হবে একদিন এসে আর কি—"

"বাজে খরচগুলো কমিয়ে নিন।"

"যে আজ্ঞে—"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চোখের সামনে মেথরদের দুরবস্থার চিত্রটা ফুটে উঠল। তিনি স্বয়ং মেথর-পল্লীতে গিয়েছিলেন এই উপলক্ষ্যে। কী ভীষণ নোংরাভাবে থাকে ওরা। শুয়ার, মুর্গি, পচা ফ্যানের ডাবা, ময়লা কাপড়, কাঁথা, খাটিয়া, পাশেই পচা ডোবা একটা, রুক্ষমাথা এক পাল

উলঙ্গ ছেলেমেয়ে—সমস্ত চিত্রটা যেন আবার দেখতে পেলেন তিনি। আবার বললেন, "ওদের ব্যবস্থাটা আগে করা দরকার।"

"যে আজ্ঞে। আমি কিন্তু এখন আর একটা দরকারে এসেছি হুজুরের কাছে।"

"কি, বলুন?"

ফাউন্টেন পেনটা নামিয়ে রেখে যেন মন দিয়ে কথাটা শুনবেন, এমনই একটা ভঙ্গী করলেন পি. এস. ডাট। যদিও গৌরীশঙ্কর লোকটার উপর মনে মনে হাড়ে চটা তিনি এবং ইচ্ছে করলেই এঁকে 'ক্রাশ' করতেও পারেন, তবু এঁর কথা মন দিয়ে শুনবেন তিনি। ব্যক্তিগত আক্রোশ অনুসারে চলবার লোক তিনি নন। তিনি জনপ্রিয় ম্যাজিস্ট্রেট, সকলের কথা শুনে সুবিচার করতে চান। করেনও।

একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে গৌরীশঙ্কর নড়ে-চড়ে বসলেন।

"যুগলের ব্যাপারে এসেছি—"

"যুগল কে?"

"আমার আপিসের হেড ক্লার্ক—"

"কি, ব্যাপার কি?"

"তার এক ভাইপো এসেছে কলকাতা থেকে। ছটফটে ছোকরা, এসেই এক কাণ্ড করে বসেছে—"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন পি. এস. ডাট।

গৌরীশঙ্কর ঢোক গিললেন।

হঠাৎ পাশের ঘরে ফোনটা বেজে উঠল। মালতী কথা কইতে লাগল কার সঙ্গে ইংরেজীতে।

গৌরীশঙ্কর বলতে লাগলেন, "যুগলের একটা বন্দুক আছে, সাধারণ একনলা বন্দুক, ননকু—মানে যুগলবাবুর ভাইপো, বন্দুকটা নিয়ে বুঝি হনুমান তাড়াতে যায়, যতদূর শুনেছি, একটা হনুমানের দিকে ফায়ারই করেছিল বুঝি জানলা দিয়ে—"

"আমি সব জানি। এস. পি. ফোন করেছিল আমাকে। একজন মানুষ খুন হয়ে গেছে। আমাকে কি করতে বলেন?"

গৌরীশঙ্করবাবু কিছু বললেন না, কেবল অসহায়ভাবে চেয়ে রইলেন পি. এস. ডাটের মুখের দিকে। এই অসহায় চাউনিটা তাঁর পোষা, যখন তখন ফুটিয়ে তুলতে পারেন চোখে এবং তা দেখলে যে কোনো ভদ্রলোক বিচলিত না হয়ে পারেন না। ব্যক্তিগত আক্রোশ সত্ত্বেও পি. এস. ডাট বিচলিত হলেন। সহজে বিচলিত হন বলেই পি. এস. ডাট এত জনপ্রিয়। বিচলিত হবার আর একটা গোপন কারণ অবশ্য ছিল। পি. এস. ডাটের আক্রোশ থাকলেও এই গৌরীশঙ্কর রায় কমিশনার সাহেবের প্রিয়পাত্র। তাঁর অনুরোধে প্রকাশ্যে গোপনে অনেক কিছু করে থাকেন তিনি টাকার জোরে। শহরের একজন নামী লোক, ধনী তো বটেনই।

"দেখুন, কেসটা সিরিয়াস—"

"একটা ব্যবস্থা করতেই হবে হুজুর—"

"বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা—যুগলবাবু এসে ধরেছেন আপনাকে—"

জিব কাটলেন গৌরীশঙ্করবাবু।

"যুগলের সাহসই হবে না, তা ছাড়া সে এখানে নেইও, সে থাকলে তার বন্দুকে হাত দিতে দেয় না কাউকে। আমি ছুটে এলুম তার বউটার কান্না দেখে, ছেলেমানুষ বউ, ঘন ঘন ফিট হচ্ছে তার, হুজুর গরিবের মা-বাপ, হুজুর যদি দয়া করেন এই ভেবে—"

শ্রদ্ধাবিষ্ট হয়ে এল গৌরীশঙ্করের চোখ দুটি।

"আইনত যতটা সম্ভব চেষ্টা করব আমি। কিন্তু বে-আইনী কিছু করবার ক্ষমতা নেই আমার। আমি যদি খুন করি, ওই একই আইন দিয়ে বিচার হবে আমার।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো ঠিকই হুজুর।"—থেমে গেলেন গৌরীশঙ্করবাবু, ইতস্তত করলেন একটু, তারপর বললেন, "আচ্ছা, শুনছি, এখানে যে নতুন মেয়ে-হাসপাতালটা হচ্ছে তার টাকা কম পড়েছে কিছু। হুজুর যদি হুকুম করেন, তার ফাণ্ডে হাজার খানেক টাকা দিইয়ে দেব আমি যুগলের কাছ থেকে, হুজুর হুকুম করলে দিতে পথ পাবে না ও—"

"গরিব কেরানী, এক কথায় হাজার টাকা বার করতে পারবে?"

"না পারে, ওর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আমার হাতে আছে। তার থেকে লোন দিইয়ে দেব—"

"সেটা কি অত্যাচার করা হবে না তার ওপর?"

"বেশ, আমিই নিজের পকেট থেকে দিয়ে দেব না হয় ওর নাম করে।"

"দেখি—"

ফাইল একটা টেনে নিলেন পি. এস. ডাট।

গৌরীশঙ্করবাবু বুঝলেন, আর কথা কইবেন না সাহেব।

উঠলেন।

"মনে রাখবেন হুজুর, গরিবের কথাটা। করুণা বলছিল কমিশনারের কাছে যেতে, কিন্তু আমি হুজুরকে চিনি—"

হেসে ঝুঁকে সেলাম করলেন, তারপরে বেরিয়ে গেলেন। ফাইলে মন দিলেন পি. এস. ডাট একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে। একটু পরে মালতী এল, হাতে তখনও সেলাই রয়েছে।

"তুমি এবার ওঠ, তোমার ভেজিটেবল স্ট্যু হয়ে গেছে—"

"নিজেই করলে নাকি?"

"ইলেকট্রিক স্টোভে ক'মিনিটই বা লাগল। এবার থেকে তোমার খাবারটা আমি নিজের হাতেই করব, বাবুর্চীর রান্না সহ্য হচ্ছে না তোমার—"

"একেবারে নিছক নিরামিষ স্ট্যু?"

"মেজর প্যাসরিচকা তাই তো বলে গেলেন। অত ইউরিক অ্যাসিড বেরুচ্ছে যখন—"

"ফোন করছিল কে?"

"মিসেস মরিসন। বিকেলে টেনিসে আসবে বলছিল, কিন্তু আমরা তো বিকেলে থাকব না।"

"কোথা যেতে হবে?"

"বাঃ, স্কুলে প্রাইজ যে আজ, ভুলে বসে আছ, বেশ!"

"ও, তোমারই দেবার কথা, না? ঠিক তো। কাপড়টার চমৎকার রঙ তো, কার জন্যে হচ্ছে?

"লিসির জন্যে করছি এটা—"

"লিসি কে আবার?"

"পি. এ.-র ভাগনী—"

"ও, সেদিন যে মেয়েটি এসেছিল?"

চাপরাসী আবার প্রবেশ করল, হাতে এক বাক্স গ্রামোফোনের রেকর্ড।

"রেকাড় হুজুর—"

মালতী এগিয়ে গেল সাগ্রহে, বাক্সটা খুলে দেখতে লাগল।

"সত্যি বড্ড ব্যাকওয়ার্ড জায়গাটা। বুশ ষ্ট্রিঙ্গ কোয়ার্টেট্ আর রেজিনাল্ড কেলের ব্রাম্স্ কুইন্টেট ইন বি মাইনারখানা থাকে যদি পাঠাতে লিখেছিলাম। এ কি অদ্ভুত রেকর্ড পাঠিয়েছে, সি স র্যাস্বা—ই নেহি লেগা, আপস দেও—"

"বহুত খুব হুজুর—"

বাক্স নিয়ে চলে গেল চাপরাসী। পি. এস. ডাট. আফিসের কাজকর্ম নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলেন। অনেক ফাইল জমে গেছে।

মালতী আবার গিয়ে বসল মোড়ায়। খানিকক্ষণ নীরবে সেলাই করবার পর বললে, "প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের পর আর এক জায়গায় যেতে হবে, এক জায়গায় কেন, দু জায়গায়। মানে কালীবাড়িতে নারী সমিতির একটা মীটিং হবে, সেখানেও যাব বলেছি। সেখান থেকে যাব ললিদের বাড়ি। ললির মেয়েটি কেমন হয়েছে দেখে আসব—ফ্রক করে রেখেছি তার জন্যে গোটা চারেক। এখানে অরগ্যাণ্ডি ভালো পাওয়া যায় না, জান—"

ডাট অন্যমনস্কভাবে বললেন, "তাই নাকি?"

খানিকক্ষণ নীরবতার পর মালতী আবার বললে, "সন্ধ্যেবেলা তোমার প্রোগ্রাম কি?"

"আমাকে একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তারপর ক্লাব—"

"ক্লাবের সেক্রেটারিশিপ ছাড় তুমি। ইণ্ডিয়ান আর ইউরোপীয়ান নিয়ে ওসব ক্লিক ভালো লাগে না আমার।"

পি. এস. ডাট কোনো উত্তর দিলেন না। মালতী মুখ টিপে হেসে তাঁর দিকে একটু চেয়ে আবার মন দিলে সেলাইয়ে।

হঠাৎ ডাট বললেন, "ব্রাউনকে যদি চায়ে নেমন্তন্ন করি আজ বিকেলে, অসুবিধে হবে কিছু?"

"কিছুমাত্র না, অসুবিধে আবার কি! টম্যাটোর জেলি, ব্রাউনের যেটা ফেভারিট, প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক পাঁচটায়, মনে থাকে যেন। তার আগেই চা শেষ করতে হবে। গল্প পেলে তোমরা তো সব ভুলে যাও। আর যত ঝঞ্ঝাট এসে জুটবে কি আমারই ঘাড়ে! কমিশনারের স্ত্রীকে বললেই পারত ওরা—"

ডাট স্মিতমুখে বক্রদৃষ্টিতে চাইলেন একবার মালতীর পানে, তারপর উঠে গেলেন এস. পি.

কে ফোন করবার জন্যে। ফোনে খানিকক্ষণ কথা হল। উত্তেজিতভাবে রিসিভারটা নামিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাট।

"ব্রাউন আসতে পারবে না। মুরারিগঞ্জে হিন্দু-মোসলেম দাঙ্গা শুরু হয়েছে, আর্মড পুলিস নিয়ে এখুনি বেরুনো দরকার। আমাকেও যেতে হবে। কটা বেজেছে?"

রিস্ট-ওয়াচ দেখে মালতী বললেন, "পৌনে এগারো। এখুনি বেরুতে হবে?"

"ইমিডিয়েট্‌লি—"

শঙ্কা ঘনিয়ে এল মালতীর চোখে।

"আমিও তোমার সঙ্গে যাব। একা যেতে দেব না তোমায়—"

ডাট হাসলেন একটু।

"পথি নারী বিবর্জিতা—"

"আমি সে রকম নারী নই।"

"নারীর আবার রকমফের আছে নাকি?"

হঠাৎ বাতাসীর মুখখানা মনে পড়ল ডাটের।

কোনো উত্তর না দিয়ে উঠে গেল মালতী, শোনা গেল, ফোনে কথা কইছে। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বেশ খানিকক্ষণ কথা কয়ে বেরিয়ে এল।

"ব্রাউন চায়ে আসছে। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের পর সে স্টার্ট করবে তোমাকে আমাকে নিয়ে।"

"কি রকম?"

"তার আগে রেডি হতে পারবে না সে।"

একটু মুচকি হাসল মালতী।

"সে কি করে হয়?"

আবার ফোন অভিমুখে অগ্রসর হতে চাইলেন ডাট।

"না, তুমি আর বাগড়া দিও না। আমি তোমার সঙ্গে যাবই এবং প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরে তবে যাব।"—আদুরে আদুরে আবদারের সুরে বললে কথাগুলো। ডাট নিরস্ত হলেন। ফাইল নিয়ে বসলেন আবার। চাপরাসী এল, বললে যে, গম্ভীরদাস ঢনঢনিয়া বাইরে এসে বসে আছেন। ডাট মালতীর দিকে চেয়ে বললেন, "লোকটা একটা প্রকাণ্ড গোশালা করেছে, তোমাকে দিয়ে তার দ্বারোদঘাটন করাতে চায়।"

"আমি ওসব পারব না।"

"লোকটা টাকার কুমির। একটু তোয়াজ করলে অনেক কাজ আদায় করা যেতে পারে।"

"বেশ তো, দিক না এখানকার মেয়েদের মাইনার স্কুলটাকে হাই স্কুল করে—"

"তা দেবার ক্ষমতা আছে ওর। সে উদ্দেশ্য যদি থাকে, তাহলে দ্বারোদঘাটন করতে আপত্তি কোরো না।"

ঘণ্টা টিপলেন ডাট।

চাপরাসী এল।

"সেলাম দেও—"

প্রবেশ করলেন কালো লং-কোট গায়ে, মাথায় হলদে পাগড়ী গম্ভীরদাস ঢনঢনিয়া।

অন্ধকার রাত্রি। কাঁচা মেঠো রাস্তা ভেঙ্গে ছুটে চলেছে পি. এস. ডাটের মোটর মুরারিগঞ্জ অভিমুখে। এস. পি.-র মোটর এগিয়ে গেছে। পিছনের সীটে বন্দুকধারী চাপরাসী বসে আছে। পি. এস. ডাট নিজেই মোটর চালাচ্ছেন, পাশে বসে আছে মালতী। হঠাৎ ভীষণ শব্দ হল একটা। টায়ার ফাটার শব্দ!

আই. সি. এস. হতে বিলেতে গিয়েছিলাম কিন্তু পরীক্ষা দিই নি। কিন্তু আমার স্বপ্নটা কি করে টের পেলে ও! এমনভাবে মূর্ত করলেই বা কি করে! আশ্চর্য।

।। তিন।।

আলো জ্বলে উঠল।

সে আর আমি মুখোমুখি বসে আছি, তেতলার নির্জন ঘরে দ্বিপ্রহর রাত্রে।

সে। কেমন লাগল?

আমি। অদ্ভুত।

সে। পি. এস. ডাট আই. সি. এস. পরীক্ষা কেন দিতে পারলে না তা আমি জানি।

আমি। অনেকেই জানে, আপনার জানাও সম্ভব। কিন্তু আমার ধারণা, ঠিক কারণটা কেউ জানে না।

সে। দেখুন, প্রতি কথায় 'আমার ধারণা' 'আমার ধারণা' করাটা কেমন যেন রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল আপনাদের! সবাই সবজান্তা!

আমি। আমি ইচ্ছে করেই সবজান্তা হবার চেষ্টা করেছিলাম, কারণ শুনেছিলাম, সবজান্তা না হলে আই. সি. এস. হওয়া যায় না।

সে। কিন্তু সবজান্তা হতে পারেননি, হয়েছেন পল্লবগ্রাহী।

আমি। যা হয়েছি তা হয়েছি। বদলাবার উপায় নেই, ইচ্ছেও নেই আর। আই. সি. এস. পরীক্ষা না দেবার কি কারণটা শুনেছেন আপনি, জানতে পারি কি?

সে। নিশ্চয়ই পারেন। আমি কারও কাছে শুনিনি, নিজেই জানি।

আমি। কি বলুন তো?

সে। অসুখটা আপনার ছুতো, মালতীর বাবার কাছে নিজের মান বাঁচাবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি। ঠিক পরীক্ষার আগেই আমার যে অসুখ হয়েছিল, সেটা তাহলে আমার মিছে কথা বলতে চান? একজন এম. ডি. এফ. আর. পি.-র সার্টিফিকেট রয়েছে।

মুচকি হাসলে সে।

সে। মালতীর চিঠির মানে আপনি বোঝেননি।

আমি। মালতীর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?

সে। না।

আমি। তাহলে এত কথা জানলেন কি করে?

সে। বললাম তো, জাদু জানি।

আমি। সত্যি, অবাক হয়ে যাচ্ছি—।

সে। পরিচয় পেলে দেখবেন, অবাক হবার কিছু নেই।

আমি। পরিচয় দিন।

সে। আপনার স্বভাব দেখছি অনেকটা আপনার বোন টুকুর মতো।

আমি। কি রকম?

সে। কোনো একটা উপন্যাস আরম্ভ করে সে অধীর হয়ে পড়ে, কিছুতেই তর সয় না, তাড়াতাড়ি আগেই শেষের কয়েক পাতা উলটে দেখে নেয়, নায়ক-নায়িকার কি হল।

আমি। কিন্তু এ উপন্যাসও নয়, আমরা নায়ক-নায়িকাও নই।

সে। গুছিয়ে লিখতে পারলে প্রত্যেক মানুষের জীবনই উপন্যাসে এবং ঠিক অবস্থায় পড়লে যে কোনো অপরিচিত যুবক-যুবতীই নায়ক-নায়িকায় রূপান্তরিত হতে পারে। নিদারুণ গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়েও আপনি যে একটু রসস্থ হয়েছেন, তা তো টেরই পাচ্ছি।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম মেয়েটির মুখের দিকে। এ আমাকে এমন করে চিনলে কি করে।

আমি। আপনি আমার জীবনের সব কথা জানেন?

সে। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি। জ্ঞাতসারে আপনি নিজেও যা জানেন না, আমি তা-ও জানি। শুধু তাই নয়, ফুটিয়ে তুলতে পারি সে সব সিনেমা দেখানোর মতো করে আপনার মানসপটে, এখন যেমন তুললাম।

আমি। কে আপনি?

সে। আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে মিছে সময় নষ্ট করছেন কেন? এখন পরিচয় দেবার ইচ্ছে নেই আমার।

হাসিমুখে চেয়ে রইল। আমিও চেয়ে রইলাম তার মুখের পানে। দেখেছি, নিশ্চয় কোথাও দেখেছি একে। জাদু জানে নাকি সত্যি সত্যি? এ কি অদ্ভুত ব্যাপার!

সে। মালতীর বাবাকে কিন্তু অমনভাব ঠকানোটা ঠিক হয়নি আপনার।

আমি। আমি ইচ্ছে করে ঠকিয়েছি কি?

সে। অনিচ্ছা সহকারে ঠকানোটাও ঠকানো। তিনি অত আশা করে, অত খরচ করে আপনাকে বিলেত পাঠালেন, আই. সি. এস. হবার জন্যে, আর আপনি স্বচ্ছন্দে পরীক্ষাটা দিলেন না!

আমি। দিতে পারা গেল না, কি করব?

সে। দিতে পারলেও আপনি পাস করতেন কি না সন্দেহ। আপনার অসুখ হয়ে, মানে মালতীর চিঠিটা পেয়ে, আপনি যেন বেঁচে গেলেন।

আমি। পরীক্ষা দিলেও পাস করতে পারতাম কি না এ বিষয়ে নিঃসংশয় হলেন কি করে?

সে। সেখানে মদ খেয়ে, মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরে, ক্লাবে-ক্যাবারেতে নেচে, নাচ দেখে,

ভারতবর্ষের হিতার্থে সভা-সমিতির ভড়ং করে, সে দেশের হাব-ভাব শিখে যতটা সময় ব্যয় করেছিলেন, তার শতাংশের একাংশও কি পড়াশোনার জন্যে করেছিলেন? আপনি তো বই ছুঁতেন না।

আমি। শিক্ষালাভ মানে কি শুধু পুঁথি মুখস্থ করা?

সে। তা না হতে পারে। কিন্তু আপনি মালতীর বাবার টাকা নিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন একটা বিশেষ পরীক্ষায় পাস করবার জন্যেই। জামাইয়ের যাতে একটা ভালো চাকরি হয়, এই আশাতেই ভদ্রলোক অতগুলো টাকা খরচ করেছিলেন মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে, আপনার মনের সংস্কার-সাধন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

আমি। জুয়ো খেলতে বসলে হার-জিত দুই-ই হবার সম্ভাবনা। মালতীর বাবা হেরে গেছেন, আমি কি করব, বলুন?

আবার হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

সে। ওই কথা আউড়ে নিজের বিবেকের কাছে রেহাই পেতে চাইছেন বুঝতে পারছি—সত্যি, কি অদ্ভুত লোক আপনারা।

কথাটার মোড় কোন দিকে ঘুরবে তা বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। সেও চুপ করে গেল। খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে মনে হল, ঠিক এই রকম একখানা মুখ যেন প্যারিসে থাকতে দেখেছিলাম। মনে হল, যেন Elysee's-এর একটা কাফেতে বসে আছি, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছি শ্যাম্পেনের গ্লাসে, চোখের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্রোত—জীবন্ত নর-নারীর স্রোত, ফেনিল আবর্ত তুলে, নানা রঙে নানা ভঙ্গিতে। স্রোতে নানা তরঙ্গ উঠছে, চটুল দৃষ্টির, মিষ্টি কথার, কলহাস্যের। পলকে প্রলয় ঘটছে। সেই ভিড়ে কি চকিতের জন্য দেখেছিলাম একে? না লণ্ডনে? গ্রাভনার স্ট্রীটের আলোক-বাদ্য-পানীয়-নর-নারী-সমন্বিত ফ্যাশানদুরস্ত হোটেলের ছবি ফুটে উঠল একটা মনে। কিউ-টেক্সনখী, শ্বেত-দন্তী রঞ্জিতাধরা, নব-ভীট-মর্দিনীর দল, যাদের শুধু দেহে নয় মনেও অতি-আধুনিক আর্ট বিজ্ঞানের ছাপ মারা, যারা খ্যাতির উপাসিকা, কুবেরের সহচরী, সাময়িক পত্রিকায় ছবি ছাপা হয় যাদের, সিনেমা স্টার হয়ে শেষ পর্যন্ত মোক্ষলাভ করে যারা, এ কি তাদেরই একজন? নিগ্রো-অধ্যুষিত কোনো নাইট ক্লাবের গোপন-বিহারিণী? যে-ই হোক, আমার এত কথা জানলে কি করে?

হঠাৎ সে কথা বললে আবার।

সে। সত্যিই অদ্ভুত আপনারা!

আমি। অদ্ভুত মানে?

সে। গোঁড়া-হিন্দু বাবার আশ্রয় থেকে যখন সরে পড়লেন, তখন বিবেককে স্তোক দিয়েছিলেন এই বলে যে, এই বিংশ শতাব্দীতে অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে ফেলাটাই যথার্থ পৌরুষ, জাতিভেদ তুলে দিয়ে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে সমুদ্র-যাত্রা করে অন্য জাতের মালতীকে বিয়ে করাটাই যথার্থ সৎকর্ম; এখন কিন্তু আবার বলছেন যে, মালতীর বাবা জুয়া খেলতে গিয়ে হেরে গেছেন, আমি কি করব!

আমি। দুটোই সত্যি।

সে। সবচেয়ে বেশি সত্যি কি জানেন?

আমি। কি?

সে। আপনার খামখেয়ালী অসংযত স্বভাবটা। যদি আপনার বাবার মতো শক্তসমর্থ পুরুষ হতেন, তাহলে হয়তো—

আমি। বাবাকেও চেনেন দেখছি।

সে। শুধু চিনি না, শ্রদ্ধা করি।

আমি। শ্রদ্ধা করেন? এ যুগে ওরকম জাত-মানা, পাঁজি-মানা, গোঁড়া, একগুঁয়ে লোককে শ্রদ্ধা কবা যায়?

সে। শক্তিশালীকে সব যুগেই শ্রদ্ধা করা যায়। তাঁরা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। পারেন আপনি অমন?

আমি। কি?

সে। একটানা দুদিন নিরম্বু উপবাসী থাকতে, সেবার যেমন তিনি ছিলেন জয়পুর যাবার সময়?

আমি। ট্রেনে জলস্পর্শ করব না, কারও ছোঁয়া কিছু খাব না—এসব আজকালকার যুগে অচল।

সে। আপনার কাছে অচল, কিন্তু তিনি তো ঠিক চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা তো কই তাঁকে বয়কট করতে পারেননি। তিনিই বরং আপনাদের বলছেন, সরে থাক আমার কাছ থেকে তোমরা।

আমি। ওইটেই ঠিক পথ?

সে। সেটা তর্কসাপেক্ষ। আমি সে তর্ক তুলতেও চাই না, কারণ, তুললেই আপনি পরের ধার-করা কতকগুলি বুলি আউড়ে যাবেন। আমি শুধু বলছি, তিনি তাঁর নিজের নির্দিষ্ট পথ থেকে একচুলও নড়েননি, কিন্তু আপনি বারবার পথ বদলাচ্ছেন।

আমি। কারণ আমি কোনো শিকলে বাঁধা থাকতে চাই না, আমি স্বাধীন।

সে। এক কথায় উচ্ছৃঙ্খল—

আমি। হয়তো।

হঠাৎ অনুভব করলাম ক্রমশ কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছি, ক্রমশ একটা নেশা যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে আমাকে।

সে। একটা কথার জবাব দেবেন?

আমি। বলুন।

সে। প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস আছে আপনার?

আমি। না।

সে। তাহলে বিলেত থেকে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন কেন?

আমি। মায়ের কাতর অনুরোধে।

সে। কিন্তু বিলেত যাবার আগে মালতীদের সঙ্গে মেশামিশি করতে বারণ করেও তো মা কাতর অনুরোধ জানিয়েছিলেন বার বার। তখন সে অনুরোধ শোনেননি কেন?

আমি। মালতীকে এত ভালো লেগেছিল যে, মায়ের অনুরোধ রাখতে পারিনি।

সে। অথচ এখন তারই ওপর এত বিতৃষ্ণা। আচ্ছা, সত্যিই কি বিতৃষ্ণা?

আমি। আপনি যখন সব কথাই জানেন, তখন—

সে। জানি বইকি। মালতীর চেয়ে বেশি জানি। আপনার বিলেতের অসুখের সম্পূর্ণ ইতিহাসটা মালতী জানে না, আমি জানি।

মুচকি হাসলে।

আমি। একটা জিনিস খুব খারাপ লাগছে আমার।

সে। কি?

আমি। কি করে জানি না, আপনি আমার চরিত্রের খারাপ দিকটার সব খবর টের পেয়েছেন আর তাস নিয়েই আলোচনা করছেন খালি। আপনাকে ছদ্মবেশিনী মিস মেয়ো বলে সন্দেহ হচ্ছে এবং তাতে আরও খারাপ লাগছে।

সে। বিলেতে আপনার অসুখের ইতিহাসটা আপনার চরিত্রের খারাপ দিক নয়?

আমি। ওটা আমার দুর্বলতার ইতিহাস, মোটেই গৌরবজনক নয়।

সে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের কাজে নেমেছিলেন, তখন সেটাকেও অনেকে দুর্বলতা আখ্যা দিয়েছিল, বলেছিল, নাটকীয় একটা কিছু করবার লোভ সামলাতে পারেননি তিনি।

আমি। ছি ছি, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা দিচ্ছেন!

সে। আয়তনে এবং উদ্দেশ্যে আকাশ-পাতাল তফাত হলেও খানিকটা মিল আছে বইকি।

আমি। কিছু মিল নেই।

সে। সত্যি? কিন্তু আমি যতদূর জানি—

আমি। আপনি জানেন না। নারী-প্রেম আর দেশ-প্রেম এক জিনিস হতে পারে না।

সে। এক জিনিস তো আমি বলছি না। আমি বলছি, এক জাতের জিনিস। নয়?

ফিক্ করে হাসলে একটু আবার।

আমি। আপনার হাসিটি কিন্তু শাণিত তীরের মতো বিঁধল। ঠাট্টা করছেন? জীবনে নানাভাবে বিপথে গেছি তা ঠিক, কিন্তু এককালে আমার প্রাণেও স্বদেশপ্রেম ছিল। বিশ্বাস হয়তো করবেন না। যখন আমার সতের-আঠার বছর বয়স, তখন—

সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তার চোখ দুটি। অদ্ভুত দীপ্তি! মনে হল যেন—

হঠাৎ আলোটা নিবে গেল আবার।

।। চার।।

অন্ধকার। চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার। আকাশে ঘন মেঘ, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের গুরুগুরু ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এই দুর্যোগ মাথায় করেও কিন্তু এগিয়ে চলেছে ব্রিটিশবাহিনী ক্লাইভের নেতৃত্বে পলাশী অভিমুখে। নিঃশব্দে ভাগীরথী পার হল

তারা, তারপর শুরু হল মার্চ—ডবল মার্চ। বৃষ্টি পড়ছে পড়ুক, বজ্রাঘাত হয় হোক, রাতারাতি পৌঁছতেই হবে পলাশীতে। মীরজাফর খবর পাঠিয়েছে। রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, ইয়ারলতিফ, উমিচাঁদ সকলেই আশ্বাস দিয়েছেন, সৈন্যদলে কালা আদমিরও অপ্রতুল হয়নি। মীরজাফরের নির্দেশমতো ঠিক সময়ে পলাশীতে পৌঁছতে পারলে যুদ্ধ জয় হবেই। নবাবের সেনা আগে থাকতে এসে পলাশী যেন না অধিকার করে—দ্রুতবেগে মার্চ করে চলল সৈন্যদল পলাশীর আম্রকানন লক্ষবাগ লক্ষ্য করে, পৌঁছতে হবে যেমন করেই হোক রাত্রের মধ্যে। মাত্র সাড়ে সাত ক্রোশ পথ, কতক্ষণ আর লাগবে! এগিয়ে চলল ব্রিটিশবাহিনী দুর্যোগ মাথায় করে।

দৃশ্য বদলাল।

ভাগীরথী যেখানে অশ্বক্ষুরের মতো বেঁকে গেছে ঠিক তার পূর্বদিকে সিরাজের শিবির। আষাঢ় মাসের গভীর রাত্রি। চিন্তামগ্ন নবাব বসে আছেন একা, সম্মুখে কারুকার্যখচিত বহুমূল্য ফরসি, সুগন্ধি তামাকের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। এক কোণে স্বর্ণ-শামাদানে সুগন্ধি প্রদীপ জ্বলছে, স্তিমিতালোকে। ঘন সবুজ মখমলের গালিচাটা মনে হচ্ছে কালো রঙের। থমথম করছে পলাশীর বাতাস, আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ চিরে চিরে ফেলছে নক্ষত্রহীন মেঘাবৃত আকাশকে। সহসা বজ্রপাত হল, হু-হু করে একটা আর্দ্র বাতাস ঢুকল শিবিরের বাতায়নপথে। সিরাজ উঠে দাঁড়ালেন, পদচারণ করতে লাগলেন অস্থিরভাবে। স্তিমিতালোকে তাঁর কালো ছায়াটাও ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে। দ্বারপ্রান্তে সন্তর্পণে উঁকি দিল কে একজন, একবার নবাবের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর ফরসিটার দিকে। চিন্তামগ্ন নবাব দেখতে পেলেন না কিছু। শিবিরগাত্র-বিলম্বিত পর্দার ছায়ায় গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল লোকটা, নবাবের দিকে চাইলে আর একবার, তারপর টপ করে ফরসিটা নিয়ে চুপিচুপি সরে পড়ল অন্ধকারে। চোর! সহসা নবাবের নজরে পড়ল, ফরসি নেই।

কোই হ্যায়?

কেউ এল না, কেউ সাড়া দিল না।

আবার দৃশ্য বদলাল।

যুদ্ধক্ষেত্র।

ইংরেজ-সৈন্য আমবাগানের অন্তরালে, নবাব-সৈন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে। নবাবের সনির্বন্ধ অনুরোধ মীরজাফর, ইয়ারলতিফ সৈন্য পরিচালনা করেছেন, অর্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ রচনা করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন, উদ্দেশ্য আমবাগানকে দু'দিক দিয়ে ঘিরে ফেলা। মধ্যস্থলে আক্রমণ করবেন মীরমদন, তাঁর এক পাশে ফরাসী বীর সিন্‌ফ্রেঁ, আর এক পাশে বাঙালী বীর মোহনলাল। সবিস্ময়ে দেখলাম, আমিই মোহনলাল। অদূরে একটা সরোবর, তার তীরে সারি সারি কামান সাজিয়েছেন মীরমদন। সহসা সংবাদ রটে গেল, মীরজাফর, ইয়ারলতিফ, রায়দুর্লভ, এঁরা কেউ অগ্রসর হলেন না, সসৈন্যে দাঁড়িয়ে আছেন চিত্রার্পিতবৎ। সৈন্যদলে কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তা। গুম গুম গুম গুম—গর্জন করে উঠল মীরমদনের কামান। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সার বেঁধে এগুতে লাগল বিরাটকায় সজ্জিত হাতির দল বাজনার তালে তালে পা ফেলে শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে, দ্রুতবেগে ছুটে চলল অশ্বারোহিগণ, ঘড়ঘড় করে এগিয়ে গেল কামানের সারি

উঁচু উঁচু চাকার উপর। গুম গুম গুম—ইংরেজরাও প্রত্যুত্তর দিলেন আমবাগানের ভিতর থেকে। মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ হতে লাগল, মুহুর্মুহু বাড়তে লাগল হতাহতের সংখ্যা দু পক্ষেই। আরও প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন মীরমদন, মোহনলালের শিরা-উপশিরায় নাচতে লাগল শোণিতধারা। সমস্ত দিন যুদ্ধ হল—ভীষণ যুদ্ধ। অবশেষে আমগাছের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে পড়ল ক্লাইভের সৈন্যরা, উঁচু চাকায় বসানো নবাবের কামান বৃথাই গর্জন করতে লাগল, একটি গোলাও স্পর্শ করল না বিপক্ষ দলকে। তাদের কামান কিন্তু চলতে লাগল সমানে—হঠাৎ একটা গোলা এসে লাগল মীরমদনের ঊরুদেশে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, দেখতে দেখতে পাণ্ডুর হয়ে এল তাঁর মুখচ্ছবি, ধরাধরি করে নিয়ে গেল তাঁকে শিবিরের মধ্যে। মীরজাফর, রায়দুর্লভ আর ইয়ারলতিফ দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলেন, এক পা-ও এগুলেন না। মীরমদনের পতনে ভীত হয়ে পড়ল নবাব-সেনা। নবাব হুকুম দিলেন, যুদ্ধ স্থগিত রাখ এখন। যুদ্ধ স্থগিত রাখ! সেনা ছত্রভঙ্গ হয় হয়, গর্জন করে উঠলেন বাঙালী বীর মোহনলাল, সিরাজের প্রিয়পাত্র ভক্ত মোহনলাল—'দাঁড়া রে দাঁড়া রে ফিরে দাঁড়া রে যবন, দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ—' আকাশ প্রকম্পিত করে বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া। পরস্পরবিরোধী অক্ষয় মৈত্র ও নবীন সেন সমস্ত বিরোধিতা ভুলে গলাগলি করে এসে দাঁড়ালেন, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, আমার মানসক্ষেত্রে।

।। পাঁচ।।

আলো জ্বলে উঠল।

হাসিমুখে বসে আছে সে। অদ্ভুত একটা ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চকমক করছে চোখ দুটিতে।

সে। একটা কথা জানেন?

আমি। কি বলুন?

সে। হিন্দু মোহনলাল মুসলমান সিরাজের এত প্রিয়পাত্র হয়েছিল কি করে?

আমি। সিরাজ ছিলেন গুণগ্রাহী।

সে। না, মোহনলালের ভগ্নী ছিলেন রূপসী। সিরাজের কামনা-বহ্নিতে ভগ্নী-আহুতি দিতে হয়েছিল মোহনলালকে।

হঠাৎ আলো নিবে গেল। মনের আলোটাও নিবিড় নীরন্ধ্র অন্ধকারে অনেকক্ষণ বসে রইলাম চুপ করে বিহ্বল হয়ে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল আর একটি ছবি।

।। ছয়।।

ছোট একখানি ঘর। ঘরের একপাশে ছোট একটি চৌকি। চৌকিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছি আমি, সতেরো-আঠারো বছর বয়সের আমি, একটু একটু গোঁফ-দাড়ি উঠেছে, মসৃণ ললাট, চিবুকে অধরে অর্ধজাগরিত পৌরুষের আভাস, চোখে আদর্শের স্বপ্ন। মাথার শিয়রে ছোট কাঠের টেবিল, টেবিলের উপর বইয়ের শেল্‌ফ, তার একধারে ছোট টাইমপিস একটা। ঝনঝন করে

অ্যালার্ম বেজে উঠল। উঠে বসলাম। বন্ধ করে দিলাম অ্যালার্মটা। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে এসে ডন-বৈঠক করলাম খানিকক্ষণ, স্নান করে এলাম চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা কনকনে জলে। স্নানান্তে মেরুদণ্ড ঋজু করে চৌকিরই উপর বসে প্রাণায়াম করলাম কিছুক্ষণ। তারপর আলো জ্বেলে পড়তে বসলাম গীতা। গীতা পড়তে পড়তে রোমাঞ্চিত হল সর্ব শরীর—মনে হতে লাগল, আমিই যেন অর্জুন, চোখের সামনে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখছি—বহু মুখ, বহু চোখ, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর, দংষ্ট্রাকরাল মুখগহ্বর, চোখে সূর্য-চন্দ্র জ্বলছে, সর্বাঙ্গে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতি, স্বর্গ মর্ত্য অন্তরীক্ষ সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত অপ্রমেয় বিরাট পুরুষ অনাদি অনন্ত অবিনশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে। ভীত বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমিই যেন—

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তুহতে দেববর প্রসীদ
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যম্
নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।

পড়ছি মনে হল না, মনে হল, সত্যিই যেন শুনছি—

"আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, এখন আমার সংহারমূর্তি," তুমি যুদ্ধ না করিলেও কেহ রক্ষা পাইবে না। অতএব যুদ্ধ কর—

তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শক্রূ ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্য সমৃদ্ধং।"

দৃশ্য বদলাল।

প্রকাণ্ড প্রান্তর। জ্যোৎস্না উঠেছে। কিছুক্ষণ আগে সরকারী খাজনার গাড়ি লুট হয়ে গেছে, অপহৃত ধনসম্ভারের ব্যবস্থা করবার জন্যে চলে গেছে জীবানন্দ একটু আগেই অনুচরবর্গ সমেত। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নির্জন মাঠের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছি আমি। ভবানন্দ নয়, আমি। গান ধরেছি গলা ছেড়ে মল্লার রাগিণীতে—

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

পিছনে আসছে মহেন্দ্র সিং নয়, বন্ধু যতীন। গানের ফাঁকে ফাঁকে সহসা যেন শুনতে পেলাম বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠস্বর—মহাকাশ থেকে ভেসে আসছে মহাকালকে এড়িয়ে। সত্যিই মনে হচ্ছে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' যতীনের মুখে শুনছি বঙ্কিমের কণ্ঠস্বর—"জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল এই সুজলা সুফলা মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমি—"

সহসা একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। ঝলমলে জরি-দেওয়া একটা লাল পাড়ের ঝলকানিতে সমস্ত মিলিয়ে গেল নিমেষে। চোখের সামনে ভেসে উঠল—আধখোলা জানলায় এক ফালি রোদ এসে পড়েছে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বেণী রচনা করছে টগর, কাঁধের উপর বুকের উপর

জ্বলজ্বল করছে জরি টকটকে লাল পাড়ের কোলে, সরু মেয়েলী গলায় কে যেন গান গাইছে ছায়ানটে—'যদি বারণ কর তবে গাহিব না, যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না—'। আমি নির্নিমেষে চেয়ে আছি, উৎকর্ণ হয়ে শুনছি.........গীতা, আনন্দমঠ, বিবেকানন্দ, টগর, যতীন......

নির্জন পার্ক। আমি আর যতীন পাশাপাশি বসে আছি। দুজনেরই পকেটে রিভলবার—তিনটে রিভলবার। মালদা থেকে যে ছেলেটির আসবার কথা আছে আজ রাত্রে এখানে, তাকে দিতে হবে একটা। গাছের ছায়ায় অন্ধকারে বসে আছি আমরা, প্রত্যেক গেটে নজর রাখছি, বিশেষ করে উত্তর দিকের গেটটায়। সাহেবী পোশাক পরে চকোলেট রঙের ফেল্ট ক্যাপ মাথায় দিয়ে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে ওই গেট দিয়েই তার ঢোকবার কথা। দুজনেই নিঃশব্দে বসে আছি। যতীনের মনে কি জাগছিল জানি না, কিন্তু আমি ভাবছিলাম দেশের বাগদী আর সাঁওতালদের দলে টানবার কথা। ভাবছিলাম শিবাজী আর রাণা প্রতাপ সিংহের কথা। পার্বত্য মাওয়ালী আর ভীলদের সুশিক্ষিত করেছিলেন তাঁরা, আমারই বা—হঠাৎ উত্তর দিকের গেটটা দিয়ে ঢুকলেন একজন মহিলা। এসে বসলেন ঠিক আলোর নীচেই যে বেঞ্চিটা ছিল তার উপরে। যতীন আমার গা টিপলে। চুপচাপ করে কাটল আরও কয়েক মিনিট। মহিলা চুপ করে বসে রইলেন, মনে হল, ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছেন। সহসা পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে রঙচঙে লুঙ্গি পরা চুড়িদার পাঞ্জাবি গায়ে দুটি লোক ঢুকল। একজনের হাতে বেলফুলের মালা, আর একজনের বগলে একটা কালো বোতল, খুব সম্ভব মদই আছে তাতে। মশমশ করে এগিয়ে এল কিছুদূর, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে মহিলাটিকে। দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে, চোখে চোখে কি একটা ইশারা হয়ে গেল যেন, চুপি চুপি কথা হল, হাসিরও আওয়াজ পাওয়া গেল একটু। তারপর দুজনেই মহিলাটির দিকে এগিয়ে গেল, সোজা গিয়ে তাঁর সামনাসামনি দাঁড়াল। কি কথা হল শুনতে পেলাম না, কেবল দেখা গেল, মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়েছেন। ক্রমশ বচসা শুরু হল, মহিলা রোষভরে চলে যেতে উদ্যত হলেন, লোক দুটো হাত বাড়িয়ে পথরোধ করলে, এমন কি একজন হাত ধরে আকর্ষণও করলে, মহিলা চিৎকার করে উঠলেন আর্তকণ্ঠে, অসহায়ভাবে চাইতে লাগলেন চারদিকে! কেউ কোথাও নেই। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল যতীন। চুপিচুপি বললে, তুই বসে থাক, আমি দেখি ব্যাটাদের। চলে গেল, নিমেষে গিয়ে হাজির হল সেখানে। যতীনকে দেখবামাত্র লোক দুটো যেন ভয় পেয়ে পালাল মনে হল। মহিলা মূর্ছা গেলেন। যতীন দু হাত দিয়া না ধরলে দড়াম করে পড়ে যেতেন মাটিতে। মূর্ছিতা মহিলাকে সামলাতে যতীনের দু হাত যখন ব্যস্ত, তখন আচম্বিতে লোক দুটো ছুটে এসে পিছন দিক থেকে জাপটে ধরলে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে হুইশলের তীব্র ধ্বনি শোনা গেল, সহসা পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল লাল-পাগড়ি পুলিশ—যতীন ধরা পড়ল। সমস্তটাই পুলিশের সাজানো ব্যাপার, মহিলাটি ভাড়া-করা। যতীনের নামে হুলিয়া ছিল। যতীন যে সর্বদা রিভলবার সঙ্গে নিয়ে ঘোরে, তা পুলিশের অবিদিত ছিল না। আজ রাত্রে পার্কে আসবার কথাও পুলিশ টের পেয়েছিল আগে থাকতে। পুলিশের আশঙ্কা ছিল, সামনাসামনি ধরতে গেলে বিনা যুদ্ধে যতীন আত্মসমর্পণ করবে না—তাই এই ফাঁদ।

হাতকড়ি পরিয়ে দিলে। চড়াত করে একটা শব্দ হল। চাপদাড়িওয়ালা একটা পুলিশ চড় মারলে যতীনের গালে।

।। সাত।।

আলো জ্বলে উঠল।

দেখলাম, সে আমার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রয়েছে, চোখে আগুন জ্বলছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, নিদারুণ একটা ঘৃণায় সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার।

সে। আপনি পালিয়ে এলেন কেন?

আমি। ভয় পেয়ে।

অপরূপ একটা মিষ্টি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখখানা।

সে। কিসের ভয়ে? পুলিশের? তবে তার পরদিন পুলিশের কাছে গিয়ে ধরা দিলেন কেন অকপটে সব কথা স্বীকার করে? ভাগ্যে পুলিশ-অফিসারটি আপনার বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন, তাই রক্ষে পেয়ে গেলেন, তা না হলে তো—

আমি: আপনি কে?

সে। ও কথা থাক, তাতে লাভ কি হয়েছিল জানেন?

আমি। শুনেছি, যতীনের—

সে। হ্যাঁ। যতীনের কেস আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

আমি। আপনি স্পাই নাকি?

সে। এতক্ষণে যা হোক ঠিক ধরতে পেরেছেন।

আমি। সত্যি স্পাই?

সে। সত্যি।

চাপা হাসি চিকমিক করতে লাগল চোখে।

আমি। কে আপনি, বলুন—

সে। বিলেতে এত মেয়ে নিয়ে এত ঘাটাঘাঁটি করেছেন, অথচ আমার মতো সামান্য একটা মেয়েকে দেখে এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?

আমি। রাত-দুপুরে এই তেতলার ঘরে আপনার আবির্ভাবটা সত্যিই একটু উত্তেজনাজনক—তা ছাড়া আপনি—

সে। আমি শুধু নয় আরও অনেকে এসেছে হয়তো।

আমি। তার মানে?

সে। আপনি প্রফেসার গুপ্তের ল্যাবরেটরি থেকে আসবার সময় সম্ভবত এত অন্যমনস্ক ছিলেন যে—

মুচকি হাসি ফুটে উঠল অধরে তার।

আমি। যে?

সে। যে, বাইরে থেকে তেতলায় ওঠবার ঘোরানো সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দেবার কথা মনে ছিল না আপনার।

আমি। সেই দরজা দিয়ে এসেছেন? বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু আপনি কে?

সে। নামটা শুনতে চান?

আমি। বলুন।

সে। যদি বলি, আমার নাম অনীতা।

আমি। অনীতা?

সে। নামটা পছন্দ হচ্ছে না? ওই ধরনের নামেরই তো আজকাল চলন হয়েছে। ঝড়ঝড়ে মোটরবাসের নাম যদি মেনকা হয়, তা হলে—

আমি। ঠাট্টা নয়, সত্যি বলুন আপনার নাম কি?

সে। যদি বলি যজ্ঞেশ্বরী, তা হলে কি পিত্তি চটে যাবে আপনার!

ঠোঁটে হাসি নেই, চোখ দুটি হাসছে।

আমি। আমার মনের যা অবস্থা, তাতে রসিকতা ভালো লাগছে না এখন। সত্যি বলুন।

সে। সত্যি কথা বলায় বিপদ—লোকে তা বিশ্বাস করতে চায় না।

আমি। বিশ্বাসযোগ্য হলে কেন তা বিশ্বাস করবে না?

সে। বিশ্বাসযোগ্য হলেও তা বলা নিরাপদ নয়।

আমি। আপনার সত্য পরিচয় কি অপ্রিয় হবার সম্ভাবনা আছে?

সে। আমি এমনভাবে কখনও নিজেকে প্রকাশ করিনি, সুতরাং আমার পরিচয় প্রিয় হবে কি অপ্রিয় হবে তা জানি না। পরিচয়ের প্রয়োজনটাই বা কি বুঝতে পারছি না। অপরিচয়ের অন্তরালটাই তো রোমান্টিক!

আমি। সব সময়ে নয়।

সে। ধরুন, যদি বলি, আমি আপনার দূর সম্পর্কের পিসী!

আমি। পিসী!

সে। হতে বাধা কি?

চোখের দৃষ্টিতে আবার ছড়িয়ে পড়ল হাসির আভা।

আমি। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে আপনি আমার সব কথা জানলেন কি করে!

সে। এ যুগে কোনো কিছুতে আশ্চর্য হওয়াটাই কি আশ্চর্যজনক নয়? এ যুগে আকাশ থেকে সৈন্য বর্ষণ হয়, সমুদ্রের তলায় টর্পেডো ছোটে, রেডিওতে বাণী বহন করে, টেলিভিশনে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, থিওরি অব রিলেটিভিটি পুরাতন বিশ্বাসের ভিত্তি নষ্ট করে। এই সামান্য ব্যাপারে আপনি এত আশ্চর্য হচ্ছেন! ওগুলোর যেমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, এটারও আছে।

আমি। কিন্তু—

সে। না তর্ক থাক, ওগুলোকে যেমন মেনে নিয়েছেন, আমাকেও তেমনই মেনে নিন। কথায় কথায় আসল কথাটা চাপা পড়ে গেছে।

আমি। কেন?

সে। আপনি পালিয়ে এলেন কেন?

আমি। বললাম তো, ভয়ে।

সে। পুলিশের ভয়ে, না প্রথম প্রণয়িনী টগরের বিচ্ছেদের ভয়ে? ঝলমলে জরিদার লাল পাড়ের ঝলকানির মোহটাই কি আসল কারণ নয়?

আমি। পুলিশের ভয় একটু ছিল বই কি। স্বীকার করলাম না হয় মোহটাই আসল কারণ, কিন্তু মোহ সত্ত্বেও আমি পরদিন পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টারের সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলেছিলাম, এটার আপনি একটুও মূল্য দেবেন না?

সে। গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার কোনো মূল্য নেই তা সত্যি!

আমি। যতীনের মতো ধরা পড়তে পারি, এ সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। এর কোনো মূল্য নেই?

সে। থাকত, যদি আপনি বাঙালী এবং পিতৃবন্ধু পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টরের কাছে না গিয়ে সাহেব পুলিশ কমিশনারের কাছে যেতেন।

আমি। তার মানে?

সে। তার মানে সত্যি সত্যি যদি বিপদকে বরণ করতেন। আপনি যা করেছেন, তাতে সাপ মরেছে কিন্তু লাঠি ভাঙেনি।

আমি। বুঝতে পারছি না ঠিক। আমি যার কাছে গিয়েছিলাম, তিনিও খুব কড়া লোক। সবাই তাঁকে বাঘ বলে।

সে। ভাত-খেকো বাঙালী বাঘ। চাকরি বাঁচিয়ে সুযোগমতো বন্ধুর ছেলেকে বাঁচাতে পারলে বাঁচাতে ইতস্তত করেন না। করেনও নি।

আমি। আপনি কি বলতে চান, আমি এত কথা ভেবে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম?

সে। জ্ঞাতসারে না ভাবলেও অজ্ঞাতসারে হয়তো ভেবেছিলেন।

আমি। ছি ছি, এত হীন ভাবেন আপনি আমাকে!

সে। হীন-অহীনের প্রশ্নই ওঠে না এতে। কিন্তু বুদ্বুদকে পর্বত মনে করি কি করে, বলুন? বদ্বুদ অথবা পর্বত কেউ হীন নয়।

আমি। দেখুন, রবি ঠাকুরের যুগে উপমার ফেরে পড়ে আমরা অনেক সময় আসল সত্যকে হারিয়ে ফেলেছি। দোহাই আপনার, উপমা দেবেন না, একটা প্রশ্নের সহজ উত্তর দিন, যদি পারেন। ব্যাপারটা আমিও ভেবে ঠিক করতে পারিনি আজও।

সে। কি বলুন?

আমি। সেদিন আমি পুলিশের কাছে গেলাম কেন টগরকে ভালোবাসা সত্ত্বেও? বিশ্বাস করুন আমি কল্পনাও করিনি যে, তিনি আমায় বাঁচিয়ে দেবেন। আমি তখন জানতামও না যে, বাবার কাছে তিনি টাকা ধার নিয়েছেন। আমি ধরা দিতেই গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন? আমার প্রথম প্রণয়ের আকর্ষণটা কিছু কম প্রবল ছিল না, নবোদ্ভিন্নযৌবনা টগর বাহুপাশে ধরা দেব-দেবও করছিল, তবু আমি কারাবরণ করতে ছুটলাম কেন?

সে। দুটো কারণ হতে পারে। প্রথম, টগরের চক্ষে নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করবার জন্যে, যদিও তা বেনাবনে মুক্তো ছড়ানোর সামিল, আর দ্বিতীয়, হয়তো মানুষের বিবেক পশুর বিবেককে পরাভূত করেছিল ক্ষণিকের জন্য এবং তারই উত্তেজনায় হয়তো আপনি ছুটে গিয়েছিলেন দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঙালীসুলভ উচ্ছ্বাসবশত। সত্যি সত্যি ধরা পড়লে হয়তো দ্বীপান্তরে বসে অনুতাপ করতেন এর জন্য আজীবন।

আমি। অনুতাপ করতাম! ঠিক জানেন আপনি?

হঠাৎ আলো নিবে গেল।

।। আট।।

তালুকপুরের স্কুলের থার্ড মাস্টারের শয়নকক্ষ। থার্ড মাস্টার অবিবাহিত যুবক। গভীর রাত্রে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন একা। ঠিক জানলার নীচেই বেলফুলের ঝাড়ে অজস্র বেলফুল ফুটেছে, খোলা জানলা দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির আকাশ দেখা যাচ্ছে খানিকটা, ধনুরাশির ঠিক নীচেই করোনা বোরিয়ালিস খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ছায়াপথের খানিকটা দেখাচ্ছে ঠিক এক টুকরো ধবধবে সাদা মেঘের মতো। অন্য দিন হলে এমন পরিষ্কার আকাশ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠত থার্ড মাস্টার। হয়তো ম্যাপ খুলে সমস্ত রাত্রি জেগে বসে থাকত ছাতে কুম্ভরাশির শতভিষা নক্ষত্র দেখার জন্য। আজ কিন্তু তার ওসব কিছুতে মন নেই। আজ তার সমস্ত মন একাগ্র হয়ে একটি কথাই চিন্তা করছে—বাতাসী অন্তঃসত্ত্বা, জানাজানি হয়ে গেছে। গ্রামের বেওয়ারিশ মেয়ে বাতাসী, অন্তত এতকাল বেওয়ারিশ ছিল, সবার বাড়িতে ঝি-গিরি করে বেড়াত। থার্ড মাস্টারের বাসা-বাড়িতেও। কানাঘুষো চলছিল অনেক দিন থেকে, আজ কিন্তু আর সন্দেহ নেই, সত্যিই সে সন্তানসম্ভবা। শুধু তাই নয়, তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী হাজির হয়েছে হঠাৎ এসে। দশ বছরের বাতাসীকে বিয়ে করে যে লোকটা আড়কাঠিদের সঙ্গে আসাম অঞ্চলে চলে গিয়েছিল, আট বছর পরে সে সশরীরে ফিরেছে এবং দাবি করেছে তার স্বামীত্বের অধিকার মহা সোরগোল করে। বাতাসীকে মার-ধোর করেছে খুব। মার খেয়েও বাতাসী কিন্তু মাস্টারের নাম বলেনি। অন্ধকার ঘরে মাস্টার এপাশ-ওপাশ করছে একা বিছানায় শুয়ে। বাতাসীর মুখখানা মনে পড়ছে বার বার, বিশেষ করে বাঁ গালের উপর বেতের কালো তির্যক দাগটা। খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে মাস্টার উঠে বসল, আলো জ্বেলে তোরঙ্গটা খুললে, তারপর তোরঙ্গের তলা থেকে বার করলে দুশো টাকার একতাড়া নোট, অর্থাৎ বছর খানেক চাকরি করে সে কায়ক্লেশে যে কটা টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছিল তার সমস্তই। পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে নোটের তাড়াটা বুকপকেটে পুরে বেরিয়ে পড়ল সে। গভীর রাত্রি, নির্জন পথ। ঘেউঘেউ করে তেড়ে এল দু-একটা কুকুর, চৌকিদারের হাঁক শোনা গেল দূরে। সাপে ব্যাঙ ধরলে যেমন একটা আওয়াজ হয়, তেমনই একটা আওয়াজ শোনা যেতে লাগল,—মৃত্যু-যন্ত্রণাকাতর ভেকের আওয়াজ নয়, এক জাতীয় পেচক-দম্পতির বিশ্রম্ভালাপ। মাস্টারের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সোজা গিয়ে উঠল সে বাতাসীর বাড়িতে। ডাক দিতেই বাতাসী বেরিয়ে এল। চোখে হরিণীর মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

"তোর স্বামীকে ডেকে দে!"

"কেন—"

"দরকার আছে—"

ডাকতে হল না, আপনিই বেরিয়ে এল সে।

দুশমনের মতো চেহারা। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে শরীরের উপরার্ধ, অনেকটা গরিলার মতো। মুখে গোঁফ দাড়ি ভ্রূ কিছু নেই, আছে কেবল ছোট ছোট এক জোড়া চোখ, প্রাণহীন দৃষ্টি তাতে। একমাথা বাবরি-করা চুল। নাকটা থ্যাবড়ানো, ডগের দিকটা একটু বাঁকাও। নাকের ঠিক নীচেই গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন। মাস্টারের ফরসা জামা-কাপড়ের জন্যই হোক, কিংবা অভ্যাসবশতই হোক, লোকটা বেরিয়ে এসেই মাস্টারকে সেলাম করলে। মাস্টার নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। এরই স্ত্রী বাতাসী! তারপর অতিশয় অবান্তর প্রশ্ন করে বসল একটা।

"তোমার নাকের ওখানটায় কি হয়েছিল?"

"ম্যানেজার সাহেব লাথি মেরেছিল।"

"কোথাকার ম্যানেজার?"

"চা-বাগানের।"

থতমত খেয়ে গেল মাস্টার। নিজেকে ওই ম্যানেজারের সমশ্রেণীর বলে মনে হতে লাগল। খানিকক্ষণ কোনো কথাই বেরুল না মুখ দিয়ে। লোকটাও হাঁ করে চেয়ে রইল। স্তব্ধতাকে সচকিত করে পাশের বৃহৎ বটগাছটায় কলরব করে উঠল কতকগুলো পাখি একযোগে, গ্রামপ্রান্তে ডেকে উঠল এক দল শেয়াল। যামিনীর দ্বিতীয় যাম শেষ হল। মাস্টারের চমক ভাঙল।

"শোন—"

"আমাকে ডাকছেন?"—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে লোকটা।

"হ্যাঁ, তোমাকেই। তুমি বাতাসীর স্বামী তো?"

"হ্যাঁ হুজুর—"

ঘাড় ফিরিয়ে বাতাসীর দিকে চাইতে গেল, কিন্তু বাতাসী ছিল না, ভিতরে চলে গিয়েছিল।

"তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে আমার। এস আমার সঙ্গে।"

"এত রাতে কোথা যাব?"

"ভয় নেই তোমার, এস না!"

লোকটা দাঁড়িয়ে কি ভাবলে, তারপর বললে, "একটু দাঁড়ান তাহলে, তালাটা লাগিয়ে আছি—"

মাস্টার কিছু বলবার আগেই সে চলে গেল। শব্দ হল কাকে যেন ভেতরে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দড়াম করে কপাট লাগিয়ে শিকল তুলে দিলে। তালায় চাবি লাগানোর শব্দটাও পাওয়া গেল। মাস্টার নিঃশব্দে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

লোকটা বেরিয়ে এল।

"চলুন—"

খানিকক্ষণ নীরবে হাঁটবার পর স্কুলের ফুটবল খেলার মাঠটায় এসে পৌঁছল দুজনে। চাঁদ উঠছে।

"বস—"

দুজনে মুখোমুখি হয়ে বসল। অকপটে সমস্ত কথা স্বীকার করলে মাস্টার, এতটুকু গোপন

করলে না কিছু। সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে শেষে বললে, "বাতাসীর কোনো দোষ নেই, সব দোষ আমার, ওকে কিছু বোলো না তুমি। ইচ্ছে কর তো আমাকে খুন করতে পার।"

"খুন করব? আপনাকে? রাম রাম, কি যে বলেন, আপনি হলেন একটা মহাপুরুষ লোক—"

ছোটলোকদের কাছ থেকেও মাঝে মাঝে চমৎকার ব্যঙ্গ-রসের নমুনা পাওয়া যায়। মাস্টার নীরবে হজম করলে খোঁচাটা। বরং আঘাত পেয়ে একটু যেন আরামই পেলে অপ্রত্যাশিতভাবে। এই কদর্য লোকটার অসহায় চাহনি এতক্ষণ যেন পীড়িত করছিল তাকে। কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে রইল নীরবে। হঠাৎ লোকটার মুখে ফুটে উঠল একটা কুৎসিত হাসি, নাকের নীচের ক্ষতচিহ্নটা কুঁকড়ে বেঁকে গেল, একটা কালো কেন্নো যেন নড়ে চড়ে উঠল।

"বেশ, আপনিই নিন তবে ওকে। আপনার কাছেই থাকুক ও।"

তালার চাবিটা বাড়িয়ে ধরল। "গোটা পঞ্চাশেক টাকা পেলেই আমি চা-বাগানে ফিরে যাব—"

"আমি ওকে নিতে চাই না। তুমিই নিয়ে যাও।"

বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে।

"পরের বোঝা ঘাড়ে করে কোথায় ঘুরব আমি?"

মাস্টারের বলতে ইচ্ছে করল, "পরের বোঝা ঘাড়ে করে বেড়ানোটাই তো তোমার পেশা বাপু, চায়ের বাগানে যে বোঝা বয়ে বেড়িয়েছ এতকাল, তা কি তোমার নিজের?" বলতে ইচ্ছে করল, কিন্তু বললে না।

বললে, "না, তুমিই নিয়ে যাও! হাজার হোক, তোমার বিয়ে করা বউ। খরচপত্তর যা লাগে, তা আমি দিচ্ছি—"

"কত দেবেন?'

"দুশো"—

মাস্টারের অভিজ্ঞতা কম, তাই একবারেই সবটা বলে ফেললে, দর-দস্তুর করবার কথা মনে হল না। পকেট থেকে নোটের তাড়াটা বার করতেই লোকটা লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ জ্যোৎস্নাতেও নোট চিনতে ভুল হয়নি তার। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে জিভ বার করে ঠোঁট দুটো চাটলে, তারপর বললে, "দুশো টাকা বড় কম হয় হুজুর, এত বড় একটা ঝুঁকি ঘাড়ে করা, গরিব মানুষ আমি—"

বাঁ হাতের অনামিকায় দামী পাথর-বসানো একটা সোনার আংটি ছিল মাস্টারের। নির্বিকার চিত্তে সেটাও খুলে দিয়ে মাস্টার বললে, "বেশ, এটাও নাও, কালই কিন্তু চলে যেতে হবে এখান থেকে। আর কেউ যেন না এ কথা ঘুণাক্ষরে জানতে পারে।"

"যে আজ্ঞে—"

টাকা আর আংটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। তারপর ঝুঁকে সেলাম করে চলে গেল। চুপ করে বসে রইল মাস্টার। কিছুদূর গিয়ে লোকটা আবার ফিরে এল।

"আপনি লোকটি কে, তা তো বুঝতে পারলাম না হুজুর—"

"আমি এখানকার স্কুলের থার্ড মাস্টার—"

"ও!"

রোমহীন ভ্রূযুগল উত্তোলন করে বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"ছেলেদের পড়ান আপনি?"

"হ্যাঁ—"

আরও কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

"আচ্ছা আসি তবে—"

ঝুঁকে, একটু বেশী রকম ঝুঁকে, সেলাম করে চলে গেল। মাস্টার বসে রইল চুপ করেই, আকাশের দিকে চাইলে একবার। কুচকুচে কালো আকাশে মেঘের লেশ নেই, একেবারে নির্মল, মকর রাশির যুগ্ম নক্ষত্র দুটো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

।। নয়।।

আলো জ্বলে উঠল।

দেখলাম, তার চোখ দুটি অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে। ঠোঁট দুটিতে ব্যঙ্গের হাসি।

সে। এত বড় পুণ্য কর্ম করে শেষে আপনি অনুতাপ করেছিলেন। এখনও করেন বোধ হয়।

আমি। সঙ্গত কারণ আছে তার। লোকটা যাবার সময় আংটি দেখিয়ে আমার নামে নালিশ করে গিয়েছিল স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছে, ফলে আমার চাকরি যায়। বাতাসীকেও সে দূর করে দিয়েছে শুনেছি। আগে সন্দেহ করলে, কিছু দিতাম না, তা ঠিক।

সে। দ্বীপান্তরে যাবার পরও অনুতাপ করবার অনুরূপ সঙ্গত কারণ জুটত আপনার। অনেকের জুটেওছে।

আমি। প্রত্যেক কাজের ফলাফল অনুসারেই লোকে আনন্দিত অথবা অনুতপ্ত হবে, এ আর বিচিত্র কি!

সে। প্রত্যেক কাজের ফলাফল নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামান আপনারা। ভিখারীকে একটা পয়সা দেবার আগেও গবেষণা করেন, লোকটা পয়সাটা নিয়ে কি করবে, গাঁজা খাবে, না ছাতু খাবে।

আমি। দূরদর্শিতা জিনিসটা তো খারাপ নয়।

সে। নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, এক রকম হওয়াই ভালো। নিছক অদূরদর্শী লোককেও ভালোবাসা শক্ত নয়, কিন্তু যারা সুযোগ এবং সুবিধা অনুসারে কখনও দূরদর্শী, কখনও অদূরদর্শী হয়, তাদের শ্রদ্ধা করা যায় না। তা ছাড়া দু নৌকায় পা দিয়ে চলাও শক্ত, শেষ পর্যন্ত তাতে ডুবতে হয়।

আমি। আমি দু নৌকায় পা দিয়েছি?

সে। দিয়েছেন বইকি!

আমি। নৌকো দুটোর নাম?

সে। স্বার্থ এবং ত্যাগ। সাময়িক একটা উচ্ছ্বাসে আপনি ত্যাগী সেজেছেন, কিন্তু যেই স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, অমনিই আবার পেছিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, পেছিয়ে আসাটার একটা চমৎকার ব্যাখ্যাও বার করেছেন সঙ্গে সঙ্গে, এইটে আরও মজার। আপনার দেশপ্রেম নারীপ্রেম দুটো ব্যাপারেই দেখুন।

আমি। দুটো ব্যাপারেই আমি পেছিয়ে এসেছি তা ঘটনা হিসাবে ঠিক, গোলমাল হচ্ছে নামকরণ নিয়ে। আপনি ওটাকে বলছেন—পলায়ন, আমি যদি বলি—সংশোধন? টেররিজ্‌ম্ বা বাতাসীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয় করা, এ দুটোর কোনোটাকেই আমি ভালো বলে মনে করি না।

সে। আমিও করি না। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা জিনিসটা তো ভালো নয়। আমার যতদূর মনে হয়, আপনার মনোভাব ঈশপের আঙ্গুরলোভী শেয়ালটার মনোভাবের মতো অর্থাৎ আত্মপ্রবঞ্চনা।

আমি। আত্মপ্রবঞ্চনা?

সে। সারাজীবন তো তাই করেছেন! ধরুন না, যে কারণে আই. এ. পাস করবার পর আপনি তালুকপুরে গিয়ে হাজির হলেন, সেই কারণটা আপনার কাছে কত বড় মনে হয়েছিল প্রথম প্রথম, কিন্তু—

আমি। মুরগি খাওয়া এখনও আমি পাপ বলে মনে করি না।

সে। তা হয়তো করেন না, কেই-বা করে আজকাল, কিন্তু তখন যেটাকে একটা মহৎ কর্ম বলে মনে হয়েছিল, জীবনের একটা প্রধান প্রিন্সিপলের মর্যাদা দিয়েছিলেন তাকে—এত বড় যে, জন্মদাতা পিতার সঙ্গে ঝগড়া করে তালুকপুরে চলে যেতে বাধে না তখন আপনার।

আমি। বাবার ওসব সেকেলে গোঁড়ামি আমি এখনও সমর্থন করি না।

সে। কিন্তু প্রতিবাদের জোরটা কমে এল, যেই সেখানকার চাকরিটা গেল। সুড়সুড় করে ফিরে এলেন সেই বাবারই কাছে আবার।

আমি। তালুকপুর থেকে আমি বাবার কাছে ফিরিনি।

সে। ফিরেছিলেন মামার কাছে তা ঠিক, কিন্তু আপনার মামা যে আপনার হয়ে আপনার বাবার কাছে ওকালতি করছিলেন, সে কথা আপনি জানতেন। এমন কি তিনি মিছে করে আপনার অনুতাপের এবং গোবর খাওয়ার কথা বলেছিলেন তাঁকে, তাও আপনার অবিদিত ছিল না।

আমি। কিন্তু বাবা যতক্ষণ না নিজে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেছেন, ততক্ষণ আমি যাই নি।

সে। আপনি তাঁর একমাত্র পুত্র, আপনার সম্বন্ধে দুর্বলতা থাকা তো খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে ঘরে স্থান দিতে রাজী হননি, যতক্ষণ না আপনার মামা এসে তাঁকে মিছে কথা বলে বোঝালেন যে, আপনি অনুতপ্ত এবং গোবর খেয়েছেন।

আমি। বাবা আমাকে এসব কথা জিজ্ঞাসাও করেননি একবার।

সে। তিনি না করলেও আপনার কি তাঁকে স্পষ্ট বলা উচিত ছিল না যে, আমি গোবরও খাইনি, অনুতপ্তও নই, সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে আবার মুরগি খাব, এ শুনেও যদি আপনি বাড়িতে স্থান দিতে রাজী থাকেন তবেই যাব।

আমি। বাবা অবুঝ, যুক্তির কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে, ওসব কথা বলে লাভ কি তাঁকে?

সে। ওইটেই আত্মপ্রবঞ্চনা।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তার চিবুকের গড়নটা বাতাসীর চিবুকের মতো, মালতীর মতো হাসবার ধরন, নাম-না-জানা বহুকাল পূর্বে দেখা সেই জেক মেয়েটির মতো গ্রীবাভঙ্গী। অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম একটু। সেই জেক মেয়েটির কথাই মনে হতে লাগল বার বার। প্যারিসেরই একটা কাফেতে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে, সমস্ত বিধি-বিধান অতিক্রম করে নিজেই এসে আলাপ করেছিল উপযাচিকার মতো। হেসে বলেছিল, "সমাজের বিধি-বিধান মানতে মানতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, চতুর্দিকে কেবল ফর্ম, আর সেফটি ফাস্ট! বিপদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, খুঁজছি অ্যাডভেঞ্চার।"

"তাহলে এখানে কেন, আফ্রিকায় যান—"

"ঠিক বলেছেন, এখানকার ভিড়টাও যেন ফ্যাকাশে গোছের, কেবল আপনাকেই একটু রঙিন মনে হচ্ছে, আপনার চোখের দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি পূর্বদিগন্তের রহস্যময় ওরিয়েন্টাল স্বপ্ন, আসুন আপনার সঙ্গে নাচি একটু।"

সোনালী রঙের অলক দুলিয়ে আহ্বান করলে। নৃত্যপরা সেই মোহিনীর দেহের উত্তাপ এখনও অনুভব করছি যেন, চোখের উপর ভেসে উঠছে তার হাসি, চাহনি, বিশেষ করে তার বেশের বর্ণ-বাহুল্য। মজবুত মোটা টকটকে লাল কাপড়ে তৈরী মাথার টুপি, প্রশস্ত মাফলার, চমৎকার কাজ করা তাতে সোনার সুতোয়। দুগ্ধধবল ঢিলে জামা, ঘন নীল স্কার্ট। তন্বী, সুন্দরী, যৌবনরসে টলমল করছে।

সে। একটা কথা মনে আছে?

আমি। কি?

সে। নাচের পর তাকে সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার শিকারের যে গল্পটা করেছিলেন, সেটা আগাগোড়া বানানো? সুন্দরবনে আপনি কখনও যাননি। অথচ তাকে গল্পটা বলছিলেন, তখন আপনার নিজেরও মনে হচ্ছিল যে, ঘটনাটা সত্যি।

সবিস্ময়ে চুপ করে রইলাম।

সে। আত্মপ্রবঞ্চনা করতে করতে মনের এমন নিদারুণ অবস্থা হয়েছে যে, আত্মহত্যা করাটাকেও বীরত্বের পর্যায়ভুক্ত করে ফেলেছেন শেষে।

আমি। প্রিয়তম জীবনকে ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে বীরত্ব আছে বইকি।

সে। থাকত, যদি ভরা-ভোগের মাঝখানে স্বেচ্ছায় তাকে ছাড়তে পারতেন। বাতাসীর মতো একটা সামান্য মেয়েকেও ভালোভাবে ভোগ করবার সামর্থ্য নেই যার—

আমি। বাতাসীকে ভোগ করিনি?

সে। ওকে ভোগ করা বলেন? একটু বিপদের আভাস দেখেই রাত্তিরে চোরের মতো গিয়ে তার স্বামীকে ঘুষ দিয়ে পালিয়ে আসার নাম—ভোগ করা? তার হাত ধরে সমস্ত বিঘ্ন-বিপদ মাথায় নিয়ে সর্বনাশের অতলস্পর্শী গহ্বরে যদি নামতে পারতেন, তাহলেই তা ভোগের মর্যাদা পেত।

আমি। কিন্তু মজুরি পোষাত না।

কোনো উত্তর দিলে না সে।

বাতাসীর কথাই মনে পড়তে লাগল বার বার। শুনেছি, লোকটা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কোথায় গেল সে, কি হল তার সন্তানের?

সে। ভাল কথা, আপনি তো খুব মার্জিতরুচি লোক, ওই ছোটলোকের মেয়েটাকে ছুঁতে আপনার প্রবৃত্তি হল কি করে?

আমি। আমার মনের গুহায় যে অদম্য আদিম পশুটা বেঁচে আছে, টগর তাকে লোলুপ করে তুলেছিল, কিন্তু ধরা দেয়নি, শেষ পর্যন্ত হয়তো দিত, কিন্তু ঠিক সেই সময় মুরগি খাওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া হল, চলে যেতে হল তালুকপুরে, দেখা হল বাতাসীর সঙ্গে।

সে। টগর ধরা দিত না।

আমি। কেন?

সে। কারণ তার বলিষ্ঠ স্বামী ছিল একজন। সতেরো-আঠারো বছরের একটা ছোঁড়ার মধ্যে বলিষ্ঠতর সে কিছুই দেখতে পায়নি।

আমি। হাব-ভাবে ইঙ্গিতে তবে সে আমাকে অমন লোলুপ করে তুলেছিল কেন?

সে। লোলুপ করে মজা দেখছিল।

আমি। মজা দেখছিল! কেন? উদ্দেশ্যটা কি?

সে। উদ্দেশ্য বোধ হয় আত্মপ্রসাদ। বড় শিকারীরা অনেক সময় কাক-বগের দিকে গুলি ছোঁড়ে কাকবগের মাংসে তার লোভ আছে বলে নয়, হাতের লক্ষ্য ঠিক অব্যর্থ আছে কি না পরখ করবার জন্যে। তার আসল কাম্য বাঘ-সিংহ। আপনি তখন লোভনীয় ছিলেন না।

আমি। কিন্তু এত কথা জানলেন কি করে আপনি?

সে। আপনি নিজে জানেন না, যদিও সেটা স্বীকার করতে আত্মাভিমানে একটু ঘা লাগে আপনার। সেদিন শেয়ালদা স্টেশনে প্যাসেঞ্জারের ভিড় ঠেলে যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, সে আপনাকে ভালো করে চিনতেই পারলে না। সুট্‌কেস, হোল্‌ডল, গয়নার বাক্স, স্বামী-পুত্র -কন্যা নিয়ে ব্যস্ত সে। পূর্বস্মৃতিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল না কই তো!

আমি। আট বছর আগেকার কথা, তাই হয়তো—

সে। আট কেন, আটাশ বছর পরেও জ্বলজ্বল করত আপনার মুখখানা তার বুকের ভেতর, যদি সত্যিই সে আপনাকে ভালোবাসত কোনোদিন।

বিস্ময় বাড়তে লাগল আমার। কে এ? সত্যিই কোনো জাদুকরী নাকি?

আমি। আমার এত রকম দুষ্কৃতির খবর জেনেও তো আপনি একা এত রাত্রে আমার কাছে এসেছেন! আপনার সাহস আছে বলতে হবে।

মুচকি হাসলে একটু।

সে। আপনার সব খবর ভালোভাবে রাখি বলেই সাহস হয়েছে। বিলেতে যে সব 'ক্যাসুয়াল অ্যাফেয়ারে' লিপ্ত হয়েছিলেন, সেইগুলিই আমার ভরসা যদি বলি?

আমি। তার মানে?

সে। বহুবার টিকে নেওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ মারাত্মক রকম কিছু হবার সম্ভাবনা কম।

উত্তেজনাভরে উঠে বসতে গিয়ে মচকানো পা-টায় সমস্ত শরীরের ভার পড়ল, লাগল খুব। যন্ত্রণাটা বোধ হয় পরিস্ফুট হল চোখে মুখে।

সে। দার্জিলিং থেকে নামবার সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে না নামলেই পারতেন, ট্রেনের যথেষ্ট সময় ছিল। তাড়াতাড়িতে নামতে গিয়ে পা-টা মচকে ফেললেন শুধু শুধু।

মনে হচ্ছে, এ যেন জাদুরও সীমা অতিক্রম করেছে।

সে। ব্যাথাটা এখনও কমেনি?

আমি। না।

সে। মিনতি বেচারী সেঁক দেবার জন্যে তো কতবার এল কেতলি হাতে করে, আপনি আমলই দিলেন না তাকে! বেচারী!

কি বলব, চুপ করে রইলাম। তার চোখের কোণে একটা দুষ্টু হাসি উঁকি মারতে লাগল।

সে। চুপ করে আছেন যে?

আমি। কি আর বলব বলুন? আপনি বদ্ধপরিকর হয়ে এসেছেন আমাকে অপমান করবেন বলে, প্রতিবাদ করা নিষ্ফল, কেন এসেছেন তাও বুঝতে পারছি না। কেবল ভাবছি, কখন শেষ হবে!

সে। একটাও মিছে কথা বলেছি কি? সত্যি যা জানি তাই বলেছি, তাও অপরের কাছে নয়, আপনারই কাছে।

আমি। আর কত বাকী আছে?

সে। আপনাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ভাবছি, রাগ করবেন, না বিস্মিত হবেন!

আমি। রাগ করলে তা প্রকাশ করতে সঙ্কুচিত হব। আপনি অসঙ্কোচে যা খুশি করতে পারেন, যা ইচ্ছে বলতে পারেন, কারণ আপনি মহিলা। আমার সে সুবিধে নেই। কি বলবেন, বলুন?

সে। আপনার আমন্ত্রণেই আমার অস্তিত্ব এখানে সম্ভব হয়েছে।

আমি। আমার আমন্ত্রণে?

সে। আমন্ত্রণে না বলে 'তাগিদে' বললে আরও ঠিক হয়। বস্তুত আপনিই আমাকে জোর করে বসিয়ে রেখেছেন নিজের সামনে, অথচ সে কথাটা নিজেই ভুলে যাচ্ছেন।

আমি। বলেন কি! আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম? একটুও মনে পড়ছে না তো! মালতীকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম বটে, কিন্তু সে আসতে রাজী হল না।

সে। সে যে এখন মিসেস গুপ্ত, যখন তখন যেখানে সেখানে যেতে পারে কি সে, হলই বা রমেশবাবু আপনার বন্ধু!

আমি। থাক তার কথা, আপনার কথা বলুন। কবে আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম? ইদানীং আমার স্মৃতিশক্তি কম হয়ে গেছে তা ঠিক, কিন্তু তবু এত বড় একটা ব্যাপার তো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া আজ রাত্রে আর কাউকে নিমন্ত্রণ করতেই পারি না যে!

সে। ন্যান্সি যদি আসে?

আমি। কোন ন্যান্সি?

সে। এর মধ্যেই ভুলে গেছেন? পিকাডিলির হোটেলের সেই ওয়েট্রেস। মালতীর বাবা যখন আপনাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন, তখন যার উপার্জনে ভাগ বসিয়ে বিলাত-প্রবাসের শেষের দিন কটা কাটিয়েছিলেন, মনে নেই তাকে? সে হয়তো এখনও আপনার পথ চেয়ে আছে।

আমি। আমি তার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সে। সে কিন্তু টাকা চায়নি।

আমি। আপনি কে, বলুন, আপনি কে— ।

সে। বিশ্বাস করবেন? যদি বলি, আমিই সেই একমাত্র ব্যক্তি, যাক আপনি নির্বিচারে সহ্য করে এসেছেন এতকাল, যে আপনাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে, উদ্দীপ্ত করেছে, অবসন্ন করেছে—

আমি। তার মানে?

সে। মানে, যদি বলি, আমি আপনার অন্তরতম, বিশ্বাস করবেন? আজ সকালে মালতীর ঘরে সোফায় হেলান দিয়ে রবীন্দ্রকাব্য-পাঠের ফাঁকে ফাঁকে যখন মালতীকে দেখছিলেন, তখন আপনি মালতীকে দেখছিলেন না, আমাকেই দেখছিলেন।

স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে এল তার চোখের দৃষ্টি। আমি কি একটা বলতে গেলাম। আলো নিবে গেল হঠাৎ।

।। দশ।।

ধূ ধূ করছে মরুভূমি চারিদিকে। আরবের ঊষর মরুভূমি। ঊষর কিন্তু সুন্দর, ভীষণ কিন্তু মুগ্ধ করে। সমস্ত দিন অগ্নিবর্ষণ করে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তার স্বর্ণদীপ্তি জ্বলছে এখনও ক্ষুদ্র বৃহৎ বালু-গিরিশ্রেণীর শিখরে শিখরে। বেশিক্ষণ জ্বলবে না, এখনই নামবে অন্ধকার, গিরিশ্রেণীগুলির পূর্বসানুদেশে ছায়া ঘনাতে শুরু করেছে এর মধ্যেই। দিগন্ত পর্যন্ত যতদূর দেখা যায়, বালি ছাড়া আর কিছুই নেই—উঁচু নীচু ছোট বড় বালির পাহাড় কেবল। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উত্তালতরঙ্গসমাকুল একটা মহাসমুদ্র যেন মন্ত্রবলে বালুময় হয়ে গেছে। উত্তাল তরঙ্গ, উত্তাল কিন্তু গতিবিহীন, নীল স্বচ্ছ নয়, ধূসর অস্বচ্ছ। স্তব্ধ স্তম্ভিত মূর্তি। এই স্তব্ধতাও বেশিক্ষণ থাকবে না, আঁধি আসবে, আসবে প্রলয়ঙ্কর সাইমুন, অবলুপ্ত হয়ে যাবে গিরিশ্রেণী দেখতে দেখতে, আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবে। আবার শান্ত হবে সব, আকাশ নির্মল হবে, নবীন সূর্য নবসৃষ্ট গিরিরাজির উপর বর্ষণ করবে নবময়ুখমালা।

দূরে উটের সারি চলেছে। বিরাট আকাশের উদার পটভূমিকায় চলেছে বণিকের দল। অতি মনোরম দেখাচ্ছে। কবির চোখে যত মনোরম দেখায়, তার চেয়ে ঢের বেশী মনোরম দেখাচ্ছে আমার চোখে। শক্ত হয়ে উঠছে শরীরের পেশীগুলো, চঞ্চলতর হয়ে উঠছে শোণিতপ্রবাহ, চোখের দৃষ্টি স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করছে, তীক্ষ্ণ বর্শাটাকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরছি।.....উটের সারি চলেছে, বণিকের দল প্রবেশ করেছে আমাদের সীমানায় বিনা অনুমতিতে। মূল্য দিতে হবে, শুল্ক দিতে হবে, অমনই ছেড়ে দেব না। আমরা ধনী নই, বিলাসের কোলে লালিত আদুরে দুলাল নই,

আমাদের সম্বল শক্তি, সাহস, ক্ষিপ্রতা, নিষ্ঠুরতা। বেদুঈন আমরা, মরুচারী দস্যু। মরুভূমির মতোই শুষ্ক রুক্ষ তপ্ত নির্মম, মরুভূমির মতোই প্রসারিত করে দিয়েছি নিজেদের জীবন ওই দূর দিগন্ত পর্যন্ত। কোথাও বাসা বাঁধিনি, কোথাও আটকা পড়িনি। বাস করি তাঁবুতে, চারণভূমির সন্ধানে ঘুরে বেড়াই দিক হতে দিগন্তরে। মরুভূমিতেই আমাদের প্রাণ, মরুভূমিতেই আমাদের মরণ, এই আমাদের রাজ্য, এই আমাদের কবরস্থান। এখানে কারও প্রবেশ-অধিকার নেই। প্রবেশ করে কেউ যদি, মূল্য দিতে হবে, মূল্য আদায় করে নেব। বাহুর পেশীতে শক্তি আছে, বর্শাফলকে তীক্ষ্ণতা আছে।

আলোছায়া-খচিত মরুভূমির এই প্রদোষ-আলোকে তাই অশ্বারোহী বেদুঈন আমি ওই উটের সারির দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছি, সঙ্গীরা সবাই চেয়ে আছে। হঠাৎ দৃষ্টি-বিনিময় হল সকলের, ঘোড়ার লাগামে ঈশারা সঞ্চারিত হল, তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলাম, আকাশ জুড়ে বালি উড়ল। দেখতে দেখতে তাদের নিকটবর্তী হলাম, একপাল ক্ষুধিত নেকড়ের মতো ঘিরে ফেললাম তাদের। উটের উপর থেকে গুলি করে কে একজন, ক্ষেপে উঠলাম আমরা। শুরু হয়ে গেল সংঘর্ষ।

দৃশ্য বদলাল।

তাঁবুতে ফিরছি। সঙ্গে লুটের মাল, বন্দী-বন্দিনীর দল। বন্দিনী মাত্র একজন, সম্ভ্রান্তবংশীয় মিশরীয় রমণী বোধ হয় কোনো, মুখ দেখা যাচ্ছে না, মুখের সামনে দুলছে রেশমের ঘন-নীল জালিকা। মুখ দেখবার চেষ্টাও করিনি আমরা, ওকে চাই না, চাই অর্থ ওর বিনিময়ে। শেখ আজ খুশি হবেন খুব, অভিযান সফল হয়েছে। দলের মালিক কিন্তু ধরা পড়েনি, একজন নিহত বেদুঈনের ঘোড়া নিয়ে তীরবেগে সে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়, ধরা গেল না। কিন্তু তার অনুচরদের বন্দী করেছি, বেগমকেও। কাপুরুষ যদি না হয়, ফিরতেই হবে তাকে। প্রচুর অর্থ দিয়ে উদ্ধার করতে হবে এদের।

অন্ধকার রাত্রি.....দেহ ক্লান্ত। দূরে গাঢ়তর অন্ধকারপুঞ্জের মাঝখানে ছোট ছোট আলোকবিন্দু দেখা যাচ্ছে, ওয়েসিসের মাঝখানে আমাদের তাঁবু। এখানে কাল আর তাঁবু থাকবে না, এখানকার ঘাস নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

দৃশ্য বদলাল।

তাঁবুর ঠিক বাইরে বসে প্রকাণ্ড চামড়ার মশকে দুধ ঝাঁকাচ্ছে শেখের দুটি মেয়ে। দুজনেই নব-যৌবনা। আমাকে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একজনের মুখ, ঊর্ধ্বমুখী চোখের দৃষ্টিতে দপ করে জ্বলে উঠল খুশির আলো, আলোক বিচ্ছুরিত হল বিকশিত দন্তরাজি থেকে। সঙ্গিনী ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইছে দেখে সামলে নিলে নিজেকে। টকটকে লাল রুমালটা কপালে ফিতের মতো বাঁধা, আটকে রেখেছে কোঁকড়ানো চুলের রাশিকে। পরেছে কালচে-সবুজ রঙের মোটাসোটা কাপড়টা সর্বাঙ্গে আঁটসাট করে জড়িয়ে। পাড়ের উজ্জ্বল সবুজ, প্রখর লাল, সোনালী হলুদ অদ্ভুত দেখাচ্ছে আলো-আঁধারিতে। এত বেশী দুধ ঝাঁকানো হচ্ছে, সম্ভবত বেশী মাখনের

প্রয়োজন আজ। শেখ বোধ হয় অতিথি সৎকার করছেন। কফির সরঞ্জামও প্রস্তুত হচ্ছে তা হলে তাঁবুর ভিতরে।

দৃশ্য বদলাল।

তাঁবুর ভিতরে ফরাশ বিছানো হয়েছে। খেতে বসেছি আমরা। অর্ধপক্ক মাংস আর ধূমায়িত ভাত পরম তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছি। ইয়োরোপীয়ান পর্যটক এসেছেন একজন, শেখের আতিথ্য স্বীকার করেছেন আর একজন শেখের পরিচয়পত্র নিয়ে। অতিথির সম্বর্ধনাকল্পে ওসমান বাঁশিতে গজল ধরেছে, গোলাপী আতর মেশানো হচ্ছে গরম কফিতে, শেখ অতিথির সঙ্গে আলাপ করবার বৃথা চেষ্টা করছেন ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও। এমন সময় হঠাৎ একটা সোরগোল উঠল তাঁবুর পিছন দিকে, পরদার ওপারে মেয়েরা চীৎকার করে উঠল। বিদ্যুৎবেগে দাঁড়ালেন শেখ, নিমেষের মধ্যে হাত চলে গেল আবার নীচে, সঙ্গে সঙ্গে চকমক করে উঠল বাঁকা ছোরাখানা তাঁর মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তে, ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বেরিয়ে গেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে গেলাম। সেই পলাতক মালিক ফিরেছে, আমাদের ঘোড়াই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। সে এসেছে, ছোঁ মেরে তার বেগমকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

আমরাও ছুটলাম। সমস্ত রাত পশ্চাদ্ধাবন করলাম তার। দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল, আগুনের গোলার মতো সূর্য উঠল অগ্নিবর্ষণ করতে করতে। তবু ছুটছি। হঠাৎ তার ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ল একটা বালিয়াড়ির চড়াই ভাঙতে গিয়ে, ছিটকে পড়ল দুজনে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি গিয়ে হাজির হলাম। তার মুখের জালিকা খসে পড়েছে, আতঙ্কে ক্লান্তিতে অপরূপ হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি। আমি নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে আছি—এ যে মালতী আর রমেশ! প্রফেসার রমেশ গুপ্ত ও তার স্ত্রী মালতী দেবী।

"বাঁচাও আমাকে—"

মালতী আর্তনাদ করে উঠল।

বাঁচাব? কি করে? হিংস্র বেদুঈন আমি। ইচ্ছে হল অট্টহাস্য করে সে কথাটা জানিয়ে দিই তাকে। ও কিসের শব্দ? ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখি আকাশ অন্ধকার করে ঝড় আসছে, সাইমুন-দৈত্য ক্ষেপে উঠেছে সহসা। এল—এল—এসে পড়ল। বালির ঘূর্ণাবর্তে দিশাহারা হয়ে গেলাম, চোখে মুখে নাকে ভীমবেগে এসে লাগছে অসংখ্য বালুকণা নয়, অসংখ্য ছররা। দু-হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম মালতীরই পদপ্রান্তে।

।। এগারো।।

আলো জ্বলে উঠল।

নিগূঢ় রহস্যের মতো সে বসে আছে সামনে।

কোনো কথা বললে না।

আমি। রবীন্দ্রনাথের "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন" কবিতাটি পড়তে পড়তে সত্যিই আমি মরুভূমির স্বপ্ন দেখছিলাম আজ সকালে।

সে। কবিতাটির মতো স্বপ্নটাও পুঁথিগত।

আমি। তার মানে?

সে। মানে, ইংরেজী কেতাবে বেদুঈনদের বিষয়ে যা পড়েছেন, তাই ভাবছিলেন। আপনার কাছে রেড ইণ্ডিয়ান, এসকিমো, জাপানী, ইহুদী, বেদুঈন, সমস্তই হয় কোনো কেতাবের কথা, না হয় কোনো সিনেমার ছবি।

আমি। হলই বা—

সে। সুতরাং সব সময় সত্য নয়।

আমি। তাতেই বা ক্ষতি কি?

সে। ক্ষতি কিছু নেই। পরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আস্ফালন করা বা পরের দেখা স্বপ্নের চর্বিতচর্বণ করা আপনার মনের বিশেষ লক্ষণ, এই আর কি—অর্থাৎ সোফায় ঠেস দিয়ে যতটুকু হয়—

আমি। এ বক্রোক্তির অর্থ কি?

সে। অর্থ, সত্যের দিকে আপনার ততটা আগ্রহ নেই, যতটা আছে স্বপ্নবিলাসের দিকে। সত্যি আরবের মরুভূমিতে গিয়ে বেদুঈনদের সঙ্গে মিশে তাদের জীবনযাপন করতেন যদি, তাহলে আপনার অভিজ্ঞতা হয়তো অন্য রকম হত, আপনার স্বপ্নে ভিন্ন রকম বর্ণ-সমাবেশ করতে পারতেন, অর্থাৎ তা কতকটা আপনার নিজস্ব দর্শন হত।

আমি। কতকটা?

সে। কোনো জিনিস সম্পূর্ণ সমগ্ররূপে জানা সহজ নাকি? এই একই মালতীরই তো কত বিভিন্ন রূপ দেখলেন এই ক-বছরে, তার সবগুলোই আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, কিন্তু প্রত্যেকটি কত বিভিন্ন!

আমি। মালতীর কথা ছেড়ে দিন, পরের অভিজ্ঞতা যে সত্য নয়, এ কথা কি করে বলছেন আপনি?

সে। ঠিক বলেই বলছি। আপনি বুঝতে পারছেন না, তার কারণ প্রক্‌সি দেওয়ার যুগ এটা, সিনেমার নির্জীব পরদায় অলীক ছায়াচিত্রকে জীবনের সত্য চিত্র বলে ভুল করবার যুগ। আপনার দোষ নেই।

আমি। জ্ঞান বলে আমরা যা কিছু আহরণ করি, তার অধিকাংশই তো পরের অভিজ্ঞতা।

সে। পরের অভিজ্ঞতাকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যদি যাচিয়ে না নেন, তা হলে তা নিরর্থক। ঝালের সম্বন্ধে যদি সত্য জ্ঞান লাভ করতে চান, তাহলে তা পরস্পরের মুখে খেলে চলে কি?

আমি। কিন্তু বিজ্ঞানের বেলায় আমরা দেখছি যে, আমাদের পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা সত্য।

সে। বিজ্ঞান যে সব সত্য নিয়ে আলোচনা করে তা চিরন্তন সত্য, তা অবৈজ্ঞানিকের কাছেও প্রত্যক্ষ, ধরুন—আলো বা বিদ্যুৎ। থিওরি নিয়েই যত গোলমাল, আজকের থিওরি তাই কাল বাতিলও হয়ে যাচ্ছে। নূতন দ্রষ্টা পুরাতন সত্যের নূতন ব্যাখ্যা বার করছেন। ডারউইনের সঙ্গে যাঁরা একমত নন, তাঁদের দৃষ্টিও কম স্বচ্ছ বা তাঁদের যুক্তিও কম জোরালো নয়।

আমি। অধিকাংশের মতে ডারউইন কিন্তু এখনও—

সে। দেখুন, "অধিকাংশের মতে" এই বাক্যটা সত্যের বেলায় খাটে না। অধিকাংশ লোক বোকা, অধিকাংশ লোক স্বার্থপর, অধিকাংশ লোক অহঙ্কারী। তারা কোনো কথায় সায় দেয় হয় না বুঝে, না হয় স্বার্থের খাতিরে, কিংবা অহঙ্কারবশত। যিনি কৃচ্ছ্রসাধন করে তপস্যা করে সত্যের সন্ধান করেন, তিনি অধিকাংশের কথা মানবেন কেন? তাঁর কাছে তাঁর নিজের মতটাই একমাত্র সত্য, কারণ সে মত তিনি গঠন করেছেন পলে পলে কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে।

আমি। অধিকাংশ লোকের মত হলেই যে তা মূল্যহীন হতেই হবে, এ কথা স্বীকার করতে পারব না, মাপ করবেন।

সে। পারবেন কি করে, এটা ডেমোক্র্যাসির যুগ যে? আচ্ছা, মালতীকে আপনার কেমন লাগে, তা কি আপনি ভোট নিয়ে ঠিক করবেন? মালতীর সম্বন্ধে আপনার সত্য মত কি আর কারও সহানুভূতি বা বিরুদ্ধতার অপেক্ষা রাখে? রবি ঠাকুরের কোন কবিতাটা ভালো, তা ভোট নিয়ে ঠিক করলে আপনার মনের মতো হবে কি?

আমি। ওসব তো ব্যক্তিগত কথা।

সে। সত্যও ব্যক্তিগত জিনিস। আপনার কাছে যা পরম সত্য, অপরের কাছে তা পরম মিথ্যা। মালতীকে আপনার ভালো লাগে, কিন্তু পুরন্দর সেন একটুও পছন্দ করেনি তাকে।

আমি। তা জানি। পুরন্দর সেন কিন্তু ব্যতিক্রম, অধিকাংশ লোকেরই মালতীকে ভালো লাগে। রমেশ তো ওর কথা বলতে পেলে আর কিছু চায় না। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এত উচ্ছ্বাস আর কারও দেখিনি।

সে। সেইজন্যেই সন্দেহ হয়, কোনোখানে কিছু গলদ আছে।

আমি। কেন?

সে। শূন্যকুম্ভই শব্দ করে, পূর্ণকুম্ভ করে না। কুম্ভটা যে শূন্য, আজই তো আপনি তার প্রমাণও পেলেন চাক্ষুষ।

আমি। আপনি কি করে জানলেন?

সে। সমস্ত কথা যা করে জেনেছি।

আমি। কিন্তু মালতীর মুখ দেখে একদিনও মনে হয়নি যে—

সে। ভুলে যাবেন না, মালতী মেয়েমানুষ। তার মুখ দেখে তার বয়সটা পর্যন্ত আন্দাজ করতে পারেন না, তার মনের কথা টের পাবেন? তার লেখা চিঠি পড়ে তার মনের কথা বুঝতে পারেননি, মুখ দেখে পারবেন?

চিঠিখানার কথায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।

সে। চিঠিখানা সর্বদা সঙ্গে দিয়ে ঘোরার মধ্যে যে কুসংস্কার প্রচ্ছন্ন ছিল, একটা মাদুলি হাতে বেঁধে ঘোরার মধ্যে তার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। অথচ মায়ের কথাতেও আপনি মাদুলি পরতে রাজী হননি, আশ্চর্য লোক আপনি!

মালতী সম্পর্কে আলোচনা করবার ইচ্ছে নেই একেবারে। তাকে আমি মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে চাই। কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিলাম।

আমি। তর্কের আবর্তে কিন্তু একটা দরকারী কথা তলিয়ে গেছে।

হাসি চিকমিক করে উঠল তার চোখে।

সে। কি দরকারী কথা?

আমি। একটু আগে আপনি যা বলে নিজের পরিচয় দিলেন তা কি—

সে। অমনই বিশ্বাস করে বসে আছেন তো। উঃ, কি বিশ্বাসপ্রবণ মন আপনাদের! যত অবিশ্বাস কেবল ধর্মের বেলা। কিন্তু ধর্মপুস্তকও তো ছাপার হরপে বেরিয়েছে আজকাল।

আমি। আপনাকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

সে। চাণক্য পণ্ডিত মানা করে গেলে কি হবে, স্ত্রীলোকদের আর রাজপুরুষদের অবিশ্বাস করবার শক্তি বাঙালী-চরিত্রে নেই।

আমি। ঠাট্টা করবেন না, সত্যি করে বলুন, কে আপনি—

সে। সে কথা গোড়াতেই বলেছি, আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন?

আমি। কি?

সে। আমি জাদুকরী।

আমি। এ রকম জাদু কি সম্ভব এ দেশে?

সে। যে দেশে মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী এসে একটা রাজ্য জয় করে ফেলতে পারে, সে দেশে কি না সম্ভব! অত দূরে যাবার দরকার কি, এখুনি তো অসম্ভব ঘটনা ঘটল একটা, ঘটছে এখনও—

আমি। কি?

সে। ইতিপূর্বে আপনি আমাকে কখনও দেখেননি বলছেন, অথচ সেই আমি যেই বললাম, আমি আপনার অন্তরতম, অমনই সঙ্গে সঙ্গে আপনার নাড়ী চঞ্চল হয়ে উঠল। এর চেয়ে অদ্ভুত জাদু আর কী হতে পারে?

আমি। অপরিচিতা নন আপনি, যদিও ঠিক করতে পারছি না, কোথায় আলাপ হয়েছিল। তা ছাড়া, অদ্ভুত রকম ভালো লাগছে আপনার কথাবার্তা, তর্ক করছি শুধু তর্কের খাতিরে, আপনার সঙ্গে সত্যি সত্যি কোনো মতবিরোধ নেই, বরং আশ্চর্য রকম মিলই আছে।

সে। সর্বনাশ! আর তো তাহলে থাকা চলে না, উঠি এবার।

আমি। সে কি?

সে। আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার সঙ্গে সহজ আলাপের পথ আর সুগম থাকবে না।

আমি। কেন?

সে। রস-পিচ্ছিল হয়ে যাবে। আপনি আপনার ব্যর্থ জীবনের কাহিনী লিখুন। অনেকটা সময় নষ্ট করে দিয়েছি আপনার, যদিও সেটা আমার দোষ নয়, ডেকেছিলেন বলেই এসেছিলাম এবং ফের যদি ডাকেন আসতে হবে। লিখুন এখন, চললাম।

মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল এবং আমি কিছু বলবার আগেই খোলা দ্বার দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। বিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর লিখতে শুরু করলাম।

।। বারো।।

নিজের জীবন-কাহিনী লিখছি কেন? যদি আর কেউ এ কাহিনী পড়ে শিক্ষালাভ করে? আমি তো কত লোকের জীবন-কাহিনী পড়েছি, কী লাভ হয়েছে তাতে আমার? তবে লিখছি কেন? হঠাৎ কণ্ঠস্বর ভেসে এল দ্বারপথে—"লিখছেন মালতী পড়বে এই আশায়"—তার কণ্ঠস্বর, কিন্তু চেয়ে দেখলাম সে নেই। ভৌতিক কাণ্ড না কি! লিখতে বসে একটা জিনিসই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ক্রমশ। সত্যিই আমার জীবন সব দিক দিয়েই ব্যর্থ। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই আমার পরিচয় মানুষ, কিন্তু আসলে আমি পশু-মানুষ, তার বেশি এক ধাপও উঠতে পারিনি। পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার যে স্বাভাবিক শক্তি অন্যান্য পশুর আছে, তাও আমার নেই, তার জন্যেও প্রতি পদে অপরের করুণা ভিক্ষা করতে হয়েছে। ভাবছি এমন কেন হল? এই ব্যর্থতার মূল কারণ কি? আমাদের দেশে সকল ব্যর্থতার মূল কারণ অবশ্য একটি—আমরা পরাধীন জাতি। আমরা যা ভাবি তা বলতে পারি না, যা করতে চাই তা করতে পারি না, ক্ষুধায় অন্ন পাই না, অসুখে ঔষধ পাই না, মানুষের প্রধান সহায় যে শিক্ষা সে শিক্ষা আমরা পাইনি, তার বদলে পেয়েছি একটা ডিগ্রী, তার সঙ্গে খানিকটা অহমিকা এবং আদিম পশু-প্রবৃত্তিগুলোর বর্বরতাকে ঢাকবার জন্যে চটকদার একটা আবরণ। বস্তুত মনুষ্যত্ব লাভ করবার জন্যে আমরা স্কুল-কলেজে ঢুকি না, আহার-নিদ্রা-মৈথুনের অবিচ্ছিন্ন চর্চা করবার ন্যায়সঙ্গত সুযোগ পাওয়া যাবে বলেই ঢুকি। পাস করলেই চাকরি পাওয়া যাবে। একটা কান কেটে ফেললে যদি চাকরি পাওয়া যেত, দেশসুদ্ধ বাপ দেশসুদ্ধ ছেলের কান কেটে দিত বোধ হয়, স্কুল-কলেজে না ঢুকিয়ে।

যতদূর মনে পড়ে, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ জাতীয় বইগুলো ছাড়া আর কোনো বই আগাগোড়া পড়িনি, পড়বার দরকার হয়নি।

শেক্স্পীয়র, কালিদাস আমাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত থাকে, কিন্তু সে সব পড়বার দরকার হয় না, নোট পড়লেই চলে। শিক্ষকেরা ক্লাসে ইম্পর্ট্যাণ্ট বলে যে অংশগুলো চিহ্নিত করে দেন, তাই পড়লেই অনায়াসে পাস করা যায়। পাস কবাই উদ্দেশ্য। পাস করার জন্যে চুরি করতে হয়, ঘুষ দিতে হয়, প্রাইভেট ট্যুশনির ব্যবস্থা করতে হয়, শিন্নি মানতে হয়, সুযোগ থাকলে পরীক্ষকদের খোশামোদ করতে হয়, করতে হয় না কেবল পাঠ্য বিষয়টা আয়ত্ত করবার চেষ্টা। করতে গেলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। যে সব ছেলে বোকার মতো আগা-গোড়া সব পড়তে যায়, তারা পরীক্ষায় প্রায়ই ভালো করে না। বেচারা সন্তোষের কথা মনে পড়ে, হুমড়ি খেয়ে সে মোটা মোটা বইগুলো আগাগোড়া পড়ত। পাস করেছিল কিন্তু কোনোক্রমে। যে সব চালাক-চতুর ছেলেরা মাস্টারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের তোয়াজ করে নোট আর সাজেশন সংগ্রহ করে বেড়াত, তারা ঢের বেশি নম্বর পেয়েছিল সন্তোষের চেয়ে। আমি আই, এ-তে ফার্স্ট হয়েছিলাম। তার কারণ, যে যে প্রশ্নগুলো আমি তৈরি করতে পেরেছিলাম ঠিক সেইগুলোই পরীক্ষায় পড়েছিল। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে, তাদের ছোট করবার জন্যে আমি এ কথা লিখছি না, আমার জীবনে যা ঘটেছিল, তাই শুধু লিখছি। এই ফার্স্ট হওয়াটাই আমার জীবনের কাল হল। ফার্স্ট হয়েছিলাম বলে মালতীদের পরিবারে আমল পেয়েছিলাম এবং

বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মালতীর বাবা তাঁর একমাত্র মেয়ের পাত্র হিসেবে আমাকে মনোনীত করে বিলেত পাঠিয়েছিলেন আই. সি. এস. পড়বার জন্যে। বিলেত যাবার আগে মালতীকে বিয়ে করে গেলেই বোধ হয় ভালো হত, কিন্তু উপায় ছিল না, আইনে বাধল। আমি তখনও আইনের চক্ষে মাইনার, যদিও তখন আমার জীবনে টগর বাতাসী এসে গেছে। মাইনার ব্যাপারের একটু ইতিহাসও আছে অবশ্য। আমি যখন বিলেত যাই, তখন আমার আসল বয়স তেইশ, কিন্তু কাগজে কলমে আমি তখনও একুশে পড়িনি, স্কুলে ভর্তি করবার সময় আমার মামা কিছু হাতে রেখেছিলেন ভবিষ্যৎ ভেবে। কিন্তু ভবিষ্যৎটা যে এমন হবে, তা তখন কে জানত!...

..."আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান তার বদলে আমি চাইনি কোনো দান।" কে গাইছে এত রাত্রে? ঠিক যেন মালতীর গলা। মালতীকে দেখতে পাচ্ছি যেন—হ্যাঁ, মালতীই তো, আবেশময় চক্ষু দুইটি অর্ধনিমীলিত, পিয়ানো বাজাচ্ছে....

না, মালতীর কথা ভাবতে শুরু করলে লেখা এগুবে না। আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম বটে, কিন্তু পড়াশোনার দিকে আমার মন ছিল না। বয়োবৃদ্ধিব সঙ্গে তীব্রভাবে যে জিনিসটা মনে জাগছিল, তা পাঠস্পৃহা নয়, যৌনক্ষুধা। এই সুস্থ স্বাভাবিক ক্ষুধার আহার সমাজ আমাকে দেয়নি, এ ক্ষুধাকে দমন করবার কৌশল পিতামাতা, শিক্ষক, বন্ধু কেউ আমাকে শেখায়নি, বাতাসী টগর মালতীরা আমাকে নিয়ে যা খুশি করেছে, আমি বাধা দিতে পারিনি, বাধা দিতে চাইনি। কামনার জয়গান শুনেছি সাহিত্যে, কামনার মূর্ত প্রকাশ দেখেছি আর্টে, ক্ষুধার অনলে ইন্ধন যুগিয়ে ক্ষুধিতকে পাগল করে তুলেছে এরা। খাতার উপর পড়ল একি? দুটো টিকটিকি—একটা ছোট, একটা বড়। সরসর করে দেওয়ালে গিয়ে উঠল, নিস্পন্দ হয়ে দেওয়ালে লেগে রইল দুটোই কিছু দূরে দূরে, দুটোরই চোখের দৃষ্টি পলকহীন।

হ্যাঁ, কি লিখছিলাম? ক্ষুধিতকে পাগল করে তুলেছিল। সত্যিই হিতাহিতজ্ঞান ছিল না, কেবল মনে হত, 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব'। কিন্তু যে বলিষ্ঠ পৌরুষ থাকলে ওই সকাম বৈরাগ্য জীবনে খাপ খায়, সে পৌরুষ, সে শক্তি ছিল না আমার। থাকবার কথাও নয়। কারণ প্রতি মাসে এক গাদা অর্থ ব্যয় করে হোস্টেলের অখাদ্য খেয়ে যে জিনিস লাভ করবার জন্যে আমরা দল বেঁধে উদ্বাহু হয়ে ছুটেছিলাম, তা শক্তিও নয়, পৌরুষও নয়, তা ডিগ্রী।

হাপরের মতো শব্দটা শুনতে পাচ্ছি। হাসছেন গৌরীশঙ্কর রায়—"আজকালকার ছেলেগুলো, বোয়েছ করুণা, যাকে বলে হ্যাংলা।—হে-হে।"

আমার বাবার সঙ্গে গৌরীশঙ্কর রায়ের বন্ধুত্ব আছে। তাঁরা দুজনে একত্রিত হলেই একালের ছেলেদের মুণ্ডপাত করেন, মাঝে মাঝে তারিণী মিত্তির আর জগৎ লাহিড়ীও জোটেন এসে। সকলেরই বদ্ধ ধারণা, সেকালে তাঁরা সবাই রত্ন ছিলেন, একালে আমরা ঝুটো কাচ। আমরা যে ঝুটো কাচ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সে কথা আমার চেয়ে বেশি কেউ উপলব্ধি করছে না এই মুহূর্তে। মনে হচ্ছে, আমি যেন এই যুগের আন্তরিকতাবর্জিত মেকি আধুনিকতার অতি উজ্জ্বল প্রতীক। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছি, কাগজে ছবি ছাপা হয়েছে, জাতিভেদ

মানিনি, দেশী কুসংস্কার বর্জন করে বিদেশী কুসংস্কার অর্জন করেছি, বিলেত গেছি, সেখানে নিজের ভাবপ্রবণতাবশত কোনো বিদ্যা বা ডিগ্রী আহরণ করতে না পেরে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা সম্বন্ধে অবজ্ঞা এবং যে কোনো ডিগ্রী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ-শোভন ঔদাসীন্যের ভান করেছি, নিজের অসংযত কামনাকে সংযত করবার চেষ্টা করিনি একটুও, বরং তার গুণগান করেছি শতমুখে—

কিসের শব্দ হচ্ছে? ঝড় আসছে নাকি? ও, মিনতি স্টোভ জ্বালছে বোধ হয় দোতলায়। কি বিরক্তিকর একটা আপদ এসে জুটেছে বাড়িতে। বাবাকে রাত তিনটের সময় উঠে চা করে দেয় বলে বোধ হয় বাবা খুব খুশী। যে কোনো একটা চাকরানীকে মাইনে দিলেই তো সে ভোরে এসে চা করে দেবে, সেই গৃহকর্মনিপুণাকে বিয়ে করতে হবে সেইজন্যে—

হ্যাঁ কি লিখছিলাম? বিলেতে গিয়ে কিছু করিনি। স্বোপার্জিত অর্থে নয়, মালতীর বাবার টাকায় মদ খেয়েছি, খানা খেয়েছি, রিভিয়েরা গেছি, মন্টি কার্লো গেছি, প্রেম কিনেছি, প্রেম বিলিয়েছি, ফ্যাশনেবল দোকানের দামী স্যুট গায়ে চড়িয়ে ন্যান্সির কাছে নিজেকে বিবাগী রাজপুত্র বলে প্রচার করেছি। মাঝে মাঝে স্বদেশপ্রেমও জেগেছে। ভারতবর্ষের হিতার্থে সভা-সমিতির আয়োজন করে দু-চার জন সাহেবকে ডিনার খাইয়েছি এবং প্রাণপণে চেষ্টা করেছি, সে খবরটা যাতে আমার নামসুদ্ধ (এবং সম্ভব হলে ছবিসুদ্ধ) ছাপা হয় স্বদেশ-বিদেশের কাগজে, শ্রমিকবাদ ধনিকবাদ নাৎসিবাদ নিয়ে বাদানুবাদ করেছি যেখানে সেখানে, এমন কি মদের ঝোঁকে সঙ্কল্পও করেছি মাঝে মাঝে যে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে হবে। এ দেশের যে সব কর্মী সর্বস্ব বিসর্জন করে আজীবন দেশসেবা করছেন, তাঁদের 'শ্যাবি' কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করেছি ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে, যাঁরা বিলেত ফেরত নন, তাঁদের প্রতি একটা অনুকম্পার ভাব পোষণ করেছি মনে মনে বাইরে অতি-মার্জিত মোলায়েম মুখশোভা রক্ষা করে এবং এই সমস্তটার ওপর অতি-আধুনিকতার লেবেল মেরে সাহিত্য সমাজ রাজনীতি সব জিনিসকে ব্যঙ্গ করেছি স্বাধীন-চিত্ততার ছদ্মবেশে, গোপনে গোপনে কিন্তু একে ওকে তাকে ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করেছি একটা মোটা মাইনের চাকরির। বন্ধুদের মধ্যে রাজপুরুষদের নিন্দে করেছি, সফলকাম বিলেত-ফেরতদের টিটকিরি দিয়েছি, কিন্তু তাদেরই দ্বারে দ্বারে ধরনা দিয়ে ফিরেছি বুভুক্ষু কুকুরের মতো উচ্ছিষ্ট প্রসাদের আশায়।

এই আমার সত্য চিত্র, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; কিন্তু যে সব প্রবীণ আমাদের দেখে নাক সেঁটকান, তাঁরা আমাদের চেয়ে কী হিসেবে ভালো? তাঁরা কি আমাদেরই পুরাতন সংস্করণ নন? তফাতের মধ্যে এই—তাঁরা পুরাকালে যে সুবিধে ও সুযোগ পেয়েছিলেন, রাজনৈতিক কারণে আমরা তার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁরা সবাই কি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন? তাঁরাও তদানীন্তন ফ্যাশনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরাও হুজুগে উন্মত্ত হতেন, তাঁরাও চাকুরিপ্রার্থী ছিলেন, তাঁদের আত্মম্ভরিতা বিশ্বাসঘাতকতা নীচতা নিষ্ঠুরতার কাহিনী ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যায়। আমাদের মতো তাঁদেরও পদস্খলন হত। আমরা অর্থহীন বলে ভাঁওতার জোরে হঠাৎ-স্বাধীন মেয়েদের সঙ্গে প্রায়-নিখরচায় প্রণয়-চর্চা করি; তাঁরা অর্থবান ছিলেন বলে টাকার জোরে বেশ্যাবাড়ি যেতেন এবং বহু-বিবাহ করতেন। সেকালের ছেলেরা ডেভিড হেয়ারের বাড়ির সামনে ভিড় করত, ডেভিড হেয়ারের পালকির পিছনে ছুটত;

একালের ছেলেরা সিনেমার সামনে ভিড় করে, সিনেমা-স্টারের সিনেমা-ডিরেক্টারের পিছনে ছোটে। কারণ কিন্তু এক—হঠাৎ আলোর ঝলকানি; উদ্দেশ্যও এক—যদি মনের খোরাক এবং পেটের খোরাক জোটে। বর্ষাকালে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বাললে যেমন দলে দলে নানারকম পোকা ছুটে আসে, আমরাও তেমনই ছুটে এসেছি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বর্তিকা লক্ষ্য করে। এই বর্তিকার নাম সেকালে ছিল—শিক্ষা, একালে তার অনেক নাম হয়েছে, দুটো যুগের বাইরের চেহারায় খানিকটা অমিল আছে, একই টাইফয়েড রোগীর ফার্স্ট উইক আর থার্ড উইকের চেহারায় যেমন অমিল থাকে। সেকালের লোকে ডিগ্রী পেলেই এবং অনেক সময় না পেলেও চাকরি পেত, তাই বিয়ে-থা করে সুখে-স্বচ্ছন্দে কতকটা স্বাভাবিক জীবন যাপন করবার সুযোগ পেত। একালে সে সুবিধে নেই, ডিগ্রী-আলেয়া একালের ছেলেদের যেখানে নিয়ে গিয়ে হাজির করছে, তা পঙ্কিল জলাভূমি, বিষ-বাষ্পে পরিপূর্ণ। দমবন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছে তারা। প্রবীণরা তাদের উদ্ধারের উপায় করেন না, ভেবে দেখেন না যে, তাদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ তাঁরা নিজেরাই। ছেলেদের নৈতিক চরিত্র গঠন করবার কোনও চেষ্টা কখনও করেননি তাঁরা, ঠেলে ঠেলে কেবল স্কুল-কলেজে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা পাস করবার জন্যে চাকরির স্বপ্ন দেখতে দেখতে। সে স্বপ্ন সফল হচ্ছে না একালে, সুতরাং একালের ছেলেদের গালাগালি দিচ্ছেন সবাই মিলে। এটাও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। আসল গলদ যে কোথায়—

খুট করে শব্দ হল। চেয়ে দেখি, দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

সে। ফের ডাকছেন আমাকে?

আমি। কখন ডাকলাম!

সে। এখুনি। আর একটা ছবি দেখুন তাহলে। আলো নিবে গেল।

।। তেরো ।।

গং গং গং গং গং—

উপাসনার ঘণ্টা বাজছে। পূর্বাকাশে উষার রক্তিম আভা দেখা যাচ্ছে সামান্য, রাত্রির অন্ধকার এখনও সম্পূর্ণ যায়নি। ছাত্রাবাসের ছোট ছোট ঘরগুলি আলোকিত হয়ে উঠছে একে একে। শিক্ষকদের ঘরগুলিও। গং গং গং গং—বেজে চলেছে ঘণ্টা গম্ভীর নির্ঘোষে, আহ্বান করছে সকলকে উপাসনা-মন্দিরে। তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে জল দিয়ে সকলে সজ্জিত হচ্ছে নীরবে, যে সব বালকের ঘুম ভাঙেনি, শিক্ষকেরা তাদের নিদ্রাভঙ্গ করছেন, তাও নীরবে। নীরবতাই এখানকার নিয়ম। সকলেই মিতবাক্ মৃদুকণ্ঠ। বিনা প্রয়োজনে কথা বলা নিষেধ, কোলাহল করা একেবারে নিষেধ।.....সজ্জিত হচ্ছে সবাই। খদ্দরের পরিধেয়, খদ্দরের উত্তরীয়—সব স্বহস্তে প্রস্তুত। ছাত্র, অধ্যাপক, আচার্য, পরিচালক সকলেরই এক সজ্জা—শুভ্র খদ্দর। এখানে পরিচ্ছদ-বৈষম্য নেই। আহার পরিচ্ছদ ধনী দরিদ্র সকলেরই সমান। গং গং গং গং গং—বেজে চলেছে—ঠিক পনেরো মিনিট বাজবে। এর মধ্যে সকলকে পৌঁছতে হবে উপাসনা-মন্দিরে।

উঠলাম। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে কুশাসন এবং উত্তরীয় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আমিই পরিচালক, নিয়ামক, স্রষ্টা—তাই আমি সর্বাপেক্ষা বেশি নিয়মানুবর্তী, সর্বাপেক্ষা বেশি নিষ্ঠাবান, সর্বাপেক্ষা বেশি নীরব।

চলেছি। শেষ রাত্রের স্বল্প অন্ধকারে শ্বেত-খদ্দরমণ্ডিত মূর্তিগুলিও চলেছে আমার আশেপাশে নীরবে। পাঁচ বছরের শিশু ষাট বছরের শিক্ষক—সবাই। উপাসনা-মন্দির জ্ঞাঁকজমকশালী হর্ম্য নয়, মাটির ঘর, কিন্তু প্রশস্ত। সকলে নীরবে গিয়ে উপবেশন করলাম স্ব স্ব আসনে। চোখ বুজে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। সহসা আচার্যের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার আদর্শ, হে ভগবান, শক্তি দাও, আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি।

মনে মনে আবৃত্তি করলাম সকলে। স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। চোখ বুজে বসে রইলাম আরও খানিকক্ষণ। ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার আদর্শ—ভালো করে চিন্তা করতে লাগলাম এর অর্থ। আবার আচার্য বললেন, ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার আদর্শ, হে ভগবান, শক্তি দাও, আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি।

পুনরায় আবৃত্তি করলাম মনে মনে, উপলব্ধি করলাম প্রার্থনার তাৎপর্য। স্তব্ধতা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে এল। তৃতীয় বার আচার্য বললেন, ভারতবর্ব আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার আদর্শ, হে ভগবান, আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি। তৃতীয় বার আমরা আবৃত্তি করলাম। প্রণাম করলাম তারপর। প্রণামান্তে চোখ খুলে চেয়ে দেখলাম, অন্ধকার স্বচ্ছ হয়েছে। সম্মুখে আচার্য দাঁড়িয়ে আছেন—সৌম্য শান্ত সমাহিত মূর্তি। যতীন।

উপাসনার পর ব্যায়াম, তারপর স্নান, তারপর পড়াশোনা।

উপাসনা-মন্দির থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে ছাত্ররা ব্যায়ামের জন্য সারি সারি দাঁড়াল। প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেল।

আমিও আমার ঘরে গিয়ে ব্যায়াম করব, স্নান করব। তারপর আমাকেও অধ্যয়ন করতে হবে অধ্যাপনা করবার জন্যে।

দৃশ্য বদলাল।

জাপানী কবি নোগুচির বংশধরের সঙ্গে আলাপ করছি। তিনি এসেছেন আমাদের প্রতিষ্ঠান দেখতে। অঙ্গে জাপানের জাতীয় পরিচ্ছদ, মুখে স্মিত স্নিগ্ধ হাসি। চমৎকার বাংলা শিখেছেন।

"ভারি চমৎকার লাগল প্রতিষ্ঠানটি। সবচেয়ে ভালো লাগছে এখানকার নীরবতা। সবই হচ্ছে, অথচ কোনো গোলমাল নেই।"

স্মিত মুখে চুপ করে রইলাম। বলতে ইচ্ছে হল যে কলরব করবার সাধনা আমাদের নয়। নীরবতাই ভারতের ধর্ম। ইচ্ছে হল, কিন্তু বললাম না। অকারণ কথা বলা নিয়মবিরুদ্ধ।

প্রশ্ন করলেন তিনি, "কত বছর বয়সের ছেলে নেন আপনারা?"

"পাঁচ বছর, বড় জোর ছ'বছর।"

"ক' বছর থাকতে হয় এখানে—"

"বারো বছর।"

"কি কি পড়ানো হয়?"

"প্রয়োজনীয় সবই। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, প্রাথমিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু—"

"এ ছাড়া আরও শুনেছি অনেক জিনিস শেখান আপনারা?"

"নিজের হাতে চাষ করতে, রান্না করতে, সুতো কাটতে, কাপড় বুনতেও শিখতে হয়। এ ছাড়া পশুপালন শিখতে হয়, গৃহশিল্পও শেখানো হয় কিছু কিছু।"

"প্রত্যেকের স্বাস্থ্য বেশ সুন্দর দেখলাম।"

"ব্যায়াম করা এখানে অবশ্যকর্তব্য—"

"পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে শুনেছি খুব কড়াকড়ি আপনাদের নাকি?"

"নিজেরা না পড়ে কোনো বই আমরা ছেলেদের হাতে দিই না। বইটি নির্ভুল এবং আমাদের আদর্শ অনুযায়ী হওয়া চাই—"

"আপনাদের আদর্শ কি?"

"বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ তৈরি করা—"

"নাচ-গানের চর্চা নেই?"

"না—"

"নাচ-গান কিন্তু সভ্য সমাজে শিক্ষার একটা অঙ্গ—"

"প্রতিষ্ঠান-জীবন শেষ করে তারা ওসব শিখতে পারে। যদি কারও মধ্যে আমরা সুকুমার-শিল্প-প্রতিভা লক্ষ্য করি, তাহলে প্রতিষ্ঠান-জীবন শেষ হবার পর সমাজে ফিরে গেলে যাতে সে সেই বিষয়টির চর্চা করতে পারে, তার ব্যবস্থা করে থাকি। প্রতিষ্ঠান-জীবনে ওসব করলে চিত্তবিক্ষেপ হবার সম্ভাবনা—"

"আপনাদের প্রতিষ্ঠান কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়?"

"না। আমাদের ছাত্ররা পরীক্ষা দেয় না।"

"তারা কৃতবিদ্য হল কি না, কি করে বোঝেন?"

"এক-একজন অধ্যাপকের অধীন পাঁচজন করে ছাত্র বারো বছর থাকে। অধ্যাপক সদাসর্বদা তাদের সঙ্গে থাকেন, অধীত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, কোনো ছাত্র কৃতবিদ্য হয়েছে কি না তা তিনি অনায়াসেই বোঝেন। তাঁর লিখিত অভিমতই এখানকার সার্টিফিকেট—"

"কিন্তু তা নিয়ে বাইরে চাকরি পাওয়া যাবে কি?"

"প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করবার সময় শপথ করতে হয়, কখনও চাকরি করব না—"

"প্রত্যেক ছাত্রের জন্য মাসিক কত করে নেন?"

"কিছু নিই না। ছাত্রদের পরিশ্রমই আমরা মূল্যস্বরূপ মনে করি—"

"বুঝলাম না ঠিক—"

"আমাদের ছাত্ররাই এখানকার সব্‌জিবাগানের, তাঁতের, পশু-বিভাগের, ফ্যাক্টরির, শিল্পশালার কর্মী। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যেক বিভাগে প্রথমে কিছুদিন কাজ শিখতে হয়, তারপর কাজ করতে হয়। সুতরাং তারা তাদের পরিশ্রমের পরিবর্তেই প্রতিষ্ঠান থেকেও শিক্ষা, আহার ও বাসস্থান পায়।"

"আপনাদের আয় কি?"

"প্রতিষ্ঠান-কর্তারা সকলেই অবিবাহিত কর্মী। তাঁরা তাঁদের সমস্ত উপার্জন এখানে দিয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্টরি প্রভৃতি থেকেও কিছু আয় হয়—"

"বাইরে থেকে চাঁদাও পান বোধ হয়—"

"না, কারও সাহায্য আমরা নিই না। নিলে দাতার সঙ্গে বাধ্যবাধকতা হবার সম্ভাবনা। টাকার জন্যে আমরা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ নষ্ট করে দিতে পারি না। আমাদের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানটি এমনভাবে করা, যাতে তার নিজের উপার্জনেই নিজের খরচ চালাতে পারে। যে সব অবিবাহিত কর্মী তাঁদের সমস্ত উপার্জন দিয়ে এটার আরম্ভ করেছেন, তাঁরা চিরকাল থাকবেন না—"

"ব্রহ্মচর্য পালন নিশ্চয় এখানকার নিয়ম—"

"হ্যাঁ, ছাত্রজীবনে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান-জীবন শেষ হলে প্রত্যেক ছাত্রকে বিয়ে করতে হবে—এই নিয়ম—"

"আপনাদের কোনো ছাত্রী তো দেখলাম না!"

"আমরা কো-এডুকেশনের পক্ষপাতী নই। ছাত্রদের চরিত্র-গঠনই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কো-এডুকেশন থাকলে তা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। স্ত্রীশিক্ষার আমরা পক্ষপাতী, কিন্তু সেটা আলাদা প্রতিষ্ঠানে হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি—"

ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ—ফ্যাক্টরির বাঁশি বাজছে। প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ডাকছে।

দৃশ্য বদলাল।

পাগলের মতো প্রত্যহ প্রত্যেক খবরের কাগজের কর্মখালি বিজ্ঞাপন খুঁজে বেড়াচ্ছি। সত্য মিথ্যা নানা রকম প্রশংসা-পত্র সংগ্রহ করছি নিজের বিষয়ে এবং সেগুলো কপি করে প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে পাঠাচ্ছি। খটখট খটখট দ্রুতবেগে টাইপ রাইটার চলছে। স্বপ্নে জাগরণে এক চিন্তা, চাকরি একটা যোগাড় করতে হবে। যোগাড় করতেই হবে যেমন করে হোক।

দৃশ্য বদলাল।

গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহর, রোদে পুড়ে যাচ্ছে চারিদিক। হ্যাট কোট প্যান্ট পরে পিতৃবন্ধু মিস্টার হেরিংটনের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি, বাবাকে লুকিয়ে। তাঁর হাতে ভালো একটি চাকরি আছে।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল আইরিশ টেরিয়ার একটা, লিসার কথা মনে পড়ল হঠাৎ, তারও একটা আইরিশ টেরিয়ার ছিল।.... চাপরাসী এল, কার্ড দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে, শেকলে বাঁধা কুকুরটা চিৎকার করতে লাগল। একটু পরে চাপরাসী ফিরল।..... "আভি মোলাকাৎ নেহি হোগা হুজুর—"

দৃশ্য বদলাল।

সরু গলি, তার মধ্যে প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি। বৃষ্টি পড়ছে, আশপাশের বাড়ির ছাত থেকে জল পড়ছে হু হু করে নল দিয়ে, আমার সাহেবী পোশাক কাদায় জলে মাখামাখি হয়ে গেছে;

হেমন্তবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছি; হেমন্ত দাশগুপ্ত একজন মাতব্বর লোক; তিনি যদি চেষ্টা করেন, সদাগরী আপিসের চাকরিটা হয়ে যায় আমার। ভয়ানক তোড়ে বৃষ্টি এল, কড়া নাড়ছি প্রাণপণে....

।। চোদ্দ।।

আলো জ্বলে উঠল।

বিচিত্র হাসির আভা ফুটে বেরুচ্ছে তার চোখ-মুখ থেকে। মেঘাবৃত চাঁদ যেন।

সে। ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ কেউ কখনও চাকরি করবে না, কিন্তু তার হবু প্রতিষ্ঠাতা চাকরির জন্য ছুটে বেড়াচ্ছিলেন কেন?

আমি। ব্যক্তিগত লাভের আশায় নয়, ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই। আশা করেছিলাম--

সে। জানি আমি। আশা করেছিলেন যে, নিজের জন্যে দৈনিক মাত্র দু পয়সা খরচ করে বাকীটা ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্যে জমাবেন।

আমি। নিশ্চয়।

সে। অর্থাৎ চুরি-নিবারণী-প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্যে অর্থ-সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিলেন চুরি করে!

আমি। চুরি তো চিরকাল করছি। একটা চৌর্যকে ভালো কাজে লাগাব ভেবেছিলাম, এতে ঠাট্টা করবার কিছু তো নেই।

সে। ঠাট্টা করছি না, বিস্মিত হচ্ছি।

আমি। আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, অনুমতি দেন তো মনে করিয়ে দিই আর একবার।

সে। দিন—

আমি। আপনিও আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন। আমার হাতে বেশি সময় নেই, আমার জীবন-কাহিনীর অনেকখানি লিখতে বাকী এখনও।

সে। আপনিও একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, অনুমতি দেন তো মনে করিয়ে দিই।

সে। আপনি ডেকেছেন বলেই আমি এসেছি।

আমি। মনে পড়ছে না, ডেকেছি কি না!

সে। সব সময়ে সব জিনিস মনে পড়ে না আমাদের। যে অক্সিজেন আপনার প্রাণবায়ু, তার কথা কতটুকু মনে পড়ছে আপনার এখন? সে যদি তার আধুনিক মলিকিউলার মূর্তি পরিগ্রহ করে বৃহদাকৃতি হয়ে দেখা দেয়, চিনতে পারবেন তাকে? হয়তো ভয়ে আঁতকে উঠবেন।

আমি। অক্সিজেন মলিকিউল-মূর্তি পরিগ্রহ করে আসবে!

সে। এ আলট্রা মডার্ন যুগে কিছুই অসম্ভব নয়।

আমি। ওসব আজগুবি চিন্তা করবার সময় নেই এখন আমার।

সে। ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যে কল্পনাটা করেছিলেন, তার বেশি আজগুবি এটা?

আমি। কে আপনি বলুন—

সে। পরিচয় দিতে ভয় করে।

আমি। কেন?

সে। হঠাৎ সংযম হারালে রাত দুপুরে আপনার মতো উন্মত্ত পুরুষের সঙ্গে পেরে উঠব না আমি। একটু আগে ঠাট্টার ছলে সামান্য একটু আভাস দিয়েই বুঝেছি আপনার দৌড় কতখানি।

আমি। আমার দৌড় কত, তা আমার চেয়ে বেশি কে আর জানে বলুন? কিন্তু মসজিদ পর্যন্ত এতবার দৌড়েছি যে, মসজিদের সম্বন্ধে মোহটা কেটে গেছে।

সে। সত্যি? তাহলে মালতীকে সকালে অত পীড়াপীড়ি করছিলেন কেন, লুকিয়ে আজ রাত্রে আপনার কাছে আসবার জন্যে?

আমি। কারণ, অনুভব করছিলাম, সে আমার এই অসম্ভব প্রস্তাবটার জন্যে মনে মনে ক্ষুধিত হয়ে আছে অনেক দিন থেকে।

সে। ও, ক্ষুধিতের প্রতি অনুকম্পা তাহলে, আর কিছু নয়? কিন্তু—

ইতস্তত করে থেমে গেল সে, দৃষ্টি আনত হল, চকিতে আড়চোখে চাইলে একবার আমার মুখের পানে, ছোট্ট একটি হাসি উঁকি দিতে লাগল অধরপ্রান্তে।

আমি। কি, বলুন?

সে। কিছুক্ষণ আগে সঙ্কোচবশত বলতে পারিনি কথাটা। বলেছিলাম, কিন্তু ঘুরিয়ে বলেছিলাম।

আমি। কথাটা কি?

সে। একটু আগে আমি বলেছিলাম যে, আপনি প্রফেসার গুপ্তের ল্যাবরেটরি থেকে ফেরবার সময় এত অন্যমনস্ক ছিলেন যে, ঘোরানো সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করবার কথা মনে ছিল না আপনার। কিন্তু সত্যিই কি আপনি অন্যমনস্ক ছিলেন?

আমি। অর্থাৎ কি বলতে চান?

সে। একাগ্রচিত্তে কি কামনা করেননি যে, মালতী আসুক, এখনও কি প্রত্যাশা করছেন না তার আগমন? দরজা খুলে রাখাটা সত্যিই কি নিছক অন্যমনস্কতা?

আমি। মাপ করবেন, মালতী সম্পর্কে আমি কোন কথা আলোচনা করতে চাই না কারও সঙ্গে। আপনার নিজের পরিচয়টা দিন যদি বাধা না থাকে।

সে। বললাম তো, ভয় করে বলতে।

আমি। দেখুন, স্ত্রীলোক নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি জীবনে, সুতরাং কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, সত্যি যদি আপনার ভয় করত তাহলে এত রাত্রে আপনি আসতেন কি আমার কাছে এমন ভাবে? বুঝতে পারছি আমার পিছন পিছনই এসেছেন আপনি।

সে। উঃ, কি ভীষণ আত্মসংযম আপনার, প্রশংসা না করে পারলাম না।

আমি। কেন?

সে। সব কথা জেনেও এতক্ষণ স্থির হয়ে আছেন!

আমি। কি কথা জেনে?

সে। যে, আমি একজন পথচারিণী, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আপনাকে দেখতে

পেয়ে মুগ্ধ হয়ে আপনার পিছন পিছন এসেছি এবং এতক্ষণ ধরে আপনাকে গাঁথবার চেষ্টা করছি চার ফেলে ফেলে।

আমি। আমি ঠিক তা বলিনি।

সে। বলবেন কেন, ভাবছেন; আসল কথা যদিও ভাববার ভান করছেন এবং চমৎকারভাবে করছেন তা।

আমি। আপনার মতো মেয়েকে পথচারিণী ভাবব কোন্ সাহসে?

সে। বিপথচারিণী ভেবেছিলেন?

আমি। সবচেয়ে মুশকিল, আপনার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছুই ভাবতে পারছি না। সবচেয়ে আশ্চর্য, আপনি আমার সব কথা জানেন, এমনকি আমার মনের কথাও। অথচ কিছুতেই আত্মপরিচয় দিচ্ছেন না।

সে। আপনার মতো অভিনেতা আমি দেখিনি। সব জানেন, অথচ ভান করছেন না জানার।

আমি। হেঁয়ালি নয়, স্পষ্ট করে বলুন।

সে। বিজ্ঞানের ভাষাই তো এ যুগের স্পষ্টতম ভাষা, সেই ভাষাতে বলব?

আমি। বলুন।

সে। যদি বলি আমি আপনার জীবনের ভিটামিন।

হাসি উপচে পড়তে লাগল চোখ দুটি থেকে।

আমি। এতে কিছুই স্পষ্ট হল না।

সে। যদি বলি, ক্যাটালিটিক এজেন্ট?

আমি। এ আরও অস্পষ্ট।

সে। তাহলে স্পষ্ট করি নিজেকে কি করে? সশরীরে সামনে বসিয়ে রেখেছেন, তবুও স্পষ্ট হচ্ছে না। কবির ভাষায় বলি তাহলে—

স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে এল যেন দৃষ্টি। অথচ কৌতুকও উঁকি দিতে লাগল তাতে।

আমি। বলুন।

সে। যদি রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা সামান্য একটু বদলে বলি?

আমি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সামান্য একটু বদলালেও অসামান্য রকম ক্ষতি করা হয় তার, তা জানেন আশা করি।

সে। 'তুমি'র জায়গায় 'আমি' বসাব খালি, অর্থাৎ—

হাসলে একটু। আমি চুপ করে রইলাম।

সে। অর্থাৎ ওই ভাষাতেই ভাবছেন কিনা আপনি, বুঝতে সুবিধে হবে।

আমি। বলুন।

সে।

আমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
তোমার সাধের সাধনা
তব শূন্য গগন বিহারী
তুমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
আমারে করেছ রচনা
আমি তোমারি যে আমি তোমারি।

সবিস্ময়ে চুপ করে রইলাম। সে বলতে লাগল—

তব হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে মম
চরণ দিয়েছ রাঙিয়া
ওগো সন্ধ্যা-স্বপনবিহারী
মম অধর এঁকেছ সুধা-বিষে মিশে
তব সুখ-দুখ ভাঙিয়া
আমি তোমারি যে আমি তোমারি।

আমি। মনে হচ্ছে, যেন চিনেছি তোমাকে, মানে আপনাকে—

সে। তুমিই বলুন।

—চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এল। চুপ করে বসে রইলাম সেই নিগূঢ় অন্ধকারে। ক্রমশ যেন একটা সুর ভেসে এল, একটা নয় অনেক, বহু বিচিত্র সুরে ক্রমশ পূর্ণ হয়ে উঠল অন্ধকার। বেণু, বীণা, বেহালা, সেতার, এস্রাজ, মৃদঙ্গ, মাদল, খঞ্জনী, পিয়ানো, ম্যাণ্ডোলিন, চেলো, গিটার, ফ্ল্যাজিওলেট, শ্রুত-অশ্রুত নানা যন্ত্রের অপূর্ব সমন্বয়ে বাজতে লাগল কানাড়া বেহাগ জ্যাজ সোনাটা সিমফনি গজল কীর্তন। ক্রমশ একটা রামধনু ভেসে এল কোথা থেকে, সপ্ত বর্ণ বিস্তার করে দুলে দুলে বেড়াতে লাগল সুর-সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে। আলোয় অন্ধকারে বর্ণে ছন্দে আবিষ্ট হয়ে এল মন। মনে হল, আমি যেন পৃথিবীর একজন বড় শিল্পী, ছন্দের বর্ণের আবেষ্টনীতে বসে স্বপ্ন দেখছি, তুলির টানে টানে রূপায়িত করব কোন্ অরূপ সুষমাকে। আচম্বিতে হঠাৎ আবার মিলিয়ে গেল সব। নিস্তব্ধ সূচীভেদ্য অন্ধকার আবার জমাট হয়ে এল চতুর্দিকে। দেখলাম কয়লার খনির গভীর অন্ধকারে বসে কয়লা কাটছি আমি। কোথাও চাকরি পাইনি, প্রকাশ্য রাজপথে কুলিগিরি করতে পারিনি, রিক্‌শা টানতে লজ্জা হয়েছে। ভূগর্ভে আত্মগোপন করে কয়লা কাটছি, যা উপার্জন করছি তার থেকে সঞ্চয় করছি প্রত্যহ কিছু কিছু আধপেটা একবেলা খেয়ে কৃপণের মতো, নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য। আমি হতভাগ্য, আমি পাপী, কিন্তু আমি জানি, কোথায় গলদ, দুর্দশার মূল কোথায়। শিক্ষার অভাব। দেশের একটা ছেলেকেও যদি মানুষ করে তুলতে পারি মনের মতন করে, তাহলেও সার্থক হয় আমার জীবন। দেশে মানুষ নেই, একটাও শক্তসমর্থ বলিষ্ঠ সত্যসন্ধ পুরুষ নেই, সব নীচ স্বার্থপর, মুখোশ পরে অভিনয় করে চলেছে—হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হল, বিষাক্ত গ্যাসে আগুন লেগে বিস্ফোরণ হয়েছে কয়লার খাদে..... ভীষণ শব্দ। সেই গগনবিদারী শব্দকে ব্যঙ্গ করে কলকণ্ঠে হেসে উঠল কে যেন!

।। পনেরো।।

আলো জ্বলে উঠল।

দেখলাম, দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। বেশবাস কবরী অসংবৃত, বিপুল হাস্যাবেগ সম্বরণ করতে করতে এসে যেন দাঁড়িয়েছে।

সে। চলে যেতে পারলাম না, ফিরে আসতে হল। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ভারি।

আমি। বলুন।

সে। আবার 'বলুন' কেন?

আমি। বল।

সে। আস. সি. এস. পরীক্ষা-বিমুখ যে কৃতবিদ্য যুবকটি নিজেকে কয়লা-খাদের কুলি কল্পনা করে স্বদেশের দুঃখ মোচনের জন্য মনে মনে কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন, তাঁর কি ধারণা, মা-বাপ স্বদেশের বাইরের লোক?

আমি। ও রকম অদ্ভুত ধারণা হতে যাবে কেন?

সে। তাহলে মা-বাপের দুঃখের কথা আগে না চিন্তা করে স্বদেশের দুঃখে বিচলিত হলেন কেন তিনি?

আমি। মা-বাবার কোনো দুঃখ ছিল না, এখনও নেই। বাবা ধনবান লোক।

সে। অর্থাভাবটাকেই একমাত্র দুঃখ বলে মনে করেন বুঝি আপনি? সেকালের জ্ঞানতপস্বী নিঃস্ব ব্রাহ্মণরা তাহলে খুব দুঃখী ছিল বলুন!

আমি। তারা কি ছিল তা জানি না, তবে এটা ঠিক যে এ যুগের দুনিয়ায় টাকাটাই সুখ-সংগ্রহের প্রধান উপায়। টাকা না থাকলেই দুঃখ বাড়ে, আধিভৌতিক দুঃখটাও কম গ্লানিজনক নয়।

সে। এই যদি আপনার মত, তাহলে আপনার বাবার ব্যবসাতে ঢুকলেন না কেন?

আমি। চামড়ার ব্যবসা করা আমার ধাতে সইল না।

সে। যে ব্যক্তি কল্পনাতেও কয়লা-খাদে নেমে যেতে পারে, তার ধাত খুব নরম বলে তো মনে হয় না। কয়লা-খাদের তুলনায় নদীর ধারের সে ট্যানারি তো স্বর্ণপুরী।

আমি। হতে পারে। আমার কিন্তু ভালো লাগল না। আমার নিজেরও পছন্দ অপছন্দ আছে।

সে। তা তো আছেই। কিন্তু আসল কারণ দুটি আপনি বলছেন না। বলব?

আমি। বল।

সে। প্রথম কারণ, আপনার বাবার প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণা।

আমি। ভণ্ড লোকের প্রতি বিতৃষ্ণা হওয়া স্বাভাবিক। যাঁর মতে—মুরগি খেলে জাত যায়, কিন্তু গোরুর চামড়ার ব্যবসা করলে যায় না, তাঁকে শ্রদ্ধা করতে পারি না কিছুতে।

সে। কিন্তু একে তো ভণ্ডামি বলে না। ওই তাঁর মত এবং সে মত তিনি আঁকড়ে আছেন শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। একে ভণ্ডামি বলেন? এই তো শক্তির পরিচয়।

আমি। ও রকম মাড়োয়ারী-মনোবৃত্তি বরদাস্ত করতে পারি না।

সে। অথচ টাকা চান? সোনার পাথরবাটি হয় কখনও?

আমি। তোমার মতে তাহলে টাকা রোজগার করতে গেলেই নিরঙ্কুশ মাড়োয়ারী হতে হবে? ম্যামন ওয়ার্শিপ করাই আমার জীবনের লক্ষ্য নয়—

সে। তা ছাড়া আর কি লক্ষ্য আছে আপনার? ভালোভাবে যদি ম্যামন ওয়ার্শিপটাও করতে

পারতেন, তাহলেও তো একটা কাজের মতো কাজ হত। কুবের দেবতাও বিনা সাধনায় তুষ্ট হন না। যাদের নিরঙ্কুশ মাড়োয়ারী বলে ঠাট্টা করলেন, পারেন তাদের মতো হতে? মাত্র লোটা-কম্বল সম্বল করে এসে একাগ্র ব্যবসায়বুদ্ধি, দুঃখসহনশীলতা, লোকের হৃদয় জয় করবার ক্ষমতা—এক কথায় তাদের চরিত্রবল কি তুচ্ছ করবার মতো?

ছুঁচটা ফুটল গায়ে।

আমি। কে বলছে, তুচ্ছ করবার মতো। কিন্তু সাধারণত মাড়োয়ারী বললে যা বোঝায়, তা হবার প্রবৃত্তি নেই। বাবা ঠিক ওই মাড়োয়ারী।

সে। মাড়োয়ারী-চরিত্রের অসৎ গুণগুলো বর্জন করে সৎ গুণগুলো নেবার তো কোন বাধা নেই। কিন্তু আসল কথা তা নয়। আসলে গেলেন না আপনি মালতীর টিটকিরির ভয়ে। যদিও মালতী ঠাট্টা করেই বলেছিল—"তুমি তো অনবরত শ্রেণীর উন্নয়নের সপক্ষে থাকবেই, তুমি নিজে যে চামারের ছেলে"; তবু কথাগুলো কাঁটার মতো বিঁধেছিল আপনার বুকে। সেইজন্যেই আরও পেছিয়ে এলেন।

আমি। এ কথা খানিকটা ঠিক, কিন্তু পুরো নয়। কারণ দেশের কাজ করাই আমি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলাম, বাবার চামড়ার ব্যবসাতে যোগ দিলে তা সম্ভব হত না। তা ছাড়া, ওই ক্যাপিটালিস্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই আমার প্রধান বিরোধ, ওরাই দেশের শ্রমিকদের রক্তশোষণ করে নিজেরা পুষ্ট হচ্ছে, ওদের না জাগালে দেশের মুক্তি নেই।

সে। শ্রমিকদের জাগাবার সোনার কাঠি কি আপনি পেয়েছিলেন?

আমি। তোমার একটা মস্ত দোষ, তুমি হেঁয়ালি বা উপমা ছাড়া কথা বলতে পার না। সোনার কাঠি মানে কি?

সে। ভালোবাসা। ওদের কি সত্যিই আপনি আপন জনের মতন ভালোবাসেন?

আমি। কোথাও যখন চাকরি পেলাম না, তখন ওদের হিতার্থে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কি পরিশ্রমটা যে করেছি, তা হয়তো জান না।

সে। জানি বইকি।

দুজনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে সে বুকের কাপড়টা সংবৃত করে নিলে একটু। আগে ওকে দেখে আমার যে নেশার মতো হয়েছিল, মনে হল, হঠাৎ যেন সেটা বেড়ে গেল। মনে হচ্ছে, ওকে চিনেছি আমি, আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি নিজেরই কৃতিত্বে; তবু কৌতূহল আছে এখনও। অপরিচয়জনিত কৌতূহল নয়, ওর অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করবার কৌতূহল। ওর বিস্ময়জনক আবির্ভাব, রহস্যময় আলাপ, আমার সম্বন্ধে ওর অদ্ভুত জ্ঞান আমায় আর বিস্মিত করছে না, আনন্দিত করছে, ওকে নিবিড় ভাবে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে; মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের "স্বপ্ন" কবিতাটি, পূর্বজন্মের সঙ্গে জড়াতে ইচ্ছে করছে ওকে।

দোতলায় স্টোভের সোঁ সোঁ আওয়াজটা স্পষ্ট হয়ে উঠল হঠাৎ।

সে। শ্রমিক-আন্দোলনের জন্যে যে পরিশ্রমটা আপনি করেছিলেন তা আমি জানি, ভালো করেই জানি। কিন্তু একটা খটকা আছে।

আমি। কি। বল?

সে। আপনি আপনার বাবার ট্যানারির শ্রমিকদের না ক্ষেপিয়ে গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিদের ক্ষেপাতে গেলেন কেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর যে উত্তরটা দিলাম, তাতে নিজেরই মনে বিস্ময় জাগল। ওকেও ঠকাতে চেষ্টা করছি!

আমি। কারণ গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিদের অবস্থা ট্যানারির কুলিদের চেয়ে ঢের খারাপ ছিল।

সে। ও!

এক ঝলক সকৌতুক হাসি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তার চোখে।

আলো নিবে গেল।

।। ষোলো।।

মফস্বলের ছোট একটি রেলওয়ে স্টেশন। অন্ধকার গভীর রাত্রি, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তবু চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। প্লাট্‌ফর্মে তিল-ধারণের স্থান নেই। স্টেশনের বাইরে, গাছের ডালে, বাড়ির ছাতে, সর্বত্র জনতা কিলবিল করছে, থিকথিক করছে। স্টেশন-মাস্টার, পুলিশ, ভলাণ্টিয়ার হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে গোলমাল থামাতে। স্থানীয় নেতা সশঙ্কিত অবস্থায় বসে আছেন স্টেশন-মাস্টারের আপিসের এক কোণে মালা আর পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন আগলে। ভিড়ে মালাটা যদি নষ্ট হয়ে যায়—এই তাঁর মহাচিন্তা। ফুটফুটে ন-দশ বছরের যে মেয়েটির গান গেয়ে মালা পরিয়ে দেবার কথা, সে পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে—রাত দুটো পর্যন্ত জেগে থাকতে পারেনি বেচারী।

বাইরে জনতার ভিতর থেকে অন্ধকারে একটা অস্পষ্ট কলরব উঠছে—বিভিন্ন স্বরের সংমিশ্রণে অর্থহীন অস্পষ্ট একটা কোলাহল; মনে হচ্ছে নিবিড় অন্ধকারে ভারতবর্ষের ক্ষুধিত পীড়িত আত্মাই যেন বিড়বিড় করে প্রলাপ বকে চলেছে।

অন্ধকার বিদীর্ণ করে হুইসল বেজে উঠল। ট্রেন আসছে। হুড়মুড়িয়ে ঢুকলেন স্টেশন-মাস্টার নিজের আপিসে। স্থানীয় নেতাকে বললেন, "এখুনি মেসেজ পেলুম ডি. এস.-এর, পারমিশন দিলে না মশাই। ট্রেন দু মিনিটের বেশি দাঁড় করাতে পারব না, গান-টান হবে না, মালাটাই পরিয়ে দেবেন। ট্রেন এল, আপনার সব ঠিক করে নিন। চাকরি, বুঝলেন মশাই চাকরি"—বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ফুলের মালাটা সাবধানে নিয়ে মেয়েটিকে জাগিয়ে বেরিয়ে পড়লেন স্থানীয় নেতা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনটি হাতে ঝুলিয়ে।

"জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়, জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়—" চতুর্দিক প্রকম্পিত করে গর্জন করে উঠল জনতা। শ্রমিক-নেতা প্রেমসিন্ধু দত্ত প্রথম শ্রেণীতে শুয়ে ছিলেন, উঠে বসলেন, অস্ফুটকণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন, প্রতি স্টেশনে এ রকম করলে আর কাঁহাতক পারা যায়! ঘুম আর হবে না দেখছি। কাল সমস্ত দিন বক্তৃতা আছে, আর পারা যায় না—

জানালা খুলে মুণ্ডটা বাড়ালেন।

"জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়—"

স্থানীয় নেতা সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন, ভক্তিভরে প্রণাম করলেন, মেয়েটি এগিয়ে এল মাল্য-হস্তে, প্রেমসিন্ধু দত্ত গলা বাড়িয়ে দিলেন, পেট্রোম্যাক্সের তীব্র আলোকে ক্লিক করে একটা শব্দ হল ফোটো নেওয়ার, মাল্যভূষিত প্রেমসিন্ধু দত্তকে দেখতে পেয়ে জনতা আর একবার চীৎকার করে উঠল—"জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়"। গার্ডের হুইস্‌ল বাজল। "নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন—" স্টেশন-মাস্টারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রণামান্তে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে নেমে এলেন স্থানীয় নেতা, ট্রেন চলতে শুরু করল। আর একবার জয়ধ্বনি উঠল—"জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়—"

দৃশ্য বদলাল।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায় বসে আছে শ্রমিকের দল—ক্ষুধিত নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রমিকের দল। কাতারে কাতারে বসে আছে উন্মুখ প্রত্যাশায়। একটা সমুদ্র যেন, কিন্তু নিস্তব্ধ সমুদ্র, একটি তরঙ্গ উঠছে না, রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে সবাই। একটা অদৃশ্য বৈদ্যুতিক প্রবাহ যেন তরঙ্গায়িত হচ্ছে বায়ুর স্তরে স্তরে। প্রেমসিন্ধু দত্ত বক্তৃতা করছেন আবেগময়ী ভাষায় মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে, ঝুলে পড়েছে খদ্দরী আস্তিন উৎক্ষিপ্ত বাহুমূলে, প্রাণের জ্বালা জ্বলন্ত বাণীমূর্তি লাভ করেছে। প্রতি মুহূর্তে উদারা মুদারা তারায়, দরদর করে ঘাম পড়ছে, অস্তগামী সূর্যের রক্তিম কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মুখমণ্ডল, অবাক হয়ে শুনছে সবাই, একটা তীব্র সুরা যেন সঞ্চারিত হচ্ছে প্রত্যেকের শিরায়-উপশিরায়, ক্ষুধিত নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রমিকদের দুঃখের অবসান বুঝি হয় হয়...।

প্রেমসিন্ধু দত্ত থামলেন।

সমস্ত মাঠ মুখরিত হয়ে উঠল করতালিরবে, আনন্দের শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল যেন। থামতে চায় না।

সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে কিন্তু স্টোভের শব্দটা স্পষ্টতর হয়ে উঠল—সোঁ-সোঁ-সোঁ-সোঁ...।

।। সাতেরো।।

আলো জ্বলে উঠল।

সে। আপনার এ স্বপ্নটা সফল হতে পারত, হল না কেবল নিজের দোষে।

আমি। কেন?

সে। গৌরীশঙ্করবাবুর সঙ্গে প্যাক্ট করলেই পারতেন, অন্য জেলায় শ্রমিক-আন্দোলন করবার জন্যে বেশ মোটা টাকা দিতে চাইছিলেন তিনি, অনায়াসে আপনি একজন নেতা হতে পারতেন।

আমি। ও রকম অসম্মানজনক প্যাক্ট করা যায় নাকি কখনো?

সে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কত অসম্মানজনক কাজই তো করলেন জীবনে, এটা করলে কি আর এমন বিশেষ ক্ষতি হত! গৌরীশঙ্করবাবুর কেবল একটি শর্ত ছিল, তাঁর মিলে হাত দিতে পারবেন না আপনি এবং অপরে যদি কেউ হাত দিতে চায়, তাকে বাধা দেবেন।

আমি। গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিদের স্বার্থ বিদলিত করবার কোনো অধিকার নেই আমার।

সে। পরের স্বার্থ তো কত বাব বিদলিত করেছেন নিজের সুখের জন্য! ওই কুলিদের বেলাতেই হঠাৎ ধর্মভাব জেগে ওঠবার মানে কি?

আমি। কার স্বার্থ বিদলিত করেছি?

সে। আপনার বাবার, মালতীর বাবার।

আমি। ওসব নিতান্ত ব্যক্তিগত জিনিস, ওসবের সঙ্গে এর তুলনা চলে না।

সে। ও, চলে না বুঝি!

হাসি চিকমিক করতে লাগল তার চোখে।

আমি। ব্যক্তি আর সমাজ এক নয়।

সে। বুঝলাম না।

আমি। সমাজ-জীবনে স্বার্থ বলিদান দেওয়াতে যে পৌরুষ, ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থ আঁকড়ে ধরাতে ঠিক সেই পৌরুষ। আমার ব্যক্তিগত মতামত, ব্যক্তিগত সুখদুঃখ নিয়েই আমি, তুচ্ছ কারণে প্রতি পদে তা বিসর্জন দিতে গেলে নিজেকেই বিসর্জন দিতে হয়। তাহলে আর বেঁচে লাভ কি! বাঁচাটাই উদ্দেশ্য। বৃহত্তর সমাজের জন্যে আত্মবিসর্জন করলে অমরত্ব লাভ করা যায়, ছোটখাটো ব্যাপারের জন্যে করলে কিছুই লাভ হয় না, এক আত্মগ্লানি ছাড়া।

সে। বাবার সঙ্গে মতে মেলেনি তাই তাঁর সঙ্গে বিরোধ, তা না হয় বুঝলাম; কিন্তু মালতীর বাবাব সঙ্গে?

আমি। মালতীর বাবার স্বার্থ আমি নষ্ট হতে দিতাম না—কিন্তু, থাক ও আলোচনা!

সে। মুখে বলছেন 'থাক', কিন্তু মনে মনে ওই আলোচনাই করছেন সারাক্ষণ। জিনিসটা মর্মমূলে কাঁটার মতো বিঁধে আছে, তবু তাই নিয়েই নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছে করছে ব্যথা সত্ত্বেও।

সমস্ত মুখ হাসিতে ভরে উঠল তার।

আলোটা নিবে গেল।

।। আঠারো ।।

দুর্জয় শীত পড়েছে। তুষারপাত হচ্ছে। ল্যাচ কী ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকলাম। একটু আগেই যে মেয়েটির সঙ্গে নাচছিলাম, তার হাব-ভাব চলন-বলনে একটু আকৃষ্ট হয়েছিলাম যদিও কিন্তু মুগ্ধ হইনি। বরং ভাবছিলাম, ভাগ্যে আমাদের দেশে ঠিক এই জাতীয় মেয়ের আবির্ভাব হয়নি

এখনও; ভাবছিলাম মালতীর কথা, ভাবছিলাম, সেদিন ইণ্ডিয়ান ওম্যানহুড নিয়ে বক্তৃতা করলে যে ছোকরা সায়েবটি, সে মালতীকে দেখেনি, সে দেখেছে রাস্তার ভিখারিণী অথবা বেশ্যালয়ের নর্তকীকে, কিংবা বড় জোর ভারী ভারী রুপোর গয়না-পরা, নাকে বেঁসর দোলানো নিম্নশ্রেণীর কোন বধূকে, মালতীকে দেখেনি। রেন-কোট ওভার-কোট খুলে সতৃষ্ণ নয়নে চাইলাম ফায়ার-প্লেসের দিকে, এখনও আগুন আছে দেখছি। হঠাৎ নজরে পড়ল, টেবিলের উপর একখানা চিঠি রয়েছে, ল্যাণ্ডলেডি রেখে গেছে বোধ হয়, আজ যে 'মেল ডে' তা মনেই ছিল না। এ কি, এ যে মালতীরই চিঠি দেখছি! আরাম করে বসে পড়তে হবে, ঈজি-চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম ভালো করে রাগটাকে পায়ের উপর টেনে নিয়ে। পড়তে লাগলাম চিঠিটা—

ভাই প্রেম দত্ত,

দোহাই তোমার, সত্যি সত্যি যেন আই. সি. এস. পরীক্ষাটি পাস করে ফেলো না, তাহলে বাবা নির্ঘাত তোমার সঙ্গেই আমার বিয়ে দিয়ে দেবেন। বাবা টাকা দিয়ে জীবনের অনেক শখ কিনেছেন, এখন টাকা দিয়ে আই. সি. এস. জামাই কেনবার শখ জেগেছে তাঁর। তাই তোমাকে এত খরচ করে বিলেত পাঠিয়েছেন। তুমিও দিব্যি চলে গেলে নিজের বাপ-মার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করে। এটা আমার একটুও ভালো লাগেনি। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি লোকটাকেই আমার মোটে পছন্দ হয়নি, তোমাকে ভালোবাসিনি একটুও, বিয়ে-টিয়ে করতে পারব না। তোমার বিলেত যাওয়ার আগ্রহ দেখে, আমি বাবা-মাকে কিছু বলিনি। বরং ভান করেছিলাম যে, তোমাকে আমার ভালোই লেগেছে। ভেবেছিলাম, বাবার প্রচুর টাকা আছে, তার থেকে কিছু খসিয়ে যদি কোনো ছেলের বিলেত যাওয়া ঘটে, আমি বাধা দিতে যাব কেন শুধু শুধু? সাহায্যই বরং করা উচিত বাবা বিনা স্বার্থে তো কাউকে পাঠাবেন না। কিন্তু এখন আর সত্যি কথাটা গোপন রাখা উচিত নয়, তোমাকে বিয়ে করব না আমি। ভালোবেসেছি তোমার বন্ধু রমেশকে, তাকেই বিয়ে কবব। কিন্তু তুমি যদি সত্যি সত্যি আই. সি. এস. পাস করে ফেল, বাবাকে ঠেকানো শক্ত হবে। দোহাই তোমার, ও কাজটি কোরো না। বাবার টাকায় তুমি ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যারিস্টার যা খুশি হও, কেবল আই. সি. এস.-টি হয়ো না।

আশা করি, এ প্রস্তাবে তোমার তরফ থেকেও ক্ষোভের কোনো কারণ ঘটবে না। কারণ, আমার মতন একজন অতি সাধারণ মেয়ে যে তোমার মতো ছেলের মনোহরণ করতে পেরেছে, এ কথা অবিশ্বাস্য। ও দেশে তোমার উপযুক্ত মেয়ে আছে, হয়তো এতদিন ভাবও হয়ে গেছে কারও সঙ্গে। চিঠির উত্তর দিতে দেরি কোরো না; এবং দোহাই তোমার, আর যা-ই কর ভণ্ডামি কোরো না। ইতি—

মালতী

সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেল।

তারপর ক্রমশ জাগল ডাক্তার রবিনসনের মুখখানা, রিসার্চ-স্কলার ডাক্তার রবিনসন। ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছে আমাকে। পট করে ছুঁচটা ফুটল গায়ে—

আলো জ্বলে উঠল।

।। উনিশ।।

সে। মালতীর কথা পরে ভাববেন, আগে আমার একটা কথার জবাব দিন।

আমি। কি বল?

সে। শ্রমিকদের কষ্টে কি সত্যি দুঃখ হয় আপনার?

আমি। হয় বইকি। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, শ্রমিকদের যতক্ষণ না আর্থিক উন্নতি হচ্ছে অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা শিক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা তাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, ততক্ষণ এদেশের মুক্তি নেই।

সে। এটা আপনার ব্যক্তিগত মত, না সামাজিক মত?

আমি। তার মানে?

সে। মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না আপনার আচরণ। আপনি গৌরশঙ্করবাবুর মিলের কুলিদের ধর্মঘট করিয়ে তাদের জন্য যে সব জিনিস দাবি করেছিলেন, আপনি নিজে তাদের সে সব দাবি গ্রাহ্য করেন কি? আপনি আপনার চাকরের ওই দাবি অনুসারে মাইনে দেন, আপনার উনুন ধরাতে গিয়ে সে যদি পুড়ে যায়, কম্‌পেন্‌সেশন দেন তাকে, অসুখে পড়লে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করান তার? তার ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন? নিয়মিত ছুটি দেন? সেদিন যে আপনার চাকরটা আসেনি, তার একমাত্র কারণ তার জ্বর হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু সে না আসাতে আপনার জুতো ব্রুশ করা হয়নি এবং যেহেতু কম চকচকে জুতো পরে মালতীদের বাড়ি যেতে আপনার লজ্জা করছিল, সেই হেতু বেচারীকে এক কথায় আপনি ছাড়িয়ে দিলেন তার শোচনীয় দুরবস্থা জেনেও। এই একই ব্যক্তি কি করে মিলের শ্রমিকদের দুঃখে বিগলিত হয় বুঝি না।

আমি। আমার আর্থিক অবস্থা আর গৌরীশঙ্করবাবুর আর্থিক অবস্থা এক নয়।

সে। নিশ্চয়ই নয়, অনেক তফাত। আপনি একজন বেকার হতভাগা, আর তিনি নিজের চেষ্টায় চার-চারটে মিল স্থাপন করেছেন। দেশের বহু নিরন্ন লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেছেন, অর্থোপার্জনের একটা স্বাধীন ক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন, উপার্জিত অর্থ দিয়ে দেশের অনেক সৎকার্যও করেছেন। কংগ্রেসের লোক, গবর্মেণ্টের লোক সবাই খাতির করে তাঁকে সেজন্য। আপনি সে সব কিছুই করেননি, আপনার একমাত্র চেষ্টা, কিসে তাঁর ব্যবসা পণ্ড হয়, কিসে তিনি জব্দ হন।

আমি। শ্রমিকদের উন্নতি করলে ব্যবসা পণ্ড হয় না, ব্যবসার উন্নতি হয়।

সে। শ্রমিকদের মারফত আপনি দাবির যে ফর্দটা পেশ করিয়েছিলেন, তা মেনে নিলে গৌরীশঙ্করবাবুর মাসিক বিশ হাজার টাকা খরচ বেড়ে যায়। এই প্রতিযোগিতার দিনে বিশ হাজার টাকা খরচ বাড়ালে তাঁর ব্যবসা টিকতে পারে? আপনি নিজে মাসে পাঁচ টাকা খরচ করে আপনার দুঃস্থ চাকরের দুঃখ দূর করতে অপারগ, আপনি বক্তৃতা করে অপরকে বিশ হাজার টাকা খরচ করবার ফরমাশ দেন!

আমি। গৌরীশঙ্করবাবু লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। যে শ্রমিকদের পেশীর শক্তি নিঙড়ে তিনি ওই টাকা উপার্জন করেছেন, সেই শ্রমিকদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে সেই উপার্জনের ন্যায্য অংশীদার হবার।

সে। হয়তো আছে। কিন্তু তা নিয়ে বোঝাপড়া করুক গৌরীশঙ্করবাবু আর তাঁর শ্রমিকরা, আপনার স্থান কোথা এর মধ্যে? আপনি ওপর-পড়া হয়ে আসেন কি হিসেবে?

আমি। এর উত্তর কবি দিয়েছেন—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—

সে। সে ভাষা দিতেই বা পারলেন কই? গৌরীশঙ্করবাবুর এক চালেই তো মাত হয়ে গেলেন।

আমি। হ্যাঁ, রমেশের জন্যেই শেষকালে—

সে। মালতীর জন্যে বলুন।

একটা ক্ষুরধার হাসি চকমক করে উঠল চোখে মুখে। আলো নিবে গেল।

।। কুড়ি।।

শ্রমিক-সঙ্ঘের আগামী অধিবেশনের আয়োজনকল্পে বেরুচ্ছিলাম। তাতে গৌরীশঙ্কর রায়কে সংঘের তরফ থেকে চরমপত্র দেবার যে আয়োজন হচ্ছিল, আমিই তার একমাত্র নেতা,—এ শহরে ধনী গৌরীশঙ্করবাবুর বিরুদ্ধতা করবার সাহস আর কারও নেই। বেরুচ্ছিলাম, এমন সময় ফোন এল—মালতীর ফোন—"বড় জরুরী দরকার, একবার এস।" মালতীর আমাকে দরকার? আমাকে? ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ভাবলাম এলোমেলো কত কি! তারপর সহসা মনে হল, বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই, যেতেই যখন হবে অবিলম্বে যাওয়াই ভালো।

এসেছি। এসেই মালতীর সঙ্গে দেখা হয়নি, হয়েছিল তারিণীবাবু আর লাহিড়ী মশায়ের সঙ্গে। তারিণী মিত্তির আর জগৎ লাহিড়ী দুজনেই পেন্‌শনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ। চাকরি নেই, ভদ্রভাবে অবসর বিনোদন করবার মতো মানসিক সংস্কৃতি নেই, শরীরও অপটু নয় যে তাই নিয়ে খানিকটা সময় কাটবে, তাই এঁরা পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়ান হিতৈষীর ছদ্মবেশে। প্রত্যেকের বৈঠকখানায় এঁদের অবাধ গতিবিধি। প্রত্যেকের মনের খবর, দেহের খবর, হাঁড়ির খবর, চাকরির খবর, মকদ্দমার খবর, চিকিৎসার খবর—সমস্ত খবর এঁরা রাখেন এবং তাই নাড়াচাড়া করে সময় কাটান। কথা চালাচালি করে মজাও দেখেন মাঝে মাঝে। এই নিরীহ বুড়ো দুটিকে শত্রু বলে চিনতে দেরি লাগে এবং চেনবার পরও তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ ঘুরিয়ে বললে এঁরা না-বোঝার ভান করেন, বুঝলেও গায়ে মাখতে চান না। সোজাসুজি কটু কথা বলা যায় না, কারণ মফস্বলে পক্ককেশ ব্যক্তি মাত্রেই বিজ্ঞ, সুতরাং পূজনীয়। আমি যদিও এঁদের অপমান করিনি কোনোদিন, কিন্তু আমাকে এঁরা ভয় করেন, এড়িয়ে চলেন। মালতীর সম্বন্ধে শহরে নানারকম গুজব প্রচলিত আছে, তারই আকর্ষণে এঁরা আসেন এখানে রমেশের রিসার্চ কতদূর এগোল এই খবর নেবার অজুহাতে। টুকরো-টাকরা যা দু-একটি খবর সংগ্রহ করতে পারেন—রিসার্চ নয়, মালতীর সম্বন্ধে—তারই উপর রঙ চড়িয়ে আনন্দলাভ করেন বোধ হয় অন্য কারও বৈঠকখানায় বসে এবং অন্য কারও খরচায় তামাক টানতে টানতে। আমাকে হঠাৎ প্রবেশ করতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন দুজনেই, মনস্কামনা সিদ্ধ হল সম্ভবত, আমার এখানে আসাটা নিয়েই বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটবে।

তারিণীবাবু মুখে একটু হাসি টেনে এনে বললেন, "প্রেমসিন্ধু যে, তারপর খবর সব ভালো? তোমার পিতা কেমন আছেন?"

"ভালো—"

সংক্ষিপ্ত উত্তরে ক্ষুণ্ণ হলেন বোধ হয় তিনি। জগৎ লাহিড়ীর দিকে চেয়ে বললেন, "চল হে, চাটুজ্জেদের মেয়েটি কেমন আছে খবর নিয়ে আসি। রমেশের ফিরতে দেরি হবে আজ দেখছি, রিসার্চের খবরটা আর নেওয়া হল না আজ।"

"চল—"

"সিবিল সার্জেন ব্যাটা মারবে দেখছি মেয়েটাকে। চাটুজ্জেকে বলছি কবরেজি করাও, কিন্তু কিছুতে শুনবে না ও।"

"চল, আর একবার বোঝাই গিয়ে—"

"তাই চল—"

চলে গেলেন দুজনে।

আমি সোজা উপরে উঠে গেলাম। মালতী বাথরুমে ছিল। আমার সাড়া পেয়ে বাথরুম থেকেই চেঁচিয়ে বললে,—"বোসো একটু, আমার হয়ে গেছে—"

গদি-আঁটা স্প্রিঙের চেয়ারটায় বসলাম। এতক্ষণ মনে পড়েনি, কিন্তু এইবার মনে পড়ল, এটা আষাঢ় মাস। মেঘ-মেদুর আষাঢ়-অপরাহ্ন! অদ্ভুত একটা ছায়া-ছায়া ভাব। হলদে দেওয়ালগুলোতে নীলাঞ্জনের আবেশ লেগেছে, পিতলের টবে বন্দী বামন তালগাছটা যেন স্বপ্ন দেখছে মেঘমল্লারের। মালতী ঠিক পাশের ঘরেই স্নান করছে, সাবান মাখার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।...... রমেশকে মনে পড়ল, বেঢপ চেহারা, মনে হয় শরীরে কোনো হাড় নেই, সর্বাঙ্গ থলথল করছে। তবু বিলেতে অনেক মেয়ে ওর প্রেমে পড়েছিল শুনেছি, মালতীরও লাভ-ম্যারেজ। রমেশের চেহারা যেমনই হোক, প্রতিভা আছে এবং সে প্রতিভার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার চোখ-মুখ দিয়ে। কোন একটা জিনিস নিয়ে তন্ময় হয়ে যাবার ক্ষমতা আছে ওর। নীরস কেমিস্ট্রিতে কি রস পেয়েছে ওই জানে, কেমিস্ট্রিই ধ্যান-জ্ঞান, ওইতেই ডুবে আছে। বাড়িতেও শোবার ঘরের পাশে ছোটখাটো ল্যাবরেটরি করেছে একটা। বিলেতেই আমার সঙ্গে ভাব হয়েছিল, আমি বিলেতে পৌঁছবার কিছুদিন পরেই ও দেশে ফেরে। তার পরের ডাকেই মালতীর চিঠি পাই।

বাথরুমের কপাট ঠেলে মালতী বেরিয়ে এল। ঠিক যে শাড়িটি পরলে ওকে সবচেয়ে বেশি মানায়, সেই শাড়িটিই পরেছে—টকটকে লালপেড়ে কমলা-রঙের শাড়ি। সুন্দরী, যুবতী বা তন্বী বলতে যা বোঝায়, মালতী ঠিক তা নয়। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, মাজা-মাজা রঙ, একটু মোটাসোটা গোছের। দেখবামাত্রই মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়বার মতো চেহারা নয়। কিন্তু ওর সঙ্গে কিছুদিন মিশলে, ওর দৃষ্টির, ওর হাসির বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর অর্থ বুঝতে পারলে, ওর অদ্ভুত স্বভাবের পরিচয় পেলে, ওর আর একটা যে রূপ চোখে পড়ে, তা সাধারণের দৃষ্টিগোচর না হলেও অনন্যসাধারণ।

দেখা হলে সাধারণত লোকে হাসে, মালতীও হাসে, আমিও তাই প্রত্যাশা করেছিলাম। আজ কিন্তু আমাকে দেখেই মালতী কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল, ভুরু দুটো ঈষৎ কুঁচকে অপাঙ্গে আমার পানে একবার চেয়ে একটি ছোট মোড়া টেনে বসল একটু দূরে। তারপর যা বললে, তা এতই অপ্রত্যাশিত যে, আমি নির্বাক হয়ে গেলাম! " এই যদি তোমার মনে ছিল তাহলে সেটা খোলাখুলি বললেই পারতে, আমি নিজেই চলে যেতাম এখানে থেকে। ওঁর চাকরি নিয়ে টানাটানি করার কোনো দরকার ছিল না।"

আমি কিছু বলবার আগেই বাঘিনীর মতো দপ করে জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো, সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা অদৃশ্য অগ্নিশিখা লকলক করে উঠল যেন। "আমি যদি না যাই, সাধ্য আছে তোমার আমাকে এখান থেকে তাড়াবার? আমি কারও চাকর নই, আমার বাপের বাড়ি এখানে, বাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকবারও সঙ্গতি আছে আমার নিজের। তোমার বন্ধুর টাকার তোয়াক্কা করি না আমি—"

"কি বলছ বুঝতে পারছি না—"

"নিজের প্রয়োজনমত কোনো জিনিস বুঝতে না পারাটাই তো তোমার বিশেষত্ব। বিলেতে তোমাকে যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেটাও তুমি বুঝতে না পারার ভান করেছ। তিন মাস থেকে যে আমাদের বাড়িতে আসছ না, তাও একটা ভান তোমার—একটা পোজ। পাছে আমার সুনামে তারিণী মিত্তির আর জগৎ লাহিড়ী কলঙ্ক রটায়—এই ভয়ে আস না। যেন কত বড় হিতৈষী আমার। তুমি কি মনে কর, তোমার ভান বুঝতে পারি না আমি?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না, কারণ জানি, উত্তর দিলে উত্তাপ বেড়ে যাবে।

হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে চলে গেল সে! সঙ্গে সঙ্গে ফিরল আবার এবং আমার দিকে একটা কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। কুড়িয়ে দেখি একখানা চিঠি। প্রফেসার চক্রবর্তী রমেশকে ইংরেজীতে লিখেছেন। তার বাংলা মর্মার্থ এই।—"রমেশবাবু, গোপনে আপনাকে একটা খবব জানাচ্ছি। আগামী একুশে তারিখে কলেজ-কমিটির যে মীটিং হবে, তাতে আপনাকে পার্মানেন্ট করা হবে কি না তাই নিয়ে আলোচনা হবে। আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু গৌরীশঙ্করবাবু প্রত্যেক মেম্বারের বাড়ি গিয়ে এই কথা বলে এসেছেন— প্রেমসিন্ধু দত্তের মতো ডেঞ্জারাস ক্যারাক্টারের লোকের সঙ্গে যার অত মাখামাখি, তাকে কিছুতেই পার্মানেণ্ট করা চলবে না। আপনি জানেন নিশ্চয়, প্রেমসিন্ধুবাবুর প্ররোচনাতেই গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিরা ধর্মঘট করেছিল। শোনা যাচ্ছে, প্রেমসিন্ধু দু-চার দিনের মধ্যেই নাকি কুলিদের তরফ থেকে একটা আল্‌টিমেটাম পাঠাবেন গৌরীশঙ্করবাবুর কাছে। আপনি যদি একটু চেষ্টা করে প্রেমসিন্ধুবাবুকে এ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন, তাহলেই গৌরীশঙ্করবাবুর মত বদলাতে পারে হয়তো, অর্থাৎ তাহলেই আপনার চাকরিতে পাকা হবার আশা আছে, নতুবা নেই, কারণ, জানেনই তো, গৌরীশঙ্করবাবু কলেজে একলাখ টাকা দান করেছেন, তাঁর কথা কোনো মেম্বারই ঠেলতে পারবে না। আপনি চেষ্টা করে দেখুন, যদি প্রেমসিন্ধুবাবুকে রাজী করাতে পারেন। আজকাল বাজারে চাকরি গেলে যে কি অবস্থা হয়, তা আশা করি প্রেমসিন্ধুবাবু বুঝবেন, যতদূর জানি, তিনি সহৃদয় লোক...."

চিঠিখানা হাতে করে বিমূঢ়ের মতো বসে রইলাম। খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম, - আষাঢ়ের নব-জলধর স্তূপীকৃত হচ্ছে ঈশান কোণটায়, মাঠের ওপাশে পুষ্পিত কদমগাছটা নুয়ে

নুয়ে পড়ছে পুবে-হাওয়ার বেগে। মালতী হঠাৎ এল আবার। হাতে একটা রুপোর ট্রে, ট্রের উপর কাচের পানপাত্র, তাতে টলমল করছে রঙিন সুরা। হুইস্কি।

"তোমার আগামী জন্মদিনে এইটে উপহার দেব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তুমি যা আয়োজন করছ, তাতে হয়তো আর দেখা হবে না আমাদের। এখনই নাও, অবশ্য নিতে যদি আপত্তি না থাকে।" বাঁ হতে দিয়ে একটা তেপায়া আমার সামনে টেনে এনে তার উপরে ট্রে-টা রাখলে।

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

"হুইস্কিতে কিছু মেশানো হয়নি, সোডা আনতে পাঠিয়েছি—"

চিঠির সম্বন্ধে আলোচনা কি ভাবে করব ভাবছি, এমন সময় সে নিজেই বললে, "তোমার বন্ধুটিও কম আশ্চর্য লোক নন। চিঠিখানার কথা আমাকে বলেনইনি। আমি ল্যাবরেটরি-ঘরটায় ঢুকে হঠাৎ ওটা আবিষ্কার করলাম একটু আগে, টেবিলের ওপর ফ্লাস্কে চাপা ছিল—"

দুজনেই চুপ করে রইলাম। একটু পরে মালতীই আবার কথা বললে, "আমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য, তুমি মনে কোরো না যে, উনি আমার মারফত তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছেন। তা জানাচ্ছেন না, আমি নিজের দিক থেকেও কিছু বলছি না, কারণ জানি, তোমাকে কিছু বলা বৃথা, তুমি যা করবার ঠিকই করবে, মাঝ থেকে পোজ করবে একটা নতুন রকম—"

আমি ওর দিকে চেয়ে ছিলাম না, আমি চেয়েছিলাম খোলা জানালা দিয়ে দূর ঈশান কোণে, যেখানে পুঞ্জীভূত মেঘমালা কৃষ্ণতর হয়ে উঠেছিল ক্রমশ, দেখছিলাম বায়ুবিগ্রস্ত কদম গাছটাকে, কিন্তু মর্মান্তিকভাবে অনুভব করছিলাম, ওর জ্বলন্ত দৃষ্টিটা আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললাম, "দেশলাই দাও তো একটা—"

পাশের টেবিলের ড্রয়ার টেনে দেশলাই বার করে দিলে, ভাবলে, সিগারেট ধরাব বুঝি। গৌরীশঙ্করবাবুকে দেবার জন্যে যে চরমপত্রখানা রচনা করেছিলাম, সেখানা পকেটেই ছিল। সেটা বার করে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে বেশ করে ভিজিয়ে নিলাম।

"কি করছ? কি ওটা?"

"শ্রমিক-সঙ্ঘের আলটিমেটাম—"

বাকী হুইস্কিটা এক নিশ্বাসে পান করে ফেললাম নির্জলাই। কাগজখানা ট্রের উপর রেখে ধরিয়ে দিলাম আগুন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা কুঁকড়ে কালো হয়ে উঠল, তারপর দেখতে দেখতে ছাই হয়ে গেল। মালতী নিস্তব্ধ হয়ে বসে বসে দেখলে সব। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, চার চোখের আগুনও নিবে গেছে, পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে মুখখানা। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নাগিনীর মতো তর্জন করে উঠল, "I hate you, I hate you, I hate you!" দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

।। একুশ।।

আলো জ্বলে উঠল।

সে। মালতীর চেয়ে মিনতি মেয়েটি কি ঠাণ্ডা নয়? নিরীহ ভালোমানুষ বেচারী, মুখে কথাটি নেই।

আমি। মালতীর সঙ্গে মিনতির তুলনা কোরো না, তুলনা হয় না।

সে। তুলনা করছি না, কে কি রকম তাই শুধু বলছি। মালতী মুখরা, মিনতি নীরব।

আমি। আর একটু সরব হলে ক্ষতি ছিল না।

চুপ করে রইলাম দুজনেই খানিকক্ষণ।

স্টোভের সোঁ-সোঁ আওয়াজটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে। যাঁর মাথায় ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা এসেছিল এবং সেই প্রতিষ্ঠানে যিনি নীরবতাকেই উচ্চ আসন দিয়েছিলেন, তাঁর মুখে এ কথা শুনে একটু বিস্ময়বোধ করছি।

আমি। ছাত্রের আচরণে যেটা শোভন, প্রিয়ার আচরণে সেটা শোভন না-ও হতে পারে।

সে। মিনতিকে প্রিয়ারূপে কল্পনা করেছেন তাহলে!

সমস্ত মুখখানা হঠাৎ হাসিতে ভরে উঠল।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আবার নীরবতা ঘনিয়ে এল, আবার স্টোভের আওয়াজটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে। যে মেয়ে খুব বকবক করতে পারে তাকেই আপনার পছন্দ যদি, তা হলে বিলেত যাবার মুখে মার্‌সেল শহরে নেমে মাদাম ডি'কস্টার ওখানে যে মেয়েটির সঙ্গে রাত্রিবাস করেছিলেন তার ওপর তত প্রসন্ন হতে পারেননি কেন, তার খিলখিল হাসি আর গলগল বকুনির তো অন্ত ছিল না।

আমি। তুমি মেয়েমানুষ, তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় আমরা মেয়েদের মধ্যে কি চাই।

সে। বোঝা অসম্ভব হত না, যদি চাহিদাটা রোজ রোজ না বদলাত।

আমি। কি রকম?

সে। প্রথম যৌবনের কথা ভেবে দেখুন। লাজনম্রা তন্বী কিশোরী মূর্তিই তখন আপনার স্বপ্নকে মধুর করে তুলত। এই মিনতিই যদি ঠিক দশ বছর আগে আসত, তা হলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। এখন কিন্তু ত্রিশ বছরের মুখরা মালতীই আপনাকে উতলা করে তুলেছে, মিনতিকে নেহাত বিস্বাদ ঠেকছে এবার।

আমি। একটা ভুল হল বোধ হয়। হিসেবটা ঠিক বয়সের নয়, গুণের এবং রুচির। আমি সুক্তো ভালোবাসি না, ঝাল-ঝাল মাংসই আমার প্রিয় খাদ্য। বিষধর সাপ যখন ফণা তুলে গ্রীবাভঙ্গীসহকারে দুলতে থাকে, আমি মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি; কিন্তু কেঁচো দেখলে আমার গা ঘিনঘিন করে।

সে। সত্যি গা ঘিনঘিন করে? কালই তো আপনি মিনতির দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন!

আমি। ঠিক মিনতির দিকে নয়, মিনতির নবোন্মেষিত যৌবনের দিকে। মিনতিকে বাদ দিয়ে যদি তার নবোন্মেষিত যৌবনটাকে বিয়ে করা চলত, আমি বিয়ে করতে রাজী ছিলাম। কিন্তু বাঙালী মেয়ের দেহে যৌবন তো বেশি দিন থাকবে না, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে, পড়ে থাকবে ওই হাঁদা মিনতি, যে একটা রসিকতা বোঝে না, ধমকালে বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, বিছানা মশারি কাঁথা বালিশ রান্নাঘর ভাঁড়ারঘরের বাইরে যার অস্তিত্ব নেই—ওই পড়ে থাকবে। ওকে নিয়ে কি করব আমি সারাজীবন?

সে। আপনার মাকে আপনার কেমন লাগে?

আমি। খুব ভালো লাগে।

সে। সত্যি? খুব আশ্চর্য তো! যতদূর জানি, বিছানা মশারি কাঁথা বালিশ রান্নাঘর ভাঁড়ারঘরের বাইরে তাঁরও তো অস্তিত্ব নেই।

আমি। কিন্তু তিনি মা।

সে। অর্থাৎ তিনি আপনার সব রকম উপদ্রব সহ্য করেন। নয়?

আলো নিবে গেল।

।। বাইশ ।।

নোংরা বস্তি। খুব ছোট একটা খোলার ঘর, বর্ষাকালে চাল দিয়ে জল পড়ে, অন্যকালে আকাশ দেখা যায়, পাশেই পচা নালা দুর্গন্ধ বিকিরণ করছে। অসংখ্য মশা, চীৎকার করছে মাতাল, আর্তনাদ করছে প্রহৃত নারী, কাঁদছে পীড়িত শিশু। তার সঙ্গে মিশছে পেঁয়াজ-ভাজার গন্ধ, রামায়ণ-পাঠ, বেশ্যার সঙ্গীত, উনলের ধোঁয়া, পুলিশের হুমকি। খোলার ঘরের এক কোণে দড়ির একখানি খাটিয়া, খাটিয়ার সামনে উপর্যুপরি সাজানো দুটি কেরোসিন কাঠের বাক্স টেবিলের অভাব পূর্ণ করছে। তার একধারে মিটমিট করে জ্বলছে কালিঝুলি-মাখা সস্তা লণ্ঠন একটা, আর একধারে রয়েছে আধখানা-খাওয়া শুকনো একটা পাঁউরুটি, মাঝখানে তন্ময় হয়ে বসে লিখে চলেছে একজন, মাথায় দীর্ঘ রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল, চোখে শিল্পীর স্বপ্ন।

ব্যাল্‌জাক নয়.....আমি।

সাহিত্য-সেবা করছি।

দেশকে জাগাতে হবে।

দৃশ্য বদলাল।

অভিজাত পল্লী। চমৎকার সুসজ্জিত একটি কক্ষ, পাশেই সুন্দর বাগান সৌরভ বিকিরণ কবছে, অসংখ্য ফুল ফুটেছে, চীৎকার করছে অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর একটা, মোটরটা আর্তনাদ করছে গ্যারেজে, কাঁদছে ক্ল্যারিঅনেট পাশের বাড়ির জ্যোৎস্নালোকিত ছাদে, বাজছে তাতে 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে,' তার সঙ্গে মিশছে বিলিতি এসেন্সের গন্ধ, এজরা পাউণ্ডের কাব্য-পাঠ, রেডিওর সঙ্গীত, সিগারেটের ধোঁয়া, সম্পাদকের বকুনি। কক্ষটির একধারে সোফা সেট, আর একধারে প্রকাণ্ড একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, রেক্সিন দিয়ে মোড়া। তার ওপর আছে সুদৃশ্য দুটি কাচের দোয়াত, এক টুকরো দামী মার্বেলের ওপর বসানো, চমৎকার কাগজ-চাপা গোটা দুই, চায়ের পেয়ালা, কয়েকটা অ্যাশ-ট্রে। টেবিলে পা তুলে সাহিত্য আলোচনা করছি, আশেপাশে এসে জুটেছে তরুণ সাহিত্যিকেরা—বুভুক্ষু, তিক্ত-চিত্ত, সন্দিগ্ধমনা, অসমর্থ, মুখে বিদ্রোহপন্থী। মাসিক পত্রিকার আপিস। আমি সম্পাদক। স্বপ্ন দেখছি,—চোখের উপর ভাসছে রবীন্দ্রনাথ, উত্তরায়ণ, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচি, অটোগ্রাফ, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, দেশসেবা, নোবেল প্রাইজ........

।। তেইশ ।।

আলো জ্বলে উঠল।

সে। শ্রমিক-আন্দোলনের শিখা মালতীর এক ফুৎকারেই নিবে গেল?

আমি। নিজেও ভেবে দেখলাম, আমি ঠিক ওর উপযুক্ত নই। আমি রাজনৈতিক নই, আমি সাহিত্যিক, আজীবন সাহিত্য-চর্চা ছাড়া আর কিছু করিনি।

সে। কিন্তু ব্যাল্‌জাক ডিকেন্সের মতো কৃচ্ছ্রসাধন করবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ ল্যান্সডাউন রোডে বাড়ি ভাড়া করে বসলেন যে?

আমি। মা লুকিয়ে যখন কিছু টাকা দিলেন, তখন কৃচ্ছ্রসাধন করবার দরকার হল না। সাহিত্যিকেরা স্বভাবত বিলাসপ্রবণ, বিলাসের আবেষ্টনীতেই তাদের কল্পনা স্ফূর্ত হয়। শখ করে কেউ কৃচ্ছ্রসাধন করে না, করে দায়ে পড়ে। আমার দরকার হয়নি।

সে। কিন্তু তবু আপনার কল্পনা স্ফূর্ত হল না কেন?

আমি। আমার কল্পনা স্ফূর্ত হয়েছিল কিন্তু একা একটা কাগজ চালানো যায় না, একজনের লেখা পড়ে পাঠকপাঠিকার পিপাসা মেটে না।

সে। কিন্তু আপনার কাগজে যৌন-পিপাসা ছাড়া আর কোনো পিপাসার খোরাক ছিল না।

আমি। আমার দলে যে সব লেখক জুটলেন, তাঁদের কলম দিয়ে অন্য আর কিছু বেরুল না, বেরুনো সম্ভবও ছিল না, কারণ সত্যিই ওঁরা সবাই যৌনক্ষুধায় ছটফট করছিলেন—

সে। ভালো লেখক পেলেন না?

আমি। প্রথমত পয়সা দেবার ক্ষমতা ছিল না, দ্বিতীয়ত ভালো লেখক নেই।

সে। নিজে কাগজ বার না করে প্রতিষ্ঠিত কোনো পত্রিকায় লিখলেই পারতেন।

আমি। চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার লেখা কেউ ছাপতে চাইলে না—সর্বত্রই ক্লিক।

চুপ করে বসে রইলাম দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে। স্টোভটা এখনও জ্বলছে।

একটা দমকা হাওয়ায় খুলে গেল জানালাটা। ওর মাথার কাপড় সরে গেল, অলক উড়তে লাগল।

সে। প্রেসের বিল শোধ করতে পেরেছেন?

মুচকি হাসলে একটু। আলো নিবে গেল।

।। চব্বিশ ।।

"ওহে করুণাসিন্ধু, তোমার ছেলেটা যে একেবারে অধঃপাতে গেল, সামলাও ওকে—"

"কি করে সামলাব বল, পরামর্শ দাও, শাসন করতে তো ত্রুটি করি না—"

"তোমার শাসনের দৌড় বোঝা গেছে; শাসনকর্ত্রী আমদানি কর টুকটুকে দেখে একটি, সব ঠিক হয়ে যাবে—"

হাপরের মতো একটা শব্দ হল, গৌরীশঙ্করবাবু হাসলেন।

"তারও চেষ্টা করছি। মিনতিকে আনিয়েছি—"

"মিনতিটি কে?"

"আমার এক বাল্যবন্ধুর মেয়ে। বেচারা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছে, মেয়েটির বিয়ে দিয়ে যেতে পারেনি—"

"মেয়েটি কেমন?"

"ভারী লক্ষ্মী, যেমন স্বভাব, তেমনই সংসারের কাজকর্মে, মুখে কথাটি নেই—"

"আরে, দেখতে কেমন?"

"দেখতে অবশ্য ডানাকাটা পরী নয়, গেরস্ত-ঘরের মেয়ে সাধারণত যেমন হয়, তেমনই—"

"কিন্তু ও মেয়ে তোমার বিলেত-ফেরত ছেলের মনে ধরবে কি?"

"ধরতেই হবে।"

"যদি না ধরে, কি করবে তুমি?"

"বাড়ি থেকে দূর করে দেব, ত্যাজ্যপুত্র করব, মিনতির পাত্রের অভাব হবে না।"

"তুমিই খরচ করে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেবে বলছ?"

"নিশ্চয়ই। মৌখিক বন্ধুত্ব করি না আমি কারও সঙ্গে। অখিল আমার 'ফ্রেণ্ড" ছিল না, অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।"

"কিন্তু মেয়ে কি তোমার ছেলের উপযুক্ত?"

"আমার ছেলে ও মেয়ের উপযুক্ত কি না তাই আমি ভাবছি।"

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বাবা চিরকালই স্বল্পভাষী, বেশি কথা বলেন না। গৌরীশঙ্করবাবুই আবার কথা বললেন।

"ওই মালতীই ওর মাথা খেলে। তারিণীবাবু আর জগৎবাবুর মুখে যা শুনি, তাতে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায় আমার। মাগী একটা পাবলিক নুইসান্স হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অথচ কিছু বলবার জো নেই, রেস্‌পেক্‌টেবল ভদ্রলোকের স্ত্রী—"

আবার হাপরের শব্দ হল।

'বাবা প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা প্রফেসার গুপ্তকে পার্মানেন্ট করলে নাকি?"

"করতে হল, মানে করতামই। লোকটা তো খারাপ নয়, সত্যিই বিদ্বান লোক। আমি অবশ্য এই উপলক্ষে নিজের কাজ খানিকটা গুছিয়ে নিয়েছি মাগীর মারফত; ভাবলাম, তোমারও হয়তো খানিকটা উপকার হবে তাতে।"

"কি কাজ?"

"তোমার ছেলে আমার মিলের কুলিগুলিকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছিল না? অবশ্য শেষ পর্যন্ত হত না কিছুই, আমি সর্দারদের সব হাত করে নিয়েছিলাম; কিন্তু আমি ভাবলাম এই উপলক্ষে তোমার ছেলের মতিগতিটা যদি ঘুরিয়ে দিতে পারি, মন্দ কি! দেখা করলাম মাগীর সঙ্গে একদিন গোপনে, তার হাতে প্রফেসার চক্রবর্তীর জবানিতে লেখা একখানা চিঠিও দিয়ে এলাম, চিঠিখানা অবশ্য লিখেছিল আমার কেরানী যুগল। মাগীকে বললাম, আপনি যদি প্রেমসিন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এই চিঠিখানা দেখান তাকে, তাহলে হয়তো ছোকরা সামলে যেতে পারে, অমন একটা ভালো ছেলে অনর্থক বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করছে তো বেফয়দা, আমরা বললে শোনে না, আপনি বললে শুনবে, বিশেষত আপনার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে জানলে ঠিক শুনবে, এ শহরে আপনার কথাই ও মানে কেবল। রমেশবাবু পার্মানেন্ট নিশ্চয়ই হবেন, সে

বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নিজে ক্যান্‌ভাস্‌ করছি তাঁর জন্যে। তারপর মাগীকে মিনার্ভাখানায় বসিয়ে বেশ লম্বা এক চক্কর দিয়ে নিয়ে এলুম—"

আবার হাপরের শব্দ হল।

বাবা বললেন, "আমার আর তাতে কি লাভ হল বল?"

"হ্যাঁ, এখন দেখছি কিছুই লাভ হয়নি। ও যে কলকাতায় গিয়ে কাব্য করবে, তা তো ভাবতে পারিনি। মাসিক-পত্রের কি নাম হে—অ্যাঁ—টর্চ। আর ওতে গুষ্টির পিণ্ডি কি যে লেখে ওরা, তার তো কোনও হদিসই পাই না! দেখেছ তুমি?"

"না। শুনেছি, উঠে গেছে কাগজটা।"

"অ্যাঁ! উঠে গেছে! ফিরেছে নাকি প্রেমসিন্ধু কলকাতা থেকে? আবার আমার মিল নিয়ে না পড়ে।"

"ফেরেনি বোধ হয়। দেখিনি তো!"

"আমি কিন্তু একটু আগেই ফিরেছিলাম, পাশের ঘরে চোরের মতো দাঁড়িয়ে শুনছিলাম সব।"

হঠাৎ কপাট ঠেলে একজন ঢুকল।

"এইটেই কি করুণাসিন্ধুবাবুর বাড়ি?"

গলার স্বরে চিনলাম, প্রেস-ওলা।

"আমিই করুণাসিন্ধু। কি চান?"

"ও আপনিই? নমস্কার। প্রেমসিন্ধুবাবু আপনারই ছেলে?"

"হ্যাঁ। কি দরকার?"

"তিনি আমার প্রেস থেকে একখানা কাগজ বার করতেন। কাগজখানা উঠে গেছে, কিন্তু আমার বিল এক পয়সাও পাইনি এখনও।"

"সে তো কলকাতাতেই আছে, তার কাছেই যান।"

"তিনি কলকাতায় নেই—"

"নেই? আচ্ছা, আমার সঙ্গে দেখা হলে বলব আপনার কথা। আপনার নাম-ঠিকানা রেখে যেতে পারেন।"

"কিন্তু যতদূর শুনেছি, তাঁর হাতে একটিও পয়সা নেই। আপনি যদি পেমেন্টটা করে দিতেন, বড় উপকৃত হতাম।"

"আমি পেমেন্ট করব কেন? আমি তো আপনার প্রেস থেকে কিছু ছাপাইনি।"

"তা জানি। কিন্তু আপনার নামের খাতিরেই আমি ধার দিয়েছিলাম আপনার ছেলেকে।"

"আমার নামের খাতিরে। আপনার সঙ্গে আমার চেনা নেই, শোনা নেই, কিছু নেই, অথচ—"

"আপনি একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী—"

"মাপ করবেন, আমি দিতে পারব না—"

প্রেস-ওলা চলে যাচ্ছিল, বাবা ডাকলেন তাকে।

"একটি শর্তে আপনার বিল শোধ করে দিতে পারি।"

"কি বলুন?"

"যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, ওর সঙ্গে বা ওর মতো কোনো ভ্যাগাবণ্ডের সঙ্গে ধারে আর কখনও কারবার করবেন না—"

"এ রকম প্রতিজ্ঞা করা কঠিন। কারবার করতে গেলেই ধার দিতে হয়—"

"লোক বুঝে দেবেন।"

"বোঝা যায় না সব সময়। প্রেমসিন্ধুবাবুকে দেখে কারও বোঝবার সাধ্যি নেই যে, তিনি টাকা মেরে দিতে পারেন। অথচ দেখুন—"

"সে কোথা আছে জানেন?"

"আমার যতদূর খবর, তাঁর এখানেই আজ আসার কথা। কদিন থেকে অবশ্য তিনি সিনেমায় ঢোকবার জন্যে ঘোরাঘুরি করছিলেন, কিন্তু সেখানে কিছু হয়নি শুনলাম।"

"আপনি এ শর্তে রাজি নন তাহলে?"

"যে শর্ত পালন করতে পারব না, তাতে রাজী হই কি করে বলুন? আচ্ছা, চলি। নমস্কার।"

"শুনুন, কত টাকার বিল আপনার?"

"পাঁচ শো বত্রিশ টাকা সাড়ে এগারো আনা—আমার যাতায়াত-খরচা সুদ্ধ ধরেই বলছি।"

ড্রয়ার টানার শব্দ পাওয়া গেল।

বাবা চেক লিখে দিলেন।

"এই নিন। আপনাকে আমি টাকাটা দিতাম না, দিলাম কেবল আপনার চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে। এ রকমটা প্রায় দেখা যায় না এ দেশে।"

অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে সকৃতজ্ঞ চিত্তে বিদায় নিলে প্রেস-ওল। হাপরের শব্দ হল।

"তোমার কাজকর্মই সব আলাদা রকম দেখছি। আচ্ছা, উঠি এবার।"

দৃশ্য বদলাল।

সকাল হয়েছে, অন্য দিনের চেয়ে একটু যেন বেশি গরম লাগছে আজ। ক্যাম্পের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। অদূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার গগনস্পর্শী তুষার-প্রাচীর খাড়া উঠে গেছে যতদূর দৃষ্টি চলে। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি, কাছে দূরে তুষার-প্রপাতের শব্দ শুনেছি সারারাত ধরে, কেমন যেন একটা নিরুদ্ধ গম্ভীর গর্জন, আমাদের আগমনে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন অবরুদ্ধ রোষে গজরাচ্ছে। অস্পষ্ট একটা আশঙ্কা সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে সারারাত কাল তন্দ্রার মধ্যে। চেয়ে চেয়ে দেখলাম চারিদিকে, একটা ঘন কুয়াশা মন্থর গতিতে বিস্তৃত হচ্ছে পূর্ব দিগন্তে, সূর্য উঠেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

এখুনি বেরুতে হবে, আরও খানিকটা উঠে তিন নম্বর তাঁবু গাড়বার কথা আজ, ওই উঁচু ফালি বারান্দার মতো জায়গাটায়। সঙ্গীরা সব বেরিয়ে পড়েছে, ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে তাদের, ছোট ছোট কালো বিন্দুর মতো শুভ্র তুষারের বিরাট পটভূমিকায়। আমাকেও বেরুতে হবে এইবার। জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্যে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকতে যাব, নিদারুণ একটা গর্জন শুনে ফিরে দাঁড়ালাম।

এ কি দৃশ্য! কাঞ্চনজঙ্ঘার গগনচুম্বী তুষার-প্রাচীরের বিরাট একটা অংশ ভেঙে পড়ছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হর্ম্যের মতো হিমানীস্তূপ হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়ছে একসঙ্গে, লক্ষ লক্ষ বিচূর্ণিত তুষারকণা মেঘের মতো আচ্ছন্ন করে ফেলছে চতুর্দিক, গগনবিদারী শব্দে চরাচর প্রকম্পিত হচ্ছে, ভয়ঙ্কর ভীম গর্জনে যেন নেমে আসছে রুষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘার শব্দায়িত শাসন অনিবার্য

করাল বেগে। নেমে আসছে একসঙ্গে কঠিন তরল বাষ্পীয় হিমানীসম্ভার প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব-নৃত্য করতে করতে.....

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছি। মনে হচ্ছে, সমস্ত বোধশক্তি যেন লোপ পেয়েছে। চোখের সামনে দেখতে দেখতে অবলুপ্ত হয়ে গেল ছোট ছোট কালো বিন্দুগুলি, অগ্রগামী সঙ্গীরা বিরাট বরফস্তূপে চাপা পড়ে গেল নিমেষের মধ্যে, জড়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম তাদের জীবন্ত সমাধি। সহসা চেতনা হল, ক্যাম্পের ভিতর থেকে বরফ-কাটা কোদাল বার করে ছুটলাম, বরফ সরিয়ে ওদের তুলতে হবে, যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে ওদের—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছি—স্মাইদ নয়, আমি।

দৃশ্য বদলাল।

নীরব নিথর চতুর্দিক। নির্মল নিখুঁত কালো আকাশে নক্ষত্রগুলো জ্বলছে যেন কষ্টিপাথরে বসানো মণির মতো, অসংখ্য উজ্জ্বল মানিক জ্বলছে, আমার মনের গহন অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে আসছে তাদের শুভ্র নির্মল কিরণস্পর্শে। অনুভব করছি, আমি ছোট নই, হীন নই, তুচ্ছ নই, ওই জ্যোতিষ্কদের সগোত্র আমি। হিমালয়ের উপত্যকায় শুয়ে আছি, চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি পর্বতমালা নিশ্চল বিরাট গাম্ভীর্য নিয়ে, অতি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে তাদের আকাশের দিকে চেয়ে। নির্নিমেষে চেয়ে আছি মহাশূন্যে, তারার মিছিল চলেছে অনাদিকাল থেকে, আমিও চলেছি তাদের সঙ্গে, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কিছু নেই, অনন্ত অনাদি অখণ্ড কালের প্রবাহে নিখিল বিশ্ব ভেসে চলেছে, আমাদের সৌরজগৎ তার মধ্যে এক বিন্দু কিরণকণিকা মাত্র, হিমালয় দেখা যাচ্ছে না। অথচ কি বিরাট বিপুল বিশাল এই হিমালয়!

শুয়ে শুয়ে ভাবছি। তপস্বীর সাধনাক্ষেত্র, তাপিতের তীর্থস্থান, ভারতবর্ষের মহিমার প্রতীক এই হিমালয়, স্বয়ং মহাকাল এখানে ধরা দিয়েছেন উমার কোমল বাহুবন্ধনে, এই হিমালয়ের শীর্ষে পদার্পণ করে সদম্ভে পতাকা রোপণ করবার মতো ধৃষ্টতার কল্পনাও করতে পারি না আমরা ইয়োরোপীয় নাস্তিকদের মতো....ভাবছি, কত কি ভাবছি, ফ্রান্সিস ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড নয়, আমি।

।। পঁচিশ ।।

আলো জ্বলে উঠল।

হাসিমুখে বসে আছে সে।

সে। সিনেমা থেকে বিফলমনোরথ হয়েই বুঝি হিমালয়ে বিবাগী হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখলেন!

আমি। ভারতবাসীর পক্ষে বৈরাগ্যটা নতুন জিনিস নয়, বৈরাগ্যই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

সে। তাই নাকি!

আমি। আমাদের রক্তের মধ্যে ওর বীজ নিহিত আছে, তাই আমরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিক ছুঁচোটাকে গলাধঃকরণ করেও আত্মসাৎ করতে পারছি না। বিপদে পড়েছি কেবল।

সে। আপনার হিমালয়-অভিযানের প্রথম স্বপ্নটা কিন্তু খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক স্বপ্ন।

আমি। স্মাইদের কাঞ্চনজঙ্ঘা অ্যাড্‌ভেঞ্চার বইখানা মনে এমন গভীরভাবে দাগ কেটেছিল যে, হিমালয়ের কথা মনে হতেই আগে ওই ধরনের স্বপ্ন মনে জাগল। তারপর মনে হল, না,

ইয়ংহাসব্যাণ্ডের মতটাই ঠিক। সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে হিমালয়ের মহত্ত্বে অভিভূত হতে পারলে হিমালয় অমৃত দান করেন, কৈলাস-পর্বতে স্বয়ং দত্তাত্রেয় সশরীরে দেখা দেন, ভগবান শ্রীহংসকে যেমন দিয়েছিলেন। কিন্তু হিমালয়ের মাথায় পা তুলে দেবার স্পর্ধা করলে পাওয়া যায় কেবল দুঃখ, হতাশা আর মৃত্যু। ভারতবাসী হিন্দু হিমালয়কে যে চোখে দেখে তাই প্রকৃত হিমালয়-দর্শন। ইংরেজদের ছোঁয়াচ লেগে আমাদের অধঃপতন হয়েছে।

সে। তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি দার্জিলিং পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন কেন?

আমি। আর একটা স্বপ্ন দেখে।

সে। স্বপ্নে যদি মিনতি আসত, ফিরতেন?

আমি। বলতে পারি না।

সে। স্বপ্ন বলছেন কেন, বলুন মালতীর জন্যে ফিরেছি।

আমি। তাই যদি হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি, মালতীই বা কম কিসে? হিমালয়ের তুষারমৌলি উচ্চতা ওর আছে কি না জানি না, কারণ এখনও ওর মনের শিখর অনাবিষ্কৃতই আছে, কিন্তু হিমালয়ের লতা-গুল্ম-বনস্পতি-শোভিত পশু-পক্ষী-পতঙ্গ-সরীসৃপ-সমন্বিত নিবিড় অরণ্য-রহস্য মালতী-চরিত্রে আছে। সত্যি যদি ওই অরণ্যে কেউ নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে, সে আনন্দ পাবে নিশ্চয়।

সে। আপনি পেয়েছিলেন? শেষ পর্যন্ত তাহলে তিব্বতী নাল্‌জোরপার ভয়াবহ তান্ত্রিক স্বপ্ন দেখতে হল কেন আপনাকে আত্মবিলোপ কামনা করে?

আমি। আমি ভীরু, একটা সরীসৃপ দেখে ভয়ে ঘৃণায় পালিয়ে এলাম। তা ছাড়া আত্মবিলোপেও কি আনন্দ নেই?

সে। আছে। কিন্তু তা পদাহত কুকুরের গ্লানিকর আত্মবিলোপ নয়। তা ছাড়া, আপনি তিব্বতী চয়েদের স্বপ্ন দেখেছেন ডেভিড নীলের কেতাবখানা পড়ে। সত্যি সত্যি তা করবার সাধনা বা সাধ্য আপনার নেই। অতি সাধারণ রাসায়নিক পন্থাই অবলম্বন করতে যাচ্ছেন তাই সস্তা নাটকীয় ভঙ্গীতে।

মনে হল, তার চোখের দৃষ্টি যেন অগ্নিশলাকার মতো আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করছে।

আলোটা নিবে গেল।

।। ছাব্বিশ ।।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। সিঁড়িতে কার্পেট পাতা, শব্দ হচ্ছে না। ঘরে ঢুকে দেখলাম, জানালা দিয়ে এক ফালি সোনালী রোদ এসে পড়েছে মালতীর কাঁধে, বাহুমূলে, বুকে। খোলা বই একখানা পড়ে আছে কোলের উপর, কিন্তু পড়ছে না সে। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে আছে ঋজু বলিষ্ঠ ইউক্যালিপটাস গাছটার দিকে।

আমাকে দেখে তার চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠল, মনে হল, যেন একটু আনন্দও।

"একি, তুমি দার্জিলিং থেকে ফিরেছ কবে?"

"কাল—"

"তুমি দার্জিলিং যাবে জানলে আমিও যেতাম তোমার সঙ্গে। ডক্টর মজুমদার চেঞ্জে যেতে বলছেন কতদিন থেকে, সঙ্গী অভাবে যেতে পারছি না, ওঁর মোটে অবসর নেই—"

ক্ষণিকের জন্যে একটা হাসির আভাস দেখা দিয়েই চকিতে মিলিয়ে গেল অধর-প্রান্তে। বেশবাস সম্বৃত করে সোফার একধারে সরে বসল।

"বোসো—"

"রমেশ কোথা?"

"তিনি তো নেই, লক্ষ্ণৌ গেছেন, বি. এস-সির পরীক্ষক হয়ে—"

বসলাম। বইটা তুলে দেখলাম—রবীন্দ্রনাথের কাব্য। 'দুরন্ত আশা' কবিতাটা খোলা রয়েছে। 'ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন'—কবিতাটা যেন পেয়ে বসল আমাকে। পড়তে লাগলাম।

"হঠাৎ দার্জিলিং চলে গেলে যে? শুটিং ছিল নাকি?"

"শুটিং? না।"

"তবে?"

"আমি সিনেমায় ঢুকতে পারিনি।"

"তাই নাকি? কেন, কি হল?"

"বললে, যোগ্যতা নেই।"

"যোগ্যতা নেই? বল কি? তোমার চেয়ে ভালো অভিনেতা তো বড় একটা দেখা যায় না—"

"ভালো নাটক বা ভালো অভিনেতা হলেই যে সিনেমায় স্থান পাবে, এমন কোন কথা নেই। অন্য গুণও থাকা দরকার—"

"আবার কি গুণ?"

"রাম-শ্যাম-হরি-যদুকে মুগ্ধ করতে পারার গুণ।"

"সে গুণও তো তোমার আছে। শ্রমিক-আন্দোলনের নেতা হতে পেরেছিলে যখন—"

"থাক, ওসব আলোচনা করতে ভালো লাগছে না—"

বইটা রেখে দিলাম। তার চোখের দিকে চেয়ে রইলাম ক্ষণকাল নির্নিমেষে, তারপর বললাম, "মালতী, তোমার কাছে এসেছি আমি—"

"চা আনতে বলি?"

"না থাক—"

"অন্য কিছু?"

"না—"

মালতী একটু নড়ে-চড়ে বসল। গায়ে গা ঠেকল। হঠাৎ কেমন যেন আত্মসংযম হারিয়ে ফেললাম, ভদ্রতার মুখোশটা খসে পড়ল এক মুহূর্তে। আবেগভরে তার হাত দুটি ধরে উচ্ছ্বসিত গদগদকণ্ঠে বললাম, "কাল সমস্ত দিন আমি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, কিন্তু পারলাম না, শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে আসতেই হল, তুমি আমাকে যেতে দিলে না—"

"আমি যেতে দিলাম না মানে?"

"হ্যাঁ, তুমিই। আমার এই ব্যর্থ জীবনের বোঝা বইতে না পেরে বিবাগী হয়ে যাচ্ছিলাম আমি, বিশ্বাস কর, নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলাম হিমালয়ের দিকে—"

"একটা উদ্দেশ ছিল তাহলে, একেবারে নিরুদ্দেশ নয়—"

ঘাড় বেঁকিয়ে চাইলে আমার দিকে স্মিতমুখে।

"নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার মুখে আমাকে দার্জিলিং থেকে চিঠি লিখেছিলে যখন—চিঠিও অদ্ভুত চিঠি, প্রকাণ্ড একটা কাগজে মাত্র একটি লাইন—আমি এখানে এসেছি।"

"পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলতে পারতাম। রমেশের ভয়ে পারিনি—"

চুপ করে রইলাম ক্ষণকাল, এই ইঙ্গিতটা ওর মনে কোনো রেখাপাত করল কি না, তা দেখবার জন্যে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

"তারপর?"

"তারপর রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, যেন তুমি আমাকে ডাকছ—"

"তাই ফিরে এলে?"

ভ্রূযুগল উত্তোলন করে বিস্ময় প্রকাশ করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু চাপা হাসি ফুটে উঠল চোখের কোণে।

"আমি সত্যিই অতি হতভাগ্য মালতী, উপহাস কোরো না আমাকে।"

"সত্যি স্বপ্ন দেখে ফিরে এসেছ?"

"সত্যি—"

"নিছক স্বপ্নকে এতটা মূল্য দেওয়ার মতো কুসংস্কার তোমার আছে, তা তো জানতাম না।"

"স্বপ্ন কুসংস্কার নয়, স্বপ্নতত্ত্ব আজকাল বিজ্ঞানের অঙ্গ। টেলিপ্যাথি—"

"টেলিপ্যাথি মানো?"

"মানি। আমি বিশ্বাস করি, সত্যিই মনে মনে তুমি ডাকছিলে আমাকে—"

"তুমি নিজের সুবিধেমত যখন যেটা খুশি বিশ্বাস কর। বিলেতে আমার চিঠিটাই তুমি বিশ্বাস করেছিলে, টেলিপ্যাথিটা করনি—"

"চিঠির ভাষা এত স্পষ্ট ছিল যে, অবিশ্বাস করবার উপায় ছিল না কোনও—"

"ভালো করে পড়েছিলে চিঠিটা?"

"বহুবার। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়েছি কবচের মতো—"

"অত না করে শেষের প্যারাগ্রাফটা যদি মন দিয়ে পড়তে, তাহলেই বুঝতে পারতে। তুমি বুঝেও ছিলে, কিন্তু—যাক।"

"কিন্তু আজও আমি বুঝতে পারিনি, মিথ্যে করে ওরকম চিঠি তুমি লিখলে কেন!"

"একটা উচ্ছ্বসিত প্রতিবাদ প্রত্যাশা করে। দিনের পর দিন কাটিয়েছি তোমার উত্তরের আশায়। রমেশের নামটা পর্যন্ত লিখে দিয়েছিলাম, উত্তরটা ফেরত ডাকেই পাব এই ভেবে। উত্তর এসেছিল, অনেকদিন পরে, এবং এক কথায়—'তথাস্তু'। মনে হল তুমি হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলে।"

"রমেশকে ভালোবাস না তুমি?"

"খুব। তোমার কি বিশ্বাস, জীবনে একবারের বেশি ভালোবাসা যায় না?"

চুপ করে রইলাম।

মালতীও চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বললে, "তোমাকে কিন্তু বাহাদুরি দিই। পরীক্ষা না দেওয়ার যে ওজুহাতটা বার করেছিলে, তা সত্যিই চমৎকার। শুধু অসুখ নয়, একজন

নামজাদা খাঁটি বিলিতি এম. ডি. এফ. আর. সি. পির সার্টিফিকেট সুদ্ধ পাঠিয়ে দিলে বাবার কাছে। 'স্লীপিং সিকনেস' অসুখটার নামই শুনিনি আমরা তার আগে। ও দেশের অত বড় ডাক্তারও যে মিথ্যে সার্টিফিকেট দিতে পারে, তাও ধারণাতীত ছিল।"

"সত্যি আমার স্লীপিং সিকনেস হয়েছিল—"

"সত্যি? কি করে হল ও অদ্ভুত অসুখ?"

"ডাক্তার রবিন্‌সন বলে একজন ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে ভাব ছিল। স্লীপিং সিকনেস নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। কথায় কথায় একদিন তিনি বললেন জানোয়ারের উপর একস্‌পেরিমেন্ট করে তৃপ্তি হচ্ছে না তাঁর, একজন সুস্থ সবল মানুষের ওপর একস্‌পেরিমেন্ট করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু কেউ রাজী হচ্ছে না। ঠিক তার দু দিন আগে তোমার চিঠিখানা পেয়েছিলাম, আমি রাজী হয়ে গেলুম। একটি শর্ত ছিল কেবল, কোনো কারণেই আমার নাম বা ছবি সে প্রকাশ করবে না কারও কাছে—"

সভয় বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে— মেকি নয়, আন্তরিক। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

"এ কথা তো বলনি একদিনও!"

"প্রয়োজন ছিল না—"

"এ অসুখে লোক মারা যায়?"

"যায় বইকি। রবিনসনের চিকিৎসানৈপুণ্যেই বেঁচে উঠলাম আবার। কিন্তু মনে হচ্ছে মারা গেলেই ছিল ভালো।"

"এ গোঁয়ারতুমি করবার কি দরকার ছিল? আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাস করা শক্ত, ফেল করা তো সোজা—"

"সোজাসুজি ফেল করলে এ দেশে মুখ দেখাতে পারতাম না, বিশেষত তোমার বাবার কাছে—"

"আমাকে এ কথা বলনি কেন এতদিন?"

মনে হল, গলার স্বরটা কাঁপল একটু।

"বললাম তো, প্রয়োজন মনে করিনি। তা ছাড়া, আমার বন্ধু রমেশেরই সঙ্গে যখন সত্যি সত্যি তোমার লাভ-ম্যারেজ হল তখন প্রয়োজনটা আরও কমে গেল—"

"আজ বলছ কেন?"

"আজ তোমার প্রণয় ভিক্ষা করতে এসেছি, নিলর্জের মতো এসেছি, রমেশের প্রতি অবিচার করছি, তা জেনেও এসেছি। বুঝেছি, তুমি ছাড়া আমার কোথাও আর আশ্রয় নেই। সত্যি সত্যি আশ্রয় দিতে যদি না-ও পার, ভান কর অন্তত, তাতেই আমি কৃতার্থ হব—"

হঠাৎ চোখের দৃষ্টিতে একটা জ্বালা ফুটে উঠল তার, মনে হল যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ চকমক করে উঠল।

"ভানের কথা উঠছে কেন?"

"কারণ তোমায় আমি ভালোবাসি, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। রমেশের চাকরি সম্পর্কে প্রফেসার চক্রবর্তীর যে চিঠিটা আমাকে দেখিয়েছিলে, সেটা যে জাল চিঠি তা তুমি জানতে!

গৌরীশঙ্করবাবু নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে তোমাকে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন, খুব সম্ভবত তোমার সম্মতিক্রমেই।"

"কি করে জানলে তুমি?"

"স্বকর্ণে শুনেছি গৌরীশঙ্করবাবুর নিজের মুখ থেকে।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ করলেন তিনি এ নিয়ে?"

"আর একজনের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, আমি আড়াল থেকে শুনেছি।"

চুপ করে রইল; কিন্তু তার চোখের দিকে চেয়ে মনে হল, জ্বলছে চোখ দুটো।

দরজা ঠেলে একজন বেয়ারা ঢুকল। হাতে প্রকাণ্ড একটা ট্রে, রুপোর মিনে-করা, সুদৃশ্য দামী তোয়ালে দিয়ে কি যেন ঢাকা দেওয়া রয়েছে তাতে।

গৌরীশঙ্করবাবু ভেট পাঠিয়েছেন।

তোয়ালেটা তুলে দেখালে, এক ট্রে ভরতি বড় বড় লাল লাল আপেল।

অকৃত্রিম বিস্ময়ভরে মালতী বললে—"হঠাৎ ভেট কেন।"

ট্রেটা সামনের তেপায়ার উপর নামিয়ে রেখে বেয়ারা বেরিয়ে গেল নীরবে।

আমি বললাম, "গৌরীশঙ্করবাবুর কাছে আমাকেও যেতে হবে। তাঁর মিলগুলোর জন্যে একজন ম্যানেজার রাখবেন বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন দেখলাম আজকের কাগজে। ওই চাকরিটার জন্যে যাব তাঁর কাছে।"

"তুমি! গৌরীশঙ্করবাবুর অধীনে চাকরি নিতে যাবে?"

"না গিয়ে উপায় নেই। এ শহরে থাকতেই হবে আমাকে। নিজের বাড়িতে থাকতে পারব না, কারণ বাবা নোটিস দিয়েছেন—মিনতিকে বিয়ে না করলে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না। গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের চাকরিটা নিতেই হবে যেমন করে হোক—"

"যদি না পাও?"

"না পেলে কি করব, তা এখনও ঠিক করিনি। তবে মিনতিকে বিয়ে করব না, এটা ঠিক।"

মালতী মুখ টিপে হাসলে একটু।

স্টোভের আওয়াজটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মালতীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, ক্ষণকাল পূর্বে তার চোখে-মুখে যে জ্বালা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, হাসির স্পর্শে স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে সেটা।

"মিনতিকে বিয়ে করতে এত আপত্তি কেন? মেয়েটি তো ভালো শুনেছি, খুব গৃহকর্মনিপুণা—"

"হ্যাঁ, খুব। তার অতি-ব্যগ্র সেবার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আরও পালিয়ে এলাম আমি তোমার কাছে—"

"কেন, কি হয়েছে?"

"দার্জিলিং থেকে নামবার সময় অসাবধানে পা-টা মচকে গেছল হঠাৎ। বাড়িতে এসে চাকরটাকে বললাম, একটু গরম জল করে দিতে শেক দেবার জন্যে। মা থাকলে মা-ই সব করতেন, কিন্তু তিনি এখানে নেই, বদ্যিনাথ গেছেন। খানিকক্ষণ পর দেখি, গরম জলের কেতলি, ফরসা ন্যাকড়া, ফরসা তোয়ালে হাতে করে মিনতি এসে উপস্থিত—আমার পায়ে শেক দেবে

বলে। শুধু একবার নয়, কাল থেকে ক্রমাগত তিন চার ঘণ্টা অন্তর আসছে তার মায়ের ইঙ্গিতে আমার পদসেবা করবার জন্যে, যাতে আমি ওকে পছন্দ করি। সিকেনিং!"

"ওর মা সুদ্ধ এসেছে নাকি!"

"হ্যাঁ, মা পিসীমা কাকীমা মামা কাকা সবাই। বাবা আনিয়েছেন। মিনতির বিয়ে দিয়ে তবে যাবে সব।"

"বাড়ি তা হলে সরগরম বল।"

"একতলা দোতালায় তিল ধরবার স্থান নেই। ভাগ্যে তেতলার ঘরটা ছিল, আর ভাগ্যে বাইরে থেকে তাতে ওঠবার সিঁড়ি ছিল, তা না হলে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম।"

"চাকরিটা যদি না পাও কি করবে?"

"আর যা-ই করি ও বাড়িতে আর থাকব না। ও বাড়িতে আজ রাত্রেই বোধ হয় শেষ থাকা—"

"আমার এখানে থাকতে পারতে, কিন্তু সেটা কি একটু বেশি দৃষ্টিকটু হবে না? তোমার বন্ধুটি থাকলে কোনো কথাই ছিল না।"

"না, আমি এ বাড়িতেও থাকব না। তারিণী মিত্তির আর জগৎ লাহিড়ীরা এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরছে—"

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তার চোখের দৃষ্টিতে আমি যে কি দেখতে পেলাম জানি না, হঠাৎ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল।

"একটা অনুরোধ রাখবে আমার?"

"কি বল—"

"চাকরিটা যদি না পাই, হয়তো এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে আমায়, হয়তো তোমার সঙ্গে দেখাই হবে না আর আমার জীবনে, কিন্তু তার আগে তোমাকে একবার পেতে চাই—মাত্র একবার। আসবে তুমি আমার তেতলার ঘরটায় আজ রাত্রে? দরজা খুলে রাখব আমি, বাইরের সিঁড়ি দিয়ে উঠলে কেউ টের পাবে না।"

"ছি ছি, কি মনে কর তুমি আমাকে! হাত ছাড়—"

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দৃশ্য বদলাল।

হাপরের মতো হাসিটা যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে আমাকে অশরীরী প্রেতের মতো।

"তোমাকে আমার মিলের ম্যানেজার করব? তোমাকে? অ্যাঁ, বল কি? আশা কর তুমি? কি আপদ!"

দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে।

দৃশ্য বদলাল।

শ্মশান। অন্ধকার শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছি একা।

হাতে বাঁশি—হাড়ের বাঁশি—উরুতের হাড় থেকে তৈরী তিব্বতী নাল্‌জোরপার কাংলিং। সজোরে ফুৎকার দিয়ে বীভৎস তান তুলেছি তাতে, ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজছে তার

তালে তালে। আত্মবিসর্জন দিতে এসেছি। সাগ্রহে আহ্বান করছি-–কোথায় আছ, ক্ষুধিত তৃষিত প্রেত-প্রেতিনী-ডাকিনী-যোগিনীর দল, এস, নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর আমার, নিঃশেষ কর আমাকে.....আমার অন্তরের আগ্রহ সহসা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে বেরিয়ে এল আমার মাথা ভেদ করে। জ্বলন্ত শিখার মতো খড়্গ-ধারিণী নারীমূর্তি। খড়্গের এক আঘাতে ছিন্ন করে ফেললে আমার মস্তক, ফোয়ারার মতো উৎক্ষিপ্ত হল শোণিতধারা। রক্তপিপাসু প্রেত-প্রেতিনী-ডাকিনী-যোগিনীর দল ভিড় করে এসে দাঁড়াল চারিদিকে। খড়্গধারিণী আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিতরণ করতে লাগলেন তাদের। ছিন্ন করলেন হস্তপদ, ছাড়িয়ে ফেললেন গায়ের চামড়া, উৎপাটিত করলেন চক্ষু, বিদীর্ণ করলেন উদর, অন্ত্রগুলো বেরিয়ে ঝুলতে লাগল, বইল রক্তের স্রোত, প্রেত-প্রেতিনী-ডাকিনী-যোগিনীরা আহারে প্রবৃত্ত হল লুব্ধ আগ্রহে, তাদের সশব্দ চর্বণে অন্ধকার মুখরিত হতে লাগল।

।। সাতাশ ।।

আলো জ্বলে উঠল।

সে। গৌরীশঙ্করবাবুর আপিস থেকে বেরিয়ে আপনি শ্মশানে চলে গেলেন কোন্ আশায়?

আমি। কোথা যাব আর?

সে। ধাপে ধাপে যখন নামতেই শুরু করেছিলেন তখন এর পরের ধাপে বাবার কাছেই ফিরে যাওয়া উচিত ছিল আপনার অনুতপ্তচিত্তে।

চুপ করে রইলাম।

সে। শ্মশানের বাঁধানো চাতালে বসে তিব্বতীয় কল্পনাবিলাস করতে করতে হঠাৎ উঠে পড়লেন কেন?

আমি। ভয় করতে লাগল।

আবার ওকে ঠকাবার চেষ্টা করছি।

সে। ভয় করছিল অবশ্য একটু একটু, কিন্তু আপনি উঠে পড়লেন টেলিপ্যাথির প্রতি বিশ্বাসবশত। আপনার মনে হতে লাগল, মালতী আপনাকে ডাকছে। এখন মনে হচ্ছে, না গেলেই ঠিক হত, না?

আলো নিবে গেল।

।। আঠাশ ।।

অন্ধকারে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠছি। সিঁড়িতে কার্পেট পাতা, শব্দ হচ্ছে না। ভাবছি, মালতীর কাছে মুখ দেখাব কি করে; ভাবছি, মালতী কি বলবে; ভাবছি, মালতীকে ছেড়ে যাব কি করে! কিন্তু যেতেই হবে, এ শহরে আর মুখ দেখাতে পারব না। ভাবছি, মালতীকে ক্ষণিকের জন্যও একবার চাই; ভাবছি, আর একবার বলব তাকে আমার তেতলার ঘরটাতে যেতে, পায়ে ধরব তার......

ওপরে উঠে দেখি, মালতীর ঘরে কেউ নেই। পাশেই রমেশের ল্যাবরেটরি, কপাট ভেজানো, কপাটের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। কপাট ঠেলে ঢুকলাম। ঢুকেই মনে হল, ভূমিকম্প হচ্ছে, বিশ্বাস হচ্ছে না কিছু, দৃষ্টি প্রলাপ দেখছে। মালতী আর গৌরীশঙ্কর! মালতী গৌরীশঙ্করের গলা জড়িয়ে আদর করছে। খানিকক্ষণ পরে যখন চমক ভাঙল, দেখলাম, ভূতের মতো আমি একাই দাঁড়িয়ে আছি.....ঘরে কেউ নেই.....দুজনেই বেরিয়ে গেছে......

মনে হল এ যেন ল্যাবরেটরি নয় শ্মশান। শ্মশানে সেই প্রেত-প্রেতিনী-ডাকিনী-যোগিনীর দল আবার ঘিরে ধরেছে আমাকে, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমার কষ্ট হচ্ছে না, আমি যেন সাগ্রহে বলছি—খাও, খাও, আমি পাপী, আমি মূর্খ, আমি ঋণী, আমার জীবন নিয়ে মুক্তি দাও আমাকে....হঠাৎ দেখলাম, সামনে একটা শেল্‌ফ রয়েছে। তার ওপর ছোট একটা শিশি। তার গায়ে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা—সোডিয়ম সায়ানাইড।

।। উনত্রিশ ।।

আলো জ্বলে উঠল।

সে। সায়ানাইড খেলে সত্যিই কি মুক্তি পাবেন আপনি? সত্যিই কি অঋণী হয়েছেন?

চুপ করে রইলাম।

হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হতে লাগল সে হাসি, ক্রমশ একটা জ্যোতির্মণ্ডলের মতো হয়ে উঠল দেখতে দেখতে, সে তার মধ্যে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

আমি চুপ করে বসেই রইলাম।

হঠাৎ দেখি, দ্বারপ্রান্তে শীর্ণকান্তি দীর্ঘদেহ কে একজন দাঁড়িয়েছে এসে।

"কে?"

"আমি যতীন—"

"যতীন? কোথা থেকে এ সময়ে?"

"কয়েকদিন হল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। আমায় একটু জায়গা দিতে পারিস ভাই?"

"জায়গা? কেন, কি হয়েছে তোর?"

"টি. বি.।"

"বাড়ি যাসনি?"

"বাড়ি ফেরবার আর মুখ নেই। আমার জন্যে বাবার চাকরি গেছে, দাদার চাকরি গেছে, ভাই নজরবন্দী হয়ে আছে, অবিবাহিত বোনটা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"

"কোথা আছিস তুই এখন?"

"এখন কোথাও নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। জেল থেকে বেরিয়ে চেনাশোনা একটা মেসে এসে উঠেছিলাম, কিন্তু মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে তারা আর রাখতে চাইলে না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। একটু জায়গা দিতে পারিস আমাকে, বেশি নয়, শুধু মরবার মতো জায়গা একটু—"

বাইরে কে যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

"বাইরে কেউ আছে নাকি?"

"ছোট একটা ভিখিরীর ছেলে। কদিন আগে ওর মা মারা গেছে রাস্তায় অনাহারে। ছেলেটা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিল, আমি এক পয়সার মুড়ি কিনে দিয়েছিলাম, সেই থেকে সঙ্গ ছাড়ছে না কিছুতেই। আয়, ভেতরে আয়, কাঁদছিস কেন, আমি যদি জায়গা পাই, তুইও পাবি, আয়।"

এল—

জীর্ণ-শীর্ণ সাত-আট বছরের ছেলে একটা। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মাথার চুল রুক্ষ, কটা। গা-ময় খোস, চোখ উঠেছে, গালের উপর চোখের জলের দাগ। যতীনের পাশে দাঁড়িয়ে পিচুটিভরা অশ্রুপূর্ণ চোখে চেয়ে রইল দুজনে, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আমি তাদের বসতে পর্যন্ত বললাম না।

অন্ধকার হয়ে এল।

নিবিড় অন্ধকারে চুপ করে বসে রইলাম।

।। ত্রিশ ।।

আলো জ্বলে উঠল।

সে বসে আছে।

সে। চিনতে পারলেন ছেলেটি কে?

আমি। না।

সে। বাতাসীর ছেলে হয়তো।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। বাতাসীর ছেলে?

সে। ভাবছেন কি?

আমি। বাতাসীর ছেলে কি করে আসবে?

সে। আপনার দরজা খোলা আছে যে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আবার। মনে হল, আবার আসছে তারা। সে উঠে গেল। সবিস্ময়ে দেখলাম, দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে মালতী। হু-হু করে একটা কনকনে বাতাস ঢুকল জানলা দিয়ে, আমার ব্যর্থ জীবন-কাহিনীর পাতাগুলো উড়তে লাগল এলোমেলো হয়ে ঘরের চারিদিকে।

মাথার খোঁপাটা দু-হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে মালতী এসে বসল আমার সামনে। হাওয়ার বেগে লালপেড়ে কমলারঙের শাড়িখানা আঁটসাট হয়ে বসে গেল তার নিটোল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি তুলে সে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ আমার পানে। আমিও চেয়ে রইলাম।

"তুমি ডেকেছ বলে আসিনি, আমি এসেছি আমার নিজের গরজে। আমাকে তুমি কোনোদিন বুঝতে পারনি, আজও হয়তো পারবে না। তবু সরল সত্যি কথাটা বলতে এসেছি, ইচ্ছে হয় বিশ্বাস না-ও করতে পার। এই নাও—"

বুকের ভেতর থেকে একখানা কাগজ বার করে দিলে আমার হাতে। হাতের স্পর্শ পেলাম। আঙুলগুলো ঠাণ্ডা কনকন করছে। পড়ে দেখলাম, গৌরীশঙ্করবাবু মাসিক আড়াই শত টাকা বেতনে আমাকে তাঁর মিলের ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন। তাঁর নিজের হাতে লেখা নিয়োগপত্র।

"তুমি জান, আমার টাকার অভাব নেই, আমাকে যদি কিছুমাত্র বুঝে থাক, তাহলে এও তোমার জানা উচিত, ওই জরদগব জরাগ্রস্ত মাংসপিণ্ডটার উপর কিছুমাত্র লোভ থাকবার কথা নয় আমার। যুগলবাবুর স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে উনি আমার পিছু নিয়েছেন, কিন্তু আমল পাননি এতদিন। আজ স্বচক্ষে তুমি যা দেখেছ তা সম্ভব হয়েছে কেবল তোমারই জন্যে, ও ছাড়া তোমার চাকরি পাবার আর কোনো উপায় ছিল না। আমি চললাম—"

উঠে চলে গেল কিছুদূর—তারপর আবার ফিরে দাঁড়াল—"আর একটা কথা বলে যাই তোমাকে। সেদিন যখন মদে ভিজিয়ে শ্রমিক-সঙ্ঘের আল্‌টিমেটামটা পুড়িয়ে ফেলেছিলে, একটুও খুশী হইনি আমি। গৌরীশঙ্করবাবু যখন ওই জাল চিঠিখানা নিয়ে এসে সাধ্যসাধনা করছিলেন আমাকে, তখন আমি রাজী হয়েছিলাম বটে; কিন্তু খুব বড গলা করে তাঁকে বলেছিলাম—'দেখবেন, প্রেমসিন্ধু কিছুতেই রাজী হবে না। সে রকম ছেলেই নয় ও।' তুমি আমাকে হতাশ করেছ সেদিন। তোমরা জান না, আমরা কি চাই। জান না তুমি, আমার কি সর্বনাশ করলে। জীবনে বহু পদলেহী কুকুরকে প্যাট করেছি; পুজো করতে চেয়েছিলাম একটা মাত্র যে মানুষকে, তুমি পাঁকে ডুবিয়ে হত্যা করলে তাকে—"

চলে গেল।

কতক্ষণ বসে ছিলাম মনে নেই।

হঠাৎ দেখলাম, সে বসে আছে সামনে।

সে। মালতী যা-ই বলুক, আমি জানি, আপনি সত্যিই একজন আদর্শবাদী ভালো ছেলে। ভুল পথে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন কেবল।

আমি। একটু পরেই যে লোক জন্মের মতো পৃথিবীকে ছেড়ে যাবে, ঠাট্টা করতে ইচ্ছে হচ্ছে তাকে?

সে। সত্যি ছেড়ে যাবেন? আর তো যাবার কোনো কারণ নেই। বেঁচে থাকবার যথেষ্ট হেতু তো পেলেন।

আমি। কি?

সে। নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন যে, মালতী আপনাকে ভালোবাসে এবং সে অসতী নয়।

আমি। কিন্তু আমার এই ব্যর্থ ক্ষতবিক্ষত জীবন নিয়ে বাঁচার কোনো অর্থ হয় না।

সে। আপনার জীবন? আপনার জীবন শুরুই তো হয়নি এখনও। এতদিন তো শুধু গা বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে এসেছেন। যুদ্ধ করলেন কখন যে ক্ষতবিক্ষত হবেন?

আমি। এতদিন তাহলে যা করলাম, সেটা কি?

সে। কিছুই নয়। অপরের শোনা কথা কপচেছেন, অপরের দেখা স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন। লেলিনের কথা শুনে কমিউনিজ্‌ম করেছেন, রবীন্দ্রনাথকে দেখে কাব্য করেছেন; কিন্তু ভুলে গেছেন, আপনার নিজের মূলধন একটি কানাকড়ি নেই।

আমি। মূলধন মানে?

সে। চরিত্র, মনুষ্যত্ব—যা না থাকলে কিছুই হয় না পৃথিবীতে। আপনি কি সত্যিই আপনার দেশকে ভালোবাসেন?

আমি। বিলেত গিয়ে আর কিছু না শিখি, দেশকে ভালোবাসতে শিখেছি।

সে। সত্যিই যদি দেশকে ভালোবেসে থাকেন, শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকুন জীবনকে। মাটি দেশ নয়, দেশবাসীই দেশ, আপনিই দেশ। আপনার মৃত্যু মানে দেশেরই একটা অংশের মৃত্যু।

আমি। কি করতে বল তুমি তাহলে? এই ঘৃণিত অস্তিত্বটাকে লাঞ্ছনা-অপমানের মধ্যে দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে বল আমরণ? মৃত্যু ছাড়া আমার মুক্তি আছে?

সে। আছে।

আমি। কি?

সে। বলতে পারি, যদি ওই সায়ানাইডের পুরিয়াটা জানলা দিয়ে ফেলে দেন আগে।

প্রদীপ্ত চক্ষু দুটি নিবদ্ধ হয়ে রইল আমার মুখের উপর। মনে হল, অমৃত বর্ষণ করছে। কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম। উঠে দাঁড়ালাম মোহাবিষ্টের মতো, ধীরে ধীরে গেলাম জানলার কাছে, পুরিয়াটা ফেলে দিলাম।

স্টোভের সোঁ সোঁ আওয়াজটা থেমে গেল হঠাৎ। নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে। চেয়ে দেখলাম, সে বসে আছে, একটা মহিমা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে। গিয়ে বসলাম।

আমি। এইবার বল।

সে। বিয়ে করুন।

আমি। বিয়ে করব! এই তোমার মুক্তির বার্তা?

সে। আগে মানুষ হোন, তারপর মুক্তির পথ আপনি নিজেই খুঁজে পাবেন।

আমি। মানুষ হবার জন্যে বিয়ে করতে হবে?

সে। তার মানেই দায়িত্ব নিতে হবে।

আমি। তোমার মতে তাহলে বিবেকানন্দ বিয়ে করেননি বলে মানুষ ছিলেন না?

সে। তিনি অতি-মানুষ ছিলেন। ওঁদের নকল করতে গিয়েই সাধারণ মানুষ আপনারা দু-কূল হারিয়েছেন।

আমি। আমাদের কি করতে হবে তাহলে?

সে। সংসার করতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে। আমার একটা পেট কোনোরকমে চালিয়ে নেব—এ মনোবৃত্তি পশুর, মানুষের নয়। সমাজের দায়িত্ব ঘাড়ে করে সমাজের সুখ-দুঃখের অংশ নিয়ে সৎপথে জীবন যাপন করার নামই মনুষ্যত্ব, তাই দেশ-সেবা।

আমি। কতকগুলো দরিদ্র অক্ষম অপোগণ্ড সৃষ্টি করলেই দেশ-উদ্ধার হবে?

সে। আপনি হয়তো দেশ-উদ্ধার করতে পারবেন না, আপনার বংশধর করবে, সে না পারলে তার সন্তানেরা করবে। কিন্তু আপনার পরে আর যদি কেউ না থাকে, আপনার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে কে? আর সবাই যে দরিদ্র অক্ষম অপোগণ্ড হবে, তাই বা কে বললে আপনাকে? পৃথিবীর অধিকাংশ বড়লোকই তো দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিলেন। ঠাকুরদাস যদি দারিদ্র্যের ওজুহাতে বিয়ে না করতেন, বিদ্যাসাগরের জন্ম হত? আপনি দেশকে ভালোবাসেন বলছেন, দেশের জন্যে কি করেছেন আপনি?

আমি। কিছুই করতে পারিনি।

সে। কিন্তু সে কাজ করবার জন্যে কি রেখে যাচ্ছেন, কাকে রেখে যাচ্ছেন?

আমি। কাকে বিয়ে করব. মালতীর যে বিয়ে হয়ে গেছে।

সে। মিনতিকে বিয়ে করুন।

আমি। মিনতিকে?

সে। হ্যাঁ, মিনতিকে। ওই আপনার মতো লোকের আদর্শ পত্নী। ও কিছু বলবে না, কোনো প্রশ্ন করবে না, শুধু সহ্য করবে। যে পা দিয়ে ওকে লাথি মারবেন, সেই পা ও পুজো করবে ভক্তিভরে নীরবে। ও মূর্খ, ও অশিক্ষিত, কিন্তু ও মূর্তিমতী ক্ষমা, মূর্তিমতী সেবা, যে ক্ষমার যে সেবার আপনার প্রয়োজন জীবনে। মালতী আপনার কাব্যের নায়িকা হতে পারে, কিন্তু মিনতি হবে আপনার গৃহশ্রী।

হঠাৎ ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল।

খুট করে শব্দ হল দ্বারপ্রান্তে।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, গরম জলের কেতলি হাতে নিয়ে মিনতি এসে দাঁড়িয়েছে।

পীতাম্বরের পুনর্জন্ম

।। এক ।।
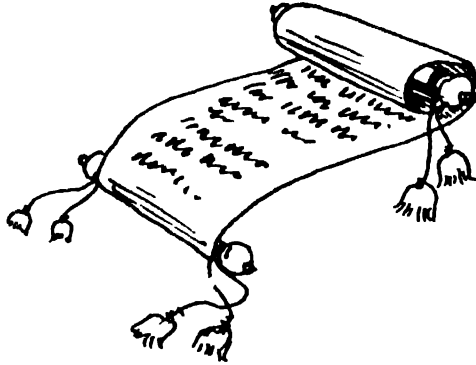
প্রথমেই শুনে রাখুন, ঘোষ মারা গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহের অবসর নেই। যারা তাকে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল—নরেন, হাবুল, টপু, জগু, মানে সৎকার সমিতির সেই দলটাই,—তারা এর সাক্ষী আছে। দত্তও ছিল সেই শবযাত্রার নাতিক্ষুদ্র অনুসরণকারীদের মধ্যে। সে নিজের চোখে দেখেছে ঘোষকে চিতায় চড়ানো হল। তারপরই অবশ্য তাকে চলে আসতে হয়েছিল দোকান খোলবার জন্য। তার দোকান থাকবে বন্ধ আর সে বসে বসে ওই ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে মড়া-পোড়ানো দেখবে এতো বেকুব লোক দত্ত নয়।

ঘোষ পটল তুলেছিল।

তবে একটা কথা, মৃত্যুকে কেন যে লোকে পটল-তোলা বলে তা আমি জানি না। পটল নামক নিতান্ত নিরীহ তরকারিটি তোলা কি এমন ভীতিকর ব্যাপার যে তার সঙ্গে ভয়ংকর মৃত্যুর উপমা দিতে হবে তা আমার মাথায় আসে না। সরলভাবেই বলছি, আসে না। তোলা কথাটা যদি ব্যবহার করতেই হয় তাহলে হেঁচকি তোলা, তাঁবু তোলা প্রভৃতি অনায়াসেই ব্যবহার করা যেতে পারত। কিন্তু আমাদের মাননীয় পূর্বপুরুষরা তা করেননি। মরে যাওয়াকে তাঁরা পটল-তোলাই বলেছেন, আমিও তাঁদের কথার প্রতিধ্বনি করলাম। পূর্বপুরুষদের 'হাঁ'-য়ে হাঁ না মেলাতে পারলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সুতরাং আপনাদের অনুমতি নিয়ে আবার বলছি ঘোষ পটল তুলেছিল।

দত্ত কি নিঃসংশয়ে জানত যে ঘোষ মারা গেছে? নিশ্চয় জানত। যদিও দত্ত স্বচক্ষে ঘোষকে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখেনি, যদিও চিতা থেকে বেঁচে উঠেছে এরকম কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে, তবু দত্ত জানত যে ঘোষ মারা গেছে। ঘোষ-দত্ত কোম্পানিতে ঘোষ দত্তের অংশীদার ছিল। সমান অংশীদার। দত্তই ছিল নিঃসন্তান ঘোষের একমাত্র উত্তরাধিকারী, একমাত্র উত্তরসূরী, একমাত্র ব্যবস্থাপক, এককথায় একমাত্র সর্বেসর্বা। ঘোষই দত্তের একমাত্র বন্ধু ছিল এবং ঘোষের মৃত্যুতে একমাত্র দত্তই শোকাচ্ছন্ন হয়েছিল খানিকক্ষণের জন্য। কিন্তু শোকাচ্ছন্ন হয়ে সে দোকান বন্ধ করেনি, সেদিন দোকান খুলে রেখেছিল বলে কেনা-বেচাও ভালো হয়েছিল।

শোকাচ্ছন্ন কথাটার সূত্র ধরে আমি আবার সেইখানে ফিরে যাচ্ছি যেখানে আমি গল্পটা শুরু করেছিলাম। ঘোষ নিঃসন্দেহে মারা গিয়েছিল। এই কথাটা ভালো করে মনে রাখতে হবে, তা না হলে গল্পের রসই জমবে না। যেদিন হ্যামলেট নাটক শুরু হয় সেদিন আমরা সবাই জানতাম যে হ্যামলেটের বাবা আগে মারা গেছেন। এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হলে নাটকই জমত না। তিনি গভীর রাত্রে ঠাণ্ডা আর পুবে হাওয়া তুচ্ছ করে নিজের প্রাসাদের আশেপাশে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন এ ঘটনায় এমন আর কি রস পেতুম তাহলে আমরা? ছেলে আর বউকে বিব্রত করে অমন অনেক বুড়ো টো টো করে রাত্রিবেলা ঘুরে বেড়ায়।

দোকানের সামনে যে সাইনবোর্ড টাঙানো ছিল তার থেকে ঘোষের নামটা তিনি তুলে দেননি। ঘোষের মৃত্যুর পরও সাইনবোর্ডের উপর লেখা ছিল ঘোষ-দত্ত কোম্পানি। দোকানের

সামনেই টাঙানো থাকত সেটা। নূতন খদ্দেরদের মধ্যে কেউ কেউ দত্তকে দত্ত বলে সম্বোধন করতেন, কেউ আবার বলতেন ঘোষ। দত্ত দু'নামেই সাড়া দিতেন। তাঁর কাছে দুই-ই এক ছিল।

দত্তের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয়নি এখনও। শুনুন। কঠিন লোক ছিল দত্ত, হাত দিয়ে জল গলত না। অমন কঞ্জুষ, কৃপণ, জাঁহাবাজ, দমবাজ, ছিনে-জোঁক, অমন লোভী ইতর পয়সা-পিশাচ দেখা যায় না সাধারণত। পাথরের মতো কঠিন ছিল লোকটা কিন্তু সে পাথর থেকে লোহা মেরেও কেউ কখনও প্রসন্নতার স্ফুলিঙ্গ বার করতে পারেনি। প্রাণ খুলে কথা কইত না কারো সঙ্গে। একা একা চুপচাপ থাকত, যেন ঝিনুকটি। তার মনে সম্ভবত বরফ জমে থাকত। তাকে আনন্দ করতে দেখেনি কেউ, হাসতে দেখেনি। এই জন্যেই সম্ভবত তার নাকের ডগাটা ঈষৎ বেঁকে গিয়েছিল, সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন ঠাণ্ডা-লাগা বোদা-গোছের ছিল। তার গাল দুটো চোপসানো, পায়ে গেঁটে বাত, চোখ লাল, ঠোঁট নীল, কথাবার্তা ঝাপসা-ঝাপসা। তার মাথার চুল, চোখের পাতা, ভুরু, আর সরু চিবুকের উপর সামান্য দাড়ি সাদা ছিল, অথচ পাকা মনে হত না, মনে হত ওগুলোর উপর বরফ পড়েছে যেন। জীবনের উত্তাপের কোন প্রকাশ ছিল না তার মধ্যে, বরং উলটোটাই ছিল। সে যেখানে যেত সেখানে একটা হিম-শীতল পরিবেশ ঘনিয়ে আসত। এমন কি তার আপিসেও কোন উচ্ছ্বাস বা হাসি শোনা যেত না। সব চুপচাপ, সব ঠাণ্ডা।

বাইরের ঠাণ্ডা বা গরম কাবু করতে পারত না দত্তকে। গ্রীষ্মকালে সে ঘামত না, শীতকালে বেশী শীত করত না তার। শীতকালের কনকনে উত্তুরে হাওয়ার চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা ছিল সে নিজে। আর ছিল ভীষণ একগুঁয়ে। যেটা ঠিক করেছে তা করবে, করবেই। বৃষ্টি বা ঝড়কে বরং অনুরোধ করে থামানো সম্ভব, কোনও মুনি ঋষি হয়তো তপস্যাবলে তা পারলেও পারতে পারেন। কিন্তু এটা বলতে পারি দত্তের কাছে হার মানতে হবে তাঁদের। ঝড় বৃষ্টির মতোই অনিবার্য আর দুর্বার ছিল লোকটা। ঝড়-বৃষ্টির সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায়, মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টির আগমনে প্রাণে আনন্দ জাগে, মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টির প্রকাশ সত্যিই মনোহর হয়, কিন্তু ঘেঁচি দত্তের বেলায় তা বলা যাবে না।

কেউ কখনও রাস্তায় তাকে থামিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করেনি—'দত্ত যে। কেমন আছ ভাই? কবে আমাদের বাড়ি আসছ।' কোনও ভিখারী তার কাছে ভিক্ষা চাইত না, স্কুলের ছেলেমেয়েরা রাস্তায় তার কাছে কখনও জানতে চাইত না কটা বেজেছে, কেউ জানতে চাইত না অমুকের বাড়িতে যাব, রাস্তাটা কোন্ দিকে বলুন তো। এমন কি রাস্তার কুকুরগুলোও তাকে চিনতো। দেখলেই ল্যাজ গুটিয়ে চলে যেত অন্য ফুটপাথে।

কিন্তু দত্ত কি এসব গ্রাহ্য করত? মোটেই না। বরং এইটেই ভালোবাসত সে। সমস্ত রকম ভদ্রতা ভালোবাসাকে এড়িয়ে পথের এক পাশ দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলে যাওয়াটাই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। সে চাইতো লোকে তাকে 'তুখোড়' বলুক। কিছুর তোয়াক্কা করত না সে।

সেবার পুজোর সময় দত্ত নিবিষ্টমনে তার দোকানে কাজ করছিল। সেবার পুজোয় বৃষ্টি নেমেছে খুব। ষষ্ঠীর দিন থেকেই মুষলধারা শুরু হয়েছিল। শুধু বৃষ্টি নয়, ঝোড়ো হাওয়াও ছিল সঙ্গে সঙ্গে। চারিদিকে একটা প্যাচপেচে ঠাণ্ডা ভাব। দত্ত বসে বসে শুনতে পাচ্ছিল তার

দোকানের সামনে দিয়ে লোকেরা ছপ ছপ করে যাতায়াত করছে। কারো মাথায় ছাতা, কারো টোকা, কারো গামছা, কারও আবার কিছু নেই। ভিজতে ভিজতেই চলেছে। একটু আগেই টং টং করে তিনটে বেজেছে লাহাদের ঘড়িতে। কিন্তু তখনই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে গেছে বেশ। দু'একটা বাড়িতে আলোও জ্বালা হয়েছে। আবছা অন্ধকার মাখানো দিনের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে সে আলো জানলা দিয়ে। ক্রমশ অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এল। রাস্তার ওপারের বাড়িগুলোকে ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হতে লাগল। দু'একটা বাড়িকে মনে হচ্ছিল যেন প্রকাণ্ড হাতি দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাড়িটা দেখে দত্তর কেরানী যদুবাবুর একটা পৌরাণিক কথা মনে জাগল। সে ভাবল মেঘবাহন ইন্দ্র বুঝি স্বয়ং মেঘে চড়ে পুজো দেখতে এসেছেন। আর তাঁর ঐরাবত খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁকে।

দত্ত আর যদুবাবু দুজনে দু'ঘরে, মাঝখানে একটি কপাট। সেই কপাটের ভিতর দিয়ে দত্ত যদুবাবুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। যদুবাবুর ঘরটি এমনিতেই একটি অন্ধকূপ বিশেষ। সেদিন সেটি একেবারে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। যদুবাবু তাঁর টেবিলটির উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখছিলেন। একটা আলো জ্বেলে নেওয়া উচিত ছিল। লণ্ঠনও কাছে ছিল একটা। কিন্তু যদুবাবু দত্তর ভয়ে লণ্ঠন জ্বালতে পারছিলেন না। জ্বালবার উপায়ও ছিল না। তেল ছিল না লণ্ঠনে। যখনই লণ্ঠন জ্বালবার দরকার হয় দত্ত নিজে হাতে মেপে তেল ঢেলে দেয় তাতে। তেলের টিন দত্তর ঘরে, দত্তর চেয়ারের ঠিক পিছনে। লণ্ঠনের কাজ হয়ে গেলে যদুবাবুকেই বাকি তেলটুকু আবার টিনে ঢেলে রেখে যেতে হয়। অত হাঙ্গামা করতে ইচ্ছে করছিল না যদুবাবুর। অন্ধকারেই ঝুঁকে পড়ে চিঠিগুলো লিখে ফেলছিলেন তিনি। মেজাজ খারাপ ছিল, পুজোর সময়ও ছুটি পাননি। দত্ত কোন পাল-পার্বণেই দোকান বন্ধ করত না। এখনকার মতো কড়া আইন তখন ছিল না। মালিকরা যা খুশী করতেন।

"মামা আছো! যাক্, বাঁচা গেল! উফ্"—তরুণ কণ্ঠে কলরব করে আপাদমস্তক ভিজে ঢুকল প্রমোদ। দত্তর ভাগনা। লোকে বলে নরানাং মাতুলক্রমঃ। কিন্তু প্রমোদকে দেখলেই বোঝা যায় কথাটা সব সময় ঠিক নয়।

"বুঝলে মামা, এবার আমরা পুজোয় থিয়েটার করছি। ফরচুনেট্‌লি মিত্তিরদের বড় হলটা আমরা পেয়ে গেছি। বাইরেই করতুম, কিন্তু যা বৃষ্টি—"

ভ্রূকুঞ্চিত করে দত্ত আপাদমস্তক নীরবে নিরীক্ষণ করলে তার ভাগনেকে। তারপর বলল—"থিয়েটার করবে? খুব ভালো কথা। তা এখানে কেন!"

"চাঁদা চাই। অন্তত দশটা টাকা দিতে হবে।"

"চাঁদা? থিয়েটারের জন্যে চাঁদা? ফক্কুড়ি করবার জায়গা পাওনি!"

"ফক্কুড়ি! থিয়েটার ফক্কুড়ি! গিরিশ ঘোষের 'জনা' করছি আমরা। 'জনা' ফক্কুড়ি?"

"সব ফক্কুড়ি। বিলকুল ফক্কুড়ি। পুজোয় এতো ফূর্তি করা মানেই ফক্কুড়ি। বেফয়দা পয়সার শ্রাদ্ধ"

"শ্রাদ্ধ! পুজোয় ফুর্তি করব না?"

"কেন করবে। তোমার ফুর্তি করার কি হেতু আছে। তোমার মা রাঁধুনিবৃত্তি করে সংসার চালায়, তুমি থিয়েটার করবে কেন জবাব দাও।"

প্রমোদ গুম হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর বলল, "বেশ তুমিও তাহলে একটা কথার জবাব দাও। তোমার তো পয়সার অভাব নেই। তুমি এই পুজোর দিনে গোমড়া মুখ করে দোকানে বসে আছ কেন!"

"দেখ্ ফক্কুড়ি ছাড়। বাড়ি গিয়ে ভিজে জামা কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল গে। অসুখে পড়লে তোর মা বিপদে পড়বে।"

"না, আগে আমার কথার জবাব দাও। তুমি পুজোর দিনে দোকানে বসে আছ কেন?"

"কি করব তাহলে—!" খেঁকিয়ে উঠল দত্ত।

"থিয়েটার করবে। শকুনির পার্ট তোমাকে চমৎকার মানায়। কাত্যায়নও করতে পার—"

"যা যা ফাজিল কোথাকার—"

"রাগ কোরো না মামা, লক্ষ্মীটি। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে—"

থিয়েটারি ভঙ্গীতে লাইনটা আবৃত্তি করে দিলে প্রমোদ।

"আনন্দময়ী? আনন্দ কোথা দেখলি? অ্যাঁ? কারো তো অন্ন-বস্ত্র নেই। সব তো চিঁ চিঁ করে ঘুরছে। ভিকিরির দল সব। আনন্দ! পুজো মানেই তো খরচ, কুমোরকে দাও, কামারকে দাও, পুরুতকে দাও, কতকগুলো অপোগণ্ডকে গেলাও আর নতুন জামা কাপড় কিনে দাও। টাকা কই? টাকা কে দেবে! পুজোয় কি দশটা হাত পা গজাবে দশভুজার মতো! পুজো এলো মানে এক বছর বয়স বেড়ে গেল। বুড়ো হয়ে গেলাম। এতে আনন্দের কি আছে! অ্যাঁ? থিয়েটার করবেন বাবু! আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো এই কদিন তোদের মতো গরুকে খোঁয়াড়ে আটকে রেখে দিতুম। চাবকাতুম!"

"ছি ছি মামা! কি সব বলছ পুজোর সময়—"

"ঠিকই বলছি! তোমার পুজো তোমার পকেটে রেখে দাও। আমার পুজো আমার কাছে থাক।"

"কোথায় থাকবে—"

"যেখানে রোজই থাকে।"

"কোথা?"

দত্ত নিজের কাঠের হাতবাক্সটি দেখিয়ে দিল।

'ফছ্' করে একটা শব্দ করে হেসে ফেললে প্রমোদ।

হাসির বেগ চাপতে গিয়েই ওই রকম শব্দটা হল।

"কি যে বলছ তুমি মামা"

"ঠিক বলছি। আমাকে বিরক্ত কোরো না। তোমরা পুজো থিয়েটার যা করতে চাও বাইরে গিয়ে কর গে। আমার কাজে বাধা দিও না। যাও—"

দত্তর কণ্ঠস্বর রূঢ় হয়ে উঠল।

"আমি সব বিষয়েই তোমার চেয়ে ছোট, আমার যা হওয়া উচিত ছিল আমি তা হতে পারিনি। আমি"—প্রমোদ একটু হেসে শুরু করল—"মানে আমি যাকে এক কথায় বখাটে বলে তাই হয়তো। কিন্তু বাল্যকাল থেকে বরাবর আমি পুজোকে একটা বিশেষ মর্যাদা দিয়ে এসেছি। বাঙালীর জীবনে পুজো একটা, মানে পবিত্র অনুষ্ঠান। পুজোর হয়তো আমি কিছু বুঝি

না, কিন্তু পুজোটা যে একটা পবিত্র জিনিস, আনন্দের জিনিস, পুজোয় যে আমরা জীর্ণ পুরাতনকে ফেলে দিয়ে নতুন কাপড় পরি, কোলাকুলি করি, প্রাণভরে খাই আর খাওয়াই, মহামিলনের আবেশে ভরপুর হয়ে যাই, এমন কি যারা ছোটলোক তারাও যেন পুজোর সময় আমাদের আত্মীয় হয়ে যায়, মনে হয় সত্যিই তো আমরা সকলেই এক নৌকায় চড়ে অনন্তের দিকে ধাবিত হচ্ছি, কেউ পর নয়, সব আপন—এটা আমি বুঝি, অনুভব করি। এই অনুভূতিতে আমার কোনও আর্থিক লাভ হয়নি—বরং পয়সাকড়ি একটু বেশীই খরচ হয়ে যায়, কিন্তু এ ভেবে আমি সুখ পেয়েছি, এবং আমার বিশ্বাস বরাবরই পাব। পুজোটাকে তুমি এমন হতচ্ছেদ্দা করলে, জগদম্বা তোমার মঙ্গল করুন। মা মঙ্গলচণ্ডী মামার উপর রাগ কোরো না।"

ওঘর থেকে যদুবাবু হঠাৎ আপন মনে বলে উঠলেন, "বাঃ বাঃ, ঠিক বলেছ ছোকরা।" বলেই বুঝতে পারলেন কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও ঝুঁকে চিঠি লেখবার ভান করতে লাগলেন।

"দেখ যদু, ফের যদি তোমার মুখ থেকে একটি শব্দ শুনি"—যদুবাবুর দিকে চেয়ে দত্ত চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—"তাহলে তোমার চাকরিটি যাবে। তোমাকে দূর করে দেব। কোনও দশভুজা এসে আটকাতে পারবে না।"

তারপর প্রমোদের দিকে চেয়ে বলল—"বাবাজীবনের বক্তৃতা করবার শক্তি তো বেশ আছে দেখছি। কাউন্সিলে ঢুকে পড় না।"

"রাগ কোরো না মামা। কাল সপ্তমী—আমাদের বাড়িতে খেও। তোমার বৌমা নিরামিষ মাংস খুব ভালো রাঁধে।"

"নিরামিষ মাংস—! বৌমা!"

"পুজোর মাংসে তো আর পেঁয়াজ দেওয়া চলবে না।"

দত্ত বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইল প্রমোদের দিকে।

"তুমি বিয়ে করেছ?"

"করেছি।"

"কেন?"

প্রমোদ একটু ইতস্ততঃ করে বলল—"সত্যি কথাটা বলব?"

"তাই তো শুনতে চাইছি।"

"টুনিকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। ভয়ে তোমাকে নেমন্তন্ন করতে পারিনি।"

"ভালোবেসে ফেলেছিলে! ভালোবেসে বিয়ে করেছ!"

"হ্যাঁ—"

"আচ্ছা বাড়ি যাও।"

"এতে রাগ করছ কেন মামা। বিধবারাও আজকাল বিয়ে করছে--"

"আচ্ছা বাড়ি যাও।"

"আমি তোমার কাছে একটি পয়সা চাইছি না। কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা তুমি মানবে না কেন। তুমি আমার মামা—"

"বাড়ি যাও, বাড়ি যাও।"

"তোমার আচরণে বড়ই দুঃখ পেলাম মামা। আজ পর্যন্ত কোন বিষয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়নি। তোমার কাছে অনেক দিন আসিনি অবশ্য, আজ পুজো বলেই এলুম, আর তুমি এমন ব্যবহার করছ"

"বাড়ি যাও—"

"বিজয়ার দিনও আমাদের বাড়িতে আসবে না! পাতিপুকুরে বাড়ি করেছি, ঠিকানাটা দিয়ে যাব?"

"বাড়ি যাও, বাড়ি যাও।"

কোনও কটু কথা না বলে প্রমোদ বেরিয়ে গেল।

বেরুবার সময় যদুবাবুকে বলে গেল—"এই আমার কার্ড দিয়ে গেলুম। বিজয়ার দিন আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন।"

"ওই আর একজন"—বলে উঠল দত্ত—"মাত্র আশী টাকা মাইনে পায়। বিয়ে করেছে, বছর বছর ছেলে হচ্ছে! বিজয়া করতে যাবেন! আন্দামান যাওয়া উচিত!"

প্রমোদ চলে যেতেই আর দুজন ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে সম্ভ্রান্ত বলে মনে হয়। তাঁরা নমস্কার করে হাসিমুখে দত্তর কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁদের হাতে কিছু কাগজ আর একটি রসিদের খাতা ছিল।

"এইটেই তো ঘোষ-দত্ত কোম্পানি? আপনি মিস্টার ঘোষ, না মিস্টার দত্ত?"

"ঘোষ সাত বছর আগে মারা গেছে"—আরও পরিষ্কার করে দত্ত বলল—"সাত বছর আগে ঠিক এই তারিখে রাত্রিবেলা স্বর্গারোহণ করেছে সে—"

"তিনি খুব উদার লোক ছিলেন শুনেছি। আশা করি সে উদারতার পরিচয় আপনার কাছেও আমরা পাব।"

এই বলে তাঁরা নিজেদের কার্ড এবং কাগজপত্রগুলি দত্তকে দিলেন। 'উদারতা' কথাটা শুনেই দত্তের ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। মাথা নেড়ে কাগজগুলি ফিরিয়ে দিলে দত্ত।

"এই পুজোর সময় দত্ত মশায় একটা ভালো কাজ করব বলে ঠিক করেছি আমরা। আমাদের পাড়ায় অনেক গরীব ছেলেমেয়ে আছে। খেতে পায় না, পরতে পায় না। এই পুজোর ক'দিন তারা যাতে দুটি ভালো খেতে পায় আর অন্তত একখানা করেও নতুন কাপড় পরতে পায়, তাহলে সত্যিই মায়ের পুজো সার্থক হবে। আমরা আমাদের পাড়ার কথাই ভাবছি—সমস্ত দেশের কথা ভাবলে তো লক্ষ লক্ষ টাকাতেও কুলোবে না—হাজার হাজার দরিদ্র ছেলেমেয়ে! আমাদের পাড়াতেই শ'চারেক আছে। দু'হাজার টাকা তুলতে হবে। আপনার নামে কত লিখব?"

ভদ্রলোক পকেট থেকে কলম বার করলেন।

"আমার নামে! আমি কি করতে পারি! নেহেরুজির কাছে যান। তিনি তো দেশের সব ছেলেমেয়েদের চাচা। আমার মতো দরিদ্র—"

"আপনি দরিদ্র নন মিস্টার দত্ত। অনায়াসে আপনি একশ টাকা দিতে পারেন"

"ওরে বাবা! কুড়ুল নিয়ে এসে একশ'বার আমাকে কোপালেও আমি কিছু দিতে পারব না। বিজনেস্ খুব ডাল্!"

"না, না, কিছু দিতে হবে বইকি।"

"মাপ করবেন।"

"পুজোর সময় গরীব ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি না ফুটলে—"

"মাপ করবেন।"

"গোটা পঞ্চাশেক টাকা লিখি?"

"মাপ করবেন।"

"কিছুই দেবেন না?"

"না। একটি ছিদামও না। পাড়ার ছোঁড়াদের আমি চিনি। এক একটি বিচ্ছু! ওদের মুখে হাসি ফোটাবার দরকার নেই—ওরা হুল ফোটাতে ওস্তাদ। হাসি ওদের মুখে ফুটবে না।"

"না, না, এ কি বলছেন। এই পুজোর সময় কি করবে বেচারারা—"

"মরুক।"

"এ উত্তর আপনার কাছে আশা করিনি।"

"এ উত্তর ছাড়া অন্য উত্তর আমার জানা নেই। পুজোর সময় আমি নিজে নতুন কাপড় কিনি না, কোনও ফুর্তিবাজিতে মাতি না। কতকগুলো বখাটে বিচ্ছু ত্যাঁদড় ছেলেমেয়ের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে পয়সা দিতে আমি পারব না। অত পয়সা আমার নেই। ওই সব আপদ মরলে দেশের পপুলেশন কমবে, আমাদের হাড়ে বাতাস লাগবে! এ সমস্যার ওই সমাধান"

"পাঁচটা টাকাও দেবেন না?"

"মাপ করবেন।"

"আপনি সমাজে বাস করেন তো? সমাজের প্রতি আপনার একটা কর্তব্য আছে তো!"

"একটি কর্তব্যকেই আমি একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করি। সেটি হচ্ছে নিজের চরকায় তেল দেওয়া। তাই দিয়ে যাচ্ছি। বাজে ব্যাপারে আমি মাততে চাই না। আমাকে মাপ করবেন।"

ভদ্রলোক দু'জন স্পষ্ট অনুভব করলেন এখানে সময় নষ্ট হচ্ছে। একটা দায় সারা গোছ নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা।

একটা মৃদু প্রসন্ন হাসি ফুটল দত্তের মুখে। সে আবার কাজে মন দিল। সে সুদের হিসাব কষছিল।

বাইরে কিন্তু বৃষ্টি বাড়তে লাগল। রাস্তায় লোকের ভিড় কিন্তু কমল না। ভিজে ভিজেও পুজোর বাজার করছিল সবাই। বৃষ্টির শব্দকে তুচ্ছ করে পুজোর বাজনাও বাজছিল, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পাড়ার শিবমন্দিরের চূড়াটা দেখা যাচ্ছিল। দত্তর মনে হল মন্দিরটা যেন উঁকি মেরে তাকে দেখছে। হঠাৎ একটা বাজ পড়ল কোথায়। দত্ত চমকে উঠল। তার মনে হল মন্দিরটাই বুঝি ধমক দিল তাকে। দত্ত চুপি চুপি উঠে জানলার কাছে গেল, উদ্দেশ্য জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া। বৃষ্টির ছাট আসছিল। কিছু কেরোসিন তেল খরচ হয় হোক, জানলাটা খুলে রাখা চলবে না। জানলার কাছেই অনেক দরকারি কাগজপত্র ছিল। জানলার কাছে যেতেই তার চোখে পড়ল রাস্তার জনারণ্য। এই বৃষ্টিতেও লোকে হৈ হৈ করে পুজোর বাজার করছে। কারো বগলে কাপড়ের পুলিন্দা, কেউ ফল নিয়ে যাচ্ছে, কারো পিছনে কুলি,

কুলির মাথায় নানারকম জিনিসের বোঝা। ঘোড়া-গাড়ি চেপেও যাচ্ছে অনেকে। ঘোড়ার গাড়ির মাথায় নানারকম জিনিস। কলার কাঁদি আর নারকেল দেখে মনে হল পুজোর জিনিস ওগুলো। আর একটা দৃশ্য দেখে বিস্মিত হল দত্ত। বহু ছেলেমেয়ে রাস্তায় ছুটোছুটি করে ভিজছে। একজনের ছাতের নালি থেকে হুহু করে জল পড়ছিল, তারই তলায় দাঁড়িয়েছে কয়েকটা ছেলেমেয়ে। মহানন্দে দু'হাত তুলে ভিজছে। রাস্তার নালি দিয়ে কলকল করে ময়লা জল বইছে, তাতে কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছে আরও কয়েকটা ছেলে। আশ্চর্য ব্যাপার! দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে দিল দত্ত।

'যদু, লণ্ঠনটা জ্বেলে ফেল—"

যদুবাবু উঠে লণ্ঠনে তেল ভরতে লাগলেন।

হঠাৎ বন্ধ জানলার ভিতর দিয়ে একজনের বাজখাঁই গলা শুনতে পাওয়া গেল।

"আরে না না। আড়াই মণ মিষ্টিতে কুলুবে না। আমরা এক হাজার কাঙালীকে খাওয়াব। দশ মণ দইয়ের অর্ডার দিয়েছি—"

দত্ত শিউরে উঠল। তার মনে হল এই অপব্যায়ের বন্যায় দেশটা ভেসে যাবে, ডুবে যাবে।

লণ্ঠন জ্বালা হলে দত্ত হাতের কাজটা শেষ করে ফেলল। আর একটা দলিলেরও সুদ কষতে বাকি ছিল। কিন্তু কেরোসিন তেল পুড়িয়ে তা করতে প্রবৃত্তি হল না।

"যদু, এবার দোকান বন্ধ কর—"

যদুবাবু উঠে বাকি জানলাগুলো বন্ধ করতে লাগলেন। যদুবাবুর দিকে কটমট করে চেয়ে দত্ত বলল—"কাল নিশ্চয় সমস্ত দিন কামাই করবে?"

সবিনয়ে যদুবাবু বললেন, "আপনার যদি অসুবিধে না হয়—"

"অসুবিধে হবেই। আমার প্রতি অবিচার করাও হবে। আমি যদি মাইনে কেটে নি তাহলে মুখ ফুলে ঢোল হবে নিশ্চয়।"

যদুবাবু হাসলেন। কিছু বললেন না। স্বল্পবাক লোক তিনি।

"তুমি কাজ করবে না অথচ মাইনেটি নেবে, এইটে কি আমার উপর সুবিচার?"

যদুবাবু বললেন, "বছরে একটিবারই তো ছুটি নি—"

"ওটা কোন যুক্তি নয়, বুঝলে যদু। তুমি যদি বল আমি তো বছরে একটিবার পিকপকেট করি—"

আবার বজ্রপাত হল বাইরে। দত্ত থেমে গেল।

"কাল সমস্ত দিন আসবে না?"

"আজ্ঞে না। কাল উপবাস করি। অঞ্জলি দিতে হবে।"

"পরশু দিন তাহলে এসো। অনেক কাজ বাকি পড়ে গেছে।"

"পরশু দিন আসব। তবে মহাষ্টমীর দিন ঘণ্টাখানেকের ছুটি চাই। মাকে একবার প্রণাম করেই চলে আসব।"

দত্ত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে বেরিয়ে গেল।

যদুবাবু তাড়াতাড়ি আপিসে তালা লাগিয়ে গলার চাদরটা মাথায় পাগড়ি করে বেঁধে নিলেন। তারপর জুতো জোড়া হাতে করে ছুটতে লাগলেন। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের বলে

এসেছিলেন তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবেন। যদুবাবু এই বুড়োবয়সেও লুকোচুরি খেলতে ভালোবাসেন।

দত্ত গেল ভোলাবাবুর হোটেলে। দত্তের বাড়িতে কেউ নেই। ভোলাবাবুর হোটেলেই দু'বেলা খায় সে। ভাত, কলাইয়ের পাতলা ডাল, কুমড়ো ভাজা, আলু পটলের ডালনা, আর কুচোচিংড়ির অম্বল—এই খাবার। দত্ত এই খাবারেই সন্তুষ্ট। খাওয়া শেষ করে দত্ত নগদ পয়সা (চার আনা) সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয়। তারপর ভোলাবাবুর কেনা খবরের কাগজটি নিয়ে তন্ন তন্ন করে পড়ে। পড়ে তারপর বাড়ি গিয়ে শোয়। সেদিনও তাই করল।

দত্ত যে বাড়িতে থাকত সেটা এককালে ঘোষের ছিল। বাড়িটা বহুকালের পুরোনো, প্রায় পোড়ো বাড়ি। কি রকম যেন হুমড়ি-খাওয়া গোছ চেহারা। আশপাশে ছোটখাটো অনেক নতুন বাড়ি হয়েছে, তার সঙ্গে এ বাড়িটা নিতান্তই বেমানান। মনে হয় বহুকাল আগে বাড়িটা যখন শিশু ছিল তখন বোধহয় এখানে লুকোচুরি খেলতে এসেছিল, আর বেরোতে পারেনি। খুবই জরাজীর্ণ এখন। দত্ত ছাড়া আর কেউ এখানে থাকে না। বাকি ঘরগুলো সব ভাড়াটে গুদোম ঘর। চারপাশে অনেকটা ফাঁকা জমি। সেকালে জমি সস্তা ছিল বলে অনেকটা জমি কিনেছিল ঘোষ। অনেকখানি জমি পেরিয়ে তবে বাড়ির সিঁড়িটা পাওয়া যায়। বৃষ্টিটা একটু ধরেছিল, কিন্তু টিপটিপ করে পড়ছিল তখনও। আকাশ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। চতুর্দিকে নীরন্ধ্র অন্ধকার। দত্ত রাস্তার প্রতিটি ইঁটের সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু তবু তার পক্ষেও স্বচ্ছন্দে এগুনো সম্ভব হচ্ছিল না। এক একবার সে ভাবছিল হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে না কি শেষ পর্যন্ত! এ কি অন্ধকার বাবা! স্বয়ং মা কালী এসে ভর করেছেন না কি এখানে।

বাড়ির কপাটের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যই ছিল, সেটি রং-চটা পুরোনো সেকেলে কপাট। এ-ও সত্য কথা, দত্ত ওই কপাট বহুবার দেখেছে। সকালে দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায় বহুবার ওই কপাটের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। এ কথাও নির্জলা সত্য যে দত্তের কল্পনার বালাই নেই। এ শহরে অনেক কবি, অনেক লেখক আছেন, অনেক সাধারণ মানুষও আছেন যাঁরা কল্পনাবিলাসী। কিন্তু দত্ত তাঁদের দলে নয়, দত্ত নিরেট নিভাঁজ বস্তুতান্ত্রিক। পূর্ণিমার চাঁদ দেখে প্রিয়ার মুখ বা প্রিয়ার পায়ের নখের কথা কখনও মনে হয়নি তার। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখুন সেদিন দত্ত তার প্রাক্তন বন্ধু ও পার্টনার ঘোষের কথা একবারও ভাবেনি। শুধু সেদিন কেন, গত সাত বৎসরের মধ্যে একদিনও ভাবেনি। কিন্তু তবু সেদিন যা ঘটল তা কেমন করে ঘটল? কে এর জবাব দেবে! কিন্তু ঘটল। দত্ত যখন কপাটের তালার চাবি খুলতে যাচ্ছে তখন কপাটের উপর সে স্পষ্ট একটা মুখ দেখতে পেলে। হ্যাঁ, একটা মুখ।

ঘোষের মুখ। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা, কিন্তু ঘোষের মুখ স্পষ্ট। তার মুখ থেকে অদ্ভুত একটা আলো বেরুচ্ছিল। মুখে কোনও রাগ বা হিংসার ভাব ছিল না। ঘোষ বরাবরই যেভাবে দত্তর দিকে চাইত তখনও ঠিক সেই ভাবে চাইছিল—প্রকাণ্ড কপালের উপর চশমাটা তোলা। মাথার চুলগুলো একটু একটু নড়ছিল, চোখ দুটো বিস্ফারিত, আর নিস্পন্দ। ভয়ংকর দেখাচ্ছিল ঘোষকে। শুধু মুখ নয়, চোখ নয়, চুল নয়, নীলচে রঙের ওই আলোটাও নয়—এ সব ছাড়াও আর একটা কি ছিল যা বর্ণনার বাইরে। চোখ দুটো বুজে ফেললে দত্ত। আবার যখন চাইলে তখন মুখ নেই, কপাটটা রয়েছে কেবল।

দত্ত ভয় পায়নি, কিংবা তার বুকের ভিতর তোলপাড় করেনি এ কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে মূর্ছা যায়নি সে। দৃঢ়হস্তে তালাটা খুলে গটগট করে সে ঘরে ঢুকে গেল। ঢুকে আলো জ্বালল।

আলোটা জ্বেলে একটু ইতস্তত করে কপাটটা বন্ধ করবার আগে সে থমকে দাঁড়াল একবার, সন্তর্পণে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সে যেন প্রত্যাশা করছিল ঘোষের টিকিটা দেখতে পাবে। কিন্তু কিছু দেখা গেল না। কপাটের বড় বড় কাঁটিগুলো ছাড়া আর কিছু নেই।

"বাজে সব!"

দত্ত দড়াম করে কপাটটা বন্ধ করে দিলে। শব্দটা বজ্রের শব্দের মতো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সারা ঘরময়। উপরের ঘরে, নীচের ঘরে যেন গমকে গমকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রতিধ্বনি শুনে ভয় পাবার ছেলে দত্ত নয়, সে কপাটে ভালো করে খিল এঁটে দিয়ে ঘরের ওধারে গেল। লণ্ঠনটা উসকে দিলে একটু। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

প্রকাণ্ড চওড়া সিঁড়ি। ছ' ঘোড়ার গাড়ি অনায়াসে তা দিয়ে চড়তে পারে : একটা মড়াকেও আড়াআড়ি নাবালে সিঁড়ির দেওয়ালে কারও গা ঠেকবে না, এত বড় সিঁড়ি। সেইজন্যই বোধহয় দত্তর মনে হচ্ছিল তার আগে আগে একটা মড়াকে আড়াআড়ি ধরে নিয়ে যাচ্ছে কারা যেন। এই বাড়িতেই ঘোষ মারা গিয়েছিল। এই সিঁড়ি দিয়েই আড়াআড়ি করে নামানো হয়েছিল তাকে। রাস্তার আলো সব নিবে গিয়েছিল। দত্তর লণ্ঠনের আলোও প্রকাণ্ড সিঁড়ির জমাট অন্ধকারকে ভেদ করতে পারছিল না। দত্তর গা-টা ছমছম করতে লাগল।

তবু দত্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল যা থাকে কপালে বলে। দত্ত অন্ধকারকে ভয় করত না, ভালোই বাসত বরং। আলো করতে পয়সা খরচ হয়, অন্ধকার আপনা-আপনি হয়। তবু ঘোষের মুখটা মনে পড়াতে দত্ত যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে সোজা শোবার ঘরে ঢুকে খিলটা লাগিয়ে ফেললে।

সব ঠিক আছে। বসবার ঘর, শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর যেমন ছিল তেমনি আছে। খাটের তলাতে, সোফার নীচে, আলমারির পিছনে কেউ নেই। স্টোভের ছোট সস্‌প্যানটি ঠিক আছে। হঠাৎ চমকে উঠল দত্ত, তারপর বুঝতে পারল ওটা তারই ড্রেসিং গাউন কোণে ঝুলছে। কি যে দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, গতবার শীতের সময় একজনের পরামর্শে ড্রেসিং গাউন করিয়েছিল! এক গাদা পয়সা খরচ করে একটা আলখাল্লা কেনবার মানে হয় কোনও? এগিয়ে গিয়ে ড্রেসিং গাউনটা নেড়ে দেখল। না, এর ভেতরও কেউ নেই। খাটের নীচে কেউ নেই, ভাঁড়ার ঘরে নেই, আলমারির পিছনেও কেউ নেই। জুতোটা ঠিক আছে, ব্রাকেট, ঘড়ি সব ঠিক আছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে দত্ত ভিতরে থেকে কপাটে তালাও লাগিয়ে দিলে একটা। শীত করতে লাগল তার। পুরোনো কম্বলটা বাক্স থেকে বার করে গায়ে জড়িয়ে বসল। জরাজীর্ণ কম্বল, সত্যিই কম বল, শীতের কাছে হেরে গেল। দেওয়ালে সারি সারি কতকগুলো ছবি টাঙানো ছিল। বাজে ছবি সব! দুর্গা, সরস্বতী, কালীঘাটের কালী, কুইন্ ভিক্‌টোরিয়া, তার নিজেরও একটা ফোটো। কিন্তু ঘোষের মুখটা ভেসে উঠল আবার মানসচক্ষে—সাত বছর আগে ঘোষ মারা গেছে, তার এ কি কাণ্ড! প্রত্যেকটি ছবির উপর ঘোষের মুখ। আবার মিলিয়ে গেল!

"বাজে!"

কম্বলটা ফেলে দিয়ে দত্ত ঘরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। কয়েকবার ঘুরে এসে বসল আবার। চেয়ারে বসে হেলান দিলে ভালো করে। হেলান দিতেই তার চোখে পড়ল ঘণ্টাটা। ওই ঘণ্টাটা ছাত থেকে তেতলার ঘর থেকে ছাতের ভিতর দিয়ে এককালে কেন যে টাঙানো হয়েছিল তা দত্ত জানে না। সম্ভবত চাকরদের ডাকবার জন্যে। এখন ওটা কেউ ব্যবহার করে না। হঠাৎ দত্তর মনে হল ঘণ্টাটা দুলছে। খুব ধীরে ধীরে দুলছে, কোন শব্দ হচ্ছে না, কিন্তু দুলে যাচ্ছে। বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল দত্ত। প্রথমে ধীরে ধীরে দুলছিল, কিন্তু ক্রমশ জোরে জোরে দুলতে লাগল, তারপর হঠাৎ বেজে উঠল। বেজে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সব ঘরে যেন ঘণ্টা বাজতে লাগল। হকচকিয়ে গেল সে।

ব্যাপারটা হয়তো আধ মিনিট বা এক মিনিট ছিল, কিন্তু দত্তর মনে হতে লাগল এক ঘণ্টা ধরে চলছে। হঠাৎ সব ঘণ্টাগুলো থেমে গেল একসঙ্গে। তারপরই একটা খনখনে আওয়াজ হতে লাগল। একটা শিকলকে কে যেন টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দত্তর মনে পড়ল ভূতুড়ে বাড়িতে ভূতেরা শিকল টেনে নিয়ে বেড়ায়।

হঠাৎ ভাঁড়ার ঘরের দরজাটা খুলে গেল। তখন শব্দটা আরও স্পষ্ট শোনা গেল। দত্তর মনে হল নীচে থেকে আসছে শব্দটা, সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরের দিকে আসছে। তার ঘরের দিকেই আসছে।

"কি বাজে জিনিসে ভয় পাচ্ছি। ভীমরতি হয়েছে আমার।"

তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল কিন্তু। তারপর যা ঘটল তা ভয়ানক। বদ্ধ দ্বারের ভিতর দিয়ে তার ঘরে কে যেন ঢুকল। ঢোকবামাত্রই লণ্ঠনের আলোটা যেন লাফিয়ে উঠল, যেন বলে উঠল—"এই যে ঘোষ! ঘোষ এসেছে"—তারপর আবার যেমন ছিল তেমনিভাবে জ্বলতে লাগল।

সেই মুখ ঃ একেবারে সেই। সেই ঘোষ, মাথায় সেই টিকি, গায়ে সেই ফতুয়া, পায়ে সেই তালতলার চটি। চটির শুঁড়টা যেন বেশী খাড়া, টিকিটাও তাই। মাথার চুলগুলোও যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কোমরে প্রকাণ্ড একটা শিকল বাঁধা, মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড একটা লেজ গজিয়েছে ঘোষের। আর সেই শিকলে বাঁধা রয়েছে ক্যাসবাক্স, চাবি, তালা, হিসাবের প্রকাণ্ড লেজার (খাতা), দলিলের বাণ্ডিল আর কয়েকটা টাকার থলি। তার শরীর স্বচ্ছ, তার শরীরের ভিতর দিয়ে দত্ত পিছনের কপাটটা দেখতে পাচ্ছিল। ঘোষ কম খেত বলে অনেকে ঠাট্টা করত, তার পেটে নাড়িভুঁড়ি কিচ্ছু নেই। এখন দত্ত সত্যিই দেখল নেই। সত্যিই পেটের ভিতরটা ফাঁকা।

দত্ত নির্নিমেষে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। ঘোষের প্রেতাত্মা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যুহিম চোখের দৃষ্টি থেকে হিমানীপ্রবাহ বেরুচ্ছে যেন। দত্তর হাড়ে একটু কাঁপন লাগল। কিন্তু তবু তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, তার মনে হচ্ছিল সে ভুল দেখছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে লাগল সে।

"কি ব্যাপার"—অবশেষে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে জিগ্যেস করে ফেললে দত্ত—"আমার কাছে কি দরকার!"

"অনেক কিছু।"

ঘোষেরই কণ্ঠস্বর, কোনও সন্দেহ নেই।

"তুমি কে?"

"জিগ্যেস কর আমি কে ছিলাম।"

"তুমি কে ছিলে তাই বল তাহলে"—একটু গলা চড়িয়ে বলল দত্ত—"তোমাকে দেখে তো একটা ছায়া মনে হচ্ছে।" দত্ত বলতে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছে তুমি একটি মূর্তিমান ধাপ্পা, কিন্তু কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে ভদ্রভাবে বলল ছায়া।

"যখন বেঁচে ছিলাম তখন আমি তোমার ব্যবসার অংশীদার ছিলাম। আমার নাম ছিল নগেন ঘোষ।"

"তুমি কি—তুমি কি বসতে পার?" একটু সন্দিগ্ধভাবে দত্ত প্রশ্ন করল।

"পারি বই কি।"

"বস তাহলে।"

দত্ত একথা জিজ্ঞাসা করল, কারণ তার সন্দেহ হচ্ছিল এরকম একটা স্বচ্ছ ভূত হয়তো চেয়ারে বসতে পারবে না। শরীর বলে তো কিছু নেই। আর সে যদি বসতে না পারে তাহলে ওরকম একটা দাঁড়ানো ভূত নিয়ে কি করবে সে এখন। সে তো আরও মুশকিল! তাকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হবে!

ভূতটি গিয়ে সামনের চেয়ারে বসল। এমনভাবে বসল যেন চেয়ারটি তার পরিচিত।

"আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?"—ভূত বলল।

"না, হচ্ছে না।"

"দেখছ, অথচ বিশ্বাস হচ্ছে না, এ তো ভারি আশ্চর্য। চাক্ষুষ প্রমাণের বেশী আর কি প্রমাণ চাও তুমি।"

"জানি না।"

"তোমার ইন্দ্রিয়কে তুমি অবিশ্বাস করছো কেন!"

"সামান্য সামান্য কারণে ইন্দ্রিয়রা প্রতারণা করে। হজমের গোলমাল হলে সব গোলমাল হয়ে যায় অনেক সময়। আজ হোটেলে ডালটা ভালো সিদ্ধ হয়নি, তোমার আবির্ভাব হয়তো আমার বদহজমের ফল। কিছুই বলা যায় না। তাছাড়া তোমার শরীরে তো কোনও বস্তুই নেই দেখছি। নগেনের শরীর বেশ মজবুত ছিল—" দত্ত সাধারণত ঠাট্টাবিদ্রূপের ধার ধারত না, তখন তার ঠাট্টাবিদ্রূপ করবার মেজাজও ছিল না। আসল কথা, বাইরে ঠাট্টাবিদ্রূপের ভান করে সে ভয়টা ঢাকতে চাইছিল। ঘোষের কণ্ঠস্বর শুনে ভয়ংকর ভয় পেয়েছিল সে। তার মেরুদণ্ডটা পর্যন্ত শিরশির করছিল।

সামনাসামনি বসে ওই চোখের দিকে চেয়ে থাকতে হলেই তো আমার দফা নিকেশ, মনে মনে ভাবছিল দত্ত। হঠাৎ তার নজরে পড়ল ভূতটার মাথায় একটা রুমালও বাঁধা রয়েছে। রুমালটা মাথা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে থুতনির নীচে বেঁধেছে। মনে পড়ল নগেন ওই রকম বাঁধত মাঝে মাঝে। আর একটা ভয়ংকর জিনিসও লক্ষ্য করল দত্ত। ওই ভূতটাকে ঘিরে যেন একটা অদৃশ্য বায়ুমণ্ডল আলোড়িত হচ্ছে। কারণ ভূতটা যদিও চুপ করে বসে আছে, কিন্তু তার মাথার চুল, রুমালের খুঁট দুটো, পরনের কাপড় সব নড়ছে। ওরে বাপরে! শিউরে উঠল দত্ত।

দত্তর পকেটে সর্বদা একটা লোহার খড়কে থাকত। সেইটে দিয়ে যখন তখন দাঁত খুঁটত সে। বিভ্রান্ত হয়ে হঠাৎ সেইটে সে বার করে ফেলল পকেট থেকে।

"এটা দেখতে পাচ্ছ—!"

ভূতটার নির্নিমেষে স্থির দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফেরাবার জন্যেই তুলে ধরল সে খড়কেটাকে।

"পাচ্ছি—"

"কিন্তু তুমি তো এদিকে চোখ ফেরাচ্ছ না।"

"না ফেরালেও দেখতে পাচ্ছি ওটা—"

"এটা আমি গিলে ফেলে এখুনি আত্মহত্যা করছি। তাহলে নিজেই ভূতের দলে মিশে যাব, আমাকে আর এমনভাবে ভয় দেখাতে পারবে না কেউ। এসব বাজে ভয়ে যদিও আমি বিশ্বাস করি না—"

এ শুনেই ভূতটা নিদারুণ চীৎকার করে তার শিকলটা আছড়াতে লাগল। এমন একটা বিকট বীভৎস শব্দ হল যে দত্ত অনড় হয়ে বসে রইল চেয়ারের হাতল দুটো দু'হাতে চেপে। তার ভয় হচ্ছিল এখনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবে সে। কিন্তু সে আরও ঘাবড়ে গেল যখন ভূত তার মাথার রুমালটা খুলে ফেলল। খোলামাত্রই তার থুতনিটা ঝুঁকে পড়ল তার বুকের উপর। সাংঘাতিক কাণ্ড!

দত্ত হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে বসে পড়ল মেঝের উপর।

"দয়া কর! ঘোষ, ঘোষ, এ বিপদে আমাকে ফেললে কেন?"

"মায়াবদ্ধ জীব"—ঘোষের প্রেতাত্মা গম্ভীর কণ্ঠে বলল—"আমার এই অস্তিত্বে তুমি বিশ্বাস কর কি না।"

"করি, করি। করতেই হবে। কিন্তু একটা কথা বল ভূতেরা পৃথিবীতে বেড়িয়ে বেড়ায় কেন। আমার কাছে এসেছ কেন তুমি?"

"ভগবান প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে প্রাণ দিয়েছেন, যে উৎসাহ দিয়েছেন তার ধর্ম হচ্ছে পৃথিবীর চতুর্দিকে সঞ্চরণ করে বেড়ানো, স্থাণু হয়ে আবদ্ধ হয়ে একজায়গায় বসে থাকবার জন্য ভগবান প্রাণ সৃষ্টি করেননি। সে প্রাণের, সে উৎসাহের, সে আত্মার একমাত্র সার্থকতা পৃথিবী পরিভ্রমণে, মানুষের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়াতে। যারা জীবনে তা করে না মৃত্যুর পর তাদের তা করতে বাধ্য হতে হয়। যা উপভোগ হতে পারত, তাই দুর্ভোগ হয়ে দাঁড়ায় তখন। তাই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, জীবনের নানা প্রকাশ দেখছি, কিন্তু তাতে যোগ দিতে পাচ্ছি না। দূর থেকে লোভীর মতো দেখছি। ভাবছি হায় হায় কেন জীবনকে ভোগ করিনি। কেন বঞ্চিত করেছি নিজেকে—"

বলে আবার সে কান্না জুড়ে দিলে, আবার নাড়তে লাগল শিকলটা। দত্তর মনে হল তার হাত দুটোও যেন কচলাচ্ছে সে।

"মনে হচ্ছে তুমি শিকল দিয়ে বাঁধা আছ—"

"হ্যাঁ।"

কাঁপতে কাঁপতে দত্ত বলল—"বাঁধা কেন?"

"যে শিকল আমি সারাজীবন ধরে তৈরি করেছি, সেই শিকলই জড়িয়েছে আমাকে। এ

শিকল আমারই তৈরি, এর প্রতিটি আংটা আমি প্রতিদিন স্বহস্তে তৈরি করেছি, দিনের পর দিন নিজেই আমি একে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করেছি। নিজেই তৈরি করেছি, নিজেই গায়ে জড়িয়েছি একে। ভালো করে চেয়ে দেখ দিকি এ শিকলের প্যাটার্ন কি তুমি চিনতে পারছ না?"

দত্ত আরও কাঁপতে লাগল।

"তোমার কোমরে যে শিকলটা এখন তুমি জড়িয়ে যাচ্ছ সেটা কত লম্বা আর ভারী তুমি জানতে চাও? সাত বচ্ছর আগে সেটা আমার শিকলেরই মতো লম্বা আর ভারী ছিল। সাত বচ্ছরে সেটাকে তুমি আরও অনেক বাড়িয়েছ। তোমার শিকল এখন বিরাট।"

দত্ত সভয়ে নিজের চারদিকে একবার চেয়ে দেখলে—সত্যিই তাকে ঘিরেও একটা লম্বা ভারী শিকল আছে না কি? কিন্তু কিছু দেখতে পেলে না।

"ঘোষ"—সানুনয়ে দত্ত বলল—"ভাই নগেন ঘোষ, সব খুলে বল ভাই। অভয় দাও ভাই, অমন করে ভয় দেখিও না। সাহস দাও—"

"সাহস বা অভয় দেবার ক্ষমতা আমার নেই। ওসব অন্য জায়গা থেকে আসে, পীতাম্বর দত্ত, অন্যরকম দূত তা বহন করে আনে অন্য জাতের লোকের কাছে। আমি যা বলতে চাই তা-ও বলতে পারব না। সামান্য একটু বলবার অনুমতি আমি পেয়েছি। আমার শান্তি নেই, আমি কোথাও থাকতে পারি না, কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়াবার উপায় নেই আমার। আমার আত্মা আমাদের দোকানের চারপাশেই আবদ্ধ ছিল। ভালো করে শোন, দোকান আর দোকানের আশপাশ ছেড়ে সে কোথাও যেতে পায়নি। সারাজীবন টেবিলে বসে বসে সে সুদের হিসাব কষেছে খালি। এখন তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, অনেক দূর যেতে হবে, অনেক পথ বাকী, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

মাথায় কোনও চিন্তা এলে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ গোঁফের ডগাটা পাকানো দত্তের একটা মুদ্রাদোষ ছিল। এখন সে তাই করতে লাগল। হাঁটু গেড়ে বসে বসেই তাই করতে লাগল।

"কিন্তু ঘোষ, তুমি তো খুব আস্তে হেঁটেছ মনে হচ্ছে।"

ভয় পেয়েছিল যদিও, তবু দত্তের হিসাবী মন সজাগ ছিল।

"আস্তে?"

"হ্যাঁ। সাত বছর আগে মারা গেছ তুমি। এবং তারপর থেকে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছ বলছ—"

"ক্রমাগত। আমার বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই। অনুতাপের অনলে পুড়ছি—"

"খুব দ্রুতগতিতে ঘুরেছ কি?"

"আমি হাওয়ায় ভর করে ঘুরি।"

"তাহলে সাত বছরে তো তোমার বহুদূর যাওয়ার কথা!"

এই শুনে ভূতটা আবার হাউ হাউ করে চীৎকার শুরু করে দিলে আর তার শিকলটা ঝনঝন করে আছড়াতে লাগল। সে চীৎকার আর শব্দ এতো ভয়ানক যে দত্তর ভয় হতে লাগল ঘুম ভেঙে গিয়ে পাড়ার লোকেরা না মারমুখী হয়ে ছুটে আসে।

"তুমি মূর্খ, তুমি অন্ধ, তুমি বন্দী তাই তুমি বুঝতে পারছ না কোটি কোটি বছর ধরে অমরবৃন্দ যদি অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাহলেও এ পৃথিবীর যতটা উন্নতি হতে পারত তা হবে

না, তার আগেই এ পৃথিবী অনন্তে বিলীন হয়ে যাবে। তুমি বুঝতে পারছ না যে কোনও ভদ্রলোক যদি তার ক্ষুদ্র পরিবেশেও সৎকার্য করতে চায় তাহলে তার জীবনে সে কাজ শেষ করতে পারবে না। তুমি বুঝতে পারছ না যে যত অনুতাপই কর না যে সব সুযোগ জীবনে হারিয়ে যায় তা আর ফিরে আসে না। আমি সব সুযোগ হারিয়েছি। সব—''

''তুমি অনুতাপ করছ কেন ঘোষ, তুমি তো পাকা ব্যবসায়ী ছিলে। চুটিয়ে ব্যবসা করেছ যতদিন আমার সঙ্গে ছিলে—''

''ব্যবসা!''—ভূত চীৎকার করে উঠল। দত্ত দেখতে পেল সে হাত দুটোও আবার কচলাতে শুরু করেছে। এই রে সেরেছে, মনে মনে বলে উঠল সে।

''ব্যবসা! মানুষের ভালো করাই আমার ব্যবসা হওয়া উচিত ছিল। ক্ষমা, দয়া, দান দাক্ষিণ্য পরোপকার এই সবই আমার ব্যবসা হওয়া উচিত ছিল। আমি যা করেছি ত কিছু নয়, কিছু নয়। তা সিন্ধুতে বিন্দুবৎ—''

এই বলে সে তার শিকলটাকে সামনে টেনে এনে তুলে ধরল, যেন সেইটেই তার সমস্ত দুঃখের মূল। তুলে ধরে আবার ঝনঝন করে মাটিতে ফেলে দিল সেটা।

''পুজোর সময়েই আমার সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয়। মনে হয় যখন মানুষের মধ্যে বেঁচে ছিলাম তখন এই পুজোর সময় কি কোনও দুঃখীর দুঃখ দূর করতে পেরেছি? ইচ্ছে করলেই পারতাম, কিন্তু আমি চোখ তুলে চাইনি কারও দিকে। মাথা হেঁট করে মাটির দিকে চেয়ে পথ চলতাম কানে তুলো গুঁজে। কারও কান্না শুনিনি, শুনতে চাইনি।''

এই ধরনের কথা শুনে দত্ত আরও ঘাবড়ে গেল। কাঁপুনি বেড়ে গেল তার।

''আমার কথা শোন''—ভূত বলল—''আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। আমার সময় কম—''

''শুনব, বল। কিন্তু ভাই আমার প্রতি দয়া কর। অমন শক্ত জ্ঞানের কথা বোলো না, ঘোষ। তোমাকে অনুরোধ করছি। ওসব শুনলে আমার ভয় করে—''

''আজ হঠাৎ কি করে মূর্তি ধরে তোমার সামনে দাঁড়াতে পেরেছি তা জানি না। আজ তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছ। কিন্তু তোমার পাশে আমি দিনের পর দিন বসে ছিলুম অদৃশ্যভাবে। আজ এতদিন পরে তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছ—''

ঘোষের অদৃশ্য প্রেতাত্মা তার ঠিক পাশে এতদিন বসে ছিল ওৎ পেতে, এ চিত্রটা মোটেই সুখকর নয়। দত্তর কপাল ঘেমে উঠল। পকেট থেকে রুমাল বার করে সে কপালটা মুছে ফেললে।

''তোমাকে আজ যে আমি সাবধান করতে এসেছি এটাও আমার প্রায়শ্চিত্ত, কঠিন প্রায়শ্চিত্ত, এর জন্যে আমি খুব কষ্ট ভোগ করছি, কিন্তু তবু এসেছি। তোমাকে সাবধান করতে এসেছি দত্ত। তুমি বেঁচে আছ, আমি যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি তার থেকে তুমি এখনও বাঁচতে পার। তোমার জন্যে একটা ব্যবস্থা করেছি সেই জন্য।''

''তুমি তো বরাবরই আমার হিতৈষী বন্ধু ছিলে ভাই। কি ব্যবস্থা করেছ বল। নিশ্চয় তোমার কথা শুনব।''

''ব্যবস্থা করেছি আরও তিনটি ভূত তোমার কাছে আসবে।''

দত্তের মুখ হাঁ হয়ে গেল, ঝুলে পড়ল থুতনিটা।

"এই ব্যবস্থা করেছ!"

"হ্যাঁ—"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—ও ধাক্কা—"

"ওই একমাত্র উপায়। আমি যে নিদারুণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি তা যদি এড়াতে চাও ওদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে। ওদের কথা শুনতে হবে। প্রথম ভূতটি আসবে কাল, ঠিক একটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে।"

"সবাইকে একসঙ্গে আসতে বল না ভাই। ব্যাপারটা তাহলে একেবারেই চুকে যাক—"

"দ্বিতীয় ভূত আসবে তার পরদিন, ঠিক ওই সময়ে। আর তৃতীয় ভূত, তার পরদিন রাত্রে বারোটার ঘণ্টা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে। আমার সঙ্গে আর তোমার দেখা হবে না। আমি যা বললাম তা কিন্তু ভুলো না।"

এই বলে ভূতটি টেবিল থেকে রুমালটি তুলে নিয়ে মাথায় জড়িয়ে থুতনির নীচে গেরো দিলে। চপাৎ করে শব্দ হল একটা। ঘোষের থুতনিটা ওপরের মাড়িতে যেন বসে গেল। দত্ত চোখের দৃষ্টি নামিয়ে ফেলেছিল। আস্তে আস্তে চোখ তুলে দেখলে ভূত তার শিকলটাও তার হাতে আর কোমরে জড়িয়ে নিচ্ছে।

তারপর সে পিছু হেঁটে হেঁটে জানলার দিকে যেতে লাগল। আর, কি আশ্চর্য, তার প্রতি পদক্ষেপে জানলাটা মেজে থেকে উঠতে লাগল উপরের দিকে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল দত্ত। ভূত যখন জানলার কাছে পৌঁছল তখন জানলাটা উপরে উঠে গেছে, দেওয়ালে রয়েছে মস্ত বড় একটা ফাঁক। ভূতটা সেখানে পৌঁছে হাতছানি দিয়ে ডাকল দত্তকে। বিহ্বলের মতো এগিয়ে গেল দত্ত। যখন তার সঙ্গে ভূতের মাত্র হাত দুয়েক তফাত, তখন আবার হাত তুলে ভূত তাকে আর এগোতে মানা করল। দত্ত থেমে গেল।

ভূতের কথায় যে দত্ত থামল তা নয়, ভয়ে এবং বিস্ময়ে থেমে গেল সে। বাইরে কেমন একটা অস্পষ্ট অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল, যেন কারা হায় হায় করে কাঁদছে—অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আর্তনাদ করছে। ভূতটা খানিকক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়ে শুনল, তারপর সেও হাহাকার করতে করতে মিলিয়ে গেল তাদের সঙ্গে অন্ধকার মহাশূন্যের মধ্যে।

দত্ত আর একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করল ব্যাপার কি।

দেখল আকাশ বাতাস ভূতে ছেয়ে রয়েছে। ছুটোছুটি করছে সব, হাহাকার করছে। ঘোষের যেমন শিকল ছিল এদেরও প্রত্যেকেরই কোমরে তেমনি শিকল। দু'চারটে ভূত পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে দেখা গেল। হয়তো তারা কোনও কোম্পানি বা গভর্নমেন্টের সভ্য ছিল। অনেককেই চেনা মনে হল। বিশেষত একজনকে মনে হল খুবই চেনা। বড় ব্যবসাদার ছিল, সায়েবি পোশাক পরত। দত্ত দেখল সে এখনও সাদা ওয়েস্টকোট পরে রয়েছে, তার পায়ের গোড়ালিতে প্রকাণ্ড একটা লোহার সিন্দুক আটকানো। চীৎকার করছে লোকটা তারস্বরে। চীৎকারের কারণ অনেক নীচে একটা দ্বারের কাছে তার বিধবা বউ আর শিশুপুত্র দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে শত চেষ্টা করেও তাদের সাহায্য করতে পারছে না। দত্ত হৃদয়ঙ্গম করল তাদের আসল কষ্ট, তারা মর্ত্যের লোকের সঙ্গে মিশতে চায়, তাদের সাহায্য করতে চায়—কিন্তু পারছে না।

তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। আরও তুমুল মেঘ ঘনিয়ে এল আকাশে। এরা মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল, না মেঘই এদের ঢেকে ফেলল, তা দত্ত ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু তারা এবং তাদের আর্তনাদ একসঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল হঠাৎ। ভয়ংকর রাত আজ মনে হল পীতাম্বর দত্তের।

জানলাটা যেমন ছিল তেমনি হয়ে গিয়েছিল আবার। জানলা কপাট ভালো করে বন্ধ করে দিতে গিয়ে দত্ত দেখল যে, যে কপাট দিয়ে ভূতটা ঢুকেছিল সে কপাটে তালা যেমনকার তেমনি লাগানো রয়েছে। ছিটকিনিও স্থানচ্যুত হয়নি একটু। সে নিজেই তালা ছিটকিনি লাগিয়েছিল। 'সব বাজে'—সে আর একবার বলতে গেল। কিন্তু পারল না। 'সব' বলেই থেমে গেল সে। তার ঘুম পাচ্ছিল খুব। মনের অদ্ভুত আলোড়ন, সমস্ত দিনের খাটুনি, অদৃশ্য জগতের অলৌকিক আভাস, ঘোষের বিচিত্র আলাপ তার সমস্ত মনকে কেমন যেন অসাড় করে দিয়েছিল। তা ছাড়া রাতও হয়েছিল অনেক। ঘুম পাচ্ছিল তার। সে জামা কাপড় না ছেড়েই সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

।। দুই।।

দত্তর যখন ঘুম ভাঙল তখন সে চোখ খুলে দেখল যে সমস্ত ঘরে সূচীভেদ্য অন্ধকার। এতো অন্ধকার যে ঘরের দেওয়াল আর জানলা সব একাকার হয়ে গেছে। সে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অন্ধকারকে ভেদ করবার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ তার কানে এল গির্জার ঘড়িটা বাজছে।

আশ্চর্য হয়ে সে শুনতে লাগল ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো, বারো। বারোটা বেজেই থেমে গেল। আশ্চর্য কাণ্ড! সে যখন শুতে গিয়েছিল, তখনই তো দুটো বেজেছিল। ঘড়িটা নিশ্চয় ভুল আছে। যে লোকটা দম দেয় সে নিশ্চয় দম দিতে গিয়ে কোনরকম গোলমাল করে ফেলেছে। বারোটা? হতেই পারে না।

"এ তো অসম্ভব! আমি কি তাহলে সমস্ত দিন ঘুমিয়েছি পরের দিন রাত বারোটা পর্যন্ত। দুপুর বারোটা নয় তো? কিন্তু এতো অন্ধকার কেন। সূর্য নিবে গেছে নাকি।"

মাথার বালিশের নীচে তার একটা ছোট ঘড়ি থাকত। অন্ধকারে দেখা যায় তাতে। সেটা বার করে দেখল! হ্যাঁ, ঠিক বারোটাই বেজেছে।

কি রকম হল?

বিছানা থেকে নেবে পড়ল দত্ত। হাতড়ে হাতড়ে জানলার কাছে গেল। জানলার কাচগুলো বৃষ্টির জলে ঝাপসা হয়ে গেছে। বিন্দু বিন্দু বাষ্প জমেছে ভিতরের দিকে। জামার হাতা দিয়ে পুঁছে ফেললে সে কাচগুলো। বাইরে অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কোনও লোকজনও নেই রাস্তায়। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। সূর্য নিবে গেলে নিশ্চয় হৈ চৈ পড়ে যেত একটা। কিন্তু কোথাও তো কিছু নেই। সব ঠাণ্ডা, সব নিস্তব্ধ। একটি লোক নেই রাস্তায়। প্রকৃতির রাজ্যেও স্বরাজের মতো কিছু একটা হয়ে গেল নাকি! সূর্য কি স্ট্রাইক করল? একটা কথা ভেবে কিন্তু একটু আনন্দ হল

তার। সেদিন তার ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার কথা। কিন্তু সূর্যই যদি না ওঠে, তাহলে টাকা জমা দেবে কি করে! ব্যাঙ্কই তো খুলবে না।

দত্ত আবার গিয়ে বিছানায় শুল। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ব্যাপারটা কি। ক্রমাগত ভাবতে লাগল, কিন্তু কোনও কূলকিনারা পেলে না। যতই ভাবতে লাগল ততই জটিল হয়ে উঠতে লাগল চিন্তাগুলো, তার জট ছাড়াতে আবার ভাবতে হল তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলে সে।

ঘোষের প্রেতাত্মাই কাবু করে ফেলল তাকে। সে ভুরু কুঁচকে ভালো করে ভেবে বার বার এই সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করছিল যে ওটা কিছু নয়, স্বপ্ন মাত্র, কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছবামাত্র—টেপা-স্প্রিং ছেড়ে দিলে তো যেমন নিমেষে পূর্বমূর্তি ধারণ করে—তেমনি গোড়ার প্রশ্নটা আবার মনে জাগছিল তার—সত্যিই ওটা স্বপ্ন? না, সত্যিই ঘোষের ভূত এসেছিল?

এই অবস্থায় অনেকক্ষণ শুয়ে রইল দত্ত। দূরে টং করে শব্দ হল একটা। গির্জার ঘড়িতে আধঘণ্টার ঘণ্টাটা বাজল। তখন দত্তর হঠাৎ মনে পড়ল ঠিক একটার সময় দ্বিতীয় ভূতটি আবির্ভূত হবে। মানে, আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি আছে। দত্ত ঠিক করল জেগেই শুয়ে থাকবে সে, কারণ এ অবস্থায় ঘুমের কথা ভাবাই হাস্যকর। ঘুম আসবে না। জেগেই থাকবে সে। চোখও বুজবে না। চোখ চেয়েই থাকবে। যা থাকে কপালে! দেখা যাক—। মরিয়া হয়ে জেগে রইল দত্ত।

অনেকক্ষণ কোনও শব্দ নেই। অনেকক্ষণ যেন নিঃশব্দে কেটে গেল। দত্তর সন্দেহ হতে লাগল সে ঘুমিয়ে পড়েনি তো! বিচিত্র নয় কিছু। আপিসে কাজের মধ্যেও তার ঢুল ধরে মাঝে মাঝে। তার ঘুমের মাঝে একটার ঘণ্টাটা বেজে যায়নি তো! একটা তুচ্ছ কথা মনে পড়ল। আপিসে তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে একটা মাছি এসে একবার তার চায়ের কাপে পড়েছিল—!

টং—'

বাইরের অন্ধকারকে প্রকম্পিত করে একটা বাজল। শব্দটা যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তার ঘরের দেওয়ালে। মনে হল যেন কাঁদছে। সঙ্গে সঙ্গে আলোকিত হয়ে গেল ঘরটা। কে যেন তার মশারিটা তুলল। তারপর যে হাতটা মশারি সরিয়েছিল সেই হাতটা দেখতে পেল। তার পিছন দিকের বা পায়ের দিকের মশারি নয়, ঠিক তার মুখের সামনে মশারির যে অংশটা ছিল সেইটে তুলে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ভূতটা। দত্ত তড়াক করে উঠে বসল। আরও বেশী মুখোমুখি হয়ে গেল।

অদ্ভুত ভূত—একটা ছেলের মতো ঃ অথচ খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয়, না, ছেলে নয় তো বুড়ো। একটা যেন অলৌকিক অপার্থিব আশ্চর্য কাচের ভিতর দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। সে যেন কাছে থেকেও অনেক দূরে রয়েছে, তাই বুড়ো হলেও ছেলের মতো দেখাচ্ছে তাকে। তার মাথার চুল লম্বা, ঘাড় পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে। সব সাদা। অথচ তার মুখে জরার কোন চিহ্ন নেই। কোথাও বলিরেখা নেই একটিও। চামড়া কচি ছেলের চামড়ার মতো, রং যেন ফেটে পড়ছে। হাত দুটো খুব লম্বা, আর বেশ বলিষ্ঠ। হাতের আঙুলগুলোও সেইরকম। দেখে মনে হয় খুব জোর আছে। একবার চেপে ধরলে আর নিস্তার নেই। পা এবং পায়ের পাতাও দেখা

যাচ্ছে, বেশ সুন্দর, সুগঠিত। কিন্তু কোনও আচ্ছাদন নেই। গা-ও অনাবৃত। কোমর থেকে হাঁটু অবধি একটা ধপধপে সাদা খদ্দরের ছোট কাপড়। আর কোমরে বাঁধা আছে একটা চকচকে উজ্জ্বল বেল্ট। অদ্ভুত উজ্জ্বল। হাতে একগোছা কাশফুল, গলায় শিউলি ফুলের মালা। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তার মাথার ঠিক মাঝখান থেকে একটা আলোর ফোয়ারা উঠছিল আর সেই আলোতেই দেখা যাচ্ছিল সব। আর ওই আলোটা নেবাবার জন্যই সম্ভবত সে জরির কাজ করা একটা মখমলের টুপি বগলদাবা করে রেখেছিল।

দত্ত নিরীক্ষণ করে দেখল এ ছাড়াও ভূতটার অন্য বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। তা ভয়ানক। ওই বেল্টটা উজ্জ্বল বটে, কিন্তু সব জায়গায় সমান উজ্জ্বল নয়। কখনও সামনেটা, কখনও ডান পাশটা, কখনও বাঁ পাশটা বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। যেখানে এখনই আলো ছিল পর-মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে সেখানটা, আর সঙ্গে সঙ্গে তার সারা শরীরেও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটছে। সেখানেও জোয়ার-ভাঁটা খেলছে যেন। কখনও মনে হচ্ছে তার একটা হাত, কখনও মনে হচ্ছে একটা পা। কখনও কুড়িটা হাত, কুড়িটা পা, কখনও মাত্র দুটো পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে ধড়টা, মুণ্ড নেই। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যেন অন্ধকারে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শেষ হয়ে যাচ্ছে না, একটু পরেই আবার ফিরে ফিরে আসছে সেগুলো।

বিস্ফারিত-চক্ষু দত্ত গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর ঢোঁক গিলে বলল, ''স্বর্গীয় নগেন ঘোষ কি আপনার কথাই বলে গেল একটু আগে?''

''হ্যাঁ।''

বেশ স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠস্বর। দত্তর মনে হল খুব আস্তে কথা বলছে, যেন সে কাছে সামনে দাঁড়িয়ে নেই, অনেক দূর থেকে কথা বলছে।

''আপনি কে, আপনার পরিচয় দিন।''

''আমি অতীত কালের পূজার ভূত।''

''বহুদূর অতীত?''

তার ছোট বালকের মতো চেহারা দেখে এই কথাটা হঠাৎ মনে হল দত্তর।

''না। তোমার অতীত।''

দত্তর হঠাৎ ইচ্ছা হল কেন জানি না, নিজেও সে বোধ হয় বলতে পারত না জিগ্যেস করলে, হঠাৎ ইচ্ছা হল ভূতটা তার টুপিটা পরে মাথার আলোটা নিবিয়ে ফেলুক। সে কথা মুখ ফুটে বলেও ফেললে সে।

''কি! এত শীঘ্র আলো নিবিয়ে দিতে চাও? এ আলো তো নিবে গেছেই, তোমাদেরই স্বার্থপরতা নিবিয়ে দিয়েছে একে। অনেক কষ্টে আজ জ্বেলেছি। আমার বগলে এই যে টুপি দেখছ, এটা কি জান? তোমাদের স্বার্থপরতাই টুপি-রূপ ধরেছে, ওই টুপি যুগযুগান্ত পরে বসে থাকতে হয় আমাকে। আলো জ্বালতে পারি না। অনেক কষ্টে আজ জ্বেলেছি।''

দত্ত ভদ্রভাবে বলবার চেষ্টা করল যে সে অন্ততঃ কোনদিন সজ্ঞানে এমন কিছু করেনি যাতে কারো মাথার আলো নিবে যায়। তারপর সাহস করে জিগ্যেস করলে—''আপনি এখানে এসেছেন কেন?''

''তোমার মঙ্গলের জন্য।''

দত্ত ধন্যবাদ দিলে তাকে। কিন্তু মনে মনে বলল—এই রাত দুপুরে এমন করে টেনে হিঁচড়ে আমাকে না তুলে, যদি ঘুমুতে দিতেন তাহলেই আমার বেশী মঙ্গল হত। শরীরটা অন্তত বিশ্রাম পেত।

ভূত বোধহয় তার মনের কথা শুনতে পেল, কারণ সঙ্গে সঙ্গে সে বলল—"তোমার উদ্ধারের জন্য। মন দিয়ে শোন। তোমার উদ্ধারের জন্য।"

তারপর সে তার লম্বা হাত তুলে তার কাঁধটা চেপে ধরল।

"এস। আমার সঙ্গে চল।"

দত্ত বলতে যাচ্ছিল যে এই বৃষ্টিবাদলে এত রাত্রে রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়ানো কি সমীচীন? এ সময় ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। গায়ে তেমন গরম জামা নেই, পায়ে পুরোনো চটিটা মাত্র রয়েছে, তাছাড়া কাল থেকে ঠাণ্ডাও লেগেছে তার একটু—কিন্তু দত্ত নিঃসংশয়ে অনুভব করল এসব বলা বৃথা। কোনও ফল হবে না। ভূত চটে গেলে হয়তো উল্‌টো উৎপত্তি হতে পারে। কাঁধের উপর যে হাতটা সে রেখেছিল সেটা যদিও নারীহস্তের মতোই কোমল, কিন্তু দত্ত উপলব্ধি করল সেটাকে উপেক্ষা করা যাবে না। সে আস্তে আস্তে তার পিছু-পিছু চলতে লাগল। কিন্তু যখন দেখল ভূতটা জানলার দিকে যাচ্ছে তখন সে তার কাপড়টা ধরে সানুনয়ে বলল, "আমি সাধারণ মানুষ, ভূত নই, আমি জানলা গলে যেতে পারব না। পড়ে যাব।"

"আমি তোমার বুকটা স্পর্শ করে দিচ্ছি। কোন ভয় নেই। তোমার কিচ্ছু হবে না। তুমি সর্বত্র যেতে পারবে।"

এই বলে সে তার বুকটা ছুঁয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা অতি সহজে জানলা গলে দেওয়াল পেরিয়ে এসে হাজির হল এক গ্রামের পথে। শহর সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে গেল। চারিদিকে মাঠ। মাঠে ফসল রয়েছে। অন্ধকার নেই, রোদ উঠেছে। শরতের আলোয় হাসছে ধানের ক্ষেত। দূরে নদীর ধারে কাশবন দেখা যাচ্ছে। দোয়েল, কোকিল ডাকছে আশেপাশে। সহসা দত্তর মনে পড়ে গেল সব।

"আরে! এ যে আমারই স্কুলের গ্রাম, হিজলপুর। এখানেই আমার জন্ম। আমার ছেলেবেলাটা এখানেই কেটেছে। এখানকার বোর্ডিংএ আমি ছিলাম।"

ভূতটা মৃদু হেসে চাইতে লাগল তার দিকে। তার হাতের মৃদু স্পর্শ তখনও যেন দত্তর বুকে লেগে আছে মনে হল। অপূর্ব গন্ধ ভেসে আসছে চারদিক থেকে, তার সঙ্গে কত স্মৃতি বিজড়িত, কত আশা, আনন্দ। বিস্মৃতপ্রায় অতীতের কত ছবি।

"তোমার ঠোঁট কাঁপছে যে।"—ভূত বলল—"তোমার গালের ওপর ওটা কি?"

কথা বলতে গিয়ে দত্তর গলাটা কেঁপে গেল।

"ওটা ছোট একটা ব্রণ। আপনি কোথায় নিয়ে যাবেন চলুন।"

"রাস্তা চিনতে পাচ্ছ তো?"

"পাচ্ছি না? আমার চোখ বেঁধে দিলেও এখন আমি চলে যেতে পারি।"

"এতদিন সব ভুলে ছিলে! আশ্চর্য নয়? চল যাওয়া যাক।"

সেই রাস্তা ধরেই চলতে লাগল তারা। দত্তর সব চেনা। চেনা আমগাছ, চেনা তালগাছ,

চেনা বেড়া, চেনা বাগান, চেনা ভাঙা দেওয়াল, চেনা টেলিগ্রাফের পোস্ট, তার উপর যে ফিঙেটা বসে আছে সেও যেন চেনা। হাঁটতে হাঁটতে সেই পুরোনো পুলটা পেরিয়ে তারা অবশেষে হাটের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হল। পাশেই বয়ে চলেছে শিউলি নদী। শিউলি হাটটাকে যেন বেড়ে ধরেছে। গরুর গাড়ি চলেছে সারি সারি। প্রতি গাড়িতে নানারকমের ছেলেমেয়ে। কি আনন্দ তাদের। হাসছে, গান গাইছে, তাদের কলরবে চতুর্দিক পরিপূর্ণ।

"যা ছিল তারই ছায়া এসব"—ভূত বলল—"ওরা আমাদের দেখতেও পাচ্ছে না।"

হৈ হৈ করতে করতে ছেলেদের দল আরও কাছে এগিয়ে এল। দত্ত সবাইকে চেনে, সবাইয়ের নাম পর্যন্ত জানে! এদের দেখে কেন তার বুক আনন্দে ভরে উঠছে? কেন তার ক্ষীণদৃষ্টি-চোখে ফুটে উঠছে নূতন আলো? কেন ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে ওদের দলে যোগ দি, আগে যেমন দিতাম? সামনে পুজো। পুজোরই গল্প করছে সবাই। সাজু কুমোর এবার কটা প্রতিমা গড়ছে, কোথায় কোথায় যাত্রা হবে, একটা নাগরদোলাও আসবে না কি এবার—সবারই গায়ে পুজোর নতুন কাপড় জামা, কারো হাতে মোয়া, কারো হাতে বাঁশী। হাসতে হাসতে চলে গেল তারা। পুজোর ছুটিতে সব বাড়ি যাচ্ছে! স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে নাকি!

"স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে বটে। কিন্তু একটি ছেলে ছুটি পায়নি। সে একা স্কুলে বসে আছে—"

দত্ত বলল, "আমি জানি, মনে পড়েছে—"

হঠাৎ তার চোখ দুটো জলে ভরে এল।

তারা তখন সদর রাস্তা ছেড়ে বাঁ-হাতি একটা গলির ভিতর ঢুকল। গলিটাও দত্তর খুব চেনা। একটু এগিয়েই লাল বাড়িটা চোখে পড়ল। ছাতের উপর সামনেই দুটো সিংহ, পরস্পর লড়াই করছে। ওই ঘণ্টাটা দুলছে বারান্দায়। বাড়িটা প্রকাণ্ড, কিন্তু পোড়ো বাড়ি। দেওয়ালে শ্যাওলা জমেছে, সামনের ঘরগুলো খালি, ঘরের দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে। জানলাগুলোর খড়খড়ি নেই। সামনের গেটটাও পড়ে গেছে। সবই যেন ভাঙাচোরা। দূরে কয়েকটা পাতিহাঁস প্যাঁকপ্যাঁক করছে ডোবার ধারে। দুটো শালিক বসেছিল, পিং করে উড়ে গেল। চারিদিকে ঘাস গজিয়ে গেছে, যেখানে গজায়নি সেখানে ঘুঘু চরছে একজোড়া। নিবিষ্টমনে চরে যাচ্ছে, কারোও প্রতি দৃকপাত নেই। বাড়িটার ভিতরও দুর্দশাপন্ন। বড় হল ঘরটায় ঢুকে তারা দেখতে পেল চতুর্দিক খাঁ-খাঁ করছে। সব কপাট জানলা খোলা, কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, বড় বড় ঘরগুলো প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পুরোনো বাড়িতে যেমন হয়—সোঁদা সোঁদা গন্ধ ছাড়ছে চারদিকে। দত্তর পুরোনো বোর্ডিং হাউসকে মনে পড়ে গেল। ভালো করে খেতে দিত না।

হল পেরিয়ে পিছনের দিকে একটা ঘরে ঢুকল তারা। এটাও লম্বা একটা হল। একটু অন্ধকার। সারি সারি বেঞ্চি আর ডেসক রয়েছে, আবছা অন্ধকারে সেগুলোকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ঘরের এক প্রান্তে একটি ছেলে স্বল্পালোকে পড়ছে জানলার ধারে বসে। দত্ত একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল, বসে কাঁদতে লাগল। যে ছেলেটি বসে আছে ও তো সে নিজে! পুজোর সময় বোর্ডিং থেকে কেউ তাকে নিতে আসেনি। বোর্ডিংয়ের সব ছেলে বাড়ি চলে গেছে, সে-ই কেবল যায়নি।

অদ্ভুত নিস্তব্ধ বাড়িটা। তবু কিন্তু শব্দ হচ্ছে একটু একটু। ইঁদুরে খুট্‌ করে একটু শব্দ করল, অনেক দূরে কুয়ো থেকে কে যেন জল তুলছে, পিছনের নিমগাছটার ডালপালায় অস্ফুট মর্মর-ধ্বনি জাগছে একটা, কোথায় যেন একটা কপাট খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে হাওয়ায়, দুর থেকে ভেসে আসছে 'চোখ গেল' পাখির ডাক। সবাই আগেকার মতো। দত্তর কান্না আরও বেড়ে গেল।

ভূত আস্তে তার গা স্পর্শ করল আবার, তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সেই কিশোরকালের দত্তকে যে দত্ত আর নেই। মন দিয়ে গল্পের বই পড়ছে। হঠাৎ একটা আরবী পোশাক-পরা অদ্ভুত লোককে দেখা গেল জানলার বাইরে, ছুঁচলো দাড়ি, কোমরের বেল্‌টে একটা ছোট কুড়ুল গোঁজা। পাশে একটা গাধা, গাধার পিঠে কাঠের বোঝা।

"আর ওই যে আলিবাবা'—বলে উঠল দত্ত সোল্লাসে, চেঁচিয়ে উঠল, ভুলে গেল যে সে বুড়ো হয়েছে—"আরে, তুমি কোথা থেকে এলে। তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম যে। কি ভালোই বাসতুম তোমাকে।"

আলিবাবা অদৃশ্য হল। নূতন দৃশ্য জেগে উঠল একটা। মাথায় রাঙা উষ্ণীষ, সাদা ঘোড়ায় চড়ে কে যেন চলেছে।

দত্ত আবার চীৎকার করে উঠলো।—"ওই যে রাজপুত্র! তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে ঘুমন্ত রাজকন্যার কাছে। মায়া রাক্ষসী রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে তাকে। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগাবে তাকে রাজপুত্র। মন্ত্রীপুত্র কোথা? কোটালপুত্র? একলাই চলেছে না কি রাজপুত্র।"

হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে বলে যেতে লাগল দত্ত। রূপকথার দেশে গিয়ে যেন নবীন জীবন ফিরে পেয়েছিল সে। তার আপিসের লোকেরা তাকে এখন দেখলে অবাক হয়ে যেত। তার চোখে আলো জ্বলছে, মুখ উদ্ভাসিত। ললাটে জরা বা ভ্রূকুটি কিছু নেই।

"ওই যে রবিন ক্রুশো! টিয়াপাখিটা। সবুজ গা, হলদে ল্যাজ, মাথার উপর সুন্দর ঝুঁটিটি। ওই তো রয়েছে। রবিন ক্রুশো যখন দ্বীপটা ঘুরে ফিরে এসেছিল তখন তাকে বলেছিল—কোথা ছিলে তুমি রবিন ক্রুশো? ওই যে ফ্রাইডে প্রাণের ভয়ে দৌড়চ্ছে!"

হঠাৎ থেমে গেল দত্ত। ঘরের কোণে ছেলেটির দিকে চেয়ে বলল, আহা, বেচারা!

আবার তার চোখে জল ভরে এল।

"আমার ইচ্ছে করছে"—হঠাৎ বলে উঠল সে পকেটে হাত দিয়ে। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তারপর বলল, "না, এখন আর উপায় নেই, দেরি হয়ে গেছে!"

"কি হল?"—জিজ্ঞাসা করল ভূতটি।

"কাল আমার আপিসের সামনে একটা ভিখারী আগমনীর গান গাইছিল। তাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করছে—"

ভূতটি হেসে তখন নিজের হাতটা শূন্যে তুলে বলল, "এস, এবার আর একটা পুজো দেখি।"

নিমেষের মধ্যে বদলে গেল সব। দেখা গেল যে ছোট ছেলেটি কোণে বসে পড়ছে সে একটু বড় হয়েছে। ঘরগুলো যেন আরও অন্ধকার, আরও পুরোনো। ছাত থেকে প্লাস্টার

খুলে পড়ছে, ভিতরের ইঁটগুলো দেখা যাচ্ছে। কি করে এ পরিবর্তন হল তা দত্ত বুঝতে পারল না। তবে এটা সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারল ভুল কিছু নেই; এই রকমই ছিল, এই রকমই ঘটেছিল। যখন সব ছেলে পুজোর ছুটিতে বাড়ি চলে গেছে তখন এমনি করেই শূন্য বোর্ডিংএ একা একা থাকতে হয়েছিল তাকে।

এবার সে পড়ছিল না, মাথা হেঁট করে পায়চারি করছিল মনের দুঃখে। দত্ত একবার ভূতটার দিকে আর একবার দরজাটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাইলে। এর পরের ঘটনাটা ঘটবে কি? ঘটল। কপাটটা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে একটি কিশোরী মেয়ে ছুটে ঘরে ঢুকল কলরব করে।

"দাদা, আমিও এসে গেছি তোমাকে নিতে। বাড়ি চল। গণশুদার গাড়িতে লুকিয়ে চলে এসেছি। বাড়ির কেউ জানে না। চল, চল, চল, শিগগির চল—"

"বাড়ি যাব পারুল? বাবার রাগ পড়েছে?"

একমুখ হেসে পারুল বলল—"একদম পড়ে গেছে। তোমাকে আর ইস্কুল বোর্ডিংয়ে থাকতেই হবে না। সব জিনিসপত্র নিয়ে চল। বাবার রাগ একদম পড়ে গেছে। বাড়ির আবহাওয়াই এখন অন্যরকম। পরশু দিন রাত্রে বাবা খুব খোশমেজাজে ছিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে তাঁকে জিগ্যেস করলাম, বাবা, দাদা পুজোতে আসবে না? ওই বোর্ডিংয়ে কতদিন রাখবে তাকে। বাবা বললেন, গণেশকে কাল পাঠিয়ে দেব, তাকে নিয়ে আসবে। আমি গণেশের সঙ্গে লুকিয়ে চলে এসেছি। আর বাবা কি বলেছে জান?"—পারুলের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল—"বাবা বলেছে তোমাকে আর পড়তে হবে না। এবার থেকে আপিস করতে হবে তোমাকে। কি মজা! কি মজা! পুজোটা এবার কি আনন্দেই কাটবে! সেজমামা একটু লুডো পাঠিয়েছে!"

"পারুল তুই তো খুব বড় হয়ে গেছিস দেখছি—"

পারুল আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফাতে লাগল। আর হেসে কুটিকুটি হতে লাগল অকারণে। পীতাম্বর তাকে ধরতে গেল, কিন্তু পারল না, ঘরময় হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি করতে লাগল পারুল। খুশীতে একেবারে ফেটে পড়ছে।

"পীতাম্বর দত্তর বাক্স বিছানা নামিয়ে নিয়ে এস।"

হেডমাস্টার মশাইয়ের গলা। তিনি নিজেও এসে ঘরে ঢুকলেন। কটমট করে চাইলেন পীতাম্বরের দিকে। তারপর এগিয়ে এসে তার পিঠে চাপড়ে বললেন, "আশা করি ভালোভাবে থাকবে এবার।" তারপর পারুলের দিকে চেয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাসি ফুটল না। সে মুখে হাসি ফোটে না। ঠোঁট আর গাল এবড়ো-খেবড়ো হয়ে বেঁকে গেল একটু।

"এস, এই ঘরে এস মা লক্ষ্মী।"

পাশের ঘরে গেল তারা। কি ঠাণ্ডা আর অন্ধকার ঘরটা! দেওয়ালে একটা ম্যাপ টাঙানো রয়েছে। টেবিলের উপর একটা গ্লোব।

"এইটে আমার ঘর। খুকী, মোয়া খাবে?"

একটা টিন খুলে মোয়া বার করে দিলেন তাকে। পীতাম্বরকেও দিলেন একটা। "তোমাদের

গাড়োয়ানকেও দাও গিয়ে" এই বলে আর একটা বার করে দিলেন পারুলকে। পারুল ছুটে বেরিয়ে গিয়ে গণেশকে দিতে গেল সেটা। গণেশ বলল, "টিন থেকে বার করে দিয়েছেন তো?"

"হ্যাঁ—"

"ও আমার চাই না। সেবার পিতুকে যখন এনেছিলাম তখনও দিয়েছিলেন একটা। বাবা কি শক্ত, যেন পাথর—।" গণেশ না খেয়ে সেটা গাড়ির ঝোলার মধ্যে রেখে দিলে।

গণেশের বিছানা বাক্স বইপত্র গাড়ির পিছনে বাঁধা হবার পর পীতাম্বর মাস্টার মশাইকে প্রণাম করল। পারুলও করল। তারপর মহানন্দে গাড়িতে চড়ে বসল তারা। গাড়ি চলতে শুরু করল। ঝনঝন করে বাজনা বাজতে লাগল গরুর গলার কণ্ঠী থেকে।

"বড্ড রোগা ছিল পারুল"—ভূত বলল—"কিন্তু মন ওর খুব বড় ছিল।"

"ছিল।"

দত্তর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

"ঠিক বলেছেন, খুব বড় মন ছিল পারুলের।"

"আমার যতদূর মনে পড়ছে তার ছেলেও ছিল একটি।"

"ছিল। আমার ভাগ্নে প্রমোদ।"

"প্রমোদ পারুলের ছেলে?"

"হ্যাঁ।"

দত্তর কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল।

স্কুল ছেড়ে চলে এল তারা।

এরপর তারা যেখানে এল, সেটা একটা রাস্তা, শহরের রাস্তা। অনেক লোক চলাচল করছে কিন্তু কারও মুখ স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না, সব যেন ছায়া। ছায়ার মিছিল চলেছে। ভিড়ে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে, ভিড় খুব, কিন্তু সব ছায়া। দোকান দেখা যাচ্ছে, কাপড়ের দোকান, খাবারের দোকান, ফলের দোকান, প্রতিমার সাজের দোকান। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। সব স্পষ্ট হয়ে গেল তখন।

ভূত একটা বড় আপিসের সামনে দাঁড়িয়ে দত্তকে জিগ্যেস করল—"এটা চিনতে পারছ?"

"পারছি বই কি! এইখানেতেই আমি প্রথম কাজ শিখি।"

"চল ভেতরে ঢোকা যাক।"

একটা টেবিলের পাশে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে ছিলেন। ভদ্রলোক এত লম্বা যে মনে হচ্ছিল আর ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হলে তাঁর মাথা ছাতে ঠেকে যেত। গালে জুলফি, কাঁচাপাকা পুষ্ট গোঁফ।

"এ কি, এ যে নিবারণবাবু! নিবারণবাবু আবার বেঁচে উঠেছেন দেখছি—"

টেবিলের উপর কলম রেখে নিবারণবাবু দেওয়াল-ঘড়ির দিকে চাইলেন। সাতটা বাজে। হাত দুটো ঘষে, গায়ের কোটটা ঠিক করে নিলেন, তারপর হাসলেন। মনে হল যেন সর্বাঙ্গ

দিয়ে হাসলেন, যেন তাঁর পায়ের জুতো থেকে চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত খুশীতে ঝলমল করে উঠল। তারপর তিনি শান্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর কোমল কণ্ঠে বললেন, "কই হে, পীতাম্বর, চারু—"

দত্তর অতীত প্রতিমূর্তি বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে, তখন সে নবীন যুবা, আর তার সঙ্গে এল আর একজন, চারু রায়।

"ও, এই যে চারু"—দত্ত ভূতকে বলল—"আমরা একসঙ্গে অ্যাপ্রেণ্টিস ছিলুম। হ্যাঁ সেই তো। ভারী ভাব ছিল আমাদের। চারু খুব ভালোবাসত আমাকে—"

"ওহে ছোকরারা শোন"—প্রসন্ন হাসি হেসে নিবারণবাবু বললেন, "আইনত মহালয়ার দিন থেকে আপিসের ছুটি। কিন্তু তার তো এখনও দু'দিন দেরি। আমি আজ থেকেই আপিস বন্ধ করে দিচ্ছি। বছরের পুজো, দু'দিন বেশী আমোদ কর তোমরা। আজই মেরে দাও তালা আপিসের দরজায়। বাইরের জানলার খড়খড়িগুলোও বন্ধ কর দিকি ভালো করে। যাও, আর দেরি কোরো না—"

ছুটে বেরিয়ে গেল তারা রাস্তায়। বাইরের চারটে বড় বড় কাঠের জানলা বন্ধ করে দিলে ভালো করে, তারপর বাইরে থেকে লোহার বারগুলো ভালো করে লাগালে। ছিটকিনি টেনে টেনে দেখলে। তালাও লাগালে প্রত্যেক জানলায় দুটো করে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল।

"ব্যাস্, জানলা বন্ধ করেছ তো। বাস এইবার"—তড়াক করে নেমে এলেন তিনি চেয়ার থেকে—"এইবার এইখানটা পরিষ্কার কর দিকি। চেয়ার বেঞ্চি সব সরিয়ে ফেল। জায়গা করে ফেল এখানটায়। চটপট কর। রোহিতলাল এখুনি এসে পড়বে—"

নিবারণবাবুর হুকুম তারা অমান্য করতে পারেনি। দেখতে দেখতে চেয়ার টেবিল, ডেস্ক টুল—সব পাশের ঘরে সরিয়ে ফেললে নিজেরাই। নিমেষের মধ্যে সরিয়ে ফেললে। বিখ্যাত বেহালাবাদক রোহিতলাল আসবে। এ যে অপ্রত্যাশিত খবর। দুজনে দুটো ঝাড়ু নিয়ে মেজেটা পরিষ্কার করে ঝাড়ু দিতে লাগল। তারপর নিবারণবাবু বললেন, "ওপর থেকে শতরঞ্জি, চাদর আর তাকিয়া আন। রোহিতলাল আসবে। একটু খুঁত থাকলে চলবে না—"

তারপর বাঁ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে বললেন, "শুধু রোহিতলাল নয়, কানু কীর্তনীয়াও আসবে। অনেককে আসতে বলেছি। চটপট আসরটা তৈরি করে ফেল দিকি। ওই পুব কোণে রোহিত বসবে আর তার ঠিক পাশেই কানু। মখমলের গালচে আর বালিশ দুটো নিয়ে এস ওপর থেকে। তোমার মাসিমাকে বোলো আতরদান গোলাপপাশটাও যেন বার করে দেন। রোহিত শৌখিন লোক।"

দেখতে দেখতে সব ঠিক হয়ে গেল। নিবারণবাবু দোতলায় থাকেন, একতলায় তাঁর আপিস। নামজাদা আপিস। সেই আপিসের মেজেতে এ বছর গানের আসর বসিয়েছেন নিবারণবাবু। অন্যদিন রোহিতলালকে পাওয়া যায় না, তাই দু'দিন আগেই বায়না করেছেন তাঁকে।

যথাসময়ে রোহিতলাল এলেন। সার্থকনাম লোক। পাকা রুইয়ের মতো চেহারা। মাথায় বাবরি চুল, ফুলেল তেলে চুপচুপে। গলায় বেলফুলের মালা। তাঁর সঙ্গে এলেন তবলচী এবং তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর চেলা বিঠল চৌবে। তিলক-কণ্ঠীপরা কানু কীর্তনীয়াও এসে পড়ল।

বেঁটে নাদুসনুদুস চেহারা। তারপর লোক আসতে লাগল। পাড়ার মুরুব্বী চৌধুরী মশায় এলেন প্রকাণ্ড পানের ডিবে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে ঢুকলেন যোগেন বসাক, টুনু সেন আর তাঁর বন্ধু সর্বেশ্বর সিং। নুনু, চারু, বিশু, পলটু প্রভৃতি ছোকরার দলও এল। তারপর মেয়েরা আসতে লাগলেন। নিবারণবাবুর স্ত্রী, তাঁর ছেলেমেয়েরা, পাড়ার গিন্নীবান্নিরা। সকলেরই মাথায় ঘোমটা দেওয়া। তাঁরা আলাদা একটা কোণে জমায়েত হয়ে বসলেন। পাড়ার চাকর ঠাকুররাও এসে বসল সব একধারে। রাস্তার লোকেরাও ঢুকে পড়ল দু'একজন। ভরে গেল হলটা।—তারপর রোহিতলাল বাজনা শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি সংস্কৃতে গুরুবন্দনা করে জোড়হাতে বসে রইলেন। তারপর প্রণাম করলেন তাঁর বেহালাটাকে। তারপর ছড় তুলে টান দিলেন। অপূর্ব শব্দ বেরুল। মনে হল একটা পাখি ডেকে উঠল যেন। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল আলাপ। তিনি বাজাচ্ছিলেন ইমন কল্যাণ, কিন্তু নিবারণবাবুর মনে হল বেহাগ বাজাচ্ছেন, চৌধুরী মশায় ভাবলেন পিলু, টুনু সেন সর্বেশ্বরের কানে কানে বললেন, "হিন্দোল ধরেছেন"। কেউ কিন্তু মুখ ফুটে টু শব্দটি করতে পারলেন না। বসে বসে সমঝদারের মতো মাথা দোলাতে লাগলেন। যোগেন বসাক টুসকি দিতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু রোহিতলাল সেদিকে একবার চাইতেই থেমে গেলেন তিনি। রোহিতলাল অত্যন্ত রাশভারী লোক। সামান্য গোলমাল হলেই বাজনা বন্ধ করে দেন। একটু পরেই সবাই আনন্দে দুলতে লাগল। নিবারণবাবুর মুখের অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে উঠল। তাঁর মুখ হাসছিল, আর জল পড়ছিল চোখ দিয়ে। প্রায় এক ঘণ্টা বেহালা আলাপ করে থামলেন তিনি। যখন শেষ হল তখন মনে হল একটা বিরাট কিছু থেমে গেল যেন। তাঁর তবলচী থেমে গিয়েছিল। পকেট থেকে রঙীন রুমাল বার করে তিনি কপাল ঘাড় মুছতে লাগলেন। তারপর কীর্তন ধরলেন কানু। তিনি কীর্তনের সুরে আগমনী গাইতে লাগলেন। তাঁর অনুরোধে বিঠল চৌবে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত্ করতে লাগলেন বেহালায়। চমৎকার জমে গেল। কীর্তনীয়ার কীর্তন শেষ হলে আবার বেহালা ধরলেন রোহিতলাল। রোহিতলালের বাজনা শেষ হলে কানু গান ধরলেন। এইভাবে চলতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন আনন্দের সমুদ্র থই থই করছে চারিদিকে।

রাত্রি এগারোটা বাজল টং টং করে। এইবার আসর ভাঙল। নিবারণবাবু হাতজোড় করে দরজায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে বিদায় দিলেন। প্রত্যেককে বললেন যে বারোয়ারিতলায় আবার দেখা হবে। প্রত্যেককে অনুরোধ করলেন বিজয়ার দিন সকলে যেন পায়ের ধুলো দেন।

সবাই যখন চলে গেল তখন নিবারণবাবু দত্ত আর চারু রায়ের দিকে ফিরেও ঠিক ওই সব কথাই বললেন। "তোমরা আজ এইখানেই খেয়ে যেও, তোমাদের মাসিমা আমাকে সকালেই এটা বলতে বলেছিল কিন্তু আমি ভুলে মেরে দিয়েছি।"—হা হা করে হেসে উঠলেন।

এই সব দেখতে দেখতে দত্ত একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। মাঝে মাঝে তার মনে হচ্ছিল পাগল হয়ে গেলাম নাকি। আগে যে সব ঘটনা সত্যি ঘটেছিল, যা দেখে তার প্রাণ একদিন আনন্দে নেচে উঠেছিল, তার আগেকার সেই তরুণ মূর্তি—সব এমনভাবে চোখের উপব ভেসে উঠছে কি করে। এ কি স্বপ্ন? না, মতিভ্রম? না, মায়া? অদ্ভুত একটা অনুভূতি হতে লাগল তার। যখন তার আগেকার তরুণ মূর্তি আর চারু রায় অন্তর্হিত হল তখন তার মনে পড়ল ভূতকে। দেখল ভূত তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, তার মাথার সেই আলোটা আরও স্বচ্ছ, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সে বলল, "এতগুলো লোক যে এত আনন্দ পেয়ে গেল, তার তুলনায় নিবারণবাবুর সামান্যই খরচ হয়েছে।"

"সামান্য?"

"ওই শোন না, চারু রায় আর যুবক পীতাম্বর দত্ত কি বলছে—"

সত্যি তারা প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

ভূত বলল, "বড়জোর শতখানেক টাকা খরচ করেছেন নিবারণবাবু কিন্তু এর জন্যে যে প্রশংসা, যে কৃতজ্ঞতা তিনি অর্জন করলেন তা কত বেশী।"

কথাটা শুনে দত্ত চটে গেল। বুড়ো দত্ত নয়, যুবক দত্ত যেন জবাব দিলে—'টাকাকড়ির ব্যাপারই নয়। নিবারণবাবু লোকটিই এমন যে তিনি ইচ্ছে করলেই আমাদের সুখী কিংবা অসুখী করতে পারেন, আমাদের কাজ সহজ কিংবা কঠিন করে দিতে পারেন, তাঁর মরজি হলে লোহার মতো ভারী ডিউটিও তুলোর মতো হালকা হয়ে যায়। তাঁর এই ক্ষমতা তাঁর টাকায় নেই, আছে তাঁর মুখের কথায়, চোখের দৃষ্টিতে আর প্রাণখোলা হাসিতে। টাকা দিয়ে কি এসব মাপা যায়? যায় না।"

ভূতের চোখে একটা বিশেষ দৃষ্টি দেখে সে থমকে থেমে গেল।

"কি হল?" জিজ্ঞেস করলে ভূত।

"না কিছু হয়নি।"

"হ্যাঁ, কিছু হয়েছে।"

"না, আমার কোরানী যদুর কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এ সময় সে যদি থাকত তাহলে তাকে—"

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

মিলিয়ে গেল সব। তারা আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

"আমার সময় নেই"—ভূত বললে—"চটপট সেরে নাও।"

এ কথা ভূত দত্তকে বলল না, কাকে যে বলল তাও বোঝা গেল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন দেখা গেল। দত্ত আবার নিজের আর একটা ভূতপূর্ব-চেহারা দেখতে পেল। এবার একটু বেশী বয়স হয়েছে। পূর্ণ যৌবন। বুড়ো বয়সে মুখে যে সব কুটিল বলিরেখা হয়েছিল, যে কুচুটে কঠোর ভাব ফুটে উঠেছিল, সে সবের কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে চিন্তার আর লোভের ছায়া পড়েছে। চোখের দৃষ্টি ব্যগ্র, লুব্ধ, যে প্রবৃত্তি পরে তার চরিত্রে শিকড় গেড়েছিল তার আভাস বেশ বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে গাছের ছায়াটি কোন্ দিকে পড়বে।

দত্ত দেখল সে একলা নেই, তার পাশে একটি মেয়ে বসে আছে। বিষাদের প্রতিমূর্তি যেন, তার বেশবাসেও সে বিষাদ ছড়িয়ে পড়েছে। মেয়েটি কাঁদছে। ভূতের মাথায় যে আলো জ্বলছিল সেই আলোয় চকমক করতে লাগল অশ্রুবিন্দুগুলি।

"তোমার কাছে হয়তো এটা খুবই সামান্য ব্যাপার। আর একজন এসে আমার স্থান অধিকার করেছে। ভবিষ্যতে আমি তোমাকে যে আনন্দ, যে সুখ দিতে পারতাম সে-ও যদি তা পারে তাহলে আমার বলবার কিছু নেই।"

"কে তোমার স্থান অধিকার করছে।"

"অথ! অর্থ-লোভ।"

"পৃথিবীর এই রকমই বিচার!"—দত্ত উত্তর দিল—"যখন দারিদ্র্যের চাপে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করে, তখন সকলে অভিশাপ দেয় দারিদ্র্যকে। দারিদ্র্যকে দূর করবার জন্য মানুষ যখন আবার টাকা রোজগার করবার চেষ্টা করে, তখনও আবার লোকে তাকে গালাগালি দিতে ছাড়ে না। আশ্চর্য, সমাজের বিচার!"

"তুমি আজকাল সমাজকে একটু বেশী ভয় করছ"—মাথা নীচু করে মেয়েটি বলল—"আগে এত করতে না। এখন তোমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ওই একটি জিনিসেই নিবদ্ধ হয়েছে, কি করে সমাজের চোখে তুমি বড়লোক বলে প্রতিপন্ন হবে। তোমার ভালো গুণগুলো একে একে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কি করে বেশী টাকা হবে একমাত্র এই চিন্তাতেই এখন তুমি মগ্ন। এই চিন্তা বানের মতো এসে তোমাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে।"

"তাতে কি? তখন আমার সাংসারিক বুদ্ধি ছিল না, এখন হয়েছে। কিন্তু তোমার প্রতি আমি বিরূপ হয়েছি কি?"

মেয়েটি মাথা নাড়ল।

"হইনি তো? তবে—"

"আমাদের দুজনের ভাব ছেলেবেলা থেকে। তখন আমরা দুজনেই গরীব ছিলাম। ভেবেছিলাম গরীব গৃহস্থের মতোই সুখে দুঃখে আমাদের জীবন কেটে যাবে। তখন তুমি দেবতার মতো ছিলে। এখন তুমি বদলে গেছ। ছেলেবেলায় তুমি আমার কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলে তা এখন বিভীষিকার মতো মনে হচ্ছে আমার কাছে। তুমি বদলে গেছ। টাকার লোভে তুমি পাড়ার নিধু মামার বিষয়সম্পত্তি নীলাম করিয়ে নিয়েছ, এ কথা ভাবতেও পারি না।"

"নিধু মামা যদি আমার টাকা নিয়ে না দেন, আমি কি করব! বাধ্য হয়ে আমাকে আদালতে যেতে হয়েছে।"

"যখন তোমার সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল, যখন আমবাগানে আমরা একসঙ্গে খেলা করতাম তখন তুমি কি এসব কথা ভাবতেও পারতে?"

"তখন আমি নির্বোধ বালক ছিলাম। এখন আমার বুদ্ধি হয়েছে।"

"এখন তুমি বদলে গেছ। যাকে আমি চেয়েছিলাম সে আর নেই। তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি। যে শপথ আমরা গোপনে ছেলেবেলায় নিয়েছিলাম, তা ভেঙে দিতে এসেছি।"

"আমি কি মুক্তি চেয়েছি কখনও?"

"না, কথায় সে কথা বলনি কখনও।"

"তবে?"

"কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গিতে তা প্রকাশ পেয়েছে। তুমি অন্য জগতের লোক, যে আবহাওয়ায় তুমি এখন ঘোরাফেরা কর তা বড়লোকদের আবহাওয়া, সেখানে আমার মতো মেয়ে বেমানান। তোমার সঙ্গে আগে যদি আমার আলাপ না থাকত তাহলে তুমি কি এখন আমার ত্রিসীমানায় আসতে? আসতে না। তুমি এখন আমার নাগালের বাইরে। আমিও আর তোমার নাগালের মধ্যে নেই।"

দত্তর মনে হল ও যা বলছে তা ঠিকই, কিন্তু তবু মুখে সে কথা স্বীকার করতে বাধল তার।

"সত্যিই কি আমরা দূরে সরে গেছি?"

"এর উল্‌টোটা ভাবতে পারলে আমার চেয়ে বেশী সুখী আর কে হত! কিন্তু যা সত্যি নয়, তা ভাবব কি করে। সত্যিই তুমি দূরে সরে গেছ। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, অনেক কেঁদেছি। শেষে দেখলাম আমাদের মিলন বিধাতার অভিপ্রেত নয়। তুমিও তো আজকাল আমাদের বাড়ি আর যাও না, আগে যেমন যেতে। আমার বাবা তোমাকে পণ দিতে পারবেন না, কিছুই দিতে পারবেন না, অথচ তোমার মতো ছেলের বাজার দর আজকাল যে কত তা তো সবাই জানে। হয়তো সেই জন্যেই তুমি আমার দিকে ফিরে চাইছ না, কারণ তোমার জীবনে এখন টাকাই ধ্যানজ্ঞান। আমাকে বিয়ে করলে হয়তো তোমার অনুতাপই হবে কিছু পাওনি বলে। আমি সে অনুতাপের কারণ হতে চাই না। আমি চললাম।"

"শোন, শোন"—দত্ত বলে উঠল।

মেয়েটি তখন একটু থেমে বলল, "বুঝতে পারছি, আমাদের সেই ছেলেবেলার কথা মনে করে হয়তো তোমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এ কষ্ট সামান্য ক্ষণের জন্যে। কিছুক্ষণ পরেই ভুলে যাবে সব। একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে লোকে যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তুমিও তেমনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, ভগবান তোমাকে সে পথে সুখী করুন।"

মেয়েটি চলে গেল।

দত্ত তখন ভূতের দিকে চেয়ে বলল, "আমি আর দেখতে চাই না। আর আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না।"

"আর একটা ছবি দেখাব"—দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল ভূত।

"না, না, আমি আর দেখতে চাই না। আর আমাকে কিছু দেখাবেন না।"

এর পর ভূত যা করল তা অপ্রত্যাশিত। তার হাত দুটো পিছমোড়া করে ধরে ফেলল শক্ত করে।

ফুটে উঠল আর একটা ছায়াছবি।

.....একটি ঘর। খুব বড়ও নয়, তেমন সুন্দরও নয়। কিন্তু সুখে শান্তিতে পরিপূর্ণ যেন। বারান্দায় একটি সুশ্রী মেয়ে বসে তরকারি কুটছিল। যে মেয়েটির সঙ্গে একটু আগে কথাবার্তা হল ঠিক সে-ই যেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙল যখন প্রৌঢ়া একটি মহিলা বেরিয়ে এল ঘর থেকে এবং এসে আসন পেতে বসল তার মেয়ের সামনে। পাশের ঘরে দারুণ হুল্লোড় হচ্ছিল। অনেকগুলো ছেলের হুল্লোড়। দত্ত জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে, যেন উন্মত্ত হয়ে লাফালাফি করছে ঘরে। মনে হচ্ছিল একশ'টা ছেলে জুটেছে ওখানে। কিন্তু আসলে প্রত্যেক ছেলেটি একাই একশ। এত চীৎকার হচ্ছিল, কিন্তু কেউ গ্রাহ্য করছিল না তা। বরং মা ও মেয়ে বারান্দায় বসে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। মনে হচ্ছিল তারা

যেন এটা উপভোগই করছে। শেষে মেয়েটিও আর কুটনো কুটতে পারল না, উঠে গিয়ে যোগ দিলে ওদের হুড়োমুড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে তার ঘাড়ে পিঠে পড়ে অস্থির করে তুললে তাকে। তার খোঁপা খুলে গেল, কাপড় বিস্রস্ত হয়ে পড়ল। দত্ত মনে মনে ভাবতে লাগল, আহা আমি যদি ওদের দলে যোগ দিতে পারতাম। ওরা সবাই কানামাছি খেলছিল। দত্তর মনে হল—ছি, ছি ছেলেগুলো মেয়েটিকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিলে। আমি থাকলে ওরকম অসভ্যতা করতাম না। আমি ওকে আদর করতাম, ওকে চুমু খেতাম, ওর আনত চোখের দৃষ্টিতে অবগাহন করে কৃতার্থ হতাম, ওর উপর এমন অত্যাচার করতাম না। ওই অসভ্য ছেলেগুলো কি করছে!

এমন সময় দুয়ারের কড়া নড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দল বেঁধে ছুটল সবাই সেদিকে, বিস্রস্তবাসা মেয়েটিও ছুটল খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে। কপাট খুলেই দেখল তাদের বাবা এসেছে। হাতে একটি বাণ্ডিল, বগলে আর একটি। পিছনে একটা ঝাঁকা মুটে। পুজোর কাপড়-চোপড়, খেলনা আর জিনিসপত্র এসেছে। ওঃ, কি হুল্লোড় হৈ-হৈ পড়ে গেল যে এর পর। বাবা যা যা এনেছিলেন—প্যাকেট, বাণ্ডিল, কৌটো,—সব কাড়াকাড়ি করে নিয়ে নিলে তারা। আর সবাই মিলে বাবাকে সে কি আদর! তাঁরও কাপড় জামা বিস্রস্ত হয়ে গেল, চাদরটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে। "আঃ, ছাড়, ছাড়, কি যে করিস তোরা"—বার বার বলতে লাগলেন তিনি। কিন্তু তারা তখন এত উত্তেজিত, এত আনন্দিত হয়েছে যে তাঁর কোন কথা কানেই গেল না। সকলেরই দন্ত বিকশিত, চোখ জ্বলছে, হাঁপাচ্ছে সবাই।

তারপর প্রত্যেকটি প্যাকেট যখন খোলা হতে লাগল তখন উত্তেজনা সীমা ছাড়িয়ে গেল। ননতুর জুতো, কানুর জুতো, বিলুর পুতুল, শ্যামের বাঁশী, হাবুলের কামিজ, উমার ফ্রক, মীরার ফ্রক, সকলের কাপড়, মেয়েদের রঙীন শাড়ি, দু'বাক্স সাবান, লজেন্স, চকোলেট, দমদেওয়া টিনের মোটরকার, রবারের দশটা বেলুন। এর মধ্যে আর একটা কাণ্ড ঘটল, প্লাসটিকের ছোট খরগোশটাকে বিলু মুখে পুরে চিবিয়ে দিয়েছে। হৈ চৈ পড়ে গেল। খরগোশের একটা কান কোথা গেল। গিলে ফেলেছে না কি! খোঁজ খোঁজ খোঁজ! বিলুকে দুবার হাঁ করিয়ে তার মুখে আঙুল দিয়ে দেখল হাবুল। তারপর হঠাৎ পাওয়া গেল খরগোশের কানটা, ভেঙে পড়েছিল মেজেতে। নিশ্চিন্ত হল সবাই। বিলু দমদেওয়া মোটরটাও তুলে মুখে দিতে যাচ্ছিল, মীরা ছোঁ মেরে সেটা কেড়ে নিলে তার হাত থেকে। কান্নার রোল তুললে বিলু। বড় মেয়েটি বিলুকে কোলে নিয়ে বাইরে চলে গেল। একটু পরেই হৈ-চৈ-টা থেমে গেল। সবাই নিজের নিজের খেলনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রত্যেকের মুখের ভিতর একটা করে লজেন্স্।

দত্ত লক্ষ্য করল পাশের ঘরে বাবা মা আর তাঁদের বড় মেয়েটি রয়েছে। বাবা দুটো বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স খুলে দেখাচ্ছেন। বড় মেয়ের জন্য এনেছেন তিনি জরির কাজ করা নীলাম্বরী শাড়ি, তার সঙ্গে মাথায় দেবার জন্য জরির ফিতেও। আর মায়ের জন্য লালপেড়ে গরদ। মা মেয়ে দুজনেরই মুখই আনন্দে উদ্ভাসিত।

"তোমার জন্যে কিছু আননি?"—জিজ্ঞাসা করলেন মা।

"আমার জন্যে একটা নতুন মিলের ধুতি কিনেছি। বিজয়ার দিন সেটা পরব। আছে ওই প্যাকেটটার মধ্যে।"

দত্ত মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার চোখের দৃষ্টি যেন ফেরে না। ও মেয়ে তারই হতে পারত, তার জীবনের অন্ধকারকে আলোকিত করতে পারত, সৃষ্টি করতে পারত ওয়েশিস তার জীবনের মরুভূমিতে।

বাবা তখন হেসে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, "বেলা, তোমার ছেলেবেলার এক বন্ধুকে আজ দেখলাম।"

"কে বন্ধু—"

"আন্দাজ কর—"

"আমি কি করে আন্দাজ করব!" তারপর হেসে বললেন, "পীতাম্বর দত্ত নয় তো?"

"হ্যাঁ, পীতাম্বর দত্তই। আমি আজ তার আপিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম আপিস খোলা রয়েছে। একটু আশ্চর্য হলাম, তার পার্টনার ঘোষ শুনলাম শুষছে, এখন তখন অবস্থা। অথচ উনি দোকান খুলে বসে আছেন। আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম। একা বসে আছেন ভদ্রলোক। দেখে কষ্ট হল। পৃথিবীতে ওঁর কেউ নেই বোধ হয়।"

দত্ত তখন ভূতের দিকে চেয়ে বলল, "এখান থেকে নিয়ে চলুন আমাকে। এ দৃশ্য আমি আর দেখতে পাচ্ছি না।"

"এসব ছায়া"—ভূত বলল—"সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এখন ওদের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু একদিন ছিল, যা দেখছ ঠিক তেমনি ছিল, এখন ওরা ছায়া।"

"আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে। এসব আমি আর দেখতে পাচ্ছি না।"

দত্ত ভূতের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল। ভূত নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত ছেড়ে দিয়েছে, তবু দত্ত নড়তে পারছে না। তার মুখ একটা মুখ নয়, একজনের মুখ নয়, নানা মুখের টুকরো জুড়ে জুড়ে কি যেন একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিস—!

"ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে, দয়া করুন।"

দত্ত চীৎকার করতে লাগল। পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ভূতের মাথার মাঝখান থেকে ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত আলোটা আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আরও উপরে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন আকাশ ছোঁবে এখুনি। তারপর সহসা সে বগল থেকে টুপিটা মাথায় পরে ফেলল। আলো নিবে গেল। মনে হল টুপিটা যেন তার সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু পায়ের কাছে আলো দেখা যাচ্ছে তবু, মাটির উপর আলোর ঝরনা ঝরছে যেন।

দত্তর মনে হল সে যেন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঃ ঘুমে চোখ দুটো ভেঙে আসছে। তারপর সে হঠাৎ অনুভব করল, সে তো তার নিজের শোবার ঘরেই রয়েছে। তারপরই সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। অঘোরে ঘুমুতে লাগল।

।। তিন।।

দত্ত প্রচণ্ডভাবে নাক ডাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার নাক-ডাকা থেমে গেল, সে চট্ করে উঠে বসল বিছানায়। তারপর চেষ্টা করল তার এলোমেলো চিন্তাগুলোকে ঠিক করে নেবার, এমন

সময় টং করে একটা বাজল। দত্তর মনে হল, ঠিক সময়ে ঘুম ভেঙেছে তো, ঘোষ যে দ্বিতীয় ভূতটি পাঠাবে বলেছিল এই তো তার আসার সময়। শীত করতে লাগল। তারপর মনে হল, কোন্ জানলাটা দিয়ে এ ভূতটা আসবে? তিনটে জানলাতেই পরদা লাগানো রয়েছে। হঠাৎ কোন্‌টা সরিয়ে দেবে এসে? না, তা করতে দেওয়া হবে না। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এসে যে ঘাবড়ে দেবে, সেটি চলবে না। সে উঠে গিয়ে তিনটি পরদাই নিজের হাতে সরিয়ে দিলে। তারপর বিছানার গিয়ে উপুড় হয়ে শুল জানলার দিকে মুখ করে। দেখা যাক কি করে। সামনাসামনি মোকাবিলা করতে হবে। হঠাৎ এসে যে হকচকিয়ে দেবে সেটি হচ্ছে না।

বাহাদুরি করা অনেক লোকেরই স্বভাব। 'কি করবে আমার? দেখ লেঙ্গে। ওরকম অনেক মিঞাকেই দেখেছি, আমার পাল্লায় পড়লে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। সেদিন একটা গুণ্ডার মাথায় এইসা এক চাঁটি দিলাম যে সে অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে গেল। এই ধরনের বাহাদুরি অনেকে করে। চলতি বাংলায় একে 'তড়পানো' বলে। দত্ত ঠিক এই ধরনের লোক নয় যদিও, মনে মনে সে আস্ফালনও করছিল না তেমন, কিন্তু এটা সত্যি কথা সে ওৎ পেতে বসেছিল, মানে প্রস্তুত হয়ে বসেছিল ভূতটার জন্যে। একটা শিশুই আসুক বা গণ্ডারই আসুক, সে ঘাবড়াবে না। সব কিছুর জন্যে মনে মনে তৈরী হয়ে বসেছিল সে।

সে সব-কিছুর জন্যে তৈরি হয়ে বসেছিল বটে, কিন্তু কিচ্ছুই হবে না, এর জন্যে তৈরি ছিল না। সুতরাং একটা বাজবার পর জানলায় যখন কোনও মূর্তি দেখা গেল না তখন ঘাবড়ে গেল সে খুব। কাঁপতে লাগল। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট কেটে গেল, কিচ্ছু হল না, কেউ এল না। বিছানায় শুয়েই রইল সে, তারপর একটা টকটকে লাল আলো সে দেখতে পেল তার বিছানার উপরই : কোন মূর্তি নয়, আলো। টকটকে লাল আলো। কি সর্বনাশ, এ যে ভূতের চেয়েও ভয়ংকর। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল দত্ত। আলো? লাল আলো? এর মানে কি? এ কি করবে শেষ পর্যন্ত! কোথাও আগুন ধরে গেল নাকি। আপনা-আপনি অনেক সময় অনেক জিনিস জ্বলে ওঠে। সেই রকম কিছু হল নাকি। দত্তের মানসিক অবস্থার কথা ভেবে হাসবেন না। বিপদে পড়লে অনেকেই ওরকম বেসামাল হয়ে এলোমেলো চিন্তা করে। এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল এ রকম উপদেশ আওড়ানোও হাস্যকর। কারণ যে লোকটা বিপদে পড়েছে, সে-ই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে কি করতে হবে। আলোটা লক্ষ্য করতে লাগল দত্ত। কোথা থেকে আসছে এটা! আরও ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল পাশের ঘর থেকে আসছে, হ্যাঁ ঠিক পাশের ঘর থেকেই। সন্দেহ নেই, পাশের ঘর থেকেই আসছে। তাহলে? মনস্থির করে দত্ত বিছানা থেকে আস্তে আস্তে নেমে পড়ল। আস্তে আস্তে চটি জুতোয় পা গলিয়ে এগিয়ে গেল পাশের ঘরের দিকে।

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াতেই আর এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। ঘরের ভিতর থেকে কে যেন ভারী গলায় বলে উঠল—পীতাম্বর দত্ত ভিতরে এস।

সঙ্গে সঙ্গে দত্ত কপাট ঠেলে ঢুকে পড়ল।

ঘরটি তারই ঘর। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে হল ঘরটার আশ্চর্য রকম পরিবর্তন ঘটেছে যেন। চেনা যাচ্ছে না। ঘরের দেওয়াল ছাদ সব সবুজ পাতা দিয়ে সাজানো।

ঘর নয়, যেন কুঞ্জ। চারদিকে থেকে এক আশ্চর্য অপরূপ সৌন্দর্য উথলে পড়ছে। গোছা গোছা কাশ ফুল, শিউলির মালা, কলকে ফুলের মালা, বেল ফুলের মালা—দুলছে দেওয়াল থেকে। আলোয় ঝলমল করছে সব। ঘরের একধারে আলপনা-দেওয়া চমৎকার বেদী একটি। তার উপর দুর্গা প্রতিমা। কি সুন্দর সে প্রতিমা, ভাষায় তার বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রতিমার সামনে থরে থরে নৈবেদ্য। কত রকম ফল, কত মিষ্টান্ন, স্তূপীকৃত কত ভাত, প্রকাণ্ড হাঁড়ি-ভরা খিচুড়ি, থালায় থালায় তরকারি, কড়া-ভরা পরমান্ন—কত শ্বেতপাথরের থালা বাটি গেলাস। ঘটের উপর নারকেল বসানো। ধূপ জ্বলছে, প্রকাণ্ড পিলসুজে প্রদীপ জ্বলছে। ধপধপে বড় শাঁখটি রয়েছে একধারে। তার পাশ ঘণ্টা। ঝাঁঝরও রয়েছে আর একধারে। অবাক হয়ে গেল দত্ত। একি কাণ্ড! এ কোথায় এলাম! এ কি আমারই ঘর। একধারে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক দৈত্যের মতো লোক, মুখে প্রসন্ন হাসি, হাতে প্রকাণ্ড একটা ঘিয়ের প্রদীপ।

"এস পীতাম্বর দত্ত। ভিতরে এস। আমার সঙ্গে আলাপ কর।"

দত্ত ভয়ে ভয়ে ঢুকে দৈত্যের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার চরিত্রের সমস্ত প্যাঁচ খুলে যেন। কিন্তু সে দৈত্যের চোখের দিকে চাইতে পারল না, যদিও দৈত্যের স্বচ্ছ প্রসন্ন দৃষ্টিতে ভয়ংকর কিছু ছিল না।

"আমার দিকে চেয়ে দেখ। আমি বর্তমান পূজার ভূত। মুখ নীচু করে থেকো না। চাও আমার দিকে।"

দত্তর কেমন যেন একটা শ্রদ্ধা হল। শ্রদ্ধাভরে সে চোখ তুলে চাইলে। ভূত এক অদ্ভুত রঙের পোশাক পরে আছে। ঘন সবুজ রঙের আলখাল্লা একটা, সাদা পাড়-বসানো। ঠিক যেন বাউলের মতো ঢিলে-ঢালা পোশাক। বুকটা কিন্তু ঢাকেনি। প্রশস্ত ছাতিটা যেন নীরবে ঘোষণা করছে, আমাকে কেউ ঢাকতে পারবে না। পা দুটোও ঢাকা পড়েনি। খালি পা। মাথায় টুপি ছিল না, ছিল সবুজ ধানের শীষ দিয়ে তৈরি একটি চমৎকার মুকুট। তার কালো কুঞ্চিত লম্বা কেশ বাবরির মতো লুটিয়ে পড়েছিল কাঁধের উপর স্বচ্ছন্দে। সবই তার স্বচ্ছন্দ। মুখের হাসি, চোখের দৃষ্টি, প্রসারিত করতল, আনন্দিত কণ্ঠস্বর, সহজ ব্যবহার—কোথাও কোন কুণ্ঠা নেই। কোমরে জড়ানো ছিল একটা ফুলের মালা।

"আমার মতো কাউকে দেখনি আগে নিশ্চয়।"

ভূত হেসে প্রশ্ন করল।

"না।"

"আমার পরিবারের ছোটদের সঙ্গেও মেশোনি বোধ হয়। ঠিক ছোট নয়, আসলে বড়, মানে যারা সম্প্রতি কিছুদিন আগে জন্মেছে।"

"না, বোধহয় মিশিনি। মনে পড়ছে না। আপনার কতগুলি ভাই আছে?"

"প্রায় হাজার দুই হবে।"

"এ বাজারে এত পরিবার! সামলানো শক্ত"—মৃদুকণ্ঠে বলে দত্ত।

ভূত উঠে দাঁড়াল।

দত্ত তখন সবিনয়ে বলল, "আমাকে যেখানে নিয়ে যেতে চান, চলুন। আপনার আগে যিনি এসেছিলেন তিনি জোর করে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি অনেক কিছু

দেখেছি, অনেক কিছু শিখেছি। এখন আপনি যদি আমাকে কিছু দেখাতে চান, আমি রাজি আছি।"

"আমার এই আলখাল্লাটা ছুঁয়ে থাক।"

দত্ত এগিয়ে গিয়ে মুঠো করে ধরল সেটা।

সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করল সব। সবুজ লতাপাতা, ফুল, ফুলের মালা, নৈবেদ্যর সারি, প্রতিমা পূজার উপচার মুহূর্তে মিলিয়ে গেল সব। ঘরটাও মিলিয়ে গেল, রাত্রিটাও। তারা সপ্তমীর ভোরে একটা রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ভৈরবী সুরে সানাই বাজছে দূরে। আগমনীর গান। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে সবাই। অনেক ঘরের সামনেই ঘট, তার উপর নব-পত্রিকা। দরজার দু'পাশে কলাগাছ। দেবদারু পাতা আর রঙীন কাগজের মালাও দুলছে কোথাও কোথাও। নানারকম পাখি ডাকছে। বিশেষ করে কোকিল আর হলদে পাখি। উৎসব পড়ে গেছে চড়াই পাখিদের। তারা কোথাও বসছে দল বেঁধে, চটপট করে দানা খুঁটে খেয়ে নিচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে তারপর দল বেঁধে। একপাল পায়রা একটা বাড়ির সামনে জমায়েত হয়েছে, ব্যস্ত হয়ে খাবার খাচ্ছে তারা। বাড়ির গৃহিণী একটা ডালা থেকে খাবার ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কি প্রসন্ন ভাব তাঁর মুখে! আকাশ নির্মেঘ, একটা ঘন-নীল আনন্দের সমুদ্র যেন নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ হয়ে মাথার উপর। মৃদু মৃদু হাওয়া বইছে। শরতের স্নিগ্ধ হাওয়া। শাঁখ বেজে উঠল একটা বাড়ি থেকে। একে একে বাড়ির কপাট খুলতে লাগল। ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সব বেরুতে লাগল একে একে। সবারই মুখে আনন্দের জ্যোতি, অনেকেরই গায়ে নূতন পোশাক, অনেক ছেলের রঙীন বেলুন। দোকানীরা দোকান খুলতে লাগল তারপর। দোকানগুলো যেন নূতন সাজে সেজেছে, দোকানীরাও। সন্দেশের দোকানে কি অপূর্ব শোভা! সন্দেশগুলোও সব নূতন সাজ পরেছে। কেউ লাল, কেউ সবুজ, কারো গায়ে রাংতা দেওয়া। থাকে থাকে সাজানো রয়েছে সব। এ ছাড়া রাস্তার উপরেই একধারে বসে গেছে ছোট ছোট খেলনার পসারীরা। তাদের দোকানে ছোট ছোট বাঁশের বাঁশি, টিনের বাঁশি, রবারের নানারকম পুতুল, ছোট ছোট পিস্তল। তাদের পাশেই চিনির মঠ বিক্রি করতে বসে গেছে বুড়ো একটি লোক। রঙীন মঠ, সাদা মঠ। গোলাপ-ছড়িও আছে তার কাছে। তার পাশে একটি কুমোর-বউ। তার কাছে রয়েছে নানারকম মাটির খেলনা। ছোট ছোট ঘোড়া, গরু (গরুগুলো ছাগলের মতো দেখাচ্ছে), মাথায়-টুকরি লাল-নীল রঙের মেয়ে, সারি সারি গণেশ, হাতি, বালগোপাল, লাঠি-ঘাড়ে পাগড়ি-মাথায় পুলিস, কত কি। খুব বড় একটা মনিহারী দোকান খুলেছে ওদিকের কোণটায়। বনবন করে পাখা ঘুরছে তাতে, রেডিও বাজছে। ফরসা লম্বা ফণী পালিত বসে আছেন। দোকানের মালিক তিনি। কুচকুচে গোঁফ ইয়া পাকানো। বড় বড় চোখ দুটি কিন্তু হাসছে। মূর্তিমান আনন্দের মতো বসে আছেন তিনি হাসিমুখে। দলে দলে ছেলেমেয়েরা ভিড় করছে তাঁর দোকানের সামনে—মোটরের দাম কত, ওই হাঁসটা কি প্যাঁকপ্যাঁক করবে, ওটা কি ব্যাঞ্জো, ওই শিশির ভেতর পদ্মফুলটার দাম কত—অসংখ্য রকম প্রশ্ন করছে ছেলেমেয়ের দল। তিনি হাসিমুখে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন আর প্রত্যেককে দিচ্ছেন একটি লজেন্স্। পুজোর ক'দিন তিনি লজেন্স্ বিতরণ করেন। কুকুরও জুটেছে অনেকগুলো। তারাও যেন পুজোর আনন্দে

মেতেছে। মাঝে মাঝে খুব কলরব করে উঠছে, সকলের মনে হচ্ছে ঝগড়া করছে বুঝি। কিন্তু আসলে ওটা ঝগড়া নয়, আনন্দ। চারিদিকেই আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। একটা নীলকণ্ঠ পাখির ডাকে মুখরিত হয়ে উঠেছে চারদিক। হঠাৎ একসঙ্গে ঢাক বেজে উঠল অনেকগুলো। কাছেই বারোয়ারিতলা, মায়ের পুজো আরম্ভ হয়ে গেল বোধহয়। ছুটল সবাই সেদিকে। পিল পিল করে ছুটল। বারোয়ারিতলার সামনে বিস্তৃত মাঠে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। স্টেজও বাঁধা হয়েছে একটা। আজ রাত্রে সেখানে 'কর্ণার্জুন' অভিনয় হচ্ছে। কর্ণ সাজবে পাড়ার বিখ্যাত অভিনেতা। সেই সামিয়ানার তলায় কাঠের বেঞ্চি আর টিনের চেয়ারও সাজানো রয়েছে। অনেক লোক বসে আছেন। আর তাঁদের সামনে ঢুলীরা বাজনা বাজাচ্ছে। বড় বড় ঢাকের উপর পালক, ঢুলীদের চেহারা কুচকুচে কালো, মাথায় বাবরি চুল, একজনের গলায় রুপোর মাদুলি একটা। নেচে নেচে কী বাজনাই বাজাচ্ছে তারা! চতুর্দিক সরগরম হয়ে উঠেছে। বাজনার তালে তালে কাঁসিও বাজছে একখানা। বাজনা নয়, যেন যুদ্ধ। শব্দের যুদ্ধ। গুড় গুড় গুড়, গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম, যেন কামান আওয়াজ হচ্ছে। দত্ত হঠাৎ লক্ষ্য করল যে ভূত তার আলখাল্লার ভিতর থেকে একটা পিচকিরির মতো জিনিস বার করে চারদিকে আতরের মতো কি একটা ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ঢাকের বাজনা থেমে গেল। শাঁখ বাজল আবার। চণ্ডীপাঠের উদাত্ত ধ্বনি শোনা গেল। ঘণ্টা বাজতে লাগল পুরোহিত মহাশয়ের হাতে। ধূপ ধুনোর গন্ধে, ফুলের গন্ধে, ভোগের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হয়ে উঠল।

দত্ত জিগ্যেস করল—"আপনি যা ছড়াচ্ছেন তাতে কি গন্ধ আছে কোনও? আতর না কি!"

"না, আতর নয়। তবু গন্ধ আছে ওতে। আমার গন্ধ।"

"আপনার গন্ধ? কি রকম?"

"আমি যা ছড়াচ্ছি তাতে আজকের সব কিছু মধুময় হয়ে যাবে। সব মন্ত্র, সব নতুন কাপড়, সব ফুল, সব হাসি, সব খাবার নূতন একটা গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠবে। বিশেষ যে সব খাবার গরীবদের দেওয়া হচ্ছে, তা আরও মধুময়—আরও সুরভিত হয়ে উঠবে!"

"গরীবদের সম্বন্ধে এ পক্ষপাত কেন?"

"ওদের প্রয়োজন যে অনেক বেশী।"

"আপনাকে একটা কথা বলব?"

"কি, বল।"

"এখানে গরীবদের লংগরখানায় রোজ খেতে দেওয়া হয়। আজ সেটা বন্ধ। গরীবরা আজ সেখানে খেতেই পাবে না।"

"কেন?"

"কর্মচারীরা সব পুজোর ছুটিতে বাড়ি গেছে। অর্থাৎ আপনার নামেই এটা হয়েছে। উচিত হয়েছে কি?"

"পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যারা আমার নামের সুযোগ নিয়ে অনেক অন্যায় করে। পুজোর নামে অনেক বীভৎস জিনিস হয় তা জানি। নিজেদের স্বার্থপরতা, নিজেদের

অহংকার, নিজেদের নীচতা, নিজেদের ঝগড়া, নিজেদের হিংসা সমস্ত আরোপ করে আমার উপর। তারা আমাকে জানে না, আমার যারা প্রিয় তাদেরও জানে না। দোষটা আমাকে দিও না, তাদের দাও।"

"বেশ।"

আবার তারা চলতে শুরু করল। বলা বাহুল্য, অদৃশ্য হয়ে চলছিল তারা। আরও দূরের দিকে চলতে লাগল তারা, শহরতলির দিকে। দত্ত ভূতটির একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করল। যদিও সে বৃহৎকায় কিন্তু যে-কোনও অবস্থায় সে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিচ্ছিল। একটা বড় 'হল'-এ বা একটা খুব নীচু ছাঁচতলায় কোথাও বেমানান হচ্ছিল না সে।

তার এই ক্ষমতা দেখাবার জন্যেই হোক, কিংবা তার মহৎ উদার প্রাণখোলা স্বভাবের জন্যই হোক, সে গরীবদের পাড়ার দিকে যেতে লাগল। ক্রমশ সে দপ্তর কেরানী যদুবাবুর বাড়িতে এসে হাজির হল। দত্তকেও যেতে হল তার সঙ্গে সঙ্গে তার আলখাল্লা ধরে ধরে। যদুবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে ভূত তার পিচকিরি বার করে আতর ছড়াতে লাগল। দত্তর মনে হল, যদু মাত্র আশি টাকা মাইনে পায়। তার বাড়ির সামনে ভূত এত আতর খরচ করছে। কি কাণ্ড! ভূত তার খোলার ঘরটাকে আতরে নাইয়ে দিলে একেবারে। তারপর তারা ঢুকল তার ঘরে।

যদুর স্ত্রী খাবার দিচ্ছিল সকলকে। আধঘোমটা দেওয়া, নাকে একটি নাকছাবি, পরনের কাপড়টা নতুন, কিন্তু খুব খেলো। পাড়টাতেই একটু জাঁকজমক। কস্তা লাল পাড়। তাকে সাহায্য করছিল তার দ্বিতীয় মেয়ে অনিমা। তার পরনের কাপড়টা যদিও ডুরে, কিন্তু সেটাও খুব বেশী দামী নয়। যদুর বড় ছেলে পলটু খুব ঢলঢলে জামা পরে আছে। যদু এই জামাটা বছর দশেক আগে কিনেছিল, সিল্কের পাঞ্জাবি একটা। কিন্তু সেটা পরেনি, রেখে দিয়েছিল পলটু বড় হয়ে পরবে বলে। এবার পুজোয় পলটুকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তবু পলটুর গায়ে ঢলঢল করছে। হাতাটা এত বেশী বড় যে বেচারা জুত করে পায়েস খেতে পাচ্ছে না। কিন্তু তবু তার দুঃখ নেই, সে যে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি পেয়েছে এই আনন্দেই সে বিভোর। খাওয়া শেষ করে কখন সে পুজোবাড়িতে গিয়ে সবাইকে পাঞ্জাবিটা দেখাবে এই কথাই সর্বক্ষণ ভাবছে। এমন সময় লক্ষ্মী আর রামু ছুটতে ছুটতে ঢুকল বাইরে থেকে।

"মা, মা, বিশু ময়রা আমাদের জন্যে পান্তুয়া ভাজছে। দেখে এলাম। গন্ধ থেকেই বুঝেছি আমাদের জন্য ভাজছে।"

পলটু নিবিষ্টমনে চেটে চেটে পায়েসটা খাচ্ছিল পাঞ্জাবির হাতা বাঁচিয়ে।

যদুর মা বললেন, "কিন্তু তোমার বাবার কি কাণ্ড। সেই যে গেছেন ফেরবার নাম নেই। তিনুও তাঁর সঙ্গে। আর সদি পোড়ারমুখিরও দেখা নেই এখনও আজ।"

"এই যে সদি পোড়ারমুখি—" একটি হাসিখুশী অল্পবয়সী ঠিকে-ঝি কপাট ঠেলে ঢুকল।

"এই যে সদি পোড়ারমুখি এসেছে"—চীৎকার করে উঠল রামু আর লক্ষ্মী, আর দু'হাত তুলে নাচতে লাগল তাকে ঘিরে ঘিরে—"সদি জানিস? বিশু ময়রা আমাদের জন্যে পান্তুয়া ভাজছে, কি চমৎকার গন্ধ ছেড়েছে।"

"আজকের দিনে এত দেরি করে আসে কেউ"—যদুর বউ সদির দিকে ফিরে বললেন—"নে, ও ঘরে গিয়ে কাপড়টা ছেড়ে আয়।"

"কাল রাত্রে আমার অনেক কাজ ছিল বউদি। নিমাইবাবুর বাড়িতে পুজো তো, কাজ সারতে সারতে রাত দুপুর হয়ে গেল।"

"যাক এসেছ, বেঁচেছি। নাও এখন তাড়াতাড়ি, কাপড়টা ছেড়ে ফেল। তোর জন্যে নতুন কাপড় রেখেছি একখানা। গত বছরে আমিই কিনেছিলাম পরব বলে, আমার আর পরা হয়নি। তুই-ই পর।"

"বাবা আসছে, বাবা আসছে"—চেঁচিয়ে উঠল রামু আর লক্ষ্মী (তারা যেন সব সময় সর্বত্র বিরাজমান!)—"সদি লুকিয়ে পড়, লুকিয়ে পড়! শিগ্‌গির ও ঘরে যা—"

সদি মুচকি হেসে চলে গেল।

যদুবাবু ঢুকলেন তিনুকে কাঁধে করে। গলায় প্রকাণ্ড একটা কমফর্টার জড়ানো, ঠাণ্ডা লেগেছে ভদ্রলোকের জলে ভিজে। তাঁর কাপড় জামা যদিও ধোপদুরস্ত কিন্তু পুরোনো, মাঝে মাঝে সেলাই আর তালি থেকে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কাঁধে তিনু। বেচারা তিনু। তার হাতে একটি ক্রাচ, পা দুটি splint দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা। বেচারা হাঁটতে পারে না।

"সদি কই?"—জিজ্ঞেস করলেন যদুবাবু।

হাসি গোপন করে যদুবাবুর স্ত্রী বললেন, "সে আসবে না।"

"আসবে না, বল কি!"

যদুবাবু একটু দমে গেলেন যেন। তিনি তিনুকে কাঁধে করে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেকদূর যেতে হয়েছিল, কারণ বারোয়ারিতলা তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় দু'মাইল। কিন্তু কিছু দমেননি তিনি, ক্লান্তও হননি, তিনুর সঙ্গে নানারকম আবোল-তাবোল গল্প করতে করতে মনের আনন্দে সারাটা রাস্তা এসেছিলেন। কিন্তু বাড়িতে এসে একি দুঃসংবাদ! আজ পুজোর দিনে সদি আসেনি। ভারি বিমর্ষ হয়ে গেলেন।

সদি দরজার আড়াল থেকে সব দেখছিল। যদুবাবুর মুখটা দেখে ভারি কষ্ট হতে লাগল তার। ঠাট্টা করেও পুজোর দিনে কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না কি। সে হাসিমুখে বেরিয়ে এসে প্রণাম করলে যদুবাবুকে।

"আরে এই যে—"

যদুবাবু হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

"ওরা ঠাট্টা করছিল—যা দুষ্টু সব।"

কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলল সদি। লক্ষ্মী আর রামু তিনুকে যদুবাবুর কাঁধ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। সেখান থেকে বিশু ময়রার দোকানটা দেখা যায় জানলা দিয়ে। কেমন পান্তুয়া ভাজা হচ্ছে তাই দেখতে নিয়ে গেল তাকে।

যদুবাবুর স্ত্রী জিগ্যেস করলেন, "তিনু কোনও দুষ্টুমি করেনি তো?"

যদুবাবু হাসিমুখে বেশ বাগিয়ে বসেছিলেন কোণের চেয়ারটায়।

"না, কিচ্ছু না। তোমার ওই ছেলে যদি বাঁচে মস্ত বড় কবি হবে একজন। আসতে আসতে কি বলছিল জান? বলছিল মা দুর্গা তো খুব ভালো, না? তিনি তো কত লোকের কত ভালো

করেন। আমিও তাঁকে প্রণাম করে আজ বলেছি—মা, আমাকে ভালো করে দাও। বাবা আমাকে আর কত কাঁধে করে করে নিয়ে বেড়াবে! শুনেছ ছেলের কথা। সমস্ত রাস্তাটা এই সব বলতে বলতে এসেছে।"

বলতে বলতে যদুবাবুর গলাটা কেঁপে গেল। তারপর বললেন, "বলতে নেই, ওজনেও ও একটু ভারী হয়েছে। অনেকদিন তো ওকে কাঁধে করিনি।"

একথা বলতে গিয়ে গলা আরও কেঁপে গেল।

ঘরের ভিতর তিনুর 'ক্রাচে'র খটখট শব্দ হচ্ছিল। ক্রাচের উপর ভর করেই পাশের ঘর থেকে হেঁটে বেরিয়ে এল সে। লক্ষ্মী আর রামুও এল সঙ্গে সঙ্গে। রামুর হাতে ছোট্ট টুল। টুলটা পেতে দিতে তিনু তার উপর বসল। তিনুর জন্যে একটু আলাদা খাবারের ব্যবস্থা ডাক্তারবাবু করেছিলেন। রোজ সকালে চকোলেট দিয়ে এক পেয়ালা দুধ। যদুবাবু সেটা ধরে রইলেন তিনুর মুখে। তিনু ঢক-ঢক করে খেতে লাগল।

"বিশুর দোকান থেকে তোমরা গরম সিঙাড়া নিয়ে এস। পান্তুয়া হতে এখনও দেরি আছে। এখন ভেজে রসে দিচ্ছে, ওবেলা ঠিক হবে। এবেলা সিঙাড়া খাও সব।"

হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল রামু আর লক্ষ্মী আর আরও দুটি ছোট ছোট ছেলে। একটু পরে প্রকাণ্ড একটা ঠোঙা নিয়ে ফিরল তারা। চোখে মুখে হাসি উপছে পড়ছে সকলের।

সিঙাড়ার গন্ধে ভরে উঠল চতুর্দিক। তখনি লক্ষ্মী আর রামু সিঙাড়া খেতে যাচ্ছিল কিন্তু যদুবাবুর স্ত্রী বললেন, "না, আগে গিয়ে ঠাকুরঘরে মাকে প্রণাম করে এস সবাই।" সবাই ঢুকল ঠাকুরঘরে। সেখানে নানারকম ঠাকুরদের ছবি তো আছেই, ঠাকুমা ঠাকুর্দার ফটোও আছে। সবাই সেখানে প্রণাম করে এল। তিনু আর টুলে বসে বসেই প্রণাম করতে লাগল তাঁদের উদ্দেশে। যদুবাবু তাকে আর টুল থেকে নামতে দিলেন না।

তারপর সিঙাড়ার ঠোঙা খুলে সিঙাড়াগুলো ঢালা হল একটা থালায়। উঃ, সে কি আনন্দ! উদ্ভাসিত মুখে সবাই ঘিরে দাঁড়াল মাকে। সিঙাড়া যেন একটা অদ্ভুত আশ্চর্য অভূতপূর্ব খাবার। বছরে ক'দিনই বা বেচারারা সিঙাড়া খেতে পায়। মা সকলের হাতে একটা করে দিলেন। বাকি রইল দুখানা। তার একটা দেওয়া হল সদিকে। সদির বয়স উনিশ কুড়ি বছর। সে-ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে একমুখ হেসে খেতে লাগল সিঙাড়া। বাকি সিঙাড়াটা যদুবাবুর স্ত্রী যদুবাবুর হাতে দিলেন। কিন্তু তিনি সবটা খেলেন না, আধখানা রেখে দিলেন স্ত্রীর জন্য।

যদুববাবু বললেন, "কম পড়ে গেল, না? আর একটা করে হলে ভালো হত। আচ্ছা, নিয়ে আয় আর এক টাকার।"

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল লক্ষ্মী, রামু আর তার সঙ্গে বাকি সকলে।

তিনু বললে—"সিঙাড়াটা খুব ভালো হয়েছে বাবা!"

"বিশু ভালোই করে বরাবর। আজ পুজোর দিন বলে আরও ভালো করেছে। চমৎকার হয়েছে পুরটা।"

সিঙাড়া এসে পড়ল আবার।

যদুবাবুর স্ত্রী বললেন, "ওগুলো বড্ড গরম। একটু ঠাণ্ডা হোক। আগে হালুয়া খেয়ে নাও।"

যদুবাবু হেসে বললেন, "তুমি যে রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন করেছ দেখছি। আমি এখন খাব না ওসব, ব্লাডপ্রেসারটা বেড়ে যাবে।"

"সিঙাড়া খেলে বুঝি ব্লাডপ্রেসার বাড়ে না!"

যদুবাবু হাসলেন কেবল, কিছু বললেন না।

ছেলেমেয়েরা আগেই পায়েস খেয়েছিল। যদুবাবু আর তিনুর জন্যে দুটি বাটিতে পায়েস রাখা ছিল। সেই দুটি বার করে নিয়ে এলেন যদুবাবুর স্ত্রী।

যদুবাবু বললেন, "আমি ভাতের সঙ্গে খাব এখন। আমারটা রেখে দাও।"

একটা চামচে দিয়ে তিনুকে পায়েসটা তিনি খাইয়ে দিতে লাগলেন।

যদুবাবুর স্ত্রী হাঁক দিলেন—"সদি, হালুয়ার কড়াইটা নিয়ে আয় রান্নাঘর থেকে।"

লক্ষ্মী আর রামুও ছুটে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। কড়াটা সদি যদি একা আনতে না পারে! ছোট্ট কড়া, অনায়াসেই নিয়ে এল সদি। লক্ষ্মী আর রামু আবার তার পিছু-পিছু ফিরে এল। বড়লোকের বাড়ি হলে প্রত্যেককে ডিশে করে হালুয়া দেওয়া হত কিন্তু অত ডিশ কোথা পাবেন যদুবাবুর স্ত্রী। প্রত্যেককে হাতে হাতেই দিলেন ডেলা পাকিয়ে। তিনু বাবুর পায়েস খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। যদুবাবু তাকে জল খাইয়ে মুখটা মুছিয়ে দিলেন।

তিনু একমুখ হেসে মায়ের দিকে চেয়ে বলল, "চমৎকার হয়েছে পায়েস মা। আমার জন্মদিনে যে পায়েস হয়েছিল তার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে আজ।"

"সেবার মোহন গয়লা দুধই ভাল দেয়নি।"

তারপর তিনুকে হালুয়া খাওয়াতে লাগলেন যদুবাবু। বাকি সকলেও হালুয়া খেয়ে আনন্দে অধীর। শুধু হালুয়া নয়, হালুয়ার ভিতর কিসমিসও আছে! লক্ষ্মী আর রামু হালুয়া খেতে খেতে নাচ শুরু করে দিলে।

সদি হালুয়াটা আড়ালে রেখে দিয়েছিল। তার ছেলেটার জন্যে নিয়ে যাবে বলে। যদুবাবুর স্ত্রীর সেটা চোখ এড়ায়নি। হেসে বললেন, "ওটা তোকে দিয়েছি, তুই খা। তোর ছেলের জন্য দেবখন আলাদা করে। পায়েসও দেব। একখানা রুটি আছে সেটাও নিয়ে যাস।"

লজ্জিত মুখে সদি হালুয়া খেতে লাগল। খেতে খেতে বলল, "তুমি আজ ঘিয়ের মট্‌কিটি শেষ করেছ মনে হচ্ছে। ঘি চপচপ করছে একেবারে। হাতে কত ঘি লেগেছে!"

"পুজোর দিন ভালো করে খাবি না? আজ কি আর ঘিয়ের কথা ভাবলে চলে!"

যদুবাবু বললেন, "আজই আবার ঘি এসে যাচ্ছে। কসবা থেকে সোনা মামা আসছেন আজ সন্ধের সময়। তাঁকে লিখে দিয়েছি ঘি আনতে। খুব ভালো ঘি কসবায়। পাঁচ সের আনতে বলে দিয়েছি।"

"পাঁচ সের!"—আঁতকে উঠলেন যদুবাবুর স্ত্রী—"অত টাকা পাবে কোথায়।"

"একেবারে না পারি, দুবারে না হয় তিনবারে দেব।"

খাওয়া-দাওয়ার পর রামু বলল—"বাবা, আমরা এবার বারোয়ারিতলায় যাই? 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে যিনি ভীম সাজবেন তিনি নাকি খুব ভালো গাইয়ে। গান শোনাচ্ছেন সকলকে। যাই?"

"যাও। তবে সাবধানে যেও। রাস্তায় মোটরের খুব ভিড়।"

"আমাকে চারটে পয়সা দেবে বাবা? গুলি কিনব।"

যদুবাবু পকেট থেকে 'মানিব্যাগ' বার করে হাত ঢুকিয়ে দেখলেন।

"আমার কাছে নেই, হ্যাঁগা, তোমার কাছে আছে?"

যদুবাবুর স্ত্রী বললেন—"আছে। ভেবেছিলাম নুন আনতে দেব। তা পরে আনালেই হবে। রান্নাঘরের তাকে আনি আছে একটা, নিয়ে যা—"

রামু লাফিয়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে আনিটা নিয়ে এল। তারপর হৈ হৈ করে বেরিয়ে গেল সবাই। তিনুর মুখটা বিমর্ষ হয়ে গেল। যদিও সে একটু আগে বাবার কাঁধে চড়ে ঠাকুর দেখে এসেছে কিন্তু, সকলের সঙ্গে হৈ হৈ করে যাওয়ার আনন্দ আলাদা। সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত বেচারা। বোধহয় চিরজন্মের মতো বঞ্চিত। যদুবাবু তাকে সান্ত্বনা দিলেন, "তোমাকে বিকেলে আবার ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাব! লজেন্স্ও কিনে দেব সেই সময়।"

তিনুর মুখ একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠল। বাবার হাতে হাতটি দিয়ে চুপ করে বসে রইল সে।

দত্ত ভূতের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করল—"আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। তিনু কি বাঁচবে?"

"না, বাঁচবে না। আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ওই টুলটিতে আর কেউ বসছে না। ওই ক্রাচ্ দুটি কোণে ঠেসানো আছে। তিনু নেই।"

"না, না, ও কথা বলবেন না। বলুন ও বেঁচে যাবে।"

"আমি যা দেখছি তা যদি সত্য হয় তাহলে ও বাঁচবে না। ও যদি না বাঁচে তাহলে ক্ষতিই বা কি! বাড়তি লোকসংখ্যা কমে যাবে! ভালোই তো হবে তাতে।"

দত্ত মাথা নীচু করে রইল। তার নিজের কথাগুলোই ফিরে এল তার কাছে। খুব অনুশোচনা হতে লাগল। ভূত বলল, "দেখ দত্ত, একটা কথা শুনে রাখ। মনে প্রাণে যদি পাথর না হয়ে গিয়ে থাক, কিছু মনুষ্যত্ব যদি এখনও বেঁচে থাকে তাহলে ওই সব বাজে কথা বোলো না আর। বাড়তি লোকসংখ্যা কমাবার তুমি কে? কার মরা উচিত আর কার বাঁচা উচিত তা কি তুমি ঠিক করতে পার? হতে পারে হয়তো ভগবানের চোখে ওই তিনুর চেয়ে তুমি ঢের বেশী খারাপ, যদি কারো আগে মরতে হয়, তোমারই মরা উচিত। একটা পোকা কি করে ঠিক করবে অন্য পোকাগুলোর বাঁচা উচিত কি না!"

বকুনি খেয়ে দত্তর মাথা আরও নীচু হয়ে গেল। একটা শিহরনও বয়ে গেল সারা দেহে। কিন্তু নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে সে আবার মুখ তুলে চাইলে।

যদুবাবু বলছেন, "পীতাম্বরবাবুর নামেও একটা পুজো দিও আজ। হাজার হোক, তিনি আমাদের অন্নদাতা। তাঁর মঙ্গল হলেই আমাদের মঙ্গল!"

"পুজো দেব তাঁর নামে!"—ফোঁস করে উঠলেন যদুবাবুর স্ত্রী—"সুযোগ পেলে তাঁর শ্রাদ্ধ করতাম, পিণ্ডি চটকাতাম।"

"ছি, ছি, কি বলছ তুমি, আজ পুজোর দিন!"

"আজ পুজোর দিন তা মানছি। আজ কারও অমঙ্গল চিন্তা করতে নেই তা ঠিক। কিন্তু ওই রকম অভদ্র, কৃপণ, চামার, ছোটলোকের নামে পুজো দেব তা বলে! ও যে কি রকম লোক তা তোমার অন্তত অবিদিত নেই।"

"আজ পুজোর দিন, রমা। আজ ওসব বলতে নেই। যখন বারোয়ারিতলায় যাবে দিও একটা পুজো ওঁর নামে।"

"বেশ, বলছ যখন দেব। ভগবান ওঁকে সুখী করুন, ওঁর মঙ্গল করুন"—তারপর একটু মুচকি হেসে বললেন, "আর একটা কথাও বলব মাকে তাহলে।"

"কি—"

সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন যদুবাবু।

"মাকে বলব, মা ওঁর চোখে একটু চামড়া দাও, আর একটু সুমতি দাও।"

মুখে আঁচল দিয়ে নিজের রসিকতায় খুব হাসতে লাগলেন।

"রেগে থেকো না দত্ত মশায়ের উপর। একটা কথা ভুলে যেও না, উনি আমার অন্নদাতা। এ বয়সে যদি তাড়িয়ে দেন চাকরি পাব না কোথাও। সব অফিসেই আজকাল বি. এ. এম. এ.-র ভিড়। আমার বিদ্যে এন্ট্রান্স পর্যন্ত—"

তারপর যদুবাবু থেমে গেলেন কয়েক মুহূর্ত। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তিনি যে অর্থাভাবে লেখাপড়া করতে পারেননি, এই কথাটাই মনে হল বোধহয় তাঁর। পলটুকেও তিনি বেশীদূর পড়াতে পারবেন না। আজকাল পড়াশোনার খরচ এত বেশী যে তাঁর মতো লোকের সাধ্যে কুলোয় না। পলটুর একটা চাকরির কথা তিনি বলে রেখেছেন মণিবাবুকে। মণিবাবু তাঁর দোকানে একজন বিশ্বাসী লোক রাখতে চান। একটা নেপালী ছোঁড়া রেখেছিলেন, সে চুরি করে পালিয়েছে। মণিবাবুর কাটা-কাপড়ের প্রকাণ্ড দোকান। তিনি এখন পলটুকে মাসে ত্রিশ টাকার বেশী দিতে পারবেন না বলেছেন। যদুবাবু খুব রহস্যময়ভাবে কথাটা ভাঙলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে।

"পলটুর ভাগ্যটা ভালো। মণিবাবু যে এককথায় রাজি হয়ে যাবেন তা ভাবিনি।"

যদুবাবুর স্ত্রী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন যদুবাবুর দিকে।

"কেন, কি হয়েছে।"

"পলটুর চাকরি ঠিক করেছি একটা। আসছে মাস থেকে মণিবাবুর দোকানে যাবে ও।"

"তাই নাকি! কত মাইনে।"

"এখন ত্রিশ টাকা করে দেবেন। ফি বছরে পাঁচ টাকা করে বাড়বে। দোলে পুজোয় জামা কাপড় পাবে। ঢুকিয়ে দি, কি বল?"

"দাও।"

যদুবাবুর স্ত্রীর কণ্ঠে কিন্তু তেমন আনন্দের সুর ফুটল না। তাঁর আশা ছিল লেখাপড়া শিখে ছেলে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবে। বাঁড়ুয্যেবাড়ির ছেলেটি বিলেত যাচ্ছে, বোসেদের বাড়ির ছেলে মুন্সেফ হয়েছে। যদুবাবুর স্ত্রীরও আশা ছিল। কিন্তু সব আশা কি পূর্ণ হয়?

সদি উঠোনে বাসন ধুচ্ছিল।

সে বলল, "ঢুকিয়ে দাও বাবু। মাইনে ভালোই দিচ্ছে। দিনকাল যা পড়েছে তাতে ভালো চাকরি পাওয়াই যায় না! আমি এ্যাদ্দিন ওদের বাড়ি কাজ করছি, খেটে খেটে হাড়মাস কালি হয়ে গেল, মাইনে দেয় মাত্র পঁচিশ টাকা। ত্রিশ টাকা মাইনে দিচ্ছে, ভালোই দিচ্ছে।"

কড়াইটা জোরে জোরে ঘষতে লাগল।

গরীব পরিবার এরা। দারিদ্র্যের ছাপ সর্বত্র। ভালো পোশাক, ভালো খাবার, দামী

আসবাবপত্র কিচ্ছু নেই। অর্থাভাবেই ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ওরা সুখী, ওদের চোখে-মুখে আনন্দের আলো ঝলমল করছে। কারও ওপর ওদের নালিশ নেই যেন। ভাগ্যকে ওরা মেনে নিয়েছে।

ভূত তার পিচকিরি থেকে যাবার আগে আবার খানিকটা আতর ছিটিয়ে দিলে চারিদিকে। সব যেন আরও উজ্জ্বল আরও প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল তারা।

রাস্তায় কী ভিড়! লোকে বলছে বটে সকলের ঘরেই অভাব, দেশে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, কিন্তু রাস্তার দিকে চাইলে তা তো মনে হয় না। রঙের স্রোত বয়ে যাচ্ছে যেন। কত রঙের আর কত রকমের পোশাক পরেছে সবাই। দত্ত লক্ষ্য করল যত গরীবই হোক আজকের দিনে সবাই একটু ছিমছাম, সবাই একটু সেজেছে। ছেলেমেয়েদেরও সাজিয়েছে। হতে পারে শস্তা জামা-কাপড়ে, কিন্তু তাতে তাদের আনন্দের কোনও বিঘ্ন হয়নি। লাল নীল হলদে নানারকম ছিটের জামা পরানো শিশুর দল, মায়ের কোলে চেপে চলেছে, ঠাকুর দেখতে। তাদের মুখে কি হাসি, কি অপরূপ সৌন্দর্য! এক জায়গায় কতকগুলি রঙীন-রিবন-বাঁধা মেয়ে ভিড় করেছে এক চানাচুরওলার সামনে, আর এক জায়গায় ছেলের দল। তারা ভিড় করেছে মনিহারীর দোকানে। কারও লজেন্‌স্ চাই, কারও গুলি, কারও খেলনা। একধারে দাঁড়িয়ে আছে রবারের বেলুনওলা, নানা রঙের ছোট বড় বেলুন ফুলিয়ে। তাকে ঘিরেও একদল ছেলেমেয়ে। তারা বেলুন কিনছে আর ফাটাচ্ছে। হয়রান হয়ে উঠেছে তাদের বাপ মায়েরা! কত কিনে দেবে!

রাস্তার ভিড় দেখে দত্তর মনে হল সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। তারা যদি কারো বাড়ি যায়, বাড়ি ফাঁকা দেখবে। রাস্তাটাকেই বাড়ি করে নিয়েছে সবাই। রাস্তার উপরই দল পাকিয়ে গল্প করছে সবাই গোল হয়ে। রাস্তা নয়, যেন বৈঠকখানা। ভূতের দিকে চেয়ে দত্ত অবাক হয়ে গেল। সে যেন একটা মূর্তিমান আনন্দ। চওড়া বুক থেকে সরে গেছে আলখাল্লাটা, মুখ থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে প্রসন্নতার আলো। মহানন্দে দু'হাত দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে তার অদৃশ্য আতর-ভরা পিচকিরি, কেউ জানতে পারছে না, কিন্তু একটা অপূর্ব সৌরভ আর মাধুরী ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। চানাচুরওলা আর বেলুনওলাটাকে তো ভূত আতরে নাইয়ে দিলে! ভূত যেন চলছে না, ডানা মেলে উড়ছে। দত্তও উড়তে লাগল।

একটু পরে তারা যেখানে এসে হাজির হল সেটা একটা অতি নোংরা জায়গা। গলির গলি তস্য গলি। ভাঙা একটা কল থেকে ক্রমাগত জল পড়ে যাচ্ছে। চারিদিকে পচা ড্রেন ভটভট করছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না। খোলার ঘর চারিদিকে আশেপাশে। ঘেয়ো কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা শীর্ণ কালো বেড়াল একটা চালের উপর থেকে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল তাদের।

"এ কোথায় এলাম আমরা।"

"এটা একটা বস্তি। যারা তোমাদের সংসার চালায়, সেই শ্রমিকরা এখানে থাকে। এরা কিন্তু আমাকে চেনে। ওই দেখ।"

দত্ত দেখতে পেল একটা খোলার ঘর থেকে প্রাণ-খোলা হাসি ভেসে আসছে। আরও কাছে গিয়ে দেখা গেল একদল লোক গোল হয়ে বসে কি যেন খেলছে। কাছে গিয়ে দেখলে গুলি খেলা চলছে। বুড়ো ঠাকুরদা আর নাতি বাজি রেখে গুলি খেলছে। ঠাকুরদার বয়স আশির কাছাকাছি, আর নাতির বয়স দশ বছরের বেশী নয়। নাতি নাকি গুলি খেলায় চ্যাম্পিয়ন, ঠাকুরদা বলেছে তাকে হারিয়ে দেবে। সে-ও ছেলেবেলায় চ্যাম্পিয়ন ছিল। ভিড়ের মধ্যে দু'তিনজন গলা মিলিয়ে গাইছে—চল্ চল রে নওজোয়ান। একটা আনন্দময় উত্তেজনার পরিবেশে থমথম করছে চারিদিকে।

ভূত এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। দত্তর দিকে চেয়ে বলল—"আমার জামাটা ভাল করে চেপে ধর।" তারপর উড়ে চলল। কোথায় যাচ্ছে? গঙ্গার দিকে নাকি! হ্যাঁ, গঙ্গার ধারেই এসে দাঁড়াল তারা। মাঝিদের মধ্যে। সারি সারি নৌকো বাঁধা রয়েছে। প্রত্যেক নৌকোটি সাজানো। কেউ ফুলের মালা জড়িয়ে দিয়েছে মাস্তুলের উপর, কেউ কাগজের রঙীন শিকল, কারও বা হালের চারধারে সবুজ লতার গোছা। রংও দিয়েছে অনেক নৌকোয়। গঙ্গার ধারে একটা খড়ের চালা তুলে সেখানে পুজোও হচ্ছে। ছোট্ট প্রতিমাটি। তার সামনে বসে গেছে একদল ঢোলক আর খঞ্জনি নিয়ে। গান ধরেছে সমস্বরে—দুর্গা মায়ী, জয় জয়। দুর্গা প্রতিমার সামনে পেঁড়া, বাতাসা, বালুশাই আর নানারকম ফলমূলের স্তূপ। একদল উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ ছেলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এই সামান্য আয়োজনকে কেন্দ্র করেই কি আনন্দ জমে উঠেছে। মনে হচ্ছে স্বয়ং গঙ্গাও যেন অংশ নিয়েছেন এতে। তাঁর তরঙ্গ-হিল্লোল আনন্দ-হিল্লোলের মতো মনে হচ্ছে।

এই সব দেখতে দেখতে দত্ত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তার মনে পড়ল ছেলেবেলায় এই ঘাটেই তারা ঠাকুর বিসর্জন দিতে আসত। দূরে মহাবীরস্থানে মহাবীরের পতাকাটা উড়ছে পতপত করে।

তারা যে উড়ে চলেছিল এ খেয়াল ছিল না দত্তর। হঠাৎ সে চমকে উঠল একটা হাসি শুনে। একি, এ যে তার ভাগনা প্রমোদের হাসি। দত্ত হঠাৎ দেখতে পেল তারা একটা চমৎকার সাজানো ঘরে দাঁড়িয়ে আছে, আর ভূত হাসিমুখে চেয়ে আছে তার ভাগনার দিকে—! হ্যাঁ, তার ভাগনাই তো।

"হা-হা"—হাসছিল প্রমোদ—"হা, হা, হা, হা"। প্রমোদের চেয়ে বেশী প্রাণ-খোলা হাসি হাসতে পারে এরকম লোকের সঙ্গে যদি আপনার জানা-শোনা থাকে তাহলে আমিও তার সঙ্গে জানা-শোনা করতে চাই।

খারাপ অসুখ যেমন ছোঁয়াচে হয়, প্রাণ-খোলা হাসি এবং পবিত্র প্রসন্নতাও তেমনি ছোঁয়াচে হয়। ভগবানের এটা অদ্ভুত নিয়ম, তিনি খারাপ জিনিসকেই কেবল ছোঁয়াচে করেননি। হাসিও ছোঁয়াচে।

বুকের দু'পাশ চেপে ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছিল প্রমোদ। যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হচ্ছিল তার সর্বাঙ্গ ঘিরে। একদল বন্ধুও বসেছিল, তারাও হাসছিল সবাই।

একধারে প্রমোদের মা বসে ছোট ছোট ডিশে খাবার সাজাচ্ছিলেন। যদিও তিনি রাঁধুনী,

কিন্তু পুজোর ক'দিন ছুটি নিয়েছেন। ছেলেকে আর ছেলের বন্ধুদের রেঁধে খাওয়াবেন। চমৎকার রাঁধেন তিনি। একটু দূরে আধঘোমটা দিয়ে রঙীন কাপড় পরে একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দত্ত বুঝতে পারলে ওইটি প্রমোদের বউ, সেই টুনি, যার কথা বলছিল আজ।

"হা-হা-হা-হা। মামা বলছিল পুজো বাজে, 'জনা' বাজে, সব বাজে। আসল কেবল টাকা। কি রকম মুখ গোমড়া করে অপিসে বসে ছিলেন যে, ঠিক যেন প্যাঁচা কোটরে বসে আছে কুইনিন খেয়ে। হা, হা, হা—"

টুনির মুখেও একটা নীরব মুচকি হাসি ফুটে উঠল। প্রমোদের মা বললে, "ছি, মামাকে নিয়ে অমন ঠাট্টা করতে নেই। সত্যি ও ওরকম ছিল না কখনও, খুব আমুদে ছিল ছেলেবেলায়। আজকাল কেমন যেন বদলে গেছে।"

দত্ত টুনিকে লক্ষ্য করছিল, চমৎকার মেয়েটি তো! খুব ফরসা নয়, শ্যামবর্ণ। কিন্তু কি সুন্দর চোখ দুটি। কপালের উপর কানের উপর কোঁকড়ানো চুলগুলি যেন হাওয়ায় দুলছে। হাসলে গালে টোল পড়ে। চিবুকেও। আর কি দুষ্টু-দুষ্টু হাসি। ঘোমটার আড়াল থেকে কেমন লুকিয়ে লুকিয়ে চাইছে এক-একবার প্রমোদের দিকে।

প্রমোদ বলল, "মামা এখনও বেশ মজার লোক। বেশ মজার মজার কথা বলতে পারেন। সত্যি, কি যে হয়েছে। মামা যদি থিয়েটার করতে রাজী হতেন—ওঁকে কাত্যায়নের পার্ট চমৎকার মানাত। কিন্তু কি যে হয়েছে ওঁর, পুজোর দিনেও আপিস খোলা রেখেছেন, যদুবাবুকে পর্যন্ত ছুটি দেননি।"

"অনেক পয়সা করেছি শুনছি"—প্রমোদের মা মৃদুকণ্ঠে বললেন।

"তা করেছেন। কিন্তু লাভটা কি হয়েছে! টাকা তো ওঁর ব্যাঙ্কে আর বাক্সে বন্ধ। উনি নিজে তো কষ্ট করে আছেন। গায়ে সেই ময়লা জামা, পায়ে সেই ছেঁড়া জুতো। হোটেলে খান— হেঁটে হেঁটে বাড়ি যান। টাকা থেকে লাভ কি! ওঁর নিজেরও লাভ নেই, আমাদেরও নেই, কারণ আমাদের যে উনি ওঁর টাকা দিয়ে যাবেন, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না! হা-হা-হা—"

একটি বড়সড় গোছের মেয়ে সেজেগুজে বসেছিল একধারে। প্রমোদের শালী বোধ হয়। মুখের আদল দেখে দত্তর তাই মনে হল। সে নাক সিঁটকে বলল, "জঘন্য লোক। সইতে পারি না ও ধরনের লোককে।"

"আমি কিন্তু পারি"—বলে উঠল প্রমোদ—"সইতে না পারবার কি আছে? কৃপণ হয়ে উনি কার কি অনিষ্ট করেছেন, এক নিজের অনিষ্ট ছাড়া? নিজেরই সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছেন উনি। ওঁকে আজ নিমন্ত্রণ করলাম—মুখ খিঁচিয়ে বললেন, যাব না—এতে কার কি ক্ষতি হল! অবশ্য আমাদের বাড়িতে যা খাওয়া হবে—পাঁঠার উরশুনি ঝোল—তা না খেলে সত্যিই যে একটা বিশেষ ক্ষতি হবে তা-ও আমি মনে করি না। হা-হা-হা।"

প্রতিবাদ করলেন প্রমোদের মা—"পাঁঠার ঝোল উরশুনি হবে কেন। খালি পেঁয়াজই দেওয়া হয়নি। আদা, দই, গোলমরিচ, গরমমসলা, হিংয়ের ফোড়ন সব রকমই দিয়েছে বউমা। এসে দেখে যেত আমার বউমা কেমন রাঁধে। তাছাড়া শুধুই কি মাংস আছে? আলুর দম, মাছের কালিয়া, মুড়ি-ঘণ্ট, ভাজা দুরকম, সরু আলোচালের ভাত, দই, মিষ্টি, পায়েস—কিছু কম করেছি নাকি আমরা!"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

সমস্বরে বলে উঠল প্রমোদের বন্ধুরা।

"তুমি তো বউমার প্রশংসায় গদগদ হবেই, কিন্তু আসল খবরটি আমি জানি। ও কেবল খুনতি নেড়েছে, আসল রান্না রেঁধেছ তুমি! কি বলিস রে তপেশ, মাকে চিনি না? একলা বউয়ের হাতে ছেড়ে দিলে—অ্যাঁ, কি বলিস?"

তপেশ প্রমোদের শালীটির দিকে বার বার চাইছিল। তার মনের ইচ্ছেটা—কিন্তু সেটা আর খুলে বলবার প্রয়োজন কি—সেটা স্পষ্টই হয়ে উঠেছিল তার চোখে মুখে। সে নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের মতো আইবুড়ো কার্তিকের মতের আর কি মূল্য আছে বল। তবে তোর বউ মাংসটা একাই রেঁধেছি শুনছি—ওটা খেয়েই বোঝা যাবে তোর ভবিষ্যৎ কি রকম।"

ও ঘর থেকে টুনি ঘোমটার ফাঁকে একটু মুচকি হেসে সরে গেল।

হা-হা করে হেসে উঠল প্রমোদ। সবাই হাসতে লাগল।

প্রমোদ বলল, "খাওয়ার কথা ছেড়ে দাও। খাওয়াটাই বড় কথা নয়, মামাকে সেজন্য নেমন্তন্ন করিনি, পয়সা ফেলতে পারলে হোটেলেও ভালো খাওয়া পাওয়া যায়। মামাকে ডেকেছিলুম যে অনেকদিন আসেননি, এলে সবাই মিলে বেশ একটা হুল্লোড় করা যেত। এলে তাঁর মনটাও হালকা হত। তিনি অন্ধকার আপিসে একটা ময়লা কোট পরে যেভাবে বসে আছেন দেখলাম তাতে মনে হল যে তিনি বহুকাল আনন্দের মুখ দেখেননি। দেখে দুঃখ হল। কিন্তু আমি ছাড়ব না। তিনি আমাকে গালই দিন আর যা-ই করুন আমি সুযোগ পেলেই আবার তাঁকে নেমন্তন্ন করব। প্রতি বছর পুজোর সময় তো করবই, দেখি তিনি কেমন না এসে পারেন। যখনই ফুরসত পাব যাব, গিয়ে বলব, মামা কেমন আছেন? চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি। সিনেমা দেখে আসি চলুন। এই ঘুপসি ঘরটা থেকে বেরুলে সত্যিই আপনি আরাম পাবেন। চলুন দেখি। ট্যাক্সি ডাকব একটা? মামা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবেন জানি। তবু আমি যাব। মামার মেজাজটা একটু ভালো করা দরকার। আর কিছু না হোক, বেচারা যদুবাবুর উপর যদি একটু সদয় হন তাহলে বেঁচে যায় লোকটা। মেজাজ ভালো হলেই বদলে যাবেন উনি। মন-রূপ ঘোড়ার মেজাজই হচ্ছে সোয়ার, সোয়ার যদি ভালো হয় তাহলেই ব্যাস্—মামা জব্দ! হা-হা-হা—" আবার একবার হাসির ধুম পড়ে গেল।

টুনি ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে এক কেত্‌লি গরম জল নিয়ে ঢুকল। মা টি-পট আর চা নিয়ে বসেছিলেন। নিজের হাতে চা তৈরি করে দেবেন সকলকে। আর কারো তৈরি চা হাজার ভালো হলেও, তাঁর পছন্দ হয় না।

চা-পর্ব শেষ হয়ে যাবার পর প্রমোদ বলল, "এবার একটু গান-বাজনা করা যাক।"

হারমোনিয়ম বেরুল, বাঁয়া-তবলাও বেরুল একজোড়া। দুটোই ছিল তক্তাপোশের তলায়। সেগুলো ঝেড়েঝুড়ে মেজেতে শতরঞ্জির উপর বসল সবাই। প্রমোদই গান ধরে দিলে সবচেয়ে প্রথমে—শরতে আজ কোন অতিথি এল মনের দ্বারে। আনন্দ গান গারে হৃদয় আনন্দ গান গারে। একটু মেয়েলী ধাঁচের হলেও প্রমোদের গলাটি সুন্দর। তার গান শেষ হলে তপেশকে

গাইতে অনুরোধ করতে লাগল সবাই। তপেশ নাকি অতুলপ্রসাদের গানে নাম-করা। তপেশ কিছুতেই গাইবে না। প্রমোদের শালীর সামনে সে কেমন যেন 'নার্ভাস' হয়ে পড়েছিল। অনেক অনুরোধের পর সে হারমোনিয়মের সামনে বসল এবং হারমোনিয়মটা ঘুরিয়ে প্রমোদের শালীর দিকে পিঠ করে অনেকবার কেশে গান ধরল, "সাথী ওগো সাথী সেই পথে যাব সাথে।" মিষ্টি গলা, তার উপর আবেগ-কম্পিত, খুব জমে উঠল। গলার এবং রগের শিরও তার ফুলে উঠল ক্রমশ। গান শেষ হলে সে রুমাল বার করে ঘাড় মুখ মুছতে লাগল। এরপর প্রমোদের মা অনুরোধ করলেন প্রমোদের শালীকে—"তুমি তো বেশ ভাল গান কর শুনেছি। আজ পুজোর দিন গান শোনাও না একটা।"

শালী লজ্জায় লাল হয়ে বলল—"আমার টন্‌সিলে বড় ব্যথা, ভাল গাইতে পারি না আজকাল।"

"আস্তে আস্তে গাও"—প্রমোদের মা বললেন।

প্রমোদ হঠাৎ পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে সেটা গলায় দিয়ে দু'হাত জোড় করে বলল, "গলবস্ত্র হয়ে বলছি, দয়া কর।"

আবার হাসির রোল পড়ে গেল একটা।

নিরুপায় শালীকে গান ধরতে হল শেষে। সে-ও বারকয়েক কাশল, তারপর প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে শুরু করল, "আমার শেষ পারানির কড়ি, কণ্ঠে নিলাম গান।"

তপেশ আর বসে থাকতে পারল না, উঠে বারান্দায় চলে গেল সে। খুব ঘামছিল ছোকরা।

শালীর গান শেষ হলে মা বললেন, "প্রমোদ, তুই সেই আগমনী গানটা কর। এস মা আনন্দময়ী।"

প্রমোদ খুব দরদ দিয়ে গাইল গানটা।

দত্তর চোখে জল এসে পড়ল। যখন সে বোর্ডিংয়ে থাকত, তখন সবাই এই গানটা গাইত। খুব সাধারণ সহজ সুর, শিখতে কষ্ট হত না কারও। ছেলেবেলায় সকলের সঙ্গে দত্তও গেয়েছে গানটা। গানটা শুনে তার সমস্ত অতীত যেন ফিরে এল তার কাছে। তার মন বিগলিত হয়ে গেল। সে যা হতে পারত তা হয়নি বলে দুঃখ হতে লাগল তার। অনুশোচনায় মন ভরে গেল।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে জুটল।

"প্রমোদদা আমরা কানামাছি খেলব। তুমি খেলবে?"

"নিশ্চয়। অফ কোর্স।"

প্রমোদ হারমোনিয়ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল উঠোনে। হুড়োমুড়ি করে শুরু হয়ে গেল কানামাছি খেলা। তপেশ এবং প্রমোদের শালীকেও যোগ দিতে হল। প্রমোদ কিছুতেই ছাড়লে না। একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল কিন্তু। তপেশের চোখ খুব কসকসিয়ে বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সে ঠিক গিয়ে প্রমোদের শালীকে ধরে ফেলতে লাগল প্রত্যেকবার। মনে হল তার কপালে একটা অদৃশ্য তৃতীয় নয়ন গজিয়েছে যেন। সে প্রত্যেকবার এমন জাপটে ধরছিল তাকে যে শোভনতাও বজায় থাকছিল না। মেয়েটি লুকিয়ে আড়ালে থাকবারই চেষ্টা করছিল, একবার তো সে তুলসীতলার পিছনে ঘোঁজটায় গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু সেখানে গিয়েও ঠিক তাকে

ধরে ফেলল তপেশ। আশ্চর্য কাণ্ড! আর আশ্চর্য প্রমোদ! কোথায় সে রাগ করবে, না, এমন হা-হা করে হাসতে লাগল যে সমস্ত ব্যাপারটা হালকা হয়ে গেল। প্রমোদের মা-ও বেরিয়ে এসে হাসতে লাগলেন। তপেশ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছিল। খুব একটা পুরু কাপড় দিয়ে তার চোখ বাঁধা হয়েছিল একবার, চোখের নীচে, নাকের পাশে তুলো গুঁজে দেওয়া হল, তপেশ যখন হাত বাড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুরছিল তখন অন্য দু'একজনও তার সামনে এল, কিন্তু তপেশ তাকে এড়িয়ে গেল, ঠিক গিয়ে ধরে ফেলল মালতীকে (প্রমোদের শালী) এবারও। সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল শিউলি গাছের ওপাশে একেবারে। কিন্তু এবারও নিস্তার পেল না সে।

প্রমোদ অস্ফুট কণ্ঠে বলল—"এ যে লোহা-চুম্বকের কাণ্ড দেখছি।"

প্রমোদের মা বললেন—"এবার তপেশ কানামাছি হবে না। মেনি হবে।"

তপেশের আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে তিনি হেসে বললেন, "তুই বাড়ি গিয়ে চান করে আয়। কাপড়টা যে কাদা মাখামাখি হয়ে গেল। চান করে আয়, এখানেই খাবি মনে আছে তো?"

"আছে।"

তপেশ চলে গেল।

টুনি কানামাছি খেলায় যায়নি। সে তার সমবয়সী কয়েকজনকে নিয়ে পাশের ঘরে বসে word making word taking খেলছিল। ভূত আর দত্ত ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়েছিল অদৃশ্যভাবে। দত্ত এককালে ও খেলায় খুব দক্ষ ছিল। সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতে লাগল টুনিও কম দক্ষ নয়। চমৎকার খেলে। তার সমবয়সী অনেকগুলি ছেলেমেয়ে বসেছিল, সবাইকে সে হারিয়ে দিচ্ছিল। দত্তও যোগ দিয়েছিল সে খেলায়, মেতে উঠেছিল, চেঁচাচ্ছিল, যদিও সে বুঝতে পারছিল না যে তার স্বর একটুও শোনা যাচ্ছে না। পাশের ঘরে একদল বসেছিল তাস নিয়ে। পেটাপিটি খেলা চলছিল। সেখানেও দত্ত উঁকি মেরে দেখলে। পুজোর আনন্দকে যতই গালাগালি করুক, কিন্তু সে যদি সেই মুহূর্তে সুযোগ পেত, ভূত যদি তাকে কোন মন্ত্রবলে ওদের সমবয়সী করে দিতে পারত তাহলে এক্ষুণি গিয়ে ও যোগ দিত ওদের দলে। তার মেজাজ যে বদলে যাচ্ছে এটা ভূত বুঝতে পারছিল, আর বুঝতে পেরে খুশীও হচ্ছিল খুব।

ভূত বলল, "চল, এবারে যাওয়া যাক।"

"না, না, আর একটু থাকি। ভাল লাগছে।"

হঠাৎ প্রমোদ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল।

"আর 'কানামাছি' নয়, এবার নতুন করে খেলা শুরু হবে—'হাঁ-না-বাজি'!"

খেলাটা নতুন ধরনের। প্রমোদ মনে মনে একটা নাম ঠিক করে রাখবে। আর সবাইকে বলতে হবে কি নাম সে ঠিক করেছে। ঠিক হলে বলবে 'হ্যাঁ', আর ভুল হলে বলবে 'না'। যে ঠিক বলতে পারবে সে পাবে একটি বাতাসা। অবশ্য সবাই তাকে প্রশ্ন করতে পারে নানারকম। যে লোকটার নাম প্রমোদ ভেবেছে সে কালো না ফরসা, লম্বা না বেঁটে, তার বয়স কত, বাড়ি কোথায়, কি করে, কি রকম লোক ইত্যাদি। নানারকম প্রশ্নের উত্তরে প্রমোদ বলল—সে এমন একজন লোকের কথা ভাবছে যার স্বভাব অনেকটা পশুর মতো, যদিও

মানুষ কিন্তু কথায় কথায় গুঁতোতে আসে। ঘোঁৎঘোঁৎ করে, গজগজ করে, গর্জনও করে, অথচ শহরেও বাস করে, রাস্তায় হাঁটে, আপিসও করে, আপিস একটু বেশী করে, করে, একবার ঢুকলে বেরুতে চায় না। লোকে ভালুক নাচায়, বাঁদর নাচায়, বাঘ সিংহকে নিয়ে খেলা দেখায়, কিন্তু এর প্রতি কেউ যে কেন নজর দেয়নি এতদিন, সেইটেই আশ্চর্য। লোকটা বাঁদরের মতো? না, ভালুকের মতো? একজন জিগ্যেস করলে। হা-হা করে হেসে উঠল প্রমোদ। বললে, দুয়ের সঙ্গেই সাদৃশ্য আছে। ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, খেঁকি কুকুর এদের সঙ্গেও মিল আছে কিছু কিছু লোকটার। প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে লাগল প্রমোদ এবং প্রতি প্রশ্নেই হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল। নানারকম নাম বলতে লাগল সবাই। প্রমোদ মাথা নেড়ে নেড়ে বলল—একটাও মিলছে না। তারপর হঠাৎ প্রমোদের শালী মালতী লাফিয়ে বলে উঠল—
"আমি ধরেছি, জামাইবাবু, বলব?"

"বল—"

"তুমি তোমার মামা পীতাম্বরবাবুর কথা ভাবছ, না?"

প্রমোদকে সত্যি কথাটা বলতেই হল। খুব হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। অনেকে বলতে লাগল—পীতাম্বরবাবুর ছাগলের সঙ্গে মিল নেই।

প্রমোদ বলল—"আছে। ছাগলে যাতে মুখ দেয় তা আর গজায় না। মামাও ঠিক তাই, প্রমাণ যদুবাবু! ও লোকটাকে মুড়িয়ে খেয়েছে মামা, আর একটিও নতুন পাতা ছাড়তে পারছে না বেচারা।"

আবার একচোট হাসি।

প্রমোদ বলল, "মামা না এসেও কিন্তু প্রচুর আনন্দের খোরাক যোগালেন আমাদের। বল সকলে, জয় মামার জয়, জয় মামার জয়।"

সকলে সমস্বরে বলে উঠল—"জয় মামার জয়।"

ধমক দিয়ে উঠলেন প্রমোদের মা—"মামাকে নিয়ে ওকি ইয়ার্কি। বল বরং মা দুর্গা মামাকে দীর্ঘজীবী কর, সুখী কর।"

দুর্গার একটি ছবি টাঙানো ছিল ঘরে। তার সামনে সবাই হাতজোড় করে বলল, "মা দুর্গা, মামাকে দীর্ঘজীবী কর, সুখী কর।"

দত্তর হৃদয় সত্যিই বিগলিত হয়ে গিয়েছিল। তার ইচ্ছে করছিল প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কবতে, প্রত্যেকের থুতনি নেড়ে আদর করতে।

কিন্তু তা সম্ভব হল না। ভূত তাড়া দিতে লাগল। আবার বেরিয়ে পড়ল তারা।

অনেক দেখল তারা, অনেক দূরে দূরে ঘুরে বেড়াল, অনেক বাড়িতে গেল। সর্বত্রই আনন্দ! এমন কি হাসপাতালে গিয়েও দেখল সেখানেও আনন্দের স্রোত বইছে। আনন্দময়ীর আগমনে সারা দেশ জুড়ে আনন্দ করছে সবাই! বিদেশে যারা আছে তারা বাড়ির কথা ভাবছে, যাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে তারাও ভাবছে সুখের দিন আসবে, খুব গরীব যারা তাদেরও আশা হচ্ছে সুদিন আসবে। সর্বত্র আশার আলো, সুখের স্বপ্ন। রাস্তার ভিখারীরা, জেলের

কয়েদীরা, হাসপাতালের রোগীরা কেউ নিরানন্দ নয়। ভূত তাকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরল, অনেক বাড়িতে তার পিচকিরি দিয়ে আতর ছেটাল। দত্ত অনেক রকম দেখল, অনেক কিছু শিখল।

চারিদিকে অন্ধকার। মনে হল রাত হয়েছে, গভীর রাত, কিন্তু সন্দেহ হতে লাগল সত্যিই কি রাত হয়েছে? একটু আগেই তো দিনের আলো ছিল। আর একটা জিনিস দেখেও দত্ত আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। দত্তর যদিও কোন পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু ভূত যেন ক্রমশ বুড়ো হয়ে আসছিল। এ পরিবর্তন দত্ত অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছিল কিন্তু কিছু বলেনি। একটা থিয়েটার থেকে বেরিয়ে দত্ত চমকে গেল, ভূতের মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে।

"আপনাদের পরমায়ু কি খুব কম?—দত্ত জিগ্যেসই করে ফেলল শেষকালে।

"হ্যাঁ, এই পৃথিবীতে আমাদের পরমায়ু খুব কম। আজ রাত্রেই শেষ হয়ে যাবে।"

"আজ রাত্রেই!"

"আজ রাত দুপুরে। ওই শোন, সময় হয়ে এল।"

দত্ত শুনতে পেল একটা ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজছে। টং করে শব্দ হল একটা। একটু আগে এগারোটা বেজেছিল। হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়তে দত্ত খুব হকচকিয়ে গেল। ভূতের আলখাল্লার নীচের দিক থেকে চারটে পায়ের মতো কি যেন বেরিয়ে আছে।

দত্ত বলল, "কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিগ্যেস করব? ওগুলো কি বেরিয়ে আছে? ওগুলো কি আপনারই শরীরের অংশ?"

"না, আমার শরীরের নয়। এই দেখ।"

আলখাল্লার ভিতর থেকে ভূত দুটি শিশু বার করল। কি চেহারা তাদের! রুগ্ন, শীর্ণ, ভয়ংকর। তারা দুজনেই হাঁটু গেড়ে ভূতের সামনে বসে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে রইল।

"দেখ, দেখ, ওদের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখ।"

একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ফ্যাকাশে গায়ের রং, মুখে জরার চিহ্ন, গায়ে শতচ্ছিন্ন জামা, ভ্রূকুটিকুটিল মুখ, মানুষের মুখ নয় যেন জানোয়ারের মুখ, অসহায়, ভূতের পা আঁকড়ে পড়ে আছে।

স্বাস্থ্য থাকলে যে মুখে যে হাতে স্বাস্থ্যের লাবণ্য ফুটত, সে মুখ সে হাত জরাজীর্ণ, যেন পুড়ে কুঁচকে কুঁচকে গেছে মাংসগুলো, কেউ যেন সেগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। যে মুখে দেবশিশুর মাধুরী ফুটত, সে মুখে শয়তানের ছাপ। একটা পশু যেন ভেংচি কাটছে। বিরাট পৃথিবীতে, বিশাল মানবসমাজে এর চেয়ে বেশী ভয়ংকর আর কোনও দৃশ্য নেই বোধহয়।

দত্ত দেখে সভয়ে পিছিয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে একটি কথা সরল না। ভূতের ছেলেমেয়ে না কি এরা! দত্ত ভেবেছিল ভদ্রতার খাতিরেও অন্তত দু'চারটে ভালো কথা বলবে সে এদের সম্বন্ধে। কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না, কথা আটকে গেল তার মুখে। এ রকম সে আগে দেখেনি।

"এরা আপনার ছেলে মেয়ে?"

"আমার নয়, মানুষের। এরা আর্তভাবে এসে আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। ছেলেটির নাম 'অজ্ঞতা' আর মেয়েটির নাম 'অভাব'। এদের সম্বন্ধে সতর্ক করে দিচ্ছি তোমায়। বিশেষ করে এই ছেলেটির সম্বন্ধে। আমি দেখতে পাচ্ছি ওই ছেলেটির কপালে 'প্রলয়' লেখা রয়েছে। যদি সে লেখা মুছে না যায়, মানবসমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। অস্বীকার করতে পার এ কথা?"— ভূত শহরের দিকে হস্ত প্রসারিত করে বলতে লাগল—"যারা অস্বীকার করতে চায়, তাদের চোখ ফুটিয়ে দিও। তোমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্যেই এ কথা স্বীকার করতে হবে। আর স্বীকার যদি না করতে চাও তাহলে মহাপ্রলয়ের জন্য প্রস্তুত থাক।"

"এদের কি কোন আশ্রয় নেই?"

"আছে বইকি! তোমাদের অনাথ আশ্রম, তোমাদের লঙ্গরখানা, তোমাদের জেল।"

টং টং করে বারোটা বাজল।

দত্ত চারিদিকে চেয়ে দেখল, ভূতকে দেখতে পেল না। সেই ছেলে মেয়ে দুটোকেও না। সব অন্তর্ধান করেছে। তারপর সে দেখতে পেল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা কি একটা যেন আসছে। ঘোষের কথা মনে পড়ল দত্তর। বুঝতে পারল তৃতীয় ভূত আসছে।

।। চার।।

হ্যাঁ, ভূতই। ধীরে ধীরে, গম্ভীরভাবে, নীরবে সে আসতে লাগল। যখন কাছে এল তখন দত্ত হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তার সামনে। তার মনে হল ভূতের আসবার ধরনটাই যেন ভয়ংকর, একটা ভীষণ রহস্যের পরিবেশও যেন এগিয়ে আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে। একটা কালো বোরখার মতো পোশাকে আপাদমস্তক ঢাকা। মাথা, মুখ, বুক, শরীরের কোন অংশই দেখা যাচ্ছে না। কেবল একটা হাত সামনের দিকে প্রসারিত রয়েছে। এই প্রসারিত হাতটার জন্যেই সে চারিদিকের অন্ধকারের সঙ্গে বেমালুম মিশে যেতে পারেনি। ওই হাতটা না থাকলে তাকে অন্ধকারের ভিতর চেনা কঠিন হত।

সে যখন আরও কাছে এল তখন দত্ত অনুভব করল যে ভূতটি বেশ লম্বা এবং ভারিক্কি। কি একটা রহস্য যেন ঘন হয়ে আছে তার চারদিকে। বেশ ভয় হল দত্তর। নড়েও না, কথাও বলে না।

দত্তই তখন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, "আপনিই কি ভবিষ্যৎ পূজার ভূত?"

ভূত তবুও কোনও কথা বলল না, তার প্রসারিত হাতটা কেবল সামনের দিকেই প্রসারিত হয়ে রইল, যেন সামনে যা আছে তাই সে দেখাচ্ছে।

"যে সব ঘটনা এখনও ঘটেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে যা ঘটবে তারই ছবি কি আপনি আমাকে দেখাতে এসেছেন? তাই, না?"

বোরখার উপর দিকটা একটু নড়ল এক মুহূর্তের জন্য। দত্তর মনে হল, ভূত যেন মাথা নেড়ে সমর্থন করলে তার কথাটা। এই ইঙ্গিতটুকু ছাড়া আর কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

ভূতের সাহচর্যে দত্ত যদিও অভ্যস্ত হয়েছিল খানিকটা তবু এই লম্বা নীরব মূর্তিটা দেখে ভয় করতে লাগল তার। পা কাঁপতে লাগল। কি করবে এ, কে জানে। ভূতকে অনুসরণ করতে গিয়ে সে পারল না, পা খুব বেশী কাঁপতে লাগল। তার অবস্থা বুঝে দাঁড়িয়ে গেল ভূত। তাকে সামলে নেবার সময় দিলে একটু।

কিন্তু এতে আরও উলটো ফল হল। একটা অজানা অনিশ্চিত ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল দত্ত। তার মনে হতে লাগল ওই বোরখার আড়ালে দুটো ভৌতিক চোখ তার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছে, আর সে চোখ দুটো চরম বিস্ফারিত করেও বুঝতে পারছে না, কি রকম সে চোখের দৃষ্টি। যা দেখা যাচ্ছে তা অন্ধকারের একটা স্তূপের ভিতর থেকে একখানা প্রসারিত হাত।

দত্ত বলল, "ভবিষ্যতের ভূত, আপনাকে দেখে আমি বড্ড ভয় পেয়েছি। অন্য দুটি ভূত দেখে আমার এত ভয় হয়নি। আমি বুঝতে পারছি আপনি আমার ভালোর জন্যেই এসেছেন, এটাও আমি ঠিক করেছি যে এবার থেকে আমি আমার জীবনের ধারা বদলে ফেলব, আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন সেইখানেই আমি যাব, যা বলবেন তাই আমি করব। আপনি কি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না?"

ভূত কোন কথা বলল না। তার হাতটা কেবল সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে রইল।

"চলুন তাহলে"—দত্ত বলল—"চলুন। যেখানে নিয়ে যাবেন সেইখানেই আমি যাব। রাত ফুরিয়ে আসছে। সময় বেশী নেই। আমি জানি, বুঝতে পারছি (আপনি) যা দেখাবেন তা আমি আমার জীবনে আর দেখতে পাব না। চলুন, কোথায় যাবেন।"

ভূত যেমন ভাবে এসেছিল, তেমনি ভাবেই আবার চলতে লাগল।

নীরব, রহস্যময়।

তারা যে শহরে এসে ঢুকল তা মনে হল না। শহরই যেন তাদের চারিপাশে গজিয়ে উঠল সহসা। চারিদিকেই শহর। সামনেই ব্যাঙ্ক। ধনী ব্যবসায়ীরা চারদিকে ঘুরছে, সব ব্যস্ত, টাকার ঝনঝন শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছোট ছোট দল বেঁধে কি সব পরামর্শ করছে সবাই, ঘড়ি দেখছে, সকলেরই কোটের উপর ঘড়ির মোটা মোটা সোনার চেন, চেন থেকে নানারকম মেডেলের মতো দুলছে—এলাহি ব্যাপার! এরা সবাই দত্তর পরিচিত, অনেকবার দেখাশোনা হয়েছে।

ভূত একটা ছোট দলের পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের দিকে হাতটা প্রসারিত হয়ে আছে দেখে দত্তও কাছে গেল তাদের।

একজন খুব মোটা লোক (তার চিবুকের নীচেও চর্বি থলথল করছে) বলল, "না, আমি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। শুধু জানি লোকটা মারা গেছে।"

"কবে মারা গেল?"

"গত রাত্রে বোধ হয়।"

"হয়েছিল কি"—তৃতীয় আর একজন প্রকাণ্ড একটা নস্যির কৌটো থেকে নস্যি নিতে নিতে বলল, "আমি তো ভেবেছিলাম ব্যাটা কখনও মরবে না।"

"কিন্তু মরেছে। সবই দয়াময়ের ইচ্ছে"—আর একটা লোক হাই তুলে টুসকি দিতে দিতে বলল।

"ওর টাকাটার কি গতি হল?"—আর একটা লোক প্রশ্ন করল। লোকটার নাকের ঠিক ডগায় বিরাট একটা আঁচিল—"প্রাণ ধরে কাউকে দিয়ে যায়নি নিশ্চয়।"

"তা শুনিনি"—মোটা লোকটি বলল—"সম্ভবতঃ ওর ব্যবসাতেই দিয়ে গেছে। আমাকে দেয়নি, এইটুকু আমি জানি কেবল।"

হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

"শ্মশানে ওর সঙ্গে গেছল ক'জন? খুব সম্ভব চারজন ভাড়াটে লোকের কাঁধে গেছেন। সদ্ভাব ছিল না তো কারো সঙ্গে!"

নাকে-আঁচিল ভদ্রলোক বললেন, "আমি যেতে পারতাম, যদি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। অন্তত এক বোতল মাল টাল না থাকলে কি যাওয়া যায় ওসব ব্যাপারে। যা কিপটে ছিল লোকটা, কিছুই হয়তো ব্যবস্থা করে যায়নি। নিজের লোকও কেউ নেই।"

"খবর পেলে আমি যেতাম"—মোটা লোকটি বলল—"কারণ মনে হয় আমিই ওঁর সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম। রাস্তায় দেখা হলে আমারই সঙ্গে দু'একটা কথা বলতেন। আচ্ছা চলি।"

সবাই সরে পড়ল নানা দিকে। গিয়ে মিশল আবার নতুন দলে। দত্ত কান পেতে রইল, এদের কথা থেকে যদি কিছু হদিস পাওয়া যায়।

এরাও প্রত্যেকেই দত্তর পরিচিত। প্রত্যেকে বড় ব্যবসায়ী, ব্যবসার জগতে সুপরিচিত। এদের সান্নিধ্য এবং সম্মান লাভ করবার চেষ্টা দত্ত বরাবরই করেছে। বলা বাহুল্য, ব্যবসার খাতিরেই কেবল। প্রাণের সম্পর্ক স্থাপন করবার লোক দত্ত কোন দিনই ছিল না।

"কেমন আছেন?"—একজন বলল।

"আপনি?" উত্তর এল।

"চলে যাচ্ছে। গর্ত তো ভরে গেল! মৃত্যুকালে কেউ কাছে ছিল না। এক ফোঁটা জলও দেয়নি কেউ।"

"তাঁর যা প্রাপ্য পেয়েছেন। আপনি আজ আসবেন আমার বাসায়? ভাল সিদ্ধি আনিয়েছি এবার কাশী থেকে। ঘোঁটবার জন্যে ভালো বেলকাঠের বড় বাটি আর ঘুঁটনিও আনিয়েছি। আমার দারোয়ান শিউকমল খুব ভাল সিদ্ধি বানায়। আসবেন—"

"যাব যাব, নিশ্চয়ই যাব।"

ব্যাস, এর বেশী আর কোনও কথা হল না। যে যার রাস্তায় চলে গেল।

দত্ত প্রথমটা একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। ভূত এই তুচ্ছ কথাবার্তা শোনবার জন্যে দাঁড়াল কেন! তারপর তার মনে হল নিশ্চয়ই কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। কি উদ্দেশ্য? একজনের মরার কথা হচ্ছিল। নিশ্চয়ই ঘোষের মৃত্যুর কথা ওরা বলছিল না। ঘোষ তো অনেক আগেই মারা গেছে। তার মৃত্যু তো অতীতের কথা। এ ভূতটি ভবিষ্যতের ঘটনা দেখাচ্ছে। গর্ত তো ভরে গেল! মানে? গর্ত কে। তার চেনা-শোনা কেউ তো নেই। যাই হোক কথাগুলো প্রণিধান করতে লাগল সে। এ-ও তার মনে হল এই ভূত যখন ভবিষ্যতের ছবি দেখাচ্ছে তখন তারও ছায়া দেখাবে। তার আশা হল তার ভবিষ্যতের আচরণ থেকে সে বুঝতে পারবে এ জীবনে সে কি হারিয়েছে। তা বুঝলে সংশোধনও করে নিতে পারবে নিজেকে।

সে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কই নিজের ছায়ামূর্তি তো চোখে পড়ল না। সে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকত সেখানে আর একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে যটার সময় রোজ আপিসে আসত ঘড়িতে ঠিক সেই তটাই বেজেছে, কিন্তু সে কোথাও নেই, চারিদিকে অসংখ্য লোকের ভিড়, কিন্তু সে নেই। একটু আশ্চর্য হয়ে গেল সে। তার পরিবর্তিত ভবিষ্যৎ জীবন দেখবে আশা করেছিল, কিন্তু কই, কিছুই তো নেই। তারপর তার মনে হল তার পরিবর্তিত জীবন হয়তো অন্য রকম হয়েছে (তাই সে আশাও করেছিল) সেইজন্যেই চিনতে পারছে না।

ভূত নীরবে এবং গম্ভীর হয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল হস্ত প্রসারিত করে। দত্তর মনে হল যে ভূতের অদৃষ্ট চক্ষুর দৃষ্টি যেন তার উপরই নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। দত্ত চিন্তা করবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সব গুলিয়ে গেল। শিউরে উঠল সে, কেমন যেন শীত করতে লাগল।

এর পর বড়বাজার ছেড়ে তারা অন্যদিকে চলল। ক্রমশ তারা শহরের এক প্রান্তে প্রায় নির্জন এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছল যা পীতাম্বরের চেনা-চেনা মনে হতে লাগল। রাস্তাটা খুব খারাপ, যে দু'চারটে লোক দেখা যাচ্ছে তারাও প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ, মাতাল, কেউ টলছে, কেউ শিস দিচ্ছে, কদর্য চেহারা সব—জায়গাটা সত্যিই খুব ভয়াবহ। নানা দিকে গলি গেছে নানা আকারের, গলি নয় যেন নালী, বিশ্রি গন্ধ। বমি, বিষ্ঠা ছড়ানো রাস্তার পাশে পাশে, কাগজ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো—কত কি! এ জায়গায় খুন রাহাজানি হওয়াও বিচিত্র নয়। অনেকরকম চোরা-কারবার হয় এখানে।

এইখানে একটা দোকানের সামনে দাঁড়াল তারা। দোকান না বলে তাকে গুহা বা গহ্বর বলাই উচিত। কপাটের সামনে নীচু একটা মরচে-পড়া করোগেটেড্ টিনের চালা। আর তার নীচে নানারকম লোহালক্কড়, বোতল বাক্স, ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপ। দোকানদারটার চেহারাও শয়তানের মতো। দোকানের ভিতর একটা শ্বাপদ জন্তুর মতো বহুবিধ মরচে-পড়া লোহালক্কড়ের মাঝখানে ওৎ পেতে বসে আছে আর বিড়ি খাচ্ছে। দাঁত নেই, চোপসা মুখ, পাঁচ-ছ'দিনের না কামানো পাকা গোঁফ দাড়ি ভরতি। ফক্ ফক্ করে ক্রমাগত বিড়ি খেয়ে যাচ্ছে। চারধারে মরচে-ধরা পেরেক, কব্জা, শিকল, রেতি, কাটারি, ছুরি-ছোরা, তার মাঝখানে ওই লোকটা। দত্ত একে একে চিনতে পারল, চোরাই মালের কেনা-বেচা করে। পিছনে আলনায় জামা কাপড়ও ঝুলছে নানা মাপের, নানা চেহারার। লোকটার বয়স বোধহয় সত্তরের কাছাকাছি, চোখ দুটো সর্বদা ঘুরছে এদিকে ওদিকে, ওঠা-নামা করছে চিবুকটা। শিকার খুঁজছে যেন।

দত্ত আর ভূত এই লোকটার সামনাসামনি এসে দাঁড়াতেই একটা মেয়েও ঢুকল পিঠে একটা বাণ্ডিল নিয়ে। সে ঢুকতে না ঢুকতেই আর একজন এল, তার পিঠেও একটা বাণ্ডিল। তার পিছু পিছু মিশকালো একটা লোকও ঢুকল এসে। লোকটা এদের দেখে যেন হকচকিয়ে গেল, এরাও আশ্চর্য হয়ে গেল তাকে দেখে। পরস্পর সবিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর হো হো করে হেসে উঠল।

প্রথম স্ত্রীলোকটি তখন দোকানদারকে সম্বোধন করে বলল, "জিতুবাবু, আমি ঝি, আমি আগে, তারপর ধোপানী, তারপর শ্মশানের চণ্ডাল। কি কাণ্ড, আমরা তিনজনেই একসঙ্গে এসে গেছি।"

ঝি গালে হাত দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল।

দেখা গেল জিতুবাবু রসিক লোক।

কর্কশ গলায় খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ, এমন ত্র্যহস্পর্শ বড় একটা দেখা যায় না। ভিতরে এসো, কি মাল এনেছ দেখাও দিকি একে একে। তোমরা তো পুরোনো খদ্দের, তোমাদের তো সব চেনা। ঝি তুমি আগে এস। থাম কপাটটা বন্ধ করে দি আগে। আঃ—কব্‌জাটার কি যে ক্যাঁচ্ করে শব্দ হয়। এ দোকানে এইটেই বোধহয় সব চেয়ে মরচে-পড়া কব্‌জা। হা-হা-হা। এস, ভেতরে এস।"

ভিতরের দিকে একটা ছেঁড়া শতরঞ্জি পাতা ছিল, সেইটে বুড়ো হাত দিয়ে ঝেড়ে দিলে একটু।

"এস, কি এনেছ দেখি।"

ঝি তার উপর বসে পুঁটুলিটি খুললে।

"কিছু অন্যায় করেছি? সবাই নিজের চরকায় তেল দেয়। বুড়োও দিত!"

"ঠিক বলেছ। ওর মতো কঞ্জুস লোক আমি তো আর দেখিনি। বাবা, মানুষ ছিল না, যেন একটা ইস্কুরুপ!"—ধোপানী বলল।

"ঠিক বলেছ। দেখো আমার কথা আবার বলে বেড়িও না যেন। যদি বল আমিও তোমার নামে ঢাক পেটাব। আমার নাম ক্ষেন্ত ঝি!"

"না, না, সে কি, আমি তেমন মেয়ে নই। কান দিয়ে চোখ দিয়ে ভিতরে যা ঢুকবে তা মুখ দিয়ে কখনও বেরুবে না। একেবারে কুলুপ।"

"সে তো যমের বাড়ি গেছে। তার এসব জিনিস এখন থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি। ভোগ করবার তো কেউ নেই। আমাদেরই দুটো পয়সা হোক। কি বল!"

"তা তো বটেই"—হেসে উত্তর দিলে ধোপানী।

"সে যদি এগুলো কাউকে দিতে চাইত অনায়াসে দিতে পারত। তার ভাগনাকে খবর দিলেই আসত সে। কিন্তু কাউকে খবর দেয়নি। একা ঘরে খাবি খেতে খেতে মরেছে। শেষ সময়ে মুখে এক ফোঁটা জলও পড়েনি। অমন কঠিন অসুখের সময়ও আত্মীয়স্বজনদের কথা মনে পড়েনি। আশ্চর্য লোক বাবা! একটি আধলা হাত দিয়ে গলত না! উঃ।"

"ভগবান তেমনি বিচারও করেছেন! ঠিক শাস্তি হয়েছে"—সায় দিল ধোপানী।

"আরও বেশী শাস্তি হওয়া উচিত ছিল, এ তো কিছুই হয়নি। আমি যদি আগে খবর পেতুম তাহলে আরও অনেক কিছু নিতে পারতুম। দেখুন তো জিতুবাবু, যা পেয়েছি তার দাম কত হবে। ঠকিও না যেন বাবু। পম্পাপষ্টি বলে দাও কি দেবে। গরীব মানুষ আমি, অতদূর থেকে ঘাড়ে করে বয়ে এনেছি। আমি এদের ভয়ও করি না, আমারি দলের লোক এরাও, কেউ আগে চুরি করেছে, কেউ পরে। পাপ আমাদের কারুরই হয়নি। কি বল? এখন খুলুন দেখি পুঁটুলিটা—"

"আমার বেশী জিনিস নেই, আমারটাই আগে দেখে ছেড়ে দিন আমাকে।"

শ্মশানের চণ্ডালটা এগিয়ে এসে তার মাল দেখাতে লাগল। সত্যিই বেশী কিছু ছিল না তার, গোটাকতক পিতলের বোতাম, আর কমদামী ফাউণ্টেন পেন একটা।

জিতুবাবু বলল—"আট আনা দিতে পারি।"

"না, না, আরও কিছু দিন। আট আনা বড্ড কম হচ্ছে।"

"আমাকে মেরে কেটে কুঁচিয়ে সিদ্ধ করে ফেললেও আর একটি ছিদামও আমি দেব না।"

একটি আটআনি নিয়ে শ্মশানের চণ্ডালটা চলে গেল। মড়ার গায়ের কোট থেকে ওগুলো খুলে নিয়েছিল সে। ভাবল আটআনায় খানিকটা তাড়ি তো হবে!

ধোপানী বলল—"এইবার আমারটা দেখুন। বেশী কিছু নেই আমার। গোটাদুই বিছানার চাদর, দুটো তোয়ালে, দুটো রুমাল আর জিনের ছেঁড়া ছেঁড়া প্যাণ্ট দুটো।

জিতু একটা কাগজে হিসেব করে বলল, "মেয়েদের আমি একটু বেশী দাম দি। এটা আমার দুর্বলতা। এর জন্যে আমার লোকসানও হয়, কিন্তু আমি কেয়ার করি না। তোমার দাম হল চার টাকা ছ'আনা। অন্য দোকানে গেলে তোমাকে তিন টাকার বেশী দিত না। প্রত্যেকটাই পুরোনো মাল।"

"বড্ড কম হচ্ছে জিতুবাবু।"

"বেশ আরও দু'আনা দিচ্ছি। পুরোপুরি সাড়ে চার টাকাই নাও। আর কিন্তু কথাটি বোলো না।"

সাড়ে চার টাকা নিয়ে চলে গেল ধোপানী। যাবার সময় একটু মুচকি হাসি হেসে গেল।

"জিতুবাবু, আমার পুঁটুলিটা এবার খোল।"

ঝি অধীর হয়ে উঠেছিল। পুঁটুলিতে অনেক গেরো, খুলতে একটু দেরি হল। খোলবার পর দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা ময়লা নেটের মশারি।

"কি এটা?"—জিতু বিস্মিত হয়ে গেল "মশারি নাকি?"

"হ্যাঁ, মশারি"—হেসে লুটিয়ে পড়ল ঝি।

"এই মশারি টাঙিয়ে মুখপোড়া শুত। কিনে এস্তক সাবান দেয়নি, ধোপার বাড়ি দেয়নি। ময়লায় রংই বদলে গেছে। ধপধপে সাদা রং ছিল।"

"ও জীবন্ত থাকতে থাকতেই তুমি ওর মশারিটা খুলে নিয়েছিলে না কি?"

"তাই নিয়েছি। মড়ার ছোঁয়া নয়। যখন দেখলুম আর বাঁচবে না, খাবি খাচ্ছে, তখন টপ টপ করে খুলে নিলুম।"

"বাঃ, বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে তো তুমি! হবে, উন্নতি হবে তোমার।"

"আমি বাগে পেলে কোন জিনিস ছাড়ি না। তবে এ-ও বলছি, অন্য লোক হলে তার মৃত্যুকালে তার চোখের সামনে আমি পট পট করে মশারি টেনে নামাতুম না। কম জ্বালিয়েছে আমাকে! পুজোর সময়ও একটি পয়সা উপুড়-হস্ত করলে না গা! ও মানুষ ছিল না, পিশাচ ছিল, পয়সা-পিশাচ: এইবার এই কম্বলগুলো দেখুন।"

"ওরই কম্বল না কি?"

"আবার কার! মরবার একটু আগেই গা থেকে খুলে নিয়েছি। বিছানার তলাতেও একটা ছিল, সেটাও টেনে বার করে নিয়েছি মরবার আগেই। মড়ার ছোঁয়া লাগতে দিইনি একটি জিনিসে। আমি তেমন কাঁচা মেয়ে নই। আর এই কামিজটা দেখ, এটাও খুলে নিয়েছি গা

থেকে মরবার আগে। একেবারে আনকোরা নতুন পপ্‌লিনের কামিজ। খুলে না নিলে নষ্ট হত।"

"নষ্ট হত মানে?"

"এইটে পরিয়েই শ্মশানে নিয়ে যেত। নিয়ে নিত ডোমেরা।"

"ও—"

"এই মোজা দুটোও দেখ। ভালো গরম মোজা। এ দুটোও ঠিক সময়ে খুলে নিয়েছিলাম। আর এই কম্‌ফর্টারটাও—। এটা বেশ গরম।"

"বুড়ো মরবার আগে শীতে হিহি করতে করতে মরছে না কি!"

"যম তখন ওর টুঁটি টিপে ধরেছে। হিহি তো করবেই!"

দত্ত ভয়ে স্তব্ধ হয়ে এই সব কথাবার্তা শুনছিল। এই লোলুপ লোকগুলোকে দেখে তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছিল বার বার। যদিও এরা ঘৃণা করবারও অযোগ্য তবু অপরিসীম ঘৃণায় ভরে উঠেছিল দত্তর সমস্ত হৃদয়। এরা কি মানুষ, না প্রেত।

জিতুবাবু টাকা দিতেই আনন্দে বিগলিত হয়ে পড়ল ঝি-টা।

"হা-হা-হা"—হেসে লুটিয়ে পড়ল ঝি-টা—"এতদিনে মিনসের জিনিসগুলোর সদগতি হল। কাউকে কি হাতে তুলে দিয়েছে কোনও জিনিস কখনও। সবাইকে খ্যাঁক খ্যাঁক করে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে সারাটা জীবন। আমাদেরই ভাগ্যে ছিল—অন্য কেউ পাবে কেন।"

আবার হেসে লুটিয়ে পড়ল সে।

দত্তর আপাদমস্তক বার বার শিউরে উঠল।

"ভূত। বুঝতে পেরেছি, সব বুঝতে পেরেছি। যে হতভাগ্য লোকটা মারা গেছে সে হয়তো আমিই। আমার জীবনের ইতিহাসও এই। ভগবান! এ কি দেখালে!"

ভয়ে পিছিয়ে এল দত্ত।

দৃশ্য আবার বদলাল। দত্ত দেখলে একটা বিছানার সামনে সে দাঁড়িয়েছে। শয্যাহীন, মশারিহীন একটা বিছানা। বিছানার উপর ছেড়া-কাঁথায় ঢাকা কি যেন একটা রয়েছে। সেটা যে কি তা নীরব ভাষায় সে-ই বলছিল।

ঘরটা খুব অন্ধকার, এত অন্ধকার যে ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তবু দত্ত চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, কৌতূহল হচ্ছিল তার, কার ঘর এটা। ভোরের আলোর মতো একটা মৃদু আলো এসে পড়েছিল বিছানাটার উপর। সেই বিছানার উপর লুণ্ঠিত, বঞ্চিত, পরিত্যক্ত মৃতদেহটা পড়ে ছিল। মনে হল কেউ এর জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি।

দত্ত ভূতের দিকে চেয়ে দেখল। ভূত ঢাকা-দেওয়া মড়াটার মাথার দিকে হস্ত প্রসারিত করে রয়েছে। যেন নীরব ভাষায় বলছে—ঢাকাটা তুলে দেখ! মুখটা ঢাকা ছিল, কিন্তু ঢাকাটা এমনভাবে ছিল যে সহজেই তুলে দেখা যায়। দুটো আঙুলের সাহায্যে কাঁথার একটা কোণ একটু তুললেই খুলে যায় ঢাকাটা। দত্তর ইচ্ছেও হচ্ছিল, কিন্তু সাহসে কুলুচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল তার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসছে।

মৃত্যু, এইসব ক্ষেত্রেই তুমি তোমার প্রতাপ দেখাতে পার। তুমি যে কত ভীষণ তা এই ধরনের শোচনীয় মরণেই বোঝা যায়। কিন্তু যাদের লোকে ভালোবাসে, সম্মান করে, শ্রদ্ধা

করে, তাদের তুমি কিছু করতে পার কি? পার না। তাদের হাত হয়তো অনড় হয়ে গেছে তাদের হৃদয়-স্পন্দন হয়তো থেমে গেছে কিন্তু ওই হাত একদিন মুক্তহস্ত ছিল, ওই হৃদয় একদিন মহৎ হৃদয় ছিল, ওই দেহে যে বাস করত সে ছিল সাহসী, স্নেহময়, প্রাণবন্ত মানুষ। তোমার হিমস্পর্শ তাদের ম্লান করতে পারে না। তুমি এদের যতই আঘাত কর না কেন, প্রত্যেক আঘাত থেকে মহিমার স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হবে। মৃত্যু, তারা অমর।

দত্তকে এসব কথা কেউ বলেনি, কিন্তু ওই বিছানাটার দিকে চেয়ে আপনা-আপনি তার এই সব মনে হল। দত্তর মনে হল কোনও মন্ত্রবলে এ লোকটা যদি এখন বেঁচে ওঠে তাহলে কি ওর লক্ষ্য হবে? টাকা, ব্যবসা, কি করে অপরকে শোষণ করা যায়, সেই চিন্তা! ওঃ, উচিত পরিণতিই হয়েছে লোকটার।

একলা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে লোকটা। এমন একজনও কেউ নেই যে বলে—লোকটা ভালো ছিল, আমার উপকার করেছিল, আমার সঙ্গে হেসে কথা বলেছিল। কাছে পিঠে কেউ নেই। সবাই ছেড়ে চলে গেছে! বাইরে একটা বিড়ালের বীভৎস ম্যাও ম্যাও শোনা যাচ্ছে। কপাট আঁচড়াচ্ছে বিড়ালটা। আশেপাশে ইঁদুর ছুটোছুটি করছে। ওরা কি কবছে এখানে? এই মড়ার ঘরে! দত্ত আর ভাবতে পারলে না।

"ভূত"—আকুল কণ্ঠে বলে উঠল দত্ত—"এ ভয়ংকর স্থান। এখানে যে শিক্ষা আমি পেলাম তা কখনও ভুলব না। দয়া করে আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে।"

ভূতের ঘাড়টা একটু ফিরল তার দিকে। মনে হল তার কথা শুনছে।

"কারও মৃত্যুতে এই শহরে যদি কোনও লোকের হৃদয়ে শোকের ছায়া পড়ে থাকে, সেইখানে আমাকে নিয়ে চলুন। আপনার ইচ্ছা আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি চাইছেন যে কাঁথার ঢাকা খুলে আমি দেখি ও লোকটা কে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি পারছি না। আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে!"

ভূতের সর্বাঙ্গ যে বোরখাটা দিয়ে ঢাকা ছিল, সেটা ডানার মতো বিস্তৃত হয়ে গেল। তারপর সেটাকে সে যখন গুটিয়ে নিলে তখন দত্ত দেখলে তারা অন্য জায়গায় এসে গেছে।

সকাল বেলা। একটি ঘরে একটি মা তার ছেলেদের নিয়ে বসে আছে। মনে হচ্ছে সে যেন আকুলভাবে কার আগমনের প্রতীক্ষা করছে। কারণ সে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না, কখনও উঠছিল, কখনও বসছিল, কখনও জানালার গরাদে ধরে বাইরের রাস্তার দিকে চাইছিল। ঘড়ি দেখছিল কখনও। তার ছেঁড়া কাপড়টা সেলাই করবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না, মন বসছিল না। ছেলেমেয়েরা হুড়োমুড়ি করছিল বলে বিরক্তও হচ্ছিল।

অবশেষে দুয়ারের কড়া নড়ল। সে তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিতেই তার স্বামী এসে ঢুকল। স্বামীটি যদিও বয়সে নবীন, কিন্তু চেহারা দেখলে মনে হয় বুড়ো। চিন্তা আর হতাশার ভারে অকালবৃদ্ধ। মনে হল সে যেন একটা আনন্দ চাপতে চেষ্টা করছে, আনন্দ হচ্ছে বলে সে যেন লজ্জিত।

তার জন্যে টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল। সে সেই টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসল। তার স্ত্রী জিগ্যেস করল কি খবর, কিন্তু লোকটি কেমন যেন বিব্রত বোধ করছিল, কিছু জবাব দিতে পারল না সহসা।

"ভালো খবর, না মন্দ খবর"—স্ত্রী জিগ্যেস করল আবার একটু দ্বিধাভরে।

"মন্দ।"

"মন্দ? আমাদের তাহলে সর্বনাশ হয়ে গেল? পথে দাঁড়াতে হবে।"

"না, কিরণ, আশা আছে এখনও একটু।"

"দত্তবাবু যদি দয়া করেন, তাহলেই আশা আছে। আশার অবশ্য শেষ নেই, কিন্তু এ অসম্ভব কি সম্ভব হবে?"

"দয়া করা বা না-করা এখন তাঁর ক্ষমতায় নেই। তিনি মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন। সে কি!"

মেয়েটির মুখ দেখে তাকে নিষ্ঠুর বা কঠোর বলে মনে হয় না, কিন্তু তবু এই খবরটা পেয়ে তার সমস্ত মনটা আনন্দে ভরে উঠল, দু'হাত জোড়া করে সেটা সে প্রকাশও করে ফেলল, "যাক্ বাঁচা গেছে!"

বলেই কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়ল।

"মারা গেছে, আহা।"

স্বামীটি বলল, "কাল রাত্রে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে এক সপ্তাহের সময় চাইতে গিয়েছিলাম, তখন সেই ঝি মাগীটা বলেছিল বাবুর বড্ড অসুখ, এখন দেখা হবে না। আমার মনে হয়েছিল এটা দেখা না-করবার ছুতো। কিন্তু এখন দেখছি সে মিছে কথা বলেনি। দত্ত তখন মরছিল।"

"তাহলে আমাদের ধারের এখন কি হবে? কে মালিক হবে ওর সম্পত্তির?"

"তা জানি না। কিন্তু যে-ই হোক, আমাদের আর ভয় নেই। ততদিনে টাকাটা যোগাড় করে রাখব। আর না-ই যদি রাখতে পারি তাহলে আশা করা যায় যে-ই উত্তরাধিকারী হোক ওর মতো চামার হবে না। ওরকম 'চিজ্' ভগবান একটিই সৃষ্টি করেছিলেন। যাক্ বাবা, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল আপাতত।"

হ্যাঁ, নিশ্চিন্তই হয়েছিল তারা। ছেলেমেয়েগুলো যদিও তাদের আসন্ন বিপদ বুঝতে পারেনি, কিন্তু মা বাবার বিষণ্ণ মুখ দেখে তারাও কেমন যেন বিমর্ষ হয়েছিল মনে মনে। মা বাবার মুখের প্রসন্নভাব ফিরে আসাতে তারাও খুশী হল।

তার মৃত্যুতে যে অনুভূতি জেগেছিল তার একটিমাত্র নমুনাই ভূত তাকে দেখাল। তার মৃত্যু হওয়াতে এরা নিশ্চিন্ত হয়েছে! এদের জীবন থেকে সর্বনাশের ছায়া সরে গেছে।

"এ মৃত্যুতে কি কারও মনে এতটুকু দুঃখ হয়নি? যা দেখলাম এর বিভীষিকাই আমার মনে চিরকাল আঁকা থাকবে?"

ভূত তখন তাকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেল অন্য রাস্তা দিয়ে। এ রাস্তা দত্তর পরিচিত। দত্ত এদিক ওদিক চাইতে লাগল, যদি সে নিজেকে কোথাও দেখতে পায়। কিন্তু কোথাও সে নেই। তারা অবশেষে যদুবাবুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আগে সে একবার এখানে এসেছিল। যদুবাবুর পরিবারবর্গকে আনন্দে উল্লসিত দেখে গেছে।

এখন কিন্তু টুঁ শব্দটি নেই। চতুর্দিক শান্ত। যদুবাবুর ছেলেমেয়েরা এককোণে চুপ করে বসে আছে প্রস্তর-মূর্তিবৎ। সবাই পলটুর দিকে চেয়ে ছিল। পলটু বই পড়ছিল একটা। মেয়েরা সেলাই করছিল। কিন্তু সবাই শান্ত, ভারি শান্ত।

যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দীঘির ধারগুলায়—

এ কথাগুলো কোথায় শুনেছে দত্ত? রেডিওতে? ছেলেটি বোধহয় পড়ছে বই থেকে। তারা ঘুরে ঢুকতেই থেমে গেল। থেমে গেল কেন?

যদুর বউ সেলাইটা রেখে দিয়ে চোখে হাত দিলেন, "রংটা চোখে বড্ড লাগছে। চোখ ব্যথা করছে!"

রংটা? তিনু কই?

যদুর বউ দু'হাতে চোখ ঢেকে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। মনে হল যেন কাঁদছেন। একটু পরে চোখ থেকে হাত নামিয়ে বললেন, "ওঁর আসবার সময় হয়ে এল না।"

"বাবার আসবার সময় হয়ে গেছে"—পলটু বইটা বন্ধ করে বলল।

"বাবা আজকাল বড্ড আস্তে আস্তে হাঁটছেন। রোজই তাঁর ফিরতে দেরি হয়।"

আবার তারা চুপ করে গেল।

তারপর যদুর স্ত্রী একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, "কিন্তু ওই একই লোক তিনুকে কাঁধে নিয়ে কি জোরে জোরেই না হাঁটত একদিন।"

"ঠিকই বলেছ মা"—পলটু বলল—"তিনুকে কাঁধে করে বাবা হনহন করে হাঁটতে পারত। বাবা এখন আর জোরে হাঁটতে পারে না।"

যদুর স্ত্রী বললেন, "কিন্তু তিনু কত হালকা ছিল। আর কি যে উনি ভালোবাসতেন ছেলেটাকে। ওকে কাঁধে নিয়ে হাঁটতে কোনদিনই কষ্ট হয়নি ওঁর। কিচ্ছু কষ্ট হয়নি। ওই উনি বোধহয় এলেন।"

তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিতেই যদুবাবু এসে ঢুকলেন। গলায় কমফর্টার ঠিক আছে। টেবিলের উপর তাঁর খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল। সেইখানেই গিয়ে বসলেন। পাশেই তোলা-উনুনে চায়ের জল ফুটছিল, যদুবাবুর স্ত্রী উঠে চা করতে লাগলেন। তাঁর দুই ছোট ছেলে কচি আর ক্ষেপু তাঁর কোলে চড়ে দুটি হাঁটু অধিকার করল এবং তাঁর গলা জড়িয়ে দুজনেই তাঁর গালে গাল দিয়ে বসে রইল চুপ করে, যেন তারা নীরব ভাষায় বলতে লাগল,—বাবা দুঃখ কোরো না, দুঃখ কোরো না। কষ্ট পেয়ো না।

যদুবাবু চোখেমুখে বেশ একটা হাসিখুশির ভাব ফোটাবার চেষ্টা করছিলেন।

"তোমার এত দেরি হল কেন বাবা"—পলটু জিগ্যেস করল।

"আজকাল রোজই তোমার দেরি হচ্ছে সত্যি। হেঁটে আসতে কষ্ট হয় না কি আজকাল।"

যদুবাবু কয়েক মুহূর্ত কিছু বললেন না। তারপর সত্যি কথাটা বলেই ফেললেন, "আমি ফিরবার সময় নিমতলাটা একবার ঘুরে আসি। তিনুকে সেখানে রেখে এসেছি।"

যদুবাবুর স্ত্রী চোখে আঁচল দিলেন।

যদুবাবু উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন। পাশের ঘরে তিনু থাকত। তার ছোট বিছানাটি একধারে রয়েছে, খেলনাও রয়েছে সাজানো। মনে হচ্ছে এই কিছুক্ষণ আগেও যেন তিনু এখানে ছিল। যদুবাবু তিনুর খাটের উপর বসে পড়লেন। তাঁর নীচের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে শান্ত হয়ে আবার ফিরে গেলেন খাবার ঘরে। তিনুর মা তখনও কাঁদছিলেন। পলটুও কাঁদছিল।

"তোমরা কেঁদ না। তিনু গেছে, বেশ গেছে। বেঁচে থাকলেই কষ্ট পেত। যে অসুখ ওর হয়েছিল তা তো আর সারত না। পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকা কি কম কষ্ট! ও পুণ্যবান ছেলে, ও এত কষ্ট পাবে কেন?"

চুপ করে গেলেন যদুবাবু। যদুবাবুর স্ত্রী চোখ মুছে বললেন, "পুণ্যবানই ছিল। ছিদাম জ্যোতিষী বলেছিল, ওর দেবগণ, দেব অংশে জন্ম। ও আমাদের মতো গরীবের ঘরে কষ্ট করে থাকবে কেন?"

যদুবাবু তখন অন্য কথা পাড়লেন।

"আজ প্রমোদবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল। দত্ত মশায়ের ভাগ্না গো! কি ভালো ছেলে! আমাকে বললেন, যদুবাবু আপনাকে কেমন যেন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। কি হয়েছে বলুন তো। বললুম তাঁকে। শুনে আঁতকে উঠলেন যেন—'তাই না কি! তিনু মারা গেছে! আপনার স্ত্রী সতীলক্ষ্মী, ভগবান তাঁকে এত কষ্ট দিলেন!' এ কথা কি করে জানলেন তিনি!"

"কি কথা!"

"তুমি যে সতীলক্ষ্মী প্রমোদবাবু জানলেন কি করে?"

পলটু একটু মুচকি হেসে বলল, "মাকে তো পাড়ার সবাই সতীলক্ষ্মী বলে। চাটুজ্যে দাদুও কাল বলছিলেন, অমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে দেখা যায় না।"

"ঠিকই বলেছেন, চাটুজ্যে কাকা। প্রমোদবাবু আরও বললেন, 'এই আমার কার্ডটা রাখুন। এতে আমার ঠিকানা আছে। আমার বাসায় আসবেন। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়, নিশ্চয় করব। আসবেন সময় করে একদিন।' অবশ্য প্রমোদবাবু বিশেষ যে কিছু করতে পারবেন তা মনে হয় না, কিন্তু তিনি যে উপকার করতে চেয়েছেন, দুটো মিষ্টি কথা বলেছেন, এই-ই যথেষ্ট। মনে হল উনি যেন তিনুকে চিনতেন।"

"হ্যাঁ, ভদ্রলোক—" যদুবাবুর স্ত্রী বললেন।

"আলাপ হলে দেখবে সত্যিই ভদ্রলোক। অমায়িক, উদার, হাসিখুশী। এক কথায় চমৎকার। বড় বংশের ছেলে তো। কিছুই আশ্চর্য নয়, পলটুর হয়তো একটা ভালো চাকরিও জুটিয়ে দিতে পারেন। অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ তো!"

"পলটু শুনচিস?"—যদুবাবুর স্ত্রী হেসে ছেলের দিকে চাইলেন।

পলটুর বোন বলল—"দাদার ভালো চাকরি হলে বিয়ে হবে। বউ আসবে। তখন হয়তো এ বাসায় আর কুলুবে না, দাদা অন্য বাসা করবে—"

"যা, যা, ফাজিল, চুপ কর"—ধমকে উঠল পলটু।

"ধমকাচ্ছিস কেন। যখন বিয়ে করবি তখন এ বাসায় কি কুলুবে? তবে বাবা, একটা কথা। তোরা যে যেখানেই থাকিস, যেমন ভাবেই থাকিস, তিনুকে তোরা যেন ভুলিস না। কত কষ্ট পেয়ে গেছে, কিন্তু টুঁ শব্দটি করেনি। ওকে তোরা ভুলিস না।"

পলটু বলল, "তা কি ভুলতে পারি কখনও? তুমি ওসব কথা ভাবছ কেন!"

যদুবাবুর স্ত্রীর চোখ দিয়ে আবার জল পড়তে লাগল।

দত্ত ভূতকে সম্বোধন করে বলল—"মনে হচ্ছে আপনি এবার চলে যাবেন। কেন মনে

হচ্ছে তা বলতে পারব না। যাবার আগে কিন্তু একটা কথা বলে যান আমাকে, আমার ঘরে কাঁথা-ঢাকা যে মড়াটা ছিল সে কে?"

ভূত কোনও উত্তর দিল না, আবার চলতে লাগল। ঠিক কোন্ দিক দিয়ে তারা যাচ্ছিল তা না বুঝতে পারলেও, দত্ত বুঝতে পারছিল যে তারা আবার বড়বাজারে এসেছে। আবার বণিকদের ভিড়। কিন্তু সে নিজেকে কোথাও দেখতে পেলে না। তার মনে হল এই তো তার আপিস। ভূত থামছিল না, কিন্তু দত্তর অনুরোধে থামল।

"এইখানেই ওই ঘরটায় আমার আপিস ছিল। বহুদিন থেকে ওটা আমার আপিস। ওখানে একবার উঁকি মেরে দেখব ভবিষ্যতে আমি কি হব?"

ভূত থামল, কিন্তু তার হাত প্রসারিত হয়ে রইল অন্যদিকে।

"আপনি ওদিকে দেখাচ্ছেন কেন? আমার আপিস তো এই দিকে।"

ভূতের হাত তেমনি প্রসারিত হয়েই রইল।

দত্ত তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজের আপিসের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। আপিস আছে, কিন্তু তার আপিস নয়। আগেকার টেবিল চেয়ার আলমারি কিছু নেই, চেয়ারে অন্য লোক বসে আছে, সে নয়।

ভূতের দিকে চেয়ে দেখল, ভূত অন্যদিকে হস্ত প্রসারিত করে রয়েছে। আবার চলতে লাগল তারা। কোন্ দিকে যাচ্ছে প্রথমটা দত্ত বুঝতে পারেনি। পরে বুঝল নিমতলা ঘাটে এসেছে। সামনেই একটা চিতা জ্বলছে। তিন চারজন লোক বসে গল্প করছে।

প্রথম ব্যক্তি বলছে—"এ মড়াটা বেগ দেবে মনে হচ্ছে। কাঠগুলো ভালো ধরেনি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, "ধরবে একটু পরে। পীতাম্বর দত্ত যেমন বেগ দিয়েছিল, এ ততটা দেবে না। পীতাম্বর দত্তকে পোড়াতে নাজেহাল হতে হয়েছিল। দু'দিনের বাসি মড়া, পেট ফুলে ঢোল। কর্পোরেশন থেকে আমার উপর হুকুল হল, পুড়িয়ে এস ওকে। চারজন ডোম নিয়ে গেলুম। কোনরকমে শ্মশানে এনে ফেললুম বটে, কিন্তু নামল মুষলধারে বৃষ্টি। ঘণ্টাখানেক ঠায় বসে থাকতে হল।

তারপর চিতায় চড়ালাম, কিন্তু ভিজে কাঠ ধরতে চায় না। শেষ পর্যন্ত সবটা পুড়লই না, টেনে ফেলে দিলাম, আধপোড়া অবস্থায়! কি করব, শীতে হিহি করতে করতে কি আর বসে থাকা যায়? দু'ছিলিম গাঁজা খেয়েও শীত যায় না।"

"পীতাম্বর দত্ত কে?"—তৃতীয় লোকটি জিগ্যেস করল।

"ছিল এক ব্যাটা সুদখোর কঞ্জুস হারামজাদা। সকালে কেউ নাম নিত না। আত্মীয়স্বজন সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের জ্বালিয়ে গেল। আমরা কর্পোরেশনের চাকর, আমাদের তো 'না' করবার উপায় নেই। পাড়ার একটি লোক সঙ্গে আসতে চাইলে না। দাও, বিড়িটা—"

দত্ত নির্বাক হয়ে রইল। তারপর ভূতকে প্রশ্ন করল, "ওরা কি আমার কথা বলছ? ঘরে যে মড়াটা দেখলুম সেটা কি আমারই মড়া? যা দেখলুম তা কি হবেই, না হতে পারে—"

ভূত কোনও উত্তর দিল না, চিতার দিকে হস্ত প্রসারিত করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দত্তর কাঁপুনি এল হঠাৎ। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সে। তারপর ভূতের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলতে লাগল, "বিশ্বাস করুন, আমি বদলে গেছি। আপনাদের সঙ্গে দেখা না হলে আমি হয়তো ওই রকম পশুই থাকতাম। কিন্তু আপনারা আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। আমি কয়লা ছিলাম, আপনাদের কৃপায় হীরে হয়ে গেছি। দয়া করে বলুন, আমার ভালো হবার আশা আছে তো?"

ভূতের অকম্পিত প্রসারিত হাতটা এবার যেন একটু কাঁপল।

দত্ত বলতে লাগল, "আমি শপথ করছি, এবার থেকে আমি প্রতি বছর মায়ের পুজো করব। সেই পুজোয় ডাকব সবাইকে। আমাকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি দেখিয়ে যে শিক্ষা আপনারা দিলেন তার মর্যাদা আমি রাখব। আপনাদের আশীর্বাদে আবার মানুষের মতো মানুষ হব। আপনারা তো সব পারেন, আমার অতীতটাকে মুছে দিন না, লোকে যেমন রবার দিয়ে ভুল লেখাকে মুছে দেয়। দেবেন? দিন না—"

দত্ত ভূতের প্রসারিত হাতটা ব্যাকুলভাবে জাপটে ধরল। ভূত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু আরো জোরে চেপে ধরল দত্ত। ভূত শেষে এক ঝটকায় সেটা ছাড়িয়ে নিলে। তারপর এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। ভূত ক্রমশ সরু হয়ে গেল। দত্ত সবিস্ময়ে দেখল সে মশারি টাঙাবার ফ্রেমে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, তারই তো মশারির ফ্রেম। বিছানাটাও তার, ঘরটাও। সানায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাহলে পুজো শেষ হয়নি। এখনও সময় আছে।

দত্ত তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে পড়ল।—"না, আর দেরি নয়! এবারই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ঘোষ, ভাই ঘোষ, কি উপকারই তুমি করেছ আমার।"

সে নিজের মুখে হাত বুলিয়ে দেখল চোখের জলে সব ভিজে গেছে। তারপর চেয়ে দেখল, না, মশারি তো ঠিক আছে, কেউ ছিঁড়ে নেয়নি। সব ঠিক আছে। চেয়ার, টেবিল, তার জামা, ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে। ভবিষ্যতের ভূত আমাকে তাহলে যা দেখালে তা হয়নি। সে হতেও দেবে না।

একটা অপূর্ব আলোয় যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখটা। তাড়াতাড়ি সে নিজের জামা কাপড়গুলো ঠিক করতে লাগল। পাট করে ঝেড়ে গোছাতে লাগল, কিন্তু গোছাতে গিয়ে আরও যেন অগোছাল হয়ে গেল সব।

"কি করব আমি এখন!"—দিশেহারা হয়ে পড়ল যেন দত্ত—"কি করব ঠিক বুঝতে পারছি না। পালকের মতো হালকা হয়ে গেছি! কি কাণ্ড! মনে হচ্ছে আমি যেন দেবদূত! আমি যেন স্কুলের ছেলে! বারোয়ারিতলায় ঢাক বাজছে। বাঃ, কি চমৎকার বাজাচ্ছে! জিগ্ জিগনা, জিগ্ জিগিনা গুম্ গুম্, জিগ্ জিগ্ জিগিন্ জিগিন্ গুম্ গুম্—"

বালকের মতো লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল দত্ত বাইরের ঘরে। হাঁপাচ্ছিল সে।

"ওই তো সেই দরজা। ওই দরজা দিয়েই ঘোষ এসেছিল। ওই যে ওইখানে ওই কোণে

বর্তমান পুজোর ভূত বসেছিল। ওই যে ওই জানলা দিয়ে আমি আরও সব ভূতদের দেখেছিলাম। আশ্চর্য, সব কি স্বপ্ন? এতো সুন্দর, এতো অসম্ভব স্বপ্ন? না, না, সব সত্যি, ওরা এসেছিল, ওরা আমাকে ঘষে মেজে বদলে দিয়ে গেছে! হা-হা-হা! কি মজা! আমি বদলে গেছি—"

উদ্বাহু হয়ে লাফাতে লাগল দত্ত। তার হাসির আওয়াজে অপূর্ব একটা তারুণ্যের সুর বাজল। কিন্তু হাঁপিয়ে পড়ল বেচারা। এই বয়সে কি অত লাফালাফি সহ্য হয়!

"এখনও পুজো শেষ হয়নি? অনেকক্ষণ যে ভূতেদের সঙ্গে ঘুরেছি। আজ কোন্ তারিখ? ক'টা বেজেছে? কিছুই জানি না। আমি যেন ছোট ছেলে হয়ে গেছি! ছোট ছেলেই থাকব। হা-হা-হা! বোকাই থাকব আমি। বুদ্ধিমান হতে চাই না। কি মজা, কি মজা!"

হঠাৎ বাড়ির খুব কাছেই পুজোর বাজনা বেজে উঠল খুব জোরে। জিগ্ জিগা জিন্, গিজিন গিজিন্ —ডুম্ ডুম্ ডুম্!

দত্ত তাড়াতাড়ি গিয়ে জানলাটা খুলে ফেলল। বাঃ আকাশ তো পরিষ্কার। রোদে ঝলমল করছে চারিদিকে। বৃষ্টি-টৃষ্টি কিচ্ছু নেই। পুজোর কলরবে পরিপূর্ণ রাস্তাঘাট। নতুন জামা কাপড় পরে ঘুরছে ছেলেমেয়ের দল। সোনালী আভা যেন ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। একটা ছেলেকে দেখে জানলা থেকে ঝুঁকে দত্ত চীৎকার করে জিগ্যেস করল—"আজ কোন্ তারিখ—"

"কি?"

ছেলেটি একটু আশ্চর্য হয়ে উপর দিকে চাইল।

"আজ কোন্ তারিখ খোকা?"

"তারিখ? তারিখ জানি না। আজ সপ্তমী।"

"আজই সপ্তমী?"

"হ্যাঁ। আজই। আমি ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি।"

"বাঃ বাঃ! আচ্ছা একটা কথা বলতে পার?"

"কি—"

"বড় রাস্তায় যে মিষ্টির দোকানটা আছে তার সব মিষ্টি কি বিক্রি হয়ে গেছে? বড় বড় ক্ষীরেলা, পানতুয়া, রসগোল্লা—করছিল কাল।"

ছেলেটা অবাক হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

লোকটা পাগল না কি!

"একটু দাঁড়াও—"

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল দত্ত। সিঁড়ি দিয়ে নেমে হাজির হল রাস্তায়।

"খোকা, আমার একটা কাজ করবে? ওই মিষ্টির দোকানে গিয়ে বলে এস, সব মিষ্টি আমি কিনব। সব মিষ্টি আমার বাড়িতে নিয়ে আসতে বল।"

"স—ব মিষ্টি?"

"সব। তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এস তাদের এখানে। তোমাকেও দেব।"

ছেলেটা আর একবার সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল দত্তর মুখের দিকে। পাগল নয় তো?

দত্ত বুঝতে পারলে তার সপ্রশ্ন দৃষ্টির অর্থ।

"না, না, আমি পাগল নাই। আচ্ছা, এই নাও।"

পকেট থেকে মনি-ব্যাগ বার করে একটা দশটাকার নোট দিলে তাকে।

"এইটে দোকানদারকে দিয়ে বল পীতাম্বর দত্তর বাড়িতে সব মিষ্টি পৌঁছে দিন। বাকি দামটা মিষ্টি এলে পাবেন। আর এই নাও তুমি এক টাকা। পুজোর সময় কিছু কিনে নিও।"

খোকা এতটা প্রত্যাশা করেনি। একছুটে চলে গেল সে।

"যদুর বাড়িতে সব পাঠিয়ে দেব। কে পাঠিয়েছে তা সে বুঝতেও পারবে না। বেশ মজা হবে।"

তারপর তার মনে হল এখানে মিষ্টিগুলো আনিয়ে কি হবে। তার চেয়ে দোকানে গিয়ে যদুর বাড়ির ঠিকানাটা লিখে দেওয়াই তো ভালো।

দত্ত মিষ্টির দোকানের দিকে গেল। ছেলেটা আগেই পৌঁছেছিল সেখানে। সে ব্যাপারটা ঠিক বোঝাতে পারছিল না তাকে। দোকানদার বুঝতেই চাইছিল না যে কিপ্‌টে পীতাম্বর দত্ত সব মিষ্টি কিনবে।

দত্ত গিয়ে তাকে বলল—"ওহে ফ্যালারাম, শোন। তোমার দোকানের সব মিষ্টিগুলো আমার চাই। কি রকম দাম পড়বে বল তো—"

"সব নেবেন?"

"সব। এই খোকাকে আগে একটা করে দাও সব রকম মিষ্টি। আর বাকিটা এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। একটা কাগজ দাও—"

দত্ত কাগজে যদুবাবুর ঠিকানাটা লিখে দিলে।

"এ তো অনেক দূর। এতো মিষ্টি সেখানে নিয়ে যেতে হলে তো একটা ট্রাক চাই।"

"ট্রাকই ভাড়া করে ফেল একটা। কত ভাড়া নেবে?"

"টাকা পনেরো তো বটেই।"

"বেশ। আর তোমার মিষ্টির দাম কত?"

হিসেব করে ফ্যালারাম বলল—"পঁচাশি টাকা বারো আনা হয়। তা আপনি পঁচাশিই দিন।"

"বেশ, তোমার পঁচাশি আর ট্রাকের পনেরো। পুরোপুরি একশ টাকাই দিচ্ছি। এই নাও। এই খোকাকে আগে এক ঠোঙা খাবার দাও—"

"আমার দোকানসুদ্ধ আপনি কিনে নিলেন। আমি যে বেকার হয়ে গেলাম!"

"বেকার হবে কেন, ফূর্তি করে পুজো দেখ গে।"

দামটাম সব চুকিয়ে দিয়ে দত্ত বাড়ির দিকে ফিরল। যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ফিরল। কি আনন্দ যে হচ্ছিল তার তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

বাড়ি ফিরে এসে কামাতে বসল। উত্তেজনায় হাত কাঁপতে লাগল, কেটে গেল দু'এক জায়গায়। দত্তর ভ্রূক্ষেপ নেই।

কামিয়ে, ফরসা জামা কাপড় বার করলে ট্রাঙ্ক খুলে। বহুকাল আগেকার একটা ফরেসডাঙার ভালো ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি ছিল। তাই বার করে পরল।

তাই পরে আর এক গোছা নোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। পুজোয় চুটিয়ে আনন্দ করতে হবে। রাস্তায় দলে দলে লোক চলেছে। সবারই মুখে হাসি, সবারই মুখে প্রসন্নতা। সবারই গায়ে নতুন জামা-কাপড়। দত্ত সকলের মুখের দিকে চাইতে চাইতে চলতে লাগল। তারও মুখে স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসির আভা। অনেকেই তাকে নমস্কার করল। সে-ও প্রতি-নমস্কার জানালে।

একটা অন্ধ ভিখারী রাস্তার ধারে বসে খঞ্জনি বাজিয়ে গান করছিল—দত্ত তাকে একটা টাকা দিয়ে দিলে।

কিছুদূর গিয়েই সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল, যিনি ছোট ছোট গরীব ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে তার আপিসে চাঁদা চাইতে এসেছিলেন। তাঁকে দেখে দত্তর বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল যেন। কিন্তু পিছপা হবার লোক সে নয়। এগিয়ে গিয়ে হেসে নমস্কার করলে।

"পুজো বেশ জমেছে মনে হচ্ছে। কাল আপনি কত যোগাড় করতে পারলেন?"

"কই আর বেশী হল। আপনিই তো পীতাম্বর দত্ত।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। অধমের ওই নাম। আপনি কাল নিশ্চয় আমার উপর চটেছিলেন, সে জন্য ক্ষমা চাইছি। শুনুন, কথাটা কানে কানে বলব, লোকে যেন না জানতে পারে।"

ভদ্রলোকের কানে কানে কথাটা বলতেই চমকে উঠলেন ভদ্রলোক—"সে কি! অত দেবেন? অথচ কাল—"

"কাল মেজাজটা ভালো ছিল না।"

"আপনি এত টাকা দেবেন তা যে স্বপ্নাতীত ছিল—"

"না, না ওসব বলবেন না। আর আমার নামটা যেন না প্রকাশ পায়। আপিসে আসবেন পুজোর পর, গল্প করা যাবে। আসবেন তো?"

"নিশ্চয় আসব।"

"আচ্ছা, নমস্কার। চলি তাহলে।"

তারপর গেলেন বারোয়ারিতলায়। করজোড়ে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দুর্গা প্রতিমার সামনে। দুর্গার একটা নূতন মূর্তি দেখলেন আজ। তিনি জগজ্জননী। মহিষাসুর মূর্তিমান পাপ বলেই তাকে দমন করছেন। পুণ্যময়ী মঙ্গলময়ী মা কি এত পাপ সহ্য করতে পারেন? তারপর দত্ত দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াল। কত ছেলেকে কত খেলনা কত লজেন্স্ কত সন্দেশ যে

কিনে কিনে দিতে লাগল। যে কটা ভিখারী ছিল প্রত্যেককে একটা করে টাকা দিল। তার মনে হতে লাগল সারাজীবন কষ্ট করে যে লক্ষ লক্ষ টাকা সে রোজগার করেছে তা যেন এতদিনে সার্থক হল। তারপর সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল দুর্গাকে। মনে মনে বলতে লাগল—অনেক পাপ করেছি মা, আর করব না, এবার আমাকে ক্ষমা কর।

তার সারা দেহ মন যেন পবিত্র হয়ে গেল।

বারোয়ারির মুরুব্বী একজন যাচ্ছিলেন, তাঁকে ডেকে দত্ত বলল—"আপনাদের বারোয়ারি ফাণ্ডে আমি একশ টাকা চাঁদা দিতে চাই। আপনাকেই দেব কি?"

"দিন। রসিদ কিন্তু এখন দিতে পারব না। রসিদ বই বাড়িতে আছে।"

"বেশ, পরেই দেবেন।"

একশ টাকার আর একটা নোট বার করে দিলে দত্ত। তারপর পুজোর প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। তাই খেয়ে কাটিয়ে দিল দুপুরটা।

সন্ধ্যাবেলা দত্ত প্রমোদের বাড়ি গেল। বাড়িটার সামনে খানিকক্ষণ পায়চারি করল। কড়া নাড়তে সাহস হচ্ছিল না প্রথমে। শেষটা মরিয়া হয়ে এগিয়ে গিয়ে নাড়তে লাগল কড়াটা।

একটি ঝি বেরিয়ে এল।

"প্রমোদ বাড়ি আছে?"

"আছেন। ওপরে আছেন তিনি। খবর দেব?"

"আমিই যাচ্ছি। আমি তার মামা—"

ঝি-টি বলল—"ওঁরা খেতে বসেছেন—"

"তা হোক—"

উপরে দরজা ফাঁক করে মুণ্ডটি ঢুকিয়ে দত্ত দেখল খাওয়ার জিনিস সব টেবিলে সাজানো হচ্ছে। প্রমোদের বউ বাটিতে বাটিতে মাংস তুলছে।

"প্রমোদ—"

টুনি চমকে উঠল। তার হাতের হাতা থেকে ঝোল খানিকটা পড়ে গেল মাটিতে।

"আরে একি! মামা যে।"

সহাস্যমুখে উঠে দাঁড়াল প্রমোদ।

"হ্যাঁ, মামাই। নিমন্ত্রণ করে এসেছিলে, খেতে এসেছি। ঢুকব?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

দত্ত ঢুকেই জাপটে ধরল প্রমোদকে। তারপর যা করলে তা স্বপ্নাতীত। চুমু খেলে তাকে।

"আরে, আরে, কি করছ মামা, ছাড় ছাড়।"

সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠল বেশ। একটু পরেই তপেশ এল, প্রমোদের সেই বড়-সড় শালীটিও এল। আরও জমে গেল। টুনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল দত্ত। পকেট থেকে আরও একশ টাকা বার করে বলল, "প্রমোদ, বৌমার একটা ভালো শাড়ি কিনে দিও। আজই দিও—"

খুব হৈ হৈ করে মহানন্দে খাওয়াদাওয়া শেষ হল। অনেকক্ষণ গল্প করে একহাত তাস খেলে প্রায় রাত ন'টা নাগাদ দত্ত বাড়ি ফিরল।

তার পরদিন খুব সকাল সকাল আপিস গেল সে। ন'টা বাজবার অনেক আগে। যদুবাবু নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে আসতে পারবেন না। হাতে-নাতে ধরতে হবে সেটা।

পৌনে ন'টায় গিয়ে দত্ত আপিস খুলল। একটু পরেই ন'টা বাজল। যদুবাবুর দেখা নেই। সওয়া ন'টা বেজে গেল। তবু যদুবাবুর দেখা নেই। ন'টা বেজে আঠারো মিনিটে এলেন যদুবাবু।

ভয়ে ভয়ে কপাট ঠেলে ঢুকলেন।

"কি হে", দত্ত চেঁচিয়ে উঠল—"এত লেট করে এলে যে।"

"একটু দেরি হয়ে গেল আজ। সত্যিই দেরি হয়ে গেছে।"

"দেরি তো হয়েই গেছে, বুঝেছি, কিন্তু কারণটা কি?"

"কাল পাড়ায় যাত্রা হচ্ছিল। সেটা শেষ হতে প্রায় রাত দুটো বেজে গেল। সকালেই শ্যামানন্দবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার করে পুজোর জামা-কাপড় কিনেছিলাম। টাকাটা তাঁকে আজ ফেরত দেবার কথা ছিল।"

"টাকা পেলে কোথায়?

"আবার ধার করলুম। মাইনে পেলে শোধ করব।"

দত্ত ছদ্ম গাম্ভীর্যে কটমট করে চেয়ে রইল যদুবাবুর দিকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "না, এরকম চলবে না। এ চাল আমি সহ্য করতে পারব না। আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি। যা পেতে তার ডবল পাবে এ মাস থেকে।"

তারপর হা-হা-হা করে হেসে উঠল দত্ত।

যদুবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা! তার একবার মনে হল পুলিশ ডাকবে কিনা।

দত্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগল—"শোন যদু, এতকাল তোমার উপর অনেক দুর্ব্যবহার করেছি। আমাকে ক্ষমা কোরো। আজ মহাষ্টমী, আজ থেকে আমি আমার ভুল সংশোধন করলাম। তোমার মাইনে তো ডবল করে দিলামই, তোমার পরিবারের ভারও আমি নেব। কোথায় কোথায় তোমার ধার আছে, কি কি কষ্ট আছে, সব আমাকে খুলে বল, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে এবার থেকে। আর রাত্রে তোমার বাড়িতে খাব আমি। আপিস বন্ধ করে দাও। গোটা কুড়ি টাকা দিচ্ছি, মাছ মাংস কিনে নিয়ে বাড়ি চলে যাও। খেতে খেতে আজ তোমার সব কথা শুনব। কিচ্ছু ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

দত্ত যদুবাবুকে যা বলেছিল, তা তো করেই ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী করেছিল। তিনু মারা যায়নি। তিনুর সব ভার নিয়েছিল দত্ত। বড় বিলেতফেরত একজন ডাক্তারের উপর তার চিকিৎসার ভার দিয়েছিল। তার চিকিৎসায় ক্রমশ ভালো হচ্ছিল তিনু। ডাক্তারবাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন, ভালো হয়ে যাবে। দত্ত আর যদুবাবুর মনিব রইল না, ক্রমশ বন্ধু হয়ে গেল। তার সংসারের সমস্ত সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে গেল সে ক্রমশ। প্রায় রাত্রে ওর বাড়িতেই যেত। দত্তর চরিত্র এমন বদলে গেল যে সকলে অবাক। অনেকে চিন্তা করে বলতে আরম্ভ

করেছিল—ও আবার নিজমূর্তি ধরবে। কয়লার কালো রং কখন ঘোচে না। দত্ত কিছু বলত না, মুচকি মুচকি হাসত কেবল। হীরে যে কয়লারই আর একটা রূপ তা তো সকলে জানে না। দত্ত এ-ও জানত যে পৃথিবীতে এমন কোন ভালো ঘটনা ঘটেনি যা দেখে লোকে প্রথম প্রথম ঠাট্টা করেনি। এমন কোন ভালো লোক জন্মেনি যাকে প্রথম জীবনে উপহাসাস্পদ না হতে হয়েছে। দত্ত কারো ঠাট্টা বা উপহাস গ্রাহ্য করত না, প্রতিবাদও করত না, মুচকি হাসতে হাসতে শুনে যেত কেবল।

ভূতেরা তাকে আর দেখা দেয়নি। কিন্তু একরাত্রেই তাকে তারা যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিল তাই যথেষ্ট হয়েছিল তার পক্ষে।

এর পর থেকে যে জীবন সে যাপন করেছিল তা আদর্শ ভদ্রলোকের জীবন। সবাই তাকে একদিন ঘৃণা করত, কিন্তু শেষে সবাই তাকে ভালোবেসেছিল। এর চেয়ে বেশী আর কিছু সে চায়ওনি।

নঞ্-তৎপুরুষ
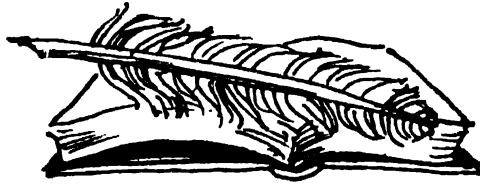
।। এক।।

গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল কিন্তু পুরন্দরবাবু কার্যগতিকে কোলকাতা ছাড়তে পারলেন না। দার্জিলিং যাবেন ঠিক ছিল কিন্তু সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল। হাইকোর্টে মোকদ্দমাটার কোন কূলকিনারাই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। জমিদারি সংক্রান্ত এই মোকদ্দমাটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে যেন। বেশ ভালোর দিকেই যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ যেন বিগড়ে গেল। হু হু করে টাকা খরচ হচ্ছে, নামজাদা বড় বড় উকিল লাগিয়েছেন, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। ক্রমশই অধীর হয়ে উঠছেন তিনি। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, নিজেই নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করেছেন। দলিলপত্র দেখে নিজে যে এজাহারটা লিখেছিলেন তাঁর উকিল নাকচ করে দিলে সেটাকে। তিনি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, সাক্ষী যোগাড় করছেন, একে বলছেন, তাকে ধরছেন—এবং সম্ভবত কাজের চেয়ে অকাজই করছেন বেশী। তাঁর উকিল অন্তত সেই কথাই বলছে। সে তাকে দার্জিলিং পাঠাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু পুরন্দরবাবু কিছুতেই যেতে পারছেন না। কোলকাতা শহরের ধুলো, ধোঁয়া, গরম, কলের তেল, পচা মাছ, শ্যামবাজারে তাঁর বাড়ির পাশের ড্রেনটা সব হার মেনেছে। পুরন্দরবাবুকে কিছুতেই কোলকাতা থেকে তাড়ান যাচ্ছে না। ''কিচ্ছু হচ্ছে না, সব গেল'' বারম্বার তিনি মনে মনে আবৃত্তি করছেন, স্নায়বিক বিকার বেড়ে যাচ্ছে রোজ, কিন্তু কিছুতেই কোলকাতা ছাড়তে পারছেন না।

একদা পরিপূর্ণ এবং বিচিত্র জীবন ছিল পুরন্দর রায় চৌধুরীর। যদিও বয়সের হিসাবে তিনি যৌবনসীমা পার হয়েছেন—এখন আটত্রিশ বছর বয়স তাঁর—কিন্তু বুড়ো হবার বয়স হয়নি এখনও। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে বার্ধক্য এসে গেছে এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে এসে গেছে। বয়সের হিসাবে নয় অন্তরের মানদণ্ডে, বাইরে থেকে নয় ভিতর থেকে অনুভব কবছেন তিনি এবং যতই সেটা অনুভব করছেন ততই যেন জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন আরও। বাইরে থেকে এখনও তাঁকে বেশ শক্তসমর্থ দেখায়। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি তিনি, একমাথা কালো কোঁকড়ান চুল—একটি পাকেনি এখনও। যদিও খুব ছিমছাম নন, কিন্তু একটু নজর করে দেখলেই বোঝা যায় যে অভিজাত বংশের ছেলে তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন। কথায় ব্যবহারে বনেদী ঘরের চিহ্ন সুস্পষ্ট এখনও। ইদানিং অবশ্য চরিত্রে একটু শৈথিল্য এসেছে, মেজাজও খিটখিটে হয়েছে—তবু কিন্তু অভিজাতসুলভ সহজ সহৃদয়তা অবলুপ্ত হয়নি এখনও চরিত্র থেকে। এ ছাড়া তাঁর এমন একটা গভীর আত্মপ্রত্যয় আছে—যা প্রায় অহঙ্কারেরই সমগোত্র। বুদ্ধি বিদ্যা সংস্কৃতি এমন কি কিঞ্চিৎ প্রতিভা সত্ত্বেও এই দাম্ভিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি তিনি কিছুতেই। তাঁর চোখে মুখে ফুটে বেরুত তা। চোখে মুখে একটা সরলতাও ছিল। পুরাকালে তাঁর টকটকে লাল মুখখানাতে এমন একটা নারীসুলভ কমনীয়তা ছিল যা সকলকে মুগ্ধ করত, বিশেষ করে নারীদেরই। এখনও অনেকে তাঁকে দেখে বলে—''বাঃ কি চমৎকার রং, কি সুন্দর স্বাস্থ্য ভদ্রলোকের!'' কিন্তু তিনি যে ভিতরে ভিতরে স্নায়বিক বিকারে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন—তা কেউ বুঝতে পারত না। বড় বড় টানাটানা চোখ ছিল তাঁর—দশ বছর আগে এই

চোখই মোহ বিস্তার করত অনেকের মনে—এমন প্রদীপ্ত, এমন প্রাণবন্ত ছিল যে লোকে মুগ্ধ না হয়ে পারত না। এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে সে চোখের দীপ্তি নিবে গেছে, চোখের কোণে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ, আশায় আনন্দে ঝলমল করত একদিন যে চোখের দৃষ্টি, এখন তাতে ফুটে উঠছে নীতিচ্যুত বিপর্যস্ত ছন্নছাড়া জীবনের ভণ্ডামি, সন্দেহ ও অবিশ্বাস—কিঞ্চিৎ ব্যথা এবং হতাশা। কেমন যেন একটা নামহীন ব্যথা এবং অনির্দিষ্ট হতাশা। যখন একা থাকতেন তখন এই হতাশাটা আরও যেন প্রবল হয়ে উঠত। আশ্চর্যের বিষয় যিনি মাত্র দু'বছর আগে হল্লা হৈ হৈ নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন, হাসতেন হাসাতেন, চমৎকার গল্প বলতে পারতেন, তিনি এখন একা থাকতে পেলে আর কিছু চান না। এই কারণে, তিনি বহু লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেছেন যাঁদের সঙ্গে এখনও (মানে, আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও) সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করলেও চলত। অবশ্য দাম্ভিকতা একটা কারণ। তা ছাড়া কোন কিছুর উপরই আস্থা ছিল না আর। কিছু আর ভালো লাগত না, কারও সঙ্গ আর সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু ক্রমশ একা থেকে থেকে তাঁর ওই দাম্ভিকতারও রূপ বদলে গেল। একটুও কমল না, বরং ঠিক উল্টো। কিন্তু তা এক বিশেষ রকম অভিনব দাম্ভিকতায় পরিণত হল, নানা বিভিন্ন অদ্ভুত কারণে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়তেন—যেন তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগত। কারণগুলো অদ্ভুত, পূর্বে একথা ভাবাও অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। সেগুলো ঠিক আধিভৌতিক নয়, যেন আধ্যাত্মিক। "আধ্যাত্মিক কারণে আরও আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্ভব না কি"—নিজেই মনে মনে বলতেন, কিন্তু কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারতেন না।

না, কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারতেন না। একটা 'আধ্যাত্মিক' ব্যাপার সর্বদাই চিত্তকে আকুল করে রাখত। পূর্বে এমন কখনও হয়নি—এ সব নিয়ে মাথাই ঘামাননি কখনও ইতিপূর্বে। তিনি সেই সব ধারণাকেই আধ্যাত্মিক বলতেন যা কিছুতেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—আশ্চর্যের বিষয়, কিছুতেই যায় না। নিজের অন্তরে অন্তরে তা মানতেই হয়। লোক-সমাজে পাঁচজনের সামনে অবশ্য হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়—লোক-সমাজের কথাই স্বতন্ত্র! প্রয়োজন হলে কালই তিনি পাঁচজনের সামনে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে রসিকতা করবেন হয় তো। বিবেকের কথা, বিশ্বাসের কথা তখন মনেই থাকবে না! আর প্রকৃতই তাই হচ্ছে। তথাকথিত 'স্বাধীন চিন্তা' 'স্বাধীন মতবাদ' প্রকৃতির কবলে পড়ে এই সেদিন পর্যন্ত তিনি এই করেছেন। বিনিদ্র নয়নে সারারাত যা ভাবেন সকালে লজ্জা পান তার জন্য। আজকাল রাত্রে ঘুমও হচ্ছে না। কিছুদিন থেকে এ-ও লক্ষ্য করেছেন যে আজকাল মনটাও বড় সহজে অভিভূত হয়ে পড়ে—কারণ ক্ষুদ্র বৃহৎ যা-ই হোক। সুতরাং মনের উপর নির্ভর করতে ভরসা হয় না তাঁর। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইদানীং এক অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে। রাত্রে তিনি যা ভাবেন, যা সত্য বলে অনুভব করেন সকালে ঠিক তা ভাবতে পারেন না, সকালে ঠিক তা সত্য বলে স্বীকার করতে দ্বিধা হয়। রাত্রিতে সমস্ত রূপান্তরিত হয়ে যায় যেন। একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে বলেছিলেন ব্যাপারটা। ডাক্তারটি অবশ্য বন্ধুলোক—রহস্যভরেই বলেছিলেন তাকে কথাটা। ডাক্তারবাবু বললেন যে ওরকম হয়। বিশেষত যারা ভাবুক প্রকৃতির তাদের মনে একাধিক বিভিন্ন চিন্তাধারার অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। বিনিদ্র রজনীরও এমন একটা অদ্ভুত প্রভাব আছে যে, সমস্ত জীবনের সংস্কার রাতারাতি বদলে যেতে পারে। সব সময়ে হয়

না অবশ্য। কেউ যদি তার এই বিবিধ সত্তার সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন হয়ে কষ্ট পায় তাহলে অবশ্য সেটা রোগেরই সূচনা বলে ধরতে হবে এবং তার চিকিৎসা করা উচিত। সব চেয়ে ভাল হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুরটাই বদলে ফেলা। আহার, বিহার, পারিপার্শ্বিক সমস্ত আমূল পরিবর্তন করা। সব ছেড়ে ছুড়ে দিনকতকের জন্য কোথাও বেরিয়ে পড়া মন্দ নয়.....ওষুধ অবশ্য আছে......কিন্তু.......

পুরন্দরবাবু আর শুনছিলেন না—তিনি যা জানতে চাইছিলেন তা জেনে গেছেন। এটা একটা অসুখেরই সূচনা তাহলে।

"অসুখ? এই সব আধ্যাত্মিক ধারণা অসুখ ছাড়া কিছু নয় তাহলে।" মন কিন্তু কিছুতেই মানতে চাইত না এ কথা।

অনতিকাল পরে আর একটা পরিবর্তন দেখা গেল। এতদিন যা রাত্রিতেই নিবদ্ধ ছিল তা সকালেও ঘটতে লাগল। তফাৎ রাত্রিতে মনটা বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত, সকালে হত রাগ। রাত্রির আবেগ সকালে রূপান্তরিত হত তিক্ত আত্মগ্লানিতে। অতীতের—এমন কি সুদূর অতীতের কতকগুলো ঘটনাও—বার বার মনে পড়তো। অদ্ভুতভাবে মনে পড়ত। কিছুতেই এড়াবার উপায় ছিল না। সত্যিই আশ্চর্য কাণ্ড। পুরন্দরবাবুর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছে। পরিচিত লোককে চিনতে পারেন না, নাম মনে থাকে না, বই পড়বার দুই একদিন পরেই গল্পটা ভুলে যান—এ সবের জন্যে অনেকবার অপ্রস্তুতও হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু স্মৃতিভ্রংশ হওয়া সত্ত্বেও সুদূর অতীতের এই ঘটনাগুলো—যা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি—এমন স্পষ্ট এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ এমন আশ্চর্য রকম নিখুঁতভাবে স্মৃতিপটে ফুটে উঠেছে কি করে? মনে হচ্ছে কিছুই যেন অতীত হয়নি, আবার যেন ঘটছে সব, আবার যেন সে জীবন ভোগ করেছেন তিনি। অস্বাভাবিক অলৌকিক কাণ্ড বলে মনে হচ্ছে তাঁর এটা। এমন কতকগুলো ঘটনা মনে পড়ছে যা বিস্মৃতির তলায় একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়—অতীতের অনেক কথাই অনেকের অনেক সময় মনে পড়ে যায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই---কিন্তু পুরন্দরবাবুর যা হচ্ছিল তা একটু বিস্ময়কর। শুধু স্মৃতি নয়, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অনুভূতি যেন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করছিলেন তিনি—মনে হচ্ছিল কেউ যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই জীবনের ঘটনা প্রবাহের মাঝখানে। অতীত জীবনের এই ঘটনাগুলোকে হঠাৎ পাপ বলেই বা মনে হচ্ছে কেন? নিজে বিচার করে যে সেগুলোকে পাপ বলে ঠিক করেছেন তা নয়—নিজের এই ভারাক্রান্ত বিষণ্ণ অসুস্থ মনের উপর কিছুমাত্র আস্থা নেই তাঁর—কিন্তু আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে অকারণে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ছে। মাত্র দু'বছর আগেও কি তিনি ভাবতে পারতেন—কেউ কি ভাবতে পারত—যে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়া সম্ভব!

প্রথম প্রথম যে ঘটনাগুলো তাঁর মনে পড়ছিল সেগুলো ঠিক অশ্রুজনক নয়—ক্ষোভজনক! জীবনের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ছিল, কোথায় কবে অপমানিত হয়েছিলেন তা-ও মনে পড়ছিল। একবার একটা লোক কুৎসা রটিয়েছিল তাঁর নামে, ফলে ভদ্রসমাজে গতিবিধি বন্ধ হয়ে গেল তাঁর কিছুদিন। প্রকাশ্য সভায় একটা লোক অপমান করেছিল তাঁকে একবার কিন্তু তিনি মানহানির মোকদ্দমা করেননি ঃ আর একবার এক মহিলা মজলিসের কয়েকটি সুন্দরী

সভ্যা তাঁর সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গোক্তি করেছিল তার জবাব দিতে গিয়ে আরও হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন তিনি ঃ টাকা ধার করে শোধ করেননি এরকম কয়েকটা ঘটনাও মনে পড়ল—সামান্য সামান্য টাকা—কিন্তু শোধ করা হয়নি। শুধু তাই নয় তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছেন—নিন্দাও করেছেন তাদের নামে। খুব যখন মন খারাপ হত তখন মনে পড়ত—দু'দুবার কি জঘন্য বাজে ব্যাপারে টাকা উড়িয়েছেন তিনি। এক আধটাকা নয়, প্রচুর টাকা! কিন্তু এসবের চেয়ে গুরুতর ঘটনাও মনে পড়ে যেত সঙ্গে সঙ্গেই।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বুড়ো কেরানীটার কথা মনে পড়ে যেতে—সেই নিরীহ পক্ককেশ লোকটাকে চোখের সামনে দেখতে পেতেন যেন, বিস্মৃতির তলায় সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে গিয়েছিল অথচ.....হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে যেত। বহুকাল পূর্বে প্রকাশ্যে লোকটাকে অসঙ্কোচে অপমান করেছিলেন তিনি। কোন কারণ ছিল না, কেবল বাহবা পাবার জন্য তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করে একটু আত্মশ্লাঘা অনুভব করার জন্য অনেক লোকের মাঝখানে অপ্রস্তুত করেছিলেন লোকটাকে। এই রসিকতাটি করার জন্যে বন্ধুবান্ধবদের কাছে খাতির বেড়ে গিয়েছিল তাঁর। ঘটনাটা এত দিন আগে ঘটেছিল যে ভদ্রলোকের নামটা পর্যন্ত ঠিক মনে করতে পারছিলেন না তিনি.....কিন্তু আর আর, সমস্ত পরিষ্কার মনে পড়ছিল....পারিপার্শ্বিক সমস্ত ছবি হুবহু যেন দেখতে পাচ্ছিলেন। বেশ মনে পড়ছে, ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের পক্ষ সমর্থন করছিলেন—অবিবাহিতা মেয়ে—যৌবন সীমা পার হয়েছে—তাকে কেন্দ্র করে নানারকম গুজব উঠেছিল তখন। ভদ্রলোক প্রথম প্রথম বেশ জোর গলায় তর্ক করছিলেন, পুরন্দরের বাক্যবাণে বিধ্বস্ত হয়ে হঠাৎ তিনি কেঁদে ফেললেন—সকলের সামনে। এখন হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে সেই ছবিটা মনে পড়ছে। ছোট ছেলের মতো কাঁদছিল লোকটা—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—দু'হাতে মুখ ঢেকে। হঠাৎ মনে হল এ ছবি তাঁর মনে বরাবর আঁকা আছে—কোনদিনই মুছে যায়নি। আর আশ্চর্য—তখন যা খুব কৌতুকজনক বলে মনে হয়েছিল—যেমন ওই ছোট ছেলের মতো দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদাটা—এখন তা আর মোটেই কৌতুকজনক নেই। বরং ঠিক উল্টো।

আর একটা ঘটনা। একবার এক গরীব স্কুল মাস্টারের যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে কুৎসিত একটা রসিকতা করেছিলেন তিনি—কেবল নিছক রসিকতার খাতিরেই! সে কথা তার স্বামীর কানে গিয়ে উঠেছিল। ফলে কি হয়েছিল তা অবশ্য তিনি জানেন না, কারণ ঠিক তারপরই তাঁকে বাইরে চলে যেতে হয়েছিল—কিন্তু এখন তাঁর মনে হচ্ছে ও জাতীয় রসিকতার বিষময় ফল হওয়া অসম্ভব নয়—হয় তো হয়েছিল....এই নিয়ে তাঁর কল্পনা হয় তো অনেক জাল বুনতো—কিন্তু আর একটা কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এই সেদিনের কথা সামান্য একটা চাকরানীর সঙ্গে কি কাণ্ড করলেন তিনি.....তার যে প্রেমে পড়েছিলেন তা নয়....কিন্তু তাকে নিয়ে যা ঘটল তা লজ্জাকর। আর সব চেয়ে লজ্জাকর তাকে ফেলে পালানো.....অসহায় শিশুটার দিকে পর্যন্ত চেয়ে দেখেননি তিনি.....অবশ্য এও ঠিক—একটা জরুরি দরকারে তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল সে সময়—দেখা করবার সময়ও ছিল না—তারপর এক বচ্ছর ধরে তিনি মেয়েটাকে খুঁজেছিলেন, কিন্তু আর পাননি। এ রকম বহু ঘটনার স্মৃতি মনে জাগছে.....মনে হচ্ছে আরও আছে। আত্মসম্মান সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছে ক্রমশ।

আত্মসম্মানবোধের মানদণ্ডটাও তাঁর বদলে যাচ্ছিল ইদানীং। আজকাল (অবশ্য মাঝে মাঝে) পায়ে হেঁটে বেড়াতে তাঁর আর লজ্জা হত না তত। নিজের গাড়ি নেই, রাস্তায় রাস্তায় অপিসে আদালতে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পরনে আধ ময়লা জামা কাপড়—আগে এ অবস্থায় পরিচিতি কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলে কুণ্ঠিত হয়ে পড়তেন—আজকাল ভ্রূক্ষেপই করেন না। ভণ্ডামি নয়। সত্যিই এরকম মনোভাব হচ্ছিল তাঁর আজকাল। কিন্তু সব সময়ে নয়। মাঝে মাঝে এরকম হত—বিশেষ করে যে সময়ে তাঁর মানসিক চঞ্চলতা বাড়ত, স্নায়বিক দুর্বলতায় অবসন্ন হয়ে পড়তেন—সেই সময়ে মনে হত....। কিন্তু না, আত্মসম্মানবোধের চেহারাটা বদলে ছিল সত্যিই। যে সব বাহ্যিক আড়ম্বর আত্মমর্যাদার জন্যে প্রয়োজনীয় মনে হত আগে, আজকাল তার অভাব বা আধিক্য মনকে আর নাড়া দেয় না তত। আজকাল সমস্ত মন একটি কথাই ভাবছে কেবল এবং দিবারাত্রি সেই দিকে উন্মুখ হয়ে আছে।

শ্লেষভরে মাঝে মাঝে ভাবতেন (এবং যখনই আজকাল নিজের সম্বন্ধে ভাবতেন শ্লেষ থাকত তাতে)—"স্বর্গে হয়তো ভগবান ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আমার জন্যে। আমার চরিত্র সংস্কার না করা পর্যন্ত ঘুম হচ্ছে না তাঁর বোধ হয়। ক্রমাগত জাগিয়ে তুলছেন বীভৎস স্মৃতিগুলোকে। অনুতাপের অশ্রু! হতে পারে। কিন্তু কিচ্ছু হবে না। বন্দুক ছুড়লে কি হবে—টোটা একদম খালি। আমি জানি না নিজেকে? স্মৃতি অনুতাপ চোখের জল—সমস্ত সত্ত্বেও কিছু করবার উপায় নেই আমার। প্রৌঢ়ত্বের প্রজ্ঞা সত্ত্বেও আমি কিছু বদলাইনি। কালই যদি প্রলোভন আসে, কালই যদি ঘটনাচক্র এমন হয় যে একটা গুজব রটিয়ে দিলেই আমার স্বার্থসিদ্ধি হবে, কালই আমি আবার গুজব রটিয়ে দিতে পারি যে ওই স্কুলমাস্টারের রূপসী বউ লুকিয়ে টাকা নিয়েছিল আমার কাছ থেকে। কালই পারি আবার—একটু ইতস্তত করব না। অতিশয় ঘৃণ্য জেনেও করব না। ফের যদি আমাকে সেই পুরুতটা আবার অপমান করে....আবার জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব তার—তার মেয়ের কান্নায় দৃকপাত করব না। সুতরাং টোটায় কিছু নেই...বন্দুক ছোড়া বৃথা। বুঝলেন ভগবান মশাই? অতীতের দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়ে, লাভ কি....নিজের হাত থেকেই যে পরিত্রাণ নেই আমার....."

যদিও স্কুলমাস্টারের স্ত্রীর নামে গুজব রটাবার অথবা পুরোহিতের মুখে জুতো মারবার কোন সুযোগ আর উপস্থিত হল না—কিন্তু উপস্থিত হলে যে তিনি দ্বিধা করবেন না এই চিন্তাই পুরন্দরবাবুকে দগ্ধ করতে লাগল। কোন মানুষই অনুতাপানলে একটানা দগ্ধ হয় না, মাঝে মাঝে ছাড়া পায় এবং সেই মুক্ত অবস্থায় জীবনকে উপভোগও করে।

পুরন্দরবাবুরও অনুতাপের অবকাশে জীবন উপভোগে আপত্তি ছিল না। অরুচিও ছিল না। কিন্তু কলিকাতা-প্রবাস মাঝে মাঝে দুঃসহ হয়ে উঠত তাঁর কাছে। জ্যৈষ্ঠমাস শেষ হতে চলল—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করছিল মোকদ্দমা চুলোয় যাক—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, পিছন দিকে না চেয়ে....সোজা কোথাও দৌড় দিতে। বনে পর্বতে যেখানে হোক। হরিদ্বারে গেলে হয়! কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই সব উলটে গেল আবার। মনে হল—'হরিদ্বারেই' যাই আর যেখানেই যাই 'কমলি' তো ছাড়বে না কিছুতেই। তা ছাড়া দায়িত্ব যখন নিয়েছি—তখন ফেলে পালানোর কোন মানে হয় না। পালাবই বা কেন? এই ধুলো, এই গরম, এই বিশৃঙ্খলা—এই তো বেশ। আদালতে ওই যে শকুনের ঝাঁক বসে রয়েছে—প্রকাশ্যভাবে দিব্যি ছেঁড়াছেঁড়ি করে খাচ্ছে—

সঙ্কোচ নেই, শঙ্কা নেই, ভণ্ডামি নেই। রাস্তায় জনস্রোত চলেছে, স্বার্থপর, ভীরু, লোভীর দল.....তার মতো পাষণ্ডের পক্ষে এই তো স্বর্গ! সমস্তই খোলাখুলি, সমস্তই স্পষ্ট পরিষ্কার—ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। তথাকথিত ভদ্র সমাজের মুখোস-পরা ভণ্ডামির চেয়ে এ ঢের ভালো। এ সারল্যকে বরং শ্রদ্ধা করা চলে। যাব না—এইখানেই থাকব আমি।

।। দুই।।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ। অসম্ভব রকমের গরম পড়েছে। সেদিন পুরন্দরবাবুকে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে খুব, পায়ে হেঁটে গাড়ি চড়ে—সবরকমে। কর্পোরেশনের নামজাদা মেম্বর এবং উকিল বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে দেখা করবার বিশেষ দরকার, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছেন না তাঁকে। শেষে ঠিক করেছেন সন্ধ্যেবেলা—বালিগঞ্জে তাঁর বাড়িতে গিয়ে অতর্কিতে ধরবেন। ছটার সময় একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকলেন। রোজই ঢোকেন। রোজই প্রায় টাকা দেড়েক খরচ হয়ে যায়। আগে যখন সচ্ছল অবস্থা ছিল—দশ টাকার কম হত না। এখন দেড় টাকায় কুলিয়ে নিতে হয়। অবস্থা খারাপ হয়েছে—উপায় কি! খেতে বসে যদিও রোজ মনে হত এসব অখাদ্য খাওয়া যায় না—খেতে আরম্ভ করলে কিন্তু শেষ করে ফেলতেন সব—কিছু পড়ে থাকত না। বরং এমন গোগ্রাসে খেতেন যেন কতদিন উপবাসী আছেন। তৃপ্তিও যে না হত তা নয়। নিজের বুভুক্ষা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যেতেন। ভাবতেন—"দুষ্টু ক্ষিদে এ। স্বাভাবিক নয়। হতেই পারে না।"

সেদিন হোটেলে যখন ঢুকলেন, তখন মনটা খিঁচড়ে আছে। চেয়ারটা সশব্দে টেনে বসলেন, টেবিলের উপরে দুই কনুই-এর ভর দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। খোশমেজাজে থাকলে তিনি শিষ্টতার চরম করতে পারেন—কিন্তু এখন মনের অবস্থা এমন যে সামান্যতম কারণে চীৎকার চেঁচামেচি করে প্রলয়কাণ্ড করে বসাও অসম্ভব নয় কিছু। অকারণে কণ্ঠস্বর চড়িয়ে হুকুম করলেন—এই কাটলেট দিয়ে যা!....কাটলেট দিয়ে গেল....ভেঙ্গে খেতে যাবেন....হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন—একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ে গেল....ভগবান জানেন কি করে—ঠিক সেই মুহূর্তে যেন তিনি তাঁর অবসাদের মূল কারণটা আবিষ্কার করে ফেললেন। বিশেষ করে এই ক'দিন থেকে যে অনির্দিষ্ট অসহ্য মানসিক যন্ত্রণাটা তিনি ভোগ করছিলেন—এক মুহূর্তের জন্য যা নিস্তার দেয়নি তাঁকে—হঠাৎ যেন তার কারণটা বুঝতে পারলেন তিনি। জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সমস্ত।

"সেই লোকটা।".....একটু উত্তেজনাভরেই অস্ফুটকণ্ঠে আবৃত্তি করলেন তিনি—"বেঁটে রোগা সেই লোকটা ঠিক!"

ভাবতে লাগলেন এবং যতই ভাবতে লাগলেন ততই যেন আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল মনটা। অসাধারণ অদ্ভুত লোকটা! কিন্তু না, অসাধারণই বা কেন, অদ্ভুত বা কি আছে এতে। বেঁটে রোগা লোক তো কত আছে!

প্রায় দিন পনের আগে—ঠিক মনে ছিল না তার, কিন্তু পনের দিনই হবে—কলেজ স্ট্রিট হ্যারিসন রোডের চৌমাথাটায় লোকটাকে প্রথম দেখেছিলেন তিনি। বেঁটে রোগা লোকটা। খুব

খুর করে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। পুরন্দরবাবুর মনে হল মুখটা যেন চেনাচেনা। কোথায় যেন দেখেছেন। তখনই আবার মনে হল "জীবনে কত সহস্র মুখই তো দেখেছি—সব মনে রাখা সম্ভব নাকি!" এগিয়ে গেলেন এবং প্রায় ভুলেই গেলেন তাঁর কথা। কিন্তু মনের অবচেতন লোকে ছাপটা লেগেই রইল এবং ক্রমশ যেন একটা নাম-হীন বিরক্তিতে রূপান্তরিত হল। এখন, পনের দিন পরে সমস্তটা স্পষ্ট মনে পড়ছে আবার, এ ক'দিনের বিরক্তির কারণটা যে ওই তাও বুঝতে পারছেন এখন। আগে ধরতে পারেননি....আজও সকালে দেখা হয়েছিল লোকটার সঙ্গে—তাই সমস্ত দিন মনটা খিঁচড়ে আছে। আগে একেবারেই এটা মাথায় ঢোকেনি তাঁর।

বেঁটে লোকটা কিন্তু ভোলবার অবসর দিলে না তাঁকে। তারপর দিনই আবার দেখা হল রাস্তায়—ওই হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রিটের মোড়েই। ঠিক তেমনি করে থমকে দাঁড়াল, ঠিক তেমনি করে একদৃষ্টে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। "চুলোয় যাক্"—পুরন্দরবাবু ব্যাপারটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন। এক একটা লোককে দেখলে এমন বিতৃষ্ণা হয়!

ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর আবার মনে হলো—"এর আগে লোকটাকে কোথাও দেখেছি,—সমস্ত সন্ধেটা মেজাজ খারাপ হয়ে রইল। রাত্রে একটা দুঃস্বপ্নও দেখলেন। এর কারণও যে ওই লোকটা হতে পারে তা মনে হলো না তাঁর। সন্ধেবেলা তো তার কথা একবারও ভাবেননি তিনি। আর তা ছাড়া ঐরকম একটা অপদার্থ যে তাঁর মনকে এতটা অধিকার করে থাকবে তাঁর মেজাজ খারাপ করে দেবে একথা স্বীকার করাও যে লজ্জাকর! দু'দিন পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হয় একটা ভিড়ের মধ্যে। মনে হল লোকটা তাঁকে চিনতে পেরেছে যেন। তার দিকে এগিয়েও আসছিল, কিন্তু ভীড়ের জন্য পারলে না, নমস্কার করবার জন্য হাতও তুলেছিল। চীৎকার করে ডাকলে নাম ধরে মনে হল....পুরন্দরবাবু এটা অবশ্য ঠিক শুনতে পাননি। রাগ হল তাঁর—"কে লোকটা! আমাকে যদি চিনেই থাকে কাছে আসছে না কেন। এমনভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার মানে কি?" একটা গাড়ি ডেকে তাতে চড়ে বসলেন। খানিকক্ষণ পরেই মামলা নিয়ে উকিলের সঙ্গে তর্কাতর্কিও করলেন খুব। সন্ধ্যাবেলা কিন্তু মন আবার অবসন্ন হয়ে পড়ল—অদ্ভুত রকম একটা অবসাদে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, "লিভারটাই খারাপ হয়েছে সম্ভবত। শরীরে জুৎ পাচ্ছি না কিছুতে...."

এই তৃতীয় সাক্ষাৎ। এর পর উপর্যুপরি আর দেখা হয়নি পাঁচ দিন। তবু কিন্তু মন থেকে দূর হয়নি সে। পুরন্দরবাবু একথা আবিষ্কার করে চমকেই গেলেন একদিন—"লোকটার জন্যই শরীর খারাপ হচ্ছে না কি! অদ্ভুত তো! কি করছে ও কোলকাতায় এতদিন ধরে! আমাকে চিনতে পেরেছে? কিন্তু আমি কিছুতেই চিনতে পারছি না তো। উস্‌কো-খুসকো চুল, করুণ চোখের দৃষ্টি। করুণ দৃষ্টি হবার মানে কি! কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলে চিনতে পারব বোধ হয়...."

বিস্মৃতি-সাগরে—তরঙ্গ উঠল যেন দু'একটা—মনে আসছে আসছে, কিন্তু আসছে না। অনেক সময় একটা নাম বা কথা যেমন মনে আসে কিন্তু মুখে আসে না, তেমনি—নাগাল পেয়েও যেন পাওয়া যাচ্ছে না।

"অনেক দিন আগে....ঠিক কোথায় যেন....ও....না-না চুলোয় যাক। কি একটা সামান্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছি....."

ভয়ঙ্কর রাগ হল। কিন্তু সন্ধেবেলা হঠাৎ মনে পড়ল যে সকালে রাগ হয়েছিল, এবং 'ভয়ঙ্কর' রাগ হয়েছিল। মনে হতেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।....শুধু আশ্চর্য নয়, কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন। কি যে ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রাগ হবার কারণ কি!

"নিশ্চয়ই হেতু আছে কোন.....তা না হলে কোথাও কিছুই নেই....আশ্চর্য!" এর বেশী ভাবনা এগোল না সেদিন।

তার পরদিন আরও বেশী রাগ হল এবং মনে হল যে রাগ হবার সঙ্গত হেতুও আছে, রাগ করে কিছুমাত্র অন্যায় করেননি তিনি। একি কাণ্ড! চতুর্থবার দেখা হয়েছিল বেঁটে লোকটার সঙ্গে। লোকটা একবার হঠাৎ যেন আবির্ভূত হল—মাটি ফুঁড়ে বেরুল যেন। কর্পোরেশনের মেম্বার নামজাদা উকিল বিশ্বম্ভর বোসের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল....বালিগঞ্জে এঁরই বাড়িতে অতর্কিতে সন্ধেবেলা যাবেন ভেবেছিলেন....ভদ্রলোকের সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না....কিন্তু মোকদ্দমার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন। অপরিহার্য ব্যক্তিটি কিন্তু ক্রমাগতই পুরন্দরবাবুকে এড়িয়ে চলছিলেন। হঠাৎ তারই সঙ্গে রাস্তায় দেখা! পুরন্দরবাবু কথা কইতে কইতে তাঁর পাশে পাশে হাঁটছিলেন এবং প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন তাঁকে বাগাতে। আর কিছু নয়, একটা ব্যাপারের আলোচনা প্রসঙ্গেই ভদ্রলোক যদি দু'একটা কথা ফাঁস করে ফেলেন—ওই দু'একটা কথা জানতে না পারলে পুরন্দরবাবুর মামলার বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কিন্তু চতুর বৃদ্ধ উকিল ঘাড় নেড়ে মুচকি হেসে ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে পারলেন ক্রমাগত। পুরন্দরবাবুও বাজার ছাড়া নন। নানা যুক্তি বিস্তার করে তিনিও জড়াবার চেষ্টা করছিলেন ভদ্রলোককে, ঠিক এই সময় সামনের ফুটপাথে হঠাৎ বেঁটে লোকটা আবির্ভূত হল। তাদের দুজনের দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে....মনে হল তার চোখেমুখে একটা বিদ্রূপও ফুটে উঠেছে যেন।

উকিল ভদ্রলোককে তাঁর গন্তব্যস্থানেই পৌঁছে দিয়ে পুরন্দরবাবু ভাবলেন—আঃ, কি পাপের ভোগ! ওই অপয়াটার জন্যই সব মাটি হয়ে গেল বোধ হয়। একটি কথাও বার করতে পারা গেল না! লোকটার উদ্দেশ্য কি? গোয়েন্দা নয় তো। মনে হচ্ছে পিছু নিয়েছে! কেউ লাগিয়ে দিয়েছে হয় তো....কিম্বা.....কিন্তু না, ওর চোখ মুখে একটা ব্যঙ্গ ধূর্ত হয়ে উঠেছে মনে হল যেন। কাকে ব্যঙ্গ করছে? আমাকে? চাবকে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব ব্যাটার। আজই একটা হাণ্টার কিনতে হবে। না এর বিহিত করা দরকার অবিলম্বে। কে লোকটা? জানতেই হবে, জানতেই হবে যেমন করে হোক....।

এই চতুর্থ সাক্ষাতের তিন দিন পরে উপরোক্ত হোটেলে পুরন্দরবাবু সত্যই অত্যন্ত বিচলিত এবং অভিভূত হয়ে পড়লেন। নিজের প্রবল অহঙ্কার সত্ত্বেও ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না তিনি। আগাগোড়া সমস্ত পর্যালোচনা করে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে গত পনর দিনের সমস্ত অবসাদ, সমস্ত হতাশা, সমস্ত মানসিক বিকারের একমাত্র কারণ ওই রোগা বেঁটে লোকটা! "হয়তো আমার মাথা খারাপ হয়েছে"—তাঁর মনে হল—"হয়তো তুচ্ছ একটা

জিনিসকে বড় করে দেখছি.....কিন্তু 'হয় তো'র ওপর নির্ভর করে এটাকে কল্পনা-বিলাস বলে উড়িয়ে দিয়েও তো লাভ নেই। কি সুবিধে হবে তাতে! রাস্তার যে কোন বদমাস এমনভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে আমাকে—তাহলে তো.....তাহলে তো.....

এই পঞ্চম সাক্ষাৎটি—যা এত বিচলিত করেছিল পুরন্দরবাবুকে—ওই বেঁটে লোকটির দিক থেকে বিচার করলে খুব যে আপত্তিকর তা নয়। পুরন্দরবাবুই বরং অদ্ভুত ব্যবহার করেছিলেন। বেঁটে লোকটি বিশেষ কিছু করেনি। পুরন্দরবাবুর পাশ দিয়ে একটু দ্রুতবেগে সে চলে গিয়েছিল কেবল। তাঁর দিকে তাকায়নি, তাঁকে যে সে চিনতে পেরেছে এমনও কোন ভাব প্রকাশ করে নি, বরং চোখ নীচু করে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে যথাসম্ভব দ্রুতবেগেই চলে গিয়েছিল সে। পুরন্দরবাবুই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"এই শুনছেন মশাই, পালাচ্ছেন কেন—শুনুন শুনুন—কে আপনি....'

এ রকম প্রশ্ন (বিশেষত ওই চীৎকারটা) খুবই অশোভন হয়েছিল। পুরন্দরবাবু পরে সেটা হৃদয়ঙ্গমও করেছিলেন। বেঁটে লোকটা তাঁর চীৎকার শুনে একবার ঘুরে দাঁড়াল, মনে হল যেন হকচকিয়ে গেছে, তারপর হাসল একটু; পরমুহূর্তেই মনে হল কি যেন বলতে চাইছে, দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল দু'এক সেকেণ্ড, তারপর হঠাৎ ঘুরে ছুট দিল ঊর্দ্ধশ্বাসে। পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভাবলেন—"মনে হচ্ছে ও নয় আমিই যেন গায়ে পড়ে আলাপ করতে চাইছি। আমার অদ্ভুত আচরণ থেকে তাই বোঝায় অন্তত—"

হোটেলের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লেন তিনি বালিগঞ্জের উদ্দেশ্যে। কর্পোরেশনের সেই উকিল ভদ্রলোককে ধরতে হবে যেমন করে হোক। গিয়ে দেখেন তিনি বাড়ি নেই। শুনলেন ধর্মতলায় কোথায় যেন নিমন্ত্রণ খেতে গেছেন কার জন্মতিথি উপলক্ষে। কখন ফিরবেন ঠিক নেই, রাত্রে না-ও ফিরতে পারেন। ঠিকানাটা জেনে নিলেন পুরন্দরবাবু—একবার মনে করলেন ধর্মতলায় গিয়েই ধরবেন তাঁকে। কিন্তু একটু পরেই মনে হল অনিমন্ত্রিত যাওয়াটা অনুচিত হবে সেখানে। রাগ হল ভয়ানক! গাড়িটা ছেড়ে দিলেন—শুরু করলেন হাঁটতে। শ্যামবাজার অনেক দূর—হোক দূর—হেঁটেই যাবেন তিনি। শরীরটা চালনা করা দরকার। যেমন করে হোক অনিদ্রাটা দূর করতে হবে, আজ রাত্রে অন্তত ভাল ঘুম হওয়া নিতান্ত দরকার....সমস্ত দেহ মন এমন উত্তেজিত হয়ে রয়েছে.....ক্লান্ত না হলে ঘুম আসবে না। হাঁটতে লাগলেন। বাড়ি এসে পৌছলেন রাত এগারটায় এবং সত্যিই তখন অত্যন্ত ক্লান্ত তিনি।

যে বাসাটা পুরন্দরবাবু ভাড়া করেছিলেন—যদিও অহরহ তার নানারকম খুঁত তাঁর চোখে পড়ত—যদিও তিনি রোজ অন্তত পঞ্চাশ বার বলতেন যে লক্ষ্মীছাড়া মোকদ্দমাটার জন্যে তাঁকে এই হতচ্ছাড়া বাসাটায় বাধ্য হয়ে বাস করতে হচ্ছে—বাসাটা কিন্তু নিতান্ত মন্দ ছিল না। দোতলায় খান-দুই চমৎকার ঘর—বাথরুম—তা ছাড়া আর একটি ছোট ঘর। পুরন্দরবাবু এটাকে নিজের পড়ার ঘর বানিয়েছিলেন। অর্থাৎ সেখানে একটা টেবিল, খান কয়েক চেয়ার, টেবিলের উপর খবরের কাগজ, বইপত্র ছড়ানো থাকতো। পুরন্দরবাবু যে ঘরটায় শুতেন—সেটা বেশ বড় ঘর—ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের কোণে একটা সোফা ছিল তাতেই শুতেন তিনি। ঘরের আসবাবপত্রগুলিও নেহাত খেলো নয়, যখন অবস্থা সচ্ছল ছিল তখনকার দিনের

শৌখীন জিনিসও ছিল দু'চারটে। ভালো চীনেমাটির বাসন কিছু, ব্রোঞ্জের মূর্তি কয়েকটা, ভাল একখানা কার্পেট, ভালো ছবি গোটা দুই.....কিন্তু সবই মলিন, ধূলিধূসরিত, এলোমেলো। তাঁর চাকর রামা বাড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে চারদিক আরও যেন অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। রামা ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। দারোয়ানের ভাই হরির তার বদলে কাজকর্ম করে দেওয়ার কথা। সেই আশায় তিনি যখন বাইরে যান, ঘরের চাবি দারোয়ানের কাছে রেখে যান। হরি কিন্তু মাইনেটি নেওয়া ছাড়া আর কিচ্ছু করে না। পুরন্দরবাবুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ছোঁড়ার হাতটানও আছে সম্ভবত। কিন্তু সবই তিনি সহ্য করেন—যা হয় হোক! বেশ তো আছেন একা একা! একা কিন্তু থাকারও একটা সীমা আছে। মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হত। বিশেষতঃ ঘরে ফিরে যখন দেখতেন—চতুর্দিক অপরিচ্ছন্ন, বিছানা অগোছাল, টেবিলে, চেয়ারে, ছবিতে, আয়নায় ধুলো জমে আছে।

সেদিন কিন্তু এসব কিচ্ছু হল না। জুতো, জামা খুলেই সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঘুমতে হবে....বাজে চিন্তা করে সময় নষ্ট করা হবে না....। বালিশে মাথা রাখা মাত্রই ঘুমিয়েও পড়লেন। এরকম আশ্চর্য ঘটনা গত এক মাসের মধ্যে ঘটেনি।

তিন ঘণ্টা ঘুমোলেন তিনি। গভীর ঘুম কিন্তু নয়। স্বপ্ন দেখলেন নানারকম। অদ্ভুত সব স্বপ্ন—লোকে জ্বরের ঘোরে যেমন স্বপ্ন দেখে অনেকটা তেমনি। যেন তিনি একটা দুষ্কর্ম করে লুকিয়ে আছেন—লোকে তা জানতে পেরেছে.....দলে দলে তাঁর দিকে আসছে সব। প্রকাণ্ড ভীড় জমে গেছে একটা। কিন্তু আসছে, ক্রমাগতই আসছে। ঘরের কপাট বন্ধ করা যাচ্ছে না...ভীড়ের মধ্যে তিনি কিন্তু একদৃষ্টে একটি লোককেই দেখছিলেন কেবল—তাঁর অন্তরঙ্গবন্ধু একজন, অনেকদিন আগে মারা গেছে....এ হঠাৎ এল কি করে! আর সব চেয়ে বিব্রত বোধ করছিলেন তার নাম মনে না করতে পেরে। কিছুতেই নামটা মনে পড়ছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল খুব ভালবাসতেন তাকে। সমস্ত জনতাও যেন তারই মুখের দিকে চেয়েছিল—সেই যেন ঠিক করে দেবে পুরন্দর দোষী না নির্দোষ....সবাই যেন অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। সে কিন্তু নির্বাক হয়ে টেবিলের ধারে চুপ করে বসেছিল। কিছুতেই কথা বলবে না। গোলমাল বাড়তে লাগল, অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই....সে কিন্তু নির্বাক। এ নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠল পুরন্দরবাবুর পক্ষে....তিনি উঠে ঠাস করে একটা চড় মারলেন তাকে চুপ করে থাকার জন্য। আর মেরে যেন উপভোগ করলেন সেটা। ভয় হল, দুঃখ হল, যা করলেন তার জন্যে শিউরে উঠলেন মনে মনে—কিন্তু শিহরনটাও উপভোগ করলেন যেন। উত্তেজিত হয়ে—আবার মারলেন তাকে, আর একবার, আর একবার, আর একবার.....রাগে, ক্ষোভে, আতঙ্কে যেন বুঁদ হয়ে গেলেন, শেষে উন্মাদ হয়ে উঠলেন, উন্মাদনার অন্তরালে অদ্ভুত একটা আনন্দও যেন শির শির করে বইতে লাগল শরীরের শিরা-উপশিরায় ...ক্রমাগত মেরে যেতে লাগলেন.....যেন থামতে পারছেন না। মনে হতে লাগল নিঃশেষ করে ফেলি সব—চুরমার করে ফেলি সমস্ত। হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে গেল একটা। সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে খোলা দরজাটার দিকে ছুটল কিসের প্রত্যাশায় যেন....আর সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল। তিন বার বাজল.....ঝন-ঝন ঝন-ঝন ঝন-ঝন....ঝনাৎকারের চোটে আকাশ ভেঙে পড়বে যেন। পুরন্দরবাবুর ঘুম ভেঙে গেল....তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটলেন

তিনিও। ইলেকট্রিক বেলটা স্বপ্ন নয়—তাঁর মনে হল—সত্যিই এসেছে কেউ। এমন তীক্ষ্ণ প্রবল ঝনাৎকার স্বপ্ন হতে পারে না কিছুতে....।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এটাও স্বপ্ন। দরজাটা খুললেন, সিঁড়ির কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলেন পর্যন্ত। কোথাও কেউ নেই। আশ্চর্য লাগল বটে, কিন্তু আরামও পেলেন মনে মনে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন, তারপর মনে হল কপাটে খিল দেননি। ফিরে দেখলেন একবার, না খিল দেননি, ভেজান আছে। আগেও অনেকবার রাত্রে ফিরে ঘরে খিল দিতে ভুলেছেন তিনি। কি আর হবে—থাক। ঘড়িতে আড়াইটে বাজার শব্দ হল।.....তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন তাহলে।

স্বপ্ন দেখে মনটা এমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে আর শুতে ইচ্ছে হল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। জানালার কাছে গিয়ে পরদাটা সরিয়ে দিলেন। গ্রীষ্মকালের রাত্রি শেষ হয়ে এল প্রায়—ভোরের আভাস দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নটা কিন্তু কিছুতেই তাড়াতে পারছিলেন না মন থেকে। ওই লোকটাকে তিনি যে মেরেছেন—মারা যে সম্ভব হল তাঁর পক্ষে—এই অনুভূতিটাই কষ্ট দিচ্ছিল তাঁকে। কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না।

"ও রকম লোক নেই, কেউ ছিল না, থাকতে পারে না—ওটা শুধু স্বপ্ন। কেন মাথা ঘামাচ্ছি এ নিয়ে!"

যতই নিজেকে বোঝাতে লাগলেন ততই উত্তেজনা বাড়তে লাগল, ততই যেন মনে হতে লাগল তাঁর সমস্ত কষ্টের মূল কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয়....আসন্ন একটা বিপদ যেন ঘনিয়ে আসছে।

ক্রমশ বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়ে পড়ছেন এ কথা ভাবলে কষ্ট হত তাঁর। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেলে নিজেকে আরও কষ্ট দেবার জন্য নিজের বার্ধক্য এবং দৌর্বল্যকেই বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতেন তিনি।

"জরা"--মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলেন তিনি—"হ্যাঁ জরাই। জরা ছাড়া আর কি। শরীরে শক্তি নেই—স্মরণ শক্তিও নেই...তা ছাড়া ভূত দেখছি.....অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখছি.....স্বপ্নে ঘণ্টা বাজছে! চুলোয় যাক....চুলোয় যাক....একটা অসুখ করবে আর কি....অসুখেরই পূর্বলক্ষণ এ সব। ওই বেঁটে লোকটাও স্বপ্ন সম্ভবত কাল যা ভাবছিলাম, আমিই তার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি, সে কিছু করেনি....সবই আমার সৃষ্টি। নিজেই ভূত সৃষ্টি করছি, নিজেই তার ভয়ে টেবিলের তলায় লুকোচ্ছি। আশ্চর্য—তার ওপর রাগই বা হচ্ছে কেন, ছোটলোকই বা বলছি কেন তাকে মিছিমিছি! হয় তো খুবই ভদ্রলোক সে আসলে। দেখতে ভালো নয়। বেঁটে—তাতে হয়েছে কি.....পোশাক-পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের মতই। কিন্তু লোকটার চোখের দৃষ্টিতে কি যেন একটা আছে....ওই, আবার শুরু করেছি। তার কথা বার বার ভাববার দরকার কি। তার চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তা আবিষ্কার করে কি হবে আমার ঘোড়ার ডিম! ও ছাড়া কি আর ভাববার কিছু নেই!...."

হঠাৎ একটা কথা ভেবে মনের ভেতরটা খচ্ খচ্ করতে লাগল। হঠাৎ তাঁর বিশ্বাস হল ওই বেঁটে লোকটা তাঁর পূর্বপরিচিত—শুধু পূর্বপরিচিত নয়, তাঁর জীবনের কোন গোপন কথা জানা আছে ওর, তাই দেখা হলেই চোখে ওই দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

জানালাটা ভালো করে খুলে দেবার জন্যে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভাবলেন বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকুক একটু, আর—হঠাৎ আপাদমস্তক শিউরে উঠল তাঁর.....মনে হল অসম্ভব একটা ব্যাপার চোখের সামনে ঘটছে যেন।

জানালাটা তখনও ভালো করে খোলেননি তিনি। চট্ করে সরে এসে জানালার একধারে লুকিয়ে পড়লেন। ঠিক জানালার সামনে ওদিকের শূন্য ফুটপাথে সেই বেঁটে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর জানালার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পায়নি বোধ হয় তাঁকে, ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছে কি যেন....ভাবছে কিন্তু ঠিক করতে পারছে না....হাতটা তুলে কপালে বুলিয়ে নিলে একবার। আর দ্বিধা রইল না....ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে একবার, তারপর চোরের মতো পা টিপে টিপে রাস্তাটা পার হতে লাগল। হ্যাঁ, এই বাড়িতেই ঢুকছে। গলিটার দিকে গেল.....

"আমার কাছেই আসছে"—চকিতে মনে হল পুরন্দরবাবুর এবং তিনিও পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন। ভেজান দরজাটার সামনে স্তব্ধ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন....সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাবে এখনই।

বুকের ভিতর এমন কাঁপছিল। লোকটা পা টিপে টিপে যদি আসে কোন শব্দই শুনতে পাবেন না হয়তো। কি যে হচ্ছিল তা যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারছিলেন না একটুও, কিন্তু শতগুণ অনুভব করছিলেন সমস্ত সত্তা দিয়েই। স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হচ্ছে। পুরন্দরবাবু সাহসী লোক। অনেক সময় অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি—লোকের কাছে বাহাদুরি পাওয়ার জন্যে নয়—নিজেকে পরীক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু এখন যা হল তাতে সাহস ছাড়া আরও কিছু ছিল। যিনি একটু আগে স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছিলেন তিনি সহসা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। অন্য লোক যেন! একটা নীরব অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বদ্ধ দ্বারের ভিতর দিয়েই তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন।

"ওই আসছে, এসে পড়ল, চারিদিকে চেয়ে দেখছে, কান পেতে শুনছে কি যেন দম বন্ধ করে—উঠছে এইবার....ওই। কপাটের কড়াতে হাত দিয়েছে....."

তিনি যা ভাবছিলেন ঠিক তাই হয়েছিল; দরজার ওপারে সত্যিই একজন দাঁড়িয়েছিল এসে, কড়াতে হাতও দিয়েছিল নিঃশব্দে। পুরন্দরবাবু আর থাকতে পারলেন না, কেমন যেন অদ্ভুত উন্মাদনা একটা পেয়ে বসল তাঁকে। হঠাৎ কপাটটি খুলে ফেললেন। সেই বেঁটে লোকটা দাঁড়িয়েছিল।

নির্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল আরও খানিকক্ষণ নিস্পন্দভাবে। হঠাৎ পুরন্দরবাবু তাকে চিনতে পারলেন। সে-ও যেন বুঝতে পারলে যে পুরন্দরবাবু তাকে চিনেছেন। তার চোখের দৃষ্টি থেকেই বোঝা গেল তা। হঠাৎ সুমিষ্ট হাসিতে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার।

"পুরন্দরবাবু আশা করি চিনতে পেরেছেন আমাকে"—গাঢ়কণ্ঠে অত্যন্ত আবেগভরে কথাগুলো বলল সে। কেমন যেন খাপছাড়া শোনাল।

"যুগল পালিত না কি"—

পুরন্দরবাবুও একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

"ন'বছর আগে বর্ধমানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই হয়েছিল, মনে আছে আশা করি আপনার"—

"হ্যাঁ....নিশ্চয়। কিন্তু এখন রাত তিনটে। আপনি আমার বন্ধ দরজার সামনে দশ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কড়ায় হাত দিয়ে, এর মানেটা বুঝতে পারছি না ঠিক—"

"রাত তিনটে! বলেন কি"—পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে যুগল শুধু বিস্মিত নয় একটু আহত হল যেন—"তাই তো, তিনটেই দেখছি। আমায় মাপ করুন পুরন্দরবাবু, সিঁড়িতে ওঠবার আগে ঘড়িটা আমার দেখা উচিত ছিল। বড় লজ্জিত হলাম, আবার একদিন আসব তখন বলব সব, দু'একদিনের মধ্যেই আসব, এখন যাই।"

"সব বলতেই যদি চান এখনই বলুন"—পুরন্দরবাবু তার হাত ধরলেন—"আসুন, ভিতরে আসুন। ভিতরে আসবারই ইচ্ছে ছিল নিশ্চয় আপনার, তা না হলে এত রাত্রে শুধু শুধু এত কষ্ট করে এলেন কেন? কিছু একটা উদ্দেশ্য ছিলই—বলুন কি সেটা—"

তিনি উত্তেজিতও হয়েছিলেন, হতাশও হয়েছিলেন, ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছিলেন না। একটু লজ্জাও করছিল.....রহস্য, বিপদ কিছুই তো নয়। কল্পনায় যেটাকে বিভীষিকাময় করে তুলেছিলেন একটু আগে তা কিছুই নয়—নিরীহ যুগল পালিতে পরিণত হল শেষ পর্যন্ত! কিন্তু না, এত সরল নয় ব্যাপারটা। একটা অস্পষ্ট আশঙ্কার হাত এড়াতে পারছিলেন না তিনি।

যুগল পালিতকে ইজিচেয়ারে বসিয়ে, পাশেই বিছানায় গিয়ে বসলেন তিনি। দুই হাঁটুর উপর হাত রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসলেন। লোকটা কি বলে শোনাই যাক। আপাদমস্তক ভালো করে দেখলেন আর একবার। ভালো করে মনে পড়ল সব। যুগল পালিত কিন্তু চুপ করে বসে রইল। একটি কথাও বলে না। ন্যায়ত সে যে তার অদ্ভুত আচরণের জবাবদিহি করতে বাধ্য একথা যেন তার মাথাতেই আসছে না। বরং সে এমনভাবে পুরন্দরবাবুর দিকে চাইতে লাগল যেন পুরন্দরবাবুই কিছু বলবেন। হয়তো ভয় পেয়েছিল। ফাঁদে পড়লে ইঁদুর যেমন হকচকিয়ে যায় তেমনি হয়েছিল হয়তো। পুরন্দরবাবু কিন্তু রেগে উঠলেন।

"এরকম করার মানেটা কি! আপনি ভূতও নন স্বপ্নও নিশ্চয়, মতলবটা কি খুলেই বলুন না—"

যুগল পালিত উসখুস করতে লাগল। তারপর একটু মুচকি হেসে একটু থেমে থেমে বলল—"আমি যতদূর বুঝতে পারছি তাতে এ সময়ে এবং এভাবে আসাটা অদ্ভুতই মনে হচ্ছে আপনার....যদিও অতীতের কথা মনে করলে, কি ভাবে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল তা ভাবলে....এটা অবশ্য ঠিক এ সময়ে আসব ভাবিনি আমি....পাকেচক্রে হয়ে গেল.....।"

"পাকেচক্রে মানে! জানালা দিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখলাম যে আপনি পা টিপে টিপে আমার ঘরের দিকে চাইতে চাইতে রাস্তাটি পার হলেন।"

"ও, আপনি দেখেছিলেন তাহলে! তাহলে আপনিই তো আমার চেয়ে বেশী জানেন। কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করছি বোধ হয়....দেখুন তিন হপ্তা আগে আমি এখানে এসেছি, নিজের একটা কাজে। আমি যুগল পালিত আপনি তো জানেনই, চিনতেই তো পারলেন। আমি এখানে এসেছি চাকরির তদ্বির করতে। বদলি হতে চাই আমি। খুব ভালো পোস্ট খালি হয়েছে একটা, ঢের বেশী মাইনে....কিন্তু সে চাকরি এখানে নয় যেখানে ছিলাম সেখানেও নয়,

যদিও....মোট কথা আসল ব্যাপারটা হচ্ছে—গত তিন সপ্তাহ ধরে এই কোলকাতা শহরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কাজটা ওজুহাত মাত্র, ঘুরে বেড়াচ্ছি এইটেই আসল কথা।—চাকরিটা যদি হয়ও খুব যে ধন্য হয়ে যাব তা নয়, তখনও হয়তো এমনি ভাবে ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায় এখন যেমন ঘুরছি। জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছি পুরন্দরবাবু। আর দেখুন হারিয়ে ফেলেছি বলে খুশীই হয়েছি মনে হচ্ছে—মানে আমার যা মনে হচ্ছে তাই বলছি আপনাকে—এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে হয়তো, মাপ করবেন—"

"কি রকম মনে হচ্ছে?" পুরন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

যুগল পালিত নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে, তারপর গাঢ়স্বরে বলল, "সে আর নেই—"

পরন্দরবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ তাঁর কান দুটো গরম হয়ে উঠল, বুকের ভিতরটা মুচড়ে দিলে কে যেন।

"কে! মিসেস্ পালিত?"

"হ্যাঁ। অপর্ণা গত ফাল্গুন মাসে মারা গেছে.....যক্ষ্মা হয়েছিল। দু'তিন মাস ভোগবার পর হঠাৎ বাড়াবাড়ি হল একদিন। আমাকে ফেলে চলে গেল। কি অবস্থায় ফেলে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন।"

হতাশা-ব্যঞ্জক ভঙ্গীতে যুগল পালিত নিজের বাহুযুগলকে দুধারে প্রসারিত করে মাথাটা নীচু করে রইল। পুরন্দরবাবু দেখলেন টাক পড়েছে লোকটার।

যুগলবাবুর কথা শুনে এবং ভাব-ভঙ্গী দেখে পুরন্দরবাবু যেন চাঙ্গা হলেন খানিকটা। একটা শ্লেষতিক্ত নির্মম হাসির আভাসও যেন খেলে গেল ঠোঁটে....কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। যে মহিলাটির মৃত্যুসংবাদ এইমাত্র শুনলেন তাকে অনেকদিন আগে তিনি চিনতেন, অনেকদিন আগে ভুলেও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে এতটা বিচলিত হয়ে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

"তাই না কি!....আমাকে এতদিন খবরটা দেননি কেন? দেওয়া উচিত ছিল। সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে না—"

"আপনার সহানুভূতির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সহানুভূতি যে মেকি নয় তাও জানি। যদিও...."

"যদিও?"

"যদিও আপনার সঙ্গে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছে—কিন্তু আপনি আমার দুঃখে এ রকম বিচলিত হলেন কি করে যে, বিশ্বাস করুন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভাষা পাচ্ছি না। অন্য বন্ধুদের সম্বন্ধেও আমার ওই এক কথা—ভাষা পাচ্ছি না—এই তো এখানেই পূর্ণ গাঙ্গুলী রয়েছেন—অকৃত্রিম বন্ধু একজন। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয়—আমি বন্ধুত্বই বলি সেটাকে, আমার স্পর্ধা মাপ করবেন—আপনার সঙ্গে পরিচয় ন'বছর আগে, তারপর যদিও আপনি আর যাননি আমাদের কাছে, চিঠিপত্রও লেখেননি...."

লোকটা সুর করে গান গাইছে যেন। আর সর্বদা চোখ নীচু করে মাটির দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। সব লক্ষ্য করে চলেছে।

পুরন্দরবাবু ইতিমধ্যে একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। সকৌতুকে এবং সবিস্ময়ে যুগল

পালিতকে লক্ষ্য করছিলেন তিনি। তার সব কথা শুনছিলেন। হঠাৎ সে যখন থেমে গেল তখন অসংলগ্ন কয়েকটা কথা তাঁর মনে হল।

"আচ্ছা, এর আগে আপনাকে চিনতে পারিনি কেন বলুন তো!"—হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—রগের শিরাগুলো দপ দপ করে উঠল তাঁর—"অন্তত পাঁচবার রাস্তায় দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে ইতিপূর্বে"—

"হ্যাঁ; আমারও মনে আছে তা। আপনার সঙ্গে কয়েকবারই দেখা হয়েছিল—দু'বার, কিম্বা তিনবার বোধ হয় আপনি এসে পড়েছিলেন আমার সামনে"—

"আপনিই এসে পড়েছিলেন বলুন। আমি একবারও যাইনি ইচ্ছে করে—"

পুরন্দরবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠলেন। যুগল পালিত থেমে গেল, পুরন্দরবাবুর দিকে এক নজর চেয়ে বলল—"আমাকে চিনতে না পারার ঢের কারণ আছে। প্রথমত হয়তো আমাকে ভুলেই গিয়েছিলেন, ভুলে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়....তা ছাড়া আমার বসন্ত হয়েছিল, মুখে দাগ হয়ে গেছে...."

"ও! বসন্ত হয়েছিল নাকি! বসন্ত কি করে—"

"বাগালাম? আরও কত কি হতে পারত। কিছু কি বলা যায় মশায়! অদৃষ্ট মন্দ হলে সবই হতে পারে—"

"তা বটে, তা বটে। বলুন কি বলছিলেন—"

"আমিও অবশ্য আপনাকে দেখেছিলাম রাস্তায়—"

"আচ্ছা—আপনি হঠাৎ 'বাগালাম' বললেন কেন! আমি কথাটা ঠিক ও রকম ভাবে বলতে চাইনি। আচ্ছা থাক ও কথা, যা বলছিলেন বলুন—" তাঁর মনে যেন প্রসন্নতা ফিরে আসছিল। ধাক্কাটা সামলে নিয়েছিলেন। উঠে পায়চারি করতে শুরু করলেন।

"যদিও আমি আপনাকে রাস্তায় দেখেছিলাম, কোলকাতায় আসবার সময়ই যদিও আমি ভেবেছিলাম যে আপনার সঙ্গে দেখা করব—কিন্তু সত্যি কথা বলছি, মনটা এমন ভেঙে গেছে....ফাল্গুন মাস থেকে বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সত্যি বলছি—"

"ও—কি বললেন—চুরমার হয়ে গেছে? আচ্ছা এক মিনিট—সিগারেট খান আপনি কি...."

"আপনি তো জানেন, আগে অপর্ণা যখন বেঁচেছিলেন তখন আমি...."

"হ্যাঁ, আগে তো খেতেন। ফাল্গুনের পর থেকে ছেড়ে দিয়েছেন বুঝি?"

"এক আধটা খাই কখনও কখনও।"

"নিন তাহলে একটা। এই যে দেশলাই—ধরিয়ে নিন। তারপর বলুন—বলে যান—এ যে অত্যন্ত, মানে—"

পুরন্দরবাবু নিজেও একটা সিগারেট ধরলেন এবং বিছানার উপর বসলেন।

যুগল পালিত চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

"আপনি বড় বিচলিত হয়েছেন মনে হচ্ছে। আপনার শরীর ভালো আছে তো?"

"চুলোয় যাক আমার শরীর"—হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন পুরন্দরবাবু—"আপনি বলে যান—"

যুগল পালিত পুরন্দরবাবুকে বিচলিত হতে দেখে একটু যেন খুশী হল। আত্মপ্রত্যয় যেন বেড়ে গেল তার।

"কিন্তু বলবার আর কি আছে? ভেবে দেখুন, আমার সমস্ত জীবনই নষ্ট হয়ে গেল—মানে সমূলে নষ্ট হয়ে গেল। কবিত্ব নয়, ভেবে দেখুন, কুড়ি বছর বিবাহিত জীবন যাপন করবার পর উদ্দেশ্যহীন হয়ে এ ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো—কোলকাতা শহর নয়—মনে হচ্ছে যেন একটা অরণ্য। সব যেন গুলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল—সব শূন্য। শূন্যতাটাই পেয়ে বসেছে যেন আমাকে। এ অবস্থায় কোন চেনাশোনা লোকের সঙ্গে, এমন কি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে পাশ কাটিয়ে সরে পড়াটাই স্বাভাবিক। অন্য সময় আবার অন্য রকম হয়—সব মনে পড়ে যায়, সকলের সঙ্গ পেতে ইচ্ছে করে, বিশেষ করে যে সময়ে চিরকালের জন্য চলে গেছে সেই সময় যারা ছিল তাদের সঙ্গ।.....মাঝে মাঝে এত ইচ্ছে করে সেই অতীতকে ফিরে পেতে, সেই অতীতের যারা সাক্ষী ছিল তাদের কাছে যেতে....বুকের ভিতরটা এমন করতে থাকে যে তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। রাত দুপুরেও—হ্যাঁ, অন্যায় জেনেও রাত দুপুরেও বন্ধুর কাছে যেতে তখন বাধে না....রাত তিনটের সময় তার ঘুম ভাঙিয়েও তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে ইচ্ছে করে....সময়টা অবশ্য ঠিক করতে পারিনি....সে বিষয়ে ভুল হয়েছে আমার.....কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব বিষয়ে ভুল করিনি আমি। এই যে আপনার সঙ্গে কথা কইছি এইতো যথেষ্ট, এইতেই সমস্ত ক্ষতিপূরণ হয়েছে বলে মনে করি। সত্যি আমি ভেবেছিলাম বড় জোর বারোটা বেজেছে.....এখনও আমার বারোটার বেশী মনে হচ্ছে না। দুঃখের নেশায় বুঁদ হয়ে গেছি, বুঝলেন—দিগ্বিদিক জ্ঞান আর নেই। ঠিক দুঃখও নয়, বুঝলেন....জিনিসটার অভিনবত্ব বিহ্বল করে তুলেছে আমাকে—"

পুরন্দরবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে পড়েছিলেন, কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল তাঁকে। বিষণ্ণ কণ্ঠেই তিনি বললেন—"ভারী অদ্ভুত তো—"

"সত্যিই অদ্ভুত হয়ে গেছি আমি যে—"

"ঠাট্টা করছেন না আশা করি—"

"ঠাট্টা!" শুধু বিস্ময় নয়, যুগল পালিতের চোখের দৃষ্টিতে বেদনাও ঘনিয়ে এল—"এ কি ঠাট্টা করবার বিষয়! যার মৃত্যুর কথা বলছি—"

"থাক—ও কথা আর বলবেন না—"

পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন এবং আবার পায়চারি শুরু করলেন।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। যুগল পালিত যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই পুরন্দরবাবু প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—"যাবেন না, বসুন, বসুন, বসুন—"

বাধ্য বালকের মতো যুগল বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। পুরন্দরবাবু হঠাৎ তার সামনে থেমে বললেন—"সত্যি, আপনার কি ভীষণ পরিবর্তন হয়েছে—"

যেন পরিবর্তনটা হঠাৎ এখনই চোখে পড়ল তাঁর।

"ভয়ানক পরিবর্তন হয়েছে। অসাধারণ। অন্য লোক হয়ে গেছেন একেবারে—"

"তা আর বিচিত্র কি। ন'বছরে—"

"না ফাল্গুন থেকে?"

"হি হি"—হাসি চেপে যুগল পালিত বললে—"না, তা নয়। আচ্ছা, জিগ্যেস করতে পারি কি—ঠিক কি পরিবর্তনটা দেখছেন আমার—"

"একথা জিগ্যেস করছেন আপনি! যে যুগল পালিতকে আমি জানতাম তিনি বেশ শক্ত সমর্থ শৌখীন লোক ছিলেন, বেশ বুদ্ধিমান.....এখন যাঁকে দেখছি তাঁকে তো মনে হচ্ছে একটা ভাঁড় মাত্র।"

পুরন্দরবাবু বিরক্তির সেই সীমায় উপনীত হয়েছিলেন যে সীমায় গম্ভীর লোকেরও রসনার রাশ টেনে রাখা শক্ত হয়।

"ভাঁড়? তাই আপনার মনে হচ্ছে? এখন আর বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে না আমাকে? সত্যি?"

যুগল পালিতের মুখে ব্যঙ্গ-দীপ্ত হাসি ফুটে উঠল একটা। মনে হল কি একটা যেন মনে মনে উপভোগ করছেন তিনি।

"বুদ্ধিমান? না,—তবে চতুর মনে হচ্ছে বটে--মানে অতি-চতুর—" বলেই পুরন্দরবাবু ভাবলেন মনে মনে, "অশিষ্টতা হচ্ছে....কিন্তু এ লোকটাও কম অশিষ্ট নয় কি....রাতদুপুরে এমন—তা ছাড়া এর উদ্দেশ্যই বা কি.....

"ছি ছি কি বলছেন পুরন্দরবাবু, আপনি হলেন পুরানো বন্ধু একজন"—যুগল পালিতের চোখে মনে নিখুঁত আন্তরিকতা ফুটে উঠল যেন—চেয়ারে ঘুরে বসল সে।

"কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলুন তো! আমরা কি এখন পৃথিবীতে আছি? সামাজিক গণ্ডী কি এখন বেঁধে রেখেছে আমাদের? আমরা দুজন বন্ধু, অনেক দিনের পুরানো বন্ধু, বহুকাল পরে একসঙ্গে মিলেছি, মন খুলে কথা বলছি, আমাদের অমূল্য বন্ধুত্বের যে প্রাণ-স্বরূপ ছিল তার কথাই স্মরণ করছি।"

কথা বলতে বলতে অভিভূত হয়ে পড়ল সে। মাথা নীচু করে দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। পুরন্দরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে। তাঁর সমস্ত চিত্ত ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। কেমন যেন একটা অস্বস্তিও ভোগ করতে লাগলেন তিনি।

"হয়ত ভাঁড় ছাড়া আর কিছু নয়"—আবার মনে হল তাঁর—"কিন্তু না মদ খায়নি তো? না—তাও নয়! কিছু বিচিত্র নয় অবশ্য। মুখটা লাল হয়ে আছে বেশ। মদও যদি খেয়ে থাকে—ব্যাপার একই দাঁড়াচ্ছে। ওর উদ্দেশ্যটা কি? কি চায় ও?"

"মনে আছে আপনার, মনে আছে"—হঠাৎ মুখ থেকে হাত সরিয়ে যুগল পালিত আবার শুরু করলে.....''সেই যে আমরা একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম মহিম মল্লিকদের জমিদারিতে—সেই বাচ খেলা. হৈ হৈ করা, গান হুল্লোড়—সন্ধ্যের সময় সেই যে আপনি রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ে শোনাতেন—নিরুদ্দেশ যাত্রা 'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি' মনে আছে সে সব? আপনার সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপের কথাটা মনে আছে? আপনি কি একটা বৈষয়িক দরকারে এসেছিলেন আমার কাছে....বসবার ঘরে আপনার সঙ্গে আলাপ করছিলাম আমি—অর্পণা এসে ঢুকল—ব্যাস্—ঠিক তার দশ মিনিটের মধ্যেই আপনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন। সমস্ত পরিবারের বন্ধু হয়ে গেলেন, আর সত্যিকারের বন্ধু। ঠিক এক বৎসর অন্তরঙ্গতাটা বজায় ছিল—ঠিক এক বছর—রবি ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদার অর্জুনের মতো—"

পুরন্দরবাবু মাটির দিকে চেয়ে পদচারণ করছিলেন ধীরে ধীরে। অধীর চিত্তে শুনছিলেন—সমস্ত মন ঘৃণায় ভরে উঠছিল—তবু শুনছিলেন—হ্যাঁ, বেশ মন দিয়েই শুনছিলেন।

"অর্জুন চিত্রাঙ্গদার কথা আমার কখনও মনে হয় না তো" অপ্রতিভভাবে হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি, "তাছাড়া আপনি অমন চীৎকার করে কথা বলছিলেন কেন, আগে তো আপনি অত চেঁচাতেন না....এমন অস্বাভাবিক ভাষাও ব্যবহার করতেন না। এমন করবার মানেটা কি—"

"হ্যাঁ, আগে আমি কথা কম কইতাম, মানে গম্ভীর ছিলাম"—যুগল পালিত বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—"আগে আমি কথা শুনতেই ভালবাসতাম। সে বলত আমি শুনতাম। আপনার মনে আছে বোধ হয় কি সুন্দর কথা বলত সে—কি চমৎকার রস দিয়ে দিয়ে। আর চিত্রাঙ্গদার কথা আপনি যা বলছেন তা ঠিক—আপনার মনে থাকবার কথা নয়—আমাদেরই মনে হয়েছিল, তা নিয়ে আলোচনাও করেছিলাম, কিন্তু আপনি চলে আসবার পর। অর্জুন যেমন হঠাৎ এল হঠাৎ চলে গেল...."

"কি অর্জুন অর্জুন করছেন" পুরন্দরবাবু মাটিতে পা ঠুকে ধমকে উঠলেন। তাঁর মনে এমন একটা বিশ্রী স্মৃতি জাগছিল!

"আমাদের কিন্তু মনে হয়েছিল অর্জুনের কথা" অতিশয় মধুমাখা কণ্ঠে যুগল পালিত আবার বললে, "বিশেষ করে পূর্ণবাবু যখন এলেন—আপনি যেভাবে এসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই এলেন। তিনি পাঁচ বচ্ছর ছিলেন।"

"পূর্ণবাবু? মানে? পূর্ণবাবু কে?"

পুরন্দরবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত শরীরটা জমে গেল যেন।

"পূর্ণচন্দ্র গাঙ্গুলী। আপনি চলে আসবার এক বচ্ছর পরে তিনিও কৃপা করে আমাদের সাহচর্য দান করেছিলেন ঠিক আপনারই মতো"—

"ও হ্যাঁ—ঠিক তো—মনে পড়ছে"—পুরন্দরবাবু আত্মসম্বরণ করে বললেন, "পূর্ণবাবু! ঠিক—তিনি তো বদলি হয়ে গিয়েছিলেন ওখানে"—

"হ্যাঁ, বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। কমিশনার সাহেবের অফিসে। এখান থেকেই গিয়েছিলেন। চমৎকার লোক, ভাল বংশের ছেলে—"

যুগল পালিত যেন গদগদ হয়ে পড়লেন একেবারে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু কি ভাবছিলাম—ও—হ্যাঁ তিনিও তো...."

"হ্যাঁ তিনিও, তিনিও—" পুরন্দনবাবু অসতর্ক মুহূর্তে যে কথাটা বলে ফেলেছিলেন যুগল পালিত সোল্লাসে তাই পুনরাবৃত্তি করল....'হ্যাঁ তিনিও। তিনি থাকতে আমরা চিত্রাঙ্গদাটা অভিনয়ও করেছিলাম একবার। আমাকে কিন্তু অর্জুনের ভূমিকায় নামতে দেয়নি—অপর্ণাই দেয়নি—"

"কি মুশকিল! আপনার অর্জুন হবার যোগ্যতা কোথায়—আপনি হলেন নিখাদ যুগল পালিত"—বিরক্তিভরে রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন পুরন্দরবাবু—রাগে বিরক্তিতে কাঁপছিলেন তিনি "ক্ষমা করবেন....ও পূর্ণবাবু—পূর্ণবাবু তো এখানেই আছেন—তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল আমার। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন না। যান নি সেখানে?"

"গেছি বই কি। গত পনের দিন থেকে প্রত্যহ যাচ্ছি। কিন্তু দেখা হচ্ছে না। আমাকে ঢুকতেই দিচ্ছে না কেউ। তাঁর অসুখ, শোনা কথা নয়, নিজে গিয়ে খোঁজ করে জেনেছি তাঁর

অসুখ। শক্ত অসুখ। ছ'বছরের বন্ধু। উঃ—সত্যি বলছি পুরন্দরবাবু, মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে ভগবতী বসুন্ধরে দ্বিধা হও—সত্যি বলছি। আবার মাঝে মাঝে অতীতটাকে আঁকড়ে ধরতেও ইচ্ছে করে—অতীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা ছিল সবাইকে—আবার কখনও কাঁদতে ইচ্ছে হয়, অন্য কোন কারণে নয়, কেবল খানিকটা হালকা হবার জন্য....."

"আচ্ছা, আজ তাহলে আসুন। আজকের মতো অন্তত যথেষ্ট হয়েছে—কি বলেন?"

পুরন্দরবাবু হঠাৎ বলে বসলেন।

"যথেষ্ট, যথেষ্ট"—যুগল পালিত উঠে দাঁড়াল—"চারটে বাজে, স্বার্থপরের মতো আপনাকে এভাবে....ছি ছি...."

"শুনুন, আমি গিয়ে দেখা করব আপনার সঙ্গে এর পরে। তারপর আশা করি—আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, সত্যি করে বলুন, আপনি কি মদ খেয়েছেন?"

"মদ? মোটেই না"—

"এখানে আসবার ঠিক আগে, কিম্বা তারও আগে মদ খাননি আপনি?"

"আপনাকে বড্ড অসুস্থ দেখাচ্ছে পুরন্দরবাবু। আপনার জ্বর হয়নি তো—"

"না কিছু হয়নি। কাল দেখা করব আপনার সঙ্গে একটা নাগাদ"—

"এসে পর্যন্ত আমি লক্ষ্য করছি আপনি কেমন যেন প্রকৃতিস্থ নন"—উপভোগ করতে করতে কথাগুলো বললে যুগল পালিত—"সত্যি বড় খারাপ লাগছে আমার, বিবেক দংশন করছে। এরকম সময়ে এসে আপনাকে....আমি যাচ্ছি—শুয়ে পড়ুন আপনি, ঘুমুন একটু—"

"শুনুন, আপনার ঠিকানাটা কি?"

"৭২, বহুবাজার স্ট্রিট—"

"ও আচ্ছা। যাব আমি—"

"নিশ্চয়। কৃতার্থ হব তাহলে—"

যুগল পালিত সিঁড়ি দিয়ে নামছিল।

"শুনুন"—পুরন্দরবাবু ডাকলেন আবার—"ঠিকানা বদলে ফেলবেন না তো..."

"ঠিকানা বদলে ফেলব মানে? কি যে বলেন?"

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়েই ঘাড় ফিরিয়ে হাসি গোপন করলে যুগল পালিত।

কোন উত্তর না দিয়ে দড়াম করে কপাটটা বন্ধ করে দিলেন পুরন্দরবাবু। খিল দিলেন। তালা লাগালেন। জানালার কাছে গিয়ে থু থু করে অনেকবার থুতু ফেললেন, মুখের ভিতর কেমন অশুচিতা অনুভব করছিলেন যেন একটা। নিস্পন্দ হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিট পাঁচেক। তারপর হঠাৎ গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন আবার।

।। তিন।।

প্রগাঢ় নিদ্রার পর বেলা সাড়ে ন'টার সময় উঠলেন তিনি। মুহূর্তেই সব মনে পড়ে গেল।

বিছানায় উঠে বসলেন! অপর্ণার মৃত্যুর কথাই মনে হতে লাগল। কাল রাত্রে আকস্মিক মৃত্যুসংবাদটা সমস্ত ওলটপালট করে দিয়েছে, অতিশয় বেদনাময় অনুভূতি রেখে গেছে একটা সারা বুক জুড়ে। যুগল পালিত যতক্ষণ ছিল বেদনাটা ঢাকা ছিল। এখন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। শুধু তাই নয়, ন'বছর আগে যা যা ঘটেছিল মানসপটে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে সব।

এই মহিলাটিকে, যুগল পালিতের স্ত্রী এই অপর্ণা পালিতকে, তিনি একদিন ভালোবেসেছিলেন। যতদিন বর্ধমানে ছিলেন, ততদিন তার প্রণয়ী ছিলেন তিনি। বর্ধমানে তিনি গিয়েছিলেন নিজের কাজে—সে-ও এক মোকদ্দমার ব্যাপার। কিন্তু সেজন্য পুরো এক বছর বাড়ি ভাড়া করে সেখানে না থাকলেও চলত। প্রণয়-ব্যাপারের জন্যেই অতদিন থেকে গিয়েছিলেন। সত্যিই বড্ড জড়িয়ে পড়েছিলেন। অপর্ণা তাঁকে যেন যাদু করেছিল। যেন ভর করেছিল তাঁর উপর। এই মেয়েটার সামান্য খেয়াল মেটাবার জন্যে না করতে পারতেন হেন কাজ ছিল না।

বস্তুত তার পূর্বে এ রকম অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি তাঁর। তীব্র উন্মাদনার আস্বাদ সেই তাঁর জীবনে প্রথম। এক বৎসর পরে বিচ্ছেদ যখন আসন্ন হয়ে এল, (যদিও সে বিচ্ছেদ দীর্ঘ হবে না এই আশা তিনি তখন করেছিলেন)—সত্যিই যাবার সময় ঘনিয়ে এল যখন, তখন এমন অধীর হয়ে পড়েছিলেন যে অপর্ণাকে হরণ করবার কথাও মনে হয়েছিল তাঁর। তাকে সে কথা বলেও ছিলেন—স্বামীকে ছেড়ে, ঘর-সংসার ছেড়ে, সমাজকে তুচ্ছ করে তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাবার কথাও পেড়েছিলেন—হ্যাঁ, সনির্বন্ধ অনুরোধই করেছিলেন—বেশ মনে পড়ছে। যদিও অপর্ণা প্রথমটা নিমরাজি হয়েছিল (হয় তো সংসারের একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে, হয় তো অভিনবত্বের আশায়) কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বেঁকে দাঁড়াল। সে আপত্তি করল বলেই পুরন্দরবাবুকে একা বর্ধমান ত্যাগ করতে হল। তা না হলে পুরন্দরবাবু তাকে নিয়েই আসতেন! কেউ তাঁর গতিরোধ করতে পারত না। অপর্ণাই তাঁকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করেছিল।

কোলকাতায় ফিরেই কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই তাঁর মনে হত—বারবার মনে হত—সত্যিই কি অপর্ণাকে ভালোবেসেছিলেন তিনি? এ প্রশ্নের কিন্তু কোন সদুত্তর মিলত না। ভালোবাসা? না, মোহ? ঠিক করতে পারেননি কিছু। আজও পারেননি। কোলকাতায় ফিরে নূতন কোন প্রেমের প্রভাবে পড়ে যে একথা মনে হত তা নয়। যদিও ফিরে এসেই তিনি দলে মিশে রামবাগান, সোনাগাছি চষে বেড়িয়েছিলেন রীতিমত কিন্তু সেই প্রথম দু'মাস তাঁর সমস্ত মন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়েছিল। কোন মেয়েমানুষই চোখে লাগেনি, কেউ মনে দাগ কাটতে পারেনি। অপর্ণার প্রতি তাঁর মনোভাব ভালবাসা না মোহ, এ প্রশ্ন মনে বারম্বার জাগলেও এটা তিনি ঠিক জানতেন যে, আবার কোনক্রমে যদি বর্ধমান গিয়ে পড়েন তাহলে অপর্ণারই মায়াপাশে আবার গিয়ে ধরা দেবেন, অসঙ্কোচে, কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। পাঁচ বৎসর পরেও তাঁর এ বিশ্বাস বদলায়নি। পাঁচ বৎসর পরে একথা স্বীকার করতে কিন্তু লজ্জা হত তাঁর, সমস্ত অন্তর আত্ম-ধিক্কারে ভরে উঠত, অপর্ণার উপরও ঘৃণা হত, সত্যটা কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারতেন না। বর্ধমানের ব্যাপারটা ভেবে মাঝে মাঝে আশ্চর্যও লাগত খুব। তিনি পুরন্দর রায়চৌধুরী কি করে এমন একটা খপ্পরে পড়লেন! প্রেম? অসম্ভব। লজ্জায় দুঃখে আত্মগ্লানিতে চোখে জলও এসে পড়েছে। হ্যাঁ জল। আরও কিছুদিন পরে অনেকটা শান্ত হয়েছিলেন অবশ্য।

প্রাণপণে ভুলতে চেষ্টা করেছিলেন, মন থেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটাকে—সফলকামও যে হননি, তা নয়। কিন্তু আজ হঠাৎ ন'বছর পরে অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ শুনে সমস্ত মনে পড়ে যাচ্ছে আবার। সমস্ত।

একটা বিষয়ে বিস্ময় লাগছে কিন্তু। এখন, বিছানায় বসে বসে নানাবিধ এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট অনুভব করছেন তিনি—যদিও সংবাদটা পেয়ে চমকে উঠেছিলেন প্রথমটা, কিন্তু অপর্ণার মৃত্যু সত্যি তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেনি। সত্যি কোন দুঃখ হচ্ছে না। সত্যিই এতটা হৃদয়হীন আমি নাকি?—নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন। এখন অবশ্য আর ঘৃণা করেন না তাকে, পক্ষপাতশূন্য হয়ে তার প্রতি সুবিচার করবার ক্ষমতা হয়েছে এখন। ন'বছরের এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের মধ্যে অপর্ণার একটা স্বরূপ খাড়া করেছিলেন তিনি মনে মনে। মফঃস্বলের শহুরে হাবভাবময়ী কলাকুশলা একধরনের ভদ্রমহিলা দেখা যায়—যারা সকলের সঙ্গে হেসে আলাপ করে, পার্টিতে যায়, সব কথায় বুকনি দেয়, অপর্ণাও সেই জাতের মেয়ে—তার বেশী কিছু নয়—তিনি হয় তো তাকে স্বপ্নালোকে দেবী বানিয়েছিলেন। হয় তো! এটাও মনে হত হয় তো তাঁর বিচার নির্ভুল নয়। বিশেষ করে এই কথাটাই মনে হচ্ছে এখন। হয় তো....কিন্তু না—বিরুদ্ধ সাক্ষী অনেক বর্তমান! এই পূর্ণ গাঙ্গুলী লোকটা পাঁচ বছর সংশ্লিষ্ট ছিল এই পরিবারের সঙ্গে এবং তাঁর মতো সে-ও হয়তো ফেঁসে ছিল। পূর্ণ গাঙ্গুলী কোলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলে, কোলকাতায় থাকলে তার হিল্লে হত কিছু একটা, কারণ তার মস্তিষ্কে বা চরিত্রে এমন কিছুই ছিল না (পুরন্দরবাবুর তাই ধারণা অন্তত) যার জোরে চেনা-শোনা সমাজের বাইরে গিয়ে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু কোলকাতা ত্যাগ করে অর্থাৎ তার ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়ে সে বর্ধমানে গিয়ে আড্ডা গাড়লে—কেবল ওই অপর্ণার জন্যে। শেষ পর্যন্ত কোলকাতায় এল—অপর্ণা তাকে ছেঁড়া জুতোর মতো পরিত্যাগ করেছিল বলে সম্ভবত। ওই মেয়েটার সত্যিই আকর্ষণ করবার, বশ করবার, শাসন করবার অদ্ভুত কুহকিনী শক্তি ছিল একটা।

কিন্তু যে সব গুণের জোরে মেয়েরা পুরুষদের সাধারণত আকর্ষণ করে, বশ করে, অপর্ণার সে সব গুণ ছিল না। সুন্দরী ছিল না মোটেই। অত্যন্ত সাদামাটা চেহারা। পুরন্দরবাবুর সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তার বয়সও আটাশ বছর—অর্থাৎ যৌবনও উত্তীর্ণ প্রায়। সুন্দরী না হলেও তার সারা মুখে অপূর্ব কমনীয়তা ছিল একটা, চোখ খুব বড় ছিল না, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ছিল অদ্ভুত শক্তির ব্যঞ্জনা। রোগা ছিল খুব। খুব বেশী লেখাপড়া শেখেনি, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। কেমন যেন জেদী গোছের ছিল। নিজের মতকে চূড়ান্ত বলে জানত। মতান্তর শোনবার ধৈর্য ছিল না। কখনও কোন ব্যাপারে আপোষ করেনি। চালচলনে শহুরে ভাব খুব বেশী না থাকলেও বেশ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। নিপুণ বৈশিষ্ট্য। মার্জিত রুচিও ছিল, যদিও তার পরিচয় প্রধানত পাওয়া যেত প্রসাধনে আর সাজসজ্জায়। চরিত্রে ছিল সে সম্রাজ্ঞী—আধিপত্য করবার লোভ এবং শক্তি দুইই ছিল তার। যাকে ভালোবাসত তাকে পদানত করে রাখত একেবারে। আসন্ন বিপদে দিশেহারা হয়ে পড়ত না কখনও। বিপদের সময় তার মনের জোর দেখে অবাক লাগত সত্যি। অদ্ভুত চরিত্র। উদারতা এবং নীচতার এমন সমন্বয় কদাচিৎ চোখে পড়ে। তার সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল

একরকম। যুক্তির ধার ধারত না, প্রয়োজন হলে 'দু' দুগুণে চার' এ সত্যকেও ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে বাধত না তার। নিজের দোষ বা নিজের ভুল দেখতেই পেত না কখনও। স্বামীকে আজীবন বঞ্চনা করে এসেছে, অসংখ্য চাতুরী খেলেছে তার সঙ্গে—কিন্তু সে জন্য কখনও দুঃখিত বা অনুতপ্ত হয়নি। তাকে দেখে পুরন্দরবাবুর মনে পড়ত উর্বশী কবিতার প্রথম লাইনটা—নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী। ও যেন সকলের। চিরন্তনী কামিনী! নিজেও বোধ হয় সে তাই অকপটে বিশ্বাস করত। পুরুষের মনোহরণ করাই তো তার কাজ। তাতে আর পাপ পুণ্য কি! যাকে যতক্ষণ ভালোবাসত ততক্ষণ তার সঙ্গে প্রতারণা করত না। কিন্তু ভালোবাসা নিঃশেষ হয়ে যেই শুরু হত অভ্যাসের দাসত্ব, অমনি শিকল কাটার সুযোগ খুঁজে বেড়াত সে। প্রণয়ীকে পীড়নও যেমন করত, সোহাগও করত তেমনি। উদগ্র কামনার নিষ্ঠুর প্রতিমূর্তি ছিল যেন। অথচ নীতি নিয়ে লম্বা বক্তৃতা—হ্যাঁ, বক্তৃতাই দিত—ভ্রষ্ট চরিত্র লোককে নিদারুণ ভাষায় গালাগালি দিতে শতমুখ হয়ে উঠত, অথচ নিজে ছিল ভ্রষ্টা! কিন্তু সে যে ভ্রষ্টা তা কিছুতেই, হাজার প্রমাণ প্রয়োগ করেও, বোঝান যেত না তাকে। প্রণয়ী পুরন্দরবাবু মাঝে মাঝে ভাবতেন—"ভণ্ডামি নয়, সত্যিই হয়তো ও ওইরকম। হয়তো ভ্রষ্টা হয়েই জন্মেছে—ওই ওর প্রকৃতি। এ জাতীয় মেয়েরা কখনও বুড়ো হয় না, কখনও কারও গৃহিণী হয় না, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, একটার পর আর একটাকে বরণ করে যায় কেবল। ওই ওদের ধর্ম। বিবাহিত স্বামীই বোধ হয় ওদের প্রণয়ী। কিন্তু সে প্রণয়টা আরম্ভ হয় বিবাহের পরে। এরা খুব সহজে স্বামী পাকড়াতেও পারে। যখন দ্বিতীয় প্রণয়ী বরণ করে তখন স্বামীকেই দোষ দেয়, যেন স্বামীর কাছে সুখের আস্বাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে পর-পুরুষের বাহুপাশে ধরা দিয়েছে। পর-পুরুষের বাহুপাশে যখন ধরা দেয় তখন প্রাণ ঢেলেই দেয়, তাতে কোনও ভণ্ডামি থাকে না। শেষ পর্যন্ত ওরা মনে করে—যা করছি ঠিকই করছি, দোষের কিছু নেই এতে... । আমরা সতীই—"

এ ধরনের মেয়ে থাকা সম্ভব পুরন্দরবাবুর এ বিশ্বাস সত্যিই হয়েছিল! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও তাঁর হয়েছিল যে, এই মেয়েদের অনুরূপ এক জাতীয় স্বামীও আছেন যাঁরা ঠিক এদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেন। অর্থাৎ যাঁরা চিরকাল স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করে যান আর কিছু করেন না, আর কিছু করবার ক্ষমতাই নেই। এঁরা কেবল বিয়ে করবার জন্যই জন্মান যেন। নিজেদের চরিত্রের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এঁরা বিয়ের পর অবিলম্বে স্ত্রীর পরিপূরক হয়ে পড়েন ঠিক। এঁদের কতকগুলো চারিত্রিক লক্ষণও থাকে। কেমন যেন মেয়েলি ভাবাপন্ন হন এঁরা। এঁদের চলন বলন হাবভাব সব কিছুই পেলব পেলব। দেখলেই চিনতে পারা যায়। পুরন্দরবাবুর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যুগল পালিত এই জাতীয় লোক। কিন্তু গতরাত্রে যে যুগল পালিতকে দেখা গেল সে তো একবারে অন্য লোক। বর্ধমানে যার সঙ্গে আলাপ ছিল এ তো সে নয়। অবিশ্বাস্য রকম বদলে গেল লোকটা। বদলাবার কথাও—পুরন্দরবাবুর মনে হল—এ অবস্থায় বদলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। স্ত্রীর জীবিতকালে সে স্ত্রীর পরিপূরক ছিল, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে আর তা থাকবে কি করে—সে তো এখন একটা ভগ্নাংশ মাত্র....দু'জনে মিলে সমগ্র ছিল। সমগ্র জীবনের একটা অংশ হঠাৎ কেটে বেরিয়ে এসেছে যেন....বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত।

অতীতের যুগল পালিত সম্বন্ধে পুরন্দরবাবুর মনে নানা কথা জাগছিল। অনেক ঘটনা, অনেক স্মৃতি।

"বর্ধমানে লোকটা স্বামী ছাড়া আর কিছু ছিল না। চাকরি করত, একজন পদস্থ কর্মচারীই ছিল, কিন্তু তাও যেন স্ত্রীর জন্যই! স্ত্রীর গয়না কাপড় কেনবার জন্য, তার সামাজিক সম্ভ্রম বাড়াবার জন্য দশটা পাঁচটা অপিস করে মরত লোকটা। আর খুব নিষ্ঠাভরেই করত। একটু ফাঁকি দিত না কাজে। অথচ অপিসে খুব যে একটা সুনাম ছিল তাও নয়। দুর্নামও ছিল না। বাপের বিষয়-আশয় ছিল কিছু। ভালোভাবেই চলে যেত। দামী শোফা সেটি, কার্পেট, দামী দামী বাসন বেয়ারা বয়।—চতুর্দিক ঝকঝকে, তকতকে টিপটপ রাখতেই হত। কারণ ভয়ানক বড়লোক ঘেঁষা ছিল। বড় বড় অফিসার তো বটেই, নামজাদা যে কোন লোকের সঙ্গেই আলাপ করতে পেলে বর্তে যেত লোকটা। বাড়িতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিত। বহু বড়লোকের সঙ্গে বেশ দহরম মহরম ছিল। অপর্ণারও বেশ খাতির ছিল বড়লোক মহলে। অপর্ণা অবশ্য খাতির পেয়ে গলে পড়ত না কখনও। নিজের ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবেই নিত সে এসব। কিন্তু নিজের বাড়িতে বড় বড় লোকদের সে নিমন্ত্রণ করত যখন, তখন সত্যিই উপভোগ্য হত ব্যাপারটা। অতিথি-সৎকার করতে জানত সে। যুগলকেও এমন তালিম দিয়েছিল যে নামজাদা অভিজাতবংশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করতেও তার তাল কাটত না কখনও। পুরন্দরবাবুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হত যে যুগল পালিতেরও নিজস্ব বুদ্ধি আছে কিছু—ইচ্ছে করলে নিজের শক্তিতেই হয়তো আলাপ করতে পারে সে—কিন্তু পাছে বেশী বকবক করে এই ভয়ে অপর্ণা তাকে ওজনকরা ভদ্রতা-সম্মত কথা ছাড়া অন্য কথা কইতেই দিত না। ভদ্রসমাজে যুগল পালিতের স্বকীয়তা পরিস্ফুটই হতে পায়নি কখনও। ভালো মন্দ মিশিয়ে তার নিজস্ব চরিত্র ছিল নিশ্চয়ই একটা। কিন্তু তা কেউ জানবার সুযোগ পায়নি। মৃদু হেসে আলতো আলতো ভদ্রতা করেই কালক্ষেপ করতে হত তাকে। তার সদগুণগুলো চাপা পড়ে যেত অপর্ণার জ্যোতিতে, আর বদগুণগুলো বিলুপ্ত হত তার শাসনে। পুরন্দরবাবুর মনে পড়ল যুগল পালিতের পরচর্চা করার দিকে একটু ঝোঁক ছিল, প্রতিবেশীদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে ভালই বাসত সে—কিন্তু অপর্ণার ভয়ে সে মুখ খুলতে পারত না। নানা রকম গালগল্প করার দক্ষতা ছিল যুগলের, কিন্তু করতে পেত না। যা সংক্ষেপে সারা যায় এবং যা কোন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নয় এ রকম প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপনই করতে দিত না তাকে অপর্ণা। যুগল মদ খেত, সুযোগ পেলে বেশ টানতে পারত, কিন্তু উপায় ছিল না। অপর্ণা ভারী কড়া ছিল সে বিষয়ে। স্ত্রীর ভয়ে যুগল মদ ছুঁত না। কিন্তু বাইরে থেকে তাকে স্ত্রৈণ বলে সন্দেহ করবার উপায় ছিল না বরং মনে হত অপর্ণাই পতিভক্তিপরায়ণা বাধ্য স্ত্রী, ভুলেও স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেনি। শুধু মনে হত নয়, অপর্ণা তা নিজেও বিশ্বাস করত সম্ভবত। যুগল হয় তো অপর্ণাকে ভালোবাসত—হয় তো খুব গভীরভাবেই ভালোবাসত, কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় ছিল না। অপর্ণার কড়া শাসনের জন্যই হয়তো ছিল না। বর্ধমানে থাকবার সময় পুরন্দরবাবুর প্রায়ই মনে হত তাঁর সঙ্গে অপর্ণার যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে তা যুগল জানে কি না। কোন সন্দেহই কি হয় না তার মনে? অপর্ণাকে প্রশ্নও করেছেন অনেকবার—কিন্তু প্রতিবারই এক উত্তর পেয়েছেন। অপর্ণা বিরক্তিভরে প্রতিবারই বলেছে—

উনি কিছু জানেন না, জানতে পারেন না—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অপর্ণার আর একটা বিশেষত্ব ছিল—স্বামীকে কখনও খেলো করবার চেষ্টা করত না সে। অপর কেউ করলে বরং চটে যেত। স্বামীর পক্ষ নিয়ে কোমর বেঁধে তর্ক করত তার সঙ্গে। ছেলেপিলে ছিল না, সুতরাং একটু বার ফটকা হতেই হয়েছিল তাকে। কোন নিমন্ত্রণ, কোন পার্টি বাদ যেত না। কিন্তু তাই বলে যে ঘরের দিকে টান ছিল না, তা নয়। মনে হত বাইরের সামাজিক আনন্দে তার মন ভরত না। ঘর-সাজানো, সেলাই-করা, রান্নার ব্যবস্থা করা এই সব গৃহস্থালী কাজেও অনেক সময় কাটাত সে। কাল রাত্রে যুগল যে কথাটা বললে—অনেক সময় সন্ধ্যাবেলায় পড়াশোনার চর্চাও হত। কখনও যুগল পালিত কোন বই পড়ত তাঁরা শুনতেন। তিনিও পড়তেন কখনও কখনও। যুগল চমৎকার পড়তে পারত, মাঝে মাঝে তাক লেগে যেত পুরন্দরবাবুর। অপর্ণা সেলাই করতে করতে গম্ভীরভাবে শুনত; রবিবাবুর গল্প, কবিতা পড়া হত বেশী; কিন্তু মাঝে মাঝে গম্ভীর জিনিসও হত—হীরের দত্তর 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' পড়া হয়েছিল একদিন। পুরন্দরবাবুর রুচি ও বিদ্যার প্রতি অপর্ণার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু নীরবে শ্রদ্ধা করত সে। কখনও উচ্ছ্বসিত হয়নি। ভাবটা যেন পুরন্দরবাবুর শ্রেষ্ঠত্ব এমনই অবিসংবাদিত যে তা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক বিষয়ে সে প্রায় চুপ করেই থাকত—পুরন্দরবাবুর মনে হত এ সব বিষয়ে খুব যেন উৎসাহ নেই তার। সমাজে থাকতে গেলে এ সবের সংস্রবে বাধ্য হয়ে আসতে হয়—হয় তো এদের উপযোগিতাও আছে কিছু—তাই যেন সে এসব সহ্য করে। যুগলের কিন্তু খুব উৎসাহ ছিল এ সব বিষয়ে।

পুরন্দরবাবুর দিক থেকে ব্যাপারটা যখন চরমে উঠেছিল অর্থাৎ যখন তিনি প্রায় উন্মত্ততার শেষ সীমায় উপস্থিত হব হব করছিলেন ঠিক সেই সময়ে প্রণয় পর্বে ছেদ পড়ল হঠাৎ একদিন। হঠাৎ অপর্ণাই সব চুকিয়ে দিল একদিন। তাঁকে ছেঁড়া চটির পাটির মতো ছুড়ে ফেলে দিলে যে—এ কথা কিন্তু বুঝতে পারেননি তিনি তখন।

এর মাস দুই আগে এক বিলাত-ফেরত ছোকরা পুলিশ বিভাগে বড় চাকরি নিয়ে বর্ধমানে এসেছিল। যুগলদের বাড়িতে যাতায়াতও শুরু করেছিল সে। আগে তাঁরা তিনজন ছিলেন—ইনি আসাতে চারজন হলেন! অপর্ণা এই 'ছেলেমানুষ' অফিসারটিকে বেশ সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করলে—ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল তাকে 'ছেলেমানুষ' বলেই গণ্য করেছে সে। পুরন্দরবাবুর মনে তাই কোন সন্দেহই হয়নি। এ সব কথা ভাববার মতো মনের অবস্থাও ছিল না তাঁর—কারণ অপর্ণা তখন তাকে 'নোটিশ' দিয়েছে। বিচ্ছেদ অনিবার্য। বহু কারণ অপর্ণা দেখিয়েছিল—তার মধ্যে প্রধানতম সে সন্তানসম্ভবা। সুতরাং অবিলম্বে অন্তত চার পাঁচ মাসের জন্য স্থান ত্যাগ করতে হবে.....এ নিয়ে কোন কেলেঙ্কারী যদি হয় তাহলে তার স্বামীর মনে কোন সন্দেহ জাগবে না অন্তত। পুরন্দরবাবুর মনে হল যুক্তিটা বড্ড বেশী প্যাঁচালো। তিনি সোজা বললেন, চল আমার সঙ্গে। বম্বে, মাদ্রাজ, কাশী, কাশ্মীর যেখানে হোক। কিন্তু কিছু হল না, তাঁকে একাই ফিরতে হল শেষ পর্যন্ত। অবশ্য মাত্র তিন চার মাসের জন্য—এ আশ্বাস না পেলে কোন ব্যক্তিই নিরস্ত করতে পারত না তাঁকে, অপর্ণাকে নিয়েই আসতেন তিনি। ঠিক দু'মাস পরে অপর্ণার এক চিঠি পেলেন—আপনার ফেরবার দরকার নেই আর। যা মরে গেছে, কি হবে তাকে আবার বাঁচিয়ে? চেষ্টা করলেও তা কি আর বাঁচে কখনও? সুখবর আছে

একটা, আমার যে 'ভয়' হয়েছিল তা অলীক। পুরন্দরবাবু খবর পেলেন "ছেলেমানুষ" পুলিশ অফিসারটি বেশ জমিয়েছেন সেখানে। পুরন্দরবাবুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল তখন। মোহের সমস্ত কুয়াসা কেটে গেল নিমেষে। আরও কিছুদিন পরে, মানে কয়েক বৎসর পরে, এ খবরও তিনি পেয়েছেন যে পূর্ণ গাঙ্গুলীও গিয়ে জুটেছিল সেখানে এবং এক আধ দিন নয় পুরো পাঁচটি বচ্ছর ছিল। পূর্ণ গাঙ্গুলীর এত সুদীর্ঘ সৌভাগ্যের কারণ বোধ হয় অপর্ণা বুড়ো হয়ে আসছিল ক্রমশ, চেখে বেড়াবার প্রকৃতি ছিল না, সুযোগও জোটেনি হয় তো।

বিছানায় পুরো এক ঘণ্টা বসে রইলেন তিনি। তারপর উঠে স্নান করলেন, চা খেলেন। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন তাড়াতাড়ি, যুগল পালিতের খোঁজে। তার সঙ্গে কাল রাত্রে যে অভদ্র ব্যবহার করেছিলেন তার স্মৃতিটা মুছে ফেলতে হবে যেমন করে হোক। ছি, ছি, বড় দুর্ব্যবহার করে ফেলেছেন.....।

গত রাত্রে যুগল পালিতের রহস্যময় আবির্ভাবটার নানা ব্যাখ্যা নিজেই বার করছিলেন তিনি মনে মনে.....হয়তো আকস্মিক খেয়াল লোকটার.....কিম্বা হয় তো মদ খেয়েছিল.....কিম্বা আরও কিছু হবে হয় তো। কিন্তু যার সঙ্গে সব চুকে বুকে গেছে তার স্বামীর সঙ্গে আবার কেন যে তিনি নূতন করে পরিচয় ঝালাতে যাচ্ছেন তার কোন ব্যাখ্যা তাঁর মাথায় এল না। কি যেন একটা আকর্ষণ করছিল তাঁকে। প্রাণে একটা অদ্ভুত সাড়া তুলেছে লোকটা।

।। চার।।

যুগল পালিত ঠিকানা বদলায়নি। সে রকম কোন উদ্দেশ্যই তার ছিল না। পুরন্দরবাবু কেন যে ও-রকম বেখাপ্পা একটা প্রশ্ন করেছিলেন তা তিনি নিজেই ঠিক করতে পারছিলেন না। একটু খোঁজ করেই যুগলের বাসাটা পেয়ে গেলেন তিনি। দোতলায় থাকে যুগল। সঙ্কীর্ণ অন্ধকার নোংরা স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই একটা কান্না শুনতে পেলেন। ছোট মেয়ের কান্না, মিহি গলা.....সাত আট বছরের মেয়ের মতো মনে হল.....ধক্ করে উঠল বুকটা। গুমরে গুমরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা.....আর কে যেন ধমকাচ্ছে তাকে.....মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে চীৎকার করছে.....ভাঙা কর্কশ গলা.....চেষ্টা করছে মেয়েটার কান্না বাইরের কেউ যেন শুনতে না পায়। ধমক দিয়ে চুপ করতে বলছে তাকে এবং এই সব করতে গিয়ে নিজেই বেশী চেঁচাচ্ছে। নির্মমকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে লোকটা.....মেয়েটা ক্ষমা ভিক্ষা করছে.....আর করব না, আর করব না.....মাপ কর আমাকে.....উঠেই লম্বা গোছের একটা লোকের সঙ্গে দেখা হল। গলায় পৈতে, ঘাড়ে গামছা.....রাঁধুনি বোধ হয়। যুগল পালিতের কথা জিগ্যেস করতেই যে ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছিল সেই ঘরটা দেখিয়ে দিলে সে। পুরন্দরবাবু লক্ষ্য করলেন তার চোখের দৃষ্টি থেকে ঘৃণা ফুটে বেরুচ্ছে।

"কি কাণ্ড" বলে সে নেমে গেল।

পুরন্দরবাবু কড়া নাড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কি ভেবে কড়া না নেড়ে সোজা ঢুকে গেলেন ভিতরে। যুগল পালিত খালি গায়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে—চীৎকার করে ধমকে (এবং খুব

সম্ভব মার-ধোর করে) একটা সাত-আট বছরের মেয়ের কান্না থামাবার চেষ্টা করছে। মেয়েটার গায়ে একটা ময়লা ছেঁড়া ফ্রক। ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল সে। যুগল পালিতের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে সে যেন তাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছিল; একটা কাতর অনুনয় যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল তার সর্বাঙ্গে। মুহূর্তে সমস্ত দৃশ্য বদলে গেল। একজন আগন্তুককে দেখে মেয়েটা পাশের একটা ছোট ঘরে পালিয়ে গেল ছুটে। যুগল হতভম্ব হয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর তার মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল একটা। কাল রাত্রে পুরন্দরবাবু সিঁড়ির কপাট খুলে তার মুখে যেমন হাসি দেখতে পেয়েছিলেন ঠিক তেমনি।

"পুরন্দরবাবু!" সবিস্ময়ে বলে উঠল সে—"সত্যিই আমি আশা করিনি—আসুন আসুন—এই চেয়ারটায় বসুন.....ইজি-চেয়ারটায় বসবেন? আমি ততক্ষণ....."

তাড়াতাড়ি সে ওপন-বেস্ট কোটটা গায়ে দিয়ে ফেললে।

"ব্যস্ত হবেন না।"

পুরন্দরবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

"না, জামাটা গায়ে দিয়েনি, মানে—ওকি আপনি কোণে বসলেন কেন, এই ইজি-চেয়ারটায় বসুন না। সত্যি আপনি যে আসবেন তা ভাবতে পারিনি.....সত্যিই প্রত্যাশা করিনি।"

একটা চেয়ার একটু সরিয়ে নিয়ে তার হাতলটার উপর বসল সে।

"আমাকে প্রত্যাশা করেননি কেন? আমি তো বলেছিলাম আসব সকালে।"

"আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আসবেন না আপনি। কাল রাত্রে যা হয়ে গেল তারপর আপনার আসাটা সম্ভবপর মনে হয়নি। মনে হচ্ছিল জীবনে বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা হবে না আর।"

পুরন্দরবাবু চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। সবই কেমন যেন এলোমেলো। বিছানা করা হয়নি, কাপড়-চোপড় চারিদিকে ছড়ানো, টেবিলে এঁটো চায়ের পেয়ালা, রুটির টুকরো পড়ে রয়েছে আশেপাশে, আধ বোতল মদও রয়েছে, বোতলে ছিপি নেই, পাশেই একটা গ্লাস। পাশের ঘরের দরজাটার দিকে চাইলেন একবার, কোন সাড়া-শব্দও নেই। মেয়েটা চুপ করে আছে।

"মদ খাচ্ছিলেন না কি" বোতলটা দেখিয়ে পুরন্দরবাবু বললেন।

"না ও কালকের পড়ে আছে খানিকটা, মানে—" যুগল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল একটু।

"খুব পরিবর্তন হয়েছে আপনার!"

"হ্যাঁ, এ সব ছিল না আগে আমার। কিন্তু গত ফাল্গুন মাসের পর থেকে ধরেছি। মাইরি বলছি। কিছুতে সামলাতে পারি না। তবে এখন আমি খাইনি, মানে মাতাল নই, ভয় পাবেন না। কাল রাত্রে যা করেছিলাম তা আর করব না.....কাল রাত্রে ছি ছি কেলেঙ্কারি— কিন্তু সত্যি বলছি গত ফাল্গুন থেকে.....আমার যে এ দশা হবে, এমনভাবে যে ভেঙে পড়ব আমি, তা কে জানত। ছ'মাস আগে কেউ যদি বলত আমায় বিশ্বাসই করতাম না, কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না—"

"কাল রাত্রে মাতাল অবস্থায় আমার কাছে গিয়েছিলেন তাহলে—"

"হ্যাঁ" মাটির দিকে চেয়ে একটু কুণ্ঠিতভাবেই যুগল পালিত বললে কথাটা। "ঠিক সেই

সময়ে মদ না খেলেও, তার খানিকক্ষণ আগে খেয়েছিলাম। মদ খাবার খানিকক্ষণ পরে আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়। একটু পেটে পড়লেই কেমন যেন হয়ে যাই। কেমন যেন মাথায় খুন চড়ে যায়, মুখ ছুটতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় দুঃখে বুকটা ফেটে যাবে বুঝি! দুঃখ ভোলবার জন্যেই মদ ধরেছিলাম হয়তো। কে জানে? মদ খেলে কিন্তু আমি না করতে পারি হেন কাজ নেই, যেখানে যাওয়া উচিত নয় সেখানে গিয়ে হাজির হই, যা মুখে আসে বলি, অপমান করে বসি যাকে তাকে। কাল আমাকে খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল, না?"

"আপনার মনে নেই?"

"মনে নেই! সব মনে আছে....."

"আমারও ঠিক ওই একই কথা মনে হচ্ছে—" পুরন্দরবাবু হেসে বললেন। "আমিও আপনার সঙ্গে ব্যবহারটা ঠিক, মানে মেজাজটাই আমার কেমন যেন বিগড়ে ছিল কাল.....কেমন যেন তিরিক্ষি গোছের.....আমার হয় এ-রকম মাঝে মাঝে। তা ছাড়া কাল অমনভাবে আপনার আসাটা....."

"হ্যাঁ, অত রাত্রে। ঠিক!"—যুগল মাথা নেড়ে সায় দিলে।

"কাল রাত্রে কিসে যেন ভর করেছিল আমার উপর। আপনি যদি তখন ঠিক মুহূর্তে দরজা না খুলতেন তাহলে দরজা থেকেই আমি ফিরে যেতাম হয়তো। এক সপ্তাহ আগে আমি আর একদিন গিয়েছিলাম, আপনি বাড়ি ছিলেন না। আর হয়তো আমার যাওয়া উচিত ছিল না, কারণ—যাই বলুন, যদিও দুরবস্থা হয়েছে আমার—আত্মসম্মান এখনও বিসর্জন দিতে পারিনি একেবারে। রাস্তায় কতবার দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে, প্রতিবারই আমি ভেবেছি—বাঃ উনি চিনতেই পারছেন না আমাকে, মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছেন—ন' বছরের ব্যবধান তো ভীষণ দেখছি। প্রতিবারই আসব আসব করে আসতে পারিনি। কাল রাত্রে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম আপনার বাড়ির কাছে হঠাৎ.....কত রাত হয়েছে খেয়ালই ছিল না। খেয়াল না থাকবার হেতু ওই (বোতলটা দেখাল)—আমার মানসিক অবস্থাও অবশ্য দায়ী খানিকটা। অন্যায় হয়েছিল খুবই। অপর কেউ হলে বোধ হয় মেরে বার করে দিত আমাকে। আপনি বলে তাই আবার এসেছেন আমার কাছে।"

পুরন্দরবাবু মন দিয়ে প্রতি কথাটি শুনছিলেন। যুগলের কথাগুলো আন্তরিক বলেই মনে হয়, কিন্তু তার একটি কথা বিশ্বাস করছিলেন না তিনি।

"আপনি কি একাই আছেন? ওই যে ছোট মেয়েটি দেখলাম ওটি কার?"

যুগল সবিস্ময়ে ভ্রূ-যুগল উৎক্ষিপ্ত করে চেয়ে রইল ক্ষণকাল। তারপরই তার চোখের দৃষ্টিতে আনন্দ ঝলমল করে উঠল যেন।

"ওই ছোট মেয়েটি? ও পাপিয়া।"

"কে পাপিয়া?" প্রশ্নটা করেই পুরন্দরবাবুর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। সম্ভাব্য উত্তরটার সম্বন্ধে সহসা সচেতন হলেন যেন। প্রথম ঘরে ঢুকেই যখন তিনি পাপিয়াকে দেখেছিলেন তখন এ-কথা মনে হয়নি।

"কে আবার, আমাদের পাপিয়া, আমাদের মেয়ে পাপিয়া" যুগলের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

"আপনার মেয়ে? মানে, আপনার অপর্ণা দেবীর?.....অপর্ণা দেবীর ছেলে-পিলে হয়েছিল নাকি! শুনিনি তো—"

একটু ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন পুরন্দরবাবু।

"হয়েছিল বই কি! কিন্তু, ঠিক তো, আপনি শুনবেন কি করে? মাথা খারাপ হয়েছে আমার। আপনি চলে আসবার পরই পাপিয়ার জন্ম হয়—হ্যাঁ, ঠিক তারপরই মার কোল আলো করে ও এল....."

যুগল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল হঠাৎ.....মনে হল যেন বসে থাকতে পারছে না।

"আমি কিছুই শুনিনি" বিবর্ণমুখে উত্তর দিলেন পুরন্দরবাবু।

"ঠিক তো, ঠিক তো, কি করে শুনবেন আপনি" যুগলের কণ্ঠস্বর আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল—"ছেলে হবার তো কোন আশাই ছিল না আমাদের, আপনি তো জানেন, মাদুলি কবচ কত কি ধারণ করেছিলাম আমরা—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সদয় হলেন ভগবান—হা হা হা। কি আনন্দ যে হয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়—আপনি চলে আসবার এক বৎসর—না, ভুল করছি—পুরো এক বছর হবে না—থামুন, আপনি যতদূর মনে পড়ছে অক্টোবর মাসে বর্ধমান থেকে চলে আসেন—অক্টোবর না নভেম্বর?"

"আমি বর্ধমান থেকে এসেছিলাম সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে। তারিখটা মনে আছে আমার ১২ই সেপ্টেম্বর—"

"ও, সেপ্টেম্বর। তাই না কি, ও.....হ্যাঁ, কি বলছিলাম।" কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল যুগল পালিতের।

"ও হ্যাঁ—তাই যদি হয়—১২ই সেপ্টেম্বর, আর পাপিয়ার জন্ম হয়েছে ৮ই মে। তাহলে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে মানে আট মাসের কিছু ওপর। আপনি যদি দেখতেন ওকে পেয়ে অপর্ণার যে কি রকম—"

"ডাকুন ওকে, ডাকুন"—বলতে গিয়ে পুরন্দরবাবুর গলাটা কেঁপে উঠল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই" যুগল পালিত ব্যস্ত হয়ে উঠল—"নিশ্চয়ই, এখনই ডাকছি ওকে। আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় করা তো আগে দরকার—" দ্রুতপদে ছোট ঘরটার ভিতর সে-ও ঢুকে পড়ল।

পুরো পাঁচটি মিনিট কেটে গেল। ঘরের ভিতর থেকে নিম্নকণ্ঠে ফুসফুস কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল। মনে হল পাপিয়াও কি বললে যেন। আসতে চাইছে না বোধ হয়, পুরন্দরবাবু ভাবলেন।

একটু পরেই বেরিয়ে এল দুজনে।

"এই দেখুন, আপনার নাম শুনে ভারী ঘাবড়ে গেছে, এত লাজুক! আত্মসম্মান বোধও কম নয় মেয়ের। হুবহু মায়ের প্রতিমূর্তি আর কি—" যুগল হাত ধরে টেনে এনেছিল তাকে। সে আর কাঁদছিল না। মাটির দিকে চেয়ে ঘাড় হেঁট করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ছিপছিপে লম্বা গড়নের মেয়েটি, ভারী চমৎকার। চোখ তুলে চাইল একবার। কৌতূহল হল বোধ হয়। বড় বড় কালো চোখে কিন্তু বিষণ্ণ দৃষ্টি। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল আবার। অপরিচিত লোক দেখলে শিশুদের চোখে যে গম্ভীর দৃষ্টি ফুটে ওঠে, যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তারা অপরিচিত আগন্তুককে আড়চোখে নিরীক্ষণ করে, এর চোখেও তা আছে—কিন্তু তা ছাড়াও আরও কি যেন একটা আছে—পুরন্দরের মনে হল।

যুগল হাত ধরে তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে এল।

"তোমার কাকাবাবু হন, তোমার মায়ের খুব বন্ধু ছিলেন এককালে। লজ্জা কি, প্রণাম কর।"

ভয়ে ভয়ে একটু নীচু হল সে—কিন্তু ঠিক প্রণাম করল না।

"ওর মা ওকে প্রণাম করতে শেখায়নি। সে কি বলত জানেন? সকলের পায়ে মাথা কুটে কুটেই এদেশের মেয়েরা আরও অপদার্থ হয়ে গেল! অদ্ভুত মত ছিল তার!"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে পুরন্দরবাবুর মুখের দিকে।

পুরন্দরবাবু বুঝতে পারছিলেন যে যুগল তাকে লক্ষ্য করছে, কিন্তু আত্মগোপন করবার কোন প্রয়াস আর করছিলেন না তিনি। পাপিয়ার হাত ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু পাপিয়া একটু বিব্রত হচ্ছিল যেন—বাপের দিকে বারবার চাইছিল সে। যুগলের প্রতি কথাটি মন দিয়ে শুনছিল। পুরন্দর নির্নিমেষে চেয়েছিল পাপিয়ার কালো চোখ দুটির দিকে। না, ও চোখ ভুল হবার নয়। মুখের লালিত্য, ঠোঁটের গড়ন, চুলের রং.....অদ্ভুত মিল। যুগল ইতিমধ্যে অত্যন্ত আবেগভরে অনর্গল কি যে বকে যাচ্ছিল, পুরন্দরবাবু তা শুনতেই পাচ্ছিলেন না। শেষ কয়টা কথা শুধু তাঁর কানে গেল ".....ভগবান যখন একে দিলেন তখন আমাদের কি যে আনন্দ হয়েছিল তা ধারণাই করতে পারবেন না আপনি। দেখতে দেখতে আমার নয়ন-মণি হয়ে উঠল মশাই। এমন কি এ-ও আমার মাঝে মাঝে মনে হত, অপর্ণাকে ভগবান যদি কেড়েও নেন পাপিয়াকে নিয়ে আমি সে শোক ভুলতে পারব। হ্যাঁ, এ বিশ্বাস আমার হয়েছিল—"

"আর মিসেস্ পালিতের?"

"অপর্ণার? তার স্বভাব তো আপনার ভালো করেই জানা আছে, সে মুখে বেশী কিছু প্রকাশ করতে পারত না, সে স্বভাবই ছিল না তার কিন্তু মৃত্যু-শয্যায় শেষ বিদায় নেবার বেলায় সব প্রকাশ হয়ে পড়ল শেষে। মৃত্যু-শয্যায় বলছি বটে কিন্তু মৃত্যুর কথা ভাবেওনি সে। মৃত্যুর আগের দিনও সে বলেছে যে আমরা মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছি—তার কিছু হয়নি, ডাক্তাররা রোগ ধরতে পারছে না বাজে ওষুধ খাওয়াচ্ছে খালি। সারদাবাবু ফিরে এলেই (সারদা ডাক্তারকে মনে আছে আপনার?) ভাল হয়ে যাবে সে। কিন্তু দেখুন! মরবার পাঁচ ঘণ্টা আগেও বলেছে যে পাপিয়ার জন্মদিনে তার পিসিদের আনতে হবে....."

পুরন্দরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন হঠাৎ। পাপিয়া তীক্ষ্ণ একাগ্র দৃষ্টিতে তার বাবার দিকে চেয়েছিল, পুরন্দরবাবুর মনে হল দৃষ্টিতে যেন মৌন ভর্ৎসনাও ফুটে উঠেছে একটা।

"এর কোন অসুখ করেনি তো" তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করলেন তিনি, যদিও সেটা বেখাপ্পা শোনাল।

"এর? না, তা তো মনে হয় না.....তবে এখানে যে অবস্থায় আছি, দেখতেই পাচ্ছেন" যুগল পালিতের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে উঠল—"আর অদ্ভুত ওর স্বভাব, এমন ভীরু। মা মারা যাবার পর পনের দিন বড্ড কাবু হয়ে পড়েছিল, কেবল কান্না। এই এখুনি, আপনি আসবার ঠিক আগেই, কি কান্নাটাই কাঁদছিল। কেন কাঁদছিলি বল ত! শুনবেন? আমি ওকে একলা ফেলে রেখে বাইরে যাই কেন। বলছে মা বেঁচে থাকতে আমাকে তুমি যত ভালবাসতে এখন

আর তত বাস না। এই নিয়ে অভিমান। কোথায় খেলনা নিয়ে খেলা-টেলা করবে.....অবশ্য খেলবার সঙ্গীও কেউ নেই এখানে—"

"একেবারে একা আছে ও?"

"একেবারে একা। চাকরটা দিনে একবার আসে শুধু—"

"আর ওকে একা রেখে বাইরে চলে যান আপনি?"

"কি করব? কাল যখন বেরুলাম ওকে ওই ছোট ঘরটায় পুরে তালা দিয়ে গেলাম। সেই জন্যেই আরও কাঁদছিল আজকে। কিন্তু ওছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন। আপনিই বলুন, পরশু দিন রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল, একটা ছোঁড়া এমন ঢিল ছুড়ে মেরেছে যে কপালটা কেটে গেছে। আমি বেরিয়ে গেলেই কাঁদবে, আর পাড়ার প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবে যে কখন ফিরব আমি। এটা কি ভাল? আপনি বলুন। আমারও অবশ্য দোষ আছে, এখ্খুনি ফিরব বলে বেরুলাম, এলাম তার পরদিন—কাল ঠিক এই হয়েছিল। আর সবচেয়ে চমৎকার হচ্ছে—ওর কান্নাকাটি শুনে বাড়ি-ওয়ালা কামার ডেকে তালা ভেঙে ঘর থেকে বার করেছিল ওকে—ছি—ছি—কি কাণ্ড—মনে হচ্ছে আমি মানুষ নই, পশু। মাথার ঠিক নেই, একটু মাথার ঠিক নেই—বুঝলেন।"

মৃদু ক্ষুব্ধকণ্ঠে পাপিয়া বলল—"বাবা—"

"ওই, আবার শুরু করছ বুঝি। এখনি কি বলেছি তোমাকে। কি বলেছি—"

"না, আর বলব না, আর বলব না"—ভয়ে বিবর্ণ হয়ে দু'হাত জোড় করে বারবার একই কথা আবৃত্তি করতে লাগল সে।

"না, এরকমভাবে তো চলতে পারে না" আদেশের ভঙ্গীতে পুরন্দরবাবু বললেন। ধৈর্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল তাঁর পক্ষে।

"আপনি গরীব নন.....এখানে এমনভাবে থাকবার মানে কি? পাড়াটা জঘন্য....."

"পাড়াটা? কিন্তু আর হপ্তাখানেকের ভিতর চলে যাব আমরা বোধ হয়। এইতেই প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে.....গরীব নই তা ঠিক—কিন্তু"—

"খুব হয়েছে, আর বলতে হবে না" বলেই পুরন্দরবাবু থেমে গেলেন (ধৈর্যের সীমা সত্যিই অতিক্রম করেছিলেন তিনি) কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গী যেমন বলতে লাগল "খুব হয়েছে, আর বলতে হবে না। যা বলবে তা আমি জানি, আর কতটা সত্যি বলবে, তাও জানি।"

"শুনুন একটা কথা বলছি। আপনি বলছেন বেশীদিন থাকবেন না, এক হপ্তা কিম্বা বড় জোর পনের দিন। এখানে আমার জানাশোনা একটি পরিবার আছে—খুবই জানাশোনা আমার সঙ্গে; গত কুড়ি বছর থেকে জানাশোনা। বাড়ির মালিক ভবেশ মল্লিক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এখানেই আছেন এখন, আপনি যে ব্যাপারে এখানে এসেছেন তাতে তিনিও সাহায্য করতে পারবেন। তারা এখন এখানেই আছে, যাদবপুরে প্রকাণ্ড বাড়ি তাদের—অনেক জায়গা। ভবেশবাবুর স্ত্রী আমার বোনের মতো। তাঁর আটটি ছেলেমেয়ে। চলুন পাপিয়াকে তাঁর কাছে রেখে আসি.....সময় নষ্ট না করে এখুনি চলুন। আপনি যে ক'দিন এখানে থাকবেন পাপিয়া ওইখানেই থাকুক। খুব ভাল লোক তাঁরা—খুব খুশী হবেন, নিজের ছেলের মতন যত্ন করবেন ওকে। নিয়ে চলুন, বুঝলেন....."

অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন পুরন্দরবাবু এবং তা গোপন করার প্রয়োজনও অনুভব করছিলেন না।

"তা কি করে হয়" নাক সিটকে পুরন্দরবাবুর দিকে আড়চোখে চেয়ে যুগল পালিত বললে।

"হবে না কেন?"

"বাঃ। যদিও আপনি একজন পুরোনো পরিচিত লোক—সেকথা বলছি না, কিন্তু হঠাৎ আমার মেয়েকে একটা অচেনা পরিবারে পাঠিয়ে দেওয়াটা কি ভালো? বিশেষতঃ তাঁরা বড়লোক, আমার মেয়েকে কি চক্ষে দেখবেন তা যখন জানি না।"

"কি বিপদ! আমি তাদের চিনি যে, আমারই পরিবার বলে ধরে নিতে পারেন তাঁদের। বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা।" সক্রোধে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন পুরন্দরবাবু—ভবেশবাবুর স্ত্রী নীলিমা আমার কথা শুনলে একটুও আপত্তি করবেন না। আমার নিজের মেয়ে হলে যেমন যত্ন করতেন ঠিক তেমনি যত্ন করবেন। এতে আপত্তির কিছু নেই।"

"কিন্তু একটু কেমন যেন ঠেকছে আমার। আমাকে মাঝে মাঝে অন্তত দু' একবারও দেখা করতে যেতে হবে তো.....হাজার হোক আমি ওর বাবা.....হি হি—তাছাড়া অত বড়লোক ওঁরা।"

"মোটেই বড়মানুষি চাল নেই ওদের, অত্যন্ত সাদাসিধে লোক। সেখানে অনেক ছেলেমেয়ে আছে, ও গেলে বেঁচে যাবে সেখানে। ওর ভালোর জন্যই বলা, অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই আমার। আপনিও চলুন না, কাল, পরিচয় করিয়ে দেবো, আপনার নিজে একবার গিয়ে বলা উচিতও, মানে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। চলুন আজই যাই।"

"কিন্তু মানে, কেমন—"

"না, না কোন সঙ্কোচের কারণ নেই, আমি বলছি। আপনি বুঝতেও পারছেন সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, ভাণ করছেন শুধু। শুনুন, আজ রাত্রে আমার বাসায় আসুন, রাত্রে সেখানে থাকবেন, ভোরে উঠেই বেরিয়ে যাব না হয়।"

"সত্যি কি উপকারী লোক আপনি, রাত্রে আপনার বাড়িতে যেতে বলছেন?"

যুগল পালিত হঠাৎ গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল,—"আপনার এত ঋণ কি করে যে শোধ করব! কোথায় থাকেন তাঁরা?"

"যাদবপুর।"

"কিন্তু ওর জামা-কাপড়ের কি হবে? অত বড়লোকের বাড়িতে ওকে এই পোশাকে পাঠাতে, মানে, হাজার হোক আমি ওর বাবা তো—"

"কি বিপদ! বলছি তারা ভদ্রলোক, কারও পোশাক নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, তা ছাড়া আপনার মেয়ের পোশাক এমন কি খারাপ, এখন শোকের সময় বেশী সাজসজ্জা করলেই বরং খারাপ দেখাবে.....পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলেই হল.....

"পাপিয়ার জামা-কাপড় সত্যিই খুব অপরিচ্ছন্ন ছিল।"

"জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলুক তাহলে"—যুগল পালিত ব্যস্ত হয়ে উঠল—"বাকী যা আছে গুছিয়ে নিক। ধোপার বাড়িও গেছে কিছু।"

"একটা গাড়ি ডাকতে বলুন তাহলে তাড়াতাড়ি।"

যুগল বেরিয়ে গিয়ে গাড়ি ডাকতে বললে।

কিন্তু আর একটা মুস্কিল হল, পাপিয়া যেতে রাজি হল না। সভয়ে সে এতক্ষণ সব শুনছিল। পুরন্দরবাবু লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন যে তিনি যখন যুগলের সঙ্গে কথা কইছিলেন পাপিয়ার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ।

"আমি যাব না—" মৃদু কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে সে বললে।

"দেখুন! ঠিক মায়ের মতো স্বভাব হয়েছে ওর, দেখছেন—"

"না, মোটেই আমি মায়ের মতো নই, মোটেই আমি মায়ের মতো নই—" এমনভাবে পাপিয়া কথাগুলো বলতে লাগল যেন মায়ের মতো হওয়াটা তার একটা অপরাধ এবং বাবার কাছে সেজন্য সে ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

"তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না....."

তারপর হঠাৎ সে পুরন্দরবাবুর দিকে ফিরে বললে—"আপনি যদি আমাকে নিয়ে যান তাহলে আমি....."

কথা শেষ করবার পূর্বেই যুগল ক্ষেপে হাত ধরে হিড় হিড় করে কোণের ঘরটায় টেনে নিয়ে গেল তাকে। তর্জন গর্জন চাপা কান্না শোনা যেতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে যুগল বেরিয়ে এসে জোর করে একটু হেসে বললে, "আসছে এবার।" পুরন্দরবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। তার দিকে চাইতে প্রবৃত্তি হল না।

পুরন্দরবাবুর যে ঠাকুরটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে এসে জিনিসপত্র সুটকেসে গুছোতে লাগল। পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে বললে—

"পাপিয়াকে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন? আপনার বাড়ি বুঝি এখানে? বেশ করছেন, বড় ভালো মেয়েটি, বড় লক্ষ্মী. এখানে যা কষ্টে ছিল—"

"তুমি যা করছ কর, ফাজিল কোথাকার—" ধমকে উঠল যুগল।

"ফাজিল বলছেন কি মশাই? মিছে কথা বলিনি কিছু। এখানে যে সব কাণ্ড হয় তা ও-টুকুন মেয়ের চোখের সামনে হওয়াই কি ভালো? ফাজিল! যেখানে গতর খাটাব সেখানেই অন্ন জুটবে দু'টি। হক কথা বলতে ভয় পাব না কখনও—"

গজগজ করতে করতে সে বেরিয়ে গেল। তারপর এসে বললে, "গাড়ি এসেছে" পাপিয়ার সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে আবার বললে, "ওর ভাগ্য ভালো যে আপনি এসে গেছেন"—

পাপিয়া বেরিয়ে এল। বিবর্ণ মূর্তি, আনত চক্ষু। কারুর দিকে চাইলে না, পুরন্দরবাবুর দিকে না, বাপের দিকেও না। যাবার সময় বাবাকে প্রণাম পর্যন্ত করল না। যুগল একটু কায়দা করে তার কপোল চুম্বন করল, আলতো আলতোভাবে পিঠটা চাপড়ে দিলে একটু, পাপিয়ার ঠোঁট চিবুক কেঁপে উঠল একবার—কিন্তু সে বাবার দিকে চাইল না। যুগলের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, হাত কাঁপতে লাগল—পুরন্দরবাবু যদিও প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যুগলের দিকে না চাইতে, তবু তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। কোন রকমে এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি এই তাঁর মনে হচ্ছিল খালি।

"আমার দোষ কি" ভাবছিলেন তিনি, "এ তো হতই—হতে বাধ্য।"

সবাই নীচে নেমে এল। ঠাকুরটা পাপিয়াকে আদর করলে একটু। গাড়ি যখন চলতে শুরু

করেছে তখন পাপিয়া হঠাৎ তার বাবার দিকে চেয়ে দু'হাত তুলে চীৎকার করে উঠল—আর একটু হলে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ত—কিন্তু ঘোড়া দুটো ছুটতে শুরু করেছে তখন।

।। পাঁচ।।

"অসুখ করবে কেন? গাড়ি থামাতে বলব? জল চাই?—"

পুরন্দরবাবু ভয় পেয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

পাপিয়া তাঁর দিকে ফিরে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ.....চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

"কোথা নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে হঠাৎ প্রশ্ন করলে সে।

"খুব.ভালো জায়গা, দেখবে খুব ভালো লোক তারা। চমৎকার ফাঁকা বাড়ি, অনেক সঙ্গী পাবে, কত খেলা করবে তারা তোমার সঙ্গে। ভয় কি, তোমার ভালোর জন্যই নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। রাগ কোরো না পাপিয়া।"

পুরন্দরবাবুর পরিচিত কেউ এ সময়ে তাঁকে দেখলে বিস্মিত হতেন।

"উঃ—কি—কি ভয়ঙ্কর লোক আপনি—ক্ষোভে দুঃখে পাপিয়ার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল—জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে রইল শুধু।"

"পাপিয়া, আমি—"

"আপনি পাজি, পাজি, পাজি, পাজি।"

নিজের হাত দুটো কচলাতে লাগল সে। পুরন্দরবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন।

"পাপিয়া মা—কেন এমন করছ, কেন এ কথা বলছ—"

"বাবা কি কাল আসবেন? সত্যি আসবেন?"

"হ্যাঁ। আমি নিজে নিয়ে আসব তাঁকে।"

"না, ঠিক ফাঁকি দিয়ে পালাবেন তিনি।"

"তোমার বাবা কি ভালোবাসেন না তোমাকে?"

"না, মোটেই না।"

"দুর্ব্যবহার করেন তোমার সঙ্গে? বল—"

পাপিয়া নীরব। তারপর তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইল। অনেক সাধ্য সাধনা করলেন পুরন্দরবাবু, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কত কি বললেন, কত বোঝালেন, পাপিয়া শুনল বটে, কিন্তু মনে হল কিছু বিশ্বাস করছে না সে। কিন্তু সে যে শুনছে এতেই পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। মানুষ মদ খেলে যে কি হয় তাই বোঝাতে লাগলেন তাকে। কোন ভয় নেই, তিনি তার আর তার বাবার যাতে কোন বিপদ না হয় তার ব্যবস্থা করবেন। পাপিয়া কি বুঝতে পারছে না যে তিনি তাদের কত আপন লোক, তাকে কত ভালবাসেন। পাপিয়া মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে চাইলে এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়েই রইল। তিনি গল্প করতে লাগলেন যে তার মায়ের সঙ্গে কত বন্ধুত্ব ছিল তাঁর, তাদের বাড়িতে কতবার গেছেন তিনি। এ-কথা শুনে পাপিয়ার মন একটু ভিজল মনে হল। ক্রমশ সে দু'একটা প্রশ্নের উত্তরও দিতে লাগল, যদিও সাবধানে এবং দু'এক কথায়। কিন্তু যা তিনি শুনতে চাইছিলেন তা কিছুতেই

বললে না সে, বাবার কথা একটি বললে না। পুরন্দরবাবু তার হাতখানা কথা বলতে বলতে ধরলেন এবং ধরেই থাকলেন। হাত সে টেনে নিলে না। নানা কথার মধ্যে একটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠল, বাবাকে সে মায়ের চেয়ে বেশী ভালোবাসত। বাবাই তাকে বরাবর বেশী স্নেহ করেছেন, মা তার দিকে ফিরেও চাইতেন না। কেবল মরবার আগে চুমো খেয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন তিনি.....অনেকক্ষণ.....এখন সে মাকে খুব ভালোবাসে, রোজ রাত্রে মনে পড়ে তাকে। পুরন্দরবাবু দেখলেন মেয়েটির আত্মসম্মান জ্ঞান খুব আছে, কথায় কথায় এত কথা বলে ফেলে হঠাৎ যেন তার হুঁস হল যে সে অন্যায় করছে—চুপ করে গেল আবার। কান্নাকাটি আর করলে না, কিন্তু চুপ করে রইল। বুনো জানোয়ারকে বন্দী করলে সে যেমন চুপ করে থাকে ঠিক তেমনি। একটা অচেনা জায়গায় যাচ্ছে বলেই যে তার কষ্ট হচ্ছিল তা ঠিক নয়। অন্য আর একটা কারণ ছিল।

পুরন্দরবাবু অনুভব করলেন সেটা। বাবার ব্যবহারে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল যে তার! এত সহজে তিনি আসতে দিলেন তাকে একটা অচেনা লোকের সঙ্গে। মনে হল তাঁর বোঝাটা পরের ঘাড়ে কোনক্রমে তুলে দিয়ে বাঁচলেন যেন!

"মেয়েটা অসুস্থ"—পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন....."খুবই অসুস্থ.....ভয়ে ভাবনায় আরও কাবু হয়ে পড়েছে। মাতালটা করেছে কি! এতক্ষণে বুঝতে পারছি সব, কোচোয়ানকে জোরে হাঁকাতে বললেন তিনি। যাদবপুর জায়গাটা ফাঁকা, বাগানও আছে ভদ্রলোকের একটা, ছেলেমেয়েগুলিও ভালো, নতুন জায়গায় গিয়ে শরীরটা সেরে যেতে পারে, তারপর.....। তারপর যে কি হবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না তাঁর মনে—ইতিমধ্যেই ভবিষ্যৎকে রঙিন করে তুলেছিলেন মনে মনে। আর একটা কথাও নিঃসন্দেহে অনুভব করছিলেন তিনি, এখন যা তাঁর মনে হচ্ছে তা ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি, এ মনোভাব জীবনে বদলাবেও না আর কখনও।

আঁকড়ে ধরবার মতো এই তো একটা পেয়েছি কিছু—সম্পূর্ণ জীবন একটা সানন্দে ভাবছিলেন তিনি।

অনেক চিন্তা তাঁর মনের উপর দ্রুতবেগে খেলে যাচ্ছিল, কিন্তু একটাকেও আমল দিলেন না তিনি—পরে ভালো করে ভেবে দেখা যাবে সব। ভালো করে ভেবে না দেখা পর্যন্ত প্রত্যেকটিকেই চমৎকার মনে হচ্ছিল, একেবারে অকাট্য—এ ছাড়া আর কি হওয়া সম্ভব! এই করতে হবে।

ভাবছিলেন—"সবাই মিলে বুঝিয়ে মাতালটার হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে একে। যাদবপুর ওদের বাড়িতেই থাকবে। দেবে না? ভালো করে বোঝালে ঠিক দেবে। প্রথমে কিছুদিনের জন্য যাদবপুর রেখে চলে যাক.....তারপর ক্রমশ আমি আমার কাছে নিয়ে নেব সেইটিই আমার উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আর তো আমি কিছু চাই না। কিন্তু যুগলও হয়তো ওকে চায়। ওই হয়ত ওর জীবনের একমাত্র সুখ........তাহলে ওকে যন্ত্রণা দেয় কেন! যন্ত্রণা দিয়ে সুখ পায় বোধ হয়।"

অবশেষে এসে পৌঁছল তারা। ভবেশবাবুর বাড়িখানা সত্যিই চমৎকার। গাড়ি থামতেই একদল ছেলেমেয়ে কলরব করতে করতে এসে অভ্যর্থনা করল। পুরন্দরবাবু অনেকদিন

আসেননি। তাঁকে দেখে সবাই মহা খুশী—সবাই ভালোবাসে তাঁকে। ওরই মধ্যে যারা বড়, গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই তারা চীৎকার করে উঠল, "আপনার মোকদ্দমার কি হল কাকাবাবু—কত বাকী আর—"

বড়দের অনুকরণে ছোটরাও তাই বলতে লাগল, মহা সোরগোল তুললে সবাই মিলে। নীলিমা দেবী বেরিয়ে এলেন, ভবেশবাবুও তাঁরাও স্মিতমুখে মোকদ্দমার বিষয়ে জানতে চাইলেন।

নীলিমা দেবীর বয়স বছর সাঁইত্রিশ। একটু মোটা হয়ে গেছেন, কিন্তু তবু এখনও সুন্দরী বলা চলে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখে-মুখে বেশ একটা সজীবতা আছে। ভবেশবাবুর বয়স বছর পঞ্চান্ন, চালাক চতুর বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি সদাশয় ব্যক্তি। পুরন্দরবাবুর মতে এঁরাই আদর্শ গৃহস্থ। এই পরিবারটির প্রতি পুরন্দরবাবুর অনুরাগের আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রায় কুড়ি বছর আগে, পুরন্দরবাবুর ছাত্রজীবন শেষ হয়নি তখনও, এই নীলিমা দেবীকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়েছিলেন তিনি। নীলিমা দেবী তাঁর জীবনের প্রথম প্রণয়। প্রচণ্ড হাস্যকর এবং চমৎকার। নীলিমা দেবী কিন্তু বিয়ে করেছিলেন ভবেশ মল্লিককে। পাঁচ বছর পরে দেখা হয়েছিল আবার। সেই উদ্দাম প্রণয় ক্রমশ রূপান্তরিত হয় শান্ত স্নিগ্ধ বন্ধুত্বে। বন্ধুত্বের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল অবশ্য। এক অনির্দিষ্ট ফল্গুধারার গোপন রসে তা সঞ্জীবিত থাকত যেন। কোন কালিমা ছিল না, গ্লানি ছিল না, শুভ্রতা ছাড়া আর কিছু ছিল না এ বন্ধুত্বে। তাঁর জীবনে পবিত্র প্রণয়ের একটি মাত্র নিদর্শন বলে বোধ হয় এর বিশেষ একটা মূল্য ছিল তাঁর কাছে। এই পরিবারের সংস্পর্শে এলে তাঁর সমস্ত মুখোস, সমস্ত বহিরাবরণ খসে যেত যেন। সরল উদার-সহৃদয় পুরন্দরবাবু আত্মপ্রকাশ করতেন সহজভাবে। ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন, তাদের আদর করতেন, নিজের সমস্ত দোষ ত্রুটি অকপটে স্বীকার করতেন, কোন রকম ভড়ং থাকত না। প্রায় বলতেন যে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এদের কাছেই এসে থাকবেন এবার। মুখের কথা নয়, সত্যি ইচ্ছে ছিল তাঁর।

পাপিয়ার কথা সব খুলে বললেন। বেশী বলবার দরকার ছিল না, পুরন্দরবাবুর অনুরোধই যথেষ্ট এ পরিবারের কাছে। নীলিমা সস্নেহে অভ্যর্থনা করে নিলেন মাতৃহীন পাপিয়াকে এবং ছেলেমেয়েরা যখন পাপিয়াকে বাগানে টেনে নিয়ে গেল তখন তিনি পুরন্দরবাবুকে বললেন যে, তাঁর যথাসাধ্য তিনি করবেন, পাপিয়ার কোন কষ্ট হবে না, পুরন্দরবাবু নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আধঘণ্টা পরেই তিনি বললেন, "এবার আমাকে যেতে হবে।" সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। কতদিন তিনি আসেননি, এসেই বলছেন যেতে হবে। আধঘণ্টা পরেই। কিন্তু পুরন্দরবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তাঁর অধৈর্য দেখেও অবাক লাগল সকলের। পুরন্দরবাবু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে পরের দিনই আবার আসবেন, আজ কিন্তু যেতেই হবে। সকলেই লক্ষ্য করল বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন তিনি। হঠাৎ উঠে তিনি নীলিমা দেবীকে বললেন, "শোন, একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে, চল ওঘরে চল।"

পাশের ঘরে গিয়ে বললেন, "অনেকদিন আগে তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে? তোমাকেই বলেছিলাম খালি, ভবেশবাবু এর বিন্দুবিসর্গ কিছু জানেন না। আমার সেই বর্ধমানের ব্যাপারটা?"

"মনে আছে বই কি, প্রায়ই সে গল্প করতেন যে" মৃদু হেসে নীলিমা বললেন।

"গল্প নয়, সত্য কথা, আর তোমাকেই কেবল বলেছিলাম তা। তার পরিচয় তোমাকে দিইনি। সে এই যুগল পালিতের স্ত্রী। সে এখন মারা গেছে—পাপিয়া তারি মেয়ে—মানে আমারই মেয়ে।"

"সত্যি!"

"সত্যি—কোন ভুল নেই এতে"—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন তিনি।

অতিশয় উত্তেজিতভাবে সংক্ষেপে যতটা পারলেন বললেন আবার—সবটাই বললেন।

অপর্ণার নামটি ছাড়া নীলিমা সবই শুনেছিলেন আগে। পুরন্দরবাবু নামটা আগে বলেননি কারণ তাঁর ভয় ছিল যদি কখনও অপর্ণা পালিতের সঙ্গে নীলিমার দেখা হয়ে যায় তখন সে হয়তো ভাববে পুরন্দরবাবুর মতো লোক এই মেয়েকে এত ভালোবেসেছিলেন! কি আশ্চর্য! নীলিমাকে পর্যন্ত নামটা বলেননি তাই।

"ওর বাপ কিছু জানে না?" নীলিমা প্রশ্ন করলেন।

"তা, মানে—হ্যাঁ—সন্দেহ—জানেই ধরতে হবে। ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হয়নি এখনও আমার কাছে। হ্যাঁ জানে বই কি, কাল আজ দু'দিনই যা লক্ষ্য করলাম তাতে তাই তো মনে হয়। কিন্তু কতটা জানে তাই আমাকে জানতে হবে। তাই আমি যেতে চাইছি এখুনি, আজ রাত্রে তার আসবার কথা আছে আমার বাসায়। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না জানলে কি করে, সমস্তটা জানা কি করে সম্ভব! কিন্তু জেনেছে। পূর্ণ গাঙ্গুলীর সম্বন্ধে যে জেনেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার কথা জানলে কি করে? অপর্ণা খুব চতুর মেয়ে ছিল—কারও নাম বলবার পাত্রী সে নয়। তাছাড়া জানই তো—স্বামীদের অদ্ভুত একটা অন্ধ বিশ্বাস থাকে স্ত্রীদের সম্বন্ধে। স্বর্গের দেবতাকে তারা স্বয়ং অবিশ্বাস করে কিন্তু স্ত্রীকে নয়। যুগলের তো কথাই নেই। না, না, মাথা নেড়ো না—আমারই ষোল আনা দোষ তা আমি স্বীকার করছি। শুধু এখন নয় বহুদিন থেকেই স্বীকার করছি আমিই দোষী।.....সে যে সব জানে এ-কথাটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আজ সকালে যে, তার কাছে আমি প্রায় সব স্বীকার করে ফেলেছিলাম সব। কাল রাত্রে হঠাৎ দেখা হয়ে এমন লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম, এমন অভদ্র ব্যবহার করে বসেছিলাম—ছি ছি কি যেন হয়ে গেল একটা! মদ খেয়ে এসেছিল লোকটা, বুঝলে? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মদ খেয়েছিল বলেই এসেছিল, বুকের জ্বালাটা চাপতে পারেনি; তার প্রতি কত বড় অন্যায় যে করা হয়েছে তাই জানাতেই এসেছিল মানে, না এসে পারেনি। অন্যায়টা কে যে করেছে তা-ও সে জানে.....সেই কথাটাই বলতে এসেছিল.....তা না হলে রাত দুপুরে অমন করে আসার মানে হয় না কোনও। দোষ দিচ্ছি না তার.....আমি হলেও ওই করতুম। কাল আজ দু'দিনই আমি গোপন করতে পারিনি নিজেকে। হড়বড় করে কি সব যে বলে বসলাম.....আঃ! আর ঠিক এমন সময় এল যখন আমার মাথার ঠিক নেই। পাপিয়াকেও ঠিক যন্ত্রণা দেয় ও। আমার মনে হয় মনের ঝাল ঝাড়বার জন্যে.....মেয়েটার ওপর দিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে! হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতে পারে ও.....যদিও মানুষ নয়, একটা কীট-বিশেষ.....কিন্তু বিষটুকু ঠিক আছে। আগে লোকটা ভদ্র ছিল—যদিও মেরুদণ্ড বলে কিছু ছিল না। এই ধরনের লোকরাই উচ্ছন্ন যায় শেষ পর্যন্ত। আমি কোন অন্যায় করতে চাই না ওর ওপর—ওর যথাসাধ্য উপকার আমি করব। আমিই দোষী.....আমিই ওর জীবনটা নষ্ট করে দিলাম হয় তো।

লোকটা সত্যিই বন্ধু বলে ভাবত আমাকে। একবার বর্ধমানে হাজার দুই টাকার দরকার হয়েছিল আমার—চাইবামাত্র দিয়ে দিলে, একটা রসিদ পর্যন্ত চায়নি.....বুঝলে....."

"আপনি বড্ড বেশী অস্থির হয়ে পড়েছেন" নীলিমা বললেন।

"আপনার জন্যে ভাবনা হচ্ছে আমার। পাপিয়াকে নিজের মেয়ের মতো যত্ন করব আমি—সে বিষয়ে কোন চিন্তা করবেন না। কিন্তু অনেক কিছু গড়াতে পারে এর থেকে, আপনি সাবধানে কথাবার্তা কইবেন তাঁর সঙ্গে। উচ্ছ্বাসের মুখে যা তা বলে বসবেন না যেন। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।"

পুরন্দরবাবুকে বিদায় দেবার জন্যে সবাই বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ছেলেরাও পাপিয়াকে নিয়ে এল বাগান থেকে। পাপিয়ার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে তাদের। পুরন্দরবাবুকে দেখে পাপিয়া মাথা নীচু করলে—লজ্জায় বোধ হয়। পুরন্দরবাবু সকলের সামনে তার মুখচুম্বন করলেন, বারবার বললেন যে কালই তিনি যুগলবাবুকে নিয়ে আসবেন। পাপিয়া চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তাঁর হাত দুটো ধরে সকরুণ দৃষ্টিতে চাইলে তাঁর দিকে, মনে হল কি যেন বলবে। তিনি তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়লেন।

"কি পাপিয়া"—

পাপিয়া এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, তারপর তাকে নিয়ে ঘরের কোণে চলে গেল একেবারে।

"কি বলবে, কি হয়েছে?"

চুপ করে রইল সে, যেন কথা বলতে পারছে না। নির্নিমেষে কালো চোখের দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর নিবদ্ধ করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে-মুখে সমস্ত ভঙ্গিমায় ফুটে উঠল ভয়—কিসের একটা আতঙ্ক।

"গলায় দড়ি দেবে....." চুপি চুপি বললে, স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো।

"কে গলায় দড়ি দেবে....."

"বাবা। কাল রাত্রে গলায় দড়ি দিচ্ছিল। আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আমাকে বলেছে গলায় দড়ি দিয়ে মরব। অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছে.....কাল আমি দেখেছিলাম—"

"কি বাজে কথা বলছ"—মুখে একথা বললেও পুরন্দরবাবু মনে মনে বিস্মিত হলেন। হঠাৎ পাপিয়া তাঁর পায়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল.....কি যে বলল কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি.....কি করবেন ভেবে পেলেন না। অশ্রুসিক্ত বেদনাতুর দৃষ্টি তুলে সে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। পাপিয়ার এই মূর্তিই আঁকা হয়ে রইল তাঁর মনে.....ভবিষ্যতে স্বপ্নে জাগরণে এই মূর্তিই দেখতে পেতেন তিনি।

হঠাৎ তাঁর হিংসে হল। মেয়েটা সত্যই কি বাপকে এত ভালোবাসে! সমস্ত রাস্তাটা এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে এলেন। বুকটা পুড়ে যেতে লাগল। আজ সকালেই তো বললে যে সে মাকে খুব ভালবাসত। তাঁকে বোধ হয় ঘৃণা করে! বাবা গলায় দড়ি দেবে মানে? মাতালটা সত্যিই আত্মহত্যা করবে না কি।.....না, ব্যাপারটা জানতে হবে। আদি অন্ত তলিয়ে সব জানতে হবে—দেরি করলে চলবে না।

।। ছয়।।

জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

"সকালে এমন গুলিয়ে গেল সব। ভালো করে ভেবে দেখবারই সময় পেলাম না"—পাপিয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলেন পুরন্দরবাবু—"এবার কিন্তু তলিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারটা কতদুর গড়িয়েছে সত্যি।" তলিয়ে দেখবার আগ্রহাতিশয্যে একবার ভাবলেন যুগলের বাসাতেই যাওয়া যাক, কিন্তু তখনই আবার মনে হল "না, আমার বাসাতেই ও আসুক। ইতিমধ্যে আমি আমার মোকদ্দমার কাজ খানিকটা সেরে ফেলি।"

কাজ সারবার জন্য কাগজপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি সুরু করলেন, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলেন যে কাজ এগোচ্ছে না, বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। পাঁচটার সময় চা খাবার জন্যে যখন বেরুলেন, তখন তাঁর প্রথম মনে হল যে সত্যিই বোধ হয় তিনি নিজেই সব করতে গিয়ে আরও জটিল করে তুলেছেন তাঁর মোকদ্দমাকে, তাঁর উকীল তাঁকে দেখলেই যে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে—ঠিকই করে বোধ হয়। কেন হাঁপিয়ে মরছি আমি। কথাটা ভেবেই হাসি পেল তাঁর—"একথাটি কাল মনে হলে কিন্তু কষ্ট হত।" তখনই কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন আবার। অধীরতা আরও বেড়ে গেল। এলোমেলো নানা চিন্তা জাগতে লাগল মনে—বিশৃঙ্খল পরস্পর-সম্বন্ধ-হীন চিন্তা সব—যার কোন মাথামুণ্ডু নেই। ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন।

"নাঃ ওই লোকটিকে চাই"—শেষ পর্যন্ত ভাবলেন "ওর রহস্য সমাধান না করতে পারলে কিছুই করা যাবে না।"

সাতটার সময় বাড়ি ফিরে যুগল পালিতকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন তিনি, তারপর রাগ হল, তারও খানিক পরে কেমন যেন দমে গেলেন। শেষটা ভয় হতে লাগল।

"শেষ পর্যন্ত কি যে হবে ভগবানই জানেন" বারবার আবৃত্তি করতে লাগলেন, বারবার ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরময়, বারবার ঘড়ি দেখতে লাগলেন। অবশেষে নটার সময় যুগল পালিত এল! পুরন্দরবাবুর মনে হল "লোকটা যদি আমাকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে থাকে তাহলে এর চেয়ে বড় সুযোগ আর পাবে না। কিছু মাথার ঠিক নেই, একদম নেই" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আত্মস্থ হলেন তিনি, মনের জোর আবার যেন ফিরে এল হঠাৎ।

স্বচ্ছন্দ সাবলীল কণ্ঠেই তিনি বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যুগল পালিতও একটু বাঁকা হাসি হেসে স্বচ্ছন্দভাবে বসে পড়ল সোফাটায়। তার স্বাচ্ছন্দ্য দেখে অবাক হলেন পুরন্দরবাবু, আগের রাত্রের মতো মোটেই নয়। এ যেন অন্য লোক।

অতিশয় শান্তভাবে পুরন্দরবাবু সব বলে গেলেন: পাপিয়া কি ভাবে গেল কত ভদ্রভাবে তাঁরা অভ্যর্থনা করলেন তাকে, পাপিয়াকে ওখানে নিয়ে যাওয়াতে কতকটা ভাল হল। ক্রমশঃ পাপিয়ার বদলে কথাটা ভবেশবাবুদের সম্বন্ধে হতে লাগল। কি চমৎকার লোক ওঁরা, তার সঙ্গে কতদিনের আলাপ, ভবেশবাবু নিজে কত সহৃদয়, অথচ প্রভাবশালী লোক—ইত্যাদি। যুগল শুনে যাচ্ছিল—খুব যে মন দিয়ে তা নয়। মাঝে মাঝে চোখ তুলে চেয়ে দেখছিল—একটা তীব্র ক্রূর হাসিও যেন উঁকি দিচ্ছিল চোখের কোণ থেকে।

"বড্ড খামখেয়ালী লোক আপনি"—বলেই অতিশয় বিশ্রী রকমের একটা হাসি হাসলে সে।

"আপনার মেজাজটা আজ যেন খারাপ বলে মনে হচ্ছে"—পুরন্দরবাবু বললেন।

"হবেই না বা কেন! আর পাঁচজনের যখন হয়, আমারই বা হবে না কেন"—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠল যুগল, মনে হল যেন ওৎ পেতে ছিল।

"তাতো বটেই"—হেসে উত্তর দিলেন পুরন্দরবাবু, "না, আমি ভাবছিলাম কিছু হয়েছে বুঝি।"

"হয়েছে বই কি!" যুগল এমনভাবে উত্তর দিলে যেন কোন কিছু হওয়াটাই একটা কৃতিত্ব।

"কি হয়েছে?"

যুগল চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

"পূর্ণবাবু শেষকালে ঠকালেন আমায়—পূর্ণ গাঙ্গুলী কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ একজন....."

"দেখা করলেন না আপনার সঙ্গে? দারোযান বুঝি বললেন বাড়িতে নেই?"

"এবার বাড়িতেই ছিলেন, আমি প্রবেশের অনুমতিও পেয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল কিন্তু তিনি মারা গেছেন! কাল মহাসমারোহ-সহকারে তাঁর শবযাত্রা বেরুবে শুনলাম।"

"সে কি! পূর্ণবাবু মারা গেছেন?"

পুরন্দরবাবু অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন, যদিও বিস্মিত হবার কারণ ছিল না কিছু। "হ্যাঁ। ছ'বছর যিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন কাল দুপুরবেলা তিনি মারা গেছেন, অথচ আমি খবর পাইনি কিছু। কাল দুপুরবেলাই ভাবছিলাম ভদ্রলোকের খবরটা নিয়ে আসি একবার। আহা, মেনিন্‌জাইটিস্ হয়েছিল! দেখা করবার সুযোগ যখন ঘটল, গিয়ে মড়া দেখলুম। একেই বলে কপাল! তাদের বলে এলাম, বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আমাদের। কিন্তু ছ'বছর ধরে আমার সঙ্গে উনি যে ব্যবহারটি করেছেন--দীর্ঘকালের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব—সে সম্বন্ধে এখন কি করা উচিত বলুন তো? ওঁর জন্যেই আমার এখানে আসা....."

"তা আর কি হবে বলুন"—পুরন্দরবাবু হেসে বললেন—"উনি তো আর ইচ্ছে করে মারা যাননি।"

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে যুগল বলে উঠল, "স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করছি যে!" একটা অদ্ভুত কুটিল হাসি খেলে গেল তার চোখে। পুরন্দরের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন বিষ ক্ষরিত হচ্ছে যেন। কিন্তু এভাবে বেশীক্ষণ থাকল না। পরক্ষণেই তার অধরেও ব্যঙ্গ-তিক্ত হাসি ফুটে উঠল একটা ধীরে ধীরে।

"ও কথার মানে কি"—যেন কিছু বোঝেননি এমনিভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"স্বামীর ভূমিকা মানে স্বামীর ভূমিকা—ভূমিকা" টেবিল চাপড়ে উত্তর দিল যুগল।

"আপনি অভিনয় করছেন?"

"নিশ্চয়! শুধু অভিনয় করছি না—মহত্ত্ব সহকারে করছি"—সমস্ত দন্ত নীরবে বিকশিত করে একটা অতি কুৎসিত হাসি হাসলে যুগল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

"আপনার বুকের পাটা আছে, একথা মানতেই হবে"—পুরন্দরবাবু বললেন অবশেষে।

'কেন, একথা বললাম বলে? তাহলে আনান কিছু—বেশী না এক বোতল।"

"বেশ তো, কি খাবেন আপনি?"

"শুধু আমি কেন, আপনিও খাবেন আজ। খাবেন না?" একটা আদেশের সুর যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল যুগলের কণ্ঠস্বরে—চোখের দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল যেন।

"বেশ তো। কি আনাব? শ্যামপেন?"

"হ্যাঁ, শ্যামপেনই ভাল। হুইস্কি এখন চলবে না।"

পুরন্দর উঠে গিয়ে চাকরকে হুকুম করলেন।

"দীর্ঘ ন'বৎসর পরে পুনর্মিলন উৎসবটি বেশ করে জমানো যাক—"

একটা বেখাপ্পা বেসুরো হাসি হেসে যুগল বাগিয়ে বসল।

"পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে এক আপনিই রইলেন শুধু। পূর্ণবাবু গেলেন।"

কবি গেয়েছেন

"মধুনিশি পূর্ণিমার আসে যায় বারবার
সে তো রে ফেবে না আর যে গেছে চলে"

ভঙ্গীভরে হাত দু'টি উলটে হাসিমুখে পুরন্দববাবুর দিকে চেয়ে বইল। "যা বলবি বলে ফেল না ব্যাটা—ইঙ্গিত-ফিঙ্গিত ভালো লাগে না আর" পুরন্দরবাবু মনে মনে বলছিলেন। রাগ ক্রমশই বাড়ছিল তাঁর. আত্মসম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল।

"আচ্ছা একটা কথা বলুন তো" বিরক্তি চেপে পুরন্দরবাবু বললেন, "পূর্ণ গাঙ্গুলী যদি আপনার প্রতি অন্যায়ই করেছিলেন তাঁর মৃত্যুতে তো আপনার আনন্দিতই হওয়া উচিত। আপনি ক্ষুব্ধ হচ্ছেন কেন?"

"আনন্দিত! আনন্দিত হতে যাব কেন?"

"আমার তো মনে হয় আনন্দিত হওয়াই উচিত।"

"হি—হি! আমার মনোভাব ঠিক ধরতে পারেননি আপনি। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন—শত্রু মরে যাওয়া ভালো, কিন্তু বেঁচে থাকা আরও ভালো। হি—হি!"

"কিন্তু আপনি তো তাকে একটানা পাঁচ বচ্ছর দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ক্লান্তি আসা উচিত ছিল"—একটু অভদ্ররকম খোঁচা দিয়ে পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন।

"আপনি কি মনে করেন আমি তখন জানতাম.....আমি কি জানতাম তখন?" যুগল পালিতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। অন্ধকার কোণ থেকে লাফিয়ে হঠাৎ আলোতে বেরিয়ে এল যেন সে। বেরিয়ে এসে বাঁচল যেন। এতদিন ধরে যে জটিল প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে চাইছিল সে কিন্তু পারছিল না—হঠাৎ আড়াল আবডালে সরে যাওয়াতে চক্ষুলজ্জার দায় থেকে সে বাঁচল যেন।

"আমাকে আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো?"

অপ্রত্যাশিত রকম নতুন একটা দীপ্তি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। চেহারাই বদলে গেল। এতক্ষণ তার মুখভাবে কুৎসিত কর্দযতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। পুরন্দরবাবু ঘাবড়ে গেলেন একটু।

"আপনি কিছুই জানতেন না, এ কি সম্ভব?"

"আমি জানতাম সেইটেই কি সম্ভব? সেইটেই কি সম্ভব? আশ্চর্য লোক এই শহরের

ভদ্রলোকরা। আপনাদের বিচারে মানুষে আর কুকুরে কোন তফাৎ নেই, আর আপনারা সবাইকে বিচার করেন নিজেদের হীন মানদণ্ড দিয়ে। সুস্থ মস্তিষ্কে বহাল তবিয়তেই একথা বলছি আপনার মুখের উপর!"

প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল সে টেবিলের উপর। মেরেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, কারণ শব্দটা খুব জোরে হল।

পুরন্দরবাবু গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

"শুনুন যুগলবাবু, আপনি জানতেন কি জানতেন না তা আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক, তা আপনি বুঝতেই পারছেন। আপনি যদি না জেনে থাকেন ভালোই, যদিও.....আর একটা কথাও আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এসব কথা আমাকেই বা বলছেন কেন—"

"আপনাকেই ঠিক বলছি না আমি, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে লক্ষ্য করেই আমি বলিনি কিছু"—চক্ষু আনত করলে যুগল।

শ্যামপেন নিয়ে চাকর প্রবেশ করল।

"এই যে" সোল্লাসে যুগল বলে উঠল। চাকরটা আসাতে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

"গ্লাস আন দিকি বাবা এইবার। বাঃ, আর কিছু চাই না। খুলেই এনেছ বেশ বেশ। যে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ত্যজিতে মুকুট দণ্ড—আসুন। যাও তুমি যাও....."

চাকরটা চলে গেল। যুগলের উৎসাহ সঞ্জীবিত হল, পুরন্দরবাবুর দিকে সে উদ্ধত দৃষ্টি মেলে চাইলে আবার।

"স্বীকার করুন" হঠাৎ সে বলে উঠল—"স্বীকার করুন যে এসব মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয় আপনার কাছে—রীতিমত প্রাসঙ্গিক, ভীষণ কৌতূহলজনক। এত বেশী যে এই মুহূর্তে যদি আমি সবটা না বলে চলে যাই রাত্রে ঘুম হবে না আপনার।

"কি যে বলছেন—"

"ঠিক বলছি।"

একটা অদ্ভুত হাসিতে তার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আসুন শুরু করা যাক—"

গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল। একগ্লাস পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে।

"আসুন, প্রথমেই প্রিয় পূর্ণবাবুর উদ্দেশ্যে পূর্ণ গ্লাস শেষ করা যাক—" বলেই গ্লাসটা তুলে ঢকঢক করে শেষ করে ফেললে।

"আমি পূর্ণবাবুকে আর টানব না!"

"কেন! অমন একটা পুণ্য-স্মৃতি!"

"আপনি এখানে আসবার আগেই খেয়ে এসেছিলেন একটু নয়?"

"হ্যাঁ, একটু। কেন?"

"না, এমনি। কাল রাত্রে আমার মনে হয়েছিল, আজ সকালে আরও বেশী করে মনে হয়েছিল যে অপর্ণার মৃত্যুটা বড্ড মর্মান্তিক হয়েছে আপনার পক্ষে।"

"মর্মান্তিক হয়নি তা-ই বা কে বললে আপনাকে এখন?"

ঠিক যেন স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠল যুগল।

"আহা, আমি সেভাবে বলছি না কথাটা। পূর্ণবাবুর সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা ভুলও তো হতে পারে—এতবড় গুরুতর ব্যাপারে ভুল ধারণা নিয়ে থাকলে—"

যুগলের মুখে চতুর হাসি ফুটে উঠল একটা। বাঁ চোখটা ছোট করে কুঞ্চিত করলে সে একবার।

"পূর্ণ গাঙ্গুলীর ব্যাপার কি করে আবিষ্কার করলাম তা জানতে আগ্রহ হচ্ছে আপনার নিশ্চয়।"

পুরন্দরবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন তিনি।

"না, আমার আগ্রহ হবে কেন!"

"বোতল-ফোতল সুদ্ধ ব্যাটাকে এই মুহূর্তে দূর করে দিলে কেমন হয়" পুরন্দরবাবু মনে মনে গজরাচ্ছিলেন। হঠাৎ সমস্ত মুখটা আরও লাল হয়ে গেল তাঁর।

"সব বলছি, ব্যস্ত হবেন না। আপনার—কৌতূহল হয়েছে তা বুঝতে পারছি, হওয়াটাই তো জীবন্ত প্রাণের লক্ষণ, আপনি যে একটা প্রাণবন্ত লোক তাতে আর সন্দেহ কি। হি হি। দিন একটা সিগারেট দিন.....গত ফাল্গুনের পর থেকে আর.....

"এই যে নিন—"

"গত ফাল্গুনের পর থেকেই আমার সর্বনাশ হয়েছে, তারপর থেকেই উচ্ছন্ন গেছি, বুঝলেন? কেমন করে কি হল সব বলছি—শুনুন। যক্ষ্মা ব্যাধিটা, আপনি তো জানেন, ভারী এক অদ্ভুত ব্যায়রাম। যক্ষ্মা রোগী কখনও বিশ্বাস করে না যে তার মৃত্যু আসন্ন অথচ ফট করে যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে সে। মৃত্যুর ঠিক পাঁচঘণ্টা আগে অপর্ণা প্ল্যান করছিল যে পনের দিন পরে সে তার পিসির কাছে বেড়াতে যাবে—পিসি থাকে ত্রিশ মাইল দূরে। অনেক মেয়ের একটা বদ অভ্যাস আছে আপনি জানেন বোধ হয়—শুধু মেয়েদের কেন তাদের প্রণয়ীদেরও আছে—প্রেমপত্রগুলি তারা পুড়িয়ে না ফেলে সযত্নে রেখে দেয়। কাগজের টুকরোটি পর্যন্ত তুলে রাখে। অনেক সময় আবার সন তারিখ মিলিয়ে গুছিয়ে রাখে থাক করে। এতে যে কি সুখ পায় তারা—তা তারাই জানে। হয় তো স্মৃতিসুখ, বলতে পারি না। অপর্ণা পিসির বাড়ি বেড়াতে যাবার আয়োজন করছিল যখন মৃত্যুর পাঁচঘণ্টা পূর্বে—তখন বুঝতেই পারছেন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার আশা ছিল যে ভালো হয়ে যাবে। ফলে হল কি—সে যখন হঠাৎ মারা গেল তখন তার ড্রয়ারে রৌপ্য এবং মুক্তাখচিত একটি আবলুস কাঠের বাক্স থেকে গেল। চমৎকার বাক্সটি। চাবিও সেই ড্রয়ারে ছিল। সেই বাক্সেই সব ছিল—সমস্ত। বিগত কুড়ি বছরের সমস্ত চিঠিপত্র সন তারিখ মিলিয়ে চমৎকার করে গুছিয়ে রেখে দিয়েছিল সে। পূর্ণবাবু একটু কবি-প্রকৃতির লোক ছিলেন (একবার একটা মাসিক পত্রে প্রেমের গল্পও লিখেছিলেন বুঝি একটা)—তাঁর চিঠি প্রায় শতাধিক ছিল—সবই তো পাঁচ বছর ধরে লিখেছেন। কতকগুলো চিঠিতে অপর্ণা আবার নিজের হাতে নোটও লিখেছে কিছু কিছু। স্বামীর দিক দিয়ে জিনিসটা বেশ উপভোগ্য—কি বলেন?

পুরন্দরবাবু বিদ্যুৎগতিতে ভেবে দেখলেন—না, তিনি কোন চিঠি অপর্ণাকে লেখেননি! না কিচ্ছু না। দু'খানা চিঠি অবশ্য লিখেছিলেন—কিন্তু দুটোতেই অপর্ণার নির্দেশ অনুসারে ঠিকানা ছিল যুগলের নামে। অর্থাৎ দুটোই নিরামিষ চিঠি। অপর্ণার শেষ চিঠির উত্তরই দেননি, দেবার প্রবৃত্তি হয়নি।

গল্প শেষ করে যুগল মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে পুরন্দরের দিকে চেয়ে রইল। চেয়েই রইল পুরো এক মিনিট ধরে।

"আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না যে—"

"কোন কথার?"

"জিনিসটা স্বামীর পক্ষে বেশ উপভোগ্য, কি না—"

"আমি আর কি বলব"—পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন এবং ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

"আপনি ঠিক ভাবছেন—এ লোকটা কি, ঘরের কথা বাইরে বলে বলে বেড়াচ্ছে! হি হি। ঠিক ভাবছেন আপনি—আপনাকে চিনি তো—ভীষণ রুচি-বাগীশ লোক আপনি—"

"আমি কিছুই ভাবছি না। আপনার আচরণে অপ্রত্যাশিত কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো। পূর্ণ গাঙ্গুলীকে জীবিত কেন চাইলেন তা-ও বুঝতে পারছি, আপনার এ দাবিকে শ্রদ্ধা করতেও ইচ্ছে করছে—"

"আচ্ছা, পূর্ণবাবুকে পেলে কি করতুম আপনি মনে করেন—"

"তা কি করে বলব?"

"আপনি বোধ হয় ভাবছেন ডুয়েল লড়তুম—অ্যাঁ নয়?"

"আঃ কি বিপদ"—একটু অধীরভাবে বলে উঠলেন পুরন্দরবাবু, তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না—"আমার তো মনে হয় এ অবস্থায় লোকে বাজে বকবক করে না, অতীত নিয়ে হা-হুতাশ করে না, নালিশও করে না কারও উপর, কোন রকম বাজে ভাবভঙ্গীর ধার দিয়েই যায় না—এ অবস্থায় যারা ভদ্রলোক তারা যা করবার সোজা করে ফেলে।"

"হি—হি—হি। আমি বোধ হয় ভদ্রলোক নই—"

"সে আপনি বুঝুন। যদি ভদ্রলোক নন তাহলে জীবিত পূর্ণ গাঙ্গুলীকে চাইছিলেন কেন....."

"পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাটা অন্যায় কি! ঠিক এমনিভাবে এক বোতল মদ আনিয়ে খেতাম দু'জনে—"

"তিনি মদ খেতেনই না আপনার সঙ্গে।"

"কেন? আপনি খাচ্ছেন তো! আপনার চেয়ে কি হিসেবে বড় তিনি?"

"আমিও আপনার সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছি না ঠিক।"

একটু অপ্রতিভ ও মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন পুরন্দরবাবু।

"ও! হঠাৎ আভিজাত্য উথলে উঠল যে আপনারও দেখছি।"

"মহা জুলুমবাজ লোক দেখছি আপনি। নিরীহ স্বামী ছাড়া আপনি আর যে কিছু হতে পারেন তা ধারণা ছিল না আমার!"

"নিরীহ স্বামী! মানে?" যুগল কান খাড়া করে উঠে বসল।

"মানে খুব সরল। স্বামী বহুপ্রকার হন—নিরীহ স্বামী একটা টাইপ।"

"আর জুলুমবাজ? জুলুমবাজ বললেন যে এখনি—"

"ঠাট্টাও বোঝেন না। উঠুন, বাড়ি যান এবার—"

"জুলুমবাজ কথাটি কি অর্থে ব্যবহার করলেন বলুন না খুলে—দোহাই আপনার! জুলুমবাজ—অ্যাঁ—? জুলুমবাজ!"

"যথেষ্ট হয়েছে, বাড়ি যান এবার। উঠুন, অনেক রাত হয়েছে।"

পুরন্দরবাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল।

"যথেষ্ট হয়নি মোটেই" ফোঁস করে উঠল যুগল, "আপনার হয় তো আর ভালো লাগছে না কিন্তু যথেষ্ট হয়নি মোটেই। আমার সঙ্গে বসে মদ খেতেই হবে আপনাকে। না খেলে ছাড়ছি না। আসুন—গ্লাস নিন।"

"আপনি যাবেন কি না?"

"যাব। কিন্তু তাব আগে মদ খাব। আর আপনাকে আমার সঙ্গে মদ খেতে হবে। খেতেই হবে।"

তার কণ্ঠস্বরে কোন রসিকতা বা ভাঁড়ামির সুর ছিল না। হঠাৎ সে অন্য লোক হয়ে গেল যেন। পুরন্দরবাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন।

"আসুন, খান এক গ্লাস আমার সঙ্গে, ক্ষতিটা কি?"

পুরন্দরবাবুর হাতটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল যুগল। স্পষ্ট বোঝা গেল, একসঙ্গে মদ খাওয়ার গুরুতর মানে আছে অন্য কিছু।

"কিছু ক্ষতি নেই—আসুন। কিন্তু বোতলে আর আছে কি কিছু?"

"হ্যাঁ, ঠিক দু'টি গ্লাস আছে। রীতিমত সভ্য রীতিতে গ্লাস 'ড্রিঙ্ক' করতে হবে কিন্তু—"

সভ্য রীতি অনুযায়ী গ্লাস ড্রিঙ্ক করা হল। শেষ করে পুরন্দরবাবু বললেন—"আচ্ছা লোক আপনি।"

যুগল নিজের রগ দুটো টিপে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে। পুরন্দরবাবু প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করতে লাগলেন এইবার যুগল তার শেষ এবং আসল কথাটি বলবে। কিন্তু যুগল কিছুই বললে না, চেয়ে রইল কেবল এবং একটু পরে তাঁর দিকে ফিরে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

পুরন্দরবাবু আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। চীৎকার করে বলে উঠলেন, "কি বিপদ, কি চান আপনি আমার কাছে! মাতলামি করবার আর জায়গা পেলেন না?"

"চেঁচাবেন না। চেঁচাচ্ছেন কেন, চেঁচাবার কি আছে। আমি মাতলামি করছি না। আপনি আমার চক্ষে এখন কি জানেন—প্রমাণ চান?"

হঠাৎ, সে পুরন্দরবাবুর হাতখানা তুলে নিয়ে চুম্বন করলে। ঘাবড়ে গেলেন পুরন্দরবাবু।

"এই, এই তার প্রমাণ। আর কিছু বলবার নেই, এবার আমি চললাম।"

"যাবেন না, থামুন। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।"

যুগল পালিত দুয়ারের কাছে ফিরে দাঁড়াল।

পুরন্দরবাবু বললেন (তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যুগলের চোখের দিকে না চাইতে) "কাল আপনাকে ভবেশবাবুদের ওখানে যেতে হবে। তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ও হবে, তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে আসবেন। ভুলবেন না, যেতেই হবে।"

"নিশ্চয়। যাব বই কি। নিশ্চয়—হ্যাঁ—যুগল মাথা এবং হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গী করল যে পুরন্দরবাবুর মনে আর আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না।

"পাপিয়াও অনেক করে বলে দিয়েছে। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাকে যে আপনাকে নিশ্চয় নিয়ে যাব।"

"পাপিয়া!"—যুগল পালিত ঘুরে দাঁড়াল ভালো করে—"পাপিয়া? পাপিয়া আমার কাছে এখন কি এবং কতটা তা জানেন? কোনও ধারণা আছে আপনার" হঠাৎ পাগলের দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে।

"আচ্ছা থাক—সে কথা পরে হবে, পরে হবে। আর একটা কথা শুনুন আগে, একসঙ্গে বসে মদ খাওয়াতেই সন্তুষ্ট নই আমি," হঠাৎ সে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং নির্নিমেষে চেয়ে রইল।

"আবার কি চাই—"

"আমাকে চুমুও খেতে হবে।"

"পাগল না কি! কি বলছেন যা তা—"

"হতে পারে, কিন্তু চুমু খেতেই হবে আপনাকে। খান, আসুন। এখুনি তো আমি আপনার কর-চুম্বন করলাম।"

পুরন্দরবাবু বজ্রাহতবৎ নিস্পন্দ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। হঠাৎ ঝুঁকে—যুগল পালিতের মাথাটা তাঁর বুকের কাছে পড়েছিল প্রায়—চুম্বন করলেন তাঁকে। মুখে ভীষণ মদের গন্ধ।

"ব্যাস্ ব্যাস্ ব্যাস্ ব্যাস্"—চীৎকার করে উঠল যুগল, চোখ দুটো জ্বলে উঠল যেন উন্মত্ত হিংস্রতায়—"ব্যাস! এইবার সব খুলে বলি শুনুন—আপনাকে সন্দেহ হয়েছিল আমার। এর পর আর কারও ওপর কি বিশ্বাস হয়?"

হঠাৎ কেঁদে ফেললে সে। ঝর ঝর করে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল।

"সুতরাং বুঝতে পারছেন, আপনি এখন আমার একমাত্র বন্ধু।"

ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।

পুরন্দরবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"মাতলামি করে গেল লোকটা"—হাত নেড়ে খানিকক্ষণ পরে বললেন, "নাঃ—মাতলামি ছাড়া আর কিছু নয়। স্রেফ মাতলামি!"

পরদিন সকালে পুরন্দরবাবু যুগলের প্রতীক্ষা করছিলেন, তাকে নিয়ে ভবেশবাবুর ওখানে যেতে হবে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। সিগারেট ধরালেন একটা। একটা কথা কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না—মনে হচ্ছিল কাল রাত্রে তাঁর গালে কে যেন চড় মেরে গেছে একটা।

"হুঁ....সব জানে বুঝতে পেরেছে সমস্ত। পাপিয়ার ওপর দিয়ে শোধটা তুলবে" কথাটা ভেবেই ভয় হল তাঁর। পাপিয়ার সুন্দর মুখখানি ভেসে উঠল মনের উপর—বিষাদ-মাখানো মুখখানি। একটু পরেই আবার তাকে দেখতে পাবেন মনে হওয়া মাত্র হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। পাপিয়া তাঁরই যে।

"না, তর্কের কোন অবসর নেই এতে। পাপিয়া আমারই। ওই এখন আমার জীবন এবং জীবনের লক্ষ্য। অতীতের স্মৃতি নিয়ে কি হবে, গালে চড় মারলেই বা কি এসে যায়। জীবনে কি করলাম এতদিন? জঞ্জাল আর জ্বালা ছাড়া কি বা পেয়েছি। কিন্তু এইবার সব ঠিক হয়ে যাবে, সব বদলে গেছে এর মধ্যেই!"

একটু পুলকিত হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু একটা ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল ক্রমাগত। "বেশ বুঝতে পারছি পাপিয়াকে দিয়েই ও জব্দ করতে চায় আমাকে। পাপিয়াকে কষ্ট দিচ্ছে সেইজন্য। এইভাবেই প্রতিশোধ নেবে। হুঁ.....। না, কাল যা করেছে তা আর করতে দিচ্ছি না অবশ্য"—মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল তার—"বারোটা বাজে—এখনও পর্যন্ত পাত্তা নেই তার—ব্যাপার কি!"

প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সাড়ে বারোটা বাজল। অধীর হয়ে উঠলেন শেষে। হবে না। হঠাৎ একটা কথা মনে হল—অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছিল—যুগল হয়তো ইচ্ছে করে আসছে না। পরে এসে কাল রাত্রের মতো আবার একটা নাটক করবে হয় তো। রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠল তাঁর। "সে ভালো করেই জানে যে আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি—এও জানে পাপিয়া তার আশায় পথ চেয়ে আছে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে যাবই বা কি করে আমি.....আঃ।"

আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, একটা বাজতেই যুগলের বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন যুগল কাল রাত্রে বাড়ি ফেরেনি, সকাল ন'টার সময় এসেছিল, পনের মিনিট থেকেই আবার বেরিয়ে গেছে। পুরন্দরবাবু বন্ধ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে চাকরের কথাগুলো শুনলেন, তারপর তালাটা ধরে অকারণে টানলেন দু'একবার অন্যমনস্কভাবে। তারপর সহসা সচেতন হয়ে লজ্জিত হলেন একটু। বাড়ির মালিক তেতলায় থাকেন। চাকরটাকে বললেন, তাকে একবার ডেকে দিতে।

বাড়ির মালিক লোকটি ভালই। ভদ্রলোক। পাপিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর সব শুনে বললেন, "পাপিয়ার জন্যেই আমি এতদিন কিছু বলিনি মশাই। তা না হলে এতদিন ওরকম লোককে দূর করে দিতাম। উনি প্রথমে একটা হোটেলে এসে উঠেছিলেন—ওঁর রকম-সকম দেখে হোটেলওয়ালা দূর করে দিলে। কি বলব মশাই—অত বড় মেয়ে সঙ্গে রয়েছে—একদিন এক মাগী এনে হাজির! চীৎকার করে বলছে আবার—'আমি যদি ইচ্ছে করি—এই তোর মা হতে পারে"—আর সে মাগী কি বললে শুনবেন? বললে—"ঝাঁটা মারি আমি অমন মেয়ের মুখে। মেয়ের মায়ের মুখেও—সে যে কি কাণ্ড মশাই—"

"সত্যি?" পুরন্দরবাবু সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

"আমি স্বকর্ণে শুনেছি। লোকটা মাতাল অবশ্য খুবই হয়েছিল—জ্ঞানগম্যি কিছুই ছিল না, কিন্তু নিজের মেয়ের সামনে ওরকম বেলেল্লাপনা করাটা উচিত কি, মেয়েটা ভাববে কি, নিতান্ত ছেলেমানুষ তো নয়। মেয়েটা খালি কাঁদত, কি আর করবে। আরও ইচ্ছে করে কাঁদাত মেয়েটাকে। সেদিন আবার এক কাণ্ড হয়েছিল সামনের বাড়িতে। এক কেরানী গলায় দড়ি দিয়েছিল। দলে দলে লোক দেখতে গেল। চারদিকে ভীড়। যুগলবাবু বাড়ি ছিলেন না, মেয়েটা ভীড়ে মিশে চলে গেছে সেখানে, দেখলাম মড়াটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে। কি দৃষ্টি চোখের! আমি তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে এলাম। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিল, সাদা মূর্তি—এসেই শুয়ে পড়ল—দেখি মূর্ছা গেছে। মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে জ্ঞান হল। তারপর থেকেই মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেছে। যুগলবাবু বাড়ি এলেন—এসে মেয়েটাকে খামচাতে লাগলেন। ও মারে না কখনও—কেবল খামচায়। তারপর থেকে মদ খেয়ে যখনই বাড়ি ফেরে মেয়েটাকে ভয় দেখায় কেবল—আমিও গলায় দড়ি দেব। তোর জ্বালাতেই গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে। এই দেখ দড়ি এনেছি। সত্যি সত্যি একটা দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে দেখায়—আর

মেয়েটা ভয়ে চেঁচাতে থাকে—দু'হাত দিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে কেবলই বলতে থাকে 'কিচ্ছু করব না, তুমি যা বলবে শুনব, গলায় দড়ি দিও না বাবা।' অত্যন্ত করুণ দৃশ্য মশাই। যাচ্ছেতাই—"

যদিও পুরন্দরবাবু এমনই কিছু একটা প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু যা শুনলেন তা এতই বীভৎস যে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না তাঁর।

বাড়িওলা আরও অনেক কিছু বললেন। বললেন—পাপিয়া দোতলার জানালা থেকে ঠিক লাফিয়ে পড়ত একদিন তিনি যদি না থাকতেন সে সময়।

পুরন্দর তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে গেলেন—পা টলছিল তাঁর।

"ব্যাটাচ্ছেলেকে ধরে চাবকাব আমি".....এই কথাটাই মনে হচ্ছিল কেবল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই একটা কথাই বারম্বার আবৃত্তি করতে লাগলেন তিনি মনে মনে।

তাঁকে একলাই যেতে হল শেষ পর্যন্ত ভবেশবাবুর ওখানে। কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা একটা চৌমাথায় দাঁড়লে, সারি সারি অনেক গাড়ি দাঁড়িয়েছে, শোভাযাত্রা চলেছে একটা। প্রচুর ভীড়। হঠাৎ পুরন্দরবাবুর চোখে পড়ল একটা গাড়িতে যুগল রয়েছে। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে হাসলে একটু। বেশ স্ফূর্তিতে আছে মনে হল—তাঁকে ইশারা করে ডাকতেও লাগল। পুরন্দরবাবু গাড়ি থেকে নেমে ভীড় ঠেলে, পুলিশ ঠেলে, প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে তার গাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং চীৎকার করে বললেন, "কি ব্যাপার কি? আপনি এলেন না যে! এখানে কি করছেন?"

"ঋণ শোধ করছি। চেঁচাবেন না অত, ঋণ শোধ করছি মশাই" চোখ মট্‌কে মুচকি হেসে বলল—"বন্ধুবর পূর্ণ গাঙ্গুলীর শবানুগমন করছি—ঋণ—ঋণ শোধ।"

ভয়ানক রাগ হল পুরন্দরবাবুর।

"আঃ কি যা তা বলছেন। আবার মদ খেয়েছেন নাকি? আসুন, নামুন গাড়ি থেকে, আসুন আমার সঙ্গে।"

"ক্ষমা করবেন, পারব না। মহৎ কর্তব্য এটা—"

"জোর করে টেনে নামিয়ে নেব"

"আমি চেঁচাব তাহলে, ঠিক চেঁচাব" গাড়ির ওদিককার কোণে সরে গেল। যেন ভারি একটা মজার রসিকতা হচ্ছে। পুরন্দরবাবু মনে মনে গাল দিতে দিতে নিজের গাড়িতে ফিরে গেলেন।

"যাক্‌গে। ওরকম লোককে নিয়ে যাওয়াও যায় না ভদ্র পরিবারে" এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু মনটা বিরক্তই হয়ে রইল।

নীলিমাকে গিয়ে সব বললেন। বাড়িওয়ালার কাছ থেকে যা শুনেছিলেন সব, তাছাড়া শবানুগমনের কথাও। শুনে তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

"আপনার জন্যে ভয় হচ্ছে আমার। ওর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না।"

"ও কি করবে আমার! একটা হতভাগা মাতাল বই তো নয়।"—পুরন্দরবাবু যেন চটেই গেলেন কথাটা শুনে, একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—"আমি কি ভয় পেয়েছি ভাবলে না কি? তাছাড়া সম্পর্ক তো রাখতেই হবে এখন পাপিয়ার জন্যে, পাপিয়ার কথাটা ভেবে দেখ।"

পাপিয়ার এদিকে অসুখ করেছিল। কাল থেকেই জ্বর হয়েছে। কোলকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে তিনি এসে পড়তে পারেন।

ষোল কলা পূর্ণ হল যেন। পুরন্দরবাবু অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন।

নীলিমা তাঁকে পাপিয়ার কাছে নিয়ে গেলেন।

"কাল সমস্তক্ষণ ওর কাছেই ছিলাম"—ঘরের বাইরে একটু থেমে নীলিমা বললেন—"মেয়েটা খুব চাপা স্বভাবের, আত্মসম্মানও খুব। এখানে আছে সেজন্যে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। ওর বাবা যে ওকে এমনভাবে ত্যাগ করেছে এইটে ওর প্রাণে বড্ড লেগেছে। আমার মনে হয় এই ওর অসুখের আসল কারণ।"

"ত্যাগ করেছে মানে? ত্যাগ করেছে বলছ কেন?"

"সম্পূর্ণ অচেনা বাড়িতে এমনভাবে পাঠিয়ে দেওয়া মানেই তো—বিশেষত এমন লোকের সঙ্গে যে.....যে লোকটাও সম্পূর্ণ অচেনা।"

"কি বিপদ, আমি তো ওকে জোর করে নিয়ে এসেছি—আমি তো—এতে কোন—কিন্তু পাপিয়া কি তাই মনে করেছে—ওইটুকু মেয়ে এতটা বোঝে? এতটা বোঝবার ক্ষমতা আছে ওর! যুগল আসবে না এখানে, কি করব বল!"

পুরন্দরবাবুকে একা দেখে পাপিয়া বিস্মিত হল না, একটু ম্লান হাসি হেসে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল সে। পুরন্দরবাবু অপটুভাবে একটু আদর করবার চেষ্টা করলেন, ভয়ে ভয়ে গায়ে মাথায় হাত দিলেন—পাপিয়া নিস্পন্দ হয়ে রইল। একবার ফিরে চাইল না পর্যন্ত। বাইরে বেরিয়ে এসে পুরন্দরবাবু কেঁদে ফেললেন হঠাৎ।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তারবাবু এলেন এবং সব দেখে শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, আমাকে আগেই খবর দেওয়া উচিত ছিল। মাত্র কাল থেকে জ্বর হয়েছে একথা বিশ্বাসই করতে চাইলেন না তিনি প্রথমে।

"আজ রাতটা কিভাবে কাটে তারই উপর নির্ভর করছে সব—" অবশেষে এই সিদ্ধান্তে এসে অনেক রকম 'ইনস্ট্রাক্‌শনস্‌' (ব্যবস্থা) দিয়ে বলে গেলেন যে কাল আবার আসবেন সকালেই। গতিক ভাল মনে হচ্ছে না তাঁর।

পুরন্দরবাবু রাতটা থাকতেন কিন্তু নীলিমা দেবী বললেন, "ওর বাপকে আর একবার আনবার চেষ্টা করুন। একথা শুনেও আসবেন না এমন পাষণ্ড কি হতে পারে মানুষ!"

"চেষ্টা!"—পুরন্দরবাবু হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন যেন—"হাত পা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসব তাকে, যদি না আসতে চায় এবার!" যুগল পালিতকে হাত-পা বেঁধে নিয়ে আসার দৃশ্যটা ফুটে উঠল তাঁর মনে—হঠাৎ রাগ চড়ে গেল। হাত-পা বেঁধেই আনতে হবে, যা থাকে কপালে।

"কাল আমার দুঃখ হচ্ছিল—ভাবছিলাম অন্যায় করেছি লোকটার প্রতি। এখন কিছু দুঃখ হচ্ছে না—মানুষ নয়, একটা পশু।—"

যাওয়ার ঠিক আগে নীলিমাকে এই কথাগুলি বলে পাপিয়ার ঘরে আবার ঢুকলেন তিনি।

পাপিয়া চোখ বুজে চুপ করে শুয়েছিল, যেন ঘুমুচ্ছে। মনে হল একটু ভাল আছে। পুরন্দরবাবু একটু ঝুঁকে আস্তে আস্তে মাথার উপর হাত রাখলেন, চুমু খাবার চেষ্টা করলেন একবার—পাপিয়া ফিরে তাকাল হঠাৎ, যেন সে তাঁরই অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ।

"আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে।"

অতিশয় করুণ সুরে সে বললে কথা ক'টি, শান্ত মৃদু মিনতিভরা সুরে। পুরন্দরবাবু যে তার অনুরোধ রাখবেন না এও যেন সে বুঝতে পেরেছিল—তার বলবার ভঙ্গী থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তা। পুরন্দরবাবু অনেক করে বোঝাতে লাগলেন তাকে।

নীরবে চোখ দুটি বুজে সে পাশ ফিরে শুল, একটি কথাও আর বললে না। পুরন্দরবাবুর কোন কথা সে যে শুনতে পাচ্ছে তা মনে হল না।

কোলকাতায় পৌঁছে পুরন্দববাবু সোজা যুগলের বাসায় গেলেন। তখন রাত্রি দশটা; যুগল তখনও বাড়ি ফেরেনি। পুরন্দরবাবু পুরো আধঘণ্টা তার জন্যে অপেক্ষা করলেন, অধীর চিত্তে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন তার বাসার বারান্দায়। বাড়িওলা বললেন, ভোরের আগে সে ফিরবে না, কেন বৃথা অপেক্ষা করছেন।

"বেশ ভোরেই আসব তাহলে" পুরন্দরবাবু আর বেশী কিছু না বলে বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর সমস্ত শরীবের বক্ত টগবগ করে ফুটছিল যেন।

বাড়ি ফি' তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর চাকর বললে "কাল যে বাবু এসেছিলেন তিনি আজও এসেছেন আবার। অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে চা করে দিলাম। আজও মদ আনবার জন্যে টাকা দিলেন। এনে দিয়েছি এক বোতল।"

।। সাত।।

যুগল পালিত বেশ জুৎ করে বসেছিল। আগের দিন যে চেয়ারটায় বসেছিল সেই চেয়ারেই বসে মহানন্দে মদ খাচ্ছিল সে—হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তৃতীয় গ্লাস শেষ করে চতুর্থ গ্লাস শুরু করেছিল। টি-পটটা আব আধকাপ চা পড়েছিল টেবিলেব একধারে। গায়ের কোট খুলে বেশ বাগিয়ে বসেছিল যুগল। সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত।

"আসুন, আসুন, আপনাব অপেক্ষাতেই বসে আছি"—পুবন্দরবাবুকে দেখেই বলে উঠল সে—"গরম লাগছিল, কোটটা খুলে ফেলেছি, আশা করি আপত্তি নেই আপনার তাতে।"

পুরন্দরবাবুর মুখ ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠল।

"বোতলে আর কতটা আছে? ভদ্রভাবে আলাপ করবার মতো অবস্থা আছে কি আপনার এখন?"

যুগল একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

"না ঠিক নেই। মৃত বন্ধুর স্মৃতিতর্পণ করছি, তবে ঠিক—"

"আমার কথা শুনবেন?"

"সেই জন্যেই তো এসেছি।"

"তাহলে শুনুন—প্রথমেই বলছি আপনি অতি অপদার্থ লোক, বুঝলেন?"

"আপনি যদি এইভাবে শুরু করেন, কিভাবে শেষ করবেন তাতো বুঝতে পাচ্ছি না। বাবা।"

যুগল ব্যাপারটাকে যদিও লঘু পরিহাস ভরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু মনে মনে একটু ভীত হয়ে পড়ল সে।

"আপনার মেয়ে মরছে, ভয়ানক অসুখ তার, আপনি কি তাকে ত্যাগ করেছেন না কি?"

"সত্যি মরছে?"

অসুখ, অসুখ—ভয়ানক অসুস্থ সে—"

"ফিট টিট?"

"ভাঁড়ামি করবেন না। ভ—য়া—ন—ক অসুখ, হয়তো বাঁচবে না। আপনি গেলেন না কেন? যাওয়া উচিত ছিল না আপনার?"

"কেন, তাঁরা আমার মেয়েকে দয়া করে স্থান দিয়েছেন বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে! উচিত ছিল। পুরন্দরবাবু, দরদী বন্ধু আমার"—হঠাৎ সে পুরন্দরবাবুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলে, নিজের হাতের মধ্যে—"রাগ কোরো না দাদা, রাগ করে কষ্ট পেও না। আমি যদি মরে যাই, কিম্বা মদের ঝোঁকে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়ি দুনিয়ার কি এসে যায় তাতে—কিসসু না। ভবেশবাবুর বাড়ি যাওয়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে.... যথেষ্ট—সময়ের অভাব কি!"

যুগলের অবস্থা দেখে আত্মসম্বরণ করলেন পুরন্দরবাবু।

"আপনি মদের ঝোঁকে কি বলছেন যা তা! আপনার সঙ্গে একটা দরকারি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই—আপনি যদি এরকম করেন তাহলে কি করে হবে তা? এরকম করলে কিন্তু ভয়ানক রাগ করব বলে দিচ্ছি—শুনুন, আজ রাত্রে থাকুন আপনি এখানে। সকালে দু'জনে যাওয়া যাবে এক সঙ্গে। সোজায় যদি না যান বেঁধে নিয়ে যাব, বুঝলেন? বেঁধে নিয়ে যাব! ওই সোফাটায় শুতে আপনার কষ্ট হবে কি—"

যে সোফাটায় তিনি নিজে শুতেন সেইটে দেখিয়ে বললেন, "ওটাতে চলবে আপনার?"

"খুব চলবে। যেখানে হোক শুলেই হল।"

"এই নিন চাদর, তোশক বালিশ" পাশের ঘর থেকে পুরন্দরবাবু নিজেই বয়ে আনলেন সব এবং যুগলের দিকে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগলেন—"বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন। এখুনি শুয়ে পড়ুন।"

বিছানার বোঝা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যুগল ইতস্তত করতে লাগল। মুখে মাতালের হাসি। পুরন্দরবাবু আর একবার ধমক দিতেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে টেবিলটা সরিয়ে ভয়ে ভয়ে বিছানা পাততে লাগল সে। পুরন্দরবাবুও সাহায্য করতে লাগলেন। লোকটার উপর আর রাগ হচ্ছিল না, তার ভীত ত্রস্তভাব দেখে করুণাই হচ্ছিল বরং।

"গ্লাসে যে মদটুকু ঢেলেছেন, খেয়ে ফেলুন সেটা। খেয়ে শুয়ে পড়ুন"—আদেশের ভঙ্গীতে বললেন পুরন্দরবাবু।

"মদ আপনিই আনতে দিয়েছিলেন, না?"

"হ্যাঁ.....আপনি যে আনিয়ে দেবেন না তা বুঝেছিলাম আগেই—"

"বুঝে ভালোই করেছিলেন। আর একটা কথাও শুনুন, আপনার কোনরকম মাতলামি আর সহ্য করব না আমি। কালকের মতো যে বলবেন—চুমু খাব—সে সব আর চলবে না, বুঝলেন?

"বুঝেছি, ওসব কি আর বারবার হয়"—হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললে সে। হাসিটা

পুরন্দরবাবু দেখতে পেলেন না। তিনি ঘরের চতুর্দিকে পরিক্রমণ শুরু করেছিলেন। উত্তরটা শুনে হঠাৎ থেমে গেলেন এবং যুগলের সামনে এসে গম্ভীরভাবে বললেন—"সরলভাবে ব্যাপারটা খুলে বলুন না সব। আপনাকে তো চিনি আমি—লোক তো আপনি খারাপ নন—ভুলপথে চলছেন কেন এভাবে? সরলভাবে সমস্ত কথা অকপটে খুলে বলুন; আমি কথা দিচ্ছি, আমাকে যা জিগ্যেস করবেন আমিও অকপটে তার উত্তর দেব।"

যুগল নীরবে সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। পুরন্দরবাবুর মাথার শিরগুলো দপদপ করে উঠল আবার।

"ও কি!" চীৎকার করে উঠলেন তিনি প্রায়—"ওরকম করে চেয়ে আছেন কেন। কি দরকার এরকম লুকোচুরির? আমি কিছু বুঝতে পারছি না ভাবছেন? শুনুন, খুলে বলুন সব। আমি কথা দিচ্ছি—ওয়ার্ড অব অনার—আপনি যা জিগ্যেস করবেন আপনার প্রতিটি প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাবেন আমার কাছে। অসঙ্গত আজগুবি—যা খুশী জিগ্যেস করুন—যা খুশী। আমার যে কি হচ্ছে তা যদি বুঝতেন তাহলে এরকম করতেন না কক্‌খনো। কি জানতে চান বলুন?"

যুগল পালিত ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তাঁর দিকে।

"এতই যখন প্রসন্ন হচ্ছেন তাহলে একটা কথার জবাব দিন দিকি। কাল রাত্রে যে বললেন—নিরীহ স্বামী—তার অর্থটা কি?"

পুরন্দরবাবু আবার পরিক্রমণ শুরু করলেন।

"রাগ করলেন? রাগ করবেন না। ওই কথাটার মানে জানবার ভারী কৌতূহল হচ্ছে—অত্যন্ত। সত্যি কথা বলতে কি—ওইটে জানবার জন্যেই বিশেষ করে আমি আজ.....দেখুন সব কথা গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। বেফাঁস যদি কিছু বলে বসি মাপ করবেন। জুলুমবাজ মানেই বা কি! পূর্ণ গাঙ্গুলী কোন টাইপ?"

জুলুমবাজ স্বামী পূর্ণ গাঙ্গুলীর খাবারে বিষ মেশাত কিম্বা তার বুকে ছুরি বসাত—তার শবানুগমন করত না, আপনি যেমন করলেন আজ আচ্ছা ওই মড়াটার পিছু পিছু গেলেন কেন! কোন মতলব ছিল না কি? ছি, ছি, এ কি জঘন্য প্রবৃত্তি আপনার—

ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বলে ফেললেন পুরন্দরবাবু।

"হ্যাঁ, যাওয়াটা উচিত হয়নি তা ঠিক। কিন্তু আপনি বড় বেশী চটেছেন দেখছি—"

"এমনি করে বেড়ানো কি পুরুষমানুষের সাজে? নিজের দুঃখের কাহিনী বিনিয়ে বিনিয়ে চারদিকে বলে বেড়ানো, একই কথা ভ্যান্‌ভ্যান্ করে বারবার বলা আর তাই নিয়ে লোকের গায়ে পড়ে নানারকম ঢং করা—এসব কি ব্যাটাছেলের কাজ? আপনি গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলেন না কি?"

মদ খেলে অনেক রকম করে থাকি—কি করেছিলুম মনে নেই। আচ্ছা, কারও খাবারে বিষ মেশানোটা কি ঠিক? ছুরি মারাটাও কি খুব পৌরুষের লক্ষণ? কি জানি! দেখুন পুরন্দরবাবু, একটা কথা আপনার মনে রাখা উচিত। আমি মোটা মাইনের চাকরি করি, বিষয় আশয়ও আছে কিছু, বিয়েও করতে পারি আমি আবার।"

"তার চেয়ে চুলোয় যাওয়া ভাল নয়?"

"তা-ও বটে। একটা গল্প শুনবেন? আজ গাড়িতে যেতে যেতে গল্পটা মনে পড়ল, তখনি আপনাকে বলব ভেবেছিলাম। আপনি এখুনি লোকের গায়ে পড়ার কথা বলছিলেন না?—অশোক সেনকে মনে আছে আপনার? আপনি যখন বর্ধমানে ছিলেন তখন সেও আসতো আমাদের বাড়িতে প্রায়। তার এক ছোট ভাই ছিল—সে ছোকরাও খুব চালিয়াৎ—সেও গভর্ণমেণ্টের চাকরি করত। হঠাৎ সে এক বড় অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া করে বসল। বড় অফিসারটি বেশ জাঁদরেল গোছের ব্যাচেলার ছিলেন। তিনি কি করলেন জানেন?—তিনি একদিন এক সভায় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকের সামনে অশোককে অপমান করে বসলেন, সেখানে অশোকের হবু-স্ত্রী সবিতাও ছিল। শুধু তাই করেই ক্ষান্ত হলেন না। সবিতার বাপের কাছে গিয়ে সবিতাকে বিয়ে করতে চাইলেন—এবং যেহেতু তিনি অশোকের চেয়ে ঢের উঁচুদরের অফিসার, সবিতার বাপ-মা এমন কি সবিতা নিজে পর্যন্ত অশোককে ত্যাগ করে তাঁকে বরণ করতে রাজী হয়ে গেলেন। অথচ আমরা শুনেছিলাম সবিতা না কি প্রেমে পড়েছে অশোকের! আর অশোক কি করলে জানেন? সে সেই বিয়েতে বরযাত্রী গেল, তারপর, মানে বিয়ের পর একদিন খুন চেপে গেল তার—অফিসারটার পেটে ছুরি বসিয়ে দিলে সে হঠাৎ। বসিয়ে দিয়েই কিন্তু হাহাকার করে উঠল—আঃ এ কি করলাম। কেঁদেই ফেললে। লোকের এমন কি স্ত্রীলোকেরও গায়ে পড়ে বলে বেড়াতে লাগল ক্রমাগত—ছি ছি একি করে ফেললাম! হি—হি—হি—খুব দেখালে একচোট অশোক। অফিসারটি অবশ্য মরল না, বেঁচে গেল শেষ পর্যন্ত, ছুরিটা ভাল করে ঢোকেনি!"

"আমাকে এ গল্প বলার অর্থ তো বুঝতে পারছি না" পুরন্দরবাবু ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললেন।

"আপনার কথাতেই মনে পড়ল গল্পটা; আপনার টাইপের সঙ্গে ঠিক মিলল কি? এ লোকটা ছুরিও মারলে, আর ঢং করে লোকের গায়ে পড়ে হাহাকারও করে বেড়াল। শেষটা তুলেছিল কিন্তু ঠিক—অ্যাঁ, কি বলেন আপনি!"

"আকার-ইঙ্গিতে আপনি কি বলতে চান?" ধৈর্যচ্যুতি ঘটল পুরন্দরবাবুর। চীৎকার করে উঠলেন তিনি—"আপনি কি ভেবেছেন আমি ভয় পেয়ে যাব? একটা শিশুকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন আমাকে ভয় খাওয়াবার জন্যে, পাজি নচ্ছার হারামজাদা কোথাকার—"

"কি বললেন?"

"হারামজাদা, হারামজাদা, হারামজাদা—"

যুগলের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

"আপনি, আপনি পুরন্দরবাবু—হারামজাদা বলছেন আমাকে!"

পুরন্দরবাবু আত্মস্থ হলেন। বুঝলেন যে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

"মাপ করুন আমাকে, রাগ সামলাতে পারিনি। আপনি এমন বাঁকা চোরা পথে চলেছেন কেন! যা বলবেন, বলুন না সোজাসুজি—"

"ক্ষমা চাইলেন তাহলে—"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, শুধু এর জন্য নয় সমস্তের জন্য ক্ষমা চাইছি। সব চুকে বুকে যাক।"

"ও—মানে—"

"আর মানে-টানে নয়, মদটুকু শেষ করে শুয়ে পড়ুন এবার।"

"ও মদটুকু....." যুগল ক্ষণকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, তারপর চোঁ চোঁ করে খেয়ে ফেলল মদটা। খানিকটা জামায় পড়ে গেল। হাত কাঁপছিল তার। সসম্ভ্রমে গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে শুতে গেল সে। কামিজটা খুলে ফেলল। তারপর একটা জুতো খুলে হঠাৎ সে বললে—"এখানে রাতটা কাটানো কি ভালো হচ্ছে?"

পুরন্দরবাবু আবার পরিক্রমণ শুরু করেছিলেন, ঘাড় না ফিরিয়েই তিনি উত্তর দিলেন—"খুব ভালো হচ্ছে।"

যুগল শুয়ে পড়ল। মিনিট পনের পরে পুরন্দরবাবুও আলো নিবিয়ে শুলেন। একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। অপ্রত্যাশিতভাবে নূতন যে কাণ্ডটা ঘটল তাতে সমস্ত ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে পড়ল তো, মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। নিজের অক্ষমতা যেন প্রকট হয়ে পড়ছিল নিজের কাছেই। একটা খস খস শব্দ শুনে হঠাৎ তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেল তাঁর। ঘাড় ফিরিয়ে যুগলের বিছানার দিকে চেয়ে দেখলেন। অন্ধকার ঘর, তবু কিন্তু পুরন্দরবাবুর মনে হল যুগল বিছানায় উঠে বসেছে।

"কি হল" পুরন্দরবাবু জিগ্যেস করলেন।

"ভূত" চুপি চুপি যুগল বললে।

"ভূত! কোথা?"

"ওই যে পাশের ঘরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি।"

"কার ভূত?"

"অপর্ণার।"

পুরন্দরবাবু উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। পাশের ঘরের দরজাটা খোলা ছিল, চেয়ে দেখলেন সেদিকে কিছুই চোখে পড়ল না তাঁর।

"কই, কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো! ভূত নয়, হুইস্কি—শুয়ে পড়ুন আপনি।"

পুরন্দরবাবু শুয়ে আপাদ-মস্তক চাদর দিয়ে ঢাকা দিলেন।

যুগলও শুয়ে পড়ল, আর কোন উচ্চবাচ্য না করে।

"ইতপূর্বে আর কখনও ভূত দেখেছেন আপনি?" মিনিট দশেক পরে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"একবার দেখেছি বোধ হয়" ক্ষীণকণ্ঠে যুগল উত্তর দিল।

নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার।

পুরন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কিনা কে জানে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ আবার পাশ ফিরলেন তিনি.....কোন খস খস শব্দ শুনেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল নাকি? নির্ণয় করতে পারলেন না ঠিক—কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলেন তাঁর বিছানার কাছে ঘরের মাঝখানে শাদা কি একটা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিছানায় উঠে বসে পুরো একটি মিনিট চেয়ে রইলেন তিনি সেদিকে।

"যুগলবাবু নাকি"—স্খলিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

অন্ধকারে নিজের কণ্ঠস্বরই অদ্ভুত শোনাল। কোন উত্তর নেই। কিন্তু কেউ যে একজন দাঁড়িয়ে আছে তাতেও সন্দেহ নেই কোন।

"কে—যুগলবাবু নাকি"—আর একবার, আর একটু জোরে জিগ্যেস করলেন। এত জোরে যে যুগল ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে উঠে সাড়া দেওয়া উচিত ছিল তার। কিন্তু এবারও কোন উত্তর এল না, কিন্তু মনে হল সাদা অস্পষ্ট মূর্তিটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। এরপরই যা হল তা অদ্ভুত, পুরন্দরবাবুর মাথার মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন—উন্মাদের মতো ভীষণ তারস্বরে চীৎকার করে উঠলেন তিনি সমস্ত শালীনতা বিস্মৃত হয়ে—

"ব্যাটাচ্ছেলে মাতাল আমাকে ভয় দেখাবে ভেবেছ। আমি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাদ-মস্তক ঢেকে সমস্ত রাত শুয়ে থাকব—একবারও ফিরব না তোমার দিকে.... দাঁড়িয়ে থাক সমস্ত রাত.... থোড়াই কেয়ার করি আমি.....ব্যাটা মাতাল কোথাকার—থুঃ—থুঃ—থুঃ—"

উন্মাদের মতো থুতু ফেলতে লাগলেন তার দিকে। তারপব বিছানার শুয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিবিয়ে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে অনড় হয়ে রইলেন। আবার নীরবতা ঘনিয়ে এল চারিদিকে। মূর্তিটা এগিয়ে আসছে, না এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তা বুঝতে পারছিলেন না যদিও, কিন্তু বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ কবছিল। পুরো পাঁচটি মিনিট কেটে গেল। তারপর বিছানার ঠিক পাশেই শোনা গেল যুগলের বিনীত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর—"আমি দেশলাইটা খোঁজবার জন্যে উঠেছি। টেবিলে নেই, ভাবলাম আপনার বিছানার তলায় যদি থাকে।"

"আমি যে এত চেঁচালাম আপনি একটি কথা বললেন না এর মানে কি" একটু পবে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"আপনি এত জোরে চীৎকার করে উঠলেন যে, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"আপনার বিছানার পাশেই কুলুঙ্গিতে দেশলাই আছে। আলো জ্বালবেন?"

"না, সিগারেট ধরাব একটা। আলোব দরকার নেই। ছি ছি, আপনার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম। সরি—"

কুলুঙ্গিটার দিকে ধীরে ধীরে সরে গেল সে।

পুরন্দরবাবুও আর কথা কইলেন না। তখনও দেওযালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিলেন তিনি এবং সমস্ত রাত তেমনিভাবেই শুয়ে রইলেন। যুগলকে বলেছিলেন বলেই যে শুয়ে রইলেন, না অন্য কোন কারণ ছিল, তা নিজেও বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে, যেন বিকারের ঘোরে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলেন, কখন যে ঘুমিয়ে পড়লেন তা জানতেও পারলেন না। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন ন'টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন বিছানায়, যেন কে ঠেলে তুলে দিলে তাঁকে। উঠে দেখলেন, যুগল পালিত নেই—খালি বিছানা পড়ে আছে। "এ আমি আগেই জানতাম"—বলে কপালে হাত দিয়ে বসে রইলেন তিনি।

।। আট।।

ডাক্তারবাবু যা ভয় করছিলেন তাই হল শেষকালে। পাপিয়ার অবস্থা দেখতে দেখতে খারাপ হয়ে গেল, হঠাৎ এমনটা যে হবে তা নীলিমা দেবী বা পুরন্দরবাবু একটুও বুঝতে পারেননি আগের দিন। পুরন্দরবাবু সকালে এসেই দেখলেন জ্ঞান আছে, এমন কি তাঁকে দেখে

সে যেন হাত দুটি তাঁর দিকে বাড়িয়েও দিলে তাঁর মনে হল। সত্যি বাড়িয়ে দিয়েছিল, না নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে পুরন্দরবাবু অজ্ঞাতসারে এটা কল্পনা করেছিলেন তা অবশ্য নিজেও তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না পরে। সন্ধ্যার দিকে ক্রমশ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত অজ্ঞানই ছিল। ভবেশবাবুর বাড়িতে আসবার ঠিক দশ-দিন পরে মারা গেল সে।

পুরন্দরবাবু এত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর জন্যে ভবেশবাবুদের চিন্তা হল। পাপিয়ার শেষ সময়টা তিনি তাদের বাড়িতেই ছিলেন দিনরাত। ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকতেন অসাড় হয়ে। কারও সঙ্গে কথা কইতে পর্যন্ত প্রবৃত্তি হত না, নীলিমা দেবী নানা কথা পেড়ে তাঁর মনটা অন্যদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু কোন ফল হত না, কোনও উত্তরই দিতেন না তিনি। পাপিয়ার জন্যে যে পুরন্দরবাবু এতটা ভেঙে পড়বেন তা ভাবতেই পারেনি কেউ। বাড়ির ছেলেমেয়েরা এসে নানাভাবে ভোলাতে চেষ্টা করত, তাদের সঙ্গেই যা দু'একবার হেসে কথা কইতেন তিনি। কিন্তু প্রায়ই পা টিপে টিপে উঠে যেতেন পাপিয়ার বিছানার পাশে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। মাঝে-মাঝে মনে হত পাপিয়া যেন চিনতে পারছে তাঁকে। পাপিয়া যে বাঁচবে এ আশা তিনি করেননি, কেউ করেনি কিন্তু পাপিয়াকে ফেলে রেখে কিছুতেই চলে যেতে পারতেন না। পাশের ঘরটায় বসে থাকতেন চুপ করে।

হঠাৎ একদিন কোলকাতায় চলে গেলেন। সমস্ত বড় বড় ডাক্তারদের ডেকে নিয়ে এলেন। ডাক্তারদের আলোচনা সভা বসল। পুরন্দরবাবু পাগলের মতো রোজ আসতে অনুরোধ করতে লাগলেন সবাইকে। আর একবার এবং সেই শেষবার এসেছিলেন তাঁরা, পাপিয়ার মৃত্যুর আগের দিন। নীলিমা দেবী বললেন—ওর বাবাকে একবাব খবর দেওয়া দরকার। কারণ. যদি কিছু হয় শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যাবে না তিনি না এলে। পুরন্দরবাবু আমতা আমতা করে বললেন—"আচ্ছা, চিঠি লিখছি একটা। কিন্তু চিঠি লিখলে কি আসবে?" ভবেশবাবু একথা শুনে বললেন, "বলেন তো পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করি, অনায়াসেই করা যায় তা। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।" পুরন্দরবাবু চিঠিই লিখলেন শেষে একটা এবং সেটা নিয়ে নিজে চলে গেলেন তার বাসায়। যুগল বাসায় ছিল না, থাকবে না তা অনুমানই করেছিলেন--পুরন্দরবাবু চিঠিখানা রেখে এলেন বাড়িওয়ালার কাছে। তিনি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো কর্তব্য করে যাচ্ছিলেন যেন।

অবশেষে পাপিয়া মারা গেল। সন্ধ্যাবেলা সূর্য অস্ত যাচ্ছিল তখন। একটা রূঢ় আঘাতে তাঁর আচ্ছন্ন ভাবটা চুরমার হয়ে গেল—হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তিনি। নীলিমা দেবী সুন্দর একটি শাড়ি পরিয়ে ফুল দিয়ে চমৎকার করে সাজিয়ে দিলেন পাপিয়াকে। পুরন্দরবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল হঠাৎ—দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে বলে উঠলেন—"খুনেটাকে যেমন করে পারি ধরে আনব আমি।" কারও বারণ না শুনে তৎক্ষণাৎ কোলকাতার দিকে ছুটলেন।

যুগলকে কোথায় পাওয়া যাবে তার আভাস তিনি একটা পেয়েছিলেন। যখন ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলেন তখন যুগলকেও খুঁজেছিলেন তিনি। কারণ তাঁর আশা ছিল যে যুগল এলে যুগলকে দেখলে পাপিয়া হয়তো ভালো হয়ে যাবে। সুতরাং যুগলকে খুঁজেছিলেন তিনি প্রাণপণে। যুগল বাসা বদলায়নি, কিন্তু বাসায় গেলে পাওয়া যেত না তাকে। বাড়িওয়ালা

প্রতিবারই এক কথা বলত—"গত তিন দিন তিনি বাসাতে ফেরেননি। আজ যদি ফেরেনও মাতাল হয়েই ফিববেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, আর ঘণ্টাখানেক থেকেই বেরিয়ে যাবেন আবার। একেবারে গোল্লায় গেল মশাই, কি আর বলব।"

চাকরটা চুপি চুপি বললে, তিনি সোনাগাছিতে পড়ে থাকেন। ঠিকানা চান তো যোগাড় করে দিতে পারি আমি।

কোলকাতায় এসেই পুরন্দরবাবু সোনাগাছির ঠিকানাটা জোগাড় করলেন। সেখানে গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ডাকিনীর মতো দুটো মাগী যুগলকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে, যুগল এত মদ খেয়েছে যে আর দাঁড়াতে পারছে না। আর তাদের পিছনে পিছনে বলিষ্ঠকায় ভীষণদর্শন একটা লোক অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিচ্ছে তাকে। শুধু গাল দিচ্ছে নয়, টাকা না দিলে জুতিয়ে লম্বা করে দেবে বলে ভয়ও দেখাচ্ছে। পুরন্দরবাবুকে দেখেই যুগল আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচান আমাকে।

পুবন্দরবাবুকে দেখেই গুণ্ডাটা সরে পড়ল, যুগল তার দিকে মুষ্টি আস্ফালন কবে চীৎকার করে উঠল বিজয়-উল্লাসে। পুরন্দরবাবু সোজা গিয়ে যুগলের কোটের কলারটা ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন তাকে, ক্রমাগত ঝাঁকাতে লাগলেন, তাঁর যেন খুন চেপে গিয়েছিল। যুগলের চীৎকার থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে, আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে, দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক শব্দ হতে লাগল। ফুটপাতের উপর বসে পড়ল সে। একটা মাগী তাড়াতাড়ি ঝুঁকে ধরলে তাকে। "পাপিয়া মারা গেছে," পুরন্দরবাবু বললেন অবশেষে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেযে রইল যুগল। মনে হল যেন বুঝল কথাটা, চিবুকটা আর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একবার।

"মারা গেছে........" অদ্ভুত স্বরে ফিস ফিস করে বললে সে। সমস্ত মুখখানা কেমন যেন কুঁচকে গেল, একটা দন্ত-সর্বস্ব হাসি ফুটে উঠল মুখে। খানিকক্ষণ বসে রইল, তারপর মাগীটার কাঁধের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল সোজা—যেন পুরন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি।

"যাচ্ছেন কোথা, আপনি না গেলে যে তার সৎকার হবে না এটা মাথায় ঢুকছে না, মাতলামির একটা সীমা থাকা উচিত।"

"আমি না গেলে সৎকার হবে না কেন"—ঘাড় ফিরিয়ে যুগল বলল।

"আপনি আইনত তার বাবা।"

"না, আমি নই, সেই পুলিশ অফিসারটি। মনে নেই আপনার তাকে? আপনি চলে আসবার ঠিক আগে যে এসেছিল—সেই যে বিলেত-ফেরত ছোকরা।"

"তার মানে"—চীৎকার করে উঠলেন পুরন্দরবাবু, সমস্ত বুকটা মুষড়ে উঠল যেন—"কি বললেন?"

"ঠিকই বলেছি, সেই ওর বাবা! সৎকারের জন্যে তার খোঁজ করুন গিয়ে।"

"মিছে কথা! আমার উপর শোধ তোলবার জন্য এই মিছে কথাটা তৈরি করেছেন আপনি। পাষণ্ড কোথাকার—"

যুগলকে মারবার জন্যে তিনি ঘুঁষি তুললেন, হয় তো মেরেই ফেলতেন তাকে, কিন্তু পারলেন না—মাগী দুটো চীৎকার করে উঠল তারস্বরে। যুগল কিন্তু এক-পা নড়ল না।

খানিকক্ষণ নির্নিমেষে তাঁর দিকে চেয়ে থেকে সঙ্গিনী দুটির কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে অদৃশ্য হয়ে গেল গলির মোড়ে। পুরন্দরবাবু আর তার অনুসরণ করলেন না। করতে প্রবৃত্তি হল না।

তার পরদিন একটি ভদ্রগোছের গভর্নমেন্ট ক্লার্ক ভবেশবাবুদের বাড়িতে নীলিমা দেবীর হাতে একটি খামের চিঠি দিলেন। যুগল পালিতের চিঠি। খামের ভিতর পাঁচশ টাকার একটা চেক এবং পাপিয়ার শবদাহ করবার আইন সঙ্গত অনুমতি ছিল। ভবেশবাবু অবশ্য শবদাহের ব্যবস্থা আগেই করেছিলেন, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদও জানিয়েছিল যুগল। লিখেছিলেন—"আপনার স্নেহের ঋণ শোধ করবার স্পর্ধা আমার নেই। তার অসুখের জন্য এবং শবদাহ প্রভৃতির জন্য যে খরচ সেই বাবদ সামান্য কিছু পাঠালাম। যদি কিছু বাঁচে কোন সৎকার্যে তা খরচ করে দেবেন। আমার শরীর খুব খারাপ বলে যেতে পারলাম না, এজন্য ক্ষমা করবেন। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।"

যে ভদ্রলোক চিঠি এনেছিলেন তিনি আর বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। যুগলবাবুর অনুরোধে তিনি চিঠিটা বহন করে এনেছেন শুধু বোঝা গেল। টাকা পাঠিয়ে দেওয়াতে ভবেশবাবুরা ক্ষুণ্ণ হলেন খুব। চেকটা ফেরত দিচ্ছিলেন কিন্তু নীলিমা দেবী বললেন—কাঙালী ভোজন করানো হোক। শেষে তাই ঠিক হল।

সব শেষ হয়ে যাবার পর পুরন্দরবাবু যাদবপুর থেকে চলে এলেন। সমস্ত দিন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন অন্যমনস্কভাবে, গাড়িচাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন একদিন। কখনও বা নিজের বাসায় চুপচাপ শুয়ে থাকতেন দিনের পর দিন, কোথাও বেরুতেন না, দৈনন্দিন কর্তব্য করতেন না কিছু। ভবেশবাবুরা মাঝে মাঝে আসতেন, যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে যেতেন, তিনি যাব বলে প্রতিশ্রুতি দিতেন—কিন্তু সে কথা আর মনে থাকত না। নীলিমা দেবী নিজে এসেছিলেন কয়েকবার, কিন্তু দেখা পাননি। তাঁর উকিলও তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তার মোকদ্দমার বেশ সুরাহা হয়েছে, শত্রুপক্ষ মিটমাট করতে চাইছে, পুরন্দরবাবুর সম্মতি পেলেই ব্যাপারটি নির্বিঘ্নে চেপে যায়, কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পাচ্ছিলেন না তিনি। অবশেষে নাগাল যখন পেলেন তখন তার ঔদাসীন্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মতো বখেড়াবাজ মক্কেল যে হঠাৎ কি করে এতটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে তা ভেবে পেলেন না তিনি।

অসহ্য গরম পড়েছিল, কিন্তু পুরন্দরবাবুর খেয়াল ছিল না কিছু। দার্জিলিং যাবার কথা মনেই ছিল না আর। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অহরহ ভোগ করছিলেন তিনি, একটা প্রকাণ্ড ফোড়া যেন থর নিয়ে বেড়ে উঠছিল ক্রমশ। তাঁকে ভালো করে জানবার পূর্বেই, তিনি যে এত অল্প সময়ে তাকে ভালবেসেছিলেন—তা না বুঝেই পাপিয়া জন্মের মতো চলে গেল—এইটেই তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল সবচেয়ে বেশী। যে আনন্দময় জীবনের সামান্য আভাসমাত্র তিনি পেয়েছিলেন, হঠাৎ তা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চিরকালের মতো। জীবনের একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছিলেন, হারিয়ে গেল সেটা। চুপ করে ভাবতেন কেবল বসে—"আমার এই ছন্নছাড়া অপবিত্র জীবনটা পাপিয়াকে ভালবেসে শুদ্ধ করে নেব ভেবেছিলাম, সারা জীবনের ক্লেদ আর বিষ অমৃতে রূপান্তরিত হয়ে যেত, ওই পবিত্র নিষ্পাপ জীবনের সংস্পর্শে এসে।

তাকে মানুষ করতে পেলে বেঁচে থাকার অর্থ থাকত একটা, আর তাহলে ভগবান আমার সমস্ত দুষ্কৃতিও ক্ষমা করতেন বোধ হয়।"

একদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ শ্মশানে গিয়ে হাজির হলেন। যে জায়গায় তার চিতাটা সাজানো হয়েছিল সেখানে গিয়ে বসলেন খানিকক্ষণ। হেঁট হয়ে চুমু খেলেন। অনেকটা শান্তি পেলেন যেন। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, পশ্চিম দিগন্তে মেঘস্তূপে আগুন জ্বলছে, সার বেঁধে পাখি উড়ে চলেছে, অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে, সমস্ত মনটা শান্ত হয়ে গেল অনেকদিন পরে। সমস্ত অন্তর পূর্ণ করে একটা আশ্বাস জেগে উঠল ধীরে ধীরে। মনে হল—পাপিয়াই বোধ হয় কাছে এসে আশ্বাস দিচ্ছে আমাকে।

শ্মশান থেকে যখন উঠলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। শ্মশানের কাছেই চায়ের দোকান ছিল একটা। তাঁর মনে হল সেই দোকানের একটা জানালায় যুগল বসে আছে এবং তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে নির্নিমেষে। তিনি সেদিকে আর না চেয়ে চলতেই লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে মনে হল কে যেন তাঁর অনুসরণ করছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন যুগল। কিছু বললেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু। কাছাকাছি এসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে যুগল হাসল একটু। মাতালের হাসি নয়, ভদ্রলোকের হাসি। যুগল সত্যিই মদ খায়নি তখন।

"নমস্কার।"

"নমস্কার।"

।। নয়।।

ভদ্রভাবে প্রতি-নমস্কার করে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। একে দেখে আর রাগ হল না তাঁর। শুধু তাই নয়, একটা নূতন দৃষ্টি নূতন মনোভাব জাগল যেন। যুগল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললে—

"চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে আজ। গরম মোটেই নেই।"

"আপনি এখনও যাননি দেখছি"—চলতে চলতে উত্তর দিলেন পুরন্দরবাবু।

"না। একটা না একটা বাধা উপস্থিত হচ্ছে। আমার প্রোমোশন হয়েছে, জানেন, মাইনেও বেড়েছে। পরশু নাগাদ যাচ্ছি নিশ্চয়।"

"প্রোমোশন হয়েছে?"

"হবে না কেন"—ভ্রূযুগল উত্তোলন করে যুগল বললে।

"না, তাই জিগ্যেস করছি......" পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে আড়চোখে চাইলেন একবার তার দিকে। লক্ষ্য করলেন যুগলের পোশাক-পরিচ্ছদ আর আগেকার মতো নেই, বেশ একটু পারিপাট্য দেখা দিয়েছে।

চায়ের দোকানে বসে কি করছিল ওখানে—পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন মনে মনে।

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হল। একটা শুভসংবাদ আছে!"

"শুভসংবাদ?"

"আমি আবার বিয়ে করছি।"

"সে কি!"

"দুঃখের পরে সুখ আসে, এই তো জীবন। আমি ভারী খুশী হতাম পুরন্দরবাবু যদি আপনি—কিন্তু না থাক, এখন বোধ হয় ব্যস্ত আছেন আপনি।"

"হ্যাঁ ব্যস্ত আছি, শরীরও ভালো নেই আমার।'

হঠাৎ মনে হল লোকটাকে এড়াতে পারলে যেন বাঁচেন। তার সম্বন্ধে যে নূতন মনোভাব জেগেছিল তা নিমেষে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

"আমি ভারী খুশী হতাম যদি......"

কিসে সে খুশী হত তা যুগল বললে না খুলে....পুরন্দরবাবু চুপ করে রইলেন।

"তাহলে পরে হবে"—তার দিকে না চেয়েই পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন এবং চলতেই লাগলেন। যুগলও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ কাটল।

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার, আবার দেখা হবে আশা করি।"

"নমস্কার।"

পুরন্দরবাবু যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর মনের সমস্ত শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ওই লোকটার সংস্পর্শ কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না তিনি। বিছানায় যখন শুতে গেলেন তখনও তাঁর আবার মনে হল—লোকটা শ্মশানের কাছে কি করছিল?

তার পরদিন সকালে উঠে তিনি ঠিক করলেন ভবেশবাবুর ওখানে যাবেন। নিতান্ত কর্তব্যবোধেই ঠিক করলেন, যাবাব আন্তরিক ইচ্ছে ছিল না। কারও সহানুভূতি, এমন কি ভবেশবাবুদের সহানুভূতিও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। কিন্তু ভবেশবাবুরা একবার এসে তাঁর খোঁজ করেছেন, না গেলে অভদ্রতা হয়। তাঁর কেমন একটু সঙ্কোচ হতে লাগল তবু। চা খাওয়া শেষ করে যাবেন কি যাবেন না ভাবছেন, এমন সময়ে সবিস্ময়ে দেখলেন যুগল পালিত প্রবেশ করছে। পুরন্দরবাবু কল্পনাও করতে পারেননি যে লোকটা আবার আসবে। নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন কি বলবেন ভেবে পেলেন না। যুগল কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। হেসে নমস্কার করে চেয়ার টেনে বসল। যে চেয়ারটায় ইতিপূর্বে বসেছিল ঠিক সেই চেয়ারটাতেই বসল। পুরন্দরবাবুও প্রতি-নমস্কার করে বসলেন। প্রথম যেদিন যুগল এসেছিল সেইদিনের ছবিটা হঠাৎ স্পষ্ট ফুটে উঠল পুরন্দরবাবুর মনে।

"আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন।" পুরন্দরবাবুর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করে যুগল বলল। যুগলের আচবণে যদিও আপাতদৃষ্টিতে লেশমাত্র আড়ষ্টতা ছিল না কিন্তু কোনও কারণে তার মনের ভিতর যে একটা তোলপাড় হচ্ছিল তা সে ঢাকতে পারছিল না। বেশবাসও বিচিত্র করে এসেছিল। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, কোঁচানো জরি-পাড় শান্তিপুরের ধুতি, জরিদার উড়ুনি, অনামিকায় হীরের আংটি, পায়ে পাম্‌শু, চোখে রিমলেস চশমা, এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করছে গায়ে। চশমাটা খুব সম্ভবত অলঙ্কারই, কারণ ইতিপূর্বে তাঁর চোখে চশমা ছিল না।

"আশ্চর্য হবারই কথা" এঁকে-বেঁকে হেসে যুগল শুরু করল আবার—"এমনভাবে আসাটা প্রত্যাশা করেননি, বুঝতে পারছি। কিন্তু দেখুন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা অত ঠুনকো হওয়া উচিত কি? পরস্পরের মধ্যে একটা দৃঢ়তর এবং মহত্তর বন্ধন থাকাটা কি বাঞ্ছনীয় নয়, সমস্ত তুচ্ছতা সমস্ত মনোমালিন্য সত্ত্বেও? কি বলেন আপনি?"

"ভণিতা না করে যা বলতে এসেছেন তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।" ভ্রূকুঞ্চিত করে পুরন্দরবাবু বললেন।

"তাহলে সংক্ষেপে বলি শুনুন। কালই বলেছি তো আমি আবার বিয়ে করব। এখন আমি আমার ভাবী সহধর্মিণীকে দেখতে যাচ্ছি। তাঁরা বালীগঞ্জে থাকেন। যদি অভয় দেন তো একটা প্রস্তাব করি।"

"কি বলুন?"

"আপনার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এবং এখন যদি আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন তাহলে কৃতার্থ হই।"

"আপনার সঙ্গে যাব! কোথায়?"

পুরন্দরবাবুর চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হয়ে পড়ল।

"তাদের বাড়ি। মাপ করবেন, আমার মাথার ঠিক নেই, মনের ভাব ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না হয় তো, আমার ভয় হচ্ছে আপনি পাছে 'না' বলে বসেন।"

অতিশয় করুণ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল পুরন্দরবাবুর মুখের দিকে।

"এখনই আপনার সঙ্গে আপনার ভাবী-সহধর্মিণীকে দেখতে যাব—এই বলছেন আপনি?"

পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন যুগলের দিকে। নিজের চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি।

"হ্যাঁ" সলজ্জ কণ্ঠে যুগল বললে—"রাগ করবেন না, পুরন্দরবাবু। পরিহাস করছি না আমি, অনুনয় করছি, সত্যিই বলছি কৃতার্থ হব। আমার আশা আছে, সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবেন না আপনি।"

"দেখুন, প্রথমত জিনিসটা অত্যন্ত অহেতুক।"

পুরন্দরবাবু অধীর ভাবে প্রতিবাদ করলেন।

"আমার প্রবল আগ্রহ, আর কিছু নয়" যুগল সানুনয়ে শুরু করল আবার—

"তাছাড়া কারণও আছে। আপনার কাছে গোপন করব না কিছু—কিন্তু সেটা ঠিক এখন, এই মুহূর্তে বলতে চাই না। এখন আমার অনুরোধটুকু রাখুন শুধু......"

"কিন্তু আপনি নিজেই কি বুঝতে পারছেন না যে ব্যাপারটা কতদূর অশোভন!"

পুরন্দরবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন। যুগলও দাঁড়িয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

"কিছু অশোভন নয়। আমি আপনাকে আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে নিয়ে যাব—এতে অশোভন কি আছে! তাছাড়া আপনি তাদের চেনেনও। বালীগঞ্জের বিশ্বস্তব বোস—নামজাদা উকীল—কর্পোরেশনের মেম্বার—"

"তাই না কি?"

এক মাস আগে এঁকে ধরবার জন্যই তিনি কি চেষ্টাটাই না করেছেন, নিজের মোকদ্দমার সুবিধে হবে বলে। কিছুতেই নাগাল পাননি। তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের দিকে ছিলেন ইনি বরাবর।

"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই লোক" পুরন্দরবাবুর মুখভাব লক্ষ্য করে যুগল বলে উঠল—"সেই যার পাশে পাশে আপনি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছিলেন আর আমি দাঁড়িয়ে আপনাদের দেখছিলাম, আপনার কথা শেষ হয়ে গেলে আমিও তাঁকে ধরব ভেবেছিলাম সেদিন। কুড়ি

বছর আগে আমরা এক অফিসে চাকরি করতাম কি না। সেদিন অবশ্য যখন আপনার কথা শেষ হবার পর তাঁকে ধরব ভাবছিলাম—তখন বিয়েব কথা ভাবিইনি। হঠাৎ সাতদিন আগে কথাটা মনে হল!"

"কিন্তু, কি মুশকিল, তাঁরা যে ভদ্রলোক"—কথাটার সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করেই পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে বলে বসলেন।

"হলই বা" যুগলের চোখে শাণিত দৃষ্টি ফুটে উঠল একটা।

"না, না, মানে আমি বলছি যে যখন আমি তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম তারা—"

"সব মনে আছে তাদের। আপনার কথা বলছিলেন, আপনাকে শ্রদ্ধাও করেন তিনি। কিন্তু আপনি বাড়ির সবাইকে দেখেননি, তারা এত—"

"তিন মাস যেতে না যেতেই বিয়ে করবেন আপনি!"

"না, বিয়ে অত তাড়াতাড়ি হবে না। তার এখনও বছর খানেক বাকী। না, না আপনি যা ভাবছেন তা নয়, তাঁরা আমাকে অনেকদিন থেকে চেনেন। আমার স্ত্রীকেও চিনতেন। সব জানেন আমার। তাছাড়া সম্পত্তি আছে আমার, চাকরিও পেয়েছি ভালো একটা, মাইনেও বাড়ল—আপত্তি নেই কিচ্ছু তাঁদের।"

"তাঁর মেয়ের সঙ্গে?"

"সে সব বলব এখন" এঁকে বেঁকে বিগলিত হয়ে পড়ল যেন যুগল, "আগে একটা সিগারেট ধরাই। আজই দেখবেন তাকে। একটা কথা কি জানেন, বিশ্বম্ভরবাবু রোজগার করছেন খুব কিন্তু রাখতে পারেননি তেমন কিছু। আজকালকার খরচ তো জানেনই, তাছাড়া বালীগঞ্জে বাড়ি করতে গিয়ে জমানো টাকাটা খরচ করে ফেলেছেন সব। বিরাট পরিবার, মেয়েই আটটি— ছেলে একটিমাত্র, সে ছেলেও মানুষ হয়নি এখনও। কাল যদি চোখ বোজেন দু'বেলা অন্ন জুটবে কিনা সন্দেহ। আটটা মেয়ে, তাঁদের কাপড়-চোপড়ের খরচেই তো ফতুর হবার কথা—তাদের পড়িয়েছেন প্রত্যেককে। এদের মধ্যে পাঁচটি বেশ প্রাপ্তযৌবনা, বড়টির বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে, খাসা মেয়ে, আলাপ করে দেখবেন। ষষ্ঠটির বয়স বছর পনের হবে—স্কুলে পড়ে। আগের পাঁচটির বিয়ে হয়নি কারও, আজকাল, মেয়ের বিয়ে মানে বুঝতে পারেন তো, কি ব্যাপার! নানা জায়গায় পাত্র খুঁজছিলেন ভদ্রলোক এমন সময় আমি গিয়ে হাজির। আমার মতো পাত্র একটিও জোটেনি ইতিপূর্বে। জানাশোনা ঘর, লেখাপড়া জানে, খেতে পরতে পাবে এরকম ছেলে খুব সুলভ তো নয়—আত্মপ্রশংসা করছি না—কিন্তু আমার মতো পাত্র বিনা পণে পাওয়া অসম্ভব হবে ওঁর পক্ষে।"

সোচ্ছ্বাসে বলে চলেছিল যুগল।

"আপনি বড়টিকে বিয়ে করছেন?"

"না মানে, বড়টিকে না। আমি ষষ্ঠটি মানে যেটি স্কুলে পড়ছে তার কথাই বলেছি।"

"সে কি!" হেসে ফেললেন পুরন্দরবাবু, "তার বয়স মোটে পনের বলছেন!"

"হ্যাঁ, এখন পনের, আর ন'মাস পরেই ষোলয় পড়বে। তাতে হয়েছে কি! এখন বিয়ে করাটা দৃষ্টিকটু হবে অবশ্য, কথাটা পাকাপাকি হয়ে থাকবে শুধু—আহা আপনি আমাকে এতই অবুঝ মনে করেছেন!"

"ও, তাহলে এখনও কিছুই ঠিক হয়নি—"

"হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে বৈকি।"

"সে মেয়েটি একথা জানে?"

"মেয়ের বাবা মা তাকে হয়তো বলেননি কিছু, একটা ইয়ে আছে তো, কিন্তু আমার মনে হয় সে জানে ঠিক" চোখ কুঁচকে হেসে ফেললে যুগল পালিত। তারপর বললে—

"এখন বলুন কি বলছেন—"

"আমি সেখানে গিয়ে করব কি!"

"পুরন্দরবাবু—"

"এ তো অদ্ভুত আবদার দেখছি আপনার।"

রাগে ঘৃণায় পুরন্দরবাবুর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না।

একি অদ্ভুত বেহায়া লোক!

"চলুন, বুঝলেন. আমি বলছি, ভালই লাগবে আপনার।"

গদগদকণ্ঠে অনুরোধ করতে লাগল যুগল—"না, না, না, শুনুন" পুরন্দরবাবুর অধীব ভাব লক্ষ্য করে বলে উঠল সে আবার, "শুনুন, সব কথা তারপর ঠিক করবেন যা হয়। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন বোধ হয়। আপনার বন্ধুত্ব দাবী করবার স্পর্ধা আমার নেই, আমি একটা অনুগ্রহ চাইছি শুধু। আর এতে আপনি ভবিষ্যতে বিপন্নও হবেন না। কোন রকমে তাও শপথ করে বলতে পারি। তাছাড়া পরশুদিন তো চলেই যাচ্ছি আমি, আপনাকে আর বিরক্ত করতে আসব না, শুধু আজকের দিনটি দয়া করুন একটু। আপনার মহত্ত্বে বিশ্বাস করি বলে, অনেক আশা করে এসেছি! হয়তো ইদানীং আমার প্রতি একটু করুণাও হয়ে থাকবে আপনার—আমার মতো হতভাগার প্রতি যে কোন লোকেরই করুণা হওয়া উচিত, আপনার মতো উদার লোকের তো......সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না—"

হঠাৎ যুগলের গলা কেঁপে গেল, আর কিছু বলতে পারলে না সে। পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে চাইলেন তার দিকে।

"আপনি আমাকে ঠিক যে কি করতে বলছেন তাও তো বুঝতে পারছি না, সাধ্যাতীত না হলে আমি তা—"

"আপনি এখন আমার সঙ্গে চলুন, তাহলেই উপকৃত হব। তারপর ফেরবার পথে, বিশ্বাস করুন, সমস্ত খুলে বলব আমি—বিশ্বাস করুন।"

পুরন্দরবাবু তবু রাজি হলেন না, বিশেষ করে নিজেরই অন্তরে দুষ্ট গোপন সঞ্চরণ অনুভব করছিলেন বলে আরও হলেন না। যুগল আবার বিয়ে করেছে শোনামাত্রেই মনে সুপ্ত অজগরটা নড়াচড়া শুরু করেছিল অনেক আগে থেকেই। হয়তো কৌতূহল, কিম্বা হয়তো নিগূঢ় আরও কিছু—রাজি হয়ে যেতে লোভ হচ্ছিল এবং যতই লোভ হচ্ছিল ততই দমন করবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। টেবিলের উপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন এবং মনে মনে ইতস্তত করতে লাগলেন। যুগল ক্রমাগত খোসামোদ করে যেতে লাগল।

"বেশ চলুন"—হঠাৎ ঠিক করে ফেললেন তিনি, মনের ভিতরটা কেমন করতে লাগল যদিও! উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ঠেলে। যুগলের আনন্দের সীমা রইল না।

জামা-কাপড় বদলাতে হবে কিন্তু, এই বেশে যাবেন না কি—তা হবে না। ভাল কাপড়-জামা বার করুন, চুলটা আঁচড়ান, আনন্দে উৎফুল্ল যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আমি কি পরে যাব তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন লোকটা—পুরন্দরবাবুর মনে হল একবার।

একটু পরেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি যুগলের সঙ্গে। যুগল প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁর পোশাকের পারিপাট্য দেখতে লাগল বারবার; শ্রদ্ধা যেন উথলে উঠতে লাগল আরও। পুরন্দরবাবু বিস্মিত হচ্ছিলেন, শুধু তার আচরণে নয়, নিজের আচরণেও। বাইরে চমৎকার গাড়ি অপেক্ষা করছিল একখানা।

"ও আমার জন্যে গাড়িও আপনি আগে থাকতেই ঠিক করে এনেছিলেন?"

"গাড়ি আমি নিজের জন্যেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আপনি যে যাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না আমার" একমুখ হেসে যুগল বললে।

"আপনাকে নিয়ে জ্বালাতন"—গাড়িতে চড়ে হেসে অনুযোগ করলেন পুরন্দরবাবু।

"প্রশ্রয় দিয়েছেন বলেই জ্বালাতন করি" গাঢ়কণ্ঠে যুগল উত্তর দিল।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

"আর পাপিয়া?" কথাটা একবার মনে হল কিন্তু জোর করে সেটাকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন পুবন্দরবাবু। তাঁর মনে হতে লাগল একটা পবিত্র জিনিস অশুচি হয়ে গেল যেন। সহসা নিজেকে অত্যন্ত হীন, অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হতে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ি এবং যুগল যদি বাধা দেয় তার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিই একটা। কিন্তু কিছুই হল না। যুগল মনের আনন্দে বকর বকর করতে লাগল; প্রলোভনটা আবার তার মন জুড়ে বসল।

"আচ্ছা পুরন্দরবাবু, দামী পাথরের সম্বন্ধে কোনও ধারণা আছে আপনার?"

"কি পাথর?"

"হীরে।"

"আছে কিছু কিছু।"

"আমার একটা উপহার নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। নেব?"

"এখন ওসব কেন!"

"ক্ষতি কি তাতে। কি কিনি বলুন তো? ব্রোচ, দুল, ব্রেসলেট—একটা 'সেট' নিলে কেমন হয়, না শুধু একটা জিনিসই নেব?"

"কত টাকা খরচ করবেন আপনি?"

"হাজার দুই আড়াই।"

"এত?"

"বেশী মনে হচ্ছে আপনার?" অপ্রতিভ হয়ে গেল যুগল একটু।

"একটা ব্রোচ কিম্বা একটা দুল নিয়ে যান বড় জোর, এত খরচ করে কি হবে এখন?"

যুগল মুষড়ে গেল। অনেক টাকা খরচ করে একটা 'হোল সেট' কিনে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। একটা গয়নার দোকানে গাড়ি দাঁড়াল। পুরন্দরবাবু আবার বেশী টাকা খরচ

করতে মানা করলেন। শেষে একজোড়া ব্রেসলেট কেনা হল—তাও যুগল যেটা পছন্দ করছিল সেটা নয়, পুরন্দরবাবু ওর মধ্যে সস্তা দেখে একজোড়া বেছে দিলেন। দাম মাত্র ৩০০্ টাকা শুনে যুগলের মন আরও দমে গেল। বেশী দামী কিনলে কি ক্ষতি ছিল!

"ভালো একটা জিনিস কিনে দিলেই হত" গাড়িতে চড়ে যুগল বলতে লাগল—"অতবড় সংসার, অতগুলি মেয়ে, বেচারারা গয়না কি পরতে পায়।" একটু পরে ফিক করে হেসে আবার শুরু করলে সে—"পনের বৎসর বয়স শুনে আপনি হাসছিলেন। কিন্তু ওই কম বয়স বলেই আমি আরও মজেছি। বেণী দুলিয়ে বই খাতা বগলে নিয়ে এখনও স্কুলে যায়,—হি-হি। মানে নিষ্পাপ, ওইতেই মুগ্ধ করেছে আমাকে, রূপে নয়। স্কুলে যায়, হুড়োহুড়ি করে. কথায় কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ে, সে কি হাসি—আর কি নিয়ে হাসি শুনবেন, বেড়ালটা সিন্দুক থেকে লাফিয়ে পড়ে কেমন বলের মতো চলে গেল, সংসারের কিছু জানে না এখনও—একেবারে কচি—হি—হি।"

পুরন্দরবাবু নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন।

মাঝে মাঝে তাঁর মনে হচ্ছিল—"আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে কেন? কোনও মতলব নেই তো! ফাঁদে ফেলবে না কি? সত্যি আমার মহত্ত্বের উপর এখনও বিশ্বাস আছে ওর! লোকটা কি! ভাঁড়, বেকুব, পাগল—না আর কিছু!"

।। দশ।।

পুরন্দরবাবু যা বলেছিলেন বিশ্বম্ভরবাবুরা সত্যই ভদ্র পরিবার। বিশ্বম্ভরবাবু নিজে একজন পদস্থ এবং সম্মানিত লোক, সকলে তাঁকে খাতির করে। তাঁর আয়ের সম্বন্ধেও যুগল যা বলেছিল তা ঠিক। যতদিন তিনি রোজগার করেছেন স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছে বেশ, কিন্তু তিনি চোখ বুজলেই সংসার অচল হয়ে পড়বে।

বিশ্বম্ভরবাবু পুরন্দরবাবুকে বেশ সহৃদয় ভদ্রতাসহকারে অভ্যর্থনা করলেন। মোকদ্দমা নিয়ে তাঁর সঙ্গে যে প্রচ্ছন্ন শত্রুতাটা হয়েছিল সেটা অবলুপ্ত হয়ে গেল যেন।

"খুব ভালো হয়েছে" প্রথমেই আরম্ভ করলেন তিনি, "আপোষে যে আপনারা মিটমাট করে ফেলেছেন খুব ভালো হয়েছে এটা। আমারও তাই ইচ্ছে ছিল, আর আপনার উকীল পরেশবাবু তো অসাধারণ লোক এসব বিষয়ে। বেশ হয়েছে। কোন হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি আপনি তিন লক্ষ টাকা পেয়ে যাবেন। মোকদ্দমা চালালে অন্তত তিনটি বছর নাকানি চোবানি খেতে হোত আপনাদের দুজনকেই। এ খুব ভাল হয়েছে—"

বিশ্বম্ভরবাবু আলোক-প্রাপ্ত সমাজের লোক, তাঁর পিতা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং পরদার বালাই নেই। একটু পরে বিশ্বম্ভরবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে পুরন্দরবাবুর আলাপ হয়ে গেল। শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবী স্থূলকায়া প্রবীণা। চোখে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। দেখলেই মনে হয় যেন অবসন্ন তিনি। আলাপ করলে মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। একটু পরেই তাঁর মেয়েরাও এল একে একে। পুরন্দরবাবু দিশেহারা হয়ে পড়লেন। একটি দুটি নয়, দশ বারোটি যুবতী সমবেত হলেন একে একে এসে। চলেও গেলেন। তাঁরা বিশ্বম্ভরবাবুর মেয়েদের

বান্ধবী বোঝা গেল। পাড়ায় থাকেন। বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়িটা বিশাল, নানা সময়ে জোড়া-তাড়া দিয়ে তৈরি। সামনে অনেকখানি জমি, প্রকাণ্ড বাগান। কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল যে তাঁরা পুরন্দরবাবুর আগমন প্রত্যাশা করছিলেন এবং যুগলের বন্ধু হিসেবেই বিশেষ করে সম্বর্ধনা করলেন তাঁর। তিনি আসাতে সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল খুব।

পুরন্দরবাবু অভিজ্ঞ লোক। একটা জিনিস সন্দেহ হতে লাগল তাঁর। এই অত্যুচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনায়, মেয়েদের বেশবিন্যাসের পারিপাট্যে তাঁর মনে হতে লাগল যে যুগল বোধ হয় আকারে ইঙ্গিতে এঁদের কাছে প্রকাশ করেছে যে তিনি এখনও বিয়ে করেননি, তাঁর বিষয়-সম্পত্তি আছে, বনেদী বংশের ছেলে তিনি, অজস্র সময় এবং সম্পত্তি নিয়ে কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না, সুতরাং এইবার বোধ হয় বিয়ে করে সংসারী হতে পারবেন--বিশেষত এত বড় মোকদ্দমাটা নির্বিবাদে মিটে গিয়ে অতগুলো টাকা পেয়ে গেলেন যখন। বড় মেয়ে সুমিতা—যাকে যুগল "খাসা মেয়ে" বলে বর্ণনা করেছিল—তার আচরণে সন্দেহটি আরও বদ্ধমূল হতে লাগল পুরন্দরবাবুর মনে। তার শাড়ি, ব্লাউস, চুল বাঁধবার ধরন, সলজ্জ দৃষ্টি প্রভৃতি অন্যগুলির থেকে একটু স্বতন্ত্র বলে ঠেকল তাঁর কাছে। তার বোনেদের এবং তাদের বান্ধবীদের ধরন থেকেও প্রতীয়মান হতে লাগল যেন সুমিতার দৌলতেই তারা পুরন্দরবাবুর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছে—অর্থাৎ যেন তিনি সুমিতাকে "দেখতে এসেছেন" এবং এরা সবাই তা আগে থাকতে জানে। তাদের ব্যবহার এবং মাঝে মাঝে দু'একটা কথাও যা প্রকাশ করতে লাগল তার অন্য কোন মানে হয় না আর। সুমিতা মেয়েটি লম্বা, ফরসা। তন্বী নয়, দোহারা। মুখখানি ভারি মিষ্টি। বেশ শান্ত শিষ্ট ভদ্র। পুরন্দরবাবুর মনে হতে লাগল এরকম মেয়ের বিয়ে হয়নি কেন এখনও? আশ্চর্য তো। পণের জন্যে আটকেছে সম্ভবত। এখনও দেখতে বেশ সুশ্রী আছে, কিন্তু এর পর দেখতে দেখতে মোটা হয়ে যাবে, তখন.....। বিশ্বম্ভরবাবুর অন্য মেয়েগুলিও দেখতে বেশ। তাদের বান্ধবীদের মধ্যেও অনেক রূপসী ছিল। পুরন্দরবাবু সুমিতার দিকেই মনটাকে একাগ্র রাখতে পারলেন না। তাছাড়া বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল তাঁর।

পারুল---ষষ্ঠী ভগ্নীটি, যে স্কুলে পড়ে, যুগল পছন্দ করেছে যাকে— সে অনেকক্ষণ পরে এল। পুরন্দরবাবু যে কতটা আগ্রহভরে তার আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন তা আবিষ্কার করে নিজেই বিস্মিত হলেন, ধিক্কারও দিলেন নিজেকে তার জন্যে। কিন্তু আগ্রহটা কমল না। পারুলের আবির্ভাবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল বেশ। পারুলের সঙ্গে এল কঙ্কনা---ছিপছিপে শ্যামবর্ণের মেয়েটি, তীক্ষ্ণ মুখশ্রী, চোখের দৃষ্টি চকমক করছে, বুদ্ধির দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে মুখভাবে। তাকে দেখে যুগল একটু তটস্থ হয়ে পড়ল। কঙ্কনার বয়স বছর তেইশ হবে। তার ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতা নাকি অসাধারণ। স্কুলে মাস্টারি করে, পাশের বাড়িতে থাকে। কিন্তু সে বিশ্বম্ভরবাবুদের বাড়িরই একজন হয়ে গিয়েছিল প্রায়। বাড়ির সব মেয়েরা 'কঙ্কনাদি' বলতে অজ্ঞান। পারুলের তো তাকে ছাড়া চলতই না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরন্দরবাবু বুঝতে পারলেন যে একটি মেয়েও যুগলের উপর প্রসন্ন নয়, পাড়ার মেয়েরাও নয়। পারুলের ভাবভঙ্গী থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে সে যুগলকে ঘৃণা করে। পুরন্দরবাবু এও লক্ষ্য করলেন যে, যুগল এ সম্বন্ধে নির্বিকার। হয় সে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না, কিম্বা বুঝতে চাইছে না।

সবগুলির মধ্যে পারুলই সবচেয়ে দেখতে ভালো। রং তত ফরসা নয় কিন্তু অপরূপ একটা

বন্যশ্রী তার সর্বাঙ্গে যেন মূর্ত হয়ে রয়েছে। এখনও পোষ মানেনি, মানবার কোন লক্ষণও নেই। উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে দুষ্টুমি মাখানো, মুখের হাসিতে ছোট্ট একটু মিষ্টি খোঁচ, চমৎকার ঠোঁট দুটি, চকচকে দাঁত, তন্বী দেহটি পেলব বন্যবল্লরীর মতো, মুখভাবে শিশুর সারল্যের সঙ্গে মিশেছে আসন্ন যৌবনের পূর্বাভাষ। তার বয়স যে পনেরোর বেশী নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল তার প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কথায়।

যুগলের উপহার দেওয়া ব্যাপারটা মোটেই জমল না, হাস্যকর হয়ে উঠল। একটু অপ্রীতিকরও। পারুল ঘরে ঢুকতেই দেঁতো হাসি হেসে যুগল এগিয়ে গেল এবং পকেট থেকে ব্রেসলেটের বাক্সটা বার করে বললে—"এর আগের দিন তোমার গান শুনে এত ভালো লেগেছিল যে তোমার জন্যে প্রাইজ এনেছি একটা—হেঁ—হেঁ।" আর বলতে পারল না, কথাটা আটকে গেল, অসহায়ভাবে বাক্সটা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। পারুল নেবার জন্যে হাত বাড়াল না দেখে জোর করে তার হাতে গুঁজে দিতে গেল। রাগে লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল পারুলের, সে হাত সরিয়ে নিয়ে মায়ের দিকে ফিরে বললে—আমি নেব না।

বিশ্বম্ভরবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—"নাও না, তাতে কি হয়েছে, এনেছেন যখন তোমার জন্যে, নাও। নিয়ে ধন্যবাদ দাও।" কিন্তু তাঁর মুখ চোখ দেখে মনে হল তিনিও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যুগলের দিকে চেয়ে বললেন, "কি দরকার ছিল এসবের—"

পারুল যখন দেখলে না নিয়ে উপায় নেই, তখন নিতেই হল তাকে। "ধন্যবাদ"টা কোনক্রমে উচ্চারণ করে মুখ টিপে মায়ের পাশে গিয়ে বসল সে, নাকের ডগাটা কাঁপতে লাগল তার। তার এক বোন উঠে গেল কি দিয়েছে দেখবার জন্যে। বাক্সটা না খুলেই পারুল তাকে দিয়ে দিলে সেটা। যুগলকে দেখিয়ে দিলে যে তার দেওয়া উপহারকে গ্রাহ্যই করে না সে। ব্রেসলেট জোড়া হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, কেউ বিশেষ কিছু মন্তব্য করলেন না, ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল কারো কারো চোখের দৃষ্টিতে। হেমাঙ্গিনী দেবীই কেবল মৃদুস্বরে প্রশংসা করলেন একটু। যুগল মরমে মরে গেল। পুরন্দরবাবুই আবহাওয়াটাকে স্বচ্ছ করে তুললেন শেষে। কথা কইতে আরম্ভ করলেন, যা মনে এল তাই নিয়েই শুরু করলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল, সবাই মন দিয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগল। ওস্তাদ আড্ডাধারী ছিলেন পুরন্দরবাবু এককালে, আড্ডা জমাবার কৌশল জানা ছিল তাঁর ভাল করেই। যা হোক কিছু একটা কায়দা করে শুরু করলেই জমে যায়। কখনও সরসতা, কখনও সরলতা, কখনও পরচর্চা, কখনও রাজনীতি, দুচার লাইন কবিতা, দুচারটে রসিকতা—নানা মন্ত্র জানা ছিল তাঁর। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের অন্তর থেকেই একটা বিশেষ প্রেরণা পাচ্ছিলেন তিনি, অপরকে আকর্ষণ করবার শক্তি যে তাঁর আছে তা যেন সচেতন ভাবে অনুভব করছিলেন এবং তারই মাদকতায় উৎফুল্ল হয়ে উঠছিলেন ক্রমশ। এখনই যে সকলে তাঁর দিকে ফিরে তাকাবে, সাগ্রহে তাঁর কথাই শুনবে, তাঁর সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে আলাপ করবে না, তাঁর রসিকতাতেই হাসবে কেবল—এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সত্যিই বেশ জমে উঠল একটু পরে। আরও তিন চারজন যোগ দিলে গল্পগুজবে হাসি-ঠাট্টায়। পরকে আপন করে দলে টেনে নেবারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল পুরন্দরবাবুর। হেমাঙ্গিনী দেবীর মুখ থেকেও ক্লান্তির ছায়া অপসারিত হয়ে হাসির আলো ফুটল। সুমিতার তো কথাই নেই, মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসে পুরন্দরবাবুর

কথা শুনছিল সে। পারুল কিন্তু একটু সন্দেহের চক্ষে দেখছিল পুরন্দরবাবুকে, তার ভ্রূভঙ্গী থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তা। এতে পুরন্দরবাবুর উৎসাহ আরও বেড়ে যাচ্ছিল যেন। কঙ্কনাও যোগ দিয়েছিল আলাপে, পুরন্দরবাবুকে ঠাট্টা করতেও ছাড়েনি একটু। "যুগলবাবু বলছিলেন আপনি তাঁর বাল্যবন্ধু, তাহলে আপনার বয়সও তো নিতান্ত কম নয়! পঞ্চাশের উপর তো হবেই, নয়? অথচ আপনাকে কত কমবয়সী মনে হচ্ছে"—মাথা দুলিয়ে মিছে কথাটা বানিয়ে বলেছিল সে, কিন্তু তারও পুরন্দরবাবুকে ভালোই লাগছিল। যুগল কিন্তু একেবারে মুষড়ে গিয়েছিল। পুরন্দরবাবুর ক্ষমতা অবশ্য জানা ছিল তার এবং এখানে তাঁর সাফল্যে সে উল্লসিতও হচ্ছিল প্রথম প্রথম, যোগ দেবারও চেষ্টা করছিল তাঁর রসিকতায় কিন্তু পুরন্দরবাবুর স্বতোৎসারিত আবেগের কাছে দাঁড়াতে পারছিল না সে। ক্রমশ সে গম্ভীর হয়ে পড়ল। শেষে তার মুখ দেখে মনে হতে লাগল অত্যন্ত দমে গেছে বেচারা।

"আপনি তো ঘরের লোক হয়ে গেলেন, আপনার সঙ্গে আর ভদ্রতার ভান করবার দরকার নেই। আমার একটু কাজ আছে, উঠি এবার। ছুটির দিনেও নিস্তার নেই মশাই, মোকদ্দমার কাগজপত্তর জমে আছে এক গাদা। আপনার সম্বন্ধে কি ভুল ধারণাই ছিল আমার—ভেবেছিলাম অহঙ্কারী গোমড়ামুখো ছিটগ্রস্ত লোকটা—এখন দেখছি ঠিক উলটো। মানুষ কত ভুলই করে। আচ্ছা চলি আমি।"

বিশ্বম্ভরবাবু চলে গেলেন। ঘরের কোণে পিয়ানো ছিল একটা। পুরন্দরবাবু প্রশ্ন করলেন—"এ যন্ত্রটি বাজায় কে?"

তারপর পারুলের দিকে হঠাৎ ফিরে বললেন—"তুমি নিশ্চয় গাইতে পার।"

"কে বললে আপনাকে" ফোঁস করে উঠল যেন পারুল।

"এক্ষুণি তো যুগলবাবু বললেন।"

"ওটা মিছে কথা। আমার গানের গলা নেই।"

"আমারও গানের গলা নেই। তবু আমি গাই মাঝে মাঝে।"

"আপনি গাইবেন? আমিও গাইব তাহলে"—হঠাৎ পারুলের চোখ দুটোতে আলো ঝলমল করে উঠল—"কিন্তু এখন নয়, খাবার পরে। গান খুব ভালো লাগে না আমার, জানেন—দিন রাত প্যান প্যান—বিচ্ছিরি—পিয়ানোটার জ্বালায় অস্থির—দিদি তো সকাল নেই সন্ধ্যে নেই টুংটাং করছেই। দিদির গান অবশ্য শোনবার মতো—"

পুরন্দরবাবু এ সূত্র ছাড়লেন না। সুমিতা সত্যই রোজ পিয়ানো সাধে। পুরন্দরবাবু সুমিতাকে অনুরোধ করাতে সবাই পুলকিত হল—হেমাঙ্গিনী দেবী তো গদগদ হয়ে পড়লেন একেবারে। একটু মুচকি হেসে সুমিতা উঠে পিয়ানোর কাছে গেল। হঠাৎ ভয়ানক লজ্জা হল তার, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল, নিজের কাছেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সে এতে—চব্বিশ বছরের বুড়ো ধাড়ি মেয়ে সে, কচি খুকীর মতো একি অশোভন লজ্জা তার, এ অপ্রতিভ ভাবটাও ফুটে উঠল মুখে। কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করে টুলটার উপর বসে পড়ল সে। দু'চারটে মামুলি গৎ মামুলিভাবেই বাজালে। ভারী লজ্জা করছিল তার। পুরন্দরবাবু কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন প্রশংসায়। গৎগুলোর প্রশংসা করলেন বেশী, বাদিকার তত নয়। কিন্তু সুমিতা এত সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরতে পারল না। সে হৃষ্ট হয়ে উঠল খুব এবং এমন তন্ময় হয়ে পুরন্দরবাবুর সঙ্গীতবিষয়ক আলোচনা শুনতে লাগল যে পুরন্দরবাবুও তার প্রতি একটু আকৃষ্ট

না হয়ে পারলেন না। "বাঃ বেশ মেয়েটি তো"—ফুটে উঠল তাঁর দৃষ্টিতে এবং তা সবাই বুঝতেও পারল, বিশেষ করে সুমিতা নিজে।

"আপনার বাগানটা তো চমৎকার" হঠাৎ জানালা দিয়ে চেয়ে পুরন্দরবাবু বললেন—"চলুন না বাগানেই যাওয়া যাক, ঘরের ভেতর কেন, এমন বাগান থাকতে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ চলুন" প্রায় সবাই বলে উঠল সমস্বরে, যেন সকলের মনের কথাটা পুরন্দরবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

সবাই বাগানে নেমে গেল এবং সন্ধ্যে পর্যন্ত রইল সেখানে। হেমাঙ্গিনী দেবীর যদিও একটু ঘুমিয়ে নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পাছে পুরন্দরবাবু কিছু মনে করেন এই ভেবে তিনি আর ঘুমুতে গেলেন না। কিন্তু বাগানে নেমে হুড়োহুড়ি করতেও প্রবৃত্তি হল না তাঁর, তিনি বারান্দায় বেরিয়ে একটা চেয়ারে বসে ঢুলতে লাগলেন। পুরন্দরবাবু বাগানে গিয়ে খুব জমিয়ে ফেললেন মেয়েদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরেই পাড়ার আরও কয়েকটি ছোকরা এসে জুটল। একজন কলেজে পড়ে, আর একজন ম্যাট্রিকের গণ্ডী পেরোয়নি। তাদের দেখে তাদের বান্ধবীরা অভ্যর্থনা করে নিলে। নীল চশমা-পরা উস্‌কো-খুস্‌কো চুল তৃতীয় আর একটি ছোকরা এল। সে এসেই পারুল আর কঙ্কনাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে চেয়ে ভুরু কুঁচকে ফুসফুস গুজগুজ করতে লাগল। বোঝা গেল পুরন্দরবাবুর অভ্যাগমে অসন্তুষ্ট হয়েছে সে এবং বাগে পেলে তাঁকে এক হাত দেখিয়ে দিতেও ছাড়বে না।

"আসুন কিছু খেলা যাক"—অনেকগুলি মেয়ে বললে।

"কি খেলবে? কি তোমরা খেল রোজ?"

"সব রকম: লুকোচুরি, কানামাছি, ব্যাডমিন্টন। সন্ধ্যের সময় কিন্তু আমরা নতুন খেলা খেলি একটা—কিম্বদন্তী।'

"সে আবার কি?"

"আমরা সবাই মিলে বসব একটা ঘরে। একজন বাইরে চলে যাবে। তারপর আমরা একটা কিম্বদন্তী ঠিক করব—এই যেমন ধরুন 'অতি দর্পে হত লঙ্কা'! তারপর যে বাইরে চলে গেছে তাকে ডাকা হবে। আর আমরা তাকে এক একটা বাক্য বলব। একজন মনে করুন বললে 'অতিশয় লোভ ভাল নয়' এর মধ্যে 'অতি' কথাটা আছে, আর একজন বললে 'দর্পনারায়ণ ঠাকুর বড়লোক ছিলেন, এর মধ্যে 'দর্প' কথাটা আছে। সকলের কথা শুনে তাকে কিম্বদন্তীটা বার করতে হবে।"

"বাঃ বেশ মজার তো" পুরন্দরবাবু বললেন।

"না, মোটেই মজার নয়। খানিকক্ষণ পরে বিরক্ত ধরে যায়" বলে উঠল দু'তিনজন।

"কিম্বা আমরা থিয়েটার থিয়েটার খেলি অনেক সময়"—পারুল বললে—"ওই যে বড় বটগাছটা দেখছেন—যার সামনে চৌতারা আছে একটা—ওইখানে। বটগাছের পেছনটা আমাদের গ্রীনরুম। ওইখানে কেউ রাজা, কেউ রাণী, কেউ মন্ত্রী সেজে বসে থাকি। যার যা খুশী। তারপর গ্রীনরুম থেকে যখন যার খুশী বেরিয়ে এলে যা মনে আসে বলে যেতে হয়। আর সবাই বসে শোনে—"

"এটাও তো বেশ" পুরন্দরবাবু বললেন।

"যত বেশ ভাবছেন তত নয়" পারুলই প্রতিবাদ করলে ঠোঁট উলটে— "ভারী বিরক্তিকর হয়ে যায় মাঝে মাঝে। কেউ কিছু বলতে পারে না ভাল করে। তবে আপনি যদি নামেন হয় তো ভালো হবে। জানেন, আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম সত্যিই বুঝি আপনি যুগলবাবুর বন্ধু। এখন দেখছি সেটা বাজে কথা। বানিয়ে গল্প করেছিলেন ভদ্রলোক।"

"আমার ওপর রাগ নেই তাহলে তো আর?"

"আমার তো খুব ভাল লাগছে"—মুচকি হেসে ছুটে চলে গেল পারুল কঙ্কনার কাছে।

অপরিচিতা একটি মেয়ে এগিয়ে এসে পুরন্দরবাবুর কানে কানে বললে, "আজ সন্ধ্যেবেলা আমরা 'কিম্বদন্তী' খেলব। যুগলবাবুকে জব্দ করতে হবে, আপনি আমাদের দিকে, বুঝলেন?"

আর একটি মেয়েকেও ইতিপূর্বে ভালো করে লক্ষ্য করেননি পুরন্দরবাবু। কটা চুল, কটা চোখ, মুখে ব্রণের দাগ—এগিয়ে এসে আলাপ করলে পুরন্দরবাবুর সঙ্গে। ধপধপে ফরসা রং—মুখ লাল হয়েছে রোদের তাতে। একমুখ হেসে বললে—"আপনি এসেছেন, বেশ হয়েছে। সময়টা কাটবে ভালো। এমন একঘেয়ে লাগে রোজ।"

যুগল পালিতের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছিল। খানিকক্ষণ পরেই পুরন্দরবাবুর সঙ্গে পারুলের ভাব হয়ে গেল বেশ। তার চোখে আর সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রইল না। সে স্বচ্ছন্দে হাসছিল, লাফাচ্ছিল, চীৎকার করছিল, পুরন্দরবাবুর হাত ধরে টেনেও ছিল বার দুই, আনন্দ উথলে পড়ছিল যেন তার সর্বাঙ্গ দিয়ে। যুগলকে কিন্তু সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছিল না, তার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল যেন যুগলের অস্তিত্বকেই সে স্বীকার করছে না। যুগল যেন নেই। পুরন্দরবাবু বেশ বুঝতে পারলেন যে সবাই মিলে যুগলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে একটা। পারুল এবং আরও কয়েকটি মেয়ে পুরন্দরবাবুকে টেনে নিয়ে একদিকে চলে গেল, আর একদল মেয়ে যুগল পালিতকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ঠিক বিপরীত দিকে। কিন্তু যুগল হঠাৎ ছটকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে এল পারুলরা যেখানে ছিল এবং এসেই পারুল ও পুরন্দরবাবুর মাঝখানে নিজের টেকো মাথাটা হঠাৎ গুঁজে দিয়ে একটা অস্বস্তির হাসি হাসতে লাগল হাঁপাতে হাঁপাতে। আদব-কায়দা শোভনতা-অশোভনতা কোন কিছুরই তোয়াক্কা করছিল না আর সে যেন। সমস্ত আবরণ উড়িয়ে দিয়ে নিজের মনোভাবটা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করছিল কেবল প্রাণপণে। পুরন্দরবাবু পারুলকে ছেড়ে সুমিতার দিকে যদি একটু মন দেন তাহলে বেচারা বেঁচে যায় যেন। সুমিতাকে একবার লেলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে সে। হাত মুখ নেড়ে একটু ধমকের সুরেই সুমিতাকে বললে—

"আপনি সরে সরে বেড়াচ্ছেন কেন, আলাপ করুন না পুরন্দরবাবুর সঙ্গে।"

সুমিতা হাসিমুখে এগিয়ে এল একটু। পুরন্দরবাবু যে তাকে দেখতে আসেননি একথা সে এতক্ষণে বুঝেছিল, তার সঙ্গর চেয়ে পারুলের সঙ্গই যে বেশী করছেন তিনি—এ-ও অস্পষ্ট ছিল না তার কাছে, তবু হাসিমুখে এগিয়ে গেল একটু সে। পুরন্দরবাবুর কথাবার্তা সম্পূর্ণরূপে বোঝবার মতো বুদ্ধি ছিল না তার, তবু সে শুনে যাচ্ছিল মুখের হাসিটুকু বজায় রেখে। তার মনে যে কোন দুঃখ হয়েছে তা তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। সকলের আনন্দের মাঝখানে সে যে থাকতে পেয়েছে এতেই যেন সে চরিতার্থ।

"তোমার দিদি ভারী চমৎকার লোক, নয়?" পুরন্দরবাবু পারুলকে বললেন চুপি চুপি।

"কে দিদি? নিশ্চয়! দিদির মতো মেয়ে আছে! এতো ভালো লাগে দিদিকে" সোচ্ছ্বাসে বলে উঠল পারুল।

বিশ্বম্ভর-গৃহিণী আহারের আয়োজন করেছিলেন সাহেবী-কায়দায়।

বেশ বোঝা গেল যে তাঁদেরই জন্যে বিশেষ আয়োজন এটা। খাওয়ার পর বৈঠকখানায় গিয়ে জমায়েত হলেন সবাই।

আহারান্তে বিশ্বম্ভরবাবু বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন। পুরন্দরবাবুর আলাপ খুব উপভোগ করতে লাগলেন তিনি, তাঁর প্রতি কথায় হাসতে লাগলেন। পুরন্দরবাবুরও প্রাণে যেন জোয়ার এসেছিল। অনুপ্রাসে, অলঙ্কারে, কবিতায়, রসিকতায় মাতিয়ে তুললেন তিনি সবাইকে। যুগল পালিতের আর সহ্য হল না। সেও রবিঠাকুরের দু'লাইন কবিতা আউড়ে দিলে......মেয়ের দল কলস্বরে হেসে উঠল, কারণ কবিতাটা একটু বেমানান হয়ে গেল। "ও মা, যুগলবাবুও কবিতা জানেন তাহলে" বলে উঠল একজন।

বিশ্বম্ভরবাবু ঘাড় ফিরিয়ে হাসিমুখে চাইলেন যুগলেব দিকে।

"কি কবিতা—"

তাঁর চতুর্থী কন্যা একমুখ হেসে বললে—"উনি বললেন; আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা।"

"বাসবদত্তা? ও. তাব মানে—ও"

কঙ্কনা বললে—"রবি ঠাকুরের অভিসার কবিতাটা—"

"অভিসার? ও—"

বিশ্বম্ভর ভ্রূকুঞ্চিত করলেন একটু।

কঙ্কনা নিম্নকণ্ঠে যুগলকে বললে—"আপনার বরং বলা উচিত ছিল 'নগরীর দীপ নিবেছে পবনে, দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে'—ও কি আপনার চোখে কিছু পড়ল না কি।"

যুগল চোখ কচলাচ্ছিল।

বিশ্বম্ভরবাবু শঙ্কিত হয়ে পড়লেন—"কি হল চোখে?"

চোখের নীচের পাতাটা ওপরের পাতার তলায় ঢুকিয়ে দিন—"

"হাঁচুন, হাঁচুন—"

"ঘাড়ে থাপ্‌পড় মারুন—"

নানা উপদেশ বর্ষিত হতে লাগল।

"খেয়ে এখন ঘুমোবেন না কি! চলুন বাগানে যাওয়া যাক,—" একজন বলে উঠল।

"আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে"—বিশ্বম্ভরবাবু হাই তুললেন।

"আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে। আমরা এখন হুল্লোড় করব, আপনি কতক্ষণ থাকবেন। আপনি শুয়ে পড়ুন।"

"ও, আচ্ছা।"

"চল, তোমার মশারীটা ফেলে দিই গে—"

স-গৃহিনী বিশ্বম্ভরবাবু ওপরে চলে যেতেই বাগানে নেমে পড়ল আবার সবাই।

যুগল হঠাৎ পুরন্দরবাবুর কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললে, "শুনুন একবার—"

একটু দূরে সরে গিয়ে সে বলে উঠল, "না, দেখুন, মাপ করবেন, এবার আমি কিছুতেই, এবার আমি কিছুতেই—মানে—"

"মানে কি?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

যুগল আর কিছু বলতে পারলে না—ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল শুধু—জোর করে হাসবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

"কোথা—কোথা গেলেন আপনারা—আমরা সব 'রেডি'।"

মেয়েদের কলকণ্ঠ শোনা গেল দূরে। পুরন্দরবাবু স্কন্ধদ্বয় উত্তোলন করে 'শ্রাগ্' করলেন. তারপর মেয়েদের দিকে ফিরে গেলেন। যুগলও ছুটতে লাগল পিছু পিছু।

"নিশ্চয় রুমাল চাইছিলেন আপনার কাছে" কল্পনা বললে পুরন্দরবাবুকে—

"গতবার রুমাল আনতে ভুলেছিলেন।"

"প্রতিবারই ভুলবেন উনি" টিপ্পনি কাটলে পারুলের সেজদিদি।

"মা, যুগলবাবু এবারও রুমাল ফেলে এসেছেন, মা যুগলবাবু রুমাল ফেলে এসেছেন" চীৎকার করে উঠল একসঙ্গে সবাই।

হেমাঙ্গিনী দেবী দ্বিতলের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন—"ও, আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি" ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

"না, না আমার দুটো রুমাল আছে" চীৎকার করে উঠল যুগল।

কিন্তু সে কথা হেমাঙ্গিনী দেবী শুনতে পেলেন না, একটু পরেই একটা চাকর একটা রুমাল নিয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এল। হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

"এবার কিন্তু কিম্বদন্তী খেলব আমরা" মেয়েরা সবাই বলে উঠল। একটা জায়গা ঠিক করে বসে পড়ল সবাই। কঙ্কনা প্রথমে যাবে ঠিক হল। কঙ্কনা দল ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল, যেন কিছু শুনতে না পায়। একটা 'কিম্বদন্তী' বাছা হল, কিম্বদন্তীর কোন্ কোন্ কথা দিয়ে কে কি বাক্য তৈরি করবে তা ঠিক হল, তারপর ডাকা হল কঙ্কনাকে। কঙ্কনা ঠিক ধরে ফেললে কিন্তু। প্রবাদটা ছিল—যার ধন তার নয় নেপোয় মারে দই।

এর পর নীল-চশমা-পরা উসকো-খুসকো চুল সেই ছোকরাটির পালা! এর সম্বন্ধে সবাই আরও সাবধান হল—একে আরও দূরে ওই বটগাছটার কাছে গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ছোকরা চটল খুব, কিন্তু যেতেই হল তাকে। ফিরে এসে 'কিম্বদন্তী'টাও সে ধরতে পারলে না। প্রত্যেকের জন্য দু'বার দু'বার শুনলে তবু পারলে না। লজ্জিত হয়ে পড়ল বেচারা। প্রবাদটা ছিল—অতি বড় হয়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোট হয়ো না ছাগলেতে খাবে।

"বাজে সব" বলে উঠল ছোকরা! এর পর গেলেন পুরন্দরবাবু, তাঁকে আরও দূরে পাঠানো হল। তিনিও হেরে গেলেন।

"বড্ড একঘেয়ে লাগছে" বললে কেউ কেউ।

"আচ্ছা এবার আমি সঙ্গে যাই" পারুল বললে।

"না, যুগলবাবু যাবেন এবার, এবার যুগলবাবুর পালা" সকলে চীৎকার করে উঠল একযোগে।

।। এগারো।।

যুগলবাবুকে একেবারে বাগানের শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে হল। গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হল একটি কোণে এবং যাতে ঘাড় ফিরিয়ে এদের দিকে না তাকায় তার জন্যে কটা-চুল সেই মেয়েটিকে পাহারা পাঠানো হল। যুগল সামলে নিয়েছিল এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল ওদের মতো করে ওদের আনন্দে যোগ দিতে। সুতরাং সে অনড় হয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কটাচুল মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে দিতে আর সকলের সঙ্গে ইশারায় ইঙ্গিতে বলতে লাগল কি যেন সব। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিল এইবার মজার কিছু একটা হবে, ষড়যন্ত্র চলছে একটা। হঠাৎ কটা-চুল মেয়েটি হাত নাড়তেই সবাই উঠে পালিয়ে গেল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

"চলুন, চলুন, আপনিও আসুন" অনেকে চুপি চুপি বললে পুরন্দরবাবুকে।

"কেন, ব্যাপার কি—"

"আঃ চেঁচাবেন না। উনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন না যতক্ষণ পারেন, আমরা পালাই চলুন। শিমূল আসছে ওই দেখুন" কটা-চুল মেয়েটিও ছুটে পালিয়ে এল নিঃশব্দে! সকলে ছুটে পুকুরের ওধারে চলে গেল। অর্থাৎ যুগল যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে বিপরীত দিকে একেবারে! পুরন্দরবাবু সেখানে গিয়ে দেখলেন সুমিতা খুব রাগ করে কঙ্কনা আর পারুলকে বকছে খুব।

"রাগ কোরো না দিদি, লক্ষ্মীটি"—পারুল ভোলাবার চেষ্টা করছে তাকে।

"আচ্ছা বেশ, মা-কে আমি বলব না, কিন্তু আমি আর থাকছি না এখানে। ভদ্রলোককে দেওয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে এমনভাবে পালিয়ে আসাটা কি ভদ্রতা! কি মনে করবেন ভদ্রলোক, ছি ছি, ছি।"

সুমিতা চলে গেল। সুমিতা যুগলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু আর কেউ হল না, বরং আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল সবাই। ঠিক হল যুগল ফিরে এলে কেউ যেন তাকে লক্ষ্য না করে। পুরন্দরবাবুও না।

"আসুন কানামাছি খেলা যাক"—কটা-চুল মেয়েটি বললে।

মিনিট পনের পরে যুগল ফিরে এল। সত্যি অনেকক্ষণ সে দেওয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কানামাছি খেলা খুব জমে উঠেছে, চীৎকার হাসি হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে সবাই। যুগল রাগে কাঁপতে কাঁপতে সোজা চলে গেল পুরন্দরবাবুর কাছে। তাঁর কামিজের হাতটায় টান দিয়ে বললে—"শুনুন একবার।"

"কি মুশকিল, বার বার কত শুনবেন উনি আপনার কথা। আবার রুমাল চাই নাকি?"

যুগল পুরন্দরবাবুকে টেনে নিয়ে গেল একধারে।

"এবার নিশ্চয় আপনি, মানে আপনি ছাড়া—"

যুগলের দাঁত কড়মড় করে উঠল।

পুরন্দরবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন—"ওরকম করবেন না আপনি, তাহলে ওরা আরও ক্ষেপে যাবে। আপনি চটছেন বলেই না ওরা চটাচ্ছে আপনাকে। বেশ সহজভাবে মিশুন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

পুরন্দরবাবুর কথাগুলো যুগলের প্রাণে লাগল মনে হল, সে আর কোন উচ্চবাচ্য না করে দলের মধ্যে ফিরে গিয়ে কানামাছি খেলায় যোগ দিলে, যেন কিচ্ছু হয়নি। মেয়েরাও আর তাকে বিশেষ বললে না কিচ্ছু। বিশ্বাসহন্ত্রী শিমূলের (কটা-চুল মেয়েটির) সঙ্গে সে বেশ সহজভাবে মেশবার চেষ্টা করতে লাগল। পুরন্দরবাবু এটা কিন্তু লক্ষ্য করলেন যে যুগল পারুলেব সঙ্গে কথা কইতে সাহস করছে না, যদিও তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোঁক ছোঁক করে। মনে হল পারুলের ঘৃণা এবং অবজ্ঞাটা সে যেন তার প্রাপ্য বলেই মেনে নিয়েছে—এ নিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস বা সামর্থ্য কোনটাই তার আর নেই যেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও আবার তারা শেষকালে তাকে আর একটা খোঁচা দিতে ছাড়লে না।

লুকোচুরি খেলা হচ্ছিল। যুগল একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে ছিল। তারপর তার কি মনে হল সে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটা ঘরে গিয়ে আলমারির পিছনে লুকোল। দেখতে পেয়ে গেল সবাই সেটা! শিমূল তার পিছু পিছু গিয়ে আস্তে আস্তে ঘরটায় শিকল তুলে দিয়ে পালিয়ে এল। তারপর সবাই চলে গেল আবার সেই বটগাছটার দিকে। যুগল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখল কেউ তাকে খুঁজতে আসছে না, তখন সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। কাছে-পিঠে কাউকে দেখতে পেলে না। কপাট খুলতে গিয়ে দেখে কপাট বাইরে থেকে বন্ধ! চীৎকার কারবার উপায় নেই—বিশ্বম্ভরবাবুর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। কাছে-পিঠে চাকরবাকরও দেখতে পাওয়া গেল না একটিও। সুমিতাও ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুতরাং বেচারাকে বন্দী হয়েই বসে থাকতে হল খানিকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে একে একে ফিরে এল সব।

যুগলবাবু আপনি এখানে বসে কি করছেন? কি মজা হল এতক্ষণ। আমরা থিয়েটার থিয়েটার খেলছিলাম। পুরন্দরবাবু কি চমৎকার বক্তৃতা দিলেন! যুবকের পার্ট করলেন, এমন সুন্দর হয়েছিল।

"আপনি বসে আছেন কেন? আসুন আপনাকে দেখেও মুগ্ধ হওয়া যাক একটু।"

"এখনও খেলা শেষ হয়নি নাকি?" হেমাঙ্গিনী দেবীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, বাগানে বসে মেয়েদের সঙ্গে চা খাবেন বলে বেরিয়ে এলেন তিনি।

"কি হচ্ছে সব?"

"দেখুন না, যুগলবাবু ওপরে বসে আছেন"—মেয়েরা আঙুল দিয়ে যুগলবাবুকে দেখিয়ে দিলে। রেগে টং হয়ে গিয়ে তিনি জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন।

"তোমাদের সঙ্গে সমানে দাপাদাপি করতে কে পারে বল?"

হেসে তিনি চাইলেন যুগলের দিকে। যুগলও হাসবার চেষ্টা করলে একটু। পুরন্দরবাবু আসাতে পারুল বিশেষ করে কেন যে খুশী হয়েছে তা একটু পরে সে নিজেই প্রকাশ করলে পুরন্দরবাবুর কাছে—অবশ্য গোপনে।

কঙ্কনা পুরন্দরবাবুকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। পারুল সেখানে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। পুরন্দরবাবুকে পারুলের কাছে রেখে কঙ্কনা চলে গেল।

পারুল তাঁকে বললে—"আমার একটি উপকার করবেন? আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না, সেইজন্যে আপনি আসাতে বিশেষ করে খুশী হয়েছি আমি।"

"কি উপকার?"

যুগলবাবু যতই বলুন আপনি যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নন তা আমার বুঝতে বাকী নেই। আপনি একটি কাজ করুন দয়া করে, এইটি ফেরত নিয়ে যান, ওঁকে দিয়ে দেবেন কোন সময়ে। আমিও ওঁকে দিতে পারতুম, কিন্তু আমি আর জীবনে ওঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাই না। আপনি একথাও জানিয়ে দিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলে দেবেন ভবিষ্যতে উনি যেন জোর করে কোন উপহার দিতে না আসেন কিম্বা আমার সঙ্গে মেশবার চেষ্টা না করেন। করলে অপমানিত হবেন শুধু। এই উপকারটি আমার করবেন?''

ব্রেসলেটের বাক্সটা আঁচলের তলা থেকে বার করলে পারুল।

''আমাকে আর এর মধ্যে জড়িয়ো না, দোহাই'' পুরন্দরবাবু সকাতরে বললেন।

''জড়াব না? কেন? আচ্ছা বেশ! বেশী করতে হবে না কিছু আপনাকে—''

হঠাৎ পারুলের গলা কেঁপে গেল, ঠোঁট ফুলে উঠল, জল এসে পড়ল চোখে। পুরন্দরবাবু বিব্রত হয়ে পড়লেন।

''না, না, আমি তা বলছি না—আচ্ছা দাও দাও—আমারও একটা বোঝাপড়া আছে ওর সঙ্গে।''

''আমি জানি আপনার সঙ্গে ওর ভাব নেই'' সুর বদলে গেল পারুলের, ''হতেই পারে না ওরকম লোকের সঙ্গে ভাব। উনি এসেছেন আমাকে বিয়ে করতে! আস্পর্ধা কম নয়। আপনি আজই ফিরিয়ে দেবেন এটা, কেমন? এ নিয়ে বাবার কাছে যদি কাঁদুনি গাইতে যান উনি, মজাটা দেখিয়ে দেব তাহলে।''

হঠাৎ পিছনের ঝোঁপটা থেকে নীল-চশমা-পরা সেই ছোকরা বেরিয়ে এল। ''ওটা ফিরিয়ে দেওয়া আপনার কর্তব্য''—ছোকরা বললে—''বুঝলেন, মানে নারীদের প্রতি কিছুমাত্র সম্মানবোধ থাকলে এরকম জবরদস্তির প্রতিবাদ করা প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই কর্তব্য'' কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই পারুল হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

''মা গো মা! কি আক্কেল তোমার অজিত। সরে যাও এখান থেকে! আড়ি পেতে কথা শুনতে লজ্জা করে না? তোমাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম—এ কি কাণ্ড—যাও এখান থেকে।''

পা ঠুকে এক ধমক দিতেই অজিত সরে পড়ল। তবু পারুলের রাগ যায় না। রাগে গরগর করতে লাগল সে।

''এমন জ্বালাতন করে এরা'' হঠাৎ পুরন্দরবাবুর দিকে ফিরে সে বললে, ''আপনি বুঝবেন না ঠিক। ভারী অবুঝ সব। আপনার হয়তো মজা লাগছে, কিন্তু এমন লজ্জা করে আমার—''

''একেই বিয়ে করবে ঠিক করেছ না কি'' হেসে পুরন্দরবাবু জিগ্যেস করলেন।

''কক্‌খনো না! একে? আচ্ছা, কি করে ভাবতে পারলেন আপনি!''

হঠাৎ লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল তার; এ তার বন্ধু একজন। ''কি রকম অদ্ভুত সব বন্ধু দেখুন তো......বন্ধুত্ব করবার লোক পায়নি আর। দেখুন, আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি এ কথা বলতে পারি না—এটা ফিরিয়ে দেবেন তো?''

''বেশ দেব।''

''বড্ড ভাল লোক আপনি, খুব ভাল লোক।''

দুচোখে আলো ঝলমল করে উঠল তার। বাক্সটা পুরন্দরবাবুকে দিয়ে বললে—"আজ অনেক গান গেয়ে শোনাব আপনাকে। অনেক—অনেক। সত্যি খুব ভাল গাইতে পারি আমি, জানেন? তখন মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আবার আসবেন তো? আর একবার অন্তত আপনাকে আসতেই হবে—খুব খুশী হব তাহলে। আপনাকে সব কথা বলব পরে—সমস্ত খুলে বলব। আর কাউকে বলবেন না যেন—"

মুচকি হেসে ভুরু নাচিয়ে ছুটে চলে গেল সে।

পারুল তার কথা রেখেছিল, চা খাবার সময় দুটো গান তাঁকে শুনিয়েছিল। সুন্দর মিষ্টি চড়া গলা। চা খাবার জন্যে ভিতরে এসে পুরন্দরবাবু দেখলেন যুগল গম্ভীরভাবে বিশ্বম্ভরবাবু ও হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বসে কি কথা কইছে—হয়তো বিবাহপ্রসঙ্গেই আলোচনাটা সে শেষ করছে। দু'দিন পরে তো তাকে চলে যেতে হবে ন'মাসের জন্য। সবাই যখন ঢুকল সে কারও দিকে ফিরে তাকাল না, পুরন্দরবাবুর দিক থেকে বিশেষ করে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

কিন্তু পারুল গান আরম্ভ করতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পারুলকে একটা কি জিগ্যেস করলে একটু হেসে, পারুল কোন উত্তর দিল না। এতে কিন্তু এতটুকু দমল না যুগল, কিছুমাত্র ইতস্তত না করে এমনভাবে সে সোজা গিয়ে পারুলের চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল যেন ন্যায়ত ওইটেই তার স্থান এবং কোন কারণেই সেখান থেকে সে একচুল নড়বে না।

পারুলের গান শেষ হয়ে গেলে সে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে বললে—"আপনি একটা গান করুন না—"

"আগে গাইতাম, অনেকদিন গাইনি। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে—" পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসলেন তিনি।

"মা, পুরন্দরবাবু গান গাইছেন" মেয়েরা আনন্দে কলরব করে উঠল। কর্তা গিন্নি বারান্দা থেকে ভিতরে এসে বসলেন। পুরন্দরবাবু রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা ধরলেন—

মম—যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি
সখী, জাগো জাগো

পারুল তাঁর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে চেয়ে চেয়েই তিনি আবেগভরে গাইতে লাগলেন। আগেকার মতো গলা আর ছিল না, কিন্তু যা ছিল তাইতেই মাত করে দিলেন। সমস্ত প্রাণ ঢেলে গাইছিলেন তিনি—অন্তরের কামনা যেন মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল প্রতি ছত্রে ছত্রে। প্রতি কথায় ফুটে উঠতে লাগল আকূতিময় আবেগ, মর্মের আবেদন, বাসনার বহ্ন্যুৎসব। প্রদীপ্ত চোখে পারুলের দিকে চাইতে চাইতে তিনি গাইতে লাগলেন—

জাগো আকুল ফুল সাজে
জাগো মৃদু কম্পিত লাজে
মম হৃদয়-শয়ন মাঝে
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি
সখী, জাগো জাগো।

পারুলের সর্বাঙ্গে একটা শিহরন জাগল, ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল সে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল এবং সেই মুহূর্তে পুরন্দরবাবুর মনে হল তার চোখে যেন সলজ্জ আমন্ত্রণের একটা আভাস দেখতে পেলেন তিনি। অন্য শ্রোতারাও মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। গান থেমে যাবার পর একটা নিবিড় স্তব্ধতা যেন ঘনিয়ে এল ক্ষণকালের জন্য—সবাই যেন রুদ্ধশ্বাসে একটা কিসের প্রতীক্ষা করতে লাগল। পুরন্দরবাবু হঠাৎ লক্ষ্য করলেন সুমিতার চোখ দুটো যেন জ্বল জ্বল করছে।

বিশ্বম্ভরবাবু নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

"গানটা বেশ, কিন্তু একটু, ওর নাম কি, যাকে বলে" গলা খাঁকারি দিয়ে থেমে গেলেন ভদ্রলোক। রবিঠাকুরের গানের বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস সংগ্রহ করতে পারলেন না তিনি।

"পুরন্দরবাবুর গলা তো চমৎকার" হেমাঙ্গিনী দেবী শুর করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু যুগল তাঁকে কথা শেষ করতে দিলে না। সে এক কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ ছুটে গিয়ে পারুলের হাত ধরে হিড় হিড় করে তাকে পুরন্দরবাবুর কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল, তারপর পুরন্দরবাবুর কাছে গিয়ে বললে—

"এক মিনিট, বাইরে চলুন তো একবার।"

ঠোঁট দুটো কাঁপছিল তার।

পুরন্দরবাবু দেখলেন বাইরে না গেলে এখনই হয়তো সে যা তা একটা কাণ্ড করে বসবে। তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন।

"আপনাকে এখনই এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে চলে যেতে হবে, বুঝলেন?"

"কেন? বুঝতে পারছি না ঠিক।"

উত্তেজিত কণ্ঠে যুগল বলতে লাগল, "মনে আছে, আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলতে বলেছিলেন, তখন আমি বলিনি, সময় হলে বলব বলেছিলাম; এখন সময় হয়েছে, বুঝলেন, চলুন যাই। আর এখানে থাকা চলবে না।"

পুরন্দরবাবু ক্ষণকাল ভাবলেন, যুগলের মুখের দিকে চাইলেন একবার, তারপর রাজি হয়ে গেলেন।

"আচ্ছা বেশ, চলুন তবে।"

হঠাৎ চলে যাওয়ার প্রস্তাবে কর্তা-গিন্নি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন, মেয়েরা আপত্তি করতে লাগল।

"আর এক কাপ করে চা খেয়ে যান অন্তত" হেমাঙ্গিনী দেবী অনুরোধ করলেন।

যুগল একধারে মুখ কালো করে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বম্ভরবাবু তার কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "হঠাৎ হল কি?"

"যুগলবাবু, কেন আপনি পুরন্দরবাবুকে নিয়ে যাচ্ছেন" মেয়েরা অনেকেই ক্ষুণ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করতে লাগল। পারুল যুগলবাবুর দিকে এমন একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, কিন্তু গোঁ ছাড়লে না।

পুরন্দরবাবু হেসে বললেন, "যুগলবাবুর দোষ নেই। আমারই জরুরি একটা এনগেজমেন্ট আছে এখন—আমি ভুলে গিয়েছিলাম—যুগলবাবু মনে করিয়ে দিলেন। আমাকে যেতেই হবে।"

পুরন্দরবাবু হাসিমুখে প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সুমিতাকে নমস্কার করলেন বিশেষ করে।

"আপনি আসাতে ভারী আনন্দে কাটল দিনটা। আবার আসবেন" বিশ্বম্ভরবাবু বললেন ভদ্রতা করে।

"এলে সত্যিই ভারী খুশী হব" হেমাঙ্গিনী দেবীও বললেন হেসে।

"পুরন্দরবাবু, আবার কবে আসবেন"—মেয়েরা অনেকে বলে উঠল।

গাড়িতে যখন চড়েছেন তখন একটি কণ্ঠস্বর একটা বিশেষ মিনতি যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল—পুরন্দরবাবুর মনে হল।

"আসবেন আবার পুরন্দরবাবু, লক্ষ্মীটি—আসবেন নিশ্চয়।"

পুরন্দরবাবু মুখ বাড়িয়ে দেখলেন সেই কটা-চুল মেয়েটি।

।। বারো।।

কটা-চুল মেয়েটির মুখখানা বার বাব মনে পড়তে লাগল, কিন্তু তবু পুরন্দরবাবুর মনের অন্ধকার যেন ঘুচল না। সমস্ত দিনটা যদিও হল্লা করেই কেটেছে—খেলা, হাসি, গান, অতগুলি মেয়ের সঙ্গ—অন্তরের গ্লানি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও অপসারিত হয়নি মন থেকে—গান গাইবার লোভটা কিছুতেই দমন করতে পারলেন না তিনি এবং সেই জন্যেই বোধ হয় অত আবেগভরে গাইলেন।

"ছি ছি কি কাণ্ডটাই করলাম—এমনভাবে চলে আসাটা" মনে মনে আফশোষ হচ্ছিল কিন্তু তখনই নিজেকে সম্বরণ করলেন। অনুতাপ করাটা আত্মসম্মানহানিকর বলে মনে হতে লাগল—তার চেয়ে বরং রাগ করা ঢের ভাল।

"গাড়োল!" যুগলের দিকে আড়চোখে চেয়ে মনে মনে বললেন তিনি।

যুগল নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল। একটি কথাও বলেনি—যা বলবে তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল বোধহয়। মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুখ মুছছিল। "ঘামছে ব্যাটা"—পুরন্দরবাবু স্বগতোক্তি করলেন!

"একবার শুধু যুগল গাড়োয়ানকে জিগ্যেস করলে—"ঝড়টড় করবে না কি, মেঘ করেছে দেখছি—"

"উঠবে ঠিক। যা গুমোট করেছে সমস্ত দিন।"

ঈশান কোণে সত্যিই মেঘ উঠেছিল, একটা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

বাড়ি পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল।

"আমি আপনার বাসাতেই যাব এখন কিন্তু" যুগল আগে থাকতে বলেই রেখেছিল।

"আসতে পারেন, কিন্তু আমার শরীরটা ভাল নেই।"

"আমি বেশীক্ষণ থাকব না।"

গাড়ি থেকে নেমেই যুগল চাকরটার খোঁজ করতে ভিতরে ঢুকে গেল।

"কেন, কেন, চাকর কি করবে এখন?"

যুগল কোন উত্তর দিলে না। পুরন্দরবাবু আলো জ্বালতেই যুগল চেয়ারে বসল। পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনের বিরক্তি যথাসাধ্য গোপন করে শেষে বললেন—"দেখুন, সব কথা আমি জানতে চেয়েছিলাম বটে, কিন্তু আর আমার কিছু জানবার প্রবৃত্তি নেই। আমাদের মধ্যে জানাজানির আর কোন প্রয়োজন আছে বলেই মনে হচ্ছে না। সুতরাং আপনি এখন বাড়ি যান, আমি খিল বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। রাত হয়ে গেছে।"

"আমাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা কিন্তু হওয়া দরকার যে" পুরন্দরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে যুগল বেশ শান্তভাবেই কথাগুলো বললে।

"বোঝাপড়া! কিসের বোঝাপড়া? এই বলবার জন্যে আপনি ডেকে নিয়ে এলেন আমাকে?"

"হ্যাঁ—এই।"

"বোঝাপড়া করবার কিছু নেই তো—বোঝাপড়া অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে।"

"ও, তাই না কি" বলে যুগল চুপ করে গেল।

পুরন্দরবাবুও কোন উত্তর না দিয়ে পরিক্রমণ শুরু করলেন। পাপিয়ার মুখখানা মনে পড়ছিল বারবার। অনেকক্ষণ নীরবতার পর হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন—"কি বোঝাপড়া করতে চান আপনি?"

যুগল চেয়ে চেয়ে দেখছিল তাঁকে এতক্ষণ।

"আর ওখানে আপনি যাবেন না" সহসা করুণ কণ্ঠে বলে উঠল সে এবং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"ও, আপনি ওই সব ভাবছেন নাকি" পুরন্দরবাবু হেসে ফেললেন, "আচ্ছা আজ সমস্ত দিন আপনি কি কাণ্ডটা করলেন বলুন দেখি?" খুব একটা উপদেশাত্মক বক্তৃতার সুরে আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ সুরটা বদলে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—"আজ আমিও নিজেকে যতটা হীন করেছি এতটা হীন বোধহয় জীবনে কখনও করিনি—প্রথমত আপনার সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে—দ্বিতীয়ত ওখানে ওদের সঙ্গে যা হল.....এত ছেলেমানুষি যা তা কাণ্ড সব.....নিজেকে ওসবের সঙ্গে জড়িয়ে লজ্জা হচ্ছে আমার.....ছি ছি.....আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল.....আর আপনিও যে কাণ্ডটা করলেন তা কি কোন ভদ্রলোক করে—আমাকে অমনভাবে অপ্রস্তুত করবার মানে কি—কিন্তু আপনাকে কিছু বলছি না আমি সে জন্যে—আমার দুর্বুদ্ধির জন্যে শাস্তি পাওয়া উচিত—ভয় নেই আমি আর যাব না সেখানে.....ওদের সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই আমার।"

সদম্ভে বক্তব্য শেষ করলেন তিনি।

"সত্যি? সত্যি বলছেন?" যুগল তার আনন্দ যেন আর চাপতে পারছিল না। পুরন্দরবাবু তার দিকে ঘৃণাব্যঞ্জক একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার পদচারণা শুরু করলেন।

"আপনি তাহলে আবার বিয়ে করে সুখী হবেন ঠিক করে ফেলেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাতে আমার কি?" পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন, "ও যদি বোকামি করে উচ্ছন্ন যায় আমার কি এসে যায় তাতে! আমি বড় জোর ঘৃণা করতে পারি, যদিও ঘৃণারও উপযুক্ত ও নয়।

"স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করাই তো আমার কাজ" কাচুমাচু হয়ে একটু হেসে যুগল বললে, "আপনিই তো একথা বলেছিলেন একদিন। আপনার একটি কথাও ভুলি না আমি, যা বলেন সব মনে থাকে।"

এক বোতল মদ এং দুটো গ্লাস নিয়ে চাকরটা ঘরে ঢুকল।

"ও, ওই জন্যই চাকরের খোঁজ হচ্ছিল! এখন আপনাকে মদ খেতে দেব না আমি---"

"মাপ করবেন পুরন্দরবাবু, না খেলে পারব না আমি। আমাকে ছোটলোক বলে ভাবুন ক্ষতি নেই—কিন্তু খেতে দিন আমাকে।"

"আমার শরীর ভাল নেই, এখন আমি শুতে যাই।"

"হ্যাঁ এই যে—এখনি এখনি—গলাটা ভিজিয়ে নি শুধু একটু।"

তাড়াতাড়ি সে আধ গ্লাসটাক খেয়ে ফেল্লে চোঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই, বাকী অর্ধেকটা শেষ করলে বসে। তারপর সস্নেহে চাইলে সে পুরন্দরবাবুর দিকে। চাকরটা বেরিয়ে গেল।

"আঃ—" পুরন্দরবাবু অস্ফুট কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

"দেখুন, ওর মেয়ে-বন্ধুগুলোই ওকে" যুগল বাগিয়ে শুরু করল আবার।

"কি? ও, তাদের কথাই ভাবছেন এখনও!"

"ওর মেয়ে-বন্ধুগুলোই ভাংচি দিচ্ছে। ওর বয়সই বা কি.....তা ছাড়া মেয়েদের একটু আধটু আদিখ্যেতা তো থাকবেই। ভারী চমৎকার! আমি কেনা গোলাম হয়ে থাকব ওর! তবু মন পাব না বলছেন? গাড়ি, বাড়ি, গয়না, সামাজিক সম্মান এসব পেলেও বদলাবে না? নিশ্চয় বদলাবে।"

"ওকে ব্রেসলেট্ জোড়া ফেরত দিতে হবে" মনে পড়ল পুরন্দরবাবুর। ভ্রূকুঞ্চিত করে পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন সেটা আছে কিনা।

'আপনি বলছেন আমি সুখী হব ঠিক করেছি কি না? না ঠিক করে উপায় কি! আর বিয়ে না করলে সুখী হবই বা কি করে। বলুন, আপনিই বলুন"—করুণকণ্ঠে বলতে লাগল সে—"আমার গতি কি হবে, তাহলে ভেবে দেখুন"-বোতলটা দেখিয়ে বললে—"এতেই ডুবে যেতে হবে শেষে, কিন্তু এ-তো কিছু নয়, যে নরক আমাকে টানছে তার শতাংশের একাংশও নয়। বিয়ে করে ভদ্র একটা জীবনকে যদি আঁকড়ে ধরতে না পারি তাহলে ডুবে যাব আমি। নূতন একটা আদর্শ পেলেই ঠেলে উঠব আবার দেখবেন।"

"কিন্তু এসব কথা আপনি আমাকে বলছেন কেন শুধু শুধু"—বলেই পুরন্দরবাবু হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা আমাকে ওখানে টেনে নিয়ে গেলেন কেন আপনি! উদ্দেশ্যটা কি ছিল আপনার?"

"পরখ করা....." বলেই যুগল বিব্রত হয়ে পড়ল।

"কি পরখ করা?"

"ফলাফলটা।.....মানে, এই হপ্তাখানেক থেকে ওখানে যাচ্ছি তো", একটু বিব্রত হয়ে পড়ল সে—'আপনাকে দেখে সেদিন হঠাৎ মনে হল পর-পুরুষের সঙ্গে ও কি রকম ব্যবহার করে তা তো জানা নেই। পরীক্ষা করে দেখলে হয় একদিন। বোকামি আর কি। কোন দরকার ছিল না। অত্যন্ত বেশী আশা করেছিলাম.....আমার চরিত্র এমনই—কি আর বলব বলুন.....মানে—"

হঠাৎ মুখ তুলে চাইলে সে। পুরন্দরবাবু দেখলেন—চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে তার।

"সত্যি কথা বলছে তো" পুরন্দরবাবু ভাবলেন এবং মনে মনে বিস্মিত হয়ে গেলেন—

"বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা ভাল করে—"

"ছেলেমানুষি আর কি! তাছাড়া ওর ওই মেয়ে বন্ধুগুলো!"

"ঝোঁকের মাথায় আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলেছি মাপ করবেন। আর কখনও এমন হবে না।"

"আমি সেখানে আর যাবই না।"

"হ্যাঁ, সেইজন্যই আশা করছি যে এ রকমটা আর কখনও ঘটবে না।"

পুরন্দরবাবু হেসে বললেন—"কিন্তু আমি ছাড়া আরও পুরুষ আছে তো সংসারে—তাদের সামলাবেন কি করে?"

যুগলের মুখ লাল হয়ে উঠল।

"আপনার মুখে একথা শুনে দুঃখিত হলাম পুরন্দরবাবু। পারুলের সম্বন্ধে আমার ধারণা মোটেই হীন নয়।"

"ক্ষমা করবেন, আমি এম্‌নি ঠাট্টা করছিলাম। একটা ব্যাপারে খুব আশ্চর্য লাগছে কিন্তু। আমার আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে আপনার ধারণা যেমন প্রচণ্ড, আমার চরিত্রের ওপর আপনার বিশ্বাসও তেমনি অগাধ দেখছি।"

"হ্যাঁ ঠিকই তাই.....অতীতে এর প্রমাণ পেয়েছি যে......"

"আপনি এখনও তাহলে আমাকে একজন চরিত্রবান পুরুষ বলে মনে করেন!"

অন্য সময়ে নিজের এ প্রশ্নে নিজেই চমকে উঠতেন পুরন্দরবাবু।

"আমি বরাবরই তাই ভেবেছি আপনাকে"— চোখ নীচু করে যুগল বললে।

"হ্যাঁ তাতো ঠিকই—তা আমি বলছি না,—আমি বলছিলাম যে, অতীতে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তা এখনও—মানে—"

"হ্যাঁ, এখনও তা ঠিক আছে।"

"আপনি এবার যখন কোলকাতায় এসেছিলেন তখনও আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিল আপনার?"

পুরন্দরবাবু কৌতূহল দমন করতে পারলেন না কিছুতেই।

"হ্যাঁ। আমি বরাবরই আপনাকে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলেই জানি।"

যুগল চোখ তুলে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে চাইলে পুরন্দরবাবুর দিকে। পুরন্দরবাবুই ভয় পেয়ে গেলেন হঠাৎ—কিন্তু একটা হয়ে পড়ুক এ তিনি চান না—যে ভদ্র আবরণটা দু'জনের মধ্যে এখনও আছে তা সরিয়ে দেবার মোটেই ইচ্ছে নেই তাঁর। ভয় হতে লাগল আবরণটা খসে পড়ে বুঝি!

"আমি আপনাকে ভালবাসতাম পুরন্দরবাবু" যেন এইবার সমস্ত খুলে বলবে এই রকম একটা ভাব করে যুগল শুরু করলে "বর্ধমানে যখন ছিলেন আপনি, সত্যিই আমি আপনাকে ভালবাসতাম। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি।"

যুগলের গলা কাঁপতে লাগল, পুরন্দরবাবুর আরও ভয় হল—"আপনার তুলনায় সত্যিই

নগণ্য ছিলাম আমি, লক্ষ্য করবার কথাও নয়। তাছাড়া প্রয়োজনও ছিল না কোন। গত ন বছর আপনার কথা কিন্তু বার বার মনে পড়েছে আমার, কারণ আমার জীবনে ওই বছরটাই সব চেয়ে সুখের ছিল। ওর চেয়ে ভাল সময় আর আসেনি" (যুগলের চোখ দুটো চক চক করতে লাগল) "আপনার অনেক রসিকতা, অনেক কবিতার লাইন, অনেক জিনিস মনে পড়ত আমার। আপনি যে একজন উদার-হৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তি—শুধু শিক্ষিত নয়, উচ্চশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি—এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না—আপনিই একবার বলেছিলেন—"মহৎ প্রেরণার উৎস মহৎ প্রতিভা নয়, মহৎ হৃদয়"—আপনি হয়তো ভুলে গেছেন—কিন্তু আমি ভুলিনি। আপনার হৃদয় যে মহৎ সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলাম আমি তাই সমস্ত সত্ত্বেও আপনার উপর বিশ্বাস হারাইনি।"

হঠাৎ তার থুতনিটা কাঁপতে লাগল। পুরন্দরবাবু অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। যেমন করে হোক কথার মোড়টা ফেরাতে হবে। কিন্তু সহসা নিজেই সংযম হারিয়ে ফেললেন তিনি।

"থাক থাক, হয়েছে হয়েছে, কি বকছেন যা তা" এই কথা বলতে বলতেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন "এ সব কথা বলবার মানে কি—বারবার বলছি শরীর ভাল নেই আমার—তবু আপনি ক্রমাগত ভ্যান ভ্যান করে বকেই চলেছেন—বকে বকে আমাকে উন্মাদ প্রায় করে তুলেছেন, তবু আপনার তৃপ্তি হচ্ছে না—ইঙ্গিতে ইশারায় ঠোরে ঠারে এক অজানা অন্ধকারে ক্রমাগত ঠেলে নিয়ে চলেছেন আমাকে—অথচ সব মিথ্যে, ধাপ্পাবাজি, জুয়োচুরি, বাড়াবাড়ি—এইটেই সবচেয়ে মারাত্মক—বাড়াবাড়ি—বাড়াবাড়ি। একটুও সত্যি নয়—সব বাজে মিথ্যে কথা। দুজনেই সমান পাজি আমরা, দুজনেই অন্ধকারের ঘৃণ্য জীব। একটুও ভালোবাসেন না আপনি আমাকে, সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেন—বলেন তো এখুনি প্রমাণ করিয়ে দিতে পারি সে কথা। আপনি মিছে কথা বলেছেন। আপনি যে আমাকে আজ ওখানে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন তা আপনার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সতীত্ব-পরীক্ষা করবার জন্যে নয়—বাঁকা পথে প্রতিশোধ নেবার জন্যে। ওই মেয়েটাকে দেখিয়ে আমার হিংসা প্রবৃত্তিটাকে উত্তেজিত করে আপনি উপভোগ করতে চাইছিলেন সেটা—"দেখেছেন কি রকম খাসা মেয়ে যোগাড় করেছি এইবার, আমারই হবে ও। কি করতে পারেন এবার করুন"—এই ছিল আপনার মনোভাব! আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন আমাকে। ঘৃণা না করলে কেউ কাউকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে না, সুতরাং আপনি যে আমাকে ঘৃণাই করেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার।"

চীৎকার করতে করতে সমস্ত ঘরে যেন ছুটোছুটি করতে লাগলেন তিনি। আত্মসংযম হারিয়ে যুগলের কাছে নিজেকে যে এমনভাবে হীন করে ফেলবেন এই ভেবে অত্যন্ত খারাপও লাগছিল তাঁর, কিন্তু সামলাতে পারছিলেন না নিজেকে।

"আপনার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলাই উদ্দেশ্য ছিল আমার পুরন্দরবাবু!"

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে যুগল বলে উঠল, হঠাৎ তার থুতনিটা কাঁপতে লাগল।

ভয়ঙ্কর রাগ হল পুরন্দরবাবুর—তাঁর মনে হল এত অপমান বুঝি তাঁকে জীবনে কেউ কখনও করেনি।

"আবার আমি আপনাকে বলছি, আমার শরীর ভাল নেই—এমন করে লাগবেন না আমার

পিছু। আপনি কেন লাগছেন তাও জানি, আপনি আশা করছেন যে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলে একটা ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তি বার করে নেবেন আমার মুখ থেকে। কিন্তু জেনে রাখুন, ভিন্ন জগতের লোক আমরা এবং.....এবং আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা চিতা প্রসারিত রয়েছে"—হঠাৎ বলে ফেললেন তিনি এবং বলেই বুঝলেন কি করে ফেলেছেন।

"আপনি জানেন" হঠাৎ যুগলের মুখখানা বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে গেল—"আপনি জানেন আমার কাছে সে চিতার অর্থ কি—"

হাস্যকর অথচ ভয়ঙ্কর একটা ভঙ্গীতে পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের বুক চাপড়ে সে বলে উঠল "এইখানে জ্বলছে সে চিতা, আমরা দুজনেই সে চিতার ধারে দাঁড়িয়ে আছি তা ঠিক, কিন্তু আমার দিকেই আঁচটা লাগছে বেশী"—পাগলের মতো বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগল—"অনেক বেশী, অনেক বেশী—"

হঠাৎ অত্যন্ত জোরে ইলেকট্রিক ঘণ্টাটা বেগে ওঠাতে দুজনেই প্রকৃতিস্থ হল। এত জোরে বাজাতে লাগল যেন কেউ ঘণ্টাটা ভেঙে ফেলতে চায়।

"কে এলো? আমার কাছে যারা আসে তারা কখনও এত জোরে ঘণ্টা বাজায় না তো—"

পুরন্দরবাবু হকচকিয়ে গেলেন একটু।

"আমার কাছেও" মৃদুকণ্ঠে যুগলও বললে, একটু ভয়ে ভয়ে। ঘণ্টার আওয়াজের চোটে সেও আত্মস্থ হয়েছিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করে পুরন্দরবাবু এগিয়ে গেলেন এবং কপাটটা খুললেন।

"আপনিই কি পুরন্দরবাবু?" কনকনে জোব গলায় প্রশ্ন করলে কে একজন।

"হ্যাঁ, কি চাই?"

"যুগল পালিত এখানে আছেন শুনলাম। তাঁর সঙ্গে এখনি দেখা করতে চাই আমি।"

পুরন্দরবাবু কমবয়সী ছোকরাটিকে আপাদমস্তক দেখলেন একবার। যদিও তাঁর ইচ্ছে করছিল লাথিয়ে ছোকরাকে দূর করে দিতে—কিন্তু তা আর করলেন না।

"আসুন, এই যে যুগলবাবু এখানেই আছেন—"

ছোকরাটির বয়স সত্যিই কম, উনিশ কুড়ির বেশী হবে না, কমও হতে পারে। তার মুখের কিশোর শ্রী, স্বস্থ চোখের দৃষ্টি, দৃপ্ত উন্নত মস্তক দেখলে তাই মনে হয়। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবিতেই চমৎকার মানিয়েছিল তাকে। একটু লম্বা ধরণের, মাথায় কোঁকড়ান চুল, বড় বড় কালো চোখে নির্ভীক দৃষ্টি। সুশ্রী ছেলেটি। খুব গম্ভীর ভাবে ঘরে এসে ঢুকল সে।

"আপনিই যুগলবাবু? ও—"

বেশ গম্ভীর ভাবে সে যুগলবাবুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। "ও" কথাটা এমনভাবে বললে যে যুগল ভড়কে গেল একটু।

পুরন্দরবাবু আভাসে যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, যুগলের মনেও কিসের যেন ছায়াপত হল একটা। চোখে মুখে আশঙ্কা ঘনিয়ে এল তাঁর। আচরণে কিন্তু সে কোন বিচলিতভাব প্রকাশ করলে না। বেশ গম্ভীরভাবেই বললে—"আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ইতিপূর্বে হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার থাকতে পারে? ভুল করেননি তো?"

"আগে আমার কথাটা শুনে নিন, তারপর যা বলবার বলবেন"—বেশ একটু অভিভাবকী ভঙ্গিতে কথা কটি বলে ছেলেটি টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস দুটোর দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকবার পর যুগলের দিকে ফিরে শান্ত কণ্ঠে বললে—"দিলীপ হালদার—"

"দিলীপ হালদার মানে?"

"আমিই। আমার নাম শোনেননি?"

"না।"

"ও, শোনবার কথাও নয় আপনার। একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আছে আপনার সঙ্গে। বসব? বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

"বসুন বসুন।"

পুরন্দরবাবু বলে উঠলেন, কিন্তু তার আগেই ছোকরা একটা চেয়ার টেনে বসেছিল। পুরন্দরবাবুর বুকের ব্যথা যদিও বাড়ছিল ক্রমশ কিন্তু এই ছেলেটির আকস্মিক আগমন, সপ্রতিভ ব্যবহার বেশ লাগছিল তাঁর। তার তরুণ সুন্দর মুখশ্রীতে পারুলকে মনে পড়ছিল।

"আপনিও বসুন না" যুগলের দিকে চেয়ে ছেলেটি বললে এবং মাথা নেড়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে।

"না, আমি বেশ আছি।"

"ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। পুরন্দরবাবু, আপনি যদি থাকতে চান থাকুন।"

"আমি আবার যাব কোথায় নিজের বাসা থেকে—"

"আপনার যা খুশী। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি থাকলে বরং ভালই হয়। পারুলের কাছে আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে—"

"পারুলের কাছে? বাঃ। কখন শুনলেন এর মধ্যে?"

"আপনারা চলে আসবার ঠিক পরেই। আমি সেখান থেকেই সোজা আসছি। যুগলবাবুকে একটা কথা বলতে চাই—" যুগলের দিকে ফিরে তারপর বললে—"আমরা—মানে পারুল আর আমি ছেলেবেলা থেকে পরস্পরকে ভালবেসে আসছি এবং ঠিক করেছি যে আমরা বিয়ে করব। আপনি হঠাৎ আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে হাজির হয়েছেন, আমি বলতে এসেছি যে আপনি সরে পড়ুন। আমাদের এ অনুরোধ রক্ষা করতে কি আপত্তি আছে আপনার?"

"নিশ্চয়! বিশেষ আপত্তি আছে।"

"ও, বাবা, তাই না কি?"

ছেলেটি গম্ভীরভাবে চেয়ারে ঠেস দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিলে।

"আমি আপনাকে চিনি না, সুতরাং আপনার সঙ্গে এসব আলোচনার কোন মানে নেই।"

এই বলে যুগল বসে পড়াটাই সমীচীন মনে করলে।

"বলেছিলাম আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। এখনি তো আপনাকে বললাম যে আমার নাম দিলীপ হালদার—পারুল আর আমি দুজনেই দুজনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং আমি আপনাকে চিনি না বলে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? আমার সব বক্তব্যও শোনেননি আপনি এখনও। তাছাড়া আমার কথা না হয় ছেড়েই দিন—আপনি পারুলকে যে

এমন বেহায়ার মতো জ্বালাতন করছেন রোজ—এই কথাটাই তো বিশেষ করে আলোচনাযোগ্য।"

একটি একটি করে মুখ টিপে টিপে কথাগুলি এমনভাবে সে বললে যে মনে হল যেন নিতান্ত বাধ্য হয়েই অপ্রিয় কথাগুলো বলতে হচ্ছে তাকে।

"দেখ ছোকরা" আত্মবিস্মৃত যুগল চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু ছোকরা তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিলে তাকে।

"দেখুন, অন্য সময় হলে আপনার ওই "ছোকরা" কথায় আপত্তি করতুম আমি। এখন করব না, কারণ একথা আপনাকেও মানতে হবে যে কম বয়সটাই আমার একমাত্র মূলধন এক্ষেত্রে। আজ সকালে যখন পারুলকে ব্রেসলেট উপহার দিচ্ছিলেন তখন আপনিও ছোকরা হতে পারলে বেঁচে যেতেন।"

"মহা ফাজিল তো" পুরন্দরবাবু মনে মনে বললেন।

"যাই হোক" যুগল উত্তর দিলে, "আপনার সঙ্গে তর্ক করব না আমি। আমার মনে হচ্ছে আপনি যে সব কারণ দেখাচ্ছেন তা আপনার মনগড়া, ও সব নিয়ে কোন কথা আর আমি কইব না আপনার সঙ্গে, কইলে নিতান্ত ছেলেমানুষি হবে তা আমার পক্ষে। কাল আমি বিশ্বম্ভরবাবুর কাছে গিয়ে খোঁজ করব। আপনি এখন যেতে পারেন।"

"দেখছেন কি রকম লোক" বলে দিলীপ পুরন্দরবাবুর দিকে চাইলে। "আজ এত অপমানিত হয়েও লজ্জা হয়নি ওঁর। উনি আমাদের নামে নালিশ করতে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে যেতে চান আবার! এর থেকে কি প্রমাণ হয়? প্রথমত প্রমাণ হয় যে আপনি অত্যন্ত আত্মসম্মানহীন একগুঁয়ে লোক, দ্বিতীয়ত প্রমাণ হয় যে আপনি এই বর্বর সমাজের নিষ্ঠুর প্রথার সুযোগ নিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে জোর করে পারুলকে বিয়ে করতে চাইছেন তার মতের বিরুদ্ধে। পারুল আপনাকে ঘৃণা করে এইটুকু জানামাত্রই থেমে যাওয়া উচিত আপনার, সে তো আপনার ব্রেসলেট পর্যন্ত ফেরত দিয়েছে—এর পরেও যাবেন আপনি?"

"ব্রেসলেট আমাকে ফেরত দেয়নি সে। ওসব একদম বাজে কথা।"

"ফেরত দেয়নি! আপনি বলতে চান পুরন্দরবাবুর কাছ থেকে আপনি ব্রেসলেট ফেরত পাননি?"

"আঃ ডোবালে দেখছি" মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ করে পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—"হ্যাঁ, পারুল আমাকে এইটে ফেরত দিতে দিয়েছিল যুগলবাবু, আমি নিতে চাইনি, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়লে না.....এই নিন....এমন মুস্কিলে ফেলেছেন আমাকে আপনারা।"

ব্রেসলেটের বাক্সটা বার করে পুরন্দরবাবু টেবিলের উপর রাখলেন। যুগল বজ্রাহতবৎ নিস্পন্দ হয় বসে রইল।

"আপনি এটা এতক্ষণ দেননি যে" একটু রূঢ়কণ্ঠেই দিলীপ বলে উঠল।

"হয়ে ওঠেনি। মনেই ছিল না।"

"অদ্ভুত কাণ্ড!"

"কি বললেন?"

"একটু অদ্ভুত নয়? যাক গে....."

পুরন্দরবাবুর ইচ্ছে করত লাগল উঠে ছোঁড়ার কান মলে দেন, কিন্তু তিনি হেসে ফেললেন. ছোকরাও হাসতে লাগল। যুগল কিন্তু একটুও হাসল না, তার অবস্থা ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরন্দরবাবু যখন দিলীপের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন তখন যদি তিনি যুগলের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেন তাহলে বুঝতে পারতেন কি ভয়াবহ কাণ্ড হচ্ছে তার মনের ভিতর। কিন্তু তবুও পরন্দরবাবুর মনে হল, এই দুঃসময়ে যুগলের পক্ষ নেওয়া উচিত।

"দেখুন দিলীপাবু একটা কথা শুনুন আমার" বন্ধুভাবে আরম্ভ করলেন তিনি "এ বিষয়ে অন্য কোন আলোচনা না করেও একটা কথা বলতে চাই শুধু আমি। পারুলের পাণি-প্রার্থী হিসেবে যুগলবাবুর একাধিক যোগ্যতা আছে--প্রথমত ওঁরা যুগলবাবুকে আগে থাকতে চেনেন, ওঁর সম্মন্ধে সব জানেন, দ্বিতীয়ত উনি বড় চাকরি করেন একটা, তৃতীয়ত ওঁর বিষয়-সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে—সুতরাং আপনার মতো একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আকস্মিক আবির্ভাবে উনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন একটু। আপনিও হয়তো খুব উপযুক্ত পাত্র—কিন্তু আপনার বয়স এত কম যে উনি আপনার কথা বিশ্বাস করতে ইতস্তত করছেন....তাই এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে না চাওয়াটা স্বাভাবিক ওঁর পক্ষে।

"আপনার বয়স এত কম—মানে কি বলতে চান আপনি! আমি উনিশ বছরে পড়েছি....আইনত আমার বিয়ে করবার বয়স হয়েছে।"

"তা হয়েছে। কিন্তু কোন্ মেয়ের বাবা আপনার হাতে কন্যা-সম্প্রদান করবে বলুন? আপনি ভবিষ্যতে হয়তো কোটিপতি হবেন, কিম্বা মানবজাতির মুক্তির পথ আবিষ্কার করবেন কিন্তু এখন আপনাকে দেখে কোন মেয়ের বাপই পাত্র হিসেবে পছন্দ করবে কি না সন্দেহ। উনিশ বছর বয়সে লোকে নিজের দায়িত্বই নিতে পারে না, আর আপনি আর একজনের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন এবং সেও আপনার মতো ছেলেমানুষ। এইটেই কি উচিত? আমার যা মনে হচ্ছে খোলাখুলি বলছি বলে রাগ করবেন না, আপনি নিজেই আমাকে মধ্যস্থতা করতে ডাকলেন বলে বলছি।"

দিলীপ একটু বিস্ময়ে চেয়ে রইল পুরন্দরবাবুর দিকে। তারপর বলল, "আপনার মুখ থেকে এসব শুনব প্রত্যাশা করিনি। পারুল যা বললে আপনার সম্বন্ধে, তাতে আমার একটু অন্যরকম ধারণা হয়েছিল; এখন দেখছি আপনারা সবাই একরকম, সব শিয়ালেরই এক রা। আপনাদের ওসব জ্ঞানগর্ভ যুক্তি অনেকেই শুনেছি কিন্তু তা মানবার উপায় নেই, কারণ একটা প্রবলতর যুক্তি আমাদেরও আছে।"

"কি সেটা?"

"আমরা পরস্পরকে ভালবাসি এবং অনেকদিন থেকে বাসছি। সুতরাং আপনার ওসব যুক্তি শুনব না আমরা। আপনার বয়স কত হল—পঞ্চাশ?"

"সে জেনে আর কি হবে আপনার। যা বলবেন বলুন।"

"মাপ করবেন, কৌতূহল সামলাতে পারলাম না। যাক্ গে—হ্যাঁ—দেখুন আপনি যে এখনই বলছিলেন—আমি কোটিপতি বা মহামানব কিছুই হব না হয়তো—কিন্তু বিয়ে করে যে সংসার চালাতে পারব সে বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ নেই। এখন অবশ্য আমি নিঃস্ব, পারুলদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছি—বিশ্বম্ভরবাবুকে জ্যাঠামশাই বলি।"

"ও, তাই নাকি?"

"আমার বাবা আর বিশ্বম্ভরবাবু খুব বন্ধু ছিলেন। আমরা পশ্চিমে থাকতাম। একবার প্লেগে আমাদের বাড়ির সবাই মারা গেল—এক আমি ছাড়া। জ্যাঠামশাই আমাকে মানুষ করেছেন—বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়েছেন আমাকে। জ্যাঠামশাই লোক খুব ভাল, বুঝলেন—"

"জানি।"

"কিন্তু ওঁর মতামত বড় সেকেলে ধরনের। এখন অবশ্য আমি আর ওঁদের বাড়ি থাকি না, আলাদা মেসে থেকে রোজগারের চেষ্টা করছি।"

"কতদিন থেকে?"

"চার মাস।"

"চাকরি পেয়েছেন?"

"পেয়েছি একটা ছোটখাটো গোছের। পঁচাত্তর টাকা মাইনে, তার আগে আর একটা পেয়েছিলাম, মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা পেতাম, তখনই আমি বিয়ের কথা বলেছিলাম।"

"কাকে?"

"জ্যাঠামশাইকে।"

"তিনি প্রথমে হেসেই উঠলেন, তারপর চটে গেলেন। পারুলকে আমার সঙ্গে দেখাই করতে দিতেন না। আসল কি কারণ জানেন? উনি আমাকে ওকালতি পড়তে বলেছিলেন—কিন্তু উকীল হয়ে কি হবে বলুন তো! তার চেয়ে রোজগার করাই তো ভাল এখন থেকে। তাই ওঁর রাগ। আমি সেইজন্যে আর যাই না বড় সেখানে। পারুল কিন্তু ঠিক আছে এসব সত্ত্বেও। আমি জানি সে তার প্রতিজ্ঞা রাখবেই।"

"আপনি ওদের বাড়ি যান না বলছেন, তাহলে পারুলের সঙ্গে কথা হল কি করে?"

"কেন, ওদের বাগানের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে। সেই কটা মেয়েটিকে মনে আছে? সে আমাদের দিকে—কঙ্কনা দিদিও। ওকি! আপনি অমন করলেন যে? বাজের শব্দে ভয় করে নাকি আপনার—বাইরের আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছিল।

"না, আমার বুকের কাছটা ব্যথা করছে অনেকক্ষণ থেকে।"

সত্যিই পুরন্দরবাবু ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ছিলেন। একটু কুঁজো হয়ে তিনি দাঁড়ালেন।

"ও তাহলে আমি যাই। আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি থাকতে অসুবিধে হচ্ছে আপনার।"

"না, কিছু অসুবিধে নেই।"

"চললাম তবু। হ্যাঁ, দেখুন অখিলবাবু—ও, যুগলবাবু বুঝি আপনার নাম? দেখুন যুগলবাবু, কি ঠিক করলেন আপনি তাহলে?"

হাস্যদীপ্ত দৃষ্টিতে যুগলের দিকে চাইলে সে।

"পারুলকে রেহাই দিচ্ছেন তো? দিন, বুঝলেন। দিলেন তো?"

"না—" যুগল অধীরভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। প্রায় ক্ষেপে যাবার মতো অবস্থা হয়েছিল তার—"আপনি দয়া করে আমাকে রেহাই দিন!" তর্জনী আস্ফালন করে দিলীপ বললে—'ভুল করছেন আপনি কিন্তু তা বলে দিচ্ছি। পারুলকে আমি চিনি, সে মরে যাবে তবু আপনাকে বিয়ে করবে না। হিসেবে ভুল করবেন না। ন' মাস পরে ফিরে এসে দেখবেন

খাঁচা খালি, পাখি উড়ে গেছে। এরকম 'ডগ্ ইন দি ম্যানজার' পলিসির মানেটা কি বুঝতে পারছি না। মাপ করবেন, উপমার খাতিরে কথাটা বললাম। জিনিসটা ভেবে দেখুন না, চেষ্টা করুন অন্তত।"

"দেখুন, আপনার বক্তৃতা শোনবার ইচ্ছে নেই আমার। আপনি যা যা বলে গেলেন সব মনে থাকবে আমার। আপনি যে সব অভদ্র ইঙ্গিত করলেন তা নিয়ে এখন প্রতিবাদ করতে চাই না। কাল এর ব্যবস্থা করব।"

"অভদ্র ইঙ্গিত? তার মানে। আমার কথাগুলো যদি আপনার অভদ্র ইঙ্গিত বলে মনে হয় তাহলে আপনার মনই অভদ্র বুঝতে হবে। আচ্ছা বেশ, কালকের জন্যে প্রস্তুত থাকব আমি। কিন্তু যদি.....আঃ আবার বাজ পড়ল একটা......আচ্ছা চলি। নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী খুশী হলাম" পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে হেসে মাথা নেড়ে দিলীপ বেরিয়ে গেল। বাইরে ঝড় উঠল একটা।

।। তেরো।।

"দেখলেন? দেখলেন কাণ্ডটা? দিলীপ চলে যেতেই যুগল পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে গেল।"

"আপনার কপালটাই খারাপ" পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন—অর্থাৎ যা মনে এল বলে ফেললেন। বুকের ব্যথাটা এমন বেড়ে উঠছিল যে ভেবে-চিন্তে উত্তর দেবার ধৈর্য থাকছিল না তাঁর আর।

"আমার প্রতি সহানুভূতিবশতই আপনি ব্রেসলেটটা ফেরত দেননি নিশ্চয়!"

"সময় পেলাম কোথা....."

"আপনার কষ্ট নিশ্চয়ই হয়েছিল, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনি।"

"হ্যাঁ, কষ্ট হয়েছিল বই কি" বাধ্য হয়ে পুরন্দরবাবুকে বলতেই হল। তিনি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বর্ণনা করলেন—পারুলের আগ্রহাতিশয্যেই যে ব্রেসলেটটা নিয়ে এসেছেন তাও বললেন।

"পারুল অত জোর না করলে কিছুতেই নিতাম না আমি.....এমনিতেই তো নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেছি।"

"পারুল আপনাকে সম্মোহিত করে ফেলেছিল, সোজা কথা বলুন না।"

"কি যা তা বলছেন। এখনই তো দেখলেন যে পারুলের আপনার উপর বিরাগের কারণ আমি নই। ভিতরে অন্য লোক আছে।"

"আছে। কিন্তু আপনিও সম্মোহিত হয়েছিলেন।"

যুগল চেয়ারে বসে গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল।

"আপনি কি ভাবছেন ছোঁড়াটার ভয়ে ভড়কে যাব আমি? কালই চাটনি বানিয়ে ফেলব ব্যাটাকে, বুঝলেন? ধোঁয়া দিয়ে যেমন করে মশা তাড়ায়, ঝাঁটা দিয়ে ধুলো ঝাড়ে—তেমনি করে বিদেয় করব।"

এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে আবার ঢাললে। বেশ 'মাই ডিয়ার' হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

"পারুলবালা দিলীপকুমার, মানিকজোড় আমার, মরি মরি—হি—হি—হি" রাগে বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল তার। আর একটা বাজ পড়ল খুব জোরে—এক ঝলক বিদ্যুতের আলো জানালা দিয়ে ঢুকল। বৃষ্টিও শুরু হল মুষলধারে। যুগল উঠে জানালাটি বন্ধ করে দিলে।

"আপনাকে জিগ্যেস করছিল বাজ পড়লে আপনি ভয় পান কি না? হি—হি—হি। আপনার বয়সও পঞ্চাশ ঠাউরেছে—অ্যাঁ—খিঃ খিঃ—"

পৈশাচিক ভাব ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

"মনে হচ্ছে রাতটা এখানেই কাটাবেন আপনি" অতি কষ্টে পুরন্দরবাবু কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। ব্যথাটা বেশ বেড়ে উঠছিল—"আমি শুয়ে পড়ছি, আপনি যা খুশী করুন।"

"এই বৃষ্টিতে বেরুই কি করে বলুন!"

"বেশ তো থাকুন না, যত খুশী মদ গিলুন, গিলে শুয়ে পড়ুন।"

পুরন্দরবাবু সোফাটায় লম্বা হয়ে শুলেন এবং মৃদু আর্তনাদ করলেন।

"রাত্রে থাকতে বলছেন আমাকে? ভয় করবে না আপনার?"

"কিসের ভয়?" মাথা তুলে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"না কিছু নয়। সেবার ভয় পেয়েছিলেন না? তাই বলছি—"

"এত বাজে কথাও বল্‌তে পারেন।"

পুরন্দরবাবু রেগে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলেন।

যুগলের মুখে একটা অদ্ভুত নীরব হাসি ফুটে উঠল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। সমস্ত দিনের মানসিক ও দৈহিক উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যথার চোটে ঘুমুতে পারলেন না বেশীক্ষণ, ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আস্তে আস্তে উঠলেন তিনি বিছানা থেকে। ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে, সমস্ত ঘরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরতি, টেবিলের উপর খালি বোতলটা পড়ে রয়েছে, আর একটা সোফায় যুগল ঘুমুচ্ছে। চিৎ হয়ে ঘুমুচ্ছে, জামা জুতো কিছু খোলেনি। পুরন্দরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে খানিকক্ষণ। দুঃখ হল। জাগালেন না তাকে। আস্তে আস্তে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, ব্যথার চোটে শুতে পারছিলেন না। ভয় করছিল তাঁর এবং ভয় করবার কারণও ছিল। এ রকম ব্যথা মাঝে মাঝে বছরে দু'একবার হয় তাঁর, এর ধরন-ধারণ জানা আছে ভালো করে। লিভারের ব্যথা। প্রথমে কেমন যেন একটা আড়ষ্ট টাটান ভাব হয়, তারপর বুকের কোন একটা জায়গায় কাঁধের কাছ বরাবর টনটন করতে থাকে। তারপর বেড়ে চলে ক্রমশ! দশ ঘণ্টা বার ঘণ্টা চলে, শেষে মনে হয় প্রাণটা বেরিয়ে গেল বুঝি। বছর খানেক আগে শেষবার হয়েছিল। এমন দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে হাত পর্যন্ত নাড়তে পারছিলেন না—ডাক্তারে পাতলা চা ছাড়া আর কিছু খেতে দেয়নি। পরে একবার ক্রমাগত বমি হয়ে তবে কমল। শেক দিলেও কমে যায় অনেক সময়। যখন কমে তখন হঠাৎ কমে যায়।.....দেখতে

দেখতে ব্যথাটা বেড়ে উঠল খুব। দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। এত রাত্রে ডাক্তার ডাকা মুস্কিল—হুট্ করে ডাকতেও চান না—কতকগুলো বাজে ওষুধ গেলাবে এসে। ব্যথায় কাতরাতে লাগলেন.....কাতরানির শব্দে যুগলের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল সে এবং হতভম্ব হয়ে রইল খানিকক্ষণ। পুরন্দরবাবু ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন।

"আপনার ব্যথাটা বাড়ল না কি? শেক দিন, কমপ্রেস। চাকরটাকে ডাকব?"

"না থাক।"

কিন্তু যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল। এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যেন তার একমাত্র ছেলের প্রাণ-সংশয়। পুরন্দরবাবুর কথায় কর্ণপাত না করে সে চাকরটাকে উঠিয়ে স্টোভ জেলে গরম জল চড়িয়ে দিলে।

"দু'তিন কাপ গরম গরম চা খেয়ে ফেলুন।"

নিজেই চা করলে। চা খাইয়ে তারপর গরম গরম কমপ্রেস দিতে লাগল পুরন্দরবাবুর গেঞ্জি আর রুমালের সাহায্যে।

"খুব গরম গরম দিন, খুব গরম গরম।"

পুরন্দরবাবু যত আপত্তি করতে লাগলেন, যুগলের উৎসাহ তত বাড়তে লাগল।

"আর একটু চা খাবেন? জল আছে এখনও, খুব গরম খেতে হবে কিন্তু—"

আবার সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আধ ঘণ্টা পরে ব্যথাটা সত্যি কমল। যুগলের ইচ্ছে ছিল আরও কিছুক্ষণ কম্‌প্রেস দেওয়া, কিন্তু পুরন্দরবাবু আর কিছুতেই রাজি হলেন না।

"এবার ঘুমুতে দিন একটু।"

"বেশ বেশ। ঘুমোন—"

"আপনি যাবেন না, থাকুন। ক'টা বেজেছে?"

"পৌনে দুটো।"

"থাকুন আপনি, যাবেন না।"

মিনিটখানেক পরে পুরন্দরবাবু যুগলকে ডেকে মৃদুকণ্ঠে বললেন—'আপনি, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী মহৎ। আমি সব বুঝতে পারছি, সব.....অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।"

"ঘুমিয়ে পড়ুন, বাতি নিবিয়ে দিচ্ছি।"

পা টিপে টিপে যুগল নিজের বিছানার দিকে চলে গেল।

বাতি নিবিয়ে দেবার পর পুরন্দরবাবু যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা স্পষ্ট মনে ছিল তাঁর। কিন্তু যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন জেগে ওঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন যে তিনি ঘুমুতে পারছেন না, নিদারুণ ক্লান্তি সত্ত্বেও কিছুতেই ঘুম আসছে না তাঁর। শেষে তাঁর মনে হতে লাগল যেন জেগে কিসের একটা ঘোরে আছেন তিনি, তাঁর আশেপাশে কি সব ছায়ামূর্তি ঘুরছে, তাদের কিছুতেই তাড়াতে পারছে না—অথচ এটা যে স্বপ্ন—সত্যি কিছু নয়—এ জ্ঞানও তাঁর আছে। ছায়ামূর্তিগুলো সবই পরিচিত ঃ ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে দলে দলে, কপাটটা খোলা রয়েছে, আরও আসছে, সিঁড়িতে ভীড় জমে গেছে।

ঘরের মাঝখানে যে টেবিলটা আছে.....তার পাশে কিন্তু একটিমাত্র লোক বসে আছে.....ঠিক এক মাস আগে যেমন দেখেছিলেন তেমনি। ঠিক আগের স্বপ্নে যেমন দেখেছিলেন এবারও লোকটা টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে বসে আছে, চুপ করে বসে আছে, একটি কথা বলছে না। কিন্তু এবার লোকটা যেন বেঁটে.....অনেকটা যুগলের মতো। "সেবারও যুগলকেই দেখছিলাম না কি" পুরন্দরবাবু ভাবতে লাগলেন। লোকটার মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলেন—এ অন্য লোক। বেঁটে কেন এত? আশ্চর্য! চীৎকার, কোলাহল, কলরবে চতুর্দিক ভরে উঠল। গতবারের চেয়ে এবার লোকগুলো যেন আরও বেশী উত্তেজিত, সবাই মারমুখী আর সবাই তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁকে লক্ষ্য করে সবাই কি যেন বলছে—চীৎকার করেই বলছে—কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারছেন না তিনি ঠিক। "এ কিছু নয়, স্বপ্ন,"—দু'একবার ভাবলেন তিনি—"ঘুম আসছে না, তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখছি শুধু"—কিন্তু ওই চীৎকার, ওই লোকের ভীড়, ওদের তর্জন গর্জন এত বেশী রকম জীবন্ত যে মাঝে মাঝে সন্দেহও হচ্ছিল। সত্যি স্বপ্ন? উঃ কি চীৎকার! এরা চায় কি? কিন্তু.....স্বপ্নই, তা না হলে যুগলের ঘুম ভেঙে যেত ঠিক। ওই তো সোফায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে! তারপর হঠাৎ এক কাণ্ড হল.....আগের বারও ঠিক এমনি হয়েছিল। সবাই এক সঙ্গে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেল, কিন্তু দুয়ার দিয়ে বেরুতে পাচ্ছে না, আর একদল ঢোকবার চেষ্টা করছে। যারা ঢোকবার চেষ্টা করছে তারা যেন ভারী কি একটি বস্তু বয়ে আনছে—সিঁড়ির উপর তাদের পদশব্দ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে একটা গুরুভার বহন করে আনছে তারা, কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে—হাঁপিয়ে পড়েছে। ঘরের মধ্যে যারা ছিল তারা চীৎকার করে উঠল সমস্বরে—এনেছে, এনেছে। সকলের দৃষ্টি পুরন্দরের উপর পড়ল গিয়ে, সকলেই সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখাতে লাগল—এমন ভাবে যেন এইবার পুরন্দরকে কবলের মধ্যে পাওয়া গেছে। এটাকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে আর সাহস হল না পুরন্দরবাবুর। তিনি বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে গিয়ে বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে সকলের মাথার উপর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন কি আনছে ওরা। বুকের ভিতরটায় হাতুড়ি পিটছে কে যেন। তারপর হঠাৎ আগের বার যেমন হয়েছিল— ঠিক তেমনি ভাবে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল—ঠিক তিনবার। এত স্পষ্ট, এত বাস্তবিক যে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিন্তু সেবার যেমন দরজার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন এবার তা গেলেন না। কি ভেবে যে গেলেন না, বস্তুত কোন ভাবনা সে সময় তাঁর মনে এসেছিল কি না, তা বলা শক্ত—কিন্তু কি করা উচিত তা কে যেন তাঁর কানে কানে বলে দিলে। তিনি একটি আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন, এবং যুগল যেখানে শুয়েছিল সেই দিকে ছুটে গেলেন। হাত বাড়াতেই আর একটি হাতের সঙ্গে ধাক্কা লাগল এবং সে হাতটা তিনি মুঠো করে চেপে ধরলেন—ও, তাহলে একজন তাঁর বিছানার কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল এসে। ঘরে অন্ধকার বিশেষ নেই, ভোরের আলো ঘরে ঢুকেছে। হঠাৎ একটি তীব্র যন্ত্রণা তিনি অনুভব করলেন তাঁর বাঁ হাতের আঙুলগুলোতে—যেন একটি ধারালো ছুরি কিম্বা ক্ষুর তিনি মুঠো করে ধরেছেন.....সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে একটি গুরুভার পতনের শব্দ হল!

পুরন্দরবাবু যুগলের চেয়ে অন্তত তিন গুণ বেশী শক্তিশালী, তবু কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হল—পুরো তিনটি মিনিট। তারপর তিনি তাকে চিৎ করে কেবল তার হাত দুটো বেঁকিয়ে পিঠের দিকে নিয়ে গেলেন, তারপর তাঁর মনে হল হাত দুটো বাঁধা উচিত। কাটা বাঁ হাত দিয়ে তাকে চেপে রেখে, ডান হাত বাড়িয়ে তিনি পরদার দড়িটা ছিঁড়ে নিলেন। কি করে, এত কাণ্ড করতে পারলেন পরে তা ভেবে নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন। এই তিন মিনিট দুজনের মধ্যে কেউ একটি কথা বলেননি, জোরে জোরে নিশ্বাসের শব্দ আর ধস্তাধস্তির অস্ফুট শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ ছিল না। হাত দুটো পিছনে বেঁধে তাকে মেঝের উপর চিৎ করে ফেলে রেখে পুরন্দরবাবু উঠলেন এবং জানালাগুলো খুলে দিলেন। সকাল হয়ে গেছে। জানালার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর ড্রয়ারটি খুলে একটা ফরসা তোয়ালে বার করে হাতে জড়ালেন সেটা—রক্ত পড়ছিল। দেখতে পেলেন মেঝের উপর একটা খোলা ক্ষুর পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে মুড়ে খাপে বন্ধ করে ফেললেন। কাল সকালে কামাবার পর ক্ষুরটি তুলতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। যুগল যে সোফাটায় শুয়েছিল তারই পাশে ছোট টেবিলটার উপর পড়েছিল ক্ষুরটা। ক্ষুরটা ড্রয়ারে বন্ধ করে রেখে দিলেন। এই সমস্ত করে তারপর যুগলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি।

যুগল ইতিমধ্যে মেঝে থেকে কোনক্রমে উঠে একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে বসেছিল। তার গায়ে একটা কামিজ ছাড়া আর কিছু ছিল না। পায়ে জুতোও ছিল না। কামিজের হাতাটা রক্তে ভেজা। পুরন্দরবাবুর রক্ত। তার চেহারা অদ্ভুত রকম বদলে গিয়েছিল—সে লোকই নয় যেন। পিছনে হাত দুটো বাঁধা থাকাতে ভালোভাবে চেয়ারে বসতে পারেনি, বাঁকাভাবে বসেছিল। সমস্ত মুখটা যেন মুচড়ে গিয়েছিল, মুখের রংও কেমন যেন অস্বাভাবিক নীলচে গোছের, চিবুকটা মাঝে মাঝে কাঁপছিল থর থর করে। পুরন্দরবাবুর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে ছিল যে.....কিন্তু সে চাউনিতে যেন দৃষ্টি নেই, প্রাণহীন ভাষাহীন চাউনি। হঠাৎ সে বোকার মতো হাসলে একটু, তারপর জলের কুঁজোটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ইতস্তত করে বললে—"একটু জল খাব।" পুরন্দরবাবু একগ্লাস জল গড়িয়ে মুখের কাছে ধরতেই সে তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে কয়েক ঢোক জল খেলে, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইলে পুরন্দরবাবুর দিকে, তারপর আবার খেতে লাগল। জল খাওয়ার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইল। পুরন্দরবাবু নিজের বালিশ এবং চাদরটা নিয়ে পাশের ঘরে শুতে গেলেন, যুগলের ঘরটা তালা বন্ধ করে দিলেন।

কালকের ব্যথাটা আর ছিল না কিন্তু এই প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির পর অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছিলেন তিনি। সমস্ত ব্যাপারটা ভালোভাবে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। সমস্তই কেমন যেন অসংলগ্ন মনে হতে লাগল। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসছিল, চোখের সামনে অন্ধকারের মতো ঘনিয়ে আসছিল কি একটা—আবার চমকে উঠে পড়ছিলেন। মনে পড়ে যাচ্ছিল সব, তোয়ালে জড়ানো হাতের কাটা আঙুলগুলো জ্বালা করছিল.....আবার প্রাণপণে ভেবে দেখবার চেষ্টা করছিলেন ব্যাপারটা। একটা বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়

হয়েছিলেন.....এ কাজ করবার মিনিট দশেক আগে সে নিজেই জানত না বোধ হয় যে এ কাজ সে করবে। ক্ষুরটা হঠাৎ চোখে পড়ে গিয়েছিল।

"প্রথম থেকেই যদি ওর উদ্দেশ্য থাকত আমাকে খুন করা তাহলে নিজেই ও ছোরা বা ক্ষুর নিয়ে আসত। আমার ক্ষুরের উপর নির্ভর করত না—তাছাড়া আমার ক্ষুর তো বাইরে থাকে না কখনও—কালই ভুলে ফেলে রেখেছিলাম....." নানা চিন্তার মধ্যে এই কথাটা বারবার মনে হতে লাগল তাঁর।

ছ'টা বাজল। পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন, জামা কাপড় বদলালেন, তারপর যুগলের ঘরে গেলেন। তালা খুলতে খুলতে তাঁর মনে হল শুধু শুধু তালা বন্ধ করতে গেলাম কেন, দূর করে তাড়িয়ে দিলেই হত। ঘরে ঢুকে বিস্মিত হয়ে গেলেন। যুগল হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছে কি করে যেন। জামা জুতো পরে তৈরী হয়ে বসে আছে চেয়ারে। তিনি ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল। তার চোখের দৃষ্টি যেন বলতে লাগল—"এ নিয়ে আর কিছু বলবেন না, বলবার কিছু নেই—"

"বেরিয়ে যান".....পুরন্দরবাবু বললেন—"আপনার ব্রেসলেট নিয়ে যান।"

দ্বারের কাছ থেকে যুগল ফিরে এল, ব্রেসলেটের বাক্সটা টেবিল থেকে তুলে পকেটে পুরে বেরিয়ে গেল। পুরন্দরবাবুও সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করবেন বলে তার পিছু পিছু গেলেন। যুগল নামতে নামতে একবার ফিরে চাইলে, পুরন্দরবাবুর চোখের দিকে—চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, কি একটা বলবে বলে যেন ইতস্তত করতে লাগল।

"যান"—হাত নেড়ে পুরন্দরবাবু বললেন।

সে নেমে গেল। পুরন্দরবাবু খিল বন্ধ করে দিলেন।

।। চৌদ্দ ।।

পুরন্দরবাবু যেন নিশ্চিন্ত হলেন, একটা বোঝা যেন মন থেকে নেমে গেল। ভারী আরাম বোধ করলেন তিনি। অনির্দিষ্ট যে যন্ত্রণাটা এতদিন ভোগ করছিলেন সেটার যেন অবসান হয়ে গেল সহসা। তোয়ালে বাঁধা হাতটা তুলে দেখলেন—"হ্যাঁ মিটে গেল সব!" সেদিন পাপিয়ার কথাও মনে হল না একবার। যেন রক্তপাতের সঙ্গে সঙ্গে সে স্মৃতিও ধুয়ে গেছে মন থেকে।

মস্ত ফাঁড়া যে একটা কেটে গেল এ অবশ্য বুঝেছিলেন। এই লোকগুলা যারা খুন করবার এক মিনিট আগে পর্যন্ত জানে না যে তারা খুন করতে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা ছুরি পেলে কম্পিত হস্তে যখন তারা একটা ঘুমন্ত লোকের গলায় ছুরি বসাতে যায়—তখন রক্তের ফিনিক একবার হাতে লাগলেই—এই ভীরু লোকগুলোই অন্য রকম হয়ে যায় হঠাৎ—সমস্ত মাথটা ধড় থেকে নামিয়ে দিতে পারে তখন বিনা দ্বিধায়।

তিনি বাড়িতে থাকতে পারলেন না, বেরিয়ে গেলেন। রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল অবিলম্বে কিছু একটা করা দরকার তা না হলে কিছু একটা ঘটে যাবে

বুঝি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কারও সঙ্গে কথা কইবার ভয়ানক ইচ্ছে করছিল, এমন কি অপরিচিত লোকের সঙ্গেও। এই জন্যেই বোধ হয় ডাক্তারের কথা মনে পড়ল তাঁর—কাটা হাতটা ভালো করে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নেবার অজুহাতে ডাক্তারের বাড়ি গেলেন তিনি। ডাক্তারবাবু পূর্বপরিচিত লোক, যত্ন করে কাটাটা দেখলেন, কি করে কাটল জিগ্যেস করলেন। পুরন্দরবাবু হাসলেন একটু, আর একটু হলে সব খুলে বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আত্মসম্বরণ করলেন। ডাক্তারবাবু নাড়িটা পরীক্ষা করে একদাগ ওষুধও খেতে দিলেন, তারপর বললেন যে, কাটা তেমন সাংঘাতিক নয়, সেরে যাবে দু'চার দিনে। সেদিন আরও দুবার সমস্ত কথা খুলে বলবার প্রলোভন হল তাঁর—একবার তো সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোকের কাছে। আগে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপই করতে পারতেন না তিনি পথে ঘাটে।

একটা দোকানে গিয়ে বই কিনলেন, কোট করতে দিলেন একটা দর্জির কাছে। নীলিমা দেবীর কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল না, তিনি আশা করছিলেন তারাই এসে পড়বে। হোটেলে ঢুকে খেলেন ভালো করে। লিভারের ব্যথাটা আবার যে চাগতে পারে এ কথা মনে হল না। তাঁর যে কোন ব্যাধি আছে একথা আর তাঁর মনেই হচ্ছিল না। তিনি যখন ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে যুগল পালিতকে অমন অবস্থায় পেড়ে ফেলতে পেরেছেন তখন তাঁর আর কোন অসুখই নেই। সন্ধ্যাবেলায় অবসন্ন বোধ করতে লাগলেন। যখন বাসায় ফিরলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকতে কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। সমস্ত বাসাটারই কেমন যেন ভূতুড়ে-ভূতুড়ে ভাব, তবু চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এমন কি যে রান্নাঘরে কখনও ঢোকেন না, সেখানেও উঁকি দিয়ে দেখলেন একবার। কপাটে খিল দিয়ে আলোটা জ্বাললেন। খিল দেবার আগে চাকরটাকে ডেকে একবার জিগ্যেস করলেন—যুগলবাবু এসেছিলেন কি? যেন যুলবাবুর আসা সম্ভব এর পর!

ঘরে খিল দিয়ে ড্রয়ারটা খুললেন, ক্ষুরটা বার করে ভালো করে দেখলেন আবার। সাদা বাঁটটায় রক্ত লেগে আছে এখনও একটু। আবার বন্ধ করে রাখলেন সেটাকে। ঘুম পেতে লাগল, ভাবলেন আর দেরী না করে এখনই শুয়ে পড়ি, কাল শরীরের গ্লানি কাটবে না তা না হলে। কাল যে বিশেষ কিছু একটা ঘটবে এ কথা খালি মনে হচ্ছিল।

কিন্তু যে চিন্তাটা সমস্ত দিন তাঁকে একমুহূর্তের জন্য ছাড়েনি, সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে যে কথাটা তিনি ক্রমাগত ভেবেছেন, এখন সেই চিন্তাগুলোই তাঁর ক্লান্ত মস্তিষ্কে ভীড় করে আসতে লাগল আবার। ঘুম এল না।

"আমাকে খুন করবার কথাটা তার হঠাৎই না হয় মনে হয়েছিল কাল, মানলাম—কিন্তু এর আগে কখনও কি সে একথা ভাবেনি একবারও?" শেষে এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তিনি—"যুগল আমাকে মারতে চেয়েছিল, কিন্তু খুন করবার কথা তার মনে হয়নি"—সংক্ষেপে যুগল তাঁকে অজ্ঞাতসারে মারতে চেয়েছিল, সচেতন ভাবে নয়। যদিও এটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে—কিন্তু এইটেই সত্য। যুগল এখানে চাকরির জন্যে আসেনি—পূর্ণ গাঙ্গুলীর জন্যেও

আসেনি—যদিও চাকরির চেষ্টা করেছিল, পূর্ণ গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখাও করতে গিয়েছিল, পূর্ণ গাঙ্গুলী ফাঁকি দিয়ে সরে যাওয়াতে মর্মাহতও হয়েছিল খুব—কিন্তু তারপর তো আর পূর্ণ গাঙ্গুলীর কথা একদিনও বলেনি—না, আসলে এসেছিল ও আমার জন্যে, আর সেইজন্যেই পাপিয়াকে নিয়ে এসেছিল.....”

যুগল আমাকে খুন করতে পারে এ কথা কি ভেবেছিলাম আমি? তাঁর মনে পড়ল, ভেবেছিলেন। যুগলকে পূর্ণ গাঙ্গুলীর শবানুগমন করতে যে দিন দেখেছিলেন সেইদিনই তাঁর মনেও এ আশঙ্কা হয়েছিল বই কি। তিনি প্রতি মুহূর্তেই কিছু একটা প্রত্যাশা করেছিলেন.....কিন্তু ঠিক এ রকম নয়.....এটা তিনি প্রত্যাশা করেননি ঠিক.....না, খুন করবে এটা ভাবেননি।

“এ কি কখনও সত্যি হতে পারে? আমাকে কত ভালোবাসে, কত শ্রদ্ধা করে—কালই তো বলছিল বুক চাপড়ে চাপড়ে—থুতনিটা কাঁপছিল। সব মিছে কথা। মোটেই না। ও রকম লোক আছে। ওরা একাধারে নীচ এবং মহৎ—স্ত্রীর প্রণয়ীকে স্বচ্ছন্দে শ্রদ্ধা করতে পারে ওরা। স্ত্রীর সঙ্গে কুড়ি বছর বাস করল, তার এতটুকু স্খলন চোখে পড়ল না অথচ। আমার কথা, আমার ব্যবহার, আমার কবিতার লাইন—ন’বছর ধরে শ্রদ্ধাসহকারে মনে করে রেখেছে ও। অথচ আমি এর কিছুই জানতাম না। কিন্তু কাল তো বলছিল “আমি বোঝাপড়া করতে চাই”—এটা কি ভালোবাসার লক্ষণ? হতে পারে বই কি। আমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে বলেই অত্যন্ত ভালোবাসে হয় তো.....”

বর্ধমানে থাকতে হয় তো—হয় তো কেন নিশ্চয়ই—খুব বেশী রকম অভিভূত হয়ে পড়েছিল লোকটা আমাকে দেখে.....ওরা সহজেই অভিভূত হয়। আমাকে একটু ভালো লাগতেই শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল আমাকে মনে মনে। কি দেখে ভালো লেগেছিল জানতে ইচ্ছা হয়.....হয় তো আমার কামিজের ছিট বা সিগারেট-হোলডার দেখে! ওই সবে খুব মুগ্ধ হয় ওরা। কামিজের ছিটটুকু ওরা দেখতে পায়, বাকীটা সৃষ্টি করে নেয় কল্পনায় তারপর ভক্ত হয়ে পড়ে। আর.....। আমার লোককে মুগ্ধ করবার ক্ষমতাও হয় তো তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।.....এসে বললে, আপনাকে জড়িয়ে ধরে আমি কাঁদতে এসেছি.....অথচ এসেছিল খুন করতে.... । পাপিয়াকেও এনেছিল সঙ্গে করে।

হঠাৎ পুরন্দরবাবুর মনে হল—“কি জানি, হয় তো আমিও যদি কাঁদতাম ওর গলা জড়িয়ে, তাহলে হয় তো ও আমায় ক্ষমা করত। ক্ষমা করতেই তো এসেছিল। ক্ষমা করবার ভয়ানক একটা আগ্রহ ছিল তাঁর।.....প্রথম ধাক্কাতেই কিন্তু বদলে গেল লোকটা, সুরই বদলে ফেললে। মেয়েলি সুরে শুরু হয়ে গেল ভ্যানভ্যানানি আর প্যানপ্যানানি। সব বলবার জন্যে ইচ্ছে করে মাতাল হয়ে আসত, কিন্তু সবটা মাতলামিই হয়ে পড়ত আর কিছু হত না। মদ না খেলেও ও কিছু বলতেও পারত না। ভাঁড়ামি করা স্বভাব লোকটার.....আমাকে দিয়ে চুমু খাইয়ে কি ফুর্তি....তখনও ঠিক করতে পারেনি বোধ হয় যে খুন করবে, না ভাব করবে। দুইই করবার ইচ্ছে ছিল বোধ হয়। উদারহৃদয় পিশাচই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। প্রকৃতি তাদের মা নয়, সৎ মা—তাদের পীড়ন করে কেবল, স্নেহ করে না। পাগল করে তোলে শেষ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করবে—আমাকে নিয়ে গেছে বউ দেখাতে। কি বোকা! বউ! যুগল পালিতের বউ। ওর মতো গাড়োলই ভাবতে পারে যে ও আবার বিয়ে করে সুখী হবে। কচি মেয়েটার দফা নিকেশ করবার চেষ্টায় আছে.....তোমার দোষ নেই যুগল.....তোমার আশা আকাঙ্ক্ষাও তোমারই মতো অদ্ভুত। অদ্ভুত যে তা নিজেও বোধ হয় বুঝত, তাই শ্রদ্ধেয় পুরন্দরকে নিয়ে নিজের খেয়ালটাকে যাচিয়ে নেবার প্রয়োজন হয়েছিল। আমাকে দিয়ে বিয়েটা সমর্থন করিয়ে নেবার তাই বোধ হয় অত আগ্রহ।.....ভুলে ক্ষুরটা যদি বাইরে ফেলে না রাখতাম তাহলে বোধহয় কিছু হত না। তাই কি? আমার জন্যেই যদিও এসেছিল, তবু এড়িয়েই চলছিল আমাকে, পনের দিন তো দেখাই করেনি। পূর্ণ গাঙ্গুলীকে নিয়ে পড়েছিল প্রথমে।.....কাল আমাকে কম্প্রেস দেবার কি ধুম! কাকে ভোলাচ্ছিলে? আমাকে, না, নিজেকে?"

একই কথা নানাভাবে ক্রমাগত ভাবতে লাগলেন পুরন্দরবাবু, শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।. সকালে উঠে অনুভব করলেন মাথাটা বেশ ধরে আছে—শুধু তাই নয়, নতুন ধরনের একটা আতঙ্কও বসে আছে সারা মন জুড়ে।

নতুন ধরনের আতঙ্কটা বেশ অপ্রত্যাশিত—তাঁর মনে হতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে যুগল পালিতের কাছে যেতে হবে। কেন? কি দরকার? তা তিনি জানেন না, জানতে চানও না—এইটে শুধু অনুভব করছিলেন যে যেতে হবে। কারণ যাই হোক। এই পাগলামির—পাগলামি ছাড়া আর কি—একটা অজুহাতও জুটে গেল শেষ পর্যন্ত। তাঁর ভয় হচ্ছিল যুগল পালিত হয়তো গলায় দড়ি দেবে। কেন? তখনই মনে হল অনুরূপ অবস্থায় পড়লে আমিও হয়ত দিতাম।

শেষ পর্যন্ত যুগলের বাসার দিকেই অগ্রসর হলেন তিনি। ভাবলেন চাকরটার কাছে খোঁজ নিয়ে চলে আসব। কিছুদূর গিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনে হল তার কাছে নতজানু হয়ে গলদাশ্রুলোচনে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি না কি? এইটে করলেই তো চূড়ান্ত হয়ে যায়!

কিন্তু ভগবান রক্ষা করলেন তাঁকে—হঠাৎ দিলীপ হালদারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর। দিলীপ ঊর্ধ্বশ্বাসে আসছিল—ভয়ানক উত্তেজিত মনে হল।

"আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম। যুগলবাবু কি বললেন জানেন শেষ পর্যন্ত?"

"গলায় দড়ি দিয়েছে না কি?"

"কে গলায় দড়ি দিয়েছে? কেন?"

"না না কিছু নয়—কি বলছিলেন বলুন।"

"কি যে অদ্ভুত কথা সব বলেন আপনি! গলায় দড়ি দিতে যাবে কোন দুঃখে। চলে গেল। আমি তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসছি। উঃ! কি ভয়ানক মদ খায়। একটি বোতল পুরো খেয়ে ফেললে। ট্রেনে গান গাইছিল, আপনাকে নমস্কারও জানিয়েছে। আচ্ছা, লোকটা একটা স্কাউণ্ড্রেল নয়?"

পুরন্দরবাবু অট্টহাস্য করে উঠলেন।

"সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল শেষ পর্যন্ত! অ্যাঁ! চলে গেল!"

"হ্যাঁ। জ্যাঠামশায়ের কাছে গিয়ে খুব লাগান-ভাঙান করলে, কিন্তু কিছু হল না। পারুল কিছুতেই রাজি হল না। আপনার কথা খুব বলছিল কিন্তু। মানে বিরুদ্ধে—। যাই বলুক, আমাদের কিন্তু আপনার উপর শ্রদ্ধা এতটুকু কম না। আপনি যে ভদ্রলোক তা একনজরেই বোঝা যায়। আজকাল মুশকিল কি হয়েছে জানেন, শ্রদ্ধা করবার মতো লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত। বুড়ো হলেই শ্রদ্ধেয় হয় না, কি বলেন? ও আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছে.....এই নিন—ভুলেই যাচ্ছিলাম।"

পুরন্দরবাবু চিঠিটা নিয়ে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে।

"আপনার হাতে কি হল?"

"কেটে গেছে।"

"কি করে?"

"এমনি, ছুরিতে—তোমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে?"

"আমাদের? সে এখন সুদূরপরাহত। তবে এই ফাঁড়াটা খুব কেটে গেল। আচ্ছা চললাম তাহলে আমি। আমার অনেক কাজ.....চলি।"

মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে দিলীপ হালদার গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুরন্দরবাবু বাড়ি ফিরে এসে চিঠিটা খুললেন। খামের ভিতর যুগলের লেখা একটি ছত্রও ছিল না। চিঠির কাগজ এত পুরোনো যে হলদে হয়ে গেছে, কালির রংও বিবর্ণ। চিঠিখানা অপর্ণা তাকে লিখেছিল.....বহুদিন আগে! এ চিঠিতে অপর্ণা তাঁর কাছে বিদায় চাইছে। লিখেছে যে আর একজনকে সে ভালোবেসেছে। সে যে সন্তানসম্ভবা সে কথাও লিখেছে। "যদি বলেন আপনার সন্তানকে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে পারি.....হাজার হোক আপনারও একটা কর্তব্য আছে তো".....একথাও লিখেছে।

পুরন্দরবাবুর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল সহসা। চিঠিখানা পড়তে পড়তে তিনি কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন—যুগল যখন চিঠিখানা প্রথম পড়েছিল তখন কি রকম মুখভাব হয়েছিল তার।

।। পনেরো।।

ঠিক দুটি বছর অতীত হয়েছে।

পুরন্দর রায়চৌধুরী লক্ষ্ণৌ চলেছেন। সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে, শুধু নিমন্ত্রণ নয়, চমৎকার সম্ভাবনাও আছে একটা। একটি সুরসিকা সুন্দরীর সঙ্গে অনেক দিন থেকে আলাপ করার ইচ্ছে—এই বন্ধুটির সাহায্যে সে বাসনা চরিতার্থ হবার সম্ভাবনা আছে। এই দু'বছরে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে তাঁর। যে সব মানসিক পীড়ায় তিনি সর্বদা উদ্বিগ্ন

থাকতেন তা আর নেই। দু'বছর আগে কোলকাতায় মোকদ্দমার হাঙ্গামার মধ্যে যে সব অদ্ভুত 'স্মৃতি' পাগল করে তুলত তাঁকে—সে সব তিরোহিত হয়েছিল। নিজের সে সব দৌর্বল্যের কথা স্মরণ করে এখন মাঝে মাঝে লজ্জিত হন শুধু। এখন প্রতিজ্ঞা করেছেন ওজাতীয় দুর্বলতাকে আর প্রশ্রয় দেবেন না কখনও। তখন কারও সঙ্গে মিশতেন না, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতেন, নোংরাভাবে থাকতেন.....সকলেই আশ্চর্য হয়ে যেত তাঁর ব্যবহারে—এখন আর সে সব কিছু নেই। এখন সকলের সঙ্গে মেশেন, হাসেন, কথা কন, যেন কিছুই হয়নি। এই পরিবর্তনের মূল কারণ অবশ্য মোকদ্দমাটা জিতেছিলেন তিনি। তিন লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন সব সুদ্ধ। তিন লক্ষ টাকা অবশ্য খুব বেশী টাকা নয়, কিন্তু তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। প্রথমত—দাঁড়াতে পেরেছেন যে এতেই খুশী আছেন তিনি। প্রথম যৌবনে বোকার মতো অনেক টাকা উড়িয়েছেন এবার শিক্ষা হয়ে গেছে। যদি না ওড়ান তাহলে যা আছে তা তাঁর জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। হুজুকে মাতবার আর প্রবৃত্তি নেই.....নিজের ক্ষুদ্র স্বর্গেই সন্তুষ্ট আছেন তিনি। নিজের পছন্দ মতো খাবারটি, দু'একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু, এক আধটি বান্ধবী, খান কয়েক ভাল বই—এর বেশী কিছু কাম্য নেই তাঁর আর। এই জীবনেই ক্রমশ মশগুল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। আগেকার উদ্দাম পুরন্দরবাবুর আর ছিল না। চেহারারও পরিবর্তন হয়েছিল। বেশ শান্ত গম্ভীর প্রফুল্ল মুখ-শ্রী হয়েছিল এখন। বলি-রেখাগুলো পর্যন্ত ছিল না। রংও ফিরে গিয়েছিল।

প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় বসেছিলেন তিনি। পরের স্টেশন মোগলসরাই। আর একটা মনোরম কল্পনায় তা দিচ্ছিলেন তিনি বসে বসে। ভাবছিলেন "কাশীটা ঘুরে গেলে কেমন হয়। কাশী থেকে তারপর লক্ষ্ণৌ যাওয়া যাবে। কাশীতে মীনা বসে বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করছে, তার সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে গেলে মন্দ হয় না।" মীনা তাঁর একজন প্রাক্তন বান্ধবী। মোগলসরাইয়ে নেমে পড়বেন কি না ঠিক করতে পারছিলেন না। কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটল যে দ্বিধার আর অবসর রইল না।

মোগলসরাই স্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ি থামে। কিছু খেয়ে নেবার জন্যে পুরন্দরবাবু গাড়ি থেকে নামলেন। কেলনারের কাছে গিয়ে দেখেন একটা ভীড় জমে গেছে। এক সুসজ্জিতা যুবতীকে কেন্দ্র করে দুটি লোক খুব উত্তেজিত হয়েছেন.....একটি মাড়োয়ারি এবং একটি বাঙালী ছোকরা। যুবতীটির অলঙ্কার এবং পোশাক-পরিচ্ছদের জাঁকজমক দেখলে হাসি পায়.....কিন্তু তিনি সুন্দরী এবং যুবতী—সুতরাং না হেসে সবাই হাঁ করে চেয়েছিল তাঁর দিকে। মাড়োয়ারিটি নাকি পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় মেয়েটির গায়ে হাত দিয়েছে.....বাঙালী ছোকরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন তা। প্রতিবাদ করাতে মাড়োয়ারি অপমানসূচক কথা বলেছে কি একটা। বাঙালীটি যদিও বলিষ্ঠ যুবক, কিন্তু এত মদ্যপান করেছেন যে দাঁড়াতে পারছেন না ভালো করে। মাড়োয়ারি তাঁর এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তম্বি করছে। মেয়েটি সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে একধারে এবং মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে—"আপনি সরে আসুন বীরেনবাবু" বলছে; এমন সময় রঙ্গস্থলে পুরন্দর প্রবেশ করলেন এবং নিমিষের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে, যা করলেন তা বাস্তবিকই নাটকীয়। এক বিরাট চপেটাঘাতে মাড়োয়ারিটিকে নিরস্ত করে

ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললেন—"বসুন আপনারা কেলনারে গিয়ে। এর ব্যবস্থা আমি করছি। এখানকার দারোগার সঙ্গে আলাপ আছে আমার।"

পুরন্দরবাবুর চেহারা এবং পরুষ ব্যবহার দেখে মাড়োয়ারি হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে ব্যবসায়ী লোক, ভীড়ের মধ্যে স্ত্রী-অঙ্গের লালিত্যটুকু বিনা পয়সায় উপভোগ করতে গিয়ে বিপন্ন হয়েছে যদিও—কিন্তু ব্যবসায়বুদ্ধিই তাকে বাঁচালে শেষ পর্যন্ত। পুরন্দরবাবু-জাতীয় লোকদের সে চেনে, এদের কি করে বশ করতে হয় তাও জানা আছে। ঝুঁকে সেলাম করে বললে, "মাফি মাংতে হেঁ হুজুর। ভীড় মে হাত লাগ গিয়া থা।"

পুরন্দরবাবু তাকে ছেড়ে দিলেন। মহিলাটির দিকে চেয়ে হেসে বললেন—"চলুন আমরা চা খাই গে।"

বীরেনবাবু টলছিলেন। তিনি নমস্কার করে বললেন—"ধন্যবাদ মশাই। বেশ করেছেন, খুব করেছেন। ব্যাটা মেড়ো........"

"চলুন চা খাওয়া যাক" পুরন্দরবাবু আবার বললেন।

"উনি যে ট্রেন থেকে নেমে কোথা গেলেন" মহিলাটি এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন বিরক্তিভরে।

"উনি আসবেন এখুনি। জিনিস সামলাচ্ছেন"—বীরেনবাবু বললেন।

"আপনারা কেলনারে বসুন ততক্ষণ। আমি খুঁজে আনছি তাঁকে। কি নাম ভদ্রলোকের—"

"যুগল পালিত।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে যুগল পালিত ভীড় ঠেলে এসে হাজির হল। পুরন্দরবাবুকে দেখে চমকে উঠল সে—যেন ভূত দেখেছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার স্ত্রী তাকে যা বলছিল তা যেন সে শুনতেই পাচ্ছিল না, পুরন্দরবাবুকে দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। তার স্ত্রী বলছিল—"ওই ভদ্রলোক না থাকলে যে কি মুশকিলেই পড়তাম আমি—"

পুরন্দরবাবু হেসে উঠলেন।

"আরে! যুগলবাবু নাকি"—তারপর তার স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন—"আমরা দুজন পুরোনো বন্ধু.... । আপনাকে পুরন্দরের কথা বলেনি কখনও?"

"না, বলেনি তো—"

"বলা উচিত ছিল। দিন, ফর্মালি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিন। বিয়ের সময় একটা খবরও তো দিলেন না। আচ্ছা লোক আপনি মশাই—"

যুগল আমতা আমতা করে বললে—"ও হ্যাঁ—বিয়ের সময় নানা গোলমালে—হ্যাঁ... .ললু.....ইনি, ইনি আমার বন্ধু... . পুরানো বন্ধু পুরন্দরবাবু—"

বলতে বলতে থেমে গেল সে হঠাৎ—দুটো চোখ দিয়ে দু'ঝলক আগুন বেরুল যেন।

পুরন্দরবাবু হাত তুলে নমস্কার করলেন। ললুও প্রতি-নমস্কার করে বললেন, "ভাগ্যে আপনি ছিলেন, তা না হলে কি মুশকিলেই যে পড়তাম।"

পুরন্দরবাবু সকলকে নিয়ে কেলনারে ঢুকলেন। একটু পরেই পরিচয় হয়ে গেল ভালো

করে। পুরন্দরবাবুর পরিচয় শুনে ললু একমুখ হেসে বললেন—"আপনিও বেড়াতে বেরিয়েছেন? চলুন না আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার। আমরা একটা বাড়ি নিয়েছি সেখানে একমাসের জন্যে। চলুন না, যাবেন?"

"বেশ তো। দিন দশেক পরে যেতে পারি।"

যুগল পালিতের মুখখানা কালো হয়ে গেল।

বীরেনাবাবু হাত ঘড়ি দেখে বললেন—"আর বেশী দেরী নেই কিন্তু। এবার ওঠা যাক—"

পুরন্দরবাবু হরিদ্বারে যাবেন শুনে বীরেনও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল। চা খাওয়া কোন রকমে সেরে সে ললুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রেনে উঠল। যুগল পালিত বসে রইল। ওরা চলে যেতেই সে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে স্খলিতকণ্ঠে জিগ্যেস করলে—"সত্যিই আসছেন আপনি হরিদ্বারে?"

"আপনি একটুও বদলাননি দেখছি"—হেসে ফেললেন পুরন্দরবাবু।

"আপনি সত্যিই ভেবেছেন আমি যাব? পাগল না কি, আমার সময় কোথায় হা—হা—হা—"

যুগল পালিতের মুখও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"ও যাচ্ছেন না তাহলে—"

"না যাচ্ছি না, ভয় নেই আপনার।"

"যা খুশী বলবেন। বলবেন আমার পা ভেঙে গেছে—।"

"বিশ্বাস করবেন না সে কথা।"

"না করলেই বা। ও বাবা, গিন্নির ভয়ে যে একেবারে অস্থির দেখছি।" যুগল হাসবার চেষ্টা করলে একটু কিন্তু পারলে না। পুরন্দরবাবুর ব্যঙ্গটা কশাঘাত করলে যেন তাকে।....গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। পুরন্দরবাবু ঠিক করে ফেলেছিলেন এ গাড়িতে আর যাবেন না, এখানেই ব্রেক জার্নি করবেন। স্টেশন প্লাটফর্মে থাকতে তাঁর ভারী ভালো লাগে। জিনিসপত্র ওয়েটিংরুমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পুরন্দরবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—"এই বীরেনবাবুটি কে?"

"ও আমার দূরসম্পর্কের একজন ভাই হয়। ভালো ফুটবল খেলত। একটা চাকরিও করে দিয়েছিলাম, কিন্তু রাখতে পারলে না। মদেই মাটি করেছে ওকে..... ।"

পুরন্দরবাবুর মনে হল—"বাঃ, ঠিক জুটে গেছে, ষোলকলা পূর্ণ একেবারে।"

"যুগলদা, আসুন না।"

বীরেন গাড়ি থেকে ডাকতে লাগল।

যুগল পালিত উঠতে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পুরন্দববাবু তাকে বললেন—"এখন যদি আপনার স্ত্রীকে গিয়ে বলি যে আপনি রাত্রে আমাকে খুন করতে গিয়েছিলেন, কেমন হয় তা হলে?"

"অ্যাঁ, কি যে বলেন!" যুগলের মুখ পাংশু বর্ণ হয়ে গেল।

"যুগলদা, যুগলদা ও যুগলদা—"

বীরেনবাবুর জড়িত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

"আচ্ছা যান আপনি।"

"সত্যিই আপনি আসছেন না তো?"

"শপথ করব? ট্রেন ছাড়ছে যান।" এই বলে পুরন্দরবাবু সহৃদয় সাহেবী ভঙ্গীতে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন শেকহ্যাণ্ড করবার জন্যে। বাড়িয়েই কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হল, যুগল হাত বাড়ালে না। এমন কি সরিয়ে নিলে।

গাড়ি ছাড়বার তৃতীয় ঘণ্টা পড়ল।

মুহূর্তে দু'জনের মধ্যে কি একটা কাণ্ড ঘটে গেল যেন। কি একটা যেন ছিঁড়ে গেল, কেটে গেল। পুরন্দরবাবু হঠাৎ বজ্রমুষ্টিতে যুগলের ঘাড়টা ধরে কাটা হাতটা তার মুখের সামনে ধরে বললেন—"এই হাত আমি বাড়িয়ে দিতে পারলাম, আর আপনি সেটা নিতে পারলেন না?"

যুগলের ঠোঁট কাঁপতে লাগল, সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে—"আর পাপিয়া?"

হঠাৎ তার ঠোঁট, গাল, থুতনি সব থর থর করে কেঁপে উঠল, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। পুরন্দরবাবু তাকে ছেড়ে দিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"যুগলদা, কি করছ তুমি, ট্রেন যে ছাড়ে—"

গার্ডের হুইসল শোনা গেল।

যুগল পালিত হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল এবং চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠে পড়ল। পুরন্দরবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে।

কৃষ্ণপক্ষ
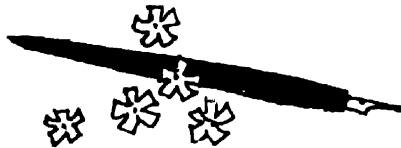
আমি কবি নই। কবিদের আমি ঘৃণা করি। কিন্তু আজ হঠাৎ আবিষ্কার করলাম—হ্যাঁ, এই নোংরা ঘরের বিশ্রী পরিবেশের মধ্যে বসে বুঝতে পারলাম, আমিও কবি। আমার অন্তরবাসী কবি এতদিন ঘুমিয়ে ছিল। তার অস্তিত্ব তো টের পাইনি এতদিন। এতদিন কবিদের ঘৃণাই করেছি কেবল, ঠাট্টাই করেছি তাদের, বলেছি ওরা মধুকরের মতো ফুলে ফুলে গুন গুন করে গান গেয়ে বেড়ায় খালি। ওরা স্বপ্নবিলাসী, ওরা অকর্মা। আজ আবিষ্কার করলাম আমিও সারা জীবন স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর তো কিছুই করিনি। আমার স্বপ্ন সফল হয়নি, তাই বোধহয় ক্ষোভের আবর্তে নাকানিচোবানি খেতে খেতে ভুলে গেছি যে আমিও স্বপ্ন-সম্বল অসহায় জীব ছাড়া কিছু নই। আমার মনের ভিতর যে সহস্র-স্বরা বীণা লুকিয়ে আছে, দৃশ্য অদৃশ্য নানা স্পর্শে যে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে তার সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না এতদিন। আজ হয়েছি। আজ বুঝেছি মনের ধর্ম সাড়া দেওয়া। যাদের প্রতিভা আছে তারা ওই সাড়াকে গানে রূপান্তরিত করতে পারে, তাদের আনন্দ-বিষাদ হাসি-কান্না ফুল হয়ে ফোটে, সূর্য হয়ে জ্বলে, ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে উদ্দাম হয়ে ওঠে, বিদ্যুতে চমকিত হয়, অন্ধকার ঘন-ঘটায় আশঙ্কার নিবিড়তায় রূপান্তরিত হতে পারে, বর্ষায় কাঁদে, শরতের রোদে ঝলমল করে ওঠে। এসব হয় যাদুকরী প্রতিভার মন্ত্র বলে। আমার প্রতিভা নেই, কিন্তু তবু আমাকে সাড়া দিতে হয়েছে। সে সাড়া কবির সাড়া নয়, কিন্তু তবু আমার মনের সহস্র-স্বরা বীণা বেজেছে অহরহ। এতদিন সেটা শুনতে পাইনি। আজ পেয়েছি।

একা আছি বলেই বোধহয় পেয়েছি।

একা না থাকলে নিজেকে চেনা যায় না। নিজের পারিপার্শ্বিককেও চেনা যায় না। চেনা যায় না তাকেও যে শুধু আভাসে দেখা দেয়।

টিউ—টিউ—

হলদে পাখি এসেছে কোথাও। দেখতে পাচ্ছি না তাকে। কিন্তু কল্পনা করছি তার অপরূপ চেহারাটি। সর্বাঙ্গে সুবর্ণ-শোভা, মাথাটি কালো, ডানার পাশেও কালোর রেখা। অনেকবার দেখেছি ওকে। কিন্তু আগে কখনও মনে হয়নি ও আমার কাছেই এসেছে। আমাকেই ডাকছে। কিন্তু ওর এ ডাকে সাড়া দেবার মতো ভাষা তো আমার নেই। আমার ভাষা যে অস্বাভাবিক ভাষা, সভ্যতার ভাষা। এ ভাষায় সাড়া দিলে তা ওর কাছে পৌঁছবে না। ও এ ভাষা বুঝতে পারবে না।

টিউ—

উড়ে গেল।

ও কাকে ডাকছে জানি। ডাকছে ওর সঙ্গিনীকে। খুঁজছে ও তাকে। খুঁজে পাবে এ-ও বুঝতে পারছি।

মা—মা—মাগো।

ভিখারী ভিক্ষা চাইছে কার বাড়িতে। অনেকক্ষণ চাইতে হবে, অনেকক্ষণ ধর্ণা দিতে হবে তবে যদি পায় কিছু। একালের সভ্য-জগৎ ভিখারীকে ঘৃণা করে। মনে করে একটা আপদ। সেকালের সভ্য-জগৎ ভিখারীকে সম্মান করত আমাদের দেশে। কারণ তখন নিয়ম ছিল জীবনের চতুর্থ-আশ্রমে সবাইকে ভিখারী হতে হবে। রাজাও ভিখারী হয়ে আসতে পারেন আমার দ্বারে। কোন্ মতটা ভালো তা জানি না। একটি জিনিস কিন্তু আবিষ্কার করেছি এতদিনে। আমিও সারাজীবন ভিক্ষেই করেছি। ও ছাড়া আর কিছু করিনি। করবার ক্ষমতা ছিল না। অনেকের দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছি আমিও। কিন্তু বুঝতে পারিনি যে ধর্ণা দিচ্ছি। এই বোধহয় নিয়ম। ছেলে মায়ের কাছে ধর্ণা দেয়, মা-ও দেয় ছেলের কাছে। প্রণয়ী ধর্ণা দেয় প্রণয়িনীর কাছে, প্রণয়িনীও পথ চেয়ে বসে থাকে প্রণয়ীর জন্য। পৃথিবীতে সব চাওয়া আর সব পাওয়ার মাঝখানে ওই ধর্ণার আকুল প্রার্থনা। প্রায়ই তাতে কান দেয় না কেউ। ভগবানের দয়াও কি বিনা ধর্ণায় পাওয়া যায়? হঠাৎ ছাতের থেকে খানিকটা চুনবালির চাপড়া খসে পড়েছিল আমার খাতার উপর। লেখাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাই। ভিখারীটা চলে গেছে। আমার মেজাজটাও। এখন আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। তবু কিন্তু লিখতে হবে। কারণ আর তো আমার কোন কাজ নেই।

উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি।

মনের গতি দেখে অবাক হয়ে গেছি। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই যেন তার আয়ত্তে। কল্পনা জগৎ আর বাস্তব জগৎ সর্বত্রই তার গতি অব্যাহত। বিদ্যুতেব চেয়ে চঞ্চল সে। এই এখানে আছে, নিমেষেই আর নেই।

মনে পড়ছে—কেন মনে পড়ছে জানি না—মনে পড়ছে কুপ্রিনের গল্পের সেই মেয়েটিকে। সেই বুড়ো জেনারেলের বউটাকে। লম্বা অস্থি-সর্বস্ব মহিলা, সাধারণের চোখে মোটেই কমনীয় নয়। কিন্তু প্রেমের চোখ আলাদা চোখ, একটি তরুণ সৈনিক প্রেমে পড়ে গেল মহিলার। নিমজ্জিত হয়ে গেল বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর স্বাধীন মানুষ রইল না সে। ক্রীতদাস হয়ে গেল। কুকুরের মতো তার পিছু পিছু ঘুরত। বুড়ো জেনারেল তাঁর স্ত্রীকে চিনতেন। তাঁর প্রেম-লীলায় বাধাও দিতেন না। ভাবতেন উপদেশ দিয়ে এ লীলা থামানো যাবে না, বুলেট দিয়ে থামানো যেতে পারে। কিন্তু ছুঁচো বা ছুঁচি মেরে হাত-গন্ধ করার প্রবৃত্তি ছিল না তাঁর। সুতরাং প্রেম-লীলা চলছিল। মহিলা কিন্তু প্রেমের ভুবনে ভূমাকাঙ্ক্ষিণী। অল্পে সন্তুষ্ট হন না। শতাধিক প্রেম করেছেন অতীত জীবনে। কচি মাছের ঝোল খেতে ভালোবাসেন। তাঁর ছেলেব বয়সী তরুণরাই তাঁর প্রেমিক। একজনকে কিছুদিন ভোগ করেন তারপর তাকে ছেড়ে দেন। ছিপ ফেলেন আর এক পুকুরে। সুতরাং এই ছোকরা ফালতু হয়ে গেল কিছুদিন পরে। তাকে একদিন বললেন—তুমি তো প্রায়ই বল, আমার জন্যে সব করতে পার। ওই যে ট্রেনটা আসছে, ওর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পার? ছেলেটা বলল—নিশ্চয় পারি। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল চলন্ত ইঞ্জিনের সামনে। কিন্তু মরল না। হাত দুটো কাটা পড়ল খালি। চাকরি গেল।

দেশ ছেড়ে চলে যেতে হল অন্যত্র। সেখানে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করত, তারপর—তারপর আর কি—মরে গেল অবশেষে। জেনারেল জাঁদরেল গিন্নী মত্ত হলেন নতুন একটি প্রেমিককে নিয়ে। এ গল্পটা হঠাৎ মনে পড়ল কেন?

মনে পড়ছে কি সুবিকে, যার পোশাকী নাম ছিল সুবাসিনী? ছবিটা কিন্তু উলটো, ভাবার্থ যদিও এক। এ ক্ষেত্রে আমিই সেই জেনারেলের নিত্য-নব-প্রেমোন্মত্তা গৃহিণীর ভূমিকায় অভিনয় করছি। সুবি আমার প্রথম শিকার। সে আমার জন্য কুল মান স্বামী সংসার সব ত্যাগ করে এসেছিল। এখন কোথায় সে? জানি না। মোগল বাদশারাই যে কেবল মেয়েদের উপভোগ করে বাসি মালার মতো ফেলে দিতেন তা নয়, আমাদের মতো সাধারণ লোকও এই বাদশাহী বিলাস উপভোগ করেছি! তফাত রাজা-বাদশাদের কথা ইতিহাসে লেখা থাকে, আমাদের মতো সাধারণ লোকের খবর দুদিনেই হারিয়ে যায়। অনুতাপ? না, অনুতাপ হচ্ছে না। কতো ভালো ভালো কাপে চা খেয়েছি, কত সুদৃশ্য পেগে চুমুক দিয়েছি, তারা তো কেউ নেই। কেউ নেই, কেউ নেই, কেউ নেই। কেউ থাকে না, এই নিয়ম। আমি বন্দী হয়ে আছি একটা ছোট্ট নোংরা ঘরে। আমার সান্ত্বনা সম্রাট শাজাহানও বন্দী হয়ে ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন আগ্রা ফোর্টে, নমাজ করতেন চমৎকার 'নাগিনা' মসজিদে। আর আমি আছি একটা নোংরা ঘরে। আমি পুজো করছি লিখে লিখে। লেখাটাই আমার পুজো। শাজাহানের সঙ্গে আমার আর একটা মিলও আছে। আমারও ছেলে বন্দী করেছে আমাকে। নাম তার সুজন, লোকে বলে সত্যই না কি সে সুজন। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরকম। যদিও মুখে তার সৌজন্যের ছাপ, ব্যবহারে কোনও ত্রুটি নেই, বাইরে থেকে আমার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে সে সদাই তৎপর। আমাব ধারণা কিন্তু ও ভণ্ডামি করছে। আমার একমাত্র ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও পরীক্ষায় কখনও সেকেণ্ড হয়নি, গভর্ণমেণ্টের স্কলারশিপ পেয়েও লণ্ডনে বা মার্কিন মুলুকে যেতে চায়নি। বলেছিল এ দেশে যা শেখবার আছে তাই শেখা শেষ হয়নি, এ দেশে যা দেখবার আছে তা-ও দেখিনি সব। আগে স্বদেশকে চিনি জানি, তারপর বিদেশ যাব। সবাই ধন্য ধন্য করেছিল। কিন্তু আমি জানি ওটা ওর ভণ্ডামি। ঔরঙ্গজেবের চেয়ে বেশী ভণ্ড আমার ছেলেটি। কিন্তু আমাকে একটা ছোট্ট ঘরে বন্দী করে রেখেছে। দেয়ালগুলো নোনা-ধরা। ছাত থেকে চুনবালির চাপড়া খসে পড়ছে। ছোট্ট একটা ময়লা বিছানা, তার পাশে ছোট্ট একটা টেবিল আর চেয়ার। দুটোই হতশ্রী। পাছে আমি চেঁচামেচি করি তাই কাগজ-কলম দিয়ে গেছে একগাদা। জানে আমি লেখা নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকব। আর দিয়ে গেছে একগাদা নভেল। জানে আমি নভেল পড়তে ভালোবাসি, চিরকাল নভেল পড়েছি নানারকম। প্রকাণ্ড একটা শেলফে রেখে গেছে নানারকম নভেল। কি চালাক! আমি লিখছি, নভেলও পড়ছি মাঝে মাঝে, কিন্তু একবারও ভুলিনি যে আমি বন্দী। ছোট্ট নোংরা একটা ঘরে বন্দী হয়ে আছি।

....গীটার আসে। বারবার আসে। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার অন্তত মনে হয় দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বিছানায় এসে বসে, কিন্তু আমার মনে হয় অনেক দূরে বসে আছে। গীটার আমার বৌমা। মনে হয় ও যেন আমার সেই মা যে আমায় ছেলেবেলায় মারত—তারপর যাকে গুণ্ডারা—না, না ওসব কথা লিখতেও লজ্জা করে। মনে হয় গীটার আমার সেই মা

চেহারা বদলে যেন এসেছে আমার কাছে আবার। কিন্তু আমি নাগাল পাচ্ছি না। সে মায়েরও পাইনি, এ মায়েরও পাচ্ছি না। 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'—আমার মনের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন। ভাবছি লিখলেন কি করে? প্রচুর টাকা রোজগার করেছি তা সত্যি, কিন্তু আসলে তো আমি একটা ওঁচা লোক, রবীন্দ্রনাথ আমার মনের কথা জানলেন কি করে? আমিও যে সারাজীবন নরক ঘাঁটতে ঘাঁটতে মনে মনে গান গেয়েছি এবং গানের ওপারে সেই অনির্বচনীয়া অধরাকে দেখেছি এ কথা রবীন্দ্রনাথের জানবার কথা তো নয়। রবীন্দ্রনাথও তো আমার গানের ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন—এপারে আছেন বরং শেলী, মোপাঁসা, দস্তরফস্কি, জোলা, ব্যালজ্যাক জাতীয় লেখকরা, এঁরা আমারই মত নানা আবর্তে হাবুডুবু খেয়েছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো ভিন্ন জাতের লোক, তাঁর মনের কথা আর আমার মনের কথা এক হয়ে গেল কি করে? তাহলে কি আমাদের দুজনের মধ্যে মিল আছে কোথাও? ছুঁচোর সঙ্গে সিংহের মিল? হয়তো আছে। দুজনেরই ক্ষিধে পায়, দুজনেরই তেষ্টা পায়। একটু আগে বলেছিলাম শাজাহানের সঙ্গেও আমার মিল আছে। যদি প্রশ্ন করেন শাজাহান তাজমহল বানিয়েছিল, আমি বানিয়েছি কি? বানিয়েছি বই কি। একটা নয় অনেক। শাজাহান হারেমে বন্দিনী অনেক প্রেয়সীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, কিন্তু অমর করে গেছেন মাত্র একটিকে, মমতাজকে। আমি কিন্তু কাউকে বাদ দিইনি। সবাইকে নিয়েই তাজমহল বানিয়েছি। কিন্তু সে তাজমহল মর্মর পাথরের নয়। কোনটা অশ্রুর, কোনটা আনন্দের, কোনটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের, কোনটা আকুলতার—বাইরে তাদের প্রকাশ নেই আমিও তাদের আর দেখতে পাই না। সব হারিয়ে গেছে। তাজমহলও হারিয়ে যায়। সর্বগ্রাসী বিস্মৃতি—এর সঙ্গে কিসের উপমা দেব? মহাসমুদ্র, মহাঅন্ধকার, না মহামরুভূমির? জানি না, শুধু জানি ও বিস্মৃতি সর্বগ্রাসী, সব গ্রাস করে ফেলেছে। আমার তাজমহলগুলো আমি দেখতে পাই না এখন। তাজমহল চুলোয় যাক—যা হারিয়ে গেছে তা নিয়ে মাথা ঘামান বৃথা। ভিখারির মতো হাত পেতে আছি বর্তমানের কাছে। ভিখারীটার মতো চেঁচাচ্ছি না, কিন্তু মনে মনে প্রত্যাশা করে আছি। ক্ষুদকুঁড়ো ঘষা পয়সা যাহোক কিছু একটা পাবই। কেউ না কেউ ছুঁড়ে দেবে।

অ—স—ঝা—ড়ু—

ফুলঝাড়ু ফেরি করেছে। ফুলঝাড়ু কথাটাকে অমনভাবে উচ্চারণ করেছে কেন? কায়দা? না জিভের দোষ? না জিভের দোষ নয়, কায়দাই। সেদিন আর একটা ফেরিওলার চিৎকারও শুনছিলাম। ক্রি—টি—না। প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে বুঝলাম। খালি টিন কিনছে। যারা কাগজ কেনে তারাও কা—গীজ বলে চেঁচায়। লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করবার কায়দা। কায়দা নিয়েই সভ্যতা। কায়দা বদলেই প্রাচীন সভ্যতা নবীন হচ্ছে। ফেরিওয়ালাগুলো কিন্তু সেকেলে। একই কায়দায় একই জিনিস রোজ ফেরি করে। রোজ যদি নূতন ধরনের হাঁক দিত, কোনদিন গাধার ডাক, কোনদিন কোকিলের ডাক, কোনদিন হালুম হালুম—তাহলে মন্দ হত না। কিন্তু এদের প্রতিভা নেই একঘেয়ে ডাক রোজ ডেকে যাচ্ছে! আঃ রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। কি ক্যাঁককেঁকে গলা মেয়েটার। রেডিওটা আমার টেবিলের উপর রেখে গেছে

গীটার। রেডিও মানেই তো দুনিয়ার হাল্লাকে নিজের কানের কাছে ডেকে আনা। গান? গান ভালো। কিন্তু ক্রমাগত গান ভালো নয়। রসগোল্লা ভালো, কিন্তু ক্রমাগত যদি একের পর এক রসগোল্লা মুখের ভিতর ঠুসে দেয় তাহলে রসগোল্লা বিরস-গোল্লা এবং শেষে বিরক্তিগোল্লা হয়ে ওঠে।

গীটার এই সব কাণ্ড করে। কখন আসে, কখন যায়, বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে দেখতে পাই দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার গানের ওপারে। কিন্তু সেই গানের দুস্তর সুর-সমুদ্র পার হয়ে কি করে কখন যে সে খুব কাছে চলে আসে, বুঝতে পারি না।

মাঝে মাঝে পারি। হঠাৎ দেখি সে আমার গলায় তোয়ালে জড়িয়ে দিয়ে দুধের বাটি মুখে ধরেছে। যে-ই কিছু বলতে যাই অমনি চলে যায়। অন্তর্ধান করে। দেখি দূরে—অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে! দাঁড়িয়ে হাসছে। মায়ের মতো হাসছে বললে বোধহয় ভালো শোনাতো, কিন্তু মায়ের হাসি কখনো দেখিনি, জানি না মায়ের হাসি কি রকম হয়। গীটারের হাসি কিন্তু অপূর্ব, অনন্য, অবর্ণনীয়। তা জ্যোৎস্না-ধারা নয়, ঝরনা নয় তা অপরূপ সুমধুর একটা সান্ত্বনার আশ্বাস। গীটারের সঙ্গে সুজনের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়ে গীটার নামটা শুনে একটু অবাক হয়েছিলাম। গীটারের বাপ সাহিত্যিক মানুষ। তাঁকে যখন বললাম—মেয়ের নূতন ধরনের নাম রেখেছেন দেখছি। তিনি বললেন—এই ভারতবর্ষে নূতন ধরনের কিছু করার জো আছে কি? বাজনার নামে অনেক মেয়ের নাম রাখা হয়েছে আগে। বেণু, বীণা, বাঁশরী, মন্দিরা তো আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমি সেতারও শুনেছি। আমি তাই রেখে দিলাম গীটার। একবার ইচ্ছে হয়েছিল—রাখি মৃদঙ্গ। কিন্তু ওর 'দঙ্গটা' দাঙ্গা দাঙ্গা শোনাতে লাগল তাই আর রাখলাম না। গীটারের বাবা গরীব সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্য থেকে কিছু রোজগার করতে পারতেন না। কেরানীগিরি করতেন। গীটারের সঙ্গে আমার একমাত্র ছেলে সুজনের বিয়ে সে-ও এক অদ্ভুত গল্প। না, প্রেমে পড়ে নয়। ছুং ছুং করে যে সব হ্যাংলা আত্মসম্মানহীন ছেলে মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায় সুজন সে জাতীয় ছেলে নয়। হলে হতে পারত। কারণ আমি নিজেই তো আত্মসম্মানহীন কাঙাল ছিলাম আমার যৌবনে।

আমড়া গাছে আমড়া ফললে আশ্চর্য হতুম না। কিন্তু বংশধারার বিচিত্র ইতিহাস। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে না কি আমও ছিলেন, আমড়াও ছিলেন। আমি আমড়ার উত্তরাধিকার বহন করছি, সুজন করছে আমের। 'জিনি'সের (genes) অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা সব। আমিও লেখাপড়া শিখেছি, সুজনও শিখেছে। আমাকে কষ্ট করে শিখতে হয়েছে, সুজন শিখেছে আমার টাকায়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাইনি, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার সুযোগই পাইনি আমি। সুজন পেয়েছে আমার টাকায়। আমার বাবা দরিদ্র ছিলেন। তিনি আমার জন্মের আগেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর নাগাল আমি পাইনি। আমি নাগাল পেয়েছিলাম—নামটা করব কি—অতবড় মহাপুরুষের নামের সঙ্গে নিজের এই ঘৃণিত নামটা সংযুক্ত করা উচিত হবে কি? না, নামটা করব না। তাছাড়া তাঁর কি একটা নাম? শত নাম, সহস্র নাম। কোন্ নামটা করব। আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর বিরাট পাঠগার-সমুদ্রে বহুকাল অবগাহন করবার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। চাকর

হয়ে ঢুকেছিলাম, কিন্তু মনিব হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলাম। আমাকে মনিবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। বিপত্নীক হয়ে পড়েছিলেন তখন, ছেলে-মেয়ে ছিল না। অত্যন্ত পাজী বুড়ী ঝি ছিল তাঁর একটা। সেই সংসার চালাবার ছুতোয় চুরি করত খুব। সরকারের দরবারে খুব বড় চাকরি করতেন উনি এককালে। পেনসন পেতেন পাঁচশ টাকা। আমি ক্রমশ তাঁর পুত্রের স্থান অধিকার করলাম। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন আরবি ফার্সি শিখছিলেন একজন মুসলমান মৌলভীর কাছে। পরে জেনেছিলাম উনি ফরাসী আর স্প্যানিশ ভাষাও জানেন। ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত ভাষাতেও অগাধ পাণ্ডিত্য। খাদ্যরসিকও ছিলেন। তাঁর এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল বুড়ী ঝিটা। সেই বাজার করত, সেই রান্না করত। তিনি হিসেব নিতেন না কখনও। টাকা চাইলেই দিতেন। আমি ভিখারি হিসাবেই গিয়েছিলাম প্রথমে। তিনি আমাকে দশটা টাকা দিয়ে বললেন—টাকা চাইছ অভাবে পড়ে—নিয়ে যাও। কি কর তুমি, কোথায় থাক। আমার পূর্ণ পরিচয় পেয়ে বললেন আমার একজন লোক দরকার, তুমিই থাক না আমার কাছে। খানিকক্ষণ পড়া-শোনা করবে, খানিকক্ষণ কাজও করবে। তোমার খাওয়া পরার ভার নিলাম আমি। ভিক্ষা কোরো না এখন। তুমি তো ছেলেমানুষ, ভিক্ষে করবার দরকার হয় বার্ধক্যে। থেকে গেলাম তাঁর কাছে। অনেক দিন ছিলাম। যদি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারতাম—না পারিনি—আপেলের কাছে আমড়া কতক্ষণ থাকতে পারে। পাবেনি। কিন্তু কেন—না, মানে সে কথা—। আবার থপ করে খানিকটা চুন সুরকি পড়ল লেখার উপর। ছাতের প্ল্যাস্টার খুলে খুলে পড়ছে।

চারিদিকে নোনা-ধরা দেওয়ালগুলো শুধু দাঁড়িয়ে নেই, ক্রমশ এগিয়ে আসছে, ক্রমশ ঘিরে ফেলছে আমাকে। আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু সুজন বলছে, গীটারও বলছে, ওসব না কি আমার কল্পনা। আমি না কি আমার সেই আগেকার ঘরেই আছি, মার্বলের মেজে, বড় বড় জানালা সব না কি আগেকার মতোই আছে, আমি না কি আমার আগেকার সেই গদি-আঁটা চেয়ারটাতেই বসে আছি। হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে। আমি যা দেখছি তাকে অস্বীকার করব? যা লিখছি এ তো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। কল্পনা? কোনটা কল্পনা কোনটা সত্য? আমি আমার চোখকে অবিশ্বাস করব? তোমরা আমাকে বন্দী করেছ কর—কিন্তু ভণ্ডামির ভাঁওতায় ভোলাতে পারবে না। ঔরঙ্গজেবও বন্দী শাজাহানের সঙ্গে অনেক ভণ্ডামি করেছিল। কিন্তু কি ভয়ানক পাষণ্ড ছিল সে। কোথায় যেন পড়েছি শাজাহান যখন মারা গেলেন তখন লোহার শিক পুড়িয়ে সে মৃত শাজাহানের পায়ে বিঁধিয়ে দিয়ে দেখেছিল যে বুড়োটা ঠিক মরেছে না মড়া সেজে শুয়ে আছে। এসব শাস্তি শাজাহানের অবশ্য প্রাপ্য ছিল, সে-ও সিংহাসন পাবার জন্যে না করেছিল কি? খুন করেছিল খুসরৌকে, অন্ধ করেছিল শাহরিয়রকে—বিদ্রোহ করেছিল বাবার বিরুদ্ধে—লোভী—লোভী—লোভী, সবাই কামুক, সবাই পিশাচ। আমিও। যদিও আমি ও রকম বাদশাহী পাপ করিনি, কারণ আমার সে সুযোগ ছিল না, কিন্তু পাপ করেছি বই কি। একটা সাম্রাজ্য চুরি করলে যে পাপ, একটা ঘষা পয়সা চুরি করলেও তাই। আমি পয়সা চোর—আমি চরিত্র-চোরও—আমি—না, খুব বেশী দোষ ছিল না আমার—

আমার অভাব ছিল চরিত্রের। আমার সে চরিত্র কেউ গঠন করে দেয়নি, আমাকে সংযম শিক্ষা দেয়নি কেউ। আমি ভেবেছিলাম উদ্ধত হওয়াই বুঝি পৌরুষ, অপরকে ঠকিয়ে নেওয়াটাই বুঝি বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা—আমি যে পরিবেশে মানুষ সে পরিবেশে অমানুষ হওয়াটাই ছিল বাহাদুরি—আমি না, না, কিন্তু কি বলতে চাইছি পারছি না—আমি আশা করিনি যে গীটার ওদের দলে থাকবে। আমার ছেলে সুজন, ভালো ছেলে—Man of principles— মানে বাঘ একটি। আর এক জাতের ঔরঙ্গজেব—কিন্তু গীটার—

টিউ—টিউ—টিউ—

আবার সেই হলদে পাখিটা এসেছে। খোলা জানলা দিয়ে তার স্বরটা শুনতে পাচ্ছি—ভাগ্যে এই খোলা জানলাটা আছে—কিন্তু হলদে পাখী খোলা জানলার সামনে এসে দাঁড়াবে না। ও তো আমার চাকর নয়। কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করছে ওকে—খুব ইচ্ছে করছে। যখন আমি স্বাধীন ছিলাম তখন ওকে দেখবার জন্যে এত আকুলতা হত কি? চঞ্চলা গ্রামে আমার সেই বাগানবাড়িটায় ছিল প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছ। বকুলগাছকে ভালো করে দেখেছেন কখনও? অদ্ভুত, অবর্ণনীয় একটা শ্রী আছে বকুলগাছের। শিরিষ বা অশ্বত্থগাছের মতো অত ঝাঁপড়ালো নয়, পাতা দিয়ে আকাশকে আড়াল করে না, অথচ বাবলা গাছের মতো ছোট ছোট পাতা ফাঁক ফাঁক ডাল নয়, অদ্ভুত একটা আভিজাত্য আছে বকুলগাছের। আমার বাগানবাড়ির সেই বকুলগাছটায় হলদে পাখির আনাগোনা ছিল খুব। আমার কিন্তু হলদে পাখি দেখবার কৌতূহল ছিল না। চোখও ছিল না। আমার চোখের দৃষ্টি হরণ করেছিল ঝুমকো নামে মেয়েটা। তেরো চোদ্দ বছরের মেয়েটা। কিন্তু কি অপরূপ লাবণ্য যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল তাকে ঘিরে। টিউ টিউ ডাক শুনতে পেতাম। তবু কৌতূহল জাগেনি। ঝুমকোই দেখিয়ে দিয়েছিল আমাকে হলদে পাখিটা। সেই বলেছিল—ওর আর একটা নাম 'বেনে বউ'। কিন্তু তা সত্ত্বেও হলদে পাখি নিয়ে মাথা ঘামাই নি, ঝুমকোকে নিয়েই মত্ত ছিল আমার মন। এখন ঝুমকো কোথায়? এমন হলদে পাখিটাই বড় হয়ে উঠেছে, সেদিন যাকে দেখেও দেখেনি তাকেই দেখতে পাওয়ার জন্য সারা মন এখন উৎসুক। সে তখন সুলভ ছিল, এখন দুর্লভ। দেখতে পাব কি এখন?

টিউ—

উড়ে গেল।

"এ কি—এ কি—এ কি। পিল? পিল পিল করে কত পিল আর গেলাবে। আমার হয়নি তো কিচ্ছু। আমাকে রুগী সাজিয়ে রেখেছ জোর করে। একি অত্যাচার—"

গীটার হাতে পিল আর জলের গেলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে নতমুখে। অধরে মৃদু হাসি, চোখে মমতা।

প্রতিবাদ করে না, দাঁড়িয়ে থাকে খালি চুপ করে। ইচ্ছে করে—! —হ্যাঁ ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ওকে দূর করে না দিলে ওর হাত থেকে নিস্তার নেই।

লিয়াকৎ—লিয়াকৎ—লিয়াকৎ—।

এ কি সত্যিই পাগল হয়ে গেলাম না কি। লিয়াকৎ তো নেই। আমার দুর্ধর্ষ দেহরক্ষী

লিয়াকতের ফাঁসি হয়ে গেছে যে। আমাকে বাঁচাতে গিয়েই সে গুলি করে দেবচরিত্র মুকুলবাবুকে। গুলি করতে গিয়েই ধরা পড়ে। ফাঁসি হয়ে গেল। অনেক টাকা খরচ করেও বাঁচাতে পারলাম না তাকে। অমন একটা প্রভুভক্ত লোককে ফাঁসিতে লটকে দিলে।

বাবা এটা খেয়ে নিন—

"কি ওটা। এটার তো আবার নতুন রকম রং দেখছি—"

উনি এটা আমেরিকা থেকে আনিয়েছেন!

"কেন আনিয়েছেন? এরকম টাকা নষ্ট করবার মানে হয় কোনও? আমার অসুখ হয়েছে এই মিথ্যেটা জাহির করবার জন্য একটা বড় ডিগ্রীধারী ডাক্তার খাড়া করেছ, মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার। তিনি নাকি বলেছেন আমাকে আটকে রাখতে, তিনি নাকি বলেছেন দুধ খেতে—I hate দুধ—তিনি নাকি বলেছেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানা রকম পিল খেতে—আমাকে যদি বন্দী করে রাখাই তোমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেইটাই সোজা ভাষায় স্পষ্ট করে বল না কেন। আমার যদি ইচ্ছে হয়, তা হলে তোমাদের হুকুম তামিল করব—এই নোংরা ঘরেই কাটিযে দেব কিছুদিন। যদি ইচ্ছে হয়। কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না তোমরা শেষ পর্যন্ত তা বলে দিচ্ছি—আমি গায়ের জোরে বেরিয়ে যাব একদিন। লিয়াকৎ—লিয়াকৎ—। ও, লিয়াকৎ মরে গেছে ভুলে যাই বারবার। আর মরে গেছে মুকুলবাবু। পুলিস-অফিসার ছিল, কিন্তু নমস্য। এক লাখ টাকা ঘুষ প্রত্যাখ্যান করেছিল। মেরে ফেলতে হল শেষকালে। লিয়াকৎ কুকুরের মতো মেরে ফেলল তাকে—মেরে ফেলে ধরা পড়ল। কুকুরের মতো? দেবতাকে কুকুর বললেই কি সে কুকুর হয়ে যায়? হয় না। মুকুলবাবু মরেওনি। সে বার বার আসে আমার কাছে, আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি তাকে। কি আবোল-তাবোল লিখে যাচ্ছি। আসল কথাটাই লিখিনি এখনও। হঠাৎ চেয়ে দেখলাম গীটার আমার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে শঙ্কা, অনুকম্পা মমতা বেদনা—আর চোখে জল।

"দাও—দাও—দাও—খেয়েনি তোমার পিল। কটা আছে?"

গীটার চলে গেল।

অনেক দূরে চলে গেল।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে সত্যি ও এসেছিল কি? সত্যি আমি পিল খেয়েছি? বৈদান্তিক প্রশ্ন। কি সত্য কি মিথ্যা এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও, এখনও ঘামাতে চাই না, কিন্তু, কি আশ্চর্য, ঘামাচ্ছি। প্রত্যক্ষের সঙ্গে পরোক্ষ মিলে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে দিনের সঙ্গে রাত, পূর্ণিমার সঙ্গে অমাবস্যা। আলো-ছায়ার খেলা অনেক দেখেছি, কিন্তু স্মৃতি-বিস্মৃতির যুগবৎ আবির্ভাব নূতন অভিজ্ঞতা হল। কিন্তু সে হিসাবে প্রতি অভিজ্ঞতাই তো নূতন অভিজ্ঞতা। আজকের আলো আজকেরই আলো গতকালের নয়, আগামী কালেরও নয়। আজকের আলোকে আমরা অন্য দিনের আলোর মতো মনে করি, তার একমাত্র কারণ আমাদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম নয়, স্থূল, অতিশয় স্থূল। গীটারও রোজ বদলায়, ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে, সব সময় পরিবর্তনটা ধরতে পারি না, তার কারণ, যদিও একটু আগে বলেছি আমার মনের বীণা সহস্র-স্বরা কিন্তু দেখছি সর্ব-স্পর্শ-কাতরা নয় সে। সব সুরে সাড়া দেয় না। আমার সেই পাহাড়ী

ঘোড়া ঝটকার মতো। কিছুতেই দুলকি চালে চলতে চাইত না ঝটকা। হয় দাঁড়িয়ে থাকত নয় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটত। না, আমি গীটারের রূপ থেকে রূপান্তর লক্ষ্য করতে পারিনি। কিন্তু আভাসে অনুভব করছি ও বদলায়। বাই জোভ, আর একটা কথা মনে হচ্ছে—ও হয়তো গীটার নয়, গীয়ার, বারবার বদলায়, না বদলালে সংসার-মোটর চলে না। কি লিখছি—যা তা। প্রশ্ন হচ্ছে, আমি পিলগুলো খেয়েছি কি? তা জেনেই বা কি হবে!

আরে, আরে, ইনি কে। ফড়িং না বোলতা? বোলতার মতোই দেখতে, কিন্তু না, বোলতা নয়, বোলতা শুধু হলদে হয়, এর খানিকটা কালো খানিকটা হলদে। দীপ্ত সপ্রতিভ চেহারা। বোঁ বোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে, যে শব্দটা করছে তা ঠিক গুন্‌গুন্ নয়, অনেকটা হুংকার গোছের। আমার শেলফের উপর বসল। আবার উড়ে গেল। দেওয়ালে বসল। সেখান থেকেও উড়ল। বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে। কোথায় বাসা বাঁধবে তারই জায়গা খুঁজছে বোধহয়। আমার ঘর পছন্দ হল না। কোনও গাছের ডালে বাসা বাঁধবে বোধহয়। কল্পনা করতে ভালো লাগছে কোনও পলাশ বনে বাসা বেঁধেছে ও। তার পাশে আছে একটা বকুল গাছ, যে বকুল গাছে হলুদ পাখির আনাগোনা, যে বকুল গাছের আশেপাশে সেই হারিয়ে যাওয়া ঝুমকোটাও হয়তো চেয়ে আছে পেয়ারা-গাছের দিকে, পেয়ারার উপর লোভ ছিল ঝুমকোর—কিন্তু না, আমি এবার থিয়েটার দেখতে চাই। ওয়ান, টু, থ্রি—হরিচরণ ড্রপ তোল—আগে হুইস্‌ল দাও—হ্যাঁ আমার 'তিন বোন' নাটকটা অভিনয় হোক। 'আমার' বলছি বটে কিন্তু নাটকটা আসলে শেখভের লেখা। আমি মূর্খদের মহলে নিজের বলে চালিয়েছিলাম কিছুদিন। সবাই বাহবা বাহবা করেছিল। বলেছিল আমি একজন জিনিয়াস। নাট্যজগতে যুগান্তর আনব। Olgaর নামে দিয়েছিলাম অলি, Mary-র নাম দিয়েছিলাম মীরা, আর আইরিনের নাম দিয়েছিলাম মৃন্ময়ী। Olga, Mary আর Irene মস্কো যাবে এই স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল—আমি এদের বিভোর করেছি মধুপুর যাওয়ার স্বপ্নে। হরিচরণ হুইস্‌ল দাও—ড্রপ তোল। ড্রপ উঠছে—লাল মখমলের উপর সোনার-কাজ-করা ড্রপটা উঠছে—প্রকাণ্ড 'হলে' বসে আছে অলি, মীরা আর মৃন্ময়ী। চুপ করে বসে আছে কেন? আশ্চর্য! মনে হচ্ছে তিনটে পুতুল যেন। অলি যেন নিষ্প্রাণ, মীরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে আমার দিকে, মৃণ্ময়ীর মাথা হেঁট। কি হল এদের? ওহো বুঝেছি। Three Sisters-এ মেরির পার্ট করেছিল Olga Kripper নামে যে মেয়েটি তাকে বিয়ে করেছিল শেখভ। আমি অলি, মীরা, মৃন্ময়ী তিনজনকেই বিয়ে করব আশা দিয়েছিলাম, কিন্তু কাউকেই করিনি। হা—হা—হা—হা। আমি বিয়ে করেছিলাম জগদম্বাকে, সুজনের মাকে, সে কোনও থিয়েটারে কোন দিন পার্ট করেনি—তার কোন ছলা-কলা হাব-ভাব ছিল না, রুজ পাউডার মাখত না, ঘুঁটে দিত, গাদা গাদা সাবান কাচত, রান্না করত, ঝগড়া করত, ভারী মুখরা ছিল—একটি মাত্র গুণ, সদ্বংশের মেয়ে। একি—ওরা সব মিলিয়ে গেল যে। হরিচরণ হুইস্‌ল দাও—জোরে হুইস্‌ল দাও। কোথায় গেল এরা? 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে'—কোনখানে সেইটেই সন্ধান করতে হবে। করবই—হরিচরণ—এঃ আবার ছাতের চাপড়া ভেঙে পড়ল লেখার উপর।

লেখাটা ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু মনটা তো ঢাকা পড়েনি। আমার আত্মা?—আমার আত্মা আছে না কি! থাকা তো উচিত। দুরাত্মারও আত্মা থাকে শাস্ত্রকাররা বলেছেন, আর বলেছেন আত্মা না কি মলিন হয় না। আমার অমলিন আত্মা কোথায় তাহলে? কোথায় তা খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু অনুভব করছি আছে। যেখানেই থাকুক আছে। হয়তো আমার এই লেখার মধ্যেই ফুটে উঠেছে তার দিব্যজ্যোতি। না, না, উঠছে না—আমি জানি উঠছে না। আমি দাম্ভিক, মহা দাম্ভিক তাই একথা বললাম। আমার লেখা? ছোঃ—সে তো কোন আঁস্তাকুড়ে কোন্ আবর্জনাস্তূপের মধ্যে থাকবে কে জানে? কিন্তু আমার আত্মা আছে, শাস্ত্রকাররা বলে গেছেন সকলের মধ্যেই আত্মা আছে, আব সে আত্মা না কি অমর। ভেরী গুড্ তাই যদি হয়—হঠাৎ মনে পড়ে গেল বনবিহারীবাবুর কথা—ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। সুতীক্ষ্ণ তরবারির মতো ছিলেন তিনি, তাঁর তীব্র ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ চকমক করে উঠেছিল বঙ্গ-সাহিত্যের আকাশে কয়েক দিন। তিনি লিখেছেন

জেনেছি আত্মা অবিনশ্বব
জেনেছি মিথ্যা দুনিয়া
তাই আমাদের নাই ভয় কানা কৌড়ি
তাই পথ চলি দিনক্ষণ দেখে
খনার বচন শুনিয়া
সাহেব এড়াই সেলাম করি বা দৌড়ি

কবিতার ব্যঙ্গটা উপভোগ করেছিলাম খুব। ব্যঙ্গের চাবুকটা আমার পিঠে পড়েনি তখন। কারণ আত্মা অবিনশ্বর কি নশ্বর তা নিয়ে মাথা ঘামানো দূরে থাক আত্মা নিয়েই মাথা ঘামাইনি কোন দিন। মাথা ঘামিয়েছি নিজের সুখ নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে। পাঁজি দেখে পথ চলিনি কখনো, সাহেব দেখে সেলামও করিনি, দৌড়ও মারিনি—ববং একটা সাহেবের সঙ্গে মারামারি করে জেল খেটেছিলাম মাস দুই—সেই জেলের জেলারকে ঘুষ দিয়ে রোজ বাত্রে বাড়ি চলে আসতাম। ভারি অমায়িক ছিলেন জেলার ভদ্রলোক। মাত্র পাঁচশ টাকা নিয়েই—কিন্তু না, কি বলছিলাম যেন খেই হারিয়ে ফেলেছি—আত্মা—হ্যাঁ আত্মা। শুনেছি আত্মা নাকি দুবকম—জীবাত্মা আব পরমাত্মা। শাস্ত্রকারেরা যা বলেছেন—ওকি—ওকি—হলদে পাখিটা জানালাব সামনে দিয়ে উড়ে গেল নাকি। এক ঝলক সোনার কিরণ যেন এল আর মিলিয়ে গেল।

—টিউ—টিউ

সঙ্গিনীকে খুঁজে পায়নি নাকি। পাখিদের সঙ্গিনীরা হারায় না তো। পাখিদের তো ডাইভোর্স কোর্ট নেই। ডাইভোর্স কোর্ট নেই কিন্তু মানুষ আছে, মানুষরা পাখি মেরে ফেলে। শুধু খাবার জন্যে মারে না, গবেষণা করবার জন্যেও মাবে। মানুষের খপ্পরে পড়েনি তো ওর সঙ্গিনী? ওর সঙ্গিনীটিও নিশ্চয় সোনার স্বপন ছিল। এ কি করছ তুমি? আগে সোনার বাটের কথা ভাবতে, সোনার মোহরের কথা ভাবতে,—এখন সোনার স্বপন আর সোনার কিরণের কথা ভাবছ? কিন্তু স্বপন আর কিরণের কি বাজার দর আছে? নেই। তবে ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ কেন! কেন, তা কি জানি। মাথা ঘামছে, জানি শুধু এইটুকু। আর জানি রুমাল দিয়ে এ ঘাম মোছা যাবে না। আমি—।

'আমার কথা একটু শোন না'

কে বললে! ঘাড় ফিরিয়ে দেখি কেউ নেই।

স্বরটা কিন্তু চেনা-চেনা। নামটা মনে নেই। নাম মনে থাকে না। স্বর মনে থাকে, হাসি মনে থাকে, মুখ মনে থাকে, নামটা হারিয়ে গেলে পৃথিবীর কাছে তার পরিচয় দেওয়া যায় না। ওগো স্বর, ওগো হাসি, ওগো মুখ তোমার কথা শুনব বই কি। তোমার কথা যে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, তোমাকে নিয়ে যে কবিতা লিখেছিল কবি কুঙ্কুম কাব্যতীর্থ, তোমাকে নিয়ে আমি যে—। কি করেছিলাম? তার চেয়ে জোরালো প্রশ্ন, কি করিনি?

"চারজন খুন, দশজন জখম, একজনকে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটেছে, দুজনকে পিটিয়ে মেরেছে—"

চীৎকার করে উঠল খবরের কাগজের শিরোনামাটা। এ কাগজ মানে এই ওঁছা খবরের কাগজটা কে রেখে গেল এখানে। নিশ্চয় গীটার। আমার মানসিক উন্নতির জন্য ও সর্বদা ব্যস্ত। ও মনে করছে আমি পাগল হয়ে গেছি। হয়তো হয়ে গেছি। কিন্তু খবরের কাগজের ওই খবরগুলো পড়লে কি আমার পাগলামি সারবে? আমি আমার পাগলামি সারাতে চাই না। খেয়ালখুশির খরস্রোতে বেশ তো ভেসে যাচ্ছি। যা খুশি লিখছি, যা ইচ্ছে বলছি। সদর খোলা খিড়কি খোলা। আমি সনাতন হতে চাই না। সনাতন অত্যন্ত নর্মাল লোক ছিল। মেপে কথা বলত, মেপে হাসত, মেপে খেত, মেপে গীতা পড়ত, কোন উচ্ছ্বাস, কোনও খেয়াল, কোনও বদচাল তাকে বিপথে নিয়ে যায়নি, একটি মিথ্যা কথা বলেনি, খারাপ কথা বলেনি, কারও মনে দুঃখ হয় এমন কথা বলেনি একবারও। অত্যন্ত সভ্যভব্য শান্তশিষ্ট পুতুল ছিল সনাতন বোস। কিন্তু যখন আসত মনে হত কখন যাবে, উঠলে বাঁচি। এলে সহজে উঠত না, খালি মেপে মেপে কেতাদুরস্ত কথা বলত, আর মুচকি মুচকি হাসত। বেশী দিন বাঁচেনি, ভদ্র রোগেই মারা গিয়েছিল, যক্ষ্মা হয়েছিল তার। দেখতে দেখতে ক্ষয়ে গেল লোকটা। গীটার, শুনে রাখ সনাতন হবার আমার ইচ্ছে নেই। ওসব খবরও শুনতে চাই না। গুণ্ডামি আমিও অনেক করেছি, গুণ্ডামির খবরে আর রুচি নেই। যদি খবর থাকত এদেশের প্রতিটি লোক বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ বা রামমোহন হয়েছে, যদি খবর থাকত এদেশের ঘরে ঘরে সীতা সতী সাবিত্রী লক্ষ্মীবাঈ, দুর্গাবতী, মীরা, ভগবতী দেবী আবার আবির্ভূতা হয়েছেন, তাহলে ঔৎসুক্যভরে উলটে পালটে দেখতাম কাগজটা, হয়তো বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু বুকটা দুর দুর করে কেঁপে উঠত—কিন্তু যে খবরের কাগজে কেবল গুণ্ডাদের গুণ্ডামি আর পতিতাদের কেচ্ছা বার হয়, মতলববাজদের পেজোমির নানা প্যাঁচ যেখানে সাড়ম্বরে বর্ণিত হয় সে খবরের কাগজে রুচি নেই আমার। বুঝলে গীটার—কিন্তু গীটার কই? দূরে দাঁড়িয়ে আছে, অনেক দূরে। আচ্ছা এরকম দূরে থাকার মানে কি। অথচ ওকে ডেকে যে বলব তুমি কাছে এস সে সাহসও আমার নেই। একটা আতঙ্ক যেন আমার মুখ চেপে ধরে। কিসের আতঙ্ক তা জানি, কিন্তু বলতে লজ্জা করে—আমারও লজ্জা আছে—আবার সেই হলদে-কালো পোকাটা ঢুকল—বোঁ বোঁ বোঁ—ঝাপটা মেরে বেরিয়ে গেল আবার। পছন্দ হল না আমার ঘর। এই নোনা-ধরা দেয়াল ওর পছন্দ হবে কেন। ও পলাশ-রঙীন বনে কোনও মহুয়া-গান্ধী নির্জনতায় ঘর বাঁধতে

চায়—তা এই শহরে পাবে না—অনেক দূরে যেতে হবে—অনেক দূর—হয়তো সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে। সভ্যতা মানে আমি যন্ত্র-সভ্যতা বলছি—কেরোসিনের মতো, আলকাতরার মতো, পীচের মতো, টিন-পেটা শব্দের মতো, মোটরের আর এরোপ্লেনের চীৎকারের মতো আরও অনেক কিছু জঘন্য জিনিসের মতো এই যন্ত্রসভ্যতা—লোহার বাঁধনে বেঁধে দাসখৎ লিখে নিয়েছে, কামনাব পণ্য যুগিয়ে পশু করে ফেলেছে আমাদের, আমি আমার কয়লাখনিতে ওই পশুগুলোকে দেখেছি, আমার চাবপাশে। একটা নাইলনেব শাড়ি, একটা মোটরকার, একটা কুম-কুলার, একটা পাখা এই সব তুচ্ছ জিনিসের লোভে কত দ্রুতগতিতে অধঃপাতের শেষ-সীমায় নেমে গিয়েছিল তুফানি, খলিল রায়বাহাদুর সেন, নওলকিশোর, মোহন মহান্তি—আরও কত লোক। সবাব গায়ে কেরোসিনেব গন্ধ, কিংবা আলকাতবার দাগ, কিংবা পীচেব ছোপ, চাবদিকে কেবল ছররর ঘররর খট্ খট্ দুমদাম। যন্ত্রসভাতা মানেই যন্ত্রণা, অথচ এর খপ্পর থেকে উদ্ধাব পাওযাব উপায়ও নেই। এ সভ্যতায় পুষ্ট অনেক মনীষী জয়গানও কবেছেন এ সভ্যতার, তাঁদেব মনীষা আছে বলেই শ্রুতিমধুব হয়েছে তাঁদের গানটা। কিন্তু মনের অন্তবতম প্রদেশে ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলী চীৎকাব কবছে—সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়।

পোকাটা আবার এল, আবার বেরিয়ে গেল।

এবাব মনে পড়ল বংকিকে। কালো হ্যাংলা মেয়েটা হলদে কামিজ পরে আসত। জিপ্সি ছিল বোধহয়। হিন্দীতে কথা বলত, সেলাম কবত কথায় কথায়। নাচ দেখিয়েছিল বেণী দুলিয়ে। এক টাকা বখশিস দিযেছিলাম; বলেছিলাম—আবাব আসিস। তোর নাম কি? বলেছিল—বংকি। আব আসেনি কিন্তু। কিন্তু এখনও আসে মাঝে মাঝে। নাচ দেখিয়ে যায়। আশ্চর্য, এখনও আসে। এ কি। এরা কে? ও বাবা, সুজন আর সেই গুঁফো ডাক্তারটা। ব্লাড প্রেসাব মাপবে? মাপ। আমি কিন্তু জানি তোমবা হালে পানি পাওনি। পাবেও না। আন্দাজি ঢিল ছুঁড়ে যাচ্ছ। তোমরা মরুভূমিতে জাহাজ এনেছ, পানি পাবে কি করে? মরুভূমিতে পানি থাকে না। যেখানে উট আনা উচিত সেখানে এনেছ জাহাজ—আপ-টু-ডেট্ হাল-ওলা জাহাজ এনে মরুভূমিতে খুঁজছো পানি। পাবে না, পাবে না, মরুভূমিতে জল পাবে না। থাম, থাম এইটুকু লিখেনি। তোমবা একটা নুইসান্স—ঠিক উচ্চারণটা কি—নিউসান্স? যাই হোক তাই তোমরা—আচ্ছা নাও, নাও মাপ। যত খুশী মাপ—ব্লাডপ্রেসার মেপে আসল প্রেসাবের খবর পাবে কি? মাপ।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছিল। কিন্তু মজার কথা ঘুমিয়েও জেগে ছিলাম। অর্থাৎ অন্য একটা বই পড়ছিলাম, গিয়েছিলাম অন্য আর একটা দেশে। যাদের সঙ্গে দেখা হল তারাও চেনা। কিছু অতীতের চেনা কিছু ভবিষ্যতের। বর্তমানের কেউ নয়। যাঁরা বুদ্ধিমান, অর্থাৎ যাঁরা সব কিছু অবিশ্বাস করেন, সব কিছু যাচিয়ে দেখতে চান, যাঁরা বাজিয়ে দেখতে চান টাকাটা অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনীর সহযোগে, টং করে শব্দ না হলে বলেন টাকাটা অচল, কিন্তু আজকাল টাকা আর আছে কি, সবই তো নোট, যে টাকা ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়

তাও আজকাল টং করে না, খট্ করে—সেটাকে ফেলে দেবে? দেবে না, দেবে না, পেলেই পকেটে পুরে ফেলবে। তবু তোমাদের অবিশ্বাসের 'পোজ'। তোমরা হয়তো জিজ্ঞেস করবে ভবিষ্যতের লোক আবার চেনা হবে কি করে? কল্পনায় চেনা হয় যে মশাই। আমার কাছে যে আলখাল্লা পরা লোকটি এসেছিলেন তিনি বললেন—মশাই, আমাকেও সবাই বলে পাগল। কেন জান? ছিলাম স্তন্য-পায়ী হয়েছি আলোক-পায়ী। সূর্যের আলো পান করি। ওরা যা খায় আমি তা খাই না। আমি উলঙ্গ হয়ে বসে থাকি সাতমহলা বাড়ির সবচেয়ে উঁচু ছাদে—আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে প্রদীপ্ত সূর্যালোক, প্রবেশ করে রামধনুর সব রং, প্রবেশ করে অবর্ণনীয় সমুজ্জ্বল পুষ্টি-ধারা। আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তোমাকে দেখে। কিন্তু তোমার গায়েও ভাত রুটির মাছমাংসের কপিকুমড়োর গন্ধ ছাড়ছে, ভেবেছিলাম তোমার কাছে বসে একটু মনের কথা বলব—কিন্তু দেখছি তোমার কাছে বসা যাবে না। চললাম।

চলে গেল। চলে যাওয়ার পর মনে হল লোকটা আমার সগোত্র। ভবিষ্যতের কুয়াশা ভেদ করে এসেছিল। এসেই চলে গেল। প্রত্যাশা রইল আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে হয়তো। তখন ও ভবিষ্যতের থাকবে না অতীতের হয়ে যাবে। অতীতের একজন এসেছিল। নটবর সোম। নেকড়ে বাঘের মতো চেহারা। স্বভাবও নেকড়ের মতো। আমার মোটর আছে, প্রভাব প্রতিপত্তি আছে এই হিংসেয় ওর বুক ফেটে যেত। গোপনে গোপনে আমার অনিষ্টের চেষ্টা করেছিল অনেক, কিন্তু কিছু করতে পারেনি। একটার জায়গায় দুটো মোটর হয়েছিল আমার। নেকড়ে তখন শৃগালে পরিণত হল। তারপর তৃতীয় মোটর কিনলাম যখন তখন শৃগালও আর রইল না সে। কুকুর হয়ে গেল। আমারই পিছু পিছু ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ঘুরত। অনেকদিন ঘুরেছিল। সুবিধে পেলেই বলত—'আপনি চেষ্টা করলে আমার ছেলের চাকরিটি হয়ে যায়।' কিন্তু আমি চেষ্টা করিনি। ছেলেটি শুধু গবেটই নয়, চোর। আজ হঠাৎ দেখা হল নটবর সোমের সঙ্গে অনেকদিন পরে। আজও তার চোখে সেই মৌন আবেদন—'আপনি চেষ্টা করলে ছেলেটার চাকরি হয়ে যায়!' কিন্তু ওর ছেলে তো মরে গেছে। কি এক পার্টিতে যোগ দিয়েছিল, বিপক্ষ পার্টির লোক গুলি করে মেরেছে তাকে। কার জন্যে চাকরি চাইছে নটবর? মিনতিপূর্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর চলে গেল। বাঃ, আশ্চর্য, একটা জিনিস দেখলাম অনেক দিন পরে আজ। অনেক দিন তো দেখিনি ওকে। আমার এই নোনা-ধরা দেওয়ালে ভাগ্যে এই জানলাটা আছে তাই তো দেখতে পেলাম ফিঙেটাকে। ফিঙের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য ওর পুচ্ছ দুটি কালো তৃতীয়ার চাঁদ যেন পিঠোপিঠি বসে আছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—ওর ভোরে ওঠা। রাত আড়াইটের সময় ওঠে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—ও জঙ্গী। কোনও অবাঞ্ছিত শত্রুকে ও নিজের এলাকায় থাকতে দেয় না। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য—ওর ছাগলের পিঠে চড়া। ফিঙে ছাড়া অর কোনও পাখিকে ছাগলের পিঠে চড়তে দেখিনি। অদ্ভুত শিকারী। উড়ন্ত পোকা ধরে। এখানে ও তারের উপর এসে বসেছে আমার জন্যে নয়, পোকা ধরবে বলে। কিন্তু ওকে আমার ভারী ভালো লাগছে। জীবনে এই একটা মজা দেখেছি, আমার জন্যে কেউ কিছু করে না, তবু আমি তাদের অজ্ঞাতসারেই তাদের সংস্পর্শে আনন্দ পেয়ে যাই। আকাশ আমার জন্যে নীল হয়নি, সন্ধ্যার মেঘে মেঘে আমার

জন্য রঙের উৎসব করেনি কেউ, ফুলেরা আমার জন্যে ফোটেনি, পাখিরা নিজেদের খুশীমতো গান গেয়েছে—আমি কিন্তু মাঝ থেকে আনন্দ পেয়ে গেছি। আমার জন্য বিশেষ করে আনন্দের আয়োজন করেছিল যারা তাদের আয়োজন মেকী ছিল বলেই বোধহয় বেশী দিন টেকেনি, দুদিনেই গিল্টি বেরিয়ে পড়ল। তাদের আন্তরিকতায় আমি সন্দেহ করছি না—কি চমৎকার বেহালাই বাজাত জাফর—খুব আন্তরিক ছিল সে, তবু মনে হচ্ছে তাতে কোথাও কিছু মেকী ছিল যেন। জাফর আকাশ হয়নি, ফুল হয়নি, পাখির গান হয়নি—তাই সে মারা গেছে—হারিয়ে গেছে। ভালো ভালো অনেক জিনিস হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যায়নি কিন্তু সেকালের সেই 'ওগো'—সেই খাটো শাড়ি-পরা কুৎসিত মেয়েটা যে খুব ভোরে উঠে ঘুঁটে দিত, তারপর বাসন মাজত, তারপর স্নান করত, তারপর ঠাকুরঘরে ঢুকত, তারপর রান্নাঘরে যেত, যে সর্বদা নজর রাখত বারান্দায়-শোয়ানো ছেলেটার উপর তখন ওর নাম ছিল খোকা, বারবার সরে সরে যেত বিছানা থেকে, বারবার এসে শুইয়ে দিত ঠিক করে। জবজবে করে সরষের তেল মাখিয়ে ফেলে রাখত রোদে, তারপরে নিষ্ঠুরের মতো স্নান করাতো ঠাণ্ডা জলে। বলতাম অত কনকনে জলে নাওয়াচ্ছ কেন, জলটা একটু গরম করে নাও না! শুনত না আমার কথা। জেদী ছিল খুব। যা মনে করত তাই করতো ঠিক। আর উপবাস করত ক্রমাগত। নানারকম ব্রত আর মানতের খানাখন্দ পার হত লাফিয়ে লাফিয়ে। আমি যেদিন মুর্গি আর মদ খেতাম সেদিন আমার বিছানায় শুতো না। পরদিন মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে বলত—শুদ্ধ হও, শুদ্ধ হও। একদিন জিগ্যেস করেছিলাম—কোন্‌টা শুদ্ধ কোন্‌টা অশুদ্ধ তা কি তুমি বোঝ। আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছিল—'তা হয়ত বুঝি না, কিন্তু তোমাকে বুঝি। তোমার আদি-অন্ত সব বুঝি, আমার গয়নাগুলো চুরি করেছে এই অপবাদে তুমি রঘুনাথ চাকরটাকে তাড়িয়ে দিলে। কিন্তু আমি জানি গয়নাগুলো রঘুনাথ নেয়নি। কে নিয়েছে তাও জানি। ও গয়না কে এখন পরছে সে খবরও পেয়েছি। কেন মদ খাও, কেন মুর্গি খাও, কে তোমাকে খাওয়ায় তা সবাই জানে, আমিও জানি। ও নিয়ে তর্ক করব না, ঝগড়াও করব না, কেবল বলব শুদ্ধ হও, নির্মল হও। ছেলের বাপ হয়েছ তুমি।'

আমি কুঁকড়ে যেতাম, কুঁচকে যেতাম, পুরুষসিংহ আমি হয়ে যেতাম কেঁচো—হ্যাঁ কেঁচো। আর ওইখানেই আমার অধঃপতন। যদি ওর চুলের ঝুঁটি ধরে বলতাম, যা করেছি বেশ করেছি আরও করব। তাহলে হয়তো—কিন্তু না ভুল বলেছি—তাহলে—তাহলে রাসকেল হয়তো স্কাউন্ড্রেল হত, হয়তো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ত, সরু ছুঁচ হয়তো শূল হত, তুষানল দাবানল হত—কিন্তু ওকে আমি দাবাতে পারতাম না। কারণ ওর মধ্যে মেকী কিছু ছিল না, মিথ্যা কিছু ছিল না, ও নীলকণ্ঠ বিদ্যার্ণবের মেয়ে ও স্বস্থান থেকে একচুল নড়ত না। আজও নড়েনি—না জগদম্বা হারায়নি। কিন্তু কোথায় আছে জানি না। অনেককে দেখতে পাই মাঝে মাঝে। ওকে পাই না। স্বপ্নে জাগরণে কোন সময়েই দেখা পাই না ওর। মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, আর ওই কথাটাই মনে করিয়ে দেয় কেবল—ছেলের বাপ হয়েছ তুমি। আরে তাতো হয়েছি, কিন্তু সেটা সর্বক্ষণ মনে রেখে কি লাভ হবে আমার। ভুলতে পারলেই বরং বাঁচি! যে আমাকে বন্দী করে রেখেছে সে যে আমার ছেলে—আমার বিদগ্ধ পুত্র সুজন—এ

কথা ভুলতে পারলেই আরাম পেতাম। ও যদি সুজন না হয়ে রমেশ হত, যে রমেশকে আমি জেল খাটিয়েছি সাত বছর, তাহলে এত কষ্ট হত না আমার—সুজনকে ঔরংজেব মনে করবার হেতু থাকত না। রমেশকে আমি জেল খাটিয়েছি, রমেশও আমাকে জেল খাটাচ্ছে—টিট্ ফর ট্যাট্— কোনও ক্ষোভ থাকত না। রমেশ আমার ক্যাশ ভেঙে ধরা পড়েছিল, হয়তো তাকে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু ছাড়িনি—কেন ছাড়িনি লিখি সেটা? লিখেই ফেলি। আমার কমলির ঘরে ওর একটা চিঠি পেয়েছিলাম। কমলিকে নিয়ে ভাগবার মতলবে ছিল। কমলি বললে রোজ একটা করে চিঠি লেখে কি করব বলুন। বললাম, আমাকে এতদিন বলনি কেন? চাবকে দিতাম। কমলি চুপ করে রইল। বুঝলাম ও হিসেব করে দেখছিল কোন্ পাল্লাটা ভারী। দর কষাকষি করছিল। কমলিকেও দূর করে দিলাম। দেখতে ভালো ছিল না, হাবভাবও ছিল না, কিন্তু নাচত গাইত ভালো। বিশেষ করে নিধুবাবুর টপ্পা এমন চোখ মুখের ভঙ্গী করে গাইত—শুনেছি মেয়েটা মুখে রক্ত উঠে মারা গেছে। কি বলছিলাম—রমেশ, রমেশ এখন লক্ষপতি, স্বাধীন গভর্নমেণ্টের সচ্চরিত্র অফিসারদের নেকনজরে পড়েছে সে, শুনেছি ইলেকশনে দাঁড়াবে, এবার মন্ত্রী হবে হয়তো।

...পট্ করে একটা কুচকুচে কালো পোকা আমার খাতার উপর পড়েই উড়ে গেল। কি চকচকে কালো তার গায়ের রং। কত আশ্চর্য রকম পোকা আছে পৃথিবীতে। আমরা কটা পোকার খবর রাখি? ছারপোকা, গোঁদোপোকা, দাঁতের পোকা, ঘায়ের পোকা এরা সবাই কি ওই জাতের? বাজের মতো পড়ল আর প্লেনের মতো সোঁ করে উড়ে গেল! চকচকে কালো, অমাবস্যার মতো—কিন্তু না বাজে চিন্তা করছি—ক্ষিধে পেয়েছে বোধহয়—ক্ষিধে পেলেই বাজে চিন্তা ভীড় করে মাথায়। কিন্তু ক্ষিধে পেয়েছে একথা উচ্চারণ করবামাত্রই অখাদ্য সব জিনিস এনে হাজির করবে গীটার—আপেল. আঙুর, পেঁপে, সন্দেশ, রাবড়ি, টোস্ট, ডিম ভাজা, জ্যাম জেলি, চিজ—অরুচি ধরে গেছে ওসব খেয়ে। ভালো লাগে গরম মুড়ি আর তেলেভাজা, তার সঙ্গে ঘুগ্‌নি, কিন্তু ওসব জিনিস দেয় না গীটার। আর একটা জিনিসও খেতে খুব ভালো। আমার মানভূমের চাকরটা দিত আমাকে করে যখন আমি কন্টাক্‌টারি করতাম রাঁচিতে। নিমপাতার সঙ্গে একটু উচ্ছে লঙ্কাবাটা পেঁয়াজবাটা আর হলুদ মেখে বাটিচচ্চড়ি করত সে তেল দিয়ে। অপূর্ব তার স্বাদ। আর বিরিঞ্চি করত সে। বেগুনের বিরিঞ্চি। এ সবের নামও বোধহয় শোনেনি গীটার। সুক্তো করতে পারে না, করে খালি সুপ। চচ্চড়ি ছ্যাঁচড়া সড়সড়ি কিচ্ছু করতে পারে না। পারে খালি মসলা গদগদে কোফতা, কারি আর—চমকে উঠলাম হঠাৎ।

"বাবা, আপনার খাবার আনি?"

গীটার কি অন্তর্যামিনী! পিছন দিকে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাইনি। লেখাটা দেখতে পেয়েছে না কি। তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে দিলাম লেখাটা। ঘাড় ফিরয়ে দেখলাম গীটার নেই। কি আশ্চর্য, গীটার নেই। অথচ— । আলবৎ আছে। গীটার গীটার গীটার গীটার—আমার ক্ষিধে পেয়েছে—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—।

ওরা বলছে আমি মূর্ছা গিয়েছিলাম। ওরা কি না বলে। ওরা বলে আমি পাগল হয়ে গেছি।

মূর্ছা গিয়েছিলাম? মূর্ছা কি একটা জায়গার নাম? জায়গাই বোধহয়। সেখানে জগদম্বা ছিল। যে শাড়িটা তাকে অনেকদিন আগে কিনে দিয়েছিলাম, কিন্তু যেটা তার পছন্দ হয়নি সেই বেগনে রঙের শাড়িটা পরেই দাঁড়িয়েছিল। বলল—তুমি অমন দাপাদাপি করছ কেন, স্থির হও, ঠাণ্ডা হও, ছেলের বাপ হয়েছ তুমি। ঠোঁট চেপে ঠিক তেমনি হাসিটি হাসল। চলে গেল তারপর। যে পথে চলে গেল সে পথ আলোয় আলো। মনে হল আকাশের নক্ষত্ররা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ভীড় করছে সে পথের দুধারে। সেই পথে বেগনে শাড়িটা পরে চলে গেল সে। তারপর হঠাৎ দেখলাম আমার সামনে সেই পুরোনো খাগড়াই বাসনটাতে নারকোল কোরা রয়েছে খানিকটা। জগদম্বাই রেখে গেলে কি এটা? সেই তো জানতো আমি নারকোলকোরা ভালোবাসি, ওই পলতোলা কাঁসার রেকাবিটা তো তারই। সেই তো বুঝতে পারত কখন আমার ক্ষিদে পায়। সেই তো উনুন ধরাতে জানতো পাঁচ মিনিটে, দুধের সর বাঁচিয়ে ঘি তৈরি করত, বড়ি দিত, আচার বানাত। কত ভোরে উঠত জানতে পারতাম না, কত রাত্রে শুতে আসত তা-ও না। মাতাল স্বামীটার মাথার বালিশ ঠিক করে দিত যখন, তখন আভাসে বুঝতাম ও লায়লি নয় জগদম্বা। আমি মূর্ছা গেলে সে-ইতো আসবে, কিন্তু আসেনি, এলে যেত না, থাকত। গেলেও নক্ষত্রছাওয়া আলোয়-আলো পথ দিয়ে যেত না সে। আলো সে মোটেই পছন্দ করত না। ঘুপচি অন্ধকার, সরু গলি, এরওর বাড়ির পিছন দিকে ছাঁচতলা এই সবই ছিল তার মনোমত পরিবেশ। সদর রাস্তায় আসেনি কোনও দিনও। একদিন এসেছিল। মৃত্যুর দিন। সেদিন সদর রাস্তার উপরই দড়ির খাটিয়াটা পাতা হয়েছিল। এ কি—এটা কি—শূন্য থেকে ঝুলছে—পিঁপড়ে না মাকড়শা—আরে—কি সর্বনাশ আসুন আসুন—এখানে দ্বিতীয় চেয়ার নেই যে আপনাকে বসতে দিই—আপনি আমার বিছানাতেই বসুন, আমি দাঁড়িয়ে থাকছি—না আমি আপনার সঙ্গে একাসনে বসতে পারব না, কক্‌খনো বসিনি, কক্‌খনো বসতে পারব না—কিন্তু আপনি এ পাপিষ্ঠের কাছে এলেন কেন। কিন্তু কি আশ্চর্য। যারা মরে হেজে গেছে তারাই বারবার আমার কাছে আসছে কেন। তাহলে কি আমারও মৃত্যু সন্নিকট? নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মহাপুরুষ। আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন, তাঁর বিরাট লাইব্রেরীতে একাধিপত্য করবার সুযোগ দিয়েছিলেন—বিয়েও দিয়েছিলেন।'

নীলকণ্ঠ বিদ্যার্ণব বাল্যবন্ধু ছিলেন ওর। তাঁর যে ঐশ্বর্য ছিল প্রচুর, বাজারদর ছিল না তার। মুর্গীরা মুক্তোর কদর করে কি? অতি কষ্টে দিন চলত, একটা স্কুলে পণ্ডিতি করতেন, মাইনে পেতেন দশ টাকা। মাত্র দশ টাকা। আমি আমার শফারকে দুশো টাকা মাইনে দিয়েছি, রক্ষিতাকে দিয়েছি হাজার টাকা, কিন্তু নীলকণ্ঠ বিদ্যার্ণব দশ টাকা মাইনেয় দিন কাটিয়ে গেছেন ওই জগদম্বাকে নিয়ে। ওই মাতৃহীনা কন্যাটি ছাড়া আর কেউ ছিল না তাঁর। মহাপুরুষই ঘটকালি করে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন আমার। আমার বয়স তখন একুশ আর জগদম্বার নয়। নীলকণ্ঠ বিদ্যার্ণব গৌরীদানে বিশ্বাসী ছিলেন। আর বিশ্বাসী ছিলেন মহাপুরুষের বিচার-বুদ্ধির উপর। মহাপুরুষ যে-ই বললেন নিপু ছেলেটি ভালো, তোমার পালটি ঘরও, ওর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। অমনি রাজি হয়ে গেলেন তিনি, আমার সম্বন্ধে কোনও খোঁজ-খবর করলেন না। বিয়ে হয়ে গেল। আমার বাবাকে দেখিনি আমি। তিনি আমাকে জন্ম

দিয়েই দেহরক্ষা করেছিলেন। শুনেছি তিনি ভিক্ষা করতেন। গানের গলাটা ভালো ছিল, গান গেয়ে ভিক্ষা করতেন। শুনেছি সংস্কৃত ভালো জানতেন। কিন্তু সে জ্ঞানের কদর কেউ করেনি এদেশে। এদেশে গানের কদর খুব—সিনেমার গান, রবীন্দ্রনাথের গান, ভিখারীর গান—সব গানেরই কদর করে সবাই—ক্ল্যাসিক্যাল গানও না কি শোনে একদল লোক—পেটে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত্র নেই, ভবিষ্যৎ মেঘাচ্ছন্ন, চুরি করতে ওস্তাদ, মিথ্যে বলতে সঙ্কোচ নেই, মহা ভীতু, চাকরির জন্যে লালায়িত এই অপদার্থের দল গানের সমঝদার—গান শুনে ভিখারীকে পয়সা ছুঁড়ে দেয়, আমার বাবা এদের মনোরঞ্জন করে পয়সা রোজগার করতেন— I hate music--I hate them all......

গোপীনাথ আছড়ে চুরমার করা হার্মোনিয়ামটা যেটা গলায় দুলিয়ে বেড়াতে তুমি—। না, না, রংকি, অমন করে কটমটিয়ে চেয়ো না আমার দিকে। তোমার গান শুনে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। জানলার পাশ দিয়ে সোনাঝুরির যে ডালটা দেখা যাচ্ছে—তাতে কয়েকটা সোনাঝুরি ফুলও ঝুলছে—তুমি ওর মধ্যে গেলে কি করে রংকি—মানছি সোনাঝুরি ফুলের মতো হলুদ জামা ছিল তোমার, মনে পড়ছে সেটা,—আর মনে পড়ছে সেই গানের কলিটা—বাজুবন্দ্ খুলি খুলি যায়—কিন্তু তুমি এখনও আসছ কেন? তুমি বেঁচে আছ, না মারা গেছ। যারা মারা গেছে তারাই তো আসছে বার বার। মাঝে মাঝে মনে হয় গীটার সুজন, ওই গুঁফো ডাক্তারটা সবাই মরে গেছে, আমিও মরে গেছি—

কিন্তু ও কি, কার কান্না—। ওঃ রুখতে পারলাম না।

সেই প্যাংলা ছেলেটা। মা ঠ্যাঙাচ্ছে ছেলেটাকে—পাখার বাঁট দিয়ে ঠ্যাঙাচ্ছে—পাগলের মতো ঠেঙিয়ে যাচ্ছে—আর গাল দিচ্ছে।

'পোড়ারমুখো, ভিকিরিব বাচ্চা, যমের অরুচি—দিন রাত খালি খাই খাই। কোথায় পাব অত খাবার। দূর হ, দূর হ—দূর হ—! লাথি মেরে ঠেলে ফেলে দিলে ছেলেটাকে। পালাতে গিয়ে পড়ে গেল ছেলেটা। কপাল কেটে রক্ত পড়তে লাগল। মা ঘরের ভিতর থেকে চিৎকার করে উঠল—যা ভিক্ষে করে খে গে যা।'

দড়াম করে বন্ধ করে দিলে কপাটটা। ছেলেটা কাঁদছে। ক্রমাগত কাঁদছে। বন্ধ কপাটের সামনে বসেই কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে, মা—মা—মাগো। একটু পরে খুলে গেল কপাট, মা-ই বেরিয়ে এল। হাতে একখানা বাসী রুটি, গুড় লাগানো তাতে খানিকটা। গুড়ের মধ্যে মরা পিঁপড়েও একটা।

'নে —গেল।'

ছেলেটা কান্না ভুলে খেতে লাগল। মা চলে গেল ঘরের ভেতর। উনুনে তেলের কড়া চড়িয়ে এসেছিল। পাঁচ ফোড়ন দিতেই গন্ধ ছাড়ল। আনাজগুলো দেওয়ার পর ছঁক্ ছঁক্ করে শব্দ হল। এ কে আবার! কোথায় দেখেছি? মনে পড়েছে। আমাকে দেখে একটু হেসেছিল। হেঁটে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। ফ্রকপরা ছোট্ট মেয়েটা। আমাকে দেখে হাসছে কেন একথা তখন ভাবিনি। আমিও হেসেছিলাম একটু। কতদিন আগে? মনে নেই। ও কেন হেসেছিল আমিই বা কেন হেসেছিলাম সেটা আর জানা যাবে না। হাসিটা কিন্তু কালের স্রোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হরে কৃষ্ণ—হরে রাম।

আর একটা ভিখারী এসেছে। নন্‌তির মায়ের মেজাজ যদি ভালো থাকে দেবে কিছু। নন্‌তির মা বাড়ির পুরোনো ঝি, মানে সেই কর্তা গিন্নি সব। গীটার ওর ভয়ে তটস্থ। থেমে গেল হরে কৃষ্ণ বুলি। চলে গেল। ভিক্ষা পেয়েছে।

কিন্তু আমি ভাবছি কতক্ষণ এভাবে লিখে যাব। বাজারে কাগজ কলম হয়তো অফুরন্ত, কিন্তু আমার শক্তির একটা সীমা আছে তো। না, নেই—হঠাৎ বলে উঠল কে যেন। বলে উঠল, তোমার শক্তির উৎসও তোমার আয়ত্তের মধ্যে নেই, সে ডায়ানামো কোথায় আছে তা-ও জান না তুমি। কাগজ কলম ফুরোতে পারে তুমি কিন্তু অফুরন্ত। একমাত্র তুমিই অফুরন্ত। বদলাবে কিন্তু ফুরোবে না। এ তো মহা অত্যাচার—আমি ফুরোব না? মহাপুরুষের কাছে উপনিষদ পড়ে যে ভুল ধারণাটা মগজে ঢুকিয়েছিলাম সেটাকে গলা-ধাক্কা দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন মহর্ষি চার্বাক, কিন্তু পারেননি দেখছি। মহাপুরুষের লাইব্রেরিতেই চার্বাকদর্শনের বইটাও ছিল। কোন্‌টা ঠিক তা মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করবার সাহস হয়নি। তাঁর চারদিকে এমন একটা দুর্ভেদ্য অদৃশ্য প্রাকার থাকতো যে তাঁর কাছে থেকেও কাছে যাওয়া যেত না কিন্তু এখন দেখছি উপনিষদই জিতছে। মনের ভিতর থেকে সে-ই বলছে, তুমি অমর, তুমি অক্ষয়। কিন্তু আমি অমর অক্ষয় হতে চাই না। এক জীবনেই যে জট পাকিয়েছি—ওই গীটার আসছে। হাতে ডিশ, ডিশে আপেল সিদ্ধ, আর চামচে। ওটা আমাকে রোজ খেতেই হবে। আপত্তি করলাম না, লক্ষ্মীর মতো খেয়ে নিলাম। যখন খেতেই হবে তখন আপত্তি করে লাভ কি। কিন্তু একটা লাভ হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। গলায় যে তোয়ালেটা জড়িয়েছিল তাতে চমৎকার সুগন্ধ ছিল। আতর কিংবা এসেন্সের গন্ধ—নাম বলতে পারব না—কিন্তু চেনা গন্ধ—ও হেনরির লেখা Furnished Room গল্পে চেনা এসেন্সের গন্ধ যেমন আকুল করে তুলেছিল লোকটাকে—আমাকেও তেমনি তুলেছে—কিন্তু মনে করতে পাচ্ছি না কিছু। তার নামটা পর্যন্ত মনে নেই। গন্ধটা কেবল ভেসে বেড়াচ্ছে। একটু আগে একটা হাসির টুকরো দেখছি, টুকরো সব। আশ্চর্য কথা মনে হচ্ছে একটা। কতকগুলো টুকরো এসে এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছিল একটা অভূতপূর্ব জিনিস। টুকরোগুলো আলাদা হয়ে গেছে, অভূতপূর্ব এখন ভূতপূর্ব। স্মৃতি থেকে মুছে গেলেই শেষ। আরও আশ্চর্য, টুকরোর স্মৃতি মনে থাকে, গোটার কথা ভুলে যাই। জট—জট—খালি জট। সব মুছে গিয়ে যদি ক্লীন শ্লেট হয়ে যেত তাহলে নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে দেবে না। মাঝে মাঝে ফুট কাটছে গভীর জলের মাছটা। ফুটটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মাছটাকে পাচ্ছি না। কোন জালেই ও মাছ ধরা দেবে না এই রকম একটা বিশ্বাস, প্রত্যয়ও বলতে পারেন, আমার মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, কিন্তু আমার মনের সদরে একটা ফাজিল সবজান্তা বুদ্ধি সরফরাজি করছে জাল, ছিপ, হুইল নিয়ে নানারকম চারের ফরম্যুলা খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার বিশ্বাস সে ধরতে পারবে মাছটাকে। আমি দোটানায় পড়েছি। কেন জানেন? আমি যে পাপী। আমার বিবেকটি শরশয্যা একটি, কিন্তু মুশকিল আমি ভীষ্ম নই, আমি ভীষণ, আমি পাজি, আমি পাপী। কিন্তু এসব কি লিখছি? সুজন গীটার পড়বে যে এগুলো। পড়ুক না, কোদালকে কোদাল বলে ওরা যদি চিনতে পারে ক্ষতি কি তাতে? কিন্তু ওরা চিনতে পারবে না। ওরা আর ওদের সেই গুঁফো

ডাক্তারটা ঠিক করেছে আমি পাগল হয়ে গেছি। ওরা ভাববে পাগলে কি না বলে? এই ভাববে আর ক্রমাগত সেবা করে যাবে আমার, ক্রমাগত ওষুধ খাওয়াবে, ইনজেকশন দেওয়াবে, আর আনবে অখাদ্য খাবারগুলো—সাবুর পুডিং, আপেল সিদ্ধ, মাগুর মাছের স্ট্যু, আর খুব সরু খুব পুরোনো চালের গলাগলা ভাত। নাথুনীর ভাজা বেগুনি, বেচুদার দোকানের ঝাল ঝাল কাটলেট, পান্থ-তৃপ্তি হোটেলের মোটা চালের ভাত আর লঙ্কা-লাল গরগচুরে ইলিশ মাছের ঝাল যা খেয়ে একদিন প্রচুর তৃপ্তি হত তা আনবে না—সে সব দেখেইনি ওরা—সোফিস্টিকেটেড, নরম, তুলতুলে, ন্যাকামি-ভণ্ডামি-ভদ্রতা-শিক্ষার কারখানায় তৈরি আজব ধরনের জীব ওরা—ওরা বুঝবে না আমাকে, বুঝতেই পারবে না। আরে রামোঃ—ঠিক এই সময়ে তোমরা এলে? বিয়ের বাজারের ঝড়তি পড়তি মাল সব। নানারকম সাজ-সজ্জা করে রঙীন আলোর মায়া-লোকে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হাজার হাজার দর্শকদের সামনে রঙ্গমঞ্চে নাচছ। নানারকম মুদ্রা দেখাচ্ছ, নানারকম গান গাইছ, চোখের মুখের ভুরুর কত রকম ভঙ্গী। আমি কিন্তু ওর মধ্যে একটি গানই শুনতে পাচ্ছি। বড় করুণ গান সেটি। সে গানের একটিই মানে—পাইনি, পাইনি, পাব কি, কোথায়, কোথায়.....। তোমাদের পেতে হবে কাউকে, যেন-তেন-প্রকারেণ। এই গানের সুরে ভেসে আসছে সেকালের গৌরীদান প্রথা, পণপ্রথা, বহুবিবাহ, ভেসে আসছে লাভ ম্যারেজ, ভেসে আসছে স্বাধীনতার মুখোশের তলায় পরাধীনতার নাগপাশে বন্দী হবার আগ্রহের বহু বিচিত্র ছবি, ভেসে আসছে আগামী কালের ঝাপসা কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুনরাবির্ভাবের বীভৎস চিত্র সব। নানারকম ট্রেডমার্ক দেওয়া বহুরকম লালসার ছবি। কিন্তু কি সুন্দর নাচছ তোমরা, গানের ভাষা কি সুন্দর, এ সময় আমার এসব কথা মনে হচ্ছে কেন। বাহবা বলতে গিয়ে আহা বলে ফেলছি কেন। কেন—কেন—কেন—কেন—অসংখ্য কেন আর অসংখ্য কিন্তু—সারা জীবনটাই এই। এর সঙ্গে মার, নানারকম মার। ও কি চলে গেলে সব? এলেই বা কেন, গেলেই বা কেন! যাওয়ার আগে একবার অনুমতিও নিলে না? এখন না হয় আমি একটা ছোট্ট ঘরে গরীবের মতো বসে আছি, কিন্তু একদিন আমার বাগানবাড়ি ছিল, সেই বাগানবাড়িতে তোমাদের নিয়ে হুল্লোড় করেছিলাম. আমার বাগানবাড়ির নাম ছিল 'সংস্কৃতি ভবন'। আসলে আমরা নচ্ছারের দল, হেন কুকার্য নেই যা করি না, কিন্তু মাঝে মাঝে সংস্কৃতি সংস্কৃতি বলে হেদিয়ে না পড়লে আমাদের ভাত হজম হয় না। তাই আমাকে কানা পুতের নাম পদ্মলোচন দিতে হয়েছিল, যেখানে গান বাজনা হই-হুল্লোড়ের সঙ্গে একটু ইয়ে-টিয়ে এটা ওটা সেটার চর্চা করা হত সেই বাড়িটার নাম দিতে হয়েছিল 'সংস্কৃতি ভবন'। মাঝে মাঝে সেখানে যে দু একজন মহামহোপাধ্যাযটাধ্যায়রা আসতেন না তা নয়, ভালো ভালো বক্তৃতাটক্তৃতাও দিতেন, আত্মাটাত্মার কথাও শোনাতেন, কিন্তু সংস্কৃতি ভবনের আসল কৃতী ছিলে তোমরা আর প্রধান সং ছিলাম আমি। নীলামে সে সংস্কৃতি ভবন বিক্রি হয়ে গেছে। এখন সেটা পাটের গুদাম। আর তোমরা? তোমরা কি যা ছিলে তাই আছ? ও মাই গুড্‌নেস। একসঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠলে তোমরা! কোত্থেকে? স্বর্গ থেকে, না নরক থেকে? ওই দেখ, ধরা পড়ে গেলাম, স্বর্গ নরক বিশ্বাস করি তাহলে। এ-টা কি? হলদে সাপ না কি! বিছানায় সাপ উঠেছে? কি সর্বনাশ, গীটার, গীটার—বিছানায় সাপ! এসো, এসো, শীগ্‌গির—।

"না বাবা ওটা সাপ নয়, আপনার বেড্ সুইচের ইলেকট্রিক তার!"

"আগে তো কালো রঙের তার ছিল একটা—"

"কাল আপনি যখন বাথরুমে গিয়েছিলেন তখন মাখন এসে বদলে দিয়ে গিয়েছে। তারটা একটু ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল, ভাবলাম আপনার শক্টক্ লেগে যেতে পারে, তাই—"

আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম! আমি তো কোথাও যাইনি, ঠায় এক জায়গায় বসে আছি তোমাদের হুকুমে। আমাকে বন্দী করে রেখেছে সুজন। শাজাহান বন্দী হয়েছে আরংজেবের চক্রান্তে। তোমাকে জাহানারা বলে মাঝে মাঝে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা ভেঙ্গেও যায়। তুমি যে ওর বউ। জাহানারা আরংজেবের বোন ছিল। কিন্তু তুমি ওর কোন্ বেগম? উদিপুরী, রাজপুতানী, না সেই মুসলমানীটা—কারোও সঙ্গে মিলছে না। না মিলুক, মিলিয়েই বা কি হবে, একটা কথার জবাব দাও তো। ইলেকট্রিক ওয়্যারটা হলদে রঙর কিনলে কেন হলদে পাখির রঙের সঙ্গে রঙ্ মিলিয়ে? ওই পাখিটাই বা বারবার এসে ডাকছে কেন—টিউ টিউ টিউ। একটু আগেই ডেকে গেল। ওর সঙ্গে কোনও ষড়যন্ত্র করেছ না কি! পাপীর মন কিনা তাই বারবার ষড়যন্ত্রের কথা মনে হয়। আচ্ছা, এ কি কাণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে গীটার ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। গানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কি ইচ্ছে করলে ওর কাছে যেতে পারি না? নিশ্চয় পাবি। পারি, কিন্তু যাব না। আমার একটা আত্মসম্মান আছে তো। কথাটা মনে হওয়া মাত্র—খটাখট্ খটাখট্ খটাখট্ শব্দ হল একটা। দেখি খোঁড়া দেবেন বাঁড়ুজ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারী আত্মসম্মানী লোক ছিল। যখন ওর দুটো পা-ই ছিল তখন আসত আমার দোকানে' প্রতিবারই হেঁট হয়ে প্রণাম করতাম ওকে। একবার করিনি। তারপর থেকে আসেনি আর। শুনেছিলাম একটা পা কাটা গেছে রেলে। দুই বগলে ক্রাচ্ দিয়ে সে এসে দাঁড়াল হঠাৎ। গায়ে আজানুলম্বিত একটা ছেঁড়া জামা। চোখে অগ্নিদৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ক্রাচের উপব ভর দিয়ে খটাখট্ করে চলে গেল। যাওয়ার ভঙ্গীতে একটা দর্প একটা অবজ্ঞা ফুটে উঠল যেন। তাবপর হঠাৎ ক্রাচ্ খটখটিয়ে ফিরে এল আবার। বলল—আমার একটা পা আছে তোমার তা-ও নেই। তুমি ভাবছ তুমি চলতে পার, কিন্তু পার না, পার না। কোনও দিনই পারবে না। তুমি অনড়, স্থবির, তোমার চলা অনেক দিন থেমে গেছে। আর তোমার আত্মসম্মান? সেদিন রাত্রির কথাটা ভুলে গেলে নাকি। তুমি ভুললেও আমি ভুলিনি। সেদিন কেঁউ কেঁউ করে পিছনের দুপায়ের ভিতর ল্যাজ ঢুকিয়েছিলে। তারপর বাঘের মতো গর্জন করেছ, শেষে স্ট্যাচুর মতো নির্বিকার হয়েছে। তোমাকে আমি চিনি না?

আবার ক্রাচ্ খটখটিয়ে চলে গেল।

অন্ধকার রাত্রে সরু গলি দিয়ে পা টিপে টিপে চলেছে সেই ছেলেটা। সেই যে ছেলেটা মায়ের কাছে মার খেয়ে কাঁদছিল, যার মা, মারতে মারতে টেনে বার করে দিয়েছিল তাকে রাস্তায়—সেই ছেলেটা। এখন একটু বড় হয়েছে। এখনও প্যাংলা, খালি গা, খালি পা, ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট-পরা, জীর্ণশীর্ণ। পাঁজরা গোনা যায়। চোখ দুটো কিন্তু জ্বলন্ত, দুটো টর্চ যেন। সূচীভেদ্য অন্ধকারে ওই টর্চ দুটোই তার সম্বল। পা টিপে টিপে একটা বাড়ির পিছন দিকে

গিয়ে দাঁড়াল, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর একটা নালী বেয়ে উপরে উঠতে লাগল গিরগিটির মতো। দোতলায় খোলাজানালা ছিল একটা। ঢুকে পড়ল তার ভিতর কার্নিসে পা রেখে সার্কাসি কায়দায়। তারপর জানালা গলিয়ে ফেলে দিল কয়েকটা জামা কাপড়। তরতর করে নালী বেয়ে নেমে এল আবার। নেমেই জামাকাপড়গুলো বগলদাবা করে বাঁই বাঁই করে ছুটল। তীক্ষ্ণ সুরে সিটি বেজে উঠল কোথায় একটা। ছেলেটাকে আর দেখা গেল না। হারিয়ে গেল সেই অন্ধকারের অন্ধলোকে যেখানে চুরি করাই নিয়ম, অশ্লীলতাই যেখানে ভাষার অলঙ্কার, যেখানে রাস্তাই ঘর-বাড়ি, গুণ্ডারা গুরু, আর বেশ্যারা পালিকা—যেখানে আইনই বে-আইনি, ভদ্রতাই অভদ্রতা যেখানে ভালো হওয়া অপরাধ মন্দ হওয়া বাহাদুরি—যেখানে, না আর ফর্দ বাড়িয়ে লাভ নেই। ওই পাতালের রাজত্বটা চেন তোমরা। ওটা তোমাদেরই সৃষ্টি, তোমাদেব সভ্যতার, তোমাদের লোভের, তোমাদের মুখোশ-পরা পশু-প্রকৃতির। এই পাতালের গুণ্ডারাই তোমাদের দুষ্কর্মে সাহায্য করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাদের শত্রুর উপর। এরা তোমাদের সেনা-বাহিনী। তোমরা আলসেশিয়ান বুলটেরিয়র, বুল-ডগ যেমন পোষ, এদেরও তেমনি পোষ। এই পাতাল তোমাদের সভ্যতার কার্পেটের ওপিঠ। সেইখানেই হারিয়ে গেল ছেলেটা। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। একটু পরেই দেবেন বাঁড়ুয্যে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন তাকে কার্পেটের সোজা পিঠে। দেবেন বাঁড়ুয্যে তখন কনেস্টেবল। থানায় এসেই চড় ঘুষি লাথি দিয়ে শুরু হল ছেলেটার সম্বর্ধনা। তারস্বরে চেঁচাতে লাগল ছেলেটা। তখন অনেক রাত। প্রায় দুটো। তখনও ব্রিটিশ আমল ছিল। মোটর সাইকেল চেপে হঠাৎ একজন সাহেব এসে হাজির হলেন থানায়। তাঁকে দেখামাত্রই বাঁড়ুয্যে হঠাৎ সোজা হয়ে স্যালুট করলেন। বুঝলাম ইনি হোমরা-চোমরা অফিসার একজন। তখন হোমরা-চোমরা পুলিস অফিসারও রাত্রে রোঁদ দিত। সাহেব ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেবেন বাঁড়ুয্যেকে কি বললেন তা বুঝতে পারলাম না। ছেলেটা হাত জোড় করে, থর থর করে কাঁপছিল কেবল। তার দুগাল বেয়ে ঝরে পড়ছিল চোখের জল। হঠাৎ সাহেব ছেলেটার দিকে চেয়ে সাহেবী বাংলায় জিগ্যেস করলেন—'কে টুমি, কোঠায় ঠাক!'

ছেলেটার কেমন যেন মনে হল ত্রাণকর্তা এসেছেন। দলের নেতা ঘন্টি ঘোষের বারণ ছিল—জান যায় সো ভি আচ্ছা, সত্যি কথা কখনও বলবি না। ছেলেটার কিন্তু মনে হল ত্রাণকর্তার কাছে মিছে কথা বলা চলবে না। অকপটে সব বলে ফেলল সে কাঁদতে কাঁদতে। বলল—মা বাবা কেউ নেই হুজুর, খেতে পাই না, তাই চুরি করি।

"কাজ করিবে?" জিজ্ঞেস করলেন সাহেব।

ছেলেটা বলল—"করব, যে কোন কাজ করব, আমাকে বাঁচান।"

"কাম অন, দেন।"

সাহেবের মোটর সাইকেলে একটা সাইড কার ছিল। তাতেই চড়ে বসল ছেলেটা। নিয়ে গেলেন আপিসে। সেখানে একজন বাঙালী সাহেব ছিলেন। মিস্টার ডাটা। তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন ছেলেটাকে। যা বললেন—তার মর্মার্থ বোধহয়—এ কাজ করতে চায়। একে কোনও কাজ দিন। ও চোর, ভালো হতে চায়। ওর ভার নিন। রিবিল্‌ড্ হিম।

মিস্টার ডাটা হাত কচলাতে লাগলেন এই অনুগ্রহের জন্য।

সেকালে সাহেবদের সামনে সবাই হাত কচলাতো।

'ইয়েস সার ইয়েস সার ইয়েস সার—'

কথাগুলো এখনও শুনতে পাচ্ছি যেন—দেখতে পাচ্ছি ডাটার কৃতজ্ঞতা-গদগদ মুখচ্ছবি। আমিই যে সেই ছেলেটা তা হয়তো বুঝতে পেরেছেন বুদ্ধিমান পাঠকরা। সোজাসুজি সে কথাটা গোড়াতেই কেন বলিনি? কায়দা মশাই। কায়দা করলাম একটু। অবশ্যই নকল কায়দা, আমাদের কোন্ কায়দাটাই বা আসল, সব নকল। আমাদের মেয়েগুলো আজকাল বর্মিদের কায়দায় লুঙ্গি পরছে দেখেননি? সেই রকম আর কি। আসল কথাটা হচ্ছে আমার সেই অধঃপতিত অবস্থায় দেবেন বাঁড়ুয্যে আমায় দেখেছিল। শুধু দেখেনি। বারবার আমার খোঁজ রেখেছিল। হঠাৎ যখন ভাগ্যভানুমতী আচমকা খেল দেখিয়ে আমাকে লাখপতি বানিয়ে দিলে, আমার ব্যবসা হল, আপিস হল তখন হঠাৎ দেবেন বাঁড়ুয্যে আমার আপিসে এসে দর্শন দিলেন একদিন। তখন তিনি রিটায়ার করেছেন, তাঁর টেবো গাল তুবড়ে গেছে, মাথায় টাক, ভুরু পাকা। আমি চিনতে পারিনি প্রথমে। পরিচয় পেতেই উঠে গিয়ে প্রণাম করলাম। বললেন—অর্থকষ্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একশ টাকা দিয়ে দিলাম! তারপর থেকে প্রায়ই মাঝে মাঝে আসতেন, আমার প্রণাম নগদ একশ টাকা নিয়ে যেতেন। এমনি চলছিল, হঠাৎ একদিন আমার কৃতজ্ঞতায় চিড় খেয়ে গেল। শুনলাম আমার অফিসের এক কেরানীকে তিনি বলেছেন—আমাকে টাকা কি সাধে দেয়, না দিলে আমি হাটে ওর হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারি। আর সে হাঁড়ি ভেঙে দিলে তোমরা নাকে কাপড় দিয়ে ছুটে পালাবে। কেমন করে শুনলাম? আমার ওই কেরানীটি বাঙালী যে। সেই একদিন কথাটা চুপিচুপি বললে এসে আমাকে আমার মনোরঞ্জন করবে বলে! আমার ফিকে-নজরকে নেক-নজর করবার আশায়। সঙ্গে সঙ্গে দূর করে দিয়েছিলাম তাকে। আর তারপর যেদিন বাঁড়ুয্যে এসেছিল তাকে প্রণামও করিনি, টাকাও দিইনি। সেই রাগে এখনও ফুলছে লোকটা। রেলে পা কাটা গিয়েছিল এ খবরটাও শুনেছিলাম। কিন্তু আর সে আসেনি আমিও খোঁজ করিনি। এতদিন পরে হঠাৎ এল—আশ্চর্য! এল, চলেও গেল। রেখে গেল কিন্তু সুরমাকে।

মিস্টার ডাটা, যাঁর আসল নাম পরাণ দত্ত— তিনি আমার কাজের ব্যবস্থা করেছিলেন একটা। করতে হয়েছিল। বড় সাহেবের হুকুম তামিল না করে কি উপায় ছিল তাঁর? তাঁর ক্লাবের ইয়ার আকাশ-ছোঁয়া বড়লোক, নামকরা জুয়াড়ি ও. সি. গোহোর হাতে সমর্পণ করেছিলেন আমাকে। ভদ্রলোকের পুরো নামটা এখনও জানি না। সুরমা তাঁরই বিবাহিতা ধর্মপত্নী, সুরমার ফাই-ফরমাস খাটবার জন্যে বাহাল হয়েছিলাম আমি।

টিউ—টিউ—টিউ—

আঃ আবার হলদে পাখিটা এসে জ্বালাতন শুরু করল। না—না—না আমি তোমার সোনার ছটায় মুগ্ধ হতে চাই না এখন। আমি এখন সুরমার কথা বলব।

টিউ-—টিউ—

লিয়াকৎ—লিয়াকৎ—গুলি কর তো পাখিটাকে।

কি আশ্চর্য আবার লিয়াকৎকে ডাকছি—বারবার ভুলে যাই লিয়াকৎ মরে গেছে! কি হল আমার? পাখিটা—কই আর ডাকছে না তো। লিয়াকতের নাম শুনেই বোধহয় ভয়ে

পালিয়েছে। হ্যাঁ সুরমার কথা বলছিলুম। সুরমারা কার্পেটের সোজা দিকে থাকে। বড়লোকের গৃহিণী। সাজে সজ্জায় অনুপম। হাতভরতি সোনার চুড়ি, মুখ ভরতি হাসি, গলা-ভরতি হার আর পাউডার। ঐশ্বর্যের রূপ উথলে উঠছে তাঁর চারিদিকে। সে রূপে চোখ ধাঁধিয়ে যায় ইতরজনের। তাঁর মোটরের বাহার, শফারের ইউনিফর্ম, হীরেমন পাখির মিষ্টি বুলি, অ্যালসেশিয়ানের চীৎকার, তাঁর প্রাসাদের মতো বাড়ি, তাঁর স্বামী-গর্ব, পুত্রগর্ব, কন্যা-গর্ব, জামাতা-গর্ব। হ্যাঁ, গর্ব করবার মতো অনেক কিছুই ছিল তাঁর। কিন্তু তবু অন্তরের নির্জনতায় তিনি ছিলেন অসহায়া ভিখারিনী। একথা বুঝেছিলাম অনেকদিন পরে যখন তিনি মহাপুরুষের কাছে গিয়েছিলেন। আমি পাশের ঘর থেকে লুকিয়ে শুনেছিলাম কি বলছেন তিনি। তাঁর কাছে বেশী দিন থাকতে পারিনি। চুরি করে গোলাপ-জলে ভিজোনো কিশমিশ খেতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম, তারপরই দূর করে দিয়েছিলেন তিনি আমাকে। সঙ্গতভাবেই দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মতো হতভাগ্য একটা ছোঁড়াকে কোলে করে যদি আদর করতেন তার বদলে—তাহলে—তাহলে—তাহলে—হা-হা-হা—তাহলে পৃথিবী উলটে যেত—ওটা নিয়ম নয়—নিয়ম নয়। পৃথিবী নিয়মমাফিক চলে। মহাপুরুষও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব কথা পরে হবে। ড্যাম ইট, পরের কথা আগে মনে আসছে কেন। এ দেখছি আর এক ধরনের হলদে পাখি। পাশের ঘর থেকে আড়ি পেতে যা শুনলাম তাতে বুঝলাম—সুরমা মহাপুরুষের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। মহাপুরুষের সুখ্যাতি শুনে এসেছেন তাঁর কাছে 'মন্তর' নিতে। স্বপ্নে তাঁর মৃতা জননী তাঁকে নাকি বলেছেন—তুই ওঁর কাছ থেকে 'মন্তর' নিলে শান্তি পাবি। শান্তির আশায় এসেছিলেন তিনি। মন্তরের নৌকোয় চড়ে অশান্তির অকূল সমুদ্র পার হয়ে শান্তির কূলে পৌঁছবেন বলে। কিন্তু মহাপুরুষ রাজি হলেন না। বললেন—আমি সামান্য লোক। কাউকে মন্তর দেবার স্পর্ধাও নেই, ক্ষমতাও নেই। তুমি ভগবানকে ডাক আর ওই জিনিসগুলো নিয়ে যাও। একগাদা জিনিস এনেছিল সুরমা। গরদের কাপড়, গরদের চাদর, রুপোর বাসন, নানারকম মিষ্টি, একগাদা ফল, বেশ বড় একটা কার্পেট, সব ফিরিয়ে দিলেন মহাপুরুষ। চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেল সুরমা। আড়াল থেকে সুরমার কথা শুনে মনে হয়েছিল সত্যি, ও হতভাগিনী। বড় অসহায়। পায়ের তলায় শক্ত মাটি নেই, মাথার উপর উদার আকাশ নেই, আশেপাশে আপনজন কেউ নেই। একটা অতলস্পর্শী গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে সে মাঝে মাঝে পা বাড়িয়ে দেখেছে, পায়ের তলার মাটি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না। মুখ তুলে চাইছে আকাশ নেই, খালি অন্ধকার। সব আছে, তবু যেন কিছু নেই, একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা, একটা বিরাট শূন্যতা, একটা করাল ইঙ্গিত যেন ঘিরে আছে তাকে। মনের ভিতর থেকে কেবল তাকে বলছে—সত্যি তুই বড্ড গরীব। তোর দিকে কেউ ফিরে দেখে না, দেখে শুধু তোর ঐশ্বর্যটা। সবাই তোর কাছে আসে স্বার্থের জন্য, তোর জন্য কেউ আসে না। তোকে কেউ চেনে না, চিনতে চায়ও না। এই অস্বিস্তকর অনুভূতির কথা সে বলতে পারে না কাউকে। মুখে ফুটিয়ে রাখতে হয় একটা হাসি-হাসি সপ্রতিভতা, মেকী সুখী-সুখী ভাব। মাঝে মাঝে মনে পড়ে শাশুড়ীর ঠাকুর-ঘরটাকে। সে ঠাকুরঘর এখন নেই। ধর্মের আবহাওয়াই নেই বাড়িতে। উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম বিলাসে ঝাঁপাই ঝুড়ছে সবাই কামনারে খরস্রোতে। বাড়িতে রাজনীতির চর্চা

হয়, শেয়ার মার্কেটের চর্চা হয়, সিনেমার চর্চা হয়, দিল্লীর লোকসভা নিয়ে মাথা ঘামায় কেউ কেউ। দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার এ নিয়েও দুশ্চিন্তা করে অনেকে। আন্তরিকতাহীন মেকী দুশ্চিন্তা সব। বাড়িতে বড় বড় সাহিত্যিক চিত্রকর মাঝে মাঝে আসেন নিমন্ত্রিত হয়ে কারও জন্মদিনে বা বিবাহ-উৎসবে। তাদের ঘিরে একটা অন্তঃসারশূন্য ভদ্রতার আড়ম্বরও ঘনিয়ে ওঠে দু'এক ঘণ্টার জন্য। কিন্তু সব মেকী, সব অভিনয়। সাহিত্যের কেউ ধার ধারে না, ছবিরও নয়। ওদের নিমন্ত্রণ করতে হয় নিজেদের জৌলুস বাড়াবার জন্যে। এ সব তবু আছে, নেই কেবল ধর্মের আবহাওয়া। ধর্মকে সবাই মনে করে কুসংস্কার। বাড়িতে ঠাকুরঘর নেই। তাঁর সেকেলে শাশুড়ি ঠাকুরঘরে ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতেন। নীরবে হয়তো সেই কথাই বলতেন যা আর কাউকে বলা যায় না। কিন্তু সুরমা মনের কথা কি করে বলবে? সোফায় ঠেস দিয়ে মাঝে মাঝে সে চোখ বুজে নিরাকার ভগবানের একটা সাকার রূপ মনে মনে খাড়া করবার চেষ্টা করেছে। চেষ্টা সফল হয়নি। ভগবানের কথা মনে জাগেনি—জেগেছে মাতাল স্বামীর কথা, আমেরিকাবাসী ছেলের কথা, যে ছেলে এদেশে আর ফিরবে না, মনে পড়েছে বিধবা মেয়ের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা, আর তার নানা জাতের বয় ফ্রেন্ডাদের চেহারাগুলো। ভগবানের ছবি ফুটে ওঠেনি। ঠাকুরঘরে শাশুড়ির মতো উপুড় হয়ে পড়ে থাকলে হয়তো ফুটতো। কিন্তু ঠাকুরঘর নেই বাড়িতে। ড্রেসিংরুম আছে, ড্রইংরুম আছে, বক্সরুম আছে, স্লিপিং রুম আছে, কুকুরের ঘর আছে, শফারের ঘর আছে, মোটরের ঘর আছে, চাকরদের ঘর আছে, নেই কেবল ঠাকুরঘর। একটা ঠাকুরঘরও হোক এ কথা বলবারও সাহস নেই সুরমার। আধুনিকতার হাই-হিল জুতো পায়ে দিয়ে পিঠকাটা ব্লাউজ পরে স্বামীর ল্যাংবোট হয়ে সে হোটেলে গিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েছে। ঠাকুর ঘর হোক এ দাবি করবার মুখ নেই তার।

"আপনি মশাই সুরমার কথা অত সাতকাহন করে বলছেন ব্যাপার কি! তার সম্বন্ধে দুর্বলতা হয়েছিল না কি কিছু—"

'কে আপনি? সামনে আসুন। আসবেন না? বেশ, তবে শুনেই যান জবাবটা। যদিও আমার জীবনে বহু সুষমা, সুশীলা, সুদীপা, সুলেখা, সুতপা এসেছে গেছে—বস্তুত আমার সমস্ত জীবনটাই যদিও সু-স্টোর হয়ে গেছে একটা—তবু আমি ওই সুরমাকে ভালবেসে ছিলুম। ও যদিও আমার মায়ের বয়সী ছিল, কিন্তু তবু ওই মোটা প্রৌঢ়াকে ঘিরে স্বপ্ন রচনা করেছিলাম আমি। ও যদি আমাকে কোলে বসিয়ে একটা চুমু খেত তাহলে আমি স্বর্গ হাতে পেতুম—হ্যাঁ স্বর্গ, হেভেন, প্যারাডাইস। আপনি ফ্রয়েড পড়েছেন না কি। তাহলে নিশ্চয় মুচকি হেসেই সবজান্তার মতো মাথা নাড়ছেন—প্লীজ স্টপ ইট্। বিদেশীদের আঁস্তাকুড়ে এঁটো-পাতা-চেটে-খাওয়া নেড়ী কুত্তা আপনারা, আপনাদের মুরোদ আমি জানি। আপনারা মুখস্থ-করা বিদ্যে ফেরি করে বেড়ান চাকরির লোভে, পুরস্কারের লোভে তেল দিয়ে বেড়ান হোমরাচোমরা গাড়োলদের পায়ে—ইউ আর এন অ্যারান্ট ফুল। গেট আউট। যোগীন্দর সিং গেট বন্ধ কর দেও।

ও গীটার এসেছ? কি এনেছ? কমলালেবুর রস? হ্যাঁ খাব খাব। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

"মুখ অমন করেছেন কেন বাবা। খুব টক না কি!"

"জোঁদা। শোন, শোন এসেই চলে যাও কেন। একটা কথা বল দিকি? সুরমা নামে কোন মহিলার সঙ্গে তোমাদের কোনও সম্পর্ক ছিল কি? ছিল না? বেশ মোটাসোটা গোলগাল, ফরসা, থেবড়ি থুবড়ি এক মুখ হাসি? চেনো না তাকে? যাক, তাহলে হারিয়ে গেল সে। তোমার সঙ্গে তার কোথায় যেন একটু মিল আছে মনে হয়েছিল—মানে—যাক্ গে—।"

ঝনাৎ করে পিঠে চাবির গোছাটা ফেলে চলে গেল গীটার।

ওরা কেউ থাকতে চায় না আমার কাছে। আমি পাগল তো। যদি কামড়েটামড়ে দিই! দোটানায় পড়েছে বেচারী—একদিকে কর্তব্য, অন্যদিকে ভয়।

কিন্তু মশাই একটা সত্যি কথা বিশ্বাস করবেন? আমি পাগল নই। ন্যাংটো হয়ে ধেই ধেই করে নাচিও না, অকারণে হিহি করে হাসিও না, হুহু করে কাঁদিও না। আমি খাই, ঘুমোই, লিখি, পড়ি। মুশকিল হয়েছে কি জানেন, ওই নোনা-ধরা দেওয়ালগুলো আমি বরদাস্ত করতে পারি না। ছাতটাতেও নোনা ধরেছে, মাঝে মাঝে চাপড়া ভেঙে পড়ছে। অথচ আমার মার্বেলের তৈরি ঘর ছিল। সুজন বলেছে আমি সেই ঘরেই বসে আছি। তার মানে—হি ইজ এ লায়ার। মার্বেলের দেওয়ালে কখনও নোনা লাগে? ও আমাকে পাগল বানাতে চায়। কেন চায় এ রহস্য কিন্তু আমি ভেদ করতে পারিনি। ঔরংজেব শাজাহানকে বন্দী করেছিল রাজ্যলোভে। দারা, সুজা, মুরাদ তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু সুজনের তো কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ওই তো একমেবাদ্বিতিয়ম্। ও হো—বুঝতে পেরেছি। না, না, ব্যাপারটা অতো সোজা নয়। তুমি ইডিয়ট্ তুমি শয়তান তাই ও কথা ভাবছ। তোমার মনে হচ্ছে—সুজন তোমার মতো কুকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে চারদিকে আর সেটা পাছে তুমি জানতে পার তাই তোমাকে বন্দী করে রেখেছে পাগল সাজিয়ে। অ্যাব্সার্ড। সুজন যে সত্যই সুজন এর প্রমাণ কি আমি পাইনি? আমার মদের বোতল থেকে একদিনও মদ চুরি যায়নি, আমার সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেটও নেয়নি কোনদিন, যে সব পরী হুরী অপ্সরারা আমার মনোরঞ্জন করতে মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে ধাওয়া করত—তাদের মধ্যে দু'একজন ওকে বাগাতে চেষ্টা করেছিল আমি জানি, কিন্তু পারেনি। সুজন দুধের চেয়েও সাদা, ইস্পাতের চেয়েও কঠিন, সুজন a man of principles—সেকেলের সিক্কা মোহর—ওর মধ্যে ভেজাল নেই। তাহলে—ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? সুজন কুজন হল কেন? আলমগিরী পদ্ধতিতে বাপকে বন্দী করে ফেলল কেন হঠাৎ। নিশ্চয়ই ভিতরে একটা ব্যাপার আছে কিছু। যাক গে—যা বোঝা যাচ্ছে না তা বুঝতেও চাই না। বদ্ধ দুয়ারের সামনে মাথা কুটে মাথাটাই রক্তাক্ত হবে কেবল। কিন্তু—কুয়াশা হয়েছে কি চারধারে! সব যে ঢেকে যাচ্ছে। ওই আমেরিকান পিলগুলো আমার দৃষ্টির দরজায় খিল এঁটে দিচ্ছে না কি। চমকে উঠলাম হঠাৎ। গীটার এল আবার।

"আমার বাবা এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। নিয়ে আসব?"

"আসবে না কেন। এই জবাবদিহিটা আগে দিয়ে তবে নিয়ে এস তাঁকে।"

গীটারের চোখে কেবল একটা নির্বাক্ বেদনা ফুটে উঠল। কিচ্ছু না বলে চলে গেল সে। মনে হচ্ছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছি। কিন্তু বললাম কি করে? আমার চারদিকেই তো ফাঁস। বেফাঁস হওয়ার তো উপায়ই রাখেনি ওরা। কিন্তু বেয়াই তো আসছেন না। গীটার এসেছিল কি

সত্যি? না ওটা আমার কল্পনা। সত্যি, বড্ড কল্পনাবাজ হয়েছি আজকাল। আবার এ কি! আবার কুয়াশা? ও বাবা—এ যে একেবারে নিবিড় নিশ্ছিদ্র।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য, মনে হচ্ছে ঘুমোইনি। ঘুমের মধ্যে হাজির হল সেই মার্কিন মেয়েটা যে একটা Poodle নিয়ে নানারকম কাণ্ডকারখানা করে শেষকালে একটা বই লিখে ফেলেছে। খুব কাটতি সে বইয়ের। বইটা মাঝে মাঝে পড়ি, কিন্তু শেষ করতে পারি না—যেই মনে হয় উঃ কি অসহ্য ন্যাকামি, অমনি ছুঁড়ে ফেলে দি। হঠাৎ দেখি আবার সেটা টেবিলের উপর এসে হাজির হয়েছে। গীটার কখন তুলে রেখে গেছে—বুঝতে পারিনি। ফলে আবার খানিকটা পড়তে হয়। এবং তার ফলে অদ্য ওই মার্কিন মহিলার আমার ঘুমের মধ্যে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। আর কি আশ্চর্য, বাংলা ভাষায়, পরিষ্কার কলকাতিয়া ভাষায় এলুম গেলুম করে আলাপ জুড়ে দিলেন আমার সঙ্গে।

বললেন—"আপনি আমার বইটা বারবার পড়ছেন তাই আপনার কাছে এলুম। আমার যোশী কিন্তু ভারি মিষ্টি—সত্যি যদি দেখতেন তাকে—"

আমি অবাক্ হয়ে দেখছিলুম মেয়েটাকে। লম্বা মুখ, ঘাড়-ছাঁটা, হাসলে নাকের দু'পাশে বিশ্রী খাঁজ পড়ে, দাঁতগুলি সম্ভবত নকল, কটা চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে খোশামোদ করছে মনে হল। দৃষ্টি দিয়ে খোশামোদ করবার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখলাম মেয়েটির। কত রকম সুরেই যে চাইছিল আমার দিকে।

"কুকুর আপনি নিশ্চয় ভালবাসেন—"

বললাম—"আমি গাই ভালবাসি, কুকুর আমার তেমন প্রিয় নয়। ওরা খালি ল্যাজ নাড়ে আর কিছু করে না। তোমরা ওদের চুম খাও। আমরা পারি না। চোরদের হাতে খাবার খেয়ে চোরদের বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছে এ খবরও জানি। মনিবকে কামড়ে তার জলাতঙ্ক রোগ ধরিয়ে দিয়েছে এ-ও শুনেছি—"

'উ হু হু হু হু—'

চমকে উঠেছিলাম, পরে দেখলাম হাসছে।

"মিস্টার চ্যাটার্জি আপনি যা বলছেন আমার যোশী তা কখনও করবে না। তাছাড়া আপনি গাই ভালবাসেন বলছেন, গাইও তো গুঁতিয়ে দিতে পারে, কিংবা গাই বাঁজাও হতে পারে, কিংবা—"

হঠাৎ টেম্পার লুজ করে চেঁচিয়ে উঠলাম—শাট্ আপ। লিয়াকৎ, লিয়াকৎ—

কি আশ্চর্য লিয়াকৎ এসে হাজির হল। সেই গালের উপর কাটা-দাগ, হাতে পিস্তল, চিবুকে কাঁচা-পাকা নূর। মেমসাহেব দেখি অন্তর্ধান করেছে।

লিয়াকৎ কি খবর তোমার?

সেলাম করে বললে—খবর ভালোই হুজুর। আমি আপনার গোলাম তখনও ছিলাম, এখনও আছি। আপনার টাকায় আমার বালবাচ্চারা আরামে আছে, আপনাকে দোয়া করছে। ও হ্যাঁ, আর একটা মজার খবর আছে। সেই দারোগাটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই বেকুব

দারোগাটার সঙ্গে, যাকে এক লাখ টাকার লোভ দেখিয়ে কাবু করতে না পেরে শেষে গুলি করতে হয়েছিল, যে জন্যে আমার ফাঁসি হয়ে গেল হুজুর, সেই বোকা দারোগাটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল হঠাৎ একদিন। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তার খোপড়ি আমি নিজে হাতে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, এখন দেখলাম, খোপড়ি ঠিক আছে। এখন দাগটি পর্যন্ত নেই। আগেকার মতোই নিখুঁত। জিজ্ঞেস করলাম—দারোগা সাহেব খুলিটি এমন চমৎকার করে কোথায় সারালে? দারোগা হেসে কি বলল জানেন? বলল—আমার মাথার খুলি তোমার গুলিতে ভাঙেনি। যেটা ভেঙে ছিল সেটা আমার মাথার খুলি নয়, সেটা একটা নশ্বর মানুষের মাথার খুলি। আমার মাথার খুলিকে যিনি বরাবর রক্ষা করছেন তিনি আমার বুকের ভিতর আছেন। দেখবে তাঁকে? বললাম, দেখব। তিনি বুক চিরে দেখালেন। দেখলাম ভিতরে হীরের মতো দপদপ করে কি একটা যেন জ্বলছে। জিজ্ঞেস করলাম কি ওটা? উনি বললেন—আমার ইজ্জত। ওরই হুকুমে আমার ছেলেমেয়ে পরিবারকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে পেরেছি। তোমার ব্ল্যাকমার্কেটিয়াব মনিবের দেওয়া লাখ টাকা নিলে ওরা সুখে থাকত, কিন্তু আমার ইজ্জৎ চলে যেত, আর আমার আসল মাথার নিখুঁত খুলিটাও খতম হয়ে যেত। লিয়াকৎ সেলাম করে চলে গেল। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। মনে হল লিয়াকৎ যেন এক জোড়া টাইট জুতো আমায় পরিয়ে দিয়ে গেল। আর সে জুতোর সুকতলায় একটা কাঁটা খচখচ করছে যেন। দারোগার ছেলেমেয়েরা অকূল পাথারে ভাসছে?

এখনও ভেসে থাকতে পেরেছে কি? না, ডুবে গেছে? সুজন সুজন, সুজন। টং করে একটা শব্দ হল। সুজন চেঁচিয়ে 'যাচ্ছি' বলে সাড়া দেয় না, টং করে ঘণ্টা বাজিয়ে জানায় শুনতে পেয়েছি ডাক। একটু অপেক্ষা করতে হবে। ও হাতের কাজটা সেরে তারপর আসবে। ম্যান অব প্রিন্সিপল। তাড়াতাড়ি এলোপাতাড়ি কিছু করে না। অপেক্ষা করতে হবে এখন। যাব্ আসছেন বাবাজীবন। ঠিক মায়ের মতো মুখ হয়েছে।

"সুজন যে দারোগাকে খুন করে লিয়াকৎ ফাঁসি গিয়েছিল তার নামটা তোমার মনে আছে কি? মনে নেই? তাহলে তো মুশকিল হল। আমারও নেই। নামটা খুঁজে বার করা অসম্ভব হবে না বলছ? তাহলে তাই কর। আর শোন, একটু দাঁড়াও না বাপু! তার নামটা আমার তত দরকার নেই—যে মরে গেছে তার নাম ক'জনই বা দরকারী মনে করে, করা উচিতও নয়—কিন্তু তার নামটা দরকার তার পরিবারবর্গের খোঁজ নেওয়ার জন্য। তারা না কি অকূলে ভাসছে। সে যদি লাখ টাকা নিত তাহলে ভাসত না। লিয়াকৎও মরত না। কিন্তু he was an ইজ্জৎ-mad fool। সব গোলমাল করে দিয়ে গেল। তছনছ। কিন্তু শোন বাবা—অকূলে ভাসার মর্মটা কি তা আমি বুঝি। আমার বাবা ভিখারী ছিল—a musician mendicant, আর আমার মা ছিল ঝি রাঁধুনী and what not—দজ্জাল হিংসুটে, মারকুণ্ডা—কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুণ্ডাদের হাতেই মারা পড়ল—কেন জান—she had a robust bumptious youth, তাছাড়া বেওয়ারিশ একটা বিধবাকে পবিত্র বঙ্গভূমির গুণ্ডারা ছাড়বে কেন? ছাড়েনি। আরে শোন শোন চলে যাচ্ছ কেন। আমার মা যখন অন্ধকারে লোপাট হয়ে গেলেন তখন আমি অকূল পড়ে গেলাম। এ দেশের সতী সাবিত্রী দময়ন্তী সীতারা আমাকে কোলে তুলে নিলে না। আমাদের পাশের বাড়ির, যে মহিলাটিকে মাসীমা বলে ডাকতুম অনেক ইতস্তত করার পর

তাঁর বারান্দায় গিয়ে উঠেছিলুম। তিনি দড়াম করে কপাট বন্ধ করে দিলেন মুখের উপর। আমাকে আশ্রয় কে দিলে জান? ঘন্‌টি ঘোষ, ঘন্‌টি ঘোষ দি গ্রেট। সে আমাকে শুধু খেতে পরতে দিলে না, সে আমাকে পকেট কাটতে শেখালে, চুরি করতে শেখালে—আমি—। আরে সুজন চলে গেছে দেখছি। সুজন—সুজন—সুজন—। আবার টং করে ঘণ্টা পড়ল। ছোকরা বাজে কথা একদম বরদাস্ত করতে পারে না। সব কথা টু দি পয়েন্ট বলতে হবে। কিন্তু আমি যে নিজেকে থামাতে পারি না। মনের কপাট খোলা, কথাগুলো গলগল করে বেরুচ্ছে ক্রমাগত। থামাতে পাচ্ছি না। সুজন এসেছ? শোন কাজের কথাটা আগে বলে ফেলি। ওই দারোগার পরিবারবর্গ অকূলে পড়েছে—আমি যেমন একদিন পড়েছিলাম—ওদের কূলে টেনে তুলতে হবে। ওই দারোগাকে আমি যে এক লাখ টাকা দিতে চেয়েছিলাম সেটা ওর পরিবারবর্গকে দাও। চেক বুকটা নিয়ে এস, আমি তোমার নামেই এক লাখ টাকার চেক লিখে দিচ্ছি একটা। আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কত এখন?

সুজন বলল—যা ছিল তাই আছে—আমি ঠিক জানি না—

বললাম—তোমার হাতে যখন ব্যবসা তুলে দি তখন পঁচাত্তর লাখ ছিল—

"তাহলে তাই আছে—"

"তুমি কিছু খরচ কর নি? তোমার আমার নামে জয়েণ্ট অ্যাকাউন্ট ছিল—"

"আমি কিছু খরচ করিনি।"

"ব্যবসা থেকে আর আয় হয়নি?"

"আমি ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছি। ও ব্যবসা চলাবার সামর্থ্য আমার নেই।"

"সংসার চালাচ্ছ কি করে তাহলে—"

"প্রফেসারি করি—"

"প্রফেসারি কর? প্রফেসারিতে কপয়সা আয় হয় তোমার? তাই বুঝি নোনা-ধরা বাড়িটায় টেনে এনেছ সব্বাইকে। জগদম্বা-মন্দির বিক্রি করে দিয়েছ না কি—বিক্রি করে দিয়েছ না কি—বল, বল শিগ্‌গির বিক্রি করে দিয়েছ না কি—"

"বাড়ি যে বিক্রি করিনি তা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন—"

"না পাচ্ছি না। আমি দেখছি নোনা-ধরা দেওয়াল, ছাদ থেকে চুন-বালির চাপড়া খসে খসে পড়ছে—সেই শ্বেত-পাথরের বাড়ি—সেই জগদম্বা-মন্দির আমি দেখতে পাচ্ছি না—সেটা তুমি বেচে দিয়েছ, তুমি জোচ্চর তুমি আরাংজেব—তুমি—"

সুজন ভয় পেয়ে গেল। একটা বিপন্নভাব ফুটে উঠল মুখে। ছুটে চলে গেল। তার পরই হ্যালো—হ্যালো—। ফোন করছে। আর গীটার—হঠাৎ একটা ছবি মনে পড়ে গেল। একবার আমার ঘরে চড়ুইপাখি আটকা পড়ে গিয়েছিল একটা—এ দেওয়াল ও দেওয়াল করে ছট্‌ফট্‌ করছিল পাখিটা। এখন গীটারের সেই অবস্থা। যা দেখছি টুকে ফেলছি তাড়াতাড়ি। এঃ চুন-বালির চাপড়া খসে পড়ল আবার লেখার উপর। ইস্ সব গোলমাল হয়ে গেল। সব ঝাপসা। ঝাপসা—কিন্তু কুয়াশা নয়—অদ্ভুত ধরনের ঝাপসা— মানে—। ওই গুঁফো ডাক্তারটাকে ফোন করছে। সে এসে এইবার বোধহয় ইলেকট্রিক শক দেবে—কি করি, পালাবার উপায় নেই। প্রথমে অজ্ঞান করবে, মুখের ভিতর 'গ্যাগ্' ঢোকাবে, তারপর দু'দিকের রগে ইলেকট্রিক

বোতাম বসিয়ে 'শক' দেবে। আমার সমস্ত দেহে একটা প্রচণ্ড আক্ষেপ হতে থাকবে। তারপর...অজ্ঞান...তারপর?...কি হবে জানি না। ঔরংজেব শাজাহানকে ইলেকট্রিক শক দিয়েছিল কি? কে জানে! না দেয়নি। তখন তো ইলেকট্রিসিটি ছিল না।

ইলেকট্রিক শক দিয়েছিল। ভূমিকম্পের মতো ব্যাপার একটা। সাংঘাতিক ব্যাপার নিশ্চয়ই। আমি কিন্তু টের পাইনি। ওইখানেই বিজ্ঞানের বাহাদুরী। সে সাংঘাতিক সাংঘাতিক কাণ্ড করে কিন্তু টের পায় না কেউ। বিহারের ভূমিকম্প আমি দেখেছি। দুদ্দাড় করে তিন মিনিটের মধ্যে কত লোকের বড় বড় বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ফেটে গেল কত জায়গা। আমার ভিতরও ও রকম কিছু হয়েছে একটা না কি? হয়েছে। আভাস পাচ্ছি। আমার ভিতরও তো কত রকম কি ছিল। কত বড় বড় অট্টালিকা—অট্টালিকা? হ্যাঁ অট্টালিকাই ছিল। প্রত্যেক মানুষই তো এক একটা অট্টালিকা। কত মানুষের স্মৃতিভরা আমার জীবন—বিরাট একটা নগর তো। সব ভেঙেচুরে গেছে না কি? না, ওই তো জগদম্বা দাঁড়িয়ে ঘুঁটে দিচ্ছে। ভূমিকম্প ওর তো কিছু করতে পারেনি। মহাপ্রলয়ও ওর কিছু করতে পারবে না। কিন্তু জগদম্বা, তুমি কি খালি ঘুঁটেই ঠুকে যাবে? আচ্ছা, তোমার নামে যে জগদম্বা-মন্দির বানিয়েছিলাম তাতে কি তুমি একবারও এসেছ? উত্তর দিচ্ছে না, পিছন ফিরে ঘুঁটেই ঠুকে যাচ্ছে। ওই ওর স্বভাব। জগদম্বা, মাছের তেল-কাঁটা দিয়ে তুমি যে রকম পুঁইশাকের চচ্চড়ি করতে সে রকম চচ্চড়ি আর খেতে পাই না। গীটার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না—বিলিতী বান্না নানারকম জানে—। জগদম্বা চলে গেল। ওটা কিসের শব্দ? মনে হচ্ছে কে যেন চিৎকার করছে। ওহো, সেই মেওয়াওলাটা নয় তো! বিহারের ভূমিকম্পে একটা মেওয়াওলা দোকান-সুদ্ধ চাপা পড়ে গিয়েছিল। চাপা পড়ে গিয়েছিল কিন্তু মরেনি। তার মস্ত বড় ফলের দোকান আর একটা রুলের কল ঢাকা পড়ে গিয়েছিল দু'পাশের বড় বড় বাড়ি পড়ে, মেওয়াওলাটা মরেনি। তাকে আমরা পনেরো দিন পরে উদ্ধার করেছিলাম। চিৎকার শুনে উদ্ধার করেছিলাম। সে দিনরাত চেঁচাত। দিনের বেলা তার চিৎকার শুনতে পাইনি, রাত্রে পেয়েছিলাম হঠাৎ একদিন। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে ভূগর্ভ থেকে কে যেন চেঁচাচ্ছে—বাবু হো, বাবু হো—। ডেব্রি সরিয়ে বার করলাম তাকে। বেঁটে মোটা তাগড়া কাবুলী একটা। এক দোকান মেওয়া পনেরো দিন ধরে খেয়ে বেশ মোটা হয়েছে। কিন্তু সে তো ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল সে চিৎকার করবে কেন। ওই আবার! মেয়েমানুষের গলা মনে হচ্ছে। সীতা নয় তো? সীতার পাতাল-প্রবেশও হয়তো ভূমিকম্পের ব্যাপার। সীতার অপমানে বসুন্ধরা কেঁপে উঠেছিল, ফেটে গিয়েছিল, সেই ফাটলে ঢুকে গিয়েছিল সীতা। সেইটেই কবি-কল্পনায় সীতার পাতাল-প্রবেশ-কাব্য হয়েছে। বিহারের ভূমিকম্পে আমি জীবন্ত লোককে ফাটলে ঢুকে যেতে দেখেছি। তাদের আর্তনাদও শুনেছি। ফাটল খুঁড়ে বেরও করেছি দু'এক-জনকে। সীতা কি তাহলে বেরিয়ে আসতে চাইছে? কেন? এই লম্পট-লম্পটীদের দেশে সীতা বেরিয়ে আসতে চাইছে কেন! তাছাড়া আমার মতো লম্পট-শিরোমণির কানে সীতার ডাক পৌঁছবেই বা কেন? আমার কানে পৌঁছবে লারেলাপ্পা, সীতার আর্তনাদ শোনবার কান কি আমার আছে এখনও? বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি নেপাল

চাটুজ্যে—যার ডাক নাম ছিল ন্যাপলা—যাকে আদর করে কেউ কেউ নিপুও বলত—আমি জানি সে কি মাল। এ-ও জানি এই মালকেই বেসামাল হয়ে সেলাম করেছে দেশের অনেক লেবেল-দেওয়া জ্ঞানী-গুণী-সাহিত্যিক-শিল্পীরা দুটো পয়সার লোভে। করেনি কেবল ওই দারোগাটা, করেননি যামিনি ঘোষাল আর করেননি মহাপুরুষ। তিনি যেই দেখলেন আমি একটা উটকো মেয়েকে এনে দোতলায় তাঁর লাইব্রেরী ঘরে বসিয়েছি অমনি দূর করে দিলেন আমাকে। মুখে বললেন না যদিও—দূর হয়ে যাও, কিন্তু এমনভাবে চাইলেন—ও গড্— সে চাহনিতে হতাশা আর ভর্ৎসনা এমনভবে মূর্ত হয়ে উঠল যে আমি পালিয়ে গেলাম। জগদম্বা তখন বছর এগারোর, বাপের বাড়িতে ছিল। সেখানেই চলে গেলাম আমি। মেয়েটাও ফিক্ করে হেসে দুদ্দাড় করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। পাড়ারই মেয়ে, বালবিধবা একটা। সে-ও নিজের বাড়িতে ফিরে গেল সম্ভবত। কোন হৈচৈ হল না, উচ্চবাচ্য হল না, কেউ জানতে পারল না। মহাপুরুষ কাউকে কিছু বলেননি। সেই জন্যেই তিনি মহাপুরুষ। আমার শ্বশুর আগেই মারা গিয়েছিলেন। জগদম্বা ছিল তার পিসীর কাছে। রাত্রে আমার কাছে শুতে এল না। পিসীর কাছে গিয়ে শুয়ে রইল। তার পরদিন সকালে বলল—আমাদেরই খেতে কুলোয় না। তুমি আবার এসে হাজির হলে কেন! বলিহারি তোমার আক্কেলকে। বেরিয়ে গেলাম শ্বশুরবাড়ি থেকে। সোজা চলে গেলাম সিম্সন সাহেবের কাছে। খেতু ভট্চাজ, কানাই সমাদ্দার বা হাবুল ঘোষের কাছে যাইনি, ওরা সবাই আমার ইয়ার ছিল, পরস্পরের মুখ থেকে এঁটো বিড়ি নিয়ে ফুঁকতাম আর পথচলতি মেয়েদের দেখতাম, আর রাজনীতির তর্ক করতাম, আমরা ছিলাম যেন ডিজরেলি, ভলটেয়ার, মার্কস, গ্ল্যাডস্টোন, চার্চিল, লিংকনদের নির্যাস দিয়ে তৈরি এক একটি অবতার, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতাম সব্বাইকে, আর নানারকম গুজব আর পরের-মুখে-শোনা গল্প নিয়ে ইতিহাস তৈরি করতাম মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, সুভাষ বোস আর যতীন সেনগুপ্তদের নিয়ে। রাজা-উজিরদের মুণ্ডহীন শব ছড়ানো থাকত আমাদের চারপাশে। কিন্তু নিজে যখন অকূল পাথারে পড়লাম তখন খেতু-কানাই-হাবুলের ওপর নির্ভর করতে সাহস হল না—মনে মনে জানতাম ওরা সব দন্তগজভুক্ত ফোঁপরা কয়েৎ বেল—গেলাম সিম্সনের কাছে। সিম্সন আমার কাছে একদা সংস্কৃত পড়তেন। এসেছিলেন অবশ্য মহাপুরুষের শিষ্য হয়ে। মহাপুরুষ তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যথাসাধ্য যত্ন করে পড়িয়েছিলাম তাঁকে। তাঁর মতো অধ্যবসায় তো আর দেখিনি আমি। ছিনে জোঁকের মতো। উপক্রমণিকা থেকে আরম্ভ করে কালিদাস ভবভূতি পড়ে ফেললেন এক বছরের মধ্যে। তারপর আরম্ভ করলেন উপনিষদ। আমার মনে হল ওঁর কাছে গেলে উনি হয়তো আমাকে সাহায্য করবেন। গিয়ে অকপটে সব খুলে বললাম। বললাম—তুমি মেঘদূত, ঋতুসংহার পড়েছ, কীটস শেলীও পড়েছ, সুতরাং আমার বেদনা তোমার বোঝা উচিত। মহাপুরুষের বাড়ি আর যাওয়া যাবে না, শ্বশুরবাড়িও না, ট্যাঁক গড়ের মাঠ, এ অবস্থায় হে উপনিষদজ্ঞ শ্বেতকেতো, তুমিই আমাকে পথ দেখাও। পথ দেখালেন তিনি। বললেন—আমার এক বন্ধু এখানে আছেন। পাটের ব্যবসা করেন। একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি সেটা নিয়ে তাঁর কাছে যাও তুমি। গেলাম। তিনি বললেন ভেরি গুড্। আর্থার যখন তোমাকে সাহায্য করতে বলেছে তখন আমি নিশ্চয় সাহায্য করব তোমাকে। প্রথমে টাকা ধার করতে হবে। আমিই নামমাত্র সুদ নিয়ে

টাকা দেব তোমাকে। আর বলে দেব আমাদের কোম্পানী মণ পিছু হাইয়েস্ট কত টাকা দরে পাট কিনবে। তুমি ওর চেয়ে যত কম দরে পার পাট কিনে আমাদের সাপ্লাই কর। আমরা সব কিনে নেব। দশ হাজার টাকা নিয়ে আপাতত কাজ আরম্ভ কর। আমি একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব, সে তোমাকে ব্যবসার ঘাঁত-ঘোঁৎ সব বুঝিয়ে দেবে। কোথায় গিয়ে কি করে পাট কিনতে হয়, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় সব বলে দেবে সে। তুমি লেগে পড়। লেগে পড়লুম। হ্যাঁ মশাই, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন সেন, সত্যেন দত্ত, শেলী কীটস্ ব্রাউনিং শেক্সপিয়ারদের শিকেয় তুলে রেখে ছুটলাম পাটের বাজারে। ছুটলাম নোয়াখালি, ধুবড়ি, পাথরগামা, ঢাকা, ফরিদপুর, গেঁওখালিতে। প্রাণের বন্ধু হল জিতু, খগেন, নুরুদ্দিন, চুনি মিঞা, ছবিলাল আর জমিরুদ্দিন, আর—না, মনে পড়ছে না তাদের নাম, আশ্চর্য একটারও নাম মনে নেই—যারা আমার যৌন-ক্ষুধা মিটিয়েছিল—তারা—

"চাই অল ঝাড়ু—অল ঝাড়ু—"

মন থেকে সব মুছে যাচ্ছে যেন। ঝাড়ুওয়ালাটা ঝাড়ু দিয়ে সব পরিষ্কার করে দিলে না কি। ঘরের দেওয়ালগুলো এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে ঝুঁকে যেন দেখছে আমি লিখছি। এ কি হঠাৎ ওরা আবার সরে গেল কেন! গীটার আসছে। সঙ্গে তার বাবা। গীটারকে দেওয়ালগুলো ভয় করে না কি! গীটারের বাবা অনেকদিন থেকে আসছেন আমার কাছে—যেন বহুযুগের ওপার হতে—শামুকের মতো মন্থরগতিতে। এতদিনে বোধহয় এসে পৌঁছলেন। লোকটা সাহিত্যিক, লোকে বলে সুসাহিত্যিক, আমি অবশ্য ওর একটা বইও পড়িনি, যদিও মুখে বলেছি পড়েছি পড়েছি। চমৎকার, চমৎকার। কিন্তু লোকটাকে শ্রদ্ধা করি আমি। কেউ ওর গায়ে আলকাতরার ছাপ দিতে পারেনি এখনও। ও পুরস্কার পায়নি একটাও। এ যুগে এটা কম কৃতিত্ব নয়। সুজন ওঁর লেখার খুব ভক্ত। বিয়ের আগে থেকেই ভক্ত ছিল। ওর লাইব্রেরীতে প্রায়ই দেখতুম যামিনী ঘোষালের বই। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প সব রকম। কৌতূহল হল। জিগ্যেস করলাম একদিন—এর লেখা কেমন? সুজন সংক্ষেপে বললে—চমৎকার। খুব পপুলার বুঝি? মোটেই না। সাহিত্য নিয়ে আছেন অনেকদিন। কিন্তু শুনেছি, এর থেকে রোজগার হয় না বেশী। কেরানীগিরি করেন। আর কিছু বললে না। আমি কিন্তু বাছাধনের দুর্বলতার রন্ধ্রটুকু টের পেয়ে গেলাম। একটা কথা জানেন কি? প্রত্যেক ভালো লোকের সঙ্গে প্রত্যেক মন্দ লেকের একটা শত্রুতা থাকে? প্রত্যেক মন্দ লোকই প্রত্যেক ভালো লোককে ঘায়েল করতে পারলে ভারী খুশি হয়। এই থিয়োরি অনুসারে সুজন আমার শত্রু। তাকে আমি ভয় করি। কিন্তু তাকে ঘায়েল করবার প্রবৃত্তি আমার হয়নি, কারণ সে আমার ছেলে। একমাত্র ছেলে। বরং এটাও খুব আশ্চর্য ব্যাপার—তাকে আমি খোশামোদ করবার সুযোগ খুঁজতাম, কিন্তু পেতাম না। সত্যি বলছি আমি মনে মনে মিনতি-ভরা চোখে ভিক্ষা করতাম তার করুণা, তার কৃতজ্ঞতা। তার এই শয়তান বাপটাকে সে একটু ভালবাসুক,—হয়তো সে বাসতো— কিন্তু তার কোনও প্রমাণ পেতাম না আমি। এই প্রমাণের জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছিলাম। তাই নিজেই চলে গেলাম একদিন যামিনী ঘোষালের খোঁজে, যে যামিনী ঘোষালকে সুজন ভক্তি করে। হ্যাঁ মশাই যা ভাবছেন তাই—ঈর্ষার তাড়নাতেই ছুটে গিয়েছিলাম। তারপরেই পা পিছলে আলুর দম।

গীটারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার অহংকারের বেলুনটা চুপসে গেল হঠাৎ। আমতা আমতা করে বললাম—"যামিনীবাবু বাড়িতে আছেন?"

বললে—"বাবা তো রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরবেন না।"

"এত রাত পর্যন্ত আপিস?"

"আপিসের পর টিউশনি করেন দু জায়গায়—"

আরও চুপসে গেলাম।

তবু বললাম—"তিনি তো একজন বড় লেখক। লেখেন কখন?"

"রাত তিনটের সময় ওঠেন। বেলা ৭টা পর্যন্ত লেখেন।"

"কখন দেখা হবে তাঁর সঙ্গে?"

"রবিবার সকালে।"

তারপরই বললে—রবিবার সকালেও কোন কোন দিন বেরিয়ে যান। আমার কেমন যেন জেদ চেপে গেল একটা। আমি তখন লাখ লাখ টাকা রোজগার করছি। পাটের ব্যবসার সঙ্গে হীরে জহরতের ব্যবসা শুরু করেছি। এদেশ থেকে হীরে জহরত কিনে পাচার করছি বিদেশের বাজারে চোরা-পথ দিয়ে। শুরু করেছি লোহার ব্যবসা, শুরু করেছি মদের ব্যবসা, চিনির ব্যবসা, মেয়েমানুষের ব্যবসা, জগদম্বা মন্দির তৈরি করেছি মার্বেল দিয়ে। তখন আমার রক্ত টগবগ করছে, শির আশমানে ঠেকেছে, আমার সঙ্গে দেখা করতে পেলে কত লোক ধন্য হয়ে যায়, আর এই কেরানীটার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমাকে—নেপাল চাটুজ্যেকে —পাঁচদিন অপেক্ষা করতে হবে? রোঁক চেপে গেল। বললাম—আচ্ছা আমি রাত দশটার সময়েই আসব।

গীটার একটু ইতস্তত করে বললে—"বাবা রাত দশটায় বড় ক্লান্ত হয়ে ফেরেন। তখন তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করুক এটা আমি চাই না। উনি এসেই খেয়ে শুয়ে পড়েন। ভোর তিনটেতেই আবার উঠতে হয় কিনা—আপনি আগামী রবিবারেই আসবেন, ওঁকে আমি বলে রাখব। আপনার নামটা কি—"

"আমার নাম নেপাল চাটুজ্যে। আমি আজই দেখা করব তাঁর সঙ্গে। দু'মিনিট কথা বলেই চলে যাব"

"বসুন তাহলে—"

বলেই চলে যাচ্ছিল। আমার কি মনে হল জানেন? ও যেন আমার মাথায় হাতুড়ি মারল। আপনারা ভদ্র ভাষায় বলবেন হয়তো—আমাকে অভিভূত করে ফেলল,—কিন্তু অভিভূত কথাটা দিয়ে—সেই নিদারুণ হকচকানো ভাবটা ফোটানো যায় না ঠিক। তাই হাতুড়ি বলছি, হাতুড়ি উপমাটাও অবশ্য ঠিক হচ্ছে না, কারণ ওই ছিপছিপে মৃদুভাষিণী মেয়েটির ভদ্র ব্যবহারকে হাতুড়ি বলা চমৎকার মিহিদানাকে করাতের গুঁড়ো বলার মতো হাস্যকর তা বুঝতে পারছি, তবু বলছি মনে হল আমার মাথায় যেন একটা হাতুড়ি মারলে কেউ। I was stunned.

বললাম—'শোন, আমি এখানে বসব না। আমি আমার মোটরে গিয়ে বসছি—"

"ও, ওই মোটরটা বুঝি আপনার?"

আমার প্রকাণ্ড ক্রাইসলার গাড়িটা যে পাড়ায় ঢুকত সেই পাড়াতেই নিঃশব্দ আলোড়ন

তুলত একটা। কিন্তু গীটার মনে হল এ বিষয়ে নির্বিকার। এতে আরও যেন চটে গেলাম আমি। নিঃশব্দে ভয়ানক চটে গেলাম। কিন্তু ভদ্রভাবে বললাম—"হ্যাঁ, আমারই।"

মোটরে গিয়েই বসলাম। একটু পরেই 'বম্'টা পড়ল। কয়েক মিনিট পরে একটা ডিসে করে দুটো সন্দেশ নিয়ে হাজির হল মেয়েটা। দুটো সাধারণ সন্দেশ, আর কাঁসার গ্লাসে জল।

"আমার খিদে পেয়েছে তুমি জানলে কি করে?"

গীটার ঘাড় হেঁট করে মুচকি হাসলে একটু।

"বাজারের সন্দেশ?"

"না। বাবা বাজারের সন্দেশ খান না"

"তোমরা ক'ভাইবোন।"

"আমার দাদা আছে একটি। তিনি দিল্লীতে চাকরি করেন।"

"তুমি কি কর?"

"আমি এম-এ পাস করেছি।"

কথাগুলো এমনভাবে বলল যেন এম-এ পাস করাটা মস্ত অপরাধ একটা।

"পাস করে চাকরিটাকরি করছ না কি—"

"না—"

চুপচাপ বসে আছ বাড়িতে?'

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সলজ্জভাবে বলল—"কবি ভারবী সম্বন্ধে একটা থীসিস লিখছি—"

'বম্' তখন বিধ্বস্ত করে ফেলেছে আমাকে। লক্ষপতি ব্যবসায়ী নেপাল চাটুজ্যে তখন finished. কিন্তু তবু হারবার পাত্র নয় সে। কারণ সে এককালে মহাপুরুষের শিষ্য ছিল তো।

বললাম—"ভারবী এককালে আমিও পড়েছিলাম। চল ঘরেই গিয়ে বসি তোমার ক্যাম্প চেয়ারে। তোমার বাবা যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ কবি ভারবীকে নিয়েই আলোচনা করা যাক—"

উঠে এসে ঘরের ভিতর ক্যাম্প চেয়ারে বসলাম।

"সন্দেশ দুটো আগে খেয়ে নিন।"

"সন্দেশ খেতেই হবে? না-ই বা খেলুম। সন্দেশ আমার তেমন ভালো লাগে না।"

"কেক খাবেন?"

"কেকও তুমি তৈরি করেছ না কি।"

আবার ঘাড় নীচু করে মৃদু হাসি।

"কেক তৈরি করা তো বেশ কঠিন। কি করে শিখলে?"

"বই দেখে। একটা বিলাতী রান্নার বই প্রাইজ পেয়েছিলাম। সেইটে দেখে দেখে শিখেছি। বাবা বলেন খুব ভালো হয়, কিন্তু আমি জানি ভালো হয় না খুব, আপনি সন্দেশ দুটোই খান—"

আবার সেই ঘাড় নীচু করে মৃদু হাসি। জুঁই ফুলের মতো হাসি।

আমি তখন কাৎ হয়ে গেছি। ঝানু ব্যবসাদার আমি, গণ্ডারচর্মবৎ আমার মন, কিন্তু সত্যিই কাৎ করে দিলে আমায় মেয়েটা। কাৎ হয়ে গেলেই আমি চটে যাই।

বললাম—"কেকও খাব, সন্দেশও খাব।"

খেয়ে দেখলাম দুটোই চমৎকার। সত্যিই চমৎকার, excellent. কিন্তু আমি পাজী নচ্ছার তো, চুপ করে রইলাম। একটি প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করলাম না। বসে রইলাম মুখ গোমড়া করে। তারপর বললাম—"বড্ড গরম। পিছনদিকের ওই জানলাটা খুলে দাও না, একটু হাওয়া আসুক—"

"পাশেই প্রকাণ্ড বাড়ি রয়েছে হাওয়া আসবে না। আমি হাওয়া করছি আপনাকে। সত্যি বড্ড গরম আজ—"

মেয়েটা একটা পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল আমাকে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে। আমি তখন সম্পূর্ণ কাৎ। তাই ধমকের সুরে বললাম—"ভারবী নিয়ে আলোচনা করব বলে এসেছিলুম ভিতরে। তুমি পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলে—"

গীটার চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললে—"বাবা বলেছেন থীসিস শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দেখিও না। ওটা শেষ হলে আমি দেখব। যদি মনে হয় ভালো হয়েছে, তখন ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়ে দিও। আপনাকে কথাটা না বললেই পারতুম।"

দুর্দান্ত ভেড়া দেখেছেন কখনও? যার বাঁকানো শিং আর কোঁকড়ানো লোম দেখলে ভীতির সঞ্চার হয়, যে রেগে গেলে গুঁতিয়ে তছনছ করে দেয় সব? আমি মনে মনে তখন সেই ভেড়া হয়ে গেছি। আমার ক্রোধ তখন তুঙ্গী হয়ে জ্বলন্ত সূর্যের মতো জ্বলছে সেই ভেড়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। কিন্তু কিছু করতে পারলাম না। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বসে রইলাম। গীটার আমার পিছনে দাঁড়িয়ে হাওয়া করে যেতে লাগল। মিনিট দুই পরেই অদ্ভুত পরিবর্তন হল একটা। এ পরিবর্তন কে করে, কেমন করে করে তা জানি না। কিন্তু হল। সেই রুদ্র ভেড়াটা একটা গোবরগাদায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। হ্যাঁ মশাই গোবর গাদায় এবং সবিস্ময়ে দেখলাম তার উপর একটা পদ্মফুল ফুটেছে। ব্যাপারটা অসম্ভব, কিন্তু দেখলাম ফুটেছে, স্বচক্ষে দেখলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, "পাঁজি আছে তোমাদের বাড়িতে?"

"আছে।"

"নিয়ে এসো তো।"

নিয়ে এল পাঁজি। তারপর মুশকিল হল। বাংলা তারিখ মনে ছিল না। আমরা বাঙালী, কিন্তু ইংরেজী তারিখেই অভ্যস্ত।

"আজ বাংলা তারিখ কত জান?"

"আজ এগারই বৈশাখ—।"

পাঁজি দেখতে লাগলাম। দেখলাম পনেরই বৈশাখ বিয়ের দিন আছে একটা।

"পাঁজিটা রেখে দাও। আমি এখুনি ঘুরে আসছি—।"

তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলাম বাড়িতে। দেখলাম সুজন তখনও ফেরেনি। লকার থেকে দশটা গিনি বার করে ফিরে গেলাম আবার। ঘড়িতে তখন পৌনে দশটা। ঠিক দশটার সময়ই এলেন যামিনী ঘোষাল। প্রৌঢ় শীর্ণ-কান্তি ভদ্রলোক। খাঁড়ার মতো নাক। প্রশস্ত ললাট। স্বপ্নময় চোখ। আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম চেয়ার থেকে। আমিই আগে নমস্কার করলুম, উনি দায়-সারা-গোছ একটু হাত তুলে সবিস্ময়ে চেয়েই রইলেন আমার দিকে।

গীটার বললে—'ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে বসে আছেন অনেকক্ষণ থেকে।"

"কে আপনি, আপনাকে চিনতে পারছি না তো।"

"আমার নাম নেপাল চাটুজ্যে।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইলেন।

"মাপ করবেন, তবু চিনতে পারলাম না।"

আমি তখন যে জগতে বিচরণ করতাম সে জগতে আমি ছিলাম একজন দিকপাল। সব খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে আমার বিজ্ঞাপন বেরুত, কিন্তু দেখলাম এ লোকটা আমার নামও শোনেনি। বেশ জোরেই হোঁচট খেলাম মনে মনে। কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম— "আমি বিখ্যাত সাহিত্যিক যামিনী ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"দেখা করতে এসেছেন আমার সঙ্গে? কেউ তো আসে না। আপনি হঠাৎ এলেন কেন! আমি বিখ্যাতও নই, তবে সাহিত্য-চর্চা কবি একটু আধটু। আপনিও সাহিত্য-চর্চা করেন না কি?"

"আমি লেখক নই, পাঠক শুধু।"

"বসুন, আমি কাপড়জামা ছেড়ে আসি।"

"আমি বেশীক্ষণ আপনার সময় নেব না। শুনলাম আপনি খেয়ে শুয়ে পড়বেন এখুনি।"

কোনও উত্তর না দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন। গীটার একটি মোড়া নিয়ে এল। মোড়াটি রেখেই ভিতরে চলে গেল সে আবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন যামিনীবাবু। পরনে একটি সাদা লুঙ্গি, শুধু গা। গলায় শুভ্র উপবীত।

"এ সময় তো সাহিত্য-আলোচনা জমবে না! সত্যিই বড় ক্লান্ত এখন। আগামী রবিবার সকালে আসুন না—"

"রবিবার দিন আমারও আসবার ইচ্ছে । কিন্তু একটু অন্যভাবে আসতে চাই।"

"অন্যভাবে—মানে?"

"তাহলে ব্যাপারটা খুলেই বলি। আমার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়েটির বিয়ে দিতে চাই। আগামী রবিবারেই দিন আছে একটা—"

"সে কি । বিয়ে কি এত তাড়াহুড়ো করে হয়। আমার মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তার মত নিতে হবে। আপনার ছেলে কি করেন—"

"এখন কিছু করছে না। তিনটে সাব্জেক্টে এম. এ. পাস করেছে পি. এইচ. ডি . হয়েছে—"

"নাম কি বলুন তো।"

"সুজন—"

"ও সুজন চট্টোপাধ্যায়ের বাবা আপনি। সুজন তো বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন একটি—"

ঈর্ষায় ঘায়েল হয়ে পড়লাম আবার। আমার নাম শোনেনি, আমার ছেলের নাম শুনেছে। রাসকেল কোথাকার! কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিসও হচ্ছিল— আমি সাঁতার কাটছিলাম। কোথায় জানেন? আনন্দের সাগরে। আর আমার সঙ্গে সাঁতার কাটছিল

জগদম্বা, যে জগদম্বা অনেকদিন আগে মরে গেছে। তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু অনুভব করছিলাম সে-ও আমার পাশে পাশে সাঁতার কাটছে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে।

"সুজনের হাতে আমার মেয়েকে দিতে পারলে আমি কৃতার্থ হব। কিন্তু—"

খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে রইল লোকটা। দেখলাম মাথার মাঝখানে একটু টাক আছে।

তারপর মাথা তুলে বললেন—"দেখুন, সব কথা স্পষ্ট করেই বলছি। আপনি যদি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হতেন তাহলে আমার ভয় হত না। ওই মোটরটা কি আপনার?"

"হ্যাঁ আমারই—"

"তাই একটু ভয় হচ্ছে। ধনী লোকদের আমি ভয় করি মশাই তবে সুজনের নাম শুনে লোভ হচ্ছে। বড় ভালো ছেলে—"

"ওর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?"

"না। ওর লেখা কয়েকটি ইংরেজী বাংলা প্রবন্ধ পড়েছি কেবল। প্রবন্ধ পড়েই ওর উপর শ্রদ্ধা হয়েছে আমার—"

আমি মনে মনে বললাম রতনে রতন চিনেছে। মুখে কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না, এক অদৃশ্য সার্জন যেন পটপট করে আমার ঠোঁট দুটো সেলাই করে দিয়ে গেল। কানে কানে বলে গেল—তুমি পাপী, তুমি পাজী, টুঁ শব্দটি কোরো না। বিবেক আমাকে শাসাচ্ছে না কি? আমাকে! নেপাল চাটুজ্যেকে! সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল মুখের সেলাই।

বললাম—'ধনী লোককে ভয় করেন? কি অপরাধ করেছে তারা?"

"অপরাধ করেনি। কিন্তু আমার মনে হয় তারা মাতালের মতো। মাতালকেও বড্ড ভয় করে আমার—"

বলেই অপ্রত্যাশিতভাবে হো হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন—"ওটা হয়তো আমার অ্যালার্জি। অনেক ভদ্রলোক ধনী আছেন তা আমি জানি। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সমস্ত উন্নতির মূলে বাংলাদেশের ধনীরা ছিলেন একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু ওই যে বললুম—ওটা আমার অ্যালার্জি। যাক ওসব কথা। আমার মেয়েকে আপনার পুত্রবধূ করবার হঠাৎ ইচ্ছে হল কেন—"

"হঠাৎই বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসে আবিষ্কার করলাম আপনার মেয়েকে। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো বলতে পারেন অনেকটা। কিন্তু না, আমেরিকা আবিষ্কার করিনি। আবিষ্কার করেছি, বাংলাদেশকে যে বাংলাদেশ হারিয়ে গেছে। যে বাংলাদেশ একদা মূর্ত ছিল আমার স্ত্রীর মধ্যে। সে স্ত্রী মারা গেছেন। তারপর থেকে তাকে খুঁজেছি অনেক বনেবাদাড়ে অনেক কাদায় নর্দমায়, কিন্তু পাইনি, সেই বাংলাদেশ হঠাৎ যেন দেখা দিল আপনার ওই ছিপছিপে শ্যামলা মেয়েটির মধ্যে আজ—আমি আপনার মতো সাহিত্যিক নই। সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না। যদি আপত্তি না করেন এই সামনের রবিবারেই তাহলে—"

"না, না অত তাড়াতাড়ি হয় কি এসব? আগে আমার মেয়ের মত নিই। সে যদি মত দেয়, তা হলেও সবুর করতে হবে আরও কয়েকটা দিন, আমার মাইনেটা না পাওয়া পর্যন্ত—"

"মাইনের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি—"

"আমি স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে ইকমিক কুকারে রেঁধে খাই। ইকমিকটা ভেঙে গেছে। আমার মেয়েই আমায় রেঁধে দিচ্ছে ক'দিন থেকে। উনুনে আমি রাঁধতে পারি না, ইকমিক কুকারটা না কিনে আনা পর্যন্ত মেয়েকে হাতছাড়া করতে পারব না—"

আবার খুব জোরে হেসে উঠলেন যামিনী ঘোষাল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—"আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা মিল দেখতে পাচ্ছি। দুজনেই বিপত্নীক। আমার স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন আগে। তখন আমার ছেলেমেয়ে খুব ছোট। মেয়েটি তিন বছরের, ছেলেটি সাত। তখন থেকে আমিই ওদের রান্না করে খাওয়াচ্ছি। পড়াচ্ছিও। আমিই ওদের কুক এবং প্রাইভেট টিউটার। এখনও আমিই রাঁধি। আজকাল মেয়েটা একটু আধটু সাহায্য করে। বই দেখে নানা রকম শৌখিন রান্না শিখেছে। ইকমিকটা ভেঙে গেছে পরশু, ওটা কিনে ফেলি—"

"আপনার ছেলে কোথায়—"

"আই. এ. এস. হয়েছে সম্প্রতি। বারবার চিঠি লিখছে আমার কাছে চলে আসুন। কিন্তু আমি যাব না। আমি ইকমিকেই চালিয়ে দেব বাকি জীবনটা"—অদ্ভুত হাসি হাসলেন একটা।

বললাম—"আমি আপনাকে যতটা বুঝতে পেরেছি তার থেকে আন্দাজ করছি আমি যদি এখুনি আপনাকে একটা ইকমিক কুকার কিনে দি, আপনি নেবেন না—"

"নেব না কেন, কিন্তু ওর দামটা নিতে হবে। সেটা আমি মাইনে না পেলে দিতে পারব না। কিন্তু আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন—"

"হচ্ছি, কারণ ওইটে আমার স্বভাব। আমি একটু ব্যস্তবাগীশ লোক। আমি ব্যবসাদার, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে চলাই আমার উচিত, কিন্তু পারি না। আমার সহজ বুদ্ধি, ইংরেজিতে যাকে আপনারা ইনস্টিংক্ট (instinct) বলেন, যা বলে তাই আমি শুনি। এবং কালবিলম্ব না করে শুনি—।"

"আচ্ছা, তাহলে আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করি। আপনিও ছেলেকে জিজ্ঞেস করবেন নিশ্চয়—"

"জিজ্ঞেস করব না। খালি বলব একজায়গায় তোমার বিয়ের ঠিক করেছি, আগামী রবিবার বিয়ে। আমি জানি আমার ছেলে আপত্তি করবে না। যেসব ছেলেরা বিয়ের সময় নিজেদের মতামত আস্ফালন করে সুজন সে ধরনের ছেলে নয়—"

কিন্তু আমি এ কি করছি। অতীতের ইতিহাস চর্বিত-চর্বণ করছি কেন। ওফ্—কি লজ্জা—বুঝেছি—বুঝেছি—কেন করছি। খোশামোদ করছি সুজনকে আর গীটারকে। আমি যা লিখি তারা তো সব নিয়ে যায়, পড়ে নিশ্চয়—আমি যদি তাদের আমড়াগাছি করি তাহলে—হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনের অবচেতনলোকে ওই মিথ্যে আশাটা আমার উপর ভর করেছিল। তাদের যদি প্রশংসা করি তাহলে তারা গদগদ হয়ে আমাকে ছেড়ে দেবে। হাত ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছে করছে। ওরে জরদ্গব, কি করে তুই ভাবলি এটা? খোশামোদে বিগলিত হয়ে ছেড়ে দেবে? তা কি দেয় কখনও? সাজাহান কি আরাংজেবকে কম খোশামোদ করেছিল? চার্লস্ দি ফার্স্ট কি কম তেল দিয়েছিল ক্রমওয়েলকে? মহম্মদী বেগ, আমার মা আমার ঠাকুমার স্নেহে লালিত হয়েছিলে তুমি, সেই কথা স্মরণ কর, আমায় হত্যা কোরো না—সিরাজের এই অনুনয়

অতীতের অন্ধকারে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ইতিহাসের পাতায় এই সত্যটাও লেখা আছে যে মহম্মদী বেগ তরোয়াল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটেছিল সিরাজকে। না, খোশামোদ ওদের বাঁচাতে পারেনি। আমাকেও পারবে না। আমাকেও মরতে হবে। ওরা কাল-সাপ, ওদের অনেক দুধকলা খাইয়েছি, তবু ওরা আমাকে কামড়াবে শেষ পর্যন্ত। ফণা তুলে তুলে সুযোগ খুঁজছে খালি। আর সে সুযোগ ওরা পাবে। কেন জানেন? আমি পাপী যে। মহাপাপী। আমরা নিজেদের মৃত্যুবাণ নিজে তৈরি করে অপরের হাতে তুলে দিই। ভালো করে ইতিহাস পড়ে দেখুন বুঝতে পারবেন। সাজাহান, আরাংজেব, সিরাজ, ফ্রান্সের সেই হৃদয়হীন আধ-বোকা রাজা লুই, আর তার আদুরে রাণী—মেরি আন্‌টোনিয়েট, (উচ্চারণটা ঠিক হল ত?), রাশিয়ার জার, সব মহাপাপী ছিল। তাদের যারা খুন করেছিল সেই জেকোবিনের দলও কি নিষ্পাপ ছিল? ছিল না। তাই রোব্‌স্‌পেয়ার, ড্যানট্যান, ম্যারাট কেউ বাঁচেনি শেষ পর্যন্ত, সবাইকে প্রাণ দিতে হয়েছিল গিলোটিনের তলায়। কিন্তু লিয়‌্‌কৎ—সে দারোগাটা—ওরা মরেছে কি? এই দেখুন, ধাঁধায় পড়ে গেলাম। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলছে ওরা মরেছে, কিন্তু ওরা তো পাপী ছিল না, ওদের তো মরবার কথা নয়। ভূশণ্ডি কাক কোথা থেকে উড়ে এসে কা কা করে জবাব দিয়ে বসল—'কার কটা পাপের খবর রাখো তুমি? সব পাপী। সবাই মরবে।' একটা নড়বড়ে বিরাট ছাতার মতো চেহারা ভূশণ্ডির। টেলিগ্রাফের থামের উপর বসে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম—"তা হলে পুণ্যবান কেউ নেই না কি পৃথিবীতে?"

"না নেই। পাপ পুণ্যের ছাপ তোমরাই তৈরি করেছ। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন—আত্মীয়-নিধন পাপ নয়। গীতা সৃষ্টি হবার আগে আত্মীয়-নিধন পাপ ছিল। তোমরা নিজেদের সুবিধা মতন পাপপুণ্যের আইন বদলাও। আজকালকার কথাই ধর না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত গর্ভপাত বে-আইনি ছিল, এইবার সেটা আইনসঙ্গত হল। আগে ভ্রূণহত্যা মহাপাপ বলে গণ্য হত, এখন হবে না। একটি সারকথা জেনে রেখো। যারা জন্মগ্রহণ করে তারাই পাপী। যতদিন বেঁচে থাকে কষ্ট পায়, তারপর অক্কা পেয়ে যায় যখন মহাকালের মুষল পড়ে মাথার উপর। খ্যাঁক খ্যাঁক্ খ্যাঁক্—"

উড়ে গেল ভূশণ্ডি।

এ আর নতুন কথা কি বললে ও। এসব তত্ত্বকথা তো অনেক আগেই শুনেছি। তাছাড়া ওই ভূশণ্ডি হঠাৎ এলোই বা কেন। ওর সঙ্গে আগে তো কখনও দেখা হয়নি. ওর কথা ভাবিওনি কোনদিন। বিজ্ঞানীরা মাথা নেড়ে মুচকি হেসে বলবেন ওসব অবচেতনলোকের রহস্য। বাস্ আর কিছু বলবার উপায় নেই। বেদে যখন আছে তখন মানতেই হবে। কিন্তু—ওহ-হো, মনে পড়েছে, আসল নামটা ভুলে গেছি কিন্তু, ওর নাম দিয়েছিলাম ছ্যাঁচড়া চচ্চড়ি। নানাবেশে দেখা দিত। কখনও মুসলমানী চেকচেক লুঙ্গির উপর খদ্দরের ছেঁড়া পাঞ্জাবি, কখনও ছেঁড়া হাফশার্ট হাফপ্যান্ট, কখনও আড়ময়লা ছেঁড়া ধুতির উপর তালিমারা গলাবদ্ধ কোট—সর্বদা ছেঁড়া জিনিস পরে আসত, আজ এক ছেঁড়া ছাতার বেশ ধরে হাজির হয়েছে বলে চিনতে পারিনি। পয়সার লোভে যারা আমার চারপাশে থেকে আমার খোশামোদ করত, আমি জল উঁচু বললেই যারা বলত, শুধু উঁচু নয়, অনেক উঁচু, তাদেরই দলের লোক ছ্যাঁচড়া,

কিন্তু তাদের জাতের নয়। ছ্যাঁচড়া আমার কথার প্রতিধ্বনি করত না, প্রতিবাদ করত। জল তরল বললে, সঙ্গে সঙ্গে বলত, মনে রেখো বরফও জল। হিমালয় গগনচুম্বী বললে মেনে নিত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিত হিমালয় একদিন সাগরের তলায় ছিল, ভূমিকম্পের গুঁতোয় গগনচুম্বী হয়েছে। তার এই প্রতিবাদ-ধর্মী খোশামোদ যে আমার ভালো লাগত তা বুঝতে বিলম্ব হয়নি তার। এ ধরনের আবোলতাবোল বলে অনেক বখশিস নিয়ে গেছে সে আমার কাছ থেকে। ওহো এইবার মনে পড়েছে, অনেকদিন আগে একটা কালো 'রেনকোট' দিয়েছিলাম ওকে। সেইটে গায়ে দিয়েই এসেছিল না কি। যাক্ গে—যাক্ গে—কিন্তু না, যাক্ গে বলে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। আমি নেপাল চাটুজ্যে আমি এ ধরনের বাজে ভাবনা ভাবছি কেন। বাজে শাক দিয়ে কোন মাছ ঢাকতে চাইছি, কার সঙ্গে মুখোমুখি হবার ভয়ে আমি এ কোণ ও কোণ করছি? নেপাল চাটুজ্যে, দি মিলিয়নেয়ার, জবাব দাও এ কথার। যদিও সামনে কোন জজসাহেব নেই, যদিও কোন উকিল তোমাকে জেরা করছে না, তবু তোমাকে জবাব দিতে হবে। নির্ভয়ে জবাব দাও। এখানে তুমিই আসামী, তুমিই ফরিয়াদী, তুমিই সাক্ষী, তুমিই বিচারক। একমেবাদ্বিতীয়ম্ তুমি। জবাব দাও। উৎকর্ণ হয়ে আছি মনে মনে। ইলেকট্রিক শক দেওয়ার পর আমার সারা দেহে মনে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেছে একটা। অনেক জিনিস চাপা পড়েছে। ডেব্রির তলা থেকে অনেকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে.....গভীর রাত্রে নির্জনে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি—আর চিৎকার শুনতে পাচ্ছি—সবাই বলছে বাঁচাও বাঁচাও আমাকে বাঁচাও। কিন্তু একটি চিৎকার অন্য কথা বলছে শুধু। সে বলছে—নিপু, নিপু, নিপু, তুমি কোথায়? আমি ওই আকুল ডাকটা না শোনার ভান করছি, নানা বাজে ভাবনার ঝামেলা জুটিয়ে কালা সাজবার চেষ্টা করছি। আমি ও ডাকে সাড়া দিতে পারব না, ওঁকে ওই ডেব্রির তলা থেকে তুলব না, ওঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস নেই আমার। ওই ডাকটাও যদি না শুনতে পেতুম—মহাপুরুষ, মহাপুরুষ দয়া কর, আমাকে আর খুঁজো না তুমি, আর ডেকো না, আমি সাড়া দিতে পারব না, আমি হারিয়ে গেছি, তলিয়ে গেছি, মরে গেছি, পচে গেছি, সম্পূর্ণ বিস্মৃতির মধ্যে গলে গলে শেষ হয়ে যেতে দাও আমাকে। তুমিও ডেব্রির তলা থেকে বেরিও না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি—এ দেশ ভয়ঙ্কর দেশ হয়ে উঠেছে। সবাই চোর। সবাই মতলববাজ। জীবনের সর্বস্তরে পোকা কিল-বিল করছে। অসাধু শিক্ষক, অসাধু চিকিৎসক, অসাধু পুলিস, অসাধু শাসনকর্তা, অসাধু ব্যবসাদার, অসাধু মনিব, অসাধু ভৃত্য। আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার মানে দেবতা তৈরি করেছি আমরা, কিন্তু সোনা-রূপো-তামা দিয়ে নয়, মাটি দিয়েও নয়, বিষ্ঠা দিয়ে, তাই দেবতার গা থেকেও দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। বিকট দুর্গন্ধ। মহাপুরুষ তুমি এখানে এসো না, এলেও টিকতে পারবে না, দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে, পাগল হয়ে যাবে, না হয় আত্মহত্যা করবে। আমাকে তুমি ভালো করতে চেষ্টা করেছিলে—পারলে? তুমি যখন দুপুরে বিশ্রাম করতে তখন তোমারই লাইব্রেরী ঘরে বসে বিদেশী উপন্যাস পড়ে প্রেম করতাম আমি। না, না, প্রেম করতাম না, গুষ্টির পিণ্ডি চটকাতাম, আর গব গব করে গিলতাম সেই পিণ্ডি, মনে করতাম খুব বাহাদুরি করছি। কিন্তু সে বাহাদুরি তালপাতার সেপাইয়ের বাহাদুরি, তুমি যেই এসে দাঁড়ালে অমনি ছুটে পালাতে হল আমাকে। বাঁই বাঁই করে ভব্যতার পগার পেরিয়ে হয়ে গেলাম কালোবাজারের খোক্কস্। এ রাক্ষস খোক্কসের দেশ,

মহাপুরুষ, ছ্যাঁচড়া ছুঁচোর দেশ, তুমি এ দেশে বেমানান।

অল—ঝাড়ু—

ক্রি—টিনা—

কাগীজ, কাগীজ কাগীজ—

ব্যাস্ সব খেই হারিয়ে গেল। কি বলছিলাম? নেভার মাইণ্ড। কিন্তু যে খেইটা এখনও হারায়নি সেইটের কথা বলে ফেলি। যাঁরা ভাবছেন আমি অনুতাপ করছি তাঁরা ভুল ভাবছেন। ভিখারীর ছেলে নেপাল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছে লক্ষ লক্ষ লোকের সেলাম কুড়িয়েছে, তার কদর্য দেহটাকে ঘিরে মেয়েমানুষের গাঁদি লেগে গেছে, ভিড় জমে গেছে পয়সা-প্রত্যাশী জ্ঞানী-গুণী সাহিত্যিক-শিল্পীদের—এতে অনুতাপের কি আছে? গরম দেশে জন্মেছি রং তাই কালো হয়েছে। পঙ্কিল পরিবেশের দুর্বার স্রোতে উজান বেয়ে তীরে উঠেছি বলেই সর্বাঙ্গে ময়লা লেগেছে। কিন্তু আমি যে কৃতী, আমি যে বীর, আমি যে জয়ী একথা সবাই স্বীকার করেছেন একবাক্যে। স্বীকার করেনি কেবল জগদম্বা। ওই যে দূরে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে চেয়ে আছে আমার দিকে, মনে মনে যা বলছে তাও শুনতে পাচ্ছি—অমন দাপাদাপি করছ কেন, তোমার ছেলে হয়েছে, অমন লক্ষ্মী বউ। না, ওর কাছে আমি কল্‌কে পাইনি। সুজন আর গীটারের কাছেও পাইনি। বাইরে ওরা ভারী ভদ্র, ভারী কেতাদুরস্ত, কিন্তু আমার মনে হয় ওরা গোপনে গোপনে আমাকে জরিপ করছে, মাপছে, আঁকছে, অঙ্ক কষছে। আমাকে বন্দী করে রেখেছে অথচ বলছে করিনি। ডাক্তার ডেকে ইলেকট্রিক শক দিচ্ছে, বলছে আমার ভালোর জন্যেই করতে হচ্ছে। আমার ভালো আমি বুঝি না, ওরা বোঝে। আমার কি ইচ্ছে করে জানেন? ইচ্ছে করে সব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাই কোথাও। কিন্তু কি চুরমার করব? শূন্যতাকে চুরমার করা যায় না। ওই নোনা-লাগা দেওয়ালগুলো ধরতে গেলেই সরে সরে দূরে চলে যায়। একটু অন্যমনস্ক হলেই আবার এগিয়ে আসে, মনে হয় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমার উপর। দম বন্ধ হয়ে আসে।

ক্লা—ক্লা—

কলা ফেরি করছে। আশ্চর্য কথা মনে হল একটা। চৌষট্টি কলার মধ্যে আসল কলার স্থান নেই। কিন্তু—যাক্ গে—।

ও—মাই—গড্।

টিউ—টিউ—টিউ—

হলদে পাখিটা এসেছে আবার। বার বার আসছে কেন? কি যেন বলতে চায় আমাকে। কিসের ইঙ্গিত যেন বার বার দিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যে সোনার আরাধনা করেছি সারাজীবন, সেই সোনারই যেন প্রতীক ও। মনে পড়ে গেল জন রাসকিনের লেখা সেই The King of the Golden River গল্পটা। তাতেও অফুরন্ত ঐশ্বর্যের উৎস স্বর্ণ-স্রোতস্বতীর রাজা দেখা দিয়েছিল গ্লাক্‌কে (Gluck)। কিন্তু আমি তো গ্লাকের মতো ভালো নই। হলদে পাখির স্বরূপ দেখতে পাব কি? আলবৎ পাব। আমি পাপী বলে কি ভালো থিয়েটার দেখিনি? হরিচরণ, ড্রপ তোল—ওয়ান, টু, থ্রি,—হুইসেল দাও—ড্রপ তোল। থিয়েটার হোক। শিশির ভাদুড়ী এসে পার্ট করুক। বলুক—তুমি সীতা নও, তুমি নীল আকাশের বুকে স্বর্ণকিরণ, তুমি পাহাড়ের বুকে

রোদের ঝরনা, তুমি ঘন শ্যামল অরণ্যে উড়ন্ত হলদে পাখির শোভা, তুমি সীতা নও, তুমি সীতার স্বপ্ন। সোনার স্বপ্ন হয়ে ফিরে এসেছ তুমি। সোনার হরিণ দেখে লোভ হয়েছিল তোমার, এখন তুমি নিজেই সোনা হয়ে গেছ। পাতালে প্রবেশ করে সোনার খনি হয়ে গেছ তুমি। সে খনির ভিতর থেকে নানারূপে দেখা দিচ্ছ আমাকে। আমি আর তোমাকে অগ্নিপরীক্ষার অপমানের মধ্যে নিয়ে যেতে পারব না, তুমি চিরকাল আমার নাগালের বাইরে দেখা দেবে, উদ্ভাসিত হবে, প্রদীপ্ত হবে, উড়বে কিন্তু আমি তোমাকে ধরতে পারব না। তোমাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলাম তার শাস্তি আমাকে পেতে হবে বৈ কি।... এ কি হল। হরিচরণ আলোটা কমে আসছে কেন, শিশিব ভাদুড়ীকে দেখতে পাচ্ছি না আমি—হরিচরণ, হরিচরণ মোর লাইট্ মোর লাইট্—।

গীটার কখন নিঃশব্দ চরণে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম মনে মনে। জানি চেঁচামেচি করার জন্য ও বকবে না—কখনও বকে না—নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল। কিন্তু ওর নীরব বকুনি আমি শুনতে পাই, বুঝতে পারি। সুতরাং ওর দিকে না চেয়েই জবাব দিলাম—থিয়েটার করছি তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে। আর মেটোর-লিংক যদি ব্লু বার্ড নিয়ে নাটক করতে পারে, তাহলে আমিই বা হলদে পাখি নিয়ে করব না কেন! হঠাৎ আমাকে মানা করতে আসবার মানে? কোন জবাব এলো না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি কেউ নেই। গীটার তাহলে আসেনি? আশ্চর্য কাণ্ড! নোনা-ধরা দেওয়ালগুলো এগিয়ে আসছে আবার। দেয়ালগুলোর ফাঁকে ফাঁকে চেনা হাসি ভেসে বেড়াচ্ছে কতকগুলো। জাফরাণী, পয়লা, রংকী, রেহন বাই, আর ভেসে বেড়াচ্ছে অনেক চেনা কান্নাও—মায়ের হাতে মার খেয়ে সেই যে ছেলেটা রাস্তায় বসে কাঁদত, সেই যে ভিখিরীটা রোজ গেটের ধারে এসে বুকফাটা আর্তনাদ করত, যে রমেশকে জেল খাটিয়েছিলাম তার মা আমার পায়ে ধরে কেঁদেছিল, এদের কান্নার সঙ্গে এসে মিশছে সেই আকাশ-ছোঁয়া বড়লোক ও. সি. গোহোর স্ত্রী সুরমার চাপা কান্না— হঠাৎ এ কি কাণ্ড। জগদম্বা এসে হাজিব হল ঝাড়ু হাতে। সব হাসি সব কান্নাকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফিরে দাঁড়াল আমার দিকে চেয়ে। মনে হল যেন বলছে—এ সব কি করছ তুমি। আমাকে তো সারাজীবন জ্বালিয়েছ, এদেরও জ্বালাবে? দুনিয়ার আঁস্তাকুড় থেকে টাকা কুড়িয়ে এনে এক পেল্লায় বাড়ি বানিয়ে তার নাম দিয়েছ জগদম্বা-মন্দির। বাড়ি নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? আঁস্তাকুড়ের টাকাতে কি মন্দির হয়? মন্দির—! যত সব ঢং। মন্দিরে দেবতারা থাকে, আমি কি দেবতা? গরীব গেরস্ত ঘরের বউ আমি, তোমার মতো স্বামীকে নিয়ে ঘর করতে হয়েছে, কত অনাচার করেছি, কত মিথ্যে কথা বলেছি, কত তঞ্চকতা করেছি, কত জিনিস লুকিয়েছি, আমাকে দেবতা বানিয়ে দিলেই হল। বাড়ির নাম বদলে দাও। মিথ্যে বেশীদিন টিকবে না।

নির্বিকার হয়ে শুনে যাচ্ছি সব। মনে হচ্ছে আমি যেন পোস্টবক্স! কত চিঠি আসছে, কত চিঠি যাচ্ছে। কিংবা আমি যেন একটা 'হল'। কে যেন দেওয়ালে ছবি টাঙিয়ে দিচ্ছে আবার সরিয়ে নিচ্ছে। কিংবা আমি যেন টেলিফোনের রিসিভার, কত রকম লোকের কণ্ঠস্বর আমার ভিতর দিয়ে আসছে যাচ্ছে। কিংবা আমি হয়তো একটা—হ্যাঁ হ্যাঁ—এইটেই ঠিক—আমি যেন একটা আগ্নেয়গিরি, আমার চুড়োটা ফেটে গেছে, গলগল করে বেরুচ্ছে লাভা-স্রোত। চারিদিক ধ্বংস করে দিচ্ছে—ভিসুবিয়াস, না, এট্না— কি আমি?

চমকে উঠলাম হঠাৎ।

'কেমন আছেন—'

সামনে দেখি গুঁপো ডাক্তারটা বসে আছে। কখন এসে সামনের চেয়ারে বসেছে কিছুই জানতে পারিনি। দেখুলম বেশ সপ্রতিভভাবে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে আছে আমার দিকে। মূর্খটা বুঝতে পাবছে না যে সে বসে আছে একটা আগ্নেয়গিরির সম্মুখে।

'কেমন আছেন আপনি?'

সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুঁষি ঝেড়ে দিলাম তার গোঁপের উপর।

সাতদিন পরে আজ মুক্তি পেয়েছি। এ ক'দিন স্ট্রেট জ্যাকেটে বন্দী ছিলাম। চিৎকারও কবতে দেয়নি। ইনজেকশন দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আজ ছাড়া পেযেছি। কাগজ কলমও পেয়েছি। লিখতেও বসেছি। কিন্তু বাঁ গালের মাঝখানটা জ্বালা করছে। মনে হচ্ছে কে যেন লঙ্কাবাটা লাগিয়ে দিয়েছে। বড় দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম। উঠতে পাচ্ছিলাম না বিছানা থেকে। গীটার আর সুজন আমাকে ধরাধবি করে বসিয়ে দিলে। সেই সময় দু ফোঁটা জল পড়েছিল আমার গালের উপর। সেই জন্যেই কি জ্বালা করছে? চোখের জলে কি জ্বালা করে? গীটারের চোখে জল টলমল করছিল আমি দেখেছি। হ্যাঁ, গীটারের চোখে, সুজনের চোখে নয়। সুজন ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে ছিল। ওটা কি কান্না সামলাবার চেষ্টা? না, না, সুজন গীটারের মতো ছিঁচকাঁদুনে নয়— অজ্ঞান অসমর্থ অপরিচিত একটা লোককে যদি রাস্তা থেকে তুলতে হত তাহলেও ওর ওই মুখভাব হত— he is a man of principle—he is not a sentimental fool!, ও সংযত শিক্ষিত সচ্চরিত্র লোক, আমি অসংযত দুশ্চরিত্র, আমি সেন্টিমেন্টাল, কথায় কথায় কেঁদে ফেলি, টপ করে রেগে যাই, ধাঁ করে বুকে জড়িয়ে ধরি, আমার হাত চলে, পা চলে, মুখও চলে, হ্রস্বদীর্ঘ লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না চটে গেলে। আমরা দুজনে দু'ক্যাম্পের লোক, অপোজিট্ ক্যাম্প, ও ভালো আমি মন্দ, I hate him। কিন্তু তবু আমি আশা করি কেন— না, না আশা করি না, ভুল বলছি, আশা করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই—আমি ঠিকই দেখেছিলাম সুজনের চোখে জল ছিল না, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ছিল সে—জল ছিল গীটারের চোখে। কিন্তু গালটা জ্বালা করছে কেন? এটা কি গীটারের অনুশোচনার অশ্রু তাহলে? আমার পুত্রবধূ হয়েছে বলে ও কি কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে? তাই কি ওর চোখের জল অ্যাসিডের মতো হয়ে গেছে? জ্বালা করছে, বেশ জ্বালা করছে গালটা। করুক। এটা আমার ন্যায্য পাওনা। যে কথাটা লিখব বলে বসেছি সেইটেরই খেই হারিয়ে গেল মাঝ থেকে। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। আশ্চর্য ঘটনা সেটা। আমাকে যখন ওরা বেঁধে রেখেছিল তখন আমি ঢুকে পড়েছিলাম আগ্নেয়গিরিটার মধ্যে। আশ্চর্য নয়? আমিই ঢুকেছিলাম আমি রূপ আগ্নেয়গিরির ভিতর? আত্মোপলব্ধি? কিন্তু আত্মার কোনও পাত্তা তো পেলাম না সেখানে। দেখলাম বিরাট একটা সমুদ্র টগবগ করে ফুটছে। মনে হল—এ আমার অন্তর-সমুদ্র, আর আমিই সেটা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছি। হ্যাঁ ফুটছে—টগবগ করে ফুটছে। কোথাও পাঁক ফুটছে, কোথাও পুঁজরক্ত ফুটছে—কোথাও অশ্রুজল ফুটছে, কোথাও কালো রং, কোথাও লাল, কোথাও হতাশার ফ্যাকাশে রং, কোথাও আশার শিখা, কোথাও অনিশ্চয়তার ধোঁয়া। কোথাও

নর্দমার মতো ভট্‌ভট্ করছে, কোথাও তা উত্তাল হয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে। আর আমি নিজেই দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি এসব। দাঁড়িয়ে আছি একটা অটল পাথরের উপর। পাথরটা কি আমার অন্তরতম সত্তা? সেটা কি আমার আত্মপ্রত্যয়? সেটা কিন্তু বিচলিত হচ্ছে না। অত উত্তাপের মধ্যেও সেটা উত্তপ্ত নয়। তার উপর দাঁড়িয়ে আমি শুধু যে আমার বিক্ষুব্ধ অন্তর-সাগর দেখছিলাম তা নয়, অনুভবও করছিলাম একটা নৌকো পেলে আমি অনায়াসেই এ সমুদ্র পেরিয়ে যেতে পারি। আমার এ জীবনের সমস্ত কীর্তি-অকীর্তিকে, সমস্ত আবর্জনা জঞ্জালকে ফেলে পাড়ি দিতে পারি অজানার উদ্দেশে, যে অজানা আমার জ্ঞানের বাইরে হলেও কল্পনার বাইরে নয়। কল্পনায় আমি এমন একটা জায়গায় যেতে চাইছিলাম যেখানে মানুষ নেই। Paul Satre তাঁর কোন একটা নাটকে বলেছেন—মানুষের সান্নিধ্যই নরক। আমিও অনুভব করেছি সেটা। মানুষই প্রলুব্ধ করে আবার মানুষই প্রলুব্ধ হলে শাস্তি দেয়। তারা শাঁখের করাত, আসতে কাটে যেতেও কাটে। তাদের নানা শাস্ত্র, নানা আইন, শুধু শুধু পরস্পরকে কষ্ট দেবার জন্য। যে ঘৃণা করে সে কষ্ট দেয়, আবার যে ভালবাসে সে-ও কষ্ট দেয়। যে আইন রক্ষা করে সেই আইনই আবার ধ্বংস করে। আজ যে রক্ষক কাল সেই ভক্ষক। সমাজ মানে কি জানেন? এর চোদ্দ আনা পরশ্রীকাতরতা, ঘোঁট, পরস্পরকে লেংগি মারবার চেষ্টা আর আত্মআস্ফালন। বাকি যে দু'আনা ভদ্র তাদের দুঃখের শেষ নেই। তাদের পিষছে সবাই। মানব-সমাজ একটা নিষ্ঠুর পেষণ-যন্ত্র। আমিই পিষেছি অনেককে, আমাকেও পিষেছে অনেকে। ব্যাস্—কুইট্‌স্। এবার পালাতে চাই। পালাতে চাই জনমানবহীন দেশে। হঠাৎ মনে হল জগদম্বাকেও কি তুমি চাও না? বকবকিয়ে গেলাম। তারপর চমকে উঠলাম যখন দেখতে পেলাম ওই ফুটন্ত সমুদ্র সাঁতরে জগদম্বাই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। পঙ্কিল সমুদ্রের পাঁক লেগেছে তার চোখে মুখে। আমাব অন্তরের সমস্ত দুর্গন্ধ উত্তাল হয়ে উঠেছে তাকে ঘিরে। আমার সমস্ত পাপ সাপের মতো ফণা তুলে তেড়ে আসছে তার পিছু পিছু। তবু তার মুখের টেপা হাসিটি ঠিক আছে তেমনি। তার চোখের দৃষ্টিতে ঠিক তেমনি জ্বলছে ব্যঙ্গের হাসি। সে দৃষ্টি যেন বলছে, 'অনেক বাহাদুরি তো দেখালে, এইবার ঘরে চল। কি চেহারা হয়েছে তোমার। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গছে, চোখ বসে গেছে, উঁচু হয়ে উঠেছে গালের হাড় দুটো, চল বাড়ি চল।' হঠাৎ খুব কাছে এসে পড়ল। বলল—যাবে না? ওহো ভুলে গেছি, তুমি যে সাঁতার জান না। আচ্ছা তোমার জন্যে আমি নৌকো পাঠিয়ে দিচ্ছি। আবার সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলে গেল। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতেও লাগল আমাকে। হঠাৎ আমার মনে হল Paul Satre বোধহয় জগদম্বাকে দেখেনি কোনদিন। চার্বাক-নীতি-নিয়ে-মত্ত-লোকটা তাহলে Existantialism-এর অন্য মানে খুঁজে পেতো হয় তো। না, ওরা জগদম্বাকে দেখেনি।

দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল সে। আর তার পরই দেখলাম একটা নৌকা ভেসে আসছে আমার দিকে। সাধারণ নৌকো নয়— সোনার তরী। তার হালের দিকটা কালো, আর মনে হল নৌকোটা যেন দুটো ডানা বিস্তার করে রয়েছে দু'দিকে। যেন উড়ে চলে আসছে। কাছে আসতে দেখলাম বাই জোভ—এ যে বিরাট একটা হলদে পাখি। কাছে এসেই মিষ্টি সুরে ডেকে উঠল—টিউ—টিউ। কিন্তু আমি উঠতে পারলাম না সেই সোনার নৌকোয়। ভিড় করে এল রংকি, চিনু, সুজাতা, শ্যামা, সন্ধ্যা, সুলেখা, বিন্দু, তাদের পিছনে সার বেঁধে এল আরও

অনেকে—সবাই সমস্বরে বলল, 'আমরাও যাব, আমরাও যাব।' পালিয়ে গেল হলদে পাখি। উড়ে চলে গেল। আর তার নাগাল পেলাম না। ওরা যখন আমায় বন্দী করেছিল তখনই পেয়েছিলাম আমি মুক্তির ডাক। কিন্তু সে ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না। কিন্তু দিতেই হবে। একটা মুশকিল হয়েছে কিন্তু। কোনটা মায়া, কোনটা ছায়া, কোনটা বাস্তব, কোনটা অবাস্তব, কোনটা ফিকশন্, কোনটা ফ্যাক্ট, কোনটা রিয়ালিটি, কোনটা ইল্যুশন— ঠিক করতে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ওরা যে আমায় স্ট্রেট্ জ্যাকেট পরিয়েছিল সেটা আমার ইল্যুশন্, আমি মনে মনে নিজেই নিজেকে বন্দী করেছিলাম অর্থাৎ সমাধিস্থ হয়ে ছিলাম। সমাধিস্থ হয়ে যা দেখেছি—ওই আবার—টিউ—টিউ। হলদে পাখিটা এসেছে। গীটার গীটার—জানলা দিয়ে দেখ তো—

গীটার সত্যি সত্যি এসে হাজির হল। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে সত্যি গীটাব তো? না মিথ্যে-গীটার, মায়া-গীটার?

গীটার বলল,—"বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন নিয়ে আসব তাঁকে।'

"তোমার বাবা? তিনি তো অনেকদিন থেকে আমার দিকে আসছেন। আজ এসে পৌঁচেছেন তাহলে। নিয়ে এস। আমার কলঙ্ক-লাঞ্ছিত মুখ-চন্দ্রমা দেখে কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক অনুকম্পা বর্ষণ করে যান। নিয়ে এস। আমি চাপটালি খেয়ে বসছি। যতক্ষণ ইচ্ছে নিরীক্ষণ করুন তিনি আমাকে—"

সত্যি সত্যি সশরীরে এসে পড়লেন যামিনী ঘোষাল। চমকে গেলাম—যেন একটা ফুল, যেন একটা সুর, যেন একটা সুগন্ধ, যেন একটা আবির্ভাব। হঠাৎ ঈর্ষায় মুচড়ে উঠল বুকের ভিতরটা। উনি যে আকাশচুম্বী হিমালয়ের চূড়া আর আমি যে পাতালস্পর্শী অধঃপতনের শেষ সীমা তা বলে দিতে হল না কাউকে। উনি আসামাত্রই স্পষ্ট হয়ে উঠল সেটা। উনি নমস্কার করে কুণ্ঠিতভাবে বসলেন, যেন যা হয়েছে তার জন্য উনিই দায়ী। একটি কথাও বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন কেবল আমার দিকে চেয়ে। তাঁর মুখভাবে যা ফুটে উঠল তা বর্ণনা করি এমন সাধ্য আমার নেই। মনে হল একটা অনিবার্য ট্রাজেডির মুখোমুখি হয়ে উনি যেন খুব কষ্ট পাচ্ছেন, উনি যেন 'হ্যামলেট' বা 'প্রফুল্ল' দেখছেন। ওঁর মুখভাবে কোনও করুণা নেই, সান্ত্বনা নেই, আছে কেবল কষ্ট। ট্র্যাজেডি শব্দের গ্রীক অর্থটাও যেন মূর্ত হয়েছে ওঁর ওই মৌন দৃষ্টিতে। গ্রীক দেবতাদের কাছে ভেড়াদের বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হত, যে সব ভেড়াকে এখনি বলি দেওয়া হবে তাদের আর্ত অসহায় চিৎকারের গ্রীক নাম 'tragedy'. মনে হল উনি যেন আমার মধ্যে দেখছেন সেই পশুকে যাকে হাড়কাঠে ফেলা হয়েছে, যার কাঁধের উপর শাণিত খড়্গ উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছেন মহাকাল, এই আসন্ন অনিবার্য বিরাট ট্রাজেডিটা উনি যেন অনুভব করছেন প্রাণ দিয়ে। ওঁর কষ্ট হচ্ছে, ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

চীৎকার করে উঠলাম আমি।

"গীটার, গীটার শীগগির ঢেকে দাও আমাকে। লেপ কাঁথা কম্বল যেখানে যা আছে নিয়ে এস। আমাকে দেখে তোমার বাবার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। উনি এ দৃশ্য দেখতে পারছেন না। ঢেকে দাও আমাকে শীগ্গির ঢেকে দাও।"

যামিনী ঘোষাল ভয় পেয়ে গেলেন। নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

দেখলাম গীটার শশব্যস্ত হয়ে আবার ফোন করছে। আবার সেই গুঁফো ডাক্তারটাকে ডাকছে নাকি। আবার কি ইলেকট্রিক 'শক্' দেবে, আবার কি জ্যাকেট পরিয়ে রাখবে—!

"গীটার—গীটার—গীটার— শোন।"

গীটার এসে দাঁড়াল আমার কাছে।

বললাম—"দেখ এভাবে দগ্ধে দগ্ধে আমাকে মেরো না। তোমরা আরাংজেবের নকল করে বন্দী করে রেখেছ আমাকে। কিন্তু আরাংজেব তো শাজাহানকে ইলেকট্রিক শক দেয়নি, স্ট্রীট্ জ্যাকেট পরায়নি। আরাংজেবের ঠাকুর-দার বাবা যা করেছিলেন তাই করে ফেল না তোমরা। তিনি জীবন্ত আনারকলিকে গেঁথে ফেলেছিলেন তার চারদিকে পাকা দেওয়াল তুলে! তাই কর তোমরা। মারতে চাও তো তাই করছ না কেন? ওই গুঁফো ডাক্তারকে আমি কাছে ঘেঁষতে দেব না। এলেই আবার মারব—"

গীটার কোনও উত্তর দিলে না। যা করলে তা অদ্ভুত। গেলাসে জল ছিল টেবিলের উপর। হাতে করে সেই জল একটু নিয়ে, মাখিয়ে দিলে চোখে মুখে কানে। তারপর আঁচলে মুছিয়ে দিলে আমার মুখটা। তারপর আমার পাশে বসে আমার মুখটা টেনে নিলে নিজের বুকের উপর, টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে চাপড়াতে লাগল, ঘুম পাড়াবার সময় মা ছেলেকে যেমনভাবে চাপড়ায় তেমনি করে। চড়াৎ করে ফেটে গেল পাথরটা। জল বেরিয়ে পড়ল চোখ থেকে। তার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলাম। আর মনে মনে বলতে লাগলাম—'তোমরা অত্যন্ত ভালো, কিন্তু আমি যে পাপী, নিজের আগুনে আমি যে পুড়ে মরছি, আমার আগ্নেয়গিরির লাভা আমাকেই যে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না, আমি খারাপ, খুব খারাপ, আমাকে তুমি ছুঁয়ো না আমি অচ্ছুৎ , আমি অপবিত্র, আমি কাদা---।'

মনে মনে বলতে লাগলাম কিন্তু মুখে উচ্চারণ করতে পারলাম না। আমি পুড়ে ছাই হয়ে গেছি তবু সেই ছাইয়ের ভিতর থেকেই অহংকার বেরিয়ে এসে আমার মুখ চেপে ধরল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার আমার আর একটা সত্তা যেন ওর পায়ে পড়ে মিনতি করছিল—"দেখ, দেখ, আমাকে, দেখ আমার কি দুর্দশা হয়েছে, চুরমার হয়ে গেছি, টুকরো টুকরো হয়ে গেছি—"। এসব মনে মনে বলছিলাম কিন্তু। মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। গীটারের কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলাম শুধু। গীটার আমাকে চাপড়েই যেতে লাগল।

"বাবা, আপেলের রস খাবেন?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, অবশ হয়ে গিয়েছিল আমার জিভ, আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছিলাম, আমার সমস্ত দম্ভ, সমস্ত বর্বরতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলাম আমি।

"জানকী ফ্রিজের ভিতর কাচের গ্লাসে আপেলের রসে আছে। নিয়ে এসো।"

হঠাৎ আবদার করে বললুম—'আপেল সিদ্ধ কিন্তু খাব না।'

"না খেলেন। আপনার জন্যে আজ সুক্তো করেছি। মুগের ডাল আর মোচার ঘণ্টও করেছি—"

"তুমি কাকে ফোন করছিলে? ডাক্তারকে?"

"হ্যাঁ। উনি—"

"ও ডাক্তার যেন না আসে।"

"আচ্ছা, মানা করে দেব।"

ছোট ছেলেকে যেমন ভোলায় তেমনি করে ভোলাতে লাগল আমায় গীটার। আমি সব বুঝছিলাম, তবু ভুলছিলাম। বড় ভালো লাগছিল। জানকী আপেলের শরবৎ নিয়ে এল।

"এটা খেয়ে, চোখ বুজে শুয়ে পড়ুন এবার।"

ছোট ছেলের মতো পাশ ফিরে চোখ বুজে শুলাম। তারপর হঠাৎ বললাম—"ফ্যানটা বন্ধ করে দাও। হাত-পাখা নিয়ে আমায় হাওয়া কর তুমি।"

তাই করতে লাগল গীটার।

চোখ বুজে শুয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম। ঘুম কিন্তু এল না। গীটার হাওয়া করে যাচ্ছে। তার হাতের চুড়ির রুনঠুন্ শুনতে পাচ্ছি। একটু পরে বন্ধ হয়ে গেল শব্দটা। মনে হল গীটারের বোধহয় হাত ব্যথা করছে তাই থেমে গেছে। একটু পরেই আবার হাওয়া করবে। পাশ ফিরেই শুয়ে রইলুম মটকা মেরে। কিন্তু চুড়ির শব্দ আর হল না, হাওয়াও পেলাম না আর। গরম বোধ হতে লাগল। পাশ ফিরে দেখি গীটার নেই। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জগদম্বা।

"আমাকে তো সারাজীবন জ্বালিয়েছ। বউটাকেও জ্বালাবে?"

গীটার কি করে জগদম্বায় রূপান্তরিত হল এ প্রশ্নই জাগল না আমার মনে. আমি বিস্ফারিত-নয়নে চেয়ে রইলাম জগদম্বার দিকে। মনে হল—হ্যাঁ, ওই তো আসবে এখন।

জগদম্বা বলতে লাগল—"ও বেচারিকে নিয়ে পড়েছ কেন। আমিই তো আছি তোমার মনের মধ্যে। মনটি তো তপ্ত সমুদ্র, টগবগ করে ফুটছে। তবু আছি সেখানে। নৌকোও পাঠিয়েছিলাম একটা। এলে না কেন, শেষ পর্যন্ত তো আসতেই হবে...

জগদম্বা অন্তর্ধান করল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দেওয়ালগুলো হঠাৎ এগিয়ে এল আমার দিকে। হুমড়ি খেয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমাকে। উপর থেকে আবার খানিকটা চাপড়া পড়ল আমার খাতায়। টিউ—টিউ—টিউ—হলদে পাখিটা ডাকছে ক্রমাগত। কি বলতে চাইছে ও?

অন্ধকারে উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি। প্রতীক্ষা করছি নৌকো পাঠাবে। আমার অন্তরের মহাসমুদ্র ফুটছে। ধস ভাঙার শব্দ পাচ্ছি। মাঝে মাঝে একটা চাপা আর্তনাদও শুনতে পাচ্ছি যেন। গর্জনও। একটা সিংহকে লোহার খাঁচায় বন্দী করে কে যেন খোঁচাচ্ছে বল্লম দিয়ে। আমি কি সেই সিংহ? না, না, আমি ককুর, কুকুরের চেয়েও অধম। ওই আবার ধস ভাঙল। গর্জন আর আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল ঝড়ের শব্দে। প্রলয় হচ্ছে। এই প্রলয়ে যদি নৌকো আসে সে নৌকো কি সমুদ্র পার হতে পারবে? পারবে, যদি হলদে পাখি নৌকো হয়ে আসে। হলদে পাখীই তো নৌকো হয়ে এসেছিল, ওরা ভিড় করে এলো বলেই চলে গেল। এখন ভিড় নেই। এখন আমি নিঃসঙ্গ। গীটারও আর আসেনি। সুজনও আসেনি। গুঁফো ডাক্তার বলে পাঠিয়েছে সে আর আমার চিকিৎসা করবে না। বাঁচা গেছে। আশেপাশে কেউ নেই। আবার ধস ভাঙার শব্দ। বৈতরণীর ধস ভাঙছে না কি? আবার সমুদ্র কি বৈতরণীর খাতে ঢুকেছে? নৌকো তো আসছে না! এই গভীর অন্ধকারে এই নিশীথ রাত্রে হলদে পাখি কি নৌকো হয়ে আসতে

পারবে? হলদে পাখিরা তো রাত্রে ঘুমোয়। কিন্তু জগদম্বা কি তাকে ঘুমোতে দেবে? কিন্তু তবু ভয় হচ্ছে হয়তো সে আসবে না। হয়তো জগদম্বা তার নাগাল পাবে না। হলদে পাখির নাগাল পাওয়া শক্ত। ভয় হচ্ছে। এতক্ষণ নিঃসঙ্গ ছিলাম। এইবার ভয়টা আমার সঙ্গী হল। অবয়বহীন কি একটা কালো যেন সামনে এসে দাঁড়াল। আমার সারা জীবনের পুঞ্জীভূত ভয়—ধরা পড়ার ভয়, বিবেকের ভয়, কলঙ্কের ভয়, আরও কত নাম-না-জানা ভয়—সবাই একসঙ্গে এসে হাজির হল যেন। অন্ধকারের মধ্যে ঘনতর আর একটা অন্ধকারের স্তূপ। ওটা তো আমার ভিতরে ছিল, বাইরে এল কি করে। এগিয়ে আসছে...হ্যাঁ, এগিয়ে আসছে...মনে হচ্ছে বিরাট একটা ভালুক পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে... খুব কাছে এসে পড়ল যে। লিয়াকৎ—লিয়াকৎ—। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না আমার। লিয়াকৎ শুনতে পাচ্ছে না আমার ডাক। গীটার—গীটার—নাঃ স্বর বেরুচ্ছে না।

"ভয় পাবেন না। আমি আপনার অনিষ্ট করব না।"

"কে আপনি।"

"আমি সেই দারোগা যাকে আপনার লিকায়ৎ খুন করেছিল।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তারপর মনে পড়ল সুজনকে সেই চেক্‌টা তো লিখে দিইনি। ওর ছেলেমেয়েরা এখনও হয়তো অকূলপাথারে ভাসছে। আরও ভয় পেয়ে গেলাম। নির্বাক একটা আতঙ্কে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। আবার ধস ভাঙছে। একটা হাহাকার যেন বাষ্পময় হয়ে উঠল—হু হু করে হাওয়া বইছে। অন্ধকারের স্তূপটা আবার এগোচ্ছে আমার দিকে। কাঁধের উপর লাফিয়ে পড়বে না কি। খুব কাছে এসে সে কিন্তু যা করল তা আশ্চর্য। চুপি চুপি বলল—"আলোটা জ্বালুন। আলো জ্বললে আর ভয় থাকবে না।"

বেড্‌সুইচ্‌টা হাতড়ে টিপে দিলাম। মনে হল একটা পুড্‌ল (poodle) কুকুর যেন ছুটে পালিয়ে গেল। একটা মেমসায়েবকেও যেন দেখতে পেলাম আবছা। তারপর নজর পড়ল বেড্‌সুইচ্‌টার তারের উপর। হলদে রং, হলদে পাখির মতো হলদে। নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম সেটার দিকে। তাহলে কি জগদম্বা আবার নৌকো পাঠিয়েছে? এটা কি হলদে পাখির ছদ্মবেশ? সবই তো ছদ্মবেশ, আসল রূপ তো কারো দেখলাম না আজ পর্যন্ত। নিশ্চয়ই এটা হলদে পাখি—জগদম্বা পাঠিয়েছে। টিউ—টিউ—টিউ—ওই যে হলদে পাখি ডাকছে। যাচ্ছি যাচ্ছি। যাবার আগে যা যা ঘটেছে সব লিখে যাব। কেউ বিশ্বাস করবে না—তবু লিখে যাব।

পরদিন সকালে গীটার চা নিয়ে এসে দেখল নেপাল চাটুজ্যের মৃতদেহটা মেজের উপর পড়ে আছে। তিনি বেড্‌সুইচ্‌টা মুখের ভিতর পুরে চিবিয়েছেন।

আগ্নেয়গিরি নির্বাপিত হয়েছে।

সুজন এতদিন কাঁদেনি। এইবার কিন্তু ভেঙে পড়ল। সে গম্ভীর লোক। গীটার একদিনও তার চোখে জল দেখেনি। তার এই কান্না দেখে বিচলিত হয়ে পড়ল সে। সান্ত্বনার সুরে বলল—"কেউ তো চিরকাল থাকে না। বাবা খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন, আর এ অসুখ তো সারত না, সব রকম চেষ্টাই তো করা হল—"

সুজন নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল গীটারের দিকে।

তারপর বলল—"বাবা বারবার লিখে গেছেন আমি পাপী আমি পাপী। কিন্তু এখন বারবার মনে হচ্ছে আমিও পাপী। আমি বাবাকে শ্রদ্ধা করতে পারিনি। যা করেছি তা কর্তব্যের খাতিরে। ভালবাসতে পারিনি তাঁকে। ভুলে গিয়েছিলাম তিনি আমার বাবা। ভুলে গিয়েছিলাম যে পরিবেশে তিনি পড়েছিলেন সে পরিবেশে পড়লে আমিও হয়তো ওই রকম হতাম। আমি হেরে গেছি গীটার। আমি ছেলে হতে পারিনি, বিচারক সেজেছিলাম। এখন আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমি পাপী মহাপাপী—"

গীটার চুপ করে রইলো। সুজন আবার বলে উঠল—"মহৎ মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। আমি মহৎ হতে পারিনি, সেইটিই আমার দুঃখ—"

আবার তার দু'চোখ জ্বলে উঠল।

"তোমার জন্যে একটু চা আনি?"

সুজন জবাব দিল না। গীটার চলে গেল চা আনতে।

সহসা সুজনের মনে হল গভীর অন্ধকারের মধ্যে তার বাবার মুখটা ফুটে উঠল। তিনি যেন নীরব ভাষায় বললেন—"কাঁদছ সুজন? আমিও কাঁদছি। কিন্তু আমার এ অন্তিম রোদন তোমরা কেউ শুনতে পাবে না। আমি বোবা হয়ে গেছি, লুপ্ত হয়ে গেছি অন্ধকারে।"

সন্ধিপূজা
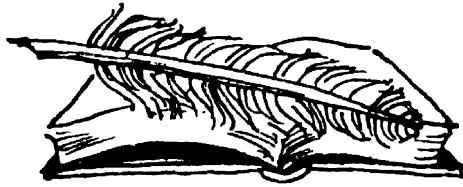
।। এক।।

সেদিন বড়ই গরম। চৈত্র মাস। আকাশে প্রতপ্ত সূর্য মীন রাশিতে অবস্থান করিয়া স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতেছেন। কোথাও পাতাটি নড়িতেছে না। এখনকার হিসাবে কালটা সেকাল। এখন যেটাকে কলিকাতা বলি তখন সেটার নাম ছিল সুতানুটি! চারিদিকে তখনও গ্রাম্য ভাব অপরিবর্তিত। মাঝে মাঝে দুই একটি পাকাবাড়ি আছে বটে, কিন্তু খড়ের বাড়ি এবং খাপরার বাড়িও বিস্তর। টিনের চালও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কাঁচা নালি রাস্তার দুইধাবে ভটভট করিতেছে। রাস্তাও কাঁচা। বর্ষার সময়ে চারিদিক কাদায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পুকুর ডোবাও কম নাই। প্রতি পল্লীতেই প্রায় একটা করিয়া পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে নারিকেল, সুপারি ও তালের গাছ। ভাল পুকুরও আছে, আবার শ্যাওলা-ঢাকা মজা পুকুরেরও অভাব নাই। অনেক বাড়ির সামনে বা পিছনে ছোট ছোট সব্‌জি-বাগান। সেখানে বেগুন, পুঁইশাক, পালং শাক, লাউ গাছ, কুমড়ো গাছ প্রভৃতির ভিড়। কলাগাছও প্রচুর। এসব ছাড়াও মাঝে মাঝে আম জাম কাঁঠাল গাছও রাস্তার ধারে ধারে আছে। সেগুলির মালিক কোম্পানি, কিন্তু সেগুলির ফল ভোগ করে পাড়ার পাঁচজন। বড় রাস্তা হইতে কিছুদূরে বেশ বড় একটি বাগান। বাগানের একধারে ছোট একটি বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালগুলি পাকা, কিন্তু ছাদ পাকা নয়। খাপরা, এবং একদিকে খানিকটা খড়ের চাল আছে। ইহার উপর একটি চারকোনা গৈরিক পতাকা উড়িতেছে। ইহার অর্থ বাড়িটির মধ্যে কোনও দেবতা আছেন। ঘরের পূর্ব দিকের দেওয়ালটায় ছোট একটি জানালা রহিয়াছে। একটিমাত্র দ্বার। সে দ্বারে প্রকাণ্ড একটি তালা ঝুলিতেছে। দেশী তালা নহে, বিদেশী ভালো তালা। বেশ বড় এবং ভারী। মন্দিরটির ভিতর আছে একটি শিবলিঙ্গ। স্বয়ম্ভু বহুকাল পূর্বে নাকি স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই স্থানে, মাটি ভেদ করিয়া। তাহার পূর্বে একটি স্বপ্ন দিয়াছিলেন বর্তমান মালিক ধূর্জটিমঙ্গল চৌধুরির পিতা মহেশমঙ্গল চৌধুরিকে। স্বপ্নে মহেশমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন—"দেখ্ মহেশ, তোর এই বাগানের কোণে বহুদিন থেকে মাটির নীচে আছি। বাংলাদেশে পাল রাজত্ব শুরু হবার অনেকদিন আগে বীরভদ্র নামে একজন তান্ত্রিক হিন্দু আমাকে এখানে স্থাপিত করেছিলেন। পাশে একটি কালীর মূর্তিও ছিল। কিন্তু অনাচারে অবিচারে অত্যাচারে যখন দেশ ছেয়ে গেল তখন বিদ্রোহ হল দেশে। পালবংশ স্থাপিত হল। তারা সব বৌদ্ধ। তারা হিন্দুদের মূর্তি সব লোপাট করতে লাগল। হঠাৎ একদিন দেখলাম আমার পাশের কালীমূর্তিটি অন্তর্ধান করেছে। রণরঙ্গিনী নিজেই অন্তর্ধান করেছেন, কেউ তাঁকে তুলে নিয়ে যাননি। আমিও ইচ্ছা করলে গা-ঢাকা দিতে পারতুম। কিন্তু আমি স্থাণু লোক, কোথাও নড়া-চড়া করতে চাই না। আমি থেকেই গেলুম। ভাবলাম, দেখাই যাক না কি হয় শেষ পর্যন্ত। বৌদ্ধদের আমলে আমার ভারী দুর্দশা হয়েছিল। আমার মন্দিরটা ভেঙে গেল। তাতে ভারী আরাম পেলুম। তুমি আর যেন মন্দির করাতে যেও না। ধুমধাম করে পুজো করবারও দরকার নেই। মনে মনে

পুজো কোরো, তাহলেই আমি সন্তুষ্ট হব। খোলা-মেলা জায়গাই আমার ভালো লাগে। তোমার বাগানটা পাহারা দেব আমি। চোরের দেশ তো, অনেকেই তোমার বাগানের ফল চুরি করে নিয়ে যায়। আমি তাদের নাম চিত্রগুপ্তের খাতায় লিখিয়ে দেব, বাছাধনরা পরে মজাটা টের পাবেন। আমি এখানে থাকব, কেউ আমাকে নাড়াতে পারবে না। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।"

মহেশমঙ্গল প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"মা কালী কোথায় গেলেন? তাঁকে কি খোঁজবার চেষ্টা করব?"

"না, চেষ্টা করলেও তুমি পারবে না। তিনি ইচ্ছা না করলে কেউ তাঁর নাগাল পায় না। তিনি সর্বত্র আছেন, এখানে আছেন। তিনি ইচ্ছাময়ী, যখন ইচ্ছা করবেন এখানে তিনি আবির্ভূতা হবেন। তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিও না।"

মহেশমঙ্গল বলিলেন—"কিন্তু আপনি বাবা একলা থাকবেন, সেটা কি ভালো দেখায়?"

মহাদেব হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি কখনও একা থাকি না। শক্তি সর্বদা আমার সঙ্গে থাকেন। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না।"

মহেশমঙ্গল ইহা লইয়া আর মাথা ঘামান নাই। মহাদেবের পাকা মন্দিরও আর নির্মিত হয় নাই। তিনি স্বপ্নের কথাটা অবশ্য সকলকে বলিয়াছিলেন। সেই হইতেই কথাটা রটিয়া গিয়াছিল যে স্বয়ং মহাদেব তাঁহার বাগান পাহারা দেন এবং চোরদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া চিত্রগুপ্তের দফতরে পাঠান। কিন্তু অতি-বুদ্ধিমান ঘুঘু ধরনের লোকেরা কথাটা বিশ্বাস করিতেন না। বলিতেন—"মহেশবাবু চতুব লোক। তাই স্বয়ং মহাদেবকে বাগানের পাহারাদার রেখেছেন। কল্পনার জোর আছে চৌধুরী মশায়ের। কিন্তু কল্পনার মুলে কি আছে জানেন? গাঁজা আর কারণ। দিনে বিশ পঁচিশ ছিলিম গাঁজা খান আর বোতল বোতল কারণ। এরই জোরে উনি মহাদেবকে বাগানের পাহারাদার বানিয়েছেন। খলিফা লোক বটে।"

এইবার ধূর্জটিমঙ্গলের পূর্বপুরুষের ইতিহাস একটু স্মরণ করা যাক। মহেশমঙ্গল বিবাট বড়লোক ছিলেন। জমি জায়গা বিস্তর ছিল। নবাবী আমল হইতে যে সব বিষয়সম্পত্তি জায়গীরস্বরূপ পাইয়াছিলেন সেগুলি তো ছিলই, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াও বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন তিনি। শোনা যায় আলিবর্দী খাঁর সুনজর ছিল তাঁহার উপর। তিনি যখন বঙ্গদেশে আসিয়া সরফরাজ খাঁকে গদিচ্যুত করিয়া সেই গদিতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন তখন মহেশমঙ্গল বালক মাত্র। তাঁহার পিতা শঙ্করমঙ্গল তখন এক বিখ্যাত ডাকাতদলের নেতা ছিলেন। শঙ্করমঙ্গলের ডাকাতরা আলিবর্দী খাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। আলিবর্দী নিজের সৈন্যদলে শঙ্করমঙ্গলকে ভর্তি করিয়া লইয়াছিলেন। আততায়ীদের সহিত এক সংঘর্ষে-শঙ্করমঙ্গল মারা যান। তখন মহেশমঙ্গলের বয়স মাত্র যোল বৎসর। আলিবর্দী তাঁহাকে অনেক জমি দান করেন। নানারকম ব্যবসার সুযোগ করিয়া দেন। নবাব-অন্তঃপুরে যে সমস্ত জরির কাপড়, জরির ওড়না, জরি-খচিত জামা ব্যবহৃত হইত তাহা সরবরাহ করিবার ভার মহেশমঙ্গলকে দিয়াছিলেন তিনি। বর্গীর হাঙ্গামার সময় সুযোগ পাইয়াও মহেশমঙ্গল সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করেন নাই। তিনি শান্তিপ্রিয় নির্বিবাদী লোক ছিলেন। আলিবর্দীর শাসনকালেই তিনি সর্পাঘাতে মারা যান। মহেশমঙ্গল পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধূর্জটিমঙ্গলও একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন মহেশমঙ্গলের। তাঁহার অনেকগুলি ভগ্নী ছিল,

জগদম্বা, দুর্গা, জয়া, শ্যামাঙ্গিনী, মহামায়া ও বারাহী। সেকালের কুলপ্রথা অনুযায়ী সকলেরই কুলীনের ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, প্রত্যেক কুলীনের ঘরে শতাধিক পত্নী ছিল, সুতরাং ধূর্জটিমঙ্গলের ভগ্নীরা কেহ পতিগৃহে গমন করেন নাই। টাকার লোভে পতিরাই মাঝে মাঝে পত্নীদের নিকট আসিয়া রাত্রিবাস করিয়া যাইতেন। তাঁহাদের বংশবৃদ্ধিও হইয়াছিল। ধূর্জটিমঙ্গলের দুই যমজ পুত্র শম্ভুমঙ্গল এবং জটামঙ্গল পলাশীর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধূর্জটিমঙ্গলের তৃতীয়া পত্নী জগদ্ধাত্রী তাঁহাদের জননী ছিলেন। জগদ্ধাত্রীর পিতা রামলোচন নবাব দরবার হইতে খান উপাধি পাইয়াছিলেন। নবাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁহার রূপসী যুবতী কন্যা জগদ্ধাত্রীর উপর নবাব সরকারের জনৈক সিরাজ-পারিষদের কু-নজর পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি ভয় পাইয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে সিংভূমের জঙ্গলে এক সাহেবের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দেন। সাহেব ব্যবসায়ী ছিলেন। নানারকম পশুচর্ম সংগ্রহ করিয়া তিনি বিলাতে চালান দিতেন। বিলাত হইতে আমদানী করিতেন বিলাতী মদ। নবাব দরবারে সে মদের খুব চাহিদা ছিল। দিল্লী এবং মুর্শিদাবাদে মদ বিক্রয় করিবার কেন্দ্র ছিল তাঁহার। কিন্তু তিনি বাস করিতেন সিংভূমের জঙ্গলে। তাঁহার জংলি কুঠি রক্ষা করিবার জন্য একদল বন্দুকধারী গোরা পাহারাদার ছিল। সাহেবের নাম ছিল জন। জন সাহেবের জংলি কুঠি বিখ্যাত স্থান ছিল ও অঞ্চলে। জগদ্ধাত্রীর পিতা রামলোচন খানের সহিত জন সাহেবের আলাপ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে। রামলোচনের সহায়তাতেই তিনি নবাব সরকার হইতে ব্যবসায় করিবার অনুমতি লাভ করেন। এজন্য তিনি রামলোচনের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। রামলোচন একদিন গভীর রাত্রে সপরিবারে কয়েকটি পালকি করিয়া জন সাহেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "আমাকে রক্ষা করতে হবে। আমার বিবাহিতা মেয়েকে আর ওদের নজরের সামনে রাখবার সাহস হল না। আগামী পূর্ণিমায় আমার জামাই আসবার কথা, কিন্তু তা আর হয়ে উঠবে না মনে হয়। কারণ ব্যাপারটা আমি গোপন রাখতে চাই।"

জন সাহেব লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। গালের দুই-ধারে জমকালো মটন-চপ দাড়ি ছিল। রামলোচন যখন গেলেন তখন গভীর রাত্রি। জন সাহেব তখন তিনটি ওরাঁও যুবতীর গান শুনিতেছেন! একজন সম্মুখে, দুই জন দুই পাশে। চার জনই বেশ সুরাপান করিয়াছেন। রামলোচনের অভ্যাগমে রস-ভঙ্গ হইল। কুঠির বাহিরে কলরব শুনিয়া জন সাহেব বন্দুক লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ওরাঁও রমণী তিনটিও তিনটি শাণিত তরবারি লইয়া সাহেবের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। ইহারা শুধু সাহেবের প্রমোদসঙ্গিনী নহে, বডি-গার্ডও। বাহিরে বন্ধু রামলোচনকে দেখিয়া সাহেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মুখে সব কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভয় কি, আমি তোমাকে রক্ষা করব।" বলিলেন অবশ্য সাহেবী বাংলা উচ্চারণে। আমি সে বাংলা আমাদের উচ্চারণে লিখিলাম। কিন্তু রামলোচন যখন নিজের জামাতার কথা উল্লেখ করিলেন এবং সে আসিতে পারিবে না বলিলেন, তখন সাহেব ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিলেন—"হোয়াই? সে নিশ্চয়ই আসবে। বাধা কি? সে থাকে কোথায়, তার নাম কি বল।"

"নাম তার ধূর্জটি। থাকে বারাসতে। ওর সুতানুটিতে কিছু বিষয় আছে, মাঝে মাঝে

সেখানে গিয়েও থাকে। এখন বারাসতে আছে।''

সাহেব ধূর্জটি নামটা কায়দা করিতে পারিলেন না। যাঁহারা গঙ্গাকে গ্যাঞ্জেস করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে শুদ্ধভাবে ধূর্জটি উচ্চারণ করা শক্ত। জর্জ শব্দটা তাঁহাদের পরিচিত। জন বলিলেন,''জর্জটিকে এখানে আসতে হবে। তাকে আনতে আমি আমার গোরাদের পাঠাব। সঙ্গে ঘোড়া ও পালকি থাকবে। ভয়ের কোনও কারণ নেই। ইউ সি দিস?''

বন্দুকটা তুলিয়া দেখাইলেন।

''এর ভয়ে সবাই কাবু।''

তাহার পর পকেট হইতে একটি মোহর বাহির করিয়া বলিলেন, ''আর এর কাছে সবাই জব্দ। আলিবর্দী দিল্লীর বাদশাহকে কয়েক কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে বাংলার মসনদে কায়েম হবার অনুমতি পেয়েছিল। জান?''

''জানি না। আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখি না।''

''বাট্ ইট ইজ এ ফ্যাক্ট। জর্জটিকে আনতে যারা যাবে তাদের সঙ্গে বন্দুক আর মোহর দুইই থাকবে।''

একটি ওঁরাও মেয়ের দিকে চাহিয়া জন আদেশ করিলেন, ''রোমনি, তুমি দানিয়েলকে ডেকে আন।''

রোমনি মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল।

রামলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, ''দানিয়েল কে?''

''দানিয়েল পর্তুগীজ। দুর্ধর্ষ জলদস্যু একজন। আগে ওদের হুগলীতে কুঠি ছিল। প্রবল প্রতাপ ছিল ওর বাবার. শাহজাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলাদেশে চলে আসেন তখন তিনি শাহজাহানকে নৌবহর দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু মমতাজ বেগমের দুটো বাঁদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে কেলেঙ্কারী কাণ্ড করে ফেললেন ভদ্রলোক শেষকালে। তাদের অপহরণ করে বেইজ্জত করলেন। শাহজাহান ক্ষেপে গেলেন এই শুনে। তিনি হুগলীর সমস্ত পর্তুগীজদের বন্দী করে দিল্লী পাঠাবার হুকুম দিলেন। কিছু পর্তুগীজ অবশ্য পালাতে পেরেছিল।''

জনের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পুনরায় পকেট হইতে মোহরটি বাহির করিয়া বলিলেন—''এর জোরে। আমি পাঁচ হাজার মোহর ঘুষ দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছিলাম দানিয়েলকে এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের। দানিয়েলের বাবার সঙ্গে আমার বাবার বন্ধুত্ব ছিল। আমার বাবা সবে তখন এদেশে এসেছেন। জাহাঙ্গীর বাদশার হুকুম মতো সবে তখন তিনি এদেশে ব্যবসা করবার অনুমতি পেয়েছেন। দানিয়েলের বাবা তখন খুব সাহায্য করেছিলেন তাঁকে। লুটের মালপত্তর খুব সস্তা দামে বিক্রি করতেন তাঁর কাছে। সেই মাল বাবা বিলেতে চালান করতেন। তাই আমি যখন শুনলাম দানিয়েল বিপদে পড়েছে, তখন তাকে ছাড়িয়ে আনলাম। দানিয়েল এখন আমার বিশ্বাসী বন্ধু। তার উপরই জর্জটিকে আনবার ভার দিচ্ছি।''

রোমনি একটু পরেই দানিয়েলকে ডাকিয়া আনিল।

দানিয়েল গ্যাঁট্টাগোট্টা বলিষ্ঠ ব্যক্তি। মুখে লাল গোঁফ দাড়ি। দেখলেই মনে হয় খুব ধূর্ত ও বেপরোয়া।

জন হাসিমুখে আগাইয়া গেল এবং দানিয়েলের সহিত করমর্দন করিয়া বলিল—

"দানিয়েল, রোমনি তোমাকে একটি অনুরোধ করতে চায়। কিন্তু নিজে সে লজ্জায় সেটা বলতে পারছে না। তাই আমাকে দিয়ে বলাচ্ছে—তোমাকে কিছু বলতে ও স্বভাবতই লজ্জা পায়।"

রোমনি মুখ ফিরাইয়া হাস্য গোপন করিল।

জন বলিতে লাগিল—"আমার বন্ধু রামলোচন তাঁর মেয়েকে এখানে এনেছেন নবাবের ভয়ে। তাঁর জামাই জর্জটি আছেন বারাসতে। সেই জামাইকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। আপনার মেয়ের নাম কি?"

রামলোচন বলিলেন, "জগদ্ধাত্রী—।"

"জাগ্ট্রি। রোমনির খুব ভালো লেগেছে জাগ্ট্রিকে। ওর ইচ্ছে জাগ্ট্রির স্বামী এখানে আসুক। তুমি ছাড়া এ ভার কাকে দিই বল। রোমনি মুখ ফুটে তোমাকে বলতে পারছে না, তাই আমিই বলছি।'

দানিয়েল রোমনির দিকে এক নজর চাহিয়া দেখিল। তাহার পর রোমনিকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"আই ক্যান প্লাক দি স্টারস ফ্রম দি স্কাই ফর ইউ ডার্লিং।" তাহার পর জনের দিকে চাহিয়া বলিল—"রেস্ট অ্যাসিওর্ড, আই শ্যাল ব্রিং জর্জটি হিয়ার। হোয়্যার ইজ হি?"

রামলোচন তাহাকে ধূর্জটিমঙ্গলের ঠিকানা দিলেন।

দানিয়েল অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

রামলোচন জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রোমনিকে এর মধ্যে জড়ালেন কেন?"

রোমনি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

"ওসব সাহেবের ছুতা গো। চালাকি—"

জন হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"শি ইজ রাইট। ইট্ ইজ্ এ ট্রিক। দানিয়েল রোমনিকে ভালবাসে। ওর প্রেমে দানিয়েলের নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে। কিন্তু রোমনি ওকে আমোল দেয় না। আর আমারও কড়া হুকুম বলাৎকার করা চলবে না। ওকে যদি রাজি করাতে পার, আপত্তি নেই। কিন্তু জবরদস্তি চলবে না। রোমনি রাজি হচ্ছে না, দানিয়েল হাবুডুবু—এই এখন অবস্থা। তাই রোমনির নাম দিয়ে অনুরোধটা জানালাম, দানিয়েল প্রাণ দিয়ে করবে। রোমনি এদের থাকবার ব্যবস্থাটা কোথায় করা যায়—রঙ্কিণী দেবীর মন্দিরের কাছে আমাদের যে কুঠিটা আছে—"

"সেটাতে কেউ নেই। মন্দিরে ঝামরি আছে।"

জন রামলোচনকে বলিলেন—"ওইখানেই তোমরা থাকো। বেশ বড় কুঠি। বড় হাতা আছে। পুকুরও আছে একটা। একটু দূরে রঙ্কিণীর মন্দির, সেখানে ঝামরি থাকে।'

"ঝামরি? সে আবার কে?"

"ঝামরি রঙ্কিণীর সেবায়েত। এমনি লোক বেশ ভালো। মাঝে মাঝে ওর ভয় হয়। তখন অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে। শি বিকাম্স এ স্ট্রেঞ্জ ওম্যান। কিন্তু অন্য সময় খুব ভালো। তির্কির কি রকম আত্মীয় হয়, না?"

আর একটি ওরাঁও মেয়ে বলিল—"আমার পিসী। বাপের বুইন—"

"তুমিই তাহলে এদের নিয়ে যাও তার কাছে। আলাপ করিয়ে দাও।"

"আসেন। আপনিও সাহেব আসেন। আপনাকে পিসি খুব ভক্তি করে। বলে সাহেব রঙ্কিণী

মায়ের সেরা ভক্ত। আপনাকে দেখলে পাগলী বড় খুশী হয়। আপনিও চলেন সঙ্গে।"

রামলোচন বলিলেন, "পাগলী না কি?"

"পাগলী না তো কি। কখনও কাপড় পরে, কখনও ন্যাংটা থাকে। মাথায় তেল দেয় না। কখনও কাঁচা মাংস খায়, কখনও পোড়া মাংস খায়। কখনও কাঁদে কখনও হাসে, কখনও নাচে কখনও দিনের পর দিন ঘুমায়! দিনের পর দিন উপবাস করে। পাগলীই তো। কিন্তুক ওর খ্যামতা আছে। দানিয়েল সাহেবের গুণ্ডা ভাইটাকে ঝামরিই তো খতম করলে বাণ মেরে। বলেছিল খবরদার আমার যখন ভর হয় তখন এসে হাল্লা করবি না, করিস তো চিরতরে মুখ বন্ধ করে দেব তোর। দিলেক তো। আসেন আপনারা—"

রামলোচন, জন সাহেব এবং জগদ্ধাত্রী তির্কির পিছু পিছু গেলেন। রামলোচন ঝামরিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। ভয়ও পাইলেন একটু। রঙ্কিণীর মন্দিরের কাছে উলঙ্গিনী ঝামরি দাঁড়াইয়া ছিল। হাতে একটি পোড়া কাঠ। ঝাম্‌রি পীন-পয়োধরা তন্বী। পূর্ণ যুবতী। চোখ দুইটি বড় বড় এবং চোখের দৃষ্টি মর্মভেদী। মাথার চুল তৈল-বিহীন। মনে হয় যেন মাথায় চামর বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কুচকুচে কালো রং, যেন কালো পাথর কুঁদিয়া কোন প্রতিভাবান শিল্পী ঝামরিকে সৃষ্টি করিয়াছে। জন সাহেবকে দেখিয়া ঝামরি পোড়া কাঠখানা ফেলিয়া দিল। তাহার পর আগাইয়া আসিল। "কি গো সাহেব। তোমার রঙ্কিণীকে একটু শাসন কর না কেন। সহজে মুখ খুলতে চায় না। কাল থেকে সাধ্যসাধনা করছি, কিছুতেই উত্তর দেয় না। শেষে আজ নিমগাছের ডাল পুড়িয়ে ঠেঙালাম, তখন জবাব দিল।"

"কিসের জবাব চাও"—জন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ইংরেজের সঙ্গে সিরাজের লড়াই হবে। জগা জানতে চায় সে যুদ্ধে কে জিতবে—"

"জগা কে?"

"জগৎ শেঠ গো। সে হরু পুরুতকে পাঠিয়েছে আমার কাছে। কাল থেকে উপোস দিয়ে ধরনা দিয়েছে বামুনটা আমার ঘরে। এদিকে রঙ্কিণী মুখ খোলে না। বড় বেয়াড়া হয়েছে আজকাল। ঠেঙালাম, তখন বললেক—ইংরেজরা জিতবেক।"

তাহার পর হঠাৎ জগদ্ধাত্রীর দিকে চাহিয়া ঝামরি বলিয়া উঠিল—"আরে ই কে—"

হাসিমুখে আগাইয়া আসিল তাহার দিকে। তাহার পর তাহার পেটে একটা খোঁচা মারিয়া—দুইটি আঙুল তুলিয়া দেখাইল। জগদ্ধাত্রীর গর্ভে যে যমজ সন্তান হইবে এই ইঙ্গিতই করিয়াছিল ঝামরি। কিন্তু তখন তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। পাগলীর কাণ্ড ভাবিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল সকলে। জগদ্ধাত্রী ভয় পাইয়া গিয়াছিল।

জন সাহেব বলিলেন—"এ মেয়েটি এখন সপরিবারে তোমার কাছেই থাকবে ওই কুঠিতে। ওঁর বাবা রামলোচন খান আমাদের বন্ধু লোক। সিরাজের আমলারা ওঁর মেয়ের উপর কু-নজর দিয়েছে। তাই পালিয়ে এসেছে তোমার কাছে। তোমার ভরসায়—"

ঝামরির চোখের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে প্রখর হইয়া উঠিল।

"মিছা কথা বলছিস কি লেগে? ওরা আইছে তোর কাছে তোর ভরসায়। তুই তো একটা মরদের মতো মরদ। বরগিদের এখানে ঢুকতে দিস নাই। তোর কাছে আসবেই তো। বরগিরা যখন আমার বুইন খাজরিকে ধরেছিল তখন যদি তুই থাকতিস সে বেঁচে যেত। অমিও তোর কাছে পালিয়ে এসে বেঁচেছি। ওরাও থাক, আমি দেখাশোনা করব—সিরাজ ধ্বংস হবেক।"

।। দুই।।

জন সাহেবের আশ্রয়ে জগদ্ধাত্রী অনেকদিন ছিলেন। রামলোচন মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার খোঁজখবর করিয়া যাইতেন। জগদ্ধাত্রীর স্বামী ধূর্জটিমঙ্গলও আসিতেন মাঝে মাঝে। শিকারে তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। বন্দুক দিয়া নিরীহ পশুপক্ষী শিকার করিতেন না তিনি। যাহারা করিত, তাহাদের তিনি বলিতেন,"পাখি-মারা বীর ওরা। মহাবীরই বলতাম, কিন্তু লাফিয়ে সমুদ্র পার হতে পারে না যে। কেবল দূর থেকে গুলি ছুঁড়ে নিরীহ পাখিগুলোবে মারে। বাঘের হাঁকাড় শুনলে ছুটে পালায়, কিন্তু নিরীহ খরগোশগুলোকে তাড়া করে তাদের মারে আর খেয়ে ফেলে। বীর ওরা, কিন্তু এখানেও মহাবীরের সঙ্গে তফাত আছে ওদের, কারণ মহাবীর মাংসাশী ছিলেন না। আমি বাঘ, ভালুক, নেকড়েদের মারি সম্মুখ যুদ্ধে, আর তারা যখন মারা পড়ে তখন তাদের মাংস আমি খাই না।" ধূর্জটিমঙ্গল সত্যই বড় শিকারী ছিলেন। হাতে একটা ছোট বল্লম এবং কাঁধে বেঁটে একটা শালকাঠের মুগুর লইয়া তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে বাঘ, ভালুক, নেকড়ে, চিতা প্রভৃতি শিকার করিতেন। প্রায়ই দেখা যাইত মুগুরের ঘায়ে তিনি শিকারের মাথাটা ফাটাইয়া দিয়াছেন, তাহার পর তাহার বুকে বিদ্ধ করিয়াছেন শাণিত বল্লমটা। জন সাহেবের কুঠিতে অনেকদিন ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা যখন বাংলার মসনদে বসিয়া পাশবিকতার পঙ্ককর্দমে নিজেকে অবলিপ্ত করিতেছিল, যখন তাহার কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের প্রকোপ হইতে হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান কাহারও নিস্তার ছিল না, যখন সতীনারীদের আর্তনাদে, গুপ্তঘাতকের নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে নিহত নর-নারীদের অভিশাপে, ভীত রাজপুরুষদের জটিল ষড়যন্ত্রে বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মীর ললাট ভ্রূকুটিল--ঠিক সেই সময় ধূর্জটিমঙ্গল সূতানুটি ত্যাগ করিয়া সিংভূমের জঙ্গলে জন সাহেবের কুঠিতে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আগে তিনি মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করিতেন, কিন্তু ইংরেজদের সহিত নবাবের মনোমালিন্য যখন বেশ পাকিয়া উঠিল তখন তিনি সূতানুটিতে থাকা আর নিরাপদ মনে করিলেন না। কলিকাতার আশেপাশে থাকাটাও বিপজ্জনক মনে হইল তাঁহার। তিনি যখন সূতানুটিতে ছিলেন তখনই সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছিলেন। সে বিভীষিকা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে, কারণ সে সময় তিনি ও ঝক্‌মারি সূতানুটি জঙ্গলের ভিতর আত্মগোপন কবিয়াছিলেন। শুধু তিনি নন, আরও অনেক লোকও "যঃ পলায়িত স জীবতি" এই নীতি অনুসরণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। ধূর্জটিমঙ্গল লোকমুখে যতটুকু শুনিয়াছিলেন তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন জন সাহেবের কাছে।

বলিয়াছিলেন--"সায়েব, নবাব ক্ষেপে গেছে। অনেকে বলছে, যে হোসেন কুলি খাঁকে উনি হত্যা করেছিলেন তারই ভূত না কি ওঁর কাঁধে ভর করেছে। তাই উনি পাগলের মতো কাণ্ড করছেন। কোলকাতায় তোমাদের যে বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল তা তো শেষ করে দিলে লোকটা। শুনলাম তোমাদের বিরুদ্ধে খবর দিয়েছিল মেদিনীপুরের ফৌজদারী রাজরাম সিং। তোমরা যে বাগবাজারে কেল্লা করছ এ খবরটা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন নবাব। রাজরাম তাঁর ভাই নারান সিংয়ের হাতে চিঠি দিয়ে তোমাদের সব খবর নবাব বাহাদুরকে জানিয়েছে। নবাব বাহাদুর তাঁর মাসতুতো ভাই পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎজঙ্গের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছিলেন। নারান

সিংকে বললেন তুমি ছদ্মবেশ ধরে কলকাতায় যাও, আর ইংরেজদের সম্বন্ধে সব খবর যোগাড় কর। আমি শওকৎজঙ্গকে খতম করে তারপর ইংরেজদের ব্যবস্থা করব। নারান সিং ফিরিওলার ছদ্মবেশে কলকাতায় এসে ঘুরতে লাগল। আমার কাছেও কাপড় বিক্রি করতে এসেছিল একদিন। এসেই বললে--কোলকাতার কোনও সায়েবের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে কি? আমাকে কোনও বড় সায়েবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন না। ওঁরা যে রকম আমীরী চালে থাকেন তাতে মনে হয় ওঁদের কাউকে খদ্দের পেলে আমার দামী মসলিনগুলো বেচতে পারব। আমি একটু ন্যাকা সাজবার চেষ্টা করলাম--বললাম, সাহেবরা আমীরী চালে থাকেন না কি! ওরা তো বেনে, বনেদী বড়লোক তো নয়। ফেরিওলা বললে--আরে মশাই, বেনেই হোক আর বনেদীই হোক, ওদের গাড়ি-ঘোড়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, চাকর-বাকর. নাচ-মোচ্ছব দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় মশাই। আমাকে একটা সায়েবের সঙ্গে পবিচয় কবিয়ে দিন। আপনার ভাইপো জেমসের ঠিকানা বলে দিলাম তাকে। আমি বুঝতেই পারিনি যে লোকটা গুপ্তচর। কিন্তু তার পর দিনই ধরা পড়ে গেল লোকটা। গভর্নর ড্রেক হুকুম দিলেন কান পাকড়ে বার করে দাও লোকটাকে কোলকাতা থেকে। কোলকাতা যখন তোমাদের জমিদারি তখন তোমরা তা দিতে পাব। কিন্তু তবু আমার মনে হয় অতটা অপমান না কবলেই চলত। এর ওপর গুজব শুনলাম গভর্নর ড্রেক নাকি সিরাজউদ্দৌলাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন যে, জগৎবল্লভের ছেলে শরণার্থী হয়ে এসেছে তাঁদের কাছে, তাকে তিনি নবাবের হাতে সমর্পণ কববেন না। নবাব নাকি তাই চেয়েছিলেন। এর পরেই নবাবের দেখা হল নারান সিংয়ের সঙ্গে। নবাব শওকৎজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে রাজমহল পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, নারান সেইখানে গেল আর তাঁর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল--হুজুর, জাঁহাপনা, খোদাবন্দ, আমাব মানইজ্জত কিছু রইল না, আপনার হুকুমে কলকাতায় গিয়ে ওই বেনেগুলোব হাতে অপমানিত হতে হল। আপনি একটা বিহিত করুন। কলকাতায় জমিদারি করে ওরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। ওরা আপনাকে নবাব বলে আমোলই দেয় না। তখন নবাব সাহেবের মনে পড়ে গেল যে তিনি যখন বাংলার মসনদে নবাব হয়ে বসেন, তখন ইংরেজরা তাঁকে নজরানা দেয়নি তো। সত্যি ওদের বাড় খুব বেড়েছে, ওদের ঢিট্ করা দরকার। নবাব রাজমহল থেকে ফিরলেন। উদ্দেশ্য ইংরেজদেব শায়েস্তা করা।”

জন সাহেব বলিলেন, “এত কাণ্ড হয়েছে তা তো জানি না। তারপর কি হল! নবাব এসে পড়ল কলকাতায়?”

“পড়ল বলে পড়ল। হৈ হৈ করে এসে পড়ল।”

“ইংরেজরা কোন বাধাই দিলে না?”

“বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। নবাব আসছেন শুনে পেরিন বাগানের কাছে তোমাদের যে গড় ছিল সেইখানে গোটাকয়েক কামান এনে ফেলেছিল সাহেবরা। নবাবের একদল সৈন্য চিৎপুর খালের ধারে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অত হাতি ঘোড়া বড় বড় কামান আর পল্টন নিয়ে সে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না। পেরিন সাহেবের বাগানে পেরিন্স পয়েন্টের ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে এনসাইন পিকার্ড নবাবের সৈন্যের সঙ্গে লড়ে গেলেন। অনেক নবাব সৈন্য মারা গেল। বনে জঙ্গলে পালিয়ে গেল অনেকে। সেখানেও তাদের তাড়া করে গেলেন পিকার্ড সাহেব। নবাব সাহেবের সেনাপতি ছিলেন মীরজাফর, তিনি পিছু হটতে

লাগলেন। নবাব হয়তো হটেই যেতেন শেষ পর্যন্ত কিন্তু উমিচাঁদের এক জমাদার জগন্নাথ সিং নবাবের ছাউনিতে গিয়ে হাজির হল। সে নবাবকে কলকাতায় ঢোকবার একটা গোপন রাস্তা দেখিয়ে দিলে। দমদম থেকে কোলকাতা আসবার রাস্তায়, প্রায় টালার কাছাকাছি একটা ছোট সাঁকো ছিল। গরু ঘোড়া চরাতে যেত ও অঞ্চলের লোক সেটার উপর দিয়ে। ইংরেজরা নবাবের আসবার খবর পেয়ে সব সাঁকো ভেঙে দিয়েছিল, এইটেই কেবল ভাঙতে ভুলে গিয়েছিল। এই ভুলের সুড়ঙ্গ দিয়ে নবাব কিছু সৈন্য নিয়ে কলকাতায় ঢুকল। পরদিন শেয়ালদার কাছে মারাঠা ডিচের উপরকার এক নীচু সাঁকো দিয়ে নবাবের বাকি সৈন্যরা হাতি ঘোড়া উট আর কামান সুদ্ধ এসে হুড়মুড়িয়ে পড়ল কোলকাতার উপর। প্রথমে বউবাজারে পড়ল, তারপর বড়বাজারে ঢুকে সমস্ত লুঠপাট করে আগুন লাগিয়ে দিলে চারিদিকে। নবাব গেলেন হালসিবাগানে উমিচাঁদের বাগানবাড়িতে।''

জন সাহেব বলিলেন—''জর্জটি তুমি হাঁপিয়ে পড়েছ। এক পেগ পোর্ট কি শেরি খাবে? ইট উইল পিক ইউ আপ—''

ধূর্জটি বলিলেন—''একপাত্র ভাং খাওয়াতে যদি পার খেতে পারি। মদ খাব না। ভাং আছে?''

''আছে। আমার এখানে সব থাকে। বোয়—''

একটি চাপরাসী গোছের লোক আসতেই তিনি হুকুম দিলেন, জর্জটির জন্যে এক গ্লাস মেওয়া ভাং নিয়ে এস।''

ধূর্জটি বলিলেন—''কোলকাতা থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়েছে নবাব সাহেব। ফোর্ট উইলিয়ম এখন নবাবের দখলে। কোলকাতার ইতর ভদ্র সব লোক পালিয়েছে। আছে কে জান?''

''কে?''

''গোবিন্দ মিত্তির।''

''ও, দ্যাট্ ব্লাক জমিনদার? ইয়েস, হি ইজ এ টাফ্ নাট্।''

কিশমিশ পেস্তা বাদামবাটা-মেশানো দুধ চিনি গোলাপজল দেওয়া এক গ্লাস চমৎকার ভাং আসিয়া পড়িল। ঢকঢক করিয়া সেটা পান করিয়া ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—'আঃ'—''

জন বলিলেন—''আর এক গ্লাস দেবে?''

''না, আর চাই না। তোমার ভাইপো জেম্‌সের কিন্তু কোনও সংবাদ পেলাম না। শুনলাম সব সাহেবরা ফলতায় গিয়ে জমা হয়েছে। সেখানে যাওয়া গেল না। চারদিকে মিলিটারি পাহারা, বাইরের কোন লোকের যাওয়ার উপায় নেই।''

জন হাত খুলিয়া বলিলেন—''খামুস। চুপ কর।''

জন মুর্শিদাবাদ দিল্লীতে ঘোরাফেরা করিয়া দুই চারিটা হিন্দী এবং উর্দু কথা শিখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তাক মাফিক সেগুলি কথাবার্তার মধ্যে লাগাইয়া দিতেন।

ধূর্জটিমঙ্গলও হিন্দী-উর্দু বুঝিতেন। তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

জন কপালের মাঝখানে দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটি ঠেকাইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত।

তাহার পর হাঁক দিলেন—বোয়।

খানসামা আবার আসিল।

জন হুকুম দিলেন—হুইস্কি সোডা।

জন নীরবে উপর্যুপরি পাঁচ পেগ হুইস্কি পান করিয়া ফেলিলেন। তাহার পরও গুম হইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

ধূর্জটিমঙ্গল তখন প্রশ্ন করিলেন—'সায়েব, কি হল তোমার!'

জন উত্তর দিলেন, "ঠিক করে ফেলেছি। আমি কয়েকজন গোরা সৈন্য নিয়ে আজই বেরিয়ে পড়ব জেম্‌সের খোঁজে। ফলতায় যাবো। দরকার হয় ইংরেজের সেনাদলে ভর্তি হয়ে সিরাজের সঙ্গে লড়ব। আমি যতদিন না ফিরি তুমি ততদিন এখানে থাক।"

'তার মানে? তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ, যদি না ফের—'

'ওয়েট এ বিট।

জন উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। একটু পরে একটি কাগজ হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

'এই নাও—'

'কি এটা।'

'পড়ে দেখ।'

'আমি ইংরেজি পড়তে পারি না।'

জন গড়গড় করিয়া পড়িয়া গেলেন। তাহার পর বাংলা করিয়া বলিলেন, "এর মানে আমার সিংভূমের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি জাগ্‌ট্রির স্বামী জর্জটির তত্ত্বাবধানে রেখে আমি যুদ্ধে চললাম। আমার অবর্তমানে এ বিষয়ের সমস্ত আয় জর্জটি ভোগ করবে। কুড়ি বছরের মধ্যে যদি আমি না ফিরি বা আমার ভাইপো জেম্‌স না ফেরে তাহলে জর্জটি এ বিষয়ের উত্তরাধিকারী হবে। এখন বুঝলে? এতে রাজী তো?"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"এখনই তাড়াহুড়ো করে যুদ্ধে না-ই গেলে? দু'দিন অপেক্ষা করেই দেখ না হাওয়া কোন দিকে বয়—"

জন সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"নো নো নো। আই ক্যানট ওয়েট এ মোমেণ্ট। জেমস আমার প্রিয় ভাইপো, আমাদের একমাত্র বংশধর। তার খোঁজে আমাকে এখনই বেরুতে হবে। তুমি এখানে থাকো। আর এই দলিল তুমি রাখ—"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"দলিল তুমি আমার এবং আমার স্ত্রীর যে নাম লিখেছ তা ঠিক নাম নয়। আমার নাম ধূর্জটি, আমার স্ত্রীর নাম জগদ্ধাত্রী, তুমি লিখেছ—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া জন বলিলেন—"অল্ রাইট্ তুমি বাংলায় একটা দলিল লিখে ফেল, আমি তাতে সই করে দিচ্ছি।"

ধূর্জটিমঙ্গল জন সাহেবের সহিত তাঁহার আপিসঘরে গেলেন এবং বাংলায় দলিলটি লিখিয়া ফেলিলেন।

তাহার পর সাহেব বলিলেন, "যাওয়ার আগে ঝামরির সঙ্গে একবার দেখা করে যাব। সে কি বলে শোনা যাক।"

ঝামরি মন্দিরের কাছেই আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া ঘুমাইতেছিল। অনেক ডাকাডাকিতেও সে

উঠিল না। সাড়া পর্যন্ত দিল না। মুখের ঢাকা যেমন ছিল তেমনি রহিল।

জন সাহেবের সঙ্গিনী তিন জন সাহেবের হাঁকডাঁক শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সাহেব বলিলেন—"ঝামরিকে ডেকে তোল। আমি কলকাতা যাব। ওর সঙ্গে দেখা করে যাই।"

তির্কি প্রশ্ন করিল—"কোলকাতা যেছ কেন?"

"নবাবের সঙ্গে লড়াই করতে।"

"ওমা! কি হবেক গো! লড়াই করতে?"

রোমনি বলিল—"আমরাও যাব তুর সঙ্গে।"

শাউনিও বলিল—"হাঁ, আমরাও যাব। আমরাও লড়ব নবাবের সঙ্গে—"

জন সাহেব হাসিমুখে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"তোরা পারবি না।"

তিন জনই সমস্বরে বলিল—"খুব পারব।"

জন সাহেব আবার খানিকক্ষণ হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"তবে চল। দানিয়েল কিন্তু এখানে থাকবে। ওর দেখাশোনা করবে কে—"

"কেন কস্তুরী আছে, লালীর সঙ্গেও দানিয়েল জমাইছে খুব। ওর জন্যে ভামনা করিও না। ও মিনসা খুব তালেবর—" বলিতে বলিতে রোমনি হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

"আচ্ছা তাহলে ঝামরিকে ওঠা—"

"ও এখন উঠবেক নাই। ওব ভর হইছে—"

সাহেব বলিলেন—"বেশ ওর ভর নামুক। তারপর আমি যাব। ততক্ষণ সব ঠিকঠাক করি। কালো পলটনরা এখানে থাকবে। আমি গোরাদের নিয়ে যাব। পাঁচটা ঘোড়া এখানে থাকবে, বাকিগুলো আমি নিয়ে যাব। তোরা পুরুষের বেশে ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারবি তো?"

তিনজনেই সমস্বরে উত্তর দিল—"হুঁ—অ।"

"তবে তৈরি হয়ে থাক। কালো পলটনদের জামা আর পাতলুন পরে নে তোরা। কাল দশটায় বেরুব আমরা। ততক্ষণ ঝামরির ভর নেমে যাবে।"

ঝামরি তড়াক করিয়া উঠিল বসিল।

বলিল—"তুই এখনই বেরিয়ে পড়। দুপহর রাতে যখন কালপেঁচাটা ডেকে উঠবে সেই সময়ে বেরিয়ে যাবি। তাহলে কোন বিপদ হবেক নাই। ওর ডাকই তোকে আগলাবেক। ওই নবাবটাকে ধরে তার নাক কান কেটে দিয়ে আয়। আজই ও দান শা ফকিরের নাক কান কেটেছে। বড় ভালো ছিল লোকটা। মরে নাই, এখনও বেঁচে আছে। আমি রঙ্কিণীর সিঁদুর মনসাপাতায় দিব। সেটা লাগাতে বলিস, ঘা সেরে যাবেক।'

জন প্রশ্ন করিলেন—"এত খবর তুমি জানলে কি করে ঝামরি?"

"আমার ভর হইছিল যে। রঙ্কিণী আমাকে বলে গেল।"

"আমার ভাইপো জেম্‌সের খরবটাও নাও না।"

"খবর জানি। কিন্তু বুলব না—"

তাহার পর হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল সে। তাহার ভ্রূকুটিকুটিল মুখ ভয়ঙ্কর হইয়া

উঠিল, মনে হইল চক্ষু দুইটি বুঝি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। রঙ্কিণী মন্দিরের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"ওই রক্তখাকীকে শুধা। ও লরবলি চায়। বলে তুরা না দিবি তো আমি জোগাড় করে লিব।"

ঝামরি হনহন করিয়া মন্দিরের পিছনে জঙ্গলের ভিতর চলিয়া গেল, আর ফিরিল না।

সেদিন মধ্যরাত্রে পেচক ডাকিয়া উঠিল বু-ওম, বু-ওম, বু-ওম। জন তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সন্ধ্যা হইতে ক্রমাগত মদ্যপান করিয়া তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রোমনি আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল—"সাহেব উঠ উঠ! প্যাঁচাটা চেঁচাচ্ছে। উঠ, যাবার সময় হল—"

সাহেবের সাড়াশব্দ নাই।

রোমনি তখন ঠেলা দিল তাঁহাকে।

"প্যাঁচাটো ডাকছে গো, উঠ উঠ—"

"ড্যাম ইওর প্যাঁচা। লেট মি স্লীপ। কাল সকালে যাব। এখন তোরাও ঘুমো—।" জন পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন সকালে যখন তাঁহার ঘুম ভাঙিল তখন চারদিকে রোদ উঠিয়া গিয়াছে।

জন সসৈন্যে যাত্রা করিলেন কলকাতার দিকে।

রোমনি, শাওনি এবং তির্কিও পুরুষের বেশে ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার অনুগমন করিল।

।। তিন।।

জন আর ফেরেন নাই। ধূর্জটিমঙ্গলও কিছুদিন পরে সিংভূমের জঙ্গল ত্যাগ করিয়া কলিকাতার দিকে রওনা হইয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার ঘরবাড়ি বিষয়-সম্পত্তি ছিল, সেগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল। তিনিও অনেকদিন ফিরিলেন না। তাঁহার অবর্তমানেই জগদ্ধাত্রী দুইটি যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। দানিয়েল সাহেব জগদ্ধাত্রীকে নিজের কুঠিতে লইয়া গিয়াছিলেন। দানিয়েল সঙ্গিনী প্রসব করাইয়াছিল শিশু দুইটিকে। দুইটি পুত্রসন্তান। কস্তুরীকে যদিও দানিয়েল বিবাহ করে নাই, কিন্তু কস্তুরীই দানিয়েল-সংসারের কর্ত্রী ছিল। সে যাহা বলিত তাহাই হইত, সে যাহা চাহিত তাহাই পাইত। সে যখন বলিল—যখন দুটো ছেল্যা হইছে, তখন আমি একটা লিব, লালী একটা লিক। সেই নামকরণ করিল তাহাদের। একটার নাম দিল খাম্বা, আর একটার নাম দিল খুঁটি। কস্তুরী খাম্বার পরিচর্যা করিত, আর লালী খুঁটির। জগদ্ধাত্রী একদিন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তোদের ছেলেমেয়ে হয়নি কেন? কস্তুরী হাসিয়া জবাব দিল—"আমাদের যে বিয়া হয় নাই গো। আমরা সায়েবের। কিন্তুক সায়েটা যে বুড়া আর বেয়ারামি। আমাদের ছেলেপুলে হবেক নাই। তোর ছেলেই আমরা পালব।"

ঝকমারি পিসী, ধূর্জটিমঙ্গলের সহিত আসিয়াছিল। সে বলিল—"তোমরা ওদের মানুষ কর; তোমাদের দেওয়া নাম খাম্বা আর খুঁটি ওদের ডাক নাম থাকতে পারে, কিন্তু ওদের বংশে সকলের নামের শেষে মঙ্গল থাকে। তাই ওদের ভালো নামও রাখতে হবে।" সেই ছেলে দুইটির নামকরণ করিল—শম্ভুমঙ্গল আর জটামঙ্গল।

ঝকমারি পিসীর একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। সে রক্তসম্পর্কে ধূর্জটিমঙ্গলের ভগ্নী নয়। ধূর্জটিমঙ্গলের পিতামহ শঙ্করমঙ্গল ডাকাতের সর্দার ছিলেন। এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার দলে ভোজপুরের এক বিহারী ডাকাত ছিল, নাম ঝঙ্কার সিং। বিপুলকায় শক্তিমান লোক। একাই দশজনের মহড়া লইতে পারিত। কিন্তু এই পালোয়ান লোকটাই ডাকাতি করিতে গিয়া একদিন মারা গেল। যে বাড়িতে ডাকাতি হইতেছিল সেই বাড়িরই একটি যুবতী মেয়ে একটি কুড়ুল দিয়া আঘাত করিল ঝঙ্কার সিংকে। তাহার মাথা দু'ফাক হইয়া গেল। ঝঙ্কার সিং মারা যাইবার পর শঙ্করমঙ্গল তাঁহার একমাত্র সন্তান রাজমণিকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিলেন। রাজমণি তখন বিধবা, কিন্তু অন্তঃস্বত্বা। রাজমণির মা আগেই মারা গিয়াছিলেন। রাজমণি একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া মারা গেল। শঙ্করমঙ্গল তাহার নাম রাখিলেন ঝঙ্কারিণী। ধূর্জটিমঙ্গলের মা অর্থাৎ মহেশমঙ্গলের স্ত্রী মানুষ করিয়াছিলেন ঝঙ্কারিণীকে। কিন্তু শিশু ঝঙ্কারিণী সকলের জীবন নাকি অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। দিনরাত চীৎকার করিত। ধূর্জটিমঙ্গলের মা সুবর্ণময়ী তাহার নামটা একটু বদলাইয়া ঝকমারিতে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিলেন। পোশাকী ঝঙ্কারণী নামটা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ঝকমারী নামটাই টিকিয়া ছিল শেষ পর্যন্ত। খাম্বা ও খুঁটির যখন জন্ম হয় তখন ঝকমারি পিসী যুবতী। বয়স ষোল বৎসর। তাহার চোখমুখে বাঙালী মেয়ের কমনীয়তা ছিল না. ছিল কেমন যেন একটা পুরুষালি ভাব। অবলীলাক্রমে বড় বড় গাছে উঠিতে পারিত, সাঁতারে তাহার জোড়া কেহ ছিল না, মারপিটেও অদ্বিতীয়া ছিল ঝকমারি। তাহার মেয়ে সঙ্গী বড একটা কেহ ছিল না, পুরুষ সঙ্গীই বেশী। কপাটি খেলা, ধাপসা খেলা এমন কি কুস্তিতেও তাহাকে কেহ হারাইতে পারিত না। বৌদিকে—ধূর্জটিমঙ্গলের স্ত্রী জগদ্ধাত্রীকে সে বড় ভালবাসিত। ভয়ও করিত। তিনিই কিছুদিন আগে তাহাকে পুরুষ সঙ্গীদের সহিত মিশিতে বারণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—তুই মেয়ে ছেলে, তুই বেটাছেলেদের সঙ্গে কুস্তি করবি? তোর লজ্জা করে না? তোকে আর ওদের সঙ্গে মিশতে হবে না।

ঝকমারি বলিল—"বাঃ, আমি কি করব তাহলে—"

"তুই আমার ঠাকুরঘর নিয়ে থাক। তারপর বিয়ে হলে শ্বশুরঘর করবি—"

"ইস আমি বিয়ে করবই না।"

"তোর দাদা যা ঠিক করবে তাই হবে। তোর দাদা বলেছে ভোজপুরী সিপাহীর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে। অযোধ্যার নবাবের পলটনে সে নাকি কাজ করে।"

ঝকমারি আবার মাথা নাড়িয়া বলিয়াছেন—"আমি বিয়ে করবই না।"

কিন্তু জগদ্ধাত্রীর কথা সে অমান্য করে নাই। জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরঘরের ভার সে লইয়াছিল। জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরঘরে অনেক ঠাকুর। শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, গণেশ তো আছেনই। আরো সব ছোট বড় নুড়ি আছে অনেক। কোনটা মা শীতলা, কোনটা ওলা বিবি, কোনটা পাষাণপুরের শিব, কোনটা হরিঘাটার জাগ্রত পীর সাহেবের কবরের নিকট কুড়াইয়া পাওয়া পাথর, কোনটা ইতু লক্ষ্মী, কোনটা তুষু ঠাকুরণ, কোনটা মা ষষ্ঠী—এই রকম অনেক। সমবেতভাবে ইহাদের সকলেরই পূজা করিত জগদ্ধাত্রী। ঠাকুরদের ভোগ দিয়া প্রত্যহ প্রসাদ বিতরণ করিত সে। এই ঠাকুরঘরের ভার লইয়াছিল ঝকমারি। ঘরটা পরিষ্কার করিত

দুইবেলা, ফুল তুলিত, ফল কুঁচাইত, চন্দন ঘষিত। ধূপধুনা জ্বালাইত। এই ঠাকুরঘর শেষে তাহাকে পাইয়া বসিল। ঠাকুরঘরে বসিয়া সে আপনমনে মালা গাঁথিত। রামায়ণ পড়িত, গানও গাহিত! এই ঠাকুরঘরে বসিয়াই সে একদিন আত্ম আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহার পূর্বজন্মের জীবন সহসা একদিন ছবির মতো ফুটিয়া উঠিল তাহার মানসপটে। ছবিটা অনেকক্ষণ ধরিয়া সে নিজেই দেখিল। তাহার পর জগদ্ধাত্রীকে গিয়া বলিল ঘটনাটা।

"বৌদি আজ ভারী একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেল ঠাকুরঘরে বসে। আমি আর এক জন্মে ফিরে গিয়েছিলাম। কি যে সব দেখলাম স্বচক্ষে—"

"কি দেখলি—"

ঝকমারি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"উঃ, কোথায় চলে গিয়েছিলাম—"

"কোথায়?"

"আমেদনগরে। সেখানে বাদশাহী তাঁবুতে বুড়ো সম্রাট আলমগীর. বিছানায় শুয়ে হাঁপাচ্ছেন। আমি তাঁকে হাওয়া করছি।"

"তুই?"

"হ্যাঁ আমি। আমি তখন ঝকমারি নই, আমি শাহানসার বাঁদী রাবেয়া। বাদশাহ্ দাক্ষিণাত্য থেকে শাহাজানাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু আমেদনগরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পা দুটো ফোলা ফোলা, চোখেব দৃষ্টি ঝাপসা, ক্রমাগত কাশছেন। হাকিম সাহেব জবাব দিয়ে গেছেন। বাদশাহ্ তাঁর পেয়ারের ছোটছেলে কামবক্সকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলেই বললেন তোমাকে বিজাপুরের নবাব করে দিলাম, তুমি এখনই সৈন্যসামন্ত নিয়ে নবাবের মর্যাদা অনুসারে শোভাযাত্রা করে বিজাপুরের উদ্দেশে বেরিয়ে সেখানকার সিংহাসন দখল করে।"

ঝকমারি আবার চুপ করিল।

"তারপর?"

"কয়েকদিন নিঃঝুমের মতো পড়ে রইলেন। সাতদিন পরে ডাকিলেন আর এক ছেলে আজিম শাকে। তাঁকে বললেন, তুমি মালওয়া চলে যাও। সেখানকার নবাব হও তুমি। তবে খুব তাড়াতাড়ি যেও না। রোজ পাঁচ ক্রোশ যাবে, তার বেশী নয়। এখনি বেরিয়ে পড়, দেরি কোরো না। আমি এখানেই বিশ্রাম করি। আজিম শাও চলে গেলেন। তখন আমি খোজা পয়গম্বরকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, এ সময়ে উনি ছেলেদের দূরে পাঠিয়ে দিলেন কেন? খোজা পয়গম্বর অনেকদিনের পুরোনো লোক, আমাকে মেয়ের মতো ভালবাসত। খোজা চুপিচুপি বললে—বাদশা নিজের বুড়ো বাপকে কয়েদ করেছিলেন। তাই তাঁর ভয় হয়েছে তাঁর ছেলেরাও যদি তাই করে। সেইজন্য ওদের সরিয়ে দিলেন দূর। চালাক লোক তো—"

ঝকমারি চুপ করিয়া গেল আবার। ফ্যালফ্যাল করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

"থেমে গেলি কেন? তারপর কি হল—"

ঝকমারি যেন আপন মনে বলিতে লাগিল—"আলমগীর মরে গেছে। কফিনে পুরে ফেলা হয়েছে তাঁর দেহ। আজিম শা কফিনটা কাঁধে তুলে কিছুদূর এগিয়ে গেল। তারপর রেখে দিল সেটা।"

আবার চুপ করিল ঝকমারি। তাহার পর আবার বলিতে লাগিল।.....

"আওরাঙ্গাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হল বাদশার দেহ। সেখানেই কবর দেওয়া হল তাঁকে। কুরবানিও হল। আজিম শা নিজেকে বাদশা বলে ট্যাঢরা পিটিয়ে দিলে চারদিকে। তারপর নিজে সিংহাসনে উঠে বসল—"আমি ছিলাম আলমগীরের বাঁদী, হয়ে গেলাম আজিম শার। সিংহাসনে উঠে আজিম শা অনেক খেলাত বখশিস দিলে সবাইকে। আমিও পেলাম একটা দামী মসলিনের ওড়না আর পঞ্চাশ আসরফি। নাচগান আমোদপ্রমোদের তুফান বইতে লাগল। কিন্তু এত সুখ সইল না বেশী দিন। আলমগীরের আরও তিনজন ছেলে খবর পেলেন যে বাদশা খুব অসুস্থ। ছোটছেলে কামবক্স ছিলেন বিজাপুরে। আলমগীর তাঁকে বিজাপুরের শাসনকর্তা করে গিয়েছিলেন। তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হলেন তিনি। আজিম শা তাঁকে আরও কিছু জমিদারি দিলেন, নিজের নামে টাকা তৈরি করবার অনুমতি দিলেন, তাঁর নামে খোতবাও পড়া হতে লাগল মসজিদে মসজিদে। কিন্তু বাদশার বড়ছেলে, সুলতান মোয়াজ্জিম বাগ মানলেন না সহজে। তিনি কাবুলের শাসনকর্তা ছিলেন আলমগীরের মৃত্যু সময়ে, তাঁর মেজছেলে আজিমউস্সান ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। এঁরা দু'জনে মিলে যাত্রা করলেন আমেদনগরের উদ্দেশ্যে। একবারাবাদে এসে মোয়াজ্জিম খবর পেলেন বাদশা মারা গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। তারপর তিনি চিঠি লিখলেন আজিম শাকে—বাবা তোমাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা করে গেছেন, তুমি তাই নিয়ে যদি সন্তুষ্ট থাক আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি যদি হিন্দুস্থানের সিংহাসনের লোভ কর তাহলে তোমার ভালো হবে না। খোজা পয়গম্বর খবরটি সংগ্রহ করে এনে চুপিচুপি বললেন আমাকে। তারপর বললেন—এইবার বেধে গেল।

ঠিক তাই হল। আজিম শা উত্তর দিলেন—এক সিংহাসনে দু'জনের স্থান নেই। সত্যিই তারপর যুদ্ধ বেধে গেল। সৈন্যসামন্তরা চলতে শুরু করল একবারাবাদের দিকে। আমাদের তাঁবুও চলল তাদের পিছু পিছু। নানারকম গুজব শুনতে লাগলাম। একদিন শুনলাম সুবে বাংলা থেকে দেওয়ান যে এক কোটি টাকা রাজস্ব দিল্লীতে পাঠাচ্ছিলেন আজিমউস্সান নাকি সেটা আটক করেছেন। আরও শুনলাম তিনি বিদরবখ্তের শ্বশুর একবারাবাদের শাসনকর্তা মোক্তার খাঁকে বন্দী করেছেন। মোক্তার খাঁ আজিম শার বন্ধু ছিলেন। তিনি আজিমউস্সানের তম্বি গ্রাহ্যই করলেন না।

এর পরই সুলতান মোয়াজ্জিম, তাঁর বড় ছেলে মুয়াজিদ্দিনকে নিয়ে এসে পড়লেন একবারাবাদে। সুলতান মোয়াজ্জিমের সৈন্যরা মাইনে পায়নি বলে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। আজিমউস্সান যে কোটি টাকা আটকে ছিলেন তা তাঁর বাবাকে দিলেন। তাঁর বাবা সে টাকা দিয়ে সৈন্যদের মাইনে তো মিটিয়ে দিলেনই, আরও অনেক দান খয়রাৎও করলেন। তারপর যুদ্ধ লেগে গেল। আজিম শার আফগান সেনাপতি মুনেব্বর খাঁর পাঁচ হাজার আফগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুলতান মোয়াজ্জিমের উপর। কিন্তু কিছুই হল না। আজিম শা হেরে গেলেন। শুধু তাই নয় মারা গেলেন তিনি। মুনেব্বর খাঁও মারা পড়লেন। আমরা সবাই বন্দী হলাম। আমি তাঁবুতে চুপ করে বসে আছি এমন সময় সুলতান মোয়াজ্জিমের একটা মাতাল সৈন্য আমার তাঁবুর সামনে এসে চীৎকার করে বললে—ওই বাঁদীটাকে আমার শোবার ঘরে পাঠিয়ে দাও। খোজা পয়গম্বর তাঁবুতে ঢুকল। আমি তার পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমাকে

বাঁচাও। খোজা বললে—বাঁচবার একটি উপায়ই আছে। বললাম, সেই উপায়ই আমাকে বলে দিন। খোজা তৎক্ষণাৎ খাপ থেকে তলোয়ার বার করে আমার গলাটা কেটে দিলে। দড়াম করে পড়ে গেলাম আমি......মরে গেলাম—''

হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল ঝকমারি।

''কিন্তু আমি মরিনি তো। এই তো একটু আগে তোমার ঠাকুরঘরে ঠাকুরের ভোগ রাঁধছিলাম। মনে মনে ডাকছিলাম, দাদা এবার ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক। নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের গোলযোগ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কি যে হচ্ছে কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। দাদা ফিরলে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু বৌদি আমি এখনি যেটা দেখলাম সেটা কি সত্যি? সত্যিই কি আমি রাবেয়া ছিলাম বাদশা আলমগীরের সময়! কিন্তু যা দেখলাম তা তো স্বপ্ন নয়, জেগে জেগে স্বচক্ষে দেখলাম—''

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—''মাথা খারাপ হয়ে গেলে লোকে জেগে জেগেও অনেককিছু আজগুবি দেখে। আমাদের গাঁয়ের নবু ঠাকুর বলতেন আমি গত জন্মে সরফবাজ খাঁ ছিলাম, আমাকে তোমরা কুর্নিশ কর। তোবও হয়তো মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তোর দাদা ফিরুন তখন তোর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে একটা। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—''

''আমি বিয়ে করবই না—''

এক বৎসর পরে ধূর্জটিমঙ্গল ফিরিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন নীলাম্বর রায়, ধূর্জটিমঙ্গলের বন্ধু! তাঁহারা খবর আনিলেন। ক্লাইভ মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌছাইয়াছেন। নবাবের সহিত এইবার যুদ্ধ হইবেই। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে।

নীলু রায় ছোটখাটো খর্বাকৃতি ব্যক্তি। রং কালো। চোখ দুইটি ছোট ছোট। মুখে চাপদাড়ি। চোখের দৃষ্টিতে ধূর্তামি মাখানো। অথচ কেমন যেন কাতর দৃষ্টি। সর্বদাই মৃদু মৃদু হাসেন এবং চাপদাড়িতে হাত বোলান। জংলি কুঠিতে যেসব কালো পলটন জন সাহেব রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের ক্যাপ্টেন সরদার মাখনলালের সহিত নীলু রায়ের বন্ধুত্ব জমিয়া গেল। মাখনলালকে নীলু রায় ক্লাইভের খবর সবিস্তারে সব বলিলেন। সর্বঘটে যেমন কাঁঠালি কলা থাকে নীলু রায়ও তেমনি সর্বঘটে বিরাজ করিবার ক্ষমতা রাখিতেন। তিনি কলিকাতায় নবাব নিয়োজিত শাসনকর্তা মাণিকচাঁদের দরবারে যেমন অনায়াসে যাতায়াত করিতেন তেমনি অনায়াসে যাতায়াত করিতেন ফলতায় ইংরেজ মহলে। নীলু রায়ের মাধ্যমে মাণিকচাঁদ অবৈধ উপায়ে লোকের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপর অনুগ্রহ বৃষ্টি করিতেন। ফলতায় ইংরেজরা বড় দুর্দশার মধ্যে ছিলেন। ভালো খাওয়া জুটিত না, মদ পাওয়া যাইত না, তাহাব উপর আর এক বিপদ হইয়াছিল ম্যালেরিয়া আর পেটের অসুখ। নীলু রায় মাণিকচাঁদের অগোচরে ইংরেজদের খাবার, মদ এবং ঔষুধ সরবরাহ করিতেন। কবিরাজী এবং হেকিমি ঔষধও পাঠাইয়া দিতেন তাহাদের জন্য। অনেক সময় ইহাতে বেশ উপকারও হইত। নীলু রায়ের মাধ্যমে কলিকাতার অনেক বড়লোক ইংরেজদের টাকাও ধার দিতেন। বরের ঘরের মাসী এবং কনের ঘরের পিসী হইয়া নীলু রায় দুই পক্ষেরই হাঁড়ির খবর সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকাতে মাখনলালকে ক্লাইভের আগমনের যে বর্ণনাটা তিনি দিলেন সেটা মিথ্যা নয়। আর একটা কথাও গোপনে তিনি বলিলেন যে যদিও মাণিকচাঁদ আপাতদৃষ্টিতে নবাবের লোক কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনিও ইংরেজদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাহা হইলে ইংরেজরা

ফলতাতেও থাকিতে পারিতেন না। কারণ ফলতাও নবাবের রাজত্বের মধ্যে। মাণিকচাঁদ খামখেয়ালী নবাবকে ভয় করেন, মনে মনে বোধহয় ঘৃণাও করেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন ইংরেজদের। সাধারণ লোকেদের সহিত ইংরেজদের ব্যবহার খুব ভালো। তাঁহারা পয়সা দিয়া জিনিস কেনন, তাঁহাদের সৈন্যরা সাধারণ লোকদের বাড়িঘর সম্পত্তি লুট করেন না। ন্যায়ের প্রতি তাঁহাদের প্রবল নিষ্ঠা। কথার খেলাপ করিবার লোক তাঁহারা নহেন। এইসব কারণে মাণিকচাঁদ ইংরেজদের বিশ্বাস করেন। অবশ্য বাহিরে বাহিরে তাঁহাকে দেখাইতে হয় যে তিনি নবাবের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তিনি বজবজে যদিও ক্লাইভের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু সেটা লোক দেখানো যুদ্ধ।

মাখনলাল জিজ্ঞাসা করিল—"ক্লাইভ লোকটা কে বল তো? এর নাম তো আগে শুনিনি—"

"ক্লাইভ সাধারণ লোক নয়, ওস্তাদ লোক, সাংঘাতিক লোক। আসল আসরফি। ছিল মাদ্রাজ আপিসের কেরানী, এখন কর্নেল। কেরানীর কাজ মোটে ভালো লাগত না ওর, দিক্ হয়ে তাই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। দু'বার নিজের মাথা লক্ষ্য করে রিভলভার ছুঁড়েছিল, কিন্তু একবারও গুলি লাগল না। মনে হয় স্বয়ং মা কালী ওর সহায়। ও সোজা লোক নয় মাখনলাল, আসল জাত সাপ—"

"কিন্তু কেরানী থেকে কর্নেল হল কি করে—"

"দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল যে ইংরেজদের। তাই অনেক কেরানীকে তারা সেনাদলে বহাল করে ফেললে। সেই সময় ক্লাইভ কলম ছেড়ে ধরল তলোয়ার। লড়ল দুপ্লেক্সের সঙ্গে। অনেক যুদ্ধে জিতে নাম কিনে ফেলল ছোকরা। হু হু করে কর্নেল হয়ে গেল। এখন তো ওই সর্বেসর্বা। ও যেরকম জাঁকজমক করে এসেছে কি হবে শেষ পর্যন্ত ভগবান জানেন—"

"জাঁকজমক মানে?"

"ক্লাইভের সঙ্গে এসেছেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ পাঁচখানা যুদ্ধজাহাজ নিয়ে, দু'খানা জাহাজ যদিও মাঝপথে লোপাট হয়েছে তবু যা এনেছেন তা প্রচুর। তার ওপর আছেন মেজর কিলপ্যাট্রিক। দুঁদে লড়িয়ে একজন দেশী সিপাইদের ক্যাপ্টেন। ক্লাইভ ফলতা থেকে মাণিকচাঁদকে, শুধু মানিকচাঁদকে কেন স্বয়ং নবাবকেও এমন চিঠি ঝেড়েছে যে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে সকলের—"

"কি চিঠি—"

"চিঠি আমি দেখিনি। কিন্তু তার মর্ম হচ্ছে, মানে মানে কলকাতা ছেড়ে চলে যাও। তা না হলে যুদ্ধং দেহি। মাণিকচাঁদ হয়তো ভেগে পড়ত কিন্তু নবাবের বিনা অনুমতিতে সেটা করা সম্ভব নয়। তাই পালালেন না। শিবপুরের দুর্গটা মেরামত করে সেনাসামন্ত নিয়ে বজবজে গিয়ে ইংরেজের রাস্তা আগলে বসে রইলেন। কিন্তু যখন ক্লাইভ আর মেজর কিলপ্যাট্রিক এসে হাজির হলেন তখন আধঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ খতম। একটা গুলি মাণিকচাঁদের মাথার পাগড়িটাই উড়িয়ে নিয়ে গেল। এক ছুটে তিনি কলকাতায় গিয়ে হাঁফ ছাড়লেন। তাঁর সৈন্যরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকে পড়ল বজবজের দুর্গে। ওয়াটসন ছিলেন জাহাজে। সেখান থেকে দুটি গোলা ফেললেন তিনি। প্রকাণ্ড গোলা। এই গোলার দাপটে বজবজের ফুটফাট গোলগুলি

একদম বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল মাণিকচাঁদের সৈন্যরা দুর্গের ভিতর। ক্লাইভ ঠিক করেছিলেন সকালে এসে দুর্গটি দখল করবেন। কিন্তু রাত্রে একটা ভুতুড়ে কাণ্ড হয়ে গেল।"

"ভুতুড়ে কাণ্ড? কি রকম?"

"রাতদুপুরে দেখা গেল দুর্গের দেওয়ালের উপর চড়ে কে যেন খনখনে গলায় বলছে—এ দুর্গ আমাদের। তোমরা অবিলম্বে পালাও। যদি না পালাও তাহলে তুলকালাম কাণ্ড করব আমি। জন দুই নবাবের সেপাই বেরিয়ে এসে তম্বি করতে গিয়েছিল। ভূতটা সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেললে একজনকে। দেখা গেল তার হাতে একটা খাঁড়াও রয়েছে। দ্বিতীয় সেপাইটার মুণ্ড সে এক কোপে উড়িয়ে দিলে। তৃতীয় একটা সেপাই আসতেই তাকে এক ঘুঁষিতে ধরাশায়ী করে ফেললে। হৈচৈ পড়ে গেল। ইংরেজের সৈন্যরা এসে পড়ল। নবাবের সৈন্যরা যে যেদিকে পারল পালাল!"

"ভূত? একটা ভূত এই কাণ্ড করলে? বল কি—"

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন নীলু রায়। বলিলেন—"না, ভূত নয় । ছিটগ্রস্ত একটা সাহেব সৈন্য। মদ খেয়ে ওই কাণ্ড করেছিল। কিন্তু ইংরেজ জাতের আইন-নিষ্ঠার গল্পটা শোন। আমার তো শুনে তাক লেগে গিয়েছিল! ওই মাতালটার জন্যেই বজবজ দুর্গ-জয় সহজ হয়ে গেল। ইংরেজের একটি সৈন্যও মরল না। ও লোকটা যদি নবাব সাহেবের চাকর হত নবাব ওকে বকশিস কবতেন, হয়তো ওকে মনসবদার বানিয়ে দিতেন, ক্লাইভ কিন্তু ওর কোর্ট মার্শাল করলেন। বললেন, বিনা হুকুমে কেন ও কেল্লার দেওয়ালে চড়েছে। লোকটাকে ক্ষমা চাইতে হল। বলতে হল এমন কাজ আর কক্‌খনো করব না। এর থেকেই বোঝ ইংরেজ আব মুসলমানে কত তফাত। ইংরেজরা নিয়ম অনুসারে চলে। কোলকাতার ফোর্ট-উইলিয়াম কেল্লা তো ওরা দখল করে নিয়েছে—"

"অ্যাঁ, বল কি! ফোর্ট দখল করে নিয়েছে—"

"হ্যাঁ। ওয়াটসন এসে দমাদ্দম গোলা ফেলতেই সব চোঁচা দৌড় দিলে। মাণিকচাঁদ পালাল হুগলিতে। ফোর্ট দখল করে নিলে ওরা।"

"আমাদের মালিক জন সাহেবের কোনও খবর পেলে না?"

"নাঃ। ধূর্জটি অনেক খোঁজখবর করলে তো। তার কিংবা তার ভাইপোর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।"

এমন সময় মধু সামন্ত আসিয়া হাজির হইল। তাহার স্কন্ধে একটি মুণ্ডুহীন বলি দেওয়া পাঁঠা। পাঁঠাটা নামাইয়া সে বলিল—"একটু তামুক খাওয়া তো মাখন।"

"পাঁঠা কি রঙ্কিণী মায়ের কাছে মানত ছিল?"

"হ্যাঁ মানতই ছিল। মানত করেছিল আমার পরিবারটি। ভারী ভীতু মেয়েমানুষ সে। আমার কিছু জমি চেপে নিয়েছিল খালিমুল্লা। আমি নালিশ করেছিলাম তার নামে। খালিম না কি ভুইএঞা ঈশা খাঁর আত্মীয়। তাই ভয় ছিল বিচারক সুবিচার করবে কিনা। আমার পরিবারটি ভীতু লোক—ভয়ে ভয়ে রঙ্কিণীর কাছে মানত করে বসল মা মকোর্দমা জিতিয়ে দাও, তোমার কাছে বলি দেব। আমাকে কিন্তু তদারকী করতে হল অনেক। সৈদুল্লার মারফত ফৌজদারের

কাছে কিছু ভেট পাঠাতে হল। ভেট নিয়ে যাওয়ার জন্য সৈদুল্লাকেও দিতে হল কিছু। রঙ্কিনীর উপর নির্ভর করে আমি বসে থাকতে পারলুম না। মকোর্দমা জিতেছি। পরিবার বললে, পাঁঠা মানত করেছিলাম দিয়ে এস। ভাবলাম অনেকদিন মাংস খাইনি, তাছাড়া যখন মানত করেছিলাম দিয়ে এস। ভাবলাম অনেকদিন মাংস খাইনি, তাছাড়া যখন মানত করেছে একটা, তখন দেওয়াই উচিত। নিয়ে এলুম একটা পাঁঠা কিনে। ৪০০ কড়ি দাম নিলে। কামার মুণ্ডুটা নিলে, তাছাড়া আরও দশটা কড়ি। ঝামরি বলছে তাকে একটু মায়েব প্রসাদ দিতে হবে। তাই ভাবছি পাঁঠাটা কেটেকুটে এইখানেই রান্না করে ফেলি, খানিকটা রাঁধা মাংস ঝামরিকে দিয়ে বাকিটা বাড়ি নিয়ে যাব। ভাই মাখন তুমি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পার? ও কি, তুমি অমন বির্মষ হয়ে বসে আছ কেন?"

"শুনছি নবাবের সঙ্গে ইংরেজের লড়াই বাধবে। তার মানেই আমাদেরও হয়তো যুদ্ধে যেতে হবে। আমরা ইংরেজদের অধীনে চাকরি করি বটে, কিন্তু নবাবকে ইংরেজবা সত্যি সত্যি হারিয়ে যদি এদেশের রাজা হয়ে বসে তাহলে সেটা খুব খারাপ লাগবে ভাই—"

নীলু রায় বলিলেন, "খারাপ লাগবে কেন। ওরকম একটা পাজী কামুক অর্থপিশাচ নিষ্ঠুর লোককে মসনদ থেকে নামিয়ে দেওয়াই তো উচিত। ইংরেজরা যদি রাজা হয়, তাহলে দেশের ভাগ্য বলে মানব সেটা—"

মধু সামন্ত প্রশ্ন করিলেন—"কেন? ইংরেজরা কি দেবতা? তারা কি কম কামুক, কম পাজী? এই যে তোমাদের জন সাহেব। ও কি শুকদেব? তোমাদের নাকের উপর দিয়েই তো তিনটে ছুঁড়িকে নিয়ে সরে পড়ল। ওদের বড় বড় চাঁইরাও রাখ্‌নি রাখে। বোজার ড্রেকের নামেও অনেক কথা শুনেছি।"

"কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার মতো কামুক পাষণ্ড—"

মধু সামন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"হবেই তো, এই হচ্ছে দস্তুর। সব নবাবরাই ওই জাতের। সব শিয়ালের এক রা। আলিবর্দী খাঁই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ছিল। একটিমাত্র বিবি ছিল তার। অন্য কোনও মেয়েমানুষের দিকে নজর দেয়নি সে। কিন্তু সে ভালো লোক ছিল বলে কই তোমরা তো দলবদ্ধ হয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াওনি যখন সে বর্গির হাঙ্গামার সময় নাস্তানাবুদ হচ্ছিল? এখন তোমরা তো সিরাজের আশেপাশেই ঘুরঘুর করছ, অনেক মহাত্মা নিজেদের বউ বেটি বোন উপহার দিচ্ছে তাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্যে। সিরাজ না হয় খারাপ কিন্তু তোমরাই কি ভালো?"

"কিন্তু সিরাজ হোসেন কুলি খাঁকে অমনভাবে মেরে ফেললে—"

"মারবে না? হোসেন কুলি যে প্রেমিক ছিলেন। সিরাজের মা আর মাসী দু'জনের সঙ্গেই প্রেম করতেন তিনি। সিরাজ তেজী লোক, এ অপমান সে সইবে কেন?"

"বল কি!"

"যা শুনেছি তাই বলছি। জগৎশেঠের একজন গোমস্তা আমাকে বলেছিল। মতিঝিলে তার আনাগোনা ছিল। সে বললে—হোসেন কুলি ঘসেটি বেগম আর আমিনা বেগম দু'জনের প্রেমেই হাবুডুব খাচ্ছিল। ওরা সব সমান। সিরাজেব আর এক মেসো সৈয়দ আহম্মদ যখন উড়িষ্যায় ছিল, সেখানে সে উড়েনিদের নিয়ে টানাটানি করত। খবর শুনে আলিবর্দী খাঁ সেখান

থেকে ওকে সরিয়ে দেন। শুধু সিরাজ খারাপ, একথা বললে শুনব কেন, ওরা সবাই খারাপ। আমরাও। আমরাই ওদের খোসামোদ করে ঘুষ দি, আমরাই ওদের মেয়েমানুষ সরবরাহ করি। আমিও সেই পাপে পাপী।''

হঠাৎ মধু সামন্ত নিজেই নিজের গালে চড় মারিতে লাগিলেন। ''আমাদের গাঁয়ের গরীব ঝুনিয়াকে আমিই তুলে দিয়েছি পাপিষ্ঠ বকাউল্লা বক্‌শির হাতে। ঝুনিয়ার অবশ্য কপাল ফিরেছে, তার বাপমায়ের দারিদ্র্যও ঘুচেছে, কিন্তু আগুন লেগে গেছে আমার মনে। বুঝলে? আমরা কেউ ভালো নই, আমরা সবাই পাজির পাঝাড়া, সবাই হারামজাদা, সবাই শয়তান, সবাই নচ্ছার। রায় মশায় সিরাজকে শয়তান বলছেন, নিজে সাধু সাজবার জন্যে নাকি?''

নীলু রায় দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিলেন—''আমি ভাই যা জানি তাই বলছি। আপনি যা বলছেন তাও হক কথা, আমরা সব কীটস্য কীট, মানুষ নই।''

মাখন বলিল—''পাঁঠাটা যদি এখানেই রান্না করেন তাহলে আর দেরি করবেন না, উঠুন—''

মধু সামন্ত পাঁঠাটা লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এমন সময় দেখা গেল ধূর্জটিমঙ্গল আসিতেছেন। তিনি এতক্ষণ পূজা করিতেছিলেন। তাঁহার কপালে ও বাহুতে চন্দনের ছাপ, পরিধানে পট্টবস্ত্র, পায়ে খড়ম, গায়ে কোনও জামা নাই। সেকালে অধিকাংশ লোকই বাড়িতে নগ্নগাত্র হইয়া থাকিতেন। মধু সামন্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। মধু সামন্ত পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোক। বেশ কিছু জমিজমা আছে, ও অঞ্চলের অধিবাসী কিছু প্রজাও আছে তাঁহার। অর্থাৎ ওই অঞ্চলের খানিকটা অংশের ইজারা লইয়াছেন তিনি। পাশেই আর একজন ইজারাদার খালিমুল্লা। তাঁহার সহিত প্রায়ই খিটিমিটি বাধে। তিনি আগাইয়া গিয়া ধূর্জটিমঙ্গলের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন; ধূর্জটিমঙ্গল ব্রাহ্মণ। তাছাড়া জন সাহেবের বন্ধু লোক।

''কি মধু, পাঁঠা কি রঙ্কিণী মাকে নিবেদন করলে নাকি—''

''আজ্ঞে হ্যাঁ। এইখানেই রান্না করে নিয়ে যাব ভাবছি। ঝামরিকে একটু প্রসাদ দিতে হবে।''

''প্রসাদ আমরাও পাব। তুমি আজ আমাদের বাড়িতে খাবে—''

''আমিই রান্নার ব্যবস্থা করছি, তোমার বৌদিই রাঁধবেন,—ওরে হোকনা—''

একটি আদিবাসী ভৃত্য আসিয়া হাজির হইল।

তাহার পর মধু সামন্তের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—''তোমার পুরুত আর কামার কি চলে গেছে?''

''অনেকক্ষণ।''

ধূর্জটি হোকনাকে আদেশ করিলেন—''তাহলে তুই রামু পুরুত আর পাঁচু কামারকে ডেকে আন। আর কাল ওই যে ওঁরাও পাড়া থেকে পাঁঠা বেচতে এসেছিল এক বুড়ী, তার কাছ থেকে পাঁচ শ' কড়ি দিয়ে পাঁঠাটাকে কিনে ফেল। কড়ি তোর গিন্নীমার কাছ থেকেই পাবি—। যা চট্ করে যা—''

মধু সামন্ত বলিলেন—''আপনিও কি একটা পূজো দেবেন নাকি?''

''দিতেই হবে। তা না হলে একটি পাঁঠায় এতগুলো লোকের কুলোবে কি করে?''

হোকনা চলিয়া যাইতেছিল, ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে আর একটা ফরমাস করিলেন।

''ঝামরি কোন দিকে আছে দেখ তো—''

সামন্ত বলিল—"ঝামরি এখন কবুতর ঝলসাচ্ছে। সকালে চেরো মাগীরা দশটা কবুতর বলি দিয়েছিল মা রঙ্কিণীর কাছে। তার থেকে দুটো ঝামরিকে দিয়ে গেছে। তাই সে ঝলসাচ্ছে একটু আগেই দেখে এলাম। আমাকেও বলেছে মাংসের ভাগ চাই। কেন কি দরকার ওর সঙ্গে—"

"আমি তো জন-এর সন্ধান পেলাম না। ও যদি কিছু বলতে পারে। মাঝে মাঝে ঠিক ঠিক বলে দেয়। অদ্ভুত ক্ষমতা ওর। কিন্তু বড্ড খামখেয়ালী। চল একটু বলে যাই ওকে—"

রঙ্কিণীর মন্দিরের পিছনে যে জঙ্গল ছিল, সেখানে ছিল একটা কৃষ্ণচূড়ার বড় গাছ। তাহারই তলায় ঝামরি বসিয়া কবুতরের হাড় চিবাইতেছিল। সামন্তকে দেখিয়া বলিল—"ওকি, মাংস এখনও কাটিস নাই? খাব কখন? ক্ষিধা লেগেছে যে—"

সামন্ত বলিল—"ধূর্জটি মশায়ও একটা পাঁঠা বলি দেবেন এখনি মায়ের কাছে! তখন দুটো পাঁঠা একসঙ্গে রান্না হবে। তোমাকে দিয়ে যাব এক বাটি—"

ধূর্জটির দিকে তাকাইয়া ঝামরি বলিল—"তুইও পাঁঠা বলি দিবি? পাঁঠা খেয়ে খেয়ে রঙ্কিণীর অরুচি ধরে গেছে। অন্য বলি চায় উ।"

"অন্য বলি আবার কি—"

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ঝামরি।

"রক্তখাকি লরবলি চায়। লরবলি—। পারবি দিতে?"

"না তা আমি পারব না। বলি দেওয়ার মানুষ পাব কোথা?"

"চেষ্টা করলেই পাবি। টাকা ফেললেই পাবি। কিনতে পাওয়া যায়।"

"ওসব পাগলামি ছাড়। জন সাহেব কোথা গেল বল—"

ঝামরি বলিল—"জানি। বুলব না।"

বলিয়াই উঠিয়া পড়িল। তাহার কোমরে যে বস্ত্রখণ্ড জড়ানো ছিল সেটাও খসিয়া পড়িল। মন্দিরের ভিতব চলিয়া গেল সে।

সেদিন ধূর্জটি শুধু সামন্তকেই নয় মাখনলাল আর তাহার সহকারী জয়রামকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। ইঁহাদের সহিত নীলু রায় তো ছিলেনই। জগদ্ধাত্রীই স্বহস্তে সব রন্ধন করিয়াছিলেন। এই কয়জন লোকের জন্য পাঁচ সের বাঁশফুলি চালের ভাত প্রস্তুত করিয়াও তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল শেষ পর্যন্ত না কম পড়িয়া যায়। কিন্তু কম পড়ে নাই। ভাতের সঙ্গে ছিল গব্য ঘৃত, মুগের ডাল, বুটের ডালের বড়া। তাছাড়া ছিল বেতের আগার তরকারি, পুঁইশাকের চচ্চড়ি, মোচার ঘণ্ট, পোস্তবাটা, সিমের সড়সড়ি, মাগুর মাছ দিয়া জিরার ঝোল, আমচুর দিয়া শোল মাছ, কলার অম্বল আর আদা কাসুন্দী। ইহার উপর মাংস তো ছিলই। মাংসে লাউ, ছোলা ভিজানো, হিং গোলমরিচ আদা প্রভৃতি দিয়া অপরূপ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিল জগদ্ধাত্রী। ইহার উপর ছিল পায়েস, মনোহরা এবং চন্দ্রপুলি। জগদ্ধাত্রী ধনীর গৃহিণী। কিন্তু তিনি নিজেই মাথায় ঘোমটা দিয়া এবং গাছকোমর বাঁধিয়া স্বহস্তে সকলকে পরিবেশন করিলেন। ঝকমারি তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। অতিথিরা প্রত্যেকে দামী কার্পেটের আসনে উপবেশন করিয়া রূপার বাটিতে ভোজন করিলেন। রূপার গ্লাসে সুগন্ধী সুশীতল জল পান করিয়া তৃপ্ত হইলেন। আহারান্তে রূপার তবক দেওয়া পান প্রত্যেকের হাতে দিবার পর ঝকমারি রূপার আতরদান খুলিয়া প্রত্যেককে আতরও মাখাইয়া দিল। মধু সামন্তের সহিত পাচক ব্রাহ্মণ গেল দুইজন। শুধু মাংস নয় সমস্ত রকম খাবার গুছাইয়া নিজে দাঁড়াইয়া দুইটি

পালকিতে তুলিয়া দিলেন। মধু সামন্ত পালকিতেই গেলেন। চওড়া লালপাড় শাড়ি, শাড়ির লাল আঁচল, মাথায় সিঁদুর, হাতে লাল শাঁখা এই বেশেই জগদ্ধাত্রীকে সত্যই যেন জগদ্ধাত্রী বলিয়া মনে হইতেছিল। যাইবার সময় মধু সামন্ত বলিয়া গেলেন "মা ঠাকুরুন কাল আবার আসব, আপনার কাছেই প্রসাদ পাব, কর্তার সঙ্গে কিছু বৈষয়িক আলোচনা আছে।"

মধু সামন্ত পরদিন এক হাঁড়ি মধু, এক হাঁড়ি দই, এক হাঁড়ি সন্দেশ এবং একটি নধর ভেড়া লইয়া দেখা দিলেন অতি প্রত্যুষেই। পদব্রজেই আসিয়াছিলেন তিনি। সঙ্গে তিনটা চাকর হাঁড়ি তিনটা মাথায় করিয়া আনিয়াছিল। চতুর্থ চাকর ভেড়াটি স্কন্ধে বহিয়া আনিয়াছিল। স্নান করিয়া আসিয়াছিলেন সামন্ত মহাশয়। তাঁহার কাঁধে ভিজা কাপড় এবং মাথায় ভিজা গামছা। পরিধানে পিরান এবং চওড়া-পাড় তাঁতের ধুতি। পায়ে মজবুত মিলিটারি বুট এক জোড়া।

"কি হে সামন্ত তুমি যে স্নান শেষ করে এসেছ দেখছি—"

"হ্যাঁ, কইলি নদীতে স্নানটা সেরেই নিলাম। আমার উর-ধুকের ব্যায়ারাম আছে, তাই ভোরেই স্নানটা করেনি। এই মুটেগুলোকেও খাইয়ে দিয়েছি নদীর ধারে। সঙ্গে চিঁড়ে এনেছিলাম। গুড়ও এনেছিলাম। বনে কিছু মহুয়াও পেলাম। আমিও জলযোগ সেরে নিয়েছি।"

ধূর্জটিমঙ্গল প্রত্যেক মুটেকে পঁচিশটি কড়ি দিলেন এবং আরও খাইতেও দিলেন। মুড়ির মোয়া আর বাতাসা। মুটে চারটি কৃষ্ণকায় ওঁরাও, সরল সদা-সপ্রতিভ, হাসিখুশিতে ভরপুর। তাহারা প্রত্যেকেই মাথা ঝুঁকাইয়া ধূর্জটিকে প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

উহারা চলিয়া গেলে সামন্ত মহাশয় বলিলেন—"এই সব আসকারা দিয়েই আপনারা মুনিসদের পায়াভারি করে দিচ্ছেন। আমি তো ওদের মজুরি খাওয়া সব দিয়েই দিয়েছি, আপনি আবার দিতে গেলেন কেন?"

নীলু রায় কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"ওটা ওর স্বভাব।"

ধূর্জটিমঙ্গল যাহা বলিলেন তাহা সে যুগের পক্ষে একটু আশ্চর্যজনক। বলিলেন, "ওরাই রাজা, তাই ওদের খাজনা দিলাম। ও কথা যাক, বস। আমি গিন্নীকে খবর দিয়ে আসি—"

খড়ম চটচট করিতে করিতে তিনি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। একটু পরেই তিনি ফিরিলেন। তাঁহার পিছনে একটি চাকর একটি পিতলের হাঁড়িতে গরম দুধ আনিয়া হাজির করিল। আর একটি চাকরের হস্তে তিনটি রূপার বাটি এবং ছোট ছোট গামছা।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"এক বাটি করে গরম দুধ খেয়ে নিয়ে তারপর চল ওই মাঠে গিয়ে বসি। কি বৈষয়িক কথা বলবে তুমি—?"

"আগে দুধটা খেয়ে নেওয়া যাক, তারপর বলছি সব।"

বাটিতে গরম দুধ ঢালিয়া দিল ভৃত্যরা। তাহার পর গামছা পাঠ করিয়া প্রত্যেকের দুই হাতের অঞ্জলিতে গামছাগুলি পাতিয়া দিল। তাহার পর সেই গামছাগুলির উপরই গরম দুধের বাটি বসাইয়া দিয়া গেল তাহারা। প্রত্যেকে ফুঁ দিয়া গরম দুধ পান করিতে লাগিলেন। ভৃত্যরা তিনটি ছোট ছোট জলও দিয়া গেল। দুগ্ধ পানান্তে সকলে হাত ধুইলেন। সামন্ত আলগোছে একটু জল পানও করিলেন।

"চল এবার মাঠে বসা যাক।"

মাঠে কয়েকটি মোড়া পাতাই ছিল। সেখানে গিয়া তিনজনেই উপবেশন করিলেন। মহুয়া

ফুলের গন্ধে চতুর্দিকে আমোদিত। অদূরে মনরঙ্গোলি গাছটায় প্রচুর ফুল ফুটিয়াছে। পিছনের বন হইতে বনমোরগের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

সামন্ত বলিলেন—"শুনছি নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাধছে। এখন আমাদের কি কর্তব্য?"

"কিসের কর্তব্য—?"

"আমরা কোন পক্ষে থাকব?"

"আমরা চুনোপুঁটি, আমরা কোনও পক্ষে থাকলাম বা না থাকলাম তাতে ওদের কিছু এসে যাবে না।"

"যাবে বই কি। আমরা যে পক্ষে থাকব সেই পক্ষকে টাকা দিয়ে লোক দিয়ে সাহায্য করব। সে সাহায্য হয়তো যৎসামান্য, কিন্তু মনে রাখবেন কাঠবেড়ালিও রামচন্দ্রকে সেতু নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন।"

বলিয়াই একদৃষ্টে তিনি ধূর্জটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নীলু রায় বলিলেন—"আপনার কথাবার্তা থেকে তো মনে হয় আপনি নবাবের দিকে।"

এইটুকু বলিয়া তিনি অন্যদিকে চাহিয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সামন্ত বলিলেন—"তা যদি মনে করেন করুন। আপনার মন তো আমার ঘোড়া নয় যে লাগাম টেনে যেদিকে ইচ্ছে ঘুরিয়ে দেব। আমি নবাবের পক্ষে এটা যদি আপনার মনে হয়ে থাকে তাহলে তাই মনে করুন। তবে এটা জানবেন কোন নবাবের উপরই আমার ভক্তি নেই। আমি এদের পক্ষে থাকতে চাইছি স্বার্থের খাতিরে। আমার ঠাকুর্দার বাবা আজিমুদ্দিনের সময় নবাব সরকারে চাকরি করতেন। সে সময় অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন তিনি। যখন খুশি খাজনা দিতেন, যখন খুশি দিতেন না। তারপর আলিবর্দীর আমলে আর অতটা যা-খুশি করা যেত না। কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে ভয়ানক কড়াকড়ি হয়ে গেল। খাজনা জমা না দিলেই বৈকুণ্ঠবাস। সেই নিয়মই এখনও চলছে। তবু আমরা মোটামুটি ভালই আছি। বছরে বছরে খাজনা দিয়ে দিই, কখনও বাকিও রাখি, সদরে কিছু ঘুষঘাষ দিলেই কেউ তাগাদা করে না। নিজের নিজের জায়গিরের হর্তাকর্তা বিধাতা আমরাই। তাছাড়া আর একটা কথা ভাবুন। শুনেছি পাঠানদের আমলে এদেশে প্রত্যেকেই ধনী ছিলেন, অনেকের ফলাও ব্যবসায় ছিল, কিন্তু মোগলদের আমলে আমাদের আর তেমন বাড়বাড়ন্ত রইল না, টাকা অনেক কমে গেল। তার কারণ গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে সব টাকা দিল্লী চলে যেতে লাগল। ইংরেজরা রাজা হয়ে যদি আরও কড়াক্কড়ি করেন তাহলেই তো আমাদের দফা নিকেশ। নবাবরা হাজার বদমায়েশ হলেও নবাব, দিলদরিয়া, কিন্তু এরা হল বেনে। এরা যদি রাজ্যপাট পায় আর এদেশের টাকা নিজেদের দেশে চালান করে, তাহলেই তো এদেশের আর কিছু থাকবে না মশাই। ছিবড়ে করে ফেলবে সব।"

নীলু রায় বলিলেন—"আপনি খুব দূরদর্শী লোক সামন্ত মশায়। আপনি যা বলছেন তা-ই হয়তো হবে। কিন্তু একটা কথা বলতে পারেন, যে-কলসীতে শত শত ফুটো, সে কলসীতে জল কতক্ষণ রাখতে পারবেন? মোগল সাম্রাজ্য টলমল করছে। বাংলা নবাবদেরও সেই অবস্থা। বর্গীয় আক্রমণে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে সব। আলিবর্দীর রাজকোষে টাকা ছিল না।

এই বিদেশী বেনেদের কাছ থেকেই তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন। দিনাজপুরের রাজা রামনাথ, নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও অনেক টাকা দিয়েছিলেন তাঁকে। তাছাড়া অনেক জমিদারদের থেকে 'আবওয়াব' আদায় করেছিলেন তিনি এজন্য। তাও সামলাতে পারেননি। তাঁর উত্তরাধিকারী সিরাজ টাকার জন্যে হন্যে কুকুরের মতো ঘুরছেন চারদিকে। যেনতেনপ্রকারেণ টাকা চাই। এর উপর আছে লাম্পট্য আর বিলাস। এ রাজ্য কি বেশীদিন টিকবে মনে করেন? টিকবে না। তখন আর কেউ আসবে। হয় বর্গীরা আবার মাথা চাড়া দেবে, তা না হলে হয়তো রাজপুতরা, কিংবা হয়তো বাইরে থেকে আহমদ শা দুরানীর মতো কোন ডাকাত এসে হানা দেবে আবার। কিংবা কোন বিদেশী জাত, যারা এখন বেনে হয়ে ব্যবসা করছে এদেশে তাদের মধ্যেই কেউ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। আমি যতদূর জানি ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ আর ইংরেজের মধ্যে ইংরেজরাই সব চেয়ে ভালো। পর্তুগীজরা তো ডাকাত। যেই হোক নবাবের নাভিশ্বাস উঠেছে। এ অবস্থায় নবাবের সহযোগিতা করা মানে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা। তাছাড়া আমাদের শক্তিই বা কত? কিই বা আমরা করতে পারি। এই ধরুন না নবাব যখন কোলকাতা আক্রমণ করে বড়বাজারে আগুন ধরিয়ে দিলে তখন আমরা বনে জঙ্গলে পালিয়েছিলাম। তারপর আবার যখন ইংরেজরা কোলকাতায় এল তখন তারাও নিজেদের পাড়াটি বাঁচিয়ে চারদিকে আগুন লাগিয়ে দিলে। আবার আমরা যে যেদিকে পারলাম পালালাম। পালানো ছাড়া আমরা কি করতে পারি বলুন। তবে মনে মনে আমি সায়েবদের দিকে—ওরা মুসলমানদের চেয়ে ভালো।"

ধূর্জটি এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবার বলিলেন, "দেখ মধু, আমি নবাবের আমলাদের ভয়ে সুতানূটি থেকে পালিয়ে এসেছি এই জঙ্গলে। জন সাহেব আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করবার ভার সে দিয়ে গেছে আমাকে। আমি এমন কিছুই করব না যাতে তার অনিষ্ট হয়—। কলকাতায় আমার ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে দিয়েছে নবাবরা। আমার প্রথম পরিবার ভানুমতীকে দ্বিতীয় পরিবার লক্ষ্মীমণিকে আর ছোট বোন বারাহীকে নবাবের পাষণ্ড সেনারা লুট করে নিয়ে গেছে। আমার আরও চারটি বোন ছিল, তাদের ছেলেমেয়েরা ছিল, তারা কে কোথায় পালিয়ে গেছে, খোঁজ পাইনি। শুনেছি ভানুমতী আর লক্ষ্মীমণি আত্মহত্যা করেছে। শুনেছি বারাহী বেঁচে আছে এখনও, সে নাকি ওই দুরাত্মা মুসলমান ওমরাওয়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে পালিয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় আছে তা আমি জানি না। এ অবস্থায় তুমি কি প্রত্যাশা কর যে আমি চাইব ওই নবাব এদেশের উপর আধিপত্য করুক? তা আমি কখনও চাইব না। আমি চাইব সে নিপাত যাক—"

নীলু রায় দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার চোখ দুইটি জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

মধু সামন্ত তখন গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন—"আমি সবই শুনেছি। তবু আপনাকে বলছি এখন আপনি নবাবের পক্ষেই থাকুন। কারণ চেনা শত্রুকে কায়দা করা সহজ। কি পেলে তারা খুশী হয় তা আমরা জানি। টাকা আর মেয়েমানুষ এই তারা চায়। বকাউল্লা বক্‌শি এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। নবাব অন্তঃপুরের অনেক দাসী বাঁদী এইখান থেকেই যায়। আপনার বন্ধু জন সাহেবও অনেক দাসী বাঁদী বিক্রি করতেন পর্তুগীজ ব্যবসাদারদের কাছে। তাদের অনেককে আমি চিনি। তাদের যারা প্রণয়ী তাদেরও। এদের সাহায্য নিয়ে আপনার ভগ্নীদের খোঁজ করা অসম্ভব নয়। হয়তো তাদের ফিরেও পেতে

পারেন, হয়তো তাদের সাহায্যে আপনার আরও উন্নতি হতে পারে। সেইজন্যে বলছি আপনি নবাবের দলে থাকুন।"

ধূর্জটি ইহার উত্তরে একটু হাসিয়া বলিলেন,"মধু, তোমার আসল উদ্দেশ্যটা তুমি খুলে বলছ না। আমি কিভাবে নবাবকে সাহায্য করতে পারি তাও বলছ না। সব খুলে বল। এতে তোমার কি লাভ হবে কিছু?"

মধু সামন্ত কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন।

"লাভ হবে। দশহাজার আসরফি।"

"কি রকম? অত টাকা কে দেবে তোমাকে—"

"সিরাজের বেগম লুৎফুন্নিসা"

"তুমি তার নাগাল পেলে কিরূপে---"

"মোমিন বিবির কৃপায়—"

"মোমিন বিবি কে?"

"আমার জমিদারিতে সে কিছুদিন আগে বাস করত। এখন সে লুৎফুন্নিসার রঙমহলের দাসী। লুৎফুন্নিসা তাকে ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে। সে—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া নীলু রায় বলিলেন—"এখানকার যারা বাসিন্দা তারা প্রায় সকলেই তো আদিবাসী। হয় ওঁরাও, নয় কোল, নয় মুণ্ডা, নয় চের। কিছু বাউরিও আছে। তাদের মধ্যে মোমিন নামটা বড় শুনিনি তো—"

সামন্ত বলিলেন—"মোমিন বিবি খাঁটি আদিবাসী নয়। তার মা আদিবাসী, কিন্তু তার বাপ ছিল একজন পর্তুগীজ দস্যু। দস্যুটা ডাকাতি করতে গিয়ে মারা যায়। তার মা মেয়েটাকে পালন করছিল। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটা। অনেক টাকা দিয়ে একজন আমীর তাকে কিনে নেন। এখন সে লুৎফুন্নিসার রঙমহলে প্রধান বাঁদী। এখানকার মেয়ে বলে সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। কয়েকদিন আগে সে আমাকে বলে পাঠিয়েছে যে, বেগম সাহেবা চারটি চিঠি লিখেছেন। একটি জগৎশেঠকে, একটি দুর্লভরামকে, একটি উমিচাঁদকে আর একটি রাজবল্লভকে। বলেছেন চিঠিগুলি গোপনে ওঁদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এর জন্যে তিনি দশহাজার আসরফি বখশিস দেবেন। মোমিন বিবি জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছে আমি একাজ পারব কি না। আমি রাজি হয়েছি। চিঠি চারখানি আমার কাছে এসে পৌঁছেচে—"

নীলু রায় প্রশ্ন করিলেন, "চিঠিতে কি আছে জান?"

"চিঠি সীলমোহর করা। তাছাড়া আমি ফারসী পড়তে জানি না। তাই চিঠি খুলিনি।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—'আমি গরীব মানুষ। ওঁদের কারো সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তবে জগৎশেঠের একজন পুরোহিত এখানে রঙ্কিণীর পুজো দিতে আসেন। তাঁকে ধরতে পারি এবং তাঁর মাবফত চিঠিটা জগৎশেঠের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি—"

"ব্যাপারটা চাউর হয়ে যাবে তাহলে। লুৎফুন্নিসা সেটা চান না। কথাটা নবাব সাহেবের কানে যদি যায় তাহলে অনর্থ বাধবার খুবই সম্ভাবনা।"

নীলু রায় বলিলেন—"কিন্তু চিঠিগুলিতে কি আছে তা না জেনে সেগুলি বিলি করবার ভার নেওয়া কি ঠিক হবে? চিঠিগুলিতে কি রকম সীলমোহর আছে?"

সামন্ত বলিলেন—"গালার। তার উপর একটা গোল আংটির ছাপ আছে। বোধহয় লুৎফুন্নিসার আংটির ছাপ।"

নীলু রায় বার দুই দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"গোল আংটির একটা আমার কাছেও আছে। গালার সীল ভেঙে আবার গোল আংটির ছাপ দিয়ে দেওয়া যায়। চিঠি এনেছেন সঙ্গে?"

"এনেছি। আমার পিরানের পকেটে আছে—"

"পিরান কোথায়?"

"পেটরার মধ্যে আছে—"

"পেটরাই বা কই? পালকি তো শুধু গায়ে এলেন ভিজে কাপড় কাঁধে করে—"

"পেটরা আছে পালকিতে। পালকি কইলি নদীর ধারে নামিয়ে স্নান করে এসেছি আমি। অনুমতি করেন তো নিয়ে আসি চিঠিগুলি—"

"আপনি যাবেন কেন? আমার একটা চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"না, চাকর আনতে পারবে না। আমি সঙ্গে একজন আর্মেনি খোজা এনেছি! সে তলোয়ার আর পিস্তল নিয়ে পালকি পাহারা দিচ্ছে। আমি যাব আর আসব। আপনার কুঠি থেকে বেশীদূরে পালকি রাখিনি। কইলি নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেইখানেই আছে পালকি—"

"তবে যান—"

মধু সামন্ত চলিয়া গেলেন।

নীলু রায় ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ লোকটিকে তুমি চেন?"

"চিনি । এখানকার ইজারাদার একজন। কিন্তু লোকটিকে যত সামান্য বলে মনে হয়, তত সামান্য নয়। ধলভূমেং রাজা ওর বন্ধু। আমার মনে হচ্ছে ও তারই দূত হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। আমরা যদি ওর কথায় সায় না দিই তাহলে এখানে টেকা যাবে না। এই সম্পত্তি যদিও দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে নজরানা দিয়ে জন সাহেব কিনেছিল কিন্তু ধলরাজার সঙ্গে ঝগড়া হলে এ সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাবে। ধলরাজার পাইক পেয়াদা আছে, সৈন্যসামন্তও আছে। দেশী সৈন্য আছে, পর্তুগীজ সৈন্যও আছে। সুতরাং ওকে চটিয়ে এখানে থাকা যাবে না। তুমি যেন বেফাঁস কিছু বলে ফেল না। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ওরা নবাবের স্বপক্ষে। আমাদের মনে মনে যাই থাক বাইরে অন্যরকম ভান করতে হবে—"

"ধর যদি তোমাকে ওই চিঠি নিয়ে যেতে বলে তুমি যাবে? জগৎশেঠের নাগাল পাবে তুমি?"

"দেখ নীলু, পৃথিবীতে অসম্ভব কিছু নেই। মুর্শিদাবাদে যাওয়াটাই শক্ত। ঘোড়ায় যেতে হবে। পথও নিরাপদ নয়। দূরও অনেক। দেখা যাক চিঠিতে কি আছে, তারপর বিবেচনা করা যাবে।"

একটু পরেই মধু সামন্ত চিঠি চারখানি আনিয়া হাজির করিল।

নীলু রায় সীলমোহরগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এ সাধারণ গোল আংটির ছাপ। আমার আংটি দিয়েও এরকম সীলমোহর করা চলবে।"

মধু সামন্ত বলিলেন—"আপনারা কি ফার্সি জানেন?"

"জানি"—নীলু রায় দাড়িতে একবার হাত বুলাইয়া লইলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"নীলু ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত বেশ ভালভাবে জানে। ইংরিজিও

শিখছে। ও চিঠিগুলো পড়ুক, পড়ে আমাদের বাংলায় বুঝিয়ে দিক বেগম লুৎফুন্নিসা কি চান। তারপর ব্যবস্থা করা যাবে—"

নীলু রায় চারটি চিঠিই খুলিয়া ফেলিলেন। চারটি চিঠিই পড়িলেন। তাহার পর বলিলেন—"চারটি চিঠিই এক। ঠিকানাগুলোই খালি আলাদা আলাদা। আমি একটা চিঠি অনুবাদ করে আপনাদের শোনাচ্ছি।

খোদাতাল্লা আপনার উপর অজস্র কৃপাবর্ষণ করিয়া আপনাকে সর্বদা সুখী করুন এই প্রার্থনা করি। আমি নবাব মনসূরোলমোল্লা সিরাজউদ্দৌল্লাশাহা কুলী খাঁ-মিরজা মহম্মদ-হায়বৎজঙ্গ বাহাদুরের ধর্মপত্নী লুৎফুন্নিসা। নিতান্ত বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট সঙ্গোপনে এই পত্র লিখিতেছি। আমি আপনার কন্যাসমা, আশা করি কন্যার গোস্তাকি আপনার স্বাভাবিক ঔদার্যগুণে মাফ করিবেন। আমি লক্ষ্য করিতেছি হারেমে নবাবের অনেক উপপত্নী আছেন, তাঁহারা নবাবের নিকট হইতে নিত্য নতুন উপহার লইয়া থাকেন, কিন্তু কেহই তাঁহার হিতৈষী নহেন। তাঁহার মঙ্গল চিন্তা করেন না, সকলেই তাঁহাকে সর্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার বন্ধুরাও কেহ তাঁহাকে সুপথে চলিবার পরামর্শ দেন না। আমার সৎপরামর্শ তিনি শুনিয়াও শোনেন না। তাঁহার নামে যে সব কলঙ্ককাহিনী লোকে প্রচার করে তাহার কিছু অতিরঞ্জিত। কিন্তু কিছু যে সত্য তাহা আমি জানি। কিন্তু এসব দোষ সত্ত্বেও আমি তাঁহাকে ভালবাসি, আমি মনে করি অন্তরে তিনি খারাপ লোক নহেন, কুসঙ্গই তাঁহাকে মন্দপথে লইয়া যাইতেছে। আপনি একজন প্রবীণ লোক, আপনি তাঁহাকে সুপথে ফিরাইবার চেষ্টা করুন। ভাল কাণ্ডারী বিপন্ন নৌককেও তুফানের মুখে রক্ষা করিতে পারে। আপনি স্বর্গীয় নবাব আলিবর্দীর আমলের লোক, আপনার নিকট আমার মিনতি আপনি তাঁহার সহায় হউন, তাঁহার বিপক্ষতা না করিয়া তাঁহার বন্ধু হউন। শুনিতেছি তাঁহার বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র হইতেছে, আপনার নিকট আমার কাতর প্রার্থনা আপনি যদি আন্তরিকতার সহিত আমার স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করেন এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি আমি আপনার কন্যাসমা, আপনি এ বিপদে কন্যার সহায় হউন। আমি যদিও নবাবের ধর্মপত্নী তবু আমি বড় হতভাগিনী। করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি আমাকে রক্ষা করুন। আর একটি প্রার্থনা, আমি যে আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি তাহা যেন প্রকাশ না পায়। আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি লুৎফুন্নিসা—"

নীলু রায় একটি পত্রপাঠ শেষ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "চারটি চিঠিই একরকম। শুধু উপরের ঠিকানাগুলি আলাদা আলাদা—"

মধু সামন্ত উৎসুক নেত্রে ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিলেন ধূর্জটিমঙ্গল। কি বলিবেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় একটি ওঁরাও বৃদ্ধ এবং আরও কয়েকজন আসিয়া হাজির হইল। তাহারা বলিল—গতরাত্রে একটা বাঘ তাহাদের গোয়ালে ঢুকিয়া তাহাদের গরু লইয়া গিয়াছে। পাশের গ্রাম ফুরুলডাঙ্গাতেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। এ বাঘটিকে না মারিলে এ অঞ্চলে গরু ভেড়া ছাগল আর থাকিবে না। মানুষও মরিবে। কিছুদিন আগে একটি অর্ধভুক্ত শম্বরকেও তাহারা বনের মধ্যে দেখিয়াছে। মাঝে মাঝেই ময়ূরের দল ডাকিয়া উঠিতেছে। তাই মনে হয় বাঘটা পাশের জঙ্গলেই আছে। পূর্বে জন সাহেব তাহাদের রক্ষাকর্তা ছিলেন। তিনি যাইবার

পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন তাঁহার অবর্তমানে ধূর্জটিমঙ্গলই তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তাই তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন।

ধূর্জটিমঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"চল এখনই আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। তোমাদের যে গরুটা নিয়ে গেছে সেটার কোনও পাত্তা পেয়েছ? বাঘ সাধারণত যেদিন মারে সেদিনই সবটা খায় না, আধখাওয়া করে রেখে যায়। পরদিন আবার সেখানে আসে—"

একজন ওঁরাও বলিল—"সেটা পাওয়া গেছে। মহুলটুলির বড় শালগাছটার নীচে পড়ে আছে সেটা—"

"ভালই হয়েছে তাহলে আমি শালগাছটার উপর চড়ে বসে থাকি। বাঘটা এলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব—"

মধু সামন্তর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"নবাব থাকুক আর যাক আমি তেমন গ্রাহ্য করি না। কিন্তু লুৎফুন্নিসার চিঠি শুনে বড় কষ্ট হয়েছে। তাঁকে আমি সাহায্য করবার চেষ্টা করব। চিঠি চারখানি নিয়ে আমি নিজেই মুর্শিদাবাদ যাব। কিন্তু পথ অনেকটা। পথে চোর ডাকাতও আছে। তাছাড়া বন আর পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। সঙ্গে হাতিয়ারবন্দুক লোকলস্কর চাই। ঘোড়ায় গেলে তাড়াতাড়ি হবে। পথে ঘোড়া বদলের ব্যবস্থা থাকলে আরও তাড়াতাড়ি হবে। সঙ্গে একদল অশ্বারোহী পলটন নিয়ে কিভাবে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারি সেটা ভেবে দেখ। আমি বাঘটা মেরে আসি—নীলু যাবে না কি সঙ্গে—"

নীলু বলিলেন—"তুমি তো মুগুর আর বর্শা নিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়বে। আমি তার মধ্যে গিয়ে কি করব?"

"তুমি একটা বড় ছোরা নিয়ে চল। যদি বাঘটা আমাকে বেকায়দায় ফেলে দেয়, তখন তুমি সাহায্য করতে পারবে।"

"বেশ চল।"

মধু সামন্ত বলিলেন-"আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে। আমি ধলরাজার কাছে যাচ্ছি। তিনি ঘোড়া লোকজন সব দেবেন। আজই একজন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি ঘোড়ায়। সে রাস্তার মাঝে মাঝে ঘোড়ার বন্দোবস্ত রাখবে। কিন্তু আপনি তো চললেন বাঘের মুখে—"

"যদি না ফিরি, তাহলে তো খেল খতম। তুমি তখন অন্য লোক দেখো—নীলু যদি অক্ষত ফিরে আসে সে-ও যেতে পারে।"

"আমি তাহলে চিঠিগুলো কি করব?"

"ফিরে নিয়ে যাও, কাল এসো।"

"কিন্তু তাতে একটু বাধা আছে। খবর পেয়েছি একটা গুপ্তচর না কি ওই চিঠিগুলো চুরি করবার মতলবে ঘোরা ফেরা করছে। তাই চিঠিগুলো আমার কাছে রাখতে চাই না।"

"ধলরাজার সঙ্গে যখন আলাপ আছে তখন সেইখানেই রেখে দাও না।"

মধু কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "শুনেছি ওই গুপ্তচরটা না কি ধলরাজারই কর্মচারী। ধলরাজা জানতে পারলে অবশ্য এখনি তার মুণ্ডচ্ছেদ করবেন। কিন্তু আজকাল সবাই মুখোশ পরে থাকে, কে বিশ্বাসী কে বিশ্বাসঘাতক, তা চেনা শক্ত। চিঠিগুলি আপনার কাছেই থাক। আমি কাল আসব।"

মধু সামন্ত চিঠি চারখানি ধূর্জটিমঙ্গলকে দিয়া চলিয়া গেলেন। ধূর্জটিমঙ্গল সেগুলি জগদ্ধাত্রীর কাছে লইয়া গেলেন।

"আমি বনে বাঘ মারতে যাচ্ছি। তুমি এ চিঠি চারখানি সিন্দুকের ভিতর পুরে তালা বন্ধ করে রেখে দাও। সিন্দুকের চাবি নিজের কাছ ছাড়া কোরো না—"

"কি চিঠি ওগুলো—"

"তা বলব না। খুব দরকারি আর খুব গোপনীয় এইটুকু শুধু জেনে রাখ।"

জগদ্ধাত্রীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। অধর কাঁপিয়া উঠিল।

"অত গোপনীয় চিঠির ভার আমি নিতে পারব না। তুমিই যেখানে রাখবার রাখ। কিছুই না জেনে অত বড় দায়িত্বের বোঝা বওয়া যায় না। আর আমার উপর তোমার যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে এ ভার আমাকে দিচ্ছই বা কেন?"

ধূর্জটিমঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিলেন যে জগদ্ধাত্রীর আত্মসম্মানে ঘা লাগিয়াছে। জগদ্ধাত্রী বড় অভিমানিনী। তাহার কম্পিত অধর, আনত অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি, তাহার কঠোর মুখভাব দেখিয়া ধূর্জটিমঙ্গল বুঝিলেন তাহাকে অবিলম্বে প্রসন্ন না করিয়া তিনি শিকারে যাইতে পারিবেন না।

বলিলেন, "তোমাকে সব কথা খুলে বলতে আমার আপত্তি নেই। তোমাকে কখনও অবিশ্বাস করতে পারি? বলিনি, কারণ শুনলে তুমি ভয় পাবে। ভেবেছিলাম শিকার থেকে ফিরে এসে তোমাকে সব বলব। বেশ, তবে এখনই সব শোন।"

ধূর্জটিমঙ্গল সব কথা খুলিয়া বলিলেন।

সব শুনিয়া জগদ্ধাত্রী বলিলেন, "যে নবাবের অত্যাচারে আমরা এত বিব্রত, সেই নবাবের সাহায্য তুমি করবে?"

"নবাবকে আমি সাহায্য করছি না, আমি লুৎফুন্নিসার অনুরোধ পালন করছি মাত্র। সে শুনেছি পতিপ্রাণা। তাছাড়া হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক রাজরানীই হোক বা ভিখারিনীই হোক মেয়েমানুষের নির্যাতন আমি সইতে পারি না। লুৎফুন্নিসা সিরাজের বেগম তবু তিনি নির্যাতিতা! তিনি সিরাজ দরবারের জনকতক বড় বড় ওমরাহকে চিঠি লিখেছেন যাতে তাঁরা সিরাজকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। আমি তাঁদের কাছে চিঠিগুলি পৌঁছে দিয়ে আসব এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এখানকার ধলরাজা নবাবের পক্ষে। যদি আমি অস্বীকার করতাম তাহলে ধলরাজা খুব অসন্তুষ্ট হতেন। সামন্ত ধলরাজারই দূত। আর ধলরাজা যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে আমরা এখানেও থাকতে পারব না। এইসব কারণেই আমি চিঠিগুলি নিয়েছি। আমি বাঘটা মেরে ফিরে আসি, তারপর যাব—"

"এখন বাঘ শিকারে না-ই গেলে। কাল তোমাকে বেরুতে হবে—"

"কিন্তু এখানে আমি যে জন সাহেবের প্রতিনিধি। তাঁর প্রজাদের রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তাছাড়া বাঘটাকে মেরে না ফেললে ও কোনদিন তোমাদেরই উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। জন সাহেবের গরু মোষ ভেড়া ছাগল তো কম নেই।"

জগদ্ধাত্রী একথার জবাব দিতে পারিল না।

ঝকমারি নিকটেই বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল। সেই জবাব দিল। বলিল, "সবই বুঝলাম,

কিন্তু তুমি কবে বুঝবে যে আমরা পাথর নই? আমাদের ভাবনা চিন্তাগুলো তো তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে না। সেগুলো যে আমাদের মনকে গামছানেংড়ানো করবে—"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন,"বেশ তো তোমরাও চল না আমার সঙ্গে। কিন্তু ওই কচি ছেলে দুটোকে নিয়ে এই দীর্ঘপথ যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? অবশ্য ছেলেদের জন্যে ভাবি না, ছেলে দুটো তো চব্বিশটি ঘণ্টা লালী আর কস্তুরীর কাছে থাকে। মায়ের দিকে ফিরেও চায় না ওরা। আমাদের ছেড়ে অনায়াসে থাকতে পারবে। একবছরের উপর তো বয়স হল ওদের।"

জগদ্ধাত্রী বলিল, "না আমি ছেলেদের ছেড়ে কোথাও যাব না। তবে ঝকমারি যদি যেতে চায় তোমার সঙ্গে যাক না।"

ঝকমারি চুপ করিয়া রহিল।

জগদ্ধাত্রী বলিতে লাগিলেন "তোর দাদা তো একবছর পরে এই সবে ফিরেছেন। এসেই আবার চললেন। আবার ফিরতে হয়তো একবছর লাগবে। আগে জন সাহেবের ভরসায় আমরা নির্ভয়ে থাকতাম। এখন কার কাছে আমাদের রেখে যাচ্ছ? ওই দানিয়েলের কাছে?"

"দানিয়েল বিশ্বাসী লোক। তাছাড়া সাহেবের কালা পলটন তো থাকবে। মাখনলাল খুব প্রভুভক্ত। এতেও যদি তোমরা ভয় পাও মধু সামন্তকে ভার দিয়ে যাব। ধলরাজার লোকেরা এখানে এসে থাকবে—"

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া উত্তর দিলেন—"তোমার দানিয়েল বিশ্বাসী হতে পারে, কিন্তু ওকে দেখে ভয় করে বাপু। মনে হয় ও লোকটাও যেন ছোটখাটো একটি সিরাজ। ধলরাজার লোকবা কেমন হবে জানি না। যাক তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর, চিরকাল তাই তো করেছ। আমাদের ভরসা অদৃষ্ট; অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। লক্ষ্মী দিদি আর ভানু দিদিকে তো আত্মহত্যা করে মান বাঁচাতে হয়েছে, আমবাও না-হয় তাই করব। কি বলিস ঝকমাবি—"

ঝকমারি ফণিনীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিল।

"আমি আত্মহত্যা করতে যাব কোন দুঃখে। যদি মরতেই হয় যুদ্ধ করতে করতে মরব।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন, "তোমরা কে কিভাবে মরবে তা তর্ক করে ঠিক কর, আমি বাঘটাকে মেরে আসি ততক্ষণ।"

অকুস্থলে গিয়া ধূর্জটিমঙ্গল দেখিলেন মরা বাছুরটা শালগাছের নিকট পড়িয়া আছে। তাহার গলার খানিকটা বাঘে খাইয়া গিয়াছে। দেখিলেন শালগাছটা খুব উঁচু। অনুভব করিলেন অত উঁচুতে উঠিয়া বসিলে সুবিধা হইবে না। প্রথমত বাঘটা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, দ্বিতীয়ত অত উঁচু হইতে বাঘের উপর লাফাইয়া পড়িলে তাঁহার নিজেরই হাত-পা ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ধূর্জটিমঙ্গল এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। বেশ একটু দূরে একটা গোলপাতার ছাউনি কুঁড়ে ঘর দেখা গেল। সঙ্গে যে ওরাঁওটি আসিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও ঘরটা কার?"

"মায়ের ঘর।"

আদিবাসীরা বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখে রঙ্কিণী দেবীর জন্য। তাহাদের ধারণা রঙ্কিণী দেবী তাহাদের খবর লইবার জন্য বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান। ঘুরিয়া বেড়াইলেই শ্রান্তি হয়, শ্রান্তি অপনোদনের জন্য ওই কুটিরগুলি। খালিই পড়িয়া থাকে

সেগুলি। অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের সেখানে রাত্রে আড্ডাও দেয়। ভাঙ্গিয়া পড়িলে মাঝে মাঝে কেহ মেরামত করিয়া দেয়।

ধূর্জটিমঙ্গল নীলু রায়কে বলিলেন, "চল ওরই মধ্যে আমরা ঢুকে বসে থাকি। এখনও সূর্য অস্ত যায়নি, সূর্য অস্ত গেলে বাঘ আসবে। দূর থেকে দেখতে পেলেই আমরা বেরিয়ে আসব।"

ধূর্জটিমঙ্গল সঙ্গে তাঁহার ছোট মুগুর এবং শাণিত বর্শাটি আনিয়াছিলেন। নীলুরায়ের হাতেও ছিল বেশ বড় ছোরা একটা। উভয়ে সেই খালি ঘরটিতে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই নীলু রায় প্রশ্ন করিলেন—"কথাটা পেড়েছিলে?"

"জগদ্ধাত্রীকে জিগ্যেস করেছিলাম, সে বললে ওর বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই। বিয়ে করতে চায় না, এ অবস্থায় জোর তো করতে পারি না।"

"কিন্তু মেয়েদের একটু জোরই করতে হয়। ঢের আগেই ওর বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

"চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পাত্র পাইনি। ওর পরিচয় গোপন করে তো সম্বন্ধ করতে পারি না। কিন্তু ও বেহারী আর ডাকাতের নাতনী শুনে কেউ ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। দু'একজন ফৌজি বেহারী সিপাহীকেও বলেছিলাম, তারাও রাজি হয়নি। কয়েকটা বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যেতে ও এখন বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বলছে বিয়েই করব না। তোমার যে হঠাৎ ওকে এত ভালো লেগে যাবে তা তো বুঝতে পাবিনি, তাহলে তোমার সঙ্গেই আগে ওর বিয়ে দিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন ওর মত না হলে কিছুই করা যাবে না। তোমাব বয়স কত হল?"

"ত্রিশ—"

"এতদিন পর্যন্ত তুমি একটাও বিয়ে করনি এটা সত্যি বিশ্বাস হয় না। আমি তোমার চেয়ে ছোট কিন্তু তিনটে বিয়ে কবে ফেলেছি।"—হাসিয়া বলিলেন,—"তাছাড়া দু'একটা উপরি প্রণয়িনীও আছে—"

"তা তো জানি। মুর্শিদাবাদে কিছুদিন আগে তোমার মৈনি বিবির গান শুনে এলাম। দারুণ গলা। শুনলাম ও নাকি আগে হিন্দু ছিল?"

"কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে। ঔরংজেবের আমলে জিজিয়া কর থেকে রেহাই পাবার জন্য ওর বাবা মুসলমান হয়ে যায়। তিনি গানের খুব বড় ওস্তাদ ছিলেন। মেয়েটা যদি রূপসী হত তাহলে অবশ্য মুসলমানদের হারেমে চলে যেত এতদিনে। কিন্তু ওই কুৎসিত মেয়েকে কেউ নিতে চাইল না। তখন ওর বাবা ওকে গান শেখালেন।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ হল কি করে?"

"অত বৃত্তান্ত নাই বা শুনলে। গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি। শুধু আমি নই, অনেকেই মুগ্ধ। অনেক বড়লোকের রঙমহলে ওর যাতায়াত আছে। চিঠিগুলো ওর সাহায্যেই পাঠাব ভাবছি—"

"আমার কিন্তু একটা কথা জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে। ওই কুৎসিত মেয়েকে তোমার মতো শৌখিন লোক পছন্দ করল কি করে। সারা মুখে বসন্তের দাগ, কুচকুচে কালো রং, বড় বড় দাঁত, বাখারির মতো চেহারা—"

ধূর্জটিমঙ্গল হাসিয়া বলিলেন—"যারা সত্যিকার শৌখিন তারা রূপকেও ভালবাসে,

গুণকেও ভালবাসে। গুণও একরকম রূপ। তাছাড়া আমি বিষয়ী লোক। আমি দেখলাম ও মেয়েটাকে যদি হাতে রাখতে পারি তাহলে আমার অনেক সুবিধা হবে। অনেক বড়লোকের বাড়িতে ওর যাতায়াত। রূপ নেই কিন্তু মেয়েটি সত্যিই ভালো। ওকে মুর্শিদাবাদে একটা বাড়ি কিনে দিয়েছি বেনামীতে। কিছুতেই নিতে চায় না, জোর করে দিয়েছি—"

"তোমার পরিবার এসব কথা জানে?"

"রামঃ। এসব ওকে জানিয়ে লাভ কি? মাঝ থেকে অশান্তি। ওর কোন অভাব রাখিনি তো। আবার কষ্ট হয় আমার আগেকার বউ দুটোর জন্যে। তারা আত্মহত্যা করল! ওদেরও বড় ভালবাসতুম। বড় বৌটা বাঁজা ছিল, মেজ বৌ মুখরা ছিল। আমাদের সুতানুটির বাড়ির পাশে কুস্তির আখড়া ছিল একটা। অনেকে এসে সেখানে গোলমাল করত। ভোর চারটে থেকে সবাইয়ের তাল ঠোকা চলত। মেজ বৌয়ের ঘুম ভেঙে যেত তাতে। তিনি একদিন বেরিয়ে এসে এমন দাবড়ি দিলেন সকলকে, যে দুড়-দাড় করে পালাল সবাই। তারপর আখড়াটা ভেঙেই গেল। সবাই বলল, না বাবা ওই রাযবাঘিনীর বাড়ির কাছে আমরা যাব না। সবাই তাকে ওই নামেই ডাকত। কিন্তু সে উগ্রচণ্ডা ছিল না। অপরূপ রূপসী ছিল সে। গম্ভীর ছিল, স্পষ্টবাদী ছিল, তার নিজস্ব জগৎ ছিল একটা, সেখানে আমাকেও ঢুকতে দিত না। আমাকে আমোল দিত না বলেই আমি জগদ্ধাত্রীকে বিয়ে করি। ওই মেয়েকেও আত্মহত্যা করতে হল। শুনেছি, বঁটি দিয়ে সে একটা গুণ্ডার ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে নিয়েছিল। শেষে নিজে কুয়ার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।"

"আর একজন?"

"সে ঘরে খিল দিয়ে গলায় দড়ি দেয়। গুণ্ডাগুলো কপাট ভেঙে দেখল সে আড়কাটা থেকে ঝুলছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল নীরব হইলেন। তাহার পর বলিলেন—"এ রকম অত্যাচার কতদিন চলবে বলতে পার?"

"যতদিন আমরা সহ্য করব ততদিন চলবে। ওদের কামের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি আমরাই তো দিচ্ছি। মোহনলাল মহারাজা হলেন, অতবড় পদ পেলেন, বোনের দৌলতে। অনেকেই এরকম করছে। আমরাই পাষণ্ড নরাধম, আমাদের এ শাস্তি হওয়া উচিত।"

"কোনও প্রতিকার নেই বলছ?'

"আপাতত মনে হচ্ছে ইংরেজই এর প্রতিকার। ওরা চতুর, ওরা বীরও। এতদিন ওরা ঘুষঘাষ দিয়ে নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সিরাজৌদ্দলা ওদের ন্যাজে পা দিয়েছে। ওরা ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। মাদ্রাজে ক্লাইভ যা করেছে তা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখানে এসেই যা করছে তা-ও কম না। ফোর্ট উইলিয়ম ওদের দখলে এসে গেছে—দেখা যাক এবার কি করে।"

"যে যাই করুক আমাদের পক্ষে কোনটা ভালো হবে না। মধু সামন্ত যে কথাটা বললে সেটা নিতান্ত ফেলনা নয়। এক একবার রাজা বদলেছে আর আমাদের অবস্থা খারাপ হয়েছে। পাঠানদের আমলে আমাদের যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল মোগলদের আমলে তা রইল না। ইংরেজরা যদি রাজা হয়—"

"দেখ ধূর্জটি ওসব নিয়ে ধানাইপানাই করে লাভ নেই। যা হবার তা হবেই। ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না। জীবনটা দাবা খেলা, এখনই যে চালটা দিতে হবে তাই নিয়ে মাথা ঘামাও। আমি হিমালয়ের উপর পাহাড়ীদের মধ্যে গিয়ে থাকব ঠিক করেছি। মনোমত যদি সঙ্গিনী পাই, তাহলে সেইখানে গিয়েই বাস করব। তোমার ঝকমারিকে পছন্দ হয়েছে, যদি ওকে আমার হাতে সমর্পণ কর—"

"আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে ঝকমারির মতটা হওয়া দরকার। ওর মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া যাবে না। তুমি বরং এখানে থেকে যাও, ওর হৃদয়-হরণ করবার চেষ্টা কর। তুমি এখানে থাকলে আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হব।"

"কোনও নারীর হৃদয়-হরণ করবার চেষ্টা তো কখনও কবি নি। সে সবের সন্ধানগুলুকও জানি না।"

"কি করলে তাহলে এতদিন?"

"লেখাপড়া করেছি খালি। গানবাজনার চর্চাও করেছি—"

"ঝকমারি মুখ্যু। লেখাপড়ার মর্ম ও বুঝবে না। গানবাজনার দিক দিয়ে চেষ্টা করতে পার। আমার এখানে দিলরুবা আর সেতার আছে। ঝকমারির আর একটা ক্ষমতা আছে। ও মাঝে মাঝে ওর পূর্বজন্মে ফিরে যায়। তখন সব আশ্চর্য কথা বলে, মনে হয় ওকে ভূতে পেয়েছে—"

"তাহলে মেয়েটি তো রহস্যময়ী।....."

"চুপ, চুপ। বাঘটা দূরে একটা ঝোপ থেকে বেরুচ্ছে।"

সত্যই বাঘটা ঝোপ হইতে সন্তর্পণে মুখ বাহির করিয়াছিল। ধূর্জটিমঙ্গল আর বিলম্ব করিলেন না। মুগুর ও বর্শা লইয়া বাঘের দিকে ছুটিয়া গেলেন। এত শীঘ্র তিনি বাঘের সম্মুখীন হইলেন যে বাঘটা ভাবিতেই পারিল না সে কি করিবে। ধূর্জটিমঙ্গল প্রচণ্ড বেগে মুগুরটা বাঘের মাথায় মারিলেন। বাঘটা কিন্তু সহজে কাবু হইল না। দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গল ক্ষতবিক্ষত হইলেন। কিন্তু বাঘের কাছে হার মানিলেন না। তিনি যখন বাঘটার বুকে বল্লম বিঁধাইয়া তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন তখন নীলু রায়ও ছোরা হস্তে ছুটিয়া আসিয়া বাঘটাকে আঘাত করিতে গেলে ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে বারণ করিলেন।

"চামড়াটা আর নষ্ট কোরো না। মোক্ষম মার দিয়েছি ওকে। আর উঠতে পারবে না। দেখ তো আমার পিঠটার অবস্থা—"

"পিঠ তো রক্তে ভেসে যাচ্ছে—"

"ওখানে একটা থাবা বসিয়েছিল, দাঁত বসাতে পারেনি কোথাও। রক্ত এখুনি থেমে যাবে—"

ওরাঁওরাও আশেপাশের জঙ্গলে লুকাইয়াছিল। তাহারাও আসিয়া পড়িল। বাঘটা সত্যই মারা গিয়াছিল। জঙ্গল হইতে গাছের ডাল কাটিয়া শীঘ্র জংলীরা একটা ডুলি বানাইয়া ফেলিল। সেই ডুলিতে বাঘটাকে তুলিয়া লইল তাহারা। ধূর্জটিমঙ্গলের জন্যও তাহারা পালকি আনিবে কি না জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন—না, আমি হেঁটেই যেতে পারব। আমার জন্যে কিছু মহুয়ার মদ এবং মধু যোগাড় কর। ধূর্জটি হাঁটিয়াই বাড়ি ফিরিলেন। তাঁহার পিঠটা অবশ্য

একটা বড় চাদর দিয়া সকলে বাঁধিয়া দিয়াছিল। খুব বেশী রক্তপাত হয় নাই। কিন্তু কাপড়ে প্রচুর রক্ত লাগিয়াছিল। তাহা দেখিয়া জগদ্ধাত্রী আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমাকে না দেখে বাঘটাকে দেখ। আমার কিচ্ছু হয়নি। প্রকাণ্ড বাঘ, ও আমাকে কখনও ওমনি ছেড়ে দেয়?"

ঝকমারি আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল ধূর্জটিমঙ্গলকে।

"গড় করি তোমার পায়ে—"

ধূর্জটিমঙ্গলের মুখে হাসি ফুটিল।

"রাগ করবি না বল? তাহলে একটা কথা বলি—। কিছু ঘুগনি কর তো। আজ মহুয়ার মদ খাব। তার সঙ্গে মধু আর সেরখানেক গরম দুধ। তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে সব। বানছিকে ডাকতে পাঠা। সে এসে তার জড়িবুটির মলম তৈরি করুক। আর ওদের সবাইকে খবর দে। নাচগান হোক—"

বানছি ওরাঁওদের মোড়ল এবং সুচিকিৎসক। সে একটু পরেই আসিয়া পড়িল। লোকটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং বেশ লম্বা। মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা। চূড়ার উপর কয়েকটি পালক। হাতে মোটা তামার বালা। গলায় একটি প্রকাণ্ড মাদুলি সোনার শিকল হইতে দুলিতেছে। মাদুলিটি বাইসনের শিঙের টুকরো একটি। তাহার দুই পাশে দুইটি সবুজ রঙের পাথরও রহিয়াছে। বানছি ধূর্জটিমঙ্গলের ক্ষতটি ভালো করিয়া পরীক্ষা করিল। তাঁহার নাড়ী দেখিল, চোখ দেখিল, জিভও দেখিল। তাহার পর বলিল—তাহাদের ভাষাতেই বলিল—"ভয় নেই। ভালো হয়ে যাবে। আমি সব সঙ্গে করে এনেছি।"

বানছির সহিত তিনটি লোক আসিয়াছিল। একটির মাথায় একটি প্রকাণ্ড ঝুড়ি। আর দুইজনের মাথায় দুই মাটির ছোট কলসী। ঝুড়িতে ছিল তাহার জড়িবুটি। একটি কলসীতে ছিল ময়াল সাপের পিত্ত, আর একটি কলসীতে বাঘের চর্বি।

বানছি প্রকাণ্ড ঝুড়ির ভিতর হইতে একটা কুচকুচে কালো শিল এবং নোড়া বাহির করিল।

"এ দুটো পুড়িয়ে পবিত্র করে নে—"

বানছির অনুচর কাঠকুটা দিয়া আগুন জ্বালিয়া শিল-নোড়াকে পুড়াইতে লাগিল। বানছি ঝুড়ির ভিতর হইতে কিছু শুকনা ডালপালা এবং কিছু সবুজ গাছপালাও বাহির করিল। তাহার পর ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে ফিরিয়া বলিল—"এইবার এমন একটি জিনিস চাই যা তোমাদের কাছেই আছে, আমার কাছে নাই। শিল-নোড়াটা বার করে ঠাণ্ডা করো। বাঘের চর্বিটা গলাও। আগুনের কাছে রাখ, আপনিই গলে যাবে।"

ধূর্জটিমঙ্গল প্রশ্ন করিলেন, "কি জিনিস চাই বল—"

বানছি সহাস্যদৃষ্টিতে ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল, "যে মেয়েটি তোমাকে সব চেয়ে বেশী ভালোবাসে তার চোখের জল চাই কয়েক ফোঁটা। যে মলম তৈরি করব তাতে গাছগাছড়া, বাঘের চর্বি, ময়াল সাপের পিত্তি এসব তো থাকবেই, তোমার ভালবাসার লোকের চোখের জলও চাই একটু—"

ধূর্জটিমঙ্গল হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "আমার পক্ষে তা ঠিক করা শক্ত কে আমাকে বেশী ভালবাসে।"

বানছি বলিল—"ঝামরি পারবে। কেউ গিয়ে ঝামরিকে ডেকে আনুক। আরে, ওই যে ঝামরি এসে গেছে—"

নিকটেই বাঘটাকে রাখা হইয়াছিল। ঝামরি তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া তাহার গোঁফ ছিঁড়িতেছিল।

মোড়লই তাহাকে ডাকিল।

"ঝামরি শোন শোন। এদিক পানে আয় একবার—"

ঝামরি কয়েক গাছা গোঁফ ছিঁড়িয়াছিল।

"তুর কাছে আসছিলাম। এইগুলা দিয়ে আমাকে তাগদের ওষুধ বানিয়ে দে একটা। বুড়ো হতে চাই না। অনেক দিন আগে একটা বুনো কাড়ার বুকের ধুকধুকিটা খেয়েছিলাম, জন সাহেব মেরেছিল কাড়াটাকে। শুনেছি বাঘের গোঁফ দিয়েও তাগদের ওষুধ হয়।"

মোড়ল বলিল, "দেব। এখন তুই একটা কাজ কর দিকি। এ লোকটাকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসে কে সেটা বার করে দে। তুই ছাড়া এ কাজ আর কেউ পারবে না—"

"কি করবি তাকে লিয়ে—"

"তার চোখের জল চাই। মলমে মেশাতে হবে।"

"ওকে যে কে বেশি ভালবাসে তা উয়াকেই শুধাও না—"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি জানি না।"

"ইস্ ন্যাকা সাজছিস কেনে? তুই জানিস না?"

"না। জগদ্ধাত্রী?"

"আরে না না, জগদ্ধাত্রী তোকে ভক্তি করে। আর ভালবাসে ওই ছুঁড়িটা। ঝকমকি না কি যে নাম তার—"

ঝকমারি বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া সে একছুটে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

"দাঁড়া ওকে ধরে আনছি আমি—"

ঝামরিও অন্দরের দিকে ছুটিল।

একটু পরেই ঝকমারিকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিল সে।

"এই লাও, এর চোখের জল পাবে কি করে? এ তো দজ্জাল মেয়ে, কাঁদবেক নাই—"

মোড়ল বলিল—"আমি চোখে একটু ওষুধ দেব। অনেক জল বেরিয়ে পড়বে। কোন ভয় নাই মা! বস। কোন কষ্ট হবে না। তোমার চোখের জল না পেলে এ মলমে ভালো কাজ হবে না।"

ঝকমারি ঝপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। ঝামরি কোমরে একটা হাত বঙ্কিম ভঙ্গীতে রাখিয়া হাসিমুখে চাহিয়া রহিল ঝকমারির দিকে। তাহার সে নীরব হাসিটাও অদ্ভুত।

মোড়ল কি একটা গুঁড়া ঝকমারির চোখে দিতেই প্রচুর অশ্রুপাত হইতে লাগিল। একটি ছোট বাটিতে মোড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু সংগ্রহ করিযা বলিল—"এতেই হবে। তুমি এবার যাও। ভিতরে গিয়ে জল দিয়ে চোখটা ধুয়ে ফেল ভালো করে।"

ঝকমারি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া গেল। ভিতরে গিয়াই সে জগদ্ধাত্রীকে বলিল—"বৌদি, তুমিও গিয়ে চোখের জল দিয়ে এস।"

"আমি আবার কেন। তুই তো দিয়ে এলি।"

"তোমার চোখের জলেই বেশী কাজ হবে। তুমি যাও। তুমি দাদাকে কত ভালবাস তা

আমি জানি না? পাগলি ঝামরি কি জানে? ও কি ওজন দাঁড়ি হাতে করে বসে আছে, কার ভালবাসা কম, কার ভালবাসা বেশি তা মাপবে? মরণ আর কি! তুমি চল। দাঁড়াও আমি চোখে একটু জল দিয়ে নিই—"

ঝকমারি চোখ ধুইয়া ফেলিল। তাহার পর জগদ্ধাত্রীকে লইয়া মোড়লের কাছে গেল।

"মোড়ল তুমি বউদির চোখের জল নাও।"

মোড়ল হাসিয়া বলিল—"বেশ তো, বেশ তো। বস।"

ঝামরি হো-হো করিয়া হাসিয়া এক ছুটে অন্তর্ধান করিল।

একটু পরেই নর্তক-নর্তকীর দল আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় পলাশফুল, গলায় মহুয়া ফুলের মালা। পরনে খাটো বস্ত্র। মেয়েদের বক্ষে কোনও আবরণ নাই। পুরুষদের মাথায় একগোছা করিয়া বাজরার শিষ। গলায় হাড়ের মালা। পুরুষদের মধ্যে দুইজন মাদল বাজাইতেছিল, দুইজন বাঁশী। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মুখে হাসি। সকলেরই হাতে এবং বাজুতে রূপার অলঙ্কার। সকলে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, মাদলের তালে তালে সকলেরই অঙ্গ দুলিতে লাগিল। তাহার পর শুধু হইল গান। গানের বাংলা তর্জমা করিলে সে গানের মাধুর্য বোঝানো যাইবে না। কারণ তাহাদের ভাষার এবং উচ্চারণের বিশেষ মিষ্টত্ব সে অনুবাদে ফুটিবে না। তবু অনুবাদ দিতেছি—

ছায়া-ঢাকা পাখি-ডাকা নদীর কিনারে
দাঁড়িয়েছিল মহুয়া
রসবতী মহুযা
কার লাগি দাঁড়িয়েছিল কে জানে
তা কে জানে
সুড়সুড়িয়ে বাতাস এসে বলল কানে কানে
তার বললে কানে কানে
ওৎ পেতে বসে আছে দেখ না ভালো করে
ও কি রে তোর মিতা
মহুয়া দেখে বসে আছে সোনার বরণ চিতা
দেহভরা কালো কালো চোখ
অনেকগুলো চোখ
চোখে পলক পড়ে না
হাজার চোখে চেয়ে আছে চিতা
চোখে পলক পড়ে না
মহুয়ার বুকের ভিতর কাঁপে বারে বারে—
ছায়া-ঢাকা পাখি-ডাকা নদীর কিনারে।
ওরে নদীর কিনারে—

মোড়ল নানান জিনিসপত্র মিশাইয়া মলমটা প্রস্তুত করিয়া ফেলিল অবশেষে। তাহার পর সেটাকে রেশমের মজবুত কাপড়ের উপর বিছাইয়া ধূর্জটিমঙ্গলের পিঠের উপর বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। গান ও নাচ চলিতে লাগিল। ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমাকে কাল সকালে কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে কলকাতার দিকে যেতে হবে। পারব ত?"

"খুব, খুব—"

মোড়ল ভরসা দিল।

"পনেরো দিন পট্টিটা বাঁধা থাকবে। তারপর ওটা খুলে ফেলতে হবে। আমি সঙ্গে লোক দেব। সেই সব করবে।"

হঠাৎ ঝামরি আবার আসিয়া উপস্থিত হইল।

মোড়লের দিকে বাঘের গোঁফের লোমগুলি আগাইয়া দিয়া বলিল—"নে, আমার ওষুধ বানিয়ে দে—"

"ওষুধ বানাতে একমাস দেরি হবে। আমার কাছে আর একটা বাঘের গোঁফ থেকে তৈরি বড়ি আছে। নিবি?"

"না। এইটে থেকেই বানিয়ে দে। এ বাঘটা আমার নাগর যে—"

"নাগর? বলিস কি!"

"হঁগো। হাঁকাড় দিয়ে রোজ ডাকত আমায়। বলত আয় আয় কাছে আয়, তোর ঘাড় মটকে খাই। এখন আমি বাগে পেয়েছি, আমিই তার গোঁফ ছিঁড়ে নিলাম। হি হি হি হি—"

হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল ঝামরি।

তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া ধূর্জটিকে প্রণাম করিয়া ফেলিল একটা।

"তুই বীর বটিস। আমার নাগরটাকে আমার কাছে এনে দিলি। আর কেউ পারতোক না। ও কি মরেছে? মরে নাই। ওরা মরে না—আড়ালে লুকিয়ে থাকে।"

ধূর্জটিমঙ্গল হাসিয়া বলিলেন—"বাঘ ভাল্লুক যে কারো নাগর হয় তা তো জানতাম না!"

ঝামরি বলিল—"মানুষ নাগরও তো বাঘ-ভাল্লুক গো। আমার মানুষ নাগর নাই। আমার নাগররা সব বুনো জানোয়ার। হাতি, কাড়া, চিতা, শম্বর এরাই আমার নাগর। রঙ্কিণী বলেছে তোর নাগরদের কেউ যদি মারে আমি তাকে দণ্ড দেব। তোকে দণ্ড দেবে রঙ্কিণী মনে রাখিস সেটা—"

এই বলিয়া সে ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে আঙুল নাড়িয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসিতে লাগিল।

মোড়ল ধমকাইয়া উঠিল।

"এখন নাখড়া করিস না ঝামরি। বাবুকে একটু ঘুমাতে দে। কাল ভোরে আবার যেতে হবে—"

"বেশ বেশ আমি যেছি—"

অভিমানের ভান করিয়া কিন্তু মুচকি হাসিতে হাসিতে গা দোলাইয়া ঝামরি চলিয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল উঠিয়া ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন এমন সময় পালকির শব্দ পাওয়া গেল। শব্দ করিতে করিতে একদল পালকিবাহক একটি সুসজ্জিত পালকি লইয়া প্রবেশ করিল।

পালকি হইতে অবতরণ করিলেন—একটি দীর্ঘাকার প্রৌঢ় ব্যক্তি। তাঁহার মাথায় পাখির

পালকের মুকুট, হাতে ধনুক, কাঁধে তূণীর, তূণীরে অনেক শাণিত তীর। অঙ্গেও তাঁহার বহুমূল্য ভূষণ। গলার হারে একটা বহুমূল্য হীরকই বোধহয় জ্বলিতেছে। নগ্নগাত্রে ভেলভেটের একটা জামা অনেকটা ফতুয়ার মতো। গলায় একটা রেশমের চাদর, দুইই জরির কাজ-করা। মুখ-ভাব বুদ্ধিদীপ্ত, বীরত্ব-ব্যঞ্জক।

পালকির সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়াছিলেন মধু সামন্ত। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন—"ধলরাজা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

নমস্কারাদি বিনিময়ের পর ধূর্জটিমঙ্গল ধলরাজাকে স-সম্ভ্রমে বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। বৈঠকখানা জন সাহেবের রুচি অনুসারে সজ্জিত। ধলরাজা ধনুকটি তাঁহার একজন পার্শ্বচরের হাতে দিয়া একটি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। চেয়ারে ঠেস দিলেন না, খাড়া হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি যে ভাষায় কথা বলিলেন তাহা ওঁরাও ভাষা।

মধু সামন্ত দো-ভাষীর কাজ করিলেন। বাংলায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার বক্তব্যটি ধূর্জটিকে শুনাইলেন।

মধু সামন্ত বলিলেন, 'আপনি মুর্শিদাবাদে যাচ্ছেন এই খবর পেয়েই ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি একটি খবর গুপ্তচরের মারফত পেয়েছেন, জন সাহেব না কি নবাবদের হাতে বন্দী হয়ে মুর্শিদাবাদ গারদখানায় আছেন। তাঁর সঙ্গে যে তিনটি ওঁরাও যুবতী গিয়েছিল তাদের কিন্তু কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আমার বিশ্বাস কারারক্ষীকে কিছু ঘুষ দিলে জন সাহেব জেল থেকে পালাতে পারবেন।

ধলরাজা বলছেন জন সাহেব যদিও বিদেশী লোক তবু তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আমাকে অনেক দামী দামী মদ উপহার পাঠাতেন। আমাদের উৎসবে গিয়ে নৃত্য করতেন অনেক সময়। ভারী আমুদে লোক ছিলেন। ভালো হরিণের মাংস পেলেই উপহার পাঠাতেন আমাকে। নবাবের কাছে একবার খাজনা পাঠাবার সময় আমার পাঁচশ আসরফি কম পড়েছিল। জন সাহেব সেটা দিয়ে দিয়েছিলেন, আর ফেরত নেননি। বলেছিলেন বন্ধুর বিপদের সময় সামান্য টাকা দিয়েছি তা আবার ফেরত নেব কেন। আমি যদি কখনও বিপদে পড়ি তখন না হয় দেবেন। জন সাহেব আজ বিপদে পড়েছেন, আমি হাজার আসরফি তাঁর জন্য এনেছি। সেটা আপনি নিয়ে যান। আমার বিশ্বাস কারারক্ষী একশ আসরফি পেলেই তাঁকে ছেড়ে দেবে। আর ওই যুবতি তিনটিরও খোঁজখবর করবেন একটু। আমি দু'জন ঘোড়সোয়ার পাঠিয়েছি, তারা আপনার জন্যে পথে তাজা ঘোড়ার বন্দোবস্ত রাখবে। বিশ ক্রোশ অন্তরই আপনি নূতন ঘোড়া পাবেন একটা। তাছাড়া আপনার সঙ্গে থাকবে দশটি ডুলি। আর কিছু সৈন্যসামন্ত। কিছু ঘোড়সোয়ারও আপনার সঙ্গে থাকবে। আর আগে পিছে দুটি দল তীরধনুক নিয়ে পায়ে হেঁটে যাবে। ইনি আপনাকে আর একটা কথা জিগ্যেস করছেন। জন সাহেবকে যদি আমরা উদ্ধার করতে না পারি তাহলে তাঁর বিশাল সম্পত্তির কি হবে? তিনি কি যাওয়ার আগে আপনাকে কিছু বলে গিয়েছিলেন।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন —"তিনি বলে গিয়েছিলেন আমি যদি না ফিরি তাহলে আপনিই আমার এ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। আরও বলে গিয়েছিলেন আমি যতদিন না ফিরি ও সম্পত্তি আপনিই ভোগ দখল করবেন।"

মধু সামন্ত বলিলেন—"ধলভূমের রাজা শুনেছেন এ সম্পত্তির অধিকার তিনি দিল্লীর বাদশাহর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। বাংলার নবাব সরকারে নিশ্চয় কর দিতে হয়। সেটা কি আপনি দেবেন?"

"আমিই দেব। আপনার আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বলুন।"

ধলভূমের রাজা হাসিমুখে ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর যাহা বলিলেন তাহার অনুবাদও করিলেন মধু সামন্ত।

"ধলরাজা বলছেন এ আমাদের দেশ। সিংবোঙা এদেশের মালিক, আমরা তাঁর প্রজা। যদিও আমরা বাইরের লোকদের অনাদর করি না কিন্তু তবু আমরা এটা চাই না যে কোনও বিদেশী এখানে পাকাপাকি বসবাস করুক। পাকাপাকি বসবাস করলে মেয়েদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। ফলে কিছুদিন পরে এমন সব ছেলেমেয়ে জন্মাতে থাকে যারা হো নয়, ওঁরাও নয়। একটা খিচুড়ি জাত তৈরি করার পক্ষপাতী আমি নই। তাই আমার ইচ্ছা যে জন সাহেব এখানে যদি না ফিরে আসেন তাহলে তাঁর বিষয় সম্পত্তি আমিই দখল করব। আপনাকে যদি তিনি উত্তরাধিকারী করে গিয়ে থাকেন আমি আপনাকে ন্যায্য মূল্য দিয়ে তাঁর এ বিষয়টা কিনে নেব। আপনি এ কথাটা ভেবে দেখবেন। অবশ্য জন সাহেব যদি ফিরে আসেন তাহলে তাঁর সঙ্গেই এ বিষয়ে আলোচনা করব। আপনিও আমাকে বন্ধু বলে জানবেন, আর যা বললাম তা বন্ধুর মন দিয়ে বিচার করে দেখবেন। আর একটা কথা। ইংরেজরা এদেশে প্রভুত্ব করুক সেটা আমি চাই না। নবাবদের নানারকম অত্যাচার আছে তা মানছি কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব নবাবরা নামেই নবাব। আমাদের দেশের প্রকৃত মালিক আমরাই আছি। ইংরেজ প্রভু হলে হয়তো তা থাকবে না। নবাবরা নবাব! তারা নবাবি ছাড়া আর কিছু চায় না। এরা নবাব নয়, ব্যবসাদার, এরা ওপর ওপর আমাদের উপর হয়তো কিছুটা সুবিচার করবার ভান করবে, কিন্তু এরা নবাব নয় এরা ব্যবসাদার, এরা আমাদের শোষণ করবে। আপনি গিয়ে চেষ্টা করুন যাতে নবাব পক্ষের জয় হয়। চিঠি চারখানি দিয়ে আসুন; যদি যুদ্ধ বাধে আমরা সৈন্য দিয়ে নবাবকে সাহায্য করব। সেটা কিভাবে করা সম্ভব তা-ও জেনে আসুন। মীরজাফর শুনেছি নবাব সাহেবের সেনাপতি। পারেন তো তার সঙ্গেও দেখা করবেন। আর জন সাহেব আমাদের বন্ধু লোক তাঁর সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই, তাঁকে আমরা রক্ষা করবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করব। আর একটা কথা। শুনলাম আপনি কাল সকালে যাবেন ঠিক করেছেন। কিন্তু আমার পরামর্শে এখনই বেরিয়ে পড়ুন। বাঘে আপনার পিঠে থাবা মেরেছে, মোড়ল বলছে একটু মাংস ছিঁড়ে গেছে, ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু ওই নিয়ে আপনি যদি এখন শুয়ে পড়েন, কাল সকালে উঠতে পারবেন না। ভয়ানক ব্যথা হবে। ঘোড়া চড়ে যেতে পারবেন না। এখন যদি বেরিয়ে পড়েন রাস্তায় চলতে চলতে ব্যথা কমে যাবে। ঘুম ব্যথা বাড়িয়ে দেয়। আপনার সঙ্গে সঙ্গে পালকিও থাকবে। ঘোড়ায় চড়তে যদি অসুবিধা হয় পালকিতে চড়ে যাবেন। কিন্তু জেগে থাকবেন। মোড়ল বলছে আপনি ঘোড়াতে চড়েই যেতে পারবেন।"

"বেশ তাই যাব। খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ব।"

"খুব বেশি খাবেন না—"

"না। ভাত রুটি খাব না। একটু দুধ, মধু, আর মহুয়া খাব।"

"সেই ভালো হবে। আপনার সঙ্গে খাবার থাকবে প্রচুর। তাছাড়া শিকারী যাচ্ছে কয়েকজন, তারা পথে শিকারও করবে—ভয়ের কোনও কারণ নেই। বন্দোবস্ত সব ঠিক থাকবে। খেয়েদেয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ুন। আমি তাহলে এখন উঠি—"

ধলরাজা উঠিয়া পড়িলেন। এমন সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। ভিতর হইতে ঝকমারি বাহির হইয়া আসিয়া ধূর্জটির দিকে চাহিয়া বলিল—"আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তারও ব্যবস্থা কর।"

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে! সে কি"—ধূর্জটিমঙ্গল সত্যই বিস্মিত হইয়া গেলেন।

"আমি তোমাকে একা যেতে দেব না। আমি তো ঘোড়ায় চড়তে জানি। তোমার পিছু পিছু ঘোড়ায় চড়েই যাব। আমার জন্যে একটা ঘোড়াব ব্যবস্থা করতে বল ধলরাজাকে—"

ধলরাজা নিজের নামটা শুনিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মধু সামন্তের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মধু সামন্ত তাঁহাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতেই ধলরাজা বলিলেন—"স্ত্রীলোক নিয়ে পথ চলায় বিপদ আছে। কিন্তু উনি যদি না-ছোড় হন নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। উনি ঘোড়ায় চড়তে পারবেন তো? না, পালকির ব্যবস্থা করতে হবে?"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন, "পারবে। ওর বাইরেটাই স্ত্রীলোকের মতো। ভিতরে ও পুরুষ!"

"উনি আপনার কে হন?"

ধলরাজার এই প্রশ্নের উত্তরে ধূর্জটি বলিলেন, "রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু ও আমাদের বাড়িতে মানুষ হয়েছে। বারাসতের বাড়িতে ছিল, এবার আমার সঙ্গে এসেছে—"

"আমি তাহলে তৈরি হয়ে নি?"

ঝকমারি ভিতরে চলিয়া গেল।

নীলু রায় এতক্ষণ কিছু বলেন নাই। কিছু না বলিয়াই তিনি বাহিরের প্রাঙ্গণে গিয়া পদচারণা শুরু করিলেন।

ধলরাজা এবং মধু সামন্তও ধূর্জটিমঙ্গলকে পুনরায় আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিলেন। অন্দরের দিকে গেলেন ধূর্জটিমঙ্গল। গিয়া জগদ্ধাত্রীর খোঁজ করিলেন। ঝকমারিকেও দেখা গেল না। জগদ্ধাত্রীর খাস পরিচারিকে রুলা বলিল—"মা ঠাকুরঘরে।"

ধূর্জটি ঠাকুরঘরে গিয়া দেখিলেন জগদ্ধাত্রী উপুড় হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন। ঠিক তাহার পিছনে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া আছে ঝকমারি। ধূর্জটিমঙ্গলও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সরিয়া গেলেন।

।। চার।।

নীলু রায় অন্ধকার প্রাঙ্গণে পদচারণ করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন এবার কি করা কর্তব্য। তিনি দাবা খেলোয়াড়, সঙ্গীতবিশারদও। দাবার যে চালটা ভাবিয়া তিনি ধূর্জটিমঙ্গলের সহিত কলিকাতা হইতে এতদূর আসিয়াছিলেন, অনুভব করিলেন সে চালটায় বাজি মাত করা সম্ভব নয়। সেতারের যে সুরটা বাজাইবেন ভাবিয়াছিলেন সে সুরটা বাজানো গেল না, গোড়াতেই সেতারের তারটা ছিঁড়িয়া গেল। নীলু রায়কে ধূর্জটিমঙ্গলের বন্ধু বলিয়াছি। কিন্তু সে বন্ধুত্ব

লৌকিক বন্ধুত্ব, মৌখিকও বলিতে পারেন। কয়টা লোকের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় আমাদের জীবনে? নীলু রায়ও ধূর্জটিমঙ্গলের প্রকৃত বন্ধু নহেন। সূতানুটিতে উভয়েই একপাড়ায় বাড়ি, ছেলেবেলায় এক পাঠশালায় সীতারাম পণ্ডিতের হাতে উভয়েই শাস্তিভোগ করিয়াছিলেন, বন্ধুত্বের সূত্র এইটুকু। শত্রুতার সূত্রও আছে। প্রথম এবং প্রধান সূত্র অবস্থা-বৈষম্য। ধূর্জটি বড়লোক, তাঁহার অনেক বিষয়সম্পত্তি, অনেক লোক তাঁহার কথায় উঠে বসে, অনেক লোক তাঁহাকে খাতির করে। নীলু রায় সে তুলনায় নিষ্প্রভ। তিনি সাধারণ গৃহস্থ। খাওয়া-পরার অভাব নাই, কিন্তু তিনি ধনী নহেন, মধ্যবিত্ত। ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতে যেমন বারো মাসে তেরো পার্বণ, সেখানে সর্বদাই যেমন দীয়তাং ভুজ্যতাং, নীলু রায়ের বাড়িতে তেমন নাই। ধূর্জটিমঙ্গলের মতো লোকলস্কর দারোয়ান চোপদার, ঘোড়া পালকি, তাঞ্জাম ডুলি, নীলু রায়ের নাই। নীলু রায় পদব্রজেই ভ্রমণ করেন। দূরে যাইতে হইলে তাঁহাকে গাড়ি কিম্বা ঘোড়া ভাড়া করিতে হয়। ধূর্জটিমঙ্গলের মতো উজ্জ্বল বংশপরিচয়ও তাঁহার নাই। ধূর্জটিমঙ্গলের পিতা বিখ্যাত মহেশমঙ্গল, কিন্তু নীলু রায়ের পিতা কুখ্যাত ব্যক্তি। তিনি আগ্রায় থাকেন, আচারআচরণ মুসলমানী। যৌবনকালেই ভাগ্য অন্বেষণ মানসে তিনি আগ্রা চলিয়া যান। সেখানেই একটি ফলের দোকান করেন, এবং তাঁহার কিশোরী স্ত্রী ফুলমণিকে সেখানেই লইয়া যান। কলিকাতার বাড়িতে তাঁহার বালবিধবা ভগ্নী দুর্গা এবং তাঁহার দেবর বালক দ্বিজদাস বসবাস করিতেন। জমিজমা হইতে যে আয় হইত, তাহাতে সংসার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবার কথা। কিন্তু নীলু রায়ের পিতা জনক রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বেশি উপার্জন-আকাঙ্ক্ষায় উত্তর প্রদেশে চলিয়া গেলেন। আগ্রায় ফলের দোকান করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং ফুলমণিকেও লইয়া গেলেন। তাহার পর সহসা একদিন তিনি আবার আবির্ভূত হইলেন। সঙ্গে ছয় মাসের একটি শিশু। পোশাক-পরিচ্ছদ মুসলমানী। গোঁফ কামাইয়া নুর রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে যে মুসলমান ভৃত্যটি আসিয়াছে সে তাঁহাকে জন্নু মিঞা বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। জন্নু মিঞা বলিলেন—এই শিশুটি প্রসব করিবার সময় ফুলমণি মরমর হইয়াছিল। আগ্রার হেকিমদের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে কোনক্রমে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু শরীর তাহার ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, আয়ুও শেষ হইয়াছিল, কিছুদিন আগে সে মারা গিয়াছে। তাই দুর্গার কাছেই সে শিশুপুত্রটিকে রাখিয়া যাইতে চায়। দ্বিজদাসকে কিছু টাকা দিয়া বলিলেন—ভালো দেখে গাই একটা কিনে নিও। আমি তো বিষয়-আশয় থেকে এক পয়সাও নিইনি, নেবও না। তবে ছেলেটার যেন অযত্ন না হয়। এর বেশি আমি আর কিছু চাই না। বাঙালীর ছেলে বাংলা দেশেই মানুষ হোক। ওদেশে মানুষ হলে ও আর বাঙালী থাকবে না। আমার দশা দেখছ না! আমি কি আর বাঙালী আছি?"

দ্বিজদাস জন্নু মিঞার মুসলমান ভৃত্যটির নিকট যে সংবাদটি পাইয়াছিলেন তাহা অনেকদিন কাহাকেও বলেন নাই। না বলাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন এই কারণে যে ইহা প্রকাশ করিয়া কোনও লাভ নাই বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা। জন্নু মিঞা গানবাজনা চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। সারেঙ্গী নামক যন্ত্রটি তিনি নাকি খুবই ভালো বাজাইতে পারিতেন। আগ্রার ফলের দোকানটি যে কিভাবে উঠিয়া গেল তাহার খবর দ্বিজদাস জানিতে পারেন নাই। এইটুকু শুধু জানিয়াছিলেন যে জন্নু মিঞা এখন ফলের ব্যবসা করেন না, বাইজী লইয়া গানবাজনার

ব্যবসা করেন, আমীর ওমরাহদের বাড়িতে 'মুজরা' করিয়া বেড়ান, তাঁহার অধীনে নাকি কয়েকটি খপসুরৎ বাইজী আছে। এ খবরটা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। দ্বিজদাসবাবু যথাসময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। বধূ যাদুমণিকে দুর্গার কাছেই আনিয়াছিলেন তিনি। নিজের বাড়িতে না লইয়া গিয়া দুর্গার কাছেই আনিয়াছিলেন কারণ তাঁহার নিজের বাড়ি বেহাত হইয়া গিয়াছিল। নবাব সরকারের একজন গোমস্তা রমজান আলীকে তিনি বাড়িটি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেকদিন নাকি খাজনা দেওয়া হয় নাই, দ্বিজদাসের বাড়ি এবং কয়েক বিঘা জমি নাকি নীলামে উঠিয়াছিল, নবাব সরকারের উক্ত গোমস্তাটি বলিলেন, "তোমার বাড়িতে যদি আমাকে থাকিতে দাও এবং তোমার জমি যদি আমাকে ভোগ করিতে দাও তাহা হইলে তোমার বাড়ি জমি নীলাম হইবে না। নবাব সরকারের আমলার সম্পত্তি নীলাম হয় না। এখানকার ফৌজদারও আমার ফুফা। আমি তোমাকে মাসে মাসে কিছু ভাড়া দিব এবং তাহা দিয়াই তোমার বাকি খাজনার উশুল করিব। সুতরাং সম্পত্তি তোমারই থাকিয়া যাইবে শেষ পর্যন্ত।" দ্বিজদাসকে কিন্তু আমরণ তাঁহার বৌদিদি দুর্গার কাছেই থাকিতে হইয়াছিল। বাড়ি বা সম্পত্তি তিনি ফেরত পান নাই। পরিবর্তে অবশ্য পাইয়াছিলেন রমজান আলীর বন্ধুত্ব। নবাবী আমোলে সেটাও কম নয় সুতরাং দ্বিজদাস যখন বিবাহ করিলেন তখন বধূ যাদুমণিকেও দুর্গার সংসারেই আনিতে হইল। কিছুদিন বেশ ভালোভাবেই কাটিল। কিন্তু যাদুমণির একটি পুত্রসন্তান হওয়ার পর দ্বিজদাসকে উপলব্ধি করিতে হইল যে জননীরা ব্যাঘ্রিণীর মতো। দুই ব্যাঘ্রিণী একসঙ্গে থাকিতে পারে না। নীলুকে দুর্গা পুত্রবৎ মানুষ করিতেছিলেন, যাদুমণিও দেখিলেন তাহার পুত্রটির যতটা যত্ন হওয়া উচিত এ সংসারে ততটা হইতেছে না। আপাতদৃষ্টিতে যাহা অতি তুচ্ছ ইহাদের দৃষ্টিতে তাহা উচ্চ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কলহ এমন পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত উঠিল যে যাদুমণি একদিন বাপের বাড়ি চলিয়া গেলেন। হরিপালে বাপের বাড়ি। একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া চলিয়া গেলেন তিনি, স্বামী দ্বিজদাসকে বলিয়া গেলেন, আর ফিরিবেন না। যাদুমণি বাপের একমাত্র সন্তান, সুতরাং পিতৃগৃহে তাঁহাকে অমর্যাদা করিবার মতো লোক ছিল না। যাদুমণির মাতা বাতরোগে কাতর হইয়া থাকিতেন, কন্যা আসাতে সংসারের যাবতীয় ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি ঠাকুরঘর আশ্রয় করিলেন। যাদুমণির পিতা রত্নেশ্বর খুব বড়লোক না হইলেও সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। ঘরে গাই ছিল, পুকুর ছিল, গৃহসংলগ্ন ছোটখাটো বাগানও ছিল একটা। ভাগে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াও জমি হইতে যে পরিমাণ ধান পাইতেন তাহাতে তাঁহাদের সম্বৎসর নিজেদের খাওয়াপরা তো চলিতই—অন্যান্য খরচও চলিয়া যাইত। যাদুমণি এই সংসারে সর্বেসর্বা হইয়া রহিলেন। ঘরজামাই হইয়া শ্বশুরবাড়িতে থাকিতে দ্বিজদাসের আত্মসম্মানে কিন্তু বাধিল। তিনি মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়িতে আসিতেন দুই একদিনের জন্য, দুর্গার কাছেই অধিকাংশ সময় কাটাইতেন তিনি। দুর্গার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানও করিতেন। এইভাবেই চলিতেছিল। কিন্তু বেশীদিন চলিল না। বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। দুর্গা ম্যালেরিয়াতে ভুগিতেছিল বহুদিন হইতে। কবিরাজের পাচন, তারকেশ্বরের মানত, গ্রহশান্তির মাদুলি কোন কিছুই তাহাকে নিরাময় করিতে পারে নাই। ইহার উপর যখন সে আমাশয় রোগে পড়িল, তখন আর সামলাইতে পারিল না। ত্রিশ বৎসর বয়সেই তাহাকে জরাজীর্ণা বৃদ্ধার মতো দেখাইত। তাহার পর হজমের গোলমাল হইয়া

যখন অতিসার রোগে ধরিল তখন শয্যা লইতে হইল তাহাকে। কিছুদিন পরে মারা গেল সে। মৃত্যুকালে সে দ্বিজদাসকে বলিয়া গেল—"আমার পাপের জন্যেই এই শাস্তি। তোমার বৌয়ের সঙ্গে আমি মানিয়ে চলতে পারিনি। সেটা আমার দোষ। আমি চললুম। তাকে আবার এই সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তা না হলে চারবছরের ছেলে নীলুকে দেখবে কে। তোমার ছেলে আর নীলু দু'জনেই যাদুমণির কাছে মানুষ হোক।" যাদুমণি প্রথমে আসিতে রাজি হন নাই। বুড়ো বাবা-মাকে কে দেখিবে। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায়ের স্বরূপ আবার প্রকটিত হইল। যাদুমণির বাবা সন্ন্যাসরোগে হঠাৎ মারা গেলেন। দ্বিজদাস তখন প্রস্তাব করিলেন যে যাদুমণি তাহার মাকে লইয়াই সুতানুটিতে চলুক। হরিপালের বিষয়ের তত্ত্বাবধান সে সুতানুটিতে বসিয়াই করিবে। তাহাই হইল। দুই বৎসরের শিশুপুত্র এবং বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া যাদুমণি আবার স্বামীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীলুর বয়স তখন চার বৎসর।......

নীলু রায় অঙ্গনে পরিক্রমণ করিতে করিতে নিজের অতীত জীবন পর্যালোচনা করিতেছিলেন। সবটা স্পষ্ট মনে ছিল না। কিছুটা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন। দুর্গাকে তাঁহার মনে পড়ে না। যাদুমণিকে পড়ে। ছয় বৎসর যাদুমণির স্নেহের অত্যাচার তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। যাদুমণির ক্ষুধিত স্নেহ যেন নাগপাশের মতো তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। হরিপাল হইতে আসিবার বছর দুই পরেই তাহার পুত্রসন্তানটি সর্দিজ্বরে মারা যায়। শেষে তাহার নাকি দমবন্ধ হইয়া গিয়াছিল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে পারে নাই। দ্বিজদাস কিছুকাল পূর্বে পশ্চিমদেশীয় এক সাধুর নিকট মন্ত্র লইয়াছিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। ছয় মাস তাঁহার কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। পাড়াব নিমু গোঁসাই পিতৃপিণ্ড দিবার জন্য গয়াধামে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত দ্বিজদাসের দেখা হইয়াছিল। বলিলেন দ্বিজু সন্ন্যাস লইয়াছে, সে আর সংসারে ফিরিবে না। তাহার গুরুর আশ্রম লছমন ঝোলার কাছে। সেইখানেই সে বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিবে। দ্বিজদাস সত্যই আর ফেরেন নাই। তখন সংসারের হাল ধরিলেন যাদুমণি। তাহার মা শয্যাগত হইয়া বহুকাল বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার সমস্ত সেবা যাদুমণি করিতেন। নীলুকে স্বহস্তে তিনি স্নান করাইতেন। নিজে তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেন। কোনও ওজর-আপত্তি শুনিতেন না। নীলু খাওয়ার সময় দুর্গার কাছে নানা বায়না করিত। এটা ঝাল, এটা তেতো, পলতা খাব না, ওল খাব না ইত্যাদি নানারকম ওজর তুলিয়া খাইতে চাহিত না। দুধ খাওয়ানো একটা সমস্যাই ছিল। কিন্তু যাদুমণির আমলে ছবি বদলাইয়া গেল। তিনি তাহাকে ঘাড় ধরিয়া স্বহস্তে খাওয়াইতেন। ভাত ডাল তরকারির গোলা পাকাইয়া মুখে গুঁজিয়া দিতেন। নীলু বেশী আপত্তি করিলে ঠাস ঠাস করিয়া চড়াইয়া দিতেন তাহাকে। মুখে স্বহস্তে দুধের বাটি ধরিতেন, এবং দুধ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া থাকিতেন। সামনের মাঠে নীলু যখন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলিত তখনও তিনি সেদিকে জানালা খুলিয়া তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তাহার পালঙ্কটা খুব উঁচু ছিল, যাদুমণি তাহার চারিদিকে উঁচু কাঠের বেড়া বানাইয়া লইয়াছিলেন পাছে নীলু রাত্রে ঘুমের ঘোরে বিছানা হইতে পড়িয়া যায়। সেই বিছানাতেই তিনি নীলুর পাশে শুইতেন। রাত্রে মাঝে মাঝে নীলুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত। নীলু দেখিত যাদুমণি ঘুমের ঘোরে তাহাকে সবলে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। কিছুতেই যেন ছাড়িবে না।

বিষয়-সম্পত্তির ভারও লইয়াছিলেন যাদুমণি। তাঁহার দূর-সম্পর্কের এক জ্ঞাতিভাই সর্বেশ্বরকে মাসিক দশ টাকা বেতনে বহাল করিয়াছিলেন। সেকালের পক্ষে মাসিক দশ টাকা বেশ ভালো বেতন। সর্বেশ্বরকে হরিপালের বিষয় এবং সুতানুটির বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় কাজ করিতে হইত। প্রজাদের জমি বিলি করা, ধান আদায় করিয়া আনা, সে ধান বিক্রয় করা, জমিদারকে খাজনা দেওয়া, গোমস্তাদের সহিত ভাব-সাব রাখা—এ সবই করিতে হইত তাহাকে। হরিপালের বসতবাটিতে কৃষ্ণ বাচস্পতিকে বাস করিতে দিয়াছিলেন তিনি। কৃষ্ণ বাচস্পতি পণ্ডিত লোক, কিন্তু অতি দরিদ্র, জীর্ণ পর্ণকুটিরে বাস করিতেন। তিনি নিঃসন্তান, বৃদ্ধা পত্নীটিই তাঁহার একমাত্র আত্মীয়। বাল্যকাল হইতেই বাচস্পতি মহাশয়কে ভক্তি করিতেন যাদুমণি। ছেলেবেলায় তাঁহারই পাঠশালায় যাদুমণি কিছুদিন পড়িয়াছিলেনও। বাচস্পতি মহাশয়কে তিনি হরিপালের বাড়ির ভদ্রাসনে বসাইয়া বলিলেন, "পণ্ডিতমশায়, আপনি এখানেই থাকুন। সর্বেশ্বর আপনার দেখাশোনা করবে। আমার জমি থেকেই আপনাদের ভরণপোষণ হবে। আপনি আপত্তি করবেন না। আশীর্বাদ করুন আমার নীলু যেন বেঁচে থাকে। আমার তো সব গেছে, আপনাদের আশীর্বাদে নীলু যদি ভালো থাকে, ও যদি মানুষর মতো মানুষ হয় তাহলেই যথেষ্ট। আর আমি কিছু চাই না। নীলু প্রণাম কর বাবা পণ্ডিতমশাইকে---"

হরিপালে যখনই যাইতেন যাদুমণি নীলুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

পিছনেব দিকে হস্তনিবদ্ধ করিয়া পদচারণ করিতে কবিতে নীলু রায়ের সহসা মনে হইল বিধাতা তাঁহার প্রতি সুবিচার করেন নাই। যখনই তাহার জীবনে সৌভাগ্যের অঙ্কুর গজাইয়াছে অমনি সেটাকে তিনি যেন দুপায়ে মাড়াইয়া পিষিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহার বয়স যখন বারো বছর তখন যাদুমণিও মারা গেলেন হঠাৎ। ওলাউঠার মহামারী বন্যায় নীলু রায়ের স্নেহের একমাত্র আশ্রয়নীড়টি ভাসিয়া গেল। নীলুর তখন ধূর্জটিমঙ্গলের সহিত ভাব হইয়াছে। একই পাঠশালায় পড়েন, একই মাঠে খেলাধূলা করেন। ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতেও যাতায়াত ছিল। ধূর্জটিমঙ্গলের মা তাহাকে স্নেহ করিতেন। ঝকমারিকে তিনি শৈশব হইতেই দেখিয়াছেন। ধূর্জটিমঙ্গলরা খুব ধনী, কিন্তু তাঁহাদের ঐশ্বর্যের উত্তাপ ছিল না। সাধারণ সাদা-মাটা চালই ছিল তাঁহাদের। ধূর্জটিমঙ্গল বড় হইয়া একটি ঘোড়া কিনিয়াছিলেন, কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গলের বাবার আমলে নিজেদের কোনও যানবাহন ছিল না তাহাদের। পোশাক-পরিচ্ছদেও বিশেষ কোন চটক ছিল না। খাওয়াদাওয়াতেও না। সাধারণ গৃহস্থের মতই থাকিতেন তাঁহারা। বাড়িতে অবশ্য বারো মাসে তেরো পার্বণ হইত এবং সে পার্বণে পাড়ার সবাই যোগ দিত। অনেক দুঃস্থ এবং গরীব লোককে প্রতিপালন করিতেন তাঁহারা। যাদুমণি যখন মারা গেলেন তখন ধূর্জটির মা সর্বমঙ্গলা নীলুকে ডাকিয়া একদিন বলিলেন—তুই আমাদের বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া করিস। সর্বমঙ্গলার সহিত ঘনিষ্ঠতাটা এমন নিবিড় হইয়াছিল যে নীলু রায় এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচবোধ করিলেন না। ধূর্জটিমঙ্গলদের পরিবারেরই একজন হইয়া গেলেন তিনি। রাত্রে অবশ্য নিজের বাড়িতে শুইতে যাইতেন। তাঁহার বাড়িটা ক্রমশ পাড়ার ছেলেদের আড্ডাঘর হইয়া পড়িল। তাস-পাশা খেলা হইত। ধূর্জটিমঙ্গল কয়েকটা হুঁকা এবং একটা বড় গড়গড়াও আমদানী করিয়াছিলেন সেখানে। যৌথভাবে তামাক খাওয়া চলিত। কিছুদিন পরে সেখানে

কেরামত মিঞা নামক একটি যুবক মুসলমানও জুটিল। এখন যেমন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা শত্রুতার প্রাচীর উঠিয়াছে তখন তেমন ছিল না। নবাবসরকারেও উচ্চপদে হিন্দু কর্মচারীরা বহাল হইতেন। মুসলমানের সহিত হিন্দুর বন্ধুত্বের কোন বাধা ছিল না। কেরামত মিঞার পিতা ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। দিল্লীতে, পাটনায়, মুর্শিদাবাদে, ঢাকায় কারবার ছিল তাঁহার। বেগমও অনেকগুলি ছিল। কেরামতের অনেকগুলি ভাইবোন। তাহার কয়েকটি ভাই পিতার ব্যবসাই দেখাশোনা করিত। কেরামত ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। গানবাজনা মজলিস তরফা লইয়াই থাকিত সে। ওই সবই ভালোবাসিত। ধূর্জটিও ভালোবাসিত বাইজিদের নাচ দেখিতে। বাইজিদের নাচের আসরেই কেরামত মিঞার সহিত তাহার আলাপ হয়। ক্রমে নীলু রায়ের সহিতও আলাপ হইল এবং সে আসিয়া হাজির হইল একদিন নীলু রায়ের বাড়িতে। কেরামত মিঞাই গান-বাজনা আরম্ভ করিল সেখানে। সেতার, এস্রাজ, সারেঙ্গি, বেহালা, ডুগিতবলা একে একে শুধু হাজিরই হইল না, নিজেদের প্রতিপত্তিও বিস্তার করিল। নীলু রায় গানবাজনায় বেশ ওস্তাদ হইয়া উঠিলেন। ধূর্জটিমঙ্গল দুই একটা যন্ত্র বাজাইতে শিখিলেন বটে, কিন্তু উহা লইয়া মাতিয়া উঠিলেন না। ধূর্জটিমঙ্গল একটু অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। তিনি সবেতেই থাকেন, অথচ কিছুর মধ্যে ডুবিয়া যান না। পদচারণা করিতে করিতে এই কথাটাই বিশেষভাবে মনে হইতে লাগিল নীলু রায়ের। ধূর্জটি তাঁহার আবাল্য বন্ধু, কিন্তু তাঁহাকে তিনি ভালো করিয়া চেনেন না। স্বল্পবাক ধূর্জটিমঙ্গল কখন যে কি ভাবিতেছে, কোন মতলবে কোনদিকে চলিতেছেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ধূর্জটি জগদ্ধাত্রীকে এই সিংভূমের জঙ্গলে এতদিন ফেলিয়া রাখিয়াছেন কেন ইহাও নীলু রায় ঠিক বুঝিতে পারেন না। ধূর্জটির শ্বশুর যে মুসলমান ওমরাহটির ভয়ে জগদ্ধাত্রীকে জন সাহেবের আশ্রয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সে ওমরাহটি বহুদিন হইল ঢাকায় চলিয়া গিয়াছেন তবু জগদ্ধাত্রীকে এখানে ফেলিয়া রাখিবার অর্থ কি ইহা নীলু রায় বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে পারেন না তাহার কারণ বন্ধুত্ব সত্ত্বেও ধূর্জটি কখনও তাঁহাকে বলেন নাই যে জন সাহেব তাহার সমস্ত সম্পত্তির ভার তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখানে একটা আস্তানা রাখা দরকার। জগদ্ধাত্রীকেই এই গৃহস্থালীর অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার, একথাও তিনি নীলু রায়কে বলেন নাই। অথচ সকলেই বলে নীলু রায় নাকি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। এক হিসেবে দক্ষিণ হস্ত তো বটেই। ধূর্জটির সমস্ত বিষয়-আশয়ের দেখাশোনা সেই করে। যাদুমণির বাপের বাড়ির বিষয়টা শেষ পর্যন্ত নীলু রায়ই পাইয়াছিলেন। ঠিক পাশেই ছিল ধূর্জটির ছোটখাটো একটা মহাল। বছরে হাজার পাঁচেক টাকা আয় ছিল তার। ধূর্জটি সেটা নীলু রায়কেই দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন ও মহালটা তুমিই নাও। এর বদলে আমার অন্যান্য বিষয়সম্পত্তিগুলোর দেখাশোনাও তুমি কর। ওসব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পারি না। তুমি চৌকশ লোক, তুমিই কর এসব।"

"আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে তো ঠিক"—নীলু রায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

"না পারবার কোনও হেতু নেই। তোমাকে এতদিন ধরে দেখছি। তোমার সঙ্গে রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই, কোনও কুটুম্বিতা নেই, তুমি আমাদের আত্মীয় নও, অথচ তোমার চেয়ে আপনার লোক আমার আর কেউ নেই। আমার যদি অবিবাহিতা একটা বোন থাকত তোমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতাম।"

নীলু রায়ের এই তো স্বপ্ন। তিনি ধূর্জটির আত্মীয় হইতে চান। এই কথার পিঠেই হঠাৎ তিনি বলিয়া বসিলেন—"কেন ঝকমারি তো আছে।"

এ কথায় ধূর্জটিমঙ্গল বিস্মিত হইবেন ইহাই নীলু রায় প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিস্মিত হন নাই। বেশ সহজভাবেই উত্তর দিয়াছিলেন—"ঝকমারি কাউকে বিয়ে করবে না। ও বেহারী মেয়ে। আমাদের বাড়িতে মানুষ হয়েছে। ওর মতের বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে পারব না। তবে তুমি যদি ওর মত করাতে পার, আমার আপত্তি হবে না।"

কথাটা ধূর্জটিমঙ্গল এমনভাবে বলিয়াছিলেন যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়, নীলু রায় যদি ঝকমারির সম্মতিটা আদায় করিতে পারেন তাহা হইলে বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়া যাইবে। নীলু রায় ঝকমারিকে আগে অনেকবার দেখিয়াছেন, নারী হিসাবে তাহাকে তাঁহার মোটেই মনোরম মনে হয় নাই। কেমন যেন মদ্দা মদ্দা চেহারা, কাটখোট্রা ভাব। না নীলু রায় ঝকমারির প্রেমে পড়েন নাই। কিন্তু সহসা সেদিন তাঁহার মনে হইয়াছিল ঝকমারিকে বিবাহ করিলে ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহার আপনলোক হইবেন। নীলু রায়ের জীবন মরুভূমির মতো. আত্মীয়স্বজন সব মরিয়া গিয়াছে, ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতেই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়, ধূর্জটিমঙ্গলের মা তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। ধূর্জটিমঙ্গল কিন্তু এখনও তাঁহাকে স্নেহ করেন। সেই ধূর্জটিকে সামাজিক আত্মীয়তার গণ্ডীর মধ্যে পাইবার আগ্রহই তাঁহার প্রবল। কিন্তু বারবার তাঁহার মনে হয় ধূর্জটি রহস্যময়।

এখানেও আজ যে ঘটনাটা ঘটিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাস ধূর্জটি তাঁহাকে আগে দেন নাই। ঝকমারি ধূর্জটিকেই ভালোবাসে, ধূর্জটিও তাহা জানেন। কিন্তু নীলু রায় ঘুণাক্ষরেও ইহা জানিতেন না। নীলু রায় যখন ঝকমারিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তখন ধূর্জটি বিস্ময়প্রকাশ করেন নাই। কেন করেন নাই তাহা এখন নীলু রায় বুঝিতে পারিলেন। এখন কি করিবেন তিনি? ঝকমারি তো ধূর্জটির সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া যাইবে। তাঁহার কর্তব্য কি? প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে একটা মোড়া ছিল। তাহার উপর তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সুতানুটিতে ফিরিয়া যাইবেন? কিন্তু সেখানে গিয়া কি হইবে? নবাব সৈন্যরা সুতানুটি পুড়াইয়া দিয়াছিল, ইংরেজরাও কালা আদমীদের আশ্রয় দেয় নাই, লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। অনেক লোক কলিকাতার বাহিরে দূর গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। নীলু রায় তখন হরিপালে চলিয়া গিয়াছিলেন। হরিপালের অনেক ঘটনা মনে পড়িল তাঁহার। হরিপালে কেবল বাড়িটাই ছিল, আর কেহ ছিল না। বৃদ্ধ বাচস্পতি বহুদিন আগে সস্ত্রীক মারা গিয়াছেন। নীলু রায় খালি বাড়ির বারান্দায় একা বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় করা যায়। সেকালে গ্রামে গ্রামে হোটেল ছিল না। দুই একদিনের জন্য আসিলে গ্রামেরই চেনাশোনা কাহারও নিকট অতিথি হিসাবে থাকিতে হইত। কিন্তু নীলু রায়কে যে কতদিন এখানে থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। পাশেই গাঙ্গুলীদের বাড়ি। কিন্তু সেখানেও কাহারও দেখা পাইলেন না নীলু রায়। বাড়িতে তালাবন্ধ। গাঙ্গুলীরা থাকিলে নীলু রায় সেখানে দিনকয়েক স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। শেষে ভাবিলেন—এই বাড়িতেই স্বহস্তে ভাতেভাত ফুটাইয়া লইলেই চলিবে। দেখিলেন বাগানে প্রচুর তরিতরকারি ফলিয়াছে। গোয়ালা পাড়ায় গিয়া কিছু দুধ বন্দোবস্ত করিলে চলিয়া যাইবে কোনক্রমে। তিনি রঘু গয়লাকে একটি গাভী

দান করিয়া গিয়াছিলেন এখান হইতে যখন বাস তুলিয়া সুতানুটিতে চলিয়া যান। গোয়ালার খোঁজ করিতে হইবে। হঠাৎ ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে একটি কালো কিশোরী মেয়ে আসিয়া হাজির হইল।

"গড় করি দাদাঠাকুর। আপনি কখন এলেন—"

"এখুনি এসেছি। তুমি কে—"

"আমি ছিরি।"

নীলু রায়ের চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি খিরির মেয়ে—"

তখন সব মনে পড়িল নীলু রায়ের। খিরি তাহাদের বাড়ির ঝি ছিল। যাদুমণি খুব ভালোবাসিতেন তাহাকে। মনে পড়িল তাহার একটা খোঁড়া মেয়ে ছিল।

"খিরিদিদি কোথায়? তাকেই আমি খুঁজছি। এখানে দিনকতক থাকতে হবে। নিজে হাতেই রেঁধে খাব ভাবছি সে যদি এসে একটু যোগাড় করে দেয়—"

"মা তো মারা গেছে। কি যোগাড় করতে হবে বলুন না, আমিই করে দিচ্ছি সব।"

নীলু রায় তখন সব বলিলেন।

"আপনি কখনও রেঁধেছেন আগে?"

"না।"

"তাহলে আপনি রাঁধবেন কেমন করে? আমিই সব রেঁধে দেব। আপনি ভাতটা নামিয়ে নেবেন খালি। আমি কম জল দিয়ে চড়িয়ে দেব, ফ্যান গালতে হবে না। ফ্যানেভাতে ভালই হবে—"

এই বলিয়া মুচকি হাসিল সে। তাহার সেই মিষ্ট হাসিটা মনে পড়িল নীলু রায়ের। ছিরি সেদিন স্বহস্তে দুইটা উনান প্রস্তুত করিল, শুকনো কাঠ যোগাড় করিল, বঁটি এবং বাসন-কোসন আনিল। ঝাড়ু আনিয়া ঘরদুয়ার পরিষ্কার করিল। নীলু রায় দিনেরবেলা সাধু ময়রার দোকানে মিষ্টান্ন খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। মণ্ডা, গজা, নিখুঁতি, মতিচুর আর দই। খাওয়া নিতান্ত মন্দ হইল না। ছিরি মুদির দোকান হইতে চাল, ডাল, মসলাপাতি কিনিয়া আনিয়াছিল। বলিল, "উনুন তো আজ শুকোয় নি। কাল আঁচ দেব। আজ চলুন সাধু-মামার দোকানেই আপনার জন্যে রান্নার ব্যবস্থা করি। ওঁর উনুনেই রান্না করে দেব আজ। সাধু মামাকে চলুন বলি গিয়ে।"

সাধু ময়রা শুনিয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বলিল,—"আমারই অতিথি হবেন উনি আজ। রাধিকে ডেকে পাঠাচ্ছি সেই সব করে দেবে—তুমি রাঁধবে কেন।"

রাধি বেণীবাবুর বাড়ির রাঁধুনী। প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা। সে আসিয়া বলিল—"আমি ওদের রান্না সেরে তবে আসব। হয়তো একটু দেরি হবে।"

নীলু রায় বলিয়াছিলেন—"ওবেলা তোমার দোকানে অনেক খেয়েছি সাধু। খুব ক্ষিধে পায়নি এখনও। রাত্রে না খেলেও চলবে—"

"সে কি হয়—"

সেদিন অধিক রাত্রে ভূরিভোজন করিয়াছিলেন নীলু রায়।

রাধি ভালো রাঁধুনী। তাহার শাকের ঘণ্ট, মুগের ডাল, রুই মাছের ঝোল, বেগুন ভাজা,

মৌরলা মাছের অম্বল প্রত্যেকটাই চমৎকার। সাধুর দোকানের ঘন ক্ষীর আর গরম সন্দেশের কথাও এখনও মনে আছে তাঁহার। সাধুর বাড়িতে নৈশভোজন সমাধা করিয়া নীলু রায় নিজের বাড়িতেই ফিরিয়া আসলেন। সঙ্গে বিছানা আনিয়াছিলেন। প্যাঁটরাও ছিল একটা। বেতের তৈরি প্রকাণ্ড প্যাঁটরা একটা। তাহাতে কাপড় পিরান গামছা টাকাকড়ি সব ছিল। তিনি একটা গরুর গাড়ি করিয়া আসিয়াছিলেন। হাঁটিয়াই আসিয়াছিলেন অবশ্য অধিকাংশ পথ, গরুর গাড়ি লইয়াছিলেন বিছানা এবং প্যাঁটরাটার জন্য। গরুর গাড়ির চালক দামোদর তাঁহার পূর্বপরিচিত ছিল। তাহার সহিত গল্প করিতে করিতে বেশ আনন্দেই পথ হাঁটিয়াছেন তিনি। ক্লান্ত হইলে মাঝে মাঝে গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছেন। ছিরি একটি প্রদীপও সংগ্রহ করিয়াছিল। পিতলের একটি পিলসুজও। সাধুর বাড়ি হইতে ফিরিয়া নীলু রায় দেখিলেন ছিরি তাঁহার জন্য পরিপাটিরূপে বিছানা করিয়া রাখিয়াছে। নীলু রায়ের অপেক্ষাতেই ছিরি বাবান্দায় বসিয়াছিল। নীলু বায় আসিতেই বলিল—"আমি এবার বাড়ি যাচ্ছি। বাবাকে গিয়ে পাঠিয়ে দেব? আপনার বাইরের বারান্দায় শুয়ে থাকবে। তাই পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাড়িটা এতদিন খালি পড়েছিল তো, একা থাকা ঠিক নয়। কাল এসে আমি রান্নাবান্না সব করে দেব। কদিন থাকবেন দাদাঠাকুব?"

"থাকব এখন কিছুদিন। সুতানুটিতে বড় গোলমাল বেধেছে।"

"তাই নাকি! লক্ষ্মণ জেলেও তাই বলছিল। সে সুতানুটিতে মাছ বিক্রি করত। সে-ও পালিয়ে এসেছে—আমি বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

ছিরি চলিয়া গেল। একটু পরেই ছিরির বাবা কৈলাস আসিয়া হাজির হইল। বেশ বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তি। বয়স যদিও ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু দেখিলে মনে হয় চল্লিশ। মাথার চুল একটিও পাকে নাই। জাতিতে কর্মকার। চাষাদের জন্য ফাল, অশ্বারোহীদের জন্য ঘোড়ার নাল, গৃহস্থদের জন্য খুন্তি, শাবল কোদাল এই সব প্রস্তুত করে সে। বাড়ির পিছনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে। সেখানে কুস্তির আখড়া আছে তাহার। সেখানে সন্ধ্যার পর গ্রামের যুবকেরা কুস্তি লড়ে। কৈলাস নিজেও একজন ভালো কুস্তিগীর। কৈলাস বগলে করিয়া একটি মাদুর এবং একটি ছোট বালিশ আনিয়াছিল। বারান্দায় সেগুলি নামাইয়া নীলু রায়কে ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

"বাবাঠাকুর, সুতোনুটি থেকে চলে এলেন কেন—"

"ওখানে ইংরেজ আর নবাবে হুজ্জুৎ লেগেছে। আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে সব—"

"হ্যাঁ ভাণ্ডারহাটির লক্ষ্মণ জেলে সেই কথা বলছিল এক দিন। সে-ও চলে এসেছে। বলছে এখানেই হাটে হাটে মাছ বেচব।"

"এখানে কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি—"

"এখানে কিছু হয়নি। যেমন চলছিল তেমনি চলছে। গোয়ালারা দুধ যোগাচ্ছে, হারাধন, মধু, নারাযণ, মহেশ চাষ করছে, দিগু নাপতে বাড়ি বাড়ি কাঁসার দর্পণ নিয়ে বাবুদের খেউরি করছে, সাধু ময়রা মিষ্টি বানাচ্ছে, নগেন তাঁতি কাপড় গামছা তৈরি করছে, আমি ফাল পিটছি আর তহশীলদার নবি মিঞা দিব্যি নবাবী করে যাচ্ছে। আর একটা ঘোড়া কিনেছে, আর একটা নিকেও করেছে—"

কৈলাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল—"এখানে আমরা খাসা আছি

বাবাঠাকুর, আমাদের গায়ে সুতোনুটির আগুনের আঁচটি পর্যন্ত লাগেনি। রাত হয়েছে এইবার শুয়ে পড় বাবাঠাকুর। আমি এই বারান্দাটায় শুয়ে পড়ছি!"

নীলু রায় ভদ্রতা করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার তো এখানে শুতে কষ্ট হবে!"

"তা হবে। কিন্তু উপায় কি। ছিরির হুকুম অমান্য করলে আরও কষ্ট। সে বলছে দাদাঠাকুর ও বাড়িতে একলা কি করে শোবে? তুমি গিয়ে শোও। তাই চলে এলাম। আমার জন্যে ভাবনা কোরো না। বাড়িতেও আমি এই মাদুরেই শুই—"

"ছিরি বলেছে কাল আমার রান্নাবান্নার সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

"দেবেই তো। ওরা মা যে তোমাকে বড্ড ভালোবাসত। তুমি হলে ওর দাদাঠাকুর। দেবে বই কি, নিশ্চয়ই দেবে—"

"তোমার বাড়িতে আর কে আছে? তুমি চলে এলে ছিরি একলা থাকবে না কি! বাড়িতে আর কে আছে তোমার? তোমার একটি ছেলে ছিল, যতদূর মনে পড়ছে—"

"সে আর নেই বাবাঠাকুর। ওলাবিবি তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। ছিরির বিয়ে দিয়েছি নবীন কামারের নাতির সঙ্গে। সে-ই এখন থাকে আমার কাছে। শুয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আমাকে আবার ভোরে উঠতে হবে—"

মাদুরটা বিছাইয়া শুইয়া পড়িল কৈলাস।

নীলাম্বর রায় অতীতের চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন। হরিপালে যে কয়টা দিন ছিলেন তাহার স্মৃতি-স্বপ্নে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন তিনি। চলিয়া আসিবার সময় ছিরিকে একটা রঙীন ধনেখালি শাড়ি আর কয়েকগাছ রূপার চুড়ি করাইয়া দিয়াছিলেন। কিছু বেতনও দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সে তাহা লইতে চাহে নাই। মাথা নাড়িয়া ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে পলাইয়া গিয়াছিল। একটু দূরে গিয়া বারবার দুই হাত নাড়িয়া বলিয়াছিল, "তোমার কাছ থেকে মাইনে আমি নিতে পারবোনি দাদাবাবু। দাদার সেবা করে কি কেউ মাইনে নেয়।"

"তাহলে আমার বাড়িতেই থাকিস তোরা। চাবি তোকে দিয়ে যাচ্ছি—"

"বেশ। তা থাকব। থাকা উচিতও। বাড়ি খালি ফেলে রাখা ঠিক নয়। আমি ঝাঁটপাট দেব। আর আমাদের বুধি গাইটাকে তোমার গোয়ালে রাখব—"

হঠাৎ নীলু রায় চমকাইয়া উঠিলেন।

"নীলু কোথা গেলে—"

ধূর্জটিমঙ্গল খুব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কাছে কেহ নাই।

নীলু রায় উঠিয়া পড়িলেন।

"আমরা তো বেরুচ্ছি। তুমি যাচ্ছ তো আমার সঙ্গে—?"

"আমি আর গিয়ে কি করব! যা করবার তুমিই কর গিয়ে। আমি এইখানেই থাকি। এখানেও তো একজনের থাকা দরকার। বৌঠান আছেন, ছেলে দুটি আছে—"

"ঝকমারি আমার সঙ্গে যাচ্ছে—"

"ভালোই তো, ভালবাসার লোক সঙ্গে থাকা ভালো।"

অন্য লোক হইলে ইহা লইয়া আলোচনা করিত। ধূর্জটিমঙ্গল কিছুই করিলেন না। চকিতদৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিলেন কেবল।

বলিলেন—"এখানে বন্দুক আছে। জগদ্ধাত্রীর হাতে কিছু টাকা দিয়াছি। তোমার হাতেও কিছু দিয়ে যাচ্ছি। এস।"

নীলু রায় তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন ঝকমারি পুরুষের বেশে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কোমরে একটি কোমরবন্ধ, কোমরবন্ধ হইতে তরবারি ঝুলিতেছে। মাথায় পাগড়ি, পাগড়িতে একটি লাল রঙের পালক।

নীলু রায় বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ। তুমি তলোয়ার চালাতে জান নাকি---"

"জানি--"

ঝকমারির মুখে কিন্তু হাসি নাই।

ধূর্জটিমঙ্গল একতোড়া টাকা আনিয়া নীলু রায়কে দিলেন। বলিলেন---"পাঁচ শ' মোহর আছে। আরও যদি দরকার পড়ে মধু সামন্তকে বলে দিয়েছি, সে তোমাকে দেবে।"

বাহিরে ঘোড়াটা ডাকিয়া উঠিল। জগদ্ধাত্রী বাহির হইয়া আসিলেন। গলবস্ত্র হইয়া নীরবে ধূর্জটিমঙ্গকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর নীরবেই চলিয়া গেলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল বাহির হইয়া গেলেন। পিছু পিছু ঝকমারিও গেল। নীলু রায়ও অনুসরণ করিলেন। বাহিরে দুইটি পাহাড়ী ঘোড়া দাঁড়াইয়া ছিল। দুইটি পালকিও ছিল। তাছাড়া আরও অনেক ঘোড়া ও অশ্বারোহী। একজন অশ্বারোহীর হাতে একটি তূর্য ছিল। সে তূর্যধ্বনি করিল। রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়া উঠিল।

।। পাঁচ।।

অন্ধকার রাত্রি। মাথার উপরে প্রকাণ্ড প্রজ্বলন্ত হীরকখণ্ডের মত লুব্ধক নক্ষত্র জ্বলিতেছে। চারিদিকে অরণ্য। শোঁ শোঁ করিয়া শব্দ হইতেছে একটা, কিন্তু বায়ুর বেগ তেমন প্রবল নয়। মাঝে মাঝে বন্য পেচকের ডাক শুনা যাইতেছে। অনেক দূরে হায়নার ডাকও। ধূর্জটিমঙ্গল অশ্বারোহণে একটি পর্বত হইতে অবতরণ করিতেছিলেন। তাঁহার আগে পিছে কয়েকজন অশ্বারোহী। ঝকমারি ঠিক তাহার পিছনেই। আগে পিছে কয়েকজন মশালধারী মশাল জ্বালাইয়া আসিতেছে। তাহাদেব পিছনে পালকি। এই অন্ধকারকে আর একটা জিনিসও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—মহুয়ার গন্ধে অন্ধকারও বুঝি বিভোর হইয়া রহিয়াছে।

সহসা সম্মুখে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। সামনের মশালবাহকেরা পিছন দিকে ছুটিয়া আসিল। সামনের কয়েকটা ঘোড়াও উলটা মুখে দৌড়িতে লাগিল। একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "এখন এগোনো যাবে না, সামনে হাতির দল--"

হাতির চীৎকারও একটা শোনা গেল।

"হাতির দল, চরবার জন্যে নেমেছে ওখানে। ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না এখন--। পাশের রাস্তা দিয়ে নেমে পড়ুন--"

পাশে কোন বাস্তা ছিল না। ঢালু পাহাড়ের গা বাহিয়া তবু সবাই নামিতে লাগিল। মশালের আলোকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল নীচে খানিকটা সমতলভূমি রহিয়াছে। কিছুদূর নামিয়া বোঝা গেল একটি ঝরনাও আছে। ঝরনার জলধারা সেই ক্ষুদ্র উপত্যকাটির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

সকলে নীচে যখন সমবেত হইয়াছে তখন ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"এদিকে কোনও পথ আছে কিনা তা যখন আমাদের জানা নেই তখন এইখানেই রাতটা কাটানো যাক। তোমরা খাওয়া দাওয়ার আয়োজন কর। এইখানেই কয়েকটা তাঁবু খাটিয়ে দাও।"

ঝকমারি ধূর্জটিমঙ্গলের পিছনেই ছিল।

বলিল—"ওই অনেক দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। ওখানে কি কোন গ্রাম আছে?"

ধলরাজের একজন অনুচর বলিল—"না, ওখানে কোন গ্রাম নাই। আমার এ দিকটা ঘোরা আছে। ও অঞ্চলটা সব পাহাড়। পাহাড়ে গুহা আছে মাঝে মাঝে—"

"এরা ততক্ষণ তাঁবুটাবু ঠিক করুক, চল আমরা দেখে আসি আলোটা কিসের?"

"বেশ চল। দুজন রক্ষীও চলুক আমাদের সঙ্গে।"

দুইজন রক্ষীকে সঙ্গে লইয়া ঝকমারি ও ধূর্জটিমঙ্গল অন্ধকারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া তাঁহারা একটি ছোট নদীরও সন্ধান পাইলেন। যে ঝরনাধারাটি দেখিয়াছিলেন সেইটিই সম্ভবত নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে। খরস্রোতা বটে, কিন্তু জল খুব বেশি নয়। ঘোড়াগুলি অনায়াসেই পার হইয়া গেল। হঠাৎ একদল শৃগাল একযোগে ডাকিয়া উঠিল।

একজন রক্ষী বলিল—"পহর পার হল একটা"

অন্ধকারে ঘোড়া ছুটাইবার সুযোগ নাই। ঘোড়াগুলি খুব সন্তর্পণে চলিতেছিল। বেশ কিছুক্ষণ চলিবার পর তাহারা আলোকের সমীপবর্তী হইল। দেখা গেল একটা গুহার সম্মুখে একটি ছোট মশাল জ্বলিতেছে। লোকজন কেহ নাই।

"এখানে কেউ আছ না কি? সাড়া দাও।"

ধূর্জটিমঙ্গলের গম্ভীর কণ্ঠ পাহাড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইল।

কিছুক্ষণ কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ধূর্জটিমঙ্গল তখন একজন সহচরকে আদেশ করিলেন, "তুমি মশালটা নিয়ে গুহার ভিতরটা দেখ, কেউ আছে কি না। গুহার মুখে দু একটা মাটির বাসনপত্র দেখছি, গুহার মুখে একটা ঝাঁপও রয়েছে। মনে হচ্ছে কোন মানুষ আছে—"

সহচরটি ঘোড়া হইতে নামিল এবং প্রথমেই গুহামুখের পরদাটা সরাইয়া ফেলিল।

ভিতর হইতে একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"খোদা মেহেরবান।"

সহচরটি তখন মশাল লইয়া গুহার ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিল গুহাটি বেশ বড়। একটি প্রশস্ত ঘরের মতো। একধারে একটি দড়ির খাটিয়ায় একটি প্রৌঢ় লোক শুইয়া আছেন। গুহার মেঝেতেও খড়ের উপর একটি বিছানা রহিয়াছে। এককোণে একটি কলসী, তাহার পাশে কিছু মাটির ছোট ছোট বাসন। কয়েকটি হাতপাখাও রহিয়াছে। যিনি শুইয়া আছেন তাঁহার দাড়ি লাল, নাকটি শুকচঞ্চুর মতো।

"আপনি কে?"

"আমার নাম মীর মহম্মদ। আপনারা কে?"

"আমরা মুসাফির। মুর্শিদাবাদের দিকে যাচ্ছিলাম, পথে একপাল হাতি রয়েছে। তাই আমরা এইদিকে সরে এসেছি। আপনি এই গুহায় কতদিন থেকে বাস করছেন?"

"অনেকদিন থেকে।"

"এই জঙ্গলে কে আপনার দেখাশোনা করে?"

"আমার দুটি মেয়ে আছে। তারাই সব করে। আপনি কি একা, না সঙ্গে আরও লোকজন আছে?"

"লোকজন অনেক আছে। আমাদের মালিক আপনার খবর নিতে এসেছেন। বাইরে অপেক্ষা করছেন তিনি।"

"তাঁর পরিচয় কি?"

"তিনি মস্ত লোক। জায়গীর জমিদারি ফলাও কারবার, সব আছে তাঁর। এখানে জন সাহেবের সমস্ত জায়গীর জমিদারির ভারও তাঁর উপর—"

"জন সাহেব? জন সাহেবকে চেনেন না কি তিনি?"

"খুব চেনেন। দুজনে খুব বন্ধুত্ব ছিল—"

"তাঁকে ভিতরে আসতে বলুন। জন সাহেবের খবর দিতে পারব—আল্লা মেহেরবান।"

প্রৌঢ় হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া চক্ষু দুইটি মুদিত করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

সহচরটি বাহিরে গিয়া সব বলিতেই ধূর্জটিমঙ্গল ঝকমারিকে লইয়া গুহার ভিতর প্রবেশ করিলেন।

"সেলাম আলেকুম। মনে হচ্ছে আপনি বিপন্ন। আপনার কোন সাহায্য করতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ কবব। এই জঙ্গলে এই গুহায় আপনি কেন এসেছেন, আপনার পুরো পরিচয় কি তা আমাকে জানান। নির্ভয়ে জানান, আমাকে আপনার বন্ধু মনে করুন। শুনলাম আপনি আমার বন্ধু জন সাহেবের খবরও জানেন। কিন্তু সর্বাগ্রে আপনার পরিচয়টা আমি জানতে চাই। মনে হচ্ছে আপনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক—"

প্রৌঢ় বলিলেন, "এখন আমার একমাত্র পরিচয় আমি হতভাগ্য। আমার সবচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে আপনার মতো লোককে আমি ভালো করে অভ্যর্থনা করতেও পাচ্ছি না। আপনাকে বসতে দেবার মতো আসনও এখানে নেই। পাশের ওই বিছানাটিতে আমার মেয়ে দুটি শোয়। ওইখানেই আপনারা দয়া করে বসুন—"

"এসব তুচ্ছ কারণে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা বসছি—"

পাশের শয্যাটির উপরই তাঁহারা উপবেশন করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"এবার বলুন আপনার কাহিনী।"

প্রৌঢ় কিন্তু যে কাহিনী বলিলেন তাহা সত্য নহে, বানানো কাহিনী। কিছুটা সত্য, কিছুটা বানানো।

"আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমি সম্ভ্রান্ত বংশেরই সন্তান। আমার পিতামহের পিতা নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে জায়গীরদার ছিলেন। আমার পিতামহও মুর্শিদকুলি খাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু সীতারাম রায়ের সঙ্গে যখন তাঁর যুদ্ধ হল তখন আমার পিতামহ গোপনে গোপনে সীতারাম রায়কে সাহায্য করেন। শুনেছি মুর্শিদকুলি খাঁ এ জন্য রেগে যান খুব। কিন্তু জায়গীর কেড়ে নেননি। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাই সুজাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর ঝগড়া বেধে গেল। সরফরাজ খাঁই মুর্শিদকুলির মনোনীত

উত্তরাধিকারী। আমার পিতামহ তারই পক্ষ নিলেন। কিন্তু সুজাউদ্দিন দখল করলেন সিংহাসন। আমার পিতামহ রাজদ্রোহ অপরাধে কারারুদ্ধ হলেন। সুজাউদ্দিনের দরবারে হাজি আহমদ আর তাঁর ভাই আলীবর্দির খুব প্রভাব ছিল। হাজি আহমদ আমার এক পিসীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিকে করতে চাইলেন। আমার পিতামহ বললেন তাঁকে যদি কারাগার থেকে মুক্ত করা হয়, তাহলে তিনি আপত্তি করবেন না। তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হলেন, আমার পিসীর সঙ্গে হাজি আহমদের নিকে হয়ে গেল। আমার পিতামহ রাজদরবারে সম্মানিত হলেন, কিন্তু তিনি সরফরাজ খাঁর সঙ্গে গোপনে গোপনে যোগাযোগ রাখতে লাগলেন। কারণ তিনি জানতেন সুজাউদ্দিনের পর সরফরাজ খাঁই নবাব হবেন। তাই হলেন। তখন আমার বয়স খুব কম। শুনতাম সরফরাজ খাঁ দরবারে আসেন না, অধিকাংশ সময়ই বেগমদের নিয়ে থাকেন। আমি যখন ষোল বছরের সেই সময় আলীবর্দি খাঁ পাটনা থেকে সসৈন্যে এসে বাংলা আক্রমণ করলেন। খুব যুদ্ধ হল। যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ পরাজিত ও নিহত হলেন। আলীবর্দি দিল্লীর বাদশাহকে প্রচুর টাকা দিয়ে বাংলাদেশে সুবেদারির সনদ পেয়ে গেলেন। আমিও আলীবর্দির দরবারে একটা চাকরি পেলাম। সৈন্য বিভাগেই ছিলাম আমি। বর্গিরা যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করে তখন আমি বর্গিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম। সেই সময় আমি একটি ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছিলাম। তা এখন স্বীকার করছি। আমি একটি হিন্দু ব্রাহ্মণকন্যাকে হরণ করি। তাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করেছিলাম আমি। কিন্তু তাকে পোষ মানাতে পারিনি। মনে হত সারাজীবন যেন একটা বাঘিনীকে নিয়ে ঘর করছি। তার গর্ভে একটি মেয়ে হয়েছিল আমার। মেয়েটিও দেখলাম একটি বাঘিনী হয়েছে। তার বয়স যখন দশ বছর তখন আসানুল্লা বলে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল। তার কাজ ছিল যুবক নবাব সিরাজের জন্য উপপত্নী সংগ্রহ করা। সে রাজ্যের অনেক যুবতী মেয়েকে ছলে বলে কৌশলে কিংবা টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যেত নবাবের ভোগের জন্য। সে একদিন আমাকে এসে বললে একটি খুব অল্পবয়স্কা কুমারী মেয়ের খোঁজ করছি আমি। নবাবের এক দোস্তের ফেরঙ্গ ব্যাধি হয়েছে। কে একজন নাকি তাঁকে বুঝিয়েছে খুব কম বয়সের প্রকৃত কুমারীর সঙ্গে বিয়ে হলে তাঁর ব্যাধি সেরে যাবে। আমাকে তিনি বলেছেন এক হাজার আসরফি পর্যন্ত দাম দিতে রাজি আছেন এরকম মেয়ের জন্য। তাছাড়া আমাকে আলাদা বখশিস তো দেবেনই। তবে তিনি "রইস" লোক, ছোট লোকের মেয়ের সংস্পর্শে আসতে চান না। আমি তখন অর্থাভাবে পড়েছিলাম। আলীবর্দি খাঁ খুব সুনীতিপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি চাইতেন যে তাঁর কর্মচারীরাও সুনীতিপরায়ণ হোক। যে-ই তিনি শুনলেন আমি একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে অপহরণ করে জোর করে তাকে বিয়ে করেছি, অমনি তিনি আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। যুদ্ধে আমার পায়ে চোট লেগেছিল। তাই আমি বড় দুরবস্থায় পড়ে গেলাম। প্রজারা খাজনা দিত না এবং প্রজাদের উপর অত্যাচার করারও উপায় ছিল না আলীবর্দির আমলে। অর্থাভাবে ছিলাম খুব। হাজার আসরফির লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার স্ত্রীকে বললাম একজন খুব বড় রইসের বাড়ি থেকে মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে। সত্যি তিনি খুব ধনী লোক ছিলেন। বিবাহের কথা পাকা করবার জন্যে তিনি যে সব দামী দামী উপহার পাঠালেন তাই দেখে আমার স্ত্রীর চোখ ধেঁধে গেল। তার জন্যে তিনি যে মসলিনের ওড়না আর কাশ্মীরের শাল পাঠিয়েছিলেন তা

বহুমূল্য। তাছাড়া ভালো ভালো কিংখাব, হাতির দাঁতের বাক্স; হাতির দাঁতের শীতলপাটি, রুপোর গোলাপ-পাশ, আতরদান, মোতিবসানো প্রকাণ্ড পানের বাটা, বহুরকম উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন তিনি। আমার স্ত্রী আর আপত্তি করলেন না। বরং বললেন, আমাদের এ দুরবস্থায় খোদাই মেহেরবানী করেছেন আমাদের উপর। তুমি আর অমত কোরো না।

আমাদের মেয়ের বয়স তখন দশ বৎসর। গয়নাপত্তর দেখে সে-ও হকচকিয়ে গেল। ভাবল বাপজান আমাকে সুপাত্রেই অর্পণ করছেন। বিয়ে হয়ে গেল নির্বিঘ্নে। আর তারপরই আমি একটা বিপদে পড়ে গেলাম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অফিসাররা 'দসতুক' বিক্রি করে জানেন বোধহয়। বাদশাহের ফরমান অনুসারে তারা কোন শুল্ক না দিয়ে ব্যবসা করতে পারে, এজন্য তাদের কাছে 'দসতুক' থাকে, সে দসতুক দেখালে আর সরকারকে কিছু দিতে হয় না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী বাইরের লোকের কাছে দসতুক বিক্রি করে। আমি সেই রকম একটা দসতুক নিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। সিরাজ এ নিয়ে খুব কড়াক্কড়ি করছিলেন। আমার কয়েদ হয়ে গেল। সেই সময়ে আপনার বন্ধু জন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁর সঙ্গে তিনটি মেয়ে ছিল। তাদেরও কয়েদ হয়েছিল এবং তাদের নিয়ে যথেচ্ছাচার চলছিল কয়েদখানায়। তারাই কারারক্ষীকে বশ করে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে। টাকা অবশ্য দিতে হয়েছে অনেক। দুটি মেয়ে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু তৃতীয় মেয়েটি জন সাহেবকে ছেড়ে আসতে চাইল না। কারারক্ষী বলল জন সাহেবকে ছাড়তে পারব না, কারণ নবাব সাহেবের হুকুম সাহেবদের উপর খুব কড়া নজর রাখতে হবে। যদি কোন সাহেব কোনরকমে পালায় তাহলে ওই কারারক্ষীরই প্রাণদণ্ড হবে। সাহেবের সঙ্গে একটি মেয়ে কিন্তু থেকে গেল। দুটি মেয়ে আমার সঙ্গে চলে এল।"

মীর মহম্মদ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং মাথার শিয়র হইতে ছোট একটি কুঁজা লইয়া সেইটিই মুখে লাগাইয়া কি যেন পান করিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। তাহার পর আবার শুইয়া পড়িলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল প্রশ্ন করিলেন—"ওষুধ খাচ্ছেন না কি!"

"আজ্ঞে না, শরাব। আগে যখন অবস্থা ভালো ছিল তখন সিরাজী খেতাম। এখন মহুয়ার মদ খাচ্ছি। আমার মেয়ে দুটিই যোগাড় করে এনে দেয়। মহুয়া খেয়েই এখন বেঁচে আছি।"

"মেয়ে দুটি কি আপনার নিজের মেয়ে?"

"না। এরা আমার সেই জেলের সঙ্গিনী। এরা জন সাহেবের সঙ্গে বন্দী হয়েছিল। আমার সঙ্গে জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। সেই থেকে বরাবরই আমার সঙ্গে আছে।"

ঝকমারি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। একথা শুনিয়া বলিল, "মেয়ে দুটির নাম কি? জন সাহেবের সঙ্গে রোমনি, শাওনি আর তির্কি গিয়েছিল।"

মীর মহম্মদ বলিলেন—"এদের নাম আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু এরা বললে—'নাম বুলব না। তুমি আমাদের নূতন নাম রাখ।' তাই একজনের নাম দিয়েছি 'রোশনি' আর একজনের নাম দিয়েছি 'খুস্‌বু'। মেয়ে দুটি বোধহয় এই অঞ্চলের, কারণ ওরাই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। ওরাই আমার সেবা-শুশ্রূষা করছে, খাবারও যোগাড় করে আনছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"একটা কথা বুঝতে পারছি না। আপনি এই জঙ্গলে চলে এলেন

কেন। জেল থেকে পালিয়ে অবশ্য কিছুদিন আত্মগোপন করা প্রয়োজন, কিন্তু আমার মনে হয় শহরে আত্মগোপন করা সহজ। শহরে থাকলে আপনি গোপনে কিছু রোজগারও করতে পারতেন। নবাবের আমলারা সহায় হলে আপনাকে কেউ কিছু বলত না। হয়তো শেষ পর্যন্ত নবাব সরকারেই আপনি চাকরি পর্যন্ত পেয়ে যেতেন। টাকা ছড়ালে সবই তো হয় আজকাল—"

"ঠিকই বলেছেন। টাকা ছড়ালে সবই হয়। কিন্তু আমার এখন টাকা নেই। আমি গরীব হয়ে গেছি। মেয়েকে ওই পাষণ্ডটার হাতে সঁপে দিয়ে আমি যে হাজার আসরফি পেয়েছিলাম সেটা আমার স্ত্রীকেই দিয়েছিলাম। কিন্তু স্ত্রী এখন আমার শত্রু। সে আমার প্রাণ নেবার চেষ্টা করছে। গুণ্ডা লাগিয়েছে আমাকে খুন করবার জন্যে। সেই ভয়েই আমি জঙ্গলে চলে এসেছি—"

"আপনার স্ত্রী গুণ্ডা লাগিয়েছেন আপনাকে খুন করবার জন্যে? বলেন কি—!"

"যা বলছি তা সত্যি। কিন্তু দোষটা আমার। আমি যখন কয়েদখানায় তখন আমার মেয়ে তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল। ওই ফেরঙ্গ ব্যাধি তাকেও ধরেছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে পালিয়ে এসেছিল তার মায়ের কাছে। আর ওই আসানুল্লা লোকটা যে টাকার লোভ দেখিয়ে ওই লম্পটটার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল সে এসে জুটল আমার স্ত্রীর সঙ্গে। সে-ও একটা লম্পট। আমার স্ত্রীও অপরূপ সুন্দরী। তার বয়স তিরিশের কোঠায়, কিন্তু দেখলে মনে হয় ষোল সতেরো বছর। আসানুল্লা জুটে গেল তার সঙ্গে। তাকে বললে যে আমি সব জেনেশুনেই টাকার লোভে ওই ব্যাধিগ্রস্ত লোকটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। তারপর আরও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল একটা। আমার মেয়ে ইঁদারায় লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। সে নাকি রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিল না আর। শুনে আমারও খুব অনুতাপ হল। আমি ঘুষ দিয়ে কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেলাম। বাড়ি এসে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। কিন্তু তার মায়ের চোখ দিয়ে একফোঁটা জলও পড়ল না। যখন তাকে গোর দিতে নিয়ে গেলাম তখনও সে সঙ্গে গেল না। যখন ফিরলাম তখন দেখলাম সে বাড়ি নেই। চাকররা বললে আসানুল্লা সাহেব একটা তাঞ্জাম পাঠিয়েছিলেন, সেই তাঞ্জামে চড়ে তিনি কোথায় গেছেন। কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরল তখন দেখি মুখ থমথম করছে, চোখে অগ্নিদৃষ্টি। আমার সঙ্গে একটি কথাও না বলে সে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিল। রাত্রে শুয়ে ঘুমুচ্ছি হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমার স্ত্রী একটা শাণিত ছোরা নিয়ে বাঘিনীর মতো চেয়ে আছে আমার দিকে। আমাকে জেগে উঠতে দেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। কিন্তু আমাকে মারতে পারেনি। আমি তার হাতটা মুচড়ে কেড়ে নিয়েছিলাম ছোরাটা। তারপর পালিয়ে গিয়েছিলাম জানলা দিয়ে। সোজা গিয়ে উঠলাম জগৎ শেঠের আত্মীয় গোপাল শেঠের বাড়ি। সে আমার খুব হিতৈষী বন্ধু ছিল। সে বললে যা বলছ তা যদি সত্যি হয় তাহলে তোমাকে খুন করবার জন্য গুণ্ডাও লাগাবে। তুমি এখানে থেকো না। এখান থেকে পালাও। সে যখন আসানুল্লার সঙ্গে জুটেছে তখন তোমার আর রক্ষা নেই। তাছাড়া তুমি কয়েদখানা থেকে পালিয়েছ, তোমার মুর্শিদাবাদে থাকা ঠিক হবে না। রোশনি আর খুস্‌বুও জেল থেকে পালিয়েছিল আমার সঙ্গে। একটা সরাইখানায় তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। তাদের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি

তারা নেচে গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে তুলেছে। তাদের বললাম, আমি এখান থেকে পালাচ্ছি। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে, না থাকবে। তারা বলল—যাব। ভাগ্যে ওদের সঙ্গে এনেছিলাম, তা না হলে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কি যে করতাম জানি না।"

ধূর্জটিমঙ্গল প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কোথায় যাবেন শেষ পর্যন্ত? এখানে এভাবে তো বেশীদিন থাকা যাবে না!"

"আমি উড়িষ্যায় যাব। সেখানে এখনও মারাঠারা সর্বেসর্বা। আমার বন্ধু গোপাল শেঠ একজন মারাঠা সেনানায়কের নামে চিঠি দিয়েছেন আমার হাতে। সে চিঠিতে বলেছেন আমাকে আশ্রয় দিলে আমি তাদের বাংলাদেশ পুনরাক্রমণের সুযোগ-সুবিধা করে দেব। সিরাজের আমীর ওমরাহরা সিরাজের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, সুতরাং সিরাজ যুদ্ধে জিততে পারবে না। মীরজাফর, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, ইয়ারলতিফ—সবাই ইংরেজের পক্ষে। কিন্তু ইংরেজদের সৈন্যবল বেশী নেই। এই সময় মারাঠারা যদি আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাহলে বাংলাদেশ তারা জয় করতে পারবে। কিন্তু আমার ভয় পাছে কোনও গুপ্তঘাতক আমাকে হত্যা করে। তাই আমি এই ঘুর পথে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উড়িষ্যায় যাবার চেষ্টা করছি।"

ঝকমারি এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এইবার সহসা সে বলিয়া উঠিল—"তুমি যদু!"

সকলে তাহার দিকে সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইল।

দেখিল ঝকমারি বিস্ফারিত নয়নে মীর মহম্মদের দিকে চাহিয়া আছে। ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইত ঝকমারির দৃষ্টি মীর মহম্মদের উপর নিবদ্ধ ছিল না, তাহা যেন বহুদূরে অবস্থিত আর একটা কিছু দেখিতেছিল। উন্মুখ ঔৎসুক্যসহকারে সুদূর অতীতের দিকে চাহিয়াছিল সে। জাতিস্মর ঝকমারি পূর্ব কোনও জন্মে ফিরিয়া গিয়াছিল সহসা!

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"যদু! যদু কে—"

"যদু রাজা গণেশের ছেলে! ছেলে নয় কুলাঙ্গার।"

"রাজা গণেশ! সেই বা কে—"

"পাঠান যুগের স্বাধীন হিন্দুরাজা। ভাতুড়িয়ায় তাঁর জমিদারি ছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের আমীর ছিলেন তিনি। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করে মুসলমান আধিপত্যকে স্তব্ধ করে দেন বাংলার। তারপর বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বাংলার দরবেশেরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল।....."

"তুমি এসব কোথা থেকে জানলে—"

"আমি জানব না? আমি ছিলাম রাজা গণেশের স্ত্রীর সহচরী। আমার নাম ছিল হিঙ্গুলা। আমি সব জানি।"

"তারপর?—"

"বাংলার দরবেশদের নেতা নূর কুত্‌ব্ আলম চিঠি লিখলেন জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর কাছে। লিখলেন তুমি এসে এই হিন্দু কাফেরকে উচ্ছেদ কর। জৌনপুরে ছিলেন আর এক দরবেশ আশরফ সিমানী। তিনিও উৎসাহিত করলেন ইব্রাহিমকে। ইব্রাহিম সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন। ত্রিহুতে রাজা শিবসিংকে হারিয়ে তিনি এলেন বাংলায়। তখন রাজা

গণেশের ছেলে যদু বাবার সিংহাসনে বসবার জন্য তার সঙ্গে যোগ দিলেন। শুধু যোগ দিলেন না, নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে হয়ে গেলেন জলালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ। ইব্রাহিম চলে যাবার পর গণেশ আবার আক্রমণ করলেন ওই কুলাঙ্গার জলালুদ্দিনকে। তাকে সিংহাসনচ্যুত করে বন্দী করলেন। নিজে দনুজমর্দনদেব নাম নিয়ে আবার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু তিনি দু'বছরের বেশী রাজত্ব করতে পারেননি। হঠাৎ খাওয়ার পর তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেকের বিশ্বাস যদুই ষড়যন্ত্র করে তাঁর খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। তুমি সেই যদু। তুমি জানু নত করে আমার প্রণয়ভিক্ষা করেছিলে, বলেছিলে আমাকেই পাটরাণী করবে। আমি তোমার মুখে লাথি মেরেছিলাম। তোমার বাবার মৃত্যুর পর তুমি যখন রাজা হলে তখন তোমার ঘাতক আমার শিরশ্ছেদ করেছিল। আমার সেই ছিন্ন মুণ্ডুটাও আমি দেখতে পাচ্ছি। যদু, ইচ্ছে করলে সে মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি এখনই নিতে পারি।"

ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—"কি করছিস তুই ঝকমারি—"

ঝকমারি আত্মস্থ হইল। লজ্জিত হইয়া মীর মহম্মদকে বলিল—"মাপ করবেন। আমি মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কিন্তু যা বললাম তা মিথ্যা নয়, আপনার এবং আমার অতীত আমি স্বচক্ষে দেখলাম এখনি। তবে প্রতিশোধ আমি নেব না। যদু যে অন্যায় করেছিল তার প্রতিশোধ মীর মহম্মদের উপর নেওয়া যায় না। ভগবানই এর শাস্তি দেবেন আপনাকে। হয়তো আপনার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে —"

মীর মহম্মদ সবিস্ময়ে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

"আপনি কে! আপনার পোশাক পুরুষের মতো, কিন্তু গলার স্বর তো পুরুষের মতো নয়। কে আপনি—"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"ওর পরিচয় এখন না-ই শুনলেন। ও খামখেয়ালী পাগল, ওর কথা এখন থাক। আমি আপনাকে দু'একটি প্রশ্ন করছি তার জবাব দিন। জন কি এখন মুর্শিদাবাদেই বন্দী হয়ে আছে?"

"মুর্শিদাবাদেই ছিল। এখন কোথায় আছে কি করে বলব। আশা করি এখনও সেখানেই আছে। একটা দোতলা বাড়িতে রেখেছে ওকে। বিশ জন পাহারাদার আছে, দশজন দিনে পাহারা দেয়, দশজন রাত্রে। ওর সঙ্গে যে মেয়েটা আছে সে ওই বিশজনকেই মজিয়েছে। তাদের ওপরওলা যে দারোগা আছে—রমজান আলী, তাকেও মজিয়েছে। তারা সাহেবকে ছেড়ে দিতে রাজী, কিন্তু রমজানের যিনি ওপরওলা তুর্বক্ খাঁ তিনি অর্থপিশাচ একটি। তাঁকে প্রচুর ঘুষ না দিলে রমজান জন সাহেবকে ছেড়ে দিতে পারবে না। আমি তুর্বককে পাঁচশো আসরফি দিয়েছিলাম। তিনি টাকাটা নিলেন, কিন্তু আমাকে ছাড়লেন না। আমার বন্ধু জমীরুদ্দিন আমাকে ধার দিয়েছিলেন টাকাটা। আমাকে সে টাকাটা শোধ করতে হবে। কিন্তু কি করে যে করব তা জানি না। গোপাল শেঠ ভরসা দিয়েছে সে সব ঠিক করে দেবে। হয়তো দেবে। জগৎ শেঠের পেয়ারের লোক সে। সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তার 'কলকাঠি' না কি গোপালেরই হাতে। জগৎ শেঠের ভয় সে যদি ব্যাপারটা সিরাজের কানে তুলে দেয় তাহলে নবাব জগৎ শেঠকে কয়েদ করতে পারে, কত্লও করতে পারে—ও যে রকম দুর্দান্ত ওর অসাধ্য কিছু নেই। এই ভয়ে জগৎ শেঠ গোপালকে খুব তোয়াজ করে

রেখেছে টাকাকড়ি দিয়ে। গোপাল এখন ধনী লোক। সে অনায়াসেই আমার পাঁচশ আসরফির ধারটা শুধে দিতে পারে। দেবে কিনা জানি না। গোপালের টিকি যার কাছে বাঁধা তার সঙ্গে যদি দেখা করে তাকে সব কথা বলে আসতে পারতাম তাহলে দিত। সে আমাকেও খাতির করে খুব। কিন্তু দেখা করে আসতে পারিনি—"

"কে তিনি?"

ধূর্জটিমঙ্গল প্রশ্ন করিলেন।

"মৈনি বিবি।"

"তয়ফা মৈনি—"

"হ্যাঁ। চমৎকার গান গায়, চমৎকার নাচে।"

"তাকে আপনি চেনেন?"

"খুব। গোপাল শেঠ ওকে নিজের বাগানবাড়িতে নিয়ে রাখতে চেয়েছিল, ও যায়নি। বলেছিল আমি আমার মালিকের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না।"

মৈনির খবর শুনিয়া ধূর্জটিমঙ্গল হৃষ্ট হইলেন। তিনি চাপা প্রকৃতির লোক। তিনিই যে মৈনিকে বাড়িটি কিনিয়া দিয়াছেন একথা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সহিত যে ঘনিষ্ঠতা আছে সে কথাও বলিলেন না।

কেবল বলিলেন—"আমিও ওঁর নাম শুনেছি। বড় বড় ওমরাহের অন্দরমহলে ওঁর যাতায়াত আছে না কি—"

"হ্যাঁ, তা আছে। চমৎকার গান গায় যে। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, গজল, এমন কি হিন্দুদের কীর্তনও। সবাই ওকে ডেকে নিয়ে যায়। পয়সাও করেছে খুব। কিন্তু কারো ওখানে ও চাকরি নিতে চায় না। গোপাল শেঠ ওকে বাঁধা মাইনে দিয়ে নিজের বাগানবাড়িতে রাখতে চেয়েছিল, গেল না। আমি যদি ওকে বলে আসতে পারতুম, তাহলে গোপাল শেঠকে দিয়ে আমার ধারটাও শোধ করে দিত। আমাকে খুব ভালোবাসে মৈনি বিবি—"

"ভালোবাসে? তাই না কি?"

ধূর্জটিমঙ্গলের গলার স্বরটা কেমন যেন রুক্ষ শুনাইল।

মীর মহম্মদ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয় হইল তাঁহার কাহিনীটা যে বানানো ইহা ধূর্জটিমঙ্গল ধরিয়া ফেলিয়াছে নাকি!

প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন তিনি।

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"মুর্শিদাবাদ যাব। কলকাতায় যাওয়ারও ইচ্ছা আছে। সুতানুটিতে আমার বাড়ি ঘরদোর তো নবাবের সৈন্যরা পুড়িয়ে দিয়েছে। সেগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে—"

ধূর্জটিমঙ্গল ইহার বেশী আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু মীর মহম্মদ ইহার উত্তরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাহা বলিলেন তাহাতে উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন তিনি। এই সব খবরই তো তিনি চান। বস্তুত এই সব খবর সংগ্রহ করাই তো তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

"যে লোকটার হুকুমে আপনাদের বাড়িঘর পুড়েছিল সেই আসফ আলীকে আমি চিনি। আসফ আলী নবাবের প্রিয়পাত্র।"

"তাকে আপনি চিনলেন কি করে? আত্মীয়তা আছে না কি?"

"না, আত্মীয়তা নেই। উমর বেগ জমাদার তিন হাজার ঘোড়সোওয়ার নিয়ে ইংরেজদের কাশিমবাজার আক্রমণ করেছিল এ খবর আপনি নিশ্চয়ই জানেন।"

"শুনেছি।"

"উমর বেগ চার দিন ওই বিরাট সৈন্য নিয়ে ইংরেজ কুঠির সামনে চুপ করে ছিলেন। আক্রমণ করেননি। হয়তো নবাব আক্রমণ করতে বলেননি। হয়তো ওদের ভয় দেখানই উদ্দেশ্য ছিল। এরা খুব ভয়ও পেয়েছিল। ওয়াট্‌স সায়েব এসে একটা মুচলেকায় সই করেও মুক্তি পেলেন না। নবাব তাঁকে আর চেম্বার্সকে আটকে রেখেছিলেন। সেই সময় বিবি ওয়াট্‌স বেগমদের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি জুড়লেন। সিরাজের মায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। মায়ের অনুরোধে সিরাজ শেষ পর্যন্ত ওদের ছেড়ে দিলেন, কিন্তু বললেন, তাঁরা যে মুচলেকানামায় সই করেছেন সেই মুচলেকানামার তিনটি শর্তই পালন করতে হবে। নবাবের সেনা যখন কাশিমবাজারে, তখন ঘোড়ার খবর খাবার সংগ্রহের একটা ঠিকা পেয়েছিলাম আমি। কিছু ঘুষ খেয়ে আসফ আলী ঠিকাটি দিয়েছিলেন আমাকে। সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ। মুচলেকানামায় শর্ত যখন ইংরেজরা মানলেন না, তখন নবাব কলকাতা আক্রমণ করেন। তখনও আমি নবাব ফৌজের সঙ্গে ছিলাম। তখনও ঘোড়ার দানা সংগ্রহ করবার ভার আমার উপর ছিল। সেইজন্য জানি আসফ আলীই আগুন লাগাবার হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু তার আগে, ইংরেজদের মিলিটারিও ব্ল্যাক টাউনে আগুন ধরিয়েছিল। সব বাঙালীরাই তো পালিয়েছিল। কিছু কিছু বাঙালী মেয়ে অবশ্য নবাবের সেনাদের কবলে পড়ে যায়। একটা খবর জানি— উজির আহম্মদ বলে একটা লোক একটি ব্রাহ্মণের মেয়েকে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

ধূর্জটিমঙ্গল সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—"উজির আহমদ থাকে কোথায়?"

"মুর্শিদাবাদেই আছে। মৈনি বিবি চেনে তাকে।"

ধূর্জটিমঙ্গল আর কিছু প্রশ্ন করলেন না। কিন্তু আসফ আলী ও উজির আহম্মদ—এই নাম দুইটি তিনি বুকের ভিতর গাঁথিয়া রাখিলেন। একটু পরেই বাহিরে একটা শব্দ শোনা গেল। মিহি গলায় গানের শব্দ। গানও অদ্ভুত। তিনিনিনি, তিনিনিনি তিনাক্ তিনা তিন, মনরঙিলা গাছের ডালে ফুল ফুটেছে রে, ফুল লয় গো মন, তিনাক তিনা তিন। তাহার পর উচ্চ কলকণ্ঠের হাসি।

মীর মহম্মদ বলিলেন—"রোশনি আর খুস্‌বু আসছে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুইটি ছোট মশাল লইয়া তির্কি ও শাওনী প্রবেশ করিল।

ধূর্জটিমঙ্গলকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল তাহারা।

"আরে রাজা তুই এখানে কি করে এলি! তোর সাথে উ কে!"

ঝকমারিকে তাহারা প্রথমে চিনিতে পারে নাই।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন,"চেয়ে দেখ্ ভালো করে। চিনতে পারবি।"

দুজনেই ঝকমারির দিকে চাহিয়া রহিল সবিস্ময়ে। তাহার পর হঠাৎ শাওনী হাততালি দিয়া লাফাইয়া উঠিল।

"চিনেছি, চিনেছি। ঝকমকি। আমাদের ঝকমকি রে তির্কি। বেটা ছেলে সেজে আইছে। আমরা যেমন এসেছিলম সায়েবের সঙ্গে—"

দুইজনেই গিয়া জড়াইয়া ধরিল ঝকমারিকে।

তাহার পর দুইজনেই গান গাহিয়া উঠিল একসঙ্গে।

মনরঙোলি ডালে ফুল ফুটেছে রে
ফুল লয় রে—মন
তিনাক তিনা তিন্।
দেখ না চুপি চুপি
মেঘের আড়ে চন্দা বহুরূপী
তিনাক তিনা তিন।

মীর মহম্মদ প্রশ্ন করিল—"খাবার কিছু পেয়েছিস?"

"পেয়েছি। মুর্গি চুরি করেছি দুটো। আর ভিখ মেঙে একটা ডিংলা এনেছি। চালও এনেছি বিশ কড়ির।"

"কই সে সব?"

মুর্গি দুটোর টুঁটি ছিঁড়ে দিয়ে চাল আর ডিংলার সঙ্গে একটা পুঁটুলিতে বেঁধেছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় একটা মেয়ার সঙ্গে দেখা। সে চীৎকার করছিল আমি কংসকে খুন করব। আমাদের দেখে বলল—বড় খিদা লেগেছে, খেতে দিবি? বললাম আমাদের মোটটা বয়ে নিয়ে চল দেব। সেই মোটটা বয়ে আনছে। তাকে ওবেলার ভাত যে কটা আছে তাই দিব।"

মীর মহম্মদ বলিলেন, "অচেনা লোকের মাথায় জিনিসগুলো দিয়েছিস, পালাবে না তো জিনিসগুলো নিয়ে—"

"না গো না। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ভালো ঘরের মেয়ে। মাঝে মাঝে কেবল বলছে কংসকে খুন করব। কে জানে বাবা কোন কংসকে খুন করবে উ—ওই যে আসছে—"

দ্বারপ্রান্তে একটি ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল। মাথায় একটা বেশ বড় পুঁটুলি।

"ভিতরে আয়—"

মেয়েটি ভিতরে আসিয়া মাথায় মোট নামাইল। তাহার পর ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "দাদা—দাদা—তুমি—"

তাহার পরই অজ্ঞান হইয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহার ছোটবোন বারাহীকে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু সে কথা খুলিয়া বলিলেন না।

বলিলেন—"ও যখন আমাকে দাদা বলেছে তখন আমিই ওকে আশ্রয় দেব।"

বারাহীর কোনও সন্তান হয় নাই। বয়সও মাত্র একুশ বৎসর। রূপসী ছিল সে। বাপের বড় আদরিণী ছিল। তাহার শীর্ণ দেহ, ছিন্ন বস্ত্র, রুক্ষ চুল দেখিয়া ধূর্জটিমঙ্গলের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে অশ্রু তিনি সংবরণ করিয়াছিলেন, গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে দেন নাই।

তাঁহার রক্ষকদের আদেশ দিলেন—"একটা পালকি এনে একে নিয়ে যাও। এ আমাদের সঙ্গে যাবে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল।

একজন অশ্বারোহী আসিয়া খবর দিল হাতির দল অন্যদিকে সরিয়া গিয়াছে। পথে আর কোন বাধা নাই। ঝকমারিও বারাহীকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গল যখন প্রকাশ্যে এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না, তখন সে-ও চুপ করিয়া রহিল।

ধূর্জটিমঙ্গল উঠিয়া পড়িলেন—"মীর সাহেব, আমি এখন তাহলে উঠি। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। আপনি বড় দুরবস্থায় পড়েছেন দেখতে পাচ্ছি। আমি আপনাকে পঞ্চাশটি আসরফি দিচ্ছি। আপনি তাড়াতাড়ি উড়িষ্যায় চলে যান। আপনি যদি মুর্শিদাবাদে মৈনি বিবিকে খবর দিতে পারেন তাহলে সে খবর আমি পাব। মুর্শিদাবাদে গিয়ে জন সায়েবকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করব আমি। এ মেয়ে দুটো আপনার সঙ্গে থাক।"

তিনি তির্কি আর শাওনীকেও পাঁচটি করিয়া আসরফি দিলেন। তাহারা আনন্দে গদগদ হইয়া পড়িল। ধূর্জটিমঙ্গলকে ঘিরিয়া তাহারা আনন্দের একটা বান বহাইয়া দিল যেন। তাহাকে বারবার জড়াইয়া ধরিল, হাত তুলিয়া নাচিল, দুই এক কলি গানও গাহিয়া দিল। ঝকমারিকে বারবার চুম্বন করিয়া বলিল—

"বেটাছেলের পোশাকে তুকে খুব ভালো দেখাচ্ছে। মন যাচ্ছে তুকে বিয়ে করি।"

একটা হাসির হুল্লোড় তুলিয়া তাহারা গড়াইয়া পড়িল।

মীর মহম্মদ বলিলেন—"আপনি আমার এত উপকার করলেন আপনার নামটা কিন্তু জানতে পারলাম না। আপনার এ উপকারের কিছু প্রত্যুপকার যদি করতে পারি—"

"একটি প্রত্যুপকার করতে পারেন। উড়িষ্যায় গিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে পারলেন কিনা, ফল কিছু হল কিনা সেটা আমকে জানাবেন।"

"কিন্তু আপনার নাম ঠিকানা না জানলে কোথায় জানাব? যদি সুবিধে করতে পারি উড়িষ্যা থেকে কোন লোককে আমি মুর্শিদাবাদে পাঠাবার চেষ্টা করব—"

"মৈনি বিবির কাছেই খবর পাঠাবেন। মৈনি বিবির কাছেই থাকব আমি। ওখানে খবর গেলে আমি পেয়ে যাব—"

"আপনি হিন্দু কি মুসলমান তাতো বললেন না—"

"তা বলবার তো কোনও প্রয়োজন নেই। দেখুন, সব দেশে, সব সমাজে দুটি জাত থাকে—একটি সৎজাত আর একটি বজ্জাত। আমি সৎজাতের দলে। আমার দলে হিন্দু মুসলমান দুইই আছেন।"

বাহিরে তূর্যধ্বনি শোনা গেল।

"এবার আমি চলি। আপনার কথা বলব আমি মৈনিকে।"

তাহারা বাহিরে গিয়া অশ্বারোহণ করিল। ধূর্জটিমঙ্গলের রক্ষকেরা ডালপালা কাটিয়া ছোট একটি ডুলির মতো বানাইয়া ছিল। অজ্ঞান বারাহীকে তাহার উপর শোওয়াইয়াই তাহারা লইয়া চলিল। এখানে পালকি আনা সম্ভব হয় নাই। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ধূর্জটিমঙ্গল হাত তুলিয়া আবার বলিল—"শাওনী তির্কি চললাম—"

উহারা গান গাহিয়া উঠিল—

আবার কবে আসবি তুরা
সেই আশাতে থাকব
আকাশে চান থাকবে
বুকেতে প্রাণ থাকবে
পথের পানে চোখটি মেলে রাখব।
মনরঙোলীর রঙিন পাতায়
তুদের ছবি আঁকব।

গান শেষ করিয়া হাসিতে হাসিতে আবার তাহারা গুহায় ঢুকিয়া পড়িল। মীর মহম্মদের সহিত কেন তাহারা যাইতেছে সে কথাটা কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গলকে তাহারও বলিল না। বলা সম্ভব ছিল না বলিয়াই বোধহয় বলিল না।

।। ছয়।।

সেদিন ধূর্জটিমঙ্গল যখন চলিয়া গেলেন নীলু রায় তখনই ঘরের ভিতর গেলেন না। অন্ধকারে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার ক্ষতবিক্ষত অতীত জীবনের পটভূমিকায় নিজের জীবনটা আর একবার প্রত্যক্ষ করিলেন। হ্যাঁ, সত্যিই তিনি নিঃসঙ্গ, সত্যই তাঁহার আত্মীয় কেহ নাই। তাঁহার রক্ত-সম্পর্কিত সব আত্মীয়স্বজনই কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। দুইজন বন্ধু তাঁহার জীবনে আসিয়াছিল। একজন কেরামত খাঁ, আর একজন ধূর্জটিমঙ্গল। কেরামত খাঁ শুধু তাঁহার বন্ধুই ছিল না, গুরুও ছিল। তাহার কাছেই তিনি গানবাজনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অসামান্য শিল্পী ওই কেরামত খাঁ। শুধু সে সুর-শিল্পী নহে, জীবন-শিল্পীও। সংসারের কোনও বন্ধন নাই। অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো। কিন্তু তাহার আরাধ্য ভগবান নহেন, তাহার আরাধ্য সুর। সুরের আহ্বানে সে ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। আজ দিল্লী, কাল ঢাকা, পরশু বিষ্ণুপুর, তাহার পরদিন মুর্শিদাবাদ। সুরের টানে কেরামত সদা চঞ্চল। এখন কোথায় আছে কে জানে। সুতরাং তাহার বন্ধুত্ব নীলু রায়ের জীবনে এমন কোন প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই যাহার উপর তিনি নির্ভর করিতে পারেন। তাঁহার সুখ দুঃখের সে অংশীদার নয়, সে কখন কোথায় থাকে ঠিক নাই। তবু কেরামত খাঁয়ের বন্ধুত্ব তাঁহার জীবনে পরম সম্পদ, একখণ্ড মাণিক্যের মতো তাহা তাঁহার আঁধার জীবনে যেন জ্বলিতেছে। যতক্ষণ সে কাছে থাকে ততক্ষণ সে পারিপার্শ্বিককে যেন আলোকিত করিয়া রাখে। শুধু গানবাজনা নয়, তাহার চরিত্রের মধ্যে এমন একটা অগাধ অথৈ ভাব আছে, এমন একটা প্রদীপ্ত আছে যে, তাহাকে ভালো না বাসিয়া থাকা যায় না। কেরামত সকলের ভালোবাসা আকর্ষণ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিরাসক্তও। কোন ভালোবাসার আকর্ষণে কোথাও সে বাঁধা পড়ে না। সে যদিও মুসলমান কিন্তু একটির বেশী বিবাহ করে নাই। অনেক তরফী, অনেক বাঈজী এমন কি ভদ্রঘরের অনেক কন্যাও তাহার প্রণয়াসক্ত। কিন্তু কেরামত আর কোথাও বাঁধা পড়ে নাই। তাহার বউ পুতলী বিবি নাকি অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু সে পর্দানশীন, যখন বাহিরে যায়

তখন বোরখা পরে। নীলু রায় কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই। লোকমুখে তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ির ঝি বলিয়াছিল—মেয়ে নয় তো পরী। রং দুধে-আলতা, একপিঠ কালো চুল, কুচকুচে কালো টানা টানা চোখ। দাঁতগুলো মুক্তোর মতো। বুড়ী ঝি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুতলী বিবি কয়েকটি যন্ত্র নাকি খুব ভালো বাজাইতে পারেন। বিশেষ করিয়া বীণা। কিন্তু তিনি কেরামত ছাড়া আর কাহাকেও বাজনা শোনাইতে চান না। আমীরওমারহদের অন্তঃপুর হইতে নিমন্ত্রণ আসিলে অসুখের ভান করেন। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। লোকে বলে তাঁহার জন্যই নাকি কেরামতকে দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কেরামতের একটি পুত্র সরফুদ্দীন মুর্শিদাবাদে তাহার বৃদ্ধা পিসীর কাছে থাকে। ধূর্জটিমঙ্গলই তাহাদের তত্ত্বাবধান করেন। তাহাদের দেখাশোনা করিবার নিমিত্ত বক্তিয়ার নামক একটি লোককেই নিযুক্ত করিয়াছেন তিনি। মাসে মাসে তাহাদের টাকাও দেন। ধূর্জটিমঙ্গল অনেক সৎকাজে লিপ্ত, নীলু রায়ও তাঁহার দাক্ষিণ্য ভোগ করিতেছেন, তিনি তাঁহার বন্ধুস্থানীয় আত্মীয়ের মতো। কিন্তু তাঁহার আদি-অন্ত তিনি বুঝিতে পারেন না। অত্যন্ত গম্ভীর, অত্যন্ত স্বল্পবাক ধূর্জটিমঙ্গলকে বন্ধুরূপে লাভ করিয়াও নীলু রায় তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারেন না। তাহাকে বুঝিতেই পারেন না তিনি। এতদিন তাঁহার সঙ্গে আছেন, কিন্তু মনে হয় একটা বন্ধ বাক্সের সম্মুখেই সারাজীবন যেন বসিয়া আছেন। প্রকাণ্ড বাক্স। লম্বাচওড়া ভারিক্কী চেহারা, গায়ে অসীম শক্তি, মনে প্রচুর সাহস কিন্তু বন্ধ-বাক্স। কখন কি যে করিবেন তাহা পূর্বাহ্ণে কখনও জানাইবেন না, এই তাহার স্বভাব। এই সিংভূমের জঙ্গলে তিনি যে সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন একথা নীলু রায় আসিবার আগের দিন পর্যন্ত জানিতেন না। হঠাৎ লুৎফুন্নিসার চিঠিগুলি লইয়া তিনি যে মুর্শিদাবাদে যাইবেন একথাও নীলু রায় কল্পনা করেন নাই, যাত্রা করিবার আগে তিনি যে হঠাৎ বাঘ শিকার করিতে যাইবেন ইহাও একটা অদ্ভুত আকস্মিক কাণ্ড। না, ধূর্জটিমঙ্গলকে নীলু রায় বুঝিতে পারেন না। তিনি যদি সঙ্গে যাইতে চাহিতেন তাহা হইলে তিনি আপত্তি করিত না, তিনি যাইতে চাহিলেন না তাহাতেও তাঁহার আপত্তি নাই। ঝকমারিকে সঙ্গে না লওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গল নিজের মতে নিজের পথে চলেন, কে তাঁহার সঙ্গী হইবে না হইবে সে সম্বন্ধে মাথাই ঘামান না। অদ্ভুত একবগ্‌গা অন্যমনস্ক গোছের লোক। কেরামত ধূর্জটিমঙ্গল—দুজনকেই ভালবাসেন নীলু রায়, কিন্তু দুইজনেই তাঁহার নাগালের বাহিরে। এখন কি কর্তব্য? হঠাৎ তাঁহার হরিপালের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল খোঁড়া ছিরিকে, ছিরির বাবা কৈলাসকে, ময়রা সাধুচরণকে, ব্রাহ্মণী রাধীকে। ইহারা তো তাঁহার নাগালের বাহিরে নয়। হরিপালে তাঁহার বাড়িটাও পড়িয়া আছে। সেখানে বাস করিলে কেমন হয়? কিন্তু মন সায় দিল না। ছিরি, কৈলাস, সাধুচরণদের গ্রাম্য ভালোবাসায় মন ভরে না। সে ভালোবাসা নিখাদ, সে ভালোবাসা পবিত্র, কিন্তু তাহাতেই মন ভরে না। ভালবাসা ছাড়াও মন আরও কিছু চায়। সে বস্তুটা কি! নীলু রায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু মনের মধ্যে কোনও সদুত্তর পাইলেন না। আমি কিন্তু উত্তরটা জানি। পশুরা যাহাতে সন্তুষ্ট হয় মানুষের তাহাতে সন্তোষ নাই। স্বাভাবিক আহার-বিহার স্নেহ-ভালবাসার বাহিরে সে এমন একটা জগতে বিচরণ করিতে চায় যে জগতে মানুষের সৃষ্টি, যে জগতে মানুষের প্রতিভা আপন খামখেয়ালে অভিনব শোভা সৃষ্টি করিয়াছে, যে জগতে

কেরামতরা সঙ্গীতসাধনা করে, ধূর্জটিমঙ্গলদের রহস্যময় গাম্ভীর্য, বিপুল সাহস, বিরাট দাক্ষিণ্য যে জগতের ভূষণ—সেই জগতে বিচরণ করিবার জন্য মানুষের মন উন্মুখ। সৃষ্টির নিত্যনতুন প্রকাশ দেখিয়া সে আত্মহারা হইতে চায়। স্বাভাবিক জীবনযাপন তাঁহার মনের এ ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। নীলু রায়ের পক্ষে আর হরিপালে গিয়া বসবাস করা সম্ভবপর নহে। তিনি যে সংস্কৃতির স্বাদ পাইয়াছেন তাহা শহরেই সুলভ, একমাত্র সুশিক্ষিত লোকের সঙ্গলাভ করিলেই তাহা পাওয়া যায়। এ রকম লোকেরা পল্লীগ্রামে বড় একটা থাকেন না। তাঁহাদের বাস শহরে। পল্লীবাসীদের সারল্য, পল্লীবাসীদের স্নেহ ভালোবাসার মধ্যে একটা মাধুর্য আছে বটে, কিন্তু সে মাধুর্য ধূর্জটিমঙ্গলের রহস্যময় আভিজাত্য বা কেরামতের অপরূপ গজলের সহিত তুলনীয় নয়। নীলু রায়কে আবার সুতানুটিতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ইহাই তিনি আবার অনুভব করিলেন যে তিনি নিঃসঙ্গ। কেরামত বা ধূর্জটিমঙ্গলকে তিনি যেমন করিয়া পাইতে চান তাহারা তেমন করিয়া ধরা দেয় না। তাহারা বন্ধু বটে, কিন্তু বড় সুদূরের। ঝকমারিকে বিবাহ করিতে পারিলে হয়তো তিনি এ পরিবারের আত্মীয় হইতে পারিতেন, কিন্তু আজ বুঝিলেন তাহা হইবার নয়। সুতানুটিতে এখন গিয়াই বা কি করিবেন? কাজকর্ম সব তো বন্ধ। ইংবেজদের এবং নবাবের অত্যাচারে মধ্যবিত্ত বাঙালী পল্লীগুলি তো শূন্য। অনেক বাড়ি পুড়িয়াছে। ইংরেজদের সহিত নবাবেব কলহে সেখানকার আকাশবাতাস থমথম করিতেছে। যে কোন সময় ঝড় উঠিতে পারে। তাহা ছাড়া তিনি যাইবেনই বা কেমন করিয়া? স্বেচ্ছায় যে তিনি জগদ্ধাত্রী ও তাঁহার ছেলে দুইটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছেন।

নীলু রায় বাহির হইতে ধীরে ধীরে ভিতরে গেলেন।

বাহির ঘর হইতে ধূর্জটিমঙ্গলের শয়নঘরটি দেখা যায়। অত রাত্রেও সে ঘরের কপাট খোলা দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন জগদ্ধাত্রী বোধহয় এতক্ষণ ঘরে খিল দিয়া ঘুমাইতেছেন। তিনি খোলা দ্বারটার দিকে আগাইয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন—জগদ্ধাত্রী বিছানাব উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছেন। ক্রন্দনাবেগে তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

নীলু রায় একবার গলা খাঁকারি দিলেন। ইহাতেই কাজ হইল। জগদ্ধাত্রী সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিলেন।

"কে—"

"আমি নীলু।"

"আপনি যাননি?"

"না। সবাই চলে গেলে আপনাকে দেখবে কে বৌঠান!"

"কেন, দানিয়েল আছে, কস্তুরী আছে, লালী আছে, স্বয়ং ধলরাজাই আছেন—"

জগদ্ধাত্রীর কণ্ঠস্বরে যে সুর বাজিয়া উঠিল তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। তাহা কোমল অথচ কঠিন, তাহা নিরুত্তাপ অথচ উত্তপ্ত, তাহা সরল অথচ বক্র, তাহাতে বিলাপের ভাষা নাই কিন্তু অশ্রুর আভাস আছে। নীলু রায় নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—'আপনার খাওয়া হয়ে গেছে তো? এইবার শুয়ে পড়ুন—"

"আমি খেয়েছি। ভেবেছিলাম আপনিও আপনার বন্ধুর সঙ্গে চলে গেছেন। আপনি আছেন জানলে আপনাকে আগে খাইয়ে তবে খেতাম। বসুন, আপনার খাবার নিয়ে আসি।"

"আমার তেমন ক্ষিধে পায়নি। আমার জন্যে কিছু করতে হবে না। আমিও শুতে যাচ্ছি—"

"আপনার জন্যে আমার কিছুই করতে হবে না। আপনার বন্ধুর জন্যই রান্না করেছিলাম। কিন্তু তিনি দুধ মধু আর মহুয়া ছাড়া আর তো কিছুই খেলেন না। সব রান্না করা আছে, আপনি বসুন—"

জগদ্ধাত্রী উঠিয়া মেজেতে একটি বাসন বিছাইয়া দিলেন।

"বসুন আপনি। আমি খাবার আনছি।"

মাথায় আধঘোমটা টানিয়া জগদ্ধাত্রী ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। যে ওঁরাও বালিকাটি তাঁহার নিকট সদাসর্বদা থাকিত সে এক গ্লাস জল লইয়া প্রবেশ করিল। আগেকার গ্লাসে ঢাকনা দেওয়া থাকিত। এ গ্লাসটি রূপার এবং ইহার ঢাকনাটি বেশী কারুকার্যময় বলিয়া নীলু রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মনে হইল ঢাকনাটির উপর দামী পাথর বসানো রহিয়াছে। তিনি আসনে বসিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

জগদ্ধাত্রী খাবারের থালা লইয়া প্রবেশ করিলেন। বালিকাটি পিছুপিছু আর একটি থালা আনিল। তাহাতে নানাবকম ব্যঞ্জন সাজানো। তাহার পর আসিল আরও দুইটি ছোট থালা।

নীলু রায় বলিলেন—"এত খাবার তো আমি খেতে পারব না। এত খাবার আপনি বেঁধেছেন?"

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—"সব আমার রান্না নয়। ওই ছোট থালা দুটো দানিয়েলের বাড়ি থেকে এসেছে। ও আজ শিকারে বেরিয়েছিল সকালে। একটা বরা মেরেছে আর কয়েকটা বনমুরগী। উনি এসব ভালোবাসেন তাই লালী রেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু উনি তো চলে গেলেন, আমি ওসব খাই না। ভাবছিলাম ফেরত দেব। আপনি তো ও সব খান—"

"খাই।"

"তাহলে তো ভালোই হল।"

জগদ্ধাত্রী খাবার সব সাজাইয়া দিয়া, মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া একটি ছোট পাখা হাতে তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিলেন। নীলু রায়ের বিসদৃশ বোধ হইল না। ইহাই তখন রেওয়াজ ছিল। আতপ চালের চমৎকার ভাত, ভাজা মুগের ডাল, বড়ার ডালনা, ডুমুরের ঘণ্ট, দুধিয়া মাছের ঝাল, শোল মাছের অম্বল, এসব ছাড়া একটু ক্ষীর এবং মিষ্টান্ন। সেই বালিকাটি কিছু গরম লুচি ভাজিয়া আনিল।

"লুচি দিয়ে মাংস দিয়ে খান। উনি খুব ভালোবাসেন। ওঁর জন্যে ময়দা মেখেই রেখেছিলাম, কিন্তু উনি তো কিছু না খেয়েই চলে গেলেন।"

এ কথাগুলির মধ্যেও নীলু রায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন দুঃখের আভাস পাইলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না, নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। প্রতিটি ব্যঞ্জন অপূর্ব। এমন ডুমুরের ডালনা এবং দুধিয়া মাছের ঝাল তিনি ইতিপূর্বে খাইয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না। বনমুরগী এবং বরাহের মাংসও চমৎকার। নীলু রায় নিঃশব্দে সমস্ত নিঃশেষ করিলেন। তিনি যে পরিমাণ

আহার করিলেন তাহা আজকালকার হিসাবে ভূরিভোজন হিসাবে গণ্য হইবে। আজকাল আমরা একটুকরা পাঁউরুটি, একটা সন্দেশ, আধখানা ফ্রাই খাইয়া উদ্‌গার তুলিয়া বলি—উঃ খুব খেয়েছি, আর পারব না। কিন্তু সেকালে নীলু রায়রা ওই পরিমাণ ভোজ্যই দুইবেলা উদরস্থ করিয়া স্বচ্ছন্দে হজম করিতেন। বিস্ময়ের কিছু ছিল না ইহাতে।

জল খাইবার সময় নীলু রায় রূপার গ্লাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

"এমন গ্লাস কোথায় পেলেন বৌঠান। রুপোর ঢাকনিতে যে হীরে, মুক্তো, প্রবাল, চুনী বসানো সেগুলো আসল বলেই মনে হচ্ছে। এ গেলাস কি ধূর্জটি কিনেছিল, না ফরমাস দিয়ে তৈরি করিয়েছিল?"

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—"আমার বিয়ের সময় শেঠ উমিচাঁদ আমাকে ওটা উপহার-স্বরূপ দিয়েছিলেন—"

"উমিচাঁদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কিরকম? আত্মীয় নয় নিশ্চয়, উনি তো বাঙালী নন, পশ্চিমদেশের লোক—"

"না। আত্মীয় নন। কিন্তু উনি আমার বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই এসে দাবা খেলতেন। ওঁব একটি খুব সুন্দরী ভাগনী ছিল। নাম লাখপতিয়া। তার সঙ্গে আমাব বন্ধুত্ব ছিল খুব—"

নীলু রায় মনে মনে চমকিত হইলেন। উমিচাঁদ বৌঠানের বাবার বন্ধু? উমিচাঁদেব খবর কি জানেন তিনি?

"উমিচাঁদ আপনার বাবার বন্ধু? তা জানতাম না তো। কতদিন তাঁর খবর পাননি?"

"খবর অনেকদিন পাইনি। বিয়ের পর তো সুতানুটিতে বেশীদিন থাকা হয়নি। বেশীর ভাগ বারাসাতেই ছিলাম। সেখানে ওই মুখপোড়া নবাবের কে একটা লোক বারবার আমাদের বাড়িতে আসতে লাগল। বাবা ভয় পেয়ে তাই আমাদের জন সায়েবের কাছে নিয়ে এলেন। সেই থেকে তো এখানেই আছি। আর কোন খবর পাইনি। লাখপতিয়ার এতদিন বিয়ে হয়ে গেছে নিশ্চয়। আপনি তাদের খবর জানেন?"

"আমি যে খবর জানি তা তো ভয়ানক। ধূর্জটি আপনাকে কিছু বলেনি?"

"না। তাকে তো চেনেন আপনি। কথাই বলে না মোটে। অন্যমনস্ক লোক। তরকারিতে যদি কোনদিন নুন দিতে ভুলে যাই, আলোনাই খেয়ে যাবে, বলবে না তরকারিতে নুন দাওনি। আপনি বলুন না, কি খবর ওদের। ভয়ানক খবর?"

"ভয়ানক খবর।"

নীলু রায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

"জগন্নাথকে চিনতেন আপনি?"

"খুব চিনতাম। জগন্নাথ তো ওদের বাড়ির জমাদার ছিল। খুব ভালো লোক—"

"হাজারিমলকে?"

"হ্যাঁ। তিনি তো উমিচাঁদের আত্মীয়। ওদের বাড়ির সব তদ্বিরতদারক করতেন। আমাদের বাড়িতেও আসতেন মাঝে মাঝে। কি হয়েছে ওদের—"

"এখনি যদি বলি আপনার রাত্রে আর ঘুম হবে না।"

"তবু বলুন। না শুনলে আরও ঘুম হবে না।"

নীলু রায় বলিতে লাগিলেন।

"নবাববাহাদুর যে কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এ খবর নিশ্চয়ই জানেন আপনি।"

"আমি তো কিছুই জানি না। আপনার বন্ধু তো আমাকে কিছুই বলেননি। আপনি সব খুলে বলুন—"

"ইংরেজদের উপর রেগে গিয়ে নবাব সাহেব কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। কলকাতার নামটা পর্যন্ত বদলে দিয়ে আলিপুর নাম রেখেছিলেন। আমাদের দেশী লোকদের বড় কষ্ট হয়েছিল। ব্যবসাবাণিজ্য তো বন্ধ হয়েই গিয়েছিল, আমাদের বাড়িঘরও পুড়ে গিয়েছিল। নবাব কলকাতা আক্রমণ করবার কিছু আগে আমি চরাধিপতি রামরাম সিংহের বাড়িতে একটা গানের মজলিসে গিয়েছিলাম। তিনি শিকারেরও কিছু আয়োজন করেছিলেন। রামরাম সিংহের বাড়ি থেকে যেদিন ফিরছি সেদিন তিনি আমাকে বললেন—'নবাব কলকাতা আক্রমণ করবেন। যুদ্ধে সাধারণ লোকদের বড় মুশকিল হয়। তোমরা যত শীঘ্র পার কলকাতা থেকে অন্যত্র চলে যাও। আর উমিচাঁদকে এই চিঠিটা দিও। সে আমার বন্ধু, তাকেও আমি এই পরামর্শ দিয়েছি চিঠিতে।' আমি চিঠিটা নিয়ে এলাম। এসে দেখি যুদ্ধ প্রায় বাধ-বাধ। নবাব সৈন্যের সঙ্গে ইংরেজদের টালায় ছোটখাটো একটা যুদ্ধ হয়েও গেছে। শুনলাম ঘসেটি বেগমের পেয়ারের লোক নবাবের চিরশত্রু রাজবল্লভের সঙ্গে নাকি নবাবের সন্ধি হয়ে গেছে। রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভ নবাবের ভয়ে অনেকদিন আগে পালিয়ে এসে ইংরেজদের আশ্রয় নিয়েছিল। ইংরেজরা যেই জানল যে রাজবল্লভের সঙ্গে নবাবের মিটমাট হয়ে গেছে, অমনি তারা কৃষ্ণবল্লভকে কয়েদ করে ফেলল। ঠিক এই সময়েই আমি রামরাম সিংহের চিঠি নিয়ে সুতানুটিতে হাজির হলাম। ধূর্জটিমঙ্গলের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির ভার আমার উপর ছিল। কয়েকটা সিন্দুকে অনেক নগদ টাকা, রুপোর বাসন আর গয়নাপত্তর ছিল। আমি সেগুলো তাড়াতাড়ি বারাসতে সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। উমিচাঁদের বাড়িতে আর যাওয়া হল না। উমিচাঁদের সঙ্গে আমার জানাশোনাও তেমন ছিল না, ওরা খুব বড়লোক তো, পাইক বরকন্দাজ পেরিয়ে তবে মালিকের নাগাল পেতে হয়, তাই যাবার তেমন উৎসাহও পাচ্ছিলাম না। এমন সময় আমার দেখা হয়ে গেল মীর মহম্মদের সঙ্গে। সে ফৌজে চাকরি করত, কিন্তু কি কারণে জানি না, তার চাকরি আর ছিল না। আলাপ ছিল তার সঙ্গে। সে এসে আমার কাছে টাকা ধার চাইলে।"

জগদ্ধাত্রী বলিয়া উঠিলেন—"মীর মহম্মদ! তাকে চেনেন নাকি আপনি—?"

"আলাপ ছিল। কেন?"

"একজন মীর মহম্মদের ভয়েই তো বাবা আমাকে এই জঙ্গলে তাঁর বন্ধু জন সাহেবের আশ্রয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মীর মহম্মদ একদিন আমাকে পুকুরে স্নান করতে দেখেছিল, তারপর থেকে ঘন ঘন আমাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করল। সবাই বলতে লাগল উনি নবাব সিরাজের একজন দোস্ত। ফৌজে চাকরি আছে কিন্তু ওঁর আসল কাজ নবাবের রঙমহলের জন্য মেয়েমানুষ যোগাড় করা। এই কথা শুনবার পরদিনই বাবা আমাকে নিয়ে

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। চলে এলেন জন সাহেবের আশ্রয়ে। আপনি যে মীর মহম্মদের কথা বলছেন সে কেমন দেখতে বলুন তো—"

"দেখতে সুপুরুষ। লাল দাড়ি, টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো নাক।"

"এ তো তাহলে সেই লোক। তাকে আমি দেখেছি। একদিন আমাদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছিল!"

"তাই নাকি!"

"এর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল? লোকটাকে আপনি টাকা ধার দিলেন—?"

"না দিইনি। তখন আমার হাতে টাকা ছিল না। শুনে সে বলল তাহলে উমিচাঁদের কাছে যাই। উমিচাঁদ কৃপণ বটে, কিন্তু আমাকে 'না' করতে পারবে না। তখন আমি তাকে বললাম—চরাধিপতি রামরাম সিংহ উমিচাঁদকে দেবার জন্য একটা চিঠি দিয়েছিলেন আমাকে। আমি এখনও গিয়ে উঠতে পারিনি। আপনি যখন সেখানে যাচ্ছেন নিয়ে যান চিঠিখানা। চিঠিখানা দিলাম। কিন্তু লোকটা শয়তান। চিঠি সে উমিচাঁদকে দেয়নি। সে চিঠি বিক্রি করেছিল ফোর্ট উইলিয়মের সাহেবদের কাছে। সাহেবরা চিঠি পেয়েই সন্দেহ করল যে উমিচাঁদ নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে নবাবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা উমিচাঁদকে বন্দী করে ফোর্ট উইলিয়মে পুরে ফেলল। হাজারিমল তখন ভয় পেয়ে বাড়ির মেয়েদের আর বাড়িতে টাকাকড়ি গয়নাপত্র যা ছিল সব নিয়ে অন্য জায়গায় পালাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কিন্তু এ-ও ইংরেজদের সহ্য হল না। তারা দলে দলে সেনা পাঠিয়ে ঘিরে ফেলল উমিচাঁদের বাড়ি। তারা যখন মেয়েদের মহলে ঢোকবার চেষ্টা করছে বুড়ো জগন্নাথ জাতে ছিল সে ক্ষত্রিয়, বাধা দিলে তাদের লোকলস্কর নিয়ে। রক্তারক্তি কাণ্ড হল একটা। জগন্নাথ শেষে দেখলে সাহেবগুলোকে আর রোখা যাচ্ছে না, তারা অন্দরে ঢুকবেই, তখন সে এক ভয়ানক কাণ্ড করে বসল। সে দৌড়ে ভিতরে ঢুকে গিয়ে অন্দরমহলের কপাটটা বন্ধ করে দিল। তারপর মেয়েদের বলল—আমি চিতা তৈরি করছি, তোমরা যদি আত্মসম্মান বাঁচাতে চাও এই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দাও। স্মরণ কর পদ্মিনীর কথা, জহরব্রতের কাহিনী। মেয়েরা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে ভয় পেতে লাগল। তখন ক্ষত্রিয় জগন্নাথ কি করল জানেন? তার হাতে শাণিত তলোয়ার ছিল, সে টপাটপ তেরজন মেয়ের মুণ্ডু কেটে তাদের জ্বলন্ত চিতায় ফেলে দিল একে একে। তারপর আত্মহত্যা করবার জন্যে নিজের বুকে ছুরি বসাল। কিন্তু মরল না সে। ফিরিঙ্গীরা তাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল। আহত অবস্থায় তাকে বাইরে রেখে আবার অন্তঃপুরে ঢোকবার চেষ্টা করল তারা। কিন্তু পারল না। তখন চারিদিকে আগুন লেগে গেছে। ফিরে এসে তারা জগন্নাথকে পায়নি। আহত অবস্থাতেই সে অন্তর্ধান করেছিল। শুধু অন্তর্ধান করেনি, প্রতিশোধও নিয়েছিল। নবাব সৈন্যের ছাউনিতে গিয়ে নবাব সৈন্যদের কলকাতায় ঢোকবার টালার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছিল সে। সেই রাস্তায় ঢুকে নবাব ইংরেজদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল কলকাতা থেকে।"

নীলু রায় চুপ করিলেন।

"উমিচাঁদের বাড়ির মেয়েরা সব মরে গেছে তাহলে? লাখপতিয়া বেঁচে নেই?"

"ঠিক বলতে পারব না: তবে খুব সম্ভবত নেই।"

জগদ্ধাত্রী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—"ঠাকুরপো আমার একটি উপকার করবেন?"

"কি বলুন—"

জগদ্ধাত্রী উঠিয়া ভিতরে গেলেন। তাহার পর প্রকাণ্ড একটি রামদা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

"এই দা দিয়ে আমাকে হত্যা করুন আপনি। আমাকে মুক্তি দিন। এদেশে মেয়েমানুষ হয়ে বাঁচবার আর ইচ্ছে নেই আমার। এদেশে একদিকে মুসলমান, অন্যদিকে ইংরেজ। যে সমাজে বাস করি সে সমাজের পুরুষরা নিষ্ঠুর ভীতু, অমানুষ। তারা গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করে কিন্তু স্ত্রীদের রক্ষা করতে পারে না। স্ত্রীদের দিকে ফিরেও চায় না। তারা নিজেদের নিয়েই মত্ত।"

নীলু রায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথাই সরিল না।

তাহার পর বলিলেন—"আমি আপনার ঘাতক হব? একথা ভাবলেন আপনি কেমন করে! স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তা মিথ্যা নয়। এদেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই বড় অসহায়। কিন্তু আপনি তো ওই অধিকাংশের দলে পড়েন না। আপনি মহেশমঙ্গলের পুত্রবধূ, ধূর্জটিমঙ্গলের স্ত্রী। কলকাতার দেশী সমাজে ওঁরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ধূর্জটিমঙ্গল আপনাকে রক্ষা করবার জন্যেই এখানে একটা গৃহস্থালী পত্তন করেছে। জন সাহেবের বিশাল সম্পত্তির অধীশ্বরী করে সে আপনাকে এখানে রেখেছে। জন সাহেবের কালাপল্টনের দল আপনাকে পাহারা দিচ্ছে। স্বয়ং ধলরাজা আপনার সহায়। আপনি নিজেকে অসহায় মনে করছেন কেন?"

"স্বামী কাছে না থাকলে স্ত্রীলোকমাত্রই নিজেকে অসহায় মনে করে। সুতানুটিতে আমাদের বাড়িতে লোকজনের অভাব ছিল না। তবু আমার দুই জাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে, আমার ননদ বারাহীকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। অন্য ননদদের জগদম্বা, দুর্গা, জয়া, শ্যামাঙ্গিনীকে বেইজ্জত করে মেরে ফেলেছে ওরা। এখানেই বা কখন নবাবের ফৌজ বা ইংরেজের ফৌজ এসে পড়বে কে জানে। যদি আসে তখন আমাকে রক্ষা করবে কে?"

নীলু রায় বলিলেন,"আমি। ধূর্জটি আমাকে সেইজন্যই রেখে গেছে।"

"কিন্তু আপনি একা কি করবেন—"

"কেন দানিয়েল আর তার পল্টন আছে—"

"নবাবের ফৌজ কিংবা ইংরেজের গোরাদের সামনে কি ওরা দাঁড়াতে পারবে? পারবে না। সবাই পালাবে।"

"নবাবের ফৌজ কিংবা ইংরেজের গোরাদের এখানে আসার সম্ভাবনা দেখি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন বললেই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। উনি থাকলে পারতাম, কিন্তু বাংলাদেশের যে খবর আপনি বললেন তাতে মনে হয় না উনি তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন।"

"আমি থাকলে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না বলছেন, ধূর্জটি থাকলেই পারতেন—এটা কি রকম কথা হল বৌঠান?"

"একথা বলছি কারণ স্বামীর চেয়ে বড় ভরসা স্ত্রীলোকের আর কেউ নেই। কিন্তু আমার এমন কপাল যে আমার স্বামী প্রায়ই আমার কাছে থাকেন না। কখন কোথায় যান, কেন যান,

তাও বলেন না। এখন হঠাৎ মুর্শিদাবাদ গেলেন কেন সেটার কারণ একটা বলেছেন কিন্তু বিশ্বাস হয় না।''

''না জরুরি দরকারে গেছে।''

''আপনি সব খুলে বলুন।''

নীলু রায় মিথ্যাভাষণ করিলেন।

বলিলেন—''আমি জানি না। একটি কথা বিশ্বাস করুন আপনাকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।''

''তাতে আপনার প্রাণটাও যাবে, আমিও রক্ষা পাব না। আমার বাঁচার আর তো দরকার নেই। বংশরক্ষা তো আমি করেছি। আমার দুটো ছেলে হয়েছে। বড় জা বাঁজা ছিলেন বলে উনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। সেজ জার সঙ্গে ওঁর মনের মিল হয়নি। তাই আমাকে বিয়ে করলেন। আমি তো যমজ ছেলে দিয়েছি ওঁকে। আর আমার বাঁচার দরকার কি?''

''ওই ছেলে দুটির জন্যই আপনার বাঁচার দরকার।''

''ছেলেরা তো মানুষ হচ্ছে লালী আর কস্তুরীর কাছে। আমার দিকে তো ফিরেও চায় না। ওদের কাছেই খায় শোয়। ওদের সঙ্গেই খেলাধুলো করে। আমাকে তো কারুরই প্রয়োজন নেই। ঝকমাবিটা এসেছিল, সে-ও চলে গেল।''

সহসা নীলু রায় যেন জগদ্ধাত্রীর মনের নিগূঢ় বেদনাটার আভাস পাইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিলেন যে সে বেদনা উপশম কবিবাব সাধ্য তাঁহার নেই। ইহা লইয়া আলোচনা করিলে বেদনা কমিবে না, বাড়িবে। তাই তিনি প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

''এবার শুয়ে পড়ুন। আপনাব যদি ভয় করে তাহলে আমি না হয় ধলরাজার সঙ্গে দেখা করে আরও লোকজন আনবার ব্যবস্থা করব। দিন, ওটা দিন আমাকে—''

রামদাখানা লইয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন—''আপাতত আমিই আপনাকে পাহারা দিই এইটে নিয়ে—''

দাখানা লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

জগদ্ধাত্রী যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। নীলু রায় বিছানায় গিয়া শুইলেন বটে কিন্তু তাঁহার ঘুম আসিল না। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া তিনি অবশেষে উঠিয়া পড়িলেন এবং আবার অন্দরে আসিলেন। দেখিলেন জগদ্ধাত্রী নাই। আর একটু আগাইয়া গিয়া দেখিতে পাইলেন ঠাকুরঘরের কপাট খোলা। সেই খোলা কপাট দিয়া প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল তাঁহার। ঠাকুরঘরের দেওয়ালের গায়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রীর পট, মাটির উপর লক্ষ্মীজনার্দনের রৌপ্যনির্মিত আসন, আসনের চারিদিকে ছোটবড় নানারকম কড়ির ঝাঁপি, ছোটবড় নানারকম পাথরও, কোনটা সিঁদুর মাখানো, কোনটা চন্দনলিপ্ত। চারিদিকে ফুল বিল্বপত্র। ধূপাধারে ধূনা পুড়িতেছে। জগদ্ধাত্রী প্রতিমাবৎ করজোড়ে বসিয়া আছেন। নীলু রায় তাঁহার মুখটা দেখিতে পাইলেন না। পাইলে দেখিতেন মুদিত নয়ন দুইটি হইতে অবিরলধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। সহসা চতুর্দিকে পাখি ডাকিয়া উঠিল। নীলু রায় বুঝিলেন রাত পোহাইয়া গেল। সন্তর্পণে তিনি আবার বাহিরে ফিরিয়া গেলেন। দেখিলেন পূর্বাকাশে উষা হাসিতেছে।

নীলু রায় সর্দার মাখনলালের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। কাছাকাছি গিয়াই দেখিতে পাইলেন মাখনলাল একটা খোলা জায়গায় একটা খাটিয়ার উপর চাদর ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে। আর তাহার পাশের খাটিয়াতেই শুইয়া আছে একটা প্রায়-উলঙ্গিনী আদিবাসী রমণী।

নীলু রায় আর কাছে গেলেন না। দূর হইতে ডাকিলেন—"মাখনলাল ওঠ—"

মাখনলাল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

তাহার পর নিজের গায়ের চাদরটা মেয়েটির গায়ে ফেলিয়া দিয়া তাহার আব্রু রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইল। মেয়েটি উঠিয়া চলিয়া গেল ঘরের ভিতরে।

"নীলুবাবু নাকি! আসেন, আসেন —এত ভোবে কি মনে করে?"

"ধূর্জটি চলে যাওয়াতে বৌঠান বড় ভয় পেয়েছেন। তোমার কালা পলটন কত আছে এখানে?"

"এক শ।"

"ইংরেজেব ফৌজ যদি আসে—"

"এতদূরে ইংরেজের ফৌজ আসবে না। ওরা এখন ওদেশেই ব্যস্ত।"

"নবাবের ফৌজ—"

"তাবা আমাদের দলের লোক। ধলবাজা তাদের তোয়াজ করে বেখেছেন। তারা আমাদের কিছু বলবে না। এখানে নবাবের ফৌজ নেইও বেশী।"

"তাহলে কোনও ভয় নেই বলছ?"

"কিচ্ছু ভয় নেই। মাকে নির্ভয়ে থাকতে বলুন।"

জগদ্ধাত্রীর ভয় যে কি এবং অশান্তির কারণ যে কোথায় তাহাব আভাস একটু আগেই তিনি পাইয়াছিলেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে পলটন মোতায়েন করিয়া সে ভয় বা অশান্তি দূর করা যাইবে না। তবু তিনি বলিলেন—"বৌঠানের বাড়ির সামনে তবু তুমি একটু পাহারার বন্দোবস্ত কর। ওদিকটা রাত্রে যেন খাঁ খাঁ করে। সিপাহীদের হাঁকডাক শুনলে বৌঠান নিশ্চিন্ত হবেন--"

"বেশ তার ব্যবস্থা আজ থেকেই করব। তবে কি জানেন কর্তা, ওরা বলবে হুঁ জেগে পাহারা দিব। কিন্তু দেবে না। মহুয়ার মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুবে। তবে ব্যবস্থা করব আমি—"

"আচ্ছা, আমি চলি তাহলে। আসব আবার। দাবা খেলবে আজ?"

"আজ একটা কিন্তু অন্য রকম মানস করেছি কর্তা। আপনিও যদি সঙ্গে আসেন তাহলে খুব ভালো হয়। আপনি তো বন্দুকে সিদ্ধহস্ত শুনেছি—"

"শিকারে যাবে নাকি?"

"হ্যাঁ, কাছের জঙ্গলে কিছু বটের এসেছে শুনলাম। কিছু মেরে আনব ভেবেছি। খাসা মাংস। তবে জন পিছু দশ বারোটা না হলে পেট ভরবে না। বিশ ত্রিশটা মারতে হবে।"

"বৌঠানকে দিয়ে আর ওসব রাঁধাতে চাই না।"

"বুধু রাঁধবে। ও চমৎকার রাঁধে। জন সাহেব ওব হাতেব রোস্ট খুব ভালোবাসতেন।"

"বুধু? সে আবার কে!"

"আমার রাঁধুনী। ওই যে ছুঁড়িটা শুয়েছিল এখানে।"

"বেশ, আসছি তাহলে একটু পরে—। আমিও অনেকদিন বটের খাইনি।"

নীলু রায় পাশেই একটা সরু পথ দিয়া কইলি নদীর দিকে চলিলেন। পথে একটা নিমগাছও চোখে পড়িল। একটা ডাল বেশ নীচু। নীলু রায় লাফাইয়া ডালটা ধরিলেন এবং একটা দাঁতন ভাঙিয়া লইলেন। উদ্দেশ্য কইলির তীরে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিবেন। পথে ঝামরির সহিত দেখা হইল। তাহার হাতে একটি ছোট কচ্ছপ। দড়িতে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার গায়ে একটা কোট।

"কি ঝামরি। কাছিম নাকি ওটা? কি করবি?"

"আমি আর কি করব। রঙ্কিনী খাবেক। ভারি নোলা যে উয়ার। লিত্যি লতুন জিনিস খেতে চায়। ক'দিন থেকে রোজ আমাকে স্বপন দিচ্ছে—কাছিম আন, কাছিম আন, কাছিম আন। পায়রা ভাল লাগে না। আজ পেয়ে গেলাম একটা। রেঁধে দিব। বুধি রাঁধবে, আমি সামনে ধরে দিব।"

"এ কোট কে দিল তোকে?"

"ওই কালা পল্টনের এক মিনসে। আমার সঙ্গে পীরিত জমাতে চায়। কোটটা গায়ে দিয়ে তাকে বললাম—ওরে খালভরা মাগারেঁড়ে আমি যে রঙ্কিণীর সেবাদাসী, বনের বাঘ সিংহ কাড়া আমার নাগর—তুই আমাকে ছুঁলে তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে—বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার বুদ্ধি কে দিলেক তোকে?"

ঝামরি হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার পর সে হঠাৎ কাছিমটা মাটিতে নামাইয়া দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিল কাহাকে। নীলু রায় দেখিলেন একটা গাছের মগডালে একটা বাদামী রঙের গ্যাট্রাগোট্টা পাখি বসিয়া রহিয়াছে। ল্যাজে বাদামী রঙের চওড়া ডোরা। দেখিলেই হিংস্র বলিয়া মনে হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি পাখি ওটা?"

"সাপমার বাজ। সাপ খায়। রঙ্কিণীও সাপের শত্রু। মনে হয় রঙ্কিণীর সঙ্গে ওর পীরিত আছে। তাই ওকে দেখলেই গড় করি। আরে এই ফাঁকে, কাছিমটো পালাবার তালে আছে—"

কাছিমটা সত্যই কিছুদূর চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার গায়ে দড়ি বাঁধা ছিল, ঝামরি আবার তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর গাছের একটা ডাল ভাঙিয়া শপাশপ মারিতে লাগিল তাহাকে।

"পালাছেন। তোর ভাগ্যি কত যে রঙ্কিণীর ভোগে লাগবি তুই।"

নীলু রায় এই পাগলীর নিকট বেশীক্ষণ আর দাঁড়াইলেন না। আগাইয়া গেলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন জগদ্ধাত্রী তাঁহার অপেক্ষায় চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, "এত ভোরে কোথা গিয়েছিলেন ঠাকুরপো?"

"এই একটু বেড়িয়ে এলাম।"

"আমি খাবার নিয়ে কতক্ষণ থেকে বসে আছি। ওরে রুলা দুধটা আবার গরম কর। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আসুন ভিতরে আসুন—"

।। সাত।।

এইবার মীর মহম্মদের খোঁজ লওয়া যাক।

এই মীর মহম্মদই জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়া মুগ্ধ এবং প্রলুব্ধ হইয়াছিল। এই মীর মহম্মদই জগদ্ধাত্রীর পিতৃগৃহে বারবার যাতায়াত শুরু করিয়াছিল বলিয়া জগদ্ধাত্রীর পিতা রামলোচন একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া সিংভূমের জঙ্গলে আসিয়া জন সাহেবের আশ্রয়প্রার্থী হন। এই মীর মহম্মদের সঙ্গে নীলু রায়েরও আলাপ ছিল, কারণ নীলু রায় সকলের সহিতই, বিশেষ করিয়া নবাবের কর্মচারীদের সহিত হৃদ্যতা রক্ষা করা পছন্দ করিতেন। তাঁহার মনে হইত নিজের এবং ধূর্জটির বিষয়আশয় তাঁহাকে বক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, রাজকর্মচারীদেব সহিত ভাব করিয়া রাখাই ভালো। ধূর্জটিমঙ্গলের সহিত মীর মহম্মদের আলাপ ছিল না, তাহাকে তিনি চিনিতেনও না। মীর মহম্মদ খবর লইবারও প্রয়োজন বোধ করেন নাই যে তাঁহার হৃদয়হারিণীর কোনও স্বামী আছে কিনা। রামলোচন যখন জগদ্ধাত্রীকে লইয়া পলায়ন করিযাছিলেন তখন মীর মহম্মদের মাথাতেও বজ্র পড়িয়াছিল। সিরাজ জানিতে পারিয়াছিলেন যে মীর মহম্মদের সহিত ইংরেজ বণিকদের দহরম মহরম আছে। সেই সময় ঢাকায় ঘসেটি বেগমের আশ্রয় না পাইলে মীর মহম্মদ মহা বিপদে পড়িতেন। ইংরেজেবই অনুরোধে ঘসেটি বেগমের দক্ষিণ হস্ত রাজা রাজবল্লভ মীর মহম্মদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বেশীদিন এ সৌভাগ্য রহিল না। কিছুদিন পরেই ঘসেটি বেগম মুর্শিদাবাদে আসিয়া মতিঝিলে বসবাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় মীর মহম্মদকেও মুর্শিদাবাদ আসিতে হইল। আসিবামাত্র তিনি কয়েদ হইলেন। ইংরেজদের 'দস্তুক' লইয়া তিনি ব্যবসায় করিতেন এ কথা কাজী সাহেবের নিকট প্রমাণিত হইয়া গেল। মীর মহম্মদ প্রেমিক লোক। রূপসী রমণী দেখিলেই তিনি প্রেমে পড়িয়া যাইতেন। কারাগারে বিগত জীবনের প্রেমাস্পদাদের স্মৃতিচারণই তাঁহার অবসর বিনোদনের একমাত্র উপায় ছিল। যাহাদের তিনি ভোগ করিয়াছিলেন তাহাদের মুখ তাঁহার মনে তেমন একটা জাগিত না, কিন্তু যাহাদের তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই, যাহাবা আলেয়ার মতো তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিযা অন্ধকারে আবার মিলাইয়া গিয়াছে তাহাদের কথাই বারবার মনে পড়িত তাঁহার। বিশেষ করিয়া মনে পড়িত নাচওয়ালী ফৈজু বাঈয়ের মুখটা। তাহাকে মীর মহম্মদই আবিষ্কার করিয়াছিল দিল্লীতে। কিন্তু তাহাকে গ্রাস করিলেন সিরাজ। দুই লক্ষ টাকা দিয়া তাহাকে কিনিয়া লইলেন। কিন্তু অমন রূপসী বাঈজী কি রূপার শিকলে চিরকাল বাঁধা থাকিতে পারে? কিছুদিন করেই সিরাজের এক আত্মীয়ের সহিতই ফৈজু ধরা পড়িল। সিরাজ তাহাকে যে শাস্তি দিলেন তাহা ভয়ানক। তিনি একটা শূন্য কক্ষে ফৈজুকে পুরিয়া তাহার জানালা দরজা বন্ধ করিয়া চারিদিকে ইঁট আর পাথর দিয়া গাঁথিয়া দিলেন। ফৈজুর জীবন্ত সমাধি হইয়া গেল! ফৈজুর মুখখানা মীর মহম্মদের মনে বারবার ভাসিয়া উঠিত। আর ভাসিয়া উঠিত জগদ্ধাত্রীর মুখটা। সে তো মরে নাই—সে নিশ্চয়ই কোথাও বাঁচিয়া আছে। খোঁজ করিলেই আবার হয়তো তাহার নাগাল পাইতে পারিত। রামলোচনকে চাপ দিলেই কাজ হইত এবং সে চাপ তিনি মনসবদার সাহেবকে দিয়াই দেওয়াইতে পারিতেন। কিন্তু সিরাজের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া কারাগারে আসিতে হইল, সমস্ত বরবাদ হইয়া গেল। এখন চিন্তাতেই সুখ, সিরাজের কারাগারে তাঁহার মনকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু একদিন

অপ্রত্যাশিতভাবে বিধি প্রসন্ন হইলেন। নিরাশার অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোর রেখা দেখা গেল। বন্দী হইয়া জন সাহেব রোমনী, শাওনী এবং তির্কিকে লইয়া ঠিক তাঁহার পাশের ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেয়ে তিনটি কালো, কিন্তু যৌবনরসে পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্যবতী, হাসিখুশি। আনন্দের ফোয়ারা যেন তিনটি। শুধু মীর মহম্মদই নয়, স্বয়ং কারাধ্যক্ষ পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কারাধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত মীর মহম্মদের আলাপ ছিল। তিনি যদি ভীতু লোক না হইতেন তাহা হইলে মীর মহম্মদকে হয়তো ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার ভয় ছিল মীর মহম্মদকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহার চাকরি তো যাইবেই, গর্দানও যাইতে পারে। খামখেয়ালী সিরাজের অসাধ্য কাজ কিছুই নাই। কিন্তু তিনি মীর মহম্মদকে একটি পরামর্শ দিলেন। মীরজাফরের পাষণ্ড পুত্র এবং সিরাজের শত্রু মীরণের সহিত এককালে মীর মহম্মদের না কি পরিচয় ছিল। কারাধ্যক্ষ বলিলেন, এই পরিচয় সূত্র ধরিয়া আপনি মীরণকে অনুনয়-বিনয় করিয়া একটি পত্র লিখুন যাহাতে তিনি আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। মীরণ চেষ্টা করিলেই মীরজাফরকে দিয়া অনায়াসে আপনার খালাসের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। তুর্কি খাঁ তখন বাধা দিতে পারিবেন না। আপনি ফৌজে চাকুরি করিতেন, মীরজাফরই এখন সেনাপতি। তাঁহার হুকুম-নামা পাইলেই আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিব। সেকালে বিনা অর্থে কোন কিছু হইবার উপায় ছিল না। কারাধ্যক্ষ বলিলেন—আপনি এক হাজার এক আসরফি যোগাড় করুন। আমি আপনার পত্রের সহিত মীরণ সাহেবকে ওই আসরফিগুলি পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিব। মনে হয় ইহাতে কাজ হইবে। কিন্তু কারাগারে বসিয়া এক হাজার এক আসরফি যোগাড় করিতে তাঁহাকে বিলম্ব হইল না। তিনি তাঁহার অন্দরমহলে খবর পাঠাইলেন। তাঁহার অনেকগুলি বিবি ছিল, তাহারাই নিজ নিজ 'জেবর' (গহনা) বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া অর্থটা সংগ্রহ করিলেন। যে ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে অপহরণ করিয়া তিনি হারেমে পুরিয়াছিলেন সে-ই না কি সর্বাপেক্ষা বেশী দিয়াছিল। তিনি তাহার নামে যে গল্পটা বানাইয়া ধূর্জটিমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন, তাহা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি পতিব্রতা রমণী, গুণ্ডা লাগাইয়া স্বামীকে খুন করিবেন ইহা তাঁহার কল্পনাতীত। গুপ্তচরদের ভয়ে নয়, অন্য কারণে মীর মহম্মদ সিংভূমের জঙ্গলে ঢুকিয়াছিলেন। জন সাহেব তাঁহার সঙ্গিনী তিনজনকে লইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি রোমনি, শাওনী ও তির্কি কারাধ্যক্ষ এবং মীর মহম্মদকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ইহাদেরই সহায়তায় জন সাহেবের সহিত মীর মহম্মদের যোগাযোগ ঘটিল। অবশ্য বে-আইনিভাবে। যেখানে তিন তিনটি প্রস্ফুটিত যৌবনা রমণী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সেখানে পুরুষ আইন রক্ষক কতক্ষণ আইনের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন? পারিলেন না। জন সাহেবের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে সহসা জন সাহেবের নিকট মীর মহম্মদ জানিতে পারিলেন যে কমলপুরের রামলোচনের কন্যা 'জাগট্রিকে' তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। কথাটা বলিয়াই জন সাহেব বুঝিতে পারিলেন ভুল করিয়াছেন। মুসলমানদের ভয়েই তো জর্জেটি জাগট্রিকে তাঁহার আশ্রয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সে খবরটা তিনি একজন মুসলমানকে বলিতে গেলেন কেন। খবরটা শুনিবামাত্র মীর মহম্মদ সাগ্রহে বলিলেন—"তাই না কি। রামলোচনের মেয়ে আপনার আশ্রয়ে আছে? রামলোচন যে আমার বন্ধু। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গেও আমার ভাব হয়েছিল। যদি ছাড়া পাই তার সঙ্গে দেখা করে আসব। কোন কোন পথ দিয়ে আপনার মুলুক পৌছতে হয় তা আমাকে

বলুন না।" জন সাহেব বলিলেন, "মুখে বললে আপনি কি যেতে পারবেন না। আমার সঙ্গে যে মেয়েগুলি আছে তাদের সঙ্গে যদি যান তাহলে তারা দেখিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে। আর আমাকে যদি কয়েদ থেকে খালাস করতে পাবেন তাহলে তো আমিই সব ব্যবস্থা করব।" মীর মহম্মদ বলিলেন—"বেশ বেশ, আমি সে চেষ্টা করব।" মীরণ সাহেবকে টাকা খাওয়াইয়া ফল হইয়াছিল। মীরজাফরের আদেশে মীর মহম্মদ মুক্তিলাভ করিযাছিলেন। জন সাহেব সাহেব বলিয়া মুক্তি পান নাই। মীর মহম্মদ মীরণকে কুর্নিশ করিয়া নিবেদন করিলেন—খোদাবন্দ অন্ততঃপক্ষে ওই তিনটি সিংভূমী আওরতকে যদি ছাড়িয়া দেন ভালো হয়। সিংভূম হইতে আপনার জন্য একটি খুপসুরৎ হিন্দু বিবি আনিয়া দিব মনস্থ করিয়াছি, সে বিবি যেখানে আছে তাহার ঠিকানা উহারা জানে। উহাদেব ছাড়িযা দিলে আমাকে উহারা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে বলিয়াছে। বিবিটি অপরূপ, ফৈজু নাচওয়ালীর চেয়েও দেখিতে ভালো। পবিত্র হিন্দুবংশেব মেয়ে বলিয়া তাহার একটা খুশবাই আছে। মীবণ পাষণ্ড ছিলেন, কিন্তু বেরসিক ছিলেন না। তিনি বুঝিলেন বেতমিজটা ওই মেয়ে তিনটিব প্রতি আসক্ত হইয়াছে। তাহাদেরও ছাড়িয়া দিবাব ব্যবস্থা করিলেন তিনি। রোমনী জন সাহেবকে ছাড়িয়া গেল না। পথপ্রদর্শক হইয়া শাওনী ও তির্কি মীর মহম্মদের সঙ্গী হইল। যাত্রা করিবাব পূর্বে জন সাহেবের সঙ্গে শাওনী ও তির্কির গোপন পরামর্শ হইয়াছিল একটা। জন সাহেব তাহাদের একটি আঙটি দিয়া বিশেষ করিয়া দুইটি নাম মনে কবিযা রাখিতে বলিয়াছিলেন ধুমসা আর টংটা। দুইজনেই গভীর অরণ্যনিবাসী। মীর মহম্মদ শাওনী ও তির্কিকে লইয়া কিছুদূর অশ্বারোহণে গিয়াছিলেন। কিন্তু সিংভূমের জঙ্গল আরম্ভ হইতেই শাওনী এবং তির্কি বলিল—"আর ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া যাইবে না। এবার জঙ্গলের পথে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। এখন ঘোড়া তিনটিকে বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করাই বুদ্ধিমানেব কাজ।" মীর মহম্মদ তাহাই করিলেন এবং তাহাদের সহিত হাঁটিয়া যাইতে লাগিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করা তাঁহার তেমন অভ্যাস ছিল না। পাহাড়ে ওঠা নামা বিস্তর, তাছাড়া জঙ্গলের পথও ক্রমশ দুর্গম হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু মীর মহম্মদের অন্তরে জগদ্ধাত্রীর মুখখানা ভাসিয়া উঠিতেছিল, যে বহ্নি এতদিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল তাহা ক্রমশ শিখাময়ী হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। পদব্রজেই তিনি পাহাড়ের চড়াই ওতরাই ভাঙিয়া প্রস্তরাকীর্ণ অরণ্যপথে ক্ষতবিক্ষত চরণ হইতে লাগিলেন। প্রেমের জন্য এতদ্দেশের অনেক কষ্ট অনেকে ভোগ করিয়াছেন শুনিয়াছি। কিন্তু মীব মহম্মদকে যাহা দুর্নিবার টানে টানিতেছিল তাহা প্রেম নয় রিরংসা। কিন্তু তিনি সুখী মানুষ, ঘোড়ায তাঞ্জামে চড়িয়া ভ্রমণ করাই তাঁহার অভ্যাস, তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছিল। মাঝে মাঝে তিনি পথে বসিয়া পড়িতেছিলেন। শাওনী আর তির্কির কিন্তু শ্রান্তি নাই। তাহারা বন্য হরিণীব মতো ক্ষিপ্র চপলগতিতে হাসিতে হাসিতে গান গাহিতে গাহিতে কিছুদূর আগাইয়া যাইতেছিল, মীর মহম্মদ বসিয়া পড়িলে আবার ফিরিয়া আসিতেছিল, ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতব জঙ্গলে প্রবেশ করিতেছিল তাহারা। অবশেষে ঠিক হইয়াছিল একদিন বিশ্রাম করিয়া একদিন পথ চলিবেন মীর মহম্মদ। এ দুরূহ পথে একটানা হাঁটা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, মাঝে মাঝে বিশ্রাম কবিতেছিলেন তিনি।

এইরূপ একটি বিশ্রামস্থানে পর্বতগুহায় তাঁহার সহিত ধূর্জটিমঙ্গলেব যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাঠক-পাঠিকা ইতিপূর্বেই পাঠ করিয়াছেন।

....বন ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। শাল, পিয়াল, শিশু, শিমুল, দেবদারু, শিরিষ—বহু রকম গাছ। মহুয়া গাছও প্রচুর। মাঝে মাঝে গাছগুলি এত ঘন এবং তাহাদের ঘিরিয়া বন্য লতাসমূহের এমন ঘনবিতান যে দিনের বেলাতেও পথ দেখা যায় না। একটা অস্পষ্ট সরু পায়ে চলার পথ আছে কিন্তু মীর মহম্মদ তাহা ঠিক মতো অনুসরণ করিতে পারিতেছিলেন না। মাঝে মাঝে বন্য জন্তুর চীৎকার শোনা যাইতেছিল, হরিণ খরগোশ তাহাদের সাড়া পাইয়া গহন বনে আত্মগোপন করিতেছিল, তীক্ষ্ণকণ্ঠ পক্ষীর চীৎকার বন্য স্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করিয়া আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছিল মীর মহম্মদকে। শাওনী ও তির্কি তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। সত্যই তিনি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশাল মহীরুহ পরিবৃত রৌদ্রকরশূন্য, লতাআচ্ছাদিত বনস্থলীকে বিরাট রহস্যময় একটা প্রেতপুরী বলিয়া মনে হইতেছিল। বড়ই আতঙ্কিত হইয়াছিলেন তিনি। যদিও খুব পরিশ্রান্ত, তবু এখানে বিশ্রাম করিবার সাহস হইতেছিল না তাঁহার। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। হঠাৎ শাওনী ও তির্কি তাঁহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে গিয়া আত্মগোপন করিল। ক্ষণপরেই তিনি দেখিলেন বিরাট একটা ভালুক হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

"আর চলতে পারছি না আমি খুসবু।"

"তাহলে ওই ছোট গাছটায় ওঠ। আমরাও আর একটা গাছে উঠি।"

"বড় ক্ষিধে পেয়েছে।"

"কলা খাও।"

দুইজনেই কোঁচড়ে করিয়া অনেক পাকা কলা আনিয়াছিল। একটি ছোট গাছে মীর মহম্মদকে তাহারা উঠাইয়া দিল। পাশের গাছটিতে তাহারাও চড়িল।

এইভাবেই পথ চলিতে লাগিল তাহারা।

সাতদিন এইভাবে চলিবার পর সহসা তাহারা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া একটা খোলা-মেলা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জায়গাটা পর্বতের একটা সানুদেশ। ঠিক তাহার নীচেই প্রকাণ্ড একটা লম্বা গভীর গর্ত, চওড়াও কম নয়। পাহাড়ী নদীর শুষ্ক খাত। বর্ষার সময় এই খাত দিয়া প্রবল বেগে জলধারা প্রবাহিত হয়। এখন শুষ্ক। খাতের ওপারেও অনেকখানি জায়গা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রকাণ্ড আটচালার মতো একটা বাড়িও রহিয়াছে। বাহিরে কয়েকটা হরিণের চামড়া শুকাইতেছে।

তির্কি বলিল—"এবার আমরা এস্যা গিছি।"

শাওনী বলিল—"এ খাতটা কিন্তু পার হতে হবেক।"

খাদের দিকে চাহিয়া মীর মহম্মদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। বলিলেন—"ও খাত আমি পার হতে পারব না—"

"আচ্ছা আমরা লোক আনাচ্ছি তাহলে—"

তরতর করিয়া তাহারা দুইজন খাতের মধ্যে নামিয়া গেল। মীর মহম্মদ বসিয়া রহিলেন। দেখিলেন দূরে আরও গভীর জঙ্গল। বড় বড় গগনস্পর্শী গাছ ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিতে পাইলেন—ওই জঙ্গলের ধারে প্রকাণ্ড আর একটা ঘর রহিয়াছে। ঘরের দেওয়াল ছাদ সব বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়া তৈরী। প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু দেওয়াল। দেওয়াল

বাহিয়া অনেক বন্য লতা উঠিয়াছে। মীর মহম্মদ ভাবিতে লাগিলেন—ইহাই কি জন সাহেবের আস্তানা? এইখানেই কি জগদ্ধাত্রী আছে? আকুল উৎসুক নয়নে তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এ স্থানটা জন সাহেবেরই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে এই আস্তানার হর্তাকর্তাবিধাতা ধুম্‌সা এবং টণ্টা। তাহারা এইখানে বাস করিয়া বন্য পশুপক্ষী ধরে, কখনও তাহাদের মারিয়া চামড়া ছাড়াইয়া লয়, কখনও বা জীবন্ত অবস্থায় তাহাদের খাঁচায় পুরিয়া রাখে। উদ্দেশ্য—বিদেশে চালান দিয়া অর্থোপার্জন করা। ধুমসা এবং টণ্টা দুইজনেই ভীষণাকৃতি, দুইজনেই শালপ্রাংশুমহাভুজ ব্যূঢ়োরস্ক তালজঙ্ঘা গজস্কন্ধ দানব। দুইজনেরই মুখে প্রচুর শ্মশ্রুগুম্ফ মাথায় জটা, দুইজনেরই হাতে বড় বড় নখ, দুইজনেরই চোখে তীক্ষ্ণ ধূর্ত দৃষ্টি, দুইজনেই বৃকোদর, দুইজনেরই সর্বাঙ্গে বহু ক্ষত চিহ্ন। টণ্টার নাকের খানিকটা নাই, বৃহৎ একটা ভালুকের সহিত মল্লযুদ্ধ করিবার সময় ভালুক নাকে থাবা মারিয়াছিল। ইহারা সাধারণতঃ ফাঁদ পাতিয়া বন্য পশুপক্ষী ধরে, প্রয়োজন হইলে সম্মুখ যুদ্ধেও পশ্চাৎপদ হয় না। ধুম্‌সা সম্মুখ যুদ্ধে গদাঘাতে যে বাইসনটাকে মারিয়াছিল তাহার মুণ্ডটা সে বিক্রয় করে নাই, রাখিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে সেটাকে নমস্কার করে আর বলে— হুঁ, বীর ছিলে তুমি। তোমাকে গড় করি। ইহাদের দুইজনের ভাষাও খিচুড়ি ভাষা। আদিবাসী রমণীর গর্ভে এবং বিদেশী জলদস্যুদের ঔরসে দুইজনেরই জন্ম। পূর্বে ইহারাও ডাকাতি করিত। আদিবাসীদের ভাষা, বাংলা ভাষা, উড়িয়া ভাষা, ইংরিজির বুক্‌নি, ওলন্দাজ পর্তুগীজদের ভাষায় টুকরো সব মিলাইয়া ইহাদের ভাষা। ইহারা ডাকাত ছিল। জন সাহেব ইহাদের চাকরি দিয়াছেন। ইহাদের সব ভার বহন করেন, সব আবদার সহ্য করেন, এই অঞ্চলটার মালিকই করিয়া দিয়াছেন ইহাদের। ইহারা কেবল তাঁহাকে পশু ধরিয়া দেয়, কিংবা পশু মারিয়া, পাখি মারিয়া তাহাদের চামড়া ছাড়াইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেয়। পশু এবং পক্ষীর চর্ম বিক্রয় জন সাহেবের লাভজনক ব্যবসায়। ধুম্‌সা এবং টণ্টা জন সাহেবকে দেবতার মতো ভক্তি করে। জন সাহেব শাওনীকে তাঁহার আঙটিটা খুলিয়া দিয়াছিলেন। এই আঙটিই তাঁহার ফরমান। এইরূপ আঙটি তাঁহার অনেক আছে। যখনই যেখানে দূত পাঠান এবং যেখানে দূতের হাতে চিঠি পাঠানো সম্ভব নয়, সেখানে তিনি এই আঙটি পাঠান। আঙটিতে বিশেষত্ব তেমন নাই। লোহার আঙটি, তাহার সহিত একটা লোহার মোহরও যুক্ত। মোহরের উপর একটি ক্রশ চিহ্ন। ক্রশের লম্বা দাঁড়িটা ইংরেজি J অক্ষর। এই আঙটি যে নীরব বার্তা বহন করে সে বার্তাটি এই—আঙটির বাহক বা বাহিকা আমার বিশ্বাসভাজন। তুমিও ইহাকে বিশ্বাস করিও এবং এ যাহা বলে তদনুসারে কাজ করিও।

শাওনী বলিল—"খালের উ পারে লোকটি বসে আছে সে সাহেবের স্যাঙাতের পরিবারের সঙ্গে পীরিত করতে চায়। আমরা উয়াকে ভুলিয়ে এখানে লিয়ে এসেছি তুদের কাছে। তুরা উয়ার ব্যবস্থা কর।"

ধুম্‌সা গর্জন করিয়া উঠিল—"লিশ্চয় করব। ফট্।"

প্রতি কথার শেষে 'ফট্' উচ্চারণ করা ধুম্‌সার একটা মুদ্রাদোষ।

তির্কি বলিল—"সায়েব বলেছে উয়াকে নিকাশ করে দাও একেবারে। আপদ চুকিয়ে দাও।"

টণ্টা বলিল—"তাই দেব। একটা আছাড় মারলেই দফা শেষ হয়ে যাবে বাছাধনের—"

ধুম্‌সা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল—"লাগরকে আছাড় মারবি কি রে? ফট্। লাগরকে লাগরীর কাছে পাঠাতে হবেক। ফট্।"

তির্কি শাওনী দুইজনেই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

"এখানে লাগরী কোথা পাবি তুরা?"

"কাল একটা বাঘিনী ধরেছি। ওই ঘরটায় আটকানো আছে। তারই মুখে ফেলে দিব উকে। ফট্।"

মীর মহম্মদ দূর হইতে কাঠের গুঁড়িনির্মিত যে ঘরটা দেখিতে পাইয়াছিলেন ধুম্‌সা হাত তুলিয়া সেই ঘরটা দেখাইল তির্কিকে।

"উটাকে এখানে আনা করা তাহলে। উ বলছে খাল পেরাতে লারবেক।"

"এখনি আনা করাচ্ছি। ফট্। তালতা, ও তালতা—শুনে যা—"

ঘরের পিছন হইতে দীর্ঘ বলিষ্ঠ এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল।

"তাল্‌তো তুই মুর্গাকে নিয়ে খালের ওপারে যা। ফট্। সেখানে একটা লোক আছে। তাকে বেঁধে টানতে টানতে লিয়ে আয় এখানে। ফট্। মজবুত কাতা দড়ি নিয়ে যা—"

তালতা ও মুর্গা চলিয়া গেল।

শাওনী বলিল—"সাহেব কয়েদ হয়ে আছে মুক্‌সুদাবাদে। আমরা সেখানেই ফিরে যাই এবার। সাহেবকে কয়েদ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবেক। চল রে তির্কি—"

"আজ আর গিয়ে কাজ নাই। ফট্। কাল যাবি—"

ধুম্‌সা হঠাৎ শাওনীকে দুই হাত দিয়া শূন্যে তুলিয়া ধরিল। শাওনী খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "নামায়ে দাও, নামায়ে দাও, এসব কি কাণ্ড তোমার!"

"আচ্ছা তাহলে আমার কাঁধের উপর বস্। তোকে কাঁধে করে নাচি একটু। ফট্। বেশ ডাগর মেয়ে বটিস তুই। ফট্—"

ধুম্‌সা শাওনীকে কাঁধে করিয়া নাচিতে লাগিল।

টণ্টা তির্কিকে ধরিতে গেল। তির্কি ধরা দিল না, ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু টণ্টার সহিত পারা শক্ত। অবশেষে সেও ধরা পড়িয়া গেল।

তালতা আর মুর্গা খাল পার হইয়া দেখিল কেহ নাই। মীর মহম্মদ অন্তর্ধান করিয়াছেন।

শাওনী ও তির্কি চলিয়া যাইবার পর মীর মহম্মদের অন্তর্যামীই সম্ভবত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন গতিক সুবিধার নহে, অবিলম্বে সরিয়া পড়। এরকম নির্জন গভীর অরণ্যে রামলোচনের কন্যা বাস করিতেছেন একথা বিশ্বাস করা শক্ত। তাহার পর তিনি এপারে বসিয়াই ধূম্‌সা ও টণ্টাকে দেখিতে পাইলেন। মানুষ নয় যেন পাহাড়। তিনি আর কালবিলম্ব করিলেন না। পুনরায় অরণ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রান্ত ছিলেন বলিয়া ছুটিতে পারিলেন না, কিন্তু যতটা সম্ভব দ্রুতবেগেই গেলেন তিনি। তালতা ও মুর্গা আসিবার পূর্বেই তিনি অরণ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। জগদ্ধাত্রীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা মনে যে লালসা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, এই দুর্গম পথে চলিতে চলিতে তাহাও যেন অনেকটা নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে একটি রমণীর জন্য এতটা পরিশ্রম করা পণ্ডশ্রম মাত্র। শেষ পর্যন্ত

তাহাকে পাইবেন কিনা তাহারও স্থিরতা নাই। তাছাড়া ধূর্জটিমঙ্গলকে দেখিবার পর হইতে তাঁহার মনে আর একটা কাণ্ড ঘটিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন যে লোকটা এত ভদ্র, যে লোকটা এত ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী, যাহার সঙ্গে অশ্বারোহী সেনাদল রক্ষীস্বরূপ মোতায়েন থাকে—সেরূপ লোকের সহিত শত্রুতা করিয়া লাভ কি। বন্ধুত্ব করিলেই বরং লাভ বেশী। যিনি অযাচিতভাবে তাঁহাকে পঞ্চাশ আসরফি দিয়া যাইতে পারেন তিনি শুধু ধনী নন, উদারও। ইঁহার পত্নীকে নষ্ট করিবার চেষ্টা খুবই অন্যায়। ইঁহার শত্রুতা কাম্য নয়, বন্ধুত্বই কাম্য। এসব কথা তাঁহার আগে হইতেই মনে হইতেছিল। এখানে আসিয়া এবং ওই দুটি মনুষ্যপর্বতকে দেখিয়া তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন পলাইতে হইবে। মুর্শিদাবাদেই ফিরিতে হইবে আবার। সম্ভব হইলে ধূর্জটিমঙ্গলকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইবে।

।। আট।।

ধূর্জটিমঙ্গল নির্বিঘ্নেই মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলেন। দেখিলেন মুর্শিদাবাদের সকলেই বেশ চঞ্চল। কিছুদিন আগেই ইংরেজরা নাকি হুগলি আক্রমণ করিয়া শহরটিকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। অনেক বাড়ি পুড়িয়াছে, অনেক প্রাচীন কীর্তি ধ্বংস হইয়াছে, বহুলোকের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, বণিকবেশী ইংরেজ দস্যুরা হুগলিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। নররূপী পশু গোরাদের হস্তে পুরস্ত্রীরাও লাঞ্ছিত হইয়াছেন। আপামরভদ্র সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকে মুর্শিদাবাদে পলাইয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা তাহা পারেন নাই তাঁহারা অনেকে হুগলি ছাড়িয়া দুর্গম পল্লীগ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। ধূর্জটিমঙ্গলের পিতৃবন্ধু পাণ্ডবপ্রধান খান মহাশয়ের মুর্শিদাবাদে বাড়ি ছিল। তিনি যদিও ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত কিন্তু আলীবর্দী খাঁর অনুগ্রহভাজন ছিলেন বলিয়া খান উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন! ধূর্জটিমঙ্গল মুর্শিদাবাদে আসিলে তাঁহার বাড়িতে ওঠেন। এবারও উঠিয়াছেন। খান মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। বয়স সত্তর পার হইয়াছে। মাথায় একমাথা পাকা বাবরি চুল। শৌখিন গোঁফ দাড়িও পাকা। এ বয়সে লোকে সাধারণত ধর্মচর্চা করেন, কিন্তু খান মহাশয়ের ধর্মে মতি নাই, মতি রাজনীতিতে। তিনি ধূর্জটিমঙ্গলকে বলিলেন, "দেখ ধূজু, তুমি এসময় এসেছ, বড় ভালো হয়েছে। আমি অকূলপাথারে পড়ে গেছি ; মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা হয় এ দেশ ত্যাগ করে জঙ্গলমহলে চলে যাই। এখানে ভদ্রলোকেরা আর ভদ্রস্থ নেই। তুমি শুনলাম সিংভূমে পরিবারকে নিয়ে গেছ, খুব উত্তম কাজ করেছ। আমাকেও নিয়ে চল সেখানে। যাবে?"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"যাব। কিন্তু আপনি কি সেই জংলী দেশে থাকতে পারবেন?"

"পারা উচিত। কিন্তু পারব না। মুশকিল হয়েছে কি জান? ঘুগনি খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে, সেখানে ঘুগনি তো পাওয়া যাবে না।"

"ঘুগনি? তা যাবে না কেন?"

"আই দেখ, তুমি কি বুঝতে কি বুঝলে। ছোলার ঘুগনি নয়, খবরের ঘুগনি। নবাব পক্ষের খবর, নবাবের আমীরওমরাহদের খবর, ইংরেজদের খবর, ফরাসীদের খবর, এইসব পাঁচরকম

খবর মিলিয়ে যে ঘুগনি-খবর তৈরী হয় তা তো জংলী দেশে পাওয়া যাবে না। ওই ঘুগনি খাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আমি আপিং খাই। কিন্তু ওই খবরের ঘুগনি না হলে আপিঙের মৌতাতও জমে না। কি করি বল তো। অথচ এদিকে ভয়ে প্রাণ ধুকপুক করছে কখন কি হয়!"

"আপনার ছেলেরা কোথায়?"

"তাদের কেউ নবাব পক্ষে, কেউ ইংরেজ ওয়াটসের মোকামে, কেউ মীরজাফরের মোসাহেবদের দলে, মোহনলালের বাড়িতেও যাতায়াত করছে একজন। ওরাই ঘুগনির মালমসলা যোগাড় করে আনে। ঘুগনি মজাদার, কিন্তু ধুকপুকুনি যায় না। ছিলাম পাণ্ডব দেবশর্মা, হয়েছি পাণ্ডব খাঁ। অদৃষ্টে আরও কি আছে জানি না!"

ধূর্জটিমঙ্গল সসম্ভ্রমে বলিলেন—"ভয় করবেন না। আমি আপনার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করব। আমার সঙ্গে কিছু সিপাহী সান্ত্রী আছে! তারা—"

"আই দেখ, তুমি কি বুঝতে কি বুঝলে। সিপাই সান্ত্রী আমারও আছে। কিন্তু আপৎকালে কেউ থাকবে না, সবাই চোঁ চোঁ দৌড় দেবে। আমিও যাতে দৌড় দিতে পারি তার একটা ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। আমার ঘোড়াটা মারা গেছে, খুব ভালো ঘোড়া ছিল, একটানা বিশক্রোশ ছুটতে পারত। আমার ছেলেদের বারবার বলছি, আমাকে একটা ভালো ঘোড়া কিনে দাও, বেগতিক দেখলে তার পিঠে চড়ে চম্পট দেব। কিন্তু ওরা গড়িমসি করছে, কিনে দিচ্ছে না। ভালো ঘোড়া পাওয়াও শক্ত, এ অঞ্চলে কাছাকাছি যত ভালো ঘোড়া ছিল নবাবের ফৌজ নিয়ে নিয়েছে সব—"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি আজই একটা ভালো ঘোড়া আপনাকে দেব। আমার সঙ্গে খুব ভালো একটা ঘোড়া আছে—"

"তোমার কথা শুনে ভরসা পেলাম বাবা। মহেশের ছেলে তুমি, তুমি তো একথা বলবেই। মহেশ দিকপাল ছিল একটা।"

পাণ্ডব খাঁ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। মহেশমঙ্গলের স্মৃতিই বোধহয় তাঁহাকে নির্বাক করিয়া রাখিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তাহার পর তিনি প্রশ্ন করিলেন—"এই হট্টগোলের সময় তুমি এসে পড়লে কেন?"

"আমি একটু বিশেষ বৈষয়িক কাজে এসেছি—"

"কলকাতায় তোমাদের সম্পত্তি ছিল। কলকাতা তো পুড়ে গেছে শুনেছি। তোমাদের বাড়িও পুড়েছে নিশ্চয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"নবাব সাহেব শুনছি ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন একটা। তাতে একটা শর্ত নাকি আছে যে তাঁর সৈন্যরা যে সব বাড়িঘর কলকাতায় পুড়িয়েছে তার খেসারত দেবেন তিনি। খাজাঞ্চি বিভাগের আলাউদ্দিন মিঞাকে একটু তোয়াজ কর গিয়ে। মবলগ কিছু পেয়ে যাবে। তোয়াজ মানে বুঝেছ তো? এই—"

তর্জনি ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে তিনি টাকা বাজাইবার মুদ্রাটি প্রদর্শন করিলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলিলেন না।

বলিলেন—"আমি একটু বেরুচ্ছি। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব।"

"খাওয়াদাওয়া করেছ তো?"

"করেছি। মা আমাকে অনেক খাইয়ে দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ। বুড়ীর তো আর কোন কাজ নেই। লোক পেলেই ধরে ধরে খাইয়ে দেয়।"

"আমি চললাম তাহলে—"

যাইবার পূর্বে ধূর্জটিমঙ্গল হেঁট হইয়া প্রণাম করিলেন তাঁহাকে।

"জয়োস্তু। তুমি আলাউদ্দিনকে আমার নাম করে বোলো তাহলে ঠিক ব্যবস্থা করে দেবে। আমার সঙ্গে খাতির আছে ওর।"

ধূর্জটিমঙ্গল আলাউদ্দিনের কাছে গেলেন না, গেলেন মৈনি বিবির কাছে। আসিয়াই তাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন তিনি। চিঠিগুলিও দিয়া আসিয়াছিলেন। মৈনির আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও কিন্তু তাহার বাড়িতে তিনি থাকিতে সম্মত হন নাই। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল মৈনি। বলিয়াছিল—"এ বাড়ি তো আপনার। আপনি কিন্তু একদিনও এখানে থাকেননি।"

মৃদু হাসিয়া ধূর্জটিমঙ্গল উত্তর দিয়াছিলেন—"তুমি তো আছ। ওসব কথা থাক, আমার কাজের কতদূর কি হল?"

"চিঠি সব ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি। কি আছে চিঠিতে?"

"তা বলব না, সেটা গোপনীয়। একটা কথা বল তো—তুমি তো সব জায়গায় ঘোর, হালচাল কি রকম বুঝছ? নবাবের আশপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের ভাবগতিক কি রকম?"

মৈনি জবাব না দিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"যদি বলি ওসব খবরও গোপনীয়, আমিও বলব না?"

"বেশ, তাহলে চললাম। বিভীষণ সিন্দুকীর কাছে গেলেই সব খবর পাব।"

মৈনি বিভীষণ সিন্দুকীর নাম শুনিয়া ভয় পাইয়া গেল। সেকালে এদেশে 'সিন্দুকী' বলিয়া এক প্রকার জীব ছিল। তাহারা নবাব এবং নবাবের সহচরদের খবর সরবরাহ করিত কোন বাড়িতে সুন্দরী নারী আছে, কোন বাড়িতে স্বর্ণপ্রতিমা বা রৌপ্যপ্রতিমা প্রস্তুত হয়। খবর পাইলেই নবাবরা সেগুলি আত্মসাৎ করিতেন। আজকালকার চলিত বাংলায় যাহাদের আমরা 'টিকটিকি' বলি, ইংরেজিতে যাহাদের বলি 'স্পাই' সেকালে সিন্দুকীরা ছিল তাহাদেরই সমগোত্র।

"না, না, আপনি বিভীষণের কাছে যাবেন না। সে জাতে চণ্ডাল, স্বভাবেও চণ্ডাল। টাকা পেলে সে আপনাকে হয়তো কিছু খবর দেবে, কিন্তু আপনি যে এসব খবর সংগ্রহ করছেন এ সংবাদটিও নবাব সরকারে বিক্রয় করবে। তখন বিপদে পড়ে যাবেন। কারণ এসব খবর চালাচালি করা আজকাল বিপজ্জনক।"

"কিন্তু খবরগুলো আমার চাই।"

"আমি তাহলে ইঙ্গিতে বলে দিচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে।"

মৈনির সঙ্গে ধূর্জটিমঙ্গল পাশের ঘরে প্রবেশ কবিলেন। সেখানে মৈনির সবরকম বাদ্যযন্ত্র সাজানো ছিল।

"বসুন।"

ধূর্জটিমঙ্গল একটি আসনে উপবেশন করিলেন।

তখন মৈনি বীণাটা তুলিয়া একবার ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজাইয়া দিল। পরমুহূর্তেই ডুগিতবলায় চাপড় দিয়া বিকট আওয়াজ করিল একটা। সারেঙ্গীতেও অনুরূপ বেসুরা শব্দ বাহির করিল একটা এবং খচমচ করিয়া বাজাইয়া দিল খঞ্জনিটা। তাহার পর কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল সে।

"এর মানে কিছু বুঝলেন?"

"বুঝলাম সব বেসুরো। একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই।"

"এইটেই তো আপনি জানতে চাইছিলেন?"

তাহার চোখের তারা দুইটি তখন হাসিতে লাগিল। মৈনির এই একটি বৈশিষ্ট্য, মুখে যখন হাসির লেশমাত্র নাই, চোখ দুইটি তখন হাসিতে থাকে। মৈনির রং কালো, মুখে বসন্তের দাগ, পরিপূর্ণ যৌবনের প্রাবল্য তাহার অঙ্গে প্রকটিত নয়, মৈনি রোগা। কিন্তু তবু তাহাকে ঘিরিয়া এমন একটা কি যেন আছে যে তাহাকে দেখিলেই ভালো লাগে। তাহার এ রূপ দৈহিক মাংসল রূপ নয়, ইহা তাহার মানসিক উৎকর্ষের সূক্ষ্ম প্রকাশ। হীরক হইতে যেমন আলোক বিচ্ছুরিত হয়, মৈনির মনের লুকানো হীরকটিও তেমনি অপরূপ প্রভায় তাহাকে সর্বদা ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তাহা স্পর্শ করা যায় না, অনুভব করা যায়।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি আরও বিশদ করে জানতে চাই।"

"বিশদ করে বলার একটু বিপদ আছে। প্রকাশ পেলে গর্দান যেতে পারে।"

"প্রকাশ পাবে কেন?"

"পাবে না? বেশ বলছি। থামুন আগে দেখে আসি, কাছে-পিঠে কেউ আছে কিনা। সিঁড়ির দরজাটায় খিল দিয়ে আসি।"

মৈনি বাহিরে গেল। ধূর্জটিমঙ্গল খিল বন্ধ করার শব্দ পাইলেন। একটু পরে সে ফিরিয়া আসিল, তাহার পর আবার কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। —"একটি শর্তে বলতে পারি—আপনি যদি আমাকে শাস্তি দেন তাহলেই বলব—"

"কী অপরাধ করেছ?"

"অপরাধ করেছি। আপনি যে আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারেন একথা একবারের জন্যও আমার মনে হয়েছিল।"

"কিন্তু আমি শাস্তি দেবার কে! শাস্তি দেন কাজী সাহেব। আমি তো কাজী নই।"

"আপনি আমার মালিক।"

"আমি তোমার মালিক নই, তোমার বন্ধু।"

মৈনি হঠাৎ আবদারমাখা সুরে বলিল, "না আপনাকে শাস্তি দিতে হবে।"

ধূর্জটিমঙ্গলের গম্ভীর মুখমণ্ডলে একটা চাপা হাসি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নীরবে তিনি তাঁহার গুম্ফপ্রান্তে তা দিতে লাগিলেন, তাহার পর বলিলেন, "বেশ শাস্তি দেব। কিন্তু আগে নয়, পরে। যা জান আগে সব বল—"

মৈনি বিবির চোখ দুইটি হাসিতে লাগিল।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন,"চেয়ে আছ কেন? বল—"

মৈনি বিবি তবু হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল।

"কি দেখছ?"

"দেখছি নির্বিকার মহাদেবকে।"

"তোমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চেগেছে দেখছি। আমি উঠলাম—"

"না, না বসুন বসুন, বলছি। একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না, সামান্য একটা নবাবকে নিয়ে মহাদেব মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?"

"কেন তা তিনি বলবেন না। তবে এটা জেনে রেখ তাঁর ভাবনার জালে তোমাকেও জড়াতে চান তিনি। তোমার যদি আপত্তি থাকে উঠছি আমি—"

"না, না বসুন—,"

তাহার পর হঠাৎ সে গান গাহিয়া উঠিল

দিলো মে পাওনিয়া আ গয়ী
কৈসে দেখুঁ, কৈসে চলুঁ
মন মে বরখা ছা গয়ী
মন কা বাতেঁ কৈসে বোলুঁ

তাহার পর হঠাৎ গান থামাইয়া বলিল—"এইবার বলছি শুনুন। প্রথমেই বলছি ওরা পাপ, ওদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। কিন্তু আপনি তো আমার কথা শুনবেন না, কোনদিনই আমার কোনও মানা আপনি শোনেননি, কোনও অনুরোধও রাখেননি, জানি এটাও রাখবেন না। শুনুন তবে। সমস্ত বাংলাদেশে নবাব সিরাজের একটি মাত্র হিতৈষী বন্ধু আছে, তার নাম বেগম লুৎফুন্নিসা, বাকী সবাই তার শত্রু। মীরজাফর নিজে বাংলার মসনদে বসতে চান, তিনি বুঝেছেন ইংরেজদের যদি তোয়াজ করা যায় তাহলে ইংরেজরা হয়তো তাঁকে সিংহাসনে চড়িয়ে দেবেন। জগৎ শেঠকে সিরাজ অপমান করেছিলেন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন সিরাজকে যেন-তেন-প্রকারেণ সিংহাসন থেকে সরাবেন। তাঁর আশা ছিল ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজেস বা পূর্ণিয়ার শওকৎজঙ্গ এসে সিংহাসন দখল করবেন, তাঁদের তিনি গোপনে সাহায্যও করেছিলেন কিন্তু তা হল না, তাই তিনি এখন ইংরেজদের সহায় হয়েছেন। রাজা রাজবল্লভ ঘসেটি বেগমের লোক। ঘসেটি বেগম আর সিরাজের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। তিনি প্রথমে সিরাজেরই ছোট্টভাই আক্রামউদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ তিনি নিঃসন্তান। আক্রমকে পুষ্যি নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আক্রাম বসন্ত-রোগে মারা গেল। তারপর তিনি চেষ্টা করলেন তাঁর আর এক বোনের ছেলে পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎজঙ্গকে সিংহাসনে বসাতে। মনিহারির বলদিয়াবাড়িতে শওকৎজঙ্গের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ হল। শওকৎজঙ্গ মারা গেলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ঘসেটি বেগম ঢাকা থেকে চলে এসে মুর্শিদাবাদে মতিঝিলে বাস করতে লাগলেন। ধনরত্নপূর্ণ মতিঝিলের মতো অমন চমৎকার প্রাসাদ মুর্শিদাবাদে খুব বেশী নেই। আপনি দেখেছেন মতিঝিল? আমি একবার গান গাইতে গিয়েছিলাম সেখানে। মনে হচ্ছিল স্বর্ণপুরীতে বসে আছি। সেই মতিঝিল সিরাজ লুঠ করেছেন এবং ঘসেটি বেগমকে বন্দী করে রেখেছেন নিজের অন্তঃপুরে। রাজা রাজবল্লভ ছিলেন ঘসেটি বেগমের দেওয়ান। তিনি নিজের যা কিছু টাকাকড়ি ধনরত্ন গয়নাগাঁটি ছিল সব ছেলের মারফত

পাচার করে দিয়েছেন কলকাতায় ইংরেজদের কাছে। তাঁর ছেলে কৃষ্ণদাস ইংরেজদের আশ্রয়ে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন। এখন শুনছি রাজবল্লভের সঙ্গে নবাবের মিটমাট হয়ে গেছে। সিরাজ নাকি রাজবল্লভকে অভয় দিয়েছেন। কিন্তু রাজবল্লভ বদ্যির ছেলে, খুব চতুর, খুব ধূর্ত। তিনি বাইরে বাইরে নবাবের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের ভাব রাখছেন, কিন্তু মনে মনে তিনি সিরাজের ঘোর শত্রু। ভিতরে ভিতরে তিনি ইংরেজের পক্ষে। দুর্লভরামও সিরাজের উপর চটা। সিরাজ মসনদে উঠেই যে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল। মানী লোককে অপমান করে, উঁচু রাজকর্মচারীদের মাথার উপরে নীচু কর্মচারীদের বসিয়ে, উচ্ছৃঙ্খল মোসায়েব আর গুণ্ডার দল দিয়ে সিরাজের রাজত্ব চলছে। ফৈজু বিবিকে জীয়ন্তে গোর দিয়ে দিলে। দানেশ ফকিরের নাক কেটে দিলে। রানী ভবানীর বিধবা মেয়ে তারার প্রতি কুনজর দিলে। কেউ ওর উপর সন্তুষ্ট নয়।"

"উমিচাঁদ?"

"উমিচাঁদ একটা বেহায়া আত্মসম্মানহীন লোক। ইংরেজরা ওকে ধরে কয়েদ করেছিল, ইংরেজের গোরা সৈন্যরা ওর অন্দর-মহলে ঢুকে মেয়েদের বেইজ্জত করতে গিয়েছিল। ওদের জমাদার জগন্নাথ নাকি চিতা জ্বেলে মেয়েদের খুন করে ফেলে দিয়েছিল চিতায়, এই খবর নাকি রটেছে। জগন্নাথ কিন্তু কিছু বলে না।"

"জগন্নাথকে তুমি চেন নাকি?"

"চিনি। উমিচাঁদেব বাড়িতে একবার মুজরা করতে গিয়েছিলাম, জগন্নাথই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়। কি চমৎকার বজরা যে এনেছিল আমার জন্যে। সেখানে লাখপতিয়া বলে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু এখন তারা কেউ নাকি বেঁচে নেই। এত কাণ্ডের পরও ওই উমিচাঁদ নাকি ইংরেজদের দলে যোগ দিয়ে ক্লাইভ আর ওয়াটসনকে সেলাম করছে।"

"জগন্নাথ কোথায় এখন?"

"মুর্শিদাবাদেই আছে। সে উমিচাঁদের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এখানে তার এক ভাইপো নবাবের ফৌজে কাজ করে। সেইখানেই সে থাকে, কোথাও কাজ করে না। কি রকম যেন পাগলাটে গোছের হয়ে গেছে। আসে আমার কাছে মাঝে মাঝে। আমাকে এসে বলে রাম নাম শুনা বেটি। ঠুমক চলত রামচন্দ্র বাজতো পাঁয়জানিয়া—এই ভজনটা ওর ভারী প্রিয়।"

"আমিও ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

"বেশ তো। ওকে খবর পাঠাব। আমি যতটুকু জানি সব বললাম, আর কিছু জানতে চান?"

"তুমি আসফ আলী আর উজির আহমদকে চেন?"

"আসফ আলী ফৌজে বড় কাজ করেন। একদিন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আমার এখানে গান শুনতে এসেছিলেন। উজির আহমদকে চিনি না।"

"আচ্ছা, আমি এবার উঠি!"

"সে কি এখনই? কিছু খাবেন না?"

"এখনও খিধে পায়নি। আচ্ছা, এক গ্লাস নিরামিষ শরবত আনো।"

"নিরামিষ মানে?"

"মদটদ মিশিয়ো না। অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে আমাকে—সরফুদ্দিন কেমন আছে জান?"

"কেরামতের ছেলে সরফুদ্দিন? সে তো প্রায়ই আমার কাছে আসে। চমৎকার বাজনা শিখেছে। সেদিন এখানে দিলরুবা এমন বাজালে যে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কত বয়স হবে? পনেরো ষোল, কিন্তু এই বয়সেই চমৎকার শিখেছে। দেখতেও অতি চমৎকার। যেন রাজপুত্র। কিন্তু শুনছি এই বয়সেই ও বদ সঙ্গে মিশছে। ওর বাবা কোথায় কখন থাকেন তাতো কেউ জানে না—অমন ছেলে বখে না যায়।"

"আমি যাব ওর কাছে। তুমি শরবতটা তাড়াতাড়ি নিয়ে এস—"

"শরবত খেয়েই কিন্তু আপনার যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

"আপনি বলেছেন সব শোনবার পর আমাকে শাস্তি দেবেন। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন—"

"ও হ্যাঁ। আচ্ছা ভাবি দাঁড়াও কি শাস্তি দেব। তুমি শরবতটা আন।"

মৈনি শরবত আনিতে গেল।

একটু পরেই সে স্ফটিকের গ্লাসে শরবত, আর সোনার রেকাবীতে এক গোছা আঙুর লইয়া আসিল।

ধূর্জটিমঙ্গল গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বড়লোক হয়েছ দেখছি।"

মৈনি বিবির চোখ দুইটি হাসিতে লাগিল। ধূর্জটিমঙ্গল একটি একটি আঙুর মুখে দিতে দিতে বলিলেন—"তোমার শাস্তি ঠিক করেছি। একটা দরবারি কানাড়ার আলাপ শোনাও আমাকে সেতারে।"

"কিন্তু এটা কি দরবারি কানাড়া বাজাবার সময়?"

"সেইটেই তো তোমার শাস্তি। অসময়ে দববারি কানাড়া বাজাতে হবে।"

মৈনি মুচকি হাসিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত, তাহার পর বলিল—"বেশ। কিন্তু দরবারি কানাড়া বাজাবার আগে আমাকে দরবার সাজাবার অনুমতি দিন—"

"এখানে দরবার সাজাবে কি করে?"

"দেখুন না; এখানে নবাবের দরবার হবে না, আপনার দরবার হবে।"

মৈনি আবার উঠিয়া চলিয়া গেল। একটু পরে সে ফিরিল একটি দামী সোনার বুটি দেওয়া লাল রঙের জমকালো বেনারসী শাড়ি লইয়া। ঘরের এক কোণে একটা উঁচু কেদারা ছিল। তাহার পর সে শাড়িটি নিপুণ করিয়া পাতিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দুইটি দাসী একটি পারস্যের গালিচা বহিয়া আনিল এবং সেটিও কেদারার সামনে পাতিয়া দিল।

ধূর্জটিমঙ্গল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি?"

"আপনি ওই উঁচু আসনটায় গিয়ে বসুন। আমি গালচের ওপর বসে বাজাব। একটু অপেক্ষা করুন ফুল আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার পর সে আবার বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিল একটি চমৎকার মুর্শিদাবাদী গরদের শাড়ি পরিয়া। হাতে গোলাপপাশ আতরদান। ধূর্জটিমঙ্গলকে তুলা করিয়া আতর দিল, গোলাপপাশ ঝাড়িয়া গোলাপজল ছিটাইল চতুর্দিকে। গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া গেল।

"তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ মৈনি। আমি উঠি, আমার কাজ আছে—"

"আমারও কাজ আছে। লুৎফা বেগমের মহল থেকে আমার ডাক এসেছে। তিনি নাকি দিনরাত কাঁদছেন। গান-বাজনা দিয়ে তাঁকে ভোলাতে হবে।"

"তাহলে এসব কাণ্ড করছ কেন? সেইখানেই যাও তুমি, আমিও উঠি। বাজনা আর একদিন শুনব—"

"না, লক্ষ্মীটি একটু বসুন। আপনি একবার চলে গেলে যে আসবেন না তা আমি জানি। কত দিন পরে এলেন বলুন তো—"

মৈনি বিবির কণ্ঠস্বরে বেদনার একটু আভাস পাওয়া গেল। মুখে কিন্তু হাসি। মৈনি আবার বাহিরে চলিয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল নীরবে আঙুরগুলি শেষ করিয়া বেদানার রসাপ্লুত বাদামের সুগন্ধি শরবত পান করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মের দুইটি প্রকাণ্ড তোড়া লইয়া মৈনি প্রবেশ করিল। তাহার সহিত সোনা-রূপার উপর মীনার কারুকার্য খচিত দুইটি ফুলদানী লইয়া প্রবেশ করিল দুইজন দাসী।

ফুলদানীতে পদ্ম সাজাইয়া কেদারার দুই পার্শ্বে তাহা রাখিয়া মৈনি বলিল—"এইবার আপনি ওখানে বসুন।"

দাসীরা চলিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গল তবু ওঠেন না।

"বসুন, দেরী করছেন কেন—"

"আমাকে কি মনে কর তুমি কর মৈনি? আমি কি তোমার হাতের পুতুল? যেখানে বসাবে, সেইখানেই বসব?"

"না, আপনি আমার রাজা। আপনার উপযুক্ত এ দরবার নয়। কিন্তু আপনি দরবারি কানাড়া শুনতে চেয়েছেন তাই যা হোক তা হোক করে একটা দরবার খাড়া করেছি। আপনি বসবেন না? আমি আপনার কাছে কি দোষ করেছি যে আপনি আমাকে এত বড় অপমান করবেন?"

ধূর্জটিমঙ্গল দেখিলেন যে চোখ দুটি একটু আগে হাসিতে ঝলমল করিতেছিল তাহাতেই এখন অশ্রু টলমল করিতেছে।

তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, উচ্চাসনে উঠিয়া বসিলেন।

মৈনির মুখে আবার হাসি ফুটিল। সে সেতার আনিয়া গালিচার উপর বসিল। হাসিমুখে নীরবে সেতারের সুর বাঁধিতে লাগিল। একটু পরেই শুরু হইয়া গেল দরবাড়ি কানাড়া। ধূর্জটিমঙ্গল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কখন যে তাঁহার চক্ষু দুইটি মুদিত হইয়াছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই, কতটা সময় যে কাটিয়া গিয়াছে তাহাও তাঁহার খেয়াল ছিল না। সেতার থামিতে তিনি চোখ খুলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি দাসী আসিয়া খবর দিল, "মহম্মদী বেগ আপনার জন্য বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।"

"তাকে ডেকে নিয়ে এস।"

একটি বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তি প্রবেশ করিল। মৈনি বিবিকে সেলাম করিয়া উর্দুতে যাহা বলিল তাহার বাংলা মর্ম এই—আমি লুৎফা বেগমের রঙমহল হইতে আপনাকে লইতে আসিয়াছি।

অনেকক্ষণ হইতে আপনার এনতেজার করিতেছি। আপনি আপনার তশ্‌রিফ লইয়া কখন যাইবেন?

মৈনি উত্তর দিলে—"একটু পরেই যাচ্ছি। আপনার অপেক্ষা করার দরকার নেই।"

মহম্মদী বেগ তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

বলিল, "রঙমহলের পালকি এসেছে। সেটা তাহলে অপেক্ষা করুক।"

মৈনি ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি এখন কি করবেন?"

"আমি সরফুর কাছে যাব। তারপর উজির আহমদের খোঁজ করব। কেউ যদি তার সন্ধান দিতে পারে ইনাম দেব তাকে।"

তসলিম করিয়া মহম্মদী বেগ বলিল—"আমি পারি হুজুর—"

"ও তুমি পার, ভালোই হল। তুমি আমার বাসায় আসতে পারবে?"

"হুজুরের দৌলতখানা কোথায়?"

"জাফরাগঞ্জে ঢুকতেই যে একটা লাল রংয়ের কুঠি আছে, সেইখানেই আমার বাসা—"

"ওটা ইদমত্‌উল্লা সাহেবের খালি বাগান বাড়ি কি?"

"হ্যাঁ। ওইটেই আমি ভাড়া নিয়েছি।"

"বেশ, আমি আজ সন্ধ্যাবেলাই সেখানে যাব।"

"বেশ।"

।। নয়।।

নীলু রায় এবং জগদ্ধাত্রী উভয়েই স্ব স্ব কর্মে নিজেদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নীলু রায় ভাবিয়াছিলেন এ অঞ্চলে জন সাহেবের যত সম্পত্তি আছে তাহা কার্যত এখন ধূর্জটিমঙ্গলেরই সম্পত্তি। সুতরাং সে সম্পত্তি কত, তাহার একটা প্রকৃত ধারণা করা তাঁহার কর্তব্য। ধূর্জটিমঙ্গলের সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করার ভার তো তাঁহার উপর। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া মহালে মহালে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কোথায় কি আছে তাহার হিসাব রাখিতেন, জন সাহেবের কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কত টাকা আদায় হইয়াছে, খাজনার টাকা দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহারও খোঁজ লইতেন। একটি পাহাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন তিনি। যে সব খবর সংগ্রহ করিতেন তাহা একটি খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। মাঝে মাঝে মাখনলালের সহিত শিকারে বাহির হইয়া বনমুর্গি, তিতির, লীখ, নওরং, হরিয়াল প্রভৃতি মারিয়া আনিতেন। মাখনলালের বুধু সেগুলি পরিপাটিরূপে রন্ধন করিত। রন্ধনের সময় মাখনলালও রান্নাঘরে বসিয়া থাকিত। একদিন নীলু রায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি রান্নাঘরে বসে থাক কেন?"

"আজ্ঞে পাহারা দি। পাহারা না দিলে রাঁধতে রাঁধতেই ও অর্ধেক খেয়ে ফেলবে। ভারী পেটকি যে—"

"বল কি।"

"ঠিকই বলছি। একদিন একটা বেশ বড় পতীলু মেরে এনেছিলাম। আমাকে বাইরে একটা কাজে যেতে হয়েছিল, বাড়ি ফিরে দেখি বুধু সবটা খেয়ে বসে আছে। খেতে বসে বললাম—কই মাংস আন। হেসে বললে পতীলুটাকে বিলারে লিয়ে গেছে। চুলের ঝুঁটি ধরে যখন ঠ্যাঙালাম তখন বলল 'বড় লোভ লাগাছিল, একটু একটু করে খেতে খেতে সব ফুরিয়ে গেল যে! একটাই তো মোটে এনেছিলে, কাল বেশী করে এনো রেঁধে দিব।' কাণ্ড দেখুন। তারপর থেকে পাহারা দি। কতবার দূর করে দিয়েছি, কিন্তু যেতে চায় না, মার খেয়েও ঘুরে আসে। তাছাড়া রাঁধেও ভালো।"

মাখনলাল হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাখনলালের ওপর রাগ করা শক্ত। ভালো দাবা খেলে, লোকও বেশ ভালো। তাহার নির্দেশে কয়েকজন সিপাহী রাত্রে হাঁকডাক দিয়া পাহারাও দেয়। নীলু রায়ের জন্য জগদ্ধাত্রী দুইবেলা নানারকম রন্ধন করেন। নিরামিষ বহুরকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে জানেন তিনি। নীলু রায়কে উপর্যুপরি এক তরকারী দুইদিন খাইতে হয় নাই। খোসাচচ্চড়িও তাঁহার হাতে অপূর্ব হইয়া ওঠে। জগদ্ধাত্রী কিন্তু বড় গম্ভীর। প্রতিদিন নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেন, পাখা হাতে সামনে বসেন, কিন্তু বড় গম্ভীর। প্রয়োজনীয় আলাপ ছাড়া অন্য কথা বলেন না। রান্নবান্না, ঠাকুরঘর ছাড়া, তাঁহার আর একটি অবলম্বন চরখা। রোজই অনেকক্ষণ ধরিয়া চরখা কাটেন। চরখার সুতায় গামছা, চাদর এবং মোটা গোড়ে কাপড় প্রস্তুত হয়। অদূরে একটি তাঁতীর ঘর আছে। ছোট তাঁতও আছে একটি তাহার। এ অঞ্চলের অনেকের কাপড় গামছা সেই বুনিয়া দেয়। সে সদা ব্যস্ত। তবু সে জগদ্ধাত্রীর সুতা পাইলে সর্বাগ্রে তাঁহার কাজই করে। সে জানে এসব কাপড়, গামছা, চাদর এই অঞ্চলের গরীব দুঃখীরাই পাইবে। বিতরণের ভারও জগদ্ধাত্রী তাহার উপরই দিয়াছেন। কারণ, তিনি এদেশের কাহাকেও চেনেন না, কে গরীব কে ধনী তাহা জানেন না। কে ধনী কে গরীব তাহা বাহির হইতে দেখিয়া চিনিবারও উপায় নাই। সকলেরই বেশবাস অনাড়ম্বর। স্বয়ং ধলরাজাই বাড়িতে যে পোশাক পরিয়া থাকেন তাহা সাধারণ আদিবাসীর পোশাক। এই সব লইয়াই জগদ্ধাত্রী নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। তাঁহার ছেলে দুটি তাঁহার নিকট থাকিতে চায় না। লালী এবং কস্তুরীর কাছেই থাকিতে ভালোবাসে তাহারা। দিনের বেলায় একবার মায়ের কাছে আসে অবশ্য, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নহে। কিছু মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া আবার চলিয়া যায় তাহারা। লালী আর কস্তুরী কখনও তাহাদের পিঠে করিয়া কখনও কাঁধে লইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়। জঙ্গলে জঙ্গলে নিত্য নূতন পরিবেশে ভ্রমণ করা তাহাদের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা বাড়িতে থাকিতেই চায় না। বন্য খরগোশের বাচ্চা, কয়েকটা দেশী কুকুর, আর লালীর পোষা ময়নাটার সঙ্গে তাহাদের খুব ভাব। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক বড়ই কম। নীলু রায় জগদ্ধাত্রীর দুঃখ বোঝেন, কিন্তু ইহাও বোঝেন, এ দুঃখ মোচন করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। তবু তিনি জগদ্ধাত্রীকে অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার ঘরের সামনে বসিয়া মাঝে মাঝে দিলরুবা বাজান। কিন্তু জগদ্ধাত্রীর দিক হইতে কোনও সাড়া আসে না। নীলু রায়ের মাঝে মাঝে ভয় হয় হয়তো তাঁহার বিরক্তি উৎপাদনই করিতেছেন তিনি। একদিন তিনি ধলরাজার নিকটে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিলেন—বৌঠান একা একা বড় চুপচাপ থাকেন । তাঁর বেড়াবার জন্য যদি একটা ভালো পালকি আর কয়েকজন বাহক দেন তাহলে

তিনি একটু আধটু বেড়াতে পারেন। ধলরাজা দিলদরিয়া লোক। একটি রৌপ্যখচিত ভালো পালকি এবং আটজন বাহক পাঠাইয়া দিলেন তাহার পরদিনই। পালকি কিন্তু বাহিরেই পড়িয়া রহিল এবং আটজন বাহক বসিয়া বসিয়া অন্ন ধ্বংস করিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী বেড়াইতে যাইবার কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কয়েকদিন পরে ধলরাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কি একটি পরবে তাঁহার বাড়িতে আদিবাসীদের নৃত্যোৎসব ছিল, সেই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য তিনি জগদ্ধাত্রীকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। মধু সামন্ত তাঁহার অনুরোধটি বহন করিয়া আনিলেন। নীলু রায়কে বলিলেন,"রাজার নিমন্ত্রণ রাখতেই হবে। না রাখলে তিনি অপমানিত বোধ করবেন। আপনার বৌঠানকে বুঝিয়ে বলুন, নাচ তাঁর ভালো লাগবে। ধলরাজা আমাকে বলেছেন মিতিনকে খুব খাতির করে এনো।"

নীলু রায় জগদ্ধাত্রীকে এ সংবাদ দিলে প্রথমে তিনি রাজী হন নাই। বলিলেন—"আমার অবসর কই। রান্নাবাড়া আছে, পুজো আছে, খুঁটি আর খাম্বা আসবে, তা ছাড়া তাঁতীকে কিছু সুতো দিতে হবে, মাখনলালের রাঁধুনীর জন্যে একটা কাপড় বুনতে দিয়েছি, সুতোয় কম পড়ে গেছে—"

নীলু রায় বলিলেন—"বৌঠান, অবসর আপনাকে করতেই হবে। আপনি পুজো সেরে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বেন—খাওয়াদাওয়া ওখানেই হবে।"

"আমি অন্য কোথাও খেতে পারব না। তাছাড়া দেখুন একা কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। উনি থাকলে উনি যদি যেতেন আমি সঙ্গে যেতাম, একা একা কোথাও যেতে ভালো লাগে না।"

"এখানে কিন্তু যেতেই হবে বৌঠান। রাজারাজড়ার ব্যাপার, না গেলে অপমানিত বোধ করবেন। ওঁকে চটিয়ে এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। যাবেন, একটু নাচ দেখে ঘুরে আসবেন। বেশীক্ষণ থাকব না আমরা।"

জগদ্ধাত্রীকে অবশেষে রাজী হইতে হইল।

ঠিক হইল, তিনি পূজা করিয়া দুধ, চিঁড়া আর কলা দিয়া ফলাহার করিয়া লইবেন। তাহার পর একটু বিশ্রাম করিয়া ধলরাজার বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করিবেন। রুলার কাছে খাম্বা-খুঁটির জন্য খাবার থাকিবে। জগদ্ধাত্রী পালকিতে গেলেন। নীলু রায় বন্দুকটি পৃষ্ঠে বাঁধিয়া অশ্বারোহণে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

ধলরাজা সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন জগদ্ধাত্রীকে। তিনি যাইবামাত্র একসঙ্গে অনেক মাদল বাজিয়া উঠিল, তূর্যধ্বনি হইল। একদল মেয়ে নাচিতে নাচিতে আসিয়া অভিবাদন করিল তাঁহাকে। মেয়েগুলি ফুলের সাজে সাজিয়াছিল। মাথায় কোমরে কৃষ্ণচূড়া পলাশ আর জবা ফুল। কটিদেশের বন্ধনীতে মহুয়া আর জারুল ফুলের গুচ্ছ, হস্তের বাজুবন্দে কর্নিকার। তাহাদের বক্ষে কোন আবরণ নাই, তাহাদের রঙীন ছোট কাপড় আঁটসাঁট করিয়া পরা। তাহাদের সর্বাঙ্গ এরণ্ড-তৈলের মর্দনে কোমল, হরিদ্রার অবলেপে স্বর্ণাভ। তাহাদের অনাবৃত বক্ষের দিকে চাহিয়া জগদ্ধাত্রী বিব্রত হইলেন, তাহাদের কিন্তু কোনও লজ্জা নাই। জন সাহেবের কুঠিতে যেসব মেয়েরা কাজ করে জন সাহেবই তাহাদের জামা পরিতে, বুকে কাপড় দিতে শিখাইয়াছেন। ধলরাজার নর্তকীরা প্রায় উলঙ্গিনী। জগদ্ধাত্রী মনে মনে বিব্রত হইলেন

বটে, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিলেন না। ধলরাজার রানী এবং সহচরীগণ জগদ্ধাত্রীকে সমাদরে একটি পুষ্পপত্রসজ্জিত বিতানে লইয়া গেলেন। সেখানে কয়েকটি অলঙ্কৃত আসন ছিল, তাহারই একটিতে জগদ্ধাত্রীকে বসাইলেন তাঁহারা, নিজেরাও তাঁহারা আশেপাশে বসিলেন। তাহার পর আসিল প্রকাণ্ড একটি স্বর্ণরৌপ্যখচিত পরাত, তাহাতে পান সুপারী এলাচ লবঙ্গ এবং আতরদানী। জগদ্ধাত্রী একটি এলাচ তুলিয়া লইলেন। তাহার পর নাচ শুরু হইল। নানারকমের নাচ, নানারকমের গান। নর্তক-নর্তকীদের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ সুরে গানে লাস্যলীলায় সকলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। স্বয়ং ধলরাজা উঠিয়া কাঁধে মাদল ঝুলাইয়া মাদল বাজাইতে বাজাইতে সকলের সহিত নাচিতে লাগিলেন। জগদ্ধাত্রী কিন্তু পাষাণপ্রতিমার মতো বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচ হইল। জগদ্ধাত্রী স্থির নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। নাচ শেষ হইবার পর খাওয়ার আয়োজন হইল। জগদ্ধাত্রীকে অন্দরমহলে লইয়া গেলেন রানী। পোলাও, রুটি পরোটা কচুরি, মাছ মাংস, নিরামিষ নানারকম তরকারী, ফল নানাবিধ। কেঁদ হইতে শুরু করিয়া পেঁপে, আনারস, আম, জাম, আপেল, আঙুর, কিসমিস পেস্তা বাদাম। তাছাড়া পর্যাপ্ত মিষ্টান্ন, দু তিন রকম পরমান্ন। শূল্যপক্ক কয়েকরকম পাখি। আরও কত কি। কিন্তু জগদ্ধাত্রী কিছুই স্পর্শ করিলেন না। অনেক অনুরোধের পর একটি আঙুর মুখে দিলেন। ভূরি ভোজন করিলেন নীলু রায়।

সব শেষ হইতে বেশ রাত হইয়া গেল। ধলরাজা তাঁহাকে বলিলেন, মিতেন কিছু খাইলেন না। বলিতেছেন তাঁহার কি একটা ব্রত আছে। তাই তিনি তাঁহার সঙ্গে সামান্য কিছু ভেট পাঠাইয়া দিতে চান। নীলু রায় ইহাতে আপত্তি করিতে পারিলেন না। যাইবার সময় দেখা গেল সামান্য ভেট মোটেই সামান্য নয়—দুই গাড়ি বোঝাই জিনিসপত্র। মূল্যবান শাড়ি, এক চুপড়ি সিঁদুর এবং একজোড়া স্বর্ণবলয়ের সহিত প্রচুর খাদ্যদ্রব্য। চাল, ডাল, মাড়োয়া, মকাই, বাজরা, অনেক ফল, দুই হাঁড়ি দই এবং কয়েকরকম মিষ্টান্ন। তাছাড়া দুইটি পাঁঠা এবং একটি নধর ভেড়া।

নীলু রায় অশ্বারোহণে গাড়িগুলির পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলেন। জগদ্ধাত্রীর পালকিটা আগাইয়া গেল।

অন্ধকার রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকে একটা প্রেতের মুখ বলিয়া মনে হইতেছে। জগদ্ধাত্রী পালকিতে বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এক টুকরা মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া দিল, একটু পরেই আবার চাঁদ মেঘের ফাঁক হইতে উঁকি দিল। জগদ্ধাত্রীর মনে হইল একটা প্রেতমূর্তি পরদার আড়াল হইতে তাঁহাকে দেখিতেছে। আবার শিহরিয়া উঠিলেন তিনি। পালকির সামনে ও পিছনে মশালধারীরা আসিতেছিল। মহিষের গাড়ি দুইটি পিছাইয়া পড়িয়াছিল, নীলু রায়ও গাড়ি দুইটির পিছনে ছিলেন। অন্ধকারে পাহাড়ী সংকীর্ণ পথে তিনি জোরে ঘোড়া চালাইতে পারিতেছিলেন না। জগদ্ধাত্রীর পালকিটা বনজঙ্গল ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিয়াছিল। সহসা জগদ্ধাত্রী পালকি বাহকদের থামাইয়া দিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন বনের ভিতর কে যেন—মা মা মা বলিয়া চীৎকার করিতেছে। শিশুর কণ্ঠ। তাঁহার মনে হইল তাঁহার খাম্বার গলা। পালকি থামিতেই আবার বনের ভিতর হইতে সেই শিশুকণ্ঠ শোনা গেল—মা—মা—মা।

"ও কিসের শব্দ, কে ডাকছে?"

একজন বাহক বলিল, "হরিণরা অনেক সময় ওইরকম শব্দ করে।"

"হরিণ নয়। এ আমার খাম্বার গলা। তোমরা কেউ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে দেখ দিকি—"

বাহকেরা ইতস্তত করিতে লাগিল। অন্ধকার রাত্রে কেহই বনের ভিতর প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নয়।

"যাবি না কেন, গিয়ে দেখ, তোদের টাকা দেব।"

বাহকেরা তবু যাইতে রাজী নয়।

একজন মশালধারী বলিল—"এই বনের মধ্যে মৌলা গাঁ আছে। সেখানে আছেন অষ্টভূজা রঙ্কিণী। কৃষ্ণপক্ষে তাঁর পুজো হচ্ছে হয়তো। ওখানে এখন যাওয়া ঠিক নয়।"

জগদ্ধাত্রী পালকি হইতে নামিয়া পড়িলেন।

"তোমরা কেউ না যাও তো, আমি একাই যাব।"

"না, না মা যাবেন না।"

বাহক এবং মশালধারীরা তাঁহাকে বারণ করিতে লাগিল।

"তোরা কেউ না যাস তো আমাকে যেতেই হবে। আমার ছেলের গলা শুনেছি আমি। আমার ভুল হয়নি, আমি যাব। আমাকে একটা মশাল দাও।"

হঠাৎ একজন মশালধারী মত বদলাইয়া ফেলিল।

"চলুন মা যা থাকে কপালে আমি আপনার সঙ্গে যাই। আপনি যখন যাবেনই তখন আপনাকে একা যেতে দিব না—"

"তাই চল।"

একজন বাহক বলিল—"ওই যে গাড়ি দুটাও পৌঁছে গেছে। বাবুও আইছেন—"

নীলু রায় গাড়ি দুইটিকে পাশ কাটাইয়া আগাইয়া আসিলেন।

"ব্যাপার কি! আপনি বৌঠান এখানে নামলেন কেন?"

"আমার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। আমি যেন খাম্বার গলা পেলাম জঙ্গলের মধ্যে, মা মা বলে ডাকছে।"

"সে কি! খাম্বার গলা?"

একজন বাহক বলিল—"হরিণটরিণ অনেক সময় হরেকরকম ডাকে। বনবিড়ালের ডাকও ওই রকম হয়।"

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—"আমি বনের মধ্যে ঢুকব। নিজের কানে আমি খাম্বার গলা শুনেছি। আমার বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে ঠাকুরপো।"

"আপনি বৌঠান ওই জঙ্গলে তো ঢুকতে পারবেন না। পথ নেই, তাছাড়া এই জঙ্গলের ভিতর ছোট ছোট পাহাড়, টিলা অনেক আছে, কোনদিকে যাবেন আপনি—"

"কিন্তু একটু খোঁজ না নিয়ে আমি যাব না। আমি তার কান্না শুনেছি, আমর ভুল হয়নি।"

নীলু রায় জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন তিনি সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

একজন বাহক বলিল—"এই জঙ্গলের ভিতর পাহাড়ঘেরা মৌলা গাঁ আছে। সেখানে

অষ্টভুজা রঙ্কিণীর মূর্তি আছে, সেখানে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দিন পূজা হয় মায়ের, বলি হয়। ঝামরি আসে সেখানে—কাপালিক আসে, খণ্ডোবাবা।"

নীলু রায় বলিলেন, "ঝামরি যে রঙ্কিণীর পুজো করে সেটা তো একটা পাথর শুধু। আমাদের বাড়ির কাছেই সেটা—"

"আসল রঙ্কিণী নয় সেটা। আসল রঙ্কিণী বনদেবী। বনের মধ্যে থাকেন তিনি। প্রতি কৃষ্ণপক্ষে তার পূজা করে ঝামরি আর খণ্ডোবাবা।"

নীলু রায় তখন জগদ্ধাত্রীকে বলিলেন—"আপনি তাহলে এই পালকিতে বসে থাকুন। আমি কয়েকজন লোক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে খোঁজ করি। আপনার কাছে সবাই থাকুক, আমি একজন মশালধারী আর একজন গাড়োয়ানকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকি—ভাগ্যে বন্দুকটা সঙ্গে এনেছিলাম।"

জগদ্ধাত্রী বলিলেন,"বেশ, কিন্তু আপনার ফিরতে দেরি হলে আমি স্থির থাকতে পারব না। আমিও জঙ্গলে ঢুকে পড়ব।"

জঙ্গল শুধু জঙ্গলই নহে, প্রস্তরসমাকীর্ণ। প্রতিপদে ছোট বড় নানারকম রুক্ষ পাথর গতিরোধ করে। তবু নীলু রায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যদিও মশাল ছিল, তবু অরণ্যের পুঞ্জীভূত অন্ধকার আলোকিত হইতেছিল না। তাহাতে সম্মুখের পথটুকুমাত্র দেখা যাইতেছিল। তবু নীলু রায় চলিতেছিলেন। কিছুদূর গিয়াই কিন্তু তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সামনেই একটি প্রকাণ্ড গাছের বাঁকানো গুঁড়ি ছিল, গাছটি বেশ খানিকটা বাঁকিয়া তবে উর্ধ্বমুখী হইয়াছে। সেই বাঁকানো গুঁড়ির উপর পা দোলাইয়া তিনি বসিলেন। লক্ষ্য করিলেন। গাছটি প্রকাণ্ড শাখাপ্রশাখাময় মহীরুহ একটি। বাঁকিয়া যেখানে হইতে সে উর্ধ্বে উঠিয়াছে সেখানে গুঁড়ির উপর প্রকাণ্ড একটি গর্তও রহিয়াছে। নীলু রায়ের মনে হইল বৃক্ষটি যেন একচক্ষু দানবের মতো নির্নিমেষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। সহসা সেই গর্তের ভিতর হইতে ফোঁস করিয়া একটা শব্দ হইল। নীলু রায় চমকিয়া উঠিলেন। সাপ নাকি? কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড একটা পাখি সবেগে গর্তটার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং তাঁহার মুখে প্রচণ্ড ডানার ঝাপটা দিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। তাঁহার সহচরটি বলিল—জংলী প্যাঁচা একটা। একটু পরেই প্যাঁচাটার কর্কশ চীৎকারে সমস্ত বনস্থলী কাঁপিয়া উঠিল। বুউউউ বোওওও—এই শব্দ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। নীলু রায়ের মনে হইল কে যেন বলিতেছে দু—য়ো, দু—য়ো। নীলু রায় আবার চলিতে শুরু করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দূরে হায়নার হাহা শব্দ রাত্রির অন্ধকারকে মথিত করিয়া যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। নীলু রায় তবু চলিতে লাগিলেন। একটু পরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল তিনি যেন ক্রমশ একটা পর্বতের উপর আরোহণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আর একটা অপ্রত্যাশিত শব্দে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। সহসা কোথায় যেন ঢোল কাঁসর ঝাঁজর একযোগে বাজিয়া উঠিল। স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন নীলু রায়। কোথাও পুজো হইতেছে নাকি? তাঁহার সহচরটি বলিল,"রঙ্কিণী মায়ের মন্দিরের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। আর একটু উঠতে হবে। পাহাড়ের উপরে উঠলে তখন দেখা যাবে সব।" নীলু রায়

পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পাহাড়ের শীর্ষে উঠিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন পর্বতবেষ্টিত একটা সমতল স্থানে অনেক মশাল জ্বলিতেছে, অনেক লোক বাজনা বাজাইতে বাজাইতে উন্মাদের মতো নৃত্য করিতেছে। একটা মন্দিরের মতো কি রহিয়াছে যেন। নীলু রায় আর অপেক্ষা করিলেন না, পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া নামিতে লাগিলেন। নামাও সহজ ছিল না। চারিদিকে ছোট বড় পাথর, কাঁটা-গাছ এবং মাঝে মাঝে গর্ত। নীলু রায় হামাগুড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। একবার বসেন, সম্মুখের দিকে পা বাড়াইয়া দেন, তাহার পর আর একটু অগ্রসর হন।

"ঠাকুরপো আমিও এসে গেছি। আমি আর থাকতে পারলাম না।"

নীলু রায় সবিস্ময়ে দেখিলেন জগদ্ধাত্রীও তাঁহার পিছনে হামাগুড়ি দিয়া নামিতেছেন। তাঁহার অবগুণ্ঠন খসিয়া গিয়াছে, গাছকোমর করিয়া কাপড় পরিয়াছেন, শাড়ির স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। চোখের দৃষ্টিতেই এমন একটা প্রখরতা যাহা নীলু রায় বাঘের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি ভয় পাইয়া গেলেন। নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন তাঁহার দিকে।

"বসে আছেন কেন, চলুন চলুন, একটা লোককে কাটছে ওরা—"

নীলু রায় সভয়ে দেখিলেন একটা লোককে ধরিয়া বাঁধিয়া একটা হাড়কাঠের মধ্যে ফেলিল তাহারা। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক প্রকাণ্ড একটা খড়্গ দিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিল। একজন অনুচর বলিল—"লরবলি হচ্ছে। এবছর ফসল ভালো হয় নাই তো। খণ্ডোবাবা নিজে হাতে কাটছে—"

নীলু রায় দেখিলেন নৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছে সবাই। মৃত ব্যক্তিটার রক্ত গায়ে মুখে মাখিয়া উন্মাদ নৃত্য জুড়িয়াছে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল তাঁহার পিঠে বন্দুক বাঁধা আছে। তিনি তাড়াতাড়ি বন্দুকটি খুলিয়া দুম দুম করিয়া দুইবার আওয়াজ করিলেন। ইহাতে ফল হইল। যে যেদিকে পারিল ছুটিতে লাগিল।

"চলুন, চলুন, বসে আছেন কেন?"

জগদ্ধাত্রীর তাড়ায় নীলু রায় আবার অবরোহণ শুরু করিলেন। জগদ্ধাত্রী তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলেন।

বার বার উঠিয়া পড়িয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবশেষে তাহারা কোনক্রমে নীচে নামিলেন। নীচে নামিয়াই জগদ্ধাত্রী উন্মাদিনীর মতো ছুটিতে লাগিলেম। মন্দিরের কাছাকাছি গিয়া রঙ্কিণীর ভীষণা মূর্তির দিকে চাহিয়া তিনি ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলেন। উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত দুই হস্তে দুইটি তরবারি। পদতলে একটি শিবমূর্তি। কিন্তু সে স্তব্ধতা মুহূর্তের জন্য। তাহার পরই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। খাম্বার মুণ্ডুটা মায়ের পায়ের কাছে রহিয়াছে। আর একটা কার মুণ্ডু? হ্যাঁ ওটাকেও তো তিনি চেনেন। লাল দাড়ি টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতো নাক। মীর মহম্মদকেও তিনি চিনিতে পারিলেন এবং পরমুহূর্তেই মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। মন্দিরের পিছনে ঝামরি ছিল সে ছুটিয়া আসিল। মূর্ছিতা জগদ্ধাত্রীর দিকে চাহিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল সে। উলঙ্গিনীর সর্বাঙ্গে রক্তমাখা। হঠাৎ বসিয়া মূর্ছিতা জগদ্ধাত্রীর মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল। বলিতে লাগিল—"তুর ব্যাটার কত পুণ্য, মায়ের ভোগে লাগল সে।

তোর দুঃখু কিসের, একটা ব্যাটা তো রইল। মায়ার বিষ আর কত খাবি? বিষ বিষ, বিষ আর খাস না—কিন্তু ও কি শুনবেক? বিষ খাবেকই।"

আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল সে। তাহার পর হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। খণ্ডোবাবা ধমক দিলেন—চুপ কর, চুপ কর।

বন্দুকের শব্দে অনেকেই পালাইয়াছিল, কিন্তু খণ্ডোবাবা পালান নাই। তিনি রঙ্কিণীর সম্মুখে করজোড়ে বসিয়াছিলেন। কাপালিকের মতো চেহারা। মাথায় জটা, কপালে সিঁদুর। রং কালো নয়, গৌরবর্ণ। চোখ দুটি টানাটানা। একমুখ গোঁফদাড়ি। বলিষ্ঠগঠন পুরুষ। পরনে কাপড় নাই, চিতাবাঘের চামড়া দিয়া তৈরি একটি কৌপীন লাল ডোরায় কটিসংলগ্ন রহিয়াছে। নীলু রায় হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নিজের চক্ষুকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না তিনি। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত পরেই তাঁহার জড়ভাব কাটিয়া গেল। তিনি বন্দুকটা তুলিয়া খণ্ডোবাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি খুনী। তোমাকে আমি শাস্তি দেব।"

খণ্ডোবাবা নির্বিকারভাবে নীলু রায়ের দিকে চাহিলেন। তিনি যে বিন্দুমাত্র ভয় পাইয়াছেন তাহা মনে হইল না। একটু হাসিয়া পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন—"তোর বন্দুকেতে তো গুলি নেই। থাকলেও মারতে পারতিস না। কেউ কাউকে মারতে পারে না। মারবার বাঁচবার মালিক মা। এ পুজো ধলরাজার পুজো। প্রতিবার পুজোতেই নরবলি হয়। এবার শিশুবলিও হল। এ অঞ্চলে মাঠে এবার সব ফসল কচি কচি অবস্থাতেই শুকিয়ে যাচ্ছে, তাই মা ঝামরিকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছিলেন এবার কচি শিশু বলি চাই। ঝামরি শিশুটিকে যোগাড় করে এনেছে। তুই যদি আমাকে গুলি করিস সে গুলি লাগবে ধলরাজার বুকে। তখন তুই আর নিস্তার পাবি না। খবরদার এ কাজ করিসনি!"

নীলু রায় জানিতেন তাঁহার বন্দুকে আর গুলি নাই। সঙ্গেও আর গুলি ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন এ অবস্থায় কি করিবেন, কি করা উচিত।

কাপালিক আবার বলিলেন—"তোর মনে যদি আমার উপর আক্রোশ হয়ে থাকে গুলি করে আমাকে মারতে পারবি না। তবে একটা কাজ করতে পারিস। মায়ের কাছে আমাকে বলি দিতে পারিস। এই খাঁড়া নে। হাড়কাঠে গলা ঢুকিয়ে দিচ্ছি, মায়ের কাছে আমাকে বলি দিয়ে দে, আমার মুক্তি হয়ে যাক—শুনলে ধলরাজাও খুশী হবে।"

প্রকাণ্ড রক্তাক্ত খাঁড়াটা লইয়া তিনি নীলু রায়ের কাছে আগাইয়া আসিলেন।

নীলু রায় পিছাইয়া আসিলেন। বলিলেন, "না, আমি পূজার নামে মানুষ খুন করি না। তোমরা কাকে খুন করেছ জান?"

"ওই দাড়িওলা লোকটাকে তো আমিই এনেছি। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। আমাকে দেখে বলল—আমি বিদেশী লোক, পথ হারিয়েছি, আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। সঙ্গে করে নিয়ে এলাম, দুনিয়ার সেরা পথটা দেখিয়ে দিলাম। হা হা হা হা—"

কাপালিকের অট্টহাস্যে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল।

"কিন্তু এই ছেলেটা কার জান? ধলরাজার বন্ধু ধূর্জটিমঙ্গলের। ধলরাজার অনুরোধেই তিনি মুর্শিদাবাদে গেলেন, আর তোমরা তাঁর ছেলেটাকে এনে—"

হঠাৎ একটা আর্তচীৎকার শুনিয়া নীলু রায় থামিয়া গেলেন। দেখিলেন মূর্ছিতা জগদ্ধাত্রী

উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার চুল আলুলায়িত, বেশবাশ বিস্রস্ত। তিনি দুই হাত রঙ্কিণীর দিকে বিস্তার করিয়া চীৎকার করিতেছেন—সে চীৎকার হৃদয়ভেদী, সে চীৎকার মর্মন্তুদ। নিপীড়িত নারীত্বের যে চীৎকার যুগ যুগ ধরিয়া মহাকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া অবশেষে শূন্যে হারাইয়া গিয়াছে সেই চীৎকার সহসা যেন জগদ্ধাত্রীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভার ঊর্ধ্বমুখী উৎক্ষেপে অন্ধকার আকাশে উচ্ছ্রিত হইয়া পড়িল। সে চীৎকারে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, হয় নাই কেবল ঝামরি। সেও চীৎকার করিতেছিল—"শুধা শুধা ওই রক্তখাগীকে, শুধা কেন ও তোর ছেলেটা কেড়ে লিলেক, কেন আমাকে স্বপ্ন দিলেক—শুধা তুই, চীৎকার করে শুধা—শুধা—রক্তখাগী আর কত রক্ত খাবেক—"

ঝামরি দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া অনেকটা নাচের ভঙ্গিতে রঙ্কিণী মূর্তির দিকে আগাইয়া গেল। তাহার পর কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল আবার।

"ও জবাব দেবেক নাই। লুকুর লুকুর করে ভালবে খালি। ওর খ্যামতা আছে, কিন্তু বড্ড নোলা—"

"তুই চুপ করবি? চুপ কর শীগ্‌গির—"

খণ্ডোবাবা ধমক দিলেন আবার। ঝামরি মুচকি হাসিয়া গা দোলাইতে দোলাইতে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। জগদ্ধাত্রীও বসিয়া পড়িলেন এবং দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মনে মনে তিনি বলিতেছিলেন—"মা রঙ্কিণী, তোমাকে আমি চিনতাম না। অনেক দেবদেবীর পূজা করেছি, কিন্তু তোমার পূজা কখনও করিনি। তাই তুমি কি আমাকে শাস্তি দিলে? তাই কি আমার খাম্বাকে কেড়ে নিলে তুমি? কিন্তু শুধু খাম্বাকেই তো নাওনি, আমার শত্রুটাকেও তো নিয়েছ। তোমার মহিমা তোমার লীলা বোঝবার মতো বুদ্ধি নেই আমার। কিন্তু আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে মা। আমি কি করি—আমি কি করি—"

হঠাৎ নীলু রায় লক্ষ্য করিলেন কাপালিকটি অন্ধকারে অন্তর্ধান করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে যে লোকজন আসিয়াছিল তাহারাও কেহ নাই। মশালের শিখাগুলিও নিবিয়া আসিতেছে। পর্বতবেষ্টিত রঙ্কিণীর মন্দির ক্রমশ অন্ধকার হইয়া যাইতেছে।

নীলু রায় ভয় পাইয়া গেলেন। জগদ্ধাত্রীকে লইয়া কি করিবেন এখন? জগদ্ধাত্রী পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, তিনি দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়াই চলিয়াছিলেন। নীলু রায় ভাবিলেন এখন ওই পাহাড়ী জঙ্গলে ঢোকা তো অসম্ভব। হঠাৎ তিনি ডাক দিলেন—ঝামরি, এই ঝামরি, কোথা গেলি তুই? আমাদের ফেরবার ব্যবস্থা করে দে—।

কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। বিব্রত হইয়া পড়িলেন নীলু রায়। তাহার পর অদ্ভুত কাণ্ড হইল একটা। অন্ধকার ভেদ করিয়া পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো দুইটি পালকি আসিয়া হাজির হইল। বাহকেরা দীর্ঘাকৃতি, ইহার বেশী আর কিছু দেখা যায় না।

"চলেন আপনারা—"

"কোথা থেকে এলে তোমরা?"

কোন জবাব নাই।

"আমাদের পালকি আর ঘোড়া কোথায় আছে জান?"

"জানি।"

"সঙ্গে মশাল তো নেই। অন্ধকারে যেতে পারবে?"

"পারব।"

নীলু রায় তখন জগদ্ধাত্রীর নিকট গিয়া বলিলেন—বৌঠান চলুন, যাই। পালকি যখন পাওয়া গেছে—"

জগদ্ধাত্রী যন্ত্রচালিতবৎ একটি পালকিতে গিয়া উঠিয়া বসিলেন। নীলু রায় বসিলেন আর একটিতে। বাহকেরা পালকি দুইটি সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া লইল এবং নিঃশব্দে দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। বনজঙ্গল ভেদ করিয়া অবলীলাক্রমে ছুটিতে লাগিল তাহারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা বড় রাস্তায় উপস্থিত হইল। সেখানে নীলু রায়ের পালকি, ঘোড়া, লোকজন সবাই তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহাদের নামাইয়াই পালকিবাহকগণ পালকি লইয়া দ্রুতপদে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। নীলু রায় তাহাদের পারিশ্রমিক দিবেন ঠিক করিয়া তাহাদের ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা আর ফিরিল না।

নীলু রায় জগদ্ধাত্রীকে লইয়া যখন জন সাহেবের কুঠিতে পৌঁছিলেন, তখন ভোর হইতেছে।

জগদ্ধাত্রী পালকি হইতে নামিয়াই বলিলেন—"এখানে আমি আর একদণ্ড থাকব না। আজই কলকাতায় ফিরে যাব। মরতে হয় সেখানেই মরব। আপনি যাবার সব ব্যবস্থা করুন।"

নীলু রায় বুঝিলেন এ কথার প্রতিবাদ করা চলিবে না।

।। দশ।।

জফরাগঞ্জের লাল কুঠিতে ধূর্জটিমঙ্গল ঝকমারি আর বারাহীর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেখানে দাসদাসী যানবাহন সিপাহীসান্ত্রী কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি সেদিন বাড়ি ফিরিয়াই প্রথমে একটি ভালো ঘোড়া পাণ্ডবপ্রধানকে পাঠাইয়া দিলেন। ঝকমারিই সে ঘোড়াটি চড়িয়া গেল। ঝকমারি পুরুষের পোশাক পরিত্যাগ করে নাই। বারাহীকে হাসিয়া বলিয়াছিল—"আমি যুদ্ধ যাব তাই পুরুষ সেজেছি। শত্রু নিপাত করব—"

বারাহীর পাগলামী কমিয়া গিয়াছিল। শরীরও সারিয়া গিয়াছিল অনেক। এ পরিবর্তন কোন ঔষধ প্রভাবে হয় নাই। ধূর্জটিমঙ্গল যে-ই তাহাকে আশ্বাস দিলেন যে কংসকে তাহার কাছে ধরিয়া আনিবেন অমনই তাহার রোগ সারিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গলকে সে বলিল—"দাদা, আমি কিন্তু ওকে খুন করব।"

"বেশ, তাই করিস।"

বারাহীর স্বামী হংসেশ্বর বৃদ্ধ। বারাহীর সহিত তাঁহার বয়সের তফাৎ বিয়াল্লিশ বৎসর। বারাহী ছাড়া আরও কয়েকটি পত্নী ছিল তাঁহার। বারাহী স্বামীগৃহে কখনও যায় নাই। পিতৃগৃহে ধূর্জটিমঙ্গলের নিকটই সে থাকিত। হংসেশ্বরই মাঝে মাঝে বারাহীর নিকট আসিতেন। একদিন

খবর আসিল হংসেশ্বর অত্যন্ত অসুস্থ, বারাহীকে দেখিতে চান। তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা কংসেশ্বরকে তিনি পাঠাইলেন বারাহীকে লইবার জন্য। বারাহী পিতৃগৃহে থাকিত বলিয়া কংসেশ্বর তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখেন নাই। নবোদ্ভিন্নযৌবনা রূপসী বারাহীকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বারাহী দেবরের সহিত স্বামীগৃহে গেলেন এবং শয্যাগত বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথমা সতীন মৃতবৎসা, অতিসারে ভুগিতেছিলেন। তিনি রোগে শোকে এমন জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহাকেও সেবা করিতে হইত বারাহীর। অন্যান্য সতীনগুলি নিজেদের ছেলেমেয়ে লইয়া বিব্রত। তাহারাও অনেকেই অসুস্থ এবং সংসারজ্বালায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ। রোগীর সেবা করিবার সময় তাহাদের ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। চতুর্দিকেই চ্যাঁ ভ্যাঁ, চতুর্দিকেই অশান্তি, চতুর্দিকেই কলহ কচকচি। বারাহীর মনে হইল যেন একটা নরকে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সে অভিজাত বংশের মেয়ে। এই নরকেও সে স্বামী ও সতীনদের সেবা করিতেছিল। কিন্তু তাহার জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিল ওই কংস। সে ফাঁক পাইলেই আসিয়া প্রণয় নিবেদন করিত। যেদিন সে তাহার হাত ধরিয়া টানিল সেদিন বারাহীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। ঠাস করিয়া তাহার গালে এক চড় মারিয়া সে পতিগৃহে ত্যাগ করিল। বেহালা অঞ্চলে শ্বশুরবাড়ি ছিল তাহার। তাহার স্বামী হংসেশ্বর সাবর্ণচৌধুরীদের কিরকম আত্মীয় ছিলেন। বারাহী বেহালা হইতে সোজা হাঁটিয়া বাপের বাড়ি সুতানুটিতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। অনুনয় করিতে করিতে কংস কিছুদূর তাহার অনুসরণও করিয়াছিল। কিন্তু বারাহীকে ফিরাইতে পারে নাই। বারাহী বলিয়াছিল, বেশী যদি বাড়াবাড়ি কর ডেকে লোক জড় করব। কংস আর অগ্রসর হইতে সাহস পায় নাই। সেকালে পথঘাট ভালো ছিল না, অনেক জায়গায় বনজঙ্গল ছিল, যানবাহন সুলভ ছিল না। বারাহী পদব্রজেই সুতানুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই শুনিল চারিদিকে পালা রব উঠিয়াছে। টালা দিয়া নবাবের ফৌজ নাকি আগাইয়া আসিতেছে। ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন এখন বাড়িতে থাকা ঠিক নয়, চল আমরা জঙ্গলে ঢুকে আত্মরক্ষা করি। দূরে ফৌজদের চীৎকার শোনা গেল। ধূর্জটিমঙ্গল ও ঝকমারি দ্রুতপদে জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। বারাহী ছুটিয়া ছাতে উঠিয়া পড়িল। চিলেকোঠার একটা ঘরে বিছানা গাদা করা ছিল। ঘরে খিল দিয়া সেই বিছানার মধ্যে লুকাইয়া রহিল বারাহী। সমস্তদিন লুকাইয়া রহিল। নবাবের সৈন্য বাড়িতে ঢুকিয়া ধূর্জটিমঙ্গলের দুই পত্নী আর ভগ্নীগণকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। চিলেকোঠার ঘরে বসিয়া তাহাদের আর্ত হাহাকার শুনিল বারাহী। কিছু করিতে পারিল না, দুরু দুরু হৃদয়ে বসিয়া রহিল কেবল। সমস্ত দিন কাটিল, সমস্ত রাত কাটিল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া অবশেষে সে চিলেকোঠার দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দেখিল লুণ্ঠনের চিহ্ন চারিদিকে। কেহ নাই। দাসী চাকররাও পালাইয়া গিয়াছে। উঠানে কূপ ছিল, কূপের ধারে দড়ি বাঁধা একটা ছোট বালতি ছিল। বারাহী উঠানে নামিয়া বালতি কূয়ায় নামাইয়া জল তুলিতেছিল। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল তাহার।

"এ কি, তুমি এখনও এখানে আছে?"

বারাহী চমকাইয়া উঠিল। দেখিল খিড়কি দরজায় কংস দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সর্বাঙ্গ যেন জমিয়া গেল। প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল সে। কংস হাসিয়া বলিল—"ভয় কি, আমি যখন

এসে গেছি, তখন তোমাকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে আর কোন ভয় থাকবে না। দাঁড়াও একটা পালকি নিয়ে আসি।"

কংস চলিয়া গেল। বারাহী জল তুলিয়া বালতিতে মুখ লাগাইয়াই খানিকটা জল খাইয়া ফেলিল। তাহার পর আবার চিলেকোঠায় উঠিয়া খিল দিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। অনেকক্ষণ পরে শব্দ পাওয়া গেল। একাধিক পদশব্দ। সিঁড়ি দিয়া শব্দ ছাদে উঠিল। তাহার পর চিলেকোঠার দরজায় ঘা পড়িল।

"কপাট খোল। আমি এসে গেছি—"

বারাহী কপাটে খুলিল না। তাহার পর পদাঘাতের পর পদাঘাত পড়িতে লাগিল কপাটের উপর। জীর্ণ কপাট সে প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। ভাঙিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিল দুইজন মুসলমান ফৌজি সিপাহী। দুইজনেরই কষকষে কালো দাড়ি, কাঁধে বন্দুক। তাহাদের পিছনে কংস, মুখে অদ্ভুত একটা কুটিল হাসি।

সিপাহী দুইটি ঘরে ঢুকিয়া কোন ভূমিকা না করিয়া বাহারীকে ধরিয়া ফেলিল এবং টানিতে টানিতে নীচে লইয়া গেল।

কংস বলিল—"যে চড়টা মেরেছিলে সেটা সুদশুদ্ধ শোধ করে দিলাম।"

তাহার পর সিপাহীদের দিকে চাহিয়া বলিল—"আরও দুই একটা বাড়িতে খবসুরৎ লেড়কী আছে তাহাদের সন্ধানও আপনাদের দিব। আমার সঙ্গে আসুন।"

সংক্ষেপে ইহাই কংসের ইতিহাস।

ধূর্জটিমঙ্গল কংসের খোঁজে উমিচাঁদের জমাদার জগন্নাথকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। মৈনি বিবির মাধ্যমে জগন্নাথের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। মহম্মদী বেগও তাঁহার নিকট আসা যাওয়া করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল ধূর্জটিমঙ্গল মালদার লোক, ভাল করিয়া খিদমত করিতে পারিলে তাহার কিসমত ফিরিয়া যাইবে। সে যুগে সকলেই নিজের নিজের কিসমত ফিরাইতে ব্যগ্র থাকিত। অর্থের বিনিময় হীনকর্ম করিতেও কেহ পশ্চাৎপদ হইত না। স্বয়ং নবাব সিরাজউদ্দৌলাই অর্থের জন্য তাঁহার আপন মাসী ঘসেটি বেগমের মতিঝিল লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, রাজবল্লভকে পীড়ন করিয়াছিলেন, জগৎশেঠকে অপমান করিয়াছিলেন, বিদেশী বণিকদের নিকট হইতে নানাছলে নজরানা ও জরিমানা আদায় করিয়াছিলেন। সেকালে টাকার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন এমন লোকের সংখ্যা বড় বেশী ছিল না। ইতর-ভদ্র হিন্দু-মুসলমান সকলেই টাকার গন্ধ পাইলে নীতি-ধর্ম বিসর্জন দিতে ইতস্তত করিতেন না। টাকা, মেয়েমানুষ এবং নবাব সরকারের দাক্ষিণ্যলাভ এই তিনটিকে কেন্দ্র করিয়াই নাগরিক জীবন আবর্তিত হইত, রাজনীতিও এই তিনটি চক্রে চক্রায়িত হইত। অধিকাংশ ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল এই তিনটি জিনিসই।

মহম্মদী বেগ আসিয়া ধূর্জটিমঙ্গলকে জানাইলেন—"আসফ আলী এখন মুর্শিদাবাদেই আছেন। তিনি ফৌজে কাজ করেন।"

"তাঁর বাড়ি কি এখানেই?"

"না। তিনি এলাহাবাদের লোক। এখানে নোকরি করেন।"

"কোথায় থাকেন?"

"থাকেন নাজমা বিবির বাড়িতে।"

"তাঁর পরিবার এখানে নেই?"

"না। তারা সব এলাহাবাদে।"

এই খবরটি সরবরাহ করার জন্য ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহাকে অনেক 'শুক্রিয়া' দিলেন। তাহার পর আর একটি প্রশ্ন করিলেন।

"উজির আহমদের কোনও খবর পেলেন না?"

"তিনি এখানে নেই। খবর পেলাম রাজমহলে ফৌজি দরকারে গেছেন! কিছুদিন এখন ওইখানেই থাকবেন। জনাব মীরজাফর সাহেবের ভাই জনাব মীরদাউদ ওখানে ফৌজদার এখন।"

ধূর্জটিমঙ্গল আবার তাঁহাকে 'শুক্রিয়া' দিয়া ছোট একটি রেশমের থলি উপহার দিলেন। থলির ভিতর পঞ্চাশটি মোহর ছিল।

মহম্মদী বেগ সেলাম করিলেন।

"আসফ আলীর সঙ্গে দেখা করবেন কি? যদি যান আমি নিয়ে যেতে পারি।"

"যদি যাই খবর পাঠাব আপনাকে।"

অভিবাদন করিয়া মহম্মদী বেগ চলিয়া গেলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। আসফ আলির আদেশে তাঁহার কলিকাতার ঘরবাড়ি পুড়িয়াছে এ খবর যেদিন তিনি মীর মহম্মদের নিকট পাইয়াছিলেন সেইদিনই তিনি স্থির করিয়াছিলেন আসফ আলিকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ দিয়া করিতে হইবে। কিন্তু হত্যাটা তিনি নিজে করিতে চান না, কোন গুণ্ডাকে দিয়া করাইতে চান। খবর লইয়া তিনি জানিয়াছেন যে মহম্মদী বেগ একজন নামী গুণ্ডা। নবাবের আশ্রয়ে বাস করে। অর্থের বিনিময়ে খুন রাহাজানি করাই নাকি তাহার পেশা। কিন্তু এই পেশাদার গুণ্ডাকে হঠাৎ বিশ্বাস করা উচিত কি? ধূর্জটিমঙ্গল স্থির করিলেন বন্ধু মাণিক্যপ্রধানের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিবেন। পাণ্ডব প্রধানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিক্যপ্রধানের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আছে। সে বিশ্বাসযোগ্য লোকও বটে। তাঁহাকে প্রত্যহ তো তাহাদের বাড়ি যাইতেই হয়। কিন্তু মাণিক্যের সহিত তাঁহার বড় একটা দেখা হয় না। সে বাহিরে বাহিরেই বেশীর ভাগ সময় থাকে। নবাব সরকারে ইংরেজদের প্রতিনিধি ওয়াট্‌সের সহিত তাহার নাকি বড়ই হৃদ্যতা। সেদিন ভাগ্যক্রমে তাহার সহিত দেখা হইয়া গেল। মাণিক্য রূপবান লোক। ছিপছিপে লম্বা, গৌরবর্ণ, মাথায় বাবরি চুল, চক্ষু দুইটি স্বপ্নময়, সরু গোঁফজোড়া কে যেন ঠোঁটের উপর আঁকিয়া দিয়াছে। পরিধানে জরিদার ঘুণ্টি দেওয়া সাদা পাঞ্জাবি, ঢিলা পায়জামা। পায়ে মখমলের আগ্রাই নাগরা, বাঁ হাতে তর্জনীর উপর একটা পোষা হরবোলা পাখি। পাখির একটি পা কালো রেশমের ডোরা দিয়া বাঁধা, ডোরাটি তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধের উপর নিবদ্ধ। মাণিক্যপ্রধানের নিজের একটি তাঞ্জাম আছে, সেই তাঞ্জামেই তিনি সর্বত্র যাতায়াত করেন। ধূর্জটিমঙ্গল যখন গেলেন তখন মাণিক্যের তাঞ্জামটি রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল। ধূর্জটিমঙ্গলঅনুমান করিলেন মাণিক্য বাড়িতেই আছে। বৈঠকখানায় কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বৈঠকখানার বিস্তৃত ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়া পাণ্ডব প্রধান বসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সোচ্ছ্বাসে সংবর্ধনা করিলেন।

"এস, এস, এস। আজ মাণিক নতুন ঘুগনি এনেছে, তাতেই তর হয়ে আছি—"

"কি রকম ঘুগনি?"

"ফরাসী ঘুগনি। ইয়োরোপে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ বেধেছে। এদেশের ইংরেজরাও ফরাসীদের এদেশ থেকে উৎখাত করতে চায়। ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের সন্ধি হয়েছে। ইংরেজরা নবাবকে বলছে তুমি আমাদের মিত্র, সুতরাং আমাদের শত্রু তোমারও শত্রু। তুমি তোমার রাজত্ব থেকে ফরাসীদের তাড়িয়ে দাও। কিন্তু নবাব মনঃস্থির করতে পারছেন না, দু'নৌকোয় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মনে মনে বুঝতে পারছেন সবাই তাঁর উপর চটা। মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, ইয়ারলতিফ, দুর্লভরাম এমন কি হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার রায় সবাই দুমুখো সাপ হয়ে বসে আছেন। রাজা মাণিকচাঁদও একটি অগ্নিগর্ভ পর্বত হয়ে আছেন। নবাব তাঁকে কয়েদ করেছিলেন, দশলাখ টাকা জরিমানা দিয়ে সে মুক্তি পেয়েছে। সে এখন তলে তলে নবাবের বিরুদ্ধে ইন্ধন যোগাচ্ছে ক্লাইভের দরবারে গিয়ে। নবাব ভাবছেন ফরাসীরা আমার সহায় আছে—কাশিমবাজার কুঠির লা সাহেব আমার বন্ধুলোক। যুদ্ধেও তারা ইংরেজদের চেয়ে কম পটু নয়—তাদের চটানো কি উচিত? এদিকে মাণিক আজ খবর এনেছে কলকাতা থেকে অ্যাডমিরল ওয়াট্‌সন্ অ্যায়সা কড়া এক চিঠি লিখেছে নবাবকে যে তাঁর চক্ষু নাকি চড়কগাছ হয়ে গেছে। ওয়াট্‌সন্ হেঁজিপেঁজি লোক নয়, কোম্পানির চাকরও নয়, সে কুইনের প্রতিনিধি, ক্লাইভকেও দাবড়ি দেয়। ইংরেজদের যুদ্ধজাহাজের মালিক সে। সে নবাবকে লিখেছে—আপনি যদি ফরাসীর বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য না করেন তাহলে আপনার রাজত্বে এমন আগুন জ্বালিয়ে দেব যে সমস্ত গঙ্গার জল ঢেলেও সে আগুন নেভাতে পারবেন না। নবাবের আর একটা আতঙ্ক আহমদ শা আবদালী। সে দিল্লী লুঠ করেছে কিছুদিন আগে। গুজব ছড়িয়েছিল সে বাংলাও নাকি লুঠ করবে। ভয়ে তটস্থ হয়েছিলেন সিরাজ। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে সে দিল্লী থেকে দেশে ফিরে যাচ্ছে। এখানে আর আসবে না। তাই নবাবের আতঙ্ক কমেছে একটু। আর একটা খবরও এনেছে মাণিক। ক্লাইভ নাকি স্থলপথে সসৈন্যে যাত্রা করেছেন চন্দননগর আক্রমণ করবেন বলে। তিনি বরানগরের কাছ বরাবর গঙ্গা পার হয়ে চন্দননগরের পাশে গেরিটির বাগানে তাঁবু গেড়েছেন। নন্দকুমার ওখানকার ফৌজদার। তার বাধা দেওয়া উচিত ছিল ক্লাইভকে। কিন্তু তিনি চুপটি করে বসে আছেন। সব তলে তলে সড়, বুঝলে? ঘুগনি কিন্তু মজাদার। হ্যাঁ, তুমি কাল চন্দ্রপুলি খেয়ে যাওনি বলে বুড়ী রেগে টং হয়ে গেছে, আজ খেয়ে যেও। তোমার জন্যে রাখা আছে।"

"মাণিক কোথা?"

"ভিতরে আছে। 'টি' নিয়ে ব্যস্ত আছে বোধহয়—"

"সে আবার কি!"

"ওয়াট্‌স্ সাহেব ওকে কালো কালো শুকনো পাতা দিয়েছে কিছু। গরম জলে ভিজিয়ে তারপর ছেঁকে দুধ আর চিনি মিশিয়ে খেতে হয়। মাণিকবাবু শৌখিন মানুষ তো, ওইসব নিয়ে থাকতে ভালবাসেন।"

ধূর্জটিমঙ্গল সোজা অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। বিরাট অন্দরমহল। প্রত্যেক ছেলের জন্যই একটা করিয়া মহল। ধূর্জটিমঙ্গল মাণিক্যপ্রধানের মহলে গিয়া ঢুকিলেন।

"আরে, আরে ধুজু যে। তুমি এসেছ শুনেছি, কিন্তু তোমার দেখাই পাইনি। অথচ তুমি রোজ আস—"

"বহু ভাগ্য না হলে মাণিক্যের নাগাল পাওয়া যায় না।"

"ধূর্জটির নাগাল পাওয়া তো আরও ভাগ্যের কথা—"

জড়াইয়া ধরিলেন তিনি ধূর্জটিমঙ্গলকে।

তাঁহার হরবোলা পাখিটা নিকটেই একটা দাঁড়ে ছিল, সে সুমিষ্ট একটা শিস দিল।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"শুনলাম তুমি 'টি' নিয়ে ব্যস্ত আছ।"

"হ্যাঁ, একটা নতুন জিনিস দিয়েছে ওয়াট্‌স্ সাহেব। খাবে?"

"না এখন থাক। মা আমার জন্যে চন্দ্রপুলি রেখেছেন শুনলাম, সেটা খেতেই হবে। টি পরে খাব। তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে। শুধু গোপন নয় জরুরিও। কখন তোমার সময় হবে?"

"সময়ের অভাব কি, আমি তো কারো চাকরি করি না।"

হরবোলা পাখি করুণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ফটি—ক জল','ফটি—ক জল'। তাহার পরই বুলবুলের স্বরে বলিল—'কৃষ্ট প্রিয়' তাহার পরই আবার ফিঙের মতো— মেকি কি, মেকি কি।

"চুপ কর ফক্কোড় কোথাকার!"

পাখিকে ধমক দিলেন মাণিক্যপ্রধান। পাখিটা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় হইতে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার কাঁধে বসিয়া বলিল—'বউ কথা কও'।

"কি দুষ্টু দেখেছ—"

"চমৎকার হরবোলাটি, সাধারণত লোকে বুলবুল পোষে, তুমি এ হরবোলা পেলে কোথায়?"

মাণিক্য এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর নিম্ন কণ্ঠে বলিলেন,"নাজমা উপহার দিয়েছে।"

"নাজমা? যার কাছে আসফ আলি থাকে?"

মাণিক্য আরও নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"আসফ আলি ওর ভরণপোষণ করে, আমি করি চরণতোষণ। চুপ, এ আলোচনা এখানে নয়। এখানে গোপন কথা বলা যায় না। কি গোপন পরামর্শ করবে বলছিলে? তুমিও জুটিয়েছ নাকি কাউকে—"

"আমার তো মৈনি আছেই। না সে সব কথা নয়, অন্য কথা।"

"খুব গোপনীয়?"

"খুব গোপনীয়।"

"তাহলে এখানে নয়। তোমর বাসায় চল। জাফরাগঞ্জে লাল কুঠিটাতে আছো তো?"

"হ্যাঁ।"

"কে আছে সেখানে?"

"ঝকমারি আর বারাহী। মনে আছে ওদের?"

"মনে আছে বোধহয়। মন তো ভাই এইটুকু, আর মনে রাখবার মতো জিনিস রাশি রাশি। সব আঁটে না তাই। তারা কি যুবতী হয়েছে?"

"বারাহীর তো বিয়েই হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। আর ঝকমারি বিয়ে করেনি। পুরুষের পোশাক পরে থাকে, বলে লড়াই করব। আমার ঠাকুর্দার ডাকাত বন্ধু ভোজপুরী ঝঞ্ঝার সিংয়ের দৌহিত্রী।"

"তোমার বাসায় ফাঁকা ঘর নিশ্চয় পাওয়া যাবে একটা?"

"তা যাবে।"

"তাহলে তোমার বাসাতেই যাওয়া যাক চল।"

"বেশ। আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি তাহলে।"

মায়ের মহল একেবারে আলাদা। সেখানে উঠানেই শ্বেত-প্রস্তর নির্মিত একটি শিবমন্দির। সেই মন্দিরটিকে ঘিরিয়া একটি চকমিলানো ছোট বাড়ি। নীচে প্রশস্ত দালানে নাতি-নাতনী পৌত্র-পৌত্রীর দল খাইতে বসিয়াছে। কনিষ্ঠ বধূটি পরিবেশন করিতেছেন। দালানের মাঝখানে একটি উচ্চাসনে বসিয়া আছেন মা। তিনি খাওয়ার তদারক করিতেছেন। ধূর্জটিমঙ্গল গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি ভর্ৎসনার সুরে বলিয়া উঠিলেন—"তুই কাল না খেয়ে পালিয়ে গেলি যে বড়। তুই চন্দ্রপুলি ভালোবাসিস বলে কাল তোর জন্যেই চন্দ্রপুলি করেছিলাম, আর তুই না খেয়েই চলে গেলি?"

"দিন, এখন খাব।"

"বৌমা, ধূজুকে এইখানেই একটা ঠাঁই করে দাও।"

ধূর্জটিমঙ্গলকে দেখিয়াই বধূটি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। শাশুড়ীর আদেশে সে একটি কার্পেটের আসন বিছাইয়া দিল।

"রুপোর থালায় ওর জন্যে পাঁচগণ্ডা চন্দ্রপুলি আলাদা রেখে দিয়েছি। বারকোস ঢাকা আছে। সেইটে নিয়ে এস। পায়েসও দাও একবাটি। আর বাগান থেকে যে কোহিতুর আম এসেছে তাই দাও গোটাকতক। ভালো বেগমপসন্দ যদি থাকে তাও এনো—"

ধূর্জটিমঙ্গল একটু প্রতিবাদ করিতে গেলেন—"মা এখন অত—"

ধমকাইয়া উঠিলেন মা।

"কথাটি বলতে পাবে না। এমন কিছু বেশী দিচ্ছি না।"

ধূর্জটিমঙ্গল আর প্রতিবাদ করিলেন না।

একটু পরে বধূটি কুড়িটি চন্দ্রপুলি, এক জামবাটি পায়েস, পাঁচটি কোহিতুর এবং পাঁচটি বেগমপসন্দ আম তাঁহার সামনে সাজাইয়া দিল। ধূর্জটি নীরবে খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেগুলি শেষ করিয়া ফেলিলেন।

"চন্দ্রপুলি কেমন লাগল?"

ধূর্জটিমঙ্গল সংক্ষেপে বলিলেন—"অমৃত।"

মাণিক্যপ্রধান এবং ধূর্জটিমঙ্গল জাফরাগঞ্জের বাসায় একটি নির্জন ঘরে বসিয়াই আলাপ করিতেছিলেন। সমস্ত শুনিয়া মাণিক্যপ্রধান বলিলেন—"তুমি আসফ আলিকে হত্যা করবেই ঠিক করেছ?"

"কেন, তোমার আপত্তি আছে?"

"আমার আপত্তি থাকবে কেন! কি আশ্চর্য, সৎকার্যে আমি আপত্তি করেছি কখনও?"

হরবোলটা তাঁহার হাতের উপর বসিয়াছিল। মাণিক্য তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—"আমি সৎকাজে কখনও আপত্তি করি?"

হরবোলা উত্তর দিল—"রামঃ রামঃ রামঃ।"

মাণিক্যপ্রধান বলিলেন—"পাপীকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে। আমি ভাবছি ছুরি দিয়ে হত্যা করবে, না পুড়িয়ে মারবে—"

"পুড়িয়ে মারার অনেক ঝঞ্ঝাট। আমি লোক লাগিয়ে হত্যা করতে চাই এবং হত্যা করবার আগে তাকে জানিয়ে দিতে চাই কেন তাকে হত্যা করা হল। মহম্মদী বেগ লোকটাকে কাজে লাগাব কিনা সেইটেই জানতে চাই।"

"গুণ্ডা হিসাবে ভাল। কাজ ঠিক হাসিল করে দেবে। কিন্তু খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর কারো কাছে টাকা খেয়ে তোমার নামটা প্রকাশ করে দেবে হয়তো। তার চেয়ে এক কাজ কর—"

"কি— "

ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ বেধেছে চন্দননগরে। ফরাসীদের সাহায্য করবার জন্য নবাব কিছু সৈন্য মোতায়েন রাখতে বলেছেন নন্দকুমারকে। আসফ আলি সেই সৈন্যদলে থাকবে। ইংরেজদের দলেও দেশী সিপাহী অনেক আছে। সেই সিপাহীদের মধ্যে আছে চক্রধর কপাট। যেমনি জোয়ান তেমনি নিষ্ঠুর। তাকে আমি হাত করতে পারি। পঞ্চাশটা কিংবা বড়জোর একশ'টা মোহর কবলালে সে সোজা গিয়ে আসফ আলিকে খুন করে আসবে। সবাই জানবে আসফ আলি যুদ্ধে মারা গেছে।"

"কিন্তু আমি তাকে জানাতে চাই যে আমি তাকে তার পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি।"

"তাহলে একটা চিঠি লিখে ফেল। লেখ—জনাব আসফ আলি খাঁ তুমি আমাদের ঘর পুড়িয়ে যে পাপ করেছ, তার জন্যে আমি তোমাকে শাস্তি দেব। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক। নীচে কোন নাম দেবার দরকার নেই। এ চিঠি আমি আসফ আলির কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি।"

"আমি এক্ষুণি লিখে দিচ্ছি।"

"কিন্তু তোমার না লেখাই ভালো। আর কাউকে দিয়ে লেখাও।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"এ বাড়িতে আমি ছাড়া ফার্সি কেউ জানে না। নীলু জানত। কিন্তু সে তো এখানে নেই।"

"উর্দুতে লিখলেও চলবে—"

"ঝকমারি উর্দু জানে। বাবা ছেলেবেলায় ওকে উর্দু শিখিয়েছিলেন।"

'কিন্তু ঝকমারি মেয়েছেলে, তাকে বিশ্বাস করবে?"

"আমার যাতে অনিষ্ট হয়, সে এমন কিছু কখনও করবে না।"

"কুর্র্র্র্—।"

একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ শব্দ করিয়া হরবোলা মাণিক্যপ্রধানের স্কন্ধে আরোহণ করিল।

মাণিক্যপ্রধান হাসিয়া বলিলেন—"এর মানে ওর ক্ষিধে পেয়েছে, আমাকে বাড়ি যেতে হবে—"

"কি খায় ও? এখানেই ওর খাবার দিচ্ছি—"

"ওর খাবার তুমি দিতে পারবে না। ও খায় মাকড়শা, উচ্চিংড়ে, মধু আর পেস্তা কিসমিস। ওর চাকর ভেড়ুয়া ওর খানা তৈরী করে। তুমি ডাক না ঝকমারিকে। তাকে দিয়ে আমি চিঠিটা লিখিয়ে নিয়ে চলে যাই।"

ডাকিতেই ঝকমারি আসিল। সে পাশের ঘরেই ছিল। পুরুষের বেশেই ছিল সে। পাঞ্জাবি ও চুস্ত পাজামা পরিয়া চমৎকার দেখাইতেছিল তাহাকে।

মাণিক্য হাসিয়া বলিলেন—"পুরুষ বেশে চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে। ধুজু বলছিল তুমি নাকি লড়াইয়ে যেতে চাও?"

ঝকমারি সাগ্রহে বলিল—"হ্যাঁ চাই। আমি নবাবদের বিরুদ্ধে লড়ব। ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?"

"তা পারি। আমার দূরসম্পর্কের ভাই বলে পরিচয় দিলে ওয়াট্‌স তোমাকে সুপারিস করে কালা ফৌজে ভরতি করিয়ে দিতে পারে। বলব তাকে?"

"হ্যাঁ, বলুন বলুন।"

ধূর্জটিমঙ্গল মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

"উর্দু লিখতে জান?"

"জানি—"

"তাহলে এই চিঠিটা নকল করে আন দেখি। ধুজু চিঠিটা লিখে ফেল তুমি।"

ধূর্জটিমঙ্গল উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন এবং চিঠিটা লিখিয়া লইয়া আসিলেন।

"এইটে নকল করে আন তুমি—"

ঝকমারি একটু অবাক হইয়া গেল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করিল না। চিঠিটা লইয়া পাশের ঘরে গেল এবং নকল করিয়া আনিল।

হরবোলা আবার বলিল—কুর্‌র্‌র্‌র্—।

"এর ক্ষিধে পেয়েছে। আমি এখন উঠি। পরে আসব—"

"আমাকে ফৌজে ঢুকিয়ে দেবেন?"

ঝকমারি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল আবার।

"ধুজু যদি রাজী হয়, চেষ্টা করতে পারি!"

ধূর্জটিমঙ্গল হাসিয়া উত্তর দিলেন—"পাগল নাকি!"

মাণিক্যপ্রধান বলিলেন—"আচ্ছা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাও তাহলে। আমি তোমাকে একটা ফৌজি পোশাক পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেইটে পরে বাড়িতেই ঘোরাফেরা কর। পোশাক আমার বাড়িতেই আছে, এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

হরবোলা আবার বলিল—কুর্‌র্‌র্‌র্

"যাচ্ছি যাচ্ছি, চল। ক্ষিদে পেলে একদণ্ড তিষ্ঠুতে দেবে না কোথাও।"

মাণিক্যপ্রধান চলিয়া গেলেন।

ঝকমারি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল—"আসফ আলি নামটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ আসবার সময় জঙ্গলে মীর মহম্মদের কাছে শুনেছিলাম এ লোকটা আমাদের ঘরবাড়িতে আগুন দিয়েছিল। একে শাস্তি দেব।"

"আমাকে যুদ্ধে যেতে দাও, আমিই ওকে শাস্তি দেব।"

"এই তুচ্ছ কাজের জন্য তোমাকে এত বড় সর্বনাশের ভিতর পাঠাতে পারি না।"

"আমিও তো তুচ্ছ। আমি তোমার জীবনে বাধা একটা। আমি তো তোমাদের কোনও কাজেই লাগিনি। এই কাজটি করতে দাও আমাকে—"

"না, তুমি পবিত্র, মহিমময়ী তোমাকে দিয়ে আমি নরহত্যা করাতে পারি না।"

"মা কালীও তো নারী, তিনি তো—"

"তিনি দেবতা, তুমি মানুষ। তফাত অনেক। আসফ খাঁ মরবে, কিন্তু তার সঙ্গে তোমাকেও মরতে দিতে পারি না।"

"আসফ খাঁকে মারবার অধিকার আমারই আছে। প্রথম যেদিন সেই অন্ধকার গুহায় ওই নামটা শুনেছিলাম সেইদিনই যেন আমার মনের অন্ধকার গুহায় একটা সাড়া জেগেছিল। তখন বুঝতে পারিনি এখন পাচ্ছি। এখন সেই যুদ্ধক্ষেত্রটা দেখতে পাচ্ছি আমি—"

ঝকমারি সামনের আসনটায় বসিয়া বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর দুলিতে লাগিল ধীরে ধীরে।

"আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি রানী দুর্গাবতীকে। রাজপুত চন্দেল বংশের উজ্জ্বল মহিমা, মাহোবারাজের বীর কন্যা, গড়মণ্ডলাধিপতির মহারানী দুর্গাবতীকে দেখতে পাচ্ছি আমি। আমিই দুর্গাবতী। আমি বিধবা হয়েছি। স্বামী চারবছর আগে মারা গেছেন। আমার রাজ্য আক্রমণ করেছেন সম্রাট আকবর। অনেক সৈন্য নিয়ে এসেছে সেনাপতি আসফ খাঁ। আমি হাতির পিঠে চড়ে সেনা পরিচালনা করছি তার বিরুদ্ধে। হঠাৎ দুটো তীর লাগল আমার মুখে। একটা তীর আমার চোখে বিঁধল। এই দেখে আমার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল। আমি বার বার ডাক দিলাম সবাইকে। ফেরো, ফেরো, ফেরো তোমরা। কেউ ফিরল না। নিরুপায় হয়ে মাহুতের হাত থেকে ছোরা নিয়ে আত্মহত্যা করলাম তখন। আসফ খাঁর সৈন্য গড়মণ্ডল অধিকার কবল, কিন্তু আমাকে অধিকার করতে পারল না। সেই আসফ খাঁ আবার আমাদের ঘর পুড়িয়েছে, এবার তাকে আমিই শাস্তি দেব। আমিই শাস্তি দেব—"

ঝকমারি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে তুলিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন।

ঝকমারি সমস্ত দিন অজ্ঞান হইয়াই রহিল। অজ্ঞান অবস্থায় বিড়বিড় করিয়া কি যে বলিতে লাগিল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। কারণ যে ভাষায় সে বলিতেছিল সে ভাষা বাংলা ভাষা নয়। ইহা দেখিয়া বারাহীরও কেমন যেন মাথা খারাপ হইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—মর মর মর, মরে শান্তি পা। এদেশে মেয়েমানুষ হয়ে জ'ন্মালে আর নিস্তার নেই। মরতেই হবে। আমি মরব। কিন্তু কংসকে মেরে তারপর মরব।"

ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে আলাদা একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। বিপদের সময় ধূর্জটিমঙ্গল বিচলিত হন না। তিনি ঝকমারির মাথার শিয়রে বসিয়া বার বার তাহার চোখে মুখে, চুলে গোলাপের আসব সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ঝকমারিকে সেবা করিতে পারে এরকম দাসী বাড়িতে ছিল, কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গল কোনও দাসী নিয়োগ করিলেন না, নিজেই তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ মৈনিবিবি আসিয়া হাজির। তাহার সর্বাঙ্গে সাদা মসলিনের অপরূপ ওড়না, পিছনে জরির ফিতা জড়ানো বেণী, চোখে সুরমা। মুখে মৃদু হাসি। ছিপছিপে কালো দেহটি ঘিরিয়া যে স্নিগ্ধতা বিচ্ছুরিত হইতেছে তাহা স্থূল নহে সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম।

ধূর্জটিমঙ্গলের কাছে আসিয়া সে বলিল—"রাজা, কি হয়েছে? একবারও যাননি কেন আমার কাছে?"

"বড় ব্যস্ত আছি—"

"এ কে?"

"আমাদের পরিবারেরই একজন। বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল খসখসের হাতপাখা দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। মৈনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। নীরবে কি যেন হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহার পর বলিল, "আমি তাহলে যাই। ওস্তাদ কেরামত ফিরে এসেছেন, সেই খবরটা দিতে এসেছিলাম। আমি চললাম।"

"যাচ্ছ কেন, বস না।"

"না এখন বসা ঠিক হবে না।"

মৈনি চলিয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল ঝকমারির শয্যাপার্শ্বে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে ঝকমারির জ্ঞান হইল, ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল সে। তাহার পর পাশ ফিরিয়া শুইল।

একটু পরেই মাণিক্যপ্রধানের একটি দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একপ্রস্থ ফৌজি পোশাক এবং একটি পত্র। মাণিক্যপ্রধান উর্দুতে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম—চন্দননগরে যুদ্ধ লাগিয়া গিয়াছে। নবাব সাহেব ফরাসী লা সাহেবকে কাশিমবাজার কুঠি ছাড়িয়া পাটনায় চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন। আসফ আলি খাঁকে পত্র পাঠাইয়াছি। উজির আহম্মদ এখানে নাই। রাজমহলে আছে। ওস্তাদ কেরামত আসিয়া তাহার সেই পুরাতন পোড়ো বাড়িটাতে উঠিয়াছে। আমি সন্ধ্যায় সেখানে যাইব। তুমি আসিলে কেরামত খুশী হইবে। ঝকমারির পোশাক পাঠালাম। পত্রপাঠ শেষ করিয়া ধূর্জটিমঙ্গল ঝকমারিকে বলিলেন—মাণিক তোমার জন্যে ফৌজি পোশাক পাঠিয়েছে ।

ঝকমারি সোৎসাহে উঠিয়া বসিল।

"তাই নাকি! কই দেখি—"

পোশাক লইয়া সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গল মাণিক্যের পত্রটি আর একবার পাঠ করিলেন। তাহার পর উঠিয়া সন্তর্পণে বারাহীর ঘরের শিকলটি খুলিয়া দেখিলেন পাগলী অঘোরে ঘুমাইতেছে। সন্তর্পণে শিকলটি আবার তুলিয়া দিলেন তিনি। ফৌজিসাজে সাজিয়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল ঝকমারী। তাহার একমুখ হাসি, চক্ষু দুইটি উদ্ভাসিত।

"গায়ে ঠিক হয়েছে?"

"খুব ঠিক হয়নি। একটু ঢিলে হয়েছে। কিন্তু এতেই চলে যাবে।"

"সিপাহীজি, তুমি তাহলে বারাহীকে পাহারা দাও। আমি কেরামতের সঙ্গে একটু দেখা করে আসি।"

"বেশ।"

মুর্শিদাবাদ শহরের বাহিরে একটি বাগানের মধ্যে ছোট একটি বাড়ি। তাহাতে শামাদানে ছোট একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। প্রদীপের সামনে একটি শতরঞ্জি পাতা। সেই শতরঞ্জির উপর গেরুয়া রঙের একটি আলখাল্লা পরিয়া কেরামত সারেঙ্গী বাজাইতেছিল। কেরামত কন্দর্পকান্তি, কিন্তু তাহার রূপের মধ্যে লালসার কোন আভাস নাই। তাহা যেন অতি পবিত্র, দেখিলেই সম্ভ্রম জাগে। যদিও তাহার পোশাক অতি সাধারণ, যদিও তাহার অঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই, যদিও তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত গোঁফদাড়িতে আতর বা অন্য কোন সুগন্ধের চিহ্ন মাত্র নাই, তবু তাহাকে ঘিরিয়া এমন একটি আভিজাত্য বিরাজ করিতেছিল যাহা দুর্লভ। মনে

হইতেছিল অদৃশ্য এক সিংহাসনে একজন সম্রাট যেন বসিয়া আছেন। সামনে আর একটি ছোট আসনে পুতলিবিবি পুতুলের মতই বসিয়া ছিল। তন্ময় হইয়া বাজনা শুনিতেছিল সে। তাহার যেন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। বাজনা শেষ করিয়া কেরামত তাহার দিকে চাহিতেই সে ঝুঁকিয়া সেলাম করিল। কেরামতের বাজনা শোনার পর পুতলি বরাবরই সেলাম করে। বলে—সুরের যে হুরী আসিয়া এতক্ষণ আনন্দ বিতরণ করিয়া গেল তাহাকেই কুরনিশ করিলাম। পুতলি নিজেও একটি মূর্তিমতী সুর। অপরূপ রূপসী তো বটেই তাহার ধরনধারণও অনন্য। কথা খুব কম বলে। কিন্তু তাহার কম্পমান অধর, তাহার চকিত দৃষ্টি, কপালের উপর ক্রীড়াশীল তাহার চূর্ণ অলকদাম, তাহার সমগ্র মুখমণ্ডলের সদা-উন্মুখ ভাব, তাহার ঈষৎ বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র তাহাকে যে অবর্ণনীয় শ্রী-শোভায় মণ্ডিত করিয়াছে, একমাত্র সুরের সহিতই তাহা উপমেয়।

কেরামত বলিলেন—"এইবার তুমি তোমার বীণা শোনাও।"

ইহাদের কথাবার্তা উর্দুতেই হয়, আমি বাংলা অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"আপনার সারেঙ্গীর পর আমার বীণা জমবে না।"

কেরামত হাসিয়া বলিলেন—"পুতলি ও কথাটা তুমি বিশ্বাস কর না কেন যে, তুমি আমার চেয়ে অনেক বড় বাজিয়ে?"

পুতলি আবার অভিবাদন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"শুক্রিয়া। খোদাতালা কিন্তু আমার উপর একটি মেহেরবানি করেছেন, আমার আসল "কিমৎ" কি তা বোঝবার বুদ্ধিটুকু আমায় দিয়েছেন।"

"আচ্ছা, তবে ওকথা যাক। সরফুদ্দিনকে দেখতে যাবে কি? খবর পেয়েছি ধুজু তাকে খুব আরামেই রেখেছে। এখানকার মাদ্রাসায় সে পড়াশোনা করছে। একজন ভালো মৌলভীসাহেব তার দেখাশোনা করেন। ধুজু সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।"

পুতলী নতমুখে নীরবে রহিল খানিকক্ষণ।

তাহার পর বলিল—"হুজুর যা করতে বলবেন. তাই করব।"

কেরামত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—দেখ আমার মতে ওর সঙ্গে আর দেখা না করাই ভালো। আমরা দুজনেই দেওয়ানা, আমরা যা খুঁজছি তা হয়তো ইহজীবনে পাব না। কিন্তু খুঁজতে হবে তবু। আমরণ খুঁজতে হবে। সুরের সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়েছি। চিরকাল ভেসেই যেতে চাই। কোন পিছটান থাকলে ভাসা যাবে না। আমরা ঢোলখণ্ডে সেই চাষার বাড়িতে খুব অনন্দে ছিলাম। এখানে ফিরে এসেছি সরফুদ্দিনের একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে। ধুজু ওর সব ব্যবস্থা করেছে। ধুজু আমাকে বলেছিল—ওর ভার আমি নিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। লালবাগের কাছে আমার কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি আছে। ভাবছি ধুজুর নামেই সেটা লেখাপড়া করে দিয়ে যাব। সেইজন্যেই এখানে এসেছি। কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে, তুমি ওর মা, তুমি কি ওকে ছেড়ে যেতে পারবে?"

পুতুলি বলিল—"আপনি যদি পারেন, আমিও নিশ্চয় পারব। আপনিই সরফুদ্দিনকে আমাকে দিয়েছিলেন, সরফুর চেয়ে আপনি আমার কাছে বড়। আপনি যদি সরফুকে ছেড়ে থাকতে পারেন, আমিও পারব।"

"একবারও দেখা করবে না?"

"দেখা করলে হয়তো দুর্বল হয়ে পড়ব। আপনি ঠিকই বলেছেন, দেখা না করাই ভালো। আমার কিন্তু একটা ছবি প্রায়ই মনে পড়ে। ঢোলখণ্ডের রাস্তার ধারে সেই যে ছোট্ট নদীটা ছিল। নদীর ধারে সামান্য জঙ্গল ছিল একটু। আমরা শিকারপুর থেকে ফিরছিলাম, রাস্তায় সন্ধ্যা হয়ে গেল, আকাশে চাঁদ উঠল। হঠাৎ দেখি নদীর ধারে একটা বাঘিনী তার তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে খেলা করছে। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম গাছের ছায়ায়। দেখতে লাগলাম সেই বাঘিনী আর তার বাচ্চা তিনটেকে, কি সুন্দর যে লাগছিল! এ ছবিটা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তোমার পড়ে না?"

"পড়ে বইকি। তার চেয়ে আরও সুন্দর একটা ছবির কথাও মনে পড়ে। বড়লোকের মেয়ে পুতলিবিবি গরীবের 'কুটিয়া'য় বসে বীণা বাজাচ্ছে। ভুলে গেছে তার ঐশ্বর্যের কথা, ছেলের কথা, সুর ছাড়া আর সবকিছুর কথা।"

পুতলিবিবির চোখ দুইটিতে অশ্রু টলমল করিতে লাগিল। কোন কথা না বলিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল সে। কিন্তু বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না, বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল সে।

মাণিক্য ও ধূর্জটি প্রবেশ করিলেন।

"আরে আরে এস এস, আমিই যে তোমাদের ওখানে যাব ভাবছিলাম। আমি যে এখানে এসেছি সে খবর কি করে পেলে?"

"মৈনি খবর দিয়েছে। তুমি কি মৈনির বাড়িতে গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম। সে আমার প্রিয় ছাত্রী। এখানে এসে তার সঙ্গে দেখা না করলে সে বড় অভিমান করে। তার কাছেই গিয়েছিলাম খালি, আর কোথাও যাইনি।"

ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার কাছে যাব মৈনিকে বলেছিলাম। মৈনি বললে তুমি কোথায় কখন থাক ঠিক নেই। মাণিকেরও পাত্তা পাওয়া নাকি শক্ত। শুনলাম ইংরেজদের গোলা পড়ছে চন্দননগরে, নবাবের সৈন্য যাচ্ছে চন্দননগরের দিকে। সাজ সাজ রব পড়ে গেছে চতুর্দিকে। আমি বিব্রত হয়ে পড়েছি। ভাবছি কালই চলে যাব এখান থেকে।"

"সরফুর সঙ্গে দেখা করবে না?"

"না। তুমি তো ওকে সুখে রেখেছ শুনলাম। আমরা দেখা করে হয়তো মায়ার ফাঁদে আটকে যাব। সে ইচ্ছে নেই।"

" কোথায় যাবে তোমরা?"

"জঙ্গলে। টনকপুরে এক বুড়ো চাষীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ভালো গান গায়। তার সঙ্গে দোস্তি হয়ে গেছে। তারও কেউ নেই। বুড়ো হয়ে গেছে বেচারা। নিজে রান্নাবান্না করতে পারে না। ঠিক হয়েছে পুতলি তার রান্না করে দেবে, আর আমি তার ক্ষেত পাহারা দেব। আর সময় পেলেই তিনজনে মিলে পাড়ি দেব সুরের সমুদ্রে। এখানে এসেছি তোমাকে একটা জিনিস দেব বলে।"

কেরামত উঠিয়া গেল এবং ভিতর হইতে লাল কাপড়ে জড়ানো ছোট একটি কাগজের পুলিন্দা লইয়া আসিল।

"এই নাও।"

ধূর্জটিমঙ্গলের হাতে পুলিন্দাটি দিল সে।

"কি এটা—"

"আমার ঠাকুর্দাকে নবাব সুজাউদ্দিন লালবাগের কাছে ছোটখাটো একটা জায়গীর দিয়েছিলেন। সেখানে আমাদের প্রায় তিনশ বিঘে জমি আছে, একটা বাড়ি আছে, বাগান আছে, পুকুরও আছে একটা। বাবা ওই বাড়িতেই ছিলেন, আমারও ছেলেবেলা ওখানে কেটেছে। এখন ওটা প্রায় বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে আছে। তোমাকেই ওটা দিয়ে যাচ্ছি। ওর কোবালা, কাগজপত্তর, সুজাউদ্দিনের হুকুমনামা, সব এর মধ্যেই আছে। আমিও লিখে দিয়েছি আমি সমস্ত তোমাকে দান করলাম। এখন তুমি ওটা নিয়ে যা খুশী কর। আমি এসব ভার বইতে পাচ্ছি না।"

"আমি নিয়ে কি করব। নিজের বিষয়ই আমি সামলাতে পারি না। নীলু সব দেখে—"

"নীলু কোথা এখন?"

"সে জঙ্গলমহালে ধলরাজার রাজ্যে আছে। তুমিই গিয়ে নিজের বাড়িতে বাস কর—"

"না, এদেশে বড় গোলমাল। এদেশের আবহাওয়ায় সুর নেই, আছে খালি হাল্লা। আমার ভালো লাগছে না। তুমি আমার ছেলে শরফুকে নিয়েছ, আমার বিষয়টাও নাও। আমরা টনকপুর চলে যাই।"

"টনকপুর কোথা?"

"হিমালয়ের নীচে। চমৎকার জায়গা। আর সেই বুড়ো আবিদ মিঞা বড় ভালো গান গায়। শুনবে তার একটা গান?"

কেরামত সারেঙ্গী তুলিয়া সারেঙ্গী বাজাইতে বাজাইতে গাহিতে লাগিল।

ময় দেওয়ানা হুঁ
মায় একই খবর লায়া হুঁ
খুদা কি মেহেরবানি
ফুল হোকর খিলতি হ্যায়
বহি ফুল দো মুঝকো
ফুল চুননে আয়া হুঁ
ময় একই খবর লায়া হুঁ
ময় দেওয়ানা হুঁ।

মাণিক্যের হরবোলা গান শেষ হইবামাত্র সুমিষ্টকণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'দেওয়ানা হুঁ'।

কেরামত সহাস্যদৃষ্টিতে পাখিটির দিকে চাহিয়া বলিল—"বাঃ দোস্ত। তোমার গলা আমার চেয়েও মিষ্টি।"

ধূর্জটি গম্ভীর হইয়া গিয়াছিলেন।

মাণিক্য বলিলেন—"দেখ, ভাই কেরামত, তোমার মতো বন্ধু যে আমাদের ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাবে এ আমরা সহ্য করব না। তুমি শহরে না থাকতে চাও পাড়াগাঁয়ে চল। কৈঁকালাতে আমার যে জমিদারি আছে সেখানে কোন গোলমাল নেই। চল সেখানেই তোমার ব্যবস্থা করে দিই।"

"আমি ভাই এদেশে থাকতে পারব না। তাছাড়া আবিদ মিঞা আমার পথ চেয়ে থাকবেন! আমি তাকে কথা দিয়ে এসেছি ফিরে যাব। আমাকে যেতেই হবে।"

"কিন্তু তোমাকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তোমার সঙ্গে টাকাকড়ি আছে?"

"আছে কিছু। খুব বেশী নয় অবশ্য—"

"কম টাকা নিয়ে অতদূর যাবে কি করে? হেঁটে যাবে?"

কেরামত কিছু বলিল না, হাসিল কেবল।

মাণিক্য বলিল—"বেশ, যাবে যাও। কিন্তু একটি শর্তে তোমাকে যেতে দেব। তোমার সঙ্গে আমরা কিছু টাকা দিয়ে দেব। দুজন হাতিয়াবন্দ লোকও সঙ্গে থাকবে আর একটা বড় পালকি—"

ধূর্জটিমঙ্গল গম্ভীর হইয়াই রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

"ধুজু তুমি কিছু বলছ না যে?"

"বলবার তো কিছু নেই। আমি নিজে চিরকাল নিজের মতে নিজের পথে চলেছি। কেরামতও যদি তাই চলতে চায় আমি বাধা দেব কেন। তবে তুমি যা বলেছ সেটা ঠিক। ওকে নিঃসহায়ভাবে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওর সঙ্গে দুজন রক্ষী, একটি বড় পালকি আর কিছু টাকা অবশ্যই দিতে হবে। সব খরচ আমাদের। কেরামত তুমি কি কালই যাবে?"

"কালই যাব। কিন্তু ভাই আমার জন্যে এতসব করছ কেন--"

ধূর্জটিমঙ্গল উত্তর দিলেন—"এর জবাব দেব না। যা ঠিক করেছি তা করবই। তোমাকে আমরা বাধা দিইনি, তুমিও আমাদের বাধা দিও না। তবে ইচ্ছে করলে তুমি আমার একটি উপকার করতে পার। শুনেছি কারাধ্যক্ষ তুর্বক আলি তোমাকে খুব খাতির করেন। আমার এক বন্ধু জন সাহেব বিনা দোষে কয়েদ হয়ে আছেন। তাকে আমি উদ্ধার করতে চাই। তুমি তুর্বক আলিকে একটা চিঠি লিখে দেবে। সেই চিঠি নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

"আমি চিঠি লিখে তোমাকে আমার বন্ধু বলে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কাজ হাসিল করতে হলে শুধু আমার চিঠিতে হবে না। ঘুষ দিতে হবে।"

"দেব।"

"বেশ, চিঠি নিয়ে যেও তাহলে।"

মাণিক্য বলিলেন—"এবার একটু গানবাজনা হোক। আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে।"

"সারেঙ্গী ছাড়া আমি কিছু আনিনি।"

"সারেঙ্গীই বাজাও।"

কেরামত সারেঙ্গী বাজাইতে শুরু করিল।

দেখিতে দেখিতে সুরের এমন এক মায়ালোক চতুর্দিকে মূর্ত হইয়া উঠিল যে, ধূর্জটি ও মাণিক্য উভয়ে ভুলিয়া গেলেন তাঁহারা মুর্শিদাবাদ শহরে সামান্য একটা শতরঞ্জিতে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মনে হইল তাঁহারা গন্ধর্বলোকে স্বপ্নবিহার করিতেছেন। মুখর হরবোলা পাখিটাও মাণিক্যের স্কন্ধে নীরবে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া ধূর্জটিমঙ্গল দেখিলেন ঝকমারি বারাহী কেহ নাই। চাকর একটি চিঠি দিল। ঝকমারির চিঠি। ঝকমারি লিখিয়াছে—"আমি যুদ্ধে চললাম। জগন্নাথ কলকাতা থেকে এসেছিল। বারাহীর স্বামী মৃত্যুশয্যায়। তিনি তাকে দেখতে চান, জগন্নাথ একটা ছিপ নিয়ে এসেছিল। সেই ছিপে চড়ে বারাহীও চলে গেছে। আমি ফিরব কিনা জানি না। যদি না

ফিরি দুঃখ কোরো না। তোমাকে দেবতা বলে জানি। দেবতার কাজে যদি আত্মবলি দিতে পারি তাহলে কৃতার্থ হব। আমার প্রণাম জেনো। বৌদিকেও অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছি। তিনি সতীলক্ষ্মী, তিনি দেবী। জানি না আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কিনা।''

ধূর্জটিমঙ্গল নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

।। এগারো।।

উমিচাঁদের জমাদার জগন্নাথ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সাবর্ণচৌধুরীরা নামী লোক ছিলেন। উমিচাঁদের জমাদার হিসাবে সে তাহাদের বাড়িতে কয়েকবার গিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই আত্মীয় হংসেশ্বরের পরিবারকে সে চিনিত না। ধূর্জটিমঙ্গলের নিকটই ইহাদের সব বৃত্তান্ত সে শুনিল। ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে বলিলেন—ওই বংশের কুলাঙ্গার কংসকে ধ্বংস করিতে হইবে। সে আমার বোনের সম্ভ্রমই শুধু নষ্ট করে নাই সে তাহাকে মুসলমান ফৌজরূপী নেকড়েগুলোর হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। বারাহী ফিরিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সে এখন উন্মাদিনী। তাহার মুখে এক বুলি—''কংসকে খুন করব।'' তাহাকে আমি আশ্বাস দিয়াছি তাহার বাসনা আমি পূর্ণ করিব। কিন্তু সে মেয়েমানুষ, কংসকে হত্যা করা তাহার সামর্থ্যে কুলাইবে না। তাহার সহিত কংসের যোগাযোগ করাও সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। তুমি ইহার একটা ব্যবস্থা কর। টাকা যাহা লাগে আমি দিব। বেশ কিছু টাকা লইয়া জগন্নাথ কলিকাতা গিয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া দেখিল কলিকাতায় বেশ একটা উত্তেজনা। লালমুখ গোরা পলটনরা সর্বত্র সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছে। তাহাদের দেখিলেই দেশী কালো আদমীরা যে যেখানে পারিতেছে আত্মগোপন করিতেছে। জগন্নাথ আসিয়া বেহালায় হংসেশ্বরদের বাড়িতেও গিয়াছিল, সাবর্ণচৌধুরীদের পরিচয়ের সুবাদেই গিয়াছিল সেখানে। বলিয়াছিল—চৌধুরীবাবুরা আপনাদের খবর লইতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু গিয়া চাকরবাকরদের মুখে যাহা সে শুনিল তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য। হংসেশ্বর সত্যই মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পাছে সহমৃতা হইতে হয় এই ভয়ে তাঁহার পত্নীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ছেলেমেয়ে লইয়া কে কোথায় যে সরিয়া পড়িয়াছেন তাহা বোঝা যাইতেছে না। হংসেশ্বরকে সেবা করিবার লোক নাই। দিবারাত্রি তিনি বারাহীকে স্মরণ করিতেছেন। জগন্নাথ আর একটি সংবাদও সংগ্রহ করিল। কংস নবাবপক্ষ ত্যাগ করিয়া এখন নাকি ইংরেজ পক্ষে ভিড়িয়াছেন। একজন ইংরেজ ব্যবসায়ীর সহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। কংস এখন তাহার ব্যবসার অংশীদার। একটি ইংরেজ পাদ্রীর সহিতও মাখামাখি করিয়াছে কংস। অনেকের ধারণা কংস এবার হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীস্টান হইলে ইংরেজ দরবারে বড় চাকরি হইবে তাহার। কংস একটা কেষ্টবিষ্টু হইয়া যাইবে। একদিন সুযোগ বুঝিয়া জগন্নাথ কংসের সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ করিল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল তাহাকে। তাহার পর হাতজোড় করিয়া বলিল—''আপনাকে গোপনে একটা কথা নিবেদন করিতে চাই।''

''কে তুমি—''

''আমি উমিচাঁদের বাড়ির চাকর। মালিক এখন মুর্শিদাবাদে আছেন বলে আমি সেখানেই থাকি। একটা জরুরি দরকারে কলকাতায় এসেছি। আমি যখন কলকাতায় আসছিলাম তখন আপনার বৌদিদি বারাহী ঠাকরুনের সঙ্গে দেখা হল আমার। তিনি বললেন—আমিও তোমার

সঙ্গে কলকাতায় যাব। আমার শ্বশুরবাড়ি বেহালায় যেতে চাই, ঠাকুরপোর জন্যে বড় মন কেমন করছে। আমি রাগারাগি করে চলে এসেছি। আবার ফিরে যেতে চাই। তুমি আমাকে নিয়ে চল। কিন্তু আমি বেহালায় যেতে পারব না, চিৎপুরেশ্বরী কালীমন্দিরের পাশের গালিতে আমার দাদার একটা বাড়ি আছে। সেখানেই আমি উঠব। তুমি ঠাকুরপোকে সেইখানেই ডেকে নিয়ে এস।"

কংস যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

"এসেছেন তিনি?"

"এসেছেন।"

"তাহলে আমাকে নিয়ে চল সেখানে।"

"নিয়ে যাব। তাঁকে জিগ্যেস করে এসে সন্ধ্যার পর নিয়ে যাব আপনাকে।"

জগন্নাথ একটি ছিপ ভাড়া করিয়াছিল, কারণ ছিপ দ্রুতগামী। দশজন মাঝি দাঁড় বাহিবে, একজন হালে থাকিবে। ছোট একটি ঘরও ছিল ছিপটিতে। ত্রিবেণীর জমিদারবাবুদের নিকট ছিপটি সংগ্রহ করিয়াছিল জগন্নাথ। ফরাসীদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধের খবর চতুর্দিকে চাউর হইয়া গিয়াছিল। দুইদিন পূর্বেই ওয়াটসনের রণতরী ভাগীরথী বাহিয়া চন্দননগরের দিকে আগাইয়া গিয়াছে। মাঝিরা মুর্শিদাবাদের দিকে যাইতে চাহে নাই। জমিদারবাবুরাও ইতস্তত করিয়াছিলেন। কিন্তু টাকার জোরে মাঝিদের বশ করিয়া ফেলিল জগন্নাথ। ত্রিবেণীর জমিদারবাবুরা উমিচাঁদের নিকট টাকা ধার করিয়াছিলেন। জগন্নাথ বলিল—মালিকের একটা জরুরি দরকারেই ছিপটা আমার চাই। জমিদারবাবুরা আর আপত্তি করিলেন না। কেবল একটা কড়ার করাইয়া লইলেন—ছিপটা মুর্শিদাবাদে গিয়াই যেন ফিরিয়া আসে। ফরাসীদের সহিত সাহেবদের জলযুদ্ধ লাগিয়াছে, তাহাদের কোন পক্ষ যদি ছিপখানাকে আটকাইয়া ফেলে তাহা হইলে বড়ই মুশকিলে পড়িতে হইবে। জগন্নাথ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল ছিপ যেদিন যাইবে সেইদিনই ফিরিয়া আসিবে। মুর্শিদাবাদে গিয়া জগন্নাথ যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার চতুর্দিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে। জাফরাগঞ্জে ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়ি গিয়া দেখিল ধূর্জটিমঙ্গল নাই। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিল সে। তবু ধূর্জটিমঙ্গল ফিরিল না। ছিপের মাঝিরা আসিয়া বলিল—রাস্তা দিয়ে একদল ফৌজ কুচকাওয়াজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনছি এখানেও নাকি যুদ্ধ বাধবে। তুমি যদি এখনি আমাদের সঙ্গে না আসতে পার, আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না। জগন্নাথ বাধ্য হইয়া শেষে বারাহীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। প্রণাম করিয়া বলিল— "মাঠাকরুন আপনার স্বামী মৃত্যুশয্যায়। আপনাকে দেখতে চান। ছিপ পাঠিয়েছেন। কিন্তু ছিপটা থাকতে চাইছে না। এক্ষুনি চলে যেতে চায়।" তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিল—"কংসকে কায়দা করেছি।"

বারাহীর মনে হইল—তাহার স্বামী মৃত্যুশয্যায়? তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন? অসহায় রুগ্ণ হংসেশ্বরের মুখটা তাহার মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু কথাটা তেমন বিশ্বাস হইল না। বহুপত্নীক হংসেশ্বর তো তাহাকে কোনদিন স্ত্রীর মর্যাদা দিয়া পার্শ্বে স্থান দেন নাই। তবু সেই রোগা লোকটার চেহারা বারবার তাহার মনে জাগিতে লাগিল। নিজে হাতে খাইতে পর্যন্ত পারেন না, খাওয়াইয়া দিতে হয়। বিছানায় উঠিয়া বসিবার সামর্থ্য নাই, উঠাইয়া বসাইয়া দিতে

হয়। বারাহীর মনে পড়িল যে দৃষ্টিতে তিনি তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন সে দৃষ্টি যেন আতুরের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন কৃপাভিখারী, সে দৃষ্টি যেন তাহার কাছে নীরব ভাষায় বারবার বলিতেছিল—আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। হঠাৎ পাগলীর মনে হইল—আমি যাইব, এখনই যাইব, নিশ্চয় যাইব, হাজার হোক স্বামী তো! কেউ তো তাঁহার সেবা করে না, হয়তো তেষ্টার সময় জল পাইতেছেন না, হয়তো খলে মাড়িয়া কবিরাজী ঔষধ কেহ সময়মতো দিতেছে না, হয়তো গুয়েমুতে মাখামাখি হইয়া পড়িয়া আছেন—নানা চিত্র পরপর তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল। সে ঠিক করিল যাইবে, দাদার জন্য আর অপেক্ষা করিবে না। কংসের কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল। সে কি ওখানে আছে? সে যদি ওখানে থাকে তাহা হইলে তো—

জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিল—"কংস কি ও বাড়িতে আছে?"

জগন্নাথ বলিল—"না—"

"গেলেই বুঝতে পারবেন। এখন এর বেশী আর কিছু বলব না। যদি যান তাহলে বেশী দেরি করবেন না, কারণ ছিপের মাঝিরা এখনই চলে যেতে চাইছে।"

বারাহী জগন্নাথের সহিত বাহির হইয়া পড়িল।

ছিপ যখন ছাড়িল, তখন চারিদিকে অন্ধকার। বারাহী সমস্ত রাত ঘুমাইল না। অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মাঝে মাঝে নৌকা দেখা গেল, ঘাটের পাশে পাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরবাড়িও দেখা গেল। মাঝে মাঝে আলো জ্বলিতেছে। আবার অন্ধকার। নদীর ধারে ধারে অনেক ঝোপ-জঙ্গল, জোনাকিরা সেখানে দীপাবলী উৎসব করিতেছে যেন। বারাহী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যখন সকাল হইল তখন ঘাটে ঘাটে স্নানার্থীর ভীড়, নৌকাও অনেকরকম। কোনটা মালবাহী ভড় কোনটা বড়লোকের বজরা, কোনটা পারাপারের খেয়া নৌকা, কোনটা ডিঙি। গঙ্গার তীরে মাঝে মাঝে মন্দির, সেখানে পুজোর ঘণ্টা বাজিতেছে। এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটা বটগাছ। তাহাতে অনেক পাখি। তাহার একটা ডাল গঙ্গার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সে ডালে উঠিয়া ছেলেমেয়েরা জলে ঝাঁপ দিতেছে। একটা ঘাটে উলু উলু শব্দ শোনা গেল। একদল মেয়ে ঘড়া লইয়া আসিয়াছে। বোধহয় কোথাও বিবাহ হইতেছে, জল 'সইতে' আসিয়াছে মেয়েরা। চারিদিকে জীবনেরই উৎসব। আসন্ন যুদ্ধের ভয় কাহারও মুখে নাই। বারাহী মাঝে মাঝে ঢুলিতেছিল। সমস্ত রাত সে ঘুমায় নাই।

"মা ঘরে গিয়ে একটু ঘুমোন না"—জগন্নাথ বলিল।

"না আমি ঘুমুব না।"

শ্রীরামপুরের ঘাটে ছিপ ভিড়াইল জগন্নাথ। ঘাটের উপরই একটি খাবারের দোকান ছিল। কিছু খাবার কিনিয়া আনিল সে। গরম সন্দেশ, গরম লুচি, এক হাঁড়ি ভাল দই।

"মা, কিছু খেয়ে নিন।"

"তোমরা খাও, আমি কিছু খাব না।"

মাঝি মাল্লারা স্নান করিয়া লইল। আহারও করিল তাহারা।

জগন্নাথ বলিল—"মা কিছু মুখে না দিলে, আমি খাব না।"

অগত্যা বারাহী সামান্য সন্দেশ লইয়া মুখে দিল। কিন্তু সে একবারে চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল সর্বক্ষণ। মাথায় ঘোমটা টানিয়া নদীর জলের দিকেই চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাহার মন চুপ করিয়া ছিল না। মন তাহার ফিরিয়া গিয়াছিল সুদূর অতীতে, যখন তাহার বাবা মহেশমঙ্গল

বাঁচিয়া ছিলেন। যখন তিনি তাহাকে নয় বৎসর বয়সে গৌরীদান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যখন তাহাকে প্রৌঢ় হংসেশ্বর মাঝে মাঝে আসিয়া আদর করিয়া যাইতেন, যখন তাহার বড়বৌঠান ভানুমতী তাহাকে নানাসাজে সাজাইয়া দিতেন, কপালের উপর চন্দনের আলপনা দিতেন, দুই ভ্রূর মাঝখানে কাঁচপোকার টিপ পরাইয়া দিতেন, চুলে সুগন্ধী তেল দিয়া চমৎকার খোঁপা বাঁধিয়া দিতেন। নিত্য নূতন রকমের খোঁপা, বৌঠান কতরকমের খোঁপা বাঁধিতেই যে জানিতেন, ঢাকাই মসলিনের হালকা শাড়ি পরাতেন তাহাকে, পায়ে পাঁয়জোর পরাইয়া দিতেন, মলের উপর চুটকি ছিল, হাত ভরতি সোনার চুড়ি ছিল, মকরমুখো বালা ছিল, তাগা ছিল। হংসেশ্বর আসিলে সেগুলি পরিতে হইত। কোথাও নিমন্ত্রণে গেলেও সেগুলি পরিতে হইত কিন্তু সেগুলি তখন মসলিনের কাপড় দিয়া ঢাকা থাকিত—হঠাৎ তাহার দিদিদের কথা মনে পড়িল। বড়দিদি জগদম্বা শ্বশুরবাড়ি হইতে পুরীতে তীর্থ করিতে গিয়াছিল। আর ফেরে নাই। জলদস্যু বোম্বেটেরা তাহাকে নাকি লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল। মনে পড়িল ভালো আমসত্ত্ব দিতে পারিত সে। নতুন কাপড়ের উপর ছোট ছোট পাথরের থালায় ভালো ভালো আমের আমসত্ত্ব দিত, রোদে বসিয়া পাহারা দিত সর্বক্ষণ। মেজদি শ্যামাঙ্গিনীকেও মনে পড়িল তাহার। পাড়ার একটা ছেলের সহিত ভাব হইয়াছিল তাহার। বাবা তাহাকে জোর করিয়া শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন মগরায়। সেখানে জ্বরে ভুগিয়া মরিয়া গেল সে। আর এক বোন জয়া—ভারী দজ্জালিনী ছিল সে। ঝকমারির সহিত খুব ভাব ছিল। আমের সময় দুইজনেই বাগানে ঘুরিত। বর্ষার সময় গঙ্গার জলে সাঁতার দিত। একবার একটা মুসলমান ছোঁড়া নাকি তাহাদের পিছু লইয়াছিল। সে শিশ দিতেই ঝকমারি একটা থান ইঁট ছুঁড়িয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। অনেক হাঙ্গামা হইয়াছিল ইহা লইয়া। বাবা গোবিন্দ মিত্তিরের সহায়তায় অনেক টাকা খরচ করিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই হইতে তাহারা আর বাড়ির বাহির হইত না। কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল তাহার। হংসেশ্বর একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন—তোমার জন্য সোনার কেয়ূর গড়াতে দিয়েছি। বারাহী বুঝিতে পারে নাই কেয়ূর আবার কি। গহনা যখন আসিল তখন হাসি পাইল তাহার—ওমা এ তো বাজু! এর নাম কেয়ূর নাকি। এমনি সব কত অসংলগ্ন স্মৃতি, কত তুচ্ছ ঘটনা মনে পড়িল তাহার। গঙ্গার জলে দেখিল একটা ফুলের মালা ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে। বারাহীর মনে হইল তাহার জীবনেও কত ফুল ফুটিয়াছিল, সে সব ফুল লইয়া মালাও গাঁথিয়াছিল সে, সে মালাও ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ একটা ঘাটের কাছে দেখিল অনেক লোকের ভীড়। ঘণ্টা বাজিতেছে, শাঁখ বাজিতেছে, কীর্তন হইতেছে। বারাহী দেখিল একটি মুমূর্ষু বৃদ্ধকে গলা পর্যন্ত গঙ্গাজলে ডুবাইয়া তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া কয়েকজন লোক তারস্বরে চীৎকার করিতেছে—হরে কৃষ্ণ হরে রাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম। বারাহী বুঝিতে পারিল অন্তর্জলী হইতেছে। তাহার ঠাকুরদাদারও হইয়াছিল। আর একটা কথাও মনে পড়িল—তাহার ঠাকুরমা 'সতী' হইয়াছিলেন। ঠাকুরদাদার সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছিলেন। তাঁহার সব দুঃখের অবসান হইয়াছিল। জীবনে অনেক শোক পাইয়াছিলেন তিনি, দুরারোগ্য পেটের ব্যথায় ছটফট করিতেন, চিতায় পুড়িয়া শান্তি পাইয়াছিলেন।

আর একটা ঘাটে দেখিল দুইটি কালো পাঁঠাকে স্নান করাইতেছে। ঘাটের উপরই একটি খড়ের মণ্ডপে কালীমূর্তিও দেখা গেল। বারাহীর মনে পড়িল খুব ছেলেবেলায় সে-ও একটি

ছাগলছানা পুষিয়াছিল। তাহার নাম ছিল মটরু। মটরু একদিন হারাইয়া গেল। শোনা গেল তাহাকে নাকি কালীঘাটে বলি দেওয়া হইয়াছে। বারাহীর মনটা কেমন যেন উদাস হইগা গেল। নদীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল সে। তাহার মনে হইতে লাগিল জীবনে সাধ-আহ্লাদ তো ফুরাইয়া গিয়াছে, নিজের আত্মীয়-স্বজন মরিয়া গিয়াছে, হারাইয়া গিয়াছে, পলাইয়া গিয়াছে। জীবনের যে ছবিটা সে আঁকিয়াছিল তাহার রং শুকাইতে না শুকাইতে কে যেন তাহার উপর এক ঘটি জল ঢালিয়া দিল, সব রং উঠিয়া গেল, ছবি অবলুপ্ত হইল। রং-ন্যাবড়ানো কাগজটার দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল সে। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল, ছিপ কলিকাতার বাগবাজারের ঘাটে ভিড়িয়াছে।

জগন্নাথ আসিয়া বলিল—"মা এবার নামতে হবে, আমরা বাগবাজারে এসে গেছি। আমি একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আসছি—"

"এখান থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে বেয়ালায় যাব?"

"বেয়ালায় যাবার আগে চিৎপুর হয়ে যাব একবার।"

"চিৎপুর? কেন?"

"সেখানে আপনাদের একটা ছোট বাড়ি আছে। একটা জিনিস আছে সেখানে। ধুজুবাবু বলেছিলেন সেটা আপনাকে দিতে—"

"কি জিনিষ?"

"একটা বাক্স।"

"কিসের বাক্স?"

একটি গলির সামনে চিৎপুরের উপরই ঘোড়ার গাড়িটি দাঁড়াইয়া রহিল। জগন্নাথ তাহাকে আর গলির ভিতর ঢুকিতে দিল না।

"মা নামুন। গলির ভিতরে কিছুদূর যেতে হবে।"

বারাহী নামিল। একটু ইতস্তত করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল আবার। এই অপরিচ্ছন্ন সরু গলিটাতে একা জগন্নাথের সঙ্গে যাইতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না তাহার। গলির মুখেই একটা মরা ইঁদুর পড়িয়া আছে। তাহার পাশে খানিকটা গাদা-করা ছাই। রাস্তার দুই ধারে সারি সারি বিষ্ঠা, পাড়ার ছেলেমেয়েরা রাস্তার দুইধারে মলত্যাগ করে। গলির দুই পাশে পচা নালী। অধিকাংশ বাড়িরই দেওয়াল মাটির, চাল খড়ের। মাঝে মাঝে দুই একটা পাকা ছোট বাড়ি আছে। কিন্তু সেগুলিও বড় পুরাতন, ইঁটগুলি নোনা লাগিয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"এ কোথায় আনলে আমাকে জগন্নাথ। এখানে আমাদের বাড়ি আছে জানতুম না তো।"

জগন্নাথ সে তর্কে না গিয়ে বলিল—"আসুন না আমার সঙ্গে। বেশীদূর নয়, কাছেই। ঘরে গিয়া কুলুপটি খুলে জিনিসটি আপনার হাতে দিয়ে দেব। ধুজুবাবুর হুকুম এটা। অমান্য করতে পারব না।"

"বেশ তো, আমি গাড়িতেই বসছি। তুমি গিয়ে নিয়ে এস সেটা।"

"না, সে জিনিস আনা যাবে না। আপনি চলুন।"

নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে অবশেষে বারাহী জগন্নাথের পিছু পিছু গেল। কিছুক্ষণ পরে একটি পাকা বাড়ির সম্মুখে জগন্নাথ দাঁড়াইল। বাহিরের দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলিতেছিল। সেটা খুলিবার পর ভিতরে ঢুকিতেই বারাহী দেখিল প্রকাণ্ড উঠান একটা। উঠানে

এক হাঁটু ঘাস। একধারে একটা আকন্দগাছে ফুল ফুটিয়াছে, আর একধারে ভাঙা তুলসীহীন তুলসীমঞ্চ একটা। আর একধারে ঘেঁটু ও কচুরী বন। বাড়ি জনশূন্য!

"কোথা নিয়ে এল জগন্নাথ—"

জগন্নাথ কোন উত্তর না দিয়া সোজা দালানে গিয়া ঢুকিল এবং আর একটা ঘরের তালা খুলিতে লাগিল।

"কোন ভয় নেই। চলে আসুন সোজা।"

বারাহী দালানে গিয়া দেখিল জগন্নাথ একটি ঘরে ঢুকিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া সে একটি তালাবন্ধ বড় সিন্দুকের তালা খুলিতেছে। বারাহী সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। সিন্দুকের ভিতর হইতে কাঁসার একটি বড় হাঁড়ি বাহির করিল জগন্নাথ। হাঁড়ির মুখে একটি পেতলের সরা, ময়দা দিয়া সরাটি হাঁড়ির মুখে আটকানো। জগন্নাথ ময়দার প্রলেপ তুলিয়া সরাটি খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর হাঁড়ির ভিতর হইতে বাহির করিল একটি ছিন্নমুণ্ড।

"এই নিন। কংসের মুণ্ডু। আপনি তাকে খুন করতে চেয়েছিলেন, আপনার আদেশ আমরা প্রতিপালন করেছি। মুণ্ডুটি কেটে তাকে ভালো বিলিতি মদে ভিজিয়ে রেখে আপনাকে আনতে গিয়েছিলাম।"

বারাহী ব্যায়ত আননে মুণ্ডুটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পা দুইটা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে মেজের উপর বসিয়া পড়িল সে। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার পর নিজেকে সামলাইয়া প্রশ্ন করিল—"একে খুন করলে কে—"

"গুণ্ডারা করেছে। পাঁচশ আসরফি খরচ হয়েছে এ জন্য। পয়সা ফেললে এদেশে ঘাতকের অভাব হয় না। তবে আমি করিনি। ওই পাষণ্ডটাকে ছুঁতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। আমি যাদের খুন করেছি তারা দেবী ছিল। তাদের রক্ষা করবার জন্যেই তাদের খুন করতে হয়েছিল—"

বারাহী নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

"চলুন এবার। আপনাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দি। আপনার স্বামীর অবস্থা খুবই খারাপ দেখে এসেছিলাম।"

কয়েকদিন পরে জগন্নাথ মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া মৈনিবিবিকে খবর দিল বারাহীর স্বামী মারা গিয়াছেন। বারাহী ফেরে নাই, কারণ সে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছে। ধূর্জটিমঙ্গল মুর্শিদাবাদে ছিলেন না। মৈনি বলিতে পারিল না তিনি কোথায় গিয়েছেন।

।। বারো ।।

কংস ও আসফ আলি খাঁকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়া ধূর্জটিমঙ্গল ঠিক করিয়াছিলেন এবার উজির আহম্মদের পশ্চাদ্ধাবন করিবেন। তাঁহার পত্নীর ধর্ষণকারী তাঁহার হাত হইতে নিস্তার পাইবে না। নানাদিক হইতে খবর লইয়া তিনি জানিয়াছিলেন উজির আহম্মদ রাজমহলে আছেন। রাজমহলে গিয়াই ওই পাষণ্ডকে বিনাশ করিতে হইবে এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বাছা বাছা কয়েকটি গুণ্ডা লইয়া রাজমহলে যাইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার বুকের

ভিতরটা পুড়িয়া যাইতেছিল অপমান অবিচার প্রতিহিংসার ত্রিশূলে, যদিও তাঁহার মর্ম ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, কিন্তু বাহিরে তাহার কিছু মাত্র প্রকাশ ছিল না। বাহিরে তিনি মৈনিবিবির অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিতেছিলেন, বন্ধু কেরামতের গান শুনিতেছিলেন, পিতৃবন্ধু পাণ্ডবপ্রধানের সহিত সরস রাজনীতি আলোচনা করিতেছিলেন, মাণিক্যের মায়ের মহলে গিয়া প্রত্যহ কিছু খাইয়া আসিতেছিলেন, মাণিক্যপ্রধানের নূতন পাখি হরবোলা এবং নূতন প্রণয়িনী নাজমাকে লইয়া লঘু হাস্য-পরিহাস করিতেছিলেন, মাঝে মাঝে জগদ্ধাত্রীর মুখখানাও তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল কিন্তু মনে মনে একটি লক্ষ্যেই তিনি দৃষ্টি স্থির রাখিয়াছিলেন, পাপীদের দণ্ড দিতে হবেই। পাপীতে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সব পাপীদের দণ্ড দিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, কিন্তু যাহারা তাঁহার বংশকে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাঁহার মর্যাদার মূলে আঘাত করিয়াছে, তাঁহার বংশের পুরনারীদের সতীত্ব হরণ করিয়াছে—তাহাদের তিনি প্রাণদণ্ড দিবেন। যে দেশে রাজাই লম্পট স্বেচ্ছাচারী, পশুবল এবং অর্থবলই যে দেশে ন্যায়বিচারের সিংহাসন জবর-দখল করিয়া বসিয়া আছে, সে দেশে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে নিজেই পাপীদের দণ্ড দিতে হইবে। পশুবল এবং অর্থবলের সহায়তা লইয়াও সে দণ্ড দিতে হইবে। ধূর্জটিমঙ্গল অনুভব করিতেছিলেন এ দণ্ড দিতে তিনি যদি অপারগ হন তাঁহার সমূহ সর্বনাশ হইয়া যাইবে, তিনি আর ভদ্রসমাজে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না, যে পৌরুষ তাঁহার বংশমর্যাদার ভিত্তি সেই পৌরুষ চিরতরে অবলুপ্ত হইবে, তাঁহার আত্মসম্মানের, তাঁহার বংশগৌরবের হর্ম্য ভাঙিয়া পড়িবে। তাই তিনি স্থির করিয়াছিলেন এ দণ্ড দিবেনই। কংস এবং আসফ আলির ব্যবস্থা হইয়াছে এবার উজির আহম্মদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাণিক্য এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে তাঁহাকে। দুইজন পর্তুগীজ, দুইজন রাজপুত এবং তিনজন সাহেব গুণ্ডা যোগাড় করিয়া দিয়াছে সে। সকলেই অস্ত্রবিশারদ, সকলেই অর্থপিশাচ। এমন কাজ নাই যাহা তাহারা টাকার জন্য না করিতে পারে।

মাণিক্যপ্রধান বলিল—"খবর নিয়ে জানলুম, উজির আহম্মদ সম্প্রতি মফঃস্বল থেকে একটি গেরস্তর বউকে ভাগিয়ে নিয়ে এসে জোর করে নিকে করেছেন। তোমাকে সেই বধূটির স্বামী সাজতে হবে। ওদের কাছে তোমার আসল নাম বলিনি, সেই মেয়েটির স্বামী বটুকলালের নাম বলেছি। তুমি বটুকলাল সেজে যেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে যাচ্ছ। ওদের প্রত্যেককে দুশো আসরফি দিয়েছি। কার্যসিদ্ধি হলে আরও একশো করে দিতে হবে। তুমি টাকাটা সঙ্গে নিয়ে যেও এবং উজির সাহেবের মরামুখ দর্শন করে টাকাটা ওদের দিয়ে দিও। ওরা রাজমহলের দিকে বেরিয়ে গেছে, ঘাটের কাছে যে আফগান সরাইখানা আছে সেইখানেই ওরা আড্ডা গাড়বে। তুমিও কাল সকালেই বেরিয়ে পড়। শুভস্য শীঘ্রম্। কি বলিস রে হরবোলা?"

হরবোলা হলদে পাখির ডাকের নকল করিয়া বলিল—'টিউ'।

সেদিন কেরামতের বাড়িতে যখন গানের আসর শেষ হইল, গন্ধর্বলোক হইতে সকলে যখন মর্ত্যলোকে অবতরণ করিলেন তখন কেরামত বলিল—"আমি কাল চলে যাব। মৈনিকে এই খবরটা দিও। আর তার সঙ্গে দেখা করতে পারব না।"

মাণিক্য বলিল, "ধুজু তুমিই তাহলে খবরটা দিয়ে দিও। আমি কেরামতের যাওয়ার ব্যবস্থা করি।"

কেরামত একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

"কেন ভাই ওসব হাঙ্গামা করতে যাচ্ছ। আমরা দেওয়ানা, আমাদের দেওয়ানার মতোই থাকতে দাও।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমরা যা করছি তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন। তুমি দেওয়ানা আছ, দেওয়ানার মতোই থাক।"

মাণিক্য বলিল—"আলবৎ।"

সেইদিন রাত্রেই ধূর্জটিমঙ্গল মৈনি বিবির কাছে গেলেন।

মৈনি অবাক হইয়া গেল।

"এত রাত্রে এত কৃপা।"

তাহার চোখ দুটিতে হাসি নাচিতে লাগিল।

"খবরটা দিতে এলাম কেরামত কাল চলে যাচ্ছে। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না তার।"

"একথা সকালে এসে বললেই পারতেন। কত রাত হয়েছে জানেন? তোপখানা থেকে রাত দুপুরের তোপ অনেকক্ষণ আগে পড়ে গেছে।"

"কাল সকালে আমি বাইরে যাব।"

"কোথায় যাবেন?"

"সব কথা না-ই জানলে।"

"তবু বলুন।"

"না, বলব না। একটা কথা কিন্তু বলব—তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।"

মৈনীর চোখ দুইটির আলো যেন নিভিয়া গেল সহসা।

বলিল—"ঘাস দেখে সবাই বলে আহা কি সবুজ, আহা কি চমৎকার। কিন্তু ঘাসের কি দুঃখ জানেন? ঘাসকে মানুষ দু'পায়ে মাড়িয়ে যায়, আর গরুতে ছিঁড়ে খায়। কিন্তু আমি জানি আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি যাচ্ছেন রাজমহল।"

"কে বলল!"

"তা বলব কেন?"

মুচকি হাসিয়া মৈনি আদাব করিল। তাহার পর হঠাৎ পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গলও আর অপেক্ষা করিলেন না, বাড়ি চলিয়া গেলেন।

বাড়ি ফিরিয়া তিনি ঝকমারির চিঠি পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। চাকর হীরালাল বলিল ঝকমারি ফৌজি বেশ পরিধান করিয়া একটি তাঞ্জামে চড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে তাহা সে জানে না। বারাহী জগন্নাথের সঙ্গে গিয়াছে। এখন কি করা উচিত? ধূর্জটিমঙ্গল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন উহাদের অনুসন্ধানে তিনি বৃথা কালক্ষয় করিবেন না। করিলেও উহাদের ধরিতে পারিবেন না। যাহা হইবার হউক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি হীরালালকে বলিলেন—"খাবার দাও— "

পাচক জানকী ঠাকুর প্রচুর রান্না করিয়া রাখিয়াছিল। নিরামিষ ব্যঞ্জনই বেশী। রোহিত মৎস্যের কালিয়া এবং রোহিতের মুড়া দিয়া মুগের ডালও ছিল। হীরালাল বলিল—"মাণিকবাবুর মা আপনার জন্যে কিছু বেলের মোরব্বা আর মধু পাঠিয়েছেন।" ধূর্জটিমঙ্গল ভাত খাইলেন না। খাইলেন রোহিত মৎস্যের কালিয়াটা এবং ডালটা। তাহার পর দুইটি আম

এবং আমের পর বেলের মোরব্বা কয়েকটা। পরিশেষে খানিকটা মধু। হীরালালকে বলিলেন—"কাল সকালে আমি বেরিয়ে যাব। রাত্রে তাই বেশী কিছু খেলাম না। খুব ভোরে ঘোড়া যেন ঠিক থাকে। আমার সঙ্গে দু'জন যাবে—রামশরণ মিশির আর যোগী সিং। বাকী সবাই এখানে থাকবে। আমি কবে ফিরব তার ঠিক নেই। এখানকার সব ভার তোমার উপর থাকল। খরচের টাকা তোমাকেই দিয়ে যাব।"

ধূর্জটিমঙ্গল শুইতে গেলেন।

কিন্তু সেদিন তাঁহার অদৃষ্টে নিদ্রা ছিল না। একটু পরেই হন্তদন্ত হইয়া মাণিক্যপ্রধান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে পাখি নাই। যোদ্ধৃবেশ।

বলিলেন, "কীর্তন জমে উঠেছে। ওয়াট্‌সের কাছে এখনি খবর পেলাম ইংরেজরা চন্দননগর দখল করেছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই কেল্লা ফতে হয়ে গেছে। কিছু ফরাসী পালিয়ে এসেছে এখানে। নবাব তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। মনে হচ্ছে এই নিয়েই নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে। ক্লাইভ নাকি বলেছে নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা চন্দননগর দখল করলাম। কিন্তু এইখানেই আমরা থামব না, আমরা নবাবকেও সিংহাসনচ্যুত করব।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"শুনেছিলাম ফরসীরা বীর। এত শীগ্‌গির তারা হেরে গেল?"

"ওদের মধ্যেও মীরজাফর আছে যে। ফরাসীরা সামনে নদীর বুকে অনেক নৌকা উপুড় করে রেখেছিল। অ্যাডমিরল ওয়াট্‌সনের যুদ্ধজাহাজ কাছে ভিড়তে পারছিল না। কিন্তু একটা গোপন পথ ছিল। ফরাসী ফৌজের টেরানু সাহেব সেই পথটি ইংরেজদের দেখিয়ে দিলেন। সেই পথে হুড়মুড় করে এসে পড়ল ওয়াট্‌সনের যুদ্ধ-জাহাজ, দমাদ্দম গোলা পড়তে লাগল। দু'ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ। খবর শুনে বাবা খুব ঘাবড়ে গেছেন। তুমি তাঁকে যে ঘোড়াটা দিয়েছিলে সেইটে চড়েই তিনি রওনা হয়ে গেছেন কৈঁকালার দিকে। আমিও ভাবছি বাড়ির সক্কলকে নিয়ে কাল ভোরে কৈঁকালার দিকে চলে যাব। কেরামতের জন্য পালকী, দু'জন সিপাহী আর পাঁচশ আসরফি পাঠিয়ে দিয়ে এলাম এখনি। চিঠিও দিলাম একটা। লিখলাম—অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ কর। নবাবের সঙ্গে ইংরেজের লেগে গেছে। কালই হয়তো ইংরেজের ফৌজ এসে পড়বে এখানে। তুমি আর এক দণ্ড থেকো না। টাকাটা সাবধানে রেখো। একটা হুণ্ডিও পাঠাচ্ছি। পাটনায় গোবিন্দ শেঠের রেশমের দোকানে এটা ভাঙাতে পারবে। আমরা কৈঁকালা চললাম। আমাদের যা করবার তা তো করেছি। এখন কেরামত কি করে দেখ। আমি তোমাকে খবরটা দিতে এলাম আর জানতে এলাম তুমি কি করবে—তুমি যদি কৈঁকালা যেতে চাও—"

"আমি রাজমহল যাব—"

"আর তোমার বাড়ির মেয়েরা কোথা থাকবে?"

"তারা কেউ নেই। এই দেখ—"

ঝকমারির চিঠিটা তিনি মাণিক্যের হাতে দিলেন।

"ঝকমারি যুদ্ধে গেছে? তার মানে? কোথা গেছে সে। চন্দননগর?"

"কি করে বলব বল। তুমি যে ফৌজি পোশাক পাঠিয়েছিলে সেই পোশাক পরেই বেরিয়ে গেছে—"

"সেটা তো ইংরেজ ফৌজের পোশাক। তাহলে কি ইংরেজ ফৌজে গিয়ে মিশেছে?"

ধূর্জটিমঙ্গল কোন জবাব দিলেন না।

বাতায়ন-পথে দৃষ্টি মেলিয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মাণিক্য বলিলেন—"দেখ ধুজু আমার একটা পরামর্শ শুনবে? এখন রাজমহল যেও না। আমি যে গুণ্ডাগুলো পাঠিয়েছি তারাই উজির আহম্মদকে খতম করতে পারবে। তুমি ও বিপদের মধ্যে যাচ্ছ কেন—"

ধূর্জটিমঙ্গল অন্ধকার হইতে চোখ ফিরাইয়া মাণিক্যপ্রধানের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মাণিক্যপ্রধান দেখিলেন তাঁহার চোখের দৃষ্টি বাঘের চোখের দৃষ্টির মতো জ্বলজ্বল করিতেছে।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"যাচ্ছি, কারণ ছেলেবেলায় বাবার কাছ থেকে একটি মন্ত্র শিখেছিলাম—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। উজির আহম্মদকে আমি শুধু খুন করতে চাই না, আমি বিচার করে তার মৃত্যুদণ্ড দিতে চাই। মৃত্যুর পূর্বে সে যেন জেনে যায় কেন তার মৃত্যু হল। আমি বিচারক, সুতরাং আমায় যেতেই হবে সেখানে।"

"তাহলে যাও। আমি উঠলাম। হ্যাঁ, আর একটা কথা। ওয়াট্স সাহেবের বাড়িতে জনাব তুর্বক মিঞার সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম তিনিও বেশ ভয় পেয়েছেন। ওয়াট্স্ সাহেব তাঁকে বললেন সাহেব কয়েদীদের ছেড়ে দিন। ক্লাইভ যদি এসে দেখেন সাহেবকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে, তাহলে আগে তিনি প্রথমে আপনাকেই গুলি করবেন। আমার মনে হয় এখন একটু চেষ্টা করলে তোমার বন্ধু জন সাহেব ছাড়া পেয়ে যেতেন। কিন্তু চেষ্টা করবে কে, আমি চললাম কৈঁকালায়, তুমি চললে রাজমহল। যা হবার তাই হবে। বেঁচে থাকি তো দেখা হবে আবার। চললাম।"

ধূর্জটিমঙ্গল আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দ্বারে আবার করাঘাত পড়িল। ধূর্জটিমঙ্গল উঠিয়া বসিলেন। হীরালাল আসিয়া খবর দিল দুইটি মেয়ে আসিয়াছে। অবিলম্বে তাঁহার সাক্ষাৎ চায়।

"মেয়ে? কি রকম মেয়ে?"

"মাথায় জবাফুল-গোঁজা কালো মেয়ে দুটো। নাম বললে তির্কি আর শাওনি। বোধ হয় সাঁওতাল।"

"ডেকে নিয়ে এস এখানে।"

তির্কি ও শাওনি আসিয়া প্রবেশ করিল। দুইজনের মুখেই আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি। শাওনি বলিল—"রাজা, তোকে দেখে ভরসা পেলাম। সেই সন্দি থেকে তুকে খুঁজছি। বাবা বাবা কত পথ যে হাঁটলাম। শহরটা মস্ত বড়।"

তির্কি বলল—"যাকে পাই তাকেই শুধাই আমাদের মঙ্গলরাজা থাকে কোথা। কেউ বুলতে পারে না। শেষে একটা সহিস বুললে—তোদের রাজার কি ঘোড়া আছে? আমরা বুললাম—হঁ আছে। মস্ত ঘোড়া। সে আবার শুধালেক—তোদের রাজা কি জোয়ান মরদ? আমরা বুললাম—হঁ মরদের মতো মরদ। তখন সে বললেক জাফরগঞ্জের লালকুঠিতে একজন রাজা আইছে, তার অনেক ঘোড়া, অনেক লোকজন। আমরা তখন তাকে বললাম—বাপধন, বাড়িটা আমাদের দেখায়ে দে। তুকে পয়সা দিব। সে-ই আমাদের এখানে দিয়ে গেল। তুকে দেখে আমরা বাঁচলম।"

ধূর্জটিমঙ্গল ইহাদের আবির্ভাবে বিস্মিত হইয়া গেলেন।

প্রশ্ন করিলেন—"তোদের সঙ্গী সেই মীর মহম্মদ সাহেব কোথা গেল?"

"তাকে ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ি ফিরে এলম আমরা।"

"উড়িষ্যা থেকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি কি করে?"

"রাস্তায় ঘোড়া কিনলম। তুই যে টাকা দিয়েছিলি সেই টাকায় ঘোড়া পেলম। পথে ধলরাজার ফৌজের সঙ্গে দেখা হল। তারা সব লাঠি শড়কি বল্লম তীর ধনুক বন্দুক নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। শুনলম তারা নবাবের ফৌজকে মদত দিতে আসছে। আমরাও তাদের সঙ্গে জুটে গেলাম। তাদের সঙ্গেই আইছি আমরা।"

শাওনি বলিল—"বড় ক্ষিধে লেগেছে রাজা। কিছু খাবার আছে?"

"আছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল হীরালালকে খাবার আনিতে আদেশ দিলেন। ভাত ডাল তরকারী, ফল মিষ্টান্ন প্রচুর ছিল। মহানন্দে দুইজনে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। ভোজনশেষে শাওনি বলিল—"মহুয়া নাই?"

"এখানে মহুয়া পাওয়া যায় না। সিরাজী পাওয়া যায়।"

"তাই দে তাহলে"

উভয়ে সিরাজীও পান করিল। তাহার পর তাহারা বিবৃত করিল কেন তাহারা ধূর্জটিমঙ্গলের সন্ধানে এত রাত্রে আসিয়াছে। তাহারা মুর্শিদাবাদে আসিয়া প্রথমেই গিয়াছিল তাহাদের প্রেমিক কারারক্ষী রমজান আলীর কাছে। রমজান আলী অনেক আগেই জন সাহেবকে ছাড়িয়া দিত, কিন্তু কারাধ্যক্ষ তুর্বক আলীর ভয়ে পারে নাই। শোনা যাইতেছে তুর্বক আলী কাল নাকি পাটনায় চলিয়া যাইবেন। নবাবের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষে তিনি নাকি খুব ভয় পাইয়াছেন। পাটনায় তাঁহার শ্বশুর আছেন, একজন ফরাসী সেনাপতির সহিত তাঁহার দোস্তিও আছে। সুতরাং তিনি পাটনা যাইতেছেন। রমজান বলিতেছে—এই সুযোগে জন সাহেবকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সে নিজে তাহার ঘরের তালা খুলিয়া দিতে ভয় পাইতেছে। বলিতেছে তোমরা উহার ঘরের জানলায় একটা মই লাগাইয়া উহাকে নামাইয়া লও। আমি চোখ বুজিয়া থাকিব। উহারা একটা মই কিনিয়াছে। কাল রাত্রে সেটার সাহায্যে জন সাহেবকে তাহারা উদ্ধার করিবে। কিন্তু তাহার পর? জন সাহেবকে লইয়া কি করিবে তাহারা? আবার যদি নবাবের কোন লোক তাহাকে কয়েদ করে? কয়েদখানা হইতে বাহির হইয়া রাত্রের অন্ধকারেই কোন গোপন জায়গায় লুকাইয়া না থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা। কি করা উচিত এই পরামর্শের জন্যই তাহারা এত রাত্রে ধূর্জটিমঙ্গলের কাছে আসিয়াছে।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি ভোরেই রাজমহল চলে যাচ্ছি। তোমরা সাহেবকে এই বাড়িতে রাখো। এখানে আমার লোকজন সবাই থাকবে। খাওয়াদাওয়ারও কোন অসুবিধে হবে না। রোমনিও আসবে তো?"

"হ্যাঁ, আসবেক বইকি। সে সাহেবকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে নারে।"

খুব ভোরে উঠিয়াই ধূর্জটিমঙ্গল বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিবার পূর্বে মৈনি বিবির মুখটা সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। মনে হইল কাল রাত্রে তাহার সহিত

আচরণটা একটু রূঢ় হইয়া গিয়াছে। মনের ভিতরটা খচখচ করিতে লাগিল। তিনি মৈনি বিবির বাড়ির দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরাইলেন। মৈনি বিবির বাড়িতে অত ভোরে সাধারণত কেহ যান না, গেলেও মৈনি তাঁহার সহিত দেখা করে না। কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গলের কথা স্বতন্ত্র। তিনি যাইবামাত্র চাকর তাঁহাকে সসম্ভ্রমে উপর লইয়া গেল এবং মৈনি বিবিকে 'এত্তেলা' দিল। মৈনিও যেন ধূর্জটিমঙ্গলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। গায়ে একটা ওড়না জড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধূর্জটিমঙ্গল দেখিলেন মৈনির চোখ দুইটি ফোলা ফোলা। কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়াছে নাকি? এ সম্বন্ধে কিন্তু তিনি কিছু উচ্চবাচ্য করিলেন না। কেবল বলিলেন, "মৈনি, আমি রাজমহল যাচ্ছি। আমার উপর রাগ করে থেকো না।"

মৈনি কিছু বলিল না, নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

"চুপ করে আছ কেন?"

"কি আর বলব।"

"তবু কিছু বল।"

"কাল রাত্রে একটা খবর শুনেছি সেইটে বলছি তাহলে। নবাব দরবারে ইংরেজদের যে উকিল ছিল তাকে নবাব সাহেব তাড়িয়ে দিয়েছেন। দুর্লভরামের সঙ্গে একদল সেনাও পলাশীতে পাঠিয়েছেন তিনি। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ লাগবে নিশ্চয়। আপনি এ সময়—"

মৈনি কথা শেষ করিল না। মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে ধূর্জটিমঙ্গলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কেবল।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমাকে যেতেই হবে। তুমি একটু হাস দেখি।"

মৈনির চোখ দুইটি সহসা হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মনে হইল চোখের ভিতর কি যেন আলো জ্বালিয়া দিল।

"চললুম। আবার ফিরে আসব। ফিরে এসে গান শুনব তোমার। ভেবো না।"

ধূর্জটিমঙ্গল নীচে নামিয়া আসিলেন।

তাঁহার দুইজন অশ্বারোহী সঙ্গী রামশরণ মিশির ও যোগী সিং রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল।

জন সাহেব ছাড়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতে লুকাইয়া থাকেন নাই। তিনি সোজা কালনায় গিয়া ইংরেজদের ফৌজে যোগদান করিয়াছিলেন।

।। তেরো।।

ইতিহাসে এই ঘটনাটির উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহা ঘটিয়াছিল। ফরাসীদের সহিত ইংরেজদের যখন যুদ্ধ বাধিল তখন কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ ল' সাহেবের অনুরোধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফরাসীদের সৈন্য সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। দুর্লভরাম, মাণিকচাঁদ, মোহনলাল সকলকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছিলেন। হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার রায়ের অধীনে যে দুই সহস্র মোগল সৈন্য ছিল নবাবের হুকুমে তাহারা চন্দননগরে গিয়াছিল। সে সৈন্যদলে আসফ আলি খাঁ ছিলেন। এ সৈন্যদল গিয়াছিল কিন্তু যুদ্ধ করে নাই। নন্দকুমার রায়ের সহিত ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ছিল, তিনি যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদের বিব্রত করিতে চাহেন নাই, নবাবের হুকুম রক্ষা করিবার জন্য লোক-দেখানো অভিনয় করিয়া ওই দুই সহস্র সেনাকে চন্দননগরে

তিনি পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা গিয়াই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হইয়া সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিল। এসব কথা ইতিহাসে লেখা আছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে ক্ষুদ্র একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে কথা ইতিহাসে লেখা নাই। এই যুদ্ধে আসফ আলি খাঁ নিহত হইয়াছিলেন। ইংরেজ-ফৌজের পোশাকপরা একটি যুবক সহসা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকে ছুরি বসাইয়া দেন। তাহার পরই প্রকাণ্ড একটি গোলা পড়ে। উভয়েরই দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। ঝকমারির আসল নাম ছিল ঝঙ্কারিণী। মহাকালের তম্বুরায় দীপক রাগে যে ঝঙ্কারটা সে বাজাইয়া গেল তাহা কেহ শুনিল না। শুনিবে এ প্রত্যাশাও সে করে নাই।

।। চোদ্দ ।।

পলাশীর প্রান্তর।

মাটির দেওয়াল-ঘেরা দেড় হাজার বিঘার বিরাট আমবাগান। আমবাগানে এক লক্ষ আম গাছ। আমবাগানের পাশেই পাঁচিলঘেরা একটি ছোট পাকাবাড়ি। নবাব শিকার করিতে আসিলে এই বাড়িতে বিশ্রাম করিতেন বলিয়া নাম শিকারবাড়ি। এই বাড়িতেই সসৈন্যে ক্লাইভ, আয়ার কুট এবং অন্যান্য ইংরেজ সেনাধ্যক্ষরা আশ্রয় লইয়াছেন। চন্দননগরের ফৌজরা কলিকাতার ফৌজের সহিত মিলিত হইয়া পলাশী প্রান্তরে সমবেত হইয়াছে। গোরা সৈন্য আসিয়াছে দুইশত নৌকা চড়িয়া, কালা সৈন্য আসিয়াছে পায়ে হাঁটিয়া। পথে হুগলী, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপে এবং পলাশীর ছাউনিতে নবাবের অনেক সিপাহী সেনা মজুত ছিল, কিন্তু কেহ তাহাদের গতিরোধ করে নাই। গতিরোধ করিলে পথেই ইংরেজ সৈন্য বিনষ্ট হইত, পলাশী পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিত না। কিন্তু তাহা হয় নাই, ইংরেজ বাহিনী বিনা বাধায় পলাশীর আমবাগানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

প্রভাত হইতেই যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল।

ক্লাইভ শিকারবাড়ির ছাতে উঠিয়া দূরবীন দিয়া নবাববাহিনী দেখিলেন। বিশাল জনসমুদ্র। বাগানের দক্ষিণ দিকে এই বিরাট বাহিনী অর্ধচন্দ্রাকারে তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। ফরাসী সেনানায়ক সাঁফ্রে অল্প দূরেই পঁয়তাল্লিশ জন গোলন্দাজ এবং চারিটি কামান লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাঁফ্রে নবাবের পক্ষে। সাঁফ্রের পিছনে মীরমদন। মীরমদনের বামদিকে একটা প্রচণ্ড জায়গা ঘিরিয়া কাশ্মীরী সেনাপতি মোহনলাল। সেখানে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার, সাত হাজার পদাতিক সৈন্য। নবারের বাকী সৈন্যরা একটা উঁচু ঢিপির উপর। ইংরেজদের বাম দিকে রহিয়াছেন রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খাঁ আর মীরজাফর।

ইংরেজদের সর্বসাকুল্যে নয়শ' পঞ্চাশ জন গোরা, একুশ শ' কালা সিপাহী, আটটি ছোট কামান এবং দুইটি বড় তোপ। নবাবপক্ষের ফৌজে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, পঞ্চাশটা বড় কামান।

সাঁফ্রে কামান দাগিয়া প্রথমেই যুদ্ধ শুরু করিয়া দিলেন। ইংরেজ সৈন্য কয়েকজন মারা পড়িতেই ইংরেজরা পিছু হটিয়া বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমবাগানে ঢুকিয়া তাঁহারা গর্ত খুঁড়িয়া গর্তের ভিতর কামান স্থাপন করিলেন। নবাবের কামানগুলি উঁচু উঁচু। সে সব কামান হইতে যে সব গোলা বাহির হইল সেগুলি ইংরেজদের গায়ে লাগিল না, সেগুলি তাহাদের মাথার উপর দিয়া গিয়া আমগাছগুলিকে জখম করিতে লাগিল। হঠাৎ এক পশলা

বৃষ্টি হইয়া গেল। সমস্ত মাঠ কাদায় জলে ভরিয়া গেল। নবাবের বারুদগাড়ির উপর কোন ঢাকা ছিল না। সমস্ত বারুদ জলে ভিজিয়া গেল।

ঐতিহাসিকেরা বলেন এক পশলা বৃষ্টি ওয়াটার্লু যুদ্ধের সময়ও হইয়াছিল এবং সেই বৃষ্টির ফলেই নেপোলিয়নের বীরবাহিনী নাকি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন ওই এক পশলা বৃষ্টি না হইলে নেপোলিয়ন হয়তো ওয়াটার্লু যুদ্ধে জয়লাভ করিতেন। এক পশলা বৃষ্টি নবাবকেও পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। মীরমদন ও সাঁফ্রের কামান নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

ইংরেজদের কামানের বারুদ সুরক্ষিত এবং শুষ্ক ছিল। তাহারা গর্তের ভিতর বসিয়া জোরে জোরে ঘন ঘন তোপ দাগিতে লাগিল। মীরমদন, এবং আরও অনেক সেনাপতি আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। নবাবসেনা পিছু হটিতে লাগিল। মীরজাফর, ইয়ারলতিফ, রায়দুর্লভ পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহারা যদি এই সময় বীরবিক্রমে আগাইয়া আসিতেন, পলাশীর যুদ্ধে নবাব হারিতেন না। ইংরেজদের ঘন ঘন তোপ-গর্জন শুনিয়া নবাবের বিপুল সৈন্যবাহিনী কেমন যেন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। মীরমদনের মৃত্যুতেও সকলে বিহ্বল ভীত হইয়া যে যেদিকে পারিলেন পালাইতে লাগিলেন। নবাব নিজের শিবিরে পিছন দিকে দুইহাত রাখিয়া উত্তেজিতভাবে পরিক্রমণ করিতেছিলেন। মীরমদনের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া নবাব মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং মীরজাফরের পায়ের কাছে নিজের পাগড়িটা রাখিয়া মিনতি করিলেন- —এখন সব তোমার হাতে, আমাকে বাঁচাও। মীরজাফর কোরান স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি নবাবকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, কিন্তু এখন যুদ্ধ বন্ধ করা হোক। রায়দুর্লভও সেই পরামর্শ দিলেন। মোহনলাল কিন্তু ইহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য আগাইয়া গেলেন। ফরাসীরাও লড়িতে লাগিল। কিন্তু নবাবের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল, কোথাও কোন শৃঙ্খলা আর ছিল না। ঘোড়া গরুর গাড়ি সৈন্য সব বিশৃঙ্খল হইয়া ছুটোছুটি করিতেছিল। ক্লাইভের সৈন্য সুশিক্ষিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাহারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু তাহাদের রণকৌশল অদ্ভুত। তাহারা কিছুক্ষণের মধ্যেই নবাবের ছাউনী দখল করিয়া ফেলিল। ছাউনীতে ঢুকিয়া দেখিল সিরাজদৌল্লা নাই। তিনি পলাতক। শোনা গেল তিনি একটা উটের পিঠে চড়িয়া মুর্শিদাবাদের দিকে চলিয়া গিয়াছেন।

এই যুদ্ধে জন সাহেবও যোগ দিয়াছিলেন।

একটি গুলি তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিয়াছিল। তিনি মারা যান নাই হাসপাতালে ছিলেন।

।। পনেরো ।।

ধূর্জটিমঙ্গল রাজমহল হইতে ফিরিতেছিলেন। সেকালে রাজমহলের নিকট পাহাড়ের উপর যে জঙ্গল ছিল সেই জঙ্গলেই তিনি তাঁহার বিচারালয় বসাইয়াছিলেন। তাঁহার নিয়োজিত গুণ্ডারা উজীর আহম্মদকে অপহরণ করিয়া সেই জঙ্গলে টানিয়া আনিয়াছিল। ব্যাপারটা মোটেই দুঃসাধ্য হয় নাই। উজীর আহম্মদের অনুচরেরাই টাকা খাইয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিয়াছিলেন—"তুমি বহু সতী রমণীর সতীত্ব অপহরণ করেছ। সেজন্য তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি। পা থেকে শুরু করে তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে

পারতাম। তুমি যা করেছ তাই হয়তো তোমার উচিত শাস্তি হত। কিন্তু অত নিষ্ঠুর আমি হব না। এক কোপেই তোমার শিরশ্ছেদ করব।"

উজীর আহম্মদের মৃতদেহটাকে তিনি জঙ্গলে শকুন শেয়ালদের মুখে ফেলিয়া দেন নাই। গর্ত খুঁড়িয়া তাঁহার একটা কবরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি সহচরবৃন্দসহ অশ্বরোহণে ফিরিতেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের খবর তিনি তখনও শোনেন নাই। তিনি জানিতেন না যে স্বয়ং নবাব পলায়ন করিয়া মহানন্দা নদী ধরিয়া পাটনার দিকে গিয়াছেন। উদ্দেশ্য বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা রামনারায়ণের সহিত মিলিত হওয়া, উদ্দেশ্য ফরাসী জাঁ লর সহায়তায় আবার বাহিনী সংগঠন করিয়া ক্লাইভকে আক্রমণ করা। ধূর্জটিমঙ্গল এসব ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না। ইহা জানিতে পারিলেন না যে রাজমহলের কিছুদূরে কালিন্দী নদীতে তাঁহার নৌকা চড়ায় ঠেকিয়ে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, জানিতে পারিলেন না যে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া বাংলার নবাব সেই ফকির দান শার দ্বারস্থ হইয়াছেন কিছু দিন আগে তিনি যাহার নাক কান কাটিয়া দিয়াছিলেন। জানিতে পারিলেন না যে ফকির দান শা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছেন, জানিতে পারিলেন না যে মীরজাফরের ভাই দাউদ এবং মীরজাফরের জামাই মীরকাশিম তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে, জানিতে পারিলেন না সিরাজউদ্দৌলা অর্থ দিয়া মীরকাশিমকে বশীভূত করিবার প্রয়াসে লুৎফুন্নিসার বহুমূল্য জহরত এবং অলঙ্কার তাঁহাকে দিয়াছিলেন, জানিতে পারিলেন না যে গহনাগুলি মীরকাশিম আত্মসাৎ করিয়াও তাঁহার মুক্তির কোনও ব্যবস্থা করে নাই। এসব কিছুই জানিতে পারিলেন না ধূর্জটিমঙ্গল। তিনি অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতেছিলেন। এক জায়গায় কিন্তু তাঁহাকে ঘোড়ার রাশ টানিয়া ধরিতে হইল। দেখিলেন একটি বহুমূল্য পর্দা-ঢাকাগাড়ি রাস্তার কাদায় আটকাইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার গর্তটি বেশ গভীর এবং কাদাও প্রচুর। ঘোড়া দুইটির পেট পর্যন্ত কাদা উঠিয়াছে। তাহারা গাড়িটিকে টানিয়া তুলিতে পারিতেছে না। গাড়ির সহিস ও কোচোয়ানও মহার্ঘ পোশাকে সজ্জিত দুইজন মুসলমান। তাহারা এ অবস্থায় কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

ধূর্জটিমঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার গাড়ি--"

কোচোয়ানটি খানিকক্ষণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! তাহার পর উর্দুতে জিজ্ঞাসা করিল— "আপনি কোথাকার লোক? কোথায় যাচ্ছেন?"

"আমি মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি। সেখানেই আমার বাড়ি।"

"আপনি লড়াইয়ের খবর শোনেননি? হালত খুবই বুরা। নবাব সাহেব ফতে হয়ে গেছেন। মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি বেগমসাহেবাকে নিয়ে পালাচ্ছিলেন! বেগমসাহেবার গাড়ি কাদায় আটকে গেছে। তিনি কিন্তু দাঁড়াতে পারলেন না, চলে গেলেন।"

গাড়ির ভিতর হইতে একটা বুকফাটা আর্ত ক্রন্দন শোনা গেল।

"কোন্ বেগমসাহেবা গাড়িতে আছেন?"

"বেগম লুৎফুন্নিসা।"

"বেশ আমি গাড়িটা তুলে দেবার ব্যবস্থা করছি। আমার সঙ্গে লোক আছে।"

ধূর্জটিমঙ্গলের সহচরবৃন্দ টানাটানি করিয়া গাড়িটাকে কাদা হইতে তুলিয়া রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহাদের ছুটিয়া পলাইতে হইল। কারণ দাউদ খাঁর সৈন্যেরা বেগমদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা আসিলেই বেগম লুৎফুন্নিসা তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

ধূর্জটিমঙ্গলের একবার মনে হইয়াছিল এই পাষণ্ডদের হস্ত হইতে বেগম লুৎফুন্নিসাকে রক্ষা করেন। যে কয়জন সৈন্য আসিয়াছিল তাহাদের হারাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না তাঁহার পক্ষে। সৈন্য ছিল মাত্র চার। ধূর্জটিমঙ্গলেরা ছিলেন দশজন। কিন্তু ভাবিলেন সাপের মাথায় মণি উদ্ধার করিয়া তিনি তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিবেন? মহাকালের মহাবিচারালয়ে যে শাস্তির রায় বাহির হইয়া গিয়াছে সে রায়ের প্রতিবাদ করিবার স্পর্ধাই বা তাঁহার কেন হইবে? তবু দুঃখিনী লুৎফুন্নিসার জন্য তাঁহার কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন অভাগিনী পূর্বজন্মে নিশ্চয় কোন মহাপাপ করিয়াছিল, তাই এ জন্মে ওই লম্পট পাষণ্ডের সহধর্মিণী হইতে হইয়াছে। তবু তাহার জন্য কষ্ট হইতে লাগিল।

একজন সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল—"এখন তো মুর্শিদাবাদে খুব গোলমাল। সেখানে যাওয়া কি ঠিক হবে এখন?"

"তোমরা যদি অন্য জায়গায় যেতে চাও যাও, আমাকে কিন্তু সেখানে যেতেই হবে।"

মৈনিবিবি এবং সরফুর কথা তিনি ভোলেন নাই।

তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে কিন্তু ত্যাগ করিল না। সকলেই তাঁহার সঙ্গে গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন ক্লাইভ সামান্য কয়েকজন সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ আসিয়াছেন। মুরাদবাগে নবাবেরই এক প্রাসাদে আছেন তিনি। ধূর্জটিমঙ্গল একটা অসমসাহসিক কাজ করিয়া বসিলেন। প্রথমেই সোজা তিনি মুরাদবাগে চলিয়া গিয়া ক্লাইভের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। সঙ্গে একজন দোভাষী লইয়া গিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন সাহেবদের যেমন কায়দা হয়তো দেখা করিবার একটা সময় বলিয়া দিবেন। ক্লাইভ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা করিলেন তাঁহার সঙ্গে। কুর্নিশ করিয়া দোভাষী মারফত জানাইলেন যুদ্ধজয়ের জন্য তিনি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে আসিয়াছেন। আরও বলিলেন যে তিনি কলিকাতায় তাঁহাদের জমিদারি সুতানুটিতে বসবাস করিতেন। কিন্তু নবাবের সৈন্যরা তাঁহার ঘরবাড়ি পুড়াইয়া দিয়াছে। এখানেও তাঁহারা বড় ভয়ে ভয়ে আছেন। ক্লাইভ সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—ভয়ের কোন কারণ নাই। কলিকাতায় যাহাদের বাড়ি পুড়িয়াছে তাহাদের বাড়ি আবার তৈয়ারি করাইয়া দেওয়া হইবে। আপনি আপনার নাম ঠিকানা এখানে রাখিয়া যান আমি সুতানুটির মুনশী নবকৃষ্ণকে বলিয়া দিব তিনি যেন আপনার থাকিবার সমস্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। এখানেও যত দিন ইচ্ছে নির্ভয়ে থাকিতে পারেন। আপনি যদি দুইজন গোরা সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত থাকেন দুইজন গোরাকে আপনার বাড়ি পাহারা দিবার জন্য মোতায়েন করিয়া দিতে পারি। ধূর্জটিমঙ্গল আর একবার কুর্নিশ করিয়া একমুঠা আসরফি তাঁহাকে নজরানা দিলেন। ক্লাইব মহা খুশী। বলিলেন, কোন ভয় নাই, আমরা আপনার সহায় থাকিব। ধূর্জটিমঙ্গল যখন ফিরিতেছেন তখন দেখিলেন দুইজন গোরা ঘোড়সওয়ার তাঁহার পিছু পিছু আসিতেছে। মৈনিবিবির বাড়ির সম্মুখে ধূর্জটিমঙ্গল অশ্ব হইতে অবরতণ করিলে। গোরা দুইটিও সেখানে ঘোড়া থামাইল। ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—এখন পাহারার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হইলে তিনি খবর দিবেন। তাহাদের একটা করিয়া আসরফিও দিলেন। তাহারা চলিয়া গেল। বাড়ির সামনে গোরা সৈন্য মোতায়েন রাখা তিনি সুবুদ্ধির কাজ মনে করিলেন না। পাড়ার লোকেরা হয়ত অন্যরকম ভাবিবে।

ভিতরে গিয়াই তিনি মৈনিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। পেশোয়াজ পরিয়া ওড়না গায়ে দিয়া চোখে সুর্মা লাগাইয়া দোদুল্যমান বেণীতে জরির ফিতা বাঁধিয়া মৈনি যেন অন্যরকম হইয়া গিয়াছে।

"আপনি এসে গেছেন। বাঁচলুম—"

'তোমার একি বেশ—"

"আমি জনাব মীরজাফর সাহেবের বাড়ি যাচ্ছি। সেখান থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে। খুব ধুম সেখানে আজ। অনেক তইফি, বাইজী, গাইয়ে বাজিয়েরা আসবে সেখানে। দরবার বসবে। শুনেছি সেই দরবারে নাকি স্বয়ং ক্লাইভ সাহেব মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসিয়ে দেবেন। নবাবের বাড়ির সামনের মাঠে প্রচুর তাঁবু পড়েছে—"

"তাই নাকি। তুমি ফিরবে কখন?"

"তা তো জানি না। ছুটি হলেই ফিরব। বহুলোক আসবে দরবারে, আপনিও চলুন না।"

"বিনা নিমন্ত্রণে আমি কোথাও যাই না।"

মৈনির চোখ দুইটির ভিতর হাসির আলো জ্বলিয়া উঠিল, সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"নিমন্ত্রণ আসবে।"

"সরফুর খবর কি?"

"ভাল আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে খবর আসিল মৈনির জন্য তাঞ্জাম আসিয়া গিয়াছে।

"তুমি তাহলে যাও এখন। আমি সরফুর কাছে চললাম।"

ধূর্জটিমঙ্গল সরফুর কাছে গিয়া দেখিলেন সরফু ঘরে খিল লাগাইয়া বসিয়া আছে। ধূর্জটিমঙ্গলকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, শুনিলাম নাকি বাবা মা এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি আর এখানে থাকিব না, আমাকেও বাবা মার কাছে পাঠাইয়া দিন। আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না। ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন তাহার বাবা মা কোথায় গিয়াছেন তাহা তিনিও জানেন না। তবে তিনি তাহাকে মুর্শিদাবাদে আর রাখিবেন না। লালবাগের কাছে তাহাদের যে বাড়ি এবং জায়গীর আছে সেইখানেই পাঠাইয়া দিবেন তাহাকে। তাহার সঙ্গে একজন মৌলভী, একজন সঙ্গীত শিক্ষক এবং একজন কুস্তিগীর থাকিবে। ভালো চাকরও বাহাল করিয়া দিবেন তিনি। কোন কষ্ট হইবে না। তাহার পর বাবার ঠিক ঠিকানা পাইলে তাহাকে সেখানে পাঠাইয়া দিবেন। আপাতত লালবাগে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। রাজধানীতে না থাকাই ভালো। ধূর্জটিমঙ্গল বেশীক্ষণ সেখানে বসিলেন না।

"আমি আজই সব ব্যবস্থা করছি। কালই তুমি লালবাগে চলে যাবে। কিচ্ছু ভয় নেই।"

ধূর্জটিমঙ্গল একজন ভালো মৌলভী, ভালো সঙ্গীত শিক্ষক এবং একজন ভালো কুস্তিগীরের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন। সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর মুর্শিদাবাদের অনেক নাগরিক ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যদিও জগৎশেঠের লোকেরা এবং মীরজাফরের অনুচরগণ পুরবাসীদের শান্ত থাকিবার পরামর্শ দিতেছিলেন, যদিও তাঁহারা বলিতেছিলেন—পাপটা বিদায় হইয়াছে এইবার সকলে সুশাসনে সুখে থাকিবে—তবু অনেকেই মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং কিছুক্ষণ ঘুরিয়াই ধূর্জটিমঙ্গল একজন

মৌলভী, একজন ওস্তাদ এবং একজন পালোয়ান যোগাড় করিতে সমর্থ হইলেন। অগ্রিম বেতন দিয়া তাহাদের নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন কাল সকালেই গাড়ি আসিয়া তাহাদের লইয়া যাইবে। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার অপেক্ষায় কেতাদুরস্ত পোশাক-পরা একজন দৌবারিক বসিয়া আছে। দৌবারিক তাঁহাকে একটা পত্র দিল। পত্রটি নবাব সাহেবের দফতরখানা হইতে আসিয়াছে। ফার্সিতে লেখা আছে—আজ বৈকালে নবাবের প্রাসাদের সম্মুখে দরবার বসিবে। সেই দরবারে আপনি যদি আপনার তশরিফ লইয়া আসেন, আমরা সকলেই সুখী হইব। নীচে মীরজাফরের নামাঙ্কিত একটি সীলমোহর। ধূর্জটিমঙ্গল বুঝিলেন মৈনিই কোন কৌশল করিয়া নিমন্ত্রণটি পাঠাইয়াছে।

ধূর্জটিমঙ্গল গেলেন। দেখিলেন বিরাট আয়োজন, রাজকীয় পরিবেশ। দূরে বৃটিশদের ব্যান্ড বাজিতেছে। চতুর্দিকে বিচিত্র পটমণ্ডপ। পাত্রমিত্র সামন্তবর্গের জন্য, নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য সারি সারি অলঙ্কৃত পট্টাবাস। নানা অলঙ্কারে সুশোভিত, কোনটাতে কিংখাব, কোনটাতে জরি ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে চক্রাকারে সহস্র সহস্র বস্ত্রগৃহ। তাহার চারিপাশে অসংখ্য দোকান, কোনটা পানের দোকান, কোনটা মদের দোকান, কোনটা অলংকারের দোকান, কোনটা মিষ্টান্নের দোকান, কোনটা রেশমের কাপড়ের দোকান, কোনটা খেলনার দোকান, কোনটা ফুলের দোকান, আরও কত রকমের কত দোকান। দোকানীরাও নানা রকমের নানা বেশভূষায় সজ্জিত। লাল দাড়ি আরমারী, ভ্রমরকৃষ্ণ বাবরি দাড়ি সমন্বিত মোগল, ফিরিঙ্গিবেশে সজ্জিত পর্তুগীজ বণিক, চুস্ত পায়জামা শেরওয়ানি পরিহিত বাঙালী ব্যবসায়ী, অর্ধেক মাথা কামানো পিরানকাপড়পরা উড়িয়া দোকানী, ভেলভেটের জামা-কাপড় পরা আফগান—এসব তো আছেই, এ ছাড়া মাঝে মাঝে আছে রূপসী মেয়েরা। তাহারা পানের এবং ফুলের দোকানগুলি অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের সকলকে ঘিরিয়া বিপুল জনতা। সকলে দাঁড়াইয়া আছে। দূরে দূরে গাছের উপরও লোক কম নাই। কেন্দ্রস্থলে বিরাট একটি মণ্ডপের উপর বিরাট একটি মখমলের চন্দ্রাতপ, তাহাতে অপরূপ কারুকার্যময় স্বর্ণনির্মিত কনকপদ্ম।, এই মণ্ডপের নিচেই সেই মসনদ, যে মসনদে আজিমউস্‌শান, মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন মুহম্মদ খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আলিবর্দী খাঁ, সিরাজউদ্দৌলা উপবেশন করিয়াছিলেন, যে মসনদে বসিবার জন্য কত নবাব কত রক্তে বাংলাদেশের মাটি সিক্ত করিয়াছেন। সেই মসনদে আজ মীরজাফর উপবেশন করিবেন। দরবারকে ঘিরিয়া যে সুসজ্জিত পট্টবস্ত্রগুলি সম্ভ্রান্ত অতিথি ও বন্ধুবর্গের জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেই পট্টবস্ত্রগুলির ভিতর হইতে গান বাজনার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল। হয়তো মৈনি উহারই একটার মধ্যে বসিয়া কোনও বিশিষ্ট অতিথির মনোরঞ্জন করিতেছে। ধূর্জটিমঙ্গল যে নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলেন তাহা দেখাইলে হয়তো তাঁহাকেও কোথাও একটা আসন দেওয়া হইত, কিন্তু তাহা দেখাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি দূরে একধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ একটা তোপধ্বনি শোনা গেল। জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য জাগিল। পট্টবাস হইতে নানাবেশে সুসজ্জিত আমীর ওমরাহেরা বাহির হইলেন। তাহার পর কুচকাওয়াজ করিতে করিতে একদল গোরা সৈন্য আসিয়া মণ্ডপের একধারে দাঁড়াইল। আর একধারে দাঁড়াইল নবাবের সৈন্যরা। দূরে দেখা গেল ক্লাইভের সহিত মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, এবং কয়েকজন হোমরাচোমরা সাহেব আসিতেছেন। তাঁহাদের আগে একজন নকীব তাঁহাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করিতেছে। তাঁহারা যখন মসনদের নিকটবর্তী হইলেন স্বয়ং

ক্লাইভ মীরজাফরকে হাত ধরিয়া মসনদের উপর বসাইয়া তাঁহার মাথায় উষ্ণীষ পরাইয়া দিলেন। সভার সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহার পর গর্জন করিয়া উঠিল আরও কয়েকটা তোপ। ধূর্জটিমঙ্গল একদৃষ্টে মীরজাফরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ একটা। গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। গাঁজা মদ আপিঙ ভাঙের করাল প্রভাব চোখে মুখে পরিস্ফুট। মুখের ভাবটা বড় ভয়ঙ্কর, মনে হয় যেন কোন কুষ্ঠরোগী। এই লোক বঙ্গদেশ শাসন করিবে! নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন ধূর্জটিমঙ্গল।

দরবার হইতে বাহির হইয়া ধূর্জটিমঙ্গল মুর্শিদাবাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন অনেকক্ষণ। যে গাড়িটা সরফু এবং তাঁহার শিক্ষকগণকে লইয়া যাইবে তাহার সহিত আর একবার যোগাযোগ করিলেন। মৈনির বাড়িতে যখন উপস্থিত হইলেন তখন অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। শুনিলেন মৈনি তখনও ফেরে নাই। চাকরকে বলিয়া গেলেন মৈনিকে বলিও আমি আসিয়াছিলাম। আমি জাফরাগঞ্জের বাড়িতে ফিরিয়া যাইতেছি।

ধূর্জটিমঙ্গল পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। খাওয়া শেষ করিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। অনেক রাত্রে মৈনি আসিয়া হাজির হইল।

"খবর শুনেছেন?"

"কি খবর?"

"এই জাফরাগঞ্জের এক বাড়িতে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে খুন করেছে আজ। কাল তাঁর দেহটাকে নিয়ে হাতি বেরুবে নাকি!"

"কে খুন করেছে?"

"মহম্মদী বেগ। আপনি তো তাকে চেনেন। আলীবর্দী খাঁ ওকে মানুষ করেছিলেন, সিরাজের দিদিমা ওর বিয়ে দিয়েছিলেন, সিরাজের মা আমিনা বেগম ওকে স্নেহ করতেন—সেই মহম্মদী বেগ।"

"তা তুমি এত রাত্রে এখানে চলে এলে কেন?"

"মনে হল আপনি এখানে আছেন—এই প্রেতপুরীতে, আমার ভয় হল। চলুন আমার বাড়ি। শুনেছিলাম ঝকমারি এখানে আছে কিন্তু দেখছি কেউ নেই—ঝকমারি কোথায়?"

"জানি না কোথায়। এখান থেকে চলে গেছে সে। বারাহীরও কোনও খবর পেলাম না। জগন্নাথ ফেরেনি এখনও।"

মৈনি বারাহীর খবর জানিত। কিন্তু কথাটা সে প্রকাশ করিল না। বলিল—"ফেরেনি বোধহয়। আপনি চলুন আমার বাড়িতে।"

"আমি কোথাও যাব না। এইখানেই থাকব। কাল ভোরে উঠে সরফুকে নিয়ে লালবাগে চলে যাব।"

"যেখানে এত বড় একটা খুন হয়ে গেছে, সেখানে আপনার ভয় করবে না? পাড়া নির্জন, কোথাও কেউ নাই।"

"আমার কিচ্ছু ভয় করবে না। তুমি ফিরে যাও।"

"আমি একা ফিরে যেতে পারব না। আপনিও চলুন। আমার বড় ভয় করছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল ধমক দিয়া উঠিলেন।

"এ কি অসঙ্গত আবদার তোমার। আমি সঙ্গে দুজন লোক দিচ্ছি, তুমি ফিরে যাও।"

মৈনি হঠাৎ ধূর্জটিমঙ্গলের পা দুইটি ধরিয়া বলিল, "দোহাই আপনার আমাকে সেখানে ফিরে যেতে বলবেন না। আমি সেখানে এখন কিছুতেই ফিরে যেতে পারব না।"

"কেন?"

মৈনি ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। দরবার থেকে ফিরে এসে দেখি আমার বাড়িতে মহম্মদী বেগ বসে আছে। সে মাঝে মাঝে আমার কাছে প্রণয় নিবেদন করত কিন্তু আমি তাকে আমোল দিইনি। আজ সে দু'থলি সোনার মোহর আমার পায়ের কাছে রেখে বলল— বিবিসাহেব, আমি তোমার কেনা গোলাম, মেহেরবানি করুন। আমি তাকে ঘরে বসিয়ে পালিয়ে এসেছি, সেখানে আর একা ফিরতে পারব না এখন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন—"

ধূর্জটিমঙ্গল কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—"বেশ, চল।"

দুইজন রক্ষী সঙ্গে লইয়া ধূর্জটিমঙ্গল বাহির হইয়া পড়িলেন।

মৈনিবিবির তাঞ্জাম বাহককে বলিলেন—"মোরাদবাগে চল।" বলিয়াই তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আগাইয়া গেলেন।

মৈনি একটু অবাক হইয়া গেল—"মোরাদবাগে কেন—?"

তাঞ্জামবাহক প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাব তাহলে—"

"আচ্ছা, মোরাদবাগেই চল—"

অনেকক্ষণ পরে মোরাদবাগে পৌঁছিয়া ধূর্জটিমঙ্গল ক্লাইভের খোঁজ করিলেন।

প্রহরী বলিল—"তিনি এখন নবাব সাহেবের বাড়িতে আছেন।"

ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে একটি আসরফি দিয়া বলিলেন, এখানে কোনও সাহেব নেই? কারো সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও। তোমাকে আরও বখশিস দেব। জরুরি দরকার।"

প্রহরী বলিল—"ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব আছেন এখানে।"

"বেশ তাঁর কাছেই আমাকে নিয়ে চল।"

ধূর্জটিমঙ্গল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে ওয়ারেন হেস্টিংস নামক যুবক ইংরেজটি চমৎকার উর্দু বলিতে পারেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি অতি ভদ্রলোক।

ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহাকে বলিলেন—"একটি বদমায়েশ লোক একজন বাইজিকে বিরক্ত করছে, আপনি তাঁকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করে দিন। মেয়েটি আমার সঙ্গে এসেছে—"

ওয়ারেন হেস্টিংস সোৎসাহে বলিলেন, "নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করব। দু'জন গোরা পাহারার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

মৈনির তাঞ্জাম আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

মৈনি তাঞ্জাম হইতে নামিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"বহুত শুক্রিয়া। কিন্তু আমি গোরা পাহারা চাই না। আমি নবাব সাহেবের অন্দরমহলে গান করি সেখানেই চললাম। আদাব।"

মৈনি তাঞ্জামে উঠিয়া সোজা নবাববাড়ির দিকেই চলিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গল তাহার পিছু পিছু কিছুদূর গেলেন। কিন্তু মৈনি তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। ফিরিয়া চাহিলে তিনি হয়তো দেখিতে পাইতেন মৈনি কাঁদিতেছে। ধূর্জটিমঙ্গল ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া আবার জাফরাগঞ্জে নিজের বাসায় ফিরিয়া গেলেন। মৈনির জন্য তাঁহার কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার সঙ্গে গেলেন না। বাসায় গিয়া পুনরায় বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

।। ষোল।।

জগদ্ধাত্রী পরদিনই চলিয়া আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। নীলু রায় বলিলেন, "ধলরাজাকে খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে যাওয়া উচিত নয়।"

দানিয়েলও বলিল—"জন সাহেব আমার উপর আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছেন, তাঁর হুকুম না পেলে কি করে আপনাদের যেতে দি। লালী খাম্বার দেখাশোনা করত, তার উপর ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলাম আমি। কিন্তু সে দেখছি তার কাজ ঠিকমতো করেনি। এর জন্যে ফৌজি শাস্তি পাবে সে—"

লালীকে সে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। এই দেখিয়া ঝামরি কোথায় যে অর্ন্তধান করিল তাহা কেহ বলিতে পারিল না। দানিয়েল বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—ওই ডাইনীকে ধরিতে পারিল তাহাকেও গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিব। জগদ্ধাত্রীর কাছে আসিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল সে, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বন্দুকটা তাঁহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—শুট মি। আমিই দোষ করেছি।

জগদ্ধাত্রী পাথরের মতো হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, ব্যক্তিগত অনুভূতি, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত সাধ আহ্লাদ সব যেন জমিয়া বিরাট একটা নৈবেদ্যে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল, সে নৈবেদ্য তিনি ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন বলিয়াছিলেন—নাও আমার সব নাও। তুমি তৃপ্ত হও, তাতেই আমার তৃপ্তি। বিধাতার অমোঘ বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তিনি। ভাবিয়াছিলেন হয়তো সত্যই তিনি সৌভাগ্যবতী, তাই রংকিণী তাঁহার শিশুপুত্রটিকে নিজের চরণে স্থান দিয়াছেন। জগদ্ধাত্রীর চোখে মুখে অদ্ভুত অপূর্ব একটা সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহা অবর্ণনীয়, যাহা অননুকরণীয়। এখন সুষমা শিল্পীরা প্রতিমায় বা চিত্রে ফুটাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। এ সুষমার মূল সুর করুণা, মূল ব্যঞ্জনা আত্মসমর্পণ, মূল উদ্দেশ্য পূজা। প্রায় সব সময়েই তিনি নিজের ঠাকুরঘরটিতে থাকিতেন। কস্তুরী একদিন খুঁটিকে আনিয়া বলিল—মা, একে তুর কাছে রাখ। আমি সদাই একে বুকে করে রাখি, বনের হুঁড়ার একে লিতে লারবে আমার বুক থেকে, কিন্তু মানুষ-হুঁড়ারকে বড় ডরাই। তোর ধন তোর কাছেই থাক। জগদ্ধাত্রী প্রসন্ন হাসি হাসিলেন। বলিলেন, মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে। ও তোর কাছেই থাক। ও আমাকে চেনে না, তোকে চেনে। দানিয়েলের কাছে থাকতে যদি তোর ভয় করে আমার কাছে এসে থাক। কস্তুরী বলিল—উকে আমার কিছু ভয় নাই। উ-ই বরং আমাকে ডরায়। জগদ্ধাত্রী বুঝিলেন কস্তুরী দানিয়েলকে ছাড়িয়া আসিবে না। বলিলেন, তবে ওইখানেই থাক তুই। খুঁটি তোর কাছেই থাক। আমার সব ভয় ভেঙে গেছে, আমার সব আমার দেবতাকে আমি দিয়েছি, ভয় ভাবনা সব। তিনি যা করবেন তাই হবে, আমাদের কিছু করবার ক্ষমতা নেই। এসব শুনিয়া কস্তুরী অবাক হইয়া গেল।

এইভাবে জগদ্ধাত্রীর দিন কাটিতেছিল।

নীলু রায় একদিন মাখনলালকে সঙ্গে করিয়া ধলরাজার বাড়িতে গেলেন। তাঁহার মনে হইল রাজাকে সব জানানো দরকার। রংকিণীর নিকট তাঁহার মিতেনের পুত্রকেই যে বলি দেওয়া হইয়াছে এবং সেইজন্যেই যে তিনি চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন এ কথাটা জানাইলে চলিয়া যাইবার ব্যবস্থাই তিনি করিবেন। তাঁহারও আর এখানে ভালো লাগিতেছিল না।

বাংলাদেশের কোনও খবরও এখানে পৌঁছে নাই। মধু সামন্ত কিছুকাল পূর্বে কিছু সৈন্যসামন্ত লইয়া নবাবকে সাহায্য করিবার জন্য গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারও আর কোনও খবর নাই। শেষপর্যন্ত নবাবের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ বাধিল কি না এবং তাহার ফলাফল কি হইল তাহা জানিবার জন্যে তিনি উৎসুক হইয়া উঠিতেছিলেন। তাছাড়া দানিয়েল লোকটাকেও কেমন যেন একটা খাপছাড়া ধরনের লোক বলিয়া মনে হইতেছিল। সে লালীকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল, জগদ্ধাত্রীর পায়ের নিকট মাথা কুটিল কিন্তু এমন একটা ভাব করিয়া বেড়াইতেছে যেন সে-ই এই অঞ্চলের হর্তাকর্তাবিধাতা। লোকটা যখন রাগে, তখন তাহার জ্ঞান থাকে না, ক্ষ্যাপা গোছের গোঁয়ার লোক। জগদ্ধাত্রীকে সে অবশ্য দেবীর মতো ভক্তি করে, কিন্তু নীলু রায়ের ধারণা এরকম একটা খামখেয়ালী লোকের নিকট বাস করা নিরাপদ নহে।

ধলরাজা সব শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন। মিতেনের ছেলেকে রংকিণীর কাছে বলি দেওয়া হইয়াছে, এ নিশ্চয় ওই ডাইনী ঝামরির কারসাজি। ইহার একটা প্রতিবিধান করিতেই হইবে। নীলু রায়কে তিনি বলিলেন ক্ষতিপূরণ না করিলে তাঁহার পাপ হইবে। যেমন করিয়া হোক ইহার ক্ষতিপূরণ করিবেনই। এখন মিতেনের যাওয়া হইবে না, তিনি যথাসময়ে সসম্মানে মিতেনকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন। নীলু রায় একটু অবাক হইলেন। ক্ষতিপূরণ করিবেন? টাকা দিবেন নাকি! তাই যদি দেন তাহা হইল সেটা তো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো হইবে। কিন্তু ধলরাজা যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছেন তাহাতে একথা বলিবার সাহস তাঁহার হইল না। তিনি বার বার নিজের দুই বাহু দুই দিকে প্রসারিত করিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা দুই উরুর উপর সশব্দে চাপড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল, চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। তিনি আদিবাসীদের ভাষায় উচ্চকণ্ঠে যাহা বলিতে লাগিলেন তাহা রণহুঙ্কার বলিয়া বোধ হইল। নীলু রায় আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। মাখনলালও চোখের ইঙ্গিতে বারণ করিল। নীলু রায় এবং মাখনলালকে ধলরাজা রাজকীয় সম্মানে আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহাদের ভূরিভোজন তো করিতে হইলই, আদিবাসী মেয়েদের বোনা কাপড় চাদর এবং আরও নানারূপ উপহার গ্রহণ করিতে হইল। ধলরাজা নীলু রায়কে একটি প্রকাণ্ড ভল্ল উপহার দিলেন।

কয়েকেদিন পরেই একটি নাটকীয় কাণ্ড ঘটিল। ধলরাজার সৈন্যসামন্তরা ঝামরিকে বাঁধিয়া টানিতে টানিতে লইয়া হাজির করিল নীলু রায়ের সম্মুখে। সৈন্যদের সহিত ধলরাজার একটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীও আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন ধলরাজা আদেশ দিয়াছেন তাঁহার মিতেন ইহাকে যে শাস্তি দিতে বলিবেন সেই শাস্তিই তাহারা ইহাকে দিবে। ফাঁসি দেওয়া যাইতে পারে, কিংবা পুড়াইয়া ফেলা যাইতে পারে। আজ অমাবস্যা, জগদ্ধাত্রী দেবী যদি ইচ্ছা করেন ইহাকে রংকিণী দেবীর নিকট বলিও দিতে পারেন। ঝামরি চীৎকার করিতেছিল—আমি জানি রংকিণী আমাকে বাঁচাবেক। ওই রক্তখাগিই আমাকে স্বপন দিয়েছিল, আমি যা করেছি তার উস্‌কানিতেই করেছি। সে আমাকে বাঁচাবেক। সত্যই সে বাঁচিয়া গেল শেষকালে। জগদ্ধাত্রী তাহাকে কোন শাস্তি দিলেন না, ক্ষমা করিলেন। সৈন্যরা তাহার বন্ধন খুলিয়া দিতেই সে হাসিতে হাসিতে বনের ভিতর চলিয়া গেল। বৈকালে যাহা ঘটিল তাহাও অপ্রত্যাশিত। স্বয়ং ধলরাজা অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোকজন এবং একটি

সুসজ্জিত ছোট পালকি। পালকির ভিতর একটি আদিবাসী রমণী একটি শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। ধলরাজা বলিলেন ছেলেটি তাঁহারই ছেলে। বয়স এক বছর। উহার মা উহাকে প্রসব করিয়াই মারা গিয়াছিল। একটি ধাত্রী তাহাকে লালন পালন করিতেছে। ধলরাজা ধাত্রী সমেত ছেলেকে মিতেনকে দান করিবেন বলিয়া আসিয়াছেন। ছেলেটির ভরণপোষণের জন্য কিছু জমিও তিনি মিতেনকে দান করিবেন। মিতেন যদি দয়া করিয়া তাঁহার এই উপহার গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহার মনের ক্ষোভ মিটিবে। মিতেনের যে ক্ষতি হইয়াছে সে ক্ষতি পূরণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, কিন্তু যতটুকু তাঁহার সাধ্যে কুলাইল ততটুকুই তিনি করিলেন। মিতেন যেন অপ্রসন্ন হইয়া না থাকেন ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। অতিথি অপ্রসন্ন হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হয়। তিনি আরও বলিলেন বঙ্গদেশের খবর না পাওয়া পর্যন্ত তিনি মিতেনকে যাইতে দিবেন না। বঙ্গদেশে এখন রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছে। ধূর্জটিমঙ্গল এখন কোথায় আছেন সবই অনিশ্চিত। এ অবস্থায় তিনি মিতেনকে সেখানে পাঠাইবেন না। মধু সমস্ত খবর লইতে গিয়াছে। সে ফিরিয়া আসিলে যে ব্যবস্থা করা দরকার তাহা তিনি করিবেন। কোন বিপদের আশঙ্কা যদি না থাকে মিতেনকে অবশ্যই তিনি পাঠাইয়া দিবেন।

পরদার আড়ালে বসিয়া জগদ্ধাত্রী সব শুনিলেন। নীলু রায় দোভাষীর কাজ করিলেন। ধলরাজা অবশেষে সেই পরদার সম্মুখেই হাঁটু গাড়িয়া অভিবাদন করিলেন জগদ্ধাত্রীকে। জগদ্ধাত্রী তখন পরদা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ধলরাজাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"আপনার দান আমি মাথা পেতে নিলাম। আপনার ছেলেকে আমি আমার সাধ্যমত মানুষ করব। আপনার আরও ছেলে আছে তো?"

ধলরাজা বলিলেন তাঁহার ছেলেমেয়ের অভাব নাই। কুড়িটি ছেলে এবং দশটি মেয়ে ভগবান তাঁহাকে দিয়াছেন। "এ ছেলেটির মা মরিয়া গিয়াছে, আপনিই ইহাকে মানুষ করুন।"

জগদ্ধাত্রী পুনরায় তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পরদার অন্তরালে চলিয়া গেলেন।

মাস ছয়েক পরে ধলরাজা জগদ্ধাত্রীকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। মধু সামন্ত যখন ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে যুদ্ধের ঝড় ঝাপটা থামিয়া গিয়াছে, ধূর্জটিমঙ্গল সুতানুটিতে নিজের নূতন বাড়ি নির্মাণ করিতেছেন, তখন ধলরাজা জগদ্ধাত্রীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সঙ্গে যদিও লোকজন ছিল তবু যাত্রা খুব নির্বিঘ্ন হয় নাই। পথে এক জায়গায় বাঘের গর্জন শুনিয়া থামিয়া যাইতে হইয়াছিল। বাঘের নিদারুণ গর্জনে দিগদিগন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। সকলে স্থির করিলেন আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়, নিকটবর্তী একটি প্রান্তরে মশাল জ্বালাইয়া সকলে একত্রে রাত্রিবাস করিলেন। প্রভাতে যাত্রা শুরু হইল। কিছুদূর গিয়াই দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড মৃত বন্য বরাহ পথের ধারে পড়িয়া আছে। সম্ভবত বরাহটার সহিত কোনও বাঘের যুদ্ধ হইয়াছিল। আর একটা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল বাংলাদেশের কাছাকাছি আসিয়া প্রকাণ্ড একটা মাঠের উপর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক পরিপ্লাবিত। একটা চটিতে আশ্রয় পাইবার জন্য জগদ্ধাত্রীর পালকি দ্রুতবেগে মাঠটা অতিক্রম করিতেছিল। জগদ্ধাত্রীর অশ্বারোহী সঙ্গীরা নিকটবর্তী একটা জঙ্গলে শিকার করিতেছিলেন বলিয়া একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা একটা পালকি-বাহকের পায়ে একটা লাঠি আসিয়া লাগিল। সে খোঁড়া হইয়া বসিয়া পড়িল। পালকি নামাইতে হইল। ওই অঞ্চলটায়

তখন ঠ্যাঙাড়েদের খুব উপদ্রব। বাকি পালকিবাহকরা তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। দেখা গেল দূরে একদল ঠ্যাঙাড়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। একজন পালকিবাহক তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল অশ্বারোহীদের খবর দিতে। বাকী যাহারা রহিল তাহাদের দুইজন ঠ্যাঙাড়েদের দিকেই আগাইয়া গেল। উদ্দেশ্য তাহাদের সহিত দরদস্তুর করিয়া কিছু কালহরণ করা। এই কৌশলে ফল হইল। তাহারা ঠ্যাঙাড়েদের সর্দারকে বলিল, তোমরা আমাদের পথ আটক কোরো না। রানী মা বিশেষ দরকারে মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছেন। তোমরা দুশ টাকা নিয়ে আমাদের ছেড়ে দাও।"

সর্দার বলিল—"রানী মা যখন তখন আরও বেশী কিছু দিতে হবে। অন্ত শ' পাঁচেক চাই।"

"তাহলে রানী মাকে জিগ্যেস করে আসি। তোমরা একটু অপেক্ষা কর।"

লোকটি পালকির কাছে ফিরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে আবার গেল।

"রানী মা তিন শ' দিতে চাচ্ছেন।"

"তিনশ'তে হবে না। অন্তত: শ' চারেক চাই।"

"আচ্ছা জিগ্যেস করি তাহলে—"

ইতিমধ্যে অশ্বারোহীরা খবর পাইয়া গেলেন। বন্দুক আওয়াজ করিতে করিতে সদলবদলে ছুটিয়া আসিলেন তাঁহারা। ঠ্যাঙাড়েরা পলায়ন করিল। নীলু রায়ই অশ্বারোহীদের অগ্রবর্তী ছিলেন। দেখা গেল তাঁহার ঘোড়ার পিছন দিকে বেশ বড় একটা হরিণ ঝুলিতেছে।

আরও দুইটি পালকি ছিল। একটিতে ছিল খুঁটি এবং কস্তুরী আর একটিতে ছিল ধলরাজার পুত্র ও তাহার ধাত্রী শাবরি। জগদ্ধাত্রী ধলরাজার পুত্রটির জটামঙ্গল নামকরণ করিয়াছিলেন।

এই পালকি দুটি দ্বিপ্রহরে আগাইয়া গিয়া চটিতে আশ্রয় লইয়াছিল। জগদ্ধাত্রীও তাহাদের সহিত যাইতেছিলেন কিন্তু পথে একটি পর্বতবেষ্টিত নদী দেখিয়া তিনি স্নান করিবার জন্য নামিয়াছিলেন। স্নানান্তে পূজাও অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। নীলু রায় ভাবিয়াছিলেন তিনটি পালকিই দিনের আলোয় চটিতে পৌছিয়া গিয়াছে। তাই তিনি শিকার করিয়া কিছু মাংস সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় নিকটবর্তী অরণ্যে ঢুকিয়াছিলেন।

আর এক জায়গায় একদিন থামিতে হইয়াছিল।

পালকিবাহক কম পড়িয়া গিয়াছিল। একজনের পায়ে লাঠি লাগিয়াছিল, পায়ের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছিল। একটা ঘোড়ার পিছনে তুলিয়া তাহাকে আনিতে হইতেছিল। আরও দুইজন বাহকও অসুস্থ হইয়া পড়িল। একজনের ভেদবমি এবং আর একজনের জ্বর হইল। তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া নূতন বাহক যোগাড় করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী সমস্ত পথটা স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের অলৌকিক সৌন্দর্যে যেন আর একটা নূতন শোভার সৃষ্টি হইল। অনেকদিন পরে স্বামী সন্দর্শনে চলিয়াছেন। স্বামীকে কেমন দেখিবেন, কি ভাবে তিনি অভ্যর্থনা করিবেন, তাঁহার হৃদয়মন্দিরে স্বামীর জন্য যে আসনটি তিনি পাতিয়া রাখিয়াছেন, সেখানে তিনি বসিবেন কি না—এই সব চিন্তা তাঁহার মুখভাবে যে প্রত্যাশা, যে উন্মুখতা, যে অনিশ্চয়তার আভাস ফুটাইয়া তুলিল তাহা যেন আলো-ছায়া-খচিত আর একটা অপূর্ব শ্রী।

।। সতেরো।।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহার পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটায় বিরাট বাড়ি নির্মাণ করিয়াছেন। তিন মহলা বাড়ি। প্রকাণ্ড বাগানের পাশে অতিথিদের থাকিবার জন্যও একটি আলাদা দোতলা বাড়ি। যে শিবলিঙ্গের মাথায় কোনও আচ্ছাদন ছিল না সেই শিবলিঙ্গকে ঘিরিয়া বিশাল একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের সংলগ্ন খুব বড় একটি পূজার দালান। দালানের পাশে আর একটি ঘর। জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরঘর। বাড়ির পিছনে পুকুর। পুকুরের পাশে ফলের বাগান। বাড়ির সম্মুখে ফুলের বাগানে বহু রকম ফুল। বাগানের পাশেও কয়েকটা ঘর।

ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতে দুর্গাপূজা হইতেছে। শিবমন্দিরসংলগ্ন দালানে লাবণ্যময়ী দুর্গাপ্রতিমা। মা যেন হাসিতেছেন। অষ্টমী পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। দালানের সম্মুখে যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাতে চাঁদোয়া টাঙানো হইয়াছে। বিরাট চাঁদোয়া, বিরাট এবং অলংকৃত। চাঁদোয়ার নীচে নিমন্ত্রিত অতিথিগণ সমবেত হইয়াছেন। হিন্দু মুসলমান সাহেব সব রকম অতিথিই আছেন। একজন সাহেব চেয়ারে বসিয়া আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন। ক্রাচের উপর ভর দিয়া জন সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধে একটি পা তিনি হারাইয়াছেন। কিন্তু কিছুমাত্র দমেন নাই।

''হ্যালো, জর্জটি, মে আই হ্যাভ এ হুইস্কি।''

''নিশ্চয়।''

ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহাকে আলাদা একটি ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে টেবিলের উপর সারি সারি বিলাতী মদ। সেখানে দুইজন পোশাকপরা আরদালীও ছিল। ইঙ্গিত করিতেই তাহারা জন সাহেবকে গ্লাসে করিয়া হুইস্কি দিল। একটু পরেই সেই ঘরে দুইজন সারেঙ্গীওলা এবং দুইজন তবলাবাদক আসিয়া বসিল। একটু পরেই বাইনাচ আরম্ভ হইবে। তাহার সংলগ্ন আর একটি ঘরে শুধু গানের আসর। মৈনি বিবি কেরামত আলী এবং পুতলি বিবি সেখানে আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন। দ্বারের কাছে বসিয়া আছে রোমনি, শাওনি আর তির্কি। ধূর্জটিমঙ্গল তাহাদের ঝকমকে নূতন পোশাক কিনিয়া দিয়াছেন, তাহারা ভারি খুশী। দন্তগুলি সর্বদা বিকশিত হইয়া আছে। মৈনি এবং কেরামতের গান শুনিয়া তাহারা অবাক হইয়া গিয়াছে। ধূর্জটিমঙ্গল ঠিক করিয়াছেন মৈনি, কেরামত এবং পুতলি এখন কলিকাতাতেই থাকিবে। বাগানের পাশের ছোট বাড়িটি তাহাদের জন্যই প্রস্তুত করাইয়াছেন তিনি। সরফুদ্দিনও কলিকাতায় ইংরেজ সরকারে একটি ভালো চাকুরি পাইয়াছেন। ধূর্জটিমঙ্গল যদিও বাড়ির মালিক, কিন্তু বাড়ির আসল কর্তা নীলু রায়। তিনি চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। ভারে ভারে খাবার আসিতেছে। দলে দলে লোক আসিতেছে, চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র জাজিম, কার্পেট, বালিশ, খাট,—কত রকম জিনিস আসিতেছে। সকলেরই ব্যবস্থা করিতেছেন নীলু রায়। তাঁহার মুহূর্তমাত্র সময় নাই।

হঠাৎ পুরোহিত মহাশয় ঘণ্টা নাড়িয়া ঘোষণা করিলেন—এইবার সন্ধিপূজা হবে।

ধূর্জটিমঙ্গল করজোড়ে অতিথিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—''আপনারা যাঁরা সন্ধিপুজো দেখতে চান তাঁরা মায়ের সামনে এসে দাঁড়ান।''

সকলেই গিয়া দালানের সম্মুখে সমবেত হইলেন। সাহেবরা এবং মুসলমানরাও গেলেন।

আহুত অনাহুত রবাহুত, ধনী দরিদ্র বালক যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ—বিরাট ভিড়। সকলেই জোড়হস্তে দাঁড়াইয়াছেন।

সহসা নীলু রায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এই সন্ধিপূজার সময় মায়ের কাছে বর প্রার্থনা করুন আমরা যেন বিজয়ী হই। আজ আমরা যুগ-সন্ধিক্ষণেও উপস্থিত হয়েছি। মুসলমানের রাজত্ব শেষ হয়েছে, ইংরেজের রাজত্ব শুরু হল। এই সন্ধিপূজাও আমাদের করতে হবে। এ পূজার মন্ত্র পাঠ করবেন আমাদের বিবেক। এ পূজায় আমরা শপথ নেব যে আমরা চিরকাল সত্যের দিকে, ন্যায়ের দিকে, ধর্মের দিকে থাকব। অসত্য অন্যায় অধর্ম আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। মা আমাদের আশীর্বাদ করুন।"

প্রতিমার একধারে জগদ্ধাত্রী তাঁহার ছোট ছেলে দুইটি ও আত্মীয়-স্বজনদের লইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঢাক, ঝাঁজর, শঙ্খ, ঘণ্টা একযোগে বাজিয়া উঠিল।

সন্ধিপূজা শুরু হইয়া গেল।

সে সন্ধিপূজায় আর একটি পবিত্র আলোও জ্বলিয়াছিল। কলিকাতায় ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতে নহে, মুর্শিদাবাদ খুশবাগে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমাধিমন্দিরে আলোটি জ্বালাইয়াছিলেন বেগম লুৎফুন্নিসা।

সিরাজের মৃত্যুর পর মীরণ তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন, আমাকে নিকা কর। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, সারাজীবন হাতির পিঠে চড়িয়া বেড়াইয়াছি, এখন গাধার পিঠে চড়িতে পারিব না।

সবাই জানে হাতিটি ছিল মত্ত মাতঙ্গ। কিন্তু এই মত্ত মাতঙ্গের স্মৃতি পূজাই মহীয়সী লুৎফুন্নিসা আমরণ করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন প্রতি সন্ধ্যায় সিরাজের কবরে একটি বাতি তিনি জ্বালিয়া দিতেন। সেই যুগসন্ধিক্ষণের মহাপূজায় এই ক্ষুদ্র বর্তিকার কোনও সার্থকতা ছিল কিনা জানি না, শুধু জানি তাহার পুণ্য-প্রভা ইতিহাসে আজও অম্লান হইয়া আছে।

কিছুক্ষণ

।। এক।।

সময়ের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে।

সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, জন্ম-জীবন-মৃত্যু সব চলিয়াছে। কত আশা-নিরাশা, আনন্দ-অবসাদ, স্তুতি-নিন্দা, সুন্দর-কুৎসিত, কালস্রোতের ঘূর্ণাবর্তে লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। অদৃশ্য ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া—কিংবা হয়তো লক্ষ্য না করিয়াই—নিখিল বিশ্ব ভাসিয়া চলিয়াছে।

আমিও চলিয়াছি।

গরুর গাড়ির গাড়োয়ানটাকে বলিলাম, তুই ট্রেনটা ফেল করাবি দেখছি—একটু হাঁকিয়ে চ। ফলে সে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে মন্থরগতি বলীবর্দযুগলকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিল। গাতিবেগ সামান্য একটু বাড়িল বটে, কিন্তু তাহা এমন নয় যে, নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বন্ধুর গ্রাম্য পথ। যতদূর দৃষ্টি চলে, চাহিয়া আছি। চোখে পড়িতেছে দূরে তালগাছের সারি। ঋজু বলিষ্ঠ দেহ লইয়া আকাশের বুকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য আঁকিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের আশপাশের ঘনসন্নিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণীকে এতদূর হইতে চেনা যায় না। নগণ্য জনতার মতো উহারা দিগন্তরেখাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। ডানদিকের একটা ঝোপ হইতে একটা শৃগাল হঠাৎ বাহির হইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ আমাদের সাড়া পাইয়া সচকিত হইয়া ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গেই দেখি আর একটা। গাড়োয়ান গরু দুইটিকে আর একবার সম্ভাষণ করিয়া আমাকে বলিল, গতিক ভাল লয়।

কিসের গতিক?

দু-দুটো শেয়াল ডান দিকেই, লক্ষণ ভাল লয়।

তাই নাকি?

লয় তো কি, কাগ, শেয়াল আর সাপ—এ তিনটি জানোয়ার ভারী ইয়ে জানবেন আপনি। হনুমানও বটে।

বাজে। কলিকালে ওসব আর ফলে না।

গাড়োয়ান খানিকক্ষণ কিছু বলিল না।

বোধ হয় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ গরুর পিঠে এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিয়া সে কহিল, আমার হাতে হাতে ফল দেখা আছে। শোনা কথা লয় যে, বলব ইয়ে—আরে, ই শালার বয়েলটাও একের লম্বর হারামজাদ;—বলিয়া সে বলদটার পৃষ্ঠদেশে সশব্দে আর এক ঘা বসাইয়া দিয়া শুরু করিল।

তাহার কাহিনী এই যে, প্রায় বৎসর খানেক পূর্বে সে লবাইগঞ্জের হাট হইতে মথুর মাঝির সঙ্গে ফিরিতেছিল। ফিরিবার পথে ঠিক তাহার বাঁ পাশে ঘেঁষিয়া প্রকাণ্ড একটা সাপ চলিয়া যায়। সে সাপ তাহার গণেশকেই লইতে আসিয়াছিল, তাহা সে তখন জানিতে পারে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, গণেশ কে?

আমার ছেলে, বাবু। ইয়া দামাল দুরন্ত ছেলে ছিল আমার গণেশ।

তাকে সাপে কামড়ে দিলে নাকি? সঙ্গে ছিল তোমার?

সঙ্গে থাকবে কিসের লেগে? বলছিলাম না আপনাকে, ভারি বিতিকিচ্ছি জানোয়ার ওগুলা। বাড়ি যেতে না যেতেই শুনলাম, গণশার অসুখ—পেট নামছে, বমিও খুব। পহরখানেক রাত হতে না হতেই সব খতম। ওসব কলেরা-মলেরা আমি বুঝি না বাবু, লিয়তি ওকে টানছিল। চ, চ বাবা, আর একটুকুন বাকি—একটু চলে চ—

গাড়োয়ানের কর্কশ স্বর কোমল হইয়া আসিয়াছিল। গরু দুইটি তাহার শোকের সুযোগ লইয়া যতদূর সম্ভব মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। আমিও খানিকক্ষণের জন্য ভুলিয়া গেলাম যে, এই ট্রেনটা আমার ফেল করা চলিবে না। কাল আমার কলেজ খুলিবে এবং আমার পারসেন্টেজ টায়ে টায়ে আছে। গাড়ির ছইয়ের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া সামনে পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, একজোড়া খঞ্জনপক্ষী পুচ্ছ দোলাইয়া পথের ধারে চরিয়া বেড়াইতেছে।

।। দুই।।

ট্রেন ছাড়ে নাই।

আমার ট্রেন আসেই নাই। শীঘ্র আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না। শৃগালদর্শনের ফল হয়তো। পশ্চিমগামী একখানা গাড়ি লাইনচ্যুত হইয়াছে। এ গাড়িখানা না উঠিলে অন্য কোনও গাড়ি আসা অসম্ভব। সমস্ত ট্রেনখানার যাত্রীরা সেই ক্ষুদ্র স্টেশনটির প্লাটফর্মে নামিয়া এক বিচিত্র জনতার সৃষ্টি করিয়াছে। আমিও গিয়া তাহাদের দলে যোগ দিলাম। অপরিচিত জনতা।

একটি লোকও আমার চেনা নয়।

নিজের বিছানা ও সুটকেসটি স্টেশনের কোথায় নিরাপদে রাখা যায় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় টেলিগ্রাফ-অপারেটর-বাবুটি সহাস্যমুখে আমাকে সম্বোধন করিলেন, এই যে স্যার, আপনিও জুটে গেছেন দেখছি! এই ট্রেনে যাচ্ছিলেন বুঝি?

যেতে আপনারা দিচ্ছেন কই? আপাতত এ জিনিসগুলো কোথায় রাখি, বলুন দেখি? চারিদিকে যা ভিড়—

এই যে এখানে রেখে দিন না।—বলিয়া তিনি তাঁহার আপিসের একটা কোণ দেখাইয়া দিলেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ছিল।

ছুটির প্রারম্ভে যখন মামার বাড়ি আসিতেছিলেম, তখন গাড়িতে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। সিগারেট আদান-প্রদান করিতে করিতে আলাপটা ঘনিষ্ঠই হইয়াছিল। মনে পড়িতেছে, সেই স্বল্প আলাপের মধ্যেই জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ভদ্রলোকের পরিবারের নাম বিনোদিনী এবং তিনি স্বামীর কাছে আসিয়া থাকিতে উৎসুক; কিন্তু রেল-কোম্পানি এমন কৃপণ যে, কিছুতেই ভাল একটা কোয়ার্টার তাঁহাকে দিতেছে না। ভদ্রলোকের নাম মাখনলাল। বেশ মন-খোলা লোক। প্রায় মাস-খানেক পূর্বে ,কদা উভয়ে এই স্টেশনে নামিয়াছিলাম। মাখনবাবু আসিয়া কাজে জয়েন করিয়াছিলেন, এবং আমি মামার বাড়ি চলিয়া গিয়াছিলাম। এই

অপরিচিত জনতার মধ্যে মাখনবাবুকে পাইয়া এবং তাঁহার ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া ভাল লাগিল।

নিকটস্থ টুলটিতে উপবেশন করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়া ট্রেনটা হঠাৎ এমনভাবে পড়িয়া গেল?

মুচকি হাসিয়া মাখনবাবু বলিলেন, গাঁজা—অর্থাৎ আমাদের রামদীনের কীর্তি।

রামদীন কে?

পয়েন্ট্‌স্‌ম্যান।

পয়েন্ট্‌স্‌ম্যান গাঁজা খেয়ে এই কীর্তি করেছে? বলেন কি মশাই?

গলা খাটো করিয়া মাখনবাবু বলিলেন, আসল ফ্যাক্ট হল এই। তবে আমরা রামদীনকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আপনি যেন কথাটা বলে বেড়াবেন না।

সহসা টেলিগ্রাফের কলটা টকটক করিয়া উঠিল এবং মাখনবাবু আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া টক্কা-টরে শুরু করিয়া দিলেন। তাহার পর হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, সমস্ত দিন ভোগান্তি আছে আজ। রিলিফ ট্রেন সন্ধে্যর আগে পাওয়া যাবে না। আবার কল কথা কহিয়া উঠিল, আবার মাখনবাবু সাড়া দিলেন। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম।

বাহিরে আসিয়া দেখি, স্টেশন-প্লাটফর্মের কোণে যে জলের কলটা আছে, তাহার সম্মুখে বহু লোকের ভিড়। কয়েকজনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে।

একটি শীর্ণকান্তি লোক তারস্বরে চিৎকার করিতেছেন। রগের শিরগুলা ফুলিয়া উঠিয়াছে।—একশো বার বলব আমি। সেকেন কেলাসের টিকিট আছে বলে কি তোমার বাবুর বেশি তেষ্টা নাকি আমাদের চেয়ে? ইস্, ভারি সেকেন কেলাস ফলাতে এসেছে আমার! সর বলছি—

ভৃত্য-স্থানীয় একটি ছোকরা একটি প্রকাণ্ড কুঁজায় জল ভরিতেছিল। সে অবিচলিত-কণ্ঠে উত্তর করিল, আমার ভরা হোক আগে। হড়বড় কোরো না।

চাকরটির গায়ে ফরসা হাত-কাটা ফতুয়া, কানে একটি অর্ধ-দগ্ধ বিড়ি। বেশ চালাক-চতুর চেহারা।

শীর্ণ ভদ্রলোক বলিলেন, তোমার ওই দিগ্‌গজ কুঁজো ভরতে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে। সর, আমার এই ছোট ঘটিটা ভরে নিই আগে।

ভৃত্য কোনও জবাবা না দিয়া জল ভরিতে লাগিল। শীর্ণকান্তি লোকটি বলিতে লাগিলেন, ওহে, কথার জবাব দাও না কেন হে তুমি? আচ্ছা বেল্লিক ছোকরা তো!

মুখ সামলে কথা বলবেন আপনি।

মুখে এক থাবড়া মারব তোমার। ডেঁপো ছোকরা কোথাকার!

এই ভিড়ের মধ্যে কারু বাপের সাধ্যি আছে, আমার গায়ে হাত দিক দিকি!

বাপ তুলে গালাগালি দেবার জায়গা পাওনি আর? ব্যাটাচ্ছেলে, হারামজাদা—

মুখ সামলে কথা বলবেন আপনি।

একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ কাবুলিওয়ালা বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া আগাইয়া গেল এবং এক ঝটকায় ছোকরাকে সরাইয়া দিয়া নিজের বদনা ভরিতে শুরু করিয়া দিল। সেই কাবুলি-ঝটকার পা ল্যে যাহা প্রত্যাশিত, তাহাই ঘটিল। কুঁজা ভাঙিয়া গেল এবং ভৃত্য ভুশায়ী হইল। ঠিক ।ঙ্গে সঙ্গে ওয়েটিং-রুম হইতে এক আর্ত নারীকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম, একটি

মহিলা নিতান্ত অসহায়ভাবে বলিতেছেন, ওমা, কি হবে গো! কাবলেটা ছট্টুকে মেরে ফেললে যে গা!

আইনত এইবার আমার পৌরুষ জাগ্রত হওয়ার কথা। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া আমি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। হাসি অবশ্য বেশিক্ষণ টিকিল না, কর্মক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হইতেই হইল।

ওয়েটিং-রুম হইতে একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক বাহির হইলেন। পুরু লেন্সের চশমা পরা। ভদ্রলোক মহিলাটিকে বলিলেন, তুই ভেতরে যা, আমি দেখছি।

বলিয়া তিনি আগাইয়া আসিলেন। আসিয়া "ছট্টু—এই ছট্টু" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়া অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই একটু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, বড় মুশকিলে পড়া গেল! বিধবা মেয়েটা কাল থেকে নিরম্বু উপবাসী, অথচ জল যোগাড় করা মুশকিল ব্যাপার দেখছি। ওই কাবলের সঙ্গে জোঝবার সামর্থ্য আমার তো নেই। ওরে ছট্টু, এ ব্যাটা চাকর আচ্ছা বাক্যবাগীশ। আবার কার সঙ্গে বচসা শুরু করেছে।

তখন আমাকে বলিতে হইল, আমাকে একটা কিছু পাত্র দিন তো, চেষ্টা করে দেখি, যদি জল আনতে পারি।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দেখুন, যদি পারেন। যা ভিড়!

ফিরিয়া দেখিলাম, কাবুলিওয়ালা বেশ স্বচ্ছন্দে সমস্ত কলটা অধিকার করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছে, এবং অন্তত পঞ্চাশজন প্যাসেঞ্জার বিরক্তি-বিদ্রূপ-হতাশার ভঙ্গিতে তাহাকে ঘিরিয়া নানা গ্রামে চিৎকার করিতেছে। ছট্টুও উঠিয়াছে এবং সেই শীর্ণকান্তি লোকটিকে নিকটে পাইয়া বাচনিক বীররসের অবতারণা করিতেছে।

আমি বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে বলিলাম, একটা কিছু পাত্র দিন তা হলে।

আসুন।

ভদ্রলোকের পিছু পিছু ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়া অ্যালুমিনিয়মের একটা ঘটি লইয়া কলের দিকে অগ্রসর হইলাম। ভিড় ঠেলিয়া কাবুলিওযালার নিকটস্থ হওয়াই মুশকিল। হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারি, বাঙালি, বেহারি সকলেই জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। সকলেরই লক্ষ্য কলটার উপর, কেহই কিন্তু অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। গাড়ুহস্তে এক বেঁটে ভদ্রলোক একটু তফাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আমাকে অযাচিতভাবে উপদেশ দিলেন, ও ব্যাটার হয়ে যাক আগে, তারপর এগুবেন মশাই। কেন মিছিমিছি সকালবেলায় গো-খাদক ব্যাটার হাতে মার খেয়ে মরবেন?

দেখি।

ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম এবং কাহাকেও ঠেলিয়া, কাহারও পা মাড়াইয়া, কাহাকেও অনুনয় করিয়া, কাহারও পাশ কাটাইয়া কাবুলিওয়ালার নিকটস্থ হইলাম। সে তখন তোড়ে কল খুলিয়া দিয়া মাথা ধুইতেছে। আমি কাছে আসিতেই সে আমার ঘটিটার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসুভাবে আমার দিকে চাহিল। চাহিবামাত্র আমি তাহাকে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বুঝাইয়া বলিলাম যে, একটি জেনানি অত্যন্ত পিপাসার্ত, তাহার জন্য জল অবিলম্বে প্রয়োজন, সুতরাং

কলটা একবার ছাড়িয়া দেওয়া দরকার।

জরুর।

কাবুলিওয়ালা তৎক্ষণাৎ কল ছাড়িয়া দিল। এত অল্প আয়াসে ব্যাপারটা মিটিয়া গেল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কাবুলিওয়ালার প্রতি রাগের ভাবটা কমিয়া আসিল। ঘটি অর্ধেক ভরা হইয়াছে, এমন সময় কাছায় টান পড়িল। ফিরিয়া দেখিলাম, সেই বেঁটে ভদ্রলোকটি একমুখ হাসিয়া আমাকে বলিতেছে, এই ফাঁকে আমার গাড়ুটাও ভরে দিন না মশাই, আপনাকে যখন ভরতে দিয়েছে। পুলিশে কাজ করেন বুঝি আপনি? হেঁ-হেঁ, তাই—

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। আমার ঘটি পরিপূর্ণ হইলে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভদ্রলোককে বলিলাম, এইবার নিন না! কিন্তু কাবুলিওয়ালা সে সুযোগ তাঁহাকে দিল না। আমি সরিয়া যাইতেই সে আসিয়া কল দখল করিল এবং বাকি সকলে নিষ্ফল কোলাহল করিতে লাগিল।

ভিড় ঠেলিয়া জলের ঘটিটা লইয়া সন্তর্পণে ওয়েটিং-রুমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বৃদ্ধ দ্বারেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার বিধবা কন্যাও দেখিলাম পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। আশা করিতেছিলাম, তিনি আমার এই অসাধ্যসাধনে পুলকিত হইয়া আমায় ধন্যবাদ দিবেন এবং ওই পিপাসিতা বিধবাটি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির দ্বারাও আমাকে অন্তত পুরস্কৃত করিবেন।

কিন্তু কিছুই হইল না।

বিধবাটি বলিলেন, ও জল আমি খাব কি করে?

ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, কেন?

তারপর হঠাৎ আমার পায়ের দিকে চাহিয়া হতাশভাবে বলিয়া ফেলিলেন, এঃ, সব মাটি হল!

মেয়েটি বলিলেন, তুমি ওঁকে বলে দিলে না কেন বাবা, ওঁর কি অত খেয়াল আছে?

আরে বাঃ! হিন্দু বিধবার জন্যে জুতো পায়ে দিয়ে জল আনে নাকি কেউ?

অপরাধী পাদুকাযুগলের প্রতি চাহিয়া আমি একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।

বৃদ্ধ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আরে বাঃ, তাতে কি হয়েছে? জলটা অন্য কাজে লাগবে। ভিড়টা কমুক একটু, জল পাওয়া যাবে এখুনি।

কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় শোরগোল করিতে করিতে টেলিগ্রাফ-মাস্টার মাখনলাল আসিয়া হাজির।

আরে মশাই, আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান। হঠাৎ কোথায় ডুব মারলেন? ও কি, হাতে জলের ঘটি কেন?

বলিলাম।

মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তার জন্যে ভাবনা কি? আপনার মেয়ের জন্যে জলটল সব আমি বাসা থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও কলের আশা ছেড়ে দিন।

তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আসুন আপনি, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

জলের ঘটিটা নামাইয়া দিয়া মাখনলালের অনুবর্তী হইলাম, যাইতে যাইতে মাখন আমাকে কনুই দিয়া এক খোঁচা মারিয়া ভ্রূ নাচাইয়া বলিলেন, কেল্লা মার দিয়া, বুঝলেন? কোয়ার্টার পেয়ে গেছি। ওয়াইফকে এনে ফেলেছি। খান না এখন কত চা খাবেন আপনি।—বলিয়া ভদ্রলোক হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরমুহূর্তেই আবার গম্ভীর হইয়া চিন্তিতস্বরে শুরু

করিলেন, ট্রেনখানা ডিরেল্‌ড হয়ে বড় যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে গেল। রামদীনটাকে এনি হাউ বাঁচাতে হবে। আমাদের মাস্টার মশাইও উঠে-পড়ে লেগেছেন। দেখা যাক কতদূর কি করা যায়। ব্যাটা গাঁজা খেয়েই মরেছে কিনা, তা না হলে লোক ভালো। ও-ই তো নিজেই কোয়ার্টারটা আমায় ছেড়ে দিয়েছে। তা না হলে বিনুকে আমি আনতে পারতাম নাকি? ব্যাটা গ্রেট সোল। বললে আমাকে, হুজুর, বহুমায়িকো লিয়ে আনেন—আমি টিশনে শুত্‌ব। হামার তো জরু-টরু কোই নেই আছে। ব্যাটা আবার বাংলা বলে। সত্যি, ব্যাটার তিন কুলে কেউ নেই। লোক ভালো। মাটি করেছে ব্যাটাকে গাঁজাতে।

আমি বলিলাম, ছোটবাবুর কোয়ার্টার নেই, অথচ পয়েন্টস্‌ম্যানের কোয়ার্টার আছে, এ কী রকম ব্যবস্থা?

কোয়ার্টার থাকবে না কেন? ওই যে দেখুন না, রিপেয়ার হচ্ছে—টিমে তেতালা চালে।—বলিয়া তিনি দূরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

মাখনবাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে চলিতেছিলাম এবং লক্ষ্য করিতেছিলাম, কত বিভিন্ন জাতীয় যাত্রী এই ছোট স্টেশনটিতে আটকাইয়া পড়িয়াছে।

একটা মেলা বসিয়া গিয়াছে যেন।

ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়াছে প্রায় ঘণ্টা দুই হইল। এই দুর্ঘটনার আকস্মিকতা প্রথমে সকলের মনকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট নাড়া দিয়াছিল, এখন দুই ঘণ্টা পরে সে ভাবটা আর নাই। এই দুর্ভাগ্যটাকে মানিয়া লইয়া এখন সকলে খানিকক্ষণের জন্য থিতাইয়া বসিয়াছে। ছোট-বড় নানা দলে বিভক্ত হইয়া সকলে নিজ নিজ সুবিধা অন্বেষণে তৎপর হইয়াছে।

আরশোলা-রঙের আজানুলম্বিত গলাবন্ধ কোট গায়ে একটি মাড়োয়ারি সপরিবার এক স্থানে বসিয়া আছেন, দেখিলাম। হলুদ-রঙের পাগড়ি বহু পাকে পাকানো। মুখে ভীত-বিনীত-চতুর ভাব। চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছে। গোঁফজোড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কাছেই দুই-তিনজন ঘোমটা-দেওয়া মহিলাও বসিয়া আছেন। হাতে ও পায়ে মোটা মোটা গোল গোল গহনা পরা, পরনে লাল ও হলুদ রঙের ছাপা সস্তা জরির-পাড়-বসানো কাপড়, অঙ্গে প্রায় তদনুরূপ ওড়না। যদিও ঘোমটা দেওয়া, কিন্তু অনর্গল কিড়ির-মিড়ির করিয়া বকিয়া চলিয়াছেন। আমাদের নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া মাড়োয়ারি ভদ্রলোক সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেলাম করিলেন এবং মাখনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ট্রেন ঠিক হইতে কত বিলম্ব হইতে পারে?

মাখনবাবু বলিলেন, খবর তো দিয়েছি আমরা। এখন প্রভুরা দয়া করবেন, তবে না সব ঠিক হবে।—বলিয়া মাখনবাবু হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একদল মুসলমান গোল হইয়া বসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে পাঁচ ছয় বছরের একটি মেয়েকে দেখিয়া বেশ লাগিল। ফুটফুটে সুন্দর মুখখানি, ডাগর চোখ দুইটিতে সুর্মা লাগানো—মাথায় লম্বা বেণী, পরনে কমলা-রঙের ঢিলা পায়জামা, গায়ে ঘননীল রঙের আঙরাখা। সর্বদাই ছটফট করিতেছে। আমাকে দেখিয়া অকারণে মুখবিকৃতি করিয়া জিভটা বাহির করিয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল।

একটি কুচকুচে কালো ভারতীয় ক্রিশ্চান সাহেব তাঁহার সুসজ্জিতা মেমসাহেব-সহ একটু দূরে তফাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মেমসাহেবটির বর্ণও মর্মান্তিক। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া

মনে হইল, যেন তাঁহারা স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া এই দূষিত জনতার মধ্যে কোনওক্রমে দয়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সাহেবটির হাতে একটি অর্ধদগ্ধ বর্মা চুরুট, মেমসাহেবের হাতে একটি ভ্যানিটি-ব্যাগ। মেমসাহেব মুখে প্রচুর পাউডার মাখিয়াছিলেন। এই দারুণ গ্রীষ্মকালে ঘর্মাক্ত কালো মুখে পাউডারের প্রাচুর্য দেখিয়া একটা উপমা হঠাৎ মনে উদয় হয়, যেন মাগুর মাছকে কুটিবার পূর্বে ছাই মাখানো হইয়াছে।

সাহেব একটু আগাইয়া আসিয়া মাখনবাবুকে প্রশ্ন করিলেন I say, how long are we to wait in this hell of a station?

নির্বিকারচিত্তে মাখনবাবু বলিলেন, Can't say.

সাহেব একটু রাগতস্বরে উত্তর দিলেন, if I cannot reach my place to-day, I shall sue the Railway Company.

মাখনবাবু এ কথার কোনও উত্তর দিলেন না। খানিক দূর আগাইয়া গিয়া কেবল নিম্নস্বরে বলিলেন, ব্যাটাচ্ছেলে! এবং আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখা গেল, কয়েকটি যুবক এক জায়গায় জমায়েত হইয়া হাস্য-পরিহাসে বেশ মশগুল হইয়া উঠিয়াছে। যুবকগুলির চেহারা বেশবাস কথাবার্তা বৈচিত্র্যময়। কাহারও পরিধানে ঢিলা পায়জামা, কেহ কাপড়টাকে কায়দা করিয়া পায়জামার মতো করিয়া পরিয়াছে, জুলফি গোঁফ ও দাড়িতেও অতি-আধুনিকতার উগ্রতা। এসবের কোনও অভাব নাই, অভাব দেখিলাম ভব্যতার। একট ট্যারা-গোছের ছোকরা কোমরে হাত দিয়া দুলিয়া দুলিয়া হো-হো করিয়া হাসিতেছিল।

ইহাদের এত আনন্দের উৎস কি, তাহাও পরক্ষণেই আবিষ্কার করিলাম। নিকটেই দেখিলাম, একটি কমবয়সী মেয়ে একেবারে একাকিনী একটি সুটকেসের উপর বসিয়া আছে। কাছাকাছি তাহার কোনও আত্মীয়স্বজন আছে বলিয়া মনে হইল না। মেয়েটি গম্ভীরভাবে দূরে মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশেই, খুব সম্ভবত তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই, যেসব চটুল আলোচনা চলিতেছিল, তাহা যে তাহার কানে যাইতেছে মুখ দেখিয়া তাহা বোঝা গেল না। তথাপি আমার মনে হইল, মেয়েটির চোখে যেন একটা বিরক্ত বিপন্ন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। একবার মনে হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাহার কোন সাহায্য আমি করিতে পারি কি না; কিন্তু সঙ্কোচ হইল, পারিলাম না।

একটু দূরে দুম-দুম করিয়া কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্দুকের শব্দ কেন মাখনবাবু?

মাখনবাবু বলিলেন, গোটা দুই সায়েব ছিল মশাই ফার্স্ট ক্লাসে। তারা ট্রেন ছাড়বার কোনও সম্ভাবনা না দেখে বন্দুক ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ল। আস্পর্ধা দেখুন না মশাই, যাবার সময় মাস্টার মশাইকে বলে গেল যে, তারা না আসা পর্যন্ত যেন ট্রেন ছাড়া না হয়। তারা কাছাকাছিই থাকবে, ট্রেন ঠিক হলে তাদের যেন খবর পাঠানো হয়। নবাবপুত্তুর সব। মাস্টার মশাইকে আমি চোখ টিপছিলুম, যেন তিনি ওসব কথা গ্রাহ্য না করেন। কিন্তু মাস্টার মশাই আমাদের সায়েব দেখলেই একেবারে গলে যান। সেলাম করে হাত কচলে বলে দিলেন, ইয়েস সার্—ইয়েস সার্। যত সব—

মাখনবাবুর কোয়ার্টারের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। মাখনবাবু বাহির হইতেই চিৎকার করিলেন,

কই বিনু, চা রেডি তো? আমার সেই বন্ধুটিকে ধরে এনেছি। চা দাও।

বিনু ওরফে বিনোদিনীর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মাখনবাবু তখন আমাকে দাঁড়াইতে বলিয়া ভিতরে গেলেন। মাখনবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, সে কি! চায়ের জল এখনও চড়াওনি?

আমার তো পাঁচটা হাত নয়। বাসন মেজে, ঘর ধুয়ে এই তো সবে কাপড়টি ছেড়েছি। বন্ধু আবার কে?

শুনিয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। মাখনবাবু বাহিরে আসিয়া সহাস্যমুখে আমাকে বলিলেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন—আগেকার চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বিনু সেটা আর দিতে চায় না। ফ্রেশ জল চড়াচ্ছে। আসুন।

গেলাম।

ভিতরে একটি মাত্র ঘর।

সেইটিই বসিবার ও শুইবার ঘর বলিয়া মনে হইল। আরও দুই-একটি ছোটখাটো ঘর আছে। সেগুলি বোধহয় রান্না-ভাঁড়ারের কাজে নিয়োজিত। সঙ্কীর্ণ উঠানে একটা ধূমায়িত কয়লার উনানের সামনে বসিয়া বিনু প্রাণপণে হাওয়া করিয়া চলিয়াছেন। পরনে একখানি আধময়লা শাড়ি! হাতে কয়েকগাছি সবুজ রঙের কাচের চুড়ি ঝুনঝুন করিয়া বাজিতেছে।

চতুর্দিক ধূমাচ্ছন্ন।

মাখনবাবুর জবরদস্ত আতিথেয়তা যে এই বধূটিকে বিব্রত করিতেছে, তাহা মনে মনে বুঝিতেছিলাম; কিন্তু কি করিয়া ভদ্রভাবে উদ্ধার পাই, কিছুতেই মাথায় আসিতেছিল না।

মাখনবাবু খুব আন্তরিকতার সহিত বলিলেন, আসুন, আসুন। যা আমাদের ঘর-দোর! পায়রার খোপ বললেও চলে। এঃ, বড্ড ধোঁয়া হল যে!—বলিয়া তিনি কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। কপাটটা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে আমার যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমি বলিলাম, কপাটটা খুলে দিন।

আরও ধোঁয়া ঢুকবে যে মশাই, এ ধোঁয়া এখুনি বেরিয়ে যাবে। দাঁড়ান না, জানলাটা খুলে দিই বেশ করে। ঘরটার এই একটা সুবিধে আছে, দক্ষিণ দিকটা বেশ খোলা। —বলিয়া তিনি জানালাটা খুলিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, একটু কি অসুবিধে জানেন—জানলাটা খুলে দিলে একটু বে-আবরু হয়ে পড়ে। দাঁড়ান দেখি, চায়ের জলটা কতদূর! —বলিয়া তিনি আবার কপাটটা খুলিয়া বাহিরে গেলেন। এই ধূমাচ্ছন্ন ঘরটা হইতে মুক্তি পাইলে যেন বাঁচি। অথচ মাখনবাবুর মনে কষ্ট দিতেও সঙ্কোচ হইতেছে। মাখনবাবুর বাহিরে তাঁহার স্ত্রীকে নিম্নস্বরে কী সব বলিতেছেন, শুনিতে পাইলাম না। মাখনবাবু ঘরে ঢুকিতেই একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

ওয়েটিং-রুমে সেই বিধবাটিকে জল দিয়ে আসতে হবে—ভুলে গেলেন বুঝি? বাঃ! দিন একটু জল, দিয়ে আসি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তো। তা আপনি যাবেন কেন? আপনি বসুন না। আমি গিয়ে দিয়ে আসছি।

না না, আমিই দিয়ে আসি। জুতো পায়ে দিয়ে গেলে হবে না আবার।

মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন, কেন, আমি খালি পায়ে যেতে পারি না নাকি? চেরটা কাল খালি পায়েই কেটেছে মশাই, ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠবার পর তবে জুতো পায়ে দিয়েছি।

আমি বলিলাম, না, শুধু জুতোর কথা নয়, আপনার হাতে যদি আবার না খান! আপনি তো ব্রাহ্মণ নন। বিধবাটি একটু বেশি নিষ্ঠাবতী বলে মনে হল।

মাখনবাবু পরাস্ত হইয়া বলিলেন, তা হলে তো নাচার মশাই। আচ্ছা, আপনিই যান তা হলে—চট করে যান, বেশি দেরি করবেন না যেন সেখানে। চা হয়ে গেল বলে। বিনু, হাউ ফার?—বলিয়া মাখনবাবু বাহিরে গেলেন এবং বলিলেন, আগে এক ঘটি জল দাও তো। ঘটিটা মাজা আছে তো?

কাল মেজেছিলাম সকালে।

কখন মেজেছ, তা জিজ্ঞেস করিনি। মাজা আছে কি না?

আচ্ছা, এতেই হবে। এক ঘটি জল দাও। ঘরে খাবার-টাবার কিছু আছে? স্রেফ ছোলা গুড়? বেশি নেই? আরে, যা আছে তাই দাও না—তুমি বেশি কথা বাড়িও না।

এক ঘটি জল ও একটি পাথরবাটিতে কিছু ছোলা-ভিজানো ও গুড় লইয়া নগ্নপদে ওয়েটিং-রুম অভিমুখে রওনা হইয়া গেলাম। কোথাকার কে অচেনা বিধবা, তাহার জন্য জল বহিয়া লইয়া যাইতেছি! পারিপার্শ্বিক ঘটনার এমন সমাবেশ হইয়াছে যে, কিছুই অসঙ্গত মনে হইতেছে না। বরং না করিলেই যেন অশোভন হইত।

স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই কমবয়সী মেয়েটি সুটকেসের উপর তেমনই ভাবে বসিয়া আছে এবং তাহার নিকটে নানা ছাঁদের সেই যুবকগুচ্ছ তেমনই হাসাহাসি করিতেছে।

।। তিন।।

নিষ্ঠাবতী বিধবাকে তৃষ্ণার জল দান করিয়া পূর্ণ সঞ্চয় করা আমার ভাগ্যে ছিল না। গিয়া দেখিলাম, তিনি একাদশীর পারন শেষ করিয়াছেন। ভৃত্য ছট্টু খবরটি দিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখিলাম ওয়েটিং-রুমের এক কোণে বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন। ভদ্রলোকের ধপধপে সাদা গায়ের রঙ। নগ্নগাত্রে শুভ্র উপবীত শোভা পাইতেছে। দৃশ্যটা বেশ ভলো লাগিল। বিধবাটিকে উদ্দেশ করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিলাম, এগুলো তা হলে ফিরে রেখে আসি?

ভদ্রমহিলা কোনও উত্তর না দিয়া মাথার ঘোমটাটা একটু টানিয়া সরিয়া বসিলেন। আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে অনিচ্ছুক, বুঝিলাম। ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ভৃত্য ছট্টু আসিয়া বলিল যে, বাবুর পূজা এখনই হইয়া যাইবে, মাইজি আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন।

অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

মানুষ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

বসিয়া বসিয়া বিধবাটিকেই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। অল্প বয়স। কুড়ির বেশি বলিয়া মনে হয় না। ইহারই মধ্যে জীবনের আনন্দ-দীপটি নিবিয়া গিয়াছে। থান-কাপড়, আভরণহীন অঙ্গ, মুখখানি বিষাদ-মাখানো। আজিও আমাদের সমাজে অসহায়া বিধবার সংখ্যা অগণিত। দ্বিতীয় বার বিবাহ করাটা আজও আমাদের হিন্দু বিধবাদের সংস্কারে বাধে। এখনও তাঁহারা ইহাকে পাপ বলিয়াই মনে করেন। আমার নিজেরও বিধবা বোন আছে—বালবিধবা। বাবা আবার

তাহার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। সে কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই। কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া সে এই জীবনটাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিতে চায়।

ও, এই যে আপনি এসেছেন দেখছি! বসুন, বসুন।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ভদ্রলোক চশমা পরিধান করিতে করিতে বলিলেন, এসব কী এনেছেন আপনি?

মাখনবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাদের জন্যে।

মাখনবাবুটি বুঝি সেই ভদ্রলোক, যিনি তখন আপনাকে ডেকে নিয়ে গেলেন? আরে বাঃ, ছোলা-গুড় এনেছেন দেখছি—দুষ্প্রাপ্য জিনিস আজকাল। মিন্টু খাবি?

মিন্টু মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আচ্ছা আমিই চারটি খাই তা হলে।

ছোলা চিবাইতে চিবাইতে ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন, বুড়ো হয়েছি, কিন্তু ছোলা এখনও বেশ চিবুতে পারি। সিক্রেট কি জানেন? নিমের দাঁতন। —বলিয়া সহাস্যমুখে চিবাইতে লাগিলেন।

ট্রেনটা কখন ছাড়বে বলতে পারেন মশাই?

শুনছি তো সন্ধ্যের আগে নয়।

তাই নাকি? আপনি কোথা যাবেন?

কলকাতা।

তাহলে তো আপনার আরও ঢের দেরি। আমাদের গাড়ি না ছাড়লে তো আপনার গাড়ি আসবে না। কি মুশকিল!

একটু থামিয়া ভদ্রলোক আবার বলিলেন, এইটুকু শুধু ভগবানের দয়া যে, কারও কোনও আঘাত লাগেনি।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোকের স্নিগ্ধ গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া কেমন যেন সম্ভ্রম হইতে লাগিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, বড় খুশি হলাম আপনাকে দেখে। কলকাতায় কি করেন আপনি?

পড়ি।

পড়েন? কোন্ কলেজে?

মেডিকেল—

আরে বাঃ! কোন্ ইয়ার হল?

সিক্সথ ইয়ার চলছে।

আরে বাঃ! তা হলে তো ডাক্তার হয়েই গেছ তুমি—আই মিন আপনি।

সসঙ্কোচে বলিলাম, আমাকে 'তুমি'ই বলুন।

ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ। উঠি উঠি করিতেছি, এমন সময় তিনি বলিলেন, বিনোদ বলে কাউকে চিনতে—বিনোদবিহারী মৈত্র? তোমার চেয়ে কিছু সিনিয়র—বছর চারেকের।

বলিলাম, না, চিনি না কেন?

ভদ্রলোক একটু থামিয়া বলিলেন, সে আমার ছেলে।

কোথায় প্র্যাক্টিস করছেন? চাকরি পেয়েছেন নাকি?

পাগল হয়ে গেছে সে। এখন পাগলা-গারদে আছে।

নিদারুণ সংবাদটা যেন বুলেটের মতো আসিয়া বিঁধিল। ভদ্রলোকও কিছু বলিলেন না। আমিও বলিবার কথা কিছু খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। মনে হইল, বিধবা যুবতীটি একদৃষ্টে যেন আমার দিকে চাহিয়া আছেন। ফিরিয়া দেখিলাম, সত্যিই তাই। আমাকে মনোযোগী দেখিয়া তিনি আবার সসঙ্কোচে মাথায় কাপড়টা টানিয়া সরিয়া বসিলেন।

উঠিয়া পড়িলাম।

চললাম এখন। মাখনবাবু চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন। দেরি হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই বলিলেন, মাখনবাবু কে?

যে ভদ্রলোক আপনাদের এই ছোলা-গুড় পাঠিয়া দিয়েছেন।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে বাঃ, ভুলেই গেছলাম। তাঁকে আমার ধন্যবাদ দিও।

ভদ্রলোকের মনের মেঘটা যেন কাটিয়া গেল। আমি নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। ভদ্রলোক বলিলেন, তুমি বাবা, চা-টা খেয়ে এস আবার। এখানে কতক্ষণ থাকতে হবে বলা তো যায় না। একটু গল্প-সল্প করা যাবে।

আচ্ছা।

প্লাটফর্মের উপর দিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চলিয়াছিলাম।

বাবুজি এ বাবুজি।

ফিরিয়া দেখিলাম, ডাকিতেছে সেই বেণী-দোলানো মুসলমানের মেয়েটি। আমি ফিরিতেই মুখটি ছুঁচলো করিয়া টুকটুকে লাল জিভটি বাহির করিয়াই ছুট দিল।

দুষ্টু মেয়ে!

একটু দূরে গিয়াই সেই বেঁটে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

নমস্কার দারোগাবাবু।

কি আশ্চর্য, ভদ্রলোক সত্যই যে আমাকে দারোগা ঠাওরাইয়াছেন। ভদ্রলোকের ভুলটা ভাঙাইতে ইচ্ছা করিল না। স্মিতমুখে প্রতি-নমস্কার করিলাম।

তিনি বলিলেন, ওই হালুয়াই ব্যাটাকে একটু শাসিয়ে দিতে পারেন আপনি? লুচির সের এক টাকায় চড়িয়ে দিয়েছে! এ কি মগের মুলুক নাকি মশায়? আমরা না হয় নিরুপায় হয়ে পড়েছি, তাই বলে গলায় ছুরি দেবে ও?

কোন হালুয়াই?

ওই যে ইস্টিশানের ওপারে আছে এক ব্যাটা। কোনও কালে এক পয়সার বিক্রি হত না, আজ ব্যাটার মরসুম পড়ে গেছে।

আমার শাসন কি শুনবে ও?

নিশ্চয় শুনবে। পুলিসের গুঁতোয় বড় বড় চোর শায়েস্তা হয়ে যায়, ও ব্যাটা তো সামান্য হালুয়াই।

আগাইয়া গেলাম।

সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক—যিনি কলের কাছে চিৎকার জুড়িয়াছিলেন—দেখিলাম, স্নান সমাপন করিয়াছেন। একটি লাল গামছা পরিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। ভদ্রলোকের বাহুমূলে প্রকাণ্ড মাদুলি ও রুদ্রাক্ষ, গলদেশেও তাবিজ-জাতীয় কি একটা দুলিতেছে। তিনি নগ্নগাত্রে গামছা পরিয়া বোধহয় সূর্যস্তব পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার কাছে একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক আবদার জুড়িয়া নাকে কাঁদিতেছে।

খিদে পেয়েছে দাদু, ওরা সবাই লুচি জিলিপি খাচ্ছে, আমিও খাব—হুঁ হুঁ দাদু—

ভদ্রলোক মন্ত্র ভুলিয়া খ্যাঁকাইয়া উঠিলেন।

আরে, জ্বালিয়ে খেলে তো দেখছি এটা! তোকে লুচি জিলিপি খাওয়াব বলে কি পয়সা সঙ্গে করে এনেছি নাকি? মাত্র ট্রেন ভাড়াটি নিয়ে তো বেরিয়েছিলাম, তখন কি জানি, এমন হবে? চুপ কর্। —বলিয়া আবার তিনি মন্ত্রে মন দিলেন।

হিং—হিং লিজিয়ে বাবু—আচ্ছা হিং।—

কাবুলিওয়ালাটি তাহার জোব্বাজাব্বা পরিধান করিয়া ব্যবসায় শুরু করিয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সেলাম করিয়া কাছে আসিল।

হাসিমুখে বলিল, হিং—হিং—বালা হিং। চাক্কু—বালা চাক্কু—আসলি জার্মনি—বড়িয়া চাক্কু—লিজিয়ে বাবুসাব—

আমার প্রয়োজন ছিল না। অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আগাইয়া গেলাম।

এক স্থানে একটা গামছাওয়ালাকে ঘিরিয়া দেখিলাম অনেক যাত্রী গামছাই খরিদ করিতেছে। একজন দুগ্ধবিক্রেতা হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া গরম দুধ ফেরি করিয়া বেড়াইতেছি। সেই মাড়োয়ারিটি মনে হইল এইমাত্র দুগ্ধপান শেষ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার হাতে গেলাস এবং গোঁফে দুধ। মাড়োয়ারি ভদ্রলোক গোঁফে-লাগা দুধটুকুও অপচয় করিতে চান না। ঠোঁট ও জিভকে নানা প্রকারে বাঁকাইয়া গোঁফটিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিলাম।

সুটকেসের উপর যে মেয়েটি বসিয়া ছিল এবং যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক দল ছোকরা ঘুরঘুর করিতেছিল, সেই মেয়েটি দেখিলাম উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কুলির মাথায় সুটকেস চাপাইয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, দয়া করে আপনি বলে দিতে পারেন, মেয়েদের বসবার আলাদা জায়গা এখানে আছে কি না?

অযাচিতভাবে একটি ছোকরা বলিল, আপনার তো আর সেকেন্ড ক্লাস টিকিট নেই। এখানে তা ছাড়া যে ফিমেল ওয়েটিং-রুম আছে, তাতে তিল-ধারণের স্থান নেই। বেশ তো বসে আছেন আপনি, থাকুন না।

বুঝিলাম, মেয়েটি একটু বিপন্ন হইয়াছে। বলিলাম, আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে। 'আসুন' বলিয়া আহ্বান তো করিলাম, কিন্তু কোথায় লইয়া গিয়া তাহাকে যে স্থান দিব, তাহা জানি না। মাখনবাবুই ভরসা। দেখি, কতদূর কি করিতে পারি! ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, দুই-তিনটি ছোকরা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। তাহাদের দৃষ্টির অর্থ সুপরিষ্কার—কোথা হইতে এ লোকটা আসিয়া জুটিল!

মাখনবাবুর বাড়িতে আসিয়া দেখি, মাখনবাবু নাই। তাঁহার স্ত্রী একটি ময়লা গামছায় করিয়া

চা ছাঁকিতেছেন। আমাকে দেখিয়া ভদ্রমহিলা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাথার ঘোমটাটা টানিয়া দিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মাখনবাবু কোথায় গেলেন? প্রথমে কোনও উত্তরই তিনি দিলেন না। তখন আমি বলিলাম, এই মেয়েটিকে একটু বসান তো আপনার কাছে। দেখি আমি, মাখনবাবু কোথায় গেলেন।

কুলিটা এবং তাহার পিছু পিছু মেয়েটিও আসিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। কুলি সুটকেসটা নামাইয়া রাখিল, এবং মেয়েটি আগাইয়া বিনুর কাছে গেল দেখিয়া আমি বলিলাম, আপনি একটু বসুন এখানে। আমি দেখি, মাখনবাবু কোথা গেলেন।

এইবার ফিসফিস করিয়া বিনু সেই মেয়েটিকে বলিলেন, উনি গেছেন দোকানে খাবার আনতে।

আচ্ছা, দেখি আমি।

।। চার।।

হালুয়াইয়ের দোকানে সত্যই ভীষণ ভিড়।

প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে রামায়ণ পাঠ করিতে করিতে সে যে-রাবণকে অকুণ্ঠিত-চিত্তে গালি দিত, আজ যদি কোনও মন্ত্রবলে একদিনের জন্যও সে সেই রাবণ হইতে পারিত, অন্তত সেই রাবণের দশটা মুণ্ড ও বিশটা হাত আয়ত্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে বেচারা বাঁচিয়া যাইত। দুই হাতে সে কত লুচিই ভাজিবে এবং একটা মুখে কত লোকের সহিতই বা কত কথা কহিবে! অথচ দুই মাইলের মধ্যে তাহার এই একখানি দোকান এবং অকস্মাৎ এতগুলি বুভুক্ষিত লোকের জন্য তাহা প্রস্তুত ছিল না।

ওটা তোমার ছান্‌চা, না, ছোরা হে? এক টাকা সের লুচির দাম! বল কি তুমি? ওরে, চ চ, আর লুচি খেতে হবে না তোকে।

হুঁ হুঁ, দাদু—

সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক ও তাহার নাতি আসিয়া জুটিয়াছেন। নাতির হাত ধরিয়া তিনি হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন।

এই, আমাকে এক পো লুচি আর একটু তরকারি দাও তো।

এই, শুন্‌তা হ্যায়, এক সের পুরি, আউর আধা সের জিলেবি, গরম গরম ভাজকে দেও।

পানতোয়া আছে—পানতোয়া?

এই, এই, আরে মলো, ব্যাটা কথাই কয় না যে! ওহে শুনছ, দু সের লুচি আর আলুর দম—বাসী নাকি ওটা?

এই প্রকার নানা কণ্ঠের নানা চিৎকারকে অগ্রাহ্য করিয়া বন্‌শি হালুয়াই দ্রুতবেগে লুচি ভাজিয়া চলিয়াছে। অন্য কোনও দিকে মন দিবার মত বাড়তি ফুরসুত তাহার এখন নাই। দুই বৎসর পূর্বে প্রদত্ত এক সন্ন্যাসীর তাবিজের ফল বুঝি ফলিতেছে। দৈবানুগৃহীত এই দুর্ঘটনা। ইহার অন্তরালে যে মঙ্গল এবং শনির পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান, তাহা আর কেহ না বুঝুক, বন্‌শি

হালুয়াই বুঝিতেছিল।

বন্‌শি ভাজিতেছে এবং তাহার ভাই ধাড়ি বিক্রয় করিতেছে। চাকর বুলাকি লুচি বেলিতেছে এবং দরকারমত পাশে কড়াতে চড়ানো তরকারিটাতে খুন্তি চালাইতেছে। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মাখনবাবুর পাত্তা নাই। সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোক দেখিলাম একটু দূরে এক স্থানে দাঁড়াইয়া এই জনতা লক্ষ্য করিতেছেন। গোঁফ পরিষ্কার, দুধের চিহ্নটুকুও আর সেখানে নাই। আমাকে দেখিয়া তিনি অকারণে আবার সেলাম করিলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করিয়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। মাখনবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত দেখিতেছি। ভদ্রলোক গেলেন কোথায়?

অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া বন্‌শি হালুইয়ের সান্নিধ্যলাভ করিলাম।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাখনবাবু কোথায় জান? বন্‌শি উত্তর দিল না। সে তখন একসঙ্গে দশখানা লুচি কড়াতে ছাড়িয়াছে এবং ছান্‌চা সঞ্চালন করিয়া চেষ্টা করিতেছে ঘি বেশি না পোড়ে। বন্‌শি লোকটি বেঁটে, রঙ কালো, দুই-চারি গাছা গোঁফ আছে, কি না আছে, মাথার সামনের দিকে চুল নাই বলিলেই চলে। চক্ষু দুইটি হইতে একটা চাপা চতুরতা উঁকি মারিতেছে। পেটটি প্রকাণ্ড। দেহের মধ্যে ওই অবয়বটিই সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফতুয়া সেটিকে আবৃত করিতে পারে নাই, বস্ত্র লাঞ্ছিত হইয়া সরিয়া গিয়াছে। নাভির বহু নিম্নে নীবিবন্ধন। সমস্ত উদরদেশ উন্মুক্ত আলোকে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত। বন্‌শির সে জন্য লেশমাত্র সঙ্কোচ নাই। সে পার্শ্ববর্তী বুলাকিকে মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে কি যেন বলিতেছে এবং একাগ্রমনে লুচি ভাজিয়া চলিয়াছে। অন্য দিকে খেয়াল দিবার মত অবসর তাহার নাই।

আমি আর একবার চেষ্টা করিলাম।—মাখনবাবু কোথায় জান?

এবার বেশ একটু চিৎকার করিয়াই বলিলাম। সম্ভবত আমার উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়াই বন্‌শি বলিল, মাখনবাবু? ভিতরে আসেন। 'আসেন' মানে অবশ্য 'আছেন'—ঢুকিয়া পড়িলাম ভিতরে। কোথা মাখনবাবু?

বন্‌শি অঙ্গুলিসঙ্কেতে একটি ক্ষুদ্র দ্বারের দিকে দেখাইয়া দিল। মাখনবাবু কি বন্‌শির অন্তঃপুরে ঢুকিয়াছেন নাকি? গেলাম আমিও। গিয়া দেখি, মাখনবাবু উবু হইয়া বসিয়া একটি কুলিজাতীয় লোকের দ্বারায় কি যেন করাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, ওয়েলকাম সার্, নিমকি করাচ্ছি। তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, অন্য দিন হলে বন্‌শি নিজেই করে দিত। আজ ব্যাটার ফুরসত নেই। আমাকে হাতজোড় করে বললে, হুজুর, রামদীনকে দিয়ে বানিয়ে নেন, আমি ভেজে দিচ্ছি। নিমকি জিনিসটা আবার ব্যাগার-সারা করে করলে হয় না কিনা; ডল্, ডল্, আর একটু ডল্। বেলতে আর কতক্ষণ যাবে? ময়দা মাখাটাই আসল।

রামদীন সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গাড়িয়া চক্ষু বুজিয়া ময়দার তালটার উপর ঘুষি চালাইতে শুরু করিল। আমার ভয় হইতে লাগিল, থালাটা না ভাঙিয়া যায়। মাখনবাবুরও দেখিলাম সে ভয় হইয়াছে। কারণ তিনিও বলিলেন, আস্তে, আস্তে।

হঠাৎ বাহিরের কলরবটা যেন বাড়িয়া উঠিল, মারো ভাগা দেও শালেকো—

বন্‌শির কণ্ঠস্বর শুনিলাম।

ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বাহিরে আসিলাম। আসিয়াও কিন্তু সহসা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ভিড়ের মধ্যে একটা আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছে, এইটুকু মাত্র বুঝা গেল।

বন্‌শিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বাংলা ভাষায় বলিল, ও কুসু নেই আসে বাবু, এক শালা লৌন্ডা জিলেবি চোরাখা থা।

এমন সময় ভিড়ের ভিতর হইতে একটা আর্ত শিশুকণ্ঠ কাঁদিয়া উঠিল, কে যেন তাহাকে মারিতেছে। বাহির হইয়া আসিলাম। ছোট ছেলেকে কেহ মারিতেছে নাকি? ভিড়ের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। অনেক ঠেলাঠেলি গুঁতা-গুঁতির পর ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া দেখিলাম, ছোট ছেলেই বটে। কে যেন তাহার গালে একটা চড় মারিয়াছে, বেশ জোরেই মারিয়াছে, পাঁচটা আঙুলের দাগ বসিয়া গিয়াছে। ছেলেটি সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোকের নাতি। সত্যই সে জিলাপি চুরি করিয়াছিল। শীর্ণকান্ত ভদ্রলোককে আশেপাশে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। এক ঠোঙা জিলাপি কিনিয়া ছেলেটির হাতে দিলাম এবং তাহাকে ভিড় হইতে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলাম।

তোমার দাদু কোথা?

জিলাপিতে কামড় দিতে দিতে সে বলিল, টেশনে।

একটু হিতোপদেশ দিবার ইচ্ছা হইল।

বলিলাম, ছি ছি, তুমি চুরি করেছিলে! ছি!

আমার খিদে লেগেছে যে! দাদুকে বললাম কত, দাদু দিলে না কিনে।

ইহার উপর আর কোনও কথা চলে না।

এখন ছেলেটাকে তাহার দাদুর জিম্মা করিয়া দিতে পারিলে বাঁচি। এই ভিড়ে ছাড়িয়া দিলে হারাইয়া যাইতে পারে।

তাহাকে প্লাটফর্মের দিকেই লইয়া চলিলাম। একটু দূর গিয়াই সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোকের দেখা মিলিল। তিনিও নাতির খোঁজে আসিতেছিলেন। সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে বলিলাম।

শুনিয়া তিনি একেবারে রুখিয়া উঠিলেন। হতভাগা, পাজি ছোঁড়া! শাল্‌টির চৌধুরী-বংশের ছেলে তুমি, তুমি গিয়েছ জিলিপি চুরি করতে! এত বড় নোলা তোমার! মেরেই ফেলব আজ, খুন করে ফেলব আজ হারামজাদাকে।

আমি ছেলেটাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলাম। শাস্তি ওর যথেষ্ট হয়ে গেছে মশাই, আর কিছু বলবেন না। ছেলেমানুষ—

কিন্তু শাল্‌টির চৌধুরী-বংশের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক কোনও কথাই শুনিতে চাহেন না। বলব না! বলেন কি আপনি! কেটে পুঁতে ফেলব ওকে আমি। ঝাড়ু মারি আমি অমন বংশধরের মুখে। নচ্ছার, কুলাঙ্গার—

উচ্চৈঃস্বরে এতগুলি সংস্কৃত শব্দ একসঙ্গে উচ্চারিত হইতে লোক জমিয়া গেল।

কি হয়েছে মশাই?

ব্যাপার কি?

চুরি গেল নাকি কিছু?

দুইজন বেহারি নিম্নস্বরে বলাবলি করিতে লাগিল, বাবু বাউরা মালুম হোতা হ্যায়।

কোথা গেলেন সার্?—মাখনবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া

আসিবার পূর্বে শীর্ণকান্তি ভদ্রলোককে অনুরোধ করিয়া আসিলাম, তিনি যেন মারধর না করেন। তথাপি তিনি ছাড়িলেন না, তাড়া করিলেন। নাতি জিলাপির ঠোঙা ফেলিয়া দৌড় দিল। ঠোঙা মাটিতে পড়িতে না পড়িতেই একদল কুকুর হুমড়ি খাসয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িল। ছেলেটি সেই যা একটা খাইয়াছিল, বাকিগুলি কুকুরের পেটে গেল।

।। পাঁচ।।

গরম গরম নিমকি লইয়া মাখনবাবু ও আমি বাসায় ফিরিতেছিলাম। পিছনে পিছনে আসিতেছিল রামদীন। মাখনবাবু আমার দিকে চাহিয়া বাম চক্ষুটা ঈষৎ কুঁচকাইয়া বলিলেন, দেখেছেন তো মহাপ্রভুকে? এঁরই কীর্তি।

বুঝিলাম, রামদীনের কথাই বলিতেছেন।

একে বাঁচাবেন বলছিলেন না? কি উপায়ে?

আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া বাম হাতের তর্জনী ঠোঁটের উপর চাপিয়া মাখনবাবু তর্জন করিয়া উঠিলেন, আস্তে মশাই, উচ্চারণ করবেন না ও-কথা, জানাজানি হয়ে গেলেই সর্বনাশ।

তাহার পর এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, বেশ করে চা-টা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে একটা পরামর্শ করতে হবে। মাস্টার মশাইকে ডেকে আনা যাবে। আপনার মত পাকা মাথা একটা পাওয়া গেছে, ব্যাটার কপাল ভাল।

আমি এ বিষয়ে আর কি পরামর্শ দেব আপনাদের?

বাঃ, আপনি বয়সে ছোট হলেও শিক্ষিত লোক, আপনার বুদ্ধির দামই আলাদা। আমার নিজের বিদ্যে ম্যাট্রিক অবধি। আর মাস্টার মশাইয়ের পেটেও—প্রাইভেটলি বলছি, এক পিলে ছাড়া আর কিছু নেই; কোনও রকমে 'ইয়েস সার্', 'নো সার্', 'ভেরি গুড সার্'—! আপনি এসে গেছেন, এ ব্যাটার পরম সৌভাগ্য।

মিনিট-খানেক নীরব থাকিয়া বলিলাম, আপনার বাসায় আর একজন অতিথি এনে জুটিয়েছি। আপনার স্ত্রীর কাছে তাঁকে বসিয়ে এসেছি।

মাখনবাবু চলিতে চলিতে থামিয়া পড়িলেন।

হোয়াট? আবার কে অতিথি মশাই? আগে বললে নিমকি কিছু বেশি নিতাম যে!

ওতেই যথেষ্ট হবে, চলুন।

চলিতে চলিতে মাখনবাবু বলিলেন, লোকটি কে?

একটি স্ত্রীলোক।

আবার মাখনবাবু দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

স্ত্রীলোক! ডোবালেন দেখছি! কে? সেই ওয়েটিংরুমের বিধবা নাকি? আচ্ছা লোক আপনি! ওর জন্য আপনার অত মাথাব্যথা কেন? ছোলা-টোলা তো সব দিয়ে এলেন।

না, না, এ সে নয়, আর একজন।

আর একজন? উঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! আচ্ছা লোক তো আপনি! ওসব টেন্‌ডেন্সি ছাড়ুন মশাই এই ভিড়ের মধ্যে। কী মুশকিল!—বলিয়া সস্মিতমুখে আমার মুখের

দিকে চাহিলেন। একটু থামিয়া আবার বলিলেন, কে ইনি? আগে চিনতেন নাকি?

না।

সাংঘাতিক লোক আপনি মশাই।

মাখনবাবুর বাসার সমীপবর্তী হইয়াছিলাম। দেখিলাম, জানালায় বিনু দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমাদের দেখিয়া সরিয়া গেলেন।

শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, মাখনবাবু রামদীনকে বলিতেছেন, ওরে, তুই মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি থেকে একখানা চেয়ার বোঁ করে নিয়ে আয় তো। বাইরেই বসা যাক। আমার চেয়ারটাও বার করি। ভেতরে একে জায়গা কম, তার ওপর আপনি—। বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। আমিও তাড়াতাড়ি বলিলাম, হ্যাঁ, সেই ভাল, বাইরেই বেশ হবে।

রামদীন ঊর্ধ্বশ্বাসে একখানা চেয়ার লইয়া আসিল। মাখনবাবুও একখানা ছোট চেয়ার এবং তাহার পর একটা ছোট টেবিলও বাহির করিয়া আনিলেন। টেবিলটা নামাইয়া দিয়া মাখনবাবু এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন, যেন কি খুঁজিতেছেন।

কি খুঁজছেন? পয়সা-টয়সা পড়ে গেল নাকি?

না, পয়সা নয়। খুঁজছি একটা সাইজমাফিক ইট।

ইট?

হ্যাঁ, টেবিলটা একটু ইয়ে কিনা, মানে পায়া চারটে সমান নয়। একটা পায়ার তলায় একটা ছোট্ট ইট না দিলে—এই যে পেয়েছি।

টেবিলটাকে ঠিকমত বসাইয়া মাখনবাবু বলিলেন, এইবার অল রাইট। দেখি, চায়ের কতদূর কি হল!—বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

গরুড়-পক্ষীটির মতো হাতজোড় করিয়া রামদীন নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আঁটসাঁট গড়নের লোকটি; পরনে রেলের জামা ও পাগড়ি। মুখের দিকে চাহিলেই প্রথমে চোখে পড়ে লাল চক্ষু দুইটি এবং কপালের ও রগের স্ফীত শিরাসমূহ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম রামদীন?

হাঁ, হুজুর। যেন হাঁড়ির ভিতর হইতে শব্দ হইল। এমন সময় মাখনবাবু ফিরিয়া আসিলেন। হাসিয়া হাত দুইটি উল্টাইয়া বলিলেন, এগেন কোল্ড সার্! ফের জল চড়িয়েছে, ফাইভ্ মিনিট্‌স মোর। ততক্ষণ আমি মাস্টার মশাইকে ডাকি একটু, আপনার সঙ্গে আলাপটা হয়ে যাক। হ্যাঁ, বাই দি বাই, ওই মেয়েটি তো কিচ্ছু খেতে চাইছে না মশাই। বলছে, শুধু বসে থাকতে পেলেই ওর যথেষ্ট। স্ট্রেঞ্জ ক্যারেক্টার। সাধারণত লোকে বসতে পেলেই শুতে চায়। এ একেবারে ঠায় বসে আছে, নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু। বিনু বললে, স্পিকটি নট, মুখ বুজে চুপচাপ বসে আছে। আপনি একটু বলে-কয়ে দেখুন না, যদি একটু চা খাওয়াতে পারেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম, দরকার কি জোর জবরদস্তি করবার? খেতে বলেছেন, ওই যথেষ্ট। তা ছাড়া আমি তো ওঁকে চিনি না যে, গিয়ে অনুরোধ করব। আমার সম্পূর্ণ অচেনা। প্লাটফর্মে কতকগুলো ছোঁড়া ওঁকে বিরক্ত করছিল, তাই আমাকে উনি বললেন, ফিমেল ওয়েটিং-রুমটা দেখিয়ে দিতে। আমি আপনার বাসাতেই নিয়ে এলাম।

বেশ আছেন আপনি!—বলিয়া হাসিয়া হাসিমুখে মাস্টার মশাইকে ডাকিতে গেলেন।

স্টেশন-মাস্টারের বাসা নিকটেই।

একটু পরেই স্টেশন-মাস্টার মহাশয় আসিলেন। ভদ্রলোকের হাঁপানি আছে, লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার গায়েও রেলের জামা। গলায় একটা বেমানান গোছের সবুজ মাফলার। কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। চোখের তারা দুইটি সর্বদাই যেন কুঞ্চিত ভ্রূযুগলে কিছু দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ আবার মাঝে মাঝে সম্মুখের দিকে চট করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। আমার দিকে চকিত চাহিয়া আবার ঊর্ধ্বনেত্র হইলেন। আমি নমস্কার করাতে একবার ক্ষণিকের জন্য আমার দিকে চাহিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন।

মাখনবাবু বলিলেন, এঁরই কথা বলছিলাম।

ও।—বলিয়া মাস্টার মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারটাতে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

রামদীন চা ও নিমকি লইয়া আসিল।

মাস্টার মহাশয় ও আমার সম্মুখে এক পেয়ালা করিয়া চা ও প্রচুর নিমকি আগাইয়া দিয়া মাখনবাবু বলিলেন, খেতে খেতে আলাপটা হোক সার্।

মাস্টার মহাশয় হাত নাড়িয়া অতি কষ্টে বলিলেন, খাবার-টাবার খাব না, ওসব চলবে না। খেলেই হাঁপানি বাড়ে। চা বরং চলতে পারে একটু। এ সময়ে খাইও এক কাপ।—বলিয়া তিনি একটা পেয়ালা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া পকেটে কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। দুইটি পকেটেই খুঁজিলেন, কিন্তু ইপ্সিত বস্তু পাওয়া গেল না। মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন, লেফ্‌ট বিহাইণ্ড বুঝি। ওরে রামদীন!

রামদীন বাড়ির ভিতরে ছিল। দৌড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। রামদীন আসিতেই মাখনবাবু বলিলেন, ওরে দৌড়ে গিয়ে বাবুর আপিঙের কৌটোটা নিয়ে আয় তো।

রামদীন দৌড়িল।

মাস্টার মহাশয় ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া চক্ষু মিটমিট করিতে করিতে বলিলেন, বালিশের নীচে আছে বলে দিন।

মাখনবাবু আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে রামদীন, শোন, বালিশের নীচে আছে, বুঝলি?

হাঁ হুজুর।

রামদীন চলিয়া গেল।

রামদীন না আসা পর্যন্ত আমরা সকলেই রামদীনের পথপানে চাহিয়া রহিলাম। আপিঙের কৌটা না আসা পর্যন্ত জমিবে না। যদিও বেশি দেরি হয় নাই, মাখনবাবু তথাপি অধীর হইয়া উঠিলেন, এ ব্যাটা গাঁজাখোরকে নিয়ে আর পারা যায় না! এমন সময় রামদীনকে দেখা গেল, বেচারা দৌড়াইয়া আসিতেছে।

একগুলি অহিফেন গলাধঃকরণ করিয়া এবং তৎপরে চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া মাস্টার বলিলেন, ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, চাকরি বোধহয় আর থাকে না। আচ্ছা মাখনবাবু, আমি ভাবছি, এ ভদ্রলোককে আমাদের এসব ব্যাপারে জড়ানো কি ঠিক হবে?

মাখনবাবু নড়বড়ে টেবিলটি চাপড়াইয়া বলিলেন, সার্‌টেনলি—নিশ্চয়ই। আমাদের এখন কারুরই মাথার ঠিক নেই। আপনারও নেই, আমারও নেই। অর্থাৎ কী ভাবে দোষটা অপরের ঘাড়ে চাপানো যায়, সেই পরামর্শটা।

মাস্টার মহাশয়ের ভ্রূ-সন্ধানী নয়নযুগল ঘন ঘন মিটমিট করিতে লাগিল। তিনি গভীর

চিন্তামগ্নভাবে আর এক চুমুক চা পান করিলেন। আমার সহিত এই সব গোপনীয় অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করিতে মাস্টার মহাশয়ের মন সরিতেছিল না।

আমার নিজেরও মনোগত অভিপ্রায় ছিল না এই সব ব্যাপারে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতে। কিন্তু মাখনবাবু নাছোড়। তিনি কনুই দিয়া আমার পিঠে একটা খোঁচা দিয়া বলিলেন, বলুন না মশাই, কার ঘাড়ে দোষটা চাপানো যায়? বলিয়াই তিনি ঘাড় ফিরাইয়া একবার চতুর্দিক দেখিয়া লইলেন, অপর কেহ আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছে কি না! এক রামদীন ছাড়া কাছেপিঠে আর কেহ ছিল না।

মাখনবাবু বলিলেন, এই রামদীন, সিগ্রেট লে আও। রামদীন চলিয়া গেলে আমি বলিলাম, রামদীনকে বাঁচাতে হলে হয় ড্রাইভারের দোষ দিতে হয়, না হয় ইঞ্জিনের দোষ দিতে হয়, না হয় রেল-লাইনের দোষ দিতে হয়। এর মধ্যে কোন্‌টা সম্ভবপর হতে পারে, ভেবে দেখুন আপনারা। মাস্টার মহাশয় নিমেষের জন্য আমার পানে চাহিয়া আবার ঊর্ধ্বনেত্র হইলেন। তাঁহার চোখের পাতা খুব ঘন ঘন ওঠা-নামা করিতে লাগিল।

মাখনবাবু আমার চিন্তাপ্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ সস্মিত দৃষ্টিতে মাস্টার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবটা যেন, দেখিলেন তো, কেমন গুছাইয়া জিনিসটাকে বলিলেন ইনি! মাস্টার মহাশয় ঊর্ধ্ব-দৃষ্টি হইয়া হাঁপাইতেছিলেন, তিনি মাখনবাবুর এই পুলকিত মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন না। বুঝিলাম, তাঁহার পক্ষে বেশি কথা বলা কষ্টকর।

মাখনবাবুকে আমি আবার বলিলাম, তা ছাড়া আমার আর একটা কথা মনে হচ্ছে এখন। বললাম বটে, ইঞ্জিন আর রেল-লাইনের দোষ দেওয়া যায়, কিন্তু ভেবে দেখছি, ও দুটো বোধহয় খাটবে না।

কেন? হোয়াই?—বিজ্ঞভাবে মাখনবাবু বলিলেন। মাস্টার মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে মনোযোগ সহকারেই আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। তাঁহার চিন্তাগ্রস্ত মুখে ও দ্রুত নড়নশীল চোখের পাতায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

আমি বলিলাম, ইঞ্জিন আর রেল-লাইন যে ঠিক আছে, তা তো যে কোনও ইঞ্জিনিয়ার এসেই ধরে ফেলবে। রামদীনকে বাঁচাতে হলে ড্রাইভারের নামে দোষ চাপানো ছাড়া আর কোনও বুদ্ধি তো মাথায় আসছে না।

মাখনবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, তা তো ঠিক। কিন্তু হাউ? কেমন করে?

সেটা ভেবে দেখতে হবে। বলতে পারেন, ড্রাইভার মাতাল অবস্থায় এই কাণ্ড করেছে, কিংবা ওই রকম একটা কিছু—

মাস্টার মহাশয়ের নয়নযুগল অল্পক্ষণের জন্য আমার মুখপানে নিবদ্ধ হইয়া আবার ঊর্ধ্বগামী হইল। মুখমণ্ডলে ক্ষণিকের জন্য যেন একটা আনন্দের আলো ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটু থামিয়া থামিয়া বলিলেন, আমিও রিপোর্ট করেছি তাই। ড্রাইভার ফাউন্ড ড্রাঙ্ক। এখন কথা হচ্ছে—। বলিয়া তিনি চায়ের বাটিতে একটা চুমুক দিলেন।

মাখনবাবু বলিলেন, আপনি রিপোর্ট করে দিয়েছেন, অলরেডি?

হ্যাঁ হ্যাঁ। আরে এই সামান্য বুদ্ধিটা কি আর আমার ঘটে নেই, অ্যাদ্দিন চাকরি করছি, হ্যাঃ! কি মনে কর তুমি আমাকে?

মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন, গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক। মাস্টার মহাশয় কিছু না বলিয়া

হাঁপাইতে লাগিলেন। এই উত্তেজনাটুকুতে তাঁহার হাঁপানিটা যেন বাড়িয়া গেল। চাটুকু নিঃশেষ করিয়া মাস্টার মশাই উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আপনারা দুজনে ভেবে-চিন্তে দেখুন জিনিসটাকে। 'ড্রাঙ্ক' বললেই তো হবে না। প্রমাণের ওপর সেটাকে দাঁড় করাতে হবে তো?

নিমকিতে একটা কামড় দিয়া মাখনবাবু বলিলেন, সার্টেনলি—নিশ্চয়ই।

রামদীন এক প্যাকেট সিগারেট লইয়া আসিল। একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে আমি বলিলাম, যাই প্লাটফর্মটায় একবার ঘুরে-ফিরে আসি।

মাখনবাবু বলিলেন, বেশি দেরি করবেন না যেন। রান্না প্রায় শেষ হয়ে গেল। আপনি আমার এখানে খাবেন, সে কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। রান্না প্রায় হয়ে এল। আর হ্যাঁ, আপনি ও মেয়েটিকে বলে-কয়ে দেখুন না, যদি একটু কিছু খাওয়াতে পারেন।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, আপনার স্ত্রী সেসব ঠিক করবেন এখন। আমার এ রকমভাবে বলাটা কি ভালো দেখায়? ভেবে দেখুন না!

মাখনবাবু চায়ের বাটিতে চুমুক দিতেছিলেন। বাটিটা নামাইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বিনু ওসব বিষয়ে খুব ওস্তাদ আছে। পরকে এমন আপন করতে পারে! গিয়ে হয়তো দেখব, দুজনে হরিহর-আত্মা হয়ে বসে আছে। কিছু বলা যায় না—বলিয়া মাখনবাবু এতদূর হইতে অনর্থক উঁকিঝুঁকি দিয়া অন্তঃপুরের অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, একটু ঘুরে আসি তা হলে!

যান, বেশি দেরি করবেন না। তারপর হাসিয়া বলিলেন, আর কাউকে জোটাবেন না যেন!

চলিয়া যাইতেছিলাম। মাখনবাবু আবার পিছু ডাকিলেন।

দিস ফেলোর কথাটাও একটু ভাববেন। শক্ত সমস্যা। ড্রাঙ্ক বললেই তো হবে না, প্রমাণ করতে হবে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, রামদীনকে বলুন না, ড্রাইভারটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি সত্যিই একটু মদ খাওয়াতে পারে। বিনা পয়সায় পেলে হয়তো খেতেও পারে—

মাখনবাবুর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, দেখি, মন্দ বুদ্ধি নয় এটা। মাথা বটে আপনার!

।। ছয়।।

প্লাটফর্মের ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম।

হঠাৎ নজরে পড়িল, সেই বেণী-দোলানো মেয়েটি রেললাইনের বেড়া-দেওয়া তারের উপর দাঁড়াইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া দুলিতেছে। আমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে তাহার টুকটুকে লাল জিভটুকু বাহির করিয়া মুখভঙ্গি সহকারে ঠিক অভ্যর্থনা করিত। একবার মনে করিলাম, ডাকি মেয়েটিকে।

কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। নিকটেই একটা গোলমাল উঠিল। একদল লোক তালগোল পাকাইয়া একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে। নিকটে গিয়া দেখি, সেই কাবুলিওয়ালা একটি যুবকের হাত চাপিয়া ধরিয়াছে এবং মার্জারকবলিত মূষিকের ন্যায় যুবকটি চিঁচিঁ

করিতেছে। কৌতূহল হইল। ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গেলাম। কাবুলি আমাকে দেখিয়া বলিল, উজুর, আপ দেখিয়ে, আপ বলা আদমি, ইন্‌সাফ কর্‌ দিজিয়ে।—বলিয়া সে যাহা বলিল, তাহার মর্মার্থ এই যে, এই যুবকটি কাবুলিটির নিকট ছুরি কিনিবে বলিয়া একটি ছুরি চাহিয়া লয় এবং ছুরির ধার আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের হাতের নখগুলি কাটিতে থাকে। দুইটি হাতের সমস্ত নখ নিপুণভাবে কাটিয়া এখন ছোকরা ছুরিটি এই অজুহাতে ফিরাইয়া দিতে চায় যে, ছুরিটি আশানুরূপ তীক্ষ্ণ নহে। তদুত্তরে কাবুলিওয়ালা বলিতেছে যে, ছুরির ধার আছে কি না, তাহা সে এখনই সর্বসমক্ষে প্রমাণ করিয়া দিবে এই বেঁইমানের নাসিকা ছেদন করিয়া। যুবকটির দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সেই ট্যারা ছোকরা। একাকিনী ভদ্রমহিলাটির সম্মুখে একটু আগেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল।

তাহাকে বলিলাম, আপনি ছুরি যখন নেবেন না, তখন মিছিমিছি কেন ওর ছুরি দিয়ে নখ কাটলেন।

ধার নেই মশাই ওর ছুরিতে।

ধার নেই তো দশটা আঙুলের নখ অমন সুন্দরভাবে কাটলেন কী করে?

জুট বাত মৎ বোল্‌না।—কাবুলি গর্জন করিয়া উঠিল।

ট্যারা ছোকরাটি বলিল, তা ছাড়া অত দাম দিয়ে ছুরি কে নেবে মশাই, দাম বলছে আড়াই টাকা।

আচ্ছা, দো রূপেয়ামে দেগা, নাফা ছোড় দিয়া।

আমি বলিলাম, কাজটা ঠিক হয়নি আপনার। এর সঙ্গে যখন দরদস্তুর করেছেন, হাতের নখ কেটেছেন, তখন নেওয়া উচিত আপনার ছুরিটা।

আমার কাছে অত পয়সা এখন নেই তো।

আপনার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে দেখুন। আপনারা তো এক দল ছিলেন।

আপনি যখন বলছেন, তাই দেখি। এই, হাত ছোড়ো।

কাবুলি হাত ছাড়িয়া দিল।

কাবুলিকে বলিলাম, বেচারার নিকট পয়সা নাই। বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে যোগাড় করিয়া আনিতেছে। কাবুলিওয়ালা ছোকরার পিছু পিছু গেল। আমি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, ছোকরার বন্ধু-বান্ধবদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সব সরিয়া পড়িয়াছে।

আর একটু আগাইয়া যাইতেই সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি এবারও আমাকে সেলাম করিলেন। শুধু সেলাম করিয়াই এবার ক্ষান্ত রহিলেন না, নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন যে, আমার সহিত তাঁহার গোপন একটা পরামর্শ আছে, আমি যদি অনুমতি করি। বিস্মিত হইলাম। আমার সহিত কি গোপন পরামর্শ থাকিতে পারে?

একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, বেশ তো বলুন। তিনি বলিলেন যে, এখানে অনেক লোকজন রহিয়াছে, পরামর্শটা প্লাটফর্মের বাহির হওয়াটাই সমীচীন। আমি তখন বলিলাম যে, ওয়েটিং-রুমে এক ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, সেটা না সরিয়া এখন আমি প্লাটর্ফমের বাহিরে যাইব না। তিনি কি অপেক্ষা করিবেন?

বহুত খুব।

আমি ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়া পড়িলাম। মাড়োয়ারিটি চঞ্চলভাবে প্লাটফর্মে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ বিছানা বিছাইয়া বেশ জমিয়া বসিয়া একটি বই পড়িতেছেন। তাঁহার বিধবা কন্যাটি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ঘরের এক কোণে স্টোভে রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন।

এসো এসো, আরে বাঃ, চা-টা খাওয়া হয়ে গেল? বসো, বসো, এই বিছানাতেই বসো না তুমি!

ভদ্রলোক মহা উৎসাহে আমাকে আপ্যায়িত করিয়া বসাইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বই পড়ছেন ওটা?

ভদ্রলোক বইখানা লুকাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, ও একটা বাজে বই বলে মনে হবে তোমার। আমার কিন্তু বেশ লাগে।

বিধবা মেয়েটি দেখিলাম মুচকি মুচকি হাসিতেছে। আমি আবার বলিলাম, কি বই?

আমার এই বয়সে 'পিল্‌গ্রিমস প্রগ্রেস' বা গীতা বা ওই রকম কিছু একটা পড়া উচিত, কিন্তু খুব ভালো লাগে আমার এই বইখানা।—বলিয়া বইটা আমার হাতে দিলেন।

দেখিলাম 'অ্যালিস ইন্ ওয়ান্ডরল্যান্ড'। বলা বাহুল্য, আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আরও দুই-তিনখানা বই কাছে পড়িয়া আছে দেখিলাম। বলিলাম, বইটা তো খুব ভালো বই। ছোট ছেলেমেয়েদের এমন বই আর হয়নি।

ম্লান হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, ভেবেছিলাম, নাতি-নাতনিদের নিয়ে বুড়ো বয়সে এই বইগুলো আবার বেশ জমিয়ে পড়ব, কিন্তু ভগবান আমার কপালে সে সুখ তো আর লেখেননি। তাই একা একাই পড়ি।

চুপ করিয়া রহিলাম।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা খুব গোঁড়া হিন্দু, না?

তিনি হাসিয়া বলিলেন, না, মোটেই না। তবে আমার মেয়ে কিছুদিন থেকে— । বলিয়া তিনি চকিতে একবার কন্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন।—ও কিছুদিন থেকে ভয়ানক গোঁড়া হয়ে উঠেছে।

আমি বলিলাম, কিছুদিন থেকে মানে? আগে গোঁড়া ছিলেন না?

না, মোটেই না। কলেজে-পড়া মেয়ে কি সহজে গোঁড়া হয়! ও বি এ পাশ করেছে আজ বছর চারেক হল, তাই না মিন্টু?

মিন্টু কিন্তু দেখিলাম আমাদের দিকে পিছনে ফিরিয়া বসিয়া আলু ছাড়াইতেছেন। বৃদ্ধের কথায় একটু মাথা নিচু করিলেন মাত্র।

হ্যাঁ, চার বছরই—বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন।

মিন্টু নীরবে তরকারি কুটিতে লাগিলেন। আমি 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডে'র পাতাগুলো উলটাইয়া ছবি দেখিতে লাগিলাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, বরাত, বরাত, সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। বুঝলে বাবা? বিধাতার বিধানকে মেনে নেবার মতো মনের শক্তি থাকা দরকার। আমার ওইটের অভাব ছিল। বলেই এত কষ্ট পেলাম।—বলিয়া বৃদ্ধ একটু হাসিলেন।

একটু চুপ করিয়া আবার শুরু করিলেন, বিধাতার বিধানকে মেনে নেওয়াই উচিত। বিনোদ পাগল হয়ে গেছে, পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি তো। মিন্টু বিধবা হয়েছিল, সেটাকেও এমনই ভাবে মেনে নিলেই চুকে যেত। কিন্তু আমি গেলাম বিধাতার উপর টেক্কা

দিতে। বিধাতা সে কথা শুনবে কেন? আরে বাঃ!—বলিয়া আবার একটু হাসিলেন।

হঠাৎ মিন্টু বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আচ্ছা বাবা, নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা বাইরের পাঁচজনকে শুনিয়ে লাভ কি? এসব কি বলে বেড়াবার মতো কথা?

আমি বলিলাম, থাক দরকার কি ওসব কথার? এবার আমাকে উঠতেও হবে।—বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিলাম।

বৃদ্ধ একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। বলিলেন, এরই মধ্যে উঠবে কোথায়? ট্রেনের তো এখন ঢের দেরি। আমাদের এইখানেই যখন রান্না হচ্ছে, তখন এইখানেই চারটি খাও না।

আমার আপত্তি নেই তাতে। কিন্তু মাখনবাবুর বাড়িতে আমার জন্যে রান্না হচ্ছে শুনলাম।

ও, আচ্ছা, সেখানেই খেও তা হলে। তবু বসো একটু। এর মধ্যেই রান্না নিশ্চয়ই হয়ে যায়নি।

না, তা বোধহয় হয়নি। আচ্ছা বসছি একটু।—বলিয়া আবার বসিয়া পড়িলাম।

কিন্তু স্বচ্ছন্দ ভাবটা যেন আর ফিরিয়া পাইলাম না। বৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন হ্যাঁ, বসো বসো, কোথায় যাবে এখন? মেডিকেল কলেজের ছেলে দেখলেই আমার বিনোদকে মনে পড়ে। এর মধ্যে হয়তো কোনও যুক্তি নেই, কিন্তু মেডিকেল কলেজের ছাত্র শুনলেই, তাকেও নিজের লোক বলে মনে হয়, অর্থাৎ—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই ভদ্রলোক থামিয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ নীরবেই কাটিল।

আমি কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। কোনও ছুতায় উঠিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচি। এমন সময় বৃদ্ধ আবার বলিয়া উঠিলেন, মিন্টু, তুই রাগ করলি, কিন্তু তুই ভেবে দেখ্ দিকি, এসব কথা চেপে রাখা উচিত কি? শিক্ষিত লোক মাত্রকেই সমাজের গলদের কথাটা বলা উচিত, কারণ হয়তো ওঁরা ওর প্রতিকার করতে পারবেন। আমার মনে হয় খবরের কাগজে লেখালেখি করে সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। সম্ভব হলে এসব লোককে পুলিসের হাতে দেওয়া কর্তব্য। শরীরের কোথাও যদি ঘা হয়ে পচে যায়, সেটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে? আরে বাঃ! তাঁহার চশমার পুরু লেন্স দুইটি আলোকপাতে অত্যন্ত চকচক করিতে লাগিল। তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, না না, শোন তুমি। তোমার শোনা উচিত। প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের জানা উচিত, কী রকম পাজি সমাজে আমরা বাস করি। মিন্টুকে বিধবা হবার পর আমি তার আবার বিয়ে দিয়েছিলাম, সে এক রকম জোর করে। মিন্টুকে অনেক কষ্টে রাজি করালাম। মিন্টু যদিও রাজি হল, আত্মীয়-স্বজনেরা ঘোরতর আপত্তি করলেন। আমি দেখলাম, আরে বাঃ, আত্মীয়-স্বজনদের মন রাখতে গেলে নিজের বিবেককেই অগ্রাহ্য করতে হয়। লেখাপড়া শিখেছি তা হলে কিসের জন্য? পাত্রের জন্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম।

বলিয়া ভদ্রলোক একটু চুপ করিয়া আবার আরম্ভ করিলেন, একদিন সকালবেলা বসে আছি, একটি নিরীহ-গোছের লোক এসে দেখা করলেন। বললেন, আমার বিজ্ঞাপন তিনি দেখেছেন এবং আমার মেয়েকে বিয়েও করতে রাজি আছেন। তিনিই পাত্র, বুঝলে? বিধবা-বিবাহ নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা হল, ছেলেটির কথাবার্তা শুনে আমার বেশ ভালো লাগল। ছেলেটি দেখতেও বেশ ভদ্র নিরীহ। তারপর ছেলেটি বললে যে, বিধবা-বিবাহ করলে

কিন্তু আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে ত্যাগ করবে। এক রকম নিঃসম্বল নিঃসহায় হয়ে পড়তে হবে তাকে। সুতরাং কিছু পণ চাই, অন্তত পাঁচ হাজার টাকা না পেলে, তার পক্ষে এ বিবাহের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভবপর নয়। আমি ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিকই, সমাজকে তো চিনি। রাজি হয়ে গেলাম।

বৃদ্ধ আবার চুপ করিলেন।

মিন্টুর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, একমনে তরকারিই কুটিতেছেন। বৃদ্ধ আবার বলিয়া উঠিলেন, উঃ, সবই বরাত! আমার রোখ চড়ে গিয়েছিল। ছোকরাটি বললে, সে গোপনেই বিয়ে করতে চায়, তাতেও রাজি হয়ে গেলাম। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে যাবার মাস-খানেক পরেই ছোকরা একদিন নিরুদ্দেশ। কোনও পাত্তা নেই। তারপর শুনলাম এবং খোঁজখবর করে জানলাম যে, কথাটা সত্যি, ছোকরার আরও দু-দুবার বিয়ে হয়েছে, পত্নী দুটিও জীবিতা। ভেবে দেখ একবার। মিন্টু তারপর থেকে যে নিষ্ঠা শুরু করেছে, তা প্রায় আত্মহত্যারই সামিল, অর্থাৎ এই দারুণ গ্রীষ্মে নিরম্বু উপবাসটা, কিন্তু করবেই তো, মানে, ওর মনের অবস্থাটা—করবে না? আরে বাঃ!

বৃদ্ধ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম, আমি বুঝেছি সব। আপনি একটু স্থির হন।

স্থির হব বইকী। আমরা অতি ধীর স্থির বিচক্ষণ জাতি যে, আরে বাঃ, অস্থির হওয়া আমাদের ধাতেই নেই। একটু অস্থির প্রকৃতির হলে ওই জুয়াচোরটা এতদিন খুন হয়ে যেত, আর আমি এতদিন ফাঁসি যেতাম। কিন্তু আমরা রাজা-উজির মারি মুখে। সত্যি সত্যি মারি মশা আর ছারপোকা, ময়লা বিছানায় বসে বসে। আসল কাজ কিছু করতে পারি না। ইংলন্ডের মেয়েরা কত অসতী, তারই হিসেব করতে আমরা ব্যস্ত, আমরা—

এমন সময়ে ফেন উথলাইয়া জ্বলন্ত স্টোভটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। মিন্টু উঠিয়া সেই দিকে গেলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেদিকে একবার চাহিয়া আবার শুরু করিতেছিলেন। আমি কিন্তু উঠিয়া পড়িলাম।

মাখনবাবুদের রান্না বোধহয় হয়ে গেছে, এইবার আমি যাই।

বাহির হইয়া আসিলাম। আসিবার সময় মিন্টুর পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম, কিছু দেখা গেল না। নির্বাপিত স্টোভটার সম্মুখে আমাদের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া আছেন।

বাহিরে আসিতেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোকটির সহিত দেখা হইল।

তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

।। সাত।।

অতিশয় সসঙ্কোচে এবং অত্যন্ত সবিনয়ে মাড়োয়ারি ভদ্রলোক যে কথাটি আমাকে বলিলেন, তাহাতে শুধু বিস্মিতই নয়, চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িলাম। চলিতেছিলাম, দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল।

মাড়োয়ারিও দাঁড়াইলেন এবং উভয় হস্ত নাড়িয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে যে কথা আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, তাহার মর্মার্থ গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব না হইলেও

তদনুসারে কার্য করা সম্ভবপর ছিল না। সে কথা তাঁহাকে বলিতেই তিন তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করিলেন যে, আমাকে, মাখনবাবুকে এবং মাস্টার মহাশয়কে পান খাইবার জন্য কিছু দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন, কার্যটি কিন্তু করাইয়া দিতে হইবে।

ব্যাপার নিম্নলিখিতরূপ—

বন্‌শি হালুয়াই মাড়োয়ারিটির পূর্বপরিচিত। সহসা এতগুলি লোকের ক্ষুধা মিটাইবার সঙ্গতি বন্‌শি হালুয়াইয়ের নাই। সুতরাং এই মরসুমে শেঠজির সহিত বন্‌শির দেখা হইয়া যাওয়াতে রামজির কৃপাই প্রমাণিত হইয়াছে। ক্যাপিটালের জন্য আর তাহাকে ভাবিতে হইবে না। প্রাক্তন বন্ধু বন্‌শির উপকারার্থে শেঠজি শও দোশো খরচ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু তৎপূর্বে তিনি আমাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে চাহেন। অর্থাৎ তিনি চাহেন যে, আমি, মাখনবাবু এবং মাস্টার মহাশয় পান খাইয়া এমন একটা কাররোয়াই করি যে, ট্রেনখানা অন্তত আরও চব্বিশ ঘণ্টা যেন এখানে পড়িয়া থাকে। তাহা না থাকিলে অনর্থক এতগুলা টাকা খরচ করিয়া আটা, ঘিউ এবং তরকারির জন্য চার ক্রোশ দূরবর্তী সাধুগঞ্জের বাজারে যাওয়ার কোনও অর্থ হয় না। কাছাকাছি যত আটা, ঘি এবং তরকারি ছিল বন্‌শি সব কিনিয়া লইয়াছে এবং তাহাও নিঃশেষিত-প্রায়। সাধুগঞ্জে যাইবার জন্য সে শেঠজিকে পীড়াপীড়ি করিতেছে। শেঠজিরও যাইতে বিশেষ কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু তৎপূর্বে তিনি আমাদের কৃপা প্রার্থনা করেন। ইচ্ছা করিলে পান অবশ্য আমরা খাইতে পারি।

আমি জানাইলাম, আমাকে এসব কথা বলা বৃথা, কারণ আমিও একজন প্যাসেঞ্জার মাত্র। মাখনবাবু বা মাস্টার মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা নিতান্তই আকস্মিক।

ইহা শুনিয়া তিনি মোটেই বিচলিত হইলেন না। মৃদু মৃদু মাথা নাড়িয়া অর্ধনিমীলিত নেত্রে তিনি যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহার প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি এমন কোনও উক্তি করিলেন না, যাহা যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যায়। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, আমার সহিত মাখনবাবু ও মাস্টার মহাশয়ের যে কোনও সম্পর্ক নাই, তাহা তিনি অবগত আছেন। সমস্ত পাক্কা খবরই তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ইহাই সার বুঝিয়াছেন যে, আমি যদি মাখনবাবু ও মাস্টার মহাশয়কে একটু অনুরোধ করি, তাহা হইলেই কার্যটি নিষ্পন্ন হইয়া যায়। এ কথা তিনি ভালো করিয়া জানিয়াই তবে আমার নিকট আসিয়াছেন।

সামান্য পান খাইতে আপত্তি কি?

বুঝিলাম, এখানে সত্যভাষণ নিষ্ফল।

একটু কৌতুক-বোধও হইল।

বলিলাম, আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখছি।

বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একটু গিয়া দেখিলাম, তিনি পিছু পিছু আসিতেছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম যে, তিনি যদি পিছু পিছু আসেন, তাহা হইলে কিন্তু কার্যসিদ্ধি হওয়া শক্ত। এ কথায় জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হইল। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গ ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু যাইবার পূর্বে বলিয়া গেলেন যে, আমার দয়ার উপর ভরসা করিয়া তিনি তাহা হইলে সাধুগঞ্জের হাট অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

হাসিয়া উত্তর দিলাম, আচ্ছা।

নমস্কার।

ফিরিয়া দেখি সেই বেঁটে ভদ্রলোক। একটি লাল রঙের কোট বাহির করিয়া পরিধান করিয়াছেন। হাতেও একটি বেঁটে গোছের বর্মা-চুরুট। এত বেঁটে বর্মা-চুরুট ইতিপূর্বে দেখি নাই।

তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আগাইয়া গেলাম।

।। আট।।

কিছুদূর গিয়াই মাখনবাবুর সহিত দেখা হইল।

তিনি আমাকে ডাকিতে আসিতেছিলেন। দূর হইতেই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, ভীষণ কাণ্ড মশাই, শিগগির আসুন।

কি হল?

আরে, ওই যে মেয়েটা আপনি রেখে গেলেন, ও মুচির মেয়ে। ভাগ্যে রান্নাঘরে ঢোকেনি, ঢুকলে তো সব হাঁড়িকুড়ি ফেলে দিতে হতো! কি মুশকিল! অজ্ঞাত-কুলশীলকে এইজন্যেই আশ্রয় দিতে নেই, শাস্ত্রে বলেছে। আরে, না না, আপনাকে অত কাঁচুমাচু হতে হবে না। আপনার দোষ কি? বাইরে থেকে দেখে তো কিছু বোঝবার জো নেই আজকালকার দিনে—সবাই ফিটফাট।

আমি শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বুঝলেন কি করে?

আরে, সে নিজেই বললে কি না! এ ধারে মেয়েটি বেশ ইয়ে আছে।

নিজেই বললে?

হ্যাঁ। বিনু খাওয়ার জন্যে খুব জিদ করতে লাগল। তখন মেয়েটি বললে যে, আমি তা হলে আপনাদের থালা-গেলাস এঁটো করব না, সব জেনে-শুনে যদি এঁটো করতে দেন, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু আমার প্রথমেই আপনাদের জানানো উচিত যে, আমি মুচির মেয়ে। এই শুনেই তো বিনুর পিলে চমকে গেল।

বলিয়া মাখনবাবু হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটি এখন আছে কোথায়? আপনাদের বাড়িতেই?

মাখনবাবু আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, নো নো, সার্। ভয় নেই, সে নিজেই চলে গেছে।

কোথায়?

আলগোছে একখানা নিমকি খেয়ে সে ওই রাস্তাটা দিয়ে চলে গেল। বলে গেল, আমি গ্রামের ভেতরটা একটু ঘুরে আসি। জিনিসপত্র সব আমার বাসাতেই পড়ে আছে।

কি বলিব কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না।

মাখনবাবু অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন।

আজ সব মাটি হয়েছিল আর একটু হলে!

রামদীন ব্যাটা গ্রান্ড পাবদামাছ যোগাড় করে এনেছে, আর বিনু করেছে তার ঝাল। বিনুর হাতের ঝাল কোনওদিন খাননি, খেলে আর ভুলতে পারবেন না। সিম্প্লি বিউটিফুল। ও বেটি ছুঁয়ে দিলেই সব ভেস্তে গিয়েছিল আর একটু হলে।

মাখনবাবুর বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, চান করবেন তো আপনি?

ইচ্ছে তো আছে। কিন্তু এখন আবার কাপড়টা ভেজাব কি না ভাবছি।

কাপড় দিচ্ছি আমি মশাই, চান করুন। চান না করলে চলে এই গরমে?—বলিয়া মাখনবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম, মাখনবাবু বলিতেছেন, এ কি, পাবদামাছগুলো এখনও কিছু করনি? তোমাকে বলে গেলাম ঝাল করতে—

এ বেলা থাক না আর। কালকের বাসী মাছের টক তো আছে এক খোরা। পাবদাগুলো বরং ভেজে রাখি, ওবেলা হবে। শরীরটাও ভাল নেই, কেমন যেন জ্বর-জ্বর করছে।

না না, তা কি হয়? ভালো করে ঝাল কর মাছগুলোর। ভদ্রলোককে আমি বললাম যে, তোমার হাতের ঝাল খেলে তিনি জীবনে সে কথা ভুলতে পারবেন না।

আহা!

কর কর, বুঝলে?

উনুন তো নিবে গেছে। তোমার যত সব অনাছিষ্টি।

কুছপরোয়া নেই, রামদীনকে ডেকে দিচ্ছি।

আমি দেখিলাম, এ ভাবে দাঁড়াইয়া দাম্পত্যালাপ চুরি করিয়া শোনাটা ঠিক নয়। একটু সরিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম। মিনিট-খানেক পরেই মাখনবাবু একখানা কাপড়, গামছা এবং একটা চায়ের পেয়ালায় করিয়া খানিকটা তৈল লইয়া দর্শন দিলেন।

তেল মাখিতে মাখিতে প্রশ্ন করিলাম, কাছাকাছি পুকুর কোথাও আছে? একটা ডুব দিয়ে আসতাম তা হলে।

মাখনবাবু বলিলেন, খুব কাছাকাছি নেই। তবে একটু দূরে গেলেই, আধ মাইলটাক, একটা ভাল পুকুর পেতে পারেন। এই যে রাস্তাটা সোজা চলে গিয়ে ওই মন্দিরটার পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে, ওই রাস্তা। মন্দিরটার পাশ দিয়ে গিয়ে রাস্তাটা দু দিকে ভাগ হয়ে গেছে, আপনি বাঁ দিকেরটা ধরে সোজা চলে গেলেই পুকুর পাবেন। বেশ ভালো পুকুর। যান, তা হলে দেরি করবেন না।

মাথায় একটু তেল চাপড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, রাস্তার মোড়টায় যেখান হইতে আমাকে বাঁকিয়া পুকুরের রাস্তা ধরিতে হইবে, সেইখানটায় অনেকগুলি লোক জমিয়াছে এবং একটা গোলমাল হইতেছে।

দ্রুতপদেই যাইতেছিলাম, গতিবেগ আরও একটু বাড়াইলাম।

ভিড়ের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম, একটা গরুর গাড়ির একটা চাকা রাস্তার পাশের একটা গর্তে পড়িয়া রহিয়াছে। শীর্ণ গরু দুইটি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের সাধ্যে কুলাইতেছে না।

গাড়োয়ান সে কথা শুনিবে কেন?

তাহার হাতে লাঠি আছে, গায়ে শক্তি আছে। সে প্রাণপণে লাঠিবাজি ও গলাবাজি করিয়া লোক জমাইয়া ফেলিয়াছে। লোকও দেখিলাম জমিয়াছে অনেকগুলি, আবালবৃদ্ধবনিতা

সকলেই এই পাঁজর-বাহির-করা ঘাড়ে-ঘা বলদ দুইটির বদমায়েশি সকৌতুকে নিরীক্ষণ করিতেছে। আশ্চর্য পাজি গরু! এত মার খাইতেছে, তবু জোর করিয়া টানিয়া গাড়িটাকে গর্ত হইতে তুলিবে না।

পেজোমি তোদের বের করছি, থাম্।

ক্রুদ্ধ গাড়োয়ান তড়াক করিয়া লাফাইয়া পড়িল এবং গাড়ির সামনে গিয়া গরু দুইটির মুখের উপর নাকের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। গাড়োয়ান ও দর্শকবৃন্দ সকলেই হিন্দু। গোজাতির উপর তাহাদের শাস্ত্রীয় অধিকার আছে। বলিবার কিছু নাই।

গাড়োয়ানের হাত ব্যথা হয় নাই। সুতরাং সে হাত চালাইতেছিল। আমি আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলাম, ওহে, আর মেরো না। এসো, বরং আমরা সবাই মিলে ঠেলেঠুলে গাড়িটাকে তুলে দিই ওপরে।

আরে, থামেন বাবু আপনি। এ গরুকে আপনি চেনেন না। দেখুন না, আমি শায়েস্তা করে তবে ছাড়ব।

বলিয়া সে আবার মার শুরু করিল।

চোড় দেও। মৎ মরো।

দেখি, সেই কাবুলিওয়ালা আসিয়া হাজির হইয়াছে।

চোড়ো।

সে তাহার বলিষ্ঠ দেহ লইয়া আগাইয়া গেল এবং প্রথমেই গিয়া গরু দুইটাকে খুলিয়া দিল।

এই আগা সায়েব, কেয়া করতা?—বলিয়া গাড়োয়ান প্রথমটা একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কাবুলিওয়ালার মুখে সে যে ভাব দেখিল, তাহাতে সে আর বেশি কিছু বলা নিরাপদ মনে করিল না।

তুম আদমি নেহি, জানবার হ্যায়।

বলিযা কাবুলি গরু দুইটিকে হাঁকাইয়া নিকটেই বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল। এইবার সে আমাকে দেখিতে পাইল। সেলাম করিয়া সহাস্যে সে বলিল, আইয়ে বাবুসাব, থোড়া হাত লাগা দিজিয়ে।

বলিয়া সে নিজেই প্রথমে গিয়া জোয়ালে কাঁধ দিল। তাহার দেখাদেখি গাড়োয়ান এবং আরও দুই-একজন আগাইয়া গেল। আমি এবং আর বাকি সকলে গাড়িটার পিছন হইতে ঠেলিতে লাগিলাম। অনেক ঠেলাঠেলির পর গাড়িটা পথে উঠিল। কার্য সমাধা করিয়া কাবুলিওয়ালা পস্তু ভাষায় খানিকটা কি বলিয়া গেল, বুঝিলাম না, য, ঝ, এবং 'Z'-এর ঝড় বহিয়া গেল। পরিশেষে সে আমাকে আবার সেলাম করিয়া বিদায় লইল, কহিল, এ ট্রেনে সে যাইবে না, কারণ ট্রেন ছাড়িবার কোনওই ঠিক নাই। উপস্থিত সে গ্রামান্তরে যাইতেছে।

কাবুলিওয়ালা চলিয়া যাইবার পর গাড়োয়ান গজর গজর করিতে লাগিল।

উঃ শালা গোঁয়ার এসে আমার সব নয়-ছয় করে দিয়ে গেল! মাল গেছে পড়ে, একবেলা যাবে এখন কুড়োতে। এই এই, একটি দানায় কেউ হাত দিও না বলছি।

সত্যই পিছনের একটা ফাটা বস্তা হইতে কিছু ছোলা রাস্তার ধূলার উপর পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া কয়েকজন পড়িয়াছিল বোধহয় কুড়াইয়া দিবার জন্যই। কিন্তু গাড়োয়ান তাহাদের এই উপচিকীর্ষাকে আমল দিল না, দাঁত খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া গেল।

পার্শ্ববর্তী একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আগা সাহেব এই অঞ্চলেই থাকে নাকি?

সে বলিল যে, আগা সাহেব কোথায় যে থাকে, তাহা তাহার জানা নাই, তবে এই অঞ্চলে সে প্রায়ই ঘোরে। অনেকেই তাহার কাছে টাকা ধার লয়। অত্যন্ত চড়া সুদ। মাসিক টাকা প্রতি দুই আনা। তাহার পর নিম্নস্বরে সে জানাইয়া দিল যে, এই মঙ্গল গাড়োয়ানই তাহার নিকট টাকা ধারে। তাই তাহার কার্যে বাধা দিতে সাহস পাইল না। তাহা না হইলে—

আমার আর বেশি শুনিবার আগ্রহ ছিল না। মাখনবাবুর নির্দেশমত বাম দিকের রাস্তাটা ধরিয়া মাঠের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম।

কিছুদুর গিয়াই সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের বুক চিরিয়া একটি পায়ে-চলা সরু পথ বিসর্পিত রেখায় দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। কাছে দূরে কতকগুলি গরু চরিতেছে। পাশেই কয়েকটি রাখাল-বালক ডাংগুলি খেলিতেছে। তাহাদেরই একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, পুকুরটা কোন্ দিকে? তাহারা বলিল যে, সোজা কিছুদুর গেলেই পাওয়া যাইবে।

উদার বিস্তীর্ণ মাঠে চলিতে চলিতে মনটা কেমন যেন উদাস হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম, মেঘলেশহীন নীলাম্বর খর-রৌদ্রে পুড়িয়া যাইতেছে। বহু ঊর্ধ্বে চক্রাকারে কতকগুলি শকুনি উড়িয়া বেড়াইতেছে। একটা গরুর পিঠে একটা কাক বসিয়া তাহার পুরাতন ক্ষতটাকে ঠোকরাইয়া রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আরও একটু দূরে গিয়া দেখিলাম, বিস্ফারিত-চঞ্চু শালিক-দম্পতি আমাকে দেখিয়া উড়িয়া গেল।

রৌদ্র-দগ্ধ ধূসর মাঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছি।

পুষ্করিণী কতদূরে আছে, কে জানে!

।। নয়।।

স্নান সমাপন করিয়া উঠিয়াছি, এমন সময় মনে হইল, পুকুরের ওপারে সেই মেয়েটি যেন একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে বোধহয় দেখিতে পায় নাই। ওপারে একটা গাছের তলায় হেঁট হইয়া একমনে কি যেন কুড়াইতেছে। একটা কি যেন গাছ রহিয়াছে ওপারে।

সিক্ত কাপড়টি কাচিয়া গামছায় বাঁধিয়া ওপারের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। একটু দূরে গিয়াই বুঝিলাম, সেই মেয়েটিই বটে।

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN BENGAL

কল্যাণীয়েষু

সাবাস! তোমার 'কিছুক্ষণ' খুবই ভালো লাগল। উল্টে পড়া রেলগাড়ি যে অসংলগ্ন জনতা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে তার মধ্যে থেকে তুমি যথেষ্ট রস আদায় করে নি..ছ। এর মধ্যে ঝাঁজ আছে কম নয়, সেটা যে কেবল স্বাদের পক্ষে ভালো তা নয়, পথ্যও বটে। সমস্ত বইখানার মধ্যে কেবল প্রথম প্যারাগ্রাফটার উপর আমি কালীর আঁচড় না চালিয়ে থাকতে পারিনি। আমার বেহোঁস্ অবস্থায় তুমি যে বইখানি পাঠিয়েছিলে সেটা আমার চৈতন্যলোকের নেপথ্যে মারা গেছে।

তাং ২৪।১।৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাছাকাছি হইতেই মেয়েটি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল। আমি নমস্কার করিলাম। মেয়েটি প্রতি-নমস্কার করিয়া নীরব হইয়া রহিল। নীরবতা আমাকেই ভঙ্গ করিতে হইল। মেয়েটির বয়স কম, তাহাকে 'তুমি' বলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাহার মুখেচোখে এমন কি একটা আছে যে, বলিতে বাধে। বলিলাম, এখানে একা একা কী করছেন?

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, জাম কুড়োচ্ছি। কেমন সুন্দর জাম দেখুন তো!

সত্যই বেশ সুন্দর বড় বড় জাম। অনেকগুলিই সংগ্রহ করিয়াছে দেখিলাম।

খাবেন? নিন না!

না, এখন আর খাব না। আমাকে ভাত খেতে হবে এখুনি গিয়ে। চান করতে এসেছিলাম।

মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসিয়া বলিতে লাগিল, আমার জাতের কথা টের পেয়ে গেছেন বুঝি? ফলের বেলায় তো দোষ নেই শুনেছি। আমার মা ঝুড়ি করে জাম, বৈঁচি, কুল ফেরি করে বেড়াতেন।

না না, সে জন্যে নয়। আমার নিজের ওসব কোনও সংস্কার নেই। আচ্ছা, দিন দু-চারটে, তা না হলে আপনার বিশ্বাস হবে না।

জাম চিবাইতে চিবাইতে বলিলাম, এখানে একা একা কি করবেন? চলুন, স্টেশনের দিকেই যাওয়া যাক।

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল।

বাঃ, ওই দিকে একটা কি সুন্দর জাম পড়ে রয়েছে, দেখুন! থামুন, আনি ওটাকে।

পাশেই একটা কাঁটা-ঝোঁপের ভিতর একটা পাকা পুষ্ট জাম পড়িয়াছিল। মেয়েটি অতি সন্তর্পণে ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইয়া সেটিকে হস্তগত করিল।

বলিলাম, এইবার চলুন তা হলে।

আপনি যান। আমি এখন যাব না, একটু পরে আসছি।

ইহার পর আমার চলিয়া আসাই উচিত ছিল। কিন্তু মাখনবাবুর বাড়ি হইতে মেয়েটির অকস্মাৎ অন্তর্ধানে মনে আঘাত পাইয়াছিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে ইহাকে আবার এখানে পাইয়া ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিল না।

মুচির মেয়ে? মুচির ঘরে এমন মেয়ে হয়, তাহা আমার জানা ছিল না। মেয়েটির চোখে মুখে এমন একটা বুদ্ধির জ্যোতি রহিয়াছে, যাহা ভদ্র মেয়েদের মুখেও খুব বেশি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

একটু ইতস্তত করিয়া আবার বলিলাম, মাখনবাবুর স্ত্রী আপনাকে ঠিক কি বলেছেন জানি না, কিন্তু আমাদের সাধারণ হিন্দু-ঘরের প্রচলিত সংস্কার কাটিয়ে ওঠা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এটা আপনার বোঝা উচিত।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদের সুরে বলিল, না না, মাখনবাবুর স্ত্রী আমাকে তেমন কিছু তো বলেননি। বললেই বা কি করতুম? মুচির মেয়ে হয়ে এ দেশে এর চেয়ে আর বেশি কী সম্মান আশা করতে পারি, বলুন?

আমি বলিয়া ফেলিলাম, আপনাকে দেখে সত্যি কিন্তু মুচির মেয়ে বলে মনে হয় না।

সত্যি বলছি। মেয়েটি গাছের ও-পাশটায় সরিয়া গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোধহয় আর একটা জাম কুড়াইতে গেল। তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না। রঙিন কাপড়ের প্রান্তটুকু শুধু

দেখা যাইতেছিল। আমিও ঘুরিয়া গাছের ও-পাশটায় গেলাম। গিয়া বলিলাম, চলুন চলুন, এখানে একা নির্জন মাঠের মাঝে থাকা ঠিক নয়।

নির্জন জায়গাই আমাদের পক্ষে নিরাপদ। কেন আপনি আমাকে শুধু শুধু বিপদের মধ্যে ডেকে নিয়ে যেতে চাইছেন? প্লাটফর্মের ওপর অসভ্য এক দল ছেলে বিরক্ত করছিল, তাই দেখে আপনি নিয়ে গেলেন এক ভদ্রলোকের বাসায়। সেখান থেকেও ফিরে আসতে হল। তার চেয়ে আমি এইখানে বেশ তো আছি।

আপনি বেশ আছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আপনাকে এখানে এরকমভাবে ফেলে রেখে যেতে আমার কেমন ইচ্ছে হচ্ছে না।

না না, ও কিছু নয়। আপনি যান। আমার জন্যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন, এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

বেশ তো, ধন্যবাদ গ্রহণ করলাম; কিন্তু এবারে চলুন। আপনাকে এই মাঠের মাঝখানে একা ফেলে রেখে আমি যাব না। আপনি যদি না যান, এই আমিও বসলাম।

বলিয়া নিকটস্থ একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলাম।

একটি জাম মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া মেয়েটি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা একগুঁয়ে লোক তো আপনি! আমার জন্যে এতখানি কষ্ট স্বীকার আপনি কেন করছেন বলুন দেখি? হাড়ি-মুচির কত মেয়ে রাস্তায় ঘাটে কতভাবে তো রোজ অপমানিত হচ্ছে, সকলের জন্যে আপনি তো এতটা ব্যস্ত হন না! আমার জন্যেই বা এতটা ব্যস্ত হতে আমি দেব কেন আপনাকে? একজন নিচজাতীয়ার জন্যে ব্যস্ত হবার কারণই বা কী থাকতে পারে?

জাত আপনার যাই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। আপনাকে নিজেদের সমশ্রেণীর বলে মনে হচ্ছে, তার প্রধান কারণ বোধহয় আপনি ফরসা জামা-কাপড় পরে রয়েছেন।

আর কোনও কারণ নেই তো?

প্রশ্নটা শুনিয়া মনে মনে একটু লজ্জা পাইয়া গেলাম। মুখে বলিলাম, কারণ হয়তো অনেকগুলিই আছে। সবগুলো না-ই শুনলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

নিতান্তই ছাড়বেন না যখন, চলুন তবে।

চলুন।

নির্জন মাঠের ভিতর দিয়া খরা-রৌদ্রে দুইজনে হাঁটিয়া চলিয়াছি। দুইজনেই নির্বাক।

নীরবতাই ভাষাময় হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি করেন কি?

আমি পড়ি।

কি পড়েন? কোথায়?

কলকাতায়, মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ি।

ও, সেইজন্যেই ঠিক ডায়াগ্‌নোসিস করেছেন।

মেয়েটির মুখে ইংরাজি কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।

কিসের ডায়াগ্‌নোসিস?

থাক, ও কিছু নয়।

বলিয়া একটু হাসিয়ামেয়েটি চুপ করিয়া গেল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল।

কাহারও মুখে কথা নাই।

একটু পরে মেয়েটিই আবার কথা কহিল।

আপনাকে একটা কথা বলছি। কাউকে বলবেন না কিন্তু। আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি মুচির মেয়ে নই, আমি কায়স্থের মেয়ে।

দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

কায়স্থের মেয়ে? তবে আপনি নিজেকে মুচির মেয়ে বলে পরিচয় দিলেন কেন?

শুনিয়া মেয়েটি একটু হাসিয়া বলিল, আপনি মহাভারত নিশ্চয়ই পড়েছেন। কুন্তীপুত্র কর্ণ চিরকাল নিজেকে অধিরথসূত বলে পরিচয় দিতেন, তা জানেন তো? আমারও অবস্থা অনেকটাই তাই।

কী রকম?

দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? চলুন না, যেতে যেতে সব বলছি।

চলিতে লাগিলাম।

মেয়েটিও বলিতে লাগিল, আমার বাপ-মায়ের নাম আমি বলব না। কোথায় আমাদের বাড়ি, তাও আপনার জানবার দরকার নেই। এইটুকু শুধু জেনে রাখুন যে, ভদ্র কায়স্থ-ঘরে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমার মা উপর্যুপরি দশটি মেয়ে প্রসব করার পর আমাকে প্রসব করেছিলেন। আমাকে প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গে মা অজ্ঞান হয়ে যান। সেই সুযোগে আমার ঠাকুমা তখন নাকি আঁতুড়-ঘরেই আমাকে বিলিয়ে দেন—সেই ধাত্রী হাড়িনীকে। বাবারও নাকি তাতে মত ছিল। মায়ের জ্ঞান হবার পর মাকে জানানো হয় যে, একটা মরা মেয়ে হয়েছিল এবং তা ফেলে দেওয়া হয়েছে।

বলিয়া মেয়েটি হঠাৎ চুপ কবিয়া গেল।

তারপর?

তারপর আর কি? আমিই সেই একাদশ কন্যা।

এ রকম অসম্ভব কথা জীবনে কখনও শুনি নাই।

মেয়েটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? না হবারই কথা। এর একটি বর্ণ কিন্তু মিথ্যে নয়। খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল।

বলিবার কিছু ছিল না। মনে হইতেছিল, এসব প্রসঙ্গ না তুলিলেই বোধহয় ভাল হইত। মনে হইতেছিল, মেয়েটিকে অবিশ্বাস করিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যাইতাম। কিন্তু অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। সমাজকে তো চিনি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, হাড়ি আর মুচি এক নাকি? আপনি পরিচয় দিচ্ছেন মুচির মেয়ে বলে, অথচ বলছেন আপনার ঠাকুমা হাড়িনীকে—

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, আপনি ভুল লাইন ধরেছেন। ডাক্তার না হয়ে উকিল হলে আপনার বেশি পসার হত। ঠাকুমা বিলিয়ে দিয়েছিলেন হাড়িনীকে, হাড়িনী আবার আমাকে বিক্রি করে দেয় এক মুচিকে। মুচির বাড়িতেই আমি মানুষ হয়েছি, মুচি মায়ের দুধ খেয়েই আমার এই দেহ পুষ্ট।

আমার কিন্তু একটা বিষয়ে খুব আশ্চর্য লাগছে, মুচির বাড়িতে আপনি এ রকম শিক্ষা পেলেন কি করে?

কেন, মুচিরা মানুষ নয় নাকি?

মেয়েটির চোখে একটা ক্রূর ব্যঙ্গ যেন ক্ষণিকের জন্য মূর্ত হইয়া উঠিল।

মানুষ নয়, তা আমি বলছি না।

এই মুচি-মেথররা আধমরা ভদ্রলোকদের চেয়ে ঢের বেশি জীবন্ত, তা জানেন? তবে এটা ঠিক, মুচির ঘরে বরাবর থাকলে আমি লেখাপড়াও শিখতে পারতাম না, কিছুই না। ভাগ্যে ক্রিশ্চান মিশনারিরা এ দেশে এসেছিল, তাই আমাদের গতি হয়েছে।

আপনি ক্রিশ্চান নাকি?

হ্যাঁ, আমি ক্রিশ্চান। মিস মার্থা দাস এখন আমার নাম। আমি কিন্তু মুচির মেয়ে বলেই নিজের পরিচয় দিতে ভালবাসি—বিশেষত হিন্দু-সমাজে।

মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য একটা ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ যেন চকমক করিয়া উঠিল।

আপনাব বাপ-মা এখনও বেঁচে আছেন?

না, তাঁরা মারা গেছেন শুনেছি। অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছেন জানি না, খোঁজ নিতে প্রবৃত্তিও হয় না। ক্রিশ্চান মিশনারিদের কাছেই আমি মানুষ। তাদেরই আশ্রয়ে ছেলেবেলাটা আমার মাদ্রাজ অঞ্চলে কেটেছে, শুধু ছেলেবেলা কেন, এ দেশে আমি অল্প কয়েক দিনই হল এসেছি।

বাংলা ভুলে যাননি তো?

আমাদের এক মিশনারি মেম সুন্দর বাংলা জানতেন। তিনিই আমাকে বাংলা পড়িয়েছিলেন খুব যত্ন করে। তিনি বলতেন, আমি বাঙালির মেয়ে, বাংলাটা আমার ভাল করে শেখা উচিত। তাঁর কাছে আমি বাইবেলও যেমন পড়েছিলাম, রামায়ণ-মহাভারতও পড়েছিলাম। তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ না থাকলে আমার বাঙালিত্বও এতদিনে লোপ পেয়ে যেত।

জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দেশে আপনি ফিরে এসেছেন আবার কি সূত্রে?

একটু দরকার আছে।

বলিয়া মেয়েটি একটু যেন লজ্জিত হইল।

আমি আবার প্রশ্ন করিলাম, আপনি এ দেশের মেয়ে হয়ে মাদ্রাজে চলে গেলেন কী করে?

সে অনেক কথা। আমার মুচি বাবা আর মুচি মা এ দেশে অন্ন-সংস্থান না করতে পেরে মাদ্রাজের দিকে চলে যান একটা চাকরি পেয়ে। আমার বাবা জুতোর খুব ভাল কারিগর ছিলেন। সেখানেও কিন্তু তাঁরা সুখে থাকতে পারেননি। আমার বাবা অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। সে অনেক কথা। ক্রমে তাঁর চাকরিটি গেল। মহাকষ্ট। শেষকালে এক পাদ্রীর অনুগ্রহে শেষজীবনটা তাঁরা একটু শান্তি পেয়েছিলেন। সেই সময়েই আমরা সবাই ক্রিশ্চান হয়ে যাই।

স্টেশনের নিকটবর্তী হইয়াছিলাম।

মেয়েটি বলিল, এলাম তো আপনার সঙ্গে, এখন যাই কোথায় বলুন তো? সকলের ব্যবহার দেখে বড় কষ্ট পাই, সত্যি বলছি। নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে।

আমি বলিলাম, আপনি মাখনবাবুর বাসাতেই আসুন না। তাতে কী হয়েছে?

না না, মাপ করবেন, আমি এখন ওখানে যাব না। বিশেষত এখন আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার সময়।

মেয়েটি সোজা প্লাটফর্মের দিকেই আগাইয়া গেল। আমি মাখনবাবুর বাড়ির দিকে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, মাখনবাবু নিজেই রান্না করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। আমার সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ধোঁয়ায় দুই চক্ষু লাল, জল পড়িতেছে, কোমরে গামছা বাঁধা, কাপড়ে হলুদের ছোপ, হাতে হাতা। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনার দেরি দেখে একটু পায়েস চড়িয়ে দিলাম। হয়ে গেল বলে, আর দেরি নেই, টেন মিনিট্স।

বলিয়া আবার তিনি ধূমাচ্ছন্ন রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। রান্নাঘর হইতেই চিৎকার করিয়া বলিলেন, আমার ঘরে টেবিলের ওপর আয়না চিরুনি আছে।

ঘরে ঢুকিতেই মাখনবাবুর স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মনে হইল, তিনি যেন শুইয়া ছিলেন। শুনিলাম, তাঁহার শরীর খারাপ।

।। দশ।।

আহারাদির পর দেখা গেল, বেলা তিনটা বাজিয়াছে। পাবদামাছের ঝাল সত্যই ভাল হইয়াছিল। পান চিবাইতে চিবাইতে মাখনবাবু বলিলেন, আপনি একটু বসুন সার্, আমি দেখে আসি, রামদীন ব্যাটা কতদূর কি করলে! আপনি শুয়ে পড়ুন না ততক্ষণ।

আমি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, আপনার স্ত্রীর খাওয়া হয়ে গেছে কি? তাঁর শরীরটা ভাল নয় শুনলাম।

হ্যাঁ, শরীরটা তেমন সুবিধে নেই, বলছিল। মুড়ি দিয়ে তো পাশের ঘরটায় শুয়েছে। জ্বর-টর এসেছে বোধহয়। ম্যালেরিয়ায় তো প্রায় ভোগে। আচ্ছা, দেখি, দাঁড়ান।—বলিয়া মাখনবাবু পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

একটু পরে পাশের ঘর হইতেই আমাকে ডাকিলেন, শুনে যান।

গেলাম। গিয়া দেখি, মাখনবাবুর স্ত্রী জ্বরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন। কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, গা পুড়িয়া যাইতেছে।

মাথায় জলপটি দিয়া হাওয়া করিতে লাগিলাম। শশব্যস্ত হইয়া মাখনবাবু বলিলেন, সিরিয়াস বুঝছেন নাকি কিছু?

না, জ্বরটা একটু বেশি হয়েছে কিনা, তাই ওই রকম করে রয়েছেন। কুইনিন পাওয়া যাবে এখানে?

ছিল তো আমার কাছেই কয়েকটা গুলি। দেখি, দাঁড়ান। ও-ঘরে র‍্যাকটায় ছিল, মনে হচ্ছে।

আপনি আগে মাথায় জল দিয়ে ভাল করে বাতাস করুন। আমি দেখছি র‍্যাকটা খুঁজে। ফিরিয়া আসিয়া র‍্যাকটা খুঁজিয়া দেখিলাম' একটি খালি কুইনিনের টিউব রহিয়াছে। কুইনিন নাই।

মাখনবাবু এই শুনিয়া ও-ঘর হইতেই চিৎকার করিয়া বলিলেন, মাস্টার মহাশয়ের বাসায় পাওয়া সম্ভব। মাস্টার মহাশয়ের বাসাতে গেলাম। পাশের বাড়ি। সেখানে গিয়া দেখি, মাস্টার মহাশয় বাসায় নাই, স্টেশনে গিয়াছেন। একটি দশ বছরের ছেলে বাসা হইতে বাহির হইয়া এই খবরটি দিল। তাহাকে বলিলাম যে, মাখনবাবুর স্ত্রীর খুব জ্বর হইয়াছে, বাড়িতে যদি কুইনিন থাকে একটু চাই। খোকা বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই কুইনিন-পিল কয়েকটা

লইয়া হাজির হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম, একটি আধময়লা-কাপড়-পরা আধঘোমটা-দেওয়া মহিলাও বাহির হইলেন এবং একটু দূরে আমার পিছু পিছু আসিতে লাগিলেন।

মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী বোধহয়।

ফিরিয়া দেখি, মাথায় জল দেওয়াতে বিনুর জ্ঞান হইয়াছে। মাখনবাবু প্রাণপণ শক্তিতে হাওয়া করিয়া চলিয়াছেন।

পেলেন কুইনিন সার্?

হ্যাঁ, পেয়েছি।

মাস্টার মশায়ের হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, এই যে স্বয়ং লক্ষ্মীও এসে হাজির হয়ে গেছেন দেখছি। আসুন বউদি, চাঙ্গা করে তুলুন। এসব আমার কর্ম নয়।—বলিয়া মাখনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী বিনুর শিয়রে গিয়া বসিলেন।

ব্যাস্, নিশ্চিন্দি! এইবার দেখা যাক, রামদীন ব্যাটা কতদূর কি করলে! হ্যাঁ, কুইনিনটা কি এখনই দিয়ে দিতে হবে?

দিলেই ভালো হয়, দুটো পিল দিন।

আমার হাত হইতে কুইনিনের পিলগুলি লইয়া মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রীর হাতে সেগুলি দিয়া মাখনবাবু বলিলেন, শুনলেন তো? দুটো পিল দিয়ে দিন এখুনি, জাস্ট নাউ। বুঝলেন?

মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী ঘাড় কাত করিয়া জানাইলেন যে, তিনি বুঝিয়াছেন; এবং ফিসফিস করিয়া বলিলেন যে, আমরা বাহিরে গেলেই তিনি পিল দুইটি খাওয়াইয়া দিবেন।

মাখনবাবু আমাকে বলিলেন, চলুন সার্, তবে বাইরে যাই। বউদি এসে গেছেন যখন, তখন আর কিছু দেখবার দরকার নেই। কিছুক্ষণ পরে চাই কি উনি চা-ও খাইয়ে দেবেন আমাদের।

ফিসফিস করিয়া বউদি আবার বলিলেন, ও-বাড়িতে যান না, চায়ের জল বসানোই আছে। খোকনকে বললেই সে সব ঠিক করে দেবে।

সস্মিত দৃষ্টিতে মাখনবাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, শুনলেন তো?

চলুন আমরা বাইরে যাই।—বলিয়া আমি মাখনবাবুকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলাম। মাখনবাবু বলিলেন, রামদীন ব্যাটা কতদূর কি করলে, একবার দেখতে হচ্ছে। ব্যাটাকে একটা টাকা দিয়েছি তো অনেকক্ষণ হল।

কেন?

ড্রাইভার ব্যাটাকে যদি ফুসলে-ফাসলে মদ খাওয়াতে পারে।

হঠাৎ আমার মনের ভিতরটাতে কে যেন একটা মোচড় দিয়া গেল। এই চক্রান্তে সত্যই যদি ড্রাইভারের চাকরিটা যায়? আমি অনর্থক ইহার মধ্যে নিজেকে জড়াইলাম কেন? নিতান্ত নিরীহ একটা লোককে ষড়যন্ত্র করিয়া এমনভাবে—

কি ভাবছেন সার্?

কিছু না।

এমন সময়ে দূরে দেখা গেল, সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া আবার সেলাম করিলেন। ইহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সব মনে পড়িয়া গেল। মাখনবাবুকে বলিলাম, আবার এক ফ্যাসাদে পড়েছি মশাই।

কি ফ্যাসাদ?

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা মাখনবাবুকে বলিলাম। মাখনবাবু নির্বিকারচিত্তে বলিলেন, কত টাকা দিতে চায়?

সে দরদস্তুর তো করিনি। টাকা নেবেন নাকি সত্যি?

সার্‌টেন্‌লি। টাকা পেলে ছাড়তে আছে?

বলিয়া মাখনবাবু হাতছানি দিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। মাড়োয়ারি ভদ্রলোকও ইহারই জন্য ওত পাতিয়া ছিলেন বলিয়া মনে হইল। আমি বলিলাম, আপনারা তা হলে কথাবার্তা চালান। আমি প্লাটফর্মটার খবর নিয়ে আসি একবার। সেই মেয়েটি আবার ফিরে এসেছে, জানেন তো?

কোন্ মেয়েটি? সেই মুচির মেয়ে?

হ্যাঁ।

কেমন করে জানলেন আপনি?

পুকুরধারে ছিল। আমার সঙ্গেই ফিরে এসেছে, প্লাটফর্মের দিকে গেছে। খবর নিয়ে আসি একবার।

মুচির মেয়েকে নিয়ে আর অত বেশি মাখামাখি করবেন না। ওসব টেন্ডেন্সি ছাড়ুন। মরুকগে ও।

না, মাখামাখি করব কেন? আপনি শেঠজির সঙ্গে ততক্ষণ আলাপ করুন না। আমি এখনই ফিরে আসছি।

শেঠজি আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

মাখনবাবু তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। আমি প্লাটফর্মের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্লাটফর্মে ঢুকিয়া একটা হাসির হর্‌রা শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম, সেই ছোকরার দল হাসিতেছে। হাসির উপকরণ এবারে তাহারা নিজেরাই সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাদের নিজেদের মধ্যেই একজন দেখিলাম ঘোমটা দিয়া বউ সাজিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে একটি ছোকরা অঙ্গভঙ্গি সহকারে গাহিতেছে—

কাদের কুলের বউ গো তুমি,
কাদের কুলের বউ?

বাকি সকলে হো-হো করিয়া হাসিতেছে।

একটু দূরে একটা গাছতলায় দেখিলাম, সেই ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান দম্পতি বেশ গুছাইয়া বসিয়াছেন। একটা বেতের বাক্স হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি বাহির হইয়াছে। পাউরুটি, মাখন এবং একটা জ্যামের শিশি—দূর হইতেই বেশ দেখা যাইতেছে। লাল চোঙওয়ালা একটা সস্তা গ্রামোফোনে একটা বিলাতি প্রচলিত গৎ বাজাইয়া তাঁহারা ভোজন-ব্যাপারে ইউরোপীয় আবহাওয়া সৃষ্টিরও প্রয়াস পাইয়াছেন দেখিলাম। কতকগুলি অর্ধনগ্ন গ্রাম্য বালক-বালিকা কিছুদূরে দলবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া এই ক্রিশ্চান দম্পতির সঙ্গীতময় ভোজন-বিলাস সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতেছে।

সেই মেয়েটিও সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছে দেখিলাম। ধর্মগত মিল থাকাতে আলাপ-পরিচয়ে বেশ একটা হৃদ্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

উহাদের নিকট যাওয়া সঙ্গত হইবে কি না চিন্তা করিতেছি, এমন সময় মাখনবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া বলিলেন, একটু তাড়াতাড়ি আসুন সার্‌। বড় বিপদে পড়েছি, রামদীন ব্যাটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমাদের এনকোয়্যারিং-অফিসার এখুনি আসছেন ট্রলি করে। ড্রাইভারটারও পাত্তা নেই।

আমি তার কী করব?

আহা, আসুন না আমার সঙ্গে। ওদিকে চা-ও হয়ে গেছে। নিন, একটা সিগ্রেট নিন। মাথা ঠিক রাখুন এ সময়ে। আপনি ঘাবড়ালেই তো গেছি আমরা।—বলিয়া তিনি ফস করিয়া একটা দিয়াশলাই জ্বালায়া ধরিলেন, আসুন সার্‌, চলুন, নো টাইম টু লুজ।

মহাবিপদে পড়িয়াছি এ ভদ্রলোককে লইয়া। অথচ এড়াইবারও উপায় নাই।

গেলাম সঙ্গে।

বাহিরে আসিতেই কনুই দিয়া আমাকে একটা খোঁচা দিয়া মাখনবাবু সহাস্যে বলিলেন, টোপ গিলিতং?

তার মানে?

তার মানে শ্রীমান ড্রাইভারচন্দ্র খুব টেনে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন ওই ওদিককার গুমটির ধারে। আপনার প্ল্যান কোয়াইট সাক্‌সেসফুল।

রামদীন কোথায়?

চা করছে, আসুন।

আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?

বিনু অল রাইট। বললাম তো, বউদি যখন গেছেন, তখন নো ফিয়ার।

নিজেকে আবার কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। ড্রাইভারটার যদি চাকরি যায়! এ কী ষড়যন্ত্রের মধ্যে নিজেকে অনর্থক জড়াইলাম!

ওদিকে নয় সার্‌, এদিকে আসুন, চা হচ্ছে মাস্টার মশায়ের বাসায়।

উভয়ে মাস্টার মহাশয়ের বাসাতে প্রবেশ করিলাম।

।। এগারো ।।

প্লাটফর্মের কোলাহলটা যেন হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল।

সায়েব এল বোধহয়।

মাখনবাবু উদ্বিগ্ন মুখে উঠিয়া পড়িলেন।

মাস্টার মহাশয় ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া চক্ষু মিটমিট করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, আপনারা বসুন। আমি দেখে আসি চট করে, ব্যাপারটা কী?

মাখনবাবু বলিলেন, যাবার সময় আপনি রামদীনটাকে একটু পাঠিয়ে দিয়ে যান তো। একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে রাখা দরকার ব্যাটাকে।

আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, রামদীন দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ভিতরে যাইতে বলিয়া সোজা প্লাটফর্মের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। প্লাটফর্মে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল।

দেখিলাম, সেই ক্রিশ্চান মেয়েটিকে ঘিরিয়া আবার সেই অশিষ্ট যুবকদল মহাকলরব শুরু করিয়াছে। আমি আগাইয়া আসিয়া বলিলাম, আবার আপনারা ওঁকে অপমান করছেন?

সেই ট্যারা ছোকরাটি ছিল।

সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, কিছু অপমান করিনি মশাই। ভিড়ে যেতে যেতে ওঁর গায়ে আমার একটু গা ঠেকে গিয়েছিল, উনি হঠাৎ আমাকে গালাগালি দিয়ে বললেন, ইডিয়ট। আমি বরং ভালভাবে বললাম, দয়াময়ী রাগ করছ কেন, দয়া কর, দয়া পরম ধর্ম।

বলিয়া ছোকরা ফিক করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। ছোকরার মুখের হাসির উপরই একটি প্রচণ্ড চড় বসাইয়া দিলাম। আর একটি ছোকরা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, তাহাকেও এক ঘা দিলাম।

ছি ছি, মারামারি করবেন না ওসব ছোটলোকদের সঙ্গে। আসুন, বাইরে আসুন।

আমার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ভীরুর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। আরও নানা লোক আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া নানারূপ প্রশ্নে আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। আমি এদিক ওদিক চাহিয়া মেয়েটিকে দেখিতে পাইলাম না। একটু দূরে দেখিলাম, লাল কোট পরিয়া সেই বেঁটে ভদ্রলোকটি আমার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া আরও দুই-তিনজন লোককে কী যেন বলিতেছেন।

আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন এবং মুখে একটা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, নমস্কার দারোগাবাবু। এবং সরিয়া দাঁড়াইলেন।

মেয়েটি কোন্ দিকে গেল দেখেছেন?

তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, মেয়েটি গেট দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং তাহার পর আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

পুলিসের লোকের সহিত বেশি বাক্যালাপ করাটা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না বোধহয়।

বাহিরে গেলাম।

বাহিরে গিয়াই মাখনবাবুর সঙ্গে দেখা।

সায়েব এল নাকি?

না। সেই মেয়েটি কোথা গেল, দেখেছেন?

হ্যাঁ, সে তো আমার বাসায় গিয়ে ঢুকল ফের। আমি দাঁড়িয়েছিলাম মশাই, কিছু বলতে পারলাম না। মহা মুশকিল হল দেখছি, জাত-জন্ম আর কিছু রইল না।

এমন সময় হঠাৎ তিনজন সাহেব আসিয়া হাজির। একজনের কাঁধে রক্তাক্ত একটা বুড়ি।

এ কী কাণ্ড!

সাহেবেরা প্রথমেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নিকটে কোনও ডাক্তার আছে কি না? কাছাকাছি হাসপাতালই বা কতদূর?

মাখনবাবু শশব্যস্ত হইয়া মাস্টার মহাশয়কে ডাকিয়া দিলেন। সাহেবের নাম শুনিয়া মাস্টার মহাশয় তাড়াতাড়ি টুপিটা মাথায় দিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে আসিয়া হাজির হইলেন। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিলাম।

সাহেবেরা তিনজন সেই ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী। নিকটবর্তী ঝিলে পক্ষী-শিকার করিতে

গিয়াছিলেন। এই ঘুঁটে-কুড়ানি বুড়িটা ঝিলের ধারে গোবর কুড়াইয়া বেড়াইতেছিল। এক সাহেবের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বুড়িকে লাগিয়াছে।

সাহেবেরা মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

স্টেশন মাস্টারকে বলিতেছেন শুনিলাম, যত টাকাই খরচ হউক না কেন, বুড়িকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

হাসপাতাল কতদূর?

মাস্টার মহাশয় জানাইলেন, প্রায় মাইল চারেক দূরে একটি সরকারি হাসপাতাল আছে।

সাহেবরা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাছাকাছি আর কোনও মেডিকেল হেল্‌প পাওয়া সম্ভব কি না? আর কোনও ডাক্তার নেই?

মাখনবাবু হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, হিয়ার ইজ ওয়ান মেডিকেল কলেজ স্টুডেণ্ট সার, ভেরি এক্সপার্ট।

আমাকে আগাইয়া আসিতে হইল।

বুড়িকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম যে, যদিও গুরুতর, কিন্তু হাসপাতালে লইয়া গিয়া উপযুক্ত চিকিৎসাদি করিলে বাঁচিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। বাহিরে ইহার চিকিৎসা হইতে পারে না, বিশেষত এ স্থানে।

এই কথা শুনিবামাত্র একটি কুলিকে সঙ্গে লইয়া সাহেব তিনজন চার মাইল দূরবর্তী হাসপাতাল অভিমুখে পদব্রজে রওনা হইয়া গেলেন। পালকি কিংবা ডুলি না পাওয়া যাওয়াতে বুড়িকে কাঁধে করিয়াই তুলিয়া লইয়া গেলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে মাখনবাবু বলিলেন, দেখলেন শালার ব্যাটাদের কাণ্ড!

মাস্টার মহাশয় ঊর্ধ্বনেত্র মিটমিট করিয়া বলিলেন, পুলিশ কেস হলে আবার সাক্ষী-ফাক্ষি দিতে না হয়! এ এক ভারি হাঙ্গামায় পড়া গেল দেখছি।

এমন সময় স্টেশন-প্লাটফর্মে আবার এক কলরব শোনা গেল। রামদীন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে, ট্রলি করিয়া দুইজন সাহেব আসিয়াছেন।

মাস্টার মহাশয়ের টুপি পরাই ছিল। তিনি সোজা চলিয়া গেলেন।

মাখনবাবুও পিছু পিছু গেলেন।

আমিও গেলাম।

একজন খাঁটি শ্বেতাঙ্গ, আর একজন ব্রাউন রঙের। তবে ব্রাউন রঙের হইলেও তিনি একজন পদস্থ অফিসার, তাহা মাস্টার মহাশয় ও মাখনবাবুর ব্যবহারে বোঝা গেল।

মাস্টার মহাশয় দেখিলাম হাত কচলাইতেছেন ও ভুল ইংরাজিতে বলিতেছেন যে, দোষ ড্রাইভারের। সে লোকটা মাতাল অবস্থায় সিগন্যাল অগ্রাহ্য করিয়া ফুল ফোর্সে স্টেশনে ট্রেন ইন করাইয়াছিল।

শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি মুখ হইতে পাইপ নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও যাত্রী জখম হইয়াছে কি না? হয় নাই শুনিয়া নিশ্চিন্ত মনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ড্রাইভার কোথায়?

মাখনবাবু বলিলেন, সে মত্ত অবস্থায় গুমটির ধারের রাস্তায় শুইয়া আছে। ট্রেন ডিরেল্‌ড হবার পর সে ক্রমাগত মদ খাইতেছে।

সাহেব বলিলেন, লেট আস সি হিম।

সকলে অগ্রসর হইলাম।

গেট হইতে বাহির হইয়া কিছুদুর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে মাখনবাবুর বাসা হইতে সেই খ্রিস্টান মেয়েটি বাহির হইয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল, হ্যালো পল, ইউ আর হিয়ার! বাই গড! হ্যাভ ইউ বিন ট্রান্সফার্‌ড?

মার্থা! হোয়াট ব্রিংস ইউ হিয়ার?

আই ওয়াজ অন মাই ওয়ে টু ইউ?

ব্রাউন রঙের সাহেবটি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

মার্থা তখন আসিয়া সোচ্ছ্বাসে বর্ণনা করিতে লাগিল যে, তাঁহাকে আশ্চর্য করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে কোনও খবর না দিয়াই তাঁহার কাছে যাইতেছিল। হঠাৎ পথে এই বিপদ।

তাহার পর তাহারা গল্প করিতে করিতে আগাইয়া গেল। তাহাদের কথাবার্তা আর শুনিতে পাইলাম না। শ্বেতাঙ্গ সাহেবটিও দেখিলাম সহাস্যমুখে হ্যাটটা একটু খুলিয়া মার্থাকে অভিবাদন করিলেন।

মাখনবাবু চুপচুপি আমার কানে কানে বললেন, সারলে দেখছি সার্! ওই সাহেব হচ্ছে পি ডব্লিউ আই। এ মেয়েটার সঙ্গে বেশ ভাব আছে দেখছি। মাগী আমাদের নামে না লাগায়! আমি কোন উত্তর দিলাম না।

আমার কিছু ভাল লাগিতেছিল না।

গুমটির নিকট পৌঁছিয়া দেখা গেল, ড্রাইভার রাস্তার ধারে শুইয়া আছে। পাশে একটা মদের বোতলও রহিয়াছে। তাহার একজন অর্ধমত্ত সঙ্গী তাহার নিকট বসিয়া তাহাকে উঠাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ড্রাইভার কিন্তু বেহুঁশ। শুধু বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে।

কাছেই একটা ঝোপের ধারে দেখিলাম, সেই ফুটফুটে বেণী-দোলানো মেয়েটি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া একটা প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সহসা এতগুলি লোকের সমাগমে সে অন্যমনস্ক হইয়া গেল, প্রজাপতি উড়িয়া গেল!

সাহেবরা গিয়া ড্রাইভারকে দেখিতে লাগিলেন। ভাঙা হিন্দিতে শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি ড্রাইভারের সঙ্গীটিকে প্রশ্ন করিলেন, ড্রাইভার কখন হইতে মদ খাইতেছে? সে সত্য কথাই বলিল। সে বলিল, এখানে ট্রেন ডিরেল্‌ড হইবার পর তবে তাহারা মদ খাইয়াছে। স্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান রামদীন সাক্ষী আছে।

স্টেশন মাস্টার চক্ষু মিটমিট করিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, অল ফলস্।

অবিশ্বাস করিবার কিছু ছিল না।

হঠাৎ সেই ব্রাউন রঙের সাহেবটি মাখনবাবু ও আমার দিকে ফিরিয়া ইংরাজিতে বলিলেন, এই বিপদে আমরা তাঁহার বাগ্‌দত্তা পত্নীর প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহার জন্য তিনি আমাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ওই মেয়েটি ইঁহার বাগ্‌দত্তা পত্নী!

মাখনবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল।

তিনি ও মাস্টার মহাশয় উভয়েই নত হইয়া এখানে তাহাকে সেলাম করিলেন।

সাহেবেরা কার্য শেষ করিয়া আবার স্টেশনের দিকে ফিরিলেন। আমার আর স্টেশনে ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। মাখনবাবুকে বলিলাম, আমি একটু বেড়িয়ে আসি। আপনারা যান।

সকলে চলিয়া গেলে আমি ড্রাইভারের সেই মুসলমান সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওই সবুজ ওড়না-পরা মেয়েটি কাহার? মেয়েটি দেখিলাম একটু দূরে আবার প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটি বলিল, মেয়েটি এই ড্রাইভারেরই মা-মরা মেয়ে। বাপ যখন যেখানে যায়, প্রায়ই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

সংবাদটা শুনিয়া কেমন যেন হইয়া গেলাম। অজ্ঞাতসারে ইহার কি সর্বনাশটাই করিয়াছি! একবার ভাবিলাম, সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিই। কিন্তু মাখনবাবুর কথা স্মরণ করিয়া তাহা পারিলাম না।

অন্যমনস্কভাবে মাঠের দিকে অগ্রসর হইলাম।

।। বারো।।

কতক্ষণ হাঁটিয়াছিলাম খেয়াল ছিল না। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এক নিস্তব্ধ প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। জটিল শাখা-প্রশাখাময় বিরাট কী একটা গাছ দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র তাহার আড়ালে উঠিতেছে দেখিতে পাইলাম। কোথাও একটু বসিতে পাইলে যেন বাঁচিতাম।

পা দুইটা ব্যথা করিতেছিল।

ধীরে ধীরে গাছটার দিকেই অগ্রসর হইলাম। গাছের নিকটবর্তী হইতেই তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে অন্ধকারকে চিরিয়া একটা শকুনি ডাকিয়া উঠিল। ডানার ঝটপট শুনিয়া বুঝিলাম, এই গাছেই বোধহয় শকুনিদের বাসা আছে।

দূরে কোথায় একটা ফেউ ডাকিতে লাগিল। গাছটার ও-পাশে গিয়া দেখি, একটা উঁচুমত ঢিবি রহিয়াছে। তাহাতেই উঠিয়া বসিলাম। উঠিয়া বসিয়া পূর্ব দিগন্তে চাহিয়া রহিলাম। চাঁদ উঠিতেছে। আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই। ফাঁকা মাঠে ঝিরঝির করিয়া সুন্দর বাতাস বহিতেছে।

একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। তবু কিন্তু ভালোই লাগিতেছিল। চাঁদ আর একটু উঠিলে দেখিতে পাইলাম, একটু দূরে একটা ছোট নদীও রহিয়াছে। ঢিবি হইতে নামিয়া সেই দিকেই গেলাম। শীর্ণস্রোতা নদীটির উপর ক্ষীণ জ্যোৎস্না পড়িয়া সেই নির্জন প্রান্তরে এমন একটা শোভার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

সেই নদীর ধারেই একটি ফাঁকা জায়গা বাছিয়া বসিলাম। হঠাৎ সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাণ্ড উল্কাপাত হইয়া গেল। সমস্ত মাঠটা আলোকিত হইয়া উঠিল।

সমস্ত দিনের অবসাদে শরীর মন ক্লান্ত। মাঠের মাঝে হাওয়াটুকু বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল। লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

ভাবিলাম, একটু বিশ্রাম করিয়া স্টেশনের দিকে যাওয়া যাইবে।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখি, একটু দূরে দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। কাছেই কতকগুলি লোক বসিয়া আছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

লোকগুলির নিকটে গেলাম।

ইহারা মড়া পোড়াইতেছে। যাহা জ্বলিতেছে, তাহা চিতা। আমি এতক্ষণ শ্মশানে শুইয়া ছিলাম।

রাত্রি কত হইয়াছে?

একজন বলিল, বারোটা হবে!

বারোটা?

স্টেশনের দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইলাম।

স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি, চারিদিকে নিস্তব্ধ। মাখনবাবু টেলিগ্রাফ-ঘরে টক্কা-টরে করিতেছেন। সমস্ত যাত্রীদের লইয়া ট্রেন চলিয়া গিয়াছে।

একজনও নাই।

আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যাহাদের লইয়া সমস্ত দিন এত উৎসাহে এত আগ্রহে এত সত্যমিথ্যার জাল বুনিতেছিলাম, তাহারা অতর্কিতে এমন করিয়া ফেলিয়া গেল! আর জীবনে দেখা হইবে না।

ধীরে ধীরে মাখনবাবুর কাছে গেলাম।

মাখনবাবু বলিলেন, অনেকক্ষণ আপনি বেড়ালেন তো সার্? আপনারও ট্রেন এল বলে। সিগন্যাল দিয়েছে। আপনার জন্য রুটি করিয়ে রেখেছি। খাবেন কি? সময় কিন্তু নেই।

থাক, দরকার নেই।

আচ্ছা, ওয়েট এ মিনিট, আপনার সঙ্গে খাবারগুলো বেঁধে দিই না হয়।

শশব্যস্ত হইয়া মাখনবাবু চলিয়া গেলেন। আমি একা নির্জন প্লাটফর্মে সিগন্যালটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ওই ট্রেন আসিতেছে। একটু পরেই আমিও আর এখানে থাকিব না।
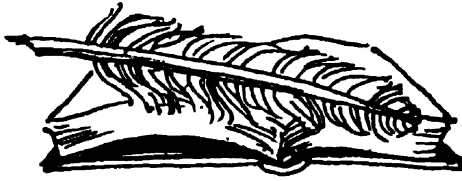
হাটে বাজারে

।। এক ।।

ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য মাছের বাজারের সামনে তাঁর মোটরটি থামালেন। তারপর ড্রাইভার আলীর দিকে চেয়ে বললেন—"গাড়ি বাঁয়ে দাবাকে রাখ্‌খো। আর টিফিন-কেরিয়ার ঠো লেকে হামারী সাথ আও।"

"বহুত খু—"

বাঁ দিকের গলি দিয়ে মাছের বাজারে ঢুকলেন সদাশিব। গ্রীষ্মকাল। একটা বেজে গেছে। মাছের বাজার উঠে গেছে প্রায়। একটা বুড়ী মেছুনী কানা-উঁচু পরাতের মতো একটা টুকরিতে কিছু ভোলা মাছ নিয়ে বসে আছে তখনও। মাছগুলোর পেট বেলুনের মতো ফোলা।

অসময়ে ডাক্তারবাবুকে বাজারে দেখে সে একটু শশব্যস্ত হয়ে উঠল। একটু আগেই তো ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, আবার এলেন কেন! আলি টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে পিছু-পিছু আসছিল, সে নীরবে তার বাঁ হাতের তর্জনী এবং মধ্যমা সংযুক্ত করে ঠোঁটের উপর রাখল, তারপর চোখের ভঙ্গী করে জানিয়ে দিল--টুঁ শব্দটি কোরো না।

সদাশিব ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকে প্রশ্ন করলেন—"আবদুল কোথা—"

"আবদুল? গুদামে আছে বোধ হয়। কিংবা হয়তো বাড়ি চলে গেছে।"

"আলী দেখ তো—"

"বহুত খু—"

আলী সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বন্‌বন্ করে চলে গেল গুদামের দিকে। আলীর ধরন-ধারণ হাব-ভাব অনেকটা সার্কাসের ক্লাউনের মতো। সদাশিব টিনের শেডের ছায়ার আর একটু সরে গেলেন। তারপর মেছুনীর দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন—"তোর নাতনী কেমন আছে—"

"ভালো আছে ডাক্তারবাবু"

"যে-কটা ইন্‌জেক্‌শন নিতে বলেছিলাম, নিয়েছে?"

বুড়ী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে পায়ের পাতাটা চুলকোতে লাগল, যেন শুনতে পায়নি। কিন্তু সদাশিব ছাড়বার পাত্র নন।

"দশটা ইন্‌জেক্‌শন নিয়েছে?"

"না। নেবার সময় পায়নি। তার স্বামী এসে তাকে নিয়ে গেল যে। কত মানা করলুম—"

গুম হয়ে রইলেন সদাশিব।

তারপর বললেন—"মজাটা পরে বুঝবে। পটাপট পেট থেকে যখন মরা ছেলে বেরুতে থাকবে তখন বুঝবেন বাবাজী—"

মেছুনীর নাতজামাইকেই বাবাজী বলে উল্লেখ করলেন সদাশিব।

আবদুলকে নিয়ে আলী এসে হাজির হল।

আলী আশঙ্কা করছিল বোমার মতো ফেটে পড়বেন ডাক্তারবাবু। তা তিনি পড়লেন না।

আবদুলের দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন—"টিফিন-কেরিয়ারে তোমার জন্যে মাছ রান্না করে এনেছি। খাও। আমার সামনে খাও—"

আবদুলের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে সদাশিবের দিকে।

"দেখছ কি, খাও—"

বুড়ী মেছুনী সভয়ে জিগ্যেস করল—"কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?"

"আবদুলকে জিগ্যেস কর। যে মাছ ও টাটকা বলে একটু আগে আমাকে বিক্রি করেছিল তা ও নিজেই খেয়ে দেখুক টাটকা কিনা।"

"আমি বুঝতে পারিনি হুজুর। আমি ভেবেছিলাম ভালো করে বরফ দেওয়া আছে, খারাপ হবে না।"

"হয়েছে কিনা খেয়ে দেখ নিজে—"

আলীর হাত থেকে টিফিন-কেরিয়ারটা ছিনিয়ে নিলেন তিনি। তারপর যা করলেন তা অপ্রত্যাশিত। এক টুকরো মাছ বের করে গুঁজে দিলেন সেটা আবদুলের মুখে। তারপর টিফিন-কেরিয়ারটা দড়াম করে ফেলে দিয়ে হনহন করে চলে গেলেন চালপট্টির দিকে।

চালপট্টির এক কোণে ডিম বিক্রি করে রহিম। কালো, বেঁটে, মুখে বসন্তের দাগ। ভুরু প্রায় নেই। তার পাশে বসে আছে তার মেয়ে ফুটফুটে ফুলিয়া। যদিও তার বয়স আট-ন বছর, কিন্তু বসে আছে যেন পাকা গিন্নীর মতো। রহিমের উপর নজর রাখবার জন্যে, তার মা তাকে বসিয়ে রেখে যায়। রহিমের একটু 'আলু' দোষ আছে। দবিরগঞ্জের রঙীন-কাপড়-পরা চোখে-কাজল-দেওয়া উন্নতবক্ষা মেয়েগুলো যখন চাটের জন্য ডিম কিনতে আসে, তখন আত্মহারা হয়ে পড়ে রহিম। তাদের বাঁকা চোখের চাউনি আর ঠোঁট-টেপা হাসিতে অভিভূত হয়ে দামই নিতে ভুলে যায় সে অনেক সময়। কেন ভুলে যায় তা জানে হানিফা, রহিমের স্ত্রী। তাই সে ফুলিয়াকে নিযুক্ত করেছে পাহারায়। ফুলিয়া সম্ভবত নিগূঢ় সব খবর জানে না, তবে সে এইটুকু জানে যে তার বাপজান অন্যমনস্ক হয়ে অনেক সময় ন্যায্য পয়সা নিতে ভুলে যায়। অন্যমনস্কতাজনিত এ অন্যায় তাকে সংশোধন করতে হবে, এ জ্ঞানটুকু টনটনে আছে তার।

সদাশিব রহিমকে বলিলেন—"আমাকে দু ডজন ভালো ডিম দিয়ে আয় গাড়িতে; দেখিস যেন পচা না হয়। আবদুল আজ পচা মাছ দিয়েছিল, খেতে পারিনি। ফুলিয়া, তুই দেখিস তোর বাবা যেন না ঠকায়।"

একটা পাঁচটাকার নোট বার করে দিলেন তিনি রহিমকে। ফুলিয়া মিষ্টি হাসি হেসে চাইল ডাক্তারবাবুর দিকে, তারপর ডিম বেছে বেছে জলে ডুবিয়ে দেখতে লাগল যে ডিমটা দিচ্ছে সেটা ভালো কিনা। সদাশিব সানন্দে লক্ষ্য করলেন ফুলিয়া কানে দুটি ছোট মাকড়ি পরেছে। সোনার নয়, রূপার। কিন্তু মানিয়েছে বেশ। কিছুদিন আগে ডাক্তার সদাশিবই তার কান বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন।

"ডিমগুলো নিয়ে আয় গাড়িতে—"

চলে গেলেন তিনি। অন্য কেউ হলে প্রত্যেকটি ডিম ভালো করে দেখে দেখে নিত, কিন্তু সদাশিব দেখলেন না। কখনও দেখেন না, মাঝে মাঝে ঠকেন তবুও দেখেন না। জনশ্রুতি ঘর-

পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। কিন্তু অনেকবার ঠকেও সদাশিব ভয় পান না, কারণ তিনি গরু নন, মানুষ। তাই তিনি মানুষকে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করে আনন্দ পান।

সদাশিব গাড়ির কাছে এসে দেখলেন আবদুল টিফিন-কেরিয়ারটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সদাশিবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিলে সে। সদাশিব থমকে দাঁড়ালেন, নিষ্পলক দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে অত্যন্ত কোমলকণ্ঠে বললেন—"আজ কি হয়েছিল তোর! অমন পচা মাছটা আমাকে দিলি—"

"আমি বুঝতে পারিনি। তাছাড়া মাথারও ঠিক ছিল না—"

"মদ খেয়েছিলি নাকি—"

"না হুজুর। রমজুটা জ্বরে বেহোঁশ হয়ে গিয়েছিল। এখনও জ্বর ছাড়েনি—"

"ওষুধ দাওনি কিছু?"

"না এখনও দিইনি। ভেবেছিলাম এমনি সেরে যাবে—"

সদাশিবের চোখের দৃষ্টিতে আবার আগুন জ্বলে উঠল।

"আমাকে বলনি কেন —"

আবদুল ক্ষণকাল চুপ করে রইল।

তারপর বলল—"আপনাকে বার বার বিরক্ত করতে লজ্জা করে হুজুর—"

সদাশিব কিছু বললেন না। গুম হয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন শুধু।

তারপর বললেন—"এখুনি আমি রমজুকে দেখতে যাব। গাড়িতে উঠে বোস—"

ঠিক এই সময় ফুলিয়া হাজির হল ডিম আর বাকী পয়সা নিয়ে। আলী ডিমগুলো নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। সদাশিব পয়সাগুলো গুনে দেখলেন না। কেবল একটা এক-আনি তুলে দিয়ে দিলেন ফুলিয়াকে। ফুলিয়া একমুখ হেসে ছুটে চলে গেল। স্মিত দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে রইলেন সদাশিব। তাঁর মনে হল ফুলিয়া নামটা সার্থক হয়েছে ওর। সত্যিই ফুলের মতো।

।। দুই।।

ডাক্তার সদাশিবের মতো লোক সাধারণত দেখা যায় না। কোনো ভালো জিনিসই সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না। হীরা-মুক্তা খোলামকুচির মতো পড়ে থাকে না পথেঘাটে। খনির অন্ধকারে অথবা সমুদ্রের অতলে ওদের জন্ম হয়, রহস্যময় উপায়ে। প্রচণ্ড চাপে কয়লা হীরকে পরিণত হয়, ঝিনুকের ভিতর সূক্ষ্ম বালুকণা প্রবেশ করে সৃষ্টি করে মুক্তা। প্রচণ্ড চাপ অথবা বালুকণার প্রদাহ না থাকলে হীরা-মুক্তার জন্ম হত না। সদাশিবের জীবনেও চাপ এবং প্রদাহ এসেছিল, কিন্তু সে তো অনেকের জীবনেই আসে, সবাই কি সদাশিব হয়? সদাশিবের সদাশিবত্বের সম্ভাবনা নিগূঢ়ভাবে সুপ্ত ছিল তাঁর চরিত্রে, পরিবেশের প্রভাবে তা পরিস্ফুট হবার সুযোগ পেয়েছিল।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটা নিহিত কারণ থাকে পূর্বপুরুষদের জীবনধারায়। সদাশিবের পূর্বপুরুষদের সকলের খবর জানা নেই, কিন্তু সদাশিবের প্রপিতামহ সুরেশ্বর শর্মা একজন গৃহী

সন্ন্যাসী ছিলেন একথা অনেকে জানে। রবীন্দ্রনাথের একজন পূর্বপুরুষ যেমন 'ঠাকুর' নামে খ্যাত ছিলেন, তেমনি 'দেবতা' বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন সুরেশ্বর শর্মা। সবাই তাঁকে 'দেবতা' বলে ডাকত। বৈষ্ণব সাধু হয়েছিলেন তিনি। তাঁর কয়েকটা বিশেষত্ব ছিল। তাঁর নিজের খাবারটা তিনি বিতরণ করে দিতেন। তিনি সামান্য দুধ এবং ফল খেয়ে থাকতেন। সংসার থেকে তাঁকে যে খাবারটা দেওয়া হত সেটা তিনি পালা করে একজন গরীবকে ডেকে খাওয়াতেন। আর স্বহস্তে সেবা করতেন সেই গাভীটিকে যার দুধ খেতেন তিনি। যে গাছগুলি তাঁকে ফল দিত তাদেরও সেবা করতেন। গাইটিকে নিয়ে বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা বাগানে বাস করতেন তিনি। সেইখানেই দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন সাধন ভজন করে। কিছু জমি ছিল তাতেই সংসার চলে যেত। উদরান্নের জন্য চাকরি বা ব্যবসা তাঁকে করতে হয়নি।

তাঁর ছেলে পীতাম্বরকে কিন্তু করতে হয়েছিল। তিনিই প্রথম গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যান একটা মার্চেন্ট আপিসের কেরানী হয়ে। প্রথমে দিনকতক একটা মেসে ছিলেন, তারপর বাগবাজারে গলির গলি তস্য গলির মধ্যে ছোট বাসা ভাড়া করেন একটা। সে বাসা আর তাঁরা ছাড়েননি। পুরুষানুক্রমে সেই বাসাতেই বাস করছেন।

সদাশিবের জন্ম ওই বাসাতেই হয়েছিল। কলকাতা শহরেই বাল্য ও যৌবন কেটেছিল তাঁর। ওইখানেই তিনি স্কুল আর কলেজের পড়া শেষ করে মেডিকেল কলেজে ঢোকেন। মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করার আগেই বিয়ে হয়েছিল সদাশিবের। যখন বিয়ে হয়েছিল তাঁর বয়স বাইশ আর স্ত্রী মনুর (মনোমোহিনী) বারো।

নববধূরা তখন পায়ে পাঁয়জোর নুপুর আর মল পরত। ঝুমঝুম করে শব্দ হত যখন ঘুরে ফিরে বেড়াত তারা। গুরুজনদের দেখলে ঘোমটা টেনে দিত। পায়ে আলতা পরত, গোল খোঁপার মাঝখানে পরত সোনার চিরুনি, খোপাকে ঘিরে থাকত বাহারে ফুল-তোলা কাঁটা। খোঁপার বিনুনিই ছিল কত রকম। মনুর এই ছবিটা এখনও মনে পড়ে সদাশিবের। পাঁয়জোর আর মলের ঝুমঝুম শব্দ এখনও শুনতে পান তিনি। বিশেষ করে একটা ছবি তাঁর মনে অক্ষয় হয়ে আছে। মনু যখন রাত্রে শুতে আসত তখন তার মুখ অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে উঠত। ঠিক সলজ্জ ভাব নয়, একটু লজ্জার আভাস থাকত অবশ্য, কিন্তু ভাবটা ঠিক সলজ্জ নয়, দুষ্টু-দুষ্টু। মাথার ঘোমটা সরে যেত তখন। উপরের দু-তিনটি দাঁত দিয়ে কামড়ে থাকত পানে-রাঙা নীচের ঠোঁটটি। ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত, চক্ষু আনত, আর সমস্ত মুখে চাপা হাসির আভাস। সদাশিব ডাকলে বাঁ হাতের ছোট্ট কিল তুলে দেখাত। এই ছবিটি অম্লান হয়ে আছে সদাশিবের মনে।

সদাশিব পাস করেই চাকরি পেয়েছিলেন। অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল তাঁকে। চাকরি-জীবনেরও অনেক টুকরো টুকরো স্মৃতি গাঁথা আছে তাঁর মনে। অনেক এবং বিচিত্র। সদাশিব রিটায়ার করেছিলেন বিহারেরই একটা শহরে। সেইখানেই বাড়ি কিনেছেন একটা। আশেপাশে কিছু জমিজমাও। ব্যাঙ্কে টাকাও জমিয়েছেন। জমানো টাকার যা সুদ পান তাতেই সংসার চলে যায় স্বচ্ছন্দে। সংসারে খাবার লোকও বিশেষ কেউ নেই। মনু যৌবনেই মারা গেছে। একটি মাত্র সন্তান হয়েছিল, মেয়ে। সোহাগিনী। সোহাগিনীর বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন আগে।

জামাই সুজিত বড়লোকের ছেলে, বড় চাকরিও করে। বছরে দু'বার তারা সদাশিবের কাছে আসে কেবল। প্রকাণ্ড বাড়িটায় সদাশিব থাকেন তাঁর ভাইপো আর ভাইপো-বউকে নিয়ে।

ভাইপো চিরঞ্জীব কোন কাজকর্ম করে না। সদাশিবের জমিজমার তদারক করে সে, তাঁর নানারকম ফাইফরমাশও খাটে। এককথায় চিরঞ্জীব সদাশিবের প্রাইভেট সেক্রেটারি। সদাশিবের বৈষয়িক ঝামেলা এবং চারিত্রিক খামখেয়ালের সমস্ত ঝঞ্ঝাট সে-ই পোয়ায়। চিরঞ্জীবের বউ মালতীও নিঃসন্তানা। ঘরকন্নার ভার তার উপর। চাকর দাই রাঁধুনী সব আছে, কিন্তু কর্ত্রী সেই। মালতী মোটাসোটা কালো রং। চোখ দুটি বড় বড়। শরীর বেশ আঁটসাঁট। ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী, কিন্তু বেশী মোটা নয়। বেশ রাশভারী। চিরঞ্জীব তো বটেই, সদাশিবও ভয় করেন তাকে। সদাশিব আর একটা কারণেও তাকে সমীহ করেন—সে রাঁধে ভালো। নিরামিষ আমিষ দু'রকম রান্নাতেই সিদ্ধহস্ত। খাদ্যরসিক সদাশিব তার এ প্রতিভাকে খাতির না করে পারেন না। রোজ একটা তরকারি নিজের হাতে করে সে। বাকী রান্না ঠাকুরকে দিয়ে করায়। ঠাকুরকে দিয়ে করায় বটে, কিন্তু ঠাকুরের পিছনে সে দাঁড়িয়ে থাকে নিজে মহিষমর্দিনীর মতো, এক চুল এদিক ওদিক হবার উপায় থাকে না। মৈথিল ঠাকুর আজবলাল মালতীর তত্ত্বাবধানে থেকে প্রথম শ্রেণীর রাঁধিয়ে হয়েছে। সে-ও মালতীকে ভয় করে খুব। মুখে যদিও বলে 'লছমি মাঈ', কিন্তু মনে মনে জানে ও একটি বাঘিনী। একটু বেচাল হলেই প্রচণ্ড ধমক দেয়।

আজবলাল সদাশিবের কাছে অনেকদিন আছে। মনুর আমল থেকে। আট টাকা মাইনেতে বাহাল হয়েছিল। এখন তার সঙ্গে আর মাইনের সম্পর্ক নেই। ঘরের লোক হয়ে গেছে, যখন যা দরকার হয় নেয়। বিকেলের দিকে একটু সিদ্ধি খায় সে। ওইটুকুই তার বিলাস। বেশ তরিবৎ করে সিদ্ধির শরবৎটুকু খায়। সদাশিব আপত্তি করেননি। সিদ্ধি খেয়ে আজবলালই বিপদে পড়ে মাঝে মাঝে। কোন কোন দিন মনে হয় সে মালতীর চেয়ে অনেক বড়, প্রায় তার বাপের বয়সী, তার মেয়ে জানকী বেঁচে থাকলে অত বড়ই তো হত, সে কেন মালতীর ভয়ে গরুড়টি হয়ে থাকবে চিরকাল, মালতীরই বরং উচিত তাকে ভয় করা। মেয়েছেলের অমন খাণ্ডারনী হওয়া কি ভালো? তার উচিত মালতীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে মেয়েমানুষের বেশী 'তেজ' হওয়া ঠিক নয়। সিদ্ধির ঝোঁকে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে মালতীকে বোঝাতে যায় এবং বোঝাতে গিয়ে আরও বকুনি খায়। নিজেই শেষে সে বুঝতে পারে জল দিয়ে ধুয়ে লালজবাকে সাদাজবা করা যায় না।

কিছুদিন আগে সদাশিব যখন চাকরি থেকে অবসর নেন তখন তিনি অতীতের দিকে চেয়ে খোঁজবার চেষ্টা করেছিলেন জীবনে তাঁর এমন কোন প্রকৃত বন্ধু বা আত্মীয় আছে কিনা যার কাছে গিয়ে তিনি বাকী জীবনটা আনন্দে কাটাতে পারেন। যন্ত্রের ইঞ্জিন তেল, কয়লা বা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। মানুষ-ইঞ্জিনের সেটা দরকার, কিন্তু তার আর একটা জিনিস চাই, ভালোবাসা। কেবল টাকার জোরে সুখে থাকা যায় না। বেঁচে থাকবার প্রেরণা চাই একটা, সে প্রেরণার উৎস হওয়া চাই মহৎ কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা অথবা ভালোবাসা।

সদাশিবের জীবনে কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসার টানে জোয়ার আসেনি কখনও। তিনি সারাজীবন চাকরি করেছেন এবং ডাক্তারি করেছেন। নামকরা ডাক্তার ছিলেন অবশ্য, যেখানেই

গেছেন তাঁর পসারের 'গর্জন' শুনেছে সবাই। কিন্তু নামকরা ডাক্তাররা ঠিক বৈজ্ঞানিক নন। তাঁরা অপর বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারকে প্রয়োগ করেন মাত্র। প্রয়োগ করে পয়সা রোজগার করেন। তাঁরা অনেকটা কেরানীর মতো। আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিক যে প্রেরণার আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন, সে আনন্দে কখনও স্পর্শ করে না সাধারণ জেনারেল প্র্যাক্‌টিশনার ডাক্তারের চিত্তকে। জেনারেল প্র্যাক্‌টিশনারের একমাত্র লক্ষ্য জনপ্রিয় হওয়া এবং জনপ্রিয় হওয়ার উদ্দেশ্য উপার্জন। বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য সত্যের সন্ধান এবং প্রয়োজন হলে তার জন্যে দারিদ্র্য এবং অপমান বরণ করা।

এ প্রেরণা সদাশিবের জীবনে আসেনি কখনও। তিনি টাকা রোজগার করতেই চেয়েছিলেন এবং প্রচুর টাকা রোজগার করতে পেরেওছিলেন। কিন্তু টাকা রোজগার করতে করতে জীবনের শেষের দিকে এসে হঠাৎ তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে—এসব কিসের জন্যে করছি? কার জন্যে? মনু তো চলে গেছে অনেকদিন আগে, সোহাগেরও বিয়ে হয়ে গেছে—তবে? কিসের জন্যে এত পরিশ্রম, এত দুশ্চিন্তা? অতীতের দিকে ফিরে তিনি অনুভব করলেন ভালোবাসার মতো আর কেউ বেঁচে নেই। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যারা বেঁচে আছে, তারা নামেই আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। প্রেম নেই কারো মনে। আছে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা আর তার উপর একটা প্রেমের ভান। ঝুটো প্রেমের মেকি অভিনয়ে মন আরও বিষিয়ে ওঠে।

যে অদ্ভুত জীবন ডাক্তার সদাশিব আজকাল যাপন করেন—হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ানো—সে জীবন আরম্ভ করবার আগে যে জীবন তিনি যাপন করতেন তার কিছু আস্বাদ না পেলে বর্তমান জীবনের সম্যক্‌ অর্থ বোঝা যাবে না। সে জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায় তাঁর ডায়েরিতে। স্থান এবং তারিখের উল্লেখ না করে তারই ঘটনাগুলি উদ্ধৃত করছি। ঘটনাগুলি একটানা ঘটেনি। মাঝে মাঝে সময়ের ব্যবধান আছে।

।। তিন।।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম তাঁর স্ত্রীকে দেখতে। আমি ভেবেছিলাম বাড়াবাড়ি কোনও অসুখ বুঝি। কিন্তু গিয়ে দেখলাম তিনি বেশ সেজেগুজে সোফায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন। বললেন সকালের দিকে তাঁর মাথাটা বড্ড ধরে। আর কানের ডগা দিয়ে আগুনের হল্‌কা বের হয়। প্যাল্‌পিটেশনও আছে। শিরদাঁড়ার কাছটা শিরশির করে মাঝে মাঝে। সব বলবার পর হেসে বললেন, চিকিৎসার কোনও ত্রুটি করিনি। কলকাতার সব বড় বড় ডাক্তাররা দেখেছেন। ইলেক্‌ট্রোকার্ডিয়োগ্রাম, এক্সরে, অপারেশন সব হয়ে গেছে। একজন বড় ডাক্তারের নাম করে বললেন—তাঁরই চিকিৎসায় আছি এখন। একগাদা রিপোর্ট আর প্রেস্কৃপসন্‌ বার করলেন আর সেগুলো এমনভাবে দেখাতে লাগলেন যেন গয়না দেখাচ্ছেন এবং দেখিয়ে গর্ব অনুভব করছেন।

আমার মনে হল তিনি আমাকে চিকিৎসা করাবার জন্য ডাকেননি, তিনি যে বড় বড় ডাক্তার দেখাতে পারেন এবং হামেশাই দেখিয়ে থাকেন, এইটে সাড়ম্বরে আমার কাছে আস্ফালন করবার জন্যেই আমাকে ডেকেছেন।

ভদ্রমহিলার সন্তান হয়নি। হবার সম্ভাবনাও নেই। বয়স ত্রিশের কোঠায় মনে হল, যদিও আমাকে বললেন পঁচিশ। দেখলুম নানারকম কম্‌প্লেক্স্‌ জট-পাকানো রয়েছে মনে। অকারণে বাপের বাড়ির গল্প করলেন খানিক। তাঁর কোন্‌ ভাই কবে বিলেত গেছেন তা বললেন। তাঁর যে ভাই এ. পি., সে যে বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে ফিরেছে তা-ও কথায় কথায় জানিয়ে দিলেন। আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন মাঝে মাঝে গিয়ে খবর নি তাঁর। বললেন—'একা এই জংগুলে দেশে পড়ে আছি, একটা কথা বলবার লোক পর্যন্ত নেই। উনি তো সমস্ত দিন বাইরে বাইরে থাকেন। আয়া, বেয়ারা আর চাপরাসী নিয়ে কতক্ষণ আর কাটানো যায় বলুন। বই-টই পড়ি। কিন্তু বই সব সময়ে ভালো লাগে না। আপনি দয়া করে আসবেন মাঝে মাঝে। এই ইন্‌জেক্‌শনগুলো কি নেব?' একজন নামজাদা ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপ্‌সন্‌, সুতরাং 'না' বলতে পারলুম না। বললাম, নিন। 'আপনি তাহলে দয়া করে এসে দিয়ে যাবেন। যাবেন তো? এবারও 'না' বলতে পারলাম না। যদিও বুঝলাম ও ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে তাঁর অসুখ সারবে না। অসুখ সারত একটি ছেলে হলে। কিন্তু হবে না, গত বছরই ইউটেরাসটি কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। টিউমার হয়েছিল নাকি। উনি নিজেও মনে মনে জানেন যে ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে কিছু হবে না। আমাকে ডাকছেন আমার সঙ্গ কামনায়। আমাকে সামনে বসিয়ে বক্‌বক্‌ করে বকে যাবেন খালি, নিজের অন্তর্নিহিত নিদারুণ বেদনাটাকে চাপা দিয়ে বাহাদুরির ফুলঝুরি কেটে চেষ্টা করবেন নিজেকে এবং আমাকে ভোলাতে। আমাকে চাইছেন উনি ডাক্তার হিসাবে নয়, শ্রোতা হিসেবে। আমার চিকিৎসানৈপুণ্যে ওঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। একটা সাদা পট না থাকলে সিনেমার ছায়াছবি দেখানো যায় না। আমাকে উনি সেই সাদা পটের মতো ব্যবহার করতে চান।

মনুকে আজ খুব বকেছি। একটা তরকারী নুনে পোড়া, মাংসটা আলুনি। রাঁধুনী রয়েছে তবু বাহাদুরি করে নিজে রাঁধতে যাওয়া চাই।.....সমস্ত দিন মনু আজ কেঁদেছে। আসল কারণ অবশ্য ওর পিসেমশাই নিতাইবাবু। ভদ্রলোককে ইতিপূর্বে দেখিনি কখনও। উনি এসে থেকে আমাদের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ। বারবার বলছেন কলিযুগে আমাদের মতো দম্পতি নাকি বিরল। হর-গৌরী আখ্যা দিয়েছেন আমাদের। মনু যখন রাঁধছিল তখন রান্নাঘরে গিয়েছিলেন তিনি। মনুকে রান্না শেখাচ্ছিলেন। মাংসে নুন না দেওয়াটাই বোধ হয় নূতনত্ব।

উনি কেন যে এসেছেন আমাদের কাছে আর কেনই বা আছেন এতদিন ধরে তা বুঝতে পারিনি আগে। আজ বিকেলে বুঝতে পারলুম। ভেবেছিলুম মনুর প্রতি স্নেহবশত এসেছেন বুঝি। কিন্তু দেখলাম তা নয়। পাওনাদারকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছেন। কালো কুচকুচে তাঁর পাওনাদারটি খুঁজে খুঁজে আজ এসে ধরেছিলেন তাঁকে। দুশমনের মতো চেহারাটা লোকটার। যদিও বাঙালী কিন্তু কথাবার্তার ধরন থেকে মনে হল কাবুলির বেহদ্দ। প্রথমেই এসে 'শালা' সম্বোধন করলেন পিসেমশাইকে। তারপর গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন। এই নাটকীয় কাণ্ড ঘটতে লাগল আমার বৈঠকখানার বারান্দায়। বাধ্য হয়ে শেষে আমাকে বন্দুক বার করতে হল।

পৃথিবীতে সবাই শক্তের ভক্ত, পাওনাদার মশাইও অবিলম্বে আমার ভক্ত হয়ে পড়লেন।

শেষে বার করলেন তাঁর ন্যায্য পাওনার দলিলখানা। দেখলাম সুদে-আসলে তিনি পিসেমশায়ের কাছে পাঁচশ টাকা পাবেন। আর একটা নাটকীয় কাণ্ড ঘটল। পিসেমশাই হঠাৎ আমার পা ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, তুমি আমাকে এখন ওই কশাইটার হাত থেকে বাঁচাও বাবা, আমি ফিরে গিয়েই টাকাটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি মনু বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে। কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনুর এই নিদারুণ অপমানে আমিও যেন অপমানিত বোধ করতে লাগলাম। অনুভব করলাম টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। ড্রয়ার থেকে টাকাটা বার করে বাইরে গেলাম। পাওনাদারের হঠাৎ একটা অন্য চেহারা বেরিয়ে পড়ল। সে বলল—টাকাটা দিচ্ছেন দিন, আমার ভালোই হল, কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে দিচ্ছি। নিতাইবাবুর কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। ও আপনাকে টাকা দেবে বলছে কিন্তু দেবে না। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আমাকে আজ দু'বচ্ছর ধরে ঘোরাচ্ছে। আপনি অন্তত একটা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিন ওর কাছে। তা না হলে টাকাটা মারা যাবে।

আমি জবাব দিলাম, সবাই তোমার মতো কশাই নয়। মুখে বললাম বটে, কিন্তু মনে মনে তারিফ করলাম লোকটার।

পিসেমশাই সেইদিন রাত্রেই উধাও হলেন। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে কিংবা মনুর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে গেলেন না। উনি চলে যাবার পর মনু আর একটা কথা বললে। 'জান? উনি আমার বিয়ের সময় বাগড়া লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন? বেনামী চিঠি লিখে দু'এক জায়গায় বিয়ে ভেঙেও দিয়েছেন।' এরাই কি আমার আত্মীয়? আশ্চর্য!

বিধুবাবুর ছেলের টাইফয়েড হয়েছে। প্রথমত প্রতিবেশী, দ্বিতীয়ত গরীব মানুষ। ফি না নিয়েই চিকিৎসা করছিলাম। দুবেলা তো যেতামই, কোন কোন দিন তিনবারও গেছি। আজ সকালে গিয়ে দেখি একটি ফরসা ছোকরা বসে আছে। বেশ ফিটফাট ছিমছাম। চোখে প্যাঁশনে, পরনে আদ্দি, পায়ে পেটেন্ট লেদারের 'শু'। আমি ঘরে ঢুকতে বিধুবাবু দাঁড়ালেন, কিন্তু সেই ছোকরা দাঁড়াল না। বিধুবাবু বললেন, ইনিই আমাদের প্রতিবেশী ডাক্তার সদাশিববাবু। পটলার চিকিৎসা ইনিই করছেন। আমি ডাক্তার শুনে ছোকরা এমনভাবে আমাদের দিকে চাইলে যেন সে কোন অদ্ভুত জীব দেখছে। তারপর বাঁ হাতটা তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—অ, আপনি এর চিকিৎসা করছেন। বসুন, বসুন, আপনাকে অনেক কথা বলবার আছে। বিধুবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—ইনি কে? বিধুবাবু হাত কচলে উত্তর দিলেন—এ আমার ভাগ্নে, বিলাস। মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছে। পটলের প্রেস্ক্রিপ্সনের ও কিছু অদলবদল করতে চায়। ও বলছে আজকাল মেডিকেল কলেজে না কি.....। থামিয়ে দিলুম বিধুবাবুকে। বললুম—আপনার ভাগ্নে এখনও ডাক্তার হননি। আমি অনেক দিন ধরে ডাক্তারী করছি। মেডিকেল কলেজে আজকাল কি ধরনের চিকিৎসা হচ্ছে তা আমিও জানি। আপনার ভাগ্নের মারফত সেটা আমার জানবার দরকার নেই। বিধুবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, হ্যাঁ, তাতো বটেই। তবে ও কি বলছে সেটা একবার শুনলে হত না? আমি উত্তর দিলাম, না, যে এখনও ডাক্তারি পাস করেনি তার সঙ্গে আমি চিকিৎসা-বিষয়ে

কোন কথা বলব না। আপনারা ওকে দিয়েই চিকিৎসা করান, আমি চললুম।

বাঙালীর ভদ্রতাবোধ কি একবারে চলে গেছে? বিধুবাবু কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে বাহাদুরি দেখাবার জন্যেই এটা করলেন উনি। উনি বোধহয় অজ্ঞাতসারেই আমার কাছে জাহির করতে চাইলেন—দেখ হে, আমিও নেহাত কেউ-কেটা নই। আমার ভাগ্নেও মেডিকেল কলেজে পড়ে, দুদিন পরে তোমার মতোই ডাক্তার হবে। সত্যি, আমরা চাষা হয়ে গেছি। যে শিক্ষার প্রধান লক্ষণ বিনয়, সেই শিক্ষা লোপ পেয়ে গেছে আমাদের ভিতর থেকে। ছি, ছি।

রঘুবাবু ছেলের বিয়ে দিলেন খুব ধুমধাম করে। বড়লোক কুটুম হয়েছে। কলকাতা থেকে রাঁধুনী এসেছিল, কাশী থেকে সানাই। শহরের অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বেশীর ভাগই অফিসার। হাসপাতালের ডাক্তার হিসাবে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। গিয়েছিলাম আমি। গিয়ে দেখলাম আয়োজনের কোনও ত্রুটি নেই! চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সব রকম ব্যবস্থাই আছে। মদের ব্যবস্থাও ছিল। পরের পয়সায় মদ খাওয়ার সুযোগ যারা ছাড়ে না, বাড়িতে যাদের জোলো চা ছাড়া অন্য কোন প্রকার পান-বিলাস নেই, তাদের অনেককেই দেখলাম দাঁত বার করে গিয়ে আসর জমিয়েছে মদের টেবিলের ধারে আর উচ্চকণ্ঠে গুণগান করছে রঘুবাবুর কাল্‌চারের। রঘুবাবু নিজে দেখলাম ব্যস্ত আছেন বড় বড় অফিসারদের নিয়ে। কমিশনার সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর পুলিস সাহেব—এই তিনজন সাহেবকে বসিয়ে ছিলেন তিনি একটি বিশেষভাবে সজ্জিত টেবিলে এবং সেইখানেই সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে হেঁ— হেঁ করছিলেন। আমাদের কাছে একবারও আসেননি। আমাদের অভ্যর্থনা করছিল তাঁর একজন মুহুরি।

ওভারশিয়ার সুরথবাবুর চরিত্রের একটা দিক সহসা উদঘাটিত হল আজ আমার কাছে। তাঁকে সাধারণ ঘুষখোর ওভারশিয়ার বলেই জানতাম। কিন্তু তিনি যে মানব-চরিত্রের গহনেও সন্ধানীআলো নিক্ষেপ করতে সক্ষম, তা জানতাম না। এখানকার স্কুলের হেডমাস্টার গগন বসু প্রবীণ লোক, মাথার চুলে পাক ধরেছে। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

সুরথবাবু কিছুদিন আগে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁর বগলে একটা দাদ আছে, সেইটের জন্যে মাঝে মাঝে মলম নিতে আসেন আমার কাছে। কথায় কথায় সেদিন গগনবাবুর কথা উঠল। আমি বললাম, আপনাদের খুব ভাগ্য যে গগনবাবুর মতো পণ্ডিত চরিত্রবান লোক আপনাদের স্কুলের হেডমাস্টার। সুরথবাবুর চোখে-মুখে একটা কুটিল হাসির চমক খেলে গেল। তারপর বললেন, ভাগ্যই বটে। বলে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—অমন করে হাসছেন যে। সুরথবাবু একটু দুলে মাথা নেড়ে বললেন, হাসি পেল বলেই হাসছি। আপনারা সাদাসিধে মানুষ, সকলের ওপরটা দেখেই মুগ্ধ হয়ে যান। আমরা সব জানি কিনা তাই অত সহজে মুগ্ধ হতে পারি না। জিগ্যেস করলাম, কি জানেন? তিনি একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, সব কথা কি বলা যায়! বলেই রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

আজ যোগেন এসেছিল। যোগেন আমার বাল্যবন্ধু। সে হেসে আমাকে বললে—'কি রে,

তুই আজকাল ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস নাকি?' 'কি রকম?'—আকাশ থেকে পড়লাম আমি। তখন যোগেন বললে—সে ট্রেনে যে কামরায় ছিল সেই কামরায় সুরথবাবু নামে একজন ওভারশিয়ার ছিলেন। তিনি তাঁর ইয়ারবক্সিদের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলেন। একজন তোর প্রশংসা করাতে সুরথবাবু বললেন—'তোমরা ওপরটা দেখেই গদগদ হয়ে পড়। কিন্তু আমি পারি না, কারণ আমি ভিতরের অনেক খবর জানি যে। কিন্তু সে সব কথা বলে আর লাভ কি। তবে এটা জেনে রাখ উনি ডুবে ডুবে জল খান।' আমি যে এতবড় একজন ডুবুরী তা আমার নিজেরই জানা ছিল না! দুনিয়ায় কত রকম মানুষই যে আছে!

বাড়িতে মহা হুলুস্থুল পড়ে গেছে। অনেকদিন পরে আমার এক বোন আমার কাছে চেঞ্জে এসেছে। তার অসুখবিসুখ কিছু নেই। কিন্তু কলকাতার লোকেদের চেঞ্জে যাওয়া একটা বাতিক। বিশেষত কোথাও বিনা-পয়সায় থাকবার খাওয়ার জায়গা যদি থাকে তাহলে তো কথাই নেই, কোন রকমে থার্ড ক্লাসের ভাড়াটা যোগাড় করে ছুটবে সেখানে। আমার আপন বোন নয়, পিসতুতো বোন। সে আসছে বলে আমি যে অসন্তুষ্ট হয়েছি তা নয়, কিন্তু সে আসাতে আমার ভীষণ অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে।

আমার বোনের ছেলেমেয়েগুলো ভারি অসভ্য। পাঁচটা ছেলে, পাঁচটাই বর্বর। এসেই আমার ঘরের দামী পর্দাগুলো ধরে দুলতে লাগল সবাই। একটা পর্দা ছিঁড়ে গেছে। ধমক দিলে শোনে না। আমার বোন ইনিয়ে বিনিয়ে তাদের মানা করে বটে কিন্তু ছেলেগুলো তার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করে না। বোনের বকুনিটাও বকুনির মতো শোনায় না, মনে হয় মানা করতে হয় তাই করছে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ভর্ৎসনার সুরটা ঠিক ফুটছে না। বড় ছেলেটা, এসেই আমার রেডিওটা খারাপ করে দিয়েছে। এই মফঃস্বল শহরে সারানো মুশকিল। ক্রিকেট ম্যাচের খবর শুনতে পাচ্ছি না। মেজাজটা বিগড়ে গেছে। ফুলবাগানটা তছনছ করে দিলে। পটাপট করে ফুলগুলো তো তুলছেই, গাছের ডালও ভাঙছে। আমার স্প্যানিয়েল কুকুরটাকে তো অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কেউ তার কান টানছে, কেউ ল্যাজ, কেউ তার পিঠে চড়ে ধামসাচ্ছে। ভালো জাতের ভালো কুকুর তাই কিছু বলে না, আভিজাত্য একটু কম থাকলে কামড়ে দিত। আমার শখের বাইনকুলারটা তাক থেকে পেড়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে দেখছে সবাই মিলে। তার ধরনধারণ দেখে মনে হয় এসব যেন তাদের বার্থরাইট। মামার বাইনকুলার নিয়ে দেখবে না তো কার বাইনকুলার নিয়ে দেখবে?

একজন ছুতোর মিস্ত্রী কিছুদিন আগে আমার রোগী হয়েছিল। তার স্ত্রীর কুষ্ঠের চিকিৎসা করেছিলাম, কিছু চাইনি। সে একটা ড্রেসিং টেবিল উপহার দিয়েছে আমাকে। চমৎকার একটি আয়না 'ফিট' করা আছে তাতে। আমার বোন সেটা দেখে বললে—দাদা, আমাকে ওটা দাও না। তোমার তো আর একটা রয়েছে। বললাম—তুই একটা কিনে নিস, আমি দাম দিয়ে দেব। এখান থেকে ওটা নিয়ে যেতে হলে ভেঙে যাবে, তাছাড়া একজনের দেওয়া উপহার, নিজের কাছেই রাখা উচিত।

বোনের মুখভাব দেখে বুঝলাম আমার কথায় সন্তুষ্ট হল না। মনু তাকে অনেকগুলো শাড়ি দিয়েছে, কিন্তু দেখলাম মনুর বাটিকের শাড়িটার উপর তার লোভ খুব। মনুকে বলেছি

ওটা দিয়ে দিতে, আমি আবার তাকে কিনে দেব। মনু মুখে বললে, আচ্ছা। কিন্তু তার গম্ভীর মুখ দেখে বুঝলাম সে মনে মনে পছন্দ করেনি প্রস্তাবটা।

কিন্তু মনু সবচেয়ে চটেছে আর একটা ব্যাপারে। আমার বোনের বড় ছেলে টুলটুল আমার মেয়ে সোহাগের গালে কামড়ে দিয়েছে। সোহাগের বয়স পাঁচ বৎসর, টুলটুলের দশ। আমার বোন জিগ্যেস করল, ও কি রে, ওর গালে অমন করে কামড়ে দিলি কেন? টুলটুল হেসে উত্তর দিলে— গালটা ঠিক টমাটোর মতো যে! আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না, হাণ্টার বার করে খুব চাবকেছি ছেলেটাকে। ভেবেছিলাম লাঠ্যৌষধি পড়েছে, এইবার ঠিক হয়ে যাবে সব। কিন্তু হল না। আজ সকালে চাকরগুলো হৈ হৈ করে ওঠাতে বেরিয়ে দেখলাম আমার বোনের মেজ ছেলে একটা হাঁসের গলা টিপে ধরেছে। পাতিহাঁস। নিখুঁত সাদা রং বলে কিনেছিলাম একজোড়া। তারই একটার গলা টিপে ধরেছে ছেলেটা। আর একটু হলে মরে যেত।...ভাবছি কবে এই সব পাপ দূর হবে বাড়ি থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, এদের দূর করতে চাইছি কেন! এরাই তো আমার আত্মীয়!

বিধুবাবুর ছেলে পটল কাল রাত্রে মারা গেছে। মেডিকেল কলেজের আপ-টু-ডেট্ ছাত্র বিলাস তাকে বাঁচাতে পারেনি। আমি তার চিকিৎসা আর করছিলাম না। করলেই বাঁচত কি?

রোগী আসে, রোগী যায়। কেউ বাঁচে, কেউ মরে। কিন্তু মনের উপর কেউতো দাগ রেখে যায় না। আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কিছু বাড়ে শুধু। মনটা যেন নির্মম আয়নার মতো! কোনও ছবিই ধরে রাখে না। যদি ক্যামেরার মতো হত তাহলে কি ভালো হত? অত ছবি রাখতাম কোথায়? মনের চিত্রশালায় অত জায়গা কি আছে? হঠাৎ মনে হল আছে বই কি। অনেক জায়গা আছে। কিন্তু রাখবার মতো ছবি একটাও পেয়েছি কি?

আজ লক্ষ্মীবাজারে রোগী দেখতে গিয়ে অদ্ভুত জিনিস দেখে এসেছি একটা। লক্ষ্মীবাজার এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। লক্ষ্মীবাজারের প্রসিদ্ধি তার বাজারের জন্য নয়, তার গড়ের জন্য। প্রায় আধ মাইলব্যাপী বিরাট বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ আছে সেখানে। প্রবাদ, বহুকাল আগে সেখানে এক রাজবংশ বাস করতেন। তাঁদের উপাধি ছিল চৌধুরী। চৌধুরী বংশের এক রাজা লক্ষ্মী চৌধুরী (যাঁর নামের স্মৃতি বহন করছে লক্ষ্মীবাজার গ্রাম) তাঁর যৌবনকালে নব-বিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে সহসা অন্তর্ধান করেন। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন তা কেউ জানে না। তিনি আর ফেরেননি। কেউ বলে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, কেউ বলে মারা গেছেন, কারও মতে তিনি পোর্তুগীজ বম্বেটেদের হাতে পড়েছিলেন, তারা তাঁকে আর তাঁর স্ত্রীকে আরবদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এই ধরনের নানা জনশ্রুতি আছে তাঁর সম্বন্ধে। মোট কথা তিনি আর ফেরেননি। কোন খবরও পাঠাননি। তিনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অত বড় চৌধুরী গড় খালি হয়ে যায়নি। তাঁদের বংশের অনেকেই বেঁচে ছিলেন সেখানে অনেকদিন ধরে। কিন্তু কালক্রমে ক্রমশ সব খালি হয়ে গেল। বংশে ছেলে হল না কারও, মৃত্যুর করালগ্রাসে অবলুপ্ত হয়ে গেল অত বড় বংশ। বংশের শেষ প্রদীপ (কমলাপতি

চৌধুরী) নির্বাপিত হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। তারপর থেকে প্রেতপুরীর মতো পড়ে আছে অতবড় গড়টা। চারদিকে বনজঙ্গল গজিয়েছে, বড় বড় অশ্বত্থ বট বিদীর্ণ করেছে বিশাল অট্টালিকার পঞ্জরকে। জঙ্গলে সাপ আর শেয়ালের আড্ডা, গাছের মাথায় মাথায় শকুনদের। বাড়িটার ভাঙা ঘরগুলোর মধ্যে ভীষণ-দর্শন প্যাঁচাও আছে নাকি। দিনের বেলাতেও চৌধুরী গড়ের জঙ্গলে যায় না কেউ। কিছুদিন আগে এক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মালমসলা সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। সর্পাঘাতে মারা গেছেন। এ ঘটনার পর থেকে আর কেউ ওদিক মাড়ায় না।

আজ কিন্তু দেখে এলাম সেখানে লোকে লোকারণ্য, এক মহাসমারোহ পড়ে গেছে। দীর্ঘকায় এক কাবুলী ঘোড়সোয়ার এসে হাজির হয়েছে সেখানে। সে আকারে ও ভাষায় কাবুলী বটে, কিন্তু তার পোশাকটা প্রায় বাঙালীরই মতো। তার ঘোড়াটাও প্রকাণ্ড। অত বড় ঘোড়া আমি অন্তত দেখিনি। সে নিজের নাম বলেছে, অ্যাচুট্অ্যাণ্ড। পরে বোঝা গেল ওটা অচ্যুতানন্দের কাবুলী সংস্করণ। তার ভাষা কেউ বুঝতে পারছিল না। পাশের গ্রামের আগা সাহেব এসে তার বক্তব্যের মর্মোদ্ধার করেছেন। আগন্তুক পোস্তু ভাষায় আগা সাহেবকে যা বলেছে তাও বিস্ময়কর। সে বলেছে যে সে গৃহত্যাগী রাজা লক্ষ্মী চৌধুরীর বংশধর। লক্ষ্মী চৌধুরী কেন গৃহত্যাগ করেছিলেন তারই বিবরণ নিয়ে সে লক্ষ্মীবাজারে এসেছে। 'ল্যাখি চোড্‌রি'কে সে নিজে কখনও দেখেনি। তার জন্মের বহুপূর্বে তিনি মারা গেছেন। তিনি ছিলেন তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। তিনি তাঁর গৃহত্যাগের বিবরণ একটি খাতায় লিখে রেখেছিলেন এবং মৃত্যুকালে বলে গিয়েছিলেন খাতাটি যেন লক্ষ্মীবাজারে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এখানে আসা এর আগে সম্ভবপর হয়নি এতদিন। তারপর বললে—"হঠাৎ আমরা একদিন লক্ষ্য করলাম যে খাতার কাগজ মলিন এবং ভঙ্গুর হয়ে গেছে। হাত দিলে ভাজা পাঁপড়ের মতো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তখন মনে হল, আর দেরি করা উচিত নয়, আর দেরি করলে তাঁর শেষ ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করতে পারব না। তাই আমি এই খাতা নিয়ে এসেছি। ঘোড়াটি শোনপুরের মেলায় কিনেছি। ইচ্ছে আছে, ফিরবার সময় ট্রেনে যাব না, ঘোড়ার পিঠেই যাব।"

লক্ষ্মী চৌধুরীর লিখিত বিবরণের অধিকাংশই প্রায় পড়া যায়নি। লেখা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেটুকু পড়া গেছে সেটুকু প্রণিধানযোগ্য। তার মর্ম এই—'আমি এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি যে আমাদের কেউ ভালবাসে না। আমরা প্রতিপত্তিশালী, আমরা ধনী, তাই সকলে বাধ্য হয়ে আমাদের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকে। সেবা করে অর্থের বিনিময়ে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা ভয়ে। কারও মনে আমরা প্রেম সঞ্চার করতে পারিনি। এই সকল প্রভুত্বের সিংহাসনে বসে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সুখ পেয়েছেন, কিন্তু আমি পাচ্ছি না। আমার প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছে আমি যেন পাশবিক শক্তিবলে দুর্বলদের পীড়ন করছি। এ আমার পক্ষে অসহ্য। এখানে থেকে আমার সমস্ত সম্পত্তি যদি বিলিয়ে দিই তাহলেও আমার কাম্য সুখ আমি পাব না। কারণ এতদিন যেরূপে সকলে আমাকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে, সে অভ্যাসের মোহ তারা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না। আমি এমন কোন অপরিচিত স্থানে যেতে চাই যেখানে আমার কৌলীন্যের পরিচয় অর্থ বা প্রতিপত্তি দিয়ে কেউ মাপবে না, আমার চাবিত্রিক মহত্ত্ব দিয়ে মাপবে। যে সমাজে আমি অপরিচিত অচেনা আগন্তুক সেই সমাজে

গিয়েই আমি নূতন রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমার পূর্বপুরুষদের অর্জিত সম্পত্তি তাই আমি ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। আমার বংশের অন্যান্য শরিকরা অথবা গ্রামবাসীরা যে সম্পত্তির যে-কোনও রূপ সৎব্যবস্থা করতে পারেন করুন, আমার আপত্তি নেই। পৈতৃব সম্পত্তির উপর আমার সমস্ত দাবি আমি ত্যাগ করলাম।”

রাজা লক্ষ্মী চৌধুরী যা যা বলেছেন তা কি সকলের সম্বন্ধেই সত্য নয়? আমাদের দেশে এরকম মহাপুরুষ আরও অনেক আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি।

প্রাণ-পতি সাধু নাম। সুদখোর বেনে। কারও প্রাণ-পতি হতে পারেনি, ধন-পতি হয়েছে অনেকের। অনেকের সম্পত্তি নিলাম করিয়েছে। সাধুও নয়, অসাধু। জাল দলিল বার করে সর্বনাশ করেছে অনেকের। আমি তার বাড়িতে চিকিৎসা করেছিলাম কিছুদিন। অনেক ফি বাকি আছে। আজ দেবে কাল দেব করছে। এখনও দেয়নি। ওষুধের দামও বাকি আছে অনেক। আজ সকালে এসে বলেছিল সে নাগেদের দোকানে জিগ্যেস করে দেখেছে ওষুধের দাম নাকি আমি অনেক বেশি নিয়েছি। অর্ধেক হওয়া উচিত। দারোয়ান দিয়ে দূর করে দিলুম লোকটাকে। দারোয়ান যখন তার হাত ধরে টেনে বারান্দা থেকে নামিয়ে দিলে, তখন ভেবেছিলুম একটা প্রতিবাদ অন্তত করবে। কিন্তু কিছু করল না, সুট সুট করে চলে গেল। অথচ শুনেছি ওর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নাকি লক্ষ টাকার উপর।

রায়সাহেব উপাধি দিয়ে গভর্নমেণ্ট অকস্মাৎ আমাকে বিব্রত করেছেন। আমি এর জন্যে কিছুমাত্র চেষ্টা করিনি, পাবার জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িতও ছিলাম না। কমিশনার সাহেবের হাইড্রোসিলটি ভালো করে অপারেশন করে দিয়েছিলাম বলেই সম্ভবত এই অযাচিত পুরস্কারটি পেলাম। এ যেন সাপের ছুঁচো-গেলা হয়েছে। গিলতেও পারছি না, ফেলতেও পারছি না। আমার চেনা-শোনা অনেকেই কিন্তু গদগদ হয়ে পড়েছেন দেখছি। রোজই অভিনন্দন জানিয়ে পত্র আসছে। আমার শালী ‘রায়সাহেব ডকটর সদাশিব ভট্টাচার্য এম্-বি’ ইংরেজী হরপে ছাপিয়ে লেটার প্যাড করিয়ে পাঠিয়েছে জলন্ধর থেকে। আমার যে বন্ধুর সঙ্গে কোনকালে বন্ধুত্ব ছিল না, যিনি বহুকাল আগে কিছুদিনের জন্য আমার সহপাঠী ছিলেন মাত্র, তিনি সন্দেশ খাওয়াবার দাবি জানিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। হে সদাশয় কমিশনার সাহেব, এ কি বিপদে ফেললে আমাকে!

আজ আমার ডিস্‌পেনসারির সামনে বেশ একটা মজার দৃশ্য দেখলাম। উচ্চকণ্ঠে কলরব শুনে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি একদল হাফ্‌প্যাণ্টপরা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে উত্তেজিত হয়ে। কথাবার্তাও উত্তেজিত। কারণটাও চোখে পড়ল। হ্যাফ্‌প্যাণ্টপরা ছেলেগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করলাম একজন আড়ময়লা খাকি একটা ফুলপ্যাণ্ট পরে আছে। তার হাতে একটা এয়ারগান। আর একটা ছেলের হাতে একটা মরা পায়রা। বুঝলাম ‘এয়ারগান’টিই ওই হতভাগ্য জীবের

ভবলীলার অবসান ঘটিয়েছে। ফুলপ্যাণ্টপরা ছেলেটার মুখের গর্বিত ভাব লক্ষ্য করে অনুমান করলাম সে-ই বোধ হয় শিকারী। একটা রোগাগোছের ছেলে চীৎকার করে বলছে—আমিই তো দেখিয়ে দিয়েছিলাম পায়রাটাকে। মোটা বেঁটে চশমাপরা আর একটা ছেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল—মিথ্যুক কোথাকার । তুমি দেখিয়ে দিয়েছিলে, না আমি? পাশেই ছেঁড়া-কেড্‌স্-পরা ট্যারা যে ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল সে রুখে এগিয়ে এল। বেঁটে ছেলেটাকে কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ফুলপ্যাণ্টপরা ছেলেটাকে সম্বোধন করে বললে—তুমিই বল না। এই ফ্লাওয়ার মিলের ফোকরে যে পায়রা থাকে, তা আমিই তোমাকে প্রথমে বলিনি? আর একজন ছেলে বলে উঠল—মাইরি আর কি! বুঝলাম ওই বারো-চোদ্দটা ছেলেই প্রত্যেকেই ওই মৃত পায়রাটির উপর অধিকার সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করছে। প্রত্যেকেরই চোখের দৃষ্টি লোলুপ। কিন্তু হায়, পায়রা যে মাত্র একটি।

এখানে কাল শখের থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' হয়েছিল। আমি যেতে পারিনি। মনু গিয়েছিল। মোটরে তাকে পৌঁছে দিয়ে আমি 'কলে' বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কথা ছিল ফেরবার সময়ে তাকে তুলে নিয়ে যাব। কিন্তু ফেরবার সময় রাস্তায় মোটরটা গেল বিগড়ে। ঠিক করতে বেশ দেরি হয়ে গেল। মনুকে হেঁটেই ফিরতে হয়েছিল। মনু বললে—ফেরবার সময় দেখলুম মণিবাবু মোটরে করে যাচ্ছেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও রয়েছে। আমাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—গাড়ি কোথায়? বললাম, আসবার কথা ছিল, কি জানি কেন আসেনি। শুনে মণিবাবু মুচকি হেসে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন। তাঁর এটুকু ভদ্রতা হল না যে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেন!

শহরের লোকে জানে মণিমোহন বসু আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু!....একটু পরে সুবলবাবু এলেন। তিনি আমার এবং মণিমোহন উভয়েরই বন্ধু। ইংরেজীতে যাকে 'কমন ফ্রেণ্ড' বলে তাই। তাঁকে মণিবাবুর ব্যবহারের কথাটা বললুম। তিনি হেসে উত্তর দিলেন, —এতেই আশ্চর্য হচ্ছেন? ওর বাড়ির উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ আছে। তার ফল কখনও খেয়েছেন একটাও? প্রত্যেকটি পেয়ারা বিক্রি করে। কখনও হাত তুলে কাউকে কিছু দিতে জানে না। হাড় চামার। আমার ধারণা ছিল মণিবাবু সুবলবাবুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু! কিন্তু বন্ধুত্বের নীচে যে এমন বিষ-ফল্গু বহমান তা জানতাম না।

আজ আমার বাগানের ক্রোটন গাছ দুটোর শ্রী দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রাণের প্রাচুর্য যেন উথলে উঠেছে রঙে, রূপে, লাবণ্যে। তার পরই মনে পড়ল রাজেনবাবুর কথা। তিনিই এই ক্রোটনের ডাল দুটো এনে পুঁতে দিয়েছিলেন। আমি বাগান ভালোবাসি, রাজেনবাবু আমাকে ভালোবাসতেন। এই দুই ভালোবাসার মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে ওই ক্রোটন গাছ দুটিতে। রাজেনবাবু আজ কোথায় জানি না, তাঁর যে দান সামান্য বলে মনে হয়েছিল, তাই আজ অসামান্য হয়ে উঠেছে। আজ মনে হচ্ছে মানবতার নিগূঢ় মহত্ত্ব যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে ওই গাছ দুটিতে। ঝারিতে করে জল এনে নিজে হাতে গাছ দুটিকে স্নান করালাম। মালীটা অবাক

হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল না যে আমি বাইরে গাছকে স্নান করাচ্ছি বটে, কিন্তু মনে মনে অভিষিক্ত করছি রাজেনবাবুকে কৃতজ্ঞতা দিয়ে। আজ এটা আমার জীবনের পরম দিন।

সুরেন বক্‌সি তাঁর বড় জুরি গাড়ি হাঁকিয়ে আজ এসেছিলেন। তাঁর শৌখিন স্প্যানিয়েলটার কানে ঘা হয়েছে তাই দেখাবার জন্যে। এ অঞ্চলে পশু-চিকিৎসক নেই বলে দরকার হলে পশুদের চিকিৎসা আমিই করি। আমি ঘায়ে লাগাবার একটা ওষুধ আমার ডিস্‌পেনসারি থেকেই দিলাম আর একটা ইন্‌জেক্‌শনের কথাও বললাম। বললাম, ওটা ওখানে কোথাও পাবেন না, কলকাতা থেকে আনাতে হবে। দামী ওষুধ। সুরেন বক্‌সি একটু দম্ভভরেই উত্তর দিলেন, দামের জন্য আমি পরোয়া করি না, আপনি আমার নামে ভি. পি. করতে লিখে দিন। লিখে দিলাম। তারপর তাঁকে বিদায় দেবার জন্যে বাইরে এসে একটা মজার জিনিস চোখে পড়ল। দেখলাম, তাঁর সহিসের বাঁ কানে একটা ঘা হয়ে কানটা বেঁকে গেছে। সহিসটি আমাকে দেখে সেলাম করলে। বক্‌সিমশায়ের বাড়িতে অনেকদিন ধরে আছে লোকটি। বক্‌সিমশাই কুকুরের কান সম্বন্ধে এত সচেতন, অথচ সহিসের কান সম্বন্ধে এত উদাসীন কেন বুঝতে পারলাম না। একবার মনে হল সহিসের কানের দিকে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আবার তখনই মনে হল—না থাক, কি দরকার আমার। এ কথা কেন মনে হল কে জানে। এখন মনে হচ্ছে সুরেন বক্‌সি তো অদ্ভুত লোক বটেনই, আমিও কম অদ্ভুত নই।

সোহাগের বিয়ে খুব ধুমধাম করে হয়ে গেল। আমার একমাত্র মা-মরা মেয়েটিকে যে সৎপাত্রের হাতে সম্প্রদান করতে পেরেছি, এতে আমার আনন্দিত হওয়া উচিত। আনন্দিত যে হইনি তা নয় কিন্তু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণও হয়েছি। যদিও মুখে দেঁতো হাসি সবাই বললেন—বাঃ, চমৎকার হয়েছে, খুব আনন্দের কথা। কিন্তু সবাই যে আনন্দিত হননি, অনেকেই যে ঈর্ষা-ক্লিষ্ট হয়েছেন তা বোঝা গেল তাঁদের মুখের ভাব-ভঙ্গীতে। পরশ্রীকাতরতা জিনিসটা বিষ্ঠার মতো, ফুল দিয়ে চাপা দিলেও তার দুর্গন্ধটা গোপন করা যায় না। সেটা প্রকাশ হয়ে পড়েই। সরলতা এবং মহত্ত্ব যেমন চোখে মুখে স্বতঃস্ফূর্ত হয়, কুটিলতা এবং নীচতাও তেমনি হয়। প্রকাশ্যভাবে খুঁতও ধরেছেন অনেকে। অনেককে নাকি ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হয়নি, অনেককে নাকি দেরিতে পাঠানো হয়েছে। হয়তো আমার অজ্ঞাতসারে এসব ত্রুটি ঘটেছে কিন্তু যাঁরা সত্যিই আমার আত্মীয় বা বন্ধু, তাঁরা এসব ত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন? বিনা-নিমন্ত্রণেই তো তাঁদের আমার বাড়িতে আসবার অধিকার আছে, এসেছেনও কতবার, থেকে গেছেন, খেয়ে গেছেন। যাঁরা দূরে আছেন তাঁদের সকলকেই আমি চিঠি লিখেছিলাম, বিয়ের কথা সকলেই জানতেন। ছাপা নিমন্ত্রণপত্রটার জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করে ছিলেন কেন বুঝতে পারছি না।

এই শহরেও আমার দুই একজন তথাকথিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নিমন্ত্রণ-না-পাওয়ার ছুতো করে সরে ছিলেন। একজন বললেন—বরবধূকে উপহার দেওয়াটা এড়াবার জন্যেই আসেননি। এ কথাটা বিশ্বাস হয় না। একটা ঝুটো আত্মসম্মানের কবলে পড়েছেন তাঁরা। আমাকে সত্যি যদি ভালোবাসতেন, বিনা-নিমন্ত্রণেই আসতেন। ভালোবাসা জিনিসটা সত্যই বড় দুর্লভ।

এ বিয়ে উপলক্ষে আরও যে দু' একটা ঘটনা ঘটেছে তা আরও মর্মান্তিক। বাড়িতে ভিয়ান বসিয়ে অনেক মিষ্টান্ন করিয়েছিলাম। মিষ্টান্নের তদারক করার ভার ছিল গোপীনাথের উপর। লোকটি অনেকদিনের বিশ্বাসী চাকর, সোহাগকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। সে যা বললে তা শুনে চক্ষুস্থির হয়ে গেছে আমার। সে বললে, সোনাপুকুরের বৌদি এবং তার ছেলে-মেয়েরা নাকি মিষ্টান্নের ভাঁড়ারে ঢুকে মিষ্টান্ন চুরি করত। বাল্‌তি বাল্‌তি পানতোয়া, রসগোল্লা, মিহিদানা সরিয়েছে। যদি খেত কষ্ট হত না, কিন্তু খায়নি, সব ফেলে দিয়েছে পাঁদাড়ে। আমাকে অপ্রস্তুত করবার চেষ্টা। তারা যে ফেলে দিচ্ছে এ কথা গোপীনাথ প্রথমে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারামাত্রই আর কাউকে ঢুকতে দেয়নি সে। এতে নাকি অনেক আত্মীয়-আত্মীয়া অপমানিত বোধ করেছেন। এধরনের আত্মীয়-আত্মীয়াদের কবল থেকে কবে আমরা পরিত্রাণ পাব।

আমার একদল আত্মীয় চিঠি লিখেছেন তাঁদের আসবার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অনিবার্য 'কারণ'বশতঃ আসতে পারেননি। পরে জানলাম অনিবার্য কারণটা আর্থিক। নিমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গে আমার নাকি গাড়িভাড়াটাও পাঠানো উচিত ছিল। গাড়িভাড়া আমি দিতাম কিন্তু নিমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গে সেটা পাঠানো কি শোভন হত! সে কথার উল্লেখ করাও যে অশোভন। এই আমাদের সমাজ, এই আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের নমুনা! একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। যিনি গাড়িভাড়ার জন্য আসেননি, তাঁর ছেলের বিয়েতে আমি সপরিবারে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তো আমাকে গাড়িভাড়া দেননি, দেবার প্রস্তাবও করেননি। অথচ তিনি যে খুব গরীব লোক তা-ও নন, ছেলের বিয়েতে নগদ মোটা পণও নিয়েছিলেন।

আজ হঠাৎ নুটবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখা হল। মুনসেফ ছিলেন ভদ্রলোক, সাবজাজ্ হয়ে রিটায়ার করেছেন। যখন সাবজজ্ ছিলেন তখন মোটর ছিল, চাপরাসী ছিল, স্যুট পরতেন, হাকিমি গাম্ভীর্যে বিচরণ করতেন বাছা বাছা অফিসারদের সমাজে। আজ হঠাৎ তাঁকে দেখলাম রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছেন সাধারণ বাঙালী পোশাক পরে। আধময়লা ধুতি, আধময়লা শার্ট, পায়ে হতশ্রী একজোড়া অ্যালবার্ট শু, হাতে বাজারের থলি। মুখে বার্ধক্যের চিহ্ন, চুলে পাক ধরেছে, সামনের দাঁত নেই। তিনি যে আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তা বুঝতে পারিনি। আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, দেখে মনে হল আমাকে বোধহয় চিনতে পারেননি। বললাম—"নুটবিহারীবাবু যে। নমস্কার। চিনতে পারছেন?" মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গেল তাঁর।

"কে, ও, ডাক্তারবাবু! আজকাল এখানেই আছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, মাস দুই হল বদলি হয়ে এসেছি।"

"প্রমোশন হল?"

"মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছেছি"

"সিভিল সার্জন হয়েছেন তাহলে—। ভালো—"

"আপনিও বদলি হয়ে এসেছেন না কি এখানে?"

"আমি রিটায়ার করেছি। এখানেই আছি একটা বাড়িভাড়া করে—"

"কোথায় আছেন?"

ঠিকানাটা জেনে নিলাম। সন্ধ্যার পর গেলাম তাঁর কাছে। অনেকদিন এক ডিস্ট্রিক্টে একসঙ্গে ছিলাম। গিয়ে দেখলাম একটা আড়ময়লা লুঙ্গী পরে একটা ভাঙা বেতের চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে দেখে নিজেই আর একটা চেয়ার টেনে বার করে আনলেন। সেটাও খুব মজবুত বলে মনে হল না। বসলুম। এক কাপ চা-ও খাওয়ালেন। ময়লা পেয়ালায় অতি জোলো চা। গল্প হল খানিকক্ষণ। তাঁর চাকুরী জীবনেরই গল্প। কবে কোন্ সাহেব তাঁকে কি বলেছিল, কার কার চক্রান্তে তাঁর আশানুরূপ উন্নতি হল না—এই কথা খালি। সারাক্ষণ যেন হায় হায় করে গেলেন। চুপ করে শুনলাম সব। ভালো লাগছিল না, তবু শুনলাম। শেষে জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন কি করেন?"

"বাজার করি আর বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে সামলাই। আর সময় পেলে অঙ্ক কষি কি করে আমার পেন্সন দিয়ে সংসার চালাব। সকালবেলা অবশ্য পুজো করি খানিকক্ষণ, স্বামী জীবনানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে চলে যাই। চিঠিপত্র লেখালিখি করছি—"

নুটবিহারীর সম্বন্ধে একটা খবর জানি। ছাত্রজীবনে তিনি ইংরেজি সাহিত্য ভালো করে পড়েছিলেন। ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর এম্-এ। সেক্স্পীয়র আর ব্রাউনিং সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর নিজের জীবনে কিন্তু সেক্স্পীয়র বা ব্রাউনিংয়ের চিহ্নমাত্র দেখলাম মা। তাঁদের পরীক্ষার খাতায় ফেলে এসেছেন, সঙ্গে করে আনতে পারেননি। সাধারণ লোকের মতোই হায় হায় করছেন।

তপেনবাবু আমার প্রতিবেশী। এখন এক আফিসে কেরানীগিরি করেন। বিয়ে করেননি। বলেন চাকরির উন্নতি না হলে বিয়ে করবেন না।

তপেনবাবুর বাড়িতে কিন্তু তপেনবাবুর চেয়ে অনেক বড় আসন তপেনবাবুর বোন রঙ্গনার। তাকে ঘিরেই বাড়িতে সর্বদাই আসর সরগরম। মেয়েটি রূপসী নয়, রং কালোই। কিন্তু হাবভাব মুগ্ধ করে দেয়। চোখের দৃষ্টিতে এবং যৌবনের সাবলীলতায় আগুন আছে। সেই আগুনে পুড়ে মরবার জন্যে একদল পুং-পতঙ্গ প্রায়ই সন্ধ্যের সময় ভিড় করে। মেয়েটি নাচ গান অভিনয় সব বিষয়েই পটীয়সী। তবলা আর ঘুঙুরের আওয়াজ প্রায়ই শুনতে পাই। তপেনবাবুর আফিসের যিনি হর্তাকর্তা বিধাতা, তিনি প্রবীণ লোক। তিনিও রোজ আসেন সন্ধ্যেবেলায়। সুতরাং মনে হচ্ছে এবার তপেনবাবুর চাকরির উন্নতি হবেই।

দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মহাভারতের আমলেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আগে সমাজে তাদের স্থান ছিল একটা বিশেষ পল্লীতে, বিশেষ সীমার মধ্যে। গৃহস্থের অঙ্গনে তাদের বসতি ছিল না। এখন আমাদের সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, তাই সব সীমারেখাও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। পুরনারীদের মধ্যে কে বরনারী, কে বারাঙ্গনা তা এখন ঠিক করা মুশকিল। মালা ভ্রমে সাপকে গলায় দুলিয়ে বেড়াচ্ছেন অনেকেই। এ দেশেও ফরাসী সমাজ গজিয়ে উঠল।

একটা নূতন ফেরিওলা এসেছিল। এ শহরের প্রায় সব ফেরিওলাকেই চিনি আমি। এ

লোকটি অচেনা। তার কাছ থেকে একটা ছুরি কিনলাম। তারপর জিগ্যেস করলাম—এখানে কোথায় আছ? সে বললে, ধরমশালায় আছি। কোথাও আমি বেশীদিন থাকি না। এক সপ্তাহের বেশী কোথাও থাকিনি। ভারতবর্ষের সব শহরেই দু চারদিন করে থাকবার ইচ্ছে আছে তার। তার জীবনে বেড়ানোটাই লক্ষ্য, ফেরি করাটা উপলক্ষ মাত্র। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক শহরে বেশীদিন থাক না কেন? সে হেসে বললে, বেশীদিন থাকলে মন খারাপ হয়ে যায় বাবু। বেশী মাখামাখি করলে মানুষের চক্‌চকে ভাবটা আর থাকে না, গিল্টি বেরিয়ে পড়ে, মন খারাপ হয়ে যায়।

তার কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। এরকম দার্শনিক ফেরিওলা আগে কখনও দেখিনি। ফেরিওলার কথা শুনে নবকিশোরের কথা মনে পড়ল। লোকটাকে দেবতা মনে করেছিলাম। তার চেহারায় কথাবার্তায় সত্যিই একটা দেবত্ব ছিল। কিন্তু বেশী মাখামাখি করবার পর গিল্টি বেরিয়ে পড়ল। একদিন সকালে দেখি সে উধাও হয়েছে। আর উধাও হয়েছে আমার ক্যাশবাক্সটা। তাতে আড়াই শ টাকা, দুটো গিনি এবং সোনার ঘড়িটা ছিল।

এখান থেকে কিছুদূরে বড় রাস্তার উপর যে পুলটি ছিল সেটি ভেঙে গেছে। পুল ভেঙে যাওয়া আশ্চর্য নয়, কিন্তু আশ্চর্য হলুম স্বয়ং এক্‌জিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার সেটির তদারক করতে এসেছেন দেখে। মফঃস্বলের এক পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় পুল ভেঙেছে তার জন্যে স্বয়ং এক্‌জিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার এসেছেন, এ যে মশা মারতে কামান দাগা। সাধারণত সাব-ওভারশিয়ার বা বড়জোর ওভারশিয়ার এসব ছোটখাটো ব্যাপারে আসেন এবং তাঁরা যা রিপোর্ট দেন তদনুসারেই গভর্নমেণ্ট টাকা খরচ করেন; এক্‌জিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ারের আবির্ভাব একটু অস্বাভাবিক বলে ঠেকল।

তাব পরদিন ভদ্রলোক নিজেই এলেন আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে এক শিশি কার্মিনেটিভ মিক্‌শ্চার নিতে। বললেন—"ওটা আমি সর্বদা সঙ্গে রাখি এবং দুবার করে খাই। খেলে ভালো থাকি। এক শিশি আমাকে করে দিন।" করে দিলাম। তারপর আলাপ হল তাঁর সঙ্গে। দেখলাম নগেনবাবু বেশ সদাশয় এবং রসিক। বিলেত-ফেরত, বড় চাকরি করেন, কিন্তু অহংকারের লেশমাত্র নেই। চমৎকার হাসিখুশী লোক। খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতেই বললেন—"ও, তাহলে তো বেঁচে যাই মশাই। চাপরাসীর হাতের রান্না খেতে খেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেছে। পেঁয়াজ আর লঙ্কা ছাড়া তৃতীয় কোন মসলা জানা নেই মহাপ্রভুদের—কিছু যদি মনে না করেন, একটা অনুরোধ করবো?" "কি বলুন—।" "একটু শুক্তো করাবেন। মুখটা বদলে নেব।" বললাম, "বেশ তো, বেশ তো—এ আর বেশী কথা কি।" আলাপ ঘনিষ্ঠতর হতে জিগ্যেস করলুম—"আচ্ছা এই অজ পাড়াগাঁয়ের পুল দেখতে আপনি এসেছেন কেন বুঝতে পারছি না।" একটু হেসে বললেন—"ওভারশিয়ার চক্রবর্তী আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে।"

জিগ্যেস করলাম—"কে তিনি?"

হেসে বললেন—"তিনি একজন পুরানো পাপী। এখন রিটায়ার করেছেন। এরকম ধূর্ত লোক আমি আর জীবনে কখনও দেখিনি। কালো বামুন। কুচকুচে কালো রং। চোখমুখে একটা

শেয়াল-শেয়াল ভাব। প্রতিবছরই সে একটা পুরানো পুলের মেরামতি বাবদ একটা বিল করত। আমি আসবার আগে থেকেই করত। আমার আগে অন্তত পাঁচজন এক্‌জিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার তার এ বিল পাস করেছে। আমিও করে দিতাম। পুলটি ছিল একটি পাড়াগাঁয়ের রাস্তায়। সেখান থেকে রেলোয়ে স্টেশন কুড়ি মাইল দূরে। স্টেশন থেকে গরুর গাড়ি করে কিংবা বাইকে করে কিংবা হেঁটে সে জায়গায় পৌঁছাতে হয়। এ কষ্ট স্বীকার করে কোনও এক্‌জিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার সে পুল দেখতে যায়নি। আমিও যাইনি। রিপেয়ারের বিল প্রতি বছর পাস হয়ে যেত কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। স্টেশন থেকে ওই কুড়ি মাইল রাস্তা, জঘন্য ছিল সেটা। পাবলিকে অনেকদিন থেকে ওটা পাকা বাস্তা করে দেবার জন্যে আন্দোলন করছিল। হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল ওটা পাকা করা হবে। আমাকে যেতে হল সেখানে। ঠিক তার আগেই ওভারশিয়ার চক্রবর্তী ওখানকার পুল রিপেয়ারের জন্য টাকা চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম—'পুলটা একবার দেখব। তারপর তোমার বিল স্যাংশন করব।' গিয়ে কি দেখলুম জানেন?" "কি— ?" "কোনও পুল নেই! Non-existent পুলের রিপেয়ার খরচ বছরের পর বছর নিয়ে যাচ্ছে চক্রবর্তী!"

"বলেন কি। কি করলেন?"

"তারপর একটা নাটকীয় কাণ্ড করল চক্রবর্তী! আমার পায়ে পড়ে পা জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। শৃগালের চোখে কুমীরের অশ্রু ঝরনার মতো পড়তে লাগল। কিছুতেই পা ছাড়ে না। শেষটা তাকে বলতে হল—'আচ্ছা, এবার তোমায় মাপ করলুম, কিন্তু আর এরকম যেন না হয়।' পরের বছর দেখি আবার চক্রবর্তী সেই পুল রিপেয়ারের বিল এসেছে! তার দিকে চাইতেই সে বললে—'আমার কথাটা শুনুন আগে সার। বিল এনেছি, কারণ বিল না দিলে অডিট্‌ ধরবে না? যে পুল গত দশ বছর ধরে বছর-বছর মেরামত হচ্ছে, এবার সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকলে সন্দেহ হবে না তাদের? এবার বিলটা পাস করে দিন, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজটা ভেঙে ফেলবার একটা অর্ডার আর এস্টিমেটও দিয়ে দিন। তারপর থেকে আর বিল আনব না।" হো হো করে হেসে উঠলেন নগেনবাবু। তারপর বললেন, "সেই থেকে কোনও পুল ভাঙলে তা সে যত ছোটই হোক, নিজের চোখে দেখে আসি।"

কাল রাত্রি এগারোটার সময় বিপিন কাকা কোন খবর না দিয়ে এসে উপস্থিত তাঁর বিধবা মেয়েটিকে নিয়ে। বিপিন কাকার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই। বাবাকে উনি দাদা বলতেন বলে আমরা ওঁকে কাকা বলি। এসেই একটি মিথ্যে কথা বললেন—চিঠি দিয়েছিলাম, পাওনি? চিঠি হারানো যে অসম্ভব তা নয়, কিন্তু সাধারণত আমার চিঠি হারায় না। তাছাড়া তাঁর চোখমুখ দেখেই মনে হচ্ছিল তিনি মিথ্যে কথা বলছেন। বিপিন কাকা ধার্মিক মানুষ। রাত এগারোটার সময় এসে তিনি গরম জলে স্নান করলেন। তারপর পুজো করলেন একঘণ্টা ধরে। তারপর চা খেয়ে গল্প করলেন একটু। মনু অত রাত্রে উনুন নিবিয়ে শুদ্ধাচারে তাঁর মেয়ের জন্য লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম করে দিলে। জিগ্যেস করলাম—"বিপিন কাকা, হঠাৎ এসে পড়লেন যে। কখনও তো খবর নেন না—"

একমুখ হেসে বিপিন কাকা বললেন, "তোমার জন্যে মনটা বড় উতলা হয়ে উঠলো। অনেকদিন দেখিনি তো—"

"আপনার মেয়েকে সঙ্গে এনেছেন কেন—"

'টুপিকে? পাশের গাঁয়েই ওর শ্বশুরবাড়ি যে। তোমার মোটরটা নিয়ে কালই ওকে পৌঁছে দিয়ে আসব—"

বুঝলাম উতলা হওয়ার কথাটাও সর্বৈব মিথ্যে।

শীতলবাবুর বক্তৃতা শুধু যে শোনবার মতো তা নয়, দেখবার মতোও। তিনি বক্তৃতা দিতে দিতে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করেন। তাঁর নিজের জীবনের ঘটনাবলীই তাঁর বক্তৃতার উৎস। তিনি প্রায়ই বক্তৃতা করেন, আজকাল ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে কোন লাভ নেই। লেখাপড়া শিখে আর ক'টাকা রোজগার করবে? দলে দলে বি-এ, এম-এ, এম-বি ফ্যা ফ্যা করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথাটা মিথ্যে নয়, শীতলবাবুর বলবার ভঙ্গীও ওজস্বিনী। কিন্তু তাঁর বক্তৃতাটা সার্থক হত যদি তিনি নিজের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে আধুনিক ভাষায় যাকে বলে 'আপ্রাণ' চেষ্টা—তা না করতেন। চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর চারটি ছেলেই বখা হয়েছে, নানারকম শৌখিন বেশভূষা করে পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা মেরে বেড়ানোই তাদের কাজ। যাদের ছেলেরা লেখাপড়ায় ভালো শীতলবাবু সাধারণত তাদেরই শুনিয়ে শুনিয়ে উক্ত বক্তৃতা অঙ্গভঙ্গী সহকারে করে থাকেন। তাঁর নিজের পুত্রবধূ সুন্দরী হয়নি, তাঁর বন্ধু বগলাবাবুর পুত্রবধূটি হয়েছে। শীতলবাবু বগলাবাবুকে বলেছিলেন—বউ সুন্দরী হয়ে কি তোমার চারটে হাত-পা বেরিয়েছে? বউ সুন্দরী হওয়া ভালো নয়। পাঁচজনে নজর দেবে, বখা ছেলেরা বাড়িতে উৎপাত করবে। বগলাবাবু বন্ধুকে চিনতেন, মুচকি হেসে চলে গেলেন। তিনি চলে যাবার পর শীতলবাবু বললেন—সুন্দরী না হাতি! ঢিবির মতো কপাল, ছোট ছোট চোখ, মুখের হাঁ ইয়া বড়। অঙ্গভঙ্গী করে দেখালেন সব।

আধুনিক বাংলা উপন্যাস পড়লাম সেদিন একখানা। ইনিয়ে বিনিয়ে কেবল মেয়েমানুষের কথা। কেবল Sex, Sex আর Sex —ও ছাড়া অন্য প্রসঙ্গই নেই। ওর কথাই নানা রঙে ফেনিয়ে নানা ঢঙে বলবার চেষ্টা করেছেন ভদ্রলোক। আমার মনে হল ভদ্রলোক Sex starved ঃ মনে হল গল্পলেখার ছুতোয় তারিয়ে তারিয়ে কামরসটা নিজেই তিনি যেন উপভোগ করছেন। অপরের পক্ষে যা বীভৎস ও ন্যক্কারজনক তাঁর পক্ষে তাই স্বাভাবিক। আমি ক্ষুধার্ত লোককে নর্দমা থেকে ভাত তুলে তুলে খেতে দেখেছি। কোনও নৈতিক বক্তৃতা দিয়ে এদের সংশোধন করা যাবে না। আসল কারণটা সম্ভবত অর্থনৈতিক। জীবনকে ভোগ করবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু লোভ আছে প্রচুর।

কাল রাত্রে আমার জীবনে একটি মহা লাভ হয়েছে। পরম প্রাপ্তি। একটি অকৃত্রিম ভক্তের দেখা পেয়েছি। কৃত্রিম ভক্ত জীবনে অনেক জুটেছে। বস্তুত তাদের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি। তাঁরা যখন আমার প্রশংসার তোড়ে আমাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেন, তখন মনে হয় যেন মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা-ধোওয়া হোজ্ পাইপের সামনে পড়ে নাকানি-চোকানি খাচ্ছি।

কারো মুখের সামনে তার অজস্র প্রশংসা করা যে নিন্দা করার চেয়েও বেশী অশোভন এবং গর্হিত, এ জ্ঞান অনেকের থাকে না। থাকে না, কারণ তাঁরা প্রশংসা করেন কোনও মতলবের তাগিদে। মতলবের তাড়ায় মানুষের শোভন-অশোভন জ্ঞান লোপ পায়। তাঁরা তখন বানরকে কন্দর্পকান্তি এবং ভীরু দুর্বলকে বীরেন্দ্র বলতেও ইতস্তত করেন না। আমার জীবনে এরকম মতলববাজ লোকের দেখা অনেক পেয়েছি।

কিন্তু কাল রাত্রে যে লোকটি বৃষ্টিতে ভিজে রাত বারোটায় স্টেশনে আমার জন্যে দাঁড়িয়েছিল সে অন্য জাতের। আমি কাল রাত্রে সপরিবারে প্রচুর মাল-পত্র নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরেছি। আমার ড্রাইভারকে এবং চাপরাসীকে খবর দেওয়া ছিল, কিন্তু তারা কেউ স্টেশনে আসেনি। এসেছিল ওই লোকটি। জিতু জেলে। বাজারে মাছ বিক্রি করে। হাসপাতালে অনেকদিন আগে তার এক যক্ষ্মাগ্রস্ত আত্মীয়কে নিয়ে এসেছিল, আমি তাকে স্যানাটোরিয়মে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিই। কর্তব্য হিসাবেই করেছিলাম, কোনও প্রতিদান প্রত্যাশা করিনি। কথাটা মনেও ছিল না আমার। স্টেশনে গাড়ি থামতেই জিতু এগিয়ে এল, আমি প্রথমটা চিনতেই পারিনি তাকে। তার মাথায় পাগড়ি বাঁধা ছিল। আমাকে প্রণাম করে বললে সে তার সেই আত্মীয়টির খবর দিতে আমার বাসায় আজ গিয়েছিল। গিয়ে দেখল ড্রাইভার আলি মদ খেয়ে বেহোঁশ হয়ে পড়ে আছে, আমার চাপরাসী শিউরামের জ্বর হয়েছে খুব। সে-ও প্রায় বেহোঁশ। জিতু ঝড় জল মাথায় করে নিজে তাই স্টেশনে এসেছে যাতে আমার কোনও কষ্ট না হয়। কুলি ডেকে আনলে, নিজেও কয়েকটা জিনিস নামালে, একটা গাড়ি আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছিল। জিতুর মুখভাবে একটা অসাধারণ ভাব ফুটে উঠেছে দেখলাম। অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধার আলোকে তার চোখমুখ প্রদীপ্ত। মুগ্ধ হলাম।

মুগ্ধ হলাম বললেও সবটা ঠিক বলা হয় না, বলতে হয় কৃতার্থ হলাম। তারপরেই বিস্মিত হলাম মনে মনে। আমার মধ্যে কি এমন আছে যা দেখে ও এমন ভক্তি-গদগদ হয়ে পড়েছে। আমি তো অতি সামান্য লোক। ওর ভক্তিভাজন হবার যোগ্যতা কি আছে আমার? পুরাণের সেই গল্পটা মনে পড়ল। এক ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে বাড়ি ফিরেছে। গুরু তাকে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করবার অনুমতি দিয়েছেন। ছেলেটি বাড়িতে এসে কপাটে ধাক্কা দিতেই তার মা কপাট খুলে দিলেন। ছেলে মাকে প্রণাম করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—বাবা কোথায়? মা বললেন, ভিতরে আছেন, এস। ভিতরে এসে কিন্তু তার বাবাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু দেখা গেল খিড়কির দুয়ারটি খোলা রয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর পাওয়া গেল না তাঁকে। তিনি ফিরলেন এক বছর পরে।

ছেলে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে?"

বাবা উত্তর দিলেন, "বনে। তপস্যা করবার জন্যে।"

বিস্মিত হয়ে গেল ছেলে। প্রশ্ন করল—"হঠাৎ এ ইচ্ছা হল কেন?"

বাবা উত্তর দিলেন—"তুমি যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে ফিরে এসে তোমার মাকে প্রণাম করছিলে তখন আমি তোমাকে উঠোন থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম তোমার ললাটে তপস্যা-লব্ধ জ্যোতি জ্বলজ্বল করছে। দেখে আমার মনে হল—আমি কি ওর প্রণাম নেবার যোগ্য? সংসারের সংঘর্ষে আমার চরিত্র যে মলিন হয়ে গেছে! তাই আমি খিড়কির

দরজা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বনে চলে গিয়েছিলাম তপস্যা করতে, মলিন চরিত্রকে উজ্জ্বল করতে। এক বৎসর অধ্যবসায়ের ফলে আমার সে সাধনা সিদ্ধ হয়েছে। এখন তুমি আমাকে প্রণাম করতে পার।"

আমার মনে হচ্ছে আমি কি জিতু জেলের ভক্তিভাজন হবার উপযুক্ত? আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, ও যদি জেলে না হয়ে কালচার্ড ভদ্রলোক হত তাহলে কি রাতদুপুরে বৃষ্টিতে ভিজে সামান্য উপকারের ঋণ শোধ করবার জন্য আসত? আমার বিশ্বাস আসত না। আজকাল 'কালচার্ড' মানেই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক।

কানাই মাড়োয়ারির ব্যবহারে সেদিন হৃদয়ঙ্গম করলুম কেন ওরা ব্যবসায়ী হিসাবে এত উন্নত। আমার এক ভাইঝি প্রসব হবার জন্য আমার কাছে এসেছিল। হাসপাতালের নার্স লুইসাকে সেজন্য মেহনত করতে হয়েছিল খুব। উপর্যুপরি দু'দিন রাত জেগেছিল, প্রায় এক মাস রোজ দু'বার করে এসে 'ড্রেস' করে দিয়ে গিয়েছিল। অন্য কোন জায়গায় হলে অন্তত সে দেড়শ টাকা রোজগার করত। কিন্তু আমার কাছে 'ফী' চাইতে পারে না। তাই ঠিক করলুম ওকে একখানা ভালো শাড়ি কিনে দেব। কানাই মাড়োয়ারির দোকান থেকে ভালো শাড়ি নিয়ে এলাম একখানা। হালকা হলুদ রঙের শাড়ি। মনু বললে—কাল যেটেরা পুজো। কালই ওকে দিও শাড়িখানা। সন্ধ্যের সময় লুইসা এলে তাকে দেখানো হল শাড়িটা। রং পছন্দ হয়েছে কিনা। লুইসা দক্ষিণ-বাসিনী। খ্রীষ্টধর্ম বরণ করেছে বটে, কিন্তু তামিল রক্ত ওর ধমনীতে বহমান। লুইসা হেসে বললে—আমার ডগমগে গাঢ় রং পছন্দ। 'I prefer deep colour'।

তার পরদিন ভোরে উঠেই গেলাম কানাইয়ের দোকানে। কানাই বললে—আজ রবিবার, আমার দোকান বন্ধ। আর আমার সেল্‌স্‌ম্যান মহাদেবের কাছে দোকানের চাবি থাকে। তার বাড়ি মাইল দুই দূরে। কাল যদি শাড়িখানা বদলে দি, হবে না? বললাম, কিন্তু আজ যে যেটেরা পুজো। ওই সঙ্গেই শাড়ি দেওয়া নিয়ম আমার স্ত্রী বলছে। বেশ, তোমার যদি অসুবিধা হয়, কালই বদলে দিও। শাড়িটা তার কাছে রেখে এলাম।

ঘণ্টা দুই পরে দেখি মহাদেব রিক্‌শা করে এসে হাজির। রিক্‌শায় প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের বস্তা! মহাদেব বললে—কানাই নিজে সাইকেল করে আমার বাড়ি গিয়েছিল, তার কথামত আমি ব্যাঙ্গালোর শাড়ি দোকানে যতগুলো ছিল সব আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আপনার যে রংটা পছন্দ বেছে নিন। কানাইয়ের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

এ কাহিনীর আর একটা চমৎকার ভাষ্য করেছেন আমার বাঙালী বন্ধুরা। হাসপাতালের যুবতী নার্স লুইসার শাড়ির জন্য আমি দোকানে ছুটোছুটি করছি—এর একটি অর্থই তাঁদের চিত্তে প্রতিভাত হয়েছে এবং সেটা তাঁরা ফুসফুস গুজগুজ করে আলোচনা করছেন!

বাংলার বাইরে এই শহরে কিছুদিন থেকে এসেছি। এখানকার যে বাঙালী সমাজ নিজেদের 'প্রবাসী' বলে চিহ্নিত করে রেখেছেন তাঁদের দুরবস্থা দেখলে সত্যিই বড় হতাশ হয়ে পড়তে হয়।

এককালে বাংলা দেশের কৃতী-সন্তানরা এখানে এসে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেদের। সকলে তাঁদের খাতির করত, তাঁরা খাতিরের উপযুক্তও ছিলেন। তাঁরা অর্থোপার্জন

করেছিলেন প্রচুর, এখানকার জনহিতকর কাজে ব্যয়ও করেছেন প্রচুর। এখানকার স্কুল, হাসপাতাল, কলেজ তাঁদের নামের সঙ্গে জড়িত। তাঁদের নিজেদেরও প্রত্যেকের প্রাসাদোপম বাড়ি আছে এখানে। জমিজমাও আছে। জমিদারিও ছিল কারো কারো।

কিন্তু তাঁদের বংশধরদের দেখে হতাশ হতে হয়। গরুড়ের বংশে এরকম চামচিকেদের জন্ম হল কি করে! ছেলেদের মধ্যে অধিকাংশই লেখাপড়ায় খুব খারাপ। সবই প্রায় থার্ড ডিভিসন। গুণ্ডামিও করতে পারে না ভালো করে, ছোঁচামি করে। প্রতি বাড়িতেই বড় বড় মেয়ে, অনেকেরই বিয়ে হয়নি, অনেকেই ব্যভিচারিণী হয়ে পড়েছে, অনেক সময় প্রকাশ্যেও। এদের দুর্গাপূজার তিন চারটে দল, লাইব্রেরীও একাধিক, কোনটাই ভালোভাবে চলে না, প্রত্যেকটাতেই দলাদলি আর ঘোঁট। ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ এদেশে জন্মেছিলেন, তাই তাঁর নামে 'জয়ন্তী' মাঝে মাঝে হয়। পঁচিশে বৈশাখটা তো একটা পর্বের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা নিজেদের বাপ-মায়ের জন্মদিন কবে তা জানে না, তারা কবির জন্ম-উৎসবে নাচতে, গাইতে বা বক্তৃতা করতে আসে। উৎসবের নামে কি যে প্রহসন হয় তা বোঝবার ক্ষমতাও এদের নেই। বিহারীদের নিন্দায় এরা পঞ্চমুখ। কিন্তু আমার মনে হয় মানুষ হিসাবে বিহারীরা এদের চেয়ে অনেক ভালো, অনেক বেশী ভদ্র।

বাঙালীর ছেলেরা চাকরি পায় না তার একটা বড় কারণ এখানকার অধিকাংশ বাঙালী ছেলেই চাকরি পাওয়ার যোগ্য নয়। আমি অমুক বাবুর নাতি বা দৌহিত্র—এ বললে তো আর চাকরি মিলবে না। যোগ্য বাঙালীরা চাকরি পায়নি এরকম দৃষ্টান্তও আছে। এই নিয়ে অনেকে গলাবাজি করে চীৎকার করেন। তাঁরা ভুলে যান যে চাকরির ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্রই পক্ষপাতিত্ব আছে। নিজেদের লোককে সবাই চাকরি দিতে চায়। এরাও চায়।

এ বিষয়ে কিন্তু বাঙালীরা ব্যতিক্রম, বাঙালী বড় চাকুরেরা সাধারণত বাঙালীদের প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না—এইরূপ জনশ্রুতি। যোগ্য বাঙালী চাকুরী-প্রার্থী বাঙালী অফিসার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন এরকম একাধিক খবর আমি জানি। এত কথা লিখলাম মনের দুঃখে।

একটা খবর পেয়ে দুঃখটা নতুন করে অনুভব করলাম। জগদীশবাবু মারা গেছেন। তিনি পোস্টাফিসে কাজ করতেন। অনেকদিন আগে রিটায়ার করেছেন। পাড়ার ছেলেরা আমার কাছে চাঁদা চাইতে এসেছিল শবদাহের ব্যবস্থা করবার জন্যে। তাঁর পরিবার নাকি কপর্দকশূন্য।

অতীতের গর্ব আঁকড়ে ধরে আমরা বেঁচে আছি ভবিষ্যতের আশায়, এ কথা অনেকে বলেন। কিন্তু সেটা কি সত্যি? একজন বাঙালীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন বাঙালীদের ইতিহাসের খবর সে রাখে কি না। দেখবেন কিচ্ছু রাখে না। নিজের বংশেরই পুরো খবর রাখে না। দেখবেন কিচ্ছু রাখে না। নিজের বংশেরই পুরো খবর রাখে না। আস্ফালন করবার বেলায় কেবল বলে, আমাদের রবীন্দ্রনাথ. আমাদের বিবেকানন্দ, আমাদের অরবিন্দ। কিন্তু একটু চেপে ধরুন, দেখবেন রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানে না সে। নামগুলো জানে শুধু। আর সেইগুলোকে মূলধন করে মাঝে মাঝে নাচ-গান-বক্তৃতার মজলিস বসায় নিজেকে জাহির করবার জন্যে। হায় ভগবান, কোথায় চলেছি আমরা? সমূলে ধ্বংস হওয়াটাই কি এ জাতির অনিবার্য পরিণাম?

কাল মনের দুঃখে বাঙালীদের সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম আজ নিজেই তার প্রতিবাদ করেছি, কারণ আজ অরুণের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অরুণ বসুকে আগে কখনও দেখিনি। তার মায়ের অসুখের জন্যে আমাকে ডাকতে এসেছিল। পিতৃহীন অরুণ নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছে। অর্থাভাবে লেখাপড়া বিশেষ হয়নি, কিন্তু সে মানুষ হয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি সে তিন বিঘে জমি পেয়েছিল। একা নিজের হাতে চাষ করে সে তিন বিঘে জমিতে শাকসব্জির বাগান করেছে। পৈতৃক বাড়ি ছিল একখানা। কিন্তু মেরামতের অভাবে পড়ে গিয়েছিল সেটা। অরুণ নিজের হাতে মাটির দেওয়াল দিয়ে ছোট বাড়ি করছে আবার। চমৎকার তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে বাড়ি। বাড়িটা তার বাগানের মধ্যেই। কারও সাহায্য না নিয়ে নিজের হাতে করেছে বাড়িখানা। বাড়িতে লোক বেশী নেই, সে আর তার মা। মাকে পরম সুখে রেখেছে দেখলাম। একটি গাই আছে, সেইটি নিয়ে থাকেন তিনি । দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

তার মায়ের ম্যালেরিয়া হয়েছে। একটু খারাপ ধরনের ম্যালেরিয়া, সারতে একটু সময় নেবে। আমি ফী নিতে চাইনি। কিন্তু অরুণ বললে, আপনি ফী না নিলে স্বস্তি পাব না। মনে হবে গরীব বলে আপনি আমার উপর দয়া করলেন। কিন্তু আমি গরীব নই, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স প্রায় আড়াইশো টাকা।

অরুণের মতো ছেলে বাঙালী জাতির গৌরব। জানি না এরকম ছেলে বাঙালীদের মধ্যে আরও আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে বাঙালীরা আবার গৌরবের শিখরে আরোহণ করবে। অরুণ শহর থেকে অনেক দূরে থাকে বলে তাকে চিনতাম না। শহরের তথাকথিত অভিজাত বাঙালীদের সঙ্গে তার নিজের কোন যোগাযোগ নেই।

এক রিক্‌শাওলার মুখে এক ভদ্রলোকের কথা শুনলাম। যখন ফরসা জামা-কাপড় পরেন, ঘন ঘন সিগারেট খান, পুলিসে চাকরি করেন—তখন তাঁকে 'ভদ্রলোক' বলতেই হবে। কিন্তু মনে মনে ভাবছি—তাঁকে 'মাল' বলব না 'চীজ্' বলব, না স্যাম্পল বলব! কোন্‌টা ঠিক মানাবে ওই পুলিসপুঙ্গবকে? ঘটনাটা এই। পুলিস-অফিসারটি উক্ত রিক্‌শাওলার রিক্‌শায় চড়ে প্রায় মাইল দুই গেলেন দুপুর রোদে। গলদঘর্ম রিক্‌শাওলা কপালের ঘাম মুছে যখন ভাড়া চাইলে তখন অবাক হয়ে গেলেন।

ভাড়া! ভাড়া চাইছে তাঁর কাছে?

বললেন, "আমি কে চেন?"

"না হুজুর—"

"আমি দারোগা। তোমার রিক্‌শার নম্বর কত দেখি। ও, ১৭৫। আচ্ছা। কত ভাড়া চাই তোমার—"

ঘাবড়ে গেল রিক্‌শাওলা। বললে,"মাপ করবেন, আমি চিনতে পারিনি। মেহেরবানি করে আমার নামে রিপোর্ট করবেন না, হুজুর।"

হুজুর বললেন,"কিন্তু তোমার নম্বরটা যে কাঁটার মতো বিঁধে গেল মনে। সে কি অমনিতে উঠবে?"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল রিক্‌শাওলা।

"ও কাঁটা তুলতে হলে কিছু সেলামী লাগবে।"

"কত হুজুর—"

"অন্তত এক টাকা—"

টাকাটা দিয়ে সেলাম করলে রিক্‌শাওলা, তার পর ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

রিক্‌শাওলাটা আমার কাছে এসেছিল তার ছেলের ওষুধ নিতে।

"আমি আপনার পুরো ফী দিতে পারব না। কিছু মাপ করুন, পুলিসের জ্বালায় আমরা মারা যেতে বসেছি—"

বলে, ওই কাহিনীটি আমাকে বললে।

আমি বললাম, "তোমাদের তো ইউনিয়ন আছে। তোমরা এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই পার—"

সে বললে, "ইউনিয়ন? ছিল বটে আগে একটা। এখন সেটা উঠে গেছে—"

"কেন—"

"আমরা চাঁদা দিয়ে যে টাকাটা জমিয়েছিলাম আমাদের প্রেসিডেণ্ট সেটা মেরে দিয়ে সরে পড়েছেন। শুনছি নাকি বোম্বাই গেছেন।"

"কে ছিলেন প্রেসিডেণ্ট?"

যার নাম করলে সে মোটেই শ্রমিক নয়, এক বড়লোকের বখা ছেলে।

ভাবছি—গরীবগুলোর উপায় কি তাহলে?

মনুর জ্বরটা কাল থেকে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। অর্থাৎ তাকে বিছানা নিতে হয়েছে। অনেকদিন থেকেই না কি একটু একটু জ্বর রোজই হত, আমার কাছে গোপন করে ছিল। কেন করেছিল জানি না। মনুর স্বভাবের মধ্যে কেমন যেন একটা গোপনতা আছে। তার অন্তরলোকে আমার অবাধ গতি, কিন্তু তবু মনে হয় ওর নিজস্ব আর একটা জগৎ আছে যেখানে ও একাকিনী। অসুখে পড়ে ও যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। অপরাধী ধরা পড়ে গেলে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি। আজবলাল আমার চেয়েও বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। চিরঞ্জীব আর মালতীকে টেলিগ্রাম করলুম। ওরা এখানে এসে থাকুক যতদিন না মনু সেরে উঠছে। সারতে দেরি হবে, টাইফয়েড বলে মনে হচ্ছে।

আমার এক ভাগ্নে এসেছিল আমার কাছে। তার পরীক্ষা হয়ে গেছে, সে এসেছিল আমার কাছে একখানা চিঠি নিতে। চিঠি নিয়ে সে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে চাকরির জন্য। বন্ধুটি ইচ্ছে করলে নাকি চাকরি জুটিয়ে দিতে পারে একটা। চিঠিখানা নিয়েই সে চলে গেল, মনুর অসুখের জন্য তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখলাম না। এসেই চলে গেল। যেন পোস্টাফিসে চিঠি ফেলতে এসেছিল।.....সোহাগকে আজ টেলিগ্রাম করলাম আসবার জন্য। মনুর টাইফয়েডই হয়েছে। আগেই আন্দাজ করেছিলাম। এখন রক্ত পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হয়েছি।

মনুর অসুখে বাড়িতে যেন একটা সাড়া পড়ে গেছে। দু'বেলায় অন্তত পঞ্চাশ কাপ চা

হচ্ছে, বৈঠকখানায় বারান্দায় লোকের ভিড়। আমার সহকর্মী ডাক্তাররা সবাই আসছেন, তাছাড়া আসছেন এখানকার প্রতিবেশীরা। আমার রোগীর আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ও কম নয়, তারা সবাই রোজ খবর নিতে আসে। এরা গরীব, এরা অনাত্মীয়, কিন্তু এদের উৎকণ্ঠা দেখে মনে হয় এদের চেয়ে বড় আত্মীয় আমার কেউ নেই। আমার রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়েরা এখনও কেউ আসেননি। দু'চারজন পোস্টকার্ড-যোগে খবর নিতে চেষ্টা করেছেন। আমি বড় ভীত হয়ে পড়েছি। সোহাগ দিনরাত কাঁদছে। মনুর জ্ঞান নাই।

মনুর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যাচ্ছে। কলকাতার একজন বড় ডাক্তারকে আসবার জন্য 'তার' করেছি। এর মধ্যেও 'কলে' বেরুতে হয়েছে আমাকে। রোগীদের বাড়ির বিপদের দিকটাও তুচ্ছ করতে পারি না। তিনটে টাইফয়েড রুগী আমার চিকিৎসায় আছে। আমার উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। সুতরাং আমাকে যেতেই হচ্ছে।

আবার এই সব করুণ রসের মধ্যেও হাস্যরসের খোরাক পেয়ে যাচ্ছি মাঝে মাঝে। মহাকাল যেন জীবন-মরণের একঘেয়েমি নষ্ট করবার জন্যে মাঝে মাঝে চাটনির ব্যবস্থা করছেন।

একটি বাড়ির কর্তা টাইফয়েডে মরণাপন্ন হয়ে আছেন। আজ তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখি একটি লোক বাইরের বারান্দায় বসে হাউ হাউ করে কাঁদছে। লোকটির এক মুখ কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ভুরুও কাঁচা-পাকা, ভুরু দুটি ঝুলে পড়েছে চোখের উপর। চোখের জলে নাকের জলে এই মুখ পরিপ্লাবিত। আমি ভাবলুম কোন আত্মীয় বুঝি। পরে জানতে পেরেছি, আত্মীয় নয়—পাওনাদার। যিনি রুগী তিনি অসুখে পড়বার ঠিক আগেই ওর কাছ থেকে চড়া সুদে হাজার তিনেক টাকা ধার নিয়েছিলেন। বলেছিলেন হ্যাণ্ডনোটটা কাল লিখে দেব। কিন্তু সেইদিন রাত্রেই তিনি জ্বরে পড়েন, আর লিখতে পারেননি!

কুলগুরু এসেছেন। তিনি দক্ষিণাকালীর পূজা করছেন। তারস্বরে পাঠ করছেন দক্ষিণাকালীর স্তব। "করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং" যদি দয়া করে মনুকে ফিরিয়ে দেন। বলিদানের ছাগ-শিশুটা আর্তরব করছে। পূজার হট্টগোল ঘণ্টা কাঁসরে প্রকম্পিত হচ্ছে বাড়িটা। এত গোলমাল আমি কখনও বরদাস্ত করতে পারি না। কিন্তু এখন করছি। কিছু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। একটি কথাই কেবল মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে—মনুর জীবন-সংশয়—হেমারেজ হচ্ছে। যে কোনও উপায়ে হোক ওকে বাঁচাতেই হবে তা সে উপায় যতই হাস্যকর, যতই অদ্ভুত হোক না কেন। এই আগ্রহের কাছে সমস্ত যুক্তি মাথা নত করেছে।

কলকাতায় যে ডাক্তারকে টেলিগ্রাম করেছিলাম তিনি দুঃখিত হয়ে টেলিগ্রাম করেছেন যে সাতদিনের আগে আসতে পারবেন না। হেভিলি এন্‌গেজ্‌ড্‌। ওর সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছিলাম আমি। আমার চেয়ে ও সব বিষয়েই খারাপ ছিল। ফেল করেছিল দুবার। কিন্তু তার বাবা ছিলেন কলকাতার একজন যশস্বী ডাক্তার। টাকার অভাব ছিল না। ছেলেকে বিলেত পাঠালেন এবং সেখানে সে বারকয়েক ফেল করে অবশেষে একটা বিলিতী ডিগ্রি নিয়ে এল। এসে বসতে লাগল বাবারই ডিস্‌পেন্সারিতে। বছর দশেক সেখানে টিকে রইল কোনক্রমে। তারপর

তার প্র্যাক্‌টিস জমল। দশ বছর পরে কলকাতার রুগীরা বুঝতে পারল ও একজন দিগ্‌গজ ডাক্তার। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে আমারও ধারণা হল ও সত্যিই বড় ডাক্তার। মনে হল মনুর চিকিৎসা ও আমার চেয়ে ভালো করে করতে পারবে! টাকার জোরে বারাঙ্গনারাও আজকাল 'দেবী', তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাও প্রথম শ্রেণীর প্রথম সারে দেদীপ্যমান। টাকার জৌলুস সকলেরই বুদ্ধিভ্রংশ করে দেয়।

আমি ভাবতাম আমার বুদ্ধি এসব মেকি জিনিসে অভিভূত হয় না। কিন্তু এখন দেখছি হয়। এখন মনে হচ্ছে কোন্‌টা মেকি কোন্‌টা খাঁটি তা ধরাও শক্ত। হাঁসেদের মধ্যে কোনও বক যদি দীর্ঘকাল বাস করতে পারে, তাহলে সবাই তাকেও হাঁসের মর্যাদা দেবে—হাঁসেরা না দিক, মানুষেরা দেবে। অদ্ভুত জীব এই সামাজিক মানুষরা!

আজবলালকে আর সামলানো যাচ্ছে না। সে মাথা খুঁড়ছে, চুল ছিঁড়ছে, পাগলের মতো হয়ে গেছে। সোহাগের ফিট হচ্ছে বারবার। একমাত্র মালতীই দৃঢ়হস্তে এই বিপর্যস্ত নৌকোটার হাল ধরে বসে আছে। চিরঞ্জীব নির্বাক হয়ে গেছে। আমার অবস্থা অবর্ণনীয়। মনু কাল চলে গেছে।

দিন কয়েক হল বদলি হয়ে এসেছি। বদলি হওয়ার যে কি ঝঞ্ঝাট তা আর ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। গভর্নমেন্টের বাড়ি, গভর্নমেন্টের চাকর-চাপরাসী, যাওয়ার খরচও গভর্নমেন্টের, কিন্তু তবু মনে হয় যেন কি একটা লোকসান হচ্ছে। অর্থের দিক থেকে লোকসান হয় না, কারণ মাইনে যা পাবার ঠিক পাই, নতুন জায়গায় কলও অনেক আসে। কিন্তু তবু মনে হয় লোকসান হল। মনে হয় পুরানো জায়গায় আমার কিছু অংশ যেন ফেলে এলাম, তা উদ্ধার করা যাবে না, হারিয়ে যাবে।

এখানে এসে ক'দিন খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমার আগে যিনি ছিলেন তিনি অসুস্থ হয়ে আমার বাড়িতেই রইলেন ক'দিন। তাঁর কলগুলো আমাকে সামলাতে হল। অফিসের কাজকর্মও অগোছালো অবস্থায় পেয়েছি, ঠিক করে নিতে হচ্ছে সেগুলো। হাসপাতালে সার্জিকাল কেসের ভিড় খুব। তিন-চারটে বড় অপারেশন রোজই করতে হয়। তাছাড়া পুলিস কেস আর পোস্টমর্টেম।

কাল একটা পোস্টমর্টেম করে মন বিকল হয়ে গেছে। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে? বিশেষ করে মেয়েমানুষ? সতীনের ছেলের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে তাকে মেরে ফেলেছে একটা উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে। ছেলেটার বয়স মাত্র দশ বছর। মেয়ের আত্মীয়স্বজনেরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে যে মেয়েটা পাগল। তাই ওকে under observation রেখেছি। আমার পাগল বলে মনে হয় না। খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। দেখে মনে হয় খুব নিশ্চিন্ত ঘুম। যেন ও জীবনের একটিমাত্র কর্তব্য শেষ করে এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। এর পর যাই হোক ও তার তোয়াক্কা করে না।

হঠাৎ মনে হল প্রায় সাত দিন মনুর কথা একবারও মনে পড়েনি। কাজের তোড়ে এই স্মৃতি রঙীন পালকটা ভেসে চলে গেল না কি! লজ্জিত হলাম।

জিতু জেলে ক'দিন আগে এসেছে একটি রোগী নিয়ে। অতদূর থেকে ট্রেনভাড়া খরচ করে এসেছে। বিনা পয়সার রোগী নয়, আমাকে রীতিমত ফী দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে। এখানে একটা ঘর ভাড়া করেছে।

জিতুকে বললাম—"ওর চিকিৎসা তো ওখানেই হতে পারত। এখানে ওকে এত খরচ করিয়ে নিয়ে এলে কেন?"

জিতু বললে—"আপনার উপর আমাদের বিশ্বাস বেশী। অন্য কোথাও চিকিৎসা করিয়ে ভরসা হয় না।"

মালতী বলছিল জিতু প্রায়ই বাড়ির ভিতরে এসে কাঁদে। মনুর জন্য। আমার সামনে কিন্তু সে শোক প্রকাশ করেনি একদিনও। মালতীর কাছে প্রকাশ করেছে লুকিয়ে। মালতীকে বলেওছে আমাকে একথা যেন না জানানো হয়। আমার মনে তাহলে দুঃখ হবে। মালতী কিন্তু কথাটা আমাকে বলে দিয়েছে।

ডায়াবিটস্ সম্বন্ধে একজন ডাক্তার গড়গড় করে অনেক নূতন কথা বলে আমাকে সেদিন তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এত কথা আমি জানতাম না। নবতম সংস্করণেব যে বইটা কিছুদিন আগে কিনেছি, তাতেও এসব কথা নেই। শ্রদ্ধা হল ডাক্তারটির উপর। দিন দুই পরে শ্রদ্ধা কিন্তু আর রইল না। আমার নামেও বিদেশী এক কোম্পানির বিজ্ঞাপনের প্যামফ্লেটটা এল। তাতে দেখলাম ওই সব কথাই লেখা আছে। গান্ধিজীর সেই কথাটা মনে পড়ল—এখনকার ডাক্তাররা বিদেশী ঔষধ ব্যবসায়ীদের দালাল মাত্র।

এসব অবশ্য সত্য যে বিদেশীরাই চিকিৎসাশাস্ত্রে বহুরকম গবেষণা করছেন, তাঁদের গবেষণা ডাক্তারি শাস্ত্রে সত্য বলে স্বীকৃতও হচ্ছে, কিন্তু একথা সমান সত্য যে আমরা মাছি-মারা কেরানীর দল, বিদেশী প্যামফ্লেটে যা কিছু লেখা থাকে তা নির্বিচারে সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং রোগীদের তা কিনতে বাধ্য করি। অনেক সময় রোগীরা এতে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সেদিকে লক্ষ্য থাকে না। আমরা আপ-টু-ডেট চিকিৎসা করে গর্ব অনুভব করি।

একটা আশ্চর্য লোক দেখলাম আজ। 'কল' থেকে ফিরছিলাম। এমন সময় টক্ করে একটা পাথর এসে আমার গাড়িতে লাগল। আর একটু হলে জানালার কাচ ভেঙে যেত। গাড়ি থামালাম। দেখি কালো লম্বা শুঁটকো একটা লোক প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গোঁফ দাড়ি মাথার চুল লম্বা লম্বা, অনেকদিন তেল পড়েনি বলে কটা হয়ে গেছে। কোমরে একটা ন্যাকড়া জড়ানো। উরুর অর্ধেকও ঢাকা পড়েনি তাতে। আমার ড্রাইভার আলী নেমে গিয়ে তাকে জিগ্যেস করলে কেন সে ঢিল ছুঁড়েছিল।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কেবল তার গোঁফের জঙ্গলে একটা শিহরণ বয়ে গেল দেখলুম। তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হল ক্ষমতা থাকলে আমার মোটরটাকে সে ভস্মীভূত করে দিত। কিন্তু কোন কথা বললে না সে।

পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় মোটর দাঁড়ালেই ছেলের দল এসে দাঁড়ায় আশেপাশে। তাদের একজন বললে—ও লোকটা চিড়ি-মার। চিড়িয়া অর্থাৎ পাখি মারে। তীর দিয়ে বা বন্দুকে দিয়ে নয়।

ঢিল ছুঁড়ে। গুলতি দিয়ে ঢিল ছোঁড়ে না, হাত দিয়ে ছোঁড়ে। হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ। চড়ুই, শালিক, কাক, বক—যা সামনে পায় তাই মারে। মেরে পুড়িয়ে খায়। এক জায়গায় দেখলাম কতকগুলো ইঁট স্তূপীকৃত করা রয়েছে। আর তার কাছেই পোড়াবার সরঞ্জাম। দু'খানা দাঁড়-করানো ইঁটের মাঝখানে কয়লা। কয়লা সে কেনেনি, শুকনো ডালপালা পুড়িয়ে করছে।

সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতে প্রাগৈতিহাসিক বন্যযুগের নমুনা দেখে বিস্মিত হলাম।

কাল মনুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজনরা কেউ আসেনি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল এদেশের লোকেরা, যাদের আমরা মূর্খ ছোটলোক বলি, তারা আত্মীয়ের আত্মীয়েরও মৃত্যু হলে সবাই মাথা কামায়। গ্রামসম্পর্কের মৃত আত্মীয়দের সম্মান জানায় এই ভাবে। আমরা সভ্য কিনা, ওদের কাণ্ড দেখে হাসি। এমন বাঙালী বাবুরও খবর জানি যিনি মায়ের মৃত্যুতেও মাথা কামাননি। পুরোহিতকে মূল্য ধরে দিয়েছেন। স্যুটের সঙ্গে ন্যাড়া মাথা নাকি নিতান্ত বেমানান। সুরুচিতে বাধে।

মনুর শ্রাদ্ধে একটি পেশাদার লোভী পুরোহিতকে ডেকে কাজ করালাম এবং দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ নামধেয় অব্রাহ্মণকে ভোজন করালাম এবং তথাকথিত বন্ধুবান্ধব, যাদের পোলাও মাংস খাইয়ে শতাধিক টাকা ব্যয় করলাম তাঁরা আমার কেহই বন্ধু নন। মনে পড়ল মনু একটা পা-কাটা খোঁড়াকে খাওয়াতে ভালবাসত। কিন্তু সে তো থাকে একশ মাইল দূরে!

চাপরাসীকে বললাম—শহরে যত খোঁড়া ভিখারী আছে ডেকে নিয়ে এস। তাদের খাওয়াব।

চাপরাসী ফিরে এসে বললে খোঁড়া ভিখারী একটাও নেই। কানা আর নুলো আছে।

কম্পাউণ্ডার শোভনলাল বললে শিবমন্দিরে এক খোঁড়া সাধু থাকে। বলেন তো তাকে ডেকে আনি।

বললাম, আনো। একটু পরেই আবক্ষদাড়ি এক লাল সন্ন্যাসী ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এসে হাজির। মনে হল সোবিয়েত রাশিয়া থেকে এল নাকি! কারণ তার সব লাল। দাড়ি লাল, মাথার পাগড়ি লাল, জামা জুতো এমন কি ছাতা পর্যন্ত লাল। সে বললে সে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাবে না, তার গুরুজীর বারণ আছে। তবে আমি যদি তাকে কিছু টাকা দি তাহলে সে শিউজির ভোগ চড়িয়ে প্রসাদ পেতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কত টাকা চাই?

সে আমার পিছন দিকে চেয়ে বললে, দশ টাকা। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম শোভনলাল দু'হাতে দশটা আঙুল তাকে দেখাচ্ছে। দূর করে দিলাম লোকটাকে। জিতু জেলেকে আজ দশ টাকা পাঠিয়ে দেব মনুর সেই খোঁড়াকে ভালো করে খাইয়ে দেবার জন্য।

তৃপ্তি-অতৃপ্তির রহস্য ভেদ করা শক্ত। কাল মালতী সামান্য বেগুন বড়ি আর উচ্ছে দিয়ে শুক্তো রেঁধেছিল। এত ভালো লেগেছিল। আজ সেই মালতীই অনেক রকম মসলা দিয়ে মাংসের কোর্মা রেঁধেছে, রান্না ভালোই হয়েছে, চিরঞ্জীব তো বললে চমৎকার, কিন্তু খেয়ে আমার তেমন তৃপ্তি হল না। কালকের শুক্তোটাই বেশী ভালো লেগেছিল। অথচ আগে এই মালতীরই রান্না কোর্মা কত তারিফ করে খেয়েছি।

মালতীর রান্না ঠিক আছে। আমিই বদলাচ্ছি। ওস্তাদী গানের চেয়ে সাদাসিধে রামপ্রসাদী গানই বেশী ভালো লাগে আজকাল।

কম্পাউণ্ডার শোভনলাল আজ চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। এক পাউণ্ড কুইনিন সরিয়েছিল। যে বাড়ি থেকে কুইনিন উদ্ধার হয়েছে, সকলের ধারণা ছিল সেটা ওরই বাড়ি এবং বাড়ির কর্ত্রী ওর বউ। এখন শুনছি অন্যরকম। বাড়িটি বেশ্যাবাড়ি এবং ওই মেয়েটি ওর রক্ষিতা। আরও শুনছি হাসপাতালের সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জনটি—যিনি চন্দনফোঁটায় চিতেবাঘটি সেজে রোজ হাসপাতালে আসেন তিনি নাকি ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনিই পুলিসে খবর দিয়ে শোভন লালকে এই খপ্পরে ফেলেছেন।

আমি পক্ষপাতহীন থাকবার চেষ্টা করছি কিন্তু আমার মনে মনে ইচ্ছেটা শোভনলাল ছাড়া পাক আর ওই চিতেবাঘটা ফাঁদে পড়ুক। এরকম অবৈধ ইচ্ছে মনে জাগা উচিত নয়, কিন্তু জাগছে। বাইরে কিন্তু একটা ন্যায়পরতার মুখোশ পরে আছি। আশ্চর্য!

দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় গাড়ির টায়ার ফাটল। আলী বললে, "কুছ্ ফিকির নেই হুজুর, আভি হাম সব ঠিক কর দেঁতে হেঁ। স্টেপ্‌নি ঠিক হ্যায়।"

কিন্তু দেখা গেল স্টেপ্‌নিও ঠিক নেই। এতেও দমল না আলী। বললে—"কুছ্ ফিকির নেই হুজুর, আভি বানা লেঙ্গে। আপ পেড়কা ঠাণ্ডে মে মজেসে বৈঠ যাইয়ে—"

কাছেই একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়া ছিল। আলী সেখানে আমার বিছানা করে দিলে একটা। আমি ছায়ায় বসে বসে তার চাকা-বদলানো দেখতে লাগলাম।

চাকা-বদলানো কাজটা নিতান্ত সহজ নয়। প্রথমে সে স্টেপ্‌নির ভিতর থেকে টিউবটা বার করলে। তারপর যেখানে-যেখানে ছ্যাঁদা হয়েছে সেগুলো সলিউশন দিয়ে জুড়ে আবার টিউবটাকে তার ভিতরে পুরে পাম্প্ করতে লাগল। পাম্প্ হয়ে গেলে সে বেরুলো ইঁট খুঁজতে। কাছে-পিঠে কোথাও ইঁট ছিল না। সে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। তপ্ত 'লু' বইছে। আলী নির্বিকার। জঙ্গল থেকে খুঁজে ইঁট নিয়ে এল। তারপর 'জক' ফিট্ করে ফাটা টায়ারটা বার করলে। সেটাকে সরিয়ে দিয়ে স্টেপ্‌নিটা ফিট্ করতে লাগল।

আমি আলীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। রোগা লোকটা, বয়স হয়েছে, মুখে জরার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওর জীবনচরিতও কিছু কিছু জানি। ও সব রকম কাজ করেছে। রিক্‌শা চালিয়েছে, টমটম চালিয়েছে, একটা ঘোড়া-গাড়ির কোচোয়ানও ছিল কিছুদিন, মুটেগিরি পর্যন্ত করেছে। বহু জায়গায় ঘুরেছে। বহু মনিবের কাছে মোটরের ড্রাইভারি করেছে। মিলিটারিতে ছিল, দেশ-বিদেশেও ঘুরেছে অনেক। হঠাৎ মনে হল অ্যাব্রাহাম্ লিংকনের মতোই ওর জীবন। কিন্তু ও আব্রাহাম্ লিংকন হয়নি কেন? ওর দুটো সাংঘাতিক দোষের কথা জানি। প্রথমত, ভয়ানক মিথ্যে কথা বলে। দ্বিতীয়ত, সুযোগ পেলেই মদ খায়। চাকা ফিট্ করে আলী বললে—"আইয়ে হুজুর, গাড়ি তৈয়ার হ্যায়।" গাড়িতে বসে আলীকে জিগ্যেস করলাম—"আলী, তুম্ ঝুট্ বাত বোলা হ্যায়—"

"কভি নেহি হুজুর—"

"কভি নেহি বোলো।"
"বহুত খু"—
"দারু পিতে হো?"
"কভি নেহি হুজুর।"
"কভি নেহি পিও।"
"বহুত খু—"
হঠাৎ এই মিথ্যেবাদী মাতালটাকে ভালো লেগে গেল। আব্রাহাম্ লিংকনের চেয়েও!

এই পৃথিবীতেই কি স্বর্গ নরক আছে? মহাপ্রভু সিং এই জীবনেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে দেখতে পাচ্ছি। কিছুদিন আগে যখন জরিপ হয়েছিল তখন মহাপ্রভু সিং আমিনকে মোটা ঘুষ খাইয়ে গঙ্গার ধারের প্রায় তিন চার-মাইল-ব্যাপী জমি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল। তার মধ্যে অনেক বিধবার, অনেক নাবালকের, অনেক গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জমিও ছিল। জমির দখল নিয়ে মকদ্দমা করবার সামর্থ্য ছিল না বেচারীদের। তাদের নীরবে অশ্রুপাত করে নিরস্ত হতে হয়েছিল। মহাপ্রভু সিং সাড়ম্বরে জমিগুলো ভোগ করছিল। গঙ্গার ধারে বিরাট বাড়ি করিয়েছিল, বাড়ির চারদিকে চমৎকার বাগান। শোনা যায় বাগান আর বাড়ি করতে তার হাজার পঁচিশেক টাকা খরচ হয়েছিল। বাড়িটি যেই শেষ হল অমনি কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে হল তাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী না বলে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী বলাই উচিত। স্বয়ং মা গঙ্গা এসে হাজির হলেন তার বাড়ির সামনে এবং দিন সাতেকের মধ্যে বাড়ি-বাগান সব গ্রাস করলেন।

মহাপ্রভু সিংয়ের টাকা ছিল, সুতরাং রোখ চড়ে গেল। আর একটা বাড়ি করালো, সেটাও কেটে গেল। উপর্যুপরি পাঁচটি বাড়ি কেটে গেছে তার। শেষ বাড়িটি করিয়েছিল গঙ্গার ধার থেকে তিন মাইল দূরে। কিন্তু মা গঙ্গা তাকেও রেহাই দেননি, সেখানেও গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। আমিনকে ঘুষ দিয়ে যে-সব জমি সে দখল করেছিল, সব গঙ্গাগর্ভে গেছে। মহাপ্রভু সিং এখন একটা খোড়ো ভাড়াটে ঘরে বাস করে। পাঁচ ছেলে ছিল, সব মারা গেছে একে একে। চোখে দেখতে পায় না। একটা পুরনো চাকর তাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে বেড়ায়। কাল আমার কাছে এসেছিল চিকিৎসা করবার জন্যে। তার সর্বাঙ্গে কি যেন বেরিয়েছে। দেখলাম, কুষ্ঠ হয়েছে। কথাটা শুনে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল। নরক কি এর চেয়েও বেশী ভয়ংকর?

আমার এখানে প্র্যাক্‌টিস বেড়েছে বলে অনেকের রাত্রে ঘুম নেই, অনেকের টনক নড়েছে, অনেকের চোখ টাটিয়েছে। শুনছি আমার বিরুদ্ধে একটা দরখাস্ত গেছে উপরওয়ালার কাছে। আমি নাকি হাসপাতালের কাজ ফাঁকি দিয়ে কেবল প্র্যাক্‌টিস করে বেড়াই। আমি নাকি নিজে বাড়িতে ওষুধ রেখে তা বিক্রি করি।

যে ওষুধ হাসপাতালে নেই বা বাজারে সহজে পাওয়া যায় না, কিংবা যে-সব ওষুধ

ইমার্জেন্সীর জন্য হঠাৎ দরকার হয় তা নিজের কাছে রাখবার অনুমতি আমি অনেক আগেই নিয়ে রেখেছি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। আমি হাসপাতালের কাজ ফাঁকি দিয়ে প্র্যাক্‌টিস করছি এ অপবাদও টিকবে না, কারণ আমি এখানে এসে যতগুলো অপারেশন করেছি এবং রোজ করি, তত আমার আগে কেউ করেননি। সুতরাং ওই দরখাস্ত আমার কেশস্পর্শ করতে পারবে না। হৃদয় স্পর্শ করেছে কিন্তু। দরখাস্তকারীদের নাম জানতে পেরে প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি। সবই প্রায় বাঙালী এবং অনেকেই আমার কাছে উপকৃত।

ব্যাঙ্কের খাতাটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই আজ আলমারির ড্রয়ারগুলো খুঁজছিলাম।

অনেক চিঠি আর পুরনো কাগজপত্রের ভিড়ে যেন দিশেহারা হয়ে পড়লাম। অতীতের পুরানো বন্ধুরা যেন ঘিরে দাঁড়ালো আমাকে একসঙ্গে। যারা একদিন কত আত্মীয় ছিল আজ তারা কে কোথায় আছে জানি না। কয়েকজনের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি। অন্যদের কোন খবরই জানি না। যখন ভাগলপুরে ছিলাম তখন আমার ধোপার নাম ছিল কারু। ছোট একখানা খাতার উপর মনুর হাতের লেখা আছে দেখছি—কারুর হিসাবের খাতা।

মনুর একটা চিঠিও পেলাম। মনু লিখেছে, "তোমার জন্যে আমার বড় ভাবনা হয়। তুমি শরীরের যত্ন কোরো। আজবলালকে বোলো যেন তোমার মোটরের টিফিন কেরিয়ারে রোজ লুচি, তরকারি আর ডিমের ওম্‌লেট করে দেয়। থারমসে ঠাণ্ডা জলও ভরিয়ে নিও। ঠাকুরপো চিঠি লিখেছে তুমি নাকি সকালে খালি পেটে চা খেয়ে বেরিয়ে যাও, আর ফেরো বেলা দেড়টা দুটোর সময়। অতক্ষণ খালি পেটে থাকলে পিত্তি পড়বে না? আজবলালকে দিয়ে খাবার করিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেও। বাবা আমাকে যেতে দিচ্ছেন না এখন, তাই আটকে পড়েছি। কিন্তু তুমি যদি শরীরের উপর অত অত্যাচার কর তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হবে। আমার জন্যে ভেবো না। আমার শরীর বেশ ভালো আছে। আমি মরব না। এদেশে মেয়েরা অমর। আমার আশেপাশে রোজ যতগুলি মেয়ে দেখি তাদের অধিকাংশই বিধবা। আমার কিছু হবে না, তুমি ভেবো না। নিজের শরীরের যত্ন কোরো তুমি। আমি বোধ হয় দিন পনেরো পরে যাব। এই সপ্তাহেই যেতাম, কিন্তু বাবা ছাড়ছেন না.....।"

মানুষ যখন ভবিষ্যদ্বাণী করে তখন তার আত্মপ্রত্যয়ের সীমা থাকে না। কিন্তু মহাকালের বিচারে সব ভবিষ্যদ্বাণী বুদ্বুদের মতো ফেটে যায়। মনু আজ কোথায়? শুধু সে যে সশরীরে বেঁচে নেই তা নয়, আমার মনের ভিতরও নেই। তার স্মৃতি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। আজকাল ক্বচিৎ তাকে মনে পড়ে।

রেভারেণ্ড টমসনের সঙ্গে আজ দেখা হল। দেখা হয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলাম। অত বড় বিদ্বান্‌, অমন শান্ত, অমন নিরহংকার পরোপকারী লোক আমি আর দেখিনি। এক অখ্যাত পল্লীর একপ্রান্তে বাস করেন তিনি একটা মাটির খোড়ো ঘরে। সামনে সামান্য একটু জমি আছে। তারই একাংশ কঞ্চি দিয়ে ঘিরে সামনে একটু শাকসবৃজির বাগান তাঁর। নিজেই তার দেখা-শোনা করেন। স্বপাক খান। অতি সাধারণ খাওয়া। ওই শাকসব্‌জি, ভাত আর একটু দুধ। একটু কথা কয়ে বুঝলাম জ্ঞানের সমুদ্র। ডাক্তারি শাস্ত্রেও আমার চেয়ে বেশী পণ্ডিত বলে মনে হল। ক্যানসার সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় লেখা একটা বই দেখালেন আমাকে।

আমি তাঁকে বললুম—ফরাসী ভাষা আমি জানি না।

তখন তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করে করে কিছু পড়ে শোনালেন। অত বড় পণ্ডিত লোক, কিন্তু কথায় ব্যবহারে বিনয় যেন বিকীর্ণ হচ্ছে আলোর মতো। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা কইলেন যেন আমি তাঁর গুরু। তাঁর শোবার ঘরে দেখলাম একটি বড় ক্রুশ রয়েছে। তার সামনে বসেই তিনি সকাল-বিকেল প্রার্থনা করেন। কাউকে কখনও ক্রিশ্চান হতে বলেন না, বলেন, ভালো হও। তাঁর কাজ হচ্ছে সেবা। অনেকগুলি ছোট ছেলেকে বিনাপয়সায় পড়ান রোজ। কারো অসুখ হলে শুশ্রূষা করেন। সাধারণ ওষুধ বিতরণ করেন বিনামূল্যে। কাছে একটা জঙ্গল আছে সেখানে রোজ যান সকালে। নিজের রান্নার জন্যে সংগ্রহ করে আনেন শুকনো ডালপালা আর সংগ্রহ করেন বটানিক্যাল গবেষণার জন্য নানারকম নমুনা। একটি ছোটখাটো ল্যাবরেটরি আর মাইক্রোস্‌কোপও আছে তাঁর। আর কাছে অসংখ্য ভক্ত যারা তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে ব্যগ্র, কিন্তু তাদের সাহায্য তিনি কদাচিৎ নেন। তাঁর প্যান্টে আর জুতোয় দেখলাম নানারঙের তালি। আসবাবের মধ্যে দুটি কেরোসিন কাঠের টেবিল, গুটি চারেক মোড়া, একটি তক্তাপোশ।

এই সামান্য উপকরণেই তাঁর জীবনে সমৃদ্ধ, পরম আনন্দে বাস করছেন মহর্ষির মতো। শুনেছি কোনো এক বিলিতী মিশনারি ফাণ্ড থেকে তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা পান। তা দিয়ে প্রতিমাসে ওষুধ কেনেন প্রায় কুড়ি টাকার। কুইনিন, অ্যাস্‌পিরিন, সাল্‌ফা ড্রাগস্‌, আইওড়িন, স্পিরিট আর ওইজাতীয় সস্তা সাধারণ ওষুধ।

আমাকে ডেকেছিলেন নিজের দাঁত তোলাবার জন্য। আমি ফী নিতে চাইলাম না। তখন তিনি বললেন—তাহলে আপনার নামে ৫.০০ টাকা আমি ডোনেশনস্বরূপ নিচ্ছি। ডোনেশনের রসিদ একটা দিলেন আমাকে। একাধারে এত গুণের শোভন সমন্বয় আমি আর দেখিনি।

প্রত্যেক লোকই একটা-না-একটা কিছু অবলম্বন করে টিকে থাকেন। বাইরের অবলম্বন নয়, মনের অবলম্বন। এই অবলম্বন না থাকলে মানুষ নোঙ্গরহীন নৌকার মতো সংসার-সাগরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়। এই অবলম্বনই তাঁর শক্তির উৎস, ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র। এই অবলম্বনেরই বোধ হয় অপর নাম অহংবোধ বা অহংকার। কারও জ্ঞানের অহংকার, কারও ধর্মের অহংকার, কারও যশের অহংকার, কারও বা টাকার অহংকার। এই সব নোঙ্গরের সহায়তায় আমরা নিজেদের জীবনকে স্থির রাখবার চেষ্টা করি। যিনি ধার্মিক তিনি ধর্মকে আঁকড়ে থাকেন, যিনি জ্ঞানী তিনি জ্ঞানকে। যিনি ধনী তিনি মনে করেন টাকার জোরেই তিনি টিকে থাকবেন। আজ কিন্তু নেকিচাঁদকে দেখে মনে হল ধনের নোঙ্গরটাই বোধহয় সবচেয়ে বেশী অপলকা। একটা বড় ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে, নেকিরাম ভিখারীর মতো হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। টাকাই তার সর্বস্ব ছিল, এখন সে নিঃস্ব।

আর মাস দুই পরেই আমাকে রিটায়ার করতে হবে। রিটায়ার করে কোথায় যাব? কি করব? আমাদের সমসাময়িক অনেকেই রিটায়ার করে প্র্যাক্‌টিস করতে বসেছেন। এঁদের অনেকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল। আলাপ করে হতাশ হয়েছি। প্রত্যেকেই

দেখলাম আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ, অনেকে আবার বিষকুম্ভ পয়োমুখ। কেউ সুখী নয়। অনেকের ধারণা শহরের লোকেরা তাঁদের যথোচিত মর্যাদা দেয়নি, অনেকের বিশ্বাস তাঁরা জ্ঞানে বুদ্ধিতে এত অধিক উচ্চস্তরের যে সাধারণ লোক তাঁদের নাগাল পায় না। সুতরাং যতটা প্র্যাক্টিস হবে তাঁরা আশা করেছিলেন ততটা হয়নি এবং সেজন্য তাঁরা মনে মনে ক্ষুব্ধ, যদিও বাইরে একটা 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব ফুটিয়ে রেখেছেন। শহরের অন্য ডাক্তারদের প্রতি অসীম অবজ্ঞা তাঁদের।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এরকম একটা ভণ্ডামির মুখোশ পরবার ইচ্ছে নেই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টাকার জন্যে হায় হায় করবারও প্রবৃত্তি নেই আমার। দরকারও নেই। যা রোজগার করেছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু করব কি? চুপ করে তো বসে থাকা যাবে না। কিছু একটা করতেই হবে। অনেকের বুড়ো বয়সে ধর্মে মতি হয়। আমার কিন্তু সে মতি এখনও হয়নি। জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি। ডাক্তারি ছাড়া আর কিছুতে প্রবৃত্তি নেই। আর কিছু জানিও না। কিন্তু কোথায় ডাক্তারি করব! যারা মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখে, অ্যাবর্শন করিয়ে, দালালকে কমিশন দিয়ে প্র্যাক্টিস জমায়, তাদের দলে ভিড়ে গিয়ে গুঁতোগুঁতি করতে হবে শেষে? ওদের চেয়েও respectable তথাকথিত অনেস্ট ডাক্তারও যে নেই তা নয়, কিন্তু তাদের সবজান্তা ভাব, তাদের আত্মম্ভরিতা, তাদের আন্তরিকতার অভাব, তাদের মেকি হাসি এবং লেফাপাদুরস্ত ভদ্রতা আরও অসহ্য মনে হয় আমার কাছে।

মনে আর একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। জীবনের শেষে আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে গিয়ে বাস করব, তাদের নিয়েই থাকব। কিন্তু এখন অনুভব করছি আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ আমার আত্মীয় নয়। অধিকাংশই শত্রু। হয় প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে, না হয় মনে মনে বিরুদ্ধভাব পোষণ করে। কাউকে আমি আপন করতে পারিনি। হয়তো এটা আমার নিজেরই দোষ, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বুঝেছি যে ওদের সঙ্গে বাস করা যাবে না। কি করব তাহলে? কোন্ তীর্থে গিয়ে থাকব? দু'একটা তীর্থস্থানে ইতিপূর্বে বেড়াতে গেছি। ভালো লাগেনি। সমস্যায় পড়েছি কি করব।

এইখানেই একটা বাড়ি কিনে ফেললাম। বাড়িটার অসুবিধা অনেক। শহর থেকে দূরে। পাড়াটাও ভালো নয়। কিন্তু প্রকাণ্ড হাতা আছে বাড়িটার চারধারে। হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারব। শহরের মাঝখানে ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে পারি না আমি। কলকাতায় ওই জন্যেই গেলাম না। সেখানে গিয়ে কিই বা করতুম? তাস খেলা, আড্ডা দেওয়া বা পার্কে চক্কোর দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করার বাতিক আমার নেই। কলকাতা একটা সমুদ্র বিশেষ। তার মধ্যে সাপ-হাঙরও আছে, আবার মণি-মাণিক্যও আছে।

অনেকদিন কলকাতায় বাস করলে মনের মতো সঙ্গী হয়তো পেতে পারতুম। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ গিয়ে তা পাব না। কিছুদিন আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম। দেখলাম সব অচেনা। চেনা লোকেরও অচেনা হয়ে গেছে। সবাই নিজের নিজের ঘানিতে বাঁধা, অপরের দিকে তাকাবার কারও অবসর নেই। দেখা হলেই মুচকি হাসিটা আর নমস্কারটাও যেন বাঁধা ফরমূলার মতো যন্ত্রচালিতবৎ। প্রাণ নেই, আন্তরিকতার অভাব। এরকম মরুভূমিতে টেকা যাবে না। তাই এখানে থাকাই স্থির করলাম। এখানে অনেককেই চিনি, অনেকে আমাকেও চেনে। এদের মধ্যে থেকেই বাকি জীবনটা কাটাব। পুরাতন উপকরণ দিয়েই নূতন জীবনের রাস্তা একটা তৈরি করতে হবে ভেবে-চিন্তে। দেখা যাক কি করতে পারি।

এখানকার স্বরূপ পাণ্ডের ছেলে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তাকে কাঁকে নিয়ে যেতে বলেছিলুম, কিন্তু নিয়ে যায়নি। নিয়ে গিয়েছিল এক দেহাতী কবিরাজ বজ্‌রংগী মিশিরের কাছে। বজ্‌রংগী মিশির বেশ কৃতবিদ্য কবিরাজ। কাশীতে অনেকদিন পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু তিনি কবিরাজী প্র্যাক্‌টিস করেন না, করেন চাষবাস। স্বরূপ পাণ্ডের সঙ্গে তাঁর নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হয়েছিল। স্বরূপ পাণ্ডেকে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন—"কে আপনি, কি চান?"

"আমার ছেলে পাগল হয়ে গেছে"

"তা আমি কি করব—"

"আপনার কাছে চিকিৎসার জন্যে এনেছি—"

"আমি চিকিৎসা করি না। তাছাড়া এখন আমার ফুরসত নেই, আমার গম দৌনি হচ্ছে—"

"যদি দয়া করে একবার দেখেন ওকে—"

"আমি দয়া করলে কিচ্ছু হবে না। মহাপাপ না করলে লোকে পাগল হয় না। ভগবান দয়া করলে কিছু হতে পারে। আমি দয়া করলে কিছু হবে না।"

"না, তবু কিছু ওষুধ বলে দিন—"

"পাপের ওষুধ প্রায়শ্চিত্ত। তাই কর গিয়ে—"

স্বরূপ পাণ্ডে বিব্রত হয়ে পড়লেন।

তারপর বললেন—"আপনার উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস। আপনার নাম শুনে এসেছি। এমন করে তাড়িয়ে দেবেন না।"

"ও আমার উপর বিশ্বাস আছে না কি? আচ্ছা, তাহলে এক কাজ কর। ওই যে কুয়োটা দেখছ ওর জল তুলে ওকে খাওয়াও আর ওই জলে ওকে চান করাও—"

"আর কোন ওষুধ দেবেন না?"

"ওই ওষুধ।"

এই বলে মিশিরজী তাঁর ছাতা আর লাঠি নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেলেন। মিশিরজীর বাড়ির চাকর দীনু বললে—"উনি যা বললেন তাই এখন করুন কয়েকদিন। যদি ওই করে কয়েকদিন টিকে থাকতে পারেন তাহলে উনি ভালো করে দেখে ওষুধ দেবেন।"

সাত দিন পরে মিশিরজী বললেন—"আচ্ছা, এবার ওকে আন দেখি।"

প্রায় আধঘণ্টা নাড়ী ধরে বসে রইলেন। তারপর ওষুধ দিলেন। স্বরূপ পাণ্ডের ছেলে ভালো হয়ে ফিরে এসেছে।

আমার প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। খুব বড় একটা স্টেশন ওয়াগন কিনলাম। তাতে শোবার জায়গা, রাঁধবার জায়গা, এমন কি ছোটখাটো একটা ড্রইংরুমের মতোও আছে। শতকরা আশীটা অসুখ যে সব সাধারণ ওষুধ দিয়ে সারে সেগুলোও অনায়াসে রাখা যাবে ওতে। প্রচুর জায়গা আছে গাড়িটাতে। ভ্রাম্যমাণ ডাক্তার হব ঠিক করেছি। গ্রামে গ্রামে হাটে বাজারে ঘুরব। চিকিৎসা করব সাধারণ লোকদের। চিকিৎসা করব পয়সা রোজগার করবার জন্য নয়, নিজের তাগিদে। কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা না করলে হতাশার কবলে পড়তে হবে না।

।। চার।।

মৎস্যব্যবসায়ী আবদুলের বাড়ি শহর থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে। সেখানে একটা খোলার ঘরে সে সপরিবারে বাস করে। ডাক্তার সদাশিবের মোটর তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। আর মোটরটা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল একপাল উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে।

সদাশিব রমজুকে একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে বেরিয়ে এলেন খোলার ঘর থেকে। আর তাঁর পিছু-পিছু বেরিয়ে এল এক পলিতকেশা বৃদ্ধা। আবদুলের নানী, অর্থাৎ ঠাকুমা। অনেক শোক পেয়েছে সে। স্বামী পুত্র নাতি নাতনী সবই প্রায় মারা গেছে। বেঁচে আছে কেবল আবদুল আর তার ছেলে রমজু। বুড়ীর পরনের কাপড় ছেঁড়া ময়লা। মুখের ভাবে কোন স্নিগ্ধতা নেই। আছে একটা 'মরিয়া' ভাব। সদাশিব মোটরের ভিতর থেকে কয়েকটি গুলি বার করে তার হাতে দিয়ে বললেন—"চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবে। দেখি, তোমার চোখের খবর কি—"

চোখের পাতা তুলে দেখলেন।

"পাকতে দেরি আছে এখনও। আগামী শীতে কেটে দেব তোর ছানি।"

বুড়ী ঝাঁজিয়ে উত্তর দিলে—"দরকার নেই আমার চোখ কাটিয়ে। পারো তো আমার কান দুটোও কালা করে দাও। আমি কিছু দেখতেও চাই না, শুনতেও চাই না—"

ডাক্তার সদাশিব বুড়ীর থুতনিটি নেড়ে হেসে বললেন—"এত রাগ কেন নানী? ভগবানকে ভুলে গেছিস্?"

এই কথায় ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল নানী। ময়লা কাপড় দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললে—"আমি ভগবানকে ভুলিনি ডাক্তারবাবু, ভগবানই আমাকে ভুলেছেন।"

সদাশিব করুণ দৃশ্য এড়িয়ে চলতে চান।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে বললেন—"আলী, হাজিপুর হাটে চল।"

"বহুত খু"—

।। পাঁচ।।

হাজিপুরের হাট প্রকাণ্ড হাট। রাস্তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা গাছ আছে। প্রচুর ছায়া। সেই ছায়াতে টেবিল আর চেয়ার পেতে রোগী দেখছিলেন সদাশিব। একটি ফোল্‌ডিং টেবিল আর ফোল্‌ডিং চেয়ারও থাকে তাঁর মোটরে। রোগী অনেক। অধিকাংশই সাধারণ রোগ। ম্যালেরিয়া, আমাশয়, চোখ-ওঠা, খোস, দাদ। যক্ষ্মাও আছে দু'একটা।

একটা খাতায় নাম, অসুখের লক্ষ্মণ এবং ওষুধের ব্যবস্থা লিখে নিজে হাতেই ওষুধ দেন সদাশিব। ওষুধের প্রকাণ্ড বাক্স একটা পাশেই থাকে। তাতে খোপ-খোপ করা। কুড়িটা শিশি আঁটে। সব ওষুধই ট্যাবলেট-করা। পুরিয়া-করাও আছে কিছু কিছু। আর আছে ইন্‌জেক্‌শন। সেগুলো আর প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি আলাদা একটা বড় ব্যাগে থাকে। স্টেথোস্কোপ, ব্লাড প্রেসার মাপবার যন্ত্র, থার্মোমিটার, ছোট একটা মাইক্রোস্‌কোপ, স্লাইড, স্টেন এই সব। দরকার বুঝলে ওই গাছতলায় বসেই রক্ত, প্রস্রাব, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা করে নেন সদাশিব। আর একটা তালাবন্ধ বাক্সও থাকে তাঁর পিছন দিকে। সেটার ডালার উপরে লম্বাটে গোছের ছিদ্র আছে

একটা। তাতে ওষুধের দাম বাবদ যে যা খুশি দিতে পারে। কারো কাছে তিনি দাবি করেন না কিছু, যার যা খুশি দেয়। কেউ যদি না-ও দেয় আপত্তি করেন না সদাশিব।

তিনি এই বাক্সের ব্যবস্থা করেছেন কারণ অনেক লোক বিনাপয়সায় চিকিৎসা করাতে চায় না। আত্মসম্মানে বাধে। তাদের সম্মান বাঁচাবার জন্যেই এই বাক্সটি। বাক্সে যে পয়সা রোজ পড়ে তাতে ওষুধের দাম তো উঠে যায়ই, পেট্রোলের দামও উঠে যায়।

সদাশিব রোগী-দেখা শেষ করে উঠতে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটি রোগা আধ-ঘোমটা দেওয়া মেয়ে এগিয়ে এসে হঠাৎ তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল।

"এ কে—"

পাশেই একটা ট্যারা লোক দাঁড়িয়েছিল, সে অকারণে একটু হেসে বললে—"ও কেব্‌লী।"

"কি চায়—"

"ওর আদমিকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে। দারোগাবাবু আপনাকে খাতির করেন, আপনি যদি বলে দেন একটু ছাড়া পেয়ে যাবে।"

"হঠাং থানায় ধরে নিয়ে গেল কেন?"

"ছবিলাল মোড়লের বাড়ি চুরি হয়েছে। তিনি ওর নাম বলে দিয়েছেন দারোগাবাবুকে—"

"ওর নামই বা বলতে গেলেন কেন শুধু শুধু।"

"কি জানি। কেব্‌লী বলতে পারবে—"

কেব্‌লী থেমে থেমে বললে—"ছবিলালবাবু আমার 'আদমি'কে তাঁর খাপরার ঘর ছেয়ে দিতে বলেছিলেন। গতবার মজুরি দেননি বলে এবার ও যায়নি। তাই উনি আমার এই সর্বনাশ করেছেন।"

কেব্‌লী কাঁদতে লাগল।

সদাশিবকে বলতে হল—"আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে দেখব।"

সদাশিব তারপর হাটের ভিতর ঢুকলেন। কিছু কিনতে হবে। প্রতি হাটেই কিছু-না-কিছু কেনেন তিনি। তাঁর সংসারে খাবার লোক কেউ নেই, তবু কেনেন। এর জন্যে মালতীর কাছে বকুনি খেতে হয়। মালতী বলে—"এত সব খাবে কে। ঘরে পড়ে শুকোবে, না হয় পচবে!" সদাশিব হেসে উত্তর দেন—"খাবার লোকের কি অভাব আছে। দাই, চাকর, তাদের ছেলেমেয়েরা, ভিকিরি—সবাইকে খাওয়াও না।" "অত ঝক্কি আমি পোয়াতে পারব না"— মালতী বলে বটে, কিন্তু পোয়াতে হয়। রোজই বাড়িতে আট-দশটা পাতা পড়ে। আজবলাল এতে মনে মনে খুব খুশি হয়, কিন্তু মুখে গজগজ করে। বলে—"একি বাজে খরচা!"

হাটে ঢুকেই সদাশিবের দেখা হল বিলাতী সাহের সঙ্গে। চালের বড় ব্যবসাদার। চক্‌চকে টাক, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। ফতুয়া একটা পরেছে বটে, কিন্তু ভুঁড়ি ঢাকেনি। ভুঁড়ো নাক, নাকের নীচে কটা রঙের সামান্য গোঁফ। বেশ ভারী মুখ। হাসলে এবড়ো-খেবড়ো হল্‌দে দাঁত বেরিয়ে পড়ে। সদাশিবকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করলে বিলাতী সাহ।

"কেমন আছ বিলাতী?"

"হুজুরকা কির্‌পা। চলে যাচ্ছে।"

"আমার জন্যে চাল রেখেছ?"

"ভালো চাল এলে নিজেই পাঠিয়ে দেব।"

"আচ্ছা।"

এগিয়ে গেলেন সদাশিব তরকারির বাজারের দিকে।

কয়েকটি বড় কুমড়ো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কুমড়ো তিনি খান না। কিন্তু কুমড়োগুলোর নধর চেহারা দেখে কিনতে প্রবৃত্ত হলেন। যে বুড়ী কুমড়ো বিক্রি করছিল সে যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। বেশ বড় দেখে ভালো একটা কুমড়ো বেছে দিয়ে বললে— "এইঠো লে যা বেটা—"

"দাম কত?—"

বুড়ী দেহাতী হিন্দী ভাষায় বললে—"তোর যা খুশি তাই দে—"

সদাশিব তাকে দুটো টাকা দিলেন।

"ওত্ না দাম নেই হোতে, আট আনা দে—"

সদাশিব হেসে বললেন তিনি কুমড়োর দাম দিচ্ছেন না, তিন টাকাটা দিচ্ছেন তার মেয়ে রৌশনকে। বছরখানেক আগে বিধবা হয়েছিল সে।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন, "রৌশনকে দেখছি না, সে কোথা?"

"তার আবার বিয়ে দিয়েছি ডাক্তারবাবু। জোয়ান মেয়েকে কতদিন আর ঘরে রাখব।"

"বেশ করেছিস।"

সদাশিবের সম্মতি পেয়ে নিশ্চিন্ত হল বুড়ী।

তারপর সদাশিব অগ্রসর হলেন মাছের বাজারের দিকে। ভালো মৌরলা মাছ ছিল। তাই কিনলেন কিছু। মাছের বাজারে দেখা হল বাবুলাল মেথরের সঙ্গে।

"তোর এ বউ কেমন হল?"

একটু সলজ্জ হাসি হেসে বাবুলাল বলল—"ভালোই তো মনে হচ্ছে—"

"রাধিয়ার সঙ্গে মারপিট করছে না তো!"

"না। দুজনে খুব ভাব।"

প্রথম বউ রাধিয়ার ছেলে হয়নি বলে বাবুলাল আর একটি বিয়ে করেছে। বাবুলালই মৌরলা মাছগুলি তার গামছায় বেঁধে নিয়ে মোটরে পৌঁছে দিয়ে এল।

একটা ফেরিওলা লাল-নীল কাগজের তৈরী পাখি বিক্রি করছিল। পাখির পিঠে লম্বা রবারের সরু ফিতে আটকানো। ফিতে ধরে নাড়ালে পাখি নাচে। কয়েকটা কিনলেন সদাশিব। 'কেঁদ' বলে একরকম ফল বিক্রি হয় এদেশে। কালচে-কমলা রং। খেতে মিষ্টি। একটি লোক এককোণে কয়েকটি 'কেঁদ' নিয়ে বসে ছিল। সদাশিব সেগুলিও কিনে নিলেন। কিছু তরি-তরকারিও কিনলেন। দোকানদাররাই সে-সব পৌঁছে দিয়ে এল তাঁর গাড়িতে।

হাট থেকে বেরিয়ে তিনি গেলেন থানায় সিংহেশ্বর সিং দারোগার কাছে। নামে যদিও সিংহেশ্বর কিন্তু দেখতে জিরাফের মতো। ছিপছিপে রোগা, ঘাড়টা খুব লম্বা। গালে মুখে চোখের কোলে ধবল হয়েছে। সদাশিবই চিকিৎসা করছেন তাঁর। কথা বলার ধরনটা একটু বেশী রকম উচ্ছ্বসিত।

"আইয়ে আইয়ে ডাক্‌টার সাব। কেয়া সৌভাগ্য, কেয়া সৌভাগ্য—"

চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন এবং একটু ঝুঁকে সদাশিবের হাত দুটি ধরে বললেন,—"আইয়ে, আইয়ে, আইয়ে—"

"কি খবর। ওষুধ খেয়ে কিছু উপকার হল?"

"দো একঠো সাদা দাগকা বিচ্‌মে তো রং লগা হ্যায়।"

"তাহলে আস্তে আস্তে সারবে। সময় নেবে কিছু। আমি একটা অন্য দরকারে এসেছি। এখানকার নারায়ণ বলে একটা লোককে আপনি ধরে এনেছেন—"

"হ্যাঁ।"

তারপর তিনি যা বললেন কেব্‌লী তা আগেই তাঁকে বলেছিল। ছবিলাল মোড়লের নির্দেশ অনুসারেই নারাণকে ধরতে হয়েছে।

"নারাণের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আছে?"

"না। এন্‌কোয়ারি চল রহা হা—"

"ওকে ছেড়ে দিন। ও নির্দোষ।"

গম্ভীর হয়ে গেলেন সিংহেশ্বর। সরু গোঁফের উপর আঙুল বুলোতে লাগলেন। হাঁটু নাচালেন বারকয়েক। তারপর বললেন—"আপ যব কহ্‌তে হেঁ তব জরুর দেঙ্গে—"

তারপর তাঁর লম্বা গলাটা বেঁকিয়ে সদাশিবের কানে কানে বললেন, ছবিলালবাবুকেও যদি সদাশিব অনুরোধ করতেন তাহলে তাঁর পক্ষে সুবিধা হত। সদাশিব বললেন—"ছবিলাল লোকটা সুদখোর মহাজন। ওর সঙ্গে আমার তেমন আলাপও নেই।"

সিংহেশ্বর এর উত্তরে হিন্দীতে যা বললেন তার বাংলা মর্মার্থ—"আলাপ করে রাখুন, আখেরে কাজ দেবে। উনি কংগ্রেসীদের পাণ্ডা, তারপর হরিজন, ওঁর একটা বাজেমার্কা ছেলে কেবল শিডিউল্‌ড্ কাস্ট বলে ভালো চাকরি পেয়েছে। ওই চাকরি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ভালো ভালো ছেলেরা পায়নি। ওদেরই এখন প্রতাপ খুব—আলাপ করুন ওর সঙ্গে।"

সদাশিব চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন—"আপনি নারাণের বিরুদ্ধে যদি প্রমাণ না পান, ছেড়ে দিন। দেবেন তো?"

"আপনি যখন বলছেন তখন দেব। কিন্তু ছবিলালজী ওর উপর চটেছেন কিনা, তাই একটু খতরা আছে, —দেখি।"

তারপর সিংহেশ্বর তাঁর ছোট ছেলে 'মুন্না'কে এনে দেখালেন। সর্বাঙ্গে খোস হয়েছে। তাকে ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন সদাশিব।

সেদিন সদাশিব তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন—

"ইংরেজদের হাত থেকে শাসনভার আজকাল যাঁদের হাতে গেছে তাঁরা শুধু যে অকর্মণ্য তাই নন, তাঁরা অসাধুও। এঁদের শাসনকালে দেশের সত্যিকার উন্নতি কিছু হয়নি। স্কুল-কলেজে ছেলেদের শিক্ষা হয় না। তারা গুণ্ডা হচ্ছে। শিক্ষকদের মারে, ভদ্রলোকদের হুমকি দেয়,

মেয়েদের প্রকাশ্যে রাস্তায় অপমান করে, বিনা টিকিটে ট্রেনে বাসে চড়ে। পুলিস এদের কিছু বলে না। যদি কোন পুলিস বলে তাহলে তারই সাজা হয়, এদের হয় না। কর্তৃপক্ষ এদের তোয়াজ করেন, কারণ ইলেকশনের সময় এদের উপরই ভরসা তাঁদের। বাজারে খাদ্যদ্রব্য এত দুর্মূল্য যে সাধারণ লোক তা কিনতে পারে না। দুধ মাছ মাংস ডিম খুব কম লোকে খায়। চাল ডাল, তরি-তরকারিও এত দুর্মূল্য যে পেট ভরে খেতে পায় না। অথচ শোনা যায় নাকি সদাশয় গভর্নমেণ্ট চাষের উন্নতির জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। টাকা খরচ হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে টাকা ঢুকছে তাঁদের পেটোয়া লোকদের পেটে।

"এখানে একটা পোল্ট্রি ফার্ম আছে। সেখান থেকে সাধারণ লোকে মুরগী বা ডিম পায় না। সেখানকার একজন কর্মচারী বলেছিলেন—'অফিসার আর মিনিস্টাররা সব মুরগী আর ডিম নিজেরা খেয়ে ফেলেন। পাব্লিককে দেবার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকলে তো দেবে!' বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ধার করে এনে যে-সব বড় বড় কাণ্ড-কারখানা হচ্ছে এদেশে সে-সবের মধ্যেও চুরি-জোচ্চুরি এবং পেটোয়া-পোষণের ধুম পড়ে গেছে নাকি। আসল কাজ যতটা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি।

"সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিজন আর শিডিউল্ড্ কাস্টের লোকেদের পোয়া বারো হয়েছে, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা নিষ্পিষ্ট হয়ে মারা যাচ্ছে। তাদের মুখের ভাষা পর্যন্ত কেড়ে নেবার চেষ্টা করছেন ওঁরা। মুসলমান আমলে ফারসী আদালতের ভাষা ছিল, ইংরেজদের আমলে ছিল ইংরেজি—এঁদের আমলে এঁরা করছেন হিন্দী। অন্যান্য ভাষাকে পিষে হিন্দীর জগদ্দল রোলার চালিয়েছেন এঁরা। সাধারণ স্কুলে ইংরেজি অবহেলিত হচ্ছে। কিন্তু মিনিস্টারদের ছেলেরা বিলাতী স্কুলে, কনভেণ্টে, কিন্টারগার্টেনে ইংরেজি ঠিক শিখছে। কারণ তারা জানে যে ইংরেজী না জানলে আধুনিক জগতে এক পা-ও চলা যাবে না। তারা চলবে, কিন্তু পিছনে পড়ে থাকবে হতভাগ্য তারা যারা হিন্দী ছাড়া আর কিছু শেখেনি।

"আমাদের স্বাধীন ভারতে আর একটা ব্যাপারও হচ্ছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে লোপ করে দেবার চেষ্টা করছেন কর্তৃপক্ষরা। তারা শিক্ষা পাচ্ছে না, চাকরি পাচ্ছে না। নানা অজুহাতে—কখনও জমিদারপ্রথা লোপ করে, কখনও বা জমির সিলিং করে—তাদের বিষয়-সম্পত্তিও সরকার বাজেয়াপ্ত করছেন। মজুরদের মাইনে বা মজুরি সাতগুণ আটগুণ বেড়েছে—কিন্তু শিক্ষকদের, ডাক্তারের, কেবানীর, এমন কি গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতনও সে অনুপাতে বাড়েনি। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেরাই এই সব কর্মে নিযুক্ত। এদের কারও চিত্তে সুখ নেই। সবাই মনে মনে গোমরাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ভুলে গেছেন যে স্বাধীনতা-সুখ আজ তাঁরা রাজার মতন ভোগ করছেন সে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই ছেলেরা। তাদের ত্যাগ, তাদের আত্মবলিদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু দেশের কর্তৃপক্ষেরা সে ঋণ সম্বন্ধে উদাসীন।

"প্রাদেশিকতা উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রতি প্রদেশে। প্রতিটি প্রদেশই ছোট ছোট পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। সবাই সবাইকে হিংসা ও ঘৃণা করে।

"আমাদের কর্তৃপক্ষদের আজকাল প্রধান কাজ হচ্ছে বিদেশী তোষণ। রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের নেতারা প্রায়ই এদেশে আসছেন, মালা পরে খানা খেয়ে

রাস্তার দুপাশে হুজুকে বেকার লোকদের ভিড় দেখে চলে যাচ্ছেন এবং এই মহৎ কর্মের জন্য আমাদের কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতাকে নিরাপদ করবার জন্যে শক্তিশালী বিদেশী রাজ্যের সঙ্গে দহরম-মহরম রাখা হয়তো প্রয়োজন, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা মূলত নির্ভর করে দেশের লোকের সদিচ্ছা এবং চরিত্রবলের উপর। এই কথাটা কর্তৃপক্ষেরা ভুলে গেছেন।

"আমি নানা স্থানে ঘুরি, নানা স্তরের লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়, বর্তমান গভর্নমেণ্টের উপর কাউকে সন্তুষ্ট দেখি না। ধনী দরিদ্র সবাই এই শাসনব্যবস্থার উপর চটা। সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে—এবং অনেক স্থলেই তা অমূলক নয়—যে আমাদের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে যাঁরা অবস্থান করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অপদার্থ, স্বার্থপর এবং অসাধু। তাঁরা অসাধু বলেই তাঁরা দেশের অসাধুতা নিবারণ করতে পারছেন না, তাঁদের কথা মানছে না কেউ। সুতরাং চোর ডাকাত জুয়াচোর কালোবাজারীতে দেশ ভরে যাচ্ছে।

"ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতারও প্রধান কারণ তাদের সামনে নির্মল আদর্শনিষ্ঠ কোন নেতা নেই। নেতারা তোতাপাখির মতো যে-সব বুলি আওড়ান কার্যকালে ঠিক তার উলটো কাজটি করেন। সুতরাং তাঁদের কথায় কারও আস্থা নেই। আমার বিশ্বাস সামনে ভালো আদর্শ থাকলে এই ছেলেরাই অন্যরকম হত।

"ইতিহাসের পাতা ওলটালে জানা যায় অসাধুতা-অপটুতা-আত্মম্ভরিতার রাজত্ব বেশীকাল টেকে না। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা ভাবলে ভয় হয়। দুঃখও হয়। কোন্ অতলস্পর্শী গহ্বরের দিকে এগুচ্ছি আমরা!"

।। ছয়।।

সকাল নটা নাগাদ সদাশিবের মোটর যথারীতি বাজারের সামনে দাঁড়াল। সারি সারি মুরগীওলারা বসেছিল তাদের ঝাঁকা নিয়ে। তারা সাধারণত পথের ধারেই বসে। সদাশিবকে দেখে দু'একজন সেলাম করে উঠে দাঁড়াল।

সদাশিব আলীকে বললেন—"আলী, কয়েকটা ভালো মুরগী বেছে নাও তো।"

"বহুত খু"—

সদাশিব বাজারের ভিতরে ঢুকলেন।

আবদুলের মুখ উদ্ভাসিত, তার ছেলের জ্বর ছেড়ে গেছে। সে বললে কিছু বড় বড় মাগুর মাছ সে তাঁর জন্যে কিনে রেখেছে। চারটে মাগুর মাছের ওজন হয়েছে সওয়া সের।

"কোথা আছে সেগুলো—"

"আলাদা হাঁড়িতে করে গুদামে রেখে দিয়েছি—"

"আমার গাড়িতে দিয়ে আয়।"

ঘাড় ফিরেই সদাশিবের দৃষ্টি পড়ল একটি নবাগত ভদ্রলোকের দিকে। অত্যন্ত মোটা। একটা হিপোপটেমাস যেন মনুষ্যমূর্তি ধারণ করেছে। তাঁর মাছ কেনবার ধরন দেখে বিস্মিত

হলেন সদাশিব। এক মেছুনী কতকগুলো ছোট ছোট মাছ বিক্রি করছিল। তিনি মাছের স্তূপের ভিতর থেকে একটি ছোট মাছ লেজ ধরে তুললেন।

"এটার কত দাম নিবি? এক পয়সা?"

"ওই একটা মাছই নেবেন আপনি!"

মুচকি হেসে জিগ্যেস করলে মেছুনি। নাম ছিপলী। সদ্য যৌবনোদগম হয়েছে তার। কথায় কথায় হাসে।

হিপো বললেন—"হাঁ। একটাই নেব—"

"নিয়ে যান। ওর আর দাম দিতে হবে না।"

অম্লানবদনে তিনি মাছটি মাছের থলিতে পুরে ফেললেন। হেসে লুটিয়ে পড়ল মেছুনীটা। হিপো আর একটা মেছুনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সে-ও ছোট মাছ বেচছিল। সেখান থেকে একটি ছোট মাছ বেছে তুললেন তিনি।

"এটার দাম কত নিবি? এক পয়সা?"

এ মেছুনীটা বুড়ী। হিপোর কাণ্ড দেখে চটে গেল সে। বললে—"একটা মাছ আমি বেচব না। আধ পোয়া নিতে হবে অন্তত—"

"কিন্তু তোমার সব মাছ তো টাটকা নয়। বাসী মাছও মিশিয়ে দিয়েছ অনেক—"

বুড়ী চুপ করে রইল, কোন জবাব দিল না।

"আচ্ছা, দু'পয়সা দিচ্ছি, দিয়ে দে মাছটা।"

বুড়ীর চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে উঠল। মাছটা ছুঁড়ে দিলে হিপোর দিকে। হিপো দুটো পয়সা দিয়ে গম্ভীরভাবে এগিয়ে গেলেন আর একা মাছের দোকানে। এ দোকানদারও একটা মাছ বেচতে রাজী হল না। ঝাঁকড়া-গোঁফ ভগলু মহলদার রসিক লোক। সে হাসিমুখে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত হিপোর দিকে, তারপর দু'হাত তুলে নমস্কার করল।

"দিবি না মাছটা?"

"একটা মাছ বিক্রি করি না। আপনার মতো লোককে ভিক্ষে দিতেও সাহস পাচ্ছি না। কি করব ভাবছি।"

সদাশিব এগিয়ে গিয়ে চোখের ইঙ্গিত করতেই ভগলু মাছটা দিয়ে দিলে হিপোকে। ডাক্তারবাবুকে অমান্য করবার সাহস হল না তার। হিপো আর একটা দোকানে গিয়ে আর একটা ছোট মাছ চার পয়সা দিয়ে কিনলেন। এই মেছোটা মোচড় দিয়ে বেশী একটু দাম নিয়ে নিলে।

সদাশিব এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে।

"নমস্কার। আপনাকে তো এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না—"

"নমস্কার। আমি এখানে থাকি না। চেঞ্জে এসেছি—"

"ও। কোথায় আছেন?"

"ঘোষ-নিবাসে।"

"ও, তাহলে তো আমার বাড়ির কাছেই!"

"আপনার পরিচয়টা দিন—"

"আমি রিটায়ার্ড ডাক্তার একজন। এখানেই একটা বাড়ি কিনে বাস করছি—"

"ও তাহলে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে তো সুবিধেই হল। আমি ডায়াবিটিস্ রুগী মশাই। তার উপর বাত। ডাক্তার বলছে ছানা খেতে আর ছোট মাছ। ভাত রুটি বন্ধ—"

"কিন্তু আপনি তো মাত্র চারটি ছোট মাছ কিনলেন—"

"বেশী নিয়ে কি করব। নিজে হাতে কুটতে হবে, নিজে হাতে রাঁধতে হবে। তাছাড়া একটু পচা বা দো-রসা হলে আর খেতে পারি না। তাই খুব বেছে বেছে কিনতে হয়—"

"আপনি একাই এসেছেন?"

"দোকা আর পাব কোথা! আমাকে ফেলে সবাই যমের বাড়ি চলে গেছে। বউ ছেলে মেয়ে সব—"

হিপোর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত তিনি নিষ্পলক হয়ে চেয়ে রইলেন সদাশিবের মুখের দিকে। অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলেন তিনি। তারপর বললেন, "আচ্ছা, আমি আপনার টাটকা মাছের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই ভগলু--"

ঝাঁকড়া গোঁফ ভগলু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—"জি হুজুর—"

"এই বাবুর জন্যে রোজ চার-পাঁচটা টাটকা মাছ আলাদা করে রেখে দিও।"

"চেষ্টা করব হুজুর। তবে আমি তো মাছ পাইকারদের কাছ থেকে কিনি, সব সময় টাটকা মাছ পাই না—"

সেই হাসিমুখী তরুণী মেছুনীটি এগিয়ে এল। বললে—"আমি গঙ্গার ঘাট থেকে মাছ আনি। আমি রেখে দেব রোজ—"

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নমস্কার।"

কোনক্রমে দেহভার বহন করে ভিড় *ঠেলে ঠেলে* আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'এই যে ডাক্তারবাবু! গুড্ মর্নিং। বাজারের সব মাছ কিনে ফেললেন নাকি! আমাদের জন্যে কিছু অবশিষ্ট আছে তো—"

পি. ডব্লিউ. ডি. আফিসের কেরানী খগেন সরখেল। হিংসুকে লোক। সদাশিব যে রোজ এত মাছমাংস কেনেন এটা বরদাস্ত করতে পারেন না। দেখা হলে প্রায়ই যে সব মন্তব্য করেন তাতে একটু খোঁচা থাকে। সদাশিব গ্রাহ্য করেন না এসব। প্রায়ই মুচকি হেসে তাঁর কথার জবাব দেন।

"কি মাছ কিনলেন আজ?"

"মাগুর।"

"মাগুর? কই, মাগুর তো কোথাও দেখলাম না! পেলে নিতাম কিছু।"

"নিন না। আমি যেগুলো নিয়েছি সেগুলো আপনিই নিয়ে যান। আমি অন্য মাছ নিচ্ছি। আবদুল, বাবুকে মাগুর মাছগুলো দিয়ে দাও।"

আবদুল বললে—"আচ্ছা। তিন টাকা করে সের। সওয়া সের আছে। আপনি কিসে করে নেবেন?"

অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন খগেন সরখেল।

"না না, আপনার মুখের গ্রাস আমি কাড়ব কেন। আপনিই নিয়ে যান। আমি আর একদিন কিনব।"

তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিলেন তিনি।

সদাশিব বেরিয়ে আসছিলেন এমন সময় সেই হাসিমুখী তরুণীটি অপাঙ্গে সলজ্জভাবে চাইলে তাঁর দিকে এবং মৃদুকণ্ঠে বললে— "বাবু—"

মনে পড়ে গেল সদাশিবের।

"হ্যাঁ, তোর জন্যে ওষুধ এনেছি। গাড়িতে আছে। চল দিয়ে দিচ্ছি—রোজ তিনটে করে খাবি।"

প্রতি মাসে 'মাসিক'-এর সময় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে সে। লজ্জায় অনেকদিন গোপন করে ছিল। কিন্তু শেষে আর পারেনি। অনেকদিন চোখ নিচু করে অনেকবার ঘাড় ফিরিয়ে ব্যক্ত করেছে সদাশিবের কাছে।

মাছের বাজার থেকে বেরোবার মুখেই আবার থমকে দাঁড়াতে হল সদাশিবকে। তিনি দেখলেন, জগদম্বা জেলে চায়ের দোকান করেছে। চেহারাই বদলে গেছে তার। মাথায় টেড়ি, কানে বিড়ি গোঁজা। পরনে হাওয়াই শার্ট। চায়ের দোকানে সিনেমা অভিনেত্রীদের ছবি। একটি বড় কাচের 'জারে' রঙিন মাছ রেখেছে।

"কিরে জগদম্বা, মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিলি?"

"ওতে পোষায় না হুজুর। তাছাড়া বড় গন্‌দা (নোংরা) কাজ। রোজগার হয় না। সব লাভ পাইকার আর গুদামওলা টেনে নেয়।"

আবদুল মাছের হাঁড়ি নিয়ে সঙ্গে আসছিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলল—"জগদম্বা চিরকালই একটু শৌখিন। বেশী পয়সা থাকলে ও আতরের দোকান খুলত।"

জগদম্বা এতে চটল না। আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে চেয়ে রইল আবদুলের দিকে। জগদম্বার বয়স বেশী নয়, ত্রিশের মধ্যেই। সদাশিবের মনে পড়ল কিছুদিন আগে তার বউ বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল আর ফেরেনি। সদাশিবের একবার ইচ্ছে হল তার বউয়ের কথাটা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এত লোকের সামনে সেটা অশোভন হবে ভেবে আর করলেন না।

মোটরের কাছে কয়েকজন রোগী দাঁড়িয়ে ছিল। সদাশিব তাদের বললেন—"আজ বিকেলে হাটে যাব। সেইখানেই তোমরা যেও। এই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখতে পারব না তোমাদের। এই ছিপলী তোর ওষুধ নিয়ে যা—"

সেই তরুণী মেয়েটি এসে ওষুধ নিয়ে গেল। মোটরের কাছে আরও চা'র-পাঁচটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে। বাজারে ঝাঁকা-মুটের কাজ করে। তাদের গায়ের জামা কাপড় ফরসা, মাথার চুল আঁচড়ানো! ঝাঁকা-মুটেদের সাধারণত এরকম হয় না। তারা হাসিমুখে সবাই সদাশিবকে সেলাম করে ঘিরে দাঁড়াল।

"ও তোরা এসেছিস? বাঃ, কাপড় জামা তো বেশ পরিষ্কার হয়েছে! দেখ্‌ তো, সাজিমাটিতে কেমন সুন্দর পরিষ্কার হয়। দেখি তোর দাঁত?"

সবাই তাদের দাঁত দেখাল। সদাশিব তাদের চোখও দেখলেন।

"ঠিক আছে—"

চারটি করে পয়সা দিলেন প্রত্যেককে। তাছাড়া হাট থেকে যে কেঁদ্‌ আর কাগজের পাখি কিনেছিলেন তা-ও উপহার দিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শেখাবার জন্য সদাশিব এই ধরনের

পুরস্কার ঘোষণা করেন মাঝে মাঝে। অতি সামান্যই খরচ হয় এতে; কিন্তু এর পরিবর্তে যে আনন্দ পান তা অসামান্য।

আলী এসে মৃদুকণ্ঠে বললে—"চারঠো মুরগি লিয়া হুজুর।"

"ভালো দেখে নিয়েছ তো?"

"জী হুজুর, সব তৈয়ারী পাট্‌ঠা হ্যাঁয়।"

মুরগিওলা রহমান বললে—"পছ্‌ছিম মু হোকে বোলতে হেঁ হুজুর, সব মুরগি আচ্ছা হ্যায়। খারাব হোনে সে জুতা মারিয়ে গা।"

সদাশিব হেসে বললেন—"যদি ঠকাও তোমার খোদাই তোমাকে জুতো মারবে। আমি কেন জুতো মারতে যাব তোমাকে শুধু শুধু—"

আলী বললে—"বেশক্।"

সদাশিব জিজ্ঞাসা করলেন—"মুরগির দাম কত?"

রহমান বললে সে পশ্চিমমুখে দাঁড়িয়ে 'কসম্' খেয়ে সত্যি কথা বলছে, সওয়া দু'টাকা করে খরিদ, এখন হুজুরের যা মরজি।

আবদুল মাছের হাঁড়ি গাড়িতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক পাশে। সে আলীকে বললে, "ঘুরা দিজিয়ে মুরগি। দেড় দেড় রুপিয়া মে ইস্‌সে আচ্ছা মুরগি হাম লান্ দেঙ্গে।"

সদাশিব বললে,"না না, গরীব মানুষের আমি লোকসান করাতে চাই না। ওই বলুক না কি হলে ওর পোষায়।"

রহমান মাথা চুলকে বললে—"হুজুরকা যেইসে মেহেরবানী। আপকা বাত সে বাহার হাম নেহি যাঙ্গে—"

শেষকালে এক টাকা দশ আনায় রফা হল। রহমান দাম নিয়ে টাকাপয়সাগুলি তার কোমরে-বাঁধা গেঁজেতে পুরে শেষে বললে, মাই দুই থেকে তার ছোট ছেলের নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, ডাক্তারবাবু, যদি কোন দাবাই দেন গরীবের উপকার হয়।

"কোথা বাড়ি তোমার?"

"হবিগঞ্জ।"

"আমি তো হবিগঞ্জের হাটে যাই। সেইখানেই নিয়ে এস তোমার ছেলেকে। নাকটা দেখে ওযুধ দেব।"

মুরগিওলা রহমান সেলাম করে বললে—"হুজুরকা মেহেরবানী। মুলাকাৎ করেঙ্গে হাটিয়ামে।"

সদাশিব বললেন—"আলী, চল এবার কমলবাবুর কারখানায়। কমলকে আজ খেতে বলব। আর গাড়ির কারবুরেটারটাও একবার দেখিয়ে নেব।"

"বহুত খু—"

কমলের কারখানায় ঢুকতেই কমলের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল। "পাগল করে দেবে আমাকে। এই মুন, আমার ড্রয়ার থেকে প্যাঁচকস্ কে নিয়েছে? কতবার মানা করেছি তোমাদের যে আমার ড্রয়ার থেকে প্যাঁচকস্ নিও না কেউ—"

সদাশিবকে দেখেই শান্ত হয়ে গেল কমল।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন—"প্যাঁচকস্ হারালে নাকি—"

"কেউ টপিয়ে দিয়েছে। আসল পাকা স্টীলের জিনিস—"

কমলরা বিহারে চার পুরুষ ধরে আছে। বিহারেই তার জন্ম। সুতরাং ভাষার মধ্যে অনেক হিন্দী কথা ঢুকে গেছে। তাই 'হাতিয়েছে' না বলে 'টপিয়ে দিয়েছে' বললে।

"গাড়ি ঠিক চলছে তো?"

"মাঝে মাঝে হাঁচছে। তাই মনে হচ্ছে 'কারবুরেটারে' ময়লা জমেছে বোধ হয়। তোমার কি সময় আছে এখন? খুলে দেখবে কি?"

"হ্যাঁ। এখনি করে দিচ্ছি। এই ফালতু, ডাক্তারবাবুর গাড়ির 'কারবুরেটার'টা খোল্—"

ফালতুর আসল নাম তমিজুদ্দিন। কমল ওর নামকরণ করেছে 'ফালতু', কারণ যখন ও অ্যাপ্রেণ্টিস হয়ে কারখানায় ঢুকেছিল তখন বাড়তি (extra) লোক হিসেব নিয়েছিল ওকে কমল। ফালতুর বয়স ষোল-সতেরো। খুব রোগা আর লম্বা। যদিও সর্বাঙ্গ কালি-ঝুলি মাখা, তবু বেশ বোঝা যায় যে ওর রং খুব ফরসা। মুখের মধ্যে একটা শিশু-সুলভ সারল্য, চোখ দুটিতে চাপা হাসি চিক্‌মিক্ করছে সর্বদা। সে সোৎসাহে কারবুরেটার খুলতে লাগল। সে জানে এর জন্যে ডাক্তারবাবু কোন-না-কোন সময়ে তাকে কিছু দেবেন। মাস দুই আগে একটা হাফপ্যাণ্ট কিনে দিয়েছেন।.....মুরগিগুলো ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ করে ডেকে উঠল কেরিয়ারের মধ্যে।

কমল হেসে জিগ্যেস করল—"কত করে কিনলেন মুরগি—"

"ওহো, বলতেই ভুলে গেছি। তুমি আজ রাত্রে খেও আমার ওখানে।"

"আচ্ছা। আমার কিন্তু আজ যেতে রাত হবে একটু। সাড়ে ন'টা—"

"বেশ—"

"বসুন—"

চেয়ার এগিয়ে দিলে কমল।

"কাজকর্ম কেমন চলছে—"

"ভালোই চলছে আপনার আশীর্বাদে—"

"হরেক রকমের গাড়ি তো অনেক জমিয়েছ দেখছি—"

"হ্যাঁ, তা জমেছে। কতকগুলো গাড়ি জমেই আছি। আর নড়ছে না—"

"কেন বল তো—"

কমল মুচকি হেসে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তত্ত্বকথা বলে ফেলল।

"গাড়ির পেছনে যে মানুষ আছে তারই উপর নির্ভর করে সেটা। তারা গাড়ি না নিয়ে গেলে গাড়ি যাবে কি করে!"

"নিচ্ছে না কেন—"

"ওই যে বড় বুইক্‌টা দেখছেন, ওই যে কোণে রয়েছে, মাডগার্ডটা টোল খাওয়া। ওর মালিকটি মাতাল চরিত্রহীন। তিনবার দেউলিয়া হয়েছে। গাড়ি চালিয়ে দুমকা থেকে আসছিল, একটা সাঁওতালকে ধাক্কা মেরে পালাচ্ছিল সেখান থেকে। পালাতে পালাতে আবার ধাক্কা খায় একটা গাছের সঙ্গে। তারপর রাত্তিরে আমার কাছে গাড়িটি রেখে সেই যে সরেছে আর পাত্তা

নেই। কেউ বলছে বম্বে গেছে, কেউ বলছে দিল্লী। ওই যে ছোট্ট বেবি অস্টিনটা দেখছেন, ওটা মিস্ মরিসের। নিজেই ড্রাইভ করে আর সঙ্গে থাকে রোজ একজন করে নূতন বন্ধু। একদিন রাত্রে মদ খেয়ে এক মাঠে পড়ে ছিল সমস্ত রাত। সকালে উঠে দেখে গাড়ির চাকাসুদ্ধ দুটো টায়ার চুরি হয়ে গেছে। গাড়িটা গরুর গাড়িতে চড়িয়ে আমার এখানে দিয়ে গেছে মাস তিনেক আগে। আর তার পাত্তা নেই, শুনছি বেবি অস্টিনের চাকা এখন এখানে পাওয়া যাবে না। বিলেত থেকে আনাতে হবে। ততদিন ও গাড়ি এখানেই পড়ে থাকবে—"

"আর ওই যে রং-ওঠা ঝরঝরে গাড়িটা রয়েছে, ওটা কে সারতে দিয়েছে? ওর তো কিছুই নেই দেখছি—"

"ওটার ইনজিন ঠিক আছে। আমি আড়াইশো টাকায় কিনেছি। ভালো করে সারিয়ে রং করে আড়াই হাজার টাকায় বিক্রি করব। তখন ওর চেহারা দেখলে আর চিনতেই পারবেন না। বেশভূষার চটকে বুড়ো মানুষকে ছোকরা বানিয়ে দেব—"

মুচকি হেসে চেয়ে রইল কমল। সে হা-হা করে হাসে না। মুচকি হাসে, কিন্তু বেশ বড় 'মুচকি', হাসিটা প্রায় কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোও হাসতে থাকে।

ফালতু কারবুরেটার খুলে নিয়ে এল।

কমল কারবুরেটার নিয়ে পড়ল।

কারখানাতেও সদাশিবের রোগী জুটে গেল কয়েকটা। ইদ্‌রিস্ মিস্ত্রীর পায়ের নীচে একটা কড়া হয়েছে, বসতে গেলে লাগে। একটা অ্যাপ্রেণ্টিস্ ছোঁড়ার হাঁপানি হচ্ছে। ফালতুর কষের দাঁতে ব্যথা হয়। সদাশিব হাঁ করিয়ে দেখলেন, কেরিজ হয়েছে। বুড়ো জগন মিস্ত্রীর বাত হয়েছে। হাঁটুতে ব্যথা। সদাশিব ওষুধের বাক্স বার করে ওষুধ দিতে লাগলেন সকলকে।

.....চতুর্দিক প্রকম্পিত করে একটা মোটর বাইক ঢুকল এসে। তার থেকে নামলেন একজন 'খাকি' হাফপ্যাণ্ট-পরা বেঁটে মোটা লোক। বুলডগের মতো মুখ, হিট্‌লারি গোঁফ। মুখে সিগার। মিস্টার পরসাদ। বড় গভর্নমেণ্ট অফিসার একজন। নিরঙ্কুশ ব্যক্তি। প্রকাশ্যে ঘুষ নেন, প্রকাশ্যে অন্যায় কাজ করেন। এঁকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে পড়ল কমল।

বলল—"কল্ আপকা গাড়ি দে দেংগে। থোড়া কাম্ বাকি হ্যাঁয—"

আদেশের কণ্ঠে মিস্টার পরসাদ বললেন—"জল্‌দি কিজিয়ে। বড়া মুশ্‌কিল মে হ্যাঁয়ে—"

"কল্ জরুর হো যায়গা—"

এমন সময় মিস্টার পরসাদের দৃষ্টি পড়ল ডাক্তারবাবুর উপর।

"নমস্তে নমস্তে। ডাক্‌টর সাহেব, আপ য়ঁহা কৈসে পৌঁছ গ্যয়ে—"

সদাশিব বাংলাতেই উত্তর দিলেন—"রিটায়ার করে' এইখানেই আছি। আপনি কবে এলেন এখানে?

"এক মাহিনা—"

ওঁদের নিম্নলিখিতরূপ আলাপ হল। মিস্টার পরসাদের হিন্দীটা বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছি।

"আপনি এখানেই প্র্যাক্‌টিস করছেন?"

"কি আর করি, কিছু তো একটা করতে হবে—"

"আপনার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না। ভাগ্যে আপনি ছিলেন তাই বেঁচে গিয়েছিলাম—"

"কি হয়েছিল আপনার বলুন তো, ঠিক মনে নেই—"

"স্ট্র্যাংগুলেটেড্ হার্নিয়া। আপনি তখন ছাপরায়, আমিও ছাপরায়। আপনি না থাকলে আমি খতম হয়ে যেতাম। আপনি চলে আসবার পর ডক্টর ঘোষ এলেন। তিনি চৌবেজির হাইড্রোসিল অপারেশন করলেন। সেপ্টিক হয়ে মারা গেলেন ভদ্রলোক—"

"দেখুন বাঁচাবার বা মারবার মালিক আমরা নই। আমরা সকলকেই ভালো করবার চেষ্টা করি, কেউ হয়, কেউ হয় না। ওপরওলার মর্জিতে সব হয়—"

"সে কথা আমি মানব না। সব ডাক্তারের বিদ্যেও সমান নয়, সবাই সমান যত্নও নেয় না। আপনি এখানে আছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। কোথায় বাসা আপনার?"

"কমল আমার বাড়ি চেনে—"

"আচ্ছা, এখন চলি। এই রোদে মোটর বাইকে করে ঘুরতে হচ্ছে। চলি, নমস্কার—"

চলে গেলেন মিস্টার পরসাদ।।

উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এল কমল।

"আপনার সঙ্গে খুব খাতির আছে দেখছি। আমার একটু উপকার করবেন?"

"কি বল—"

"গভর্নমেন্টের কাছে আমার পনেরো হাজার টাকার বিল বাকি আছে। দু'বছর হয়ে গেল, কিছুতেই আদায় করতে পারছি না। চিঠি লিখে লিখে হয়রান হয়ে গেছি, উত্তর পাই না। আপিসে গিয়ে তদ্বির করলুম, দু'একটা ক্লার্ককে ঘুষও দিলুম, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। কানাঘুষো শুনছি ওপরওলাকেও নাকি কিছু সেলামী দিতে হবে। মিস্টার পরসাদের খুব ইনফ্লুয়েন্স, উনি যদি চেষ্টা করেন এখনই পেয়ে যাব টাকাটা। এর আগে ওঁর গাড়ি একবার সারিয়ে দিয়েছি, একটি পয়সা চার্জ করিনি। এবারও করব না। এইবার ওঁকে বলব ভেবেছিলাম কথাটা। আপনি যদি বলে দেন তাহলে আরও ভালো হয়—"

"আচ্ছা বলব—"

কমল যত্ন করে কারবুরেটারটা পরিষ্কার করে ফিট করে দিলে।

"আজ রাত্রে যেও মনে করে—"

"যাব—"

সদাশিব নিজের হাতঘড়িটা দেখলেন। দেড়টা বেজে গেছে। বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন তিনি।

।। সাত।।

সদাশিব ডাক্তারের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল একটা প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে, প্রকাণ্ড একটা গাছের ছায়ায়। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে হাজিপুর হাট। বেলা দুটো বেজেছে। হাট তিনটের আগে বসে না। সদাশিব নির্জনে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছেন। নির্জন প্রকৃতির কোলে মাঝে মাঝে একা বসে থাকতে ভালোবাসেন তিনি।

আলীকে পাঠিয়েছেন গ্রামের ভিতর একটু টাটকা দুধ সংগ্রহ করবার জন্য। সঙ্গে কনডেন্সড মিল্‌ক্‌ ছিল, তবু পাঠিয়েছেন। আসল উদ্দেশ্য আলীকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। কাছে কোন লোক থাকলে তাঁর চিন্তা বিঘ্নিত হয়। স্রোতে লোকে যেমন নৌকো ছেড়ে দেয়, তাঁর মনকেও তেমনি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নানা জায়গায় ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে সে। সামনে কয়েকটা খঞ্জন ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা নীলকণ্ঠ ছোট্ট একটা গাছের ডালে বসে 'টক্‌' 'টক্‌' শব্দ করছে মাঝে মাঝে। একটু দূরে গরু ভেড়া ছাগল চরছে। একটা গরুর পিঠে ফিঙে পাখি বসে আছে। লঘু সাদা মেঘ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। এলোমেলো হাওয়া বইছে। দোয়েল পাখীর তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। সদাশিব উঠে নিজের ডায়েরীটা বার করে আনলেন। তারপর ফোলডিং টেবিল চেয়ারটাও বার করে পাতলেন। একটু ভেবে লিখতে শুরু করলেন তিনি।

"দেখতে দেখতে এখানে অনেকদিন কেটে গেল। দিন কত শীঘ্র কেটে যায়। মনে হচ্ছে এই সেদিন এসেছি। সকালের পর সন্ধ্যা, তারপর আবার সকাল। কালের প্রবাহ বয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল।

"প্রথমে যখন এখানে জীবন আরম্ভ করেছিলাম তখন আশঙ্কা হয়েছিল সময় কাটবে কিনা, মনের অবলম্বন পাব কিনা, মনের মধ্যে যে স্নেহের কাঙাল ক্ষুধিত হয়ে বসে আছে সে তার আকাঙ্ক্ষিত সুধা পাবে কিনা। আজ নিঃসংশয়ে বলতে পারি আমার সে আশঙ্কা অপনোদিত হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার অবসর নেই। মনের যে অবলম্বন পেয়েছি তার চেয়ে বড় অবলম্বন আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি প্রচলিত অর্থে 'ধার্মিক' হইনি, রাজনীতি বা সমাজনীতি আলোচনার ছুতোয় পরনিন্দা করিনি, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট কুড়িয়ে 'নেতা' হইনি, আমি যা ছিলাম তাই আছি, যে পথে এতদিন চলে এসেছি সেই পথই ধরে আছি। তার থেকে বিচ্যুত হইনি। বরাবর ডাক্তারি করছি, এখনও তাই করছি। অন্য কিছু হবার শখ হয়নি আমার। সাধ্যও নেই। এক হিসাবে গীতার নির্দেশই পালন করেছি, 'স্বধর্ম'কেই আঁকড়ে আছি। স্নেহের কাঙাল আমার মনও পরিতৃপ্ত হয়েছে। যে অপরিমেয় সুধা সে পেয়েছে তা তার কল্পনার অতীত ছিল। আমি মহাপুরুষ নই, অত্যন্ত সাধারণ লোক আমি। আমি কি করে লোকের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ আকর্ষণ করতে পেরেছি? ভাবলেও অবাক লাগে।

"অনেকে হয়তো মনে করবেন আমি অসুখে বিসুখে ওদের চিকিৎসা করি বলেই ওরা আমাকে ভালোবাসে। বাইরে থেকে বিচার করলে তাই মনে হয়, কিন্তু আসল কারণ বোধ হয় তা নয়। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়, জমিদারবাবু নওলকিশোর প্রতি রবিবারে ভিখারীদের চাল দেন, বেঙ্কট শর্মার ঠাকুরবাড়িতে প্রত্যহ তৃষিতদের জল আর ছোলা-গুড় দেওয়া হয়। জনসাধারণ কি এদের ভালোবাসে? কেউ কেউ হয়তো শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ভালবাসে না। ঘনিষ্ঠ না হলে ভালোবাসা যায় না। আমরা পোষা কুকুর বিড়ালকে যত ভালবাসি, দূরবর্তী মহৎ লোককেও ততটা বাসি না। আমি ওদের উপকার করেছি বলেই যে ওরা আমাকে ভালোবাসে তা নয়, আমি ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি বলেই ভালোবাসে। আমার যারা রক্তসম্পর্কিত, সমাজের খাতায় যারা

আমার আত্মীয় বলে চিহ্নিত, তাদের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক নেই, কারণ তারা দূরে থাকে, ক্বচিৎ তাদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা পর হয়ে গেছে। আবদুল, আলী, ভগলু, কেব্‌লী, ফালতু, রহমান, কমল, জগদম্বা, সুখিয়া, বিলাতী সাহ্ এবং আরও অনেক নগণ্য লোক আজ আত্মীয় হয়েছে আমার। ওদের সুখদুঃখের সঙ্গে আমি জড়িত, তাই আমাকে ওরা আপন লোক মনে করে। আমি পরম সুখে আছি।

"কেবল একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়েছি একটু। মালতীর হিস্টিরিয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে ফিট্ হচ্ছে। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি কাঁদছে। কেন কাঁদছে তা বললে না। আমাকে দেখে চোখ মুছে অন্য ঘরে চলে গেল। আজবলাল বলছিল প্রায় নাকি অকারণে কাঁদে। অকারণে চটেও যায়। আজবলাল ওর নাম দিয়েছে পাগলী। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি কি হয়েছে। বাঁজা মেয়েদের এরকম হয়। সন্তান-পালনের অন্তর্নিহিত কামনা স্বাভাবিক পথে চরিতার্থ না হলে নানা অস্বাভাবিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ওকে একটা কাবুলী বিড়াল, একটা টিয়াপাখি, একজোড়া খরগোশ কিনে দিয়েছি। কিন্তু দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? ওর যদি একটা ছেলে হত!"

এই পর্যন্ত লিখেই বন্ধ করতে হল সদাশিবকে। কারণ তিনি দেখতে পেলেন আলী একটা বাছুরের দড়ি বেঁধে টানতে টানতে আনছে আর তার পিছনে আসছে একটা গাই আর তার পিছনে হলদে-শাড়ি-পরা একটা মেয়ে। কাছে আসতেই গীতাকে চিনতে পারলেন তিনি। গোয়ালার মেয়ে। বাপ-মা নাম রেখেছিল গিতিয়া। কিন্তু কাছেই যে মিশনারী স্কুলটা আছে তাতে গিতিয়া পড়েছিল ছেলেবেলায়। সেই স্কুলের মেমসাহেব তার নাম গিতিয়া বদলে গীতা করে দিয়েছেন। গীতা স্কুলে আর পড়ে না। অনেকদিন হল বিয়ে হয়ে গেছে তার। যখন তার দশ বছর বয়স তখনই। সম্প্রতি দ্বিরাগমন হয়েছে। চমৎকার বাংলা নাম বলতে পারে গীতা।

"গীতা, কবে শ্বশুরবাড়ি থেকে এলি?"

"পরশু—"

"আমার জন্যে সামান্য দুধ দিলেই তো হত। একটু চায়ের জন্যে দরকার খালি। তুই একেবারে গাই নিয়ে হাজির হলি কেন?"

"আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে—"

চমৎকার চকচকে একটি কাঁসার ঘটিও এনেছিল সে। তাইতে নিজেই দুধ দুয়ে আলীর হাতে দিতেই আলী হাতের তর্জনী উত্তোলন করে বললে—"ঠহর যাও এক মিনিট—" কেরিয়ার থেকে বার করলে সে অ্যালুমিনিয়মের একটা মুখ-ঢাকা হাঁড়ি। তাইতেই দুধটা ঢেলে নিয়ে সদাশিবের দিকে একটু ঝুঁকে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—"চায় কা পানি চঢ়া দেঁ হুজুর?"

"দাও। গীতা চা খাবি?"

গীতা লজ্জিত হল।

"আলী, গাড়িতে বেশী গ্লাস আছে?"

"জী হুজুর, হ্যায়। মগর থোড়া সা চন্‌কা হুয়া—"

আলী তর্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের একটি ছোট মুদ্রা করে জানিয়ে দিলে গ্লাসটা সামান্য ফাটা।

"ওতেই গীতাকে চা দাও। তুমি এক কাপ চা বানাও নিজের জন্যে।"

"বহুত খু—"

মাঠের মধ্যে স্টোভ জ্বালা সহজসাধ্য নয় । এলোমেলো হাওয়ার জন্যে সহজে ধরতে চায় না। কিন্তু সদাশিবের মোটরে সব ব্যবস্থা আছে। বড় বড় টিনের পাত দিয়ে ছোট একটা টিনের ঘর মতো করে নিলে আলী। তার ভিতর স্টোভটা ঢুকিয়ে জ্বালতে লাগল।

গীতা সদাশিবের কাছে সরে এসে মৃদুকণ্ঠে তার দুঃখের কাহিনী বলতে লাগল। গীতা শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। তার স্বামী দুশ্চরিত্র, মাতাল। শাশুড়ী দজ্জাল। তিনটি ননদ আছে, তিনটিই হাড়-জ্বালানী। কেউ শ্বশুরঘর করে না। সব মায়ের কাছে আছে। শুধু তারা নয়, তাদের স্বামীরা এবং ছেলেপিলেরাও। গীতাকেই সকলের সেবা করতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই মার-ধোর করে। একদিন এমন ইট ছুঁড়েছিল যে মাথা কেটে গিয়েছিল তার। তাছাড়া তাকে তার স্বামীর মালিকের বাড়িতেও কাজ করতে হয়।

"তোর স্বামী কি করে?"

"একজন বাভনের জমি চষে। এক পয়সা মাইনে পায় না। কবে নাকি দু'শো টাকা ধার নিয়েছিল তারই সুদের সুদ জমেছে। খেটে শোধ করতে হবে।"

"তো'দের চলে কি করে?"

"ওই জমি থেকে যা ফসল হয় তাই দেয় আমাদের খাবার মতো। তার দামও হিসেব করে ধারে জমা করে। ও ধার জীবনে কখনও শোধ হবে না—"

এই একই কাহিনী সদাশিব অনেকের মুখ থেকে শুনেছেন। বার বার অনুভব করেছেন যে দাসত্ব-প্রথা এখনও লোপ পায়নি। কেবল তার বাইরের রূপটা বদলেছে মাত্র। দাস-দাসী বিক্রয়ের আলাদা হাট-বাজার নেই আজকাল। সমাজের বুকের উপরই ঘরে ঘরে সে হাট বসেছে। ধূর্ত ধনীর কাছে অসহায় দুর্বলরা স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় করছে। না করে উপায় নেই তাদের।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন—"আমি কি করতে পারি—"

গীতা বললে—"দু'-একদিন পরে আমার স্বামী আমাকে নিতে আসবে। আমি যদি যেতে না চাই আমাকে সেই বাভন লোকজন পাঠিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। এখন ছোলা উঠেছে, আমাকে দিয়ে সেই ছোলা মণ মণ পেষাবে আর ছাতু করাবে। আমি তা পারব না। আমার স্বামী এলেই আমি আপনার কাছে পালিয়ে যাব। আপনি বলবেন আমি ওকে চাকরানী রেখেছি, ওকে যেতে দেব না।"

একটু ইতস্তত করে সদাশিব বললেন, "সেটা কি ঠিক হবে? কারও স্ত্রীকে কি তার স্বামীর কাছ থেকে কেউ জোর করে সরিয়ে আনতে পারে? সেটা বে-আইনী হবে। তুমি যদি তোমার স্বামীর কাছে না থাকতে চাও, তাহলে আদালতের সাহায্যে বিয়ে ভেঙে দিতে হবে। সে অনেক ঝঞ্ঝাট। তাঁর চেয়ে এক কাজ কর, তোমার স্বামীকেও এই শহরে এনে কোন রোজগারের কাজে লাগিয়ে দাও, তুমিও কাজ কর।"

"কিন্তু সেই বাভন তার টাকা ছাড়বে কেন? নালিশ করবে—"

"তার টাকা শোধ করে দাও। সে নালিশ করুক, আদালতের বিচারে তার যে টাকা পাওনা হবে তা আমরা দিয়ে দেব।"

"কিন্তু কি করে দেব অত টাকা। আপনি তো জানেন আমরা কত গরীব। বাবা অন্ধ, মা

শুষছে, ভাইটা তাড়িখোর, সপ্তাহের মধ্যে তিনদিন কাজ করে না। আমরা কি করে অত টাকা শোধ করব?''

''আচ্ছা সে একটা ব্যবস্থা হবে' খন।''

''হবে?''

উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল গীতা সদাশিবের মুখের দিকে। সে জানে সদাশিব যদি ভরসা দেন তাহলে হবেই একটা কিছু।

''হবে, তোর স্বামী এলে নিয়ে আসিস তাকে আমার কাছে—''

গীতা হঠাৎ হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলে সদাশিবকে। তারপর মোটরের পিছনে বসে চা খেয়ে গরু নিয়ে চলে গেল। মনের ভার হাল্‌কা হয়ে গেল তার।

হাজিপুর হাটের কাছে সেই গাছের ছায়ায় বসে সদাশিব যথারীতি রোগী দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ভিড়ের মধ্যে কেব্‌লী দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি শঙ্কিত।

''কি হল কেব্‌লী? নারাণ ছাড়া পেয়েছে?'

''না বাবু। তাকে জেলে আটকে রেখেছে। আমি কাল দেখতে গিয়েছিলাম, অমন জোয়ান মরদ, মেয়েমানুষের মতো হাউ হাউ করে কাঁদছে। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন ডাক্তারবাবু। আপনিই তো আমাদের মা-বাপ।''

কেব্‌লীর ছেকা-ছেনি হিন্দীতে উক্ত উক্তিটি শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন সদাশিব।

''আচ্ছা তুই যা, দেখি কি করতে পারি।''

কেব্‌লী ময়লা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। সদাশিব রোগী দেখতে লাগলেন। ভিড়ের পিছনদিকে একটা কলরব উঠল। সদাশিব দেখলেন শুকুর কশাই তার ছেলে সিদ্দিককে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

''আদাব। বংগট্‌ কো পকড়কে লায়ে হ্যাঁয়, ডাক্‌টার সাব।''

বংগট্‌ মানে পাজি।

সদাশিব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন এবং সিদ্দিকের গালে ঠাস্‌ ঠাস্‌ করে দুটো চড় মারলেন জোরে।

শুকুর চীৎকার করে উঠল—''আউর মারিয়ে, আউর মারিয়ে —''

সদাশিব কিন্তু আর মারলেন না, চেয়ারে এসে বসলেন। তারপর বললেন—''উসকো বৈঠাকে রাখ্‌খো, সুই দেঙ্গে—''

সিদ্দিকের বয়স সতরো-আঠারো বছর। গনোরিয়া হয়েছে। শুকুর তাকে সদাশিবের কাছে নিয়ে আসতে চেয়েছিল কিন্তু সিদ্দিকে রাজী হয়নি। সে বলেছিল উনি তো 'ভিক্‌-মাংগা'-দের (ভিখারীদের) ডাক্তার। উনি আবার চিকিৎসার জানেন কি? শুকুরের কিন্তু সদাশিবের উপর অগাধ বিশ্বাস। তার সিফিলিস সদাশিবই সারিয়েছেন। শুকুর এসে সদাশিবকে জানিয়েছিল তার কুপুত্র সিদ্দিক সদাশিবের সম্বন্ধে কি অভদ্র উক্তি করেছে। সদাশিব প্রথমে কোন উত্তরই দেননি। কিন্তু শুকুর না-ছোড়।

''অব্‌ কুছ্‌ রাস্তা বাত্‌লাইয়ে হুজুর। ক্যা কিয়া যায়?''

"ওকে এখানে ধরে নিয়ে এস। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

দুটি প্রচণ্ড চড় খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল সিদ্দিক। সদাশিব যখন তাকে ইন্‌জেক্‌শন দিলেন তখন আর আপত্তি করল না সে। সদাশিব বললেন—"এ ইন্‌জেক্‌শন রোজ নিতে হবে। দশ দিন। আর এ ওষুধ খাও। রোজ তিনটে করে ট্যাবলেট—"

শুকুর বললে—"কাল বাজারেই কি ইন্‌জেক্‌শন দেবেন?"

"তা দিতে পারি। ভোর ৭টার আগে যদি আমার বাড়িতে আসে তাহলে বাড়িতেও দিতে পারি।"

শুকুর আদাব করে সিদ্দিককে নিয়ে চলে গেল।

সদাশিব অন্যান্য রোগীদের ব্যবস্থা করে দিয়ে হাটে ঢুকলেন। কিছু কিনলেন। সেই কুমড়োউলী বুড়ী বসে ছিল। তার পাশে বসে ছিল তার নাতনী রৌশন। বিয়ে হয়ে তার চেহারাই বদলে গেছে। সে উঠে এসে সদাশিবকে প্রণাম করল। সদাশিব তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন একটু। তারপর এগিয়ে গেলেন বিলাতী সাহের দোকানের দিকে।

"দু' মং। কাতারনী চাল আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। খুব ভালো চাল—"

"দাম কত—"

"আমি বিয়াল্লিশ টাকা মণ খরিদ করেছি। এখন আপনি যা দেন—"

এবড়োখেবড়ো হল্‌দে দাঁত বার করে হাসলে বিলাতী সাহ।

"বেশী ভণিতা কোরো না। কত দেবো বল—"

"এক টাকা মণ লাভ দিন।"

"আমার গাড়ির কাছে চল্, চেক্ দিয়ে দিচ্ছি।"

"চেক্ ভাঙানো বড় হাঙ্গামা ডাক্তারবাবু। আমি পরে গিয়ে আপনার বাড়ি থেকে দাম নিয়ে আসব।"

"বেশ।"

গাড়ির কাছে এসে দেখলেন একটা জেলে একটা রুই মাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমার ছেলে ভালো হয়ে গেছে বাবু। আপনাকে তো কিছু দিতে পারিনি, তাই এই মাছটা—"

"ভালো হয়ে গেছে? বাঃ! আমাকে কিছু দিতে হবে না। এই মাছটা বেচে তোর ছেলেকে একটা তাগদের ওষুধ খাওয়া। আমি লিখে দিচ্ছি—"

একটা কাগজে ওষুধের নাম লিখে দিলেন তিনি। জেলেটা তবু কুণ্ঠিত মনে দাঁড়িয়ে রইল।

"কি রে, দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন—"

"এ মাছটা আপনি নিয়ে যান। আপনার নাম করে এনেছি। এ আমি বেচব না। আমার ছেলেকে তাগদের দাবাই আমি কিনে দেব—"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন সদাশিব।

"এই নবাবী আর লৌকিকতা করেই উচ্ছন্ন গেছ তোমরা। দাও, তোমাকে আর ওষুধ কিনতে হবে না। আমিই এনে দেব।"

তার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে মোটরে উঠে পড়লেন সদাশিব। আলী গোপনে

মাছটি 'কেরিয়ারে' রেখে দিলে। জেলেটা সদাশিবকে কি বলতে যাচ্ছিল। আলী ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইশারায় জানিয়ে দিলে—একটি কথা বোলো না এখন।

হাজিপুরের হাট থেকে সদাশিব সোজা চলে গেলেন ডি. আই. জি. অব পুলিসের বাড়িতে। যিনি এখন এই পদে অধিষ্ঠিত তাঁর সঙ্গে সদাশিবের আলাপ ছিল চাকরিজীবনে। তখন তিনি এস. পি. ছিলেন। সদাশিব এখন পারতপক্ষে অফিসারদের এড়িয়ে চলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল ইনি তাঁকে চিনতে পারবেন কিনা। প্রায় দশ বছর পরে দেখা হচ্ছে। যদি চিনতে না পারেন, যদি তাঁর কথা না রাখেন, তাহলে বড়ই মর্মান্তিক ব্যাপার হবে। তবু গেলেন তিনি। কেব্‌লীর অশ্রুপ্লাবিত মুখটা বড়ই পীড়া দিচ্ছিল তাঁকে।.....

ডি. আই. জি. প্রথমে তাঁকে সত্যিই চিনতে পারেননি। কিন্তু পরিচয় দিতেই চিনতে পারলেন এবং সাদর অভ্যর্থনা করে বসালেন।

"বসুন, বসুন। আপনার চেহারাটা একটু বদলে গেছে। তাই চিনতে দেরি হল! রিটায়ার করে এখানে প্র্যাক্‌টিস করছেন?"

"হ্যাঁ—"

"কই আপনার কথা শুনিনি তো—"

"আমি যাদের মধ্যে প্র্যাক্‌টিস্‌ করি তারা আপনার কাছে আসতে পারে না। ইতর লোকেদের ডাক্তার আমি—"

"ওরাই তো এখন দেশের মালিক সার। ওদের এখন আর অবজ্ঞা করবার জো নেই।"

"কিন্তু তবু ওদের সম্বন্ধে এখনও আপনারা সুবিচার করছেন না। ওদেরই একজনের জন্য আজ আপনার কাছে দরবার করতে এসেছি।"

"কি ব্যাপার!"

সদাশিব খুলে বললেন সব।

"ও, এই! আচ্ছা, আজই ছাড়া পেয়ে যাবে। আমি এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

ফোন তুলে তিনি এস. পিকে বললেন ব্যাপারটা। এস. পি. কি বলছিলেন তা শুনতে পেলেন না সদাশিব। ডি. আই. জি. বললেন, "যেমন করে হোক ওকে ছেড়ে দিতে হবে। ছবিলালবাবুর চক্রান্তে নির্দোষ বেচারা কষ্ট পাচ্ছে। ওকে আজই ছেড়ে দিন। আচ্ছা, আচ্ছা—"

ডি. আই. জি. সদাশিবের দিকে চেয়ে বললেন—"আজই ছাড়া পাবে। আজ না পায়, কাল পাবেই। বয়—"

লিভেরি-পরা 'বয়' দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন—"হুইস্কি-সোডা।"

তারপর সদাশিবের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

"আপনার চলবে কি?"

"না, আমি ও-রসে বঞ্চিত।"

ডি. আই. জি. আর একবার হাসলেন।

"আপনার খদ্দর দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল। যদিও আজকাল অনেক খদ্দরধারীরাও এ-রসের রসিক হয়েছেন—"

"তা জানি। খদ্দর আজকাল অনেক পাজি লোকদের ইউনিফর্ম হয়েছে।"

"তবে পরেন কেন?"

"ওর পিছনে একটা বড় আদর্শ আছে বলে। পাজিরা ভাত খায় জুতো পরে বলে তো ভাত খাওয়া জুতো পরা ছাড়তে পারি না—"

হা হা করে হেসে উঠলেন ডি. আই. জি.।

"ওয়েল সেড্। আসবেন মাঝে মাঝে। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

সদাশিব বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ফিরে এলেন আবার।

"একটা যদি প্রস্তাব করি, রাগ করবেন?"

"কি বলুন—"

"একটু আগেই আমার এক জেলে রুগী বড় একটা রুই মাছ উপহার দিয়েছে। মাছটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আমি বিপত্নীক। বাড়িতে খাবার লোক বেশী নেই। ঠাকুরটা অসুখে পড়েছে। এই অসময়ে যদি মাছ নিয়ে যাই আমার ভাইপো-বউ মালতী চটে যাবে। মাছটা যদি আপনাকে দিয়ে যাই, কেমন হয়?"

"এককালে ঘুষ নিতাম, এখন আর নিই না। তবে এতে যদি আপনার সমস্যার সমাধান হয় দিয়ে যেতে পারেন।"

আবার উচ্চকণ্ঠে হাসলেন তিনি।

তাঁকে মাছটা দিয়ে চলে গেলেন সদাশিব।

।। আট ।।

সেদিন বাজারে ঢুকেই সদাশিব দেখলেন বাঁড়ুয্যে মশাই একগাদা ছোট মাছের সামনে বসে সেই গাদার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কুঁচো-চিংড়ি বাছছেন! বাঁড়ুয্যে মশায়ের বয়স কত তা বলা শক্ত। জরাজীর্ণ চেহারা। মাথায় চুল প্রায় নেই, যে ক'গাছি আছে তা পাকা। ঝোলা গোঁফ, তাও পাকা। রোগা সরু মুখ। চক্ষু কোটরগত, দৃষ্টি নিষ্প্রভ। ডান দিকের পাকা ভুরুর মাঝখানে একটা কালো আঁচিল তাঁর জরালাঞ্ছিত মুখের মধ্যে নির্জর হয়ে আছে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। নিকেলের, একধারে সুতো দিয়ে বাঁধা। বাঁড়ুয্যে মশাই কারো দিকে তাকান না, তন্ময় হয়ে মাছ ঘাঁটেন। চারদিকে জল, কাদা প্যাচপ্যাচ করছে, লোকের ভিড় গিজ্ গিজ্ করছে, কিন্তু সেদিকে বাঁড়ুয্যে মশায়ের লক্ষ্য নেই। তিনি ওই জলকাদার উপর উবু হয়ে বসে বহু লোকের পায়ের এবং হাঁটুর গুঁতো সহ্য করে কুঁচো-চিংড়ি সংগ্রহ করছেন। আধপোয়ার বেশী কিনবেন না, কিন্তু মাছ ঘাঁটবেন অনেকক্ষণ ধরে। ওতেই আনন্দ।

"নমস্কার বাঁড়ুয্যে মশাই। কি মাছ কিনছেন—"

বাঁড়ুয্যে মশাই ঘাড় তুললেন না। স্বর শুনেই সদাশিবকে চিনতে পারলেন।

"কে, ডাক্তারবাবু, নমস্কার। কুঁচো-চিংড়ি কিনছি। বেগুনও কিনেছি কিছু। নাতনী বলেছে বেগুন দিয়ে কুঁচো-চিংড়ি রেঁধে দেবে। বেশ রাঁধে।"

"কত করে দর—"

"এক টাকা। এই পোকার মতো মাছ বলে কিনা এক টাকা! বাজারে কোন জিনিসে কি হাত দেবার জো আছে! সব আগুন!"

ঘাড় না তুলেই কথাগুলি বলে গেলেন।

বাঁড়ুয্যে মশাই রোজ বাজারে আসেন। রোজ ওই ছোট ছোট মাছের স্তূপের ভিতর হাত চালিয়ে চালিয়ে নিজের পছন্দমত মাছ বার করেন। কোনদিন কুঁচো-চিংড়ি, কোনদিন মৌরলা, কোনদিন খয়রা, কোনদিন ছোট পুঁটি। আধপোর বেশী কেনেন না কোনদিন। কোন্ মাছের সঙ্গে কোন্ মসলা দিলে মুখরোচক তরকারি হয় তা তাঁর নখদর্পণে। এঁকে দেখলেই সদাশিবের মনে হয় নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের প্রতীক ইনি। খাদ্য-রসিক, কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত। আত্মসম্মানবোধ খুব প্রবল। কারো কাছে মাথা নত করতে চান না, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার তাড়নায় মাঝে মাঝে করতে হয় বলে মরমে মরে থাকেন।

জেলেরা ওঁকে খুব খাতির করে। উনি এখানকার স্কুলে অনেকদিন শিক্ষকতা করে এখন রিটায়ার করেছেন। একমাত্র পুত্রটি অকালে মারা গেছে। তারই মেয়ে ওঁর দেখাশোনা করে। পুত্রবধূও নেই।

"আপনার নাতনীর রান্নার সুখ্যাতি আমিও শুনেছি। একদিন গিয়ে তার হাতের বেগুন-চিংড়ি খেয়ে আসব—"

"যাবেন, যাবেন। সে তো আমার পরম সৌভাগ্য—"

সদাশিব মাংসের দোকানের দিকে গেলেন। আগের দিন রহমন কশাই খবর দিয়ে গিয়েছিল যে সে ভালো ভেড়া কাটবে একটা। ভেড়ার মাংস এ অঞ্চলে দুর্লভ। ছাগলই বেশী পছন্দ করে এদেশের লোক। কশাইরা সবাই জানে ডাক্তারবাবু ভেড়ার মাংস ভালবাসেন, তাই ভেড়া কাটলেই খবর দিয়ে আসে তাঁকে।

রহমনের কাছে যেতেই রহমন তাঁকে বলল—"হুজুরের জন্য একটা 'লেগ' আলাদা করে রেখেছি—"

"ওজন কর—"

ওজনে আড়াই সের হল। বেশ চর্বিদার 'মাটন', দেখে খুশী হলেন সদাশিব। ভালো রোস্ট হবে। তিনি দামটা মিটিয়ে দিয়ে ফিরেই দেখতে পেলেন খগেন সরখেলকে। লুব্ধদৃষ্টিতে 'মাটন-লেগ'-টার দিকে চেয়ে আছেন।

"আপনি কিনলেন বুঝি ওটা? বড্ড বেশী চর্বি। তা না হলে আমি নিতুম সের দুই। আপনি পুরো 'লেগ'-টাই নিলেন? আপনার এ বয়সে অত চর্বি খাওয়া কি ভালো?" পরমুহূর্তেই অপ্রস্তুত মুখে বললেন—"ও আপনি তো নিজেই ডাক্তার।" বলেই সুট করে চলে গেলেন তিনি মাছের বাজারের দিকে।

"সেলাম হুজুর—"

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন সিতাবী মেথর। তিনি যখন হাসপাতালে চাকরি করতেন তখন এ-ও ছিল সেখানে। এখনও আছে। সিতাবী এক সের 'মাটন' কিনলে। সদাশিব আন্দাজ করলেন আজ সন্ধ্যায় ওদের তাড়ির আসর ভালো করে জমবে। আর একটা কথাও সঙ্গে

সঙ্গে মনে হল তাঁর। এই মেথররা খায় ভালো। কারণ মেথরদের প্রত্যেকেই কাজ করে। সিতাবীর পরিবারে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে পাঁচ-ছ'জন লোক। সকলেই রোজগার করে। ওদের সকলের আয় যোগ করলে মাসে আড়াইশ'-তিনশ' টাকা হবে। সদাশিব ভাবলেন, তাই সিতাবী স্বচ্ছন্দে তিন টাকা খরচ করে মাটন কিনতে পারল। কিন্তু খগেন সরখেল পারলেন না। তাঁর মাইনে মাত্র একশ টাকা। একঘর ছেলে-মেয়ে। দু'টি মেয়ে বিবাহযোগ্যা। মেয়েরা কলেজে পড়ে। ছেলেরা স্কুলে। খগেনের একশ টাকাতে কুলোয় না। সকাল-বিকেল টিউশনিও করতে হয়।

হঠাৎ সদাশিবের মনে হল খগেন যদি সিতাবী হত তাহলে কি ঠিক হত? কথাটা মনে হতেই শিউরে উঠলেন তিনি। সিতাবী অশিক্ষিত মাতাল, তার বউও তাই। দুজনেই সিফিলিসগ্রস্ত। ওর ছেলেমেয়েগুলোও কেউ সুস্থ নয়। মাঝে মাঝে ডগমগে রঙিন কাপড় পরে বটে, কিন্তু খুব নোংরা। সিতাবীর জোয়ান মেয়ে-দুটোও পাজি, নানারকম বদনাম ওদের সম্বন্ধে। আর খগেন সরখেল শিক্ষিত ভদ্রলোক। সাহিত্য-প্রীতি আছে, সংগীতানুরাগ আছে। ভালো বেহালা বাজাতে পারেন, যথাসাধ্য সামাজিক শালীনতা বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করেন—উনি সিতাবীর স্তরে নেমে যাবেন এটা ভাবাও যায় না। খগেন সরখেলদের জীবনের ট্রাজেডি এঁরা আশানুরূপ উপার্জন করতে পারেন না। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কি?

স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকে এদের সমস্যা তো উত্তরোত্তর জটিলতর হচ্ছে। দম-বন্ধ হয়ে আসছে এদের, চারদিকে নানা বিধিনিষেধের প্রাচীর তুলে এদের নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা করছেন সরকার। এদের বাঁচবার উপায় কি? বিদ্রোহ? এরা কি বিদ্রোহ করতে পারবে? গান্ধিজীর একটা উক্তি তাঁর মনে পড়ল—'In Satyagraha, it is never the number that counts....Indeed one perfect civil register is enough to win the battle of Right against Wrong'—অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজনও বিশুদ্ধ-চরিত্র যোদ্ধা যদি মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলেই যুদ্ধজয় হবে। এ যুদ্ধে সৈনিকের সংখ্যা বেশী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোথায় সেই একজন বিশুদ্ধ-চরিত্র 'perfect' সৈনিক? এদের মধ্যে আছে কি একজনও? একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন সদাশিব। ছিপলী যে তাঁর আশেপাশে ঘুরঘুর করছে তা দেখতে পাননি। হঠাৎ দেখতে পেলেন।

"কি ছিপলী? তোর পেটের ব্যথা কেমন আছে?"

"ভালো হয়ে গেছে। আপনি ওঁকে একবার দেখুন। দিন দিন কমজোর হয়ে যাচ্ছে—"

ছিপলীর স্বামী কাঁচুমাঁচু মুখে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। ছোঁড়া একটা। ছিপলীর চেয়ে বয়স কম বলে মনে হয়। পাণ্ডুর রক্তহীন চেহারা। সদাশিব ওই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই তার চোখ দেখলেন, জিব দেখলেন। তাঁর সন্দেহ হল পেটে 'হুকওয়ার্ম' আছে। বললেন, "মোটরের কাছে গিয়ে দাঁড়া, ওষুধ দিচ্ছি।" চলে গেল তারা।

তারপর তিনি তাঁর অন্যান্য রোগীদেরও খোঁজ নিলেন। আবদুলের ছেলের আর জ্বর হয়নি। কয়লার চোখ-ওঠা অনেকটা কমেছে। ভগলুর নাতির খোসও প্রায় ভালো হয়ে গেছে। সুখনের ছেলের টাইফয়েড হয়েছে। তার জ্বরটা ছাড়েনি এখনও। দামী বিলিতী ওষুধ দিয়েছেন সদাশিব, তবু ছাড়েনি।

হঠাৎ কেব্‌লীর সঙ্গে দেখা হল। দন্ত বিকশিত করে একটু হেসে আধঘোমটা দিয়ে সরে দাঁড়াল সে। তার স্বামী নারাণ কয়েকদিন আগে ছাড়া পেয়েছে। কেব্‌লী তার জন্যেই পাঁঠার 'কলিজা' (মেটে) কিনতে এসেছিল। কয়েকদিন জেলে থেকে নাকি কমজোর হয়ে গেছে নারাণ।

বাইরে এসে সদাশিব দেখলেন মোটরের কাছেও বেশ ভিড় আর একদল ঝাঁকামুটে ছোঁড়া দাঁড়িয়ে ছিল ফরসা কাপড় পরে। যথারীতি সদাশিব সকলের চোখ দেখলেন, দাঁত দেখলেন, চারটে করে পয়সা দিলেন। পাশেই যে দোকানটা ছিল তাকে বললেন—এদের প্রত্যেককে একটা করে লজেন্‌স্‌ দিতে। বারোজন ছিল, বারোটা লজেন্‌সের দাম দিয়ে দিলেন। ওদের মধ্যে একটা ছেলে বলল,"ডাক্তারবাবু, যোগীয়া আপনাকে ঠকিয়েছে। ও নিজে কাপড় পরিষ্কার করেনি, আর একজনের পরিষ্কার কাপড় পরে এসেছে।" সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল। ঝগড়া মেটাতে দেরি হয়ে গেল সদাশিবের। যোগীয়া সত্যিই প্রতারণা করেছিল। ধরা পড়ে গিয়ে কাঁদতে লাগল খুব। শেষকালে তাকে আর একটা লজেন্‌স্‌ দিয়ে থামাতে হল। তারপর ছিপলীর স্বামীকে ওষুধ দিলেন তিনি। আরও কয়েকজনকে দিলেন। গাড়িতে উঠতে যাবেন এমন সময়ে বাঁড়ুয্যে মশায়ের গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাঁকে।

"ডাক্তারবাবু, আপনার জন্যেও কিছু কুঁচো-চিংড়ি বাছলুম। বাড়িতে বেগুন আছে তো? না থাকে তো আধসেরটাক কিনে নিয়ে যান। বেগুন-চিংড়ি করে দিতে বলবেন আপনার রাঁধুনীকে। মসলা কিছুই নয়। পেঁয়াজের ফোড়ন দিতে হবে বেশী করে। আর মাছগুলো যেন বেশ লাল করে ভেজে নয়। বেগুন ও পেঁয়াজের সঙ্গে বেশ করে ভাজতে হবে। রুটি বা লুচি দিয়ে খেলে সুখ পাবেন—"

"আপনার মাছগুলোই আমাকে দিয়ে দিলেন নাকি--"

"না, অতটা নিঃস্বার্থপর আমি নই। নিজেরটা রেখে তবে আপনাকে দিয়েছি—"

বাঁড়ুয্যে মশাই বেঁটে লোক। সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে থাকেন। মুখে ভাবের অভিব্যক্তি বড় একটা হয় না। কিন্তু সদাশিব লক্ষ্য করলেন তাঁর মুখে একটা মৃদু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

"অনেক ধন্যবাদ। আপনার নাতনীর হাতের রান্না খেতে একদিন যাব কিন্তু—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। যেদিন খুশী। কমল সেদিন বলছিল, আপনি খুব খাইয়েছেন তাকে। আমার তো হজমশক্তি নেই, থাকলে আমিও একদিন আপনার সঙ্গে খেয়ে আসতুম—"

"আসুন না একদিন। আপনার হজমশক্তির মতোই ব্যবস্থা করা যাবে—"

বাঁড়ুয্যে মশাই নমস্কার করলেন।

"না, ও কথা ঠাট্টা করে বললাম। আমি কোথাও নিমন্ত্রণ খাই না। গুরুদেবের বারণ—"

কমলের কথায় সদাশিবের মনে পড়ল মিস্টার পরসাদের কথা। কমলের কথা তো তাঁকে বলা হয়নি। কমল হয়তো আশা করে আছে। তখুনি মিস্টার পরসাদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

।। নয়।।

সদাশিব ডায়েরি লিখছিলেন।

"মালতীকে নিয়ে বেশ একটু চিন্তায় পড়েছি। আজকাল তার বড় ঘন ঘন 'ফিট' হচ্ছে। 'ফিট'-এর ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাল রাত্রে হঠাৎ যা কানে এল তাতে একটু বিব্রত বোধ করছি। কাল রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম আসছিল না। বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে ছিলাম। বারান্দার ঠিক পাশেই মালতীর শোবার ঘর। মালতীর সঙ্গে চিরঞ্জীবের কথোপকথন আমার কানে গেল। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ সম্ভাবনাটা আমার মনে একদিনও উদয় হয়নি।

মালতী বলছিল, 'আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে। বেঁচে আমার সুখ কি! তোমার কাকার সংসারে রাঁধুনীবৃত্তি করতে করতে তো হাড় কালি হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে ইস্তক তো ওই কাজই করছি। উনি বাহাদুরি করে রাজ্যের লোককে নিমন্ত্রণ করবেন, আর আমাকে তাদের জন্যে কাঁড়ি কাঁড়ি রাঁধতে হবে। সকাল থেকে রাত্তির এগারোটা পর্যন্ত ওই আজবলালের টিকি ধরে দাঁড়িয়ে থাকা অসহ্য হয়েছে আমার পক্ষে। আমি আর পারছি না, পারছি না—'

মালতী কান্নায় ভেঙে পড়ল। চিরঞ্জীব নিম্নকণ্ঠে কি বললে ঠিক শুনতে পেলাম না। সম্ভবত সান্ত্বনা দিতে লাগল।

মালতীর যেটা দুঃখের কারণ—বন্ধ্যাত্ব—তা কেউ ঘোচাতে পারবে না। ওরই দু'চারটে ছেলে-মেয়ে হলে ওর অন্যরকম চেহারা হত। কিন্তু আমি ওর দুঃখের নিমিত্ত হয়ে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে ওকে আমার গৃহস্থালিতে কর্ত্রীপদে বরণ করে হয়তো ভুল করেছি।

চিরঞ্জীব এক অজ পাড়াগাঁয়ে একশ টাকা বেতনে স্কুলমাস্টারি করত। খুব কষ্টে ছিল। প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভুগত। তাই আমি ওকে নিয়ে এসেছিলাম। যে একশ টাকা ওখানে মাইনে পেত সে একশ টাকা আমি ওকে মাসে মাসে হাত-খরচস্বরূপ দিই। ওরা এখানে যে স্টাইলে থাকে সে স্টাইলে ওরা মাসে পাঁচশ টাকা রোজগার করলেও থাকতে পারত না। মালতীর শাড়ি-গয়নার অভাব রাখিনি। ওর যে-কোনও শখ বলবামাত্রই মিটিয়ে দিয়েছি। বাড়িতে খরগোশ, কাবুলী বিড়াল, কুকুর, পায়রা, নানারকম পাখি—সব ওর জন্যই। তবু দেখছি ও সুখী নয়। আমার সংসারকে ও নিজের সংসার করে নিতে পারেনি। ওর সর্বদাই মনে হচ্ছে—এটা কাকার সংসার। কিন্তু আমার সংসারে ওরাই তো সর্বেসর্বা।

সোহাগ তার স্বামীর সঙ্গে বিলেত চলে গেছে। কন্টিনেন্ট টুর করছে। সোহাগের স্বামী বিলেতেই একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। বাড়িও কিনেছে লণ্ডনের কাছাকাছি একটা জায়গায়। হয়তো ওইখানেই শেষ পর্যন্ত বসবাস করবে। অর্থাৎ ওদের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধ ছিন্ন হল যদি না আমিও ওদের সঙ্গে গিয়ে বাস করি। সোহাগ লিখেওছে যেতে। অনেক শিক্ষিত লোক নাকি এদেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিলেতে বা আমেরিকায় গিয়ে বাস করছে। সেখানে নাকি সবরকম সুবিধা। হোক সুবিধা, আমি বিদেশে যেতে পারব না। লক্ষ্য করছি সব সময় সব ব্যাপার নিজের সুবিধার মানদণ্ডে মাপতে গিয়ে অনেক লোক পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছে।

স্বদেশের ঠাকুরকে অবহেলা করে বিদেশের কুকুরদের আদর করার জন্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাদের গাল দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর গালাগাল গায়ে মাখিনি। সাহেবরা এদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে আমাদের বিদেশী-প্রীতি যেন হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। এটা দুর্লক্ষণ। সাহেবদের অনেক সদ্‌গুণ আছে স্বীকার করি, সেই সদ্‌গুণগুলি আমরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি, কারণ সদ্‌গুণ কোনও বিশেষ দেশের বিশেষ মানুষদের সম্পত্তি নয়। সেগুলি আয়ত্ত করবার জন্যে প্যাণ্ট নেকটাই পরবার বা গরু খাবার দরকার নেই, তার জন্যে দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়াও অনাবশ্যক।

এক বিলেত-ফেরত ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন—বিলেতে সাহেবরা সামনাসামনি আমাদের সঙ্গে যত ভদ্রতাই করুক, আড়ালে আমরা তাদের চোখে 'ব্রাউনি', একটা অদৃশ্য সীমারেখা টেনে মনে মনে ওরা আমাদের সর্বদাই তফাত করে রাখে। নিজেদের মধ্যে হয়তো আমাদের নিয়ে হাসাহাসিও করে। রবীন্দ্রনাথের মতো লোকের সম্বন্ধেও একজন বিখ্যাত লেখকের যে-সব প্রাইভেট চিঠিপত্র বেরিয়েছিল তা পড়বার পর আর ওদেশে যেতে ইচ্ছে করে না। রবীন্দ্রনাথকে তো আমেরিকার লোকেরাও ভারতীয় বলে অপমান করেছিল। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে চলে আসেন। আমার মেয়ে-জামাই সেই বিদেশে গিয়ে থাকবে ঠিক করেছে। করুক, আমি যাব না। এই দেশে জন্মেছি, এই দেশেই মরব।"

সদাশিব একটা বড় দীঘির ধারে চেয়ার টেবিল পেতে লিখছিলেন। দীঘির ধারে 'কুঁজড়া' (যারা তরকারি ফলিয়ে বিক্রি করে) জগদীশের ঘর। জগদীশ নবীগঞ্জের হাটে তরকারি বেচে। বুড়ো মানুষ। তার স্ট্র্যাংগুলেটেড্ হার্নিয়া হয়ে মর-মর হয়েছিল। খবর পেয়ে সদাশিব এসে সেটা অপারেশন করেছেন। দুঃসাধ্য কাজ। উলফৎ কম্পাউণ্ডার এবং ড্রাইভার আলীর সহায়তায় এটি করেছেন তিনি। সকাল থেকে এইখানেই বসে আছেন। কম্পাউণ্ডার উলফৎকে বসিয়ে রেখেছেন জগদীশের কাছে। জগদীশের জ্ঞান হয়েছে। তবু বসিয়ে রেখেছেন উলফৎকে। আরও ঘণ্টাখানেক পরে ছুটি দেবেন। উলফৎ বুড়ো অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডার। সদাশিব যখন চাকরি করতেন তখন হাসপাতালে ছিল। এখন সেও রিটায়ার করেছে। সদাশিব বাইরে যখন অপারেশন করেন, উলফৎকে ডাকেন।

জগদীশের মেয়ে এসে বললে—"বাবুজি ভালো আছে। হাসছে—"

আমার জন্যে একগ্লাস শরবত করে নিয়ে আয়। আমার গাড়ি থেকে গ্লাস নিয়ে যা—"

মেয়েটা দৌড়ে চলে গেল।

।। দশ ।।

ভোর পাঁচটা। সদাশিব বাইরে 'লনে' চুপ করে বসে আছেন একা একটা ক্যাম্প-চেয়ারে। দুটো কোকিল ডাকাডাকি করছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডাকছে আরও কয়েকটা পাখি। দুটো হাঁড়িচাঁচা মিষ্টিসুরে কথাবার্তা কইছে পরস্পরের সঙ্গে। মনে হচ্ছে যেন বলছে 'খুকু নেই', 'খুকু নেই'। টংক্ টংক্ টংক্ একঘেয়ে সুরে ডেকে চলেছে স্যাকরা পাখি। কয়েকটা দুর্গাটুনটুনী উড়ে বেড়াচ্ছে কল্‌কে ফুলের ঝাড়ে। কল্‌কে ফুলের ভিতর ঠোঁট চালিয়ে মধু

খাচ্ছে আর কিচ্‌কিচ্‌ কিচ্‌কিচ্‌ চর্‌চর্‌ করে শব্দ করছে। সদাশিবের স্প্যানিয়েল কুকুর 'লোমেশ' সামনে বসে আছে থাবার উপর মুখ রেখে। উৎসুকদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সদাশিবের মুখের দিকে। সদাশিব যে আজ বিশেষরকম অন্যমনস্ক তা যেন সে বুঝতে পেরেছে। বাড়ির চাকরটা একটা চৌকো টুল রেখে গেল সামনে। তারপর একটা ট্রের উপরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে রাখল তার উপর।

"চা কি ছেঁকে দেব—"

"থাক্‌। আর একটু ভিজুক—"

সদাশিব অন্যমনস্কভাবে পাখিদের গান শুনতে লাগলেন পা দোলাতে দোলাতে। চায়ের দিকে তেমন মনোযোগ দিলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল লোমেশ উৎসুকদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর দিকে আর আস্তে আস্তে ল্যাজ নাড়ছে। তিনি ট্রের উপর থেকে একটা বিস্কুট ছুঁড়ে দিলেন তার দিকে। লোমেশ সেটাকে আর মাটিতে পড়বার অবসর দিলে না, শূন্য থেকেই লুফে নিলে সেটাকে মুখ দিয়ে। একটা বিস্কুট খেয়ে উৎসাহভরে উঠে পড়ল এবং একটু এগিয়ে এসে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল। আর একটা বিস্কুট দিলেন তাকে, তারপর আর একটা।

"আরও বিস্কুট এনে দেব—"

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন আজবলাল দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কখন এসেছে তা টের পাননি তিনি। সদাশিব দেখলেন তার চোখে-মুখে একটা কুণ্ঠিত স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে—সদাশিব যেন ক্রীড়ারত শিশু একটা—ক্রীড়াচ্ছলে দামী বিস্কুটগুলো কুকুরকে খাওয়াচ্ছেন। তাঁর উদারতায় সে মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু অপচয়শীলতায় ক্ষুব্ধও কম হয়নি। তার মনে হচ্ছে মালতী থাকলে তাঁকে হয়তো শাসন করত, কিন্তু সে তাঁকে শাসন করতে পারে না। মনিব যে!

"না, আমার আর বিস্কুট চাই না।"

"চা-টা ছেঁকে দেব? ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

"দাও—"

আজবলাল চা ছাঁকতে লাগল।

মালতীকে নিয়ে চিরঞ্জীব কাল চলে গেল কাশ্মীর। সদাশিব জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের।

তাঁর মনে হয়েছে বাইরে একটু বেড়িয়ে এলে হয়তো মালতীর মনটা ভালো হবে।

প্রস্তাবটা শুনে চিরঞ্জীব আশ্চর্য হয়েছিল প্রথমটা।

"কাশ্মীর? সেখানে গিয়ে কি হবে!"

"ওর মনটা ভালো হবে। একঘেয়ে জীবন থেকে একটু ছাড়া পেয়ে বাঁচবে। ওকে কিছুদিন নানা জায়গায় নিয়ে ঘুরে বেড়াও। দিল্লী, আগ্রা, কাশী, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন—যেখানে ও যেতে চায় নিয়ে যাও ওকে। এতে একটু উপকার হবে মনে হয়। টাকার জন্যে ভেবো না, সে আমি ব্যবস্থা করব—"

চিরঞ্জীব স্বল্পভাষী, কিছু বলল না। কিন্তু সে মনে মনে বুঝল সদাশিব মালতীর পরিবর্তিত মনোভাবের আভাস পেয়েছেন। এজন্য নিজেই সে মনে মনে কুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কি করবে

ভেবে পাচ্ছিল না। এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে সে-ও যেন বাঁচল। এতে মালতীর উপকার হবে কিনা সে জানত না, কিন্তু মালতীকে যে কাকার কাছ থেকে সে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছে, এতেই সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। তার ভয় ছিল মালতী কোনদিন প্রকাশ্যে কোনও কেলেঙ্কারি করে না বসে।

মালতী কাল চলে গেছে। যদিও বাড়িতে চাকরবাকরদের অভাব নেই, তবু যেন বাড়িটা খালি খালি মনে হচ্ছে সদাশিবের। মালতী যে বাড়িটার অনেকখানি পূর্ণ করে থাকত। তার চীৎকার চেঁচামেচি, চাকর-ঠাকুরের উপর তার দোর্দণ্ড প্রতাপ, বাড়ির সমস্ত আবহাওয়া সরগরম করে রাখত। হঠাৎ সব যেন নিঝ্‌ঝুম হয়ে গেছে।

সদাশিব চা খেয়ে চুপ করে বসে রইলেন আরও খানিকক্ষণ। খবরের কাগজওলা এসে কাগজ দিয়ে গেল। সদাশিব খবরের কাগজ কেনেন কিন্তু পড়েন না। চিরঞ্জীবই কাগজ পড়ে দরকারী খবর মাঝে মাঝে শোনাত তাঁকে। কাগজটা দেখে আর একবার চিরঞ্জীবের কথা মনে পড়ল।

একটু পরেই গেটের কাছে মোটর এসে দাঁড়াল একটা। কমল নেমে এল মোটর থেকে।

"কি খবর কমল, এত সকালে হঠাৎ?"

"কাল জগদীশপুর হাটে গিয়েছিলাম। এস. ডি. ও. সাহেবের গাড়ি খারাপ হয়েছিল সেখানে। হাটে দেখলাম, বেশ সস্তায় মুরগি বিক্রি হচ্ছে। কিনে নিয়ে এসেছি গোটা ছয়েক। মালতীদি-কে বলুন ভালো করে রান্না করতে। রাত্রে এসে খাব। আমার জন্যে যেন রুটি করেন।"

"মালতী কাশ্মীরে বেডাতে গেছে। যাক্, তার জন্যে আটকাবে না—এই আলী—"

"হজৌর—"

আলী সেলাম করে এসে দাঁড়াল।

"বাবুর্চি গোলাম রসুলকে খবর দাও, আজ এখানে এসে রাঁধবে।"

"বহুত খু—"

"আমি তো এখুনি বেরুব। তখনই যাবার পথে বলে যাব তাকে—"

"বহুত খু—"

"মুরগিগুলো নাবিয়ে রেখে দাও—"

"বহুৎ খু—"

আলী চলে গেল। সদাশিব কমলকে জিগ্যেস করলেন, "তোমার বিল আদায় হল?"

"হয়েছে। মিস্টার পরসাদ এমন জোর কলমে লিখলেন যে বাপ বাপ করে টাকা দিয়ে গেলেন। তাই না মবলগ দশ টাকা খরচ করে মুরগি কিনলাম কাল।"

সদাশিব হাসলেন। একবার ইচ্ছে হল তাকে মিতব্যয়ী হতে উপদেশ দেন। কিন্তু নিজের কথা ভেবে তা আর দিলেন না।

"আচ্ছা চলি এখন। একটা মোটর 'চুর' হয়ে এসেছে কারখানায়। অ্যাক্সিডেন্ট করে এসেছে। গাড়ির ভিতর রক্তও রয়েছে। ওরা বলছে রক্ত মানুষের নয়, ওরা কোথায় যেন পুজো দিয়ে পাঁঠা বলি দিয়েছিল, সেই কাটা পাঁঠাটা গাড়িতে ছিল, তারই রক্ত—"

"চেনা গাড়ি?—"

"না বাইরের গাড়ি। মোটরের নম্বর রাঁচির। কি করব বলুন তো?"

"পুলিসে খবর দাও। পুলিস এসে দেখে যাক্, তারপর গাড়িতে হাত দিও। তা না হলে ফ্যাসাদে পড়ে যেতে পার।"

"তাই করি তাহলে।"

কমল চলে গেল।

তারপর সদাশিবের মনে পড়ল বনুর ওখানে যেতে হবে। বনু কয়লা-গুদামের কুলি। কাল থেকে তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। বনু কয়লা-গুদামেরই একধারে থাকে। তার দেশ কোথায় কেউ জানে না, তাকে সবাই চিরকাল কয়লা বইতে দেখেছে। ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা, কুচকুচে কালো। ঘাড়টা একধারে একটু বেঁকা। গলার স্বর ঝাপসা। কাল যখন সদাশিব বাজারে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সামনেই বনু কয়লার বোঝাসুদ্ধ রাস্তায় পড়ে যায়। তারপর তার মুখ থেকে রক্ত উঠতে থাকে। সদাশিব তাকে গাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু বনু যেতে চাইলো না। বললে, ওখানে গেলেই পয়সা চাইবে: আমার পয়সা নেই। আমাকে ওই গুদামেই নিয়ে চলুন। গুদামের মালিক সৌখা মাড়োয়ারী একটা ঘর খালি করিয়ে দিয়েছেন। ঠিক পাশেই যে কয়লার গুদাম আছে সেখানে একটা ভালো ঘর ছিল; কিন্তু সে গুদামের মালিক বাঙালী সর্বেশ্বরবাবু। তিনি সর্ববিষয়ে গা বাঁচিয়ে হিসাব করে চলেন, তাই সে ঘরে টি. বি. রোগীকে ঢুকতে দেননি। বনুর টি. বি. হয়েছে কিনা তা সদাশিব এখনও ঠিক করতে পারেননি, কিন্তু সর্বেশ্বর এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

সদাশিব উঠতে যাবেন এমন সময়ে আধঘোমটা দিয়ে কেব্‌লী এসে দাঁড়াল।

"কি খবর কেব্‌লী?"

কেব্‌লী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"কি ব্যাপার, কি হয়েছে—"

কেব্‌লী কাঁদতেই লাগল। তারপর অশ্রুজড়িত কণ্ঠে থেমে থেমে বলল যে নারাণ তাকে কাল মেরেছে। তার মাথা ফেটে গেছে।

" সে কি!"

" দেখো নি" (দেখ না)

মাথার কাপড় তুলে সে দেখাল। সামনের চুলগুলো শুকনো রক্তের চাপে জড়িয়ে গেছে। সদাশিব তার চেহারা দেখে ভয় পেলেন। চোখে অশ্রু লেগে আছে বটে কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ, যেন সর্পিণী ফণা তুলেছে। কিছুদিন আগে এইরকম এক স্বামী-লাঞ্ছিতা কাহারনী তার স্বামীকে দা দিয়ে কেটে ফেলেছিল। ঘটনাটা হঠাৎ মনে পড়ল।

"কেন মারলে কেন তোকে—"

তখন কেব্‌লী আসল কারণটি বিবৃত করল। নারাণ আবার একটি বিয়ে করতে চায়। কেব্‌লী বাঁজা। সুতরাং নারাণের দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে চাইছে তার ভাই। তার মায়ের—মানে কেব্‌লীর শাশুড়ীর এতে মত নেই।

"নারাণের মা বেঁচে আছে নাকি এখনও?"

"হ্যাঁ। দেহাতে সে জমিতে কাজ করে—"

"কোথায় নারাণের বিয়ে ঠিক হয়েছে?"

"ওই দেহাতেই। একটা কানী বিধবা ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। কে ভালো মেয়ে দেবে ওই বুড়োকে—"

"এ মেয়েটার বয়স কত—"

"তা জোয়ান আছে —"

"তোকে মারতে গেল কেন শুধু শুধু—"

"বাঃ, আমার মত না পেলে তো বিয়েই হবে না। আমাদের সমাজের নিয়ম যে 'পন্চ'-এর (সমাজের মোড়লদের) সামনে আমি যতক্ষণ না বলব যে আমার বিয়েতে মত আছে, ততক্ষণ ওকে কেউ মেয়ে দিতে পারবে না। আমার সেই মত নেবার জন্যে আমাকে মারধোর শুরু করেছে—"

কেব্‌লীরা জাতে মুচি। তাদের সমাজে এরকম নিয়ম আছে শুনে সদাশিব বিস্মিত হলেন।

"এ ব্যাপারে আমি কি করব বল—"

"আপনি দারোগা সাহেবকে বলে আবার ওকে জেলে পুরে দিন। ওরকম মারখুণ্ডা শন্‌কাহা মানুষের জেলে থাকাই উচিত—"

সদাশিব হেসে ফেললেন।

"সে কি হয়। আচ্ছা তুই বাড়ি যা। নারাণের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলব আমি—"

কেব্‌লী চলে গেল।

সদাশিবের গাড়ি যখন কয়লা-গুদামের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন সেখানে কেউ ছিল না। গুদামের মালিকরা কেউ আসেননি তখনও, কুলিরাও কেউ আসেনি। বনুকে কাল যে ঘরটায় সদাশিব রেখে গিয়েছিলেন সে ঘরের কপাট দুটো খোলা। সদাশিব মোটর থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্ষণকালের জন্য। কয়লার স্তূপগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হল যেন শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছেন। 'কয়লাগুলো তো মৃত অরণ্যের কঙ্কাল, মাটির তলা থেকে খুঁড়ে আবার সেগুলো পোড়াচ্ছি আমরা'—এই দার্শনিক চিন্তা ক্ষণিকের জন্যে অন্যমনস্ক করে দিল তাঁকে। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন বনুর ঘরটার দিকে। গিয়ে দেখলেন বনু মুখ গুঁজড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, আর ঘরের কোণে বসে আছে একটা লোম-ওঠা রাস্তার কুকুর। বনু যখন দুপুরে ছাতু খেত এই কুকুরটাকে ছাতুর গুলি পাকিয়ে পাকিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। সেই কুকুরটা বসে আছে চুপ করে। আর একফালি রোদ বনুর মাথায় পিঠে সোনালী চাদরের মতো বিছানো রয়েছে। সদাশিব পরীক্ষা করে দেখলেন বনু মারা গেছে। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

অনেকদিন আগেকার ছবি ফুটে উঠল তাঁর মনে। সেদিন রবিবার। সব কয়লার দোকান বন্ধ। তার উপর বৃষ্টি পড়ছে। সেদিন বাড়িতে তিনি কয়েকজনকে খেতে বলেছেন। মালতী খেয়াল করেনি যে আগের দিন রাত্রেই কয়লা ফুরিয়ে গেছে। সকালবেলা চাকর বাজার থেকে ফিরে এসে বলল, সব দোকান বন্ধ, কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না। সঙীন পরিস্থিতি। সদাশিব নিজে

বেরুলেন শেষকালে। বৃষ্টি পড়ছিল খুব। রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। মাছের দোকানের গলিটার সামনে এসে দেখলেন বনু রাস্তার ধারে মাথায় বোরা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। নেমে পড়লেন তিনি গাড়ি থেকে। তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াল বনু। মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বাঁকা ঘাড়টা আর একটু বেঁকিয়ে সেলাম করল তাঁকে।

"বনু, মহা মুশকিলে পড়েছি..."

সকল কথা বললেন বনুকে।

বনু ঝাপ্‌সা গলায় ভরসা দিল।

"আপনি বাড়ি যান, কয়লা পৌঁছে দিচ্ছি আমি—"

"সব দোকান তো বন্ধ, কোথায় পাবে তুমি—"

কোথায় পাব তা সে বলেনি। কেবল বলেছিল, 'পাব'।

"দামটা নাও তাহলে—"

একটা পাঁচটাকার নোট বার করে দিয়েছিলেন সদাশিব।

"ভাঙানি তো নেই। দাম আমি পরে নিয়ে নেব—"

এক ঘণ্টা পরেই বনু ভিজতে ভিজতে কয়লা দিয়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে সদাশিব মনে করতে পারলেন না, বনু কয়লার দামটা চেয়ে নিয়েছিল কিনা। কারণ তারপর বনুর সঙ্গে আর তাঁর দেখাই হয়নি অনেকদিন। মালতী হয়তো দিয়ে থাকবে—এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলেন তিনি। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন সদাশিব। ভাবতে লাগলেন এই আত্মীয়-স্বজনহীন লোকটার এখন আর কি করতে পারেন তিনি। এখন তো ও চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। সেদিনের সেই কথাটা স্মরণ করে তিনি অনুভব করলেন আজও তিনি বনুর কাছে ঋণী আছেন। কি করে এ ঋণ শোধ করা যায়? কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন আরও, তার পর বুঝতে পারলেন এ ঋণ শোধ করা যাবে না। সব ঋণ শোধ করা যায় না।

"রাম রাম ডাক্‌টার সাহেব। বনু কেমন আসে?"

সদাশিব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, সৌখী মাড়োয়ারী এসে তাঁর আপিসের চাবি খুলছেন।

"বনু মারা গেছে—"

"মরিয়ে গেলো? সরবোনাস্ হল তাহলে। ও মুরদাকে এখন ফেক্‌বে কে?—"

বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা কথা মনে হল সদাশিবের। বললেন, "সে ব্যবস্থা আমি করছি—"

"আপনি কোরবেন? কম সে কম দশ পন্‌দরহ্ টাকা খরচা হইয়ে যাবে—"

"দেখি—"

তখনি মোটরে করে বেরিয়ে গেলেন সদাশিব। বনুকে বাজারে সবাই চিনত। লোক সংগ্রহ করতে বিলম্ব হল না। সদাশিব খাটিয়া, শালু আর ফুল কিনে দিলেন। বাজারে যত ফুল পাওয়া গেল সব কিনলেন। ছিপলী, আবদুল আর ঝকমুও যোগাড় করে নিয়ে এল কিছু ফুল। একদল কীর্তনীয়াও জুটে গেল। বেশ বড় শোভাযাত্রা করে মহাসমারোহে বনু চলে গেল মহাপ্রস্থানের পথে। সদাশিব লক্ষ্য করলেন শোভাযাত্রার পিছন পিছন সেই লোম-ওঠা কুকুরটাও চলেছে। সদাশিবের সবসুদ্ধ খরচ হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ টাকা। এত কম টাকার বিনিময়ে এমন প্রচুর

আনন্দ তিনি জীবনে আর কখনও পাননি। অনেকদিন পরে তাঁর মন অনাবিল তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। একটু দূরে দূরে তিনিও শবানুগমন করতে লাগলেন তাঁর মোটরে।

"রাম রাম ডাক্‌টার সাহেব—"

সৌখী মাড়োয়ারীকে দেখে গাড়ি থামালেন সদাশিব। "হামার বড় তাজ্জুব লাগছে। আপনে এক কুলিকে লিয়ে কাহে এত্‌না রুপিয়া খরচ কর ডালা হমরা সমঝ্‌মে নেহি আতা হ্যায়—"

সদাশিব দেখলেন এর আধ্যাত্মিক দিকটা সৌখী মাড়োয়ারীকে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললেন—"বনুর কিছু টাকা আমার কাছে জমা ছিল। সে টাকাই লাগিয়ে দিলাম এতে।"

"ও আব্ সমঝা। ভালো করিয়েসেন—রাম রাম।"

সৌখী মাড়োয়ারী চলে গেলেন।

আলী আবার স্টার্ট দিলে মোটরে।

"আস্তে আস্তে চল—"

কিছুদূর যাবার পর একটা খুব রঙচঙে রিক্‌শা সামনে এসে দাঁড়াল। রিক্‌শার পিছনে একটি উন্মুক্ত-বক্ষা অত্যাধুনিকা অভিনেত্রীর ছবি রয়েছে। রিক্‌শার গদি লাল সাটিনের, হুডটা সবুজ রঙের। হুডের চারিধারে চমৎকার ঝালর দেওয়া। সাইকেলের হাতলে একরাশ সোঁদাল ফুল। রিক্‌শাচালক নেমে খুব ঝুঁকে সেলাম করলে সদাশিবকে। শুকুরের ছেলে সিদ্দিক। একেই তিনি কিছুদিন আগে হাটে চড় মেরেছিলেন। গনোরিয়া হয়েছিল ছোকরার।

"কৈসা হ্যায়—"

"ছুট্ গিয়া হুজুর। আওর কি সুই লেনা পড়েগা?"

"কল্ পেসাব লে কর্ আও, দেখেঙ্গে—"

শোভাযাত্রার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সিদ্দিক আলীকে জিগ্যেস করলে, "ইয়ে জুলুস কিস্‌কা হ্যায়—"

আলী তখন তাকে বললে যে বনু মরে গেছে, তাকেই শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে সবাই।

"ম্যায় ভি যাউঙ্গা—"

সিদ্দিক তার রঙীন রিক্‌শা চালিয়ে চলে গেল ভিড়ের মধ্যে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে।

শ্মশান থেকে সদাশিব গিয়েছিলেন তিরমোহানীর হাটে। সেখানে অনেকগুলি রোগীর আসার কথা ছিল। সেখানে দেখা হল গীতার সঙ্গে। গীতা সেখানে মহুয়া দই বিক্রি করছিল। সে উদ্ভাসিত মুখে সদাশিবের দিকে চেয়ে মাথার কাপড়টা টেনে দিল একটু। তারপর তার পাশেই যে বলিষ্ঠ গুঁপো লোকটি বসে ছিল তাকে ফিসফিস করে কি বললে। নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল লোকটি।

"কে তুমি, চিনতে পারছি না তো—"

"শকলদীপ—"

পাশের একজন পরিচয় করিয়ে দিলে শকলদীপ গীতার স্বামী। শকলদীপ আহীর

গোয়ালাদের মিষ্টি ভাষায় মৃদুকণ্ঠে বলল যে সে তাঁরই ভরসায় গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে। একদিন সে তাঁর কাছে যাবে।

"যেও—"

সদাশিব হাটে ঘুরতে লাগলেন। তিরমোহানীর হাটে ভালো পেঁপে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। সেদিন কিন্তু পেঁপে দেখতে পেলেন না। অন্যান্য তরকারিওলার কাছে খবর পেলাম শিবুর একমাত্র ছেলেটি নাকি মারা গেছে দুদিন আগে। শিবুই হাটে পেঁপে আনত।

"কি হয়েছিল তার ছেলের?"

"মেয়াদী বোখার—"

টাইফয়েড-জাতীয় কোন জ্বর হয়েছিল সদাশিবের মনে হল।

"কে দেখছিল?"

"বিলাতী ডাক্‌টার দৎ সাহেব—"

সদাশিবের আত্মসম্মানে যেন একটু আঘাত লাগল। শিবুর বাড়ির অনেক অসুখ তিনি সারিয়েছেন। আজ শিবু বিলাতী ডাক্তার দৎ সাহেবের কাছে ছেলের চিকিৎসা করিয়েছে শুনে তাঁর খারাপ লাগল।

দৎ সাহেবের বয়স বেশী নয়, বিলেত থেকে সম্প্রতি ডি. টি. এম. পাস করে এসেছেন। লোকটির চিকিৎসা-নৈপুণ্য আছে কিনা তা এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ, কিন্তু ব্যবসায়-নৈপুণ্য যে আছে তা ইতিমধ্যেই বেশ বোঝা গেছে। অনেক দালাল লাগিয়েছেন, তারা রোগীপিছু কমিশন পায়। তাদের আরও একটা কাজ হচ্ছে আকারে-ইঙ্গিতে প্রচার করা যে সদাশিবকে দিয়ে চিকিৎসা করানো নিরাপদ নয়। তিনি বুড়ো হয়েছেন, সেকেলে মতে চিকিৎসা করেন, অনেক কিছু ভুলেও গেছেন। এবং এই কারণেই 'ফি' নেন না, ওষুধের দামও দাবি করেন না। এই প্রচারে সদাশিবের অবশ্য ক্ষতি হয়নি, কারণ তিনি লাভের আশায় প্র্যাক্‌টিস্ করতেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে কষ্ট হয় তাঁর। মানুষের মনের বিচিত্র মতিগতি দেখে কৌতুকও অনুভব করেন।

...হাট থেকে যখন ফিরলেন তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। প্রায় দুটো। এসে দেখেন দ্বিজেনবাবু বসে আছেন একটা নীল চশমা পরে। দ্বিজেনবাবু একজন মোক্তার। সদাশিবের সঙ্গে তাঁর ক্বচিৎ দেখা হয়। প্রোটিন খাদ্যের মহার্ঘতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন—"আজকাল পাকা রুই সাড়ে তিন টাকা সের, মাংসও তাই। ভালো ডিম এক টাকায় সাতটা বা বড়জোর আটটা। দুধ টাকায় পাঁচপো। তাই কিনে খাই, কি আর করব। যা রোজগার করি খাওয়াতেই যায়। ভিটামিনের জন্য ফলও খেতে হয় কিছু—লেবু, বেদানা এই সব। শসা-টসা আমার রোচে না। খেয়েই সর্বস্বান্ত হলাম মশাই"—বলেই অধরোষ্ঠের সহযোগে আক্ষেপসূচক 'মছ'-গোছের একটা শব্দ করেন। তাঁর চেহারাটি কিন্তু খাদ্যপুষ্ট নয়। চোখের কোল বসা, গালের হাড় উঁচু, নাকটা খাঁড়ার মতো। দেখলেই মনে হয় বুভুক্ষা যেন মূর্তিমতী হয়ে রয়েছে তাঁর চেহারায়।

" নমস্কার ডাক্তারবাবু, অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি আপনার অপেক্ষায়—"

. "নমস্কার। হঠাৎ এ সময়ে কেন?"

"চোখটাতে ভালো দেখতে পাচ্ছি না কদিন থেকে। নতুন বিলেতফেরত ডাক্তারটার কাছে গিয়েছিলাম, এক কাঁড়ি টাকা খরচ হল খালি, চোখের তো কোনও উপকার দেখছি না।"

"বসুন দেখছি।"

তখনই ভালো করে পরীক্ষা করলেন চোখটা। দেখে তাঁর যা মনে হল তা বলতে পারলেন না তিনি দ্বিজেনবাবুকে। যে ব্যক্তি বরাবর বড়াই করে এসেছেন যে ভালো ভালো খাবার খেয়েই তিনি সর্বস্বান্ত তাঁকে কি করে বলা যায় যে ভালো খাদ্যের অভাবেই তাঁর চোখের এই দশা হয়েছে। তাঁর মনে পড়ল তাঁর এক বন্ধু জ্ঞানবাবুর কথা। জ্ঞানবাবু একবার বলেছিলেন—"এটা সার জেনে রেখো পেট না মারলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে পয়সা জমানো অসম্ভব। যারা মুখে বলে হাতি খাচ্ছি ঘোড়া খাচ্ছি তারা জেনো বাহাদুরি করছে। ছেলে পড়িয়ে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে, বাড়িভাড়া গুনে আর লোক-লৌকিকতা করে কটা পয়সা বাঁচে যে খাবে? জান, অনেক বাড়িতেই দাই চাকর নেই, অনেক বাড়িতেই দুবেলা রান্না হয় না। সব জানা আছে আমার। সুতরাং পয়সা যদি বাঁচাতে চাও নোলাটি কমাও।"

জ্ঞানবাবুর এ সারগর্ভ উপদেশ সদাশিব পালন করেননি। দ্বিজেনবাবুর চোখ দেখে জ্ঞানবাবুর কথাগুলো অনেকদিন পরে মনে পড়ল। হয়তো এতদিন লোকটা মিথ্যে বাহাদুরি করে এসেছে।

"কি দেখলেন চোখে?"

"হ্যাঁ, একটু খারাপ হয়েছে। আপনি ডিম আর দুধ কি ভাবে খান?"

"দুধের ক্ষীর আর ডিমের ডালনা।"

"এগ্‌ফ্লিপ্ করে খাবেন। আধকাপ দুধে একটা কাঁচা ডিম মিশিয়ে তাই ঢক করে খেয়ে ফেলবেন রোজ সকালে—"

"আঁশটে গন্ধ ছাড়বে যে—"

"নাক টিপে ওষুধের মতো খেয়ে নেবেন।"

"ওষুধ দেবেন না কিছু?"

"দিচ্ছি—"

সদাশিবের কাছে ভিটামিনের স্যাম্পল্ ছিল নানারকম। সেইগুলোই দিয়ে দিলেন।

"আপাতত এইগুলো খেয়ে দেখুন। যদি না কমে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে—"

"আপনার ফি—আর ওষুধের দাম—"

"না, ওসব দিতে হবে না। এখন আমি কেবল ডাক্তারি করি, ডাক্তারি ব্যবসা অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি—"

"আচ্ছা, তাহলে চলি। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।"

দ্বিজেনবাবু চলে গেলেন।

আজবলাল আড়ালে এতক্ষণ 'টাইম-বমে'র মতো চুপ করে ছিল। দ্বিজেনবাবু চলে যাবার পর বিস্ফোরণ হল।

"মালতী দিদি চলে যাবার পর থেকে আপনি বাবু শরীরের উপর বড়ই জুলুম লাগিয়েছেন। আমাকে শেষে জবাবদিহিতে পড়তে হবে।"

"দাও, খাবার দাও—"

"চান করবেন না? গরম জল তৈরি আছে—"

"না থাক।"

এতে অসন্তুষ্ট হল আজবলাল। তার চোখ-দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত হল। এই না-চান-করাটাও সে শরীরের উপর আর একটা জুলুম বলে গণ্য করলে। কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না আর। হন হন করে ভিতরের দিকে চলে গেল।

খেতে বসে সদাশিব তাই লক্ষ্য করলেন, মালতী চলে যাওয়ার পর থেকে যা রোজই লক্ষ্য করছেন। আজবলাল অনেকরকম রান্না করেছে,—মাছ, মাংস, লাউ, কুমড়ো, আলুর দম, শুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা, অম্বল কিচ্ছু বাদ দেয়নি। তার চেষ্টা মালতীর অভাবে তিনি যেন কষ্ট না পান। আজবলাল রাঁধে ভালো, কেবল তার মসলার হাতটা একটু বেশী। সে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে কোন্ তরকারিটা কেমন হয়েছে।

"মাংসা সিদ্ধ হয়েছে তো বাবু? আজ মাংসটা খুব কচি ছিল না।"

"বেশ হয়েছে মাংস। খুব নরম হয়ে গেছে—"

"মাছের ঝালটা দেখুন তো, দিদিমণির মতো পেরেছি কি—"

"চমৎকার হয়েছে..."

প্রতিটি জিনিসের প্রশংসা না করলে আজবলাল মনে মনে দুঃখিত হয়। একবার খুব ঝাল হয়েছিল বলে মাংসের বাটিটা সদাশিব ঠেলে দিয়েছিলেন, খাননি। আজবলালও খায়নি সেদিন। শুধু তাই নয়, তার পরদিন এসে বলেছিল—"আমি বুড়ো হয়েছি বাবু, সত্যিই আর রাঁধতে পারি না। আমাকে এবার ছুটি দিন।"

সদাশিব শুধু একটা কথা বলেছিলেন—"মালতী চলে গেছে, সোহাগ চলে গেছে, তুমি যাবে? যেতে চাও যাও। ওদের আটকাইনি, তোমাকেও আটকাব না।"

আজবলাল আর যায়নি। শুধু যে যায় নাই তাই নয়, তারপর থেকে অপ্রত্যাশিত একটা পরিবর্তন ঘটেছে তার চরিত্রে। বহুদিনের কু-সংস্কার সে বর্জন করেছে। আজবলাল মুরগির মাংস ছুঁতো না। মুরগির মাংস মালতী রাঁধত আলাদা উনুনে। মালতী চলে যাওয়ার পর মাঝে মাঝে বাবুর্চি আনিয়ে সদাশিব মুরগি রান্না করেছেন। হঠাৎ আজবলাল একদিন বললে—"বাবুর্চিকে ডাকবার দরকার নেই। আমিই পাখি রেঁধে দেব। রেঁধে না হয় চনে করে নেব। রোজ রোজ আপনার খাসির মাংস খাওয়ার দরকার নেই। মুরগি খেলে যখন ভালো থাকেন, আমি রেঁধে দেব—"

তারপর থেকে আজবলাল রোজ মুরগি রাঁধছে।

খেতে খেতে সদাশিব জিগ্যেস করলেন, "মহেন্দ্রবাবুর খাবার রোজ পাঠাচ্ছ তো?"

"হ্যাঁ। ছানা পাঠাই রোজ আধসের দুধের। উনি বলে পাঠিয়েছেন ওঁর জন্যে আলাদা করে ছোট মাছ পাঠাবার দরকার নেই। বাড়িতে যা রান্না হয় তাই পাঠালেই চলবে। ওঁকে মাছ মাংস সবই দিই—"

মহেন্দ্রবাবু মানে সেই 'হিপো' যাঁকে একদিন সদাশিব বেছে বেছে চারটি ছোট ছোট মাছ কিনতে দেখেছিলেন। এখন তিনি সদাশিবের চিকিৎসাধীন আছেন। সদাশিব তাঁকে আর বাজার করতে দেন না, আজবলালকে বলে দিয়েছেন তাঁকে যেন খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সদাশিবের মনে হল অনেকদিন তাঁর খবর নেওয়া হয়নি। কেমন আছেন ভদ্রলোক কে জানে।

।। এগারো।।

খুব ভোরে সদাশিব বাড়ির সামনে 'লনে' চুপ করে বসে থাকেন। কিছু করেন না, কেবল পা দোলান আর বসে বসে চেয়ে দেখেন চারদিকে। পাখি, ফল, গাছ, আকাশ, চিরপুরাতন তাঁর এই সঙ্গীরা নিত্য-নূতন আনন্দ দেয় তাঁকে। লনে বসেই চা খান এবং চা খাওয়ার পরও চুপ করে বসে থাকেন তাঁর ড্রাইভার আলী যতক্ষণ না আসে। আলী এলেই বেরিয়ে যান তিনি।

সেদিন ভোরে ছিপলী এসেছিল, কিছু মাছ আর তার স্বামীকে নিয়ে। সদাশিব দেখলেন ছিপলীর স্বামীর হুকওয়ার্মের চিকিৎসা করে স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছে। আগে চোখ মুখ বিবর্ণ ছিল, এখন একটু রক্তের আভাস দেখা দিয়েছে। ছিপলী কিন্তু বললে ওর 'তাগত' নেই কিছু। হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন সদাশিব। ছিপলীকে বললেন, "তুই মাছগুলো নিয়ে বাড়ির ভেতর যা। আমি দেখছি একে। আজবলালের কাছ থেকে বঁটি নিয়ে মাছগুলো বেছে দিগে যা।"

ছিপলীর স্বামীকে মৃদুকণ্ঠে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন সদাশিব। ছিপলীর স্বামী অপ্রতিভ মুখে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সত্য কথা বলল। লোকটা পারুষ্য-হীন। পূর্ণ যুবতী হাস্যমুখী ছিপলীর ঢল্‌ঢলে চেহারাটা ফুটে উঠল সদাশিবের মানসপটে।

"নাম কি তোমার—"

"জিতু—"

"তোমার যে অসুখ হয়েছে তা তো বাপু চট্ করে সারবে না। এর জন্যে যে-সব ইন্‌জেক্‌শন নিতে হবে তার দামও অনেক। তুমি কি পারবে?"

"ঘটি বাটি বন্ধক দিয়ে টাকা যোগাড় করতে হবে। কত টাকা লাগবে—?"

"আমি ওষুধের নাম লিখে দেব। তুমি দোকানে গিয়ে খোঁজ কর কত দাম লাগবে—"

"আচ্ছা, যদি অসুখ সেরে যায় তাহলে আমি যেমন করে হোক ওষুধের দাম জোটাব—"

"আচ্ছা তুমি বস। আমি ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছি। ছিপলী আসুক—"

জিতু একধারে বিমর্ষ মুখে বসে রইল। সদাশিবও একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় এ অসুখ প্রায় দুরারোগ্য। ওষুধও দুর্মূল্য। এ অবস্থায় এই গরীব লোকটাকে কি এত খরচের মধ্যে ফেলা উচিত হবে?

ছিপলী একটু পরে বেরিয়ে এল।

তাকে স্পষ্ট কথাই বললেন সদাশিব—"তোর স্বামীর যা হয়েছে তা প্রায় সারে না। একরকম ইন্‌জেক্‌শন আছে, তাতে কিছু উপকার হতেও পারে, না-ও হতে পারে। তোমরা যদি সে ইন্‌জেক্‌শন কিনতে পারো, তাহলে উলফৎ সে ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে দেবে, পয়সা নেবে না। ওষুধটা কিন্তু কিনতে হবে। আমার কাছে নেই—"

"বেশ, লিখে দিন কিনে নেব—"

ওষুধের প্রেসকৃপশন নিয়ে ছিপলী আর তার স্বামী চলে গেল।

ওরা চলে যাবার পর সদাশিব ভাবতে লাগলেন। জিতুর অসুখ যদি না সারে, তাহলে কি হবে? আইনত ছিপলী তার স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য বিবাহ করতে পারে। কিন্তু ছিপলী কি তা করবে? মনে হয় ওর স্বামীকে ও ভালোবাসে। দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে বলেই সব

ভালোবাসা উবে যাবে? কেবল আইন বা শাস্ত্র মেনে চললেই কি মানুষ সুখী হয়? কি জানি ওর কিসে সুখ হবে।

বহুদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ল। ভবদেববাবুর স্ত্রী সাবিত্রীর কথা। ভবদেববাবুরও কোনও পারুষ্য ছিল না। সাবিত্রী দেবী সাবিত্রী নামের মর্যাদা রাখতে পারেননি। অনেক প্রণয়ী ছিল তাঁর। ভবদেববাবুও জানতেন একথা, কিন্তু কিছু বলতেন না। স্ত্রীকে ভয় করতেন তিনি, সর্বদাই যেন তাঁর কাছে অপরাধী হয়ে থাকতেন। আড়ালে সকলেই ভবদেববাবুকে নিয়ে পরিহাস করতেন। নিজেকে এরকম হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলার চেয়ে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা ঢের ভালো।

আজবলাল চা নিয়ে এল।

চায়ের টেবিল সাজিয়ে দিয়ে সে কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল একধারে।

"তুমি যাও, আমি নিজে ছেঁকে নেব—"

"একটা কথা ছিল বাবু। আমি মাসখানেকের জন্যে বাড়ি যেতে চাই। দেশে আমাদের কিছু জমি আছে, আমার ভাইপোটাই এতদিন সব দেখাশোনা করত। কিন্তু সে পুলিসের চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে গেছে, বাড়িতে কেউ নেই, আমি একবার বাড়ি না গেলে সব বরবাদ হয়ে যাবে। আমি রামলক্ষ্মণ ঠাকুরকে বলেছি, এখানে এসে কাজ করবে।"

"এখান থেকে যদি কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও কোনও ব্যবস্থা হতে পারে না?"

"শুধু টাকা পাঠালে কিছু হবে না। আমাকে নিজে যেতে হবে। জমিগুলো ভাগে বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসব। যাবার সময় আমাকে কিছু টাকাও নিয়ে যেতে হবে।"

সদাশিব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, "বেশ—"

চা খেয়ে সদাশিব চুপ করে বসে রইলেন। কাগজওলা কাগজ দিয়ে গেল। আলী এসে সেলাম করে গাড়ির চাবি নিয়ে গাড়ি বার করল। সদাশিব চুপ করে বসে রইলেন। সোহাগ গেছে, মালতী গেছে, আজ আজবলালও চলল। ও বলছে বটে ফিরে আসবে, কিন্তু সম্ভবত ফিরবে না। দেশে ওর ভাইপো ছিল বলেই এতদিন ও একটানা এখানে থাকতে পেরেছিল। আর থাকবে না। হঠাৎ যেন তিনি চম্‌কে উঠলেন। মনে হল মনু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। পরমুহূর্তেই কিন্তু আর দেখতে পেলেন না। চোখের ভুল? কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে! অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলেন তিনি। তারপর তাঁর সমস্ত হৃদয় অদ্ভুত একটা সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর বিশ্বাস হল আর কেউ না থাক মনু তাঁর কাছাকাছি আছে এবং চিরকাল থাকবে।

।। বারো ।।

নবীগঞ্জের হাটের কাছে সেই বড় দীঘিটার ধারে চেয়ার টেবিল পেতে বসেছিলেন সদাশিব। দীঘির ধারে জগদীশ কুঁজড়ার বাড়ি। অপারেশন করবার পর জগদীশ ভালো হয়ে গেছে। আজবলাল চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি দুপুরে আর বাড়িতে খেতে যান না। আলীর

সহায়তায় বাইরের কোথাও না কোথাও রান্না করে নেন। আলীও রাঁধে ভালো। তাছাড়া যেখানে রান্না করা হয় সেখানে আশেপাশে তাঁর চেনা রোগী থাকেই। তারাও এসে আলীকে সাহায্য করে। সেদিন জগদীশের বউ ছেলেমেয়েরা আলীর সহকারী হয়েছিল। কেউ মসলা বেটে দিচ্ছে, কেউ জল তুলে আনছে, কেউ তরকারি কুটে দিচ্ছে। নতুন-ধরনের এক যাযাবর জীবন যাপন করছেন সদাশিব। রোজই কোথাও না কোথাও যেন পি্‌কনিক্ হচ্ছে।

সদাশিব ডায়েরি লিখছিলেন।

"আজবলাল আর ফেরেনি। লিখেছে তার জমি নিয়ে বড্ড বেশী জড়িয়ে পড়েছে, তার এক জ্ঞাতি নাকি তার সঙ্গে মকদ্দমা করছে জমির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে। লিখেছে মকদ্দমা শেষ হলেই ফিরে আসবে। আমি জানি আসবে না। জমির মকদ্দমা সহজে মেটে না।

"মালতীর খবরও পাই মাঝে মাঝে। উত্তরপ্রদেশের তীর্থগুলি একে একে দেখে বেড়াচ্ছে। কোন কোন জায়গায় থেকেও যাচ্ছে বেশ কিছুদিন। চিরঞ্জীব লিখেছে মালতী অনেক ভালো আছে। 'ফিট্' আর হয়নি। মালতী নাকি প্রত্যেক তীর্থস্থানে গিয়ে মন্দিরেই অধিকাংশ সময় কাটায়। চিরঞ্জীবই একটু মুশকিলে পড়েছে। তার ধর্মে তেমন মতি নেই। লিখেছে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলো আবার পড়তে শুরু করেছি। আরও লিখেছে—টাকা যদি বাঁচে কাশ্মীরটা দেখে আসবার ইচ্ছে আছে। আমি তাকে লিখে দিলাম টাকার জন্যে ভেবো না, কাশ্মীর বেড়িয়ে এস। যারা যেখানে থেকে সুখী থাকে থাক। আমার জন্যে কেউ যেন কষ্ট না পায়।

"সোহাগরাও বোধ হয় শেষ পর্যন্ত বিলেতেই থাকবে। লিখেছে বছরে একবার আমার সঙ্গে এসে দেখা করে যাবে। প্লেনে আসতে যেতে বেশী সময় লাগবে না। আসে যদি ভালোই, না-ও যদি আসে তাতেই বা ক্ষতি কি! কারো জন্যে কিছু আটকায় না। ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ছে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে একটা ঝুমকোলতা ছিল। বাঁশের একটা মাচার উপর ভর করে অজস্র ফুল ফোটাত সে। একদিন ঝড় হয়ে তার মাচাটা পড়ে গেল। নূতন মাচা আর কেউ দিলে না তাকে। লতাটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল দু'চারদিন। পাশেই ঝোপঝাড় ছিল কতকগুলো বুনো গাছের। লতাটা ক্রমশ সেই দিকে তার ডালপালা বিস্তার করতে লাগল। বছরখানেক পরে কলেজের একটা ছুটিতে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম, দেখি ভাঙা মাচাটা অন্তর্ধান করেছে, কিন্তু ঝুমকোলতাটা সগৌরবে বেঁচে আছে তখনও। পাশের ঝোপটা আশ্রয় করেই অজস্র ফুল ফোটাচ্ছে। ঝোপেঝাড়ে খ্যাতিহীন অন্য ফুলও ফুটেছে অনেক। অনেক বুনো-লতাও জড়িয়ে গেছে ঝুমকোলতাটার সঙ্গে। তাদেরও ফুল ফুটেছে। তাদের দলে ঝুমকোলতাকে কিছু বেমানান মনে হয়নি। মাচার আশ্রয় হারিয়ে ঝুমকোলতা মরে যায়নি, নূতন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে, সেইখানেই সার্থক করেছে নিজেকে।

"আমার জীবনের মাচাও বার বার বদলেছে। বার বার বদলির চাকরি করেছি, আজ-এখানে-কাল-ওখানে করেই কেটেছে জীবনের বেশীর ভাগ। পুরাতনকে ছেড়ে নূতনের কাছে বার বার গেছি, তার সঙ্গে নূতন বন্ধনে বাঁধা পড়েছি, পুরাতন বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়েছে। সেই নূতনও পুরাতনে বিলীন হয়েছে আবার, তাকে আঁকড়ে বেশী দিন থাকতে পারিনি। এর নামই জীবন। আমার জীবনের মঞ্চে যাদের স্থায়ী সম্পদ বলে মনে হয়েছিল আজ দেখছি

তারাও একে একে সরে গেছে। চিরঞ্জীব, মালতী, সোহাগ আজ কোথায়? মনু অনেক আগেই চলে গেছে। সেদিন সকালে তার যে আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেটা বোধ হয় আমার অবচেতন মনেরই সৃষ্টি। আমার যে কামনা মনের নিগূঢ় লোকে বসে তাকে চাইছে, সেই কামনাই হয়তো মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল সেদিন। কই, আর তো তাকে কোনদিন দেখিনি। ওদের চিন্তা, ওদের সুখদুঃখ আগে আমাকে বিচলিত করত, এখন তো আর করে না। আমার গাড়ি ওদের স্টেশন ছেড়ে চলে এসেছে। এখন নূতন স্টেশনে নূতন লোকের ভিড়। মন তাদের নিয়েই ব্যাপৃত আছে। আজ কেব্‌লী, ছিপলী, গীতা, জগদীশ এদের সুখদুঃখেই আমি বেশী আন্দোলিত।

"কেব্‌লীর স্বামী নারাণ আমাকে এড়িয়ে চলছে। দেখা হবেই কোথাও-না-কোথাও। আলীকে বলেছি তাকে খবর দিতে। ছিপলীর স্বামী জিতু ইন্‌জেকশন নিয়ে ভালো আছে বলছে। আমার কিন্তু মনে হয় না ও সেরে যাবে। যদি কিছু উপকার হয়ে থাকে সেটা সাময়িক। ছিপলীর হাতে রুপোর খাড়ু ছিল, এখন সেগুলো নেই দেখছি। সম্ভবত ওষুধ কেনবার জন্য সেগুলো বেচে দিয়েছে। আমি ওকে বলেছিলাম আমি ওষুধ কিনে দিচ্ছি, তুই পরে টাকা দিয়ে দিস। কিন্তু ছিপলী তাতে রাজী হয়নি। বলেছিল, টাকার বন্দোবস্ত আমরা করেছি।

"আশ্চর্য মেয়ে এই ছিপলী। সদা হাস্যমুখী, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। চালচলন দেখে মনে হয় ভ্রষ্টা নয়। ওর সঙ্গে হাসিঠাট্টা অনেকে করে বটে, কিন্তু মনে হয় তার বেশী আর কেউ অগ্রসর হতে পারে না। ছবিলাল মোড়লের ছেলে একদিন বাজারে ওকে কি একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল। ছিপলী বঁটি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল তাকে। বলেছিল, তোর নাক কেটে দেব। তা ও পারে।

"গীতার সেই বাভন মহাজন সেদিন এসেছিল তার দলিলপত্র নিয়ে। দেখলুম গীতার স্বামী জিতু বহুদিন আগে দু'শ টাকা নিয়েছিল। দু'বছর ধরে ওরা স্বামী-স্ত্রী ওর বাড়িতে বিনা বেতনে খেটেছে, কিন্তু ধার এখনও শোধ হয়নি। বাভন বলছে এখনও দেড়শ টাকা বাকি আছে। আমি আর ও নিয়ে কচলাকচলি না করে টাকাটা দিয়ে দিয়েছি ওকে।

"গীতা বলেছে দুধ দিয়ে আর ঘুঁটে দিয়ে টাকাটা শোধ করে দেবে। আমি তাতেই রাজী হয়েছি। আর একটা প্রস্তাব করেছিল গীতা, তাতে আমি রাজী হইনি। সে বলেছিল, মালতী দিদি তো এখন নেই, তিনি যতদিন না আসবেন আমি আপনার বাড়িতে কাজকর্ম করে দেব। বাড়িতে কোনও মেয়েছেলে নেই, আপনার হয়তো কষ্ট হচ্ছে। এ প্রস্তাবে রাজী হইনি আমি। এমনই তো আমার নামে নানারকম নিন্দা রটিয়ে থাকেন আমার তথাকথিত বন্ধুরা। গীতার মতো এক রূপসী যুবতী যদি আমার বাড়িতে ঘুরঘুর করে তাহলে তো খই ফুটবে সকলের মুখে।

"...এদের কেন্দ্র করেই নূতন জীবন গড়ে উঠেছে আবার। বাঁচবই বা আর ক'দিন? শমনের নোটিশ এসে গেছে। ইউরিনে অ্যালবুমেন দেখা দিয়েছে, ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে। এর চিকিৎসা হচ্ছে সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে হিন্দুবিধবার আহার খেয়ে জড়ভরতের মতো পড়ে থাকা। তা আমি পারব না। জীবন্মৃত হয়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো। মরে না

গিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকলে অবশ্য শোচনীয় ব্যাপার হবে সেটা। কিন্তু যারা খুব নিয়মে থেকেছে এরকম লোকেরও তো পক্ষাঘাত হতে দেখেছি...”

সদাশিবের লেখায় বাধা পড়ল।

জগদীশের ছোট মেয়ে ফুদিয়া ছুটে এসে জিগ্যেস করলে, “মা ঠেকুয়া বানিয়েছে, খাবেন?”

“নিশ্চয় খাব। তবে একটার বেশী নয়—”

সুসংবাদ বহন করে ছুটে চলে গেল ফুদিয়া।

ডাক্তারবাবু তাদের বাড়ির তৈরি ঠেকুয়া খাবেন এটা যেন একটা আশাতীত ব্যাপার।

আলী এসে চুপি চুপি বললে—“হুজুর, খানা তো পক্ গিয়া। আভি খাইয়ে গা?”

“একটু পরে খাব—”

“তব্ হম্ নারাণকো পকড়কে লে আঁবে?”

“নারাণকো কোথা পাবে এখানে?”

“বহ্ দেখিয়ে, খাপরা ছা রহা হ্যায়—”

আলী একটু ঝুঁকে ডানহাতের তর্জনী-মধ্যমা একত্র করে দুটো গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখাতে লাগল। সদাশিব দেখতে পেলেন একটা খাপরার ঘর ছাওয়া হচ্ছে।

“ডেকে নিয়ে এস—”

আলী চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইক করে এসে হাজির হল ফালতু।

কমলের কারখানার অ্যাপ্রেণ্টিস্।

“হুজর, মুর্গ মসল্লম্ ভেজ্ দিহিন কমলবাবু—”

কমলের একটা চিঠিও ছিল।

“ডাক্তারবাবু, আপনার জন্যে একটা মুর্গ মসল্লম্ পাঠালাম। আপনি খেলে বিশেষ আনন্দিত হব। ফালতুকে বলেছি আপনি যেখানেই থাকুন সে আপনাকে খুঁজে গিয়ে দিয়ে আসবে—”

“তুই কি করে খোঁজ পেলি যে আমি এখানে আছি?”

“উলফৎ বললে—”

ফালতুর বুদ্ধি দেখে প্রীত হলেন সদাশিব। তাঁর দৈনন্দিন গতিবিধি যে উলফৎই জানে একথা ফালতু কি করে জানল? খুশী হলেন সদাশিব। ফরসা লম্বা কিশোর ছেলেটির মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন। ফালতুরও চোখের দৃষ্টি হাস্য-প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সদাশিব পকেট থেকে একটা টাকা বার করে দিতে গেলেন তাকে।

“নেহি হুজুর—”

সেলাম করে সরে দাঁড়াল সে মুচকি হাসতে হাসতে। তারপর গাড়িটার কাছে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

“পিছেকা চাক্কা মে হাওয়া নেহি হ্যায়!”

“পাম্প করে দাও—”

"আলী কাঁহা?"

"সে আসছে এখুনি। সে এসে পাম্প বের করে দেবে। তুই এখানেই খেয়ে যা—"

ফালতু হেসে একবার চাইলে তাঁর দিকে, যেন এমনই একটা প্রত্যাশা করছিল সে। তারপর সে গাড়িটাকেই প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে লাগল যদি আরও কিছু গলদ চোখে পড়ে। হঠাৎ সদাশিব লক্ষ্য করলেন তার কামিজটা বড্ড ছেঁড়া। পিঠের মাঝামাঝি লম্বালম্বি ছিঁড়ে গেছে। তিনি একটা কাগজে একটা চিঠি লিখে ফালতুকে বললেন—"তুই যখন ফিরে যাবি তখন বাজারে হরিকিষুণবাবুর দোকানে এই চিঠিটা দিয়ে দিস—"

"কাপ্ড়াকা দোকান যিন্‌কা হ্যায়?"

"হ্যাঁ—"

সদাশিব হরিকিষুণবাবুকে লিখে দিয়েছিলেন ফালতুকে ফালতুর গায়ের মাপে একটা কামিজ তিনি যেন দিয়ে দেন। তিনি দাম পরে পাঠিয়ে দেবেন। ফালতুকে সে কথা আর বললেন না। যদি না নেয়? ওদের আত্মসম্মানজ্ঞান খুব বেশী।

একটু পরেই আলীর সঙ্গে নারাণ এসে হাজির হল। নারাণের রং নিকষ-কৃষ্ণ, শরীর বেশ বলিষ্ঠ। মনে হয় কষ্টিপাথর কুঁদে কোনও শিল্পী যেন সৃষ্টি করেছে ওকে। যেন একটা কাফ্রী অসুর। তার চলনে এবং দৃষ্টিতে একটা মার্জার-সুলভ ভাব আছে। এদিক-ওদিক চেয়ে ঈষৎ হেলে-দুলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলাফেরা করে, দেখলেই চোর বা ডাকাত বলে সন্দেহ হয়।

"কি নারাণ, শুনছি তুমি বিয়ে করতে চাইছ আবার—"

"জি হুজুর—"

নারাণ বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর দিলে।

"কেব্‌লী তো আছে, আবার বিয়ে কেন—"

"ভিতর মে বাত্ ছে হুজুর—"

ছেকা-ছিনি ভাষায় আলাপ হল। তার মর্মার্থ এই—

"ভিতরে আবার কি কথা আছে?"

"কেব্‌লীর যে ছেলেপিলে হয়নি। আমার বংশ লোপ পেয়ে যাবে যে—"

"কিন্তু এতে কেব্‌লীর মনে কষ্ট হবে না?—"

"দুদিন কষ্ট হবে। তারপর ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের সমাজে তো এরকম আখছার হচ্ছে। তাছাড়া আর একটা কথা আছে। আমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি সে বিধবা! তার আগেরকার স্বামীর জমি ও পেয়েছে। তাই ওর বাবা বলেছে যে কেব্‌লীকে ও দু'বিঘে জমি লেখাপড়া করে দিয়ে দেবে। এতে কেব্‌লীর আখেরে সুবিধে হবে কত।"

"কিন্তু তোমার বদলে দু'বিঘে জমি পেলে কি কেব্‌লী সুখী হবে? হবে না। ও তোমাকে খুব ভালবাসে। এটা জেনে রেখ ওর জন্যেই তুমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছ। ওর মনে কষ্ট দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? আর ছেলে না-হওয়ার কারণ যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাহলে হাজারটা বিয়ে করলেও তোমার ছেলে হবে না—"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নারাণ।

তারপর বলল,"আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব—"

"হ্যাঁ, আর একটা কথা শোন। কেব্‌লীকে তুমি মারধোর করেছ কেন?"

নারাণের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

"না, মারব কেন। মারিনি তো। আমি কিচ্ছু করিনি।"

"কিন্তু ওর মাথায় রক্ত দেখলাম যে—"

"ও মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে নিজেই রক্ত বার করেছে কপাল থেকে আমি কি করব!"

"তাই নাকি!"

কেব্‌লী-চরিত্রের আর একটা দিক সহসা প্রতিভাত হল সদাশিবের কাছে। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন কেব্‌লী নারাণকে কতটা ভালবাসে। তাঁর ভয় হল নারাণ বিয়ে করলে কেব্‌লী আত্মহত্যা করে বসবে না তো?

"আমি এবার কাজে যাই হুজুর?"

"যাও। কথাটা ভেবে দেখো—"

"জি হুজুর।"

কিন্তু নারাণের মুখভাব দেখে সদাশিবের মনে হল ও বিয়ে করবেই।

"খানা ঠাণ্ডা হো রহা হুজুর—"

ফিসফিস করে আলী এসে বললে।

"হ্যাঁ, এবার খেতে দাও—"

আলী প্লেটে সাজাতে লাগল।

জগদীশের দুই ছেলে এক মেয়েও খেতে বসল। ফালতুও। একটু পরে জগদীশ এসে বসল একধারে।

"আমাকে আর কতদিন ঘরে বসিয়ে রাখবেন ডাক্তারবাবু, আমি তো ভালো হয়ে গেছি। হাটে না গেলে পেট চালাব কি করে?"

"তোমার বউ হাটে যাক না—"

"ও বড় সরমিলা (লাজুক), কোথাও যেতে চায় না। যাওয়াও মুশকিল। আজকালকার ছোঁড়াগুলো বড় পাজি। রাস্তায় জোয়ান মেয়ে দেখলেই পিছু নেয়—"

"আর সাতটা দিন কোনরকম করে কাটিয়ে দাও। অতবড় অপারেশন হয়েছে, ভারী ভারী মোট তোলা এখন চলবে না—"

জগদীশ চুপ করে রইল।

"আর কাউকে বলো না, তোমার তরি-তরকারিগুলো নিয়ে বেচে দিক—"

"বিরজু নিয়ে যায়। কিন্তু হিসেব ঠিক দেয় না। সেদিন কুড়িটা কদ্‌দু (লাউ) বিক্রি করে মাত্র আড়াই টাকা এনেছে। চার আনার কম কি কোন কদ্‌দু বিক্রি হয়? অথচ ওকে কিছু বলা যায় না, গোতিয়া (জ্ঞাতি)—"

"আর সাতটা দিন কাটিয়ে দাও কোনরকমে।"

সদাশিব যে এখানে এসে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তার একটা কারণ, তিনি এখানে খেলে ওরাও খেতে পাবে। সে কথাটা প্রকাশ্যে ওদের বলেননি। কিন্তু আলীকে গোপনে বলে দিয়েছেন। আলী বেশী বেশী করে রান্না করেছে। পাছে ছোঁয়া যায় বলে ভাত-ডালটা

জগদীশের বউই নামিয়ে দিয়েছে। কিছু নটে শাক সে সকালবেলাই তুলে রেখেছিল তাই ভেজেছে, আর লাউয়ের তরকারি করেছে একটা। ডাল আর আচার সহযোগে এই এদের কাছে রাজভোগ। ডাল-ভাতই প্রচুর পরিমাণে জোটানো শক্ত, রোজ জোটে না। সদাশিব ক'দিন থেকে এখানে খাচ্ছেন বলে পেট ভরে খেতে পাচ্ছে ওরা।

....খাওয়া-দাওয়ার পর গাছতলায় ইজিচেয়ারটা পেতে শুয়ে পড়লেন সদাশিব। বরাবর দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর শোয়া অভ্যাস। এই সেদিন পর্যন্ত পালঙ্কের উপর শুভ্র বিছানায় ইলেকট্রিক পাখার তলায় ঘুমিয়েছেন। ইচ্ছে করলে এখনও ঘুমুতে পারেন। কিন্তু এখন আর ইচ্ছে করে না। গাছতলায় খোলা হাওয়ায় ফোল্ডিং ক্যাম্প-চেয়ারে শুয়েই বেশী আনন্দ পান এখন। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন মনু এসেছে। হেসে বলছে, কাশী গিয়েছিলাম, খুব ভালো জর্দা এনেছি। ঘুমটা ভেঙে গেল। মনু যে জর্দা খেত একথা তাঁর মনেই ছিল না।

।। তেরো।।

নবীপুর হাটে সদাশিব সেদিন একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসলেন। ডাক্তারি-বিদ্যার প্রয়োগ হিসাবে তাতে অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না। কিন্তু হাটসুদ্ধ লোক চমৎকৃত হয়ে গেল, হাট ভেঙে যাবার উপক্রম হল প্রায়। সবাই রাধাকিষুণ বাবাজিকে ঘিরে দাঁড়াল এসে। লোকটির নাম রাধাকিষুণ নয়, মঙ্গলদাস। কিন্তু সকলেই তাকে রাধাকিষুণ বলে ডাকে, কারণ রাধাকিষুণ বললে সে ক্ষেপে যায়। প্রকাণ্ড একটা টিকি আছে মঙ্গলদাসের। রাস্তায় বেরুলেই ছেলের দল তার পিছনে লাগে—'টিক্‌কি মে রাধাকিষুণ', 'টিক্‌কি মে রাধাকিষুণ'—বলতে বলতে ছোটে পিছু-পিছু। মঙ্গলদাস দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে যায় তাদের। তারা হৈ হৈ করে হাসতে হাসতে দুড়দাড় করে ছুটে পালায়। এ খেলা অনেকদিন থেকে চলছে। অনেকে বলে, ওই তেড়ে যাওয়াটা মঙ্গলদাসের মেকি রাগ-দেখানো, আসলে ও ছেলেদের মুখে রাধাকিষুণ নামটা শুনতেই চায় বার বার। বাইরে সে কালীসাধক। টিকিতে জবাফুল বাঁধা থাকে। কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। লোকে বলে মঙ্গলদাস খুব চালাক লোক। বাইরে সে কালীপূজা করে, আবার ছেলেদের মুখ থেকে রাধাকৃষ্ণের নামটাও শুনে নেয়। গাছেরও খায় তলারও কুড়োয়।

ইদানীং কিছুদিন থেকে মঙ্গলদাসকে আর পথে-ঘাটে দেখা যাচ্ছিল না। কারণ সে একটি সাধক-সঙ্গিনী জুটিয়ে কামরূপে গিয়ে সাধনা করছিল নাকি। কিন্তু সেখানে আর একটি বেশী শক্তিশালী সাধক ছিলেন। মঙ্গলদাসের সাধন-সঙ্গিনী তাঁর খপ্‌পরে গিয়ে পড়ল। মঙ্গলদাস হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে দিনকয়েক আগে। শুধু যে সাধক-সঙ্গিনীকে হারিয়েছে তা নয়, স্বাস্থ্যটিকেও হারিয়েছে। অতিরিক্ত 'কারণ' পান করার ফলে লিভারটি গেছে। প্রকাণ্ড উদরী হয়েছে এখন। সদাশিবের কাছে মঙ্গলদাস এসেছিল কয়েকদিন আগে। সদাশিব বলেছিলেন, এ রোগ সারবে না। তবে পেটের জলটা বার করে দিলে কিছুদিন আরামে থাকবে। নবীপুরে মঙ্গলদাসের বাড়ি। সদাশিব হাটে এসে দেখলেন বিরাট পেট নিয়ে মঙ্গলদাস বসে আছে।

"পানি নিকাল দিজিয়ে হুজুর। জান যা রহা হ্যায়।"

সদাশিব বললেন,"আচ্ছা, একটা বালতি আনাও। কত জল বেরুবে সেটা দেখতে হবে।"

বালতি যোগাড় হয়ে গেল একটা। তারপর সদাশিব তার ব্লাডপ্রেসার আর নাড়ী দেখলেন। ঘী-বিশাল পাণ্ডের দোকানে বড় চৌকো-গোছের টুল ছিল একটা। সেইটের উপর বসালেন মঙ্গলদাসকে। তারপর পেটের নিচের দিকে একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে অসাড় করে দিলেন জায়গাটাকে। তারপর পট্ করে মোটা একটা ট্রোকার দিয়ে ছ্যাঁদা করে দিলেন। পিচকিরির মতো জল বেরুতে লাগল আর পড়তে লাগল বালতিতে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল চারদিকে। সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড!

মঙ্গলদাস চোখ বুজে বসে ছিল।

হঠাৎ সে চোখ খুলে বললে—"নাম শুনাও। বিরিঞ্চয়াকে খবর দেও।"

একটু পরে বিরিঞ্চিয়ার দলবল খোল মাদল আর খঞ্জন নিয়ে এসে হাজির হয়ে নাম শোনাতে লাগল মঙ্গলদাসকে। "জে জে রাধা, জে জে কিষুণ, জে জে রাধা, জে জে কিষুণ"— জে জে মানে জয় জয়। সদাশিব বাধা দিলেন না, উপভোগ করতে লাগলেন।

সদাশিবের একটু পরে চোখে পড়ল ভিড়ের মধ্যে ছিপলীও দাঁড়িয়ে আছে। আর ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে তিনটে বখা গোছের ছোঁড়া। প্রত্যেকেরই মাথায় বাহারে তেড়ি, চোকে রঙীন চশমা, পরনে হাওয়াই শার্ট আর ঢিলে পা-জামা। কথায় কথায় ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে হাসছে।

ওদের মধ্যে দু'জনকে চিনতে পারলেন সদাশিব।

একজন স্থানীয় এক ডাক্তারের ছেলে। জাতে সোনার বেনে। ঠাকুর্দা তেজারতি করে বড়লোক। জমিদারি কিনেছে। এ ছোক্‌রার কলেজে নাম লেখানো আছে। প্রফেসারদের ঘুষ দিয়ে কিংবা হুমকি দিয়ে পরীক্ষা পাস করে যায়। সেদিন দলবল নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে একটা দোকান লুঠ করেছে। পুলিস এদের কিচ্ছু বলে না। সবাই টাকার বশীভূত।

দ্বিতীয় ছোক্‌রা ছবিলাল মোড়লের ছেলে। ছবিলাল একজন কংগ্রেস-অনুগৃহীত ব্যক্তি। সুতরাং ছেলেটি একটি অকুতোভয় গুণ্ডা। এর প্রধান কাজ হচ্ছে পরের পাঁঠা চুরি করে খাওয়া। গরীব মানুষেরা প্রায়ই ছাগল পোষে, ছাগলের বাচ্চা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। এ ছোক্‌রা সুবিধে পেলেই গ্রাস করে সেগুলি। ওদের পাড়ার গরীব লোকেরা অস্থির হয়ে উঠেছে ওর জ্বালায়। অথচ ভয়ে মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারে না। পুলিস ওদের সহায়।

তৃতীয় ছোক্‌রাটিকে সদাশিব চিনতে পারলেন না।

ওরা খুব সম্ভবত ছিপলীকে নিয়েই হাসাহাসি করছিল। ছিপলীর কুঞ্চিত ভ্রূ এবং অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি দেখে তাই অনুমান করলেন সদাশিব। ছিপলী ভিড় ঠেলে ঠেলে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল, শেষে তাঁর চেয়ারের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল। হো হো করে হেসে উঠল ছোক্‌রা তিনটে।

একজন বলে বসল—"বড়ঢার কাছে গিয়ে কি মজা পাবে সহেলি—!"

ছিপলীর মুখ লাল হয়ে উঠল। সদাশিব গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তারপর উঠে মঙ্গলদাসের কাছে গেলেন। অনেক জল বেরিয়েছিল। ট্রোকারের ক্যানুলাটা বার করে নিয়ে বেন্‌জাইন্ দিয়ে সিল করে দিলেন জায়গাটা।

সেই ছোক্‌রা তিনজন এগিয়ে এল এবং ছিপলীর উপর প্রায় হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে সদাশিবকে বাংলায় জিগ্যেস করতে লাগল—"শিলাই করে দিলেন না কি—"

সদাশিব আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না।

"নিকল্‌ যাও হিয়াঁসে—"

"নিকল্‌ যায়েঙ্গে! হাটিয়ামে তো সব কোইকো equal right হ্যায়—"

সদাশিব জনতার দিকে চেয়ে বললেন—"নিকল্‌ দেও এই তিন ছোক্‌রা কো—"

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে উঠল সবাই এবং 'মার' 'মার' শব্দে তেড়ে গেল তাদের। দেখতে দেখতে দাঙ্গা বেধে গেল একটা। প্রচণ্ড মার খেলে ছোক্‌রা তিনটি। চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে বার করে দিল তাদের হাট থেকে। ধী-বিশাল পাণ্ডে একটু ভয় পেয়ে গেল। সদাশিবকে বললে,"ও তিনটেই হারামি ডাক্তারবাবু। ওদের ঘেঁটিয়ে ভালো করলেন না। আমার দোকানেই ব্যাপারটা ঘটল, হয়তো কোনদিন আমাকে এসে বে-ইজ্জৎ করবে। লুটও করতে পারে—"

"কোনও ভয় নেই। কি করবে ওরা। আমি এখনই থানায় ডায়েরি করে দিচ্ছি। মঙ্গলদাস তুমি শুয়ে পড় এবার। কেমন লাগছে—"

"অনেক হাল্‌কা লাগছে। বিরিঞ্চ ভাই, আউর থোড়া নাম শুনাও—"

দাঙ্গার গোলমালে কীর্তন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার শুরু হয়ে গেল— "জে জে রাধা, জে জে কিষুণ—"

ধী-বিশাল পাণ্ডের 'ধী' কতটা বিশাল তা বলা শক্ত কিন্তু দেহটি যে বিশাল তাতে সন্দেহ নেই। বৃহৎ একটা ষাঁড়ের মতো চেহারা তার। সে নিজেই দোকানের বড় বড় চাল-ভরতি বোরাগুলোকে তুলে তুলে ভিতরের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। দুটো উদ্দেশ্য। প্রথম, এইখানে খাটিয়া বিছিয়ে মঙ্গলদাসের জন্য বিছানা করে দেওয়া। দ্বিতীয়, চালের বোরাগুলোকে ভিতরে সরিয়ে রাখা। কি জানি যদি ও গুণ্ডার দল এসে পড়ে তাহলে চালের বোরা পেলে নয়-ছয় করে দেবে সব। চালের বোরাগুলি ভিতরের ঘরে পুরে তাতে তালা লাগিয়ে ধী-বিশাল একটা দড়ির খাটিয়া নিয়ে এল পিছন দিক থেকে। একটা ডগমগে রঙের শতরঞ্চি বিছালো তার উপর। তারপর বালিশ আনল একটি। বালিশটির বিশেষত্ব, খুব ছোট এবং টাইট্‌। মনে হয় দম বন্ধ করে আছে, এখনি বুঝি ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়বে।

"ডাক্তারবাবু, মঙ্গলদাসজী এখানে কতক্ষণ থাকবে—"

"আজ দিনভোর থাক। সন্ধ্যের পর আস্তে আস্তে বাড়ি চলে যাবে গাড়ি করে।"

বিরিঞ্চ আর ধী-বিশাল মঙ্গলদাসকে ধরে আস্তে আস্তে খাটিয়ায় শুইয়ে দিলে। মঙ্গলদাসের সঙ্গে বিরিঞ্চ বা ধী-বিশালের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যারা একথা জানে না, তাদের মনে হবে ওরাই এর পরমাত্মীয়।

সদাশিব নবীপুরের হাট থেকে সোজা থানায় চলে গেলেন। যাবার সময় ছিপলীকেও নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে।

।। চৌদ্দ।।

জিরাফ-প্রতিম সিংহেশ্বর সিং দারোগা সোচ্ছ্বাসে সংবর্ধনা করলেন সদাশিবকে।

"আইয়ে আইয়ে ডাক্‌টার সাহেব, কেয়া সৌভাগ্য। পধারিয়ে। আপকা 'কিরপা'সে মুন্না তো একদম cured হো গয়া। আরে মুন্না, ডাক্‌টার সাহেবকো প্রণাম কর—"

একটা ফরসা কিশোর এসে লজ্জিতভাবে প্রণাম করল।

"ডাক্‌টার সাহেবকো কুছ্ নাশ্‌তা (জলখাবার) লা দেও—"

সদাশিব বললেন, "না, আমি এখন কিছু খাব না—"

"চায়?"

"না। আমি যেজন্য এসেছি তা শুনুন।"

নবীপুর হাটের ঘটনা সব খুলে বললেন তাঁকে। তারপর বললেন, "ওই তিন ছোক্‌রার বিরুদ্ধে ডায়েরিতে লিখে নিন। এই ছিপলী মেয়েটাকে ওরা হাটে জ্বালাতন করছিল, হাটের সবাই দেখেছে। ওকে যা জিগ্যেস করতে চান করুন—"

সিংহেশ্বর গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর হিন্দীতে যা বললেন তার মর্ম হচ্ছে, "ও ছোক্‌রা তিনটে যে পাজি তা তো সুবিদিত। কিন্তু ওরা আঁটঘাঁট বেঁধে এমনভাবে বদমায়েশী করে যে ওদের ধরা-ছোঁয়া যায় না। আমরা যদি কিছু করতে যাই আমরাই বিপদে পড়ে যাব। কারণ যাদের অধীনে আমরা চাকরি করি, যাদের হুকুম অনুসারে আমাদের চলতে হয়, তারা ওদের সপক্ষে। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আমি ডায়েরিতে লিখে নিচ্ছি। আপনি ব্যাপারটা এস. পি. এবং ডি. আই. জি-র কানেও তুলে দিন। ওঁরা বড় অফিসার, ওঁরা ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারেন।" তারপর হেসে বললেন—"যা 'জমানা' (দিনকাল) পড়েছে তাতে ওঁরাও পারেন কিনা সন্দেহ । চাকরির মায়া তো সকলেরই আছে।"

দারোগা সাহেব ছিপলীকে আপিস-ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। তারপর যথারীতি ডায়েরিটা লিখে নিলেন।

.....ছিপলিকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে সদাশিব গেলেন ডি. আই. জি-র কাছে। যেতে যেতে তাঁর মনে হতে লাগল তিনি ডাক্তার, ডাক্তারি ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছুতেই মাথা-গলাতে যাওয়াটা কি তাঁর উচিত হচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেয়ে গেলেন নিজের মনের ভিতর থেকেই। বহুকাল আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটা লেখা পড়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, কেমিস্ট হয়েও তিনি কেন দেশের কাজে নেমেছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ্ Henry Moissau-এর একমাত্র পুত্র Louis বিশ্বমহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে মারা যান। তিনিও একজন রসায়নবিদ্ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র Laski-র বিখ্যাত প্রবন্ধ—*The Danger of Obedience* থেকে কিছু উদ্ধৃত করেছিলেন। সেই কথাগুলো সদাশিবের মনে পড়ল। Men who insist that some paiticular injustice is not their responsibility sooner or later become unable to resent any injustice. Tyranny depends upon nothing so much as the lethargy of a people. Autocracy is born above all of the experience that it need not expect active resentment against injustice. This is the inner truth of

Thoreau's famous sentence that 'under a government which imprisons any unjustly the true place for a just man is also a prison'.

আরও খানিকটা কি ছিল কিন্তু সদাশিবের তা মনে পড়ল না। তবে তাঁর মনের সংশয় কেটে গেল। অন্যায় অসভ্য অসুন্দরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। ডাক্তার হয়েছেন বলেই তিনি এ কর্তব্যের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। দেশ এখন স্বাধীন বলেই এ দায়িত্ব আরও প্রবল হয়েছে। বহুকালের পরাধীনতা আর অশিক্ষার ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষই স্বার্থপর পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক সময় লাগবে। বর্তমান সমাজের ও শাসনব্যবস্থার ভয়াবহ চেহারা দেখে ভয় পেলে চলবে না, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামে সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা যদি প্রাণপণে লেগে না থাকেন তাহলেই ভয়ের কথা। এই সব ভাবতে ভাবতে সদাশিব ডি. আই. জি-র বাংলোয় পৌঁছলেন।

ডি. আই. জি. অফিসে কাজ করছিলেন। সেখানেই সদাশিবকে ডেকে পাঠালেন।

"নমস্কার। আসুন, আমিই আপনার ওখানে যাব ভেবেছিলাম।"

"কেন বলুন তো?"

"সিরোসিস্ অব্ লিভার সারে কি?"

"সেটা নির্ভর করে লিভারটা কতটা খারাপ হয়েছে তার উপর। কেন, কার হয়েছে সিরোসিস্ অব্ লিভার—"

"আমার। পাপী লোক তো! কতটা খারাপ হয়েছে তা কি পেট টিপে বুঝতে পারবেন?"

"খানিকটা পারব। তবে ভালো করে জানতে হলে কতগুলো ল্যাবরেটরি টেস্ট আছে তা করতে হবে। তা এখানে হবে না, কোলকাতায় যেতে হবে—"

"তাই যাব। তবে, কোলকাতার ব্যাপার কি জানেন, কে ভালো ডাক্তার, কে রিলায়েবল্, কে নয়, তা ঠিক করা বড় শক্ত। অনেক ডিগ্রীধারী জুয়াচোর ফাঁদ পেতে বসে আছে তো, প্রত্যেকের টাউট্ও ঘুরছে বাজারে। আপনি যদি কোন ভালো লোকের কাছে পাঠিয়ে দেন সেইখানেই যাব—"

"কি কষ্ট হয় আপনার?"

"ডিস্পেপ্সিয়া। অম্বলে বুক জ্বালা করে বিকেলের দিকে—"

"সেটা সিরোসিস অব্ লিভারের জন্য না-ও হতে পারে।"

"মদ খাই যে। গিল্টি কন্শেন্স তো। এখন যিনি সিভিল সার্জন আছেন তিনি ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন। ইন্জেক্শনও দিয়ে যাচ্ছেন রোজ একটা করে। কিচ্ছু ফল হচ্ছে না। তাই ভাবছিলাম আপনাকে একবার কন্সালট করব।"

"মদ খেলে যে সিরোসিস্ হবেই এমন কোনও কথা নেই। হিন্দু বিধবাদেরও সিরোসিস্ হতে দেখেছি। তারা মদ খায় না, ঝাল খায়, আর প্রোটিন নামমাত্র খায়। অনেকের মতে প্রোটিন ফুডের অভাবই সিরোসিসের একটা কারণ।"

"আমি তো রোজ দুটো করে মুরগি খাই।"

"আপনি এক কাজ করুন, খাবার পর ফোঁটা-কয়েক অ্যাসিড খেয়ে দেখুন না, আপনার কষ্ট কমে কিনা।"

"বেশ, লিখে দিন প্রেস্ক্রিপশন্ একটা।"

কাগজ আর কলম এগিয়ে দিলেন। প্রেস্ক্রিপশন্ লিখে বললেন, "আমার মোটরেই ওষুধ আছে। বলেন তো দিয়ে দি।"

"দিন—"

সদাশিব বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এলেন একটা ছোট শিশি আর একটা ড্রপার নিয়ে।

"এটা অ্যাসিড্ হাইড্রোক্লোরিক ডিল। এর দশ ফোঁটা খাবেন একটু জলের সঙ্গে মিশিয়ে, খাবার পরই দু'বেলা। আউন্সখানেক জল দেবেন, বেশ টক।"

"থ্যাঙ্কিয়ু। এর দাম-টাম—"

"দাম অতি সামান্য, তা আর দিতে হবে না। তবে আমি একটা কাজের জন্যে এসেছি, যদি একটু সাহায্য করেন উপকৃত হব।"

"কি বলুন। আপনার সে লোকটা তো ছাড়া পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই—"

"হ্যাঁ। এ একটা অন্য ব্যাপার—"

সব বললেন খুলে।

ডি. আই. জি. একটু চুপ করে থেকে বললেন, "থানায় ডায়েরি করিয়ে ভালোই করেছেন। আমি দেখব। ওই ছিপলীর সঙ্গে আপনার আলাপ হল কি করে?"

"ওদের বাড়িতে আমি চিকিৎসা করি। ওরা ঘরের লোকের মতো হয়ে গেছে।"

"ও, আচ্ছা আমি দেখব।"

তারপর হেসে বললেন, "আপনি যদি আপত্তি না করেন একটা হুইস্কি সোডা অর্ডার করি—"

"না না, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না যে আপনার সিরোসিস্ হয়েছে।"

টং করে ঘণ্টা টিপতেই এক আরদালী এল।

"হুইস্কি সোডা—"

হুইস্কি-সোডায় এক চুমুক দিয়ে বললেন, "আপনার রিভলবার আছে?"

"আছে।"

"সঙ্গে থাকে তো?"

"না।"

"সঙ্গে রাখবেন। যে গুণ্ডা তিনটির নাম করলেন তারা সাংঘাতিক লোক। ওদের কথা আমি শুনেছি। ওদের গায়ে হাত দেওয়া শক্ত। ওদের খুঁটির জোর আছে। অবশ্য আমি কিছু কেয়ার করি না। আমার রিটায়ার করবার সময় হয়ে এসেছে, ওরা আমার বেশী কিছু করতে পারবে না। তবে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন—"

"স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকে ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতাটা একটু বেড়েছে—"

"বাড়বেই তো। আমি তো ইংরেজ আমলের লোক, এদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। খদ্দর পরে যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেমেছিল তাদের মধ্যে ওয়ান পারসেন্ট লোক ভালো ছিল কিনা সন্দেহ। তাদের হাতেই রাজত্ব গেছে, তারা লুটেপুটে খাচ্ছে। সেদিন এক গ্রামে এক বড় গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে, গ্রামের লোক তাড়া করাতে ডাকাতগুলো পালিয়েছিল। কিন্তু তারা যে জীপটায় এসেছিল সেটা নিয়ে যেতে পারেনি। দেখা গেল যে জীপটা একজন হোমরাচোমরা রাজপুরুষের—"

"কি করলেন আপনারা—"

"কি আর করব। তিনি বললেন, তাঁর জীপটাও ডাকাতরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা ধামা-চাপা পড়ে গেল। দুরাত্মার পিছনে যদি রাজবল থাকে তাহলে সে দিন-দুপুরে হাতে মাথা কাটবে—"

"এর প্রতিকার কি?"

"প্রতিকার? It will come in time! ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের ইতিহাস পড়েছেন?"

"ভালো করে পড়িনি।"

"পড়ে দেখবেন। ওর মধ্যে অনেক শিক্ষাপ্রদ জিনিস আছে।"

ডি. আই. জি. হাসিমুখে হুইস্কি-সোডা সিপ করতে লাগলেন।

"আচ্ছা, এবার উঠি আমি।"

"আচ্ছা। নমস্কার। দিন আষ্টেক পরে খবর পাঠাব কেমন আছি। নমস্কার।"

।। পনেরো ।।

সদাশিবের মোটর বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাজারে তিনি রোজ একবার করে যান, শুধু বাজার করবার জন্যেই নয়, বাজারের লোকদের খবর নেবার জন্যেও বটে। মাঝে কয়েকদিন যেতে পারেননি। সেদিন গিয়ে আবদুলকে দেখতে পেলেন না। শুনলেন তার জ্বর হয়েছে। তার জায়গায় জগদম্বা বসে মাছ বিক্রি করছে।

জগদম্বা মাছের ব্যবসা ছেড়ে চায়ের দোকান করেছিল, তার দোকানের বড় কাচের বোতলে রঙ্গীন মাছ ছিল, সিনেমা অভিনেত্রীদের ছবিও টাঙানো ছিল অনেকগুলো। চা বিক্রিও হত খুব। হঠাৎ সে আবার মাছ বিক্রি করতে বসল কেন? জগদম্বা বললে, লোকে ধারে চা আর পান খেয়ে খেয়ে দোকানটা তার উঠিয়ে দিলে। সে কাকে 'না' বলবে? বাবুভেইয়ারা পর্যন্ত ধারে নিতে আরম্ভ করেছিল। তার পুঁজি আর কতটুকু! সুতরাং দোকান তুলে দিতে হয়েছে। এখন সে আড়তদারের মাছ বিক্রি করে। যা লাভ হয় ভাগাভাগি করে নেয়।

ছিপলী তার কোণটিতে ঠিক বসে ছিল। তাঁকে দেখে মৃদু হেসে বললে যে তাঁর জন্যে সে সদ্য-ধরা টাটকা রুই মাছের পেটি খানিকটা রেখে দিয়েছে। আরও একটি সুখবর দিল সে। সেই গুণ্ডা ছোঁড়া তিনটিকে পুলিসে ধরে নিয়ে চালান দিয়েছে। তার কাছে ভগলু মহলদার বসে ছিল প্রকাণ্ড একটা চিতল মাছ নিয়ে। সদাশিব দেখলেন তার একটা চোখ বেশ ফুলে রয়েছে।

"চোখে কি হল ভগলু?"

ভগলু মৃদু হেসে চুপ করে রইল, তার ঝাঁকড়া গোঁফগুলো কম্পিত হতে লাগল শুধু।

"কি হল চোখে—"

চিতল মাছটাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে—'ই শালা মারিস হ্যায়।"

চিতল মাছের ল্যাজের ঝাপটায় চোখটা জখম হয়েছে তার। সদাশিব চোখটা দেখলেন। তারপর বললেন, "বিশেষ কিছু হয়নি, সেক দিও। আর আমি ওষুধ একফোঁটা দিয়ে দেব চোখে।"

বাঁড়ুয্যে মশাই যথারীতি মাছ ঘাঁটছিলেন বসে।

"নমস্কার বাঁড়ুয্যে মশাই। ভালো আছেন? কদিন আসতে পারিনি।"

বাঁড়ুয্যে ঘাড় তুললেন না। হেঁটমুণ্ডেই উত্তর দিলেন, "নমস্কার। আপনি আমার ওখানে খাবেন বলেছিলেন, কই এলেন না তো!"

"নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। ভুলেই গেছি।"

"তা বুঝতে পেরেছি। গরীবের কথা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।"

অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন সদাশিব।

"আচ্ছা, আজই যাব। বারোটা নাগাদ যাব আপনার বাসায়।"

"বেশ—"

হঠাৎ সরখেলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তাঁর বাঁ হাতে রুমালে বাঁধা কতকগুলি কুঁচো মাছ। চোখেমুখে একটা চাপা অপ্রসন্নতা ফুটে রয়েছে। দারিদ্র্য-জনিত যে অসন্তোষের আগুন তাঁর অন্তরে ধিকধিকি অহরহ জ্বলে তার শিখা তাঁর চোখেমুখে পরিস্ফুট। সৌভাগ্যবান লোকের সান্নিধ্য তিনি সহ্য করতে পারেন না। সদাশিবকে পারতপক্ষে তিনি এড়িয়ে চলেন। বাজারের সেরা মাছ মাংস তাঁর বাড়িতে রোজ যায় এইটেই বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। সদাশিবকে দেখলেই তাঁর চোখেমুখে একটা উগ্রভাব দেখা দেয়। ভদ্রতার খাতিরে একটু হাসেন অবশ্য, কিন্তু তা ঈর্ষা-ক্লিষ্ট তিক্ত হাসি।

"নমস্কার। আপনার জন্যে তো রুই মাছের পেটি কেটে রেখেছে মেছুনীটা। আমিও নিতুম, কিন্তু একটু দোরসা মনে হল, তাই আর নিলাম না। খুব 'রেয়ার' জিনিস পেয়ে গেছি একটা—"

"কি—"

'টাট্‌কা ট্যাংরা মাছ। এ দেশে দুর্লভ—"

"তা বটে—"

নমস্কার করে সরখেল কেটে পড়লেন।

তারপর দেখা হল প্রফেসার জলধরবাবু সঙ্গে। থলথলে মোটা মানুষ। বাজারে কখনও আসেন না। ভিড়ে আর ঠেলাঠেলিতে বিব্রত হয়ে পড়েছেন।

"নমস্কার, নমস্কার, আপনি হঠাৎ বাজারে যে!"

"আর বলেন কেন। জামাই এসেছে।। গিন্নী বললেন তুমি নিজে গিয়ে রুই মাছের মুড়ো নিয়ে এস একটা। কিন্তু রুই মাছ তো নেই। সবই দেখছি আড়, শিলং আর বাঘাড়। এই ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করে খোঁজাও তো মুশকিল—"

"দাঁড়ান দেখছি—"

তিনি এগিয়ে গেলেন ছিপলীর কাছে।

"তুই যে রুই মাছটা কেটেছিলি তার মুড়োটা কোথা?"

"তোরহ্ বাস্তে রাখলি—"

ছিপলি আলাদা করে রেখে দিয়েছিল মাছ আর মুড়ো পিছনের দিকে একটা ঝুড়িতে ন্যাকড়া চাপা দিয়ে।

"মুড়োটা প্রফেসার সাহেবকে দিয়ে দে। জলধরবাবু, মুড়ো পাওয়া গেছে একটা—"

জলধরবাবু আকর্ণ হাসি হেসে বললেন—"বাঁচালেন মশাই। মুড়ো না নিয়ে গেলে জামাইয়ের কাছে মান থাকত না। এর দাম—"

ছিপলী দাম নিতে চাইছিল না। সদাশিব ধমক দেওয়াতে নিলে।

জলধরবাবু একটু অবাক হলেন—"দাম নিতে চাইছে না কেন!"

"ও আমার বেটী কিনা। তাই আপনাকেও খাতির করছিল।"

অনেক ধন্যবাদ দিয়ে জলধরবাবু চলে গেলেন।

সদাশিব চারদিকে একবার চেয়ে দেখলেন। পরিচিত সবাইকে দেখতে পেলেন। বাজারে এসে নিজের অজ্ঞাতসারেই অনেকে স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেন। পবিত্রবাবু মাছের বাজারে ঘোরেন যেন তিনি নিজের জমিদারি পরিদর্শন করছেন। স্কুলমাস্টার শম্ভুবাবু সর্বদাই কুণ্ঠিত, ভিড়ের মধ্যে সাইকেল ঠেলে ঠেলে ঢোকেন, দেখা হলেই ঘাড়টি নুইয়ে নমস্কার করেন। তাঁর সাইকেলটি একটি জবড়জং ব্যাপার। সামনে পিছনে বেতের ঝুড়ি নানারকম জিনিসে ভরা। তরি-তরকারি, ওষুধ, কাপড়।

শম্ভুবাবু ভোর সকালে টিউশনি করতে বেরোন। দুটো টিউশনি সেরে এসে বাজার করেন। তারপর বাড়ি গিয়ে স্নানাহার করেই স্কুলে ছোটেন। স্কুল থেকে আর বাড়ি ফেরেন না, টিউশনি করতে যান। রাত দশটা পর্যন্ত টিউশনি করেন। ঘানির বলদরাও বোধ হয় এত খাটে না। অথচ তাঁর মুখে কোন অসন্তোষ বা ক্ষোভের গ্লানি নেই। মিষ্টি হাসিটি লেগেই আছে।

ত্রৈলোক্যবাবুর স্বভাব কলহ করা। তিনি মাছ কিনবেন এক পো কি দেড়পো কিন্তু তার বায়নাক্কা অনেক। ওজনদাঁড়ির 'পাষাণ' দেখবেন, মাছ টাটকা কি বাসি দেখবেন, মাছের সঙ্গে 'কানকো' বা ফুলখারা দিচ্ছে কিনা দেখবেন, পরিশেষে দর নিয়ে কচলাকচলি করবেন। তাঁর মুখটা নাক-সর্বস্ব। খাঁড়ার মতো নাক। টকটকে ফরসা রং, কটা চোখ। মনে হয় কোন সাহেব যেন বাঙালী পোশাক পরেছে। জেলেরা তাঁর নাম দিয়েছে সাহেববাবু। তিনি মাছ কেনবার সময় এত হাঙ্গামা করেন, কিন্তু জেলেরা এতটুকু বিরক্ত হয় না। তাঁর এই সব অন্যায় আবদার হাসিমুখে সহ্য করে তারা।

কতরকম লোকই যে আসে বাজারে। একদল আসে তাদের ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। মুখের দর্পণে কোন ভাব প্রতিফলিত হয় না। বোদা চেহারা । ভিড়ের মধ্যেও যেমন, ফাঁকা জায়গাতেও তেমনি। কথা বলে না, গা বাঁচিয়ে চলে, টুক করে বাজারে ঢোকে, টুক করে বেরিয়ে যায়। অনেকটা শশক-প্রকৃতির।

হঠাৎ যোগেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি একজন খবরের কাগজের ঘুণ। দু'তিনটি কাগজ তন্ন তন্ন করে পড়েন এবং কারো সঙ্গে দেখা হলেই খবরের কাগজের খবর নিয়েই আলোচনা করেন।

"ডাক্তারবাবু নমস্কার। নেহেরুর কাণ্ডটা দেখেছেন? আমাদের অতখানি জায়গা পাকিস্তানকে দিয়ে দিলে! যেন ওর বাপের সম্পত্তি। ও যদি আর কিছুদিন প্রাইম মিনিস্টার থাকে আমাদের প্রত্যেকের ভিটেতে ঘুঘু চরিয়ে দেবে—"

"সদাশিব সাধারণত রাজনৈতিক তর্ক করেন না। মুচকি হাসলেন একটু। উত্তেজিত যোগেনবাবু বললেন, "আপনি কেন যে খদ্দর পরেন বুঝি না। ওই খদ্দরধারীরাই তো আমাদের দফা নিকেশ করে দিলে। বাঙালীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে ওরা, দেখে নেবেন। দেখবেন ঠিক দেবে। গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়।"

যোগেনবাবুর ক্ষোভের কারণ আছে। তিনি রিটিয়ার করবার পর এক্স্‌টেনশন পাননি। তাঁর ধারণা বাঙালী বলেই পাননি। তাঁর ছেলে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক, একবার ফেল করে আই. এ., দু'বার ফেল করে বি. এ. পাস করেছে। কোথাও তাকে ঢোকাতে পাচ্ছেন না। তাঁর ধারণা বাঙালী বলেই পাচ্ছেন না। আহা, আজ যদি হ্যামিলটন সাহেব থাকত তাহলে তাঁর ছেলের চাকরির ভাবনা। সেলাম করলেই চাকরি হত। বার বার এই কথাই বলেন।

যোগেনবাবু একটি সাংঘাতিক খবর দিলেন।

"মহেন্দ্রবাবুর খাবার আপনার বাড়ি থেকে যায় তো?"

"হ্যাঁ—"

"তাঁর খবর জানেন?"

"না। অনেকদিন দেখা হয়নি।"

"শুয্‌ছে—"

"তাই না কি?"

"যান একবার দেখে আসুন।"

"শুয্‌ছে? আমাকে তো কোন খবর দেননি।"

"খবর দিলে যদি খাওয়াটি বন্ধ করে দেন, সেই ভয়ে দেননি। রোজ রসগোল্লা কিনে খেতেন। আপনি নাকি খেতে বলেছিলেন।"

"না। আমি মিষ্টি খেতে বারণই করেছিলুম।"

"উনি এখন দোষটা আপনার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। ওঁর খাওয়ার খরচটা তো আপনার ঘাড় দিয়ে চলে যেত, যা বাড়তি পয়সা হাতে থাকত তাই দিয়ে রসগোল্লা কিনতেন।"

সদাশিব গিয়ে দেখলেন মহেন্দ্রবাবু সত্যিই মরছেন। শেষ অবস্থা। আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন। অনেক ঠেলাঠেলির পর চোখ খুললেন।

"কে ডাক্তারবাবু। নমস্কার—"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, "অনেক করলেন আমার জন্যে। অনেক ধন্যবাদ। আপনার কথা একটাও শুনিনি। বাঁচতে চাই না। বেঁচে সুখ নেই—"

একটু পরেই মারা গেলেন।

শবদাহের ব্যবস্থা করে বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাড়িতে আসতে প্রায় একটা বেজে গেল। বাঁড়ুয্যে মশাইদের বাড়ি বেশ বড়। কিন্তু পরিবার বড় বলে ভাগ ভাগ হয়ে গেছে। বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের ভাগে দু' খানি ঘর, একফালি বারান্দা, একফালি উঠোন, আর উঠোনের পাশে ছোট্ট

রান্নাঘর। বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের নাতিনীটি ছাড়া আর কেউ নেই। নাতনীটির চেহারা বীভৎস। মুখের আধখানা পোড়া। স্টোভে পুড়ে গিয়েছিল। সদাশিব গিয়ে দেখলেন বাঁড়ুয্যে মশাই নিজেই রাঁধছেন। শুধু গা, পরনে একটি গামছা। রান্নাঘর থেকে তিনি বললেন, "ওরে, ডাক্তারবাবুকে ঘরে বসিয়ে হাওয়া কর। একটু বসুন। বেগুন-চিংড়িটা নাতনীকে দিয়ে রাঁধিয়েছি, ওটা ওর স্পেশালিটি। আমি লাউঘণ্ট রাঁধছি, ওটা আমার স্পেশালিটি। খেয়ে দেখুন কেমন লাগে—"

সদাশিব ঘরের ভিতর গিয়ে বসলেন। নাতনী একটি ভাঙা হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। ঘরের চারদিকেই দারিদ্র্যের ছাপ। দেওয়ালে বহুকাল চুনকাম করা হয়নি। দু' এক জায়গায় নোনা ধরেছে। চেয়ার ভাঙা, নড়বড়ে, একটি হাতল নেই। বিছানার চাদর ময়লা। মাছি ভন ভন করছে চতুর্দিকে। পাশের নর্দমা থেকে দুর্গন্ধ উঠছে একটা।

সদাশিব কখনও বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাড়িতে আসেননি। যখন হাসপাতালে সিভিল সার্জন ছিলেন তখন এই নাতনী স্টোভ জ্বালতে গিয়ে পুড়ে যায়। বাঁড়ুয্যে মশাই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন একে। বাঁচবার আশা ছিল না। অনেক চেষ্টা করবার পর বাঁচল বটে, কিন্তু মুখটা বীভৎস হয়ে রইল।

সদাশিবের কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। তিনি যেন হঠাৎ একটা রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন। নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী গৃহস্থের নগ্নরূপটা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল এদের দশা কি হবে? এরা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? কে বাঁচাবে এদের? ভারত স্বাধীন হয়ে এরাই তো সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হয়েছে। উদ্বাস্তুদের কথা মনে পড়ল, তারা নাকি আরও বিপন্ন। শিয়ালদহ স্টেশনে তাদের যে চেহারা একবার দেখেছেন তা মর্মন্তুদ। মানুষ নয়, যেন পশুর দল। তিন-চারজন নেতা মিলে দেশটাকে ভাগ করে দিলে ক্ষমতার লোভে। ভাঙা দেশ আবার কি জুড়বে? কতদিনে?

এই সব নানা চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। বাঁড়ুয্যে মশাই এলেন একটু পরে।

"হয়ে গেল, এইবাব খেতে বসুন। মুখপুড়ী জায়গা করে দে। কার্পেটের আসনটা বিছিয়ে দিস—"

নাতনী বেরিয়ে গেল। বাঁড়ুয্যে মশাই আবার চেঁচিয়ে বললেন, "কাঁসার গেলাসটা মেজেছিস তো?"

"হ্যাঁ"— মৃদুস্বরে উত্তর এল বাইরে থেকে।

বাঁড়ুয্যে মশাই (তখনও গামছা-পরা) ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর তাঁর ভাবলেশহীন মুখে হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়ল একটু।

বললেন, "ওর মা ওর নাম স্বর্ণলতা রেখেছিল। দেখতে স্বর্ণলতার মতো না হোক, তাম্রলতার মতো হয়েছিল। এখন ওকে মুখপুড়ী বলে ডাকি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় ভাগ্যে ওর মুখ পুড়েছিল, তাই তো ও আমার কাছে আছে, আমাকে দুটো ভাত ফুটিয়ে দিচ্ছে। মুখ না পুড়লে তো এতদিন বিয়ে হয়ে আমাকে ছেড়ে চলে যেত। বিয়ে দিতেই হত, ভদ্রাসনটুকু বিক্রি করেও দিতে হত। কিন্তু তা আর হল না, ভগবান আমার উপর দয়া করল, মুখটা ওর পুড়ে গেল—"

ভগবানের এই দয়ার জন্যে বাঁড়ুয্যে মশাই যে কৃতজ্ঞ তা কিন্তু মনে হল না। কারণ তাঁর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

সদাশিব বললেন, "আমার একটু সংকোচ হচ্ছে। এমনভাবে বিব্রত করলুম—"

"কিছুমাত্র না। এ তো ভাগ্য, ভাগ্য, পরম ভাগ্য। বেশীদিনের কথা নয়, আমার ঠাকুরদার আমলেই আমাদের বাড়িতে দু'বেলায় পঞ্চাশজন লোকের পাতা পড়ত—পাড়ার লোক, বাইরের লোক, অতিথি বন্ধু আত্মীয় কেউ বাদ পড়ত না। আমাদের ঠাকুমারা রুপোর গয়না পরতেন, শাড়ির বাহার ছিল না, কিন্তু তাঁরা দশজনকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন, নিজেরাই পরিবেশনও করতেন। দাসী চাকরানীর মতো গজগজ করে করতেন না, হাসিমুখে করতেন। দেখতে দেখতে সব মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল। এক জীবনে কতোই না দেখলুম। চলুন—"

সদাশিব গিয়ে দেখলেন প্রচুর আয়োজন করেছেন বাঁড়ুয্যে মশাই। নানারকম তরকারি, নিরামিষই প্রায় আট-দশ রকম।

"করেছেন কি! এতো কি খেতে পারব?"

"আপনি পারবেন না তো পারবে কে। আপনি তো খাইয়ে লোক—"

"আপনি খাবেন না?"

"আমার দেরি আছে। স্নান করব, আহ্নিক করব, তবে খাব। ভাবছি একেবারে ওবেলায় খাব। একবেলাই খাই আমি। দু'বেলা খাওয়া সহ্য হয় না। আপনি বসে খান, আমি হাওয়া করি—"

"না না, আপনি হাওয়া করবেন কি—"

"যা মাছি, খেতে দেবে না আপনাকে। ফিনাইল কিনেও কুল পাই না, তাই আজকাল কেনা ছেড়ে দিয়েছি—"

খেতে খেতে গল্প হতে লাগল।

সদাশিব জিগ্যেস করলেন, "আপনাদের পরিবার এককালে নিশ্চয়ই খুব বড় ছিল—"

"বড় বলে বড়, রাবণের গুষ্টি। বিষয় ভাগ করতে করতে প্রত্যেকের ভাগে চটকস্য মাংসও হয়নি। ও পাড়াটাই বলতে গেলে আমাদের। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে মকদ্দমা করছে—ভেঙে টকরো টুকরো হয়ে গেল।"

"মকদ্দমা কেন—"

"মতিচ্ছন্ন আর কি! আমি নিজেই সাতবার মকদ্দমা করেছি। যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল ওতেই গেছে। এখন পেন্সনটির উপর ভরসা। বেগুন-চিংড়ি কেমন হয়েছে, বলুন?"

"খাসা—"

"মুখপুড়ী ওটা রাঁধে ভালো—"

"আপনার লাউঘণ্টও চমৎকার হয়েছে। এমন ঘণ্টও বহুকাল খাইনি। আপনি এত চমৎকার রাঁধেন! বাঃ—"

"ও রান্নাটি আমার স্ত্রীর কাছে শিখেছিলাম। তিনি শিখেছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। ওর একটু ট্রিকস্ আছে, সেটা সবাইকে শেখাই না।"

বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মুখে আবার একটু হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়ল।

"এতো রকম করেছেন, আবার মাংস করতে গেলেন কেন?"

"আপনি যে রোজ মাংস খান। আমি সব খবর রাখি—"

খাওয়া শেষ করে সদাশিব যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন বাঁড়ুয্যে মশাই হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করে বসলেন। ঝুঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন সদাশিবকে।

"আপনি যে গরীবের বাড়ি পাত পেড়ে দুটো খেয়ে গেলেন এতে কৃতার্থ হয়ে গেলাম আমি—"

টপ্ করে একফোঁটা চোখের জল পড়ল সদাশিবের পায়ের উপর। তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিলেন তিনি। বাঁড়ুয্যে মশাই ঘাড় ফিরিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সদাশিব। তারপর গিয়ে মোটরে উঠলেন।

।। ষোল।।

খুব সকালে গীতিয়া এসেছিল। আর তার সঙ্গে এসেছিল একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

"এরা সব কে—"

"আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়ে। সব চোখ উঠেছে। আপনি তো আমাদের পাড়ায় অনেকদিন যাননি, তাই ডেকে নিয়ে এলাম। নিজেদেরই তো গরজ।"

গীতিয়ার কণ্ঠস্বর একটু অভিমানের সুর। সে যে ডাক্তারবাবুর বিশেষ স্নেহাস্পদা একথা সে পাঁচজনের কাছে খুব বড় গলা করে বলে বেড়ায়, ডাক্তারবাবু অত টাকা দিয়ে তাদের মহাজনের কবল মুক্ত করেছেন, কিন্তু সদাশিবের উদাসীন ব্যবহারে সে যেন একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে ইদানীং। সদাশিব যদি তাকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন তাহলে একমাসের মধ্যে একবারও কি খবর নিতেন না? আজবলাল চলে যাওয়ার পর সে সেখানে এসে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু উনি রাজী হননি। সদাশিবের একটু স্নেহ পেলে সে কৃতার্থ হয়ে যায়। এর মধ্যে কোনও খারাপ ভাব নেই, খারাপ ভাব যে থাকতে পারে, তা তার চিন্তারও অতীত। সে সদাশিবের কাছে কন্যা-স্নেহ প্রত্যাশা করে। সদাশিব হয়তো তাকে স্নেহও করেন, কিন্তু তার কোনও বহিঃপ্রকাশ নেই। গীতিয়ার তাই অভিমান হয়েছে একটু।

সদাশিব ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের চোখে ওষুধ দিয়ে দিলেন। একটা শিশি করে কিছু ওষুধ আর একটা ড্রপারও দিলেন।

"রোজ সকাল-বিকেল দিয়ে দিস—"

গীতিয়া তখন আঁচল থেকে খুলে খানকয়েক নোট সদাশিবের হাতে দিয়ে বললে, "এইটে রাখুন—"

"কি এটা—"

"দু' জনে খেটে কিছু টাকা জমিয়েছি, ধারে সেটা শোধ করে নিন—"

"ঘুঁটে আর দুধ দিয়ে শোধ করবার কথা ছিল। নগদ টাকা কেন? কোথা পেলি নগদ টাকা? কারো কাছে ধার করেছিস নাকি?"

চুপ করে রইল গীতিয়া। তারপর বলল, 'টাকা যে অনেক। ঘুঁটে আর দুধ দিয়ে ও-টাকা জন্মে শোধ হবে না—"

"তুই টাকা কোথা পেলি বল না—"

গীতিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "ছবিলাল মোড়লের বাড়ি 'গিন্না নোক্‌রি'তে বাহাল হয়েছি। খাওয়া-পরা দেবে, তাছাড়া ২৫ টাকা মাইনে দেবে। ওঁকেও কংগ্রেস আপিসে একটা চাকরি করে দিয়েছে, মাইনে ৪৫ টাকা, পিওনের কাজ করতে হয়। এ মাসে পঞ্চাশ টাকা জমাতে পেরেছি, সেটা দিয়ে গেলাম। ঘুঁটে আর দুধে টাকা তিরিশেক শোধ হবে—"

সদাশিব টাকাগুলি পকেটে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, "ছবিলাল লোকটা পাজি শুনেছি—"

"খুব পাজি। কিন্তু কি করব, ভালো লোকে না রাখলে পাজি লোকের কাছেই যেতে হবে—"

গীতিয়ার চোখে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল।

চুপ করে রইলেন সদাশিব, কি আর বলবেন। সেই পুরাতন সত্যটাই উপলব্ধি করলেন, অসাধু লোকেদের হাতে ক্ষমতা এসেছে, সাধুদের এখন পরিত্রাণ নেই। ছলে বলে কৌশলে ওরাই এখন ভোগদখল করবে।

প্রশ্ন করলেন,"ছবিলাল মোড়লের ছেলেটাকে তো পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল—"

"ছাড়া পেয়ে গেছে। ওদের টাকার জোর আছে, কংগ্রেস ওদের সহায়, ওদের কি কেউ আটকে রাখতে পারে?"

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন সদাশিব। মনে হল তিনি হেরে গেলেন। আর একটা কথাও মনে হল—গীতিয়ার মতো মেয়ে এইবার ওর লম্পট ছেলেটার কবলে পড়বে। একটা ছবি ফুটে উঠল মনে—হরিণী যেন ময়াল সাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

"আমি যাই তাহলে—"

গীতিয়া প্রণাম করে কিছুদূর চলে গেল।

"গীতিয়া, শোন—"

"কি—"

"ও চাকরি ছেড়ে দে তুই—"

সোৎসুক হয়ে উঠল গীতিয়ার চোখের দৃষ্টি। নির্বাক আগ্রহে সে চেয়ে রইল সদাশিবের দিকে। সদাশিব কোন কথা কইলেন না। তখন গীতিয়া জিগ্যেস করল, "চাকরি ছেড়ে দিলে আমাদের চলবে কি করে?"

"তোরা স্বামী-স্ত্রী আমার এখানে এসেই থাক। তুই তো লেখাপড়া জানিস, আমার বাড়ির 'আউট হাউসে' ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল কর একটা। আর তোর স্বামী আমার গরু-বাছুর ঘর-দোর দেখাশোনা করুক। দুটো গাই এবার বিয়োবে। দু'জনে আমার এখানেই খাবি-দাবি থাকবি। তোদের আর যা যা দরকার হয় তা-ও পাবি।"

গীতিয়া হাতে যেন স্বর্গ পেল।

উদ্ভাসিত মুখে বলল, "এই তো আমি চাইছিলুম। যাই ওকে বলে আসি—"

"এগুলো নিয়ে যা—"

"কি—"

"টাকাগুলো নিয়ে যা—"

"ও নিয়ে আমি কি করব?"

"পোস্টাফিসে একটা পাস বুক করে জমা করে রাখ—"

"কিন্তু—"

"আর কিন্তু শুনতে চাই না। যত শিগ্‌গির পার এখানে এসে পড়—"

গীতিয়া একছুটে বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়েগুলোও ছুটতে লাগল তার পিছু-পিছু।

রামলক্ষ্মণ ঠাকুর এসে বলল, "চাল ডাল নুন তেল সব ফুরিয়ে গেছে।" সদাশিব বললেন, "আচ্ছা, স্লিপ লিখে দিচ্ছি, দোকান থেকে আনিয়ে নাও।" সদাশিব আজকাল বাইরে বাইরে খান। কিন্তু বাড়িতে অনেক লোক খায়, অনেক গরীবদুঃখী।

।। সতেরো।।

নবীপুরের হাটে দেখা হল কেব্‌লী আর কেব্‌লীর স্বামী নারাণের সঙ্গে। কেব্‌লী একটি নূতন শাড়ি হলুদ রঙে ছুপিয়ে পরেছে, নারাণের পরনেও একটি গোলাপী রঙের ধুতি। নারাণ এগিয়ে এসে প্রণাম করল সদাশিবকে। কেব্‌লী তার পিছনে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"কি নারাণ, কি খবর, হঠাৎ প্রণামের ধুম কেন?"

"সাধি ভে গেলে হুজুর—"

কেব্‌লী মুখে কাপড় দিয়ে খুব হাসতে লাগল। নারাণের দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে হওয়াতে সে যে দুঃখিত হয়েছে তা মনে হল না।

ধী-বিশালের দোকানের দিকে গেলেন সদাশিব। মঙ্গলদাসের খবর নিলেন। মঙ্গলদাস ভালো আছে। কিন্তু আবার জল জমেছে পেটে।

"ও তো জমবেই। ও অসুখ সারবে না। বেশী জল জমলে আবার বার করে দিতে হবে। এইভাবে যে কদিন চলে।"

ধী-বিশাল বললে মঙ্গলদাসও সে কথা বুঝেছে। তার বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা নাম-সংকীর্তন হচ্ছে। তারপর ধী-বিশাল নিম্নকণ্ঠে বললে, সেই বদমাস ছোক্‌রা তিনটে পুলিসের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে। কাল সন্ধ্যের সময় তার দোকানের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ধী-বিশাল ভয় খেয়ে তিনজন তীরন্দাজ সাঁওতাল বাহাল করেছে দোকান পাহারা দেবার জন্যে।

"তুমি থানাতেও একটা ডায়েরি করিয়ে দাও—"

"আচ্ছা—"

হাটে অনেক রোগী অপেক্ষা করছিল মোটরের আশেপাশে। সদাশিব সেইদিকে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে দেখলেন, কেব্‌লী দাঁড়িয়ে আছে, নারাণ সঙ্গে নেই।

ভিড় কমে যাবার পর কেব্‌লী কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, দু' নৌকোয় পা দিয়ে নারাণ এখন মহাবিপদে পড়েছে। নারাণের মা ওই কানী বিধবাকে ঘরে নিতে চাইছে না। আর

ওই কানীর বাবা যে জমি দেবে বলেছিল সে জমিও দেয়নি। সে বলেছে আগে দেখি আমার মেয়ের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করে, তবে জমি লিখে দেব।

"তোকে তো জমি দেবে বলেছিল, তাও দেয়নি?"

"না—"

"তুই কিছু বললি না?"

"কানী হামরা মারে লে দৌগেছে। বড় বরিয়ার ছে। হাম্ ভাগীকে চললো আইলি। বড় মারখুণ্ডা ছে। ওকরো ভী মারেলা দৌগেছে—"

"কানী বিধবাকে বিয়ে করে নারাণ তো তাহলে মহাবিপদে পড়েছে। কোথায় আছে এখন ও?"

"হিয়াঁই। কাঁহা যাইতে—"

মুখ ফিরিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেব্‌লী হাসতে লাগল। তারপর সে আসল কথাটি ভাঙল।

আবার পঞ্চ ডাকা হয়েছে। কেব্‌লীর প্রাপ্য জমি তাকে দেওয়া হবে কিনা সেই 'পঞ্চ' ঠিক করবে। সেই পঞ্চের দু' জন মাতব্বর লোক সদাশিবকে খুব খাতির করে। তাদের কঠিন কঠিন অসুখ সদাশিবই নাকি একদিন সারিয়েছিলেন। তারা আবার ওষুধ নিতে সদাশিবের কাছে আসবে। তখন সদাশিব যদি তাদের একটু বলে দেন তাহলে কেব্‌লী জমিটা পেয়ে যাবে।

সদাশিব বললেন, "কবে কার অসুখ সারিয়েছি আমার তো কিছু মনে নেই!"

কেব্‌লী মনে করিয়ে দিলে তিনি তখন সরকারী কাজ করতেন। একজনের 'পোতা' (হাইড্রোসিল) আর একজনের 'গুরা' (ফোড়া) কেটেছিলেন। সদাশিবের মনে পড়ল না। বললেন, "আচ্ছা আমার কাছে আসে তো বলব। নারাণ আর একটা বিয়ে করেছে বলে তোর দুঃখ হয়নি একটুও—"

"দুঃখ করি কে কি করবো। ওই সেই ওকরো মতি-গতি আর হম্‌রা কপার—"

কেব্‌লী খানিকক্ষণ ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ল, তারপর চলে গেল।

তারপর এল কয়েকটা ছোট ছেলে। ফরসা জামা-কাপড় পরা। সদাশিব তাদের চোখ দেখলেন, দাঁত দেখলেন, খুশী হলেন খুব।

"আলী, এদের প্রত্যেককে দুটো করে সন্দেশ দাও —"

আসবার সময় দীনু হালুয়াইদের দোকান থেকে সের দুই সন্দেশ কিনে এনেছিলেন। তারা সন্দেশ নিয়ে কলরব করতে করতে চলে গেল।

"আলী—"

"হজৌর—"

আলী এসে সামনে দাঁড়াল।

"তুমি সন্দেশ খেয়েছ?"

আলীর মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে সে মৃদুকণ্ঠে বলে—"হুজুর হুকুম নেহি দেনে সে কৈসে খায়েঙ্গে?"

"খাও চারটে সন্দেশ। আজ আমাদের রান্নার ব্যবস্থা কি করেছ? হাটে মাছ তেমন পেলে কি?"

"নেই হুজুর। মুরগী লেয়া দোঠো।"

"মুরগির ঝোল আর ভাত বানাও আজকে।"

"বহুত খু—"

"বেশী মসলা দিও না। সাদা ঝোল বানাও—"

"বহুত খু—"

"কোথায় রাঁধবে আজ? ওই বড় তালাওটার ধারে চল—"

"বহুত খু—"

আলী কয়েক মুহূর্ত ঘাড়টা একদিকে বেঁকিয়ে এবং দুটি আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সমস্ত ব্যাপারটা প্রণিধান করে ফেলল। তারপর মোটরের পিছনে চলে গেল।

সদাশিব উঠতে যাবেন এমন সময় দেখতে পেলেন নারাণ আসছে। একা আসছে। সঙ্গে কেব্‌লী নেই।

"কি নারাণ, আবার এলে যে—"

নারাণ একটু চুপ করে রইল, তারপর বললে—গোপনে সে তাঁকে একটা কথা বলতে চায়। এতক্ষণ সে হাটে অপেক্ষা করছিল। রোগীর ভিড় কমে যাবার পর এসেছে।

"কি কথা—"

নারাণ হিন্দীতে বললে—"আপনি কেব্‌লীকে একটু শাসন করে দিন। ও একটা সিপাহীর সঙ্গে বড্ড বেশী মাখামাখি করছে। ভেবেছিলাম 'দোসরা' একটা 'সাধি' করে আমি আলাদা সরে থাকব, ও যা খুশী করুক। কিন্তু আমার মা ওই কানী বিধবাকে কিছুতেই ঘরে নিতে চাইছে না। আমাকে বাধ্য হয়ে কেব্‌লীর কাছে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু কেব্‌লী যদি একটা সিপাহীর সঙ্গে লট্‌পট্‌ করে তাহলে তো বরদাস্ত করতে পারি না। শেষকালে একটা খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যাবে একদিন।"

সদাশিব প্রশ্ন করলেন, "এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি? ও তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপার, তোমরাই ঠিক কর—"

হঠাৎ নারাণ সদাশিবের পা জড়িয়ে ধরল—

"আপ একদফে কহ্‌ দেনে সে সব ঠিক হো যায়ে গা। উ আপকো বাপকো এইসা মানতা হয়।"

হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল নারাণ।

সদাশিব বললেন, "ওকে যদি চরিত্রহীন বলে মনে হয়, ছেড়ে দাও না ওকে—"

নারাণ বললে কেব্‌লীকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

"আবার বিয়ে তো করতে গেছলে—"

নারাণ নিজেই নিজের দুকান মলে গালে ঠাস ঠাস করে চড়াতে লাগল।

"কসুর হো গিয়া হুজুর। কসুর হো গিয়া—"

সদাশিব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। শেষে বললেন, "আচ্ছা, আমি শাসন করে দেব। কিন্তু আমার কথা শুনবে কি?"

"জরুর শুনে গা, জরুর শুনে গা, উস্‌কো বাপ শুনে গা—"

একটু পরেই রাস্তায় কেব্‌লীর সঙ্গে দেখা হল। সে একাই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল হাট থেকে কিছু তরি-তরকারি কিনে। সদাশিব মোটর থামালেন। নামলেন মোটর থেকে। কেব্‌লীকে ডেকে নিয়ে গেলেন একটু দূরে।

"শুনছি তুই কোন্ এক সিপাহীর সঙ্গে লট্‌পট্ লাগিয়েছিস্ ?"

কেব্‌লী ঘাড় ফিরিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে রইল মুখে আধঘোমটা টেনে।

সদাশিব সংক্ষেপে বললেন "ফের যদি শুনি চাবকে তোর পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলব। মনে থাকে যেন; কথাটা মনে থাকবে তো?"

কেব্‌লী সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাৎ করে জানাল, থাকবে।

সদাশিব ফের এসে মোটরে উঠলেন।

হঠাৎ একটা নির্মল আনন্দে তাঁর সমস্ত মন ভরে গেল যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি এদের যথার্থ আত্মীয় হতে পেরেছেন—এই উপলব্ধিতে তন্ময় হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

।। আঠারো।।

কিন্তু হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল একদিন। গভীর রাত্রে সদাশিবের ঘুম ভেঙে গেল কুকুরের ডাকে। কুকুরটা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে খুব ডাকছিল। রামলক্ষ্মণ ঠাকুর, গীতিয়া, গীতিয়ার স্বামী সবাই উঠেছিল। সদাশিব উঠে আলোটা জ্বাললেন। রামলক্ষ্মণ এসে বলল যে ছিপলীর স্বামী এসে ডাকাডাকি করছে। তাদের বাড়িতে নাকি ডাকাতি হচ্ছে। ডাকাতি হচ্ছে? ছিপলীর স্বামীকে ডাকতে বললেন। সে এসে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। তারপর তাঁর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে একটি কাতরোক্তিই সে করলে—"বাঁচাইয়ে হুজুর!" অনেক জেবার পর জানা গেল ছবিলালের ছেলেটি দলবল জুটিয়ে তাদের বাড়িতে হানা দিয়েছে, আর ছিপলীর উপর বলাৎকার করেছে। জিতু বাধা দিতে গিয়েছিল, পারেনি। সে তাই ছুটতে ছুটতে এখানে এসেছে।

আলী সাধারণত রাত্রে নিজের বাড়ি চলে যায়। সদাশিব নিজেই গাড়ি বের করে বেরিয়ে পড়লেন। তার সঙ্গে রইল রামলক্ষ্মণ ঠাকুর; গীতিয়ার স্বামী আর জিতু। রিভলবারটাও সঙ্গে নিলেন।

সদাশিব যখন পৌঁছলেন তখন যা হবার হয়ে গেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। টর্চ ফেলতে ফেলতে সদাশিব ঘরে ঢুকলেন। গিয়ে দেখলেন মেঝের উপর বিস্রস্তবাসা ছিপলী পড়ে আছে। ঘরের কোণে আর একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে ছিল একটা লাঠি। সদাশিবকে দেখেই সে লাঠি চালাল। লাঠিটা সজোরে এসে লাগল সদাশিবের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

।। উনিশ।।

সদাশিব অনুভব করলেন তিনি যেন কার কোলের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন।

তিনি জিগ্যেস করলেন—"কে—"

"আমি ছিপলী—"

ছিপলীই তাঁর মাথাটা কোলে নিয়ে বসেছিল।

"এখনও কি রাত পোহায়নি?"

গীতিয়া বললে "অনেকক্ষণ সকাল হয়ে গেছে।"

"কই, আমি তো আলো দেখতে পাচ্ছি না—"

সদাশিবের চোখের ভিতর হেমারেজ হয়েছিল। তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

শহর থেকে একজন ডাক্তার এসেছিলেন। তিনি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেন।

সদাশিব যেতে চাইলেন না।

আস্তে আস্তে বললেন, "আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।"

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দেখতে দেখতে।

হাটের লোক, বাজারের লোক ভেঙে পড়ল ছিপলীর বাড়িতে।

বাঙালীরা কেউ যাননি। তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল অবশ্য। কেউ বললেন, লোকটা এক্সেন্ট্রিক, কেউ বললেন, বাহাদুরি করতে গিয়েই মৃত্যু হল লোকটার, কারও মতে আসলে উনি চরিত্রহীন লোক ছিলেন, হাটে-বাজারে যুবতী মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতেন। এর নজীরস্বরূপ তিনি হ্যাভলক এলিস, ফ্রয়েড থেকে বচন উদ্ধৃত করলেন। বাঁড়ুয্যে মশাই-ই নাকি কেবল বলেছিলেন—"উনি নররূপী দেবতা ছিলেন।" ডি. আই. জি. ছিপলীর বাড়ির চারদিকে সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন করে দিয়েছিলেন। আলী হাউ হাউ করে কাঁদছিল কেবল। গীতিয়া, কেব্‌লী, নারাণও কাঁদছিল। সবারই চোখে জল।

আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিলেন সদাশিব। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছিলেন।

"কে আবদুল, জ্বর ছেড়েছে? এখন বাজারে যেও না, দু'দিন বিশ্রাম নাও—"

"ফালতু তোর কামিজটা তো ঠিক ফিট্ করেনি। রমজান দরজির কাছে যাস, সে মাপ নিয়ে নেবে একটা—"

"না, মঙ্গলদাস, নুনটা তুমি ছেড়েই দাও; নুন খাচ্ছ বলেই পা দুটো ফুলছে। নুন ছেড়ে দাও। দুধ-ভাত খাও—"

"কে, আবদুলের মা? নানি তোর চোখ ঠিক করে দিতে পারলাম না। আমি অন্ধ হয়ে গেলাম।"

"নারাণ নাকি, কেব্‌লী বলেছে ভালোভাবে থাকবে এবার।"

"ও কে? সরখেল মশাই, ইলিশ মাছ পেয়েছেন? বাঃ—"

"আজবলাল এসেছে? আজ ফিস্ট লাগাও একটা। সবাই খাক। ভালো মাছ মাংস পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

"মহেন্দ্রবাবু নাকি? সেরে গেছেন? রসগোল্লা খেয়ে সেরে গেলেন? এ তো বড় আশ্চর্য! রোগা হয়ে গেছেন দেখছি। আমার মনে হয় কিন্তু রসগোল্লাটা বেশী না খাওয়াই ভালো—"

"মালতী? কেদার-বদরি ঘুরে এলি? বাঃ, কাশ্মীর কেমন লাগল? ভালো তো লাগবেই, ভূ-স্বর্গ ওর নাম। এইবার দাক্ষিণাত্যে বেড়িয়ে আয়। কন্যাকুমারী শুনেছি অপূর্ব—"

"কে ভগলু মহলদার? সন্দেশ এনেছ? তোমার বেটীর সাদি হয়ে গেল। বাঃ বাঃ। থাক আর প্রণাম করতে হবে না।"

"ছিপলী আমার রিভলবারটা তুই রেখে দে। তোর নামে লাইসেন্স করিয়ে দেব। ওটা সঙ্গে থাকলে কেউ আর কিছু বলতে পারবে না।"

"গীতিয়ার স্কুলটাকে আরও বড় করতে হবে। গীতিয়া পারবি তো? তুইও পড়, প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাস করে ফেল—"

"মনু? ওই দেখ, তোমার জন্যে জর্দা আনতে ভুলে গেলাম। তোমার কাশীর জর্দার কৌটোটা আলমারির মধ্যে আছে। ভেবেছিলাম নিয়ে আসব। সোহাগ বিলেতে চলে গেছে, সেখানেই বাড়ি করেছে, সুখে আছে—"

ক্রমশ প্রলাপও বন্ধ হয়ে গেল। ঠোঁট দুটো নড়ত খালি, কি বলতেন কিছু বোঝা যেত না।

দিন দুই পরে তাঁর মৃত্যু হল।

মালতী বা সোহাগকে খবর দিতে পারা যায়নি। ছিপলীই তাঁর মুখাগ্নি করল।

কন্যাসু

।। এক ।।
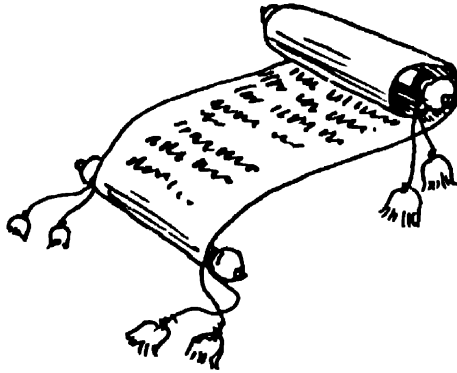
মেয়ের বয়স যখন কুড়ি পেরিয়ে গেল তখন ব্রজেন্দ্রবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর স্ত্রী হরমোহিনী তাঁকে স্থির থাকতে দিলেন না। ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত লোক, একটি গেঞ্জির মিল আছে তাঁর। দেশের সবাই তাঁর নাম জানে। ছোট বড় নানা কাগজে তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হয়। লোকে জানে তিনি খুব ধনী লোক। কিন্তু ধনী বলে যতটা তাঁর নাম-ডাক ব্যাঙ্কে তত টাকা তাঁর নেই। অধিকাংশ টাকাই ব্যবসাতে খাটছে। তবে অবশ্য টাকার অভাবেই যে তাঁর মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল না তা নয়। কোথায় মনোমত সৎপাত্র আছে তা তিনি ঠিক খবর পাচ্ছিলেন না। মাঝে মাঝে পেলেও যোগাযোগ হচ্ছিল না ঠিক। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখেছিলেন অনেকগুলো। কোনও ফল হয়নি। কয়েকখানা চিঠি লিখে তাঁর এই ধারণা হল যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যে সব পাত্রের জন্য সাধারণত পাত্রী খোঁজা হয় সে সব পাত্র ঠিক সুপাত্র নয়। কোনও না কোনও গলদ আছে তাদের মধ্যে। হয় বয়স বেশী, না হয় চেহারায় বা বংশে খুঁত আছে। অর্থাৎ নিজেদের পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁরা পাত্রী সংগ্রহ করতে না পেরে বিজ্ঞাপনের শরণাপন্ন হয়েছেন। বিজ্ঞাপন-দেনে-ওলাদের মধ্যে আর এক ধরনের লোকের সন্ধান পেয়েছিলেন ব্রজেনবাবু। এঁরা সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত গভর্নমেণ্ট অফিসার। চাকুরি-জীবনে হোমরা-চোমরা ছিলেন। বিজ্ঞাপন দিয়ে আপিসে লোক নিতেন এবং দরখাস্তকারীদের প্রতি যতটা সম্ভব সুবিচার করতেন। এঁদের ধারণা বধূ-নির্বাচনও অনেকটা কেরানী-নির্বাচনের মতো ব্যাপার। ছেলেদের চাকুরি-লাভ আর মেয়েদের স্বামী-লাভ এঁদের চক্ষে একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। সুতরাং তাঁরা যতগুলি সম্ভব পাত্রীকে চান্স দিতে চান এবং নিক্তির ওজনে যোগ্যতা বিচার করতে চান তাদের। ব্রজেনবাবু কলকাতার বাইরে থাকেন, সুতরাং ঘটক-সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তাঁর তেমন যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। যে দ' একটি পেশাদার ঘটক-কোম্পানী নিজেদের যোগ্যতার কথা কাগজে বিজ্ঞাপিত করে থাকেন তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন তিনি। পত্রালাপ করেই বুঝতে পারলেন যে এঁদের দ্বারা তাঁর কাজ হবে না। কারণ এঁরা আগেই টাকা চেয়ে বসলেন। টাকা অর্থাৎ পারিশ্রমিক দিতে ব্রজেনবাবুর আপত্তি ছিল না, কিন্তু চিঠির ধরন-ধারণ দেখে তাঁর সন্দেহ হল কেমন। ও পথে তিনি আর অগ্রসর হলেন না।

অথচ এদিকে মেয়ের বয়স বেড়ে যাচ্ছে। হরমোহিনীর রাত্রির নিদ্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। ব্রজেনবাবু শেষে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি শিক্ষিত লোক, তিনি জানেন যে মেয়ের বিয়েটা এমন একটা কিছু ব্যাপার নয় যার জন্যে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করতে হবে। মেয়ে লেখাপড়া শিখছে, এবার বি. এ. পরীক্ষা দেবে, গানবাজনাও শেখাচ্ছেন তাকে। যথাসময়ে কোথাও না কোথাও বিয়ে হবেই তার। তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। কিন্তু তবু তিনি ব্যস্ত হতে লাগলেন। হরমোহিনীর প্ররোচনায় এলোপাতাড়ি চিঠি লিখতে লাগলেন। শুধু চিঠি নয়, যার সঙ্গে দেখা হতে লাগল, তাকেই বলতে লাগলেন—ভাই, আমার মেয়ের জন্য সৎপাত্র দেখে

দাও একটি। খবর আসতে লাগল নানারকম। প্রথম খবর এল দূরসম্পর্কের ভাই হরিমোহনের কাছে থেকে। হরিমোহন একটু তড়বড়ে লোক। তার চিঠি থেকেই সেটা বোঝা যায়। তাড়াতাড়ি ভাব প্রকাশ করার দিকেই ঝোঁক বেশী, বাক্য সম্পূর্ণ নাই বা হল। তার চিঠিখানি এই।

পূজনীয় ব্রজেনদা,

আশা করি বৌদি ও আপনি ভালই। আমি কথা দিয়েছি তাই পাত্রের সন্ধান দিতেছি। মাঝে মাঝে আরও দেব, সন্ধান পেলেই।

এ ছোকরাটি দামোদর ভ্যালি প্রোজেক্টে কাজ করে। বেশ চনমনে। বি. ই. পাস। নাম হরিশঙ্কর চক্রবর্তী। এস. ডি. ও. পদে অধিষ্ঠান করছেন। বয়স সাতাশ। পিতা জীবিত। কলকাতায় নিজ বাটীতে থাকেন। আদি বাড়ি পূর্ববঙ্গ। ঠিকানা সঙ্গীয় চিরকুটে দিলাম। দাদা, আপনি পাত্রের বাবা জয়শঙ্কর চক্রবর্তীকে পত্র দিন। পাত্রটি মধ্যম পুত্র। বড় ছেলেও একজন বড় ইন্‌জিনিয়ার, বিয়ে হয়ে গেছে। পত্রপাঠ ব্যবস্থা করুন এবং আমাকেও পত্র দিন। পাত্রটির রং গৌরবর্ণ, নাক মুখ চোখা। ছেলেমেয়েদের স্নেহাশীষ দেবেন। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—

শ্রীহরিমোহন চট্টো
H T C.(Head Ticket Collector)
জামালপুর স্টেশন, জামালপুর।

ব্রজেনবাবু 'আশীষ' বানানটার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন। তাঁর ধারণা ছিল হরিমোহন বাংলাটা অন্তত ভালো জানে। 'আশীষ' বানানটা দেখে তাঁর সে ভ্রম দূর হল।

হরমোহিনী বললেন, "বাঙালদের ঘরে আমি মেয়ে দেব না। আমি নিজে বাঙালের মেয়ে, বাঙালদের হালচাল আমার জানা আছে। খাটতে খাটতে আমার মেয়ের হাড় কালি হয়ে যাবে।

হরমোহিনী অবশ্য নামে বাঙাল। তাঁর মা বাবা দুজনেই পূর্ববঙ্গের। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছেন তাঁরা বহুপূর্বে। হরমোহিনীর বাল্যকালটা কেটেছিল ফরিদপুরে। বাঙাল ভাষাটা পর্যন্ত তিনি ভুলে গেছেন। বাঙালদের কেউ গাল দিলে তাঁর গায়ে লাগে, কিন্তু নিজের মেয়েকে বাঙালদের বাড়িতে দিতে রাজী নন।

ব্রজেন্দ্রবাবু মৃদু হেসে বললেন,"অত ভাবলে কি চলে। আজকাল অসবর্ণ বিয়েও তো হচ্ছে। একটা চিঠি লিখে দেখতে ক্ষতি কি— । পাত্রটি ভালো। আমার তো যতগুলি বন্ধু আছে তাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের লোকই বেশি। ওরা খুব সিন্‌সিয়ার লোক হয়— ।"

হরমোহিনী দেবীর স্বামীকে ভর্ৎসনা করবার একটা বিশেষ স্টাইল আছে। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে চোখ বড় বড় করে নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন স্বামীর দিকে কয়েক মুহূর্ত, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে স্থানত্যাগ করেন। এবারও তাই করলেন। অন্য সময়ে এতে বেশ কাজ হয়, কিন্তু এবার হল না। ব্রজেন্দ্রবাবু অনুভব করলেন যে পরিবারের এই খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করলে মেয়ের বিয়ে হবে না। আমাদের সমাজে সৎপাত্র খোঁজা মানে রাবিশের স্তূপ থেকে স্বর্ণকণিকা আহরণ করা। রাবিশের স্তূপ ঘাঁটতেই হবে। বিখ্যাত কবিতাটার দু'চরণ মনে পড়ল।— যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

সুতরাং তিনি চিঠি লিখলেন একটি। তিনি অনেক চিঠি লিখেছিলেন এই ব্যাপারে, একটি নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করছি ঃ

প্রীতিভাজনেষু—

আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। খবর পাইলাম আপনার মধ্যম পুত্রটির এখনও বিবাহ দেন নাই। আমার কন্যার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া তাই এই পত্র লিখিতেছি। আমার কন্যার বয়স কুড়ি বৎসর। সে এবার বি. এ. পরীক্ষা দিবে। রং খুব ফর্সা না হইলেও কালো নয়। সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যবতী। লম্বা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। ভালো সেতার বাজাইতে পারে। শিল্পকর্মও কিছু কিছু জানে। খুব ভালো আলপনা দেয়। রন্ধনাদিতেও নিপুণ। আমাদের আদি নিবাস হুগলি জেলায়। ত্রিবেণীর সন্নিকটে একটি গ্রামে। সেখানে পূর্বপুরুষদের ভিটা পড়িয়া আছে। কেহই আর সেখানে বসবাস করে না। আমরা তিন ভাই কর্মোপলক্ষ্যে তিন জায়গায় থাকি। আমার তিন ছেলে। একজন অধ্যাপক, একজন ডাক্তার এবং একজন ইন্‌জিনিয়ার। তিনজনেরই বিবাহ দিয়াছি, তিনজনই কর্মে নিযুক্ত। কন্যাটিই কনিষ্ঠা। আমরা অধ্যাপকের বংশ। আমাদের পূর্বপুরুষদের টোল ছিল, সেখানে তাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন। আমিও এম. এ. পাস করিয়া কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও পথ পরিত্যাগ করিতে হইল, কারণ বেতন স্বরূপ যাহা পাইতাম তাহাতে কুলাইত না। আমার এক মাড়োয়ারি ছাত্র আমার বিশেষ ভক্ত ছিল। তাহারই পরামর্শে এবং অর্থানুকূল্যে গেঞ্জির ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছি। সুন্দর গেঞ্জি মিলের নাম হয়তো আপনি শুনিয়া থাকিবেন। সেই মিলের অর্ধেক অংশ আমার। আপনি যদি আমার প্রস্তাব অনুমোদন করেন তাহা হইলে আমাদের বিস্তৃততর পরিচয় আপনাকে জানাইব। মেয়ের ঠিকুজির নকল এই সঙ্গে পাঠাইলাম। যদি ইচ্ছা হয় মিলাইয়া দেখিবেন। আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গৃহিণীকে না জানিয়েই চিঠিটি পোস্ট করে দিলেন তিনি।

।। দুই।।

জয়শঙ্কর চক্রবর্তী লম্বা সুঁটকো লোক। গায়ের রং কুচকুচে কালো। থেলো হুঁকোয় হরদম তামাক খান বলে সাদা গোঁফে লালচে ছোপ ধরেছে। যখন বাইরে বেরোন তখন বিড়ি খান। অন্য কিছু পছন্দ নয় তাঁর। ব্রজেনবাবুর চিঠি যখন এল তখন তিনি ন'হাতি একটি কাপড় পরে উবু হয়ে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। কাজে বেরুবার আগে এইটেই তাঁর দৈনন্দিন কর্ম এবং বিলাস। আগে সরকারি ইন্‌জিনিয়ার ছিলেন এবং সেই সময় কলিকাতার অভিজাত পল্লীতে একটি চারতলা বাড়ি করিয়েছেন। নিজে চারতলায় থাকেন, বাকি তিন তলা ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়া থেকেই মাসে হাজার দেড়েক টাকা আসে। তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন বটে কিন্তু পেন্সনটির উপর নির্ভর করে বসে নেই। উদ্যোগী পুরুষ। কন্ট্রাকটারি করেন। দালালিও করেন। তাছাড়া ফাটকা খেলেন, শেয়ার-মার্কেটে গতিবিধি আছে। টাকার অভাব নেই। অভাব সুখের। একটি মেয়ে বিধবা হয়েছে। কিন্তু সে বিধবার মতো থাকে না। রঙীন শাড়ি পরে, হোটেলে মাছ মাংস খায়। সংস্কৃতির নামে বেলেল্লাগিরি করে বেড়ায়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গোঁড়া হিন্দু, সুতরাং সেখানে তার স্থান হয়নি। মেয়েটি জয়শঙ্করের স্কন্ধারূঢ়া হয়ে আছে।

জয়শঙ্কর তাকে কিছু বলতে সাহস করেন না। তাঁর ভয় হয় কিছু বললে হয় আত্মহত্যা করবে না হয় পালিয়ে যাবে। এম. এ. পাস মেয়ে, মুখের উপর কিছু বলাও শক্ত। গিন্নীর ভয়েও চুপ করে থাকতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় গিন্নীই মেয়েকে যথেচ্ছাচার করবার অবাধ অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি সহজ এবং জোরালো। সামাজিক পথে তাঁর মেয়ের যখন সাধআহ্লাদ মিটল না, তখন স্বাভাবিক পথেই তা মিটুক। টাকার জোর থাকলে সমাজে কিছুই যখন আটকায় না, তখন আর ভাবনা কি। মেয়ে সেজেগুজে চারতলার ঘরে বসে যতক্ষণ পিয়ানো বাজাতে চায় বাজাক। যত বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে আড্ডা দিতে চায় দিক। যত সংস্কৃতি-সভা করতে চায় করুক। কন্যার বৈধব্যের জন্য জয়শঙ্করবাবুকেই দায়ী করেছেন তাঁর গৃহিণী। বিয়ের সময় নাকি ঠিকুজি মেলানো হয়নি। বিয়ের পর দেখা গেল কন্যার রাক্ষসগণ আর বরের নরগণ। সুতরাং কন্যার প্রসঙ্গ উঠলেই জয়শঙ্করবাবু বাইরে একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে তিনি খুবই চটে যান সেটা বোঝা যায় তাঁর থেলো হুঁকোর ভড়াক ভড়াক শব্দ শুনলে।

ছেলেদের নিয়েও সুখ নেই তাঁর। বড় ছেলে বিলেত থেকে ইন্‌জিনিয়ার হয়ে এসেছে। কিন্তু বিলেত থেকে সে শুধু ডিগ্রিই আনেনি, একটি মেমসাহেব বউও এনেছে। চৌরঙ্গী অঞ্চলে আলাদা বাড়িতে থাকে। একটি ছেলে হয়েছে। মেম মা ছেলের নাম রেখেছে চার্লি।

মধ্যম পুত্রটি বাধ্য, কিন্তু বাবার বাধ্য নয়, মায়ের বাধ্য। সে বলেছে মা যে মেয়েকে পছন্দ করবে তাকেই বিয়ে করবে সে। মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে অনেক। কিন্তু ভদ্রমহিলা পছন্দের যে ফরম্যুলা বানিয়েছেন তা কোন মেয়েকেই ফিট্ করছে না। ডানাকাটা পরী তিনি চান না, অথচ শ্যামবর্ণ মেয়েও পছন্দ নয়, মেয়ে মূর্খ হলে চলবে না, অথচ আই. এ. পাস অনেকগুলি মেয়েকে অপছন্দ করেছেন তিনি। বি. এ. পাস মেয়ে তো চলবেই না, কারণ তাঁর মতে বি. এ. পাস মানে বুড়ী। মেয়ের বাপ মা-রা মেয়ের যে বয়স বলেন তা তাঁর বিশ্বাস হয় না।

জয়শঙ্কর তোমাকে খেতে খেতে ব্রজেনবাবুর চিঠিটা পড়লেন। তারপর গৃহিণীকে ডেকে দিলেন চিঠিখানি। তাঁর মতামতই এ বিষয়ে চূড়ান্ত, তিনি যে রকম উত্তর লিখতে বলবেন তাই তিনি লিখে দেবেন। চিঠিখানি দিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকলেন। আধঘণ্টা পরে যখন বেরুলেন তখন গৃহিণী বললেন, "ঘটির লগে কাম করুম্ না।" তখন জয়শঙ্করবাবুর মনে পড়ল বিক্রমপুরের মেয়ে ছাড়া অন্য মেয়ে চান না তিনি।

সুতরাং জয়শঙ্কর ব্রজেন্দ্রবাবুর চিঠির উত্তর দেওয়ার আর প্রয়োজন বোধ করলেন না। একটা পোস্টকার্ড মানেই পাঁচ নয়া পয়সা। অনর্থক অর্থব্যয়ের তিনি পক্ষপাতী নন।

।। তিন।।

তিনকড়ি মজুমদার কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন। উত্তর দিতে দেরিও করেননি, উত্তরের মধ্যে ঝাপসাও কিছু রাখেননি।

ব্রজেনবাবু এ ভদ্রলোকের খবর পান তাঁর এক দালালের মারফত। তাঁর দালাল শ্রীধর নাগ

জহুরী লোক। গেঞ্জির দালালি করতে তাঁকে অনেক জায়গায় যেতে হয়। তিনি কলিকাতাবাসী তিনকড়ি মজুমদারের খবরটি নিয়ে এলেন। বললেন, টালিগঞ্জে প্রকাণ্ড বাড়ি ভদ্রলোকের। ছয় ছেলে, ছ'জনই এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ। প্রত্যেকটি ইন্‌জিনিয়ার, প্রত্যেকেই বড় চাকরি করে। আর কি চেহারা সব! রাজপুত্র বলতে চান বলতে পারেন, কন্দর্পকান্তি বলতে চান তাও বলতে পারেন। কোনটাই বেমানান হবে না। আর বাপের চেহারা কি, যেন শিবটি। অবশ্য একটু তফাত আছে। মাথায় জটা নেই, গলায় সাপ নেই, দিগম্বরও নন (ঝোলা পাজামা পরেন)—কিন্তু আর সব মিল। নধর ভুঁড়ি, প্রশান্ত হাসি, চোখের দৃষ্টি থেকে যেন ক্ষমা ঝরে পড়ছে। তাঁর ঠিকানা এনেছি। আজই চিঠি লিখুন তাঁকে। তাঁর পাঁচ ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে, কেবল ছোটটি বাকি। মেয়ের বাবারা ছেঁকে ধরেছে ভদ্রলোককে। আপনি আজই চিঠি লিখুন। নাগ মশায় ঠিকানা এনেছিলেন। ব্রজেনবাবু অবিলম্বে চিঠি লিখে দিলেন। দিন সাতেকের মধ্যেই উত্তরও এসে গেল ঃ

মান্যবরেষু—

আপনার ৪/১০ তারিখের পত্র পাইয়াছি। যে ঠিকুজি পাঠাইয়াছেন তাহার সহিত আমার পুত্রের ঠিকুজির রাজযোটক মিল হইয়াছে। কিন্তু কন্যার ছকে কুজগ্রহ কোথায় আছে তাহা ধরিতে পারিলাম না। প্রথম যৌবনে জ্যোতিষ লইয়া কিঞ্চিৎ নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম। কুজগ্রহ যে দাম্পত্যজীবনে নানা বিঘ্নকারক তাহা মনে আছে। কুজগ্রহই কি মঙ্গল? অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

আপনাকে প্রসিদ্ধ গেঞ্জি ব্যবসায়ী ব্রজেন্দ্রনাথ বলিয়া অনুমান করিলে কি ভুল হইবে? আপনার সহিত কুটুম্বিতা কাম্য মনে করি। আপনি শ্রদ্ধেয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন ইহা কম কৃতিত্ব নহে। এইবার আমাদের পরিচয় শুনুন। আমরা ঢাকার বাঙাল। পাকিস্তান ভদ্রাসন গ্রাস করিবার পরে টালিগঞ্জে ছোট একখানা দ্বিতল বাড়ি করাইয়া বাস করিতেছি। আমার ছয় পুত্র, সবগুলিই ইন্‌জিনিয়ার ও ভারত গভর্নমেণ্টের অধীনে কর্মে নিযুক্ত। পাত্র কনিষ্ঠ, বয়স সাতাশ। কিছুদিন পূর্বে সে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের অধীনে ভালো চাকুরি পাইয়াছে।

আপনি লিখিয়াছেন পাত্রী সুশ্রী। সুশ্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃত গৌরাঙ্গী না হইলে এ পরিবারে মানাইবে না। আর একটা কথাও পূর্বেই পরিষ্কারভাবে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। জীবন-যুদ্ধে নানাভাবে বিপর্যস্ত হইয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। চড়া সুদে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কর্জ করিতে হইয়াছে। পাঁচ ছেলের বিবাহ দিয়া ত্রিশ হাজার শোধ করিয়াছি। কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহে পাঁচ হাজার টাকা পণ লইয়া বাকিটা শোধ করিয়া দিব। সুদের বোঝা আর টানিতে পারিতেছি না। ইহা ছাড়া গহনা-পত্র বরাভরণ প্রভৃতিও আপনাকে দিতে হইবে। আমি কোনও কিছুই ঝাপসা রাখিতে চাহি না। মনে হয় আপনার হাজার বিশেক টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে কন্যাটি পছন্দ হওয়া দরকার। আপনি দূরে থাকেন, আপনার পক্ষে কন্যা লইয়া আসা একটু শক্ত, আমাদের পক্ষেও যাওয়া সহজ নয়। আপনাদের যদি কোনও আত্মীয় কলিকাতায় থাকেন তাঁহাকে আমার কাছে পাঠাইলে সুবিধা হয়। তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া কন্যার রূপের সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ পাইব। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া যদি বুঝি যে কন্যা প্রকৃত গৌরাঙ্গী

তাহা হইলে আপনাকে কন্যা লইয়া এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিব। আপনার আত্মীয়কে বলিবেন টালিগঞ্জে চারু অ্যাভেনিউ রোডে পৌঁছিয়া আমার নাম করিলেই অনেকে আমার বাড়ি দেখাইয়া দিবে। বাড়ির রং গোলাপী। বাড়ির নাম বঙ্গকুটির । বাড়ির নম্বর ৩৫/১। চিনিতে কষ্ট হইবে না।

গৌরবর্ণ বর্তমান বাঙ্গালীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। ফরসা রংও বিভিন্ন চক্ষে বিভিন্ন রকম দেখায়। রবীন্দ্রনাথের মায়ের চক্ষে রবীন্দ্রনাথ কালো ছিলেন! সুতরাং আপনাার আত্মীয়ের সহিত আলোচনা করিয়া তবে আপনাকে কন্যা আনিতে অনুরোধ করিব। গৌরবর্ণ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে।

নমস্কার ও প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীতিনকড়ি মজুমদার।

হরমোহিনীর এ প্রস্তাবে দুটি আপত্তি ছিল। প্রথম ওরা পূর্ববঙ্গের, দ্বিতীয় ওদের উপাধি মজুমদার। তাঁর ইচ্ছা পাত্রের উপাধি বন্দোপাধ্যায় হোক আর বাড়ি হোক কলকাতায়। যদিও কল্‌কাতিয়াদের নিয়ে তিনি সুযোগ পেলেই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে থাকেন কিন্তু মেয়ের বিয়ে তিনি কলকাতাতেই দিতে চান। ব্রজেন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান লোক। স্ত্রীর সঙ্গে কলহ্ করে যে লাভ নেই এ অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। তিনি কেবল বললেন,—যা বরাবরই বলে আসছেন,—"চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। পাত্রটি ভালো। ভদ্রলোক কলকাতাতেই যখন বাড়ি করেছেন, তখন তো কলকাতার লোকই হয়ে গেছেন। আমি শিবুকে লিখে দিচ্ছি ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসুক। কুড়ি হাজার টাকা কোনক্রমে যোগাড় করব। ধারধোর করে। পাত্রটি বড় ভালো।"

ব্রজেন্দ্রবাবুর শ্যালকের নাম শিবতোষ না হয়ে কৃষ্ণতোষ হলে বেশী মানাতো। কুচকুচে কালো রং। বলিষ্ঠগঠন কোল বা সাঁওতালের মতো দেখতে। ব্রজেন্দ্রবাবুর নির্দেশে শিবতোষই দ্বিতীয়বার দেখা করতে গিয়েছিল। তিনকড়িবাবু নাকি তাহার আপাদমস্তক একবার দেখে একটি প্রশ্নই করেছিলেন, "আপনার ভাগ্নী কি আপনারই মতো দেখতে?"

শিবতোষ ভালমানুষ লোক। অত ঘোরপ্যাঁচের ধার ধারে না। বলেছিল, "কিছুটা মিল আছে বই কি। হাজার হোক ভাগ্নী তো। তবে আমার মতো এতো কালো নয়।"

তিনকড়িবাবু আর কোন কথা জিজ্ঞেস করেননি। ব্রজেন্দ্রবাবুর চিঠির উত্তরে সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন—"আপনার শ্যালকের সহিত আলাপ করিলাম। বুঝিলাম আমরা পাত্রী যেরূপ চাই আপনার কন্যা সেরূপ নহে। সুতরাং এ বিষয়ে আর কথা বাড়াইতে চাহি না। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ব্রজেন্দ্রবাবু চিঠি পেয়ে খুব দমে গেলেন। তাঁর মেয়ে যে কারও অপছন্দ হবে এ ভয় তাঁর ছিল না। তাঁর ভয় ছিল অত টাকা যোগাড় করতে পারবেন কি না। কিন্তু তাঁর ভক্ত এবং পার্টনার সুন্দরমল আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁকে—আপনি ভালো পাত্র ঠিক করুন, টাকার ভার আমি নিলাম। এই আশ্বাসে তাঁর মন চিন্তামুক্ত হয়ে নির্মেঘ আকাশের মতো হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তিনকড়িবাবুর চিঠি পেয়ে আবার মেঘ জমতে লাগল।

হরমোহিনী কেবল বললেন,"হয়নি বাঁচা গেছে। ও বাড়িতে আমার মেয়ের সুখ হত না। দেখেছি তো, পূর্ববঙ্গে বউদের ভয়ানক খাটায়!"

ব্রজেন্দ্রবাবু কয়েকদিন চুপ করে রইলেন। মনের বিমর্ষ ভাবটা কাটতে কয়েকদিন লাগল তাঁর। মাঝে মাঝে এ-ও মনে হচ্ছিল, যাক্ গে, যা হয় হবে, আর পারা যায় না। কিন্তু এ নিবৃত্তিমার্গে বেশীদিন তিনি চলতে পারলেন না। তাঁর বিবেক তাঁকে বলতে লাগল—"তুমি অন্যায় করছ, কর্তব্যে অবহেলা করা নিয়ে মাথা অহংকার তাঁকে ওসকাতে লাগল—'তুমি সৎপাত্র যোগাড় করতে পারবে না? কিসের অভাব তোমার! তোমার মিলের দেশজোড়া নাম। সুন্দরমলের মতো টাকার কুমীর তোমার ভক্ত। তোমার তিন তিনটি উপযুক্ত ছেলে, এত বন্ধুবান্ধব। তোমার মেয়ের পাত্র জুটবে না? হতাশ হচ্ছ কেন? কাপুরুষরাই হতাশ হয়।'

উত্তেজিত হয়ে ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁর তিন ছেলেকে এবং কয়েকজন বন্ধুকে চিঠি লিখলেন।

।। চার।।

তাঁর বড় ছেলে অধ্যাপক। সে চিঠি পেয়েই উত্তর দিল বাবাকে।

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। ঊষার জন্য আমি পাত্রের সন্ধানে আছি। একটি পাত্রের খবর পেয়েছি। ছেলেটি সম্প্রতি বিলেত থেকে লিটারেচারে ডক্টরেট্ পেয়ে ফিরেছে। আশা করছি ভাল চাকরিই পাবে। তার ঠিকানা নীচে দিলাম। ছেলেটির বাবা নেই, মা-ও নেই। মামারাই বিবাহের কর্তা। বড় মামা রিটায়ার্ড সব-জজ। নাম শশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুঙ্গেরে থাকেন। তাঁর ঠিকানাও এই সঙ্গে দিলাম। আপনি তাঁকে পত্র লিখুন। আমিও ছেলেটির সহিত এ বিষয়ে আলাপ করব। একদিন তার বাসায় গিয়েছিলাম. দেখা পাইনি। আপনি ও মা আমার প্রণাম জানবেন। ঊষাকে আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণত নরেন।

দ্বিতীয় পুত্র বরেন, ডাক্তার। সে যা উত্তর দিল তা ব্রজেন্দ্রনাথের ভালো লাগল না। ছেলেটা বরাবরই জ্যাঠা। সে লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আপনি ঊষার বিয়ের জন্য এত ভাবছেন কেন বুঝতে পারছি না। আজকাল মেয়েদের বিয়ের জন্য কেউ ভাবে নাকি। মেয়েরা আজকাল আর সমাজশৃঙ্খলে বন্দিনী নয়। ছেলেদের মতোই তারা স্বচ্ছন্দে চলতে ফিরতে আরম্ভ করেছে। বিয়ে যথাসময়ে এবং যেখানে হোক হবে। ঊষা নিজেই পছন্দ করে হয়তো বিয়ে করবে কাউকে। জোর করে কারো ঘাড়ে একটা বিয়ের জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া সমীচীনও নয় সব সময়ে। তাতে তাদের সহজ গতি নষ্ট হয়ে যায়, অনেক সময় জীবনই দুর্বহ হয়ে পড়ে। আজকাল মেয়েরা তো নিজেদের পায়ে বেশ দাঁড়াতে শিখেছে, তারা ডাক্তার হচ্ছে, শিক্ষক হচ্ছে, ইন্‌জিনিয়ার হচ্ছে, ব্যারিস্টার হচ্ছে, উকীল হচ্ছে, পুলিসবিভাগেও ঢুকছে। কেরানী, স্টেনোগ্রাফার, টাইপিস্ট তো অজস্র। মেমসায়েব নার্স আজকাল বিরল, তাদের জায়গা নিয়েছে আমাদের দেশের মেয়েরা। মেয়েদের স্কোপ অনেক, ছেলেদের চেয়েও বেশী। ঊষা লেখাপড়ায় ভালো, সে এম. এ. পড়ুক। তারপর

বিলেতে গিয়ে একটা ভালো ডিগ্রি নিয়ে আসুক। ওর যে রকম সাহিত্য-প্রীতি, তাতে মনে হয় ওদেশের কোনও বড় ইউনিভার্সিটি থেকে ও ডি. লিট্. হয়ে আসতে পারবে। আপনি ওর বিয়ের জন্যে যে টাকা খরচ করবেন তার চেয়ে ঢের কম টাকায় ওর উজ্জ্বল 'কেরিয়ার' হয়ে যাবে। যাই হোক আপনি যখন লিখেছেন তখন পাত্রের সন্ধানে থাকব। আপনি অনর্থক চিন্তিত হবেন না। আজকাল মেয়ের বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। আপনি ও মা আমার প্রণাম নেবেন! উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণত বরেন।

তৃতীয় পুত্র হরেনের উত্তর এল কয়েকদিন পরেই।

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা, আপনি উষার জন্যে ইন্‌জিনিয়ার পাত্র খুঁজতে বলেছেন, আমি কয়েকটি পাত্রের খবর দিলাম। আমি ওদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। কুমুদকান্তি আমার সঙ্গে শিবপুরে পড়ত। পড়াশোনায় ভালো। কিন্তু গোঁড়া কমিউনিস্ট। তার বিশ্বাস আমাদের দেশেও পুরোপুরি মজদুররাজ হয়ে যাবে আর সেই রাজ্যের সে হবে ক্রুশ্‌চেভ। তাছাড়া বড্ড বেশী সিগারেট খায়। রোজ প্রায় তিন প্যাকেট। অন্য ছেলেগুলির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। একটি ছেলে যাদবপুরের, আর একটি খড়্গাপুরের। আপনি ইন্‌জিনিয়ার পাত্রের উপর এত ঝোঁক দিচ্ছেন কেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমি নিজে ইন্‌জিনিয়ার হয়ে দেখছি এ অতি ওঁছা প্রফেসন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুটি নেই। আর যতসব অশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে কাজকর্ম। সন্ধ্যের পর ক্লাবে বা আড্ডায় যাদের সঙ্গে দেখা হয় তারা সব নির্জলা স্নব। ভদ্রলোক তো কই চোখে পড়ল না এখনও। অন্য প্রফেসনের তুলনায় রোজগার কি খুব বেশী? গভর্নমেন্টের চাকরিতে মাইনে খুবই কম। প্রাইভেট সার্ভিসে বেশী মাইনে দেয় বটে কিন্তু সিকিউরিটি নেই। আর খাটতেও হয় খুব বেশী। তাছাড়া আর একটা কথা মনে হয়। চারিদিকে যে রকম রেটে হু হু করে ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ আর স্কুল হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে ইন্‌জিনিয়ারদের বাজারদরও কমে যাবে। আপনি যদি বলেন অন্য পাত্রেরও চেষ্টা করতে পারি। প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়ত। ভারি ভালো ছেলে। আমাদের পালটি ঘর। এখন মফঃস্বলের কোনও কলেজে প্রফেসারি করছে। প্রাইভেট কলেজ, মাইনে দু'শ টাকার বেশী নয়। পরে উন্নতি হবে। যদি বলেন, এর সঙ্গে সম্বন্ধ করি। এদের পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। সবাই খুব ভালো। আমার মনে হয় উষা এখানে সুখে থাকবে। তবে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মতো থাকতে হবে। আমার শরীর আপাতত ভালো আছে। মাঝে কয়েকদিন জ্বরে ভুগে উঠলুম। ডাক্তারবাবু বললেন, 'লু' লেগেছে। সমস্ত দিন সাইটে দাঁড়িয়ে কাজ করাতে হয়, বিশ্রাম করবার যে জায়গাটুকু, তাও টিনের। এখন ভালো আছি।

আপনি ও মা আমার প্রণাম নেবেন। উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। এই গরমে জাম্বু আর ভুটান কেমন আছে? ইতি—

প্রণত
হরেন।

জাম্বু ভুটান কুকুরের নাম। দুটি কুকুরই হরেনের খুব প্রিয়।

তিন ছেলের চিঠি নিয়ে আলোচনা হল কর্তা-গিন্নীর মধ্যে। ব্রজেন্দ্রকুমার বরেনের উপর চটেছিলেন বলেই হরমোহিনী তার পক্ষ অবলম্বন করলেন।

বললেন, "ও তো মিছে কথা লেখেনি কিছু। তোমরা এতকাল দুপায়ে মেয়েদের থেঁৎলে আধমরা করে রেখেছিলে, এইবার তারা রুখে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়াবেই তো। তোমরা যে বড্ড বাড়িয়েছিলে। ঠিক লিখেছে বরেন—"

ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীর একটি বৈশিষ্ট্য বরাবরই লক্ষ্য করেছেন। যখনই এই ধরনের কথা হয় তখনই হরমোহিনী তাঁকেই শত্রুপক্ষ মনে করে পাঁয়তারা করেন। একমাত্র তিনিই যেন মেয়েদের দুর্দশার জন্য দায়ী। মুখে তিনি যদিও 'তোমরা' বলেন, কিন্তু তাঁর চোখ মুখ দেখে মনে হয় বহুবচনটা বাহুল্যমাত্র। পুরুষরাই মেয়েদের উপর নানা অত্যাচার করেছে, এ কথাটা ইতিহাসসম্মত। কিন্তু যে সব কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সব কথা মোটেই কম সত্য নয়, তা হচ্ছে এই যে সব দেশে মেয়েমানুষরাই পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। ইতিহাসেও পড়া যায় বড় বড় যুদ্ধের মূলে মেয়েমানুষ। আমাদের দেশেও মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু, তাদের নির্যাতনটা হয়তো পুরুষদের হাত দিয়েই হয়—কিন্তু সে হস্ত নিয়ন্ত্রণ করে অনেক সময় মেয়েরাই। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ এত কথা হরমোহিনীকে বললেন না। তিনি জানেন, বলে লাভ নেই। হরমোহিনীর মনোগত ইচ্ছাটা যে কি তাও তিনি জানেন, সুতরাং সেই পথে আক্রমণ করলেন।

বললেন, "বরেনের মতেই যদি তোমার মত হয় তাহলে আর এতো পাত্র খোঁজাখুঁজির দরকার কি। ওকে পড়ানোই যাক। বিলেত পাঠাবারই ব্যবস্থা করি না হয়—"

ঝেঁজে উঠলেন হরমোহিনী।

"যা হয় না, হবে না, হতে পারে না তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি! তোমার ওই আদুরে মেয়ে চাকরি করতে পারবে, না বিলেত যেতে পারবে? এখনও সামনে বসে খাওয়াতে হয়। সবাই কি সব পারে? মেয়েটিকে যে রকম আদুরে করেছ তাতে বিয়ে দেওয়া ছাড়া গতি নেই, তা-ও যা তা ঘরে দিলে চলবে না। ভালো করে দেখে শুনে দিতে হবে যাতে সেখানে খাপ-খাইয়ে সুখে থাকতে পারে। বরাবর পইপই করে বলেছি মেয়েকে অত আদর দিও না, মেয়েকে অত আদর দিতে নেই। কার হাঁড়িতে চাল দিয়েছে এক ভগবান ছাড়া তো আর কেউ জানে না, নিজেদের সেই বুঝে চলতে হবে। কিন্তু তুমি কি আমার একটি কথাও শুনেছ কখনও?"

কোনও সতী রমণীকে মিথ্যাবাদিনী বলা উচিত নয়, ভদ্রতার আইনে আটকায়। ব্রজেন্দ্রনাথ অনায়াসে বলতে পারতেন যে তিনি মেয়েকে একটু-আধটু প্রশ্রয় দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছেন হরমোহিনী নিজে। উষার খাওয়ার নানারকম বাছবিচার। বেগুন খাবে না, পোস্ত খাবে না। ছোট মাছ ছোঁবে না। গৃহস্থ ঘরের ছেলে-মেয়েরা চিরকাল বাসী রুটি আর তরকারি খেয়েছে, কিন্তু উষা তা খাবে না। তার চাই মাখন দেওয়া টোস্ট, বিস্কুট, জ্যাম জেলি। মাংসটি খুব প্রিয়। কিন্তু কোন্ গৃহস্থ ঘরে রোজ মাংস হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ আগে আগে হরমোহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন এদিকে। কিন্তু হরমোহিনী গ্রাহ্য করেননি।

তখন তাঁর যুক্তি ছিল—"ভবিষ্যতে কি হবে তাই ভেবে এখন থেকে ওর খাওয়া বন্ধ করে দেব না কি! ভবিষ্যতে ওর অদৃষ্টে যদি দুঃখ থাকে ভবিষ্যতেই সেটা ও ভোগ করবে। এখন থেকে সেটা ভোগ করে লাভ কি। ভবিষ্যতে কি হবে তা জানা নেই বলেই তো আরও উচিত এখন ওকে ভালোভাবে খেতে পরতে দেওয়া। আমাদের কাছে যতদিন আছে ততদিন যতটা পারে খেয়ে মেখে নিক, তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তুমি এ নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামাচ্ছ কেন।" ব্রজেন্দ্রনাথকে থেমে যেতে হয়েছিল। আমতা আমতা করে কেবল বলেছিলেন, "না আমি বলছি, মানে অভ্যাসটা একবার বিগড়ে গেলে পরে বদলানো শক্ত হবে তো। বদলাতে কষ্টও হবে। হয়তো ওই নিয়েই মনোমালিন্য হবে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে—"

"তা হোক, তাই বলে এখন থেকে ওকে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়ে আধপেটা খাইয়ে রাখতে পারব না"—এই বলে হরমোহিনী ধামা-চাপা দিয়েছিলেন ব্যাপারটার উপর। পরে এসব নিয়ে আর আলোচনাও করেননি ব্রজেন্দ্রনাথ। ওদের শাড়ি ব্লাউস আগে নিজেই দোকান থেকে কিনে আনতেন। কিন্তু এখন আব আনেন না। এ ছিট ভালো নয়, ও রংটা ম্যাটমেটে, এত মোটা কাপড় কি পরা যায়, শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ ম্যাচ করেনি—এই রকম নানা বায়নাক্কা। আর এ সমস্তর প্রশ্রয় দিয়েছেন হরমোহিনী। তিনি নিজেই এখন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে যান এবং নিজেদের পছন্দমতো কাপড়-চোপড় কেনেন। আর সেই ভদ্রমহিলাই এখন অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে ব্রজেন্দ্রনাথই মেয়েকে আদুরে করেছে। আশ্চর্য ব্যাপার!

আর তর্কাতর্কির মধ্যে না গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "হরেন যে প্রফেসার ছেলেটির কথা লিখেছে তাদের চিঠি লিখব?"

"না, প্রফেসার ছেলের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না। তুমি তো নিজে প্রফেসার ছিলে। প্রফেসারদের যে কি দুর্দশা তা কি তুমি জান না? যতদিন প্রফেসার ছিলে ততদিন হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে আমার হাড়মাস কালি হয়ে গিয়েছিল। চতুর্দিকে দেনার জ্বালায় অস্থির, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে দিতে পারতুম না, সাধ-আহ্লাদ বলে কিছু ছিল না, বাবা যে ক'গাছা চুড়ি দিয়েছিলেন, ক্ষয়ে গিয়েছিল সেগুলো—"

যতই দিন যাচ্ছে হরমোহিনী তাঁর বিগত জীবনের কাহিনীটা ক্রমশঃই অতিরঞ্জিত করে তুলছেন! তিনি ভুলে গেছেন যে ওই প্রফেসারি করতে করতেই তিনি তাঁকে সোনার বিছে গড়িয়ে দিয়েছিলেন, শাড়িও কম কিনে দেননি, ঢাকাই, মুর্শিদাবাদী, বেনারসী, এমন কি জর্জেটও। স্ত্রীকে গয়না কাপড় কিনে দিয়ে কেউ রসিদ নেয় না, তিনিও নেননি। নিলে এখন প্রমাণ দেখাতে পারতেন।

হঠাৎ চটে উঠলেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

দু'হাত উপরে তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন—"হয়েছে, হয়েছে, ঢের হয়েছে। পুরোনো কাসুন্দি কত আর ঘাঁটবে? প্রফেসারির উপর এতই যখন রাগ নরেনকে প্রফেসার হতে দিলে কেন?"

"আমি কি দিয়েছি? যখন আই, এস-সি পাস করলে তখনই বলেছিলাম ডাক্তারি বা ইন্‌জিনিয়ারিতে ঢুকে পড়। ছেলে বললে আমি অঙ্ক পড়ব। অঙ্ক আমার খুব ভালো লাগে। শুনলে না কি আমার কথা! হুবহু তোমার স্বভাবটি পেয়েছে—"

ব্রজেন্দ্রনাথ দেখলেন যেদিক দিয়েই তিনি যাচ্ছেন চোট খেতে হচ্ছে। তাই রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করলেন। হনহন করে বৈঠকখানায় চলে গেলেন।

আহার এবং দিবানিদ্রার পর অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। ব্রজেন্দ্রনাথ এবং হরমোহিনী দু'জনেরই মেজাজ শরীফ। হরমোহিনী ইদানীং যা অনেককাল করেননি সেদিন তাই করলেন। স্বহস্তে এক কাপ চা ছেঁকে নিয়ে এসে কোমলকণ্ঠে বললেন,"নরু ওই যে বিলেতফেরত ছেলেটির কথা লিখেছে তারই মামাকে চিঠি লিখে দাও না একখানা—"

"সে ছেলে তো ডি. লিট্‌। শেষ পর্যন্ত প্রফেসারই হবে। তুমি তো প্রফেসাব জামাই চাও না--"

"বিলেতফেরত যখন, তখন প্রফেসারি পেলেও বড় চাকরি পাবে। আমাদের স্বদেশী গভর্নমেন্টে বিদেশী ডিগ্রিরই কদর বেশী। নরু ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল, আর নরুর বন্ধু গজেন পেয়েছিল সেকেন ক্লাস। গজেনের বাপের টাকা ছিল, বিলেত পাঠিয়ে দিলে ছেলেকে। সে একটা ডিগ্রি নিয়ে ফিরে অনেক বেশী মাইনের চাকরি করছে। নরুও বিলেত যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তখন তুমি বললে আমার হাতে টাকা নেই।"

ম্লানমুখে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, 'টাকা তো ছিলই না। দেখি উষার বিয়েটা হয়ে যাক্‌ তখন চেষ্টা করব—"

"ওই ছেলেটির মামাকে আজই লিখে দাও একখানা চিঠি। অমন ভালো ছেলে বাজারে বেশীদিন পড়ে থাকবে না।"

"বেশ দিচ্ছি—"

ব্রজেন্দ্রনাথ চা পান শেষ করে সুগন্ধি জরদা সহযোগে এক খিলি পান খেলেন। এইটেই তাঁর একমাত্র বিলাস। হরমোহিনী জুলজুল করে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। ব্রজেন্দ্রনাথের হার্ট খুব সবল নয়, ডাক্তার জরদা খেতে মানা করেছেন। সেই মানার পরোয়ানাটা হরমোহিনীই যখন তখন স-ঝংকারে আস্ফালন করেন। এখন কিন্তু কিছু বললেন না। তাঁর মনে হল ওর মেজাজটা খিঁচড়ে দিয়ে লাভ নেই। ভালো মনে চিঠিটা লিখুক।

'বিহিত সম্মানপুরঃসর সবিনয় নিবেদন' এই পাঠ ফেঁদে মেয়ের বাবা ব্রজেন্দ্রনাথ ছেলের মামা শশীনাথকে চিঠি লিখতে বসলেন। হরমোহিনী ঠাকুরঘরে গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণতা হলেন জগদ্ধাত্রীর ছবির সামনে আর মনে মনে বলতে লাগলেন, মা দয়া কর, দয়া কর।

।। পাঁচ।।

পাত্রের মামা শশীনাথ অনেকদিন মুনসেফী করার পর সব-জজ হয়েছিলেন। বেশীদিন জজিয়তি করতে পাননি। সব-জজ হবার মাস ছয়েক পরেই তাঁকে রিটায়ার করতে হল। অনেক চেষ্টা করেও এক্‌স্‌টেন্‌শন পেলেন না। এর জন্যে তাঁর স্ত্রী নাকি বাবা তারকেশ্বরের কাছে ধরনা দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা দয়া করেননি। শশীনাথের ধারণা তাঁর প্রতি সুবিচার করেনি কেউ কখনও। স্কুলে মাস্টাররা পক্ষপাতিত্ব করে কখনও ভালো নম্বর দেননি তাঁকে। কলেজ জীবনেও প্রফেসাররা বিশেষ আমল দিতেন না। তাঁর সহপাঠীরা প্রফেসারদের বাড়ি গিয়ে অনেক সময় অনেক কাজ আদায় করে নিত, কিন্তু তিনি কখনও পারেননি। তিনি মুখ ফুটে তেমন দাবিও করতে পারতেন না। চাকরি জীবনেও ওপরওয়ালার বকুনি খেয়েছেন

চিরকাল, অধিকাংশই অন্যায় বকুনি, কিন্তু তার প্রতিবাদ করতে পারেননি কখনও। ডাক্তাররা বলেছেন এই সবই না কি তাঁর বর্তমান রোগের কারণ। রোগটা বিশেষ মারাত্মক কিছু নয়। কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ করলে বা অবাধ্য হলে, কিংবা তাঁর যদি ধারণাও হয়, যে মুখে প্রতিবাদ না করলেও ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করছে, সামনে অবাধ্য না হলেও তাঁর অগোচরে ভবিষ্যতে অবাধ্য হবে—তাহলেই তাঁর সারা মুখমণ্ডলে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসবার মতো হয়, গালের মাংস, থুতনির নীচের মাংস, গলার খানিকটা থর্‌থর্ করে কাঁপতে থাকে। মনে হয় তাঁর মুখমণ্ডলে যেন ভূমিকম্প গোছের কিছু একটা হচ্ছে। মুখে একটি কথা বলেন না, যেন দম আটকে বসে আছেন। অনেক ডাক্তার গুপ্ত সিফিলিস সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু বার বার রক্ত পরীক্ষা করিয়েও কোন দোষ পাওয়া যায়নি। একজন বিলেতফেরত মনস্তত্ত্ববিশারদ ডাক্তার শেষে বললেন এটা সারাজীবনব্যাপী রিপ্রেশনের ফল। বহুকাল ধরে মনে যে সব কষ্ট, যে সব ক্ষোভ চাপা ছিল, তারাই নাকি এখন ওইভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। তাঁর আর একটা কষ্ট নিজের ছেলে-মেয়ে হয়নি। তাঁর স্ত্রী কনকচাঁপা তাই ক্রমাগত সিনেমা থিয়েটার ঠাকুরঘর আর তীর্থ নিয়ে থাকেন। শশীনাথের ভরসা ভাগ্নেটির উপর। বিলেত থেকে ফেরার পর অনেকেই তাঁকে চিঠি লিখেছে। নানা রকম চিঠি। অধিকাংশই কাকুতি-মিনতিপূর্ণ। কাকুতি-মিনতির উপর তাঁর বিশেষ আস্থা নেই। নিজের চাকরি জীবনে তিনি সারাজীবন নিজের উপরওয়ালাদেব কাকুতি-মিনতি করেছেন, কোন ফল হয়নি। হাকিম হিসেবে নিজেও তিনি অনেকের কাকুতি-মিনতি শুনেছেন কিন্তু সাক্ষীর মুখে সে সব কাকুতি-মিনতির চেহারা বদলে গেছে। প্রায়ই দেখেছেন যারা বেশী কাকুতি-মিনতি করে তারা বদমায়েস, ভালো অভিনয় করতে পারে।

ব্রজেন্দ্রবাবুর চিঠি পড়ে তাঁর ভালো লাগল। ভদ্রলোক অহেতুক বিনয়-প্রকাশ করেননি, অশোভনভাবে নিজেকে হীনও করেননি। সব কথাগুলি শোভন সংযত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। গেঞ্জির মিলটার নামও আছে, সুতরাং পয়সাকড়িও খরচ করবেন বলে মনে হয়।

তাঁর একমাত্র ভগ্নী টুসি বিধবা, তাঁর সঙ্গেই থাকে।

ভাজ কনকচাঁপার সঙ্গে মনের মিল নেই। সে নিজেই আলাদা রেঁধে খায়।

টুসির আশা-আকাঙ্ক্ষা সব এখন টুবলুকে কেন্দ্র করে। ভগবানের দয়ায় ছেলেটি মানুষ হয়েছে, বিলেত থেকে বড় ডিগ্রি নিয়ে এসেছে এইবার বোধহয় দুঃখ ঘুচবে। দিল্লীর কোন বড় কলেজে নাকি চাকরিরও কথাবার্তা চলছে। এইবার একটি মনোমত বউ পেলেই নিজের স্বপ্নের ছাঁচে আবার আলাদা সংসার পাতবে সে। আঁটকুড়ো ভাজের মুখঝামটা আর সহ্য করতে হবে না। একটা ব্যাপারে কিন্তু টুসি মনে মনে শঙ্কিত হয়েছে। বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর টুবলু তার সঙ্গে কথা কয় না। অধিকাংশ সময় বাড়িতেই থাকে না। অধিকাংশ দিনই বাড়ির বাইরে খায়, হোটেলে, কিংবা বন্ধুদের বাড়িতে। টুসির মনে হয় টুবলু হঠাৎ যেন তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। কি হয়েছে ছেলের? কিছুই বুঝতে পারে না টুসি। সর্বদাই অন্যমনস্ক। মুখের ভাবভঙ্গী ভালো নয়, কোন কথা জিগ্যেস করতে ভয় করে। শশীনাথবাবুর কাছে অনেক মেয়ের ফোটো এসেছে। টুসি সব ফোটোই টুবলুকে দিয়েছে, টুবলু একনজর মাত্র দেখে রেখে দিয়েছে সেগুলো টেবিলের উপর। পছন্দ হল কি না বলেনি। টেবিলের উপর ফোটোর স্তূপ জমে গেছে। কিন্তু টুবলুর মত পাওয়া যাচ্ছে না।

শশীনাথবাবু টুসিকে ডেকে বললেন, "এই সম্বন্ধটি ভালো মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকের পয়সাকড়ি আছে, নামও আছে। মেয়েটি বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। ভদ্রলোক লিখেছেন সুশ্রী। ফোটো পাঠাতে লিখব? কিংবা টুবলু যদি দেখতে চায় ভদ্রলোককে লিখি মেয়ে নিয়ে আসুন। তুই জিগ্যেস করদিকি টুবলুকে—"

"আমি জিগ্যেস করতে পারব না দাদা। তুমিই বরং কর। বিলেত থেকে ফিরে এসে ও বড্ড বেশী গম্ভীর হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে। অধিকাংশ দিন তো বাড়িতে খেতেই আসে না—"

"আচ্ছা, আমিই জিগ্যেস করব—"

সেই দিনই বিকেলে টুবলু যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল শশীনাথ ধরলেন তাকে।

'টুবলু, শোন। এইবার তোমার বিয়ের একটা ঠিক করতে হবে, তোমার মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সম্বন্ধও এসেছে অনেকগুলি। তোমার মত না পেলে উত্তর দিতে পাচ্ছি না কাউকে।"

"আচ্ছা ভেবে দেখব"—বলে টুবলু বেরিয়ে গেল।

ছিটকে বেরিয়ে এল শশীনাথের চোখ দুটো। গালের আর থুতনির মাংস থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল।

ব্রজেন্দ্রনাথ যাহোক একটা উত্তরের প্রত্যাশা করেছিলেন। উত্তরটি পেলেন পনেরো দিন পরে। শশীনাথের হাতের লেখা ক্ষুদি ক্ষুদি এবং দুষ্পাঠ্য। এই হস্তাক্ষরে জোলো কালিতে তিনি লিখেছেন—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার বারো তারিখের পত্র পাইয়াছি। আমার ভাগিনেয়র অনেক সম্বন্ধ আসিয়াছে। এত আসিয়াছে যে আমরা সামলাইতে পারিতেছি না। ফোটোর স্তূপ, ঠিকুজির গোছা। সব মেয়েই সুন্দরী। একটি মেয়ে গতবৎসর নফর-নগরশ্রী হইযাছিল। বিশ্ববার্তা পত্রিকায় তাহার প্রতিকৃতি সম্ভবত দেখিয়া থাকিবেন। আপনি আপনার মেয়ের ফোটো পাঠান নাই। না পাঠাইয়া ভালোই করিয়াছেন, কারণ আমার ভাগিনেয় ফোটোর সংখ্যা দেখিয়া সম্ভবত ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেই একটিমাত্র উত্তর দিতেছে—পরে ভেবে বলব। এ অবস্থায় আমি কি করব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই আপনাকে অনুরোধ আপনি মাসখানেক পরে আর একবার খোঁজ করিবেন। নমস্কারান্তে—

ভবদীয়

শ্রীশশীনাথ ভট্টাচার্য।

ব্রজেন্দ্রনাথকে আর চিঠি লিখতে হল না। শশীনাথের চিঠি পাওয়ার দিন সাতেক পরে বড় ছেলে নরেনের চিঠি পেলেন তিনি। নরেন লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আপনাকে যে ডি. লিট. পাত্রটির কথা লিখেছিলাম তার মামাকে কি চিঠি লিখেছেন? যদি না লিখে থাকেন আর লিখবেন না। কাল টুবলুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বললে বাধ্য হয়ে তাকে দিল্লীর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করতে হচ্ছে। এই প্রভাবশালী

ব্যক্তিটির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে নাকি খুবই দহরম-মহরম। তিনি টুবলুকে বলেছেন সে যদি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে তিনি তাকে ক্লাস ওয়ান সার্ভিস পাইয়ে দেবেন। টুবলু দুটি কারণে ইতস্তত করছিল। প্রথম, মেয়েটি অবাঙালী। দ্বিতীয়, দেখতে খুব খারাপ। কালো, বেঁটে এবং মোটা। বয়সও অনেক, টুবলুর চেয়ে বোধহয় বড়ই হবে। টুবলুর চার পাঁচ জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু কোথাও তার চাকরি হয়নি, সে হিন্দু বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে এইটেই তার মস্ত অপরাধ! এমন কি বাংলাদেশেও তার দাবিকে অগ্রাহ্য করে একজন অবাঙালীকে নেওয়া হয়েছে। তাই সে ঠিক করেছে ওই প্রভাবশালী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করেই চারিটি যোগাড় করবে। যস্মিন্ দেশে যদাচার—এই তার মত। বেচারা মনে মনে কিন্তু বড্ড দমে গেছে। আমি অন্য পাত্রের সন্ধানে আছি। পেলেই জানাব। আপনি ও মা প্রণাম জানবেন। উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণত

নরেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ চিঠিটি হরমোহিনীকে দিলেন।

হরমোহিনী সংক্ষেপে মন্তব্য করলেন, মুয়ে আগুন।'

।। ছয়।।

চিঠিখানি পেয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলেন কয়েকদিন। বেশীদিন কিন্তু পারলেন না। নিজের তাগিদ তো ছিলই, হরমোহিনীও তাগিদ দিতে লাগলেন।

"তুমি যে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইলে। হরেন কয়েকটি ইন্‌জিনিয়ার ছেলের খবর দিয়েছিল তাদের চিঠি লেখ না—"

"যখন লাগবার লাগবে খুঁজতে হবে। চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না।"

"ভালো লাগছে না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ জানালার ভিতর দিয়ে বহুবার-দেখা ন্যাড়া আমড়া গাছটার দিকে চেয়ে রইলেন। সেদিন আর চিঠি লিখলেন না, তার পরদিন লিখলেন। হরেন তিনটি পাত্রের ঠিকানা পাঠিয়েছিল, তার মধ্যে প্রথম একটিকেই নির্বাচন করলেন তিনি, তার বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি দেখে। বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিটার প্রতি হরমোহিনীর তো বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছেই, তাঁর নিজেরও আছে। এ চিঠি লিখে তিনি ভাবলেন এর উত্তরটা আসুক, যদি লেগে যায় ভালোই, যদি না লাগে তখন বাকী দু'জনকে লেখা যাবে।

কিন্তু এর পর যে দুটো ঘটনা ঘটল, তাতে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। বাকী দু'জনকেও চিঠি লিখে ফেললেন। এদের একজনের উপাধি চক্রবর্তী। এ উপাধিটা তাঁর পছন্দ নয়, হরমোহিনীর তো নয়ই। হরমোহিনী বলেন যে তাঁদের দেশে চক্রবর্তী মানেই রাঁধুনী বামুন। হয়তো এ খবর ভুল, কিন্তু ওই ভুল আঁকড়েই হরমোহিনী বসে আছেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন। চক্রবর্তী, মজুমদার, রায় প্রভৃতি উপাধি ব্রজেন্দ্রনাথের পছন্দ নয় অন্য কারণে। ওসব উপাধি মুসলমান আমলে রাজানুগৃহীত ব্যক্তিদের দেওয়া হয়েছিল। সাহেবদের আমলে

এবং স্বাধীনতার আমলেও যে সব লোক খেতাব পেয়েছেন তাঁদের উপর তেমন শ্রদ্ধা নেই ব্রজেন্দ্রনাথের। তাই তির্যকভাবে মুসলমান রাজাদের দেওয়া খেতাবের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ তিনি। তাঁর এই মনোভাব হয়তো যুক্তিসম্মত নয়, কিন্তু মানুষ কি সব সময় যুক্তি মেনে চলে?

তৃতীয় যে পাত্রটির জন্যে তিনি চিঠি লিখলেন সেটির উপাধি মিশ্র। কেমন যেন বিহারী-বিহারী গন্ধ আছে উপাধিটাতে। তাঁর অনেক বিহারী বন্ধু আছেন, এমন কি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে মিশ্রও আছেন একজন—কিন্তু মিশ্র উপাধিধারী কাউকে জামাই করতে মন সরে না। ব্রজেন্দ্রনাথ শিক্ষিত লোক, কিন্তু কুসংস্কারমুক্ত নন। তবু তিনি এদের দু'জনকেও চিঠি লিখলেন, কারণ যে দুটি ঘটনা ঘটল তাতে বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি।

প্রথম ঘটনাটির অনুরূপ ঘটনা প্রায়ই আজকাল ঘটছে। কিন্তু এটি তাঁর বন্ধুর মেয়ের সম্পর্কে বলে তিনি একটু বেশী বিচলিত হলেন, হঠাৎ কে যেন তাঁর পিঠে একটা চাবুক মারল। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেপাল চাটুজ্যের মেয়ে এক বৈদ্য ছোকরার সঙ্গে পালিয়েছে! মেয়েটি আই. এ. পড়ছিল। যার সঙ্গে পালিয়েছে সে নন-ম্যাট্রিক।

দ্বিতীয় ঘটনাটি মর্মান্তিক নয়, সামাজিক দিক থেকে ভালোই, কিন্তু তবু ব্রজেন্দ্রনাথের মনকে তা নাড়া দিল। ঊষা একদিন কলেজ থেকে এসে বললে—"বাবা, নমিতার বিয়ের ঠিক হয়েছে। খুব সুন্দর ছেলে, এরোপ্লেনের গ্রাউণ্ড ইন্‌জিনিয়ার।" ঊষার চোখে মুখে যদিও হাসি ফুটে উঠেছিল তবু তার পিছনে এমন একটা কি ছিল যা দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যথিত হলেন মনে মনে।

হরমোহিনীকে না জানিয়েই তিনি মিশ্র এবং চক্রবর্তী পাত্রদের উদ্দেশে চিঠি লিখে দিলেন।

।। সাত।।

ইন্‌জিনিয়ার কমলকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নামও কে কে. বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরা নাম কুন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঁটে রোগা এবং খেঁকুরে প্রকৃতির লোক। ডিস্‌পেপসিয়ার রোগী। কোন এক সাপ্লাই আপিসের ক্ষমতাবান অফিসার ছিলেন, সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাঁর। তিনটি ছেলে, সাতটি মেয়ে। ছেলে তিনটির মধ্যে কমলকিশোরই ভালো এবং পুত্রদের মধ্যে কনিষ্ঠ। বড় ছেলে পুষ্পকিশোর থিয়েটার-বিলাসী, পাড়ার শখের থিয়েটারের পাণ্ডাগিরি করে। শিশির ভাদুড়ীর নিখুঁত নকল করে রসিকমহলে নাম কিনেছে। বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিল, পাস করতে পারেনি! দ্বিতীয় পুত্র পদ্মকিশোরের বিদ্যা ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত । তার প্রধান কাজ রকে বসে আড্ডা মারা এবং বাড়ির ফাইফরমাশ খাটা। সমস্ত রাজনৈতিক নেতা এবং সিনেমা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে তার জ্ঞান প্রগাঢ়। পাড়ার লোকের সন্দেহ তার নাকি হাতটানও আছে। কুন্দকিশোরবাবুরও সুনাম নেই। খুব ঘুষ নিতেন নাকি, কলাটা মুলোটাও ছাড়তেন না। মাইনে খুব বেশী ছিল না। মাইনের উপরই নির্ভর করে থাকলে তিনি পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দিতেও পারতেন না, কমলকিশোরকেও উচ্চশিক্ষাও দিতে পারতেন না। চাকরি থেকে রিটায়ার করবার পর তিনি ঠিক করেছিলেন যে তিনটি ছেলের বিয়ে দিয়ে যে অর্থ পাবেন তাতেই মেয়ে দুটির বিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু

এইখানেই তাঁর হিসাবে একটু গোলমাল হয়ে গেল। বড় ছেলে বিয়ে করতে চাইছে না, আর মেজ ছেলের ভালো সম্বন্ধও আসছে না। যা আসছে তা খেঁদি বুঁচি গোছের কুৎসিত মেয়ের দল আর তাদের অতিদরিদ্র পিতাদের মিনতিপূর্ণ চিঠি। কুন্দকিশোর বিরক্ত হয়ে শেষে ঠিক করেছেন যে ছোট ছেলের বিয়েই আগে দেবেন। ব্রজেন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে তিনি খুশী হলেন। কারণ সুন্দর গেঞ্জি মিলের নাম দেশের সকলেই জানে। ব্রজেন্দ্রনাথও স্বনামধন্য পুরুষ। এঁর সঙ্গে সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয় মনে করে তিনি নিম্নলিখিত চিঠিটি লিখলেন। বাড়িতে চিঠি লেখবার কাগজ ছিল না, এর জন্যে নূতন একটি প্যাডও কিনলেন তিনি। তাঁর মনে হল অমন একটি লোককে যা-তা কাগজে চিঠি লেখা ঠিক নয়।

নমস্কারান্তে নিবেদন,

মহাশয়, আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার পুত্র ইন্‌জিনিয়ার বটে। যে চাকুরি করিতেছে যদিও তাহা এখনও পাকা হয় নাই, কিন্তু পাকা হইবার ষোল-আনা আশা রাখি। তাহার বর্তমানে বেতন পাঁচশত পঁচাত্তর টাকা। ইহার মধ্যে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সও আছে। আপনার সহিত কুটুম্বিতা স্থাপিত হইলে অতিশয় আনন্দিত হইব। আপনি কন্যার পিতা, আপনার মনোভাব আমি বুঝিতে পারিতেছি। কারণ আমিও কন্যার পিতা। আমার সাত কন্যা। পাঁচটির বিবাহ দিয়াছি, দুইটি এখনও অবিবাহিতা। কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সুতরাং আয়ের পথ বন্ধ। কি করিয়া যে কন্যা দুইটিকে পার করিব তাহাই ভাবিতেছি। আপনার কি কোনও বিবাহ-যোগ্য পুত্র আছে? যদি পরিবর্তে সম্মত থাকেন, আপত্তি করিব না। আপনি জানিতে চাহিয়াছেন আমার বাড়িঘর আছে কিনা। খুলনা জেলায় বাড়িঘর ছিল, সেখানে এখন মুসলমানেরা বসবাস করিতেছে। অনেক লেখালেখি করিয়াও পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট হইতে আমার বাড়ির ন্যায্য মূল্য আদায় করিতে পারি নাই! কলিকাতায় ভাড়া বাড়িতে বাস করি। কিন্তু আমার ছেলে যখন ইন্‌জিনিয়ার তখন মনে হয় এইবার বোধহয় কোথাও মাথা গুঁজিবার মতো বাড়ি একটা হইবে। নিউ আলিপুর অঞ্চলে একটা জমির চেষ্টায় আছি।

এইবার আমার ছেলেদের কথা বলি। আমার তিন ছেলে। ইন্‌জিনিয়ার পুত্রটি সব চেয়ে ছোট। বড়ো দুইটির বিবাহ হয় নাই। তাহারা বিবাহ করিতে চাহিতেছে না। আজকালকার ছেলেরা এ বিষয়ে বড়ই অবাধ্য। তাই অগত্যা ছোট ছেলেরই আগে বিবাহ দিতেছি। আপনি যদি পরিবর্তে সম্মত থাকেন—জানি না আপনার বিবাহযোগ্য পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র আছে কি না—তাহা হইলে সব দিক দিয়াই সুরাহা হয়। আপনার কন্যার ঠিকুজি এবং ফোটো পাঠাইয়া দিবেন। ঠিকুজির মিল হইলে এবং ফোটো দেখিয়া কন্যা পছন্দ হইলে মেয়েকে সামনাসামনি একবার দেখিব। ফোটো দেখিয়া অনেক সময় ঠিক ধারণা করা যায় না। অন্যান্য কথাবার্তাও তাহার পর হইবে। আমার সাদর নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীকুন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ চিঠিখানি পড়ে হরমোহিনীকে ডাকলেন—"ওগো শুনছ, চিঠি এসেছে—"

হরমোহিনী পাশের ঘরে ছিলেন, হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

"কার চিঠি, বরেনের?"

কয়েকদিন বরেনের চিঠি না পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছেন হরমোহিনী। তাঁর ইচ্ছা তাঁর প্রত্যেক ছেলে তাঁকে রোজ চিঠি লিখুক। ছেলেরা না লিখলে বউরা লিখুক। কিন্তু কেউ লেখে না, লেখা সম্ভবই নয়। কিন্তু হরমোহিনীর মাতৃ-হৃদয় কোনও যুক্তির তোয়াক্কা করে না। দুদিন চিঠি না পেলেই তাঁর মনে হয় নিশ্চয় কারও অসুখ করেছে, কিংবা অন্য কোন বিপদ হয়েছে। আরও মুশকিল, তিনি একজন স্বপ্ন-একস্‌পার্ট। চোখটি বুজলেই স্বপ্ন দেখেন। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন। ঘুম ভেঙেই তাঁর মনে হয় মা মঙ্গলচণ্ডী স্বপ্নদূত পাঠিয়ে তাঁকে সাবধান করছেন। গতকল্য তিনি যে স্বপ্নটি দেখেছেন তা ভয়ানক, একটা মরা জানোয়ারকে শকুনিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সেই থেকে তাঁর মনে আর স্বস্তি নেই। নরেন আর হরেনের চিঠি এসেছে! কিন্তু বরেনের চিঠি অনেকদিন পাননি। হরমোহিনীর শাস্ত্রে শকুনের স্বপ্ন অত্যন্ত খারাপ, নিশ্চয়ই কোথাও কোনও অমঙ্গল হয়েছে, কিংবা হবে।

"না, বরেনের চিঠি আসেনি—"

"আসেনি? বরেন না হয় ডাক্তার মানুষ, রুগীটুগি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, শিউলি কি একলাইন চিঠি লিখতে পারে না? সমস্ত দিন করে কি!"

ব্রজেন্দ্রনাথ এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করলেন না। ইতিপূর্বে বহুবার তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে তাঁর কাছে ঘন-ঘন চিঠি পাওয়াটা প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু ওদের পক্ষে ঘন ঘন চিঠি লেখাটা তেমন প্রয়োজনীয় নয়। প্রয়োজনটা যেখানে একতরফা সেখানে একরকম অসঙ্গতি মাঝে মাঝে ঘটবেই। এসব বিষয়ে অশিক্ষিতদের মনোভাবটাই ভালো মনে করেন তিনি। ওরা প্রবাসী আত্মীয়স্বজনদের চিঠি প্রায় পায় না, না পেলে চিন্তিতও হয় না, বরং চিঠি এলে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। হঠাৎ চিঠি এল কেন? নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ আছে! এসব কথা হরমোহিনীকে অনেকবার বলেছেন তিনি, কোনও ফল হয়নি। এখন আর ও নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে প্রবৃত্তি হল না তাঁর।

"বরেনের চিঠি কাল বা পরশু আসবে। তাব চেয়েও দরকারী চিঠি এসেছে একটা—তোমরা সেই বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্‌জিনিয়ার পাত্রটির বাবার চিঠি—"

চিঠিটি পড়ে শোনালেন। তারপর নিজের মনের ভাব চেপে রেখে বললেন, "পাত্রটিবে তো ভালোই মনে হচ্ছে। ঠিকুজি আর ফোটো পাঠিয়ে দেব? ঊষার ভালো ফোটো আছে কি?"

এইবার হরমোহিনী বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ওই পাত্রের সঙ্গে ঊষার বিয়ে দেবে? সাত-সাতটা ননদের আর দু'দুটো হুমদো আইবুড়ো ভাশুরের ধাক্কা সামলাতে পারবে তোমার মেয়ে? তাছাড়া ঘরবাড়িও নেই। ওই ছোট ছেলেটিই সম্বল। ওকে ভাঙিয়েই আইবুড়ো মেয়ে দুটো পার করবে। ওখানে আমি ঊষার বিয়ে দেব না—"

ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরেরই এই অবস্থা। ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।"

"তা যাক্। তবু ঠগের হাতে মেয়ে দিতে পারব না।"

।। আট।।

হরিহর মিশ্র লোকটিও হিসাবী। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি হিসাব করে জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বোর্ডিং-এ মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে মাত্র পাঁচ টাকা হাত-খরচ দিতেন। এই পাঁচ টাকার মধ্যেই সব রকম করতেন তিনি। সিনেমা দেখতেন, থিয়েটার দেখতেন, চপ কাটলেট খেতেন, ভীম নাগের সন্দেশেরও রসাস্বাদন করতে ছাড়তেন না। কিন্তু এগুলি করতেন মাসে একবার করে। বাকী দিনগুলি কাটাতেন ছোলা ভিজে বা মুড়ি খেয়ে। সেকালে সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল বলে পাঁচটাকাতেই কুলিয়ে যেত। ওভারশিয়ার হয়েছিলেন। অনেক কাঁচা পয়সা রোজগার করেছেন, কিন্তু বাড়াবাড়ি রকম বেসামাল হননি কখনও। মদ খেয়েছেন, কিন্তু প্রায়ই পরের পয়সায় এবং লোভের মুখে রাশ টেনে। নারী-মাংসের লোভেও বেপাড়ায় যে মাঝে মাঝে ঘোরাঘুরি করেনি তা নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। পা পিছলে পড়ে গিয়ে কেলেঙ্কারি করেননি কখনও। তুখোড় ছেলে, চৌকোশ মাল এই সব নামে বন্ধুমহলে খ্যাত ছিলেন। বেশ মোটা পণ নিয়ে বিয়ে করেছিলেন। পণের দিকটা ভারী ছিল বলে বধূর দিকটা হালকা হয়ে গিয়েছিল। হরিহর-পত্নী ছিলেন কালো, রোগা এবং কুশ্রী। মুখের মধ্যে চোখ দুটিই ছিল আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল। যক্ষ্মারোগের এটি একটি লক্ষণ নাকি। বিয়ের আগে মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। জ্বরও হচ্ছিল রোজ। টাকার জোরে কন্যার পিতা এই মেয়েকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন হরিহর মিশ্রের ঘাড়ে। টাকার লোভে অন্ধ হয়ে হিসাবী হরিহরও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এই বেহিসাবী কাজটি করে ফেললেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁর একটি মাত্র পুত্রের জন্ম হয়। তার জন্ম দেবার পর হরিহরের স্ত্রী আর বাঁচেননি। এক স্যানাটোরিয়মে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তিনি।

হরিহরও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেননি। শ্বশুরের তিনি নামকরণ করেছিলেন "জোচ্চোর'। নবজাত শিশুটিকে তাঁর শ্বশুর নিয়ে যেতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু হরিহর দেননি। নিজেই মানুষ করেছিলেন তাকে এক 'ওয়েট্ নার্স'-এর সাহায্যে। ওয়েট্ নার্স মেম নয়, বাঙালীও নয়, এক বিহারবাসিনী কাহারনী। মেয়েটি ওভারশিয়ার হরিহরের অধীনে একদা মজুরনীর কাজ করত। তার স্বামী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ওকে একদিন ফেলে পালায়। পালাবার দিনকতক পরে ছেলে হয় ওর একটি। ছেলেটিও বাঁচেনি। এই সময় হরিহর ওর কোলে তাঁর শিশুপুত্র জলধরকে তুলে দেন। সেই থেকে ওর নূতন নামকরণ হল জলধরের মা। এই জলধরের মা-ই এখন হরিহরের গৃহের কর্ত্রী। হরিহরের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ঠিক কতটা ঘনিষ্ঠ তা বাইরে থেকে নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু এ কথাটা মানতেই হবে হরিহর তাঁর কর্তব্য থেকে একচুলও নড়েননি। প্রাণ দিয়ে ছেলেটিকে মানুষ করেছিলেন। বরাবরই তিনি হিসাবী লোক। ছেলেটির শৈশব থেকেই তার জন্য টাকা জমাবার নানারকম ব্যবস্থা করতে ভোলেননি। Fixed deposit, সেভিংস ব্যাঙ্ক, পোস্টাল সার্টিফিকেট, ইন্‌সিওরেন্স এসব তো করেই ছিলেন, ছেলের নামে লটারির টিকিটও কিনতেন প্রায়ই। একটা লটারিতে মোটা রকম টাকাও পেয়েছিলেন। তাঁর নিজের জীবন অর্থাভাবের মধ্যে কেটেছিল, টাকার অভাবেই তিনি ইন্‌জিনিয়ারিং পড়তে পারেননি। সেইজন্য তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল জলধর যেন কখনও এ কৃচ্ছ্রতার কবলে না পড়ে। স্কুলজীবন থেকেই ভালো গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন জলধরের জন্য। বাইরে গৃহশিক্ষক

তাকে পড়াত আর ভিতরে ওই অশিক্ষিতা কাহারনী বসে বসে উৎকর্ণ হয়ে শুনত ঠিকমতো পড়ানো হচ্ছে কি না।

জলধরের মা না থাকলে জলধর হয়তো মানুষ হত না। তার নিজের মা বেঁচে থাকলে তার জন্য এতটা করত কিনা সন্দেহ।

একদিন কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়ল। জলধর তখন ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে সবে ঢুকেছে, মুখ দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক রক্ত উঠল তার। হরিহর আর কালবিলম্ব করলেন না, তাকে নিয়ে সোজা সুইটজারল্যাণ্ড চলে গেলেন। জলধরের মা-ও সঙ্গে গেল। জলের মতো টাকা খরচ হল, কিন্তু সেরে গেল জলধর। হরিহর তাকে আর এদেশে নিয়ে এলেন না, লণ্ডনেই সে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়তে লাগল। হরিহর দেশে ফিরে এলেন জলধরের মাকে নিয়ে। দেশে ফিরে এক বছর পরে জলধরের মা পড়ল অসুখে। ডাক্তাররা সন্দেহ করতে লাগলেন তারও যক্ষ্মা হয়েছে। কিছুদিন পরেই মারা গেল সে। তাকে সুইটজারল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়ার মতো আর টাকা ছিল না হরিহরের।

যথাসময়ে জলধর বিলেত থেকে ইন্‌জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এল। বড় চাকরিও পেল একটা। এর পর হরিহর বিয়ে দেবার আয়োজন করতে লাগলেন ছেলের। হিসাব করে এবং সব দিক বাঁচিয়েই আয়োজন করলেন।

প্রথমত সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সেই ডাক্তারকে চিঠি লিখলেন যে জলধরের এখন বিয়ে দেওয়া যেতে পারে কি না। তার শরীরে রোগের আর কোন লক্ষণ নেই, ওজন কমেনি, বরং বেড়েছে। ডাক্তার মত দিলেন। ভারতবর্ষের কয়েকজন নামজাদা ডাক্তারেরও অভিমত নিলেন তিনি। তাঁরাও আপত্তি করলেন না।

এরপর তিনি শরণাপন্ন হলেন জ্যোতিষীর। তারা বললে ছেলে আপনার দীর্ঘায়ু নয়। কিন্তু ওর যদি এমন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন যার পতির দীর্ঘায়ুযোগ আছে অর্থাৎ যার সপ্তম, চতুর্থ স্থান এবং চন্দ্র শুক্র খুব ভালো তাহলে ভয় নেই।

জলধর বিয়ে করতে চায়নি, কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হল যখন হরিহর বললেন, তুমি আমার একমাত্র পুত্র। তুমি যদি বিয়ে না কর তাহলে আমার বংশলোপ হয়ে যাবে।

জলধর উত্তর দিলে— বেশ, তাহলে করব। কিন্তু একটি শর্ত আছে—আমার যে অসুখ করেছিল তার বিবরণ কন্যাপক্ষদের আগে জানাতে হবে। অসুখের খবর লুকিয়ে আমি বিয়ে করতে পারব না।

হরিহরও এতে রাজী হলেন। তিনি জানতেন দু'চারজন মেয়ের বাপ হয়তো এ খবর পেয়ে পেছিয়ে যাবে, কিন্তু যে দেশে মৃত্যুপথযাত্রী স্থবিরের গলাতেও বধূরা মালা দেয়, যে দেশে টাকার লোভে যে কোনও পাষণ্ডকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয় মেয়েরা, সে দেশে জলধরের মতো পাত্রের জন্য মেয়ের অভাব হবে না।

হরিহরকে পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপনও দিতে হয়নি। খবরটা মুখে মুখে চাউর হয়ে পড়াতেই অনেক পাত্রীর খবর পেয়ে গেলেন তিনি। সব মেয়ের বাপকেই এক উত্তর দিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথও যথাসময়ে উত্তর পেলেন।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পেলাম। এ বিষয়ে অগ্রসর হবার আগে প্রথমেই আপনাকে একটি কথা জানাতে চাই। আমার ছেলের দশ বছর আগে যক্ষ্মা হয়েছিল। তাকে আমি সুইটজারল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলাম চিকিৎসার জন্য। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। সেখানকার ডাক্তাররা এবং এদেশের বড় বড় ডাক্তাররা বলেছেন যে ও এখন স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে, কোন বাধা নেই। এ খবর জেনেও আপনি আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন কি না। যদি প্রস্তুত থাকেন তাহলে আপনার মেয়ের জন্ম-তারিখ, জন্মসময় এবং ঠিকুজি থাকলে ঠিকুজিও পাঠাবেন। মেয়ের ঠিকুজি যদি আমার জ্যোতিষীর মনোমত হয় তবেই আমি এ বিষয়ে অগ্রসর হব। আমার নমস্কার জানবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীহরিহর মিশ্র।

চিঠিটা পড়ে ব্রজেন্দ্রনাথ মনে মনে বললেন, বোগাস্। হরিহরের জীবনবৃত্তান্ত জানলে হয়তো একথা বলতেন না। হরিহর যে কৃতী পুরুষ তার একটা প্রমাণ কিন্তু পেলেন তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে। আমাদের সমাজে কৃতী পুরুষদেরই শত্রু থাকে, বাঘের পিছনে যেমন ফেউ। হরিহরবাবুর চিঠি পাওয়ার দিন দুই পরেই আর একটি চিঠি এল। চিঠির উপরে লেখা—

কন্‌ফিডেনশ্যাল।

প্রিয় ব্রজেন্দ্রবাবু,

আমি আপনার জনৈক হিতৈষী বলিয়া আপনাকে এই পত্র দিতেছি। শুনিলাম আপনার কন্যার সহিত হরিহরবাবুর ইন্‌জিনিয়ার পুত্র জলধরের বিবাহের কথা আপনি পাড়িয়াছেন। মহাশয়, কদাচ ওখানে বিবাহ দিবেন না। ছেলেটি তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জন্মে নাই। তাহার জন্ম হইয়াছে এক ছোটলোক মজুরনীর গর্ভে। ইহা ছাড়া আরও গোল আছে, ছেলেটি যক্ষ্মারোগী। এ বিষয়ে তৃতীয় সংবাদটি দিয়া পত্র শেষ করিব। হরিহর লোকটি চামার, পয়সা-পিশাচ। আপনার জ্ঞাতার্থে পত্র লিখিলাম। নমস্কার জানিমেন। আশা করি কুশলে আছেন। ইতি—

আপনার জনৈক হিতৈষী বন্ধু।

এই চিঠি পড়ে ব্রজেন্দ্রনাথের বাঙালী-চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান আর একটু বাড়ল। কিছুদিন আগে তাঁর বাগান থেকে ফুলগাছ চুরি করেছিল বাঙালী কয়েকটা ছোঁড়া। তারাই যে নিয়েছে এ হদিসও দিয়েছিল আর একদল বাঙালী ছোঁড়া। সে সময় সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালীর নীচতার কিছু পরিচয় পেয়েছিলেন। আজ আবার নূতন রকম আর একটা পেলেন।

হরমোহিনীকে এ দুটি চিঠির কথা আর জানালেন না তিনি। বরেনের চিঠি পেয়ে তাঁর মনের শান্তি ফিরে এসেছিল, সেটা আর বিঘ্নিত করতে ইচ্ছা হল না তাঁর।

।। নয়।।

পার্থ-বিক্রম চক্র-বর্তী খুবই আধুনিক-মনা লোক। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের নকল করে আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি ইনি ত্যাগ করেছেন। নামের আগে 'শ্রী' লেখেন না। তাঁর বন্ধু

গনেশ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ''পূর্বপুরুষদের শ্রী-কে বিদায় করে দিলেন কেন?'' চক্রবর্তী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, ''ওতে অহংকার প্রকাশ পায়। নিজেই নিজেকে শ্রীমান্ বলাটা অশোভন নয় কি!'' গণেশও ছাড়বার পাত্র না, সে বললে, ''তাহলে তোমার ওই পার্থ-বিক্রম চক্রবর্তী নামটাও বদলে ফেলা উচিত। তোমার পার্থ-বিক্রমও নেই, তুমি সত্যিকার চক্রবর্তীও নও। ও নাম বদলে তাহলে নিজের নাম রেখে দাও ছুঁচোর গোলাম চামচিকে—'' চক্রবর্তীও হটবার লোক ছিলেন না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ''ওর আর একটা দিক আছে। আমাদের 'শ্রী'টা বিলিতি 'মিস্টার'-এর অনুরূপ। নিজের নামে কেউ মিস্টার যোগ করে লেখে না ইংরাজিতে।'' গণেশ উত্তর দিয়েছিল, ''তুমি ভুলে যাচ্ছ ভায়া ইংরিজি মিস্টার সৃষ্টি হবার ঢের আগে আমাদের 'শ্রী' মূর্তিমতী হয়েছেন, শুধু আমাদের নামের গোড়ায় নয়, আমাদের লক্ষ্মীতে, আমাদের সরস্বতীতে, আমাদের সারাজীবনে। শ্রীকে বাদ দিয়ে দিলে আমাদের সভ্যতার অনেকখানিই বাদ দিতে হয়।''

তর্ক আর বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। পার্থ-বিক্রম অবশ্য গণেশের কথায় নিজের নামের গোড়ায় আর শ্রীকে যোগ করেননি। কারণ তিনি আধুনিক। তিনি জানেন এ যুগে আধুনিকতার ছাপ না থাকলে কোনও আধুনিক সমাজে কলকে পাওয়া অসম্ভব। তিনি তাঁর যৌবনকাল থেকেই আধুনিক সমাজে কলকে পাওয়ার জন্য সমুৎসুক। আধুনিক কথাটা অবশ্য আমি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করছি যার নির্গলিতার্থ সাহেবিয়ানার নকল করা। পার্থ-বিক্রম বাইরে স্যুট এবং বাড়িতে ঝোলা পা-জামা পবেন, চাকরকে 'বয়' বলে ডাকেন, সাহেবী খানা খান সাহেবী কেতায়, বাড়িতে রান্না করে বাবুর্চি, গৃহিণী বা মৈথিল ঠাকুর নয়। গৃহিণী আর কন্যা বেড়িয়ে বেড়ান সভায় সভায়, পার্টিতে পার্টিতে. তাঁদের ফোটো কাগজে বেরোয়, তাঁদের গানের নাচের এবং শিল্পবোধের তারিফ করেন পাইপ-কামড়ে-ধরা মুখে প্রৌঢ় রসিকরা। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে পার্থ-বিক্রম নমস্কার করেন না, বলে ওঠেন 'হ্যালো', যখন তাঁরা বিদায় নেন তখনও প্রণাম বা নমস্কার করেন না, বাঁ হাতটা ঈষৎ উত্তোলন করে বলেন, 'টা টা বাই বাই'। মেয়ের নাম 'জিপ্‌সি'। ছেলের নাম চাকু, এটা চক্রবর্তীরই অপভ্রংশ বোধহয়। ওরা সবাই সোসাইটি ক্রিচার। আমোদের স্রোতে ভাসতে চায় কিন্তু নাকানিচোবানি খায় আন্তরিকতাহীন ন্যাকামির আবর্তে। তা থাক, ওতেই ওরা খুশী।

পার্থ-বিক্রম বহুকাল আগে বিলেত গিয়েছিলেন শ্বশুরের টাকায় এবং সেই সময় আলাপ হয়েছিল সেই সব লোকেদের সঙ্গে যাঁরা আজকাল ভারত-ভাগ্য-বিধাতা। ভারত ভাগ্য-বিধাতারা অনেক বিষয়েই নিষ্প্রভ কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব-প্রীতির জলুসটা চোখ-ধাঁধানো। তাই এই স্বাধীনতার বাজারে পার্থ-বিক্রমের সুবিধা হয়েছে অনেক। যদিও তিনি খবরের কাগজের ফ্রন্ট-পেজ-বিহারী হোমরাচোমরা নন, কিন্তু নেপথ্যে থেকেও তিনি যা গুছিয়ে নিয়েছেন তা-ও নিন্দনীয় নয়। বিলেত থেকে যে ব্যারিস্টারি ডিগ্রিটা এনেছিলেন (ঠিক এনেছিলেন কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে অনেকের) সেটা কিন্তু কাজে লাগেনি। পারমিটের নৌকা বেয়েই তিনি ঐশ্বর্যের যে সমুদ্রে পৌছতে পেরেছেন তা অগাধ। তাঁর বিশ্বাস আচারে-ব্যবহারে চোস্ত আধুনিকতাই তাঁর উন্নতির কারণ।

তিনি প্রায় খোলাখুলিই বলেন যে গান্ধীজীর নীতি এবং উপদেশ এ যুগে অচল। তা যদি

তিনি অনুসরণ করতেন—যা কিছুকাল তিনি করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং এখনও দরকার পড়লে যা তিনি থিয়েটারে অভিনয় করার মতো মাঝে মাঝে করেন—তাহলে বড়জোর একটা আশ্রম করতে পারতেন কিংবা কোন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি পদ অলংকৃত করতেন। তিনি আজ যে ধনকুবের হয়েছেন তা স্বপ্নেরও অতীত থেকে যেত তাঁর কাছে। আর কালোবাজারই তাঁর জীবনে আলো এনেছে। এই কালোবাজারে তাঁর হাতের টর্চ হয়েছেন হোমরাচোমরা গভর্নমেণ্ট অফিসাররাই এবং তাঁর ধারণা নিখুঁত আধুনিকতার ফাঁদেই এই সব অফিসাররা ধরা পড়েছিলেন। ঘুষের জোরে সবটা হয়নি।

জিপ্‌সি অনেককে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রীর অমায়িকতা, অভিনয়-কুশলতা এবং প্রসাধন-পটুতাও কম সাহায্য করেনি। এঁরা যদি পর্দানশীন হতেন বা সাধারণ গৃহস্থ মেয়েদের মতো অনগ্রসর হতেন তাহলে হয়তো পার্থ-বিক্রম যা হয়েছেন তা হতে পারতেন না। বর্তমানে তাঁর প্রভাব বিরাট অক্টোপাসের মতো, বহু লোকের এবং বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। এঁর ছেলের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হবে সে যে রাজরানী হবে তাতে সন্দেহ নেই।

ছেলেটির নিজের যোগ্যতাও কম নয়, সে আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং জার্মানি—এই তিন দেশ ইন্‌জিনিয়ারিং পড়ে ভালো ডিগ্রি এনেছে। ইচ্ছে করলেই সে খুব বড় চাকরি পেতে পারত, কিন্তু চাকরি করার রুচি তার নেই। সে ব্যবসা করতে চায়। ছেলেটির আর একটি বৈশিষ্ট্যও বিব্রত করেছে আধুনিকতা বাতিকগ্রস্ত পার্থ-বিক্রমকে। সে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে বিলাতী প্রথায় কোর্টশিপ করে সে বিয়ে করবার পক্ষপাতী নয়, সে চিরাচরিত হিন্দু প্রথায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে পিতামাতার নির্বাচিত মেয়েকেই বিয়ে করবে। সে যদি মার্কিন, লণ্ডনী বা জার্মান বউ ঘরে আনত পার্থ-বিক্রম বিচলিত হতেন না, সে যদি পারসী কোটিপতি অমুকের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইত সে ব্যবস্থাও তিনি অনায়াসে করতে পারতেন। তাঁর মেয়ে জিপ্‌সি অনেকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়ে শেষে এখন ঠিক করেছে এক লক্ষপতি সিন্ধি বিড়িব্যবসায়ীর গলায় মালা দেবে—পার্থ-বিক্রম আপত্তি করেননি। কিন্তু চাকুর প্রস্তাব শুনে ঘাবড়ে গেলেন তিনি। তাঁর অমন হীরের টুকরো ছেলের উপযুক্ত সহধর্মিণী কি তিনি পচা পুরানো এঁদো ঘুণ-ধরা হিন্দুসমাজে খুঁজে পাবেন? রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ওর উপযুক্ত মেয়ে আছে কি! সত্যিই তিনি বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও তিনি আধুনিকতার উপাসক তবু তাঁর মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে সেকেলে কর্তার ভূত বেঁচেছিল একটা, পিতৃ-অধিকারের দাবি জানিয়ে সে বলতে চাইছিল, আধুনিক যুগে আধুনিক কায়দায় চলতে হবে তোমাকে এই আমার ইচ্ছা এবং আদেশ।

কিন্তু স্বল্পবাক তীক্ষ্ণ-নাক তিন-তিনটে বিলিতী ডিগ্রিওলা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছা বা আদেশ কোনটাই জাহির করতে পারলেন না। এ-ও তাঁর মনে হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই যখন আধুনিকতার বীজ-মন্ত্র তখন ছেলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্মান না করলে হয়তো তিনি ধর্মচ্যুত হবেন। নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা তাঁর মনে জাগল না। নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জাহির করে যদি তিনি বলতে পারতেন, তোমার জন্যে ঐ পচা হিন্দুসমাজে আমি মেয়ে খুঁজতে পারব না, তুমি নিজেই খুঁজে নাও গিয়ে—তাহলে সেটা তাঁর তথাকথিত আধুনিক মনোভাবের সঙ্গে খাপ খেয়ে যেত, কিন্তু তবু তিনি পারলেন না।

আসল কথা ছেলেকে তিনি ভয় পান, মেয়েকেও। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস তাঁর নেই। তাই আধুনিকতা-বিরোধী এই ভীরুতাকে তিনি নিজের কাছেই আমল দিলেন না শেষ পর্যন্ত। অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সারাজীবন যা করেছেন এবার তাই করে ফেললেন, মুখোশ পরে ফেললেন একটা। সোৎসাহে বন্ধুমহলে বলে বেড়াতে লাগলেন— চাকুই হচ্ছে মনে-প্রাণে স্বদেশী, এত দেশ ঘুরে এলো, কিন্তু গায়ে আঁচড়টি লাগেনি, বুঝলে। ওর জন্যে একটি খাঁটি দেশী মেয়ে খুঁজে বার করতে হবে। শুনলে বিশ্বাস করবে না, ও এখনও খেতে বসে গণ্ডুষ করে। কোনদিন হয়তো টিকি রেখে বসবে—আই শাণ্ট বি সারপ্রাইজ্ড। ওর মনের মতো একটি পাত্রী খুঁজতে হবে। ভেবেছিলেন পাত্রীর জন্যে বিজ্ঞাপন দেবেন একটা। কিন্তু তার দরকার হল না। মুখে মুখেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল এবং তার ফলে এত চিঠি আসতে লাগল যে বিব্রত পড়লেন পার্থ-বিক্রম। প্রত্যেক লোকের সঙ্গে পত্রালাপ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল তাঁর পক্ষে। তাই তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় বার করে ফেললেন একটা। হাজারখানেক চিঠি আর হাজারখানেক ফর্ম ছাপিয়ে ফেললেন। চিঠিটি নিম্নলিখিতরূপ ঃ

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পেয়েছি। একটি ফর্ম পাঠাচ্ছি সেটি ভরে পাঠাবেন। যদি এক মাসের মধ্যে উত্তর না পান জানবেন, আপনার আবেদন গ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি। নমস্কার গ্রহণ করুন্। ইতি—

ভবদীয়
পার্থবিক্রম চক্রবর্তী।

প্রথম কয়েকখানা চিঠিতে নিজে হাতেই সই করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা-ও আর পেরে উঠলেন না, নিজের সইয়ের রবার স্ট্যাম্প করিয়ে নিলেন একটা।

ফর্মটি নিম্নলিখিতরূপ—

(১) পাত্রীর নাম
(২) পাত্রীর পিতামাতার নাম
(৩) পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের পরিচয়
(৪) পাত্রীর বয়স
(৫) পাত্রীর লেখাপড়ার বিবরণ—স্কুল ও কলেজের নাম।
(৬) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোন্‌গুলিতে পারদর্শিতা আছে—
(ক) কণ্ঠসংগীত (খ) বাদ্যযন্ত্র (গ) রন্ধন (ঘ) চিত্রাঙ্কন (ঙ) নৃত্য (চ) সেলাইয়ের কাজ
(ছ) বাটিকের কাজ (জ) উল বোনা (ঝ) আলপনা দেওয়া (ঞ) চামড়ার কাজ।
(৭) পাত্রীর গায়ের বর্ণ কিরূপ
(৮) পাত্রীর উচ্চতা কত
(৯) পাত্রীর কোমরের ও বুকের মাপ
(ফিতা দিয়া মাপিয়া পাঠাইতে হইবে)
(১০) মাথার চুলের ঘনত্ব এবং দৈর্ঘ্য কত, চুলের ডগা কিরূপ

(১১) ওজন

(১২) স্বাস্থ্য কেমন? ইতিপূর্বে কি কি রোগে ভুগিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১৩) পা পাতিলে পায়ের নীচে ফাঁক থাকে কি না

(১৪) দাঁত কেমন

(১৫) টেনিস, ব্যাডমিণ্টন বা অন্য কোন আউটডোর খেলায় দক্ষতা আছে কিনা

(১৬) টিকিট সংগ্রহ, অটোগ্রাফ সংগ্রহ বা ওই জাতীয় কোন বাতিক আছে কি? পাত্রীর যদি কোন 'হবি' (hobby) থাকে এখানে তাহা বিবৃত করুন।

এই ফর্মটির সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিসগুলিও পাঠাইতে হইবে

(ক) দুইটি ফোটো ঃ—একটি ফ্রণ্ট ফেস, আর একটি প্রোফিল।

(খ) পাত্রীর ঠিকুজি।

(গ) সম্ভব হইলে একজন রেজিস্টার্ড অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বিবাহে যাহা খরচ করিতে পারিবেন তাহার পরিমাণ জানাইবেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ এতটা প্রত্যাশা করেননি। বিস্মিত এবং ঈষৎ আতঙ্কিত হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি ওই চিঠি এবং ফর্মের দিকে। বাঙালীদের যে এত দ্রুত অধঃপতন হয়েছে তা তিনি ভাবতে পারেননি। একবার তাঁর মনে হল তাঁর 'কিউরিও'-সংগ্রহের মধ্যে ওগুলো রেখে দেবেন, কিন্তু পরক্ষণেই ঘৃণা হল। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন চিঠি দুটো। তাতেও তৃপ্তি হল না, সেগুলোকে একত্রিত করে পুড়িয়ে ফেললেন। তারপর ভিতর গিয়ে বাথরুমে ঢুকে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন।

ব্রজেন্দ্রনাথকে অসময়ে বাথরুম থেকে বেরুতে দেখে হরমোহিনী বললেন, "হঠাৎ বাথরুমে গেছলে যে? পেট ভাল আছে তো? যখন খেতে আরম্ভ কর তখন তো আর জ্ঞান থাকে না—"

"সাবান দিয়ে হাতটা ধুতে গিয়েছিলাম—"

"হঠাৎ সাবান দিয়ে হাত-ধোওয়া কেন?"

"এমনি—"

ব্রজেন্দ্রনাথ হরমোহিনীর কাছে আর কথাটা ভাঙলেন না। ভাঙলে আর এক চোট বকুনি খেতে হত। হরমোহিনী ওই চক্রবর্তী পাত্রকে গোড়াতেই নাকচ করেছিলেন।

।। দশ ।।

এই যখন অবস্থা, তখন উষার খবর কি? সে কি কিছু ভাবছে না এ বিষয়ে? তার ভাবনার কিছু খবর পাওয়া যাবে তার এই চিঠিখানা থেকে। চিঠিখানা সে লিখেছিল তার এক বিবাহিতা বান্ধবীকে। ছ'মাস আগে তার বিয়ে হয়েছে।

ভাই সুজাতা,

অনেকদিন পর তোর চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। তুই জানতে চেয়েছিস আমার বিয়ের

কিছু ঠিক হয়েছে কি না। এখনও কিছু শুনিনি। বাবা অনেক জায়গায় চিঠি লিখছেন। অনেক পুকুরে ছিপ ফেলছেন, অনেক নদীতে জাল। কিন্তু কিছু উঠেছে বলে এখনও শুনিনি। যে সব পাত্রের খবর মাঝে মাঝে শুনি তাদের অধিকাংশই বাজে বলে মনে হয়। কিন্তু বাবা যদি ওই পাত্রের মধ্যে কাউকে নির্বাচন করেন, মুখটি বুজে বিয়ে করতে হবে। 'না' যে বলতে পারি না, তা নয়, কিন্তু বাবার মনে কষ্ট দিতে পারব না। যদি অমত করি বাবা তা অগ্রাহ্য করবেন না, এ বিশ্বাস আছে। কিন্তু বাবাকে বিব্রত করার ইচ্ছা নেই। তিনি যা করবেন, মেনে নেব।

এখানকার স্কুলের হেডমিস্ট্রেস শুক্লাদি আমাকে খুব ভালোবাসেন, তিনি বলছিলেন, তাঁরা তাঁদের স্কুলে একজন 'টিচার' নেবেন। আমি যদি বি. এ. পাস করতে পারি আর যদি চাকরি নিতে রাজী থাকি তাহলে আমাকে তিনি কাজ দেবেন বললেন। মাকে কথাটা একবার বলেছিলাম, তাতে তিনি এমন ধমক দিয়েছেন যে দ্বিতীয়বার আর সে কথা পাড়তে সাহস করিনি। আর সত্যি কথা বলতে কি আমার ভাই চাকরি করতে ইচ্ছে করে না। শুক্লাদি, বেণুদি, সোনাদি এঁদের মুখ দেখলে মনে হয় না ওঁরা খুব সুখে আছেন। ওঁদের মুখে আনন্দের ছাপ নেই যেন। মনে হয় ওঁরা সবাই অসুখী, সকলেরই মনের ভিতর যেন অসন্তুষ্টির আগুন জ্বল্‌ছে।

কিন্তু তুই তোর শ্বশুরবাড়ির কথা যা লিখেছিস তাতেও ভাই আমি ভয় পেয়ে গেছি। তুই অমন ভালো সেতার বাজাতিস লিখেছিস এখন একবারও বাজাবার সময় পাস না। দিন্‌রাত খালি সংসারের কাজ করতে হয়। তুই ওদের বাড়িতে যাবার আগে ওদের সংসার কি করে চলত তাহলে? নিজের সংসারের কাজ করা যে খারাপ তা বলছি না (যদিও আমি নিজে খুব কুঁড়ে, গতরটি নাড়তে ইচ্ছা করে না), নিজের সংসারের কাজ করা তো উচিতই, স্বামী-শ্বশুর-দেওর-ননদ এদের সেবা করাটাই তো আনন্দের—কিন্তু তাই বলে দাসীবৃত্তিটা ভালো নয়। তুই তোর শ্বশুরবাড়ির কথা যা লিখেছিস তা পড়ে কষ্ট হল। পরাধীনতার নাগপাশে আমাদের সমাজ-জীবন আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা, তাই বাইরের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েও আমরা কিছুই পাইনি, আমরা সত্য কথা বলতে ভয় পাই, আনন্দলাভ করবার দাবি জানাতেও ভয় পাই। ঘরে-বাইরে সশঙ্কিত পশুর মতো রয়েছি, সামান্য একটু আনন্দের জন্যে, মানুষের মতো বাঁচবার জন্যে অমানুষের মতো কি হীনতাই না সহ্য করতে হচ্ছে আমাদের।

মালতীর কথা মনে পড়ে? মাতাল স্বামীর যথেচ্ছাচারকে সহ্য করছে সে এখনও মুখ বুজে। এর মধ্যেই তিনটে মেয়ে হয়েছে তার। ক্রমাগত মেয়ে হচ্ছে বলে তার শাশুড়ী তাকে কী যে গঞ্জনা দিত তা আর বলবার নয়। কিন্তু তা সহ্য করেও সে শ্বশুরবাড়ি আঁকড়ে পড়ে ছিল, কারণ তার আশা ছিল স্বামী হয়তো একদিন ফিরে আসবে, হয়তো একদিন তার সুমতি হবে। কিন্তু তার সে আশাও ভেঙে গেছে, কাবণ সে এখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছে যে তার স্বামী কেবল মাতাল নয়, চরিত্রহীনও। আর একটি মেয়েকে নিয়ে সে আছে। তাকে বিয়ে করেনি, তবু স্বামী-স্ত্রীর মতো আছে।

আমাদের দেশে একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে আইন পাস হয়েছে, কিন্তু নীতিহীনতার বিরুদ্ধে হয়েছে কি? যারা দুশ্চরিত্র বা দুশ্চরিত্রা তারা বিয়ের ফাঁদে পা দিতে যাবে কেন! সুতরাং আমাদের পক্ষে ও আইন ব্যর্থ। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কি জানিস? মালতী এখনও

তার স্বামীর পা আঁকড়ে পড়ে আছে। কি করবে, নিতান্ত নিরুপায় যে। আই. এ. পাস করেছিল, হয়তো কোথাও চাকরি জুটতে পারে, আমাকেই সে লিখেছিল আমাদের মিলে যদি কোন চাকরি যোগাড় করে দিতে পারি বাবাকে বলে। বাবাকে বলেছিলাম, বাবা বললেন— টাইপিস্ট করে বহাল করে নিতে পারি, কিন্তু একশ টাকার বেশী মাইনে দিতে পারব না। মালতী টাইপ করতে জানে না, যদি জানতও তাহলে মাত্র একশ টাকায় তিন তিনটে মেয়ে নিয়ে ওর চলত কি? মেয়ে তিনটেকে ফেলে রেখে তো পালিয়ে আসতে পারে না। মালতীর বাবা খুব গরীব, তিনি ওর ভার নিতে অক্ষম। মালতীর এক দাদা কোথায় যেন কেরানীগিরি করেন। মালতী তাঁকে চিঠি লিখেছিল, উত্তর পায়নি। এ অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকা ছাড়া ওর আর গতি কি। সেদিন এসেছিল আমার কাছে, দেখে বড় কষ্ট হল।

ফন্‌তিকে মনে আছে তোর? সেই যে আমাদের সঙ্গে ম্যাট্রিক পড়ে হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল যার। কি রূপ ছিল তার মনে আছে? কি রং, কি চুল, কি চোখ মুখ, রূপের জোরেই প্রায় বিনাপণে বিয়ে হয়েছিল। অনেকদিন পরে সেদিন দেখা হল তার সঙ্গে। চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে যে প্রথমে আমি চিনতেই পারিনি। সে রং নেই, চোখের কোলে কালসিটে পড়েছে, মাথার চুল উঠে গেছে, আর কি রোগা, একটা কঙ্কাল যেন। শুনলাম তার ছেলে বাঁচবে না। পেট থেকেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার স্বামীর রোজগার ভালো, কিন্তু ফন্‌তির মনে সুখ নেই। এই সব দেখে শুনে বিয়ের কথা উঠলেই ভয় করে। জানি না অদৃষ্টে কি আছে। একটিমাত্র ভরসা বাবা ভালো করে না দেখে শুনে বিয়ে দেবেন না। অনেক লম্বা চিঠি লিখে ফেললাম। যা মনে এল লিখে ফেললাম আবোল-তাবোল। পড়ে নিশ্চয়ই তুই হাসচিস? ভালোবাসা নে। আবার অনুরোধ করছি সেতার বাজানো ছাড়িসনি।

ইতি—
ঊষা।

।। এগারো।।

সব জায়গাতেই হতাশ হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ আবার চুপ করে গেলেন কয়েকদিন। ডায়েরি খুলে বিমর্ষও হয়ে গেলেন। দেখলেন অনেকেই চিঠির উত্তর দেননি। তাঁর মনে হয়েছিল উত্তর পাওয়ার জন্যে চিঠির সঙ্গে ঠিকানা-দেওয়া খাম দিয়ে দেবেন, কারণ উত্তর পাওয়ার গরজটা তাঁরই। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম ভদ্রতাবোধে আবিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি খাম দেননি। যাঁকে চিঠি লিখেছেন তিনি ভদ্রলোক এ বিশ্বাস তিনি শেষ পর্যন্ত রেখেছিলেন। উত্তর না পেয়ে হতাশ হলেন বটে কিন্তু তার মধ্যেই সান্ত্বনাও পেলেন একটু। মনে হল উত্তরের জন্য খাম না দিয়ে এক হিসাবে ভালোই করেছেন তিনি, এতে কে ভদ্র কে অভদ্র তা সহজে ধরা পড়েছে। মেয়ের বিয়ে তিনি ভদ্র পরিবারেই দিতে চান, কিন্তু কোথায় সে ভদ্র পরিবার। কি করে নাগাল পাবেন তার। সবাই যে আজকাল মুখোশ-পরা। মুখোশের আড়ালে কে ভদ্র কে অভদ্র খুঁজে পাবেন কি করে। এই চিন্তায় তিনি যখন মগ্ন তখন হরমোহিনী দেখা দিলেন রঙ্গমঞ্চে। তাঁর মন খুব খুশী। বরেনের চিঠি এসেছে। আজও তাঁর হাতে একটি চিঠি।

"শুনছ, শিউলি চিঠি লিখেছে। খুব ভালো পাত্রের খবর দিয়েছে একটা।"

"শিউলি? আমার বউমা?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আবার কোন্ শিউলি চিঠি লিখতে যাবে আমাকে?"

"কি লিখেছে—"

"খুব ভালো একটি পাত্রের সন্ধান দিয়েছে সে। কলকাতায় তার আলাপী তো অনেক। পার্কে ওদের মহিলা সমিতি আছে, সেখানকার ও মেম্বারও একজন। সেইখান থেকে এই খবরটি পেয়েছে। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। সেই মেয়েটির ননদ খবরটি দিয়েছে।"

"ছেলে করে কি?"

"ইন্‌জিনিয়ার। বড় ফার্মে চাকরি করে। এই দেখ না সব লিখেই দিয়েছে—"

ব্রজেন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত পড়লেন চিঠিটি। পাত্রটিকে ভালো লাগল। গঙ্গোপাধ্যায় উপাধি দেখে তাঁর বাল্যবন্ধু বিকাশ গাঙ্গুলীকেও মনে পড়ল। দেব-চরিত্র লোক ছিল সে। অন্যমনস্ক হয়ে তার কথাই ভাবতে লাগলেন। একটি যুবতীর মান বাঁচাতে গিয়ে গুণ্ডার হাতে প্রাণ দিয়েছিল সে। তার উজ্জ্বল মুখটা বার বার মনে পড়তে লাগল।

"ভুরু কুঁচকে ভাবছ কি? আজই চিঠি লিখে দাও—"

"হ্যাঁ দিচ্ছি—"

তখনই তিনি চিঠি লিখতে বসে গেলেন।

হরমোহিনীও গিয়ে ঢুকলেন ঠাকুরঘরে।

।। বারো ।।

শ্রীনীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় ভীতু প্রকৃতির লোক। চিরকাল সবাইকে ভয় করে এসেছেন। বাবা, মা, ভূত-প্রেত, তেত্রিশ কোটি দেবতা, স্কুলের শিক্ষকরা, আপিসের বড়বাবু, জাঁদরেল প্রতিবেশী সবাই তাঁকে ভয় দেখিয়েছে, বৃদ্ধবয়সেও তিনি ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পাননি। গৃহিণী এবং ছেলে-মেয়ের ভয়ে তিনি সন্ত্রস্ত। গৃহিণী বিশালাকায়া নীলকণ্ঠবাবু খর্বাকৃতি। এই বিসদৃশ দম্পতিকে দেখে একজন রসিক একবার মন্তব্য করেছিলেন তুলোর বস্তার উপর নেংটি ইঁদুর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে যেন।

বস্তুত নীলকণ্ঠবাবু সত্যিই দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মতো। খুর্‌খুর্ করে তাড়াতাড়ি হাঁটেন, হাঁটতে হাঁটতে চট্ করে থেমে গিয়ে এদিক ওদিক তাকান, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে দিক পরিবর্তন করে খুর্‌খুর্ করে অন্যদিকে চলে যান আবার। ছোট ছোট চোখ, ছোট কান, রং ঘোর কালো। সরু একজোড়া গোঁফ আছে, যখন কাঁচা ছিল, তখন তার অস্তিত্ব বোঝা যেত না। এখন পাক ধরাতে সেটা পরিদৃশ্যমান হয়েছে। মেয়ের বিয়ের সময় তিনি অবশ্য কন্যাসম্প্রদান করেছিলেন, বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্রেও তাঁর নাম ছাপা ছিল, কিন্তু বিবাহ-ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র হাত ছিল না। হাত ছিল তাঁর দশাসই শ্যালক দিগিন্দ্র ঘোষালের, হাত ছিল তাঁর গৃহিণীর এবং হাত ছিল তাঁর মেয়ে শৈলবালার।

নবীন মুখুজ্যের ছেলে তরুণ যেই বিলেত থেকে ডাক্তারি পাস করে এল, অমনি নীলকণ্ঠ-

গৃহিণী তাকে নিমন্ত্রণ করলেন। একবার নয়, বার বার। শৈলবালা তাকে সকাল-বিকাল আধুনিক গান শোনাতে লাগল, দশাসই শ্যালক দিগিন্দ্র ঘোষালের জীপে চড়ে তারা সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গায় পিক্‌নিকেও মেতে উঠল। নীলকণ্ঠ ক্ষীণকণ্ঠে এই সব অশোভন কাণ্ডকারখানার প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করেছিলেন একবার। কিন্তু গৃহিণীর ধমক খেয়ে তাঁকে থেমে যেতে হয়েছিল, থেমে গিয়ে তাই করেছিলেন চিরকাল যা করে এসেছেন, মুখ কাঁচুমাচু করে ময়লা পৈতেটা টেনে ধরে পিঠ চুলকেছিলেন।

শৈলবালা আধুনিক মেয়ে। সে জানে এ যুগে সাহস করে এগিয়ে যেতে হয়, লোভনীয় জিনিসটা হামড়ে পড়ে সংগ্রহ করতে হয় ভিড় ঠেলেঠুলে। সসংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেই অপরে সেটি নিয়ে নেবে। শৈলবালা পষ্টাপষ্টি নাম করতে চায় না, কিন্তু সে দেখেছে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের কাছ-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফোটো তুলিয়েছে এমন অনেক অভাজন যাদের নাম পর্যন্ত জানত না কেউ আগে, কিন্তু যারা বড়লোকদের সঙ্গে কাঁধ ঘষাঘষি করেই শেষ পর্যন্ত পাদ-প্রদীপের বন্দনা লাভ করেছে। দূরে সরে থাকলে গুণের বা রূপের কদর হয় না, নিজেকে জাহির করতে হয়, বিজ্ঞাপিত করতে হয়। তার বাল্যসখী কঙ্কাবতী চক্রবর্তীও টোপ ফেলেছিল এবং শৈলবালা অবহিত না হলে হয়তো গেঁথেও ফেলত তরুণকে, কিন্তু শৈলবালার তৎপরতায় হার মানতে হয়েছে তাকে। চটপট বিবাহটা চুকেও গেছে নির্বিঘ্নে।

নীলকণ্ঠবাবু মেয়ের বিয়ের জন্য হাজার দশেক টাকা রেখেছিলেন। কিছু খরচ হয়নি। নবীনবাবুও খরচের দায় এড়িয়েছেন। কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে। নীলকণ্ঠবাবু ভেবেছিলেন এইবার ছেলের বিয়ে দেবেন এবং হয়তো সেই অনাগতা নববধূটির কাছে তাঁর ভীত মন একটু প্রশ্রয় পাবে, হয়তো সে তাঁকে যখন তখন এমন বকবে না। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল: তাঁর ইন্‌জিনিয়ার পুত্র নূতন স্বপ্ন দেখে বসল একা। তার মাকে বলল, শৈলর বিয়েতে তোমাদের তো একটি পয়সা খরচ হল না। ওই টাকাটা আমাকে দাও না, আমি বিলেত ঘুরে আসি। দুটি বছর ছেড়ে দাও আমাকে, বিলেত থেকে আমি ভালো ডিগ্রি নিয়ে আসছি। বিলিতী ডিগ্রি থাকলে চাকরির বাজারে অনেক দাম বেড়ে যাবে।

নীলকণ্ঠ-গৃহিণীও ভেবেছিলেন ছেলের এইবার বিয়ে দেবেন। কিন্তু বিলেত-ফেরত ছেলের সঙ্গে শৈলর বিয়ে হয়ে যাওয়াতে তাঁর মনের মধ্যে একটু গোল বেধেছিল। জামাইয়ের বিলিতী ডিগ্রি রয়েছে, অথচ তাঁর ছেলের নেই এই সত্যটাকে যেন ঠিকমতো পরিপাক করতে পারছিলেন না। তাঁর আত্মসম্মান যেন ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। ছেলের কথায় তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, বেশ তো, চলে যা। টাকা তো আছেই, সেই ভালো।

এ প্রস্তাবে নীলকণ্ঠ একটু বিব্রত হলেন মনে মনে। শৈলর তৎপরতায় এবং কর্মপটুতায় তাঁর যে টাকাটা বেঁচে গিয়েছিল সে টাকাটার উপর তিনি অনেকখানি ভরসা করেছিলেন। কারণ ওই টাকাটাই ছিল তাঁর যথাসর্বস্ব। আমাদের বাঙালী হিন্দুসমাজের নিয়মানুসারে সম্বন্ধ করে বিয়ে দিতে গেলে তাঁকে সর্বস্বান্ত হয়েই বিয়ে দিতে হত। শৈল যেভাবে বিয়ে করেছিল সেটা যদিও তাঁর মনঃপূত হয়নি, কিন্তু টাকাটা বেঁচে যাওয়াতে মনে মনে খুশীই হয়েছিলেন তিনি, ভেবেছিলেন বুড়ো বয়সে অথর্ব হয়ে পড়লে ওই টাকাটাই তাঁর সহায় হবে। তাঁর বন্ধু জগদীশ মিত্তিরের অবস্থা দেখে তাঁর এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে বৃদ্ধবয়সে টাকা না থাকলে

ছেলে বউ কেউ পোঁছে না, তাদের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়। দরিদ্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত জগদীশ মিত্তিরের বিছানাও রোজ বদলানো হয় না। বেচারার টাকা থাকলে চাকরে অন্তত তাঁর সেবা করত। জগদীশ মিত্তির ছেলেদের পড়িয়ে এবং মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত, বৃদ্ধ পিতার যথোচিত সেবা তারা করতে পারে না।

ছেলের প্রস্তাব শুনে নীলকণ্ঠ বললেন, "বেশ তো, বিলেত যাও, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যাবার আগে বিয়ে করে যাও।" নীলকণ্ঠ ভেবেছিলেন, ছেলের বিয়েতে নগদ কিছু আদায় করতে পারবেন হয়তো এবং তাতে বিলাত যাওয়ার খরচের খানিকটা অন্তত উঠে যাবে।

ছেলে কিন্তু এটা অন্যভাবে নিয়ে চটে উঠল। মাকে বলল, "কেন, তোমরা কি মনে করছ বিয়ে না করে গেলে ওদেশে আমি মেমসাহেবের ফাঁদে পড়ে যাব? আমাকে বিশ্বাস করে দেখ, আমি তোমাদের সে রকম ছেলে নই যে তোমাদের মুখে কালি দেব।"

নীলকণ্ঠ-গৃহিণীর হৃদয় পুত্র-গর্বে ভরে উঠল। মায়ের মন স্বভাবতই ছেলেদের কথা বিশ্বাস করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। সুতরাং তিনিও ছেলের সঙ্গে যোগ দিয়ে চোখ রাঙিয়ে বকলেন নীলকণ্ঠকে—"ছি ছি, কি নীচ মন তোমার, নিজের ছেলেকেও বিশ্বাস করতে পার না!" হকচকিয়ে গেলেন নীলকণ্ঠ। তিনি কেন যে ছেলেকে বিয়ে করে বিলেতে যেতে বলছিলেন তা-ও বিবৃত করে বলতে তাঁর সাহসে কুলোল না। তিনি অপ্রস্তুত মুখে ময়লা পৈতেটা টান করে ধরে পিঠ চুলকোতে লাগলেন। ইন্‌জিনিয়ার ছেলের খবর চাপা ছিল না। অনেক জায়গা থেকেই সম্বন্ধ আসছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের চিঠিও পেয়েছিলেন তিনি। সকলকেই এক উত্তর দিলেন।

প্রীতিভাজন মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার সহিত কুটুম্বিতা হইলে অতিশয় সুখী হইতাম। কিন্তু এখন এ বিষয়ে আপনাকে কোনও কথা দিতে পারিতেছি না। কারণ, আমার পুত্র বিলাতে গিয়া আরও পড়াশোনা করিবে স্থির করিয়াছে। এখন সে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নয়। দুই বৎসর পরে সে বিলাত হইতে ফিরিবে। সুতরাং এখন এ বিষয়ে কোনও আলোচনা করা বৃথা। আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীনীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়

চিঠি পেয়ে ব্রজেন্দ্রবাবু তো দমে গেলেনই, হরমোহিনীও গেলেন। তাঁর বউমার দেওয়া এই সম্বন্ধটি যে নির্ঘাৎ লাগবেই, কেন জানি না, এই রকম একটা ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তাঁর ঠাকুরের মুখের দিকে চেয়েও তিনি যেন একটু মৃদু হাসি লক্ষ্য করেছিলেন যাতে তাঁর মনে আশা হয়েছিল যে ঠাকুর বোধহয় দয়া করলেন। নীলকণ্ঠবাবুর চিঠি পড়ে তাঁর মনে হল ঠাকুর যে হাসিটি হেসেছিলেন তা ব্যঙ্গের হাসি। চটে উঠলেন তিনি শিউলির উপর। শুধু শিউলির উপর নয়, আজকালকার মেয়েদের উপরও।

"কি যে আজকালকার ফাজিল মেয়েগুলো, না আছে তাদের কথার ওজন, না আছে দাম।

বাজে উড়ো কথা নিয়ে চালাচালি করে কেবল”—বলেই দুমদুম করে ভিতরের দিকে চলে গেলেন। ইঁদুর ফাঁদে ধরা পড়লে আর যাই করুক হাসে না। ব্রজেন্দ্রবাবুও ফাঁদে পড়েছিলেন, তবু তাঁর মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠল। কারণ তিনি মানুষ, ইঁদুর নন। শুধু হাসিই ফুটল না, মতলবও জাগল একটা। নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়কে আর একটি পত্র লিখলেন তিনি। চিঠির খেলো কাগজখানা দেখে তাঁর মনে হল টাকার লোভ দেখালে হয়তো কাজ হতে পারে। ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুমান মিথ্যা ছিল না, নীলকণ্ঠবাবুর যদি হাত থাকতো তাহলে হয়তো এতে কাজও হত। তাছাড়া আর একটা দুর্ঘটনা ঘটল। চিঠিখানা পড়ল তাঁর ছেলের হাতে। আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরাই নানা ছলে পণ নেয়, কিন্তু সেটা সোজাসুজি বা খোলাখুলি বললেই তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখেছিলেন—

নমস্কারান্তে সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আপনার পুত্র উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবার জন্য বিদেশে যাইতেছে ইহা অত্যন্ত আনন্দজনক খবর । কিন্তু বিদেশে যাইবার পূর্বে সে যদি বিবাহ করিয়া স-স্ত্রীক বিদেশে যায় তাহা হইলে ক্ষতি কি। আমার মেয়েও এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছে, সম্ভবত পাস করিবে। আপনি যদি আপনার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেন তাহা হইলে সে-ও বিদেশে গিয়া স্বামীর সহিত লেখাপড়া করিতে পারে। স্বীকার করি ইহা ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু আপনি যদি অনুমতি এবং অভয় দেন উভয়েরই ব্যয়ভার বহন করিতে আমি প্রস্তুত আছি। আমার নমস্কার জানিবেন। আশা করি আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল। তাড়াতাড়ি পত্রের উত্তর দিলে বাধিত হইব। ইতি—

বিনায়বনত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

চিঠির উত্তর তাড়াতাড়ি এল। চিঠির হস্তাক্ষর নীলকণ্ঠের, কিন্তু চিঠির ভাষা ও ভাব তাঁর পুত্রের। চিঠিখানা পেয়ে তাঁর পুত্র যে উত্তর লিখে দিয়েছিল গৃহিণীর আদেশে নীলকণ্ঠ তাই টুকে পাঠিয়েছেন। টাকার লোভে নীলকণ্ঠ-গৃহিণীও যে বিচলিত হননি তা নয়, কিন্তু তিনি পুত্রের আদর্শ-প্রীতিতে এবং পুত্র-গর্বে এত বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে টাকার প্রশ্নটা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে। তাছাড়া আর একটা নিগূঢ় কারণও ছিল। তিনি ভাবলেন নিজের মেয়েকে বিলিতী শিক্ষা দেবার জন্যে উনি টাকা খরচ করবেন তাতে তাঁদের সংসারে কি লাভ হবে। বিলিতী লেখাপড়া আর হাবভাব শিখে তাঁর মেয়েটি যদি হাই-হিল-জুতো-পরা-নাক-তোলা ঘাড়-ছাঁটা মেমসাহেব হয়ে ফিরে আসেন তাহলে বিপদেই বরং পড়ে যাবেন তাঁরা। তাছাড়া তাঁর মনের নেপথ্য আকাশে এ বিশ্বাসটাও ধ্রুবতারার মতো জ্বলছিল যে তাঁর ছেলে যদি ভালো একটা বিলিতী ডিগ্রি আনতে পারে তাহলে অনেক মেয়ের বাপ সেধে তার পায়ে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা তো দেবেই, বেশীও দিতে পারে। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে তিনি দ্বিধা করলেন না। ছেলেকে বললেন—খুব কড়া জবাব লিখে দে একটা আর স্বামীকে বললেন, ও যা লিখবে তুমি সেটা টুকে পাঠিয়ে দাও। যে চিঠি ব্রজেন্দ্রবাবু পেলেন তা এই—

প্রীতিভাজন মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া যুগপৎ বিস্মিত এবং অপমানিত হইয়াছি। আপনি আমাকে এবং আমার পুত্রকে যে পণ-লোলুপ আত্ম-সম্মানহীন ব্যক্তিদের দলভুক্ত করিয়াছেন ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। ইহাও অনুভব করিতেছি, দোষ আপনার নয়, দোষ সমাজের। সমাজের হাওয়া যেদিকে বহিতেছে সেই হাওয়ার আনুকূল্য লাভের জন্য সেই দিকেই আপনি ঘুড়ি উড়াইয়াছেন। কিন্তু আপনার জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে আমার পুত্রের শিক্ষার ভার লইতে আমি সক্ষম, ভবিষ্যতে আমার পুত্রবধূকেও যদি বিদেশী শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি তাহার ব্যয়ভারও আমরা বহন করিতে পারিব। এজন্য আপনার অর্থসাহায্য আমরা অনাবশ্যক মনে করি। আমার পুত্র বিলাত যাইবার পূর্বে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। সে পৃথিবীতে একমাত্র মায়ের আদেশই বিনা দ্বিধায় পালন করে, তাহার মা-ও তাহাকে বিবাহ না করাইয়া বিলাত যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। সুতরাং আপনার প্রস্তাবে সায় দিতে পারিলাম না। ক্ষমা করিবেন। নমস্কারান্তে—

ভবদীয়

শ্রীনীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়।

নীলকণ্ঠের এ চিঠির কথা ব্রজেন্দ্রনাথ একেবারে চেপে গেলেন হরমোহিনীর কাছ থেকে। কিন্তু একটা কথা তাঁর মনে হল—কোন্ পাপে, এদেশে মেয়ের বাপ হয়ে জন্মেছি! আগেকার দিনে সোজাসুজি পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে হত, যারা পণ দিতে সক্ষম তারা অন্তত মেয়ের বিয়েটা নির্ঝঞ্ঝাটে দিতে পারত। কিন্তু আজকাল এ কি কাণ্ড হয়েছে। পণপ্রথা তো ওঠেই নি, তার ওপর চেপেছে নানারকম মুখোশ, ভণ্ডামি আর চালিয়াতির ঢং। এর থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই! মুক্তির একটা চেহারা কিন্তু হঠাৎ এসে হাজির হল তার পরদিনই। আগে একটা টেলিগ্রাম এল—Reaching tomorrow evening–Kusumika.

কুসুমিকা? চিনতে পারলেন না। নামটা আগে শুনেছেন কি না মনে পড়ল না। এমন কি এ ব্যক্তি মেয়ে না পুরুষ তা-ও সহসা ঠিক করতে পারলেন না ব্রজেন্দ্রনাথ। অনেক পুরুষের মেয়েলী নাম দেখেছেন তিনি। শেষে মনে হল ঊষার কোন সহপাঠিনী সম্ভবত। ঊষাকে ডাকলেন। তার হাতে টেলিগ্রামটা দিয়ে বললেন, "একে চিনিস?"

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ঊষার মুখ।

"ও, কুসুমদি আসছেন?"

"আমি তো চিনতে পারছি না—"

"বাঃ—তোমারই তো বন্ধুর মেয়ে। আগে আমাদের হেড্‌মিস্ট্রেস ছিলেন। মনে নেই তোমার? বিলেত গিয়েছিলেন। ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস হয়েছেন আজকাল।"

তখন ব্রজেন্দ্রনাথের মনে পড়ল কুসিকে। তাঁর বন্ধু দেবেন মৈত্রর মেয়ে।

।। তেরো।।

দেবেন মৈত্রর কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। তিনি যখন প্রফেসারি করতেন, তখন দেবেন মৈত্রর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি যে কলেজে ছিলেন, সেই কলেজের কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক ছিলেন দেবেনবাবু। যেমন দেবতার মতো রূপ ছিল, তেমনি দেবতার মতো স্বভাব। এঁর বন্ধুত্ব লাভ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন তিনি একদা। অথচ আজ তাঁর কথা মনেই পড়েনি। আশ্চর্য মানুষের মন।

অনেকদিন পরে কুসি আসছে এ খবর পেয়ে সমস্ত মন আনন্দে ভরে উঠল ব্রজেন্দ্রনাথের। কুসিকে শেষবার দেখেছিলেন এইখানেই মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীরূপে। ঊষা তখন ওই স্কুলেরই ছাত্রী ছিল। বেশ নাম করেছিল কুসি শিক্ষয়িত্রী রূপে। এখান থেকেই বিলেত চলে যায়। সে যে স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস হয়েছে এ খবর পাননি ব্রজেন্দ্রনাথ। টেলিগ্রামটার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন তিনি। দেবেনবাবুর কথাই মনে পড়ছিল। সমস্ত দিন নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন দেবেনবাবু। কারও বাড়ি বড় একটা যেতেন না। ব্রজেন্দ্রনাথের কাছেও তিনি কম এসেছেন। কিন্তু যখনই আসতেন সঙ্গে করে একটা পবিত্রতা বহন করে আনতেন। তাঁর চোখ মুখ থেকে একটা বিশুদ্ধতার আভা যেন বিকীর্ণ হত। আদর্শবাদী লোক ছিলেন। যৌবনে বিয়ে করেছিলেন এক গরীবের কুৎসিত কালো মেয়েকে। একটিমাত্র সন্তান হয়েছিল ওই কুসি। কুসিও রূপসী হয়নি এবং সেইজন্যেই দেবেনবাবু আদর করে ওর নাম রেখেছিলেন কুসুমিকা।

দেবেনবাবুর নিজের সংসার ছোট ছিল, কিন্তু স্বার্থপরের মতো নিজের সংসার নিয়েই তিনি থাকতে পারেননি। এই 'আপনি আর কোপ্‌নি'র যুগেও অনেক আত্মীয়স্বজন নিয়ে থাকতেন তিনি। সামান্য স্কুল মাস্টার ছিলেন, মাইনে খুব বেশী ছিল না, প্রাইভেট ট্যুশনি করতেন না (যদিও বাড়িতে অনেক ছেলেকে বিনাপয়সায় পড়াতেন), ওই সামান্য আয়েও কৃচ্ছ্রসাধন করে তিনি নিজের আর্দশ বজায় রেখেছিলেন। এর জন্যে সমাজের লোকও তাঁকে যে বিশেষ সম্মান করত তা নয়, অনেকে তাঁকে নির্বোধই বলত। কিন্তু সে সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না দেবেনবাবু। স্কুল থেকে তিনি একটা কোয়ার্টার পেয়েছিলেন। মাত্র তিনখানি শোওয়ার ঘর ছিল তাতে। কিন্তু তিনি সেই তিনখানি ঘরকেই ছ'খানি ঘরে পরিণত করেছিলেন চৌকির সাহায্যে। রাত্রে একদল চৌকির উপরে শুত, আর একদল চৌকির নীচে। তিনি নিজে শুতেন একখানি চৌকির নীচে। সেইখানে বসে পড়াশোনা করতেন, ছেলেদের হোম্‌টাস্‌কের খাতাও সংশোধন করতেন। আর ভোরে উঠে চলে যেতেন স্কুলের সমীপবর্তী বটগাছটার তলায়। সেইখানে মাদুর পেতে বসতেন আর যে সব ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে পড়তে আসত তাদের পড়াতেন। কখনও শৌখিন কাপড় জামা পরেননি। অধিকাংশ দিনই খালি পায়ে স্কুলে আসতেন, বিশেষ পর্ব উপলক্ষে বা স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টার এলে তালতলার চটি পায়ে দিতেন। চিনি কিনতেন না, পাঁউরুটি কিনতেন না, গুড় আর হাতে-গড়া রুটিই চিরকাল খেয়েছেন। রাত্রে তাঁর বাড়িতে রান্না হত না। মুড়ি খেত সবাই। মুড়ি আর ছোলার ঘুগনি।

কুসির মা মুড়ির চাল কিনে নিজেই মুড়ি ভাজতেন। একটি গাই ছিল। তার যখন দুধ হত,

তখন রাত্রে মুড়ি খাওয়া চলত দিনকতক। কুসির মা-ই গরুর সেবা করতেন স্বহস্তে। জাব কাটতেন, দুধ দুইতেন, ঘুঁটেও দিতেন। বাছুর কখনো বিক্রি করেননি দেবেনবাবু। সৎপাত্রে দান করে দিতেন। এরকম অদ্ভুত আদর্শবাদী লোক ব্রজেন্দ্রনাথ আর দেখেননি।

কুসি তার বাবার অনেক গুণ পেয়েছিল। দেবেনবাবু তাকে নিজেই পড়িয়েছিলেন বাড়িতে। প্রাইভেটে সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে। পাস করবার পর তার বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিয়ে দিতে পারেননি। তাকে বাড়িতেই আই. এ. পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর এক ভাইয়ের বড় চাকরি হয়ে গেল। ভাইটিকে দেবেনবাবুই মানুষ করেছিলেন। সেই ভাই কুসুমকে কলেজে ভরতি করে দেয়। কলেজে গিয়ে কুসুমের সুপ্ত প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করল। দারিদ্র্যের পাথরে ঝরনাটা যেন চাপা ছিল, পাথরটা সরে যেতেই দিগ্বিজয়িনীর মতো বেরিয়ে পড়ল সে কলোল্লাসে। কলেজের প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তিতে এবং পুরস্কারে যা পেতে লাগল তাতে তার নিজের পড়ার খরচ তো চলতই, দেবেনবাবুর সংসারেও সাহায্য হত। এম. এ. এবং ডিপ-ইন-এড্ এর বন্দর পর্যন্ত পৌঁছতে কোথাও আটকালো না কুসুমিকার। এর পরেই পেল সে চাকরি। তারপর স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলেত গেল। বিলেত থেকেও ভালো ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে ডিভিশনাল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস অব স্কুলস হয়েছিল—এই খবর পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথের জানা।

দেবেনবাবুও রিটায়ার করে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শুনেছিলেন সেখানেও নিজের বাড়িতে তিনি অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলেছেন একটি। অনেকদিন দেবেনবাবুর বা কুসুমিকার খবর পাননি। এতদিন পরে হঠাৎ কুসুমিকা আসছে কেন? সরকারী কাজ নিশ্চয়ই নয়, কারণ তার কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ডিভিসনে। বদলি হয়ে আসছে কি? ঊষাই মোটর নিয়ে স্টেশনে গেল কুসুমিকাকে আনতে। খবরটা শুনে হরমোহিনী খুব খুশী হলেন না। যে সব মেয়ের ভাবভঙ্গীতে পুরুষালির প্রভাব বেশী, মুখে কিছু বলতে না পারলেও, মনে মনে তাদের উপর খুব প্রীত নন হরমোহিনী। কুসুমিকা যখন ছেলেদের সঙ্গে টেনিস্ বা ব্যাডমিন্টন খেলত আর কথায় কথায় হা হা করে হেসে গড়িয়ে পড়ত তখন হরমোহিনী সেটা খুব পছন্দ করতেন না। মনে মনে বলতেন—'ধিঙ্গি মেয়ের কাণ্ড দেখ না।' যাই হোক যখন আসছে তখন অভ্যর্থনা করতেই হবে। একটা কথা তাঁর মনে পড়ল, কুসি পুডিং খেতে খুব ভালবাসে। পুডিংয়ের আয়োজন করতে লাগলেন তিনি।

।। চোদ্দ।।

কুসুমিকাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। হরমোহিনীও কম অবাক হলেন না। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন হাই-হিল-জুতো খটখটিয়ে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে, চোখে গগল্‌স্ এঁটে, গালে ঠোঁটে রং মেখে, হব্‌লকরা শাড়ির আঁচলা ঝলমলিয়ে বিবি-মার্কা কোনও আধুনিকার আবির্ভাব হবে বুঝি। কিন্তু কুসুমিকাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। অতি সাধারণ মিলের সাদা শাড়ি পরনে, মাথার চুল টান করে বাঁধা, চোখে কাজল নেই, ঠোঁটে রং নেই,

গলার খাঁজে খাঁজে পাউডার নেই। কালো মুখখানিকে আলো করে রেখেছে একটি স্নিগ্ধ নম্র হাসি। এই মেয়েই কিছুকাল আগে হুড়োহুড়ি করে টেনিস খেলত। এই মেয়ে এত বড় বিদুষী, বিলেত থেকে ঘুরে এসেছে! হরমোহিনী বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে তার থুতনিতে হাত দিয়ে চুমু খেলেন এবং বলে উঠলেন, "ওমা, এ কি ছিরি মেয়ের! এত রোজগার করছিস একটা ভালো শাড়ি কিনতে পারিসনি?" কুসুমিকা মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

"চল খাবি চল—"

জোর করে অনেকখানি পুডিং, চারটে রসগোল্লা, ডবল ডিমের ওমলেট খাওয়ালেন তাকে।

খাওয়াদাওয়ার পর ব্রজেন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলেন, "এখানে কি বদলি হয়ে এলি না কি? এখানকার স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেসের কোয়ার্টার তো খুব ভালো—"

"আমি তো স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেসের চাকরি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি!"

"কেন?"

"ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগত না। তাছাড়া এক ডাকবাংলোয় একটা অসভ্য এস. ডি. ও. কে চড়িয়েছিলাম বলে গোলমালও হয়েছিল একটু!"

"চড়িয়েছিলি? সে কি!"

"হ্যাঁ, অশ্লীল অসভ্যতা করেছিল। আমি ও চাকরি ছেড়ে প্রফেসারি নিয়েছিলাম, কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হবে।"

"এত কাণ্ড করেছিস কিচ্ছুই শুনিনি তো!"

অভিমানভরা কণ্ঠে কুসুমিকা বলল, "আপনি আজকাল আমাদের খবর আর রাখেন নাকি!"

ব্রজেন্দ্রনাথ মনে মনে লজ্জিত হলেন, সত্যিই ওদের খবর অনেকদিন রাখেননি। পৃথিবীতে পরিচিতের সংখ্যা রোজ এত বাড়ছে, আর তাদের খবরের পরিমাণও রোজ এত বেশী হচ্ছে যে সব দিকে হিসাব ঠিক রাখা মুশকিল। কিন্তু এ-ও তাঁর মনে হল দেবেনবাবুর আর কুসুমিকার খবরটা তাঁর রাখা উচিত ছিল। কারণ ওদের সঙ্গে পরিচয়টা ছিল একটু স্বতন্ত্র ধরনের।

"প্রফেসারি ছাড়ছিস কেন?"

"বাবা ছেড়ে দিতে বলেছেন।"

"কেন হঠাৎ?"

কুসুমিকা তখন সব কথা বলল। বক্তব্যটা বক্তৃতার মতো শোনালো অনেকটা।

"আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার পর জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অসাধুতা, কপটতা আর যথেচ্ছাচার চলছে। মনে হচ্ছে যেন মধ্যযুগীয় বর্বরতা আবার ফিরে এসেছে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে। যে দেশে অধিকাংশ লোক মূর্খ, যে দেশে পয়সা দিয়ে ভোট কেনা যায়, লোভ দেখিয়ে হুমকি দিয়ে ভোট আদায় করা যায়, সে দেশে গণতন্ত্র কতকগুলি মতলববাজ লোকের হাতে পড়ে অত্যাচারের যন্ত্র হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি। আমাদের বর্তমানে তো অন্ধকারই, কিন্তু ভবিষ্যৎ মনে হচ্ছে আরও অন্ধকার। কারণ মনুষ্যত্ব গড়বার যে পথ তাই এরা কণ্টকাকীর্ণ করে দিচ্ছেন। আমাদের দেশে শিক্ষার আবহাওয়া আজ বিষাক্ত। শিক্ষার পদ্ধতিই

ভুলে ভরা। বাইরে থেকে মনে হবে আমাদের ছেলে-মেয়েরা বুঝি অনেক কিছু শিখছে, কিন্তু কেউ কিচ্ছু শিখছে না। বইয়ের ভারে ছোট ছোট শিশুদের পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে যাচ্ছে কেবল। তাদের শেখাবার মতো শিক্ষকও নেই। সুপারিশের জোরে ভাইপো ভাগনারাই শিক্ষকের চাকরি পাচ্ছেন, ভালো লোকের স্থান নেই। আর সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়েও চোরাকারবার অবাধে চলছে।

"আমি একটি মহিলা কলেজের মহিলা প্রিন্সিপালের খবর জানি। তিনি তাঁর বাজেমার্কা মেয়েকে ফার্স্টক্লাস অনার্স পাওয়াবার জন্যে চতুর্দিক তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে খুশী করবার জন্যে তাঁর অধীন কিংবা প্রসাদকামী পরীক্ষকেরা নির্বিচারে ঢেলে ঢেলে নম্বরও দিচ্ছে তাঁর মেয়েকে। অথচ তার চেয়ে ঢের ভালো ছেলে-মেয়েরা কিচ্ছু পাচ্ছে না।

"অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই আজকাল পরীক্ষকেরা খাতা পরীক্ষা করে নম্বর দেন না, অনেক সময় নম্বর দেন জাত বিচার করে, কিংবা কোন্ প্রদেশবাসী তা জেনে নিয়ে, কিংবা ওপরওয়ালার আদেশ বা অনুরোধে। ডিগ্রির আজকাল কোন মূল্য নেই, প্রকৃত শিক্ষার তো নেই-ই। চাকরির জন্যে যেন-তেন-প্রকারেণ ডিগ্রির একটা তকমা চাই। সে তকমাটা যত চকচকে হয় চাকরির ক্ষেত্রে ততই সুবিধা। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চালকরা আজকাল পক্ষপাতিত্ব করে তাঁদের নিজেদের লোকেদের তকমাটা চকচকে করে দেবার কাজে লেগেছেন উঠে পড়ে। অবাধে ঘুষ দেওয়া-নেওয়াও চলছে। আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষায়তনে শিক্ষা দেওয়া হয় না, গুণের বিচার করা হয় না, ভালো ছেলে-মেয়েদের পিছনে ঠেলে দিয়ে সামনে হাজির করা হয় সেই সব হস্তিমূর্খ ছেলে-মেয়েদের যারা দৈবাৎ আধুনিক রাজকুলের আত্মীয়স্বজন। দেশ যাতে ভবিষ্যতে আর কিছুতে মাথা তুলতে না পারে, তারই সুনিপুণ ব্যবস্থা করেছেন এঁরা। তাই আমার বাবা বলেছেন চাকরি ছেড়ে দিতে। যে গভর্নমেণ্টের আগাগোড়া কলুষিত সেখানে প্রতিবাদ করেও কোন লাভ নেই। সুতরাং ওদের সংস্রবই ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করে নূতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। আমাদের এখন প্রধান কাজ মানুষ তৈরি করা। আমাদের গ্রামের যিনি জমিদার ছিলেন তিনি বাবার ছাত্র। তাঁর এখন জমিদারি নেই, কিন্তু এখন কলকাতায় ব্যবসা করে তিনি অনেক টাকা রোজগার করেছেন। তিনি বাবাকে এক লক্ষ টাকা দিতে চান গ্রামে একটা স্কুল করবার জন্যে। বাবা বলেছেন তিনি স্কুলের ভার নিতে রাজী আছেন কিন্তু সে স্কুলের সঙ্গে গভর্নমেণ্টের কোনও সংস্রব থাকবে না। সে স্কুলের একমাত্র লক্ষ্য হবে ভালো ছেলে-মেয়ে তৈরি করা। যারা পরীক্ষা পাস করে চাকরি পেতে চায় তাদেরও পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকবে তাতে, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা দিতে হবে প্রাইভেটে। বাবা আমাকে তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওই স্কুলে যেতে বলছেন। মেয়েদের ভার আমার উপর থাকবে। কিন্তু আমি একা তো পারব না, তাই আমি আমার যে সব ভালো ছাত্রী ছিল তাদের খোঁজে বেরিয়েছি। উষা তো এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। ওকে দেবেন আমার সঙ্গে? আমাদের বাড়িতে থাকবে, মাইনেও কিছু দেব আমরা--"

এ প্রস্তাবের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ প্রস্তুত ছিলেন না। হরমোহিনীও ছিলেন না।

ব্রজেন্দ্রনাথ সোজাসুজি 'না' বলতে পারলেন না। মাথা চুলকে বললেন, "ও এখনও ছেলেমানুষ আছে, ও কি পারবে?"

"খুব পারবে। বাবা বলেছেন কমবয়সী শিক্ষক-শিক্ষিকাই দরকার। তারাই আদর্শবাদী। তারা শুধু পড়াবে না, নিজেরাও পড়বে। আপনি উষাকে দিন—"

এইবার হরমোহিনী আসরে নামলেন।

"দেখ্ আমি তোর মতো লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু তোর চেয়ে আমার বয়স ঢের বেশী, অনেক দেখছি, অনেক শুনেছি। এটা ভালো করে বুঝেছি সময়ে বিয়ে না হলে মেয়েদের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। বাপ মা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন খেতে পরতে পায়। আজকাল তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, চাকরিবাকরি করেও হয়তো অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারবে তোমরা, কিন্তু এটা জেনে রেখ শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকলেই মানুষের সুখ হয় না। বিশেষ করে মেয়েমানুষের। তার কোলে কাঁখে ছেলেমেয়ে চাই। তাতেই তার সুখ। অনেক বড়লোকের বাড়ির বাঁজা বউ মেয়ে দেখেছি, তাদের খাওয়াপরাব অভাব নেই, কাপড়-গয়নাও অজস্র, কিন্তু মনে সুখ নেই। কারো ফিট হচ্ছে, কারও মাথায় ছিট এসে গেছে, কেউ মুখ গোমড়া করে বসে আছে দিনরাত, কেউ ঝগড়া করে মরছে, অনেকে পাগলও হয়ে গেছে। মনে সুখ নেই কারও—। আমি বাপু আমার মেয়ের বিয়ে দেব, মাস্টারি-ফাস্টারি করতে দেব না। আর তুমি যদি তোমার কাকীমার কথাটি শোন তাহলে ওসব উদ্‌খুট্টে ব্যাপারে না মেতে একটি বিয়ে করে ফেল!"

ব্রজেন্দ্রনাথও সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারও সেই মত। বলিস তো তোর জন্যেও একটি ভালো ছেলের খোঁজ করি—"

হরমোহিনী ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে। তাঁর চোখে একটা ব্যঙ্গের হাসি চকমক করতে লাগল। মুখে যদিও তিনি কিছুই বললেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। নিজের মেয়ের জন্যে পাত্র জোটাতে পারছেন না, পরের মেয়ের ভার নিতে চাইছেন! আশ্চর্য লোক।

কুসুমিকা হেসে বলল, "বাবা তো আমার বিয়ের জন্যে কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু কেউ আমাকে নিলে না যে। আমাদের সমাজে রূপ রূপিয়া দুটোই চায় সকলে। আমার যে একটাও নেই।"

কুসুমিকা পরের ট্রেনেই ফিরে গেল।

যাবার সময় বলে গেল উষার জন্য সে-ও পাত্রের সন্ধান করবে। ব্রজেন্দ্রনাথ মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। একথা তাঁর বারবার মনে হতে লাগল মেয়েদের আত্মসম্মানের যে উচ্চ আদর্শকে তিনি বরাবর সমর্থন করে এসেছেন, নিজের মেয়ের বেলা সে আদর্শের মান তিনি রাখতে পারলেন না। তাঁর বন্ধু দেবেন মৈত্র পেরেছেন, শত দুঃখকষ্ট সহ্য করেও আদর্শের ধ্বজাটাকে উঁচু করে রেখেছেন। কিন্তু তিনি পারলেন না। তিনিও হয়তো পারতেন, যদি উষা নিজে জোর করে এগিয়ে আসত। কিন্তু উষা মায়ের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল মুচকি হেসে। মনে হল মায়ের কথাতেই যেন ওর সায় আছে। ব্রজেন্দ্রবাবু তাই আর জোর পেলেন না, সাহস করতে পারলেন না। এই ভেবে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করলেন যে সব মেয়ে কি একরকম হয়? সবাইকেই কি এক ছাঁচে ঢালা যায়?

কুসুমিকা চলে যাবার পর হরমোহিনী তেমন কিছু মন্তব্য করলেন না। কিন্তু স্নান করে উঠে

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তিনি নিজের মনে যা বলেছিলেন, তা ব্রজেন্দ্রনাথের কানে গেল।

"ওসব ওদের মতো মেয়েরই পোষায়। আমার মেয়ে বিলেতও যায়নি, চাকরিও করেনি। দুটো অচেনা পুরুষের সামনাসামনি হলেই ভয়ে নীল হয়ে যায়। সেরকমভাবে তো মানুষ করিনি। হুট্ করে চাকরি করতে পাঠিয়ে দিলেই হল! আমাদের একমাত্র মেয়ে, তাকে চাকরি করতে পাঠাবই বা কেন! ওর কথা আলাদা—"

ব্রজেন্দ্রনাথ সব শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। ভাবলেন বলবার কি-ই বা আছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাও হল, করাই বা যায় কি। সৎপাত্র তো ডুমুরের ফুলের চেয়েও দুর্লভ হয়ে উঠল। সেই দিনই তিনি আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে চিঠি লিখলেন, যদি কেউ কোনও পাত্রের খবর দিতে পারে। তাঁর মনে হল আমাদের সমাজে বিবাহ ব্যাপারটা ক্রমশঃই খুব জটিল হয়ে উঠছে।

।। পনেরো।।

কয়েকদিন পরে কুসুমিকার একটা চিঠি পাওয়া গেল। মজঃফরপুর থেকে লিখেছে ঃ

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, ফিরে গিয়ে আপনাদের কথা বাবাকে সব বলেছিলাম। বাবাও কাকীমার কথায় সায় দিলেন। বললেন, গৃহই মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মক্ষেত্র। সে সুযোগ যখন পাওয়া যায় না তখনই মেয়েদের ক্ষেত্রান্তরে যেতে হয়। তিনি একটি পাত্রের খবরও দিয়েছেন। পাত্রটির নাম তিনি জানেন না, উপাধি চট্টোপাধ্যায় এই খবরটুকু শুধু জানা আছে। পাত্রের পুয়া খবর ও ঠিকানা আপনি পাবেন দ্বিজেন চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে। তাঁর ঠিকানা নীচে দিলাম। দ্বিজেনবাবু বাবার পুরাতন বন্ধু। এখন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। সেজন্য মনে হয় চিঠি লিখে উত্তর পেতে বিলম্ব হবে। সব চেয়ে ভালো হয় আপনি যদি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। পূর্ণিয়া তো খুব বেশী দূর নয়। কাকীমার এক ভাইপোও তো সেখানে আছেন শুনেছি। তাঁকেও চিঠি লিখতে পারেন, তিনি দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে ঠিকানাটা নিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেবেন।

আমি এখানে এসেছিলাম আমার এক ছাত্রীর খোঁজে। মেয়েটি বিহারী, দু'বছর আগে এম. এ. তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, তার স্বামীও এম. এ. পি-এইচ. ডি.। এরা দু'জনেই আমাদের গ্রামের স্কুলে যোগদান করবে বলছে। এরা এবং এদের পরিবারবর্গ কি যে ভালো, কত যে ভদ্র তা একমুখে বলা যায় না। রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্তে আজ প্রাদেশিকতাব বিষ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। বাঙালী বিহারী পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শিখেছে। কিন্তু এ বিষ সবাইকে আচ্ছন্ন করেনি। আদর্শবাদী, ভদ্র, মহৎপ্রাণ অনেক বিহারীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সারা দেশ জুড়ে অন্যায় ও অসাধুতার যে তাণ্ডব চলেছে তার বিরুদ্ধে লড়তে হলে সব প্রদেশের আদর্শবাদী লোকদের সাহায্য আমাদের নিতে হবে। আমার বিশ্বাস সব প্রদেশেই এরকম আদর্শবাদী ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের খবর নিতে হবে, তাদেরও উদ্বুদ্ধ করতে হবে প্রকৃত স্বদেশ-সেবায়। দেশের আত্মসম্মান, শুভ-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে মরে যাওয়ার

আগে রক্ষা করতে হবে তাদের। এ কাজ শিক্ষকদের। আপনারা আশীর্বাদ করুন, এ ব্রত যেন উদ্‌যাপন করতে পারি।

উষার ভালো বিয়ে হবেই, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি পাত্রের খবর পেলেই আপনাকে জানাব। আপনি ও কাকীমা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণতা

কুসুমিকা।

চিঠিটা পড়ে হরমোহিনী বললেন, "মেয়েটার সব ভালো, কিন্তু বড় জ্যাঠা হয়ে গেছে। কে জানে ভবিষ্যতে সুখী হবে কি না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ এবার আর চুপ করে রইলেন না। বললেন, "তোমরা তো কোনোকালে জ্যাঠা ছিলে না, কিন্তু তোমরাই কি সুখী হয়েছ জীবনে? তোমাদের কথা শুনে মনে হয় তোমাদের মতো অসুখী ভূ-ভারতে আর কেউ নেই।"

"দেখ, আর কথা বাড়িও না। আমাদের অসুখ যে কোথায় এবং তার কারণ যে কি তা সবাই জানে। তুমিও জানো। সারাজীবন কেবল না জানার ভান করছ—"

ব্রজেন্দ্রনাথ আবার অনুভব করলেন তর্ক করা বৃথা। তর্কের খোরাক তিনি নিজেই যুগিয়েছেন ভেবে অনুতপ্ত হয়ে স-ক্ষোভে থেমে গেলেন।

যোদ্ধা হিসাবে হরমোহিনী ব্রজেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী উঁচুদরের। লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না কখনও। যদিও তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে থাবা মেরে নিজের বক্তব্য বারবার জাহির করেন, কিন্তু এটা তিনি নিঃসংশয়ে মনে মনে জানেন যে ব্রজেন্দ্রনাথের সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলে উষার বিয়ে হবে না।

তাই তিনি উক্ত বাদানুবাদের কাদা গায়ে না মেখে বেশ সহজ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন—"দ্বিজেনবাবুর কাছে যাবে নাকি? আমার ভাইপোর কথা কুসি লিখেছে সে তো আজকাল ওখানে নেই, ডালটনগঞ্জে বদলি হয়ে গেছে—"

প্রস্তাবটা শুনে বিব্রত হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। তিনি যেখানে আছেন সেখান থেকে পূর্ণিয়া যাওয়ার চেয়ে দিল্লী যাওয়া সহজ। একা নদী বিশ ক্রোশ, কথাতেই আছে। কিন্তু যে সব ঘাট পেরিয়ে তাঁকে পূর্ণিয়া যেতে হবে সে সব ঘাটের কথা মনে হলে ক্রোশের হিসাবে কুলোয় না। দোনোমোনো হয়ে তাই বললেন, "দেখি—"

"না, আর দেখিটেখি নয়"—সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন হরমোহিনী—"এই গেঁতোমি করে করেই এতদিন দেরি করে ফেলেছ। মেয়ের বিয়ের কথা কি আজ থেকে বলছি আমি। যখন ও ম্যাট্রিক পাস করলে তখন থেকেই সমানে বলে আসছি। বিয়ে যখন দিতেই হবে, ও ছাড়া যখন গতি নেই, তখন দেরি করে লাভ কি!"

নিরুপায় ব্রজেন্দ্রনাথ তখন বললেন, "তাহলে কালই বেরিয়ে পড়ি দুগ্‌গা বলে—"

"কাল শনিবার, কাল কি যাওয়া হয়? শুভকাজে শুভদিনে বেরুতে হবে। দাঁড়াও পাঁজিটা দেখাই—"

"কিন্তু শিউরাম তো ছুটি নিয়েছে, কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। আমার সঙ্গে যাবে কে—"

"আমি যাব। বিশুও চলুক। ছেলেমানুষ হলে কি হয়, খুব চটপটে ছোঁড়াটা—"

হরমোহিনী প্রায়ই ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে সফরে বের হন। সুতরাং এ প্রস্তাবে ব্রজেন্দ্রনাথ খুব বেশী বিস্মিত হলেন না।

॥ ষোল ॥

শুভদিন দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ সপরিবারে যেদিন পূর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন সেইদিন বিহারের প্রসিদ্ধ 'পছিয়া' হাওয়াও উঠল। সে-ও বোধহয় শুভদিন দেখেই যাত্রা করেছিল। পছিয়া হাওয়ার বিশেষত্ব হচ্ছে, খুব হু হু করে বয়। স্বভাবটা শুষ্ক রুক্ষ তপ্ত, একবার অঙ্গ স্পর্শ করলে মনে হয় জ্বলন্ত উনুনের কাছে কেউ ঠেলে দিলে বুঝি।

পছিয়া হাওয়ার আর একটি বিশেষত্ব, কখনও একা আসেন না। সঙ্গে থাকে প্রচুর ধুলো আর বালি। ধুলোবালি দিয়ে আকাশকে আচ্ছন্ন করে দেবার ক্ষমতাও রাখেন ইনি। এঁকে সঙ্গী করেই বেরিয়ে পড়লেন ব্রজেন্দ্রনাথ ও হরমোহিনী। সঙ্গে ছোঁড়া চাকর বিশু।

—ট্রেনে অসম্ভব ভিড়। ফার্স্ট ক্লাসেও বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। আমরা এখন স্বাধীনতা পেয়েছি, সুতরাং অধিকাংশ লোকই টিকিট কেনে না। গাড়িতে চেকারবাবুরা থাকেন, কিন্তু চেক করেন না। স্বাধীনতা-প্রবুদ্ধ জনতার কাছ থেকে যতটা পারেন পয়সা আদায় করে নিজেদের পকেটে পোরেন। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। তাঁদের নৈতিক শিক্ষাও উঁচুদরের নয়, তাঁরা যে বেতন পান তা দিয়ে এই দুমূর্ল্যের বাজারে তাঁরা সংসার চালাতেও পারেন না। সুতরাং এই 'উপরি'র উপরই তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে। একথা ওঁদের উপরওলারাও জানেন বোধহয়। কারণ উপরে নালিশ করে সুফল পাওয়া যায় না, বরং যাঁরা নালিশ করেছেন তাঁদের মধ্যে দু'একজন নিগৃহীতও হয়েছেন, এ খবর ব্রজেন্দ্রনাথ জানেন।

আমাদের স্বাধীন গভর্নমেন্ট পুরাতন জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে নূতন জমিদারির পত্তন করেছেন। সেকালে জমিদারদের নায়েবরা মাইনে পেতেন কেউ পাঁচ টাকা, কেউ দশ টাকা, কিন্তু থাকতেন রাজার হালে। আধুনিক জমিদারের নায়েবদেরও অনেকটা সেই অবস্থা। তাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কিন্তু বেতন পান কম। তাঁদের লোভের, কামের, তাঁদের বিবিধ উচ্ছৃঙ্খলতার খোরাক যোগায় এই উপরি পাওনা।

গভর্নমেন্টের দপ্তরে চিঠি লিখলে আজকাল উত্তর পাওয়া যায় না, উত্তর পেতে হলে কেরানীদের ঘুষ দিতে হয়। নিদারুণ ভিড়ে কষ্ট ভোগ করতে করতে এই সবই মনে হচ্ছিল ব্রজেন্দ্রনাথের।

সামনের সীটে একটি ছোক্‌রা প্যাণ্ট আর বুশশার্ট পরে সিগারেট টানছিল। বয়োবৃদ্ধ ব্রজেন্দ্রনাথকে দেখে একটুও সমীহ করছিল না সে। ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু এই ছোক্‌রার দুর্বিনীত আচরণ দেখে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল এরাই কি দেশের ভবিষ্যৎ? তাঁর কষ্ট বাড়ল যখন ছেলেটি পাশের লোকটির সঙ্গে কথা কইতে লাগল। ছোক্‌রা বাঙালী। হঠাৎ

একটি বৃদ্ধ বিহারী ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে হরমোহিনীকে লক্ষ্য করে সম্ভ্রমপূর্ণ-কণ্ঠে বললেন, "মাইজি, আপ বৈঠ যাইয়ে—"

হরমোহিনীও বিনয়ে হার মানবার লোক নন।

"নেই নেই আপ বৈঠিয়ে। হম্ ঠিক হ্যাঁয়—"

শেষ পর্যন্ত কিন্তু হরমোহিনীকে হার মানতে হল। বৃদ্ধ বিহারী ভদ্রলোকের সীটেই বসতে হল তাঁকে।

"আপনি এখানে বসুন—"

একটি কমনীয় কণ্ঠ ধ্বনিত হল গাড়ির অপর প্রান্ত থেকে। ব্রজেন্দ্রনাথ দেখলেন একটি রোগা মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ওধারের কোণের সীট থেকে। হাওয়ায় তার রুক্ষ চুল উড়ে উড়ে পড়ছে কপালের উপর, হাত দিয়ে সেটা ঠিক করে নিচ্ছে সে বারবার। চোখে হাই-পাওয়ার চশমা। শীর্ণ মুখ, রং কালো। কিন্তু মুখের হাসিটি কি সুন্দর! অনেকটা যেন ঊষার হাসির মতো।

"আপনি আসুন এখানে। আমি ওই দিকে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি—"

ব্রজেন্দ্রনাথের সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি আর মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করলেন না। তাঁর মনে হল ঊষাই তাঁকে ডাকছে। কিন্তু চাকরটা জিনিসপত্র নিয়ে একটা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িতে উঠেছিল, তাঁর চিন্তা হল সে ঠিকমতো উঠতে পেরেছে কিনা। এ-ও তাঁর মনে হল এই ব্যাপার নিয়ে হরমোহিনী হয়তো চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তাঁর দিকে চেয়ে কিন্তু অবাক হয়ে গেলেন তিনি। মুখে চিন্তার লেশ নেই। হাসিমুখে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছেন সেই বিহারী ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভদ্রলোকও একেবারে গদ্‌গদ, মাতাজি মাতাজি বলে খুব গল্প করছেন কপাটে ঠেস দিয়ে। ....হুহু করে ধুলোর ঝড় বইছে। ওদিকের সব জানালাগুলো খোলা। ব্রজেন্দ্রনাথ একজনকে বললেন জানালাগুলো বন্ধ করে দিতে। একজন বিহারী হেসে বালিয়া জেলার ভাষাতে যা বললেন, তার মর্মার্থ—বন্ধ করতে বলছেন কেন বাবু। এ হাওয়া খুব ভালো হাওয়া, শরীরকে দুরস্ত্ করে দেয়। অসুখবিসুখ হয় না এ হাওয়া গায়ে লাগলে। সেই দিনই সকালে ব্রজেন্দ্রনাথ কাগজে পড়েছিলেন এই হাওয়ার কৃপায় দশজন ভবযন্ত্রণা থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তিনি আর তর্ক করলেন না। নীরবে হাসিমুখে বসে রইলেন।

সাহেবগঞ্জে নেমে আর এক সমস্যা। ওয়েটিং রুমের পশ্চিম দিকের জানালাটাই ভাঙা। অবাধে ধুলোর ঝড় ঢুকছে তার ভিতর দিয়ে। চেয়ার টেবিল সব ধুলোয় ভরতি। "এ ঘরে তো বসা যাবে না"—ব্রজেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন। "প্ল্যাটফর্মে তো দাঁড়ানও অসম্ভব" —শান্তকণ্ঠে বললেন হরমোহিনী। হরমোহিনীর শান্তভাব দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বাড়িতে যিনি পদে পদে অসহিষ্ণু বাইরে তিনি হঠাৎ এমন শান্ত হয়ে গেলেন কি করে। ব্রজেন্দ্রনাথ জানতেন না যে সুযোগ পেলে হরমোহিনী বড় সেনাপতি হতে পারতেন, যে সেনাপতির একমাত্র লক্ষ্য যুদ্ধ জেতা। হরমোহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, যেমন করে হোক মেয়ের বিয়ে তাঁকে দিতেই হবে। শুধু দিতে হবে না, মনের মতো করে দিতে হবে। এর জন্যে সব রকম কষ্টের সম্মুখীন হতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

পছিয়া হাওয়ায় ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

তিনি বিশুকে দিয়ে চেয়ার টেবিলগুলো ঝাড়াচ্ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "তুমি ওই দিকের কোণটায় বস না গিয়ে। ওখানে তো হাওয়া যাচ্ছে না—"

"আচ্ছা, আমি একবার দেখি গিয়ে—"

বেরিয়ে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তিনি। স্টেশন মাস্টারটি সেকেলে লোক। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, ঝাঁকড়া-গোঁফও কাঁচা-পাকা, ভুরু বেশ ঘন, তাতেও পাক ধরেছে। চোখ দুটি বড় বড় এবং রক্তাভ। শরীরটি নধর। গাল চিবুক চর্বি-স্ফীত। ব্রজেন্দ্রনাথের কথাগুলি শুনে তাঁর চোখ দুটিতে চাপা হাসি ফুটে উঠল।

বললেন, "ওয়েটিং রুমের জানালাটা আর আয়নাটা কালই রাত্রে চুরি গেছে—"

"চুরি গেছে! পাহারা থাকে না—"

"সব থাকে, তবু গেছে। আমাদের যা কর্তব্য তা করেছি, জি. আর. পি-কে খবর দিয়েছি। পেটমোটা খাকি হাফপ্যাণ্টপরা একজন দারোগা সাহেব পান চিবুতে চিবুতে এসেছিলেন, এসে তদন্ত করে রিপোর্ট লিখে নিয়ে গেছেন। ব্যস্, ব্যাপার ওইখানেই খতম হয়ে গেছে। আর কিছু হবে না। চোরাই মালও পাওয়া যাবে না, চোরও ধরা পড়বে না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। স্টেশন মাস্টার তাঁর চোখের দিকে চেয়ে গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি ফুটিয়ে বললেন, "স্বাধীনতা পেয়েছেন, আবার কি চান! কোন্ ক্লাসের টিকিট আপনার—"

"ফার্স্ট ক্লাসের—"

"ফার্স্ট ক্লাসের আজকাল কি অবস্থা তা তো দেখেই এলেন। থার্ড ক্লাস ওর চেয়ে ভালো। আমাদের কর্তারা তো আজকাল সব প্লেনে যাতায়াত করেন তাই ফার্স্ট ক্লাসের গদিই ছিঁড়ুক আর আয়নাই ভাঙুক, সেদিকে তাঁদের নজর দেবার দরকার হয় না। তাঁরা এখন নজর দিয়েছেন জনসাধারণ অর্থাৎ মুটে, মেথর, কিষাণ মজদুরদের যাতে উন্নতি হয়। তাই থার্ড ক্লাসে বনবন পাখা ঘুরছে। ওসব দাদন, বুঝলেন, ভবিষ্যৎ ভোটের জন্য দাদন—"

হঠাৎ তাঁর চোখ দুটোতে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল।

"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। বসুন—"

ব্রজেন্দ্রনাথ সামনের চেয়ারটায় উপবেশন করলেন। বললেন, "গরীব লোকরা এতকাল দুঃখভোগ করে এসেছে, স্বাধীনতা পাওয়ার পর তারা একটু সুখভোগ করুক তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের উপর এ অত্যাচার কেন—"

"আপনারা যে ভদ্রলোক। ওদের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই আপনাদের ওরা ক্রাশ্ করে ফেলতে চায়। আপনাদের গাড়ি খারাপ হবে, আপনারা ভালো খাবার পাবেন না, ভালো ওষুধ পাবেন না, আপনাদের ছেলেরা ভালো শিক্ষা পাবে না, চাকরি পাবে না। আর ওই কিষাণ মজদুরদেরও কি উন্নতি হচ্ছে ভেবেছেন? ওরা কি শিক্ষা পাচ্ছে? ওদের মাইনে বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাড়ির দোকান বেড়েছে—"

ব্রজেন্দ্রনাথের মনে হল আমাদের নেতাদের বিরাট বিরাট পরিকল্পনার ধর্ম বোধহয় বুঝতে

পারেননি ভদ্রলোক। বললেন, "সে যাই হোক, আমি এখন কি করি বলুন। আমাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। এই পছিয়া হাওয়াতে ওই খোলা জানালার সামনে তো বসে থাকা যাবে না। রেস্ট রুম আছে?"

"সব ভরতি!"

তারপর হঠাৎ গোঁফে আঙুল চালিয়ে বললেন, "তবে একটা ব্যবস্থা হতে পারে, যদি কিছু পয়সা খরচ করেন।"

"কি বলুন—"

"স্টেশন ইয়ার্ডে খানকয়েক করোগেটেড্ শীট পড়ে আছে। মালগুদামের ছাতের জন্যে এসেছিল, সব খরচ হয়নি। ইয়ার্ডে পড়ে আছে খানকয়েক। আপনি কুলি দিয়ে সেগুলো তুলে আনিয়ে ওই খোলা জানলার সামনে দাঁড় করিয়ে দিন, বাইরে থেকে ভিতরে তাহলে আর হাওয়া ঢুকবে না। আর অত হাঙ্গামা যদি না করতে চান, আমার ওই ইজিচেয়ারটা দখল করতে পারেন!"

"আমি তো একা নই। সঙ্গে স্ত্রীও আছেন—"

"ও, তা হলে ওই যা বললুম তাই করুন।"

একটু ইতস্তত করে ব্রজেন্দ্রনাথ আর একটি প্রশ্ন করলেন।

"আচ্ছা এখানে ভালো চা পাওয়া যাবে কি?"

"ভালো চা বলতে যা বোঝায় তা পাওয়া যাবে না। আমাদের ওই রেস্টুরেণ্টে আলকাতরার মতো কালচে রংয়ের খানিকটা গরম জল পাবেন অপরিষ্কার পেয়ালায়। তা খেয়ে যদি আপনার রাগ হয় ওইখানেই একটা 'কম্‌প্লেন্ট্ বুক' আছে তাতে লিখে দেবেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না।"

স্টেশন মাস্টার চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলেন ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে। তারপর 'ফিক্' করে হেসে ফেললেন। বললেন, "বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—ওরে ফাগুয়া—"

একটি ইউনিফর্ম পরিহিত কুলির আবির্ভাব হল দ্বারপ্রান্তে।

"রেস্টুরেণ্টের ম্যানেজারবাবুকে বল গিয়ে আমার জন্যে ভাল 'এক পট' চা আলাদা যেন করিয়ে দেন। এক্ষুনি চাই।"

ফাগুয়া চলে গেল।

"কোথায় আপনার করোগেটেড্ শীটগুলো আছে? আমি তাহলে ততক্ষণ সেগুলো নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি—"

স্টেশন মাস্টারমশাই নিজের বেরিয়ে একটা কুলিকে ডেকে সব বলে দিলেন। তারপর ভিতরে এসে বললেন, "চারটে কুলি লাগবে। ওদের একটা টাকা দিয়ে দেবেন।"

করোগেটেড্ টিন দিয়েও বিশেষ সুবিধা হল না। হাওয়ার বেগে দুবার পড়েই গেল। তৃতীয়বার কয়েকটা ইটের সাহায্যে দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব হলেও হাওয়া সম্পূর্ণভাবে রোধ করা গেল না। দু'পাশে ফাঁক থেকে গেল আর হাওয়া ঢুকতে লাগল তার ভিতর দিয়ে। হরমোহিনী চা খেলেন না। একাই 'একপট' চা খেয়ে ঘামতে লাগলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। ঘাম

হওয়াতে খানিকটা আরাম পেলেন। তারপর হঠাৎ হরমোহিনীর দিকে চেয়ে একটা শিক্ষালাভ করলেন সহসা। হরমোহিনী ওয়েটিং রুমের এককোণে ছোট একটা বিছানা পেতে পাশ ফিরে শুয়ে ছিলেন মুখ ঢেকে। মনে হচ্ছিল তিনি যেন সমস্ত প্রতিকূলতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। ওই আত্মসমর্পণটাই যেন বর্মের কাজ করছে তাঁর। ব্রজেন্দ্রনাথও তাই করলেন। হাওয়া, ধুলো, গরম সমস্ত অগ্রাহ্য করে বসে রইলেন মরিয়ার মতো। হঠাৎ তাঁর মনে হল— কেন এত কষ্ট সহ্য করছি? কি দরকার ছিল? মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে কি এতটা কৃচ্ছ্রসাধন না করলে চলত না? তাঁর বিবেক উত্তর দিল, না চলত না। আধুনিক যুগের সঙ্গে পা ফেলে যখন তুমি চলতে পারবে না তখন তোমাকে প্রাচীন প্রথাতেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, আর সে প্রথা মানতে হলে এসব কষ্ট অনিবার্য। তুমি পিতা, পিতার কর্তব্য তোমাকে পালন করতে হবে। তাঁর পিতৃবন্ধু মুখুজ্যে মশাইয়ের একটা উপদেশ মনে পড়ল। কোন কাজে সিদ্ধিলাভ করতে হলে অলস হয়ে বসে থাকলে চলবে না। সিদ্ধিলাভ করবার যত রকম উপায় তোমার মাথায় আসবে সবগুলোকে অনুসরণ করে দেখতে হবে। উদ্যম চাই, পুরুষকার চাই, তা না হলে কিছু হবে না।

হঠাৎ হরমোহিনী মুখের কাপড়টা সরিয়ে প্রশ্ন করলেন, "পূর্ণিয়ার দ্বিজেনবাবুকে কবে চিঠি দিয়েছিলে?"

"দিন সাতেক আগে। বেরুবার আগে একটা টেলিগ্রামও করেছি—"

"ওদের সঙ্গে আমাদের জানাশোনা নেই। ওঁদের বাড়িতে গিয়ে ওঠাটা কি ঠিক হবে? ওখানে যদি হোটেলে টোটেল থাকে সেইখানেই গিয়ে উঠব, বুঝলে—"

"ওসব শহরে হোটেল না থাকারই কথা। ডাকবাংলোয় উঠব। সেখানেও একটা চিঠি লিখে দিয়েছি—"

সাহেবগঞ্জ থেকে সক্‌রিগলি ঘাটে এলেন তাঁরা সন্ধ্যা প্রায় সাতটায়। তারপর স্টীমার। অসম্ভব ভিড় সেখানেও। ধাক্কাধাক্কি করে কোনমতে জায়গা পেলেন ফার্স্ট ক্লাসে। মনিহারিঘাটে পৌঁছলেন যখন, তখন রাত প্রায় দশটা। সেখানেও উঁচু পাড় ভেঙে জনতার ধাক্কা খেতে খেতে গিয়ে কোনক্রমে ট্রেনে উঠলেন। এ ট্রেনেও ভয়ানক ভিড়। হরমোহিনীকে কোনরকমে বসিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগলেন। এর পর কাটিহারেও নাকি আবার গাড়ি বদলাতে হবে! হরমোহিনী সমস্ত দিন কিছু খাননি। গাড়ির জানালা দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন সামনেই একটা খাবারের দোকান।

"তোমার জন্যে কিছু খাবার কিনব? ভালো পানতোয়া রয়েছে—"

ব্রজেন্দ্রনাথ জানেন পানতোয়া মিষ্টান্নটি হরমোহিনীর খুব প্রিয়।

"কিছু কিনে নাও। পৌঁছে কাপড়চোপড় ছেড়ে খাব'খন।"

"এখনি খাও না। সমস্ত দিন তো উপোস করে আছ।"

"উপোস করলে আমি ভালোই থাকি।"

ব্রজেন্দ্রনাথের তখন মনে পড়ল হরমোহিনী ব্রত-এক্‌স্‌পার্ট। বহুরকম ষষ্ঠী, জয়মঙ্গলবার, শিবরাত্রি, অষ্টমী, নবমী—কিচ্ছু বাদ দেন না।

।। সতেরো।।

পূর্ণিয়া স্টেশনে নেমে ব্রজেন্দ্রনাথ আর হরমোহিনী অবাক হয়ে গেলেন। দ্বিজেনবাবুর দুই ছেলে তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এসেছে মোটর নিয়ে! এটা তাঁরা প্রত্যাশা করেননি। ব্রজেন্দ্রনাথের এ-ও মনে হল যদি তিনি খোলাখুলি দ্বিজেনবাবুকে পাত্রের কথা লিখতেন তাহলে তাঁর ছেলেরাই তো উত্তর দিয়ে দিতে পারত! কিন্তু সে কথা তিনি লেখেননি। লিখেছেন—'কোন কার্যবশত আমাকে পূর্ণিয়া যেতে হবে, সেই সময় আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনার সঙ্গে দেখা করার বিশেষ আগ্রহ এই জন্যে যে আপনি দেবেনের বন্ধু। আমার সঙ্গেও দেবেনের বন্ধুত্ব অনেককালের, সে আমার সাধারণ বন্ধু নয়, শ্রদ্ধেয় বন্ধু।' এই ভণ্ডামিটুকু না করলে ব্রজেন্দ্রনাথকে এই পথ-কষ্ট ভোগ করতে হত না। ভণ্ডামি করবার কারণ অবশ্যই ছিল। প্রত্যেকের কাছে মেয়ের বিয়ের জন্য মিনতিপূর্ণ চিঠি লিখতে অনেকদিন থেকেই তাঁর আত্মসম্মানে বাধছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন ভিখারীর পর্যায়ে নেমে যাচ্ছেন। তাছাড়া কুসুমিকার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনে মনে তিনি যেন ভিখারীর পর্যায়ে নেমে যাচ্ছেন। তাছাড়া কুসুমিকার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনে মনে তিনি যেন অপরাধী হয়ে পড়েছিলেন। হরমোহিনীর সামনে যদিও কথাটা তিনি প্রকাশ করতে পারেননি, কিন্তু নিজের অন্তরের মধ্যে তিনি অনুভব করেছিলেন যে কুসুমিকাই ঠিক পথ ধরে চলেছে, ওই আত্মসম্মানের পথ। কুসুমিকার সঙ্গে দ্বিজেনবাবুর ঘনিষ্ঠতা আছে, তাই তাঁকে মেয়ের বিয়ের কথাটা চিঠিতে জানাতে সংকোচ হয়েছিল তাঁর।

দ্বিজেনবাবুর দুই ছেলে সমর এবং অমরকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। যেমন চেহারা তেমন কথাবার্তা, তেমনি সভ্য আচরণ। যদিও কথাটা শুনতে হাস্যকর তবু তারা তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে দেখে শুধু পুলকিত নয়, বিস্মিত হয়ে গেলেন তাঁরা। আজকালকার অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না, অনেকে প্রণামই করে না, দেখা হলে মুচকি হাসে একটু। একজন তাঁকে বলেছিল, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নাকি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে বারণ করেছেন। তিনি কোথায়, কি সূত্রে কবে বারণ করেছেন তা তাঁর জানা নেই, কিন্তু একথাটা তাঁর অজানা নয় যে প্রধানমন্ত্রীর অনেক উপদেশই ছেলে-মেয়েরা পালন করে না। হঠাৎ এই উপদেশই পালন করবার দিকে তাদের এমন প্রবণতা কেন! এর যে অনিবার্য উত্তর তাঁর মনে জেগেছিল তা আনন্দজনক নয়। সমর এবং অমরকে দেখে তাই খুব ভালো লাগল তাঁর।

দ্বিজেনবাবু পক্ষাঘাতগ্রস্ত বটে, কিন্তু মোটেই জীবন্মৃত নন। বেশ জীবন্ত। পা দুটোই অবশ হয়েছে, শরীরের উপরার্ধ ঠিক আছে। তাঁর ছাত-কাঁপানো হাসি শুনে ব্রজেন্দ্রনাথের তাক লেগে গেল। বেশ বলিষ্ঠ লোক। ঘন ভুরু, পুরুষোচিত গোঁফ, দৃঢ় চিবুক, ব্যঞ্জনাময় চোখের দৃষ্টি, প্রশস্ত বুক, উন্নত ললাট দেখলে শ্রদ্ধা হয়। অল্পদিন হল রিটায়ার করেছেন। বয়স ষাটের কোঠায় এখনও পৌঁছায়নি। তাঁকে দেখলে মনে হয় বয়স পঞ্চাশের বেশী নয়। কথায় কথায় চোখ মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আর রসিকতার মাত্রা সামান্য বেশী হলে হা হা করে ফেটে পড়েন হাসিতে।

ব্রজেনবাবুকে বললেন, "আপনার পায়ের ধুলো আমার বাড়িতে পড়ল আমি কৃতার্থ হলাম। আর বৌদিও যে এসেছেন এতে কি খুশী যে হয়েছি তা বলবার নয়। দেবেনের কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি। দেবেনের ধারণা আপনি যদি প্রফেসারি লাইনে থাকতেন দেশের ঢের বেশী উপকার হত। আপনার ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান দেখে সে মুগ্ধ।"

ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন, "দেবেন বাড়িয়ে বলেছে। দুজনে বন্ধুত্ব ছিল তো খুব!"

"প্রফেসারি লাইন আপনি ছেড়ে দিলেন কেন—"

"প্রফেসার থেকে আমি প্রিন্সিপালও হয়েছিলাম, আর সেইটেই হল আমার কাল। কলেজে একজন নতুন প্রফেসর নেওয়া হল। আমি একটি ফার্স্ট ক্লাস ছেলেকে রেকমেণ্ড করেছিলাম। কিন্তু তাকে নেওয়া হল না। নেওয়া হল একটি থার্ড ক্লাস ক্যাণ্ডিডেট্‌কে, সে একজন হোমরা-চোমরা মেম্বারের জামাই বলে। এর পর আর চাকরি করতে পারলাম না। ইস্তফা দিয়ে চলে এলাম। আর একটা কলেজে প্রফেসারির চাকরি পেয়েছিলাম কিন্তু আমার এক মাড়োয়াবি ছাত্র সুন্দরমল আমাকে আর চাকরি নিতে দিলে না। এক হিসেবে ভালই হয়েছে। আর্থিক কষ্ট আর নেই, যখন প্রফেসার ছিলাম বাঁয়ে আনতে ডাইনে কুলোতো না। এখন দু'দিকেই কুলুচ্ছে। গিন্নী খুশী আছেন।"

ঘর কাঁপিয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন দ্বিজেনবাবু। তারপর বললেন, "দেশের ছেলে-মেয়েরা কিন্তু আপনার মতো একজন প্রফেসর তো হারালো।"

ব্রজেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "আপনি ওকথা বলছেন বটে, কিন্তু আমাদের দেশ সত্যিই কি গুণীকে চায়? আমার মনে হয় চায় না। গুণীরা দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও সুখে থাকত যদি সত্যিকার শ্রদ্ধা পেত। তাদের শ্রদ্ধাও করে না কেউ। আমার ক্লাসে সত্যিকার ভালো ছেলে ছিল মাত্র গুটিকয়েক। বাকী সব জানোয়ার। ক্লাসে বসে সিটি মারত, শেয়াল কুকুরের ডাক ডাকত। কথায় কথায় স্ট্রাইক আর হুজুক। সুপারিশ করে নম্বর বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা, না বাড়িয়ে দিলে রাস্তায় ঘাটে অপমান, অনেক সময় প্রহারও। একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় বা সিনেমা অভিনেতা তাদের কাছে যে খাতির পায় কোনও প্রথমশ্রেণীর অধ্যাপক তা পায় না। তাদের কাছে ভালো প্রফেসারের চেয়ে মন্দ প্রফেসারের দর বেশী। যে প্রফেসার তাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করে, তাদের হৈ-হুল্লোড়ে মাতে, তাদের আবদার শোনে, নম্বর বাড়িয়ে দেয়, পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়, তারাই তাদের চোখে ভালো প্রফেসার। ছেলে-মেয়েদের বাপ-মায়েরাও চান না যে ছেলে মানুষ হোক, তাঁরা চান ছেলে পাস করুক। তাঁদের কাছেও ভালো প্রফেসারের কদর নেই। তাই ভালো ছেলেরা আজকাল প্রফেসারি লাইনে যেতে চায় না। তারা ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়ার হচ্ছে, শাসন-বিভাগে বড় অফিসার হবার চেষ্টা করছে। ওই সব লাইনে গেলেই আজকাল কদর হয়, পয়সাও হয়।"

দ্বিজেনবাবু হেসে বললেন, "আপনি যা বললেন তা ঠিকই। দেশের অবস্থা সব দিক দিয়েই শোচনীয়, কিন্তু বিশেষ করে এই জন্যেই দেশের শিক্ষা-বিভাগে ভালো লোক থাকা দরকার!"

"কিন্তু আমাদের স্বাধীন গভর্নমেণ্টের যে রকম কাণ্ডকারখানা তাতে কোনও আত্মসম্মানী লোক শিক্ষা-বিভাগে থাকতে পারবে না—"

"সেই জন্যেই দেবেন গভর্নমেণ্ট সংস্পর্শবর্জিত স্কুল খুলছে একটা। আপনি শুনেছেন বোধহয়—"

"শুনেছি। কুসুম আমার কাছে এসেছিল। সে আমার মেয়ে উষাকে নিয়ে যেতে চাইছিল তাদের স্কুলে। কিন্তু আমার গিন্নী তাতে আপত্তি করলেন, আমারও মনে হল ও পারবে না। ওর বিয়েই দিতে হবে। হ্যাঁ ভালো কথা, কুসুম বলছিল আপনার জানা একটি ভালো পাত্র আছে নাকি? চাটুজ্যে তাদের উপাধি?"

দ্বিজেনবাবু দু'এক মিনিট ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন। তারপর বললেন, "ও হ্যাঁ, আছে। গয়ার গিরিন চাটুজ্যের ছেলে। ছেলেটি খুব ব্রিলিয়াণ্ট নয়, একবার আই. এস-সি ফেল করেছিল। এম. বি. বি. এস.ও বোধহয় একবারে পাস করতে পারেনি। তারপর গিয়েছিল বিলেত। সেখানেও বার দুই ঘোলটান খেয়ে শেষে এফ. আর. সি. এস. টা পাস করেছে। ভালো চাকরিও পেয়েছে একটা। তবে ওর কাঁধে লায়াবিলিটিও অনেক। দুটি অবিবাহিতা ভগ্নী আছে। দুটি ভাইও এখনও স্কুলে পড়ছে। নিজেদের বাড়ি আছে অবশ্য। গিরিনবাবুরও টাকা আছে। আপনি যান না, দেখে আসুন। চিঠিপত্র লিখে সুবিধা হবে না। মেয়েকে যেখানে দিতে হবে সেখানে নিজে গিয়ে সব দেখে শুনে আসাই ভালো। গিরিন চাটুজ্যে লোক খারাপ নয়। আপনি বলেন তো আমি চিঠি লিখে দিতে পারি একটা!"

"ভদ্রলোক করেন কি?"

"বিড়ির ব্যবসা করেন। ওখানে পরিচিত মহলে উনি বিড়িবাবু বলেই পরিচিত। বিড়ির ব্যবসা করে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছে মশাই। একটু কন্‌জুসও আছে। মোটর টোটর নেই, বাইরের কোন বহ্বাড়ম্বরও নেই। আড়ময়লা ফতুয়া গায়ে, পায়ে কেড্‌স-এর জুতো পরে ছাতি ঘাড়ে নিয়ে পায়ে হেঁটেই বিশ্বজয় করে বেড়াচ্ছে! আলাপ করে আসুন।"

"বেশ তাই যাব—"

"কি নাগাদ যাবেন, আজই তাহলে চিঠি লিখে দি একটা—"

"এখান থেকে ফিরেই যাব। এই ধরুন, আগামী রবিবার—"

"বেশ। সেই রকমই লিখে দিচ্ছি তাহলে—"

হরমোহিনী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু অবাক নয়, হতভম্ব। এতদিন ধরে যে দুটো ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে ছিল সে দুটোই যে বানচাল হয়ে গেল। এরা চক্রবর্তী, কিন্তু কি ভদ্র এদের ব্যবহার, কি আভিজাত্যপূর্ণ আচরণ! এরা বাঙাল, কিন্তু বউদের খাটায় না তো! বউরা কুটোটি পর্যন্ত নাড়ে না। চাকর, রাঁধুনী, দাই, বেয়ারাতে বাড়ি ভরতি! অবাক কাণ্ড!

।। আঠার।।

গিরিন চাটুজ্যেও স্টেশনে লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রজেনবাবু তাঁর বাড়িতে উঠলেন না। একটা হোটেলেই উঠলেন গিয়ে। তারপর স্নানাহার সেরে বিকেলের দিকে গেলেন তাঁর

বাড়িতে। এখটা রিক্‌শা করেই গেলেন। দেখলেন রিক্‌শাওলারাও তাঁকে বিড়িবাবু বলে চেনে। কারণ যে লোকটি তাঁকে নিতে এসেছিল সে রিক্‌শাওলাকে কেবল বললে—'বিড়িবাবুকা মকান যানা হ্যায়।' অমনি সে চলতে লাগল। হরমোহিনীর গোড়া থেকেই 'বিড়িবাবু' নামটা পছন্দ হয়নি। যেতে যেতে বললেন, "এখানে এসেছি যখন, তখন চল একবার দেখে আসি, কিন্তু এখানে মেয়ের বিয়ে দেব না। 'বিড়িবাবু' যার নাম তার সঙ্গে কুটুম্বিতা করা যায় না কি?"

ব্রজেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, "ইংরেজিতে একটা কথা আছে—What is in a name.অন্য সব দিকে যদি ভালো হয় নামে কিছু আসবে যাবে না।"

গলির গলি তস্য গলির মধ্যে একটি ত্রিতল বাড়ি। হঠাৎ মনে হয় যেন একটা খাঁচা, কিংবা বাড়ির কঙ্কাল। বাড়িতে বহুকাল রং পড়েনি। বাড়ির সামনেই সারি সারি অনেকগুলো লোহার-গরাদ-দেওয়া জানালা। আশপাশে রঙের কোনও চিহ্ন নেই। বাড়ির দেওয়ালে শুকনো শ্যাওলার কালো দাগ। বিড়িবাবু বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। শুধু গা, পরনের কাপড়টা মনে হল ন'হাতি। পায়ে জুতো নেই, খড়ম।

রিক্‌শা থামতেই সোচ্ছ্বাসে সংবর্ধনা করলেন।

"আসুন আসুন আসুন। আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

ব্রজেন্দ্রবাবু চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হল যেন একটা পাতিহাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠল। মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পাতিহাঁসের কণ্ঠস্বরের যে এতটা সাদৃশ্য থাকতে পারে তা তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল।

"আসুন আসুন ভিতরে আসুন। বল্‌ভদ্দরজী পাংখা খোল দিজিয়ে—"

তারপর হরমোহিনীর দিকে ফিরে বললেন—"মালক্ষ্মী, আপনি ভিতরে যান। ওগো এঁবে ভিতরে নিয়ে যাও।"

আধঘোমটা-দেওয়া একটি স্থূলাঙ্গিনী মহিলা ভিতর থেকে বাইরে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে হরমোহিনী অন্তঃপুরে চলে গেলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বাইরের ঘরে গিয়ে বসলেন। বাইরের ঘরে একটি কাঠের টেবিল এবং তার দু'পাশে দুখানি কাঠের হাতল-হীন চেয়ার। দেওয়ালে একটি মাত্র ফোটো। সেটি বিড়িবাবুর। নামাবলী গায়ে, হাতে মালা, চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত। টেবিলের উপর একটি মাত্র লাল মলাটের প্যামফ্লেটগোছের বই রয়েছে, তার উপরে প্রথমেই বড় দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা রয়েছে 'বিড়ি বার্তা', তার একটু নীচে ব্র্যাকেটের মধ্যে ইংরেজি ছোট অক্ষরে (Biri News)। ঘরে আর কোন আসবাব নেই।

বিড়িবাবু বললেন, "এইখানেই বসুন। আমার বন্ধু নবীনবাবু এখনই আসবেন। তাঁকেও আসতে বলেছি। বল্‌ভদ্দরজী—"

বল্‌ভদ্দরজী (বলভদ্রজী) বিড়িবাবুর চাকর।

"কহিয়ে—"

"আপ নবীনবাবুকো খবর দিজিয়ে যে ব্রজেন্দ্রবাবু আ গয়েঁ হেঁ।"

"তুরন্ত যাতা হুঁ। চায় কা পানি চঢ়া দিয়া উতারকে যায়েঙ্গে না?"

"ঠিক হ্যয়। উতারকে পাত্তি ভিজাকে, তব যাইয়ে—"

ব্রজেন্দ্রনাথের মনে হল বল্‌ভদ্দরজী বোধহয় বিড়িবাবুর একমাত্র চাকর। বিড়িবাবু তার সঙ্গে এরকম সম্ভ্রমপূর্ণ ভাষায় কথাবার্তা কইছেন দেখে একটু বিস্মিত হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। যাই হোক বল্‌ভদ্দরজীকে আর যেতে হল না, নবীনবাবু নিজেই এসে পড়লেন। সরু লিকলিকে চেহারা। মুখে ছুঁচলো পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর পাকা চুলে তেড়ি দেখে মনে হয় ভদ্রলোক এককালে শৌখিন ছিলেন। আড়ময়লা প্যান্টের উপর বুশর্শাট পরে এসেছিলেন। বাঁ হাতটা উত্তোলন করে হাসিমুখে সংবর্ধনা করলেন ব্রজেন্দ্রনাথকে। তারপর হেসে বললেন, "দেখা হয়ে খুশী হলাম। আপনি শুনে সুখী হবেন, আমরা সবাই আপনার মিলেরই গেঞ্জি ব্যবহার করি।"

ব্রজেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। নবীনবাবুর বসবার চেয়ার ছিল না। বিড়িবাবু আবার তাঁর বল্‌ভদ্দরজীকে ফরমাশ করলেন—"বল্‌ভদ্দরজী, আউর এক কুরসী লে আইয়ে।"

টিনের একটি চেয়ার দিয়ে গেল সে।

ব্রজেন্দ্রনাথ হঠাৎ লক্ষ্য করলেন বিড়িবাবুর সঙ্গে নবীনবাবুর চোখের ইশারায় কি যেন একটা কথা হয়ে গেল।

"জগুকে ফোন করেছিলেন নবীনবাবু?"

"করেছি। সে এক্ষুনি আসছে।"—এ কথা বলে নবীনবাবু ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললেন, "জগু হচ্ছে এঁর ছেলে, এখানকার হাসপাতালেই কাজ করছে এখন। হীরের টুক্‌রো ছেলে—যদি ভগবানের ইচ্ছেয় আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা হয়—তখন দেখবেন—"

ব্রজেন্দ্রনাথ বিড়িবাবুকে প্রশ্ন করলেন—"ইনি কে, পরিচয় করিয়ে দিলেন না তো—"

প্যাঁক প্যাঁক করে উঠলেন বিড়িবাবু।

"আরে আরে মস্ত ভুল হয়ে গেছে। ইনি নবীনবাবু, আমার বন্ধু, আমার দক্ষিণহস্ত। আমার ব্যবসায় দেখাশোনা করেন, তাছাড়া হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস্‌ও করেন। খুব হাতযশ। জগু যখন ইস্কুলে পড়ত, তখন উনি ওর প্রাইভেট টিউটারও ছিলেন। জগুকে আমার চেয়ে উনিই ঢের বেশী চেনেন। ওই রোগা চেহারা, কিন্তু ওস্তাদ লোক—"

ক্যাঁক ক্যাঁক করে হেসে উঠলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। এমন সময় ভিতর থেকে ডাক এল। বল্‌ভদ্দরজী এসে বললেন মাতাজি সকলকে উপরে যেতে বলছেন। উপরে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ দেখলেন—সেকেলে চকমিলানো বাড়ি। দোতলার চারদিকে ফালি বারান্দা, সেগুলিও লোহার গরাদে দিয়ে ঘেরা। গরাদের উপর আবার ক্যাম্বিসের পরদা টাঙাবারও ব্যবস্থা আছে। ব্রজেন্দ্রনাথের আবার খাঁচার উপমাটা মনে পড়ল।

ওঁরা উপরে গিয়ে শোবার ঘরেই বিছানার উপর বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে বল্‌ভদ্দরজী তিনটি ছোট ছোট টেবিল এনে রাখল ঘরের ভিতর। চা এবং জলখাবার এল তারপর। প্রচুর জলখাবার। সিঙ্গাড়া এবং কচুরির বেয়াড়া সাইজ। এ ছাড়া মিষ্টিও অনেক রকম। মামুলী বিনয়-বচনের আদান-প্রদান হল যথারীতি। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "এতো খেতে পারব না।"

বিড়িবাবু হাত কচলে কচলে হাসতে হাসতে বললেন, "সামান্যই তো দেওয়া হয়েছে। আপনাদের মতো লোককে খাওয়াবার সাধ্য কি আমার আছে!"

ব্রজেন্দ্রনাথ টেনিস বলের মতো কচুরিটি তুলে নিলেন এবং চা দিয়ে সেইটেই খেলেন কেবল। কচুরিটি ভালো কিন্তু চা অত্যন্ত খারাপ। নবীনবাবু কিন্তু কিছু ফেললেন না। সব খাবারগুলি নীরবে খেলেন বসে বসে।

এর পরেই জগু এসে পড়ল। কালো রং, রোগা, বেঁটে, মাথার সামনের দিকে চুল নেই। পরনে হাফশার্ট আর প্যাণ্ট। চোখে মুখে সপ্রতিভ সবজান্তা ভাব।

নবীনবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

"ইনিই বিখ্যাত ব্রজেনবাবু, সুন্দর গেঞ্জি মিলের মালিক এবং সম্ভবত তোমার উড-বি শ্বশুর—"

জগু একটু মুচকি হাসল শুধু। প্রণাম তো করলই না, নমস্কার পর্যন্ত করল না। তার মুখে একটা মুরুব্বিসুলভ ভাব ফুটে উঠল বরং—ভাবটা যেন, ও আমাকে দেখতে এসেছে, ও, তা তো আসবেই। তারপর সে নবীনবাবুকে বলতে লাগল—কোথায় কোথায় তার চাকরির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কথা শুনে মনে হল সবাই যেন তাকে চাকরি দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে। নবীনবাবু তার কথা শুনতে শুনতে ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে চাইতে লাগলেন, তাঁর দৃষ্টির অর্থ, শুনছেন? শুনুন ! জগু নবীনবাবুকে শেষে বললেন, "আপনার ফোন পেয়েই আমি এলাম। আমাকে এখুনি আবার চলে যেতে হবে। একটা স্ট্র্যাংগুলেটেড্ হার্নিয়া কেস এসে অপেক্ষা করছে। বোধহয় সেটাকে এখনই 'ওপন্' করতে হবে। আমি চলি—"

এই বলে তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খেয়ে চলে গেল সে। বিড়িবাবু বললেন, "চলুন আমার বাড়িটা আপনাকে দেখাই।" ব্রজেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলেন বাড়িটা। সত্যিই বাড়িটি একটি খাঁচা বিশেষ। তেতলার বারান্দা থেকে উঠোনের দিকে চেয়ে মনে হল যেন কুয়োর ভিতর উঁকি দিচ্ছেন। অনেকগুলি ঘর। কয়েকটি ঘরে বিড়ির পাতা, আর বিড়ির তামাক ঠাসা। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন, বাড়িতে একটি বই নেই। খবরের কাগজও না। একটি ঘরে দেখলেন একটি সুন্দরী মেয়ে একটি শিশু কোলে করে বসে আছে। ব্রজেন্দ্রনাথকে দেখে ঘোমটা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিড়িবাবু বললেন, "এটা আমার ভাইপো-বউ।" ব্রজেন্দ্রনাথের মনে হল যেন বন্দিনী হয়ে আছে! ফিরে আসবার মুখে বিড়িবাবু বললেন, "একটা কথা বোধহয় আপনি জানেন না। আপনার মেয়েকে আমরা দেখেছি—"

"কোথায়—"

"আপনি গতবার যখন দিল্লী এক্‌জিবিশনে গিয়েছিলেন, আপনার মেয়ে সঙ্গে ছিল তো?"

"হ্যাঁ—"

"সেই এক্‌জিবিশনে আমি আর নবীনবাবু ছিলাম—। মেয়ে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। আমার ছেলেকেও তো দেখলেন, এখন বাকি কথাবার্তাগুলো হয়ে গেলেই ব্যস্—"

ব্রজেন্দ্রনাথ ঘরে ফিরে এসে হেসে জিগ্যেস করলেন—"আপনার ডিমাণ্ড কি রকম—"

জিব কেটে বিড়িবাবু বললেন, "ছি, ছি, আপনার কাছে কি ডিমাণ্ড করতে পারি! আপনার যা খুশী দেবেন—"

নবীনবাবু একধারে একটু কাত হয়ে বসে একটা কাগজে কি কি যেন লিখছিলেন। লেখা শেষ করে বললেন, ডিমাণ্ড আমাদের নেই। কিন্তু মেয়ে জামাইকে আপনি তো কিছু দেবেন? আপনার খ্যাতি আর মর্যাদা অনুসারে আপনাকেও কিছু দিতে হবে তো! তাই আপনার হয়ে আমি এই লিস্টটা তৈরি করছিলুম। এর ওপর আপনি যা বাড়াতে চান বাড়াবেন বা কমাতে চান তো কমাবেন।"

বিড়িবাবু প্যাঁক প্যাঁক করে বলে উঠলেন—"না, না লিস্ট দেবেন না নবীনবাবু—"

মুখে একথা বললেন বটে, কিন্তু চোখ মুখের ভাব যা প্রকাশ পেল তা অন্যরকম। মুচকি মুচকি হাসছিলেন তিনি।

নবীনবাবু বললেন, "আহা, এটা ওঁরই সুবিধের জন্য দিচ্ছি। জাস্ট ফর এ গাইডেন্স।"

ব্রজেন্দ্রনাথ কাগজটা নিয়ে দেখলেন নবীনবাবু ত্রিশ হাজার টাকার ফর্দ করেছেন।

হরমোহিনী কেমন যেন মুষড়ে পড়েছিলেন।

রিক্শায় নীরবেই রইলেন দু'জনে পাশাপাশি। অবশেষে ব্রজেন্দ্রনাথই কথা বললেন, "এখানে বিয়ে দেব না!"

হরমোহিনী ছোট্ট উত্তর দিলেন—"রামোঃ।"

।। উনিশ।।

প্রায় মাসখানেক কেটে গেল। এর আগে যে কজনকে চিঠি লিখেছিলেন তাদের কেউই আর উত্তর দিলেন না। ক্রমশঃ আবার হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। হরমোহিনী কিন্তু হতাশ হবার লোক নন। তিনি এসে একদিন কড়া তাগাদা দিলেন।

"তুমি বেশ হাল ছেড়ে বসে আছ তো। এভাবে বসে থাকলে চলবে কি। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো।"

"আমি কি করব বল। চিঠি তো লিখেছি কয়েক জায়গায়। উত্তর না এলে কি করতে পারি।"

"ছেলেদের চিঠি লেখ আবার। ওরা বড় হয়েছে, উপযুক্ত হয়েছে, ওরাই ভার নিক।"

"ওদেরও তো লিখেছি। ওরা কয়েকটি পাত্রের সন্ধান তো দিয়েও ছিল, কিন্তু তোমারই তো পছন্দ হল না।"

"পছন্দ হবার মতো হলেই পছন্দ হত। যার তার হাতে তো মেয়ে দিতে পারি না। না, না, অমন বসে থাকলে চলবে না। ছেলেদের আজই চিঠি লেখ ফের।"

"লিখব।"

তিন ছেলেকেই আবার চিঠি লিখলেন তিনি।

অন্যান্য কথার পর লিখলেন, "উষার বিয়ের তো কোথাও ঠিক করতে পারলাম না এখনও। তোমরাও তো কিছু চেষ্টা করছ না। পাত্র নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। এ কাজ তোমাদেরই। তোমার মা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাগাদার জ্বালায় জীবন দুর্বহ করে তুলছেন আমার। আজকাল অবশ্য মেয়েদের অনেক বয়েসে বিয়ে হচ্ছে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মেয়ে তো ঘরে ঘরে। সে হিসেবে উষার এমন কিছু বয়স হয়নি। কিন্তু তোমার মায়ের আর তর সইছে না। আমাকে ক্রমাগত খোঁচাচ্ছেন। কিন্তু আমি কি করব বল, চেষ্টার ত্রুটি করছি না। কষ্ট করে পূর্ণিয়া আর গয়ায় গিয়েছিলাম তোমার মাকে নিয়ে। হল না। সবই অদৃষ্ট—"

তিন ছেলেকে একই চিঠি লিখলেন।

ছেলেদের চিঠি লেখার দিন দুই পরে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু শিবেন দত্তের চিঠি পেলেন। অনেকদিন আগে তাঁকেও চিঠি লিখেছিলেন উষার জন্যে পাত্র সন্ধান করতে। শিবেন তাঁর সহপাঠী ছিলেন। প্রফেসারি করতেন। এখন রিটায়ার করে ফার্মিং করছেন। নানারকম খবর-টবর রাখেন। বেশ মার্জিতরুচি লোক। অনেকদিন আগে চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে। কিন্তু উত্তর পাননি। হঠাৎ তাঁর চিঠি এসে হাজির হল।

ভাই ব্রজ,

নিশ্চয়ই চটে আগুন হয়ে আছ। তোমর চিঠির উত্তর অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভাই মনই চিঠির উত্তর দেয়, হাত বা কলম নয়। মনই ব্যাপৃত ছিল অন্যত্র। এতদিনে তার ছুটি হয়েছে। তুমি আমাকে তোমার কন্যাদায়ের সমস্যা সমাধান করতে বলেছ। প্রথমত আমার মনে হয় ওটা কোনও সমস্যাই নয়, আমরা নিজেরাই ওটাকে সমস্যা বানিয়েছি, নিজেদের স্বার্থের জন্য এবং নিজেদের অহংকারতৃপ্তির বাসনায়। আমাদের ইচ্ছা আমরা মেয়েকে যতদূর সম্ভব কম খরচে যতদূর সম্ভব ভালো পাত্রে সমর্পণ করব, যদি তার জাত কুল কুষ্ঠী আমাদের মজ্জাগত কুসংস্কারের অনুকূল হয়। এই অস্বাভাবিক সমস্যার কোন স্বাভাবিক সমাধান নেই। ওটা অনেকটা জিগ্‌শ পাজ্‌লের মতো। যদি মিলে যায় তো ভালোই, যদি না মেলে ধৈর্য হারালে চলবে না।

আমাদের দেশে আগে মেয়ে বিক্রি হত। অন্যান্য রত্নের মতো কন্যা-রত্নেরও কেনা-বেচা চলত। তার বাজার-দরও ভালো ছিল। এখনও এদেশের অনেক সমাজে কন্যা বেচা-কেনা চলছে। আমাদের সমাজে এর চেয়েও ঘৃণ্য ব্যবসা চলছে আজকাল। মেয়েকে সাময়িকভাবে বিক্রি করে অনেক পিতামাতা নিজেদের সংসার চালাচ্ছেন। স্ত্রীকে বিক্রি করতে বা সাময়িকভাবে ভাড়া দিতে অনেক স্বামীরও দেখছি আপত্তি নেই।

আমরা, মানে তথাকথিত সদ্‌ব্রাহ্মণেরা, মেয়েদের বিক্রি করতে চাইনি, দান করতে চেয়েছিলাম কুলীনবংশোদ্ভব সৎপাত্রের হাতে। দানের সঙ্গে দক্ষিণা দিতে হয়। ক্রমশ ওই দক্ষিণার পরিমাণটা বাড়তে বাড়তে 'পণে' রূপান্তরিত হয়েছে, কন্যারাও আর রত্ন নেই, হয়েছেন গলগ্রহ। কুলীনদেরও রূপান্তর ঘটেছে। নবধা-কুল-লক্ষণ-যুক্ত কুলীনদের সমাজ-

কৌলিন্য এখন আর নেই, এখন অর্থ-কৌলিন্যই একমাত্র কৌলিন্য এখন আচার বিনয় বিদ্যা নয়, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ি গাড়ি—এই সবেরই কদর বেশী। আমরা দুরকম কুলীনকেই একপাত্রে চাইছি। তা কি পাওয়া যায়? সোনার পাথরবাটি কবিকল্পনাতেই সম্ভব। যুগ বদলাচ্ছে, তোমাকেও বদলাতে হবে।

আমার জানাশোনা একটি পাত্র আছে। ছেলেটি বারেন্দ্র। শাস্ত্রের মানদণ্ডে নিখুঁত কুলীন হয়তো নয়, একটু-আধটু খাদ আছে, কিন্তু ছেলেটি ভালো। সুরূপ, বিদ্বান এবং ভালো চাকরিও করে। মেকানিকাল ইন্‌জিনিয়ার। তার বাপও গভর্নমেণ্ট প্লীডার ছিলেন। প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন, কিন্তু আটটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, অনেক রুধির ক্ষয় হয়েছে। সম্প্রতি কিছু হীনবল। ওই ছেলেটিই তাঁর একমাত্র ছেলে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমি ওঁদের বলতে পারি। আমাকে খাতির করেন। পণ হয়তো কিছু দিতে হবে কিন্তু কচ্ছপের কামড় আছে বলে মনে হয় না।

আর একটি পাত্র আছে, সেটি কায়স্থ, আমারই বড় ছেলে। সে এবার আই. এ. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা তো আছেই, কুটুম্বিতা হলে আরও সুখী হব। ছেলের মত আছে। পণের কোনও দাবি নেই। তবে আমাদের পরিবারের সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। আমার বড় মেয়ে বিয়ে করেছে একজন ব্রাহ্মণের ছেলেকে। লাভ ম্যারেজ। আমি কোনও আপত্তি করিনি, যুগের হাওয়াকে মেনে নিয়েছি।

এই প্রসঙ্গে বিপত্নীক নিকুঞ্জবাবুর কথা মনে পড়ছে। তাঁর একটি মেয়ে ছিল। দেখতে পরী নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। তার নামে যখন বার বার প্রেমপত্র আসতে লাগল তখন বিব্রত হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। একবার একজন প্রণয়ীকে ধরেছিলেন তিনি। তাকে জিগ্যেস করেছিলেন, তুমি কি একে বিয়ে করবে? সে বললে, বিয়ে? আচ্ছা বাবাকে জিগ্যেস করে আসি। প্রেম করবার আগে বাবাকে জিগ্যেস করবার প্রয়োজন অনুভব করেনি ছোক্‌রা। বলা বাহুল্য, কাপুরুষটা আর ফিরল না।

নিকুঞ্জবাবুর বিপদ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। বাড়িতে স্ত্রী নেই, তাঁকেই মেয়ে পাহারা দিতে হত। সুসভ্য বাংলাদেশের মেয়েকে বাড়িতে একা রেখে নির্ভয়ে বেরুনো যায় না। খবরের কাগজে প্রত্যহ যে সব খবর বের হয় (সম্ভবত সেগুলি সত্য খবর) তা পড়লে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

নিকুঞ্জবাবুর পৈতৃক অর্থ ছিল কিছু, ব্যাঙ্কে ফিক্‌সড্ ডিপজিট। তার সুদ পেতেন এবং ঘরে বসে টাইপ করতেন। ভাঙা টাইপরাইটার একটা ছিল তাঁর। তাঁর দু'একজন হিতৈষী বন্ধু তাঁর টাইপের কাজ যোগাড় করে দিতেন। আমিও তাঁকে দিয়ে আমার থীসিস্‌টা টাইপ করিয়েছিলাম। নির্ভুল টাইপ করতেন। পিতাপুত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন কোনক্রমে চলত এই সামান্য আয় থেকে। কিন্তু মেয়ের বিয়ের খরচ জোটানো সম্ভবপর ছিল না। মেয়েকে বাড়িতেই পড়াতেন তিনি। প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাসও করেছিল মেয়েটি। শেষকালে মরিয়া হয়ে এক অসমসাহসিক কাজ করে বসলেন নিকুঞ্জবাবু।

স্ত্রী ছিল না বলেই বোধহয় পেরেছিলেন, স্ত্রী থাকলে পারতেন না।

তিনি এক ইংরেজি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেন। সারমর্ম হচ্ছে—আমার একটি

আঠারো বছরের মেয়ে আছে। মেয়েটি রূপসী নয়, কুৎসিতও নয়। স্বাস্থ্যবতী। যে-কোনও জাতের এবং যে-কোনও প্রদেশের ভদ্র ছেলের হাতে আমি এ মেয়েকে সম্প্রদান করতে রাজী আছি, যদি তিনি মেয়েটিকে বিনাপণে গ্রহণ করতে সম্মত থাকেন।

কোনও বাঙালী যুবক এগিয়ে এল না। তারা প্রেম করতে প্রস্তুত, বিয়ে করবার তাগদ নেই।

এগিয়ে এলেন একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক। ভারত গভর্নমেণ্টে পদস্থ অফিসার একজন। বিনা আড়ম্বরে বিয়ে হয়ে গেল। তারা এখন সুখে আছে। খবর নিয়েছি মেয়েটির দুটি ছেলে হয়েছে। নিকুঞ্জবাবু কন্যাদায়মুক্ত হয়েছেন। আমি এই ধবনের আরও খবর জানি। ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করেছে সোনার-বেনে। বাঙলী হিন্দু মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করেছে মুসলমান, পাঞ্জাবী এবং সিন্ধি।

তোমাকে এত কথা লেখবার উদ্দেশ্য—যুগ বদলেছে, তুমিও বদলাও। যে জাত নেই সে আঁকড়ে থেকো না। নূতন জাত তৈরি কর।

তোমার পত্রের আশায় রইলাম। ভালবাসা জেনো। ইতি—

তোমারই
শিবেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

ভাই শিবেন,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলাম। তুমি যা লিখেছ সবই ঠিক। তোমার সঙ্গে আমার মতের কিছু অমিল নেই। আমার একার মতে যদি বিয়ে হত তাহলে আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী হতাম। কিন্তু বিবাহ সামাজিক ব্যাপার। বিশেষ করে যে ব্যক্তিটির সঙ্গে এর সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সেই ব্যক্তিটিরই এতে আপত্তি। আমার মেয়ে অসবর্ণ বিবাহে রাজী নয়, যে নিয়ম আমাদের পরিবারে চিরাচরিত তার বাইরে সে যেতে চায় না। আমার স্ত্রী তো চানই না। সুতরাং আমি ভাই নাচার। আমার ভালবাসা জেন। ইতি—

তোমার
ব্রজেন্দ্রনাথ।

দিনকয়েক পরে কুসুমিকারও চিঠি এল একটি।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, প্রায় মাস তিনেক আপনাদের চিঠি পাইনি। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। কাল দ্বিজেনকাকার একটা চিঠিতে জানলাম আপনারা পূর্ণিয়া গিয়েছিলেন। দ্বিজেনকাকার কাছে পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন। সেখানে কি হল? জানাবেন। আমি কলকাতায় আর একটি পাত্রের খবর পেয়েছি। পাত্রটি ইন্‌জিনিয়ার। তার বাবা বড় উকীল। নীচে ঠিকানা দিলাম। আপনি তাঁকে চিঠি লিখে দেখুন। আমাদের স্কুল আরম্ভ হয়ে গেছে। পাকা বিল্ডিং এখনও হয়নি। বাবা খুব বড় বিল্ডিং করতে চাইছেন না। ছোট পাকা বাড়ি পরে হবে। এখন আমরা মাটির ঘরেই স্কুল শুরু করে দিয়েছি। এখানে অন্য কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু

ম্যালেরিয়ায় ভুগছি। এখানে আর একটা অসুবিধা, বড্ড সাপ। গোখরো সাপ। তিন চারটে মারা হয়েছে। আপনাদের খবর দেবেন। বাবার শরীরও ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁর উৎসাহ খুব। আপনি ও কাকীমা আমার প্রণাম নিন।

ইতি—

প্রণতা
কুসুমিকা।

।। কুড়ি।।

ব্রজেন্দ্রনাথের তিন ছেলেই কলকাতাতে ছিল। বাবার এবং মায়ের চিঠি পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল সবাই প্রথমটা। নরেন বলল, "বাবা কেন যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন তা তো বুঝি না। ব্যস্ত হলেই তো পাত্র জুটবে না—"

বরেন হেসে বলল, "বাবার চেয়ে মা-ই বেশী ব্যস্ত হয়েছেন। আর তিনিই ব্যস্ত করে তুলছেন বাবাকে—"

হরেন প্র্যাক্টিকাল লোক। সে ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, বিজ্ঞাপন না দিলে পাত্রের খবর পাওয়া যাবে না। আমরা রাস্তায় রাস্তায় কোথায় পাত্র খুঁজে বেড়াব। সব কাগজগুলোতে বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেলা যাক পোস্ট বক্সের নম্বর দিয়ে। খবর এলেই বাবাকে ঠিকানা পাঠানো যাবে। তারপর তিনি চিঠি লিখে ব্যবস্থা করুন। এ ছাড়া তো অন্য কিছু আমার মাথায় আসছে না—"

বরেন বলল, "হ্যাঁ, ওই ব্যবস্থাই ভালো। তাছাড়া আর একটা জিনিস করা দরকার। এদের সবাইকে বাবা মার কাছে পাঠিয়ে দাও—

"এদের মানে—"

"বউদিকে, শিউলিকে আর অরুণাকে।"

"তাতে লাভটা কি হবে?"

"ওরা গেলে বাবা মা দু'জনেই অন্যমনস্ক থাকবেন। যতদূর বোঝা যাচ্ছে ওঁদের এই ছট্ফটানির আসল কারণটা ঊষার বিয়ে নয়, আসল কারণ হাতে কোন কাজ নেই। এরা গেলে হাতের এবং মনের আর অবসর থাকবে না। বিশেষত জিরে, মৌরি আর লবঙ্গ গেলে বিয়ের কথা চাপাই পড়ে যাবে।

জিরে নরেনের ছেলে, মৌরি তার মেয়ে। লবঙ্গ বরেনের মেয়ে। হরেনের ছেলে মেয়ে হয়নি এখনও। অরুণার বয়স মাত্র কুড়ি। বিয়ে হয়েছে মাত্র এক বছর আগে।

তাই ঠিক হল।

এই উপলক্ষে বউদের মধ্যে গোপন যে কথাবার্তা হল তা উপভোগ্য। তিনজনই লেখাপড়া জানা আধুনিকা।

নরেনের বউ রূপ-রেখা মুচকি হেসে বরেনের বউ শিউলিকে বলল, "আমরা কেন যাচ্ছি জানিস? পীস্ মিশনে। বাবা কেনেডি, মা ক্রুশ্চেভ, আমি ম্যাকমিলান, তুই দি গ্যল, আর ছুট্‌কি আডেনয়ার—"

শেফালি হেসে লুটোপুটি।

"যুদ্ধটা কার সঙ্গে কার?"

"যুদ্ধ এখনও বাধেনি। সমস্যা নিউক্লিয়ার এনার্জি নিয়ে—"

"সেটা কার কাছে বেশী?"

"'এখনও বোঝা যাচ্ছে না সেটা—। বোধ হয় মা—"

অরুণা মুচকি হেসে বলল, "বেশ বোঝা যাচ্ছে মূর্তিমতী নিউক্লিয়ার এনার্জি হচ্ছে উষা।"

"ঠিক বলেছিস, কোন্ দিক দিয়ে যে ফেটে পড়বে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।"

তিনজনেই আবার হেসে উঠল।

।। একুশ ।।

তিন বউ একসঙ্গে এল না।

প্রথমে এল বড় বউ। সঙ্গে জিরে আর মৌরি। আসার আগে নরেনের ছোট একটা চিঠি—"বড় বউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কাছে। ওর শরীরটা এখানে খুব ভালো থাকছে না। প্রায়ই অম্বল হয়। ওখানকার জলহাওয়া ভালো, হয়তো উপকার হতে পারে। পাত্রের সন্ধান পেলেই আপনাকে জানাব। প্রণাম নেবেন।"

চিঠি পড়ে হরমোহিনী মন্তব্য করলেন—"অম্বল হবে না? যা লঙ্কা খাওয়ার ধুম। জিরে আর মৌরিকেও ওই মসলা-গরগরে তরকারি খাওয়ায়—"

ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, "ওদের নামকরণই করেছে মসলার নামে। মসলা-প্রীতি ওদের অসাধারণ।"

রূপ-রেখা যখন এল তখন কিন্তু তার চেহারায় কোনও রোগের লক্ষণ দেখা গেল না। ঢলঢলে মুখখানি ঠিক তেমনি ঢলঢলে আছে। রূপ-রেখা গৌরাঙ্গী নয়, শ্যামা। কিন্তু তার মুখশ্রী অপরূপ। তার রূপ একটুও কমেনি, বরং বেড়েছে। হরমোহিনী কিন্তু ছাড়লেন না, তাঁর মনে হল বাইরের ও রূপ ওপর-চকচকে রূপ। ভিতরে ভিতরে সর্বনাশা ডিস্‌পেপসিয়া ওকে জীর্ণ করছে।

বললেন, "এখানে শরীর সারতে এসেছ, খাওয়া-দাওয়ার একটু ধরা-কাট কারো। জিব সামলাতে না পারলে পেটের অসুখ সারে না।"

রূপ-রেখা আকাশ থেকে পড়ল।

"শরীর তো আমার খারাপ হয়নি। যা খাই বেশ হজম হয়। এখানে এসেছি এমনি বেড়াতে। কলকাতার ওই একঘেয়ে জীবন ভালো লাগছিল না। তাই চলে এলাম।"

"নরেন তবে যে লিখেছে তোমার প্রায়ই অম্বল হয়—"

"না তো। ওটা ওঁর নিজেরই বাই। নিজেরই অম্বল হয়, আঝালা সিদ্ধ তরকারী খান, ওষুধ তো লেগেই আছে, তবু অম্বলের কমতি নেই—"

রূপ-রেখা ফিক করে হেসে ফেললে।

জিরে চোখ বড় বড় করে বলল, "জান ঠা'মা, আমাকে বাবা এক্‌তা হাতি কিনে দিয়েছে। এত্‌তো বলো তাল শুঁল—"

মৌরি একটু বড়। তার কথা পরিষ্কার হয়েছে।

"কি যে বোকা জিরেটা! অত বড় শুঁড় কি করে হবে। হাতিটাই তো এত্‌তো টুকু। বড় বরং আমার পুতুলটা। শুইয়ে দিলেই চোখ বুজে ফেলে—"

জিরে আবদার ধরল—"ঠা'মা, আমাকেও ওই রকম পুতুল কিনে দাও না একটা—"

হরমোহিনী আর রূপ-রেখার অসুখের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলেন না। নাতি-নাতনীর সমস্যা নিয়ে পড়তে হল। কারণ মৌরিও পরক্ষণেই বলল, "আমাকেও তাহলে হাতি কিনে দিতে হবে। ওর চেয়ে বড় হাতি। অনেক অনেক বড়—"

"সব হবে সব হবে—"

নাতি-নাতনীকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন রূপ-রেখা কলের ময়দা নিয়ে মাখতে বসেছে। সে বড় বউ, এ বাড়িতে বেশ কিছুদিন এসেছে, সে জানে এ বাড়িতে অধিকার সাব্যস্ত করতে হলে অনুমতির অপেক্ষা চলে না। সে স্বল্পভাষিণী কিন্তু শক্ত মেয়ে। যা করবার তা সে করবেই। তার চরিত্র তার হোস্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস কারফরমা ভালো করেই জানতেন।

"হঠাৎ ময়দা বার করে বসলে যে বউমা?"

রূপ-রেখা বলল, "বাবা বললেন, আমার হাতের নিমকি খাবেন। লেবুর রস দিয়ে নিমকি করব আজ।"

"ভীমরতি ধরেছে তোমার বাবার। ডাক্তাররা ঘিয়ের খাবার ওঁকে খেতে বারণ করেছে জান?"

"দু'একখানা খেলে আর কি হবে।"

আসলে নিমকি খেতে চেয়েছিল উষা। বলেছিল, "বউদি তুমি যে সেই নেবু দিয়ে নিমকি করেছিলে, কি চমৎকারই যে হয়েছিল। আবার কর না—"

রূপ-রেখা সোজা চলে গিয়েছিল ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে।

"বাবা আপনার জন্যে নিমকি করব?"

"হ্যাঁ বেশ তো। তোমার হাতে নিমকিটা ওতরায় ভালো—"

ব্যস, রূপ-রেখা সোজা ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ময়দা বার করে মাখতে বসে গেল। হরমোহিনী থ' হয়ে গেলেন। কি কাণ্ড আজকালকার মেয়েদের! কারু তোয়াক্কাই করে না।

শিউলি এল দিন চারেক পরে। হঠাৎ এল, চিঠিপত্র না দিয়েই। রূপ-রেখা ছাড়া সবাই বিস্মিত হয়ে গেল।

"কি মজা, কি মজা। মেজ বৌদিও এসে গেছে। এবার চল একদিন বাগানে পিকনিক করে আসা যাক—" লাফিয়ে উঠল উষা।

হরমোহিনী শিউলিকে তুই-তোকারি করেন।

"তুই হঠাৎ চলে এলি যে—"

শিউলি সদা হাস্যমুখী। এই কথায় সে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল একেবারে। আসল কারণটা সে যেন আর চেপে রাখতে পারছিল না। পারলও না শেষ পর্যন্ত। বলল, "উনি বললেন বাবা মা উষার বিয়ের জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তুমি গিয়ে সামলাও ওঁদের।"

হরমোহিনী তাঁর বাঁ গালের উপর বাঁ হাতটি রেখে ঘাড়টি কাত করে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "তোমাদের খুরে খুরে পেন্নাম! আমরা কি কচি ছেলে যে সামলাতে এসেছ? আসল কাজের বেলায় তো সব নবডঙ্কা। যে পাত্রটির খবর দিয়েছিলে সেটি তো খবর নয়, গুজব। তাই বিশ্বাস করে চিঠি লেখালেখি করে হয়রান হলুম আমরা। ওগো শুনছো, ইনি এসেছেন আমাদের সামলাতে—"

রূপ-রেখা তখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল। গম্ভীরভাবে শিউলিকে ধমক দিয়ে বলল, "কেন মিছে কথা বলছিস? তুই তো পালিয়ে এসেছিস স্যাকরার তাগাদার ভয়ে। জানেন মা, ও লুকিয়ে একটা হার গড়িয়েছে, তার 'বানি' দিতে পারেনি এখনও। সেই ভয়ে পালিয়ে এসেছে--"

শিউলি আবার একবার হেসে লুটিয়ে পড়ল। সত্যিই সে হার গড়িয়েছিল একটা আর সত্যিই তার 'বানি' বাকি আছে। গয়নার নামে হরমোহিনী এই বুড়োবয়সেও উল্লসিত হয়ে ওঠেন।

বললেন, "হার গড়িয়েছিস নাকি? ভালই করেছিস। কই দেখি কি রকম হার—বাঃ, বেশ সুন্দর প্যাটার্ন তো। কত বানি চেয়েছে—"

"একশ' টাকা—"

"সে আমি দিয়ে দেব'খন" --হঠাৎ খুব প্রসন্ন হয়ে গেলেন তিনি। হারটি উলটে পালটে দেখতে লাগলেন।

শিউলির মেয়ে লবঙ্গর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথেরই ভাব বেশী। সে গিয়ে তাঁর কোল দখল করে বসেছিল এসেই।

অরুণাও যখন দিন সাতেক পরে এসে গেল, তখন হরমোহিনীর মনে সন্দেহ হল ভিতরে একটা নিগূঢ় ব্যাপার আছে কিছু। এরকম একজোট হয়ে সবাই চলে এল এর মানে কি। অথচ ঘরের বউ, তারা এসেছে, তা নিয়ে বেশী আলোচনা করাটা একটু অশোভন। ওরা ভাববে—ওরা যে কি ভাববে, কি যে না ভাববে—তা হরমোহিনীর কল্পনার অতীত। আজকালকার মেয়েদের কাণ্ডকারখানা দেখে হরমোহিনী উত্তরোত্তর বিস্মিতই হচ্ছেন। কোন কূলকিনারা

পাচ্ছেন না। সেকালে কি বউরা এমন 'হুট্' করে নিজের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যেতে পারত? এখনকার বউরা পারে। পারবে না কেন? ছেলেরাই যে কমজোর হয়ে গেছে সব। আজকাল বউরা তাদের ইয়ার। ইয়ারের উপর জোর চলে না। ঘোড়া বোঝে তার পিঠের সওয়ার কি রকম। সেই ভাবেই চলে। আর শাশুড়ীদের তো আজকাল কিছু বলবার জো নেই। নিজের মান বাঁচিয়ে মুখটি বুজে সব সহ্য করতে হয়। কিছু বললেই অশান্তি। হরমোহিনীর এসব চিন্তা নিতান্তই ব্যক্তিগত। মুখে ফুটে এসব কথা বলেন না কাউকে। এমন কি ব্রজেন্দ্রনাথকেও নয়। তিনি জানেন, বলে লাভ নেই। স্রোতের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। মাঝ থেকে অশান্তি হবে কেবল।

অরুণা যদিও বউদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট তাকেই কিন্তু মনে মনে সবচেয়ে বেশী ভয় করেন হরমোহিনী। ইংরেজিতে এম.এ.পাস। দেখতে সুন্দরী। ভারী গম্ভীর। হরমোহিনী ওর সঙ্গে বেশ সহজ হতে পারেননি। আড়াল থেকে ওর হাবভাব যা লক্ষ্য করেছেন তাতে তাঁর মনে হয়েছে মাথায় ছিট আছে মেয়েটির। বারবার আয়নায় মুখ দেখে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই হাসে। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তার হাসিমুখটা কেমন দেখাচ্ছে। গুনগুন করে গান গায় আপনমনে। আপনমনে কথাও বলে। একা একা কথা বলে, কিন্তু লোকের সামনে একদম চুপ। হরমোহিনীকে শ্রদ্ধাযত্নও যে না করে তা নয়। বাইরে খুবই কেতা-দুরস্ত। কিন্তু হরমোহিনীর মনে হয় ও সবই যেন বাইরে বাইরে, যা উচিত যা কর্তব্য তা করে যাচ্ছে কেবল। ঠিক প্রাণের যোগ নেই। শিউলির যেমন আছে। শিউলি আলবিড্ডে, অগোছালো, হি হি করে হেসে মরছে, ওর শত দোষ, ও কিন্তু ভালবাসে হরমোহিনীকে। ভারী সরল মেয়েটা। অরুণা সে রকম নয়। অরুণা স্বতন্ত্র, ছিমছাম, যেন ভিন্নলোকবাসিনী।

ও এসে যা বললে তাতে অবাক হয়ে গেলেন হরমোহিনী। বলল, "বাবার কাছে শেক্‌স্‌পীয়র পড়ব বলে এসেছি।"

শেক্‌স্‌পীয়র পড়বে বলে? সংসার ফেলে চলে এসেছে শেক্‌স্‌পীয়র পড়বে বলে? আর হরেন তাতে আপত্তি করেনি! ধন্যি আজকালকার ছেলে-মেয়েরা। সে ঠাকুরের রান্না খাবে, আর বউ এসে শেক্‌স্‌পীয়র পড়বে? আর ব্রজেন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখেও অবাক হয়ে গেছেন তিনি। ব্রজেন্দ্রনাথের বুদ্ধির উপর তাঁর কোনকালেই আস্থা নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি হকচকিয়ে গেছেন একেবারে। তিনিও এই বুড়োবয়সে পুরোনো বইপত্র বার করে শেক্‌স্‌পীয়র নিয়ে মেতে উঠলেন। কি কাণ্ড!

উষা মেতে উঠেছে পিকনিক নিয়ে। রূপ-রেখা আর শিউলিও। হরমোহিনী এখনও মরেন নি, কিন্তু রূপ-রেখা এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন সে-ই এ বাড়ির কর্ত্রী। হরমোহিনীর মত না নিয়েই পিকনিকের জায়গা ঠিক হয়ে গেছে, 'মেনু' ঠিক হয়ে গেছে, কি কি হবে তা ঠিক হয়ে গেছে, ভাঙা গ্রামোফোনটা সারানো হয়ে গেছে—এখন সবাই মিলে ধরেছে হরমোহিনীকে পায়েস আর চাটনি করতে হবে। ওদুটো জিনিস নাকি ওঁর মতো কেউ রান্না করতে পারে না। ব্রজেন্দ্রনাথই নাকি ভিতরে ভিতরে উসকে দিয়েছেন উষাকে, তোর মাকে বল ওই দুটোর ভার

নিতে। আমার ডায়াবেটিসের কারণ ওঁর রান্না পায়েস। হরমোহিনীর হাসিও পায়, দুঃখও হয়। আশকারা দিয়ে দিয়ে এদের যে কোথায় উনি নিয়ে যান, কতদূর পর্যন্ত যে ওদের দৌড়, সেইটিই তিনি দেখতে চান কেবল!

তিন বউয়ের চক্রান্ত সফলই হয়েছিল বলতে হবে। কারণ মাসখানেক সত্যিই তারা এমন হৈ হৈ করেছিল যে ঊষার বিয়ের কথা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার সময়ই পাননি ব্রজেন্দ্রনাথ বা হরমোহিনী।

কিন্তু বিজ্ঞাপনের উত্তর এসেছিল অনেক। তিনি ছেলে সে সব ঠিকানা পাঠাতে লাগল ব্রজেন্দ্রনাথকে। তিনি আবার চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

।। বাইশ।।

ব্রজেন্দ্রনাথের চিঠির যে সব জবাব আসতে লাগল তা নিম্নলিখিত প্রকার ঃ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। আপনার সঙ্গে যদি পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হয় তাহলে তা বিশেষ আনন্দের হবে। আমার পুত্রটি বিবাহযোগ্য। লণ্ডন থেকে বি. এস-সি. পাস করেছে। বয়স ঠিক পঁচিশ বছর। এখন সে বাড়িতে বসে আছে। কিন্তু কাজ শীঘ্রই পাবে। অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছে, দু'এক জায়গায় ইন্টারভিউও দিয়ে আসছে। একটি কথা জানানো দরকার মনে করি। আমার ছেলেটি উগ্ররকম ফরসা। আমার ইচ্ছা এবং আমার স্ত্রীরও ইচ্ছা মেয়েটি যাতে গৌরাঙ্গী এবং সুশ্রী হয়। আপনি তার চেহারার বিশেষ বিবরণ পাঠাবেন। প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

মাননীয় ব্রজেন্দ্রবাবু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হল, তার জন্যে মার্জনা করবেন। আমি যখন আপনার বিজ্ঞাপন দেখে আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম, তখন আমার ধারণা ছিল যে আমার ভাগিনেয় বিবাহে সম্মত আছে। কিন্তু এখন দেখছি বিপরীত। সে ডি. এস-সি-র জন্য রিসার্চ করছে। সেটা শেষ না হলে বিবাহ করবে না। আমি তার মত করাবার জন্যে তার কর্মস্থানেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী নয়। অতএব আমার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও এ বিষয়ে উপস্থিত অগ্রসর হওয়া গেল না। ক্ষমা করবেন।

ইতি—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১৩।৪ তারিখের চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনি স্বনামধন্য পুরুষ, আপনার পরিচয় দরকার হয় না। আপনি আপনার কন্যার যে ঠিকুজিটি পাঠাইয়াছেন, তাহা একাধিক

জ্যোতিষীকে দিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু মিল কিছুতেই হইল না। সুতরাং বুঝিলাম আপনার সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন বিধাতার অভিপ্রেত নয়। আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ইতি—

সবিনয় নিবেদন,

আপনি বিখ্যাত লোক, আপনার পত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার ছেলে এবার আই. এ. এস. পরীক্ষায় পাস করিয়াছে তাহা ঠিক, কিন্তু সে এখন বিবাহ করিতে চায় না। তাহার বয়সও অল্প। মাত্র তেইশ বছর কয়েক মাস। আপনার বিজ্ঞাপনের উত্তরে চিঠি লিখিয়াছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি অবশ্য ছেলের বিবাহ দিতে উৎসুক। কিন্তু ছেলে বলিতেছে এখন বিবাহ করিবে না। প্রীতি ও নমস্কার জানিবেন। ইতি—

মান্যবরেষু,

আপনার ১৪।৪ তারিখের পত্র পাইয়াছি। আমার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র বিবাহিত। তৃতীয় পুত্র সুইজারল্যাণ্ড হইতে টি. বি. স্পেশালিস্ট হইয়া ফিরিয়াছে। ভালো হাসপাতালে বড় চাকরি পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমার তিনটি কন্যা এখনও অবিবাহিতা। তাহারা সকলে স্কুলে মাস্টারি করে। আমার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রবধূও চাকুরিস্থ। আজকাল মেয়েরা চাকরি না করিলে সংসার চলে না। আমার তৃতীয় পুত্রের ইচ্ছা তাহার বউও চাকরি করুক। ইহাতে আপনার মত আছে কি না জানাইবেন। নমস্কার লইবেন।

ইতি—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। জ্ঞাতার্থে জানাই যে আমার ছেলেটি বি. কম. ফেল। কোথাও তাহার চাকুরি জুটাইতে পারি নাই। এখন ভরসা তাহার স্ত্রীর ভাগ্যে এবং শ্বশুরকুলের সহায়তায় যদি কোথাও জোটে। আমি সরল মানুষ। সব কথা খুলিয়াই লিখিলাম। আমার ছেলের যদি কোন চাকুরির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, এক্ষুনি আমি রাজী হইব। কথাটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার দুটি অবিবাহিত কন্যা আছে। স্ত্রী রোগবশত কর্মপটু নহেন। যদি আপনার কন্যা আমার গৃহে পুত্রবধূরূপে আসেন তাঁহাকে সংসারের ভারও লইতে হইবে। সব কথা খুলিয়াই লিখিলাম। আগেই সব খোলসা হইয়া যাওয়া ভালো। আপনার পত্রের আশায় রহিলাম। নমস্কার জানিবেন।

ইতি—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইলাম। আজকাল সৎপাত্র যেমন দুর্লভ, সৎপাত্রীও তেমনি। আমার ছেলেটি এম. এস-সি. পাস করিয়া রিসার্চ করিতেছে। বয়স প্রায় বত্রিশের কাছাকাছি। অনেক

সন্ধান করিয়াও তাহার জন্য এযাবৎ একটি সৎপাত্রী যোগাড় করিতে পারি নাই। অন্ততঃপক্ষে দুইশত পাত্রী দেখিয়াছি, একটিও মনোমত হয় নাই। মনোমত পাত্রী বলিতে কি বুঝি তাহা আপনাকে জানানো দরকার। আমার ছেলেটি লম্বা, উচ্চতায় প্রায় সাড়ে ছয় ফুট। সুতরাং পাত্রীর উচ্চতা ছয় ফুট কিংবা পৌনে ছয় ফুট না হইলে মানাইবে না। দ্বিতীয়ত, পাত্রীর বর্ণ ফিট গৌরবর্ণ হওয়া দরকার। কারণ আমার পুত্রের রং কালো। উভয়ের রং কালো হইলে বংশই কালো হইয়া যাইবে। তৃতীয়ত, শিক্ষায় অন্ততঃ গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই। আপনি লিখিয়াছেন আপনার কন্যা বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছে, বি. এস-সি. হইলেই ভালো হইত। আমার ছেলের সহিত শিক্ষায় তাহা হইলে মিল থাকিত। কিন্তু বি. এ. পাসেও চলিবে। কিন্তু পাস করা চাই। চতুর্থত, জানা দরকার আপনার পিতৃকুলের এবং আপনার শ্বশুরকুলের পুত্র-কন্যার সংখ্যা কিরূপ। যদি কন্যার সংখ্যাই বেশী হয়, তাহা হইলে আমি বিবাহ দিব না। কারণ তাহা হইলে আপনার কন্যারও বহুকন্যাপ্রাবিনী হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। সে সম্ভাবনার সম্মুখীন হইতে আমি প্রস্তুত নই। আপনি নামজাদা লোক, আপনার বংশপরিচয় যাহা দিয়াছেন তাহাও নিন্দনীয় নয়। এখন উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য শুনিলে অন্যান্য কথাবার্তা কহিব।

নমস্কারান্তে—

প্রিয় ব্রজেনবাবু,

আপনি যে রতন ব্যানার্জির খোঁজ লইতে বলিয়াছিলেন তাহার খোঁজ লইয়া কোনই হদিস পাইতেছি না। বার্মা শেলের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। বার্মা অয়েল কোম্পানিতেও খোঁজ লইয়াছি, সেখানেও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের লিস্টে রতন ব্যানার্জির নাম পাইলাম না। রতন ব্যানার্জির পিতা শৈলেশবাবুর বাড়িও গিয়াছিলাম। বাড়ি তাঁহার নিজের বাড়ি শুনিলাম, কিন্তু কি জঘন্য বাড়ি। একতলা স্যাঁতসেঁতে। আপনার মেয়ে সে বাড়িতে থাকিতে পারিবে না। শৈলেশবাবু দরিদ্র স্কুলমাস্টার। খুব বিনীত ভদ্রলোক। আমি যাওয়াতে শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে তাঁহার পুত্র কভেনান্টেড চাকরি পাইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কোথাও পোস্টেড হয় নাই। সম্ভবত ভারতবর্ষের বাহিরে হইবে। মোটের উপর পাত্রটি হয়তো ভালো, কিন্তু আপনার মেয়ের উপযুক্ত বলিয়া মনে হইল না। আপনি যথাকালে আপনার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র ঠিক পাইয়া যাইবেন। বিয়ের ফুল না ফুটিলে তো তাহা হইবে না। ততদিন অপেক্ষা করুন। আমার ভালোবাসা সকলে জানিবেন।

ইতি—

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ভালো পাত্রীর সন্ধান পাইব বলিয়া আপনার বিজ্ঞাপনের উত্তরে আপনাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। আমার মেজ ছেলেটি শিবপুরের B. E. বটে। আপনার মতো প্রতিষ্ঠাবান লোকের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু আমার ছেলের বয়স এখনো চব্বিশ পূর্ণ হয় নাই। আপনার কন্যার বয়স লিখিয়াছেন কুড়ি। বয়সের তফাত একটু কম বলিয়া মনে হইতেছে। তাই এই লোভ সংবরণ

করিলাম। আপনার কন্যা সৎপাত্রস্থা হউক—ইহাই কামনা করি। আপনার জানাশোনা অপেক্ষাকৃত কম-বয়সী মেয়ে (ষোল বছরের বেশী নয়) যদি আপনার জানা থাকে জানাইবেন। আমার আন্তরিক প্রীতি ও নমস্কার জানাইতেছি।

ইতি—

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আমার ছেলে এখন বিলাতে। এক বৎসরের আগে ফিরিবে না। ফিরিলেই তাহার বিবাহ দিব। ইতিমধ্যে তাহার জন্য কন্যা বাছিয়া রাখিতেছি। আপনার কন্যার উচ্চতা, বর্ণ, দেহের ও চোখ মুখের গড়ন কেবল জানাইবেন। সম্ভব হইলে একটি ফোটোও পাঠাইবেন। আমাদের যদি পছন্দ হয় আপনাদের সহিত পরে পত্রালাপ করিব। আশা করি ভালো আছেন।

নমস্কারান্তে—

মান্যবরেষু,

আপনার পত্র পেয়ে একটু হতাশ হলাম। আমি আপনার পোস্ট বক্সে যখন চিঠি লিখেছিলাম তখন ভাবিনি যে আপনার মতো স্বনামধন্য ব্যক্তির নাগাল পাব। কিন্তু নাগাল পেয়েও কোনও সুবিধা হল না। আমরা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তদুপরি আপনার সগোত্র। এ অবস্থায় এ বিষয়ে আর আলোচনার অবসর থাকে না। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনার প্রস্তাবে আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি এবং আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হলে নিঃসন্দেহে সুখী হতাম। কিন্তু কি করব উপায় নাই। সামাজিক বাধানিষেধ আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়, একথা আপনি নিশ্চয়ই বিবেচনা করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

নমস্কারান্তে—

এই ধরনের অনেক চিঠি আসতে লাগল। কোথাও একটুও আশা বা আশ্বাসের সুর নেই। মরিয়া হয়ে উঠলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। হরমোহিনীর ঠাকুর প্রায় পঞ্চাশ টাকার সিন্নি খেলেন, হাসলেনও কয়েকবার কিন্তু কৃপা করলেন না। অবশেষে সকলের কলকাতায় যাওয়া স্থির হল। ঠিক হল সেখানেই বসে ব্রজেন্দ্রনাথ কোমর বেঁধে লাগবেন আবার। কলকাতায় সব পাওয়া যায়, পাত্রও পাওয়া যাবে।

।। তেইশ।।

অদ্ভুত জায়গা কলকাতা। অনেকদিন পরে ব্রজেন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে অভিভূত হয়ে পড়লেন। এত ভিড়, এত অসুবিধা, এত স্থানাভাব কিন্তু এর মধ্যেই একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগলেন তিনি। আর কিছু নয়, এই ভিড়ের মধ্যেও বেশ একটা একাকিত্ব, কেউ কারু হাঁড়ির খবর নেয় না। জনস্রোত চলেছে, কেউ কারও খবর রাখে না। সবাইয়ের লক্ষ্য নিজের স্বার্থের উপর নিবদ্ধ। ঘাড় ফিরিয়ে অপরের দিকে চাইবারও অবসর নেই কারও। এর মধ্যেই

নরেন আরও দুটি সম্বন্ধ এনেছিল। একটি ইন্‌জিনিয়ার, উপাধি চক্রবর্তী। হরমোহিনী রাজী হলেন না। দ্বিজেনবাবুর সংসার স্বচক্ষে দেখেও তাঁর মত বদলায়নি।

দ্বিতীয় পাত্রটি গাঙ্গুলী। ছেলেটি মন্দ ছিল না, কিন্তু কোষ্ঠী মিলল না। তার সপ্তমে রাহু, শনি এবং রবি দেখে ব্রজেন্দ্রনাথের জ্যোতিষীই এখানে বিয়ে দিতে বারণ করলেন।

বরেন একটি প্রফেসার ছেলের কথাও বলেছিল, কিন্তু প্রফেসার পাত্রও হরমোহিনীর পছন্দ নয়।

হরেন একটি এয়ার-পাইলট পাত্র এনেছিল। কিন্তু তখন উপর্যুপরি কয়েকটি এরোপ্লেন দুর্ঘটনার কথা কাগজে বেরিয়েছে, সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথ হরমোহিনী দুজনেই পেছিয়ে গেলেন। হরমোহিনী বললেন, "মানুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। ওরা কি মানুষ, ওরা পাখি।" হরমোহিনী সমানে জেদ ধরে বসে রইলেন কলিকাতা নিবাসী 'বন্দ্যোপাধ্যায়' উপাধিধারী সৎপাত্র না পেলে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

সুতরাং অবস্থা আগে যেমন জটিল ছিল, কলকাতায় এসেও ঠিক তেমনি রইল। জট এতটুকু খুলল না। মাঝে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন পরিচিত সাধু এসেছিলেন। কানু ছাড়া যেমন গান নেই, তেমনি মেয়ের বিয়ের কথা ছাড়া ব্রজেন্দ্রবাবুর মুখে আজকাল অন্য কথা নেই। তিনি কথায় কথায় মহারাজকে বললেন, "আজকাল মেয়েদের বিয়ে দেওয়া ঘোরতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মেয়েটির জন্য পাত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলুম। আর পেরে উঠছি না। ভাবছি বি. এ. পাস করলে ওকে এম. এ. ক্লাসে ভরতি করে দিয়ে যাব। তারপর যা হয় হবে। যা হবে তাও দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কোনও বয়ফ্রেণ্ডকে বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত। যুগের এই হাওয়া আজকাল---"

স্বামীজী বললেন, "এ যুগের হাওয়ায় সবাই গা ভাসিয়ে দিলে সমাজ উচ্ছন্ন যাবে। আজকালকার ধনী সমাজ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল অত্যধিক পয়সা থাকার জন্য। গরীব সমাজও উচ্ছন্ন যাচ্ছে দারিদ্র্যের জন্য। মধ্যবিত্ত সমাজের কিছুটা এখনও আঁকড়ে ধরে আছে প্রাচীন প্রথা। তারাই একমাত্র তাদের মধ্যেই আমাদের সমাজের সুন্দর আদর্শটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তারাই এখনও কন্যাকে সযত্নে লালন-পালন করে সৎপাত্রে সম্প্রদান করে। তারাই এখনও বাবা মায়ের শ্রাদ্ধ করে, তারাই দশবিধ সংস্কারের ধারক। বাকী সব বেজাত হয়ে গেছে, জাতের বৈশিষ্ট্য, কৌলিন্য সব হারিয়ে সাহেবদের নকল করে হাস্যকর হয়েছে। চতুর্দিকেই বর্ণসঙ্কর। বিবেকানন্দ আমাদের দেশের সনাতন বিবাহ পদ্ধতিকে সমর্থন করতেন। বলতেন, একমাত্র পিতা-মাতাই কন্যার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র নির্বাচন করতে পারে, আর কেউ পারে না। কন্যা মোহে অন্ধ হয়ে অনেক সময় বিপথগামিনী হয়। আজকাল সুবিধাবাদীদের যুগ। সুবিধা হবে বলে কাপড় ছেড়ে ঝোলা পায়জামা পরে 'সবাই', সুবিধা হবে বলে যেখানে সেখানে হোটেলে খায়, সুবিধা হবে বলে চাকুরে মেয়ে বিয়ে করে, সুবিধা হবে বলে যে-কোনও দুরাত্মার পায়ে প্রণত হতে তাদের আপত্তি নেই। মাত্র কয়েকটি মধ্যবিত্ত পরিবার এখনও এই হাস্যকর অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আগলে আছে পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার। মনে রাখবেন আপনি তাদের মধ্যে একটি। যে আধুনিকতা অসংযমের নামান্তর আপনিও তাতে গা ভাসিয়ে দেবেন না। খবরদার না!"

হরমোহিনী মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। মহারাজের বক্তৃতা শেষ হতেই প্রণাম করলেন তাঁকে। তারপর বললেন, "আপনি আমার মনের কথাটি বলেছেন মহারাজ। এরা মেয়েকে যেখানে সেখানে বিয়ে দিতে চায়, মেয়েকে চাকরি করতে বলে—একমাত্র আমি রুখে দাঁড়িয়েছি বলে পারেনি।"

"মেয়েরাই তো যুগে যুগে ধর্মের রক্ষক মা।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন,"কিন্তু আমার যে প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছে। কোথাও যে মনোমত পাত্র পাচ্ছি না।"

"পাবেন পাবেন"—আশ্বাস দিলেন মহারাজ—"যখন সময় হবে পেয়ে যাবেন। যেখানে ভবিতব্য সেখানেই হবে। আপনি বৃথাই ভেবে মরছেন—ইংরেজিতে একটা কথা আছে, marriages are made in Heaven. মর্ত্যের ওতে কোন হাত নেই।"

মহারাজ চলে গেলেন।

সেই দিনই রাত্রি সাড়ে দশটার সময় দুয়ারের কড়া নড়ল। ব্রজেন্দ্রনাথই তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিলেন। দেখেন এক সৌম্যদর্শন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাথার চুলে যদিও পাক ধরেছে, কিন্তু মুখে চোখে যৌবনের ছটা। নমস্কার করে বললেন, "আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো।"

এক মুখ হেসে বললেন, "আমাকে চেনবার কথা নয়। এই চিঠি আপনি আমাকে লিখেছিলেন।"

একটি চিঠি দিলেন। কুসুমিকা কিছুদিন আগে যে ইনজিনিয়ার পাত্রটির খবর দিয়েছিল তার বাবাকে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি চিঠি লিখেছিলেন কলকাতায় আসার আগে। দেখলেন ভদ্রলোক সেই চিঠিখানি এনেছেন।

"ও। আপনিই কি ভূপেশবাবু?"

"হ্যাঁ আমিই।"

"আসুন আসুন আসুন। এত রাত্রে আপনি কষ্ট করে এলেন কেন! এক লাইন লিখে জানালে আমিই যেতুম আপনার কাছে—"

"তাতে কি হয়েছে"—এক মুখ হেসে বললেন ভূপেশবাবু—"বিয়ে তো ভবিতব্যের হাতে, যদি হবার হয় হয়ে যাবে। ভাবলাম বিয়ে হোক আর না-ই হোক, একজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আলাপ তো করে আসি—"

হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসিতে শিশুর সারল্য।

"ঊষা—ঊষা—"

ঊষা পাশের ঘরেই ছিল। এসে দাঁড়াল।

"এইটেই আমার মেয়ে, প্রণাম কর—"

ঊষা প্রণাম করল।

"বাঃ—"

এরপর আর কিছুতেই আটকাল না। অতিশয় সহজভাবে সব হয়ে গেল। ভূপেশবাবু কোষ্ঠি

পর্যন্ত চাইলেন না। বললেন, "অদৃষ্টকে দেখা যায় না। দেখবার চেষ্টা করাও বাতুলতা। ভগবান যা করবেন তা-ই হবে।"

ব্রজেন্দ্রবাবু সসংকোচে একবার দেনা-পাওনার কথা তুলেছিলেন। ভূপেশবাবু হেসে বললেন, "দেনা-পাওনা ক্যানসেল্স্ ইচ্ আদার (cancels each other). তবে বরপণ আপনাকে দিতে হবে। যে পণ আমার বাবা নিয়েছেন, আমি নিয়েছি, আমার বড় ছেলে নিয়েছে সে পণ আপনাকেও দিতে হবে। নগদ একটি টাকা—"

হো হো করে হেসে উঠলেন নিজের রসিকতায় নিজেই। তার পরদিন এসে বললেন— "ও মশাই, যে বরপণ দাবি করেছিলুম তা-ও আর আদায় করতে পারব না। কাগজে দেখেছেন নিশ্চয়, ডাউরি বিল পাস হয়ে গেছে!"—আবার সেই হো হো হাসি।

ব্রজেন্দ্রনাথ হরমোহিনী দু'জনেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এমনটা যে এ যুগে সম্ভব তা তাঁরা ভাবতে পারেননি।

।। চব্বিশ ।।

নির্দিষ্ট দিনে মহাসমারোহে বিবাহ হয়ে গেল। বিয়ের দিন ভিড়ে গোলমালে ব্যস্ত ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। সেদিন তিনি বুঝতে পারেননি উষা চলে গেলে তাঁর কি অবস্থা হবে। কিন্তু যখন উষা সিঁথের সিঁদুরে দশদিকে আলো করে হাসিমুখে চলে গেল, সেদিন তিনি যেন অন্ধকার দেখলেন চোখে। মনে হল একা থাকব কি করে। ঠিক ওই সময়ে আবার দুয়ারে কড়া নড়ল। একাই বসেছিলেন তিনি। উঠে কপাট খুলে দিলেন। কপাট খুলেই ভূত দেখলেন যেন।

"এ কি কুসি? তুই! এ কি তোর চেহারা—"

কুসুমের চেহারা জরাজীর্ণ, চক্ষু কোটরগত, চোখের কোলে কালি। দাঁতগুলো বড্ড বেশী বড় দেখাচ্ছে। মাথার সামনে চুল উঠে গেছে। চুলে তেল নেই। গালের হাড় দুটো উঁচু।

"হ্যাঁ, চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। গত দু'মাস থেকে রোজ জ্বর হচ্ছিল। কাল মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে। তাই বাবা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন—"

"ও। আচ্ছা বোস। কিছু খেয়েছিস? নরেন বেরিয়ে গেছে। সে এলে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ভয় কি। ভালো হয়ে যাবি—"

"উষার বিয়ের চিঠি আমরা পেয়েছিলুম। বাবা ভূপেশবাবুকে চিনতেন। তিনিও একটা চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে। ছেলেটি খুব সুন্দর, নয়?"

"হ্যাঁ—"

"আমার শরীর খারাপ বলে, আর তো আসতে পারিনি। কিন্তু কাল মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে চলে এলুম।"

"বেশ করেছিস। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ব্রজেন্দ্রনাথ আশ্বাস দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর গলার স্বর কেঁপে যাচ্ছিল।

।। পঁচিশ।।

কুসুমিকার যক্ষ্মাই হয়েছিল। নরেন তাকে একটা ভালো স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দিলে। ডাক্তাররা আশা দিলেন ভালো হয়ে যাবে। স্যানাটোরিয়মের খরচ ব্রজেন্দ্রনাথ দেবেন বললেন।

যাবার আগে কুসুমিকা ম্লান হেসে বলল, "কাকাবাবু, আমার স্কুলটার কি হবে? আমি অনেক জায়গায় ঘুরে দেখলুম, কম মাইনেতে কোন ভাল টিচার আসতে চায় না। আমি তো বিনা মাইনেতে কাজ করতুম। আমি চলে গেলে স্কুলে ইংরিজি পড়াবে কে?"

"আমি পড়াব—"

বলে উঠলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। বলে হঠাৎ যেন তৃপ্তি পেলেন।

কুসুমিকা মাদ্রাজে চলে যাওয়ার পরদিনই ব্রজেন্দ্রনাথ হরমোহিনীকে বললেন, "তুমি ছেলেদের কাছে থাক। আমি দেবেনের কাছে যাচ্ছি—ওর স্কুলে পড়াব।"

"তুমি এই বয়সে পারবে ওই পাড়াগাঁয়ে থাকতে?"

"পারব, পারতেই হবে। ওইটুকু কচি মেয়ে যা পেরেছে তা আমি পারব না—"

কারও কথা শুনলেন না, পরদিনই চলে গেলেন।

দিন পনেরো পরে হরমোহিনীও সেখানে গিয়ে হাজির। বিস্মিত দেবেনবাবু বললেন, "একি বউদি, আপনি চলে এলেন যে!"

হরমোহিনী হেসে উত্তর দিলেন—"এলুম। ঝগড়া করতে না পেরে গলা কুটকুট করছে।"

"কি কাণ্ড!"